জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক — { শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র
শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম যান্মাসিক সূচীপত্র
১৯৪৯

দ্বিতীয় বর্ষ ; জানুয়ারি—জুন, ১৯৪৯

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাষিক বিষয় সূচী জানুয়ারি হইতে জুন। ১৯৪৯

জানুয়ারি '৪৯

(ক)

ফেব্রুয়ারি '৪৯

মার্চ '৪৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক লেখক সূচী (জানুয়ারি হইতে জুন, ১৯৪৯)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক— শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষান্মাসিক সূচীপত্র
১৯৪৯

দ্বিতীয় বর্ষ ; জুলাই—ডিসেম্বর ১৯৪৯

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষান্মাসিক বিষয় সূচী ; জুলাই হইতে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

জুলাই—'৪৯

আগষ্ট—'৪৯

সেপ্টেম্বর—'৪৯

অক্টোবর—'৪৯

নভেম্বর—'৪৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক লেখক সূচী (জুলাই হইতে ডিসেম্বর, ১৯৪৯)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | জানুয়ারী—১৯৪৯ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

আমাদের দেশের মতো সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন দেশে বিজ্ঞানবিষয়ে কৌতূহল এবং আগ্রহ জাগতে সুদীর্ঘ কাল কেটে যাবার কথা, সুতরাং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সীমাবদ্ধ চেষ্টায় এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মতো বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা দ্বারা হাতে হাতে ফলপ্রাপ্তির আশা আমরা করিনি। কিন্তু তবু আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করছি যে এই এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও আমাদের উদ্যমের সার্থকতা বিষয়ে আমরা অধিকতর আস্থাবান হয়ে উঠেছি এবং আমাদের গুরুদায়িত্ব বিষয়ে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছি। তার একটি প্রধান কারণ এই যে আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী ও আমাদের সরকারের কাছ থেকে আমরা প্রথমেই যে পরিমাণ সাড়া পাব বলে আশা করেছিলাম, তা আমরা পেয়েছি।

কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা দ্বারা ব্যাপক ভাবে সাড়া জাগাতে হলে স্বভাবতঃই আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। কারণ বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্ঞান অথবা বস্তু নিরপেক্ষ জ্ঞান প্রচার আমাদের একটি লক্ষ্য হলেও আমাদের প্রধান লক্ষ্য, বর্তমান যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিল্প উৎপাদন ও বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে সেই দিকে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করা। এটা আমাদের করতেই হবে। কারণ বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা প্রায় শুরু হয়েছে এবং ঐ সঙ্গে ধীরে ধীরে দেশের নানাবিধ শিল্প যার জন্যে এতকাল আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম তারও উৎপাদন ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের বহুবিধ সম্ভাব্য-প্রয়োগের ক্ষেত্র সবে উন্মুক্ত হতে চলেছে। কিন্তু তবু একথাও সত্য যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবে দেশের অধিকাংশ লোক এখনও ঘোর সন্দেহবাদীর দলে। তার কারণ বিজ্ঞানকে এখনও লোকে প্রায় অলৌকিক বলে জানে এবং এখনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের দিকে পল্লীবাসীর মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যেমন সে চেয়েছিল ১২৬ বৎসর পূর্বে কলকাতায় প্রথম, আনীত গ্যাসের আলোর দিকে। সে সময়ের খবরের কাগজে

(ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" দ্রঃ) খবরটি এইভাবে বেরিয়েছিল—

"ইংলণ্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে টৌল্মিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন"…(সমাচার দর্পণ, ১৮২২)

এর ভাষা লক্ষণীয়। ১২৬ বৎসর পূর্বের এই ভাষায় যে গ্রাম্য বিস্ময় ছিল সেই বিস্ময় এখনও আমাদের কাটেনি। অর্থাৎ আমরা এখনও জানি বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার একমাত্র বিদেশীর দ্বারাই সম্ভব, ওরা সবই পারে, আমরা কিছুই পারিনা। আমরা বংশ বংশ ধরে কেবল ওদের বৈজ্ঞানিক জয়-যাত্রার দিকে নির্বোধের মূঢ়বিস্ময় নিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকব। তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারাই হয়, এবং আমাদের দ্বারাও সম্ভব এ বোধ আমাদের সহজে জাগতে চায় না।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর এই অবস্থা বেশি দিন থাকতে পারে না। এখন, আমাদের এই দীর্ঘ কালের মানসিক জড়তা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন দেখতে পাব আমরা বিজ্ঞানের বিবিধ প্রয়োগ বিভাগে জড়িয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখতে পাব আমাদের ডাক পড়েছে শত রকম শিল্প গঠন সম্ভব করার কাজে। এর জন্যে বহুরকম কৌশল এবং কল নিজেদেরই উদ্ভাবন করে নিতে হবে, যেমন ইউরোপবাসীরা তাঁদের জন্যে করেছে। আর এই উপলক্ষেই আমাদের জনসাধারণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে বহু আবিষ্কারক, বহু উদ্ভাবক। সুতরাং আমাদের কাছে বিজ্ঞানের অলৌকিকত্ব ধূলিসাৎ হয়ে বিজ্ঞান অচিরে হবে লোকায়ত্ত। বৈজ্ঞানিকেরা তত্ত্ব আবিষ্কার করবেন গবেষণাগারে, সাধারণ লোক তার করবে প্রয়োগ দেশের মাটিতে। সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে, সুতরাং বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভাগে অন্ততঃ জনসাধারণের কৌতূহল অল্পদিনের মধ্যেই আশাতীত বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় হাতে কলমে পরীক্ষা বিষয়ে যে অধ্যায়টি প্রতিমাসে দেওয়া হচ্ছে সেটি ইতিমধ্যেই কৌতূহলীদের মনে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। সাড়া যে জাগাবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু তবু একথা স্বীকার করি যে পাঠক-মহল থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপর যতটা দাবী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে ততটা দাবী পূরণ করার মতো অবস্থা এখনও আমাদের আসেনি। আমাদের বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে, এবং সবিনয়ে জানাই এই ত্রুটি-বিচ্যুতির অনেকখানিই আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। আশা করছি ১৯৪৯ সালে আমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আরও কিছু উন্নতি করতে পারব। আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, এবং কাগজের দিক দিয়ে যদি কিছু সুবিধা হয় তা হলে পত্রিকখানি যাতে একঘেয়ে চেহারায় আবদ্ধ হয়ে না থাকে সে দিকে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখব।

পাঠকদের কাছে নিবেদন তাঁরা যেন সহজভাষায় প্রয়োজনীয় এবং অবিলম্বে প্রয়োগযোগ্য বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখে আমাদের সাহায্য করেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা সম্বলিত দীর্ঘ প্রবন্ধের স্থান এতে কম আছে, যদিও তত্ত্বালোচনাও এ পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু কার্যকরী এবং প্রয়োগযোগ্য বিষয় সমূহের আলোচনা অধিকাংশ স্থান অধিকার করায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমশঃ জনপ্রিয় হবে এবং দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরও কিছু এগিয়ে গেলে বহুবিধ সমস্যার উত্থাপন ও তার মীমাংসার জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক এই একমাত্র বাংলা পত্রিকা-খানিকেই আশ্রয় করতে হবে সবাইকে।

পরিশেষে আমাদের লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপন-দাতা ও শুভার্থীমাত্রকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এক্স-রে'র ব্যবহারিক প্রয়োগ*

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

এক্স-রে আবিষ্কার হয়েছে আজ প্রায় ৫০ বৎসর। ১৮৯৫ সালে জার্মান অধ্যাপক রোণ্টগেন প্রায় বায়ুশূন্য কাচ নলের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ পরিচালনা করতে গিয়ে দেখেন যে, কাগজে মোড়া ফটোগ্র্যাফির প্লেট, কাচনল হ'তে বিচ্ছুরিত অদৃশ্য আলোকের ক্রিয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে।

এই রশ্মি আবিষ্কারের পর থেকে এর নানা-প্রকার প্রয়োগ গূঢ় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে লেগেছে।

এক্স-রে'র একটা প্রয়োগ অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে কোনও যন্ত্র বিকল হলে ডাক্তার বা সার্জন যদি তার স্বরূপ ভালভাবে জানতে চান তা'হলে তাঁকে এক্স-রে'র সাহায্য নিতে হয়। হাত ভাঙ্গা, পাকস্থলী, অন্ত্র বা ফুসফুসের কোনও বিকৃতি আশঙ্কা করলেই ডাক্তার বলেন এক্স-রে করিয়ে ছবি আন। এই সব এক্স-রে ছবি তোলার আজকাল প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে আধ ঘণ্টা লাগত আজকাল সেখানে আধ মিনিটও লাগে না।

কিন্তু ডাক্তারীতে রোগ নির্ণয় ছাড়া সম্প্রতি কলকারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও যে এক্স-রে'র অদ্ভুত প্রয়োগ চলছে, তার কথা অনেকেই জানেন না। আজ সেই প্রসঙ্গে কিছু বলব।

এক্স-রে'র এই'সব প্রয়োগ বুঝতে হলে গোড়ায় এক্স-রে কি ও এর কি গুণ, সে সম্বন্ধে কিছু জানা চাই। রোণ্টগেন যখন এক্স-রে আবিষ্কার করেন, তখন তিনি এর প্রকৃতি কি জানতেন না। সেইজন্য এই রশ্মির নাম তিনি দেন এক্স বা অজানা। এক্স-রে'র স্বরূপ বের হয় ১৯১২ সালে অধ্যাপক ল কর্তৃক। পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, এক্স-রে অদৃশ্য আলোক মাত্র। শুধু সাধারণ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চাইতে এর তরঙ্গের দৈর্ঘ প্রায় দশ হাজার গুণ ছোট। এই আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের দুই খ্যাতনামা পিতাপুত্র বৈজ্ঞানিক—উইলিয়ম্ ও লরেন্স ব্র্যাগ এক্স-রে'র সাহায্যে ক্রিষ্ট্যালের মধ্যে অণু-পরমাণুর বিন্যাস বের করার জন্য সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেন। যে কোনও ক্রিষ্ট্যাল যেমন, চিনি বা মিছরির দানা, নূন, তুঁতে, হীরাকষের টুক্‌রার জ্যামিতিক আকার দেখলেই মনে হয় এর ভিতর অণু-পরমাণুগুলি নিশ্চয়ই শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান আছে। এরূপ যে সাজান থাকা সম্ভব তা বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন হতেই অনুমান করেছিলেন; কিন্তু কোন্ ক্রিষ্ট্যালে ঠিক কি রকম সাজান তা জানার কোনও উপায় ছিল না। পিতা-পুত্র ব্র্যাগদ্বয়ের গবেষণায় এই বিন্যাস সঠিক ভাবে জানার উপায় বের হয়। এক্স-রে যখন কোনও ক্রিষ্ট্যালের উপর পড়ে তখন তার ভিতরের সুবিন্যস্ত পরমাণুগুলি দ্বারা উহা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরিত হওয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে পরমাণুর বিন্যাসের উপর। সুতরাং বিচ্ছুরিত এক্স-রে'র বিন্যাস থেকে ক্রিষ্ট্যালের ভিতরের পরমাণু-বিন্যাস বের করা যায় ও এক্স-রে ছবি থেকে সহজেই বলা যায় যে, ক্রিষ্ট্যাল কিসের ও কি জাতীয়।

এক্স-রে'র এই যে দুটি গুণ—সাধারণ অস্বচ্ছ জিনিষকে ভেদ করে যাওয়া ও ক্রিষ্ট্যালের ভিতর বিন্যস্ত অণু-পরমাণু দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিচ্ছুরিত হওয়া—এ দুটিকে নানারূপ ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রথমে, এক্স-রে'র অস্বচ্ছ বস্তুকে ভেদ করে

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র বেতার বক্তৃতা কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

যাওয়ার বিষয়ই বলি। এক্স-রে'র শক্তি যত বাড়ান যায়, তার ভেদ করার শক্তিও তত বাড়ে। আবার যে বস্তুর পরমাণু-ভার যত বেশী সে বস্তুকে ভেদ করতে তত বেশী শক্তিসম্পন্ন এক্স-রে দরকার হয়। তামার পরমাণুর চাইতে এ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু হাল্কা; সুতরাং এক্স-রে'র পক্ষে এ্যালুমিনিয়ামের পাত তামার পাতের চাইতে স্বচ্ছ। সেই রকম তামার পাত রূপার পাতের চাইতে, রূপার পাত টাংস্টেনের পাতের চাইতে ও টাংস্টেনের পাত সীসার পাতের চাইতে স্বচ্ছ। শিল্পদ্রব্য বা যন্ত্র তৈয়ার করার সময় নানারকম ধাতুর নানা-রকমের পাত, দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটির বাহিরে একটি ধাতুর আবরণ করতে হবে এবং আবরণের ভিতর যন্ত্রের জটিল অংশ সাজাতে হ'বে। কিন্তু ঐ ভিতরের অংশগুলি ঠিকমত নির্ভুলভাবে সাজানো হলো কিনা তা আবরণের বাহির হতে পরীক্ষা করার কোন উপায় নাই। আজকাল এই জাতীয় পরীক্ষণের জন্য, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক শিল্প ও রেডিয়ো ভাল্‌ভের কারখানায় এক্স-রে'র প্রয়োগ বহুল পরিমাণে হচ্ছে। ২।১টা উদাহরণ দিচ্ছি।

ছোট রেডিয়ো ভাল্‌ভের সঙ্গে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। বিজলী বাতির মত একটা কাচের বাল্‌বের ভিতর ভাল্‌ভের কার্যকরী অংশ যেমন এ্যানোড্, গ্রিড্ ও ফিলামেন্ট সাজানো থাকে। বাল্‌বটি কাচের বলে এই সব অংশগুলি ভিতরে ঠিক বসান হ'লো কি না কারিগর বাহির হ'তে দেখ্‌তে পারে। কিন্তু বড় বড় ভাল্‌ভে, যেগুলি ট্রান্সমিটার বা প্রেরক-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় সেগুলির বেলা অসুবিধা হয়। কারণ বড় ভাল্‌ভে বাহিরের আবরণটা কাচের নয়—ধাতুর। এই আবরণটাকে এ্যানোড্ ভাবে ব্যবহার করা হয়—উদ্দেশ্য ভালভ্ চলার সময় এ্যানোডটা যখন খুব গরম হয়, তখন হাওয়া বা জলের সাহায্যে সেটিকে সহজেই ঠাণ্ডা রাখা। কিন্তু ভাল্‌ভের বাইরের আবরণ ধাতুর হাওয়ার জন্য ভিতরের অংশগুলি ঠিক ঠিক স্বস্থানে বস্‌লো কি না তা কারিগর জান্‌তে পারে না। আজ-কাল এই পরীক্ষার জন্য এক্স-রশ্মি ব্যবহার করা হয়। হিসাব ক'রে এমন রশ্মি দিয়ে ছবি তোলা হয় যে, রশ্মি বাইরের তামার তৈরী আবরণের পক্ষে স্বচ্ছ, কিন্তু ভিতরের অংশগুলির পক্ষে অস্বচ্ছ। সুতরাং এক্স-রে দিয়ে ভিতরের অংশগুলির ছায়া-ছবি সহজেই উঠানো যায়। এক্স রশ্মির এই প্রয়োগে বড় বড় ভালভ্ তৈয়ারী অনেক সহজসাধ্য হয়েছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের সময়ও এইরূপ পরীক্ষা চলে। ইলেকট্রিক আর্কের জন্য যে কার্বন দণ্ড ব্যবহার করা হয় তার মাঝে সাধারণতঃ একটা সরল লম্বা ছিদ্র থাকে ও তার ভিতর গুঁড়া কার্বন ঠেঁসে দেওয়া হয়। এরূপ কার্বনে আর্কটা স্থির থাকে, তা না হ'লে আর্ক চঞ্চল হ'য়ে এদিক ওদিক নড়াচড়া করে। এই গুঁড়ার সঙ্গে প্রায় নানারকম ধাতব লবণ মেশান হয়। এইভাবে কার্বন দণ্ড তৈয়ার হ'লে পর তাদের ভিতরের ছিদ্রপথ ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য এক্স-রে ছবি তোলা হয় ও সেই অনুসারে দণ্ড তৈয়ারীর পদ্ধতি ঠিক করা হয়।

ইলেকট্রিক কেৎলি অনেকেই ব্যবহার করেন। এগুলির তলায় একটা প্লেটের মধ্যে নিক্রোমের তার কুণ্ডলী ক'রে জড়ানো থাকে। কারখানায় হাজার হাজার কেৎলির তলায় প্লেটের ভিতর তার জড়িয়ে বসান হচ্ছে—কিন্তু ঠিক হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে এক একটা প্লেট নিয়ে তার এক্স-রে ছবি তোলা হয়। এতে প্লেট খুলে তার ভিতরে পরীক্ষা করার জন্য শ্রম ও সময় অনেক সংক্ষেপ হয়। এইভাবে বিদ্যুৎ-শিল্পের অনেক বিভাগেই আজকাল এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়।

এইবার এক্স-রে'র দ্বিতীয় গুণ, কৃষ্টালের ভিতর বিন্যস্ত অণু-পরমাণু দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিচ্ছুরণের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলি

এক ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতুর খাদ মিশিয়ে নূতন গুণসম্পন্ন নানা রকম ধাতু তৈরী হয়। আজকাল বিশেষ করে লোহার সঙ্গে টাংস্টেন, নিকেল, ক্রেমিয়াম ইত্যাদির খাদ দিয়ে বহু রকমের নানা গুণসম্পন্ন ঢালাই অথবা পেটা লোহার জিনিষ তৈয়ার হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চুম্বক লোহার কথা বলতে পারি। আগে চুম্বক তৈয়ার হত ইস্পাত দিয়ে—লোহার সঙ্গে শতকরা ১ ভাগ কার্বন মিশিয়ে। এর পর এর উন্নতি হয় লোহার সঙ্গে শতকরা ৬ ভাগ টাংস্টেন ধাতু মিশিয়ে। এই লোহার চুম্বকের শক্তি সাধারণ চুম্বক লোহার চাইতে প্রায় দেড়গুণ বেশী। তার পর দেখা গেল, যদি লোহার সঙ্গে শতকরা ৩৫ ভাগ কোবাল্ট মেশানো যায় তা হলে তার তৈয়ারী চুম্বকের শক্তি সাধারণ লোহার চাইতে ৫ গুণ বেশী হয়। এর পর আরো উন্নতি হয় লোহার সঙ্গে কোবাল্ট ও এল্যুমিনিয়াম মিশিয়ে; এর তৈয়ারী চুম্বকের শক্তি প্রায় ১০ গুণ বেশী। এই সব খাদযুক্ত ধাতু তৈয়ারীর জন্য মিশ্রিত ধাতুকে প্রথমে একসঙ্গে গলান হয়। তারপর মিশ্রিত ধাতু যেমন ঠাণ্ডা হতে থাকে, তার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা দানা বেঁধে কৃষ্ট্যাল হয়। এই দানাগুলির প্রকৃতি ও বিন্যাসের উপর ধাতুর গুণ—যেমন, নমনীয়তা, ঘাত সহনতা ইত্যাদি নির্ভর করে। এক্স-রশ্মি সাহায্যে এই দানাগুলির প্রকৃতি অতি সহজেই ধরা যায়। এক্স-রশ্মি পরীক্ষকের মস্ত একটা সুবিধা এই যে, অতি ক্ষুদ্র একটা দানা নিয়েও পরীক্ষা করা যায়। দানাটিকে ভাঙবার বা বিকৃত করার কোনও আবশ্যকতা নাই। বড় বড় লৌহ কারখানায় গবেষণাগারে এক্স-রশ্মি এইজন্য একটা খুব বড় স্থান অধিকার করে আছে।

আরো একটা দিকে এক্স-রে'র প্রয়োগ আজ কাল খুব বেড়েছে। কোনও যন্ত্রের ধাতু নির্মিত অংশ ঢালাই বা পেটাই হ'লে তার ভিতর কোন দোষ আছে কিনা জানা অত্যন্ত আবশ্যক হয়। যেখানে কোনও দোষ থাকে সে জায়গাটি স্বভাবতঃই দুর্বল হয় ও যন্ত্র বা কল চলবার সময় যদি সেই অংশে কখনও দৈবাৎ বেশী জোর বা চাপ পড়ে তা হলে সেই অংশ ভেঙ্গে যায় ও দুর্ঘটনা ঘটে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এরোপ্লেনের কথা বলা যেতে পারে। এরোপ্লেন তৈয়ারীর সময় এ সম্বন্ধে যে অত্যধিক সাবধানতা দরকার তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এরোপ্লেনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ধাতুর অংশ এক্স-রে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ভিতরের কোনও দোষ বাহির হইতে দেখে বা অন্য কোনও উপায়ে জানবার উপায় নেই। কিন্তু এক্স-রে পরীক্ষায় ভিতরের দোষ সহজেই ধরা পড়ে ও সেই অংশ পরিত্যক্ত হয়। এক্স-রে'র সাহায্যে এরূপ স্থলে কড়াকড়ি পরীক্ষণের ফলে এরোপ্লেন বিকল হয়ে বা ভেঙ্গে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম হয়েছে।

এই সব পরীক্ষণের জন্য খুব শক্তিশালী এক্স-রে টিউব আজকাল তৈরী হয়েছে। আমেরিকার ইণ্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী একটা ২০ লক্ষ ভোল্টের এক্স-রে যন্ত্র সম্প্রতি বের করেছেন। এমন কৌশল করে যন্ত্রটি তৈয়ার করা হয়েছে যে; এটিকে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। একটা বিরাট ভারী জিনিষের কোনও অংশ হয় তো পরীক্ষা করতে হবে। ভারী জিনিষটা নড়াচড়া না করে এক্স-রে যন্ত্রটাকেই জিনিষটির কাছে নিয়ে গিয়ে ঠিক স্থানে বসিয়ে ছবি তোলা হয়। যন্ত্রের টিউবটি এত শক্তিশালী যে, এর রশ্মি এক ফুট মোটা ঢালাই লোহা ভেদ করে যেতে পারে।

এক্স-রে'র আরো একটা প্রয়োজন চলছে বয়নশিল্পে। বয়নশিল্পের উপকরণ এতদিন ছিল কার্পাস বা পাটের অথবা রেশমের তন্তু। এখন আবার কৃত্রিম প্লাস্টিকের নানারকম তন্তু তৈয়ার হচ্ছে। এই সব স্বাভাবিক বা কৃত্রিম তন্তুর গঠনে পরমাণুর বিন্যাস কি রকম, কিরূপ বিন্যাসে তন্তু দৃঢ় ও টেকসই হয় তা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। পাট নিয়ে গবেষণা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সে হচ্ছে। এ ছাড়া শুধু প্লাস্টিক নিয়ে যে কত গবেষণা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। নানা রকমের নূতন প্লাস্টিক যে-আবিষ্কার হচ্ছে তার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে রাসায়নিকের অসীম অধ্যবসায়, অপরদিকে তেমনি রয়েছে এক্স-রে'র সাহায্যে পদার্থবিদ্‌দের গভীর গবেষণা।

এক্স-রে'র প্রয়োগ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু বললাম। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এর প্রয়োগক্ষেত্রও যে অনেক বেড়ে যাবে তা সুনিশ্চিত।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যা

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য

মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও প্রয়োগকে প্রয়োগিক মনোবিদ্যা বলে। বিশ্বের এক একটি বিশেষ অংশকে অবলম্বন করিয়া এক একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যেমন পদার্থ-বিদ্যা, আলোক, শব্দ, তাপ, তড়িৎ, চুম্বক প্রভৃতি জড়প্রকৃতির বিশেষ অংশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান, অথবা রসায়ন মৌলিক পদার্থগুলির বিভিন্নমাত্রায় মিশ্রণ হইতে বিবিধ যৌগিকের উৎপত্তি ও স্বভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞান। তেমনই মনোবিদ্যাও মনুষ্যপ্রকৃতির একটি বিশেষ অংশ, মনকে বিষয় করিয়া একটি বিজ্ঞান। সুতরাং আলোচ্য বিষয়বস্তুর দিক্ হইতে বিজ্ঞানের "বিশেষত্ব" ধর্মটি মনোবিদ্যার আছে। দর্শন যেমন সমস্ত বিশ্বের সারভূত সত্য অথবা মূলভূত সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াসী এবং কাজেই বিষয় সম্পর্কে "বিশেষত্ব" বর্জিত, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিদ্যা সেরূপ নয়। মনুষ্যপ্রকতির বিশেষ অংশ মন সম্বন্ধে যাহা কিছু বিজ্ঞানসম্মতভাবে জিজ্ঞাস্য, জ্ঞাতব্য ও করনীয়, তাহাই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।

কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়বস্তুর অংশে "বিশেষ" হইলেও ফলাংশে নির্বিশেষ। বিশেষ বস্তুর স্বভাব ও ক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান যে নিয়মসূত্রগুলি বাহির করে তাহা শুধু ইহার পর্যবেক্ষণলব্ধ একটি মাত্র দৃষ্টান্তে অথবা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু ঐ জাতীয় সকল বস্তুতেই প্রয়োজ্য। যেমন, একটি আপেলের পতনকে উপলক্ষ্য করিয়া মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কৃত হইলেও, এই সূত্রটি শুধু ঐ একটি মাত্র আপেল পতনেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু যে কোন জড়বস্তুতেই প্রযোজ্য। যে বিজ্ঞান কতকগুলি সার্বভৌম ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মসূত্র আবিষ্কার করিয়া নির্বিশেষ অথবা "সাধারণ" জ্ঞানে পৌঁছা-ইতে পারে না তাহা বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানীর কল্পনাবিলাস নয়, অথবা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ইহা সকলেরই পক্ষে পরীক্ষ-ণীয় অথবা পরীক্ষিত সত্য। মনোবিদ্যায় এই "সাধারণত্ব" অথবা সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে। কারণ, মনোবিদ্যা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ সাহায্যে যে সকল নিয়মসূত্র আবিষ্কার করে তাহা শুধু কোন বিশেষ ব্যক্তির মনেই সীমাবদ্ধ নয়, উপরন্তু সকলের মন সম্বন্ধেই সমভাবে সত্য ও প্রয়োগসহ। সুতরাং মনোবিদ্যাকে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান বলা অসমীচীন।

অধিকন্তু, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিদ্যা প্রণালী অথবা পদ্ধতিবদ্ধ উপায়ে তাহার বিষয়বস্তু মনের অনুসন্ধান করে। প্রদর্শিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া কোন সমাধান বাহির করিলে মনোবিদ্যা উহাকে স্বীকার করেনা, যেমন অন্যান্য বিজ্ঞান নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক "পদ্ধতি" উপেক্ষা করিয়া কিছু বলিতে অথবা করিতে চাহিলে তাহা গ্রাহ্য করে না। চতুর্থতঃ বিজ্ঞানের নিয়ম অথবা সমাধানগুলি পরস্পর বিরোধ অথবা বাস্তবের সহিত বিরোধ বর্জিত। বিজ্ঞানী যদি এমন কিছু আবিষ্কার করেন যাহা অন্যান্য পরীক্ষিত অথবা স্বীকৃত সত্যের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে বিজ্ঞানীর সেইরূপ আবিষ্কার পরিত্যজ্য। মনোবিদ্যাও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় স্বসামঞ্জস্য ও বাস্তব সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যাহা কিছু মনোবিদ্যা আলোচনা করে তাহা বিচার করিবার মানদণ্ড বাস্তব ও স্ব-বিরোধ শূন্যতা। পঞ্চমতঃ, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনো-

বিদ্যাও ধাপে ধাপে প্রণালীবদ্ধভাবে অগ্রসর হয় এবং সেই কারণে ইহার সিদ্ধান্তগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যথার্থ ও নিখুঁত। অবশ্য যথার্থ অথবা নিখুঁত বলিতে এইটুকুই বুঝায় যে, আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তগুলির কোন ভ্রান্তি অথবা অসত্যতা পরিলক্ষিত হয় নাই। শেষতঃ, বৈজ্ঞানিক সমাধানগুলি নিশ্চিত, যেহেতু সমস্ত ফলাফল সূক্ষ্ম আঙ্কিক অথবা সংখ্যা বৈজ্ঞানিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞানের সকল লক্ষণগুলিই মনোবিদ্যায় বর্তমান। সুতরাং মনোবিদ্যা যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। উপরন্তু মনোবিদ্যা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ বিজ্ঞান নয়। কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণসিদ্ধ বিজ্ঞান হইলে মনোবিদ্যা যে কোন মানসবৃত্তিকে আবশ্যকমত পুনঃপুনঃ উৎপন্ন করিতে পারিত না। সূর্যগ্রহণ অথবা ভূমিকম্প প্রভৃতি মাত্র পর্যবেক্ষণসিদ্ধ, কারণ এই জাতীয় ঘটনাগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানী অথবা ভূবিজ্ঞানীর আয়ত্তাধীন নয় এবং এতজ্জাতীয় অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে আবশ্যকমত উৎপন্ন করা যায় না। ফলে ঐ সকল ঘটনার পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলগুলি অপেক্ষাকৃতভাবে অনিশ্চিত থাকিয়া যায় এবং বাস্তবক্ষেত্রে অপ্রযুক্ত হয়। উপরন্তু ঐ সকল ঘটনার পর্যবেক্ষণ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে। ঘটনাগুলি একবার ঘটিয়া গেলে আবার কবে ঘটিবে বিজ্ঞানীকে তাহার প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে হয়। এই সকল কারণে নিছক পর্যবেক্ষণ বিদ্যা হইতে প্রয়োগবিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

মনোবিদ্যা শুধু পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ বিদ্যা নয়। মনোবিদ্যা একটি প্রয়োগবিদ্যা। প্রয়োগশালায় যেমন পরিমাণমত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগিক প্রণালীতে জল উৎপন্ন করা যায়, তেমন নির্দিষ্ট উদ্দীপক সাহায্যে মানসবৃত্তিকেও উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং আবশ্যক মত ইহার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া ব্যবহারিক জীবনের কার্যে লাগানো যায়। অতএব মনোবিদ্যা শুধু বিজ্ঞানই নয়, ইহা একটি প্রয়োগবিজ্ঞান।

এখন মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি মনের ন্যায় আপাতদৃষ্টিতে একটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে অবলম্বন করে না। সকলেই দেখিতে শুনিতে অথবা পর্যবেক্ষণ করিতে পারে এমন কোন সর্বজন গ্রাহ্য ও নৈর্ব্যক্তিক বস্তু লইয়া অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি আলোচনা করে। মন ভিতরকার জিনিষ। পক্ষান্তরে আলোক, শব্দ, তড়িৎ বা চুম্বককে কেহ ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ বলিয়া কল্পনা করে না; কারণ ইহারা বাহ্য এবং একই সময়ে একাধিক পর্যবেক্ষকের গ্রাহ্য বস্তু। কিন্তু রামের মনে এখন কোন্ বৃত্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা শ্যাম জানে না। অথবা শ্যামের মনে এখন সুখ, দুঃখ, বিরাগ, অনুরাগ ইত্যাদি যে প্রক্ষোভগুলি উদিত হইতেছে, রাম তাহার সংবাদ রাখে না। অতএব মন এমন একটি বস্তু যাহা নিছক ব্যক্তিগত এবং মন সম্বন্ধে কোন নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মনোবিদ্যার পক্ষে যে সকল অনুকূল যুক্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

এইরূপ বিপক্ষ যুক্তির উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, মন বলিতে আমরা শুধু ব্যক্তিগত বস্তুবিশেষকেই বুঝি না। মনোবিদ্যার মন বলিতে আমরা এমন একটি বস্তুকে ইঙ্গিত করি যাহা শুধু যাহার মন সেই ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু যাহা অপরাপর ব্যক্তির মনের সহিত সমধর্মী এবং সম্বন্ধ বিশিষ্ট। বলা যাইতে পারে যে আমার সুখ নিতান্ত আমারই একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ইহাতে আমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। সেইরূপ আমার পক্ষেও অন্য ব্যক্তির সুখানুভূতিতে অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। সুতরাং 'সুখ' এই বৃত্তিটি সম্বন্ধে এমন কোন সূত্র বা নিয়ম বাহির করা অসম্ভব যাহা সুখসাধারণের সমান সূচক।

কিন্তু এই প্রকার আপত্তি অযৌক্তিক। কারণ যে যুক্তি অনুসারে মানসবৃত্তিকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করা হয় ঐ একই যুক্তি অনুসারে প্রত্যেক স্থূল বস্তু অথবা বাহ্য পদার্থও ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয়, এইরূপ প্রমাণ করা যায়। আমরা সকলেই একই 'টেবিল' দেখিতেছি মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্ত। উপস্থিত সকল ব্যক্তি যদিও একই 'টেবিল' দেখিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ দৃষ্টিকোণ এবং ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে প্রত্যেকে টেবিলের এক একটি অংশ দেখিতেছে মাত্র। রাম টেবিলটির যে অংশ দেখিতেছে তাহাতে বেশী আলোকপাত হওয়ায় রামের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা এক প্রকার বর্ণ ও আকার বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আবার শ্যাম উহার যে অংশটি দেখিতেছে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প আলোকপাত হওয়ায় উহা অন্য প্রকার বর্ণ ও আকার বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। রাম হয়ত টেবিলের উপরিভাগ স্পষ্টভাবে দেখিতেছে, সে দেখিতেছে যে টেবিলটি চতুষ্কোণ এবং উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ; পক্ষান্তরে শ্যাম হয়ত নীচ হইতে টেবিলের একটি কোণ মাত্র স্পষ্ট দেখিতেছে দৃষ্টিকোণ ও আলোক পাতের তারতম্যে সে মনে করিতেছে টেবিলটি ধূসরবর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'একই টেবিল বলিয়া যে নৈর্ব্যক্তিক এবং বাহ্য টেবিলটিকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া থাকি, প্রত্যক্ষজ্ঞানে তাহার কোনপ্রকার ভিত্তি নাই। 'একই টেবিল' এই প্রকারের বাহ্য সর্বজনজ্ঞেয় বস্তুটি একটি অনুমান মাত্র এবং অনুমান ব্যতিরেকে 'একই টেবিল'রূপ বাস্তব ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। এই ভাবে যে কোন তথাকথিত বাহ্য অথবা সর্বজনগ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ যুক্তি খাটিতে পারে। যেমন, 'শব্দ' একটি বাহ্য এবং স্থূল পদার্থ। অথচ, শব্দটি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শ্রোতার অবস্থান অথবা "শ্রুতিকোণের" উপর নির্ভর করিতে হয়। যেহেতু দুইজন শ্রোতা একই শ্রুতিকোণে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং রাম যে শব্দটি শুনিতেছে শ্যাম তাহাই শুনিতেছে মনে করিলেও ঠিক তাহা শুনিতেছে না।

রাম যে শব্দটি শুনিতেছে তাহার তরঙ্গটি যেরূপ উচ্চ বা দীর্ঘ, শ্যামের শব্দতরঙ্গ সেরূপ নহে। অতএব রাম ও শ্যাম 'একই শব্দ' শুনিতেছে এইরূপ ব্যবহার দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। অথচ এইরূপ ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং 'একই শব্দ' বলিয়া সর্বসাধারণ শব্দ প্রত্যক্ষের অভাবে অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ হয়।

এইবার পূর্ব জিজ্ঞাসিত সুখনামক মানসবৃত্তিতে ফিরিয়া আসা যাউক। রাম সুখ অনুভব করিতেছে, অথবা শ্যাম সুখ অনুভব করিতেছে, এই উভয়স্থলেই রামের সুখ তাহার নিজস্ব অনুভব এবং শ্যামের সুখ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কারণ শ্যাম সুখী হইলে রামের সুখবোধ হয় না, অথবা রাম সুখী হইলে শ্যামের সুখবোধ হয় না। কোন কোন স্থলে যে একজনের সুখে আর একজন সুখবোধ করে তাহা নিঃসন্দেহ। পুত্রের সুখে মাতা সুখ পাইয়া থাকেন অথবা তাহার দুঃখে তিনি দুঃখক্লিষ্ট হন। কিন্তু পুত্রের সুখই মাতার সুখ ইহা কথার কথা মাত্র, কারণ পুত্রের সুখ পুত্রেরই এবং পুত্রসুখজনিত মাতার সুখ মাতারই। এইস্থলে উভয়েরই অনুভব সুখাত্মক হইলেও প্রত্যেকের অনুভব প্রত্যেকে সীমাবদ্ধ। টেবিল জ্ঞান স্থলেও প্রত্যেকে একই টেবিল দেখিলেও, প্রত্যেকের দেখা দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং এই অর্থে টেবিল জ্ঞানও নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। পুত্রের ও মাতার সুখ বিষয়াবলম্বনে অভিন্ন হইলেও জ্ঞান হিসাবে পৃথক, যেমন শ্যামের ও রামের টেবিল 'দেখা' বিষয় হিসাবে অভিন্ন হইলেও 'দেখা' হিসাবে ভিন্ন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যদি মনোবিদ্যাকে সার্বভৌমত্ব বর্জিত এবং ব্যক্তিগত বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়

তাহা হইলে যে অর্থে ইহা এই অভিযোগদুষ্ট, ঠিক সেই অর্থে সকল বিজ্ঞানই মনোবিদ্যার সহিত একই দশা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অভিযোগ যে মন অথবা মনোবিদ্যা সম্পর্কেই উত্থাপন করা যায় এমন নয়। ইহা সকল বস্তু সম্বন্ধেই সমানভাবে খাটে এবং মন যদি ব্যক্তির নিজস্ব অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে যে কোন বাহ্য বস্তুর জ্ঞানও পর্যবেক্ষকের নিজস্ব অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এইরূপ আপত্তি বা অভিযোগ অমূলক। মন ব্যক্তির নিজস্ব হইলেও ইহার একটি সার্বভৌম বা সর্ব-সাধারণ স্বভাব আছে যে স্বভাবেরর গুণে মন সম্বন্ধে যাহা বলা যায় তাহা যেমন ব্যক্তির মন সম্বন্ধে খাটে তেমন অপরের মন সম্বন্ধেও খাটিতে পারে না এমন কথা নাই। যদি বলা যায় যে, রাম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা তবে সকলেই এই কথাটির অর্থ বুঝিতে পারে। যেমন যদি বলা যায় যে, টেবিলটি চতুষ্কোণ তাহা সকলেরই বোধগম্য। টেবিলটির একটি কোণ অথবা দিক্ দেখিয়া যেমন তাহার অন্যান্য কোণ এবং দিক্‌গুলি পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, তেমনি রামের সঙ্কীর্ণমনের কিছু ব্যবহারিক পরিচয় পাইয়া বাকীটা অনুমান করিয়া লই। এই স্থলে আমাদের বিচার ভ্রান্ত হইতে পারে। ঠিক তেমনই সমস্ত টেবিল সম্বন্ধে জ্ঞানও ভ্রান্ত হইতে পারে।

কি টেবিল, কি মন, কোনটি সম্বন্ধেই 'ব্যক্তিগত,' এই অভিযোগ খাটে না। অতএব টেবিল জাতীয় স্থূল বস্তুগুলি যেমন ব্যক্তি সাধারণের জ্ঞেয়, ঠিক তেমনই মন, আন্তর এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হইলেও, শুধু ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু ব্যক্তি সাধারণের জ্ঞেয়। এই সম্বন্ধে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের অযথা কলেরব বৃদ্ধি না করিয়া মূল বক্তব্য আলোচনা করা যাউক। আমরা দেখিতেছি যে, মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে বিজ্ঞানীর গবেষণা অসম্ভব নয়, পরন্তু ঠিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সম্ভব। মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অর্থাৎ মনোবিদ্যা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য এই গবেষণার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা মুখ্যতঃ অতিপ্রাকৃত ও যৌগিক। পাতঞ্জল যোগ-দর্শন যে শুধু মনের সূক্ষ্মস্তরগুলি উদ্ঘাটন অথবা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাই নয়। এই সকল সূক্ষ্মস্তরগুলির উদ্ঘাটন করিতে গিয়া স্থূলবৃত্তিগুলির নিরোধব্যবস্থা প্রসঙ্গে উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যোগ-দর্শনে সমগ্র মনের একটি রূপ প্রকটিত হইয়াছে। ইউরোপে মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন বুণ্ড, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লাইপ্‌জিগ মনোবিদ্যার প্রয়োগশালায়। তিনি দেখিলেন যে, মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রচলিত অন্তর্দর্শন পদ্ধতিতেই শুধু চলিবেনা কিন্তু ইহাকে বহির্দর্শন অথবা পর্যবেক্ষণের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। এই যুক্ত পদ্ধতি অনুসারে একটি মানসক্রিয়ার স্বভাব নির্ণয় করিতে হইলে দুই ব্যক্তির সহযোগিতা আবশ্যক—এক, মনোবিৎ, প্রযোক্তা, প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক এবং অপর, পাত্র অথবা অন্তর্দর্শক। যে অবস্থাগুলি প্রয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রথম ব্যক্তি তাহার ব্যবস্থা করেন। প্রয়োগের পক্ষে প্রয়োজন অনুকূল আবহাওয়া অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যন্ত্রপাতির যথাযথ বিধান ও সংস্থাপন এবং পাত্রকে প্রয়োগের উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ দান। প্রযোক্তা প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যেমন প্রয়োগশালায় প্রয়োজনমত আলোক অথবা তাপ নিয়ন্ত্রণ করেন, অথবা এমন কোনরূপ অন্তরায় যাহা পাত্রেব মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে তাহা দূরীভূত করেন। প্রয়োগে যে সকল সাজসরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতি আবশ্যক প্রযোক্তা তাহার সংস্থান করেন। পাত্রকে তিনি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার কি করিতে হইবে। পাত্রকে প্রস্তুত হইবার ইঙ্গিত করিয়া তিনি পাত্রের সম্মুখে উদ্দীপক উপস্থাপিত করেন। প্রয়োগ আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে,

প্রয়োগ চলিতে থাকিবার সময় এবং প্রয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পরক্ষণে পাত্রের বাহ্যলক্ষণগুলি তিনি পরিদর্শন প্রণালী দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর তিনি পাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই তিন সময়ে, অর্থাৎ প্রয়োগের পূর্বে, মধ্যে এবং পরে তাহার কি প্রকার মানস অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তিনি পূর্বেই পাত্রকে মানস বৃত্তিগুলিকে অন্তর্দর্শন করিতে বলিয়া দেন এবং তদনুসারে প্রয়োগ শেষ হইয়া গেলে তিনি পাত্রের অন্তর্দর্শন শ্রবণ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করেন। সর্বশেষে তিনি আঙ্কিক অথবা সংখ্যা বৈজ্ঞানিক হিসাবের সাহায্য প্রয়োগের ফলাফল নির্ণয় করেন। এইরূপে প্রয়োক্তার আয়ত্তাধীন অবস্থার মধ্যে উত্তেজক সাহায্যে পাত্রের মনে প্রয়োজনীয় বৃত্তি উৎপাদন, তাহার বাহ্যলক্ষণগুলির বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ এবং পাত্রের অন্তর্দর্শন, এই উভয়ের সমাবেশে মনোবিদ্যার প্রয়োগিক পদ্ধতি গঠিত। ফলে এই পদ্ধতিটি যেমন পাত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ণয় করে তেমনিই পাত্রের বাহ্য প্রকাশগুলিও নিরূপণ করে। অতএব 'মনোবিদ্যা ব্যক্তিগত' এই অপবাদ দিবার উপায় নাই। প্রয়োগকর্তা এবং পাত্রের সহযোগিতায় এই অভিযোগ নিরস্ত ও প্রতীকৃত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে যাহা বলা হইল তদনুসারে প্রায়োগিক মনোবিদ্যার স্বরূপ উদঘাটন করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যাউক।

কারণ ছাড়া কার্য হয় না—"ন কারণেন বিনা কার্য্যং সিধ্যতি"। মনোবিদ্যার ভাষায়, উদ্দীপক অথবা উত্তেজক না হইলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। যেমন, ইথর-তরঙ্গরূপ উত্তেজক চক্ষুকে আঘাত না করিলে আলোক দর্শনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না, অথবা বায়ুতরঙ্গরূপ উদ্দীপক কর্ণকে আঘাত না করিলে শব্দশ্রবণরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইথর-তরঙ্গ অথবা বায়ু-তরঙ্গরূপ উদ্দীপকের উপস্থিতি এবং আলোক-দর্শন অথবা শব্দশ্রবণরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু 'কালব্যবধান' থাকে। অর্থাৎ, উত্তেজকটি পূর্ববর্তী এবং প্রতিক্রিয়াটি পরবর্তী। পূর্বাপর মধ্যবর্তী সময়কে 'কালব্যবধান' অথবা 'প্রতিক্রিয়াকাল' বলে। এই কালব্যবধানের কারণ কি? উত্তেজকের উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়ার উৎপাদন, এই দুইটি প্রান্ত কতকগুলি মধ্যবর্তী ক্রিয়া দ্বারা ব্যয়িত হয়। আলোকতরঙ্গটি নেত্রগোলক, স্বচ্ছ অচ্ছোদ পটল, (Cornea) তারারন্ধ্র (pupil) পূর্বাপরভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, লেন্স দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া, অক্ষিপটে (Retina) আঘাত করে এবং সন্নিহিত দৃকনার্ভের (Optic nerve) বহিঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা ঐ নার্ভে প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কস্থিত দৃক্প্রদেশে (Occipital lobe) পরিসমাপ্ত ঐ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে সঞ্চারিত হয়—ফলে দর্শন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। প্রতিক্রিয়া কালটি এই সকল অন্তর্বর্তী ঘটনা সমূহে অতিবাহিত হয়।

কাল ব্যবধান অথবা প্রতিক্রিয়া কাল অতি তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহার নিরূপণ বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসাপেক্ষ। কারণ, 'প্রতিক্রিয়া কাল' সাধারণভাবে সকলের জ্ঞাত হইলেও উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াভেদে যে কাল ব্যবধানের তারতম্য হয়, কিরূপ তারতম্য হয় এবং প্রতিক্রিয়ায় কিরূপ মানসবৃত্তি সক্রিয়, তাহা মনোবিৎ ব্যতীত অনেকেরই অজ্ঞাত। যেমন, দেখা গিয়াছে যে, একই উদ্দীপকের চেষ্টীয় (motor) বা সংবেদজ (sensory) প্রতিক্রিয়া ভেদে কালব্যবধানের পার্থক্য হয়। চেষ্টীয়-প্রতিক্রিয়া-কাল সংবেদজ-প্রতিক্রিয়া-কাল হইতে অল্প। এই প্রতিক্রিয়া কাল এত অল্প যে সাধারণ কাল নির্ণায়ক যন্ত্র অথবা ঘড়ি সাহায্যে তাহা নির্ণয় করা যায় না। সেজন্য এই প্রয়োগে এমন কালনির্ণায়ক যন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে যাহা এক সেকেণ্ডেরও অধিক সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ পরিমাপ করিতে পারে। সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয়ে "ভার্নিয়ার" অথবা "হিপ" কালদৃক্ (chronoscope) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কালদৃক্ সাহায্যে ব্যবধান কালটি অতি সূক্ষ্ম ভাবে নির্ণয় করা যায়।

ধরা যাউক যে, ইথরতরঙ্গরূপ উদ্দীপক এবং

আলোকদর্শনরূপ তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতটুকু কাল ব্যয়িত হয় তাহা সঠিকভাবে বাহির করিতে হইবে। হিপ্ কালদৃক সাহায্যে কি ভাবে এই সময় নিরূপণ করা হয় তাহা দেখা যাউক। প্রযোক্তা বা প্রয়োগকর্তা ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে হিপ কালদৃকের যোজকের সহিত যোজকপট্টের (key-board) সংযোগ স্থাপন করেন। এই সংযোগ এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, প্রযোক্তা যে মুহূর্তে তাহার যোজকপট্টের চাবি টিপিয়া দিবেন অমনি আলোক জ্বলিয়া উঠিবে অথবা অন্য কোন উত্তেজক অবস্থা উপস্থাপিত হইবে এবং সংগে সংগে হিপ্ কালদৃকের কাঁটা চলিতে আরম্ভ করিবে। এদিকে প্রয়োগের পূর্বে প্রযোক্তাপ্রদত্ত উপদেশ অনুসারে আলোক দেখিবামাত্র অথবা অন্য কোন উত্তেজক অবস্থার সৃষ্টি হইবামাত্র পাত্রও তাহার যোজকটিকে টিপিয়া দিবেন এবং সংগে সঙ্গে হিপ কালদৃকের চলমান কাঁটা থামিয়া যাইবে। আলোক উপস্থাপনরূপ উত্তেজক এবং আলোকদর্শনরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী-কাল এইভাবে নিরূপিত হইয়া যায়। কারণ আলোক উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি চলিতে আরম্ভ করে এবং আলোক-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। অতএব প্রতিক্রিয়া কাল নিরূপণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ঘড়ির কাঁটা কতদূর চলিল। এই সময়ই হইবে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার ব্যবধান কাল। পাত্রকে প্রযোক্তা প্রয়োগের পূর্বে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, "আমি আপনার সম্মুখে একটি আলোক জ্বালাইব, আপনি ইহা দেখিবামাত্র এই চাবিটি টিপিয়া দিবেন। আলোকটির অপেক্ষা-কাল অর্থাৎ আলোকটি দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সময়, প্রতিক্রিয়ার সমসাময়িক কাল এবং প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী কালে আপনার অভিজ্ঞতাগুলি অন্তর্দর্শন পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ অথবা বর্ণনা করিবেন। ভার্ণিয়ার কালদৃক্ দ্বারাও প্রতিক্রিয়া কাল বাহির করা যায়। যেভাবেই উহা বাহির হউক না কেন এই প্রয়োগে প্রযোক্তা এবং পাত্র, এই দুইজনের সহযোগিতা আবশ্যক। একজনের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরজন অগ্রসর হইতে পারেন না। এই রূপে প্রযোক্তার প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ এবং পাত্রের অন্তর্দর্শন যুক্ত হইয়া মনো-বিদ্যাকে "ব্যক্তিগত এই অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দান করে এবং ইহাকে পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ বিজ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

নিউক্লিয়াসের রূপ প্রকটন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ সুদুর্লভ শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল বর্তমান শতকে—প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্বে; আর তখন হইতেই প্রচেষ্টা চলিয়াছিল সেই শক্তি প্রকট করার উপায় নির্ধারণে ও যথাসম্ভব নানাবিধ লোকহিতকর গঠন কার্যে তাহার নিয়োগ সাধনে। দুঃখ এই যে, সেই মহান উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াও বিজ্ঞানী জন্ম দিলেন এক মহাবজ্রের। ইউরোপীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই বজ্রের ধ্বংসলীলা সভ্যজগৎকে সন্ত্রাসিত করিয়াছে। যুদ্ধের অবসানে মানুষের মতি নাকি পরিবর্তিত হইয়াছে; তাই এখন সকল দেশে পরমাণু রহস্য উদ্ঘাটন ও লোকহিত সাধনের উদ্দেশ্য লইয়াই বহু বীক্ষণাগার স্থাপিত হইতেছে। আমাদের এই কলিকাতা নগরীতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নিউক্লিয়ার ইনষ্টিটিউটের কার্য অনেক-দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সমস্ত চেষ্টার ফল বরাভয় মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেই মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

অধ্যাপক গ্যামোর মতে এক অপরূপ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ আমাদের এই বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান। ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই; তখনও পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। জড়ধর্মানুসারে এই নিউক্লিয়ার ফ্লুয়িড্ তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার এক অপূর্ব সংশ্লেষণ। সাধারণ তরল অপেক্ষা উহার ঘনাংক ও পৃষ্ঠটান বহুগুণ অধিক। এই পদার্থ হইতেই উহার উপাদান প্রোটন, নিউট্রন নানা বিন্যাসে সজ্জিত হইয়া যাবতীয় মৌলের নিউক্লিয়াস ও পরমাণু দেহ গঠিত হইয়াছে। জড়ের জননী-স্বরূপা এই অভিনব বস্তুর নাম দিয়াছি কারণ-সলিল।

ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পারদের একটি ফোঁটা কাঁচ বা অন্য কোন মসৃণ সমতলে রাখিলে উহা বর্তুলাকারে অবস্থান করে। এই প্রকার দুইটি ফোঁটা পরস্পর সান্নিধ্যে আসিলেই পৃষ্ঠটানের আধিক্যে একত্রে মিশিয়া একটি বৃহত্তর বর্তুলে পরিণত হইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উপাদান বর্তুল দুইটি সমায়তন হইলে উৎপন্ন বর্তুলের আয়তন কি তাহাদের দ্বিগুণ হইবে? সহজ গণিতের সাহায্যেই দেখান যায় যে, উৎপন্ন বর্তুলের মুক্ত পৃষ্ঠের আয়তন উপাদান দুইটির যুক্ত আয়তন অপেক্ষা কম। কেবল সমায়তন কেন, যে কোন আয়তনের দুই বর্তুল মিলিত হইলে সর্বক্ষেত্রেই উৎপন্ন বর্তুলের আয়তন হ্রাস পায়। আবার তরলের মুক্ত পৃষ্ঠও শক্তির আধার, সুতরাং সম্মিলনে আয়তন হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠ-শক্তিও হ্রাস পাইবে; অর্থাৎ ঐ শক্তির কতকাংশ ফোঁটা দুইটির মিলনের ফলে বাহির হইয়া যাইবে। এই জন্যেই কোন তরলের একটি ফোঁটা ভাঙ্গিতে বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাও এক বৈজ্ঞানিক সত্য যে, যদি পৃষ্ঠটানই একমাত্র ক্রিয়মান বল হয়, তাহা হইলে দুইটি ফোঁটার পরীক্ষার উপরে যে ফলের কথা বলা হইল তাহা সকল তরলের বেলায়ই ঘটিবে। দুইটি ফোঁটা সান্নিধ্যে আসিলেই মিলিত হইবে। কারণ-সলিল তরল ধর্মসম্পন্ন। উহারও দুইটি ফোঁটা বা নিউ-ক্লিয়াস্ পরস্পর সান্নিধ্যে আসিলেই মিশিয়া এক হইয়া যাইবে ও এই প্রকার মিলনের ফলে পরিণামে বিশ্বজগৎ এক কারণার্ণবে মগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে বিশ্বসৃষ্টির এতকাল পরে বিভিন্ন জড় বস্তুর কোন অস্তিত্ব থাকিত না। সুতরাং,

কারণ-সলিলের ফোঁটায় পৃষ্ঠটানই একমাত্র ক্রিয়মান বল নহে। অপর কোন বল পৃষ্ঠটানের বিপরীত মুখে ক্রিয়া করিতেছে। আর এই বলের অস্তিত্বও আমরা সহজেই দেখিতে পাইতেছি। নিউক্লিয়াসস্থ +তড়িদ্ধর্মী প্রোটন কণাগুলির মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ বিদ্যমান। এই বলের কার্য, কণাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া। সুতরাং কারণ-সলিলের ফোঁটাগুলির মধ্যে এই দুই প্রকার বলের প্রভাবই ক্রিয়া করিবে; ভারী ও বড় ফোঁটায় তড়িৎ অধিকতর হওয়ায় তাহারা ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়াসে পরিণত হইবে এবং হাল্‌কা ও ছোট ফোঁটাগুলি সন্নিকটস্থ হইলে অধিকতর পৃষ্ঠটান প্রভাবে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া যাইবে। নিউ-ক্লিয়াসের এই প্রকার সংযোজন ও বিয়োজনের সম্ভাব্যতা উপরে বর্ণিত দুই প্রকার শক্তির হিসাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

একটি নিউক্লিয়াস দ্বিধা বিভক্ত হইলেই পৃষ্ঠশক্তি বর্ধিত হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ প্রকার বিভাগে তড়িৎশক্তির কি ব্যবস্থা হয়? সহজেই দেখান যায় যে, উক্ত প্রকার বিদারণ বা বিয়োজনের ফলে তড়িৎশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও সংযোজনে উহার বিবৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং এই দুই শক্তি নিউক্লিয়াসের দুই ব্যবস্থানে বিপরীত ভাবে ক্রিয়মান হয়। যে ব্যবস্থানে পৃষ্ঠশক্তি বর্ধিত হয় (বিয়োজন) তাহাতে তড়িৎশক্তি হ্রাস পায় ও সংযোজন কালে তড়িৎশক্তি বর্ধিত হয় বটে, কিন্তু পৃষ্ঠশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কোন নিউক্লিয়াসে আভ্যন্তরিক বৈষম্য উপস্থিত হইলেই উহা আপনা হইতেই বিদীর্ণ হইবে কি না তাহা নির্ধারিত হইবে উহার পৃষ্ঠায়তন এবং তড়িৎ ও পৃষ্ঠশক্তির সমন্বয় দ্বারা। যদি প্রথমোক্ত শক্তির হ্রাস পরিমাণ শেষোক্ত শক্তির বিবৃদ্ধিমান অপেক্ষা অধিকতর হয় তবেই স্বতঃ-বিদারণ প্রবর্তিত হইতে পারে। এই আলোতে একবার মেণ্ডেলিফের মৌল-ছকের সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়াস লইয়া পরীক্ষা করিলে এক নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান মিলে। লঘুতম মৌল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ভারী ভারী মৌলের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায়, পৃষ্ঠশক্তি অতি সামান্য হারে বর্ধিত হয়; কিন্তু নিউক্লিয়াসের + তড়িতাধান পরমাণু অঙ্কের সমানু-পাতে ও সেই জন্যই তড়িৎশক্তির বিবৃদ্ধি পরমাণু অঙ্কের বর্গের সমানুপাতে বর্ধিত হয়। সুতরাং লঘুতম পরমাণুর বেলা তড়িৎশক্তির বিরোধিতা করিয়া পৃষ্ঠশক্তি নিউক্লিয়াসকে অটুট রাখিতে সক্ষম হইলেও অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর বেলায় তড়িৎ শক্তিই প্রবল হইয়া নিউক্লিয়াসকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বো'র ও হুইলার মেণ্ডেলিফের ছকের সমস্ত মৌলের হিসাব হইতে দেখিতে পান যে, ক্রিয়মান শক্তির অসামঞ্জস্যে নিউক্লিয়াসের অস্থিরতা ও ভগ্নোন্মুখতা আরম্ভ হয় ছকের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থায় স্থিত মৌল রৌপ্য হইতে। ইহার পর সর্বশেষ মৌলে ইউরেনিয়ম পর্যন্তই এক অপস্থির (metastable) অবস্থা বর্তমান, অর্থাৎ বাহির হইতে যথোচিত বল প্রয়োগে ঐ সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়াস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শক্তি প্রকট করে। অপরপক্ষে, রৌপ্যের অপর পার্শ্ববর্তী লঘুতর মৌলে পৃষ্ঠটান সমধিক হওয়ায় তজ্জনিত আসক্তি তড়িৎ বিকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল; সুতরাং কোন দুইটি নিউক্লিয়াস পরস্পর সমীপবর্তী হইলেই যুক্ত হইয়া যাইতে পারে। ইহাতেও শক্তির বিকাশ হইবে। সুতরাং উপরের আলোচনায় ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অবস্থা বিশেষে নিউক্লিয়াসের বিয়োজন বা সংযোজন ঘটিতে পারে ও উভয় কার্যেই শক্তি বিমুক্ত হইয়া বাহিরে আসে। রৌপ্য ব্যতীত আর ৯১টি মৌলেরই অপস্থির অবস্থা।

এই তথ্য কিন্তু প্রত্যক্ষ রাসায়নিক তথ্যের বিরোধী। তাহার মতে সর্বপ্রকার আণবিক পরি-বর্তনে স্থিরবস্থ বস্তুই লাভ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল বস্তুই, প্রকৃত

শক্তির আধার। এক গেলাস জলই হউক, বা এক টুকরা রুটী বা একটি লৌহ দণ্ডই হউক, প্রত্যেকেই শক্তিতে ভরপুর। এই শক্তি আছে শুধু মুক্তির প্রতীক্ষায়। এই যে যুগ যুগ ধরিয়া সূর্য ও তারকা-রাজি তেজোধারা বিকিরণ করিতেছে তাহাও এই শক্তির আধার অবলম্বনেই। অথচ আজ সৃষ্টির প্রায় ৩০০ কোটি বৎসর পর ধরাপৃষ্ঠে অবস্থিত ক্ষুদ্রকায় মানব কি ভাবে এই জড়নিহিত শক্তিকে মানবের কল্যাণে নিযুক্ত করিবে তাহার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইতেছে।

দেখা যাইতেছে যে, রৌপ্যের নিউক্লিয়াসই একমাত্র সুস্থির; তাহার বিকার হয় না। কিন্তু লঘুতর বা গুরুতর আর সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়াসই অপস্থিরবস্থ। লঘুতরগুলি পরস্পর সান্নিধ্যে আসিলে সংযুক্ত হইতে পারে, আর গুরুতরগুলি তড়িৎ শক্তি প্রভাবে বিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এই কার্য অবিরাম চলার বাধা না থাকিলে, কালে সংযোজন বিয়োজনের ফলে, একমাত্র রৌপ্যের নিউক্লিয়াসই বর্তমান থাকিবে। কিন্তু ইহা ত সত্য নহে! তাহা হইলেই পদার্থের স্থির ও অস্থির অবস্থার অবকাশে আর একটা অপস্থির অবস্থা রহিয়াছে ইহা মানিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও মানিতে হয় যে, বাহির হইতে যথোচিত শক্তি প্রয়োগেই এই অবস্থার বিকার সাধন করা যায়। এই শক্তির নাম দেওয়া হয় কারয়িত্রী শক্তি। এই শক্তি প্রযুক্ত হইলেই নিউক্লিয়াসের সংযোজন বিয়োজন সম্ভব হইতে পারে।

এই কারয়িত্রী শক্তি আমাদের পূর্বপরিচিতা। সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় উহার কার্য দেখা যায়, তবে তাহা অতি মৃদু ও অনেক সময়ই উপলব্ধি এড়াইয়া যায়। কাঠ আগুনে পোড়ে; কিন্তু উহা অগ্নিসাৎ করামাত্রই দহন আরম্ভ হয় না। কাষ্ঠখণ্ডকে যথোচিত উত্তপ্ত হইতে দিতে হইবে, তবেই উহাতে আগুন ধরিবে। দহন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কাঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত শক্তিই এস্থলে কারয়িত্রী শক্তি। ইহা পরিমাণে নগণ্য। দুইটি কাষ্ঠখণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই এই তাপ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু নিউক্লিয়াস পরি-বর্তনে প্রয়োজনীয় কারয়িত্রী শক্তি সামান্য নহে। বিজ্ঞানীর ধারণা যে পৃথিবী কিংবা নক্ষত্ররাজিরও আবির্ভাবের বহু পূর্বে, এখন হইতে কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধানে বিশ্বসৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে নিউক্লিয়াস সৃষ্ট হইয়াছিল, যুগযুগান্তে তাহার পরিবেশেরও বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম সংগঠন সময়ে যে কারয়িত্রী শক্তি প্রভাবে তাহাদের পরিবর্তন সম্ভবপর হইত পরিবর্তিত পরিবেশে তাহা বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ধরাবক্ষে সেই শক্তি আয়াসসাধ্য হইলেও এখনও তারকা রাজির অন্তঃস্থলে হয়ত পূর্বের পরিবেশই বিদ্যমান রহিয়াছে ও সেই স্থলে এই সংযোজন অব্যাহত গতিতে প্রবর্তিত রহিয়াছে।

সুতরাং নিউক্লিয়াস বিদারক বা সংযোজক কার-য়িত্রী শক্তির পরিমাণ সামান্য নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এই শক্তির পরিমাণ হিসাব করিয়াছেন। প্রোটন ও ডয়টারন নামধেয় নিউ-ক্লিয়াসদ্বয়ে বিদ্যমান + তড়িৎ—মাত্রা এক একক। সুতরাং ইহাদের স্বশ্রেণীভুক্ত দুইটির বা প্রোটন-ডয়টারনের সংযোগস্থাপনে প্রয়োজনীয় কারয়িত্রী শক্তি সর্বাপেক্ষা অল্প হইবে। ইহার পরিমাণ অর্ধ Mev (এক Million electron-Volt = $1\cdot6 \times 10^{-6}$ আর্গ)। পরমাণু যত ভারী হইবে উক্ত শক্তিও তত অধিক হইবে। সুতরাং রৌপ্য মৌলের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে এই শক্তিও সমধিক বর্ধিত হইবে। আর একথা পূর্বে বলা হইয়াছে, রৌপ্যের পর হইতে শেষ মৌল ইউরেনিয়াম পর্যন্ত কারয়িত্রী শক্তির প্রয়োগে নিউ-ক্লিয়াস বিদারণই চলিবে। আবার মৌল-ছকের এই অংশে এক অভিনব জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা ভারী ইউরেনিয়াম বিদারণে প্রয়োজনীয় কারয়িত্রী শক্তিই সর্বাপেক্ষা অল্প ও তাহা হইতে

লঘুতর পরমাণুতে আসিতে আসিতে ঐ শক্তি পরিমাণে বাড়িতে থাকে। তবে সাধারণতঃ বিদারক কারয়িত্রী শক্তির মাত্রা সংযোজক শক্তি অপেক্ষা অধিক। ইউরেনিয়ামের বেলায় উহা ৫ Mev অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অল্প সংযোজক শক্তির ১০ গুণ।

অতএব মৌল-ছকের দুই প্রান্তে অবস্থিত মৌলে পরমাণবিক বিপর্যয় সাধনই সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। সুতরাং হাইড্রোজেনের গুরুতর সমপদ ডয়টেরিয়াম ও ইউরেনিয়ামের লঘুতর সমপদ U_{235} অতি সহজে বিপর্যস্ত হইবে। কিন্তু দুঃখ এই যে, ভূপৃষ্ঠে এই দুই মৌলের পরিমাণ অতি অল্প।

নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন সংসাধনের ফলে মৌলান্তরের উৎপাদন বর্তমান যুগে সম্ভবপর হইলেও কার্যটি অতিশয় অধ্যবসায় ও প্রভূত ব্যয় সাপেক্ষ। কারণ, যে পরিমিত শক্তি নিউক্লিয়াসস্থ কণাগুলিকে একত্রে গ্রথিত ও পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া তাহার ভিতরেই অপ্রকটরূপে বিদ্যমান, ঠিক সেই বা ততোধিক শক্তি বাহির হইতে প্রযুক্ত হইলেই কণার জমাট ভাঙ্গিয়া গিয়া লুক্কায়িত শক্তি বাহিরে আসিতে পারে। এই কারয়িত্রী শক্তি সামান্য নহে। জড়ের সামান্য একটি খণ্ডের অভ্যন্তরে পরমাণু সংখ্যা অগণ্য, নিউক্লিয়াসও তদনুরূপ। এই অগণিত নিউক্লিয়াসকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ক্ষেপণী লাগিবে বহু সংখ্যায়। আবার এই সকল ক্ষেপণী যথোচিত কারয়িত্রী শক্তিতে চালিত হওয়া চাই। সুতরাং কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে প্রচুর সংখ্যায় ক্ষেপণীর সন্ধান ও তাহাদিগকে সমৃদ্ধ বেগবান করিবার উপায় নির্ধারণ প্রয়োজন।

তেজস্ক্রিয় মৌল হইতে স্বতঃবিকীর্ণ আলফা কণাই (বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) সর্বপ্রথমে ক্ষেপণী-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কারণ এই প্রকার মৌল নিসর্গে বর্তমান ও এই + তড়িদ্ধর্মী ক্ষুদ্র কণা বিজ্ঞানীর সন্ধানে পরিচিত হইয়াছে বহু পূর্বে। কিন্তু প্রকৃতিতে হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণ নগণ্য ও তেজস্ক্রিয় মৌল সংগ্রহও সবিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং সহজে স্বল্পতর ব্যয় সাধনে অন্য কোন তড়িৎকণা প্রাপ্তি সম্ভবপর কিনা ও অল্পব্যয়ে প্রবর্তিত তড়িৎক্ষেত্রে প্রধাবিত করিয়া সেই সকল কণার বেগ ও শক্তি বৃদ্ধি সাধন কতদূর সম্ভব তাহারই জ্ঞান আহরণে নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাহারই ফলে আলফা কণার ন্যায় প্রোটন ও ডয়টেরিয়াম কণা ক্ষেপণীরূপে নিউক্লিয়াস বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করে।

ক্ষেপণীকে তড়িৎক্ষেত্রে বেগবান্ করিতে হইলে, তড়িতাধানের সঙ্গে সঙ্গে উহার বস্তু ও ওজন বিবেচনা করিতে হয়। যথোপযুক্ত কণাটি হইবে আকারে ক্ষুদ্র; অথচ সমধিক ভার বিশিষ্ট। এই হিসাবে প্রোটন ও ডয়টেরিয়ামের যোগ্যতা নিঃসন্দেহ। আবার আকারের ক্ষুদ্রতা বিবেচনা করিলে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, নিউক্লিয়াস বিদারণ একটি দুইটি ক্ষেপণীর কর্ম নহে। এজন্য প্রয়োজন ক্ষেপণীর ধারা বা স্রোত। ঝাঁকে ঝাঁকে সূক্ষ্মকায় ক্ষেপণী পদার্থের উপর পড়িলেও তাহাদের কোন একটির পক্ষে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসে প্রহৃত হওয়ার সম্ভাবনা বড়ই কম। পরমাণুর মণ্ডলীর ভিতরে বহু ক্ষেপণীর চলার পথে কোন নিউক্লিয়াস না-ও পড়িতে পারে। শতকরা একটি ক্ষেপণীরও এই সৌভাগ্য হইবে কি না সন্দেহ।

তেজস্ক্রিয় মৌল হইতে নির্গমণ কালে আলফা কণার শক্তি থাবে প্রায় ৮০ লক্ষ Mev. ক্ষেপণীরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে উহাকে আরও শক্তিমান করা প্রয়োজন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ক্যাভেণ্ডিস্ ল্যাবরেটরীতে কক্রফ্ট্ ও ওয়াল্টন সর্বপ্রথমে নিউক্লিয়াস্ বিদারী ক্ষেপণীকে সমৃদ্ধবেগ করার ব্যবস্থার প্রয়োজন করেন। এ জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম দেওয়া হয় পরমাণু বিধ্বংসী যন্ত্র বা অ্যাটম স্ম্যাসার। এই যন্ত্রে প্রলব্ধ তড়িৎবল দশ লক্ষ ভোল্ট। এই ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইয়া প্রোটন কণা সবিশেষ শক্তিশালী হয়। এইরূপে সর্বপ্রথমে প্রোটন ক্ষেপণী সহায়ে লিথিয়াম মৌলকে বিদারিত করা হয়। বিদারণের

পরিণামে প্রত্যেক লিথিয়াম নিউক্লিয়াস দুইটি আলফা কণা বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয় ও ১৭ Mev শক্তি প্রকট হইয়া পরে। একই প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন পরমাণু হইতে পাওয়া যায় কার্বন ও হিলিয়াম এবং বোরন হইতে পাওয়া যায় ৩টি আলফা কণা।

ক্রমে আরও নানাপ্রকার পরমাণু-বিধ্বংসী যন্ত্র উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হইতে থাকে। বিখ্যাত সাইক্লোট্রন যন্ত্র তাহাদের অন্যতম। প্রায় ৫ বৎসর হয় কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই যন্ত্রের কার্য পদ্ধতি বিবৃত হইতেছে।

সাধারণতঃ কোন তড়িতাবিষ্ট কণা বেগবান্ হইলে সরল পথে চলিয়া থাকে। কিন্তু চলার পথটি যদি কোন নির্বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রে সংস্থিত হয়, তাহা হইলে গতির দিক বিপর্যয় ঘটে ও পথটি চক্রাকার ধারণ করে। এই চক্রপথের ব্যাস নির্দিষ্ট হয়, যুগপৎ চৌম্বক বলের তীক্ষ্ণতা ও কণার গতিবেগের ক্রম অনুযায়ী। পদার্থ বিজ্ঞানের এই নীতিকেই ভিত্তি করিয়া বিখ্যাত সাইক্লোট্রন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই নীতি হইতেই পাওয়া যাইতেছে যে, ত্বরিদ্গতি কোন কণা চক্রপথে একবার ঘুরিতে যে সময় লইবে মৃদুগতি অন্য কণাও সেই একই সময় লইবে। এই তথ্যের সাহায্যে চিত্র হইতে যন্ত্রের ক্রিয়া সহজ বোধগম্য হইবে।

একটী অনুচ্চ নলাকৃতি বাক্সকে "ক" ও "খ" এই দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে ও উহাকে এক বৃহৎ তড়িৎচুম্বকের মেরুদ্বয়ের অবকাশে নির্বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ক ও খ অংশকে একটি পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ জনক ট্র্যান্সফরমারের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া আছে; সুতরাং যন্ত্রের সক্রিয় অবস্থায় ক ও খ অংশ পালাক্রমে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ বিভব ধারণ করিবে। মনে করা যাক, এক অবস্থানে ক+

সাইক্লোট্রন

ও খ–, ও একটি তড়িৎ কণা ক অংশে চলমান আছে। এস্থলে তড়িৎক্ষেত্র নির্বিশেষধর্মী বলিয়া কণায় কোন বেগ সমৃদ্ধি আরোপ করিবে না ও কণাটি চৌম্বকক্ষেত্রের ধর্মানুযায়ী চক্রাকার পথ অঙ্কিত করিবে। কিন্তু এইভাবে অর্ধচক্র অঙ্কন করার পর, ক অংশ হইতে খ অংশে গমন কালে বিভব পরিবর্তন হেতু সবিশেষ গঠন ক্ষেত্রে কণাটির গতিমান্দ্য ঘটিবে। এক্ষণে ট্র্যান্স্‌ফরমারের ক্রিয়া যদি এইরূপে ব্যবস্থিত হয় যে, যে মুহূর্তে কণাটি অর্ধ চক্রপথের শেষ প্রান্তে পৌছিবে ঠিক সেই মুহূর্তে খ+ ও ক– বিভব গ্রহণ করে তাহা হইলে খ এর ভিতর প্রবেশ কালে কণার গতিবৃদ্ধি হইবে। এই ভাবে কণার প্রথম গতিবেগ ও অংশদ্বয়ের বিভব পরিবর্তন সম লয় বিশিষ্ট হইলে চক্রাবর্তণের সঙ্গে সঙ্গে কণাটি সমৃদ্ধ বেগ হইতে থাকিবে। ক ও খ অংশের মধ্যস্থলে প্রদর্শিত সরু নল দ্বারা আয়ন সমূহ যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইবে। উহাদের অনেকগুলি লয় হারা হওয়াতে বিপথে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সম লয় বিশিষ্ট কণাগুলির গতিবৃদ্ধি হেতু চক্রপথের পরিধিও বাড়িতে থাকিবে এবং অবশেষে উহা যন্ত্রের সমান পরিধি বিশিষ্ট হইলে "গ" গবাক্ষ পথে প্রচণ্ড বেগশালী আয়নগুলি বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যত্র ক্ষেপণীরূপে প্রযুক্ত হইবে।

এই উপায়ে লব্ধ ক্ষেপণীর শক্তি যন্ত্রভেদে বিভিন্ন। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউটে যে দুইটি যন্ত্র আছে তাহাতে চুম্বক মেরুর ব্যবধান ৬০ ইঞ্চি ও উহা হইতে নির্গত প্রোটনের শক্তি ২৫ Mev। ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটি নূতন ও বৃহত্তর সাইক্লোট্রনের পরিকল্পনা চলিয়াছে, তাহাতে নাকি প্রোটনের শক্তি হইবে ১০০ Mev.

উপরে বর্ণিত ক্ষেপণী ব্যবহারে একটি অসুবিধার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ পরমাণুর ব্যাসার্ধ $১০^{-৮}$ সেঃ মিঃ. ও তাহার অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ $১০^{-১২}$ সেঃ মিঃ অপেক্ষাও অল্প হইবে। সুতরাং বহু সংখ্যক ক্ষেপণী পদার্থের সামান্য অংশে চালাইয়া দিলেও উহাদের অনেকেই কদাচিৎ কোন নিউক্লিয়াসে প্রহৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিবে। এতদ্ব্যতীত আর একটি অসুবিধা আছে। নিউক্লিয়াসের সমীপবর্তী হইতে ক্ষেপণীকে ইলেকট্রনের আবরণ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। তজ্জন্য প্রহৃত হওয়ার পূর্বেই ক্ষেপণীর শক্তিমান্দ্য ঘটিবে। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য দুই প্রকার পরিকল্পনা সম্ভব। প্রথমতঃ, যদি কোন উপায়ে পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের সংহতিকে ক্ষেপণী সহ প্রভূত তাপে উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হেতু কণা সকলের চাঞ্চল্য সবিশেষ বর্ধিত হইলে উহাদের পরস্পর সংঘর্ষের সম্ভাবনা অধিকতর হইবে। কিন্তু এজন্য কোটি কোটি ডিগ্রী উষ্ণতার প্রয়োজন। এই প্রকার উষ্ণতা সূর্য ও নক্ষত্রাদিতেই থাকা সম্ভব। মনে হয়, উহাদের অফুরন্ত তেজোভাণ্ডারের উৎস পরমাণবিক প্রতিক্রিয়া জাত শক্তি। ঐ স্থানের উষ্ণতায় এই নিউক্লিয়াস প্রতিক্রিয়া সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নিউট্রনের ন্যায় কোন জড় কণা ক্ষেপণীরূপে ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। উহারা তড়িদ্ধর্মহীন জড় কণা বিধায় ইলেকট্রন বা নিউক্লিয়াসের তড়িৎক্ষেত্র উহাদিগকে কোনরূপে বিপর্যস্ত করিবে না। অনায়াসে অপ্রতিহত বেগেই উহারা নিউক্লিয়াসে প্রহৃত হইতে পারে। কিন্তু নিসর্গে নিউট্রন কণার অস্তিত্ব নাই। পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিদারণের ফলেই নিউট্রনের দেখা মিলে। সুতরাং যদি কোন পরমাণু বিদারণের ফলে নিউট্রন অন্যান্য পরমাণুতে ক্রিয়মান হইতে পারে তাহা হইলেই পরমাণুর স্বতঃ-বিদারণ ক্রিয়া প্রবর্তিত হইতে পারে। কারণ উদ্গত নিউট্রনগুলি পরমাণুর পর পরমাণু বিদারণ করিয়া চলিবে। এইভাবে নিউট্রন প্রজনন প্রক্রিয়া ইউরেনিয়াম যৌগের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য সমপদে প্রবর্তিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

(২)

আদিবাসী

পূর্বের প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে আদিবাসী উপজাতিগণের অধ্যুষিত চারিটি অঞ্চল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়, যথা, (১) দক্ষিণভারত (২) মধ্য ও পূর্বভারত (৩) পশ্চিমভারত এবং (৪) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। এই চারটি অঞ্চলের অধিবাসী উপজাতিগুলির সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ কি বলেন তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমে দক্ষিণভারতীয় আদিবাসী উপজাতিগুলির কথা বলা যাইতে পারে।

দক্ষিণভারতীয় আদিবাসী উপজাতিগুলির দৈহিক লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে: লম্বা মুণ্ড (dolichocephalic), চেপ্টা নাক (platyrrhine), কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ও ঢেউ খেলান বা কুঞ্চিত কেশ (cymotrichous)। মোটামুটি বলা যায় যে, এই সকল উপজাতিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীর নামের তালিকাটি বেশ বড় ; যথা, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় (Pre-Dravidian), প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড (Proto-Australoid), অষ্ট্রালয়েড-বেদ্দাইক (Australoid-Veddwic), ও বেদ্দিদ (Weddid)। মালয়ের শকাই, সিংহলের বেদ্দা, দক্ষিণভারতের কাদার বা কাদির, কুরুম্বা, পানিয়ান, ইরুলা প্রভৃতি উপজাতি, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত। পূর্বসুমাত্রার অধিবাসী, সেলিবিসের তোয়ালা প্রভৃতি ইহাদের স্বগোষ্ঠীয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় হইলেও প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়।

এখন এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দক্ষিণভারতের কতকগুলি আদিবাসী উপজাতিকে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় নাম দেওয়া হইয়াছে দ্রাবিড় জাতি হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য। এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "the lowest castes and the outcastes are predominantly Pre-Dravidian"—ইহার অর্থ দক্ষিণভারতের হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ও উহার বাহিরে যে সকল উপজাতি দেখা যায় তাহারাই প্রাক্-দ্রাবিড়ীয়। যদিও এইভাবে পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা যায় না তথাপি এই তথ্য প্রকাশ পাইতেছে যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলির স্বাধীন সমাজ নাই, উহারা হিন্দু সমাজের আওতায় আসিয়া গিয়াছে। পূর্বে এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইহাদিগকে একটা প্রাচীন গোষ্ঠীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা ভাসমান ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, দ্রাবিড় ও প্রাক্-দ্রাবিড় মূলতঃ একই গোষ্ঠীয় অথবা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর সংমিশ্রন হইয়াছে। সে যাহা হউক, যাঁহারা দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলিকে প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত বলেন তাহাদের মত এই যে সভ্য দ্রাবিড় গোষ্ঠী পরে দক্ষিণভারতে উপস্থিত হয়।

প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড নামের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মূলতঃ একই গোষ্ঠীয়, যদিও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী-

দিগের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের অর্থ দৈহিক লক্ষণ সমূহের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ। এই ইতরবিশেষ হইবার হেতু পারিপার্শ্বিক অবস্থানের প্রভাব হইতে পারে। অষ্ট্রালয়েড-বেদ্দাইক নামের অর্থ দক্ষিণভারতের আদিবাসী, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও সিংহলের আদিবাসী বেদ্দাগণ এক গোষ্ঠীয়। ইহারা সকলেই লম্বামুণ্ড, কৃষ্ণকায় ও কিমোট্রিক্যাস অর্থাৎ ঢেউ খেলান বা কুঞ্চিত কেশ। দেহের দৈর্ঘ ও নাসিকার গঠনে তারতম্য থাকিলেও ইহাদের সকলকেই এক বৃহৎ গোষ্ঠিভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। বেদ্দিদ নামের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী ও সিংহলের বেদ্দাগণ এক গোষ্ঠীয়।

এই সকল নামের ব্যাখ্যা হইতে এই মত দাঁড়াইতেছে যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতিগণ—যাহাদিগকে একদল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রাক্ দ্রাবিড়ীয় নাম দিয়াছেন—শুধু নিকটবর্তী সিংহলের নহে, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের মুখে অবস্থিত সুদূরবর্তী অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের মূল গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে দ্রাবিড়জাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমগোষ্ঠীয়।

জার্মান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Eickstedt দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীর নামকরণ করিয়াছেন বেদ্দিদ (Weddid) অর্থাৎ তাঁহার মতে মূলগোষ্ঠী সিংহলের বেদ্দা হইতে সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণভারতের আদিবাসীদের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে সমগ্র দক্ষিণভারতের অধিবাসীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের উল্লেখ করা হইতেছে না। Fritschএর মতে বেদ্দাগণ ভারতবর্ষের আদিম মানবগোষ্ঠী (Primitive racial type). Sarasin ভ্রাতৃদ্বয়ের মতে (Paul and Fritz Sarasin) দক্ষিণভারতের বেদ্দাগোষ্ঠী সকল কিমোট্রিকাস গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। তাঁহারা মনে করেন দক্ষিণভারতের প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি বেদ্দাগোষ্ঠীয়, কিন্তু দ্রাবিড়গণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের সমগোষ্ঠীয়। ডাঃ গুহ বলেন সিংহলের বেদ্দাগণের সঙ্গে দক্ষিণভারতের উপজাতিগুলি অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদিগের সাদৃশ্য বেশী। দক্ষিণভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে মূলগোষ্ঠীয় দৈহিক লক্ষণ সমূহ অধিকতর বজায় আছে। এই অভিমতের তাৎপর্য এই যে, মূলগোষ্ঠীর লোক ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে ও অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আসে নাই। Huxleyর মতে দক্ষিণভারতের প্রাচীন অধিবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এক গোষ্ঠীর। Keaneএর মতে দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণভারতের আদিবাসী নহে, তাহাদের পূর্বে নিগ্রো গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ আছে এরূপ উপজাতিরা (aberrant Negrite type) দক্ষিণভারতে আসিয়াছিল। Dr. Maclean এর মতে প্রাক-দ্রাবিড়ীয় কোন উপজাতির অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। দ্রাবিড় ও যাহাদিগকে প্রাক্-দ্রাবিড় বলা হয় তাহারা একই গোষ্ঠীর দুইটি শাখা। দ্রাবিড়গণ ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এক গোষ্ঠীভুক্ত। Sir William Turner এর মত অনুরূপ। তিনি বলেন যে, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীকে একগোষ্ঠীর লোক বলা যায় না। উভয় জাতির মস্তকের গঠনে অসাদৃশ্য রহিয়াছে। Virchow এর মতে বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর মস্তকের গঠনে পার্থক্য দেখা যায়। এইরূপ মত আরও কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রকাশ করিয়াছেন। Risley তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যাহাদিগকে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি বলা হয়—তাহাদের ও দ্রাবিড়গণের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। Lapicque প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় উপজাতিগুলির মধ্যে নিগ্রো সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে

করেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছেন Negre Paria. নেগ্রিটোবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে Sergi ও Bia Suttiর অভিমত ও Giuffrida Ruggeriর ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলির মধ্যে দুইটি টাইপ দেখা যায়, একটির সাদৃশ্য অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও অন্যটির নেগ্রিটোর সহিত।

উপরে যে সকল অভিমতের উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি সম্বন্ধে কিরূপ পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদলের মত এই যে, দ্রাবিড়জাতি ও প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় বলিয়া যাহাদের পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে সেই সকল উপজাতি একই গোষ্ঠীর। এই মত অনেকে অগ্রাহ্য করেন। যাঁহারা দক্ষিণভারতীয় উপজাতিগুলিকে দ্রাবিড় জাতি হইতে ভিন্ন গোষ্ঠীয় বলেন তাঁহাদের মোটামুটি মত এই যে, এই সকল উপজাতি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের পূর্বপুরুষ (Proto-Australoid) বা তাহাদিগের ও বেদ্দাদিগের সমগোষ্ঠীয় (Australoid-Veddaic); কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে একটা জায়গায় মিল আছে। দ্রাবিড়জাতি আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় না হইলেও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের ব্যবহৃত যুক্তির তাৎপর্য বুঝিবার জন্য এখানে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কথা বলা হইয়াছে যে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়ানদিগের সহিত দ্রাবিড়দিগের সাদৃশ্য দেখিতে পান, আবার কেহ কেহ দক্ষিণভারতীয় উপজাতির সহিত অষ্ট্রেলিয়ানদিগের সাদৃশ্য দেখিতে পান। এই দুই দলের অভিমতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে দাঁড়ায় যে, প্রাক্-দ্রাবিড়ী ও দ্রাবিড়ের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় সম্ভবতঃ সেখানে কিছু গলদ আছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ অপেক্ষা সাদৃশ্যের পরিমাণ কম নহে।

এখন দেখা যাউক কিপ্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের সহিত সম্পর্ক নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে।

দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি ও দ্রাবিড়জাতির (উপস্থিত তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হইতেছে যে দ্রাবিড়জাতি বলিয়া একটা জাতি দক্ষিণভারতে আছে) ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর মধ্যে দৈহিক লক্ষণের গরমিলের কথা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে Sir William Turner এর মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। "The affinities between the Dravidians and Australians have been based upon the employment of certain words by both people, apparently derived from common roots, by the use of the boomerang, similar to the well known Australian weapon by some Dravidian tribes, by the Indian Peninsula having possibly had in a previous geologic epoch a land connection with the Austro-Malayan Archipelago and by certain correspondences in the physical type of the two people." শেষের যুক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "The comparative study of the characters of the two series of crania (Australian and Dravidian) has not led me to the conclusion that they can be adduced in support of the unity of the two people" (Contributions to the Craniology of the people of the Empire of India).

বাকী যুক্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। উভয় ভাষার কতকগুলি কথার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন Bishop Caldwell. তাহার পর হইতে এই সাদৃশ্য একটি প্রবল যুক্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছে এবং Sarasins, Von Luschen প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তাঁহাদের মতবাদের ব্যাখ্যায় এই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। Boomerang সম্বন্ধে (কাঠের বা লোহার তৈয়ারী অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্র যাহা ঘুরাইয়া শত্রু বা শিকারের প্রতি ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়) Thurston লিখিতেছেন যে, তাঞ্জোর রাজ-অস্ত্রশালায় প্রাপ্ত তিনটি এইরূপ অস্ত্র মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পদুকোট্টাই রাজ্যে প্রাচীনকালে ইহা সাধারণতঃ পশুশিকারে ব্যবহৃত হইত। কোন কালে যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। Huxley তাঁহার ব্যাখ্যায় একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্যে জাতিভেদের প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ এই জাতিভেদ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির কাল বিচার করিলে ইহাকে একটি মৌলিক আবিষ্কার ও ততোধিক মৌলিক যুক্তি বলা যাইতে পারে। তৃতীয় যুক্তিটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণভারত এক সময়ে সম্ভবতঃ মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী-গণের এই অভিমত উৎসাহী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ কাজে লাগাইয়াছেন। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীগণের এক-দলের মত এই যে Palaezoic যুগের শেষে Permo-Carboniferous আমলে এখন যেখানে ভারতমহাসাগর দেখা যায় সেখানে ও তাহার উত্তরে দুইটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। উত্তরের ভূভাগ পূর্ব হইতে পশ্চিমে পৃথিবীর উত্তরাংশ জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই উত্তর মহাদেশের নাম দেওয়া হয় Angara. দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ অষ্ট্রেলিয়া, ভারতীয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়িয়া বর্তমান ছিল। ইহার নাম দেওয়া হয় Gondwana. এই দুই ভূভাগের মধ্যে ছিল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া একটি বিস্তৃত সমুদ্র। Mesozoic যুগের শেষে দক্ষিণ মহাদেশ Gond-wana land ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও বৃহৎ অঞ্চল সমূহ জলমগ্ন হইয়া যায়। ফলে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে একটি যোজক তখনও বর্তমান থাকে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Lemuria. মাডাগাস্কার হইতে পূর্বমুখে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ পর্যন্ত এই যোজক বিস্তৃত ছিল। ভারতবর্ষের পূর্বদিকেও এক বৃহৎ ভূভাগ আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখন যেখানে বঙ্গোপসাগর বর্তমান তাহা এই ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। Jurassic আমলে এই ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া যায়।

এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এককালে পূর্বদিকে বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা ও মালাক্কা হইয়া এশিয়া মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল ও পশ্চিম দিকে সেলিবিস, মলাক্কা, নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। পশ্চিমের অংশকে ইন্দো-মালয় ও পূর্বের অংশকে অষ্ট্রো-মালয় দ্বীপপুঞ্জ নাম দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুমান করা হয় যে, পশ্চিমের অংশ বা ইন্দো-মালয় দ্বীপপুঞ্জ লেমুরিয়া যোজকের অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার প্রধান ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীগণের মত এই যে, যাহাকে Malayan Arc বলা হয়—তাহার উৎপত্তিকাল Cainozoic যুগের প্রথমভাগে। ইহা এশিয়ার আগ্নেয়গিরি বলয়ের এক অংশ। Cainozoic যুগকে মধ্য এশিয়ার মালভূমি এবং হিমালয়—আল্পস পর্বত শ্রেণীর-উৎপত্তিকাল বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণআমেরিকা (Patagonia) ও অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি অনুরূপ প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্ ও সরীসৃপ কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। একজন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীর কথা উদ্ধৃত করা হইতেছে:

"From this fact...it is argued that land connections existed between these distant regions, across what is now the Indian Ocean, either through one continuous southern continent, or through series of land bridges and isthmuses, which extended from South America to India and united within its borders the Malay Archipelago and Australia. To this old World Southern Continent the name of Gondwonaland is given. This continent persisted as a prominent feature of the Southern Hemisphere from the end of the Palaezoic, through the whole length of the Mesozoic to the beginning of the Cainozoic when it disappeared as an entity by fragmentation and drifting away of its constituent blocks, or by their foundering". (D. N. Wadia, An outline of the Geological History of India.) অর্থাৎ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণআমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া এক অবিভক্ত মহাদেশের যে যে কল্পনা করা হয় পৃথিবীর শৈশবে তাহার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হইলেও (আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্ত ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক অনুমান মাত্র) যে সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠ উহার বর্তমান রূপ ধরিতে আরম্ভ করে সেই সকল পরিবর্তন কেনোজইক যুগের সূচনায় ঘটিতে থাকে অথবা মেসোজইক যুগের শেষের দিকে সেই সকল পরিবর্তন ঘটিয়া কেনোজইক যুগের প্রবর্তন হয়। কল্পিত মহাদেশটি এই সময়ে ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কোন কোন অংশ জলমগ্ন হয়।

এখন এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে টারসিয়ারী আমলের (Tertiary epoch) শেষের দিকে অর্থাৎ প্লিওসিন (pliocene) যুগে যখন কতকটা মানুষের মত জীবের (Eoanthropus) আবির্ভাব অনুমান করা হয় সম্ভবতঃ তাহার পূর্বেই ভূপৃষ্ঠের বিরাট পরিবর্তন ঘটিতেছিল। [Wallace এর মতে টারসিয়ারী আমলের অধিকাংশ সময়ে সিংহল ও দক্ষিণভারত একটি মহাদেশ বা দ্বীপের অংশ ছিল এবং ইহার উত্তরে ছিল বিস্তীর্ণ সমুদ্র—Geographical Distribution of Animals.] ইউরোপের নিয়েনডারথাল জাতির করোটির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর করোটির সাদৃশ্য কোন কোন পণ্ডিত দেখিতে পাইয়াছেন। কেহ নিয়েনডারথাল জাতিকে, কেহ জাভার Homo Soloensis-কে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। এই সকল মতের মূল্য যাহাই হউক এ কথা বলা যায় যে, ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অনুমান মতে ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার স্থলপথে সংযোগ যখন লুপ্ত হয় তখন পৃথিবীতে প্রকৃত নরজাতির (Neanthropic men) অভ্যুদয় হইয়াছে কিনা সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয়। ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার স্থলপথে সংযোগকে ভিত্তি করিয়া যাহারা দ্রাবিড় জাতি বা প্রাক্-দ্রাবিড়ীজাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর এক গোষ্ঠীত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন তাঁহাদের উৎসাহের প্রশংসা করিলেও বিচার শক্তির প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু আপাত চিত্তাকর্ষক কোন মতবাদ একবার প্রচার হইলে তাহা যতই অসার হউক না কেন তাহার জড় সহজে নষ্ট হয় না, বরং নূতন নূতন সমর্থক আবির্ভূত হইয়া উহার জীবনীশক্তি আরও বাড়াইয়া

দেন। একজন উৎসাহী পণ্ডিত আমাদিগকে বলিতেছেন, "...Geology and natural history alike make it certain that at a time *within the bounds of human knowledge* Sothern India did not form part of Asia. A large southern continent, of which this country once formed part, has ever been assumed as necessary to account for the different circumstances." তারপর আরও অগ্রসর হইয়া তিনি বলিতেছেন, "The Sanskrit Pooranic writers, the Ceylon Boddhists, the local traditions of the west coast, all indicate a great disturbancc of the point of the Peninsula within recent times." টারসিয়ারী যুগ হইতে এক নিঃশ্বাসে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে অবতরণ অসাধারণ উল্লম্ফন দক্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই!

ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের অনুমাণকে দক্ষিণভারতের অধিবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর এক গোষ্ঠীত্ব প্রমাণ করিবার যুক্তি হিসাবে Haeckel, Huxley, Keane, Dr. Maclean, Prof. Semon প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং আরও অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও ইউরোপের নিয়ানডারথাল জাতির করোটির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া ও প্রস্তর যুগের ইউরোপ, এই উভয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ সেতু-স্বরূপ ছিল, এইরূপ মনে করেন।

সে যাহা হউক বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এ বিষয়ে অধিক আলোচনার স্থানাভাব। দ্রাবিড় জাতির কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছে, পরে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক দল পণ্ডিত দক্ষিণভারতের সকল অধিবাসীকে দ্রাবিড় জাতীয় বলেন। Sir Herbert Risley এই দলের। আরেক দল প্রাক্-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় এই দুই ভাগে তাহাদের ভাগ করেন। প্রাক্ দ্রাবিড় বলিতে যাহাদিগকে দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি বলা হইতেছে তাহাদের বুঝায়। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ এই সকল উপজাতিকে বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর সহিত একগোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন। এ পর্যন্ত কোন জটিলতা নাই। জটিলতা দেখা দেয় যখন একগোষ্ঠীত্ব প্রমাণ করিবার প্রশ্ন উঠে।

প্রথমতঃ, দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি, বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর দৈহিক লক্ষণের যে অসাদৃশ্য দেখা যায় তাহা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে ভারত মহাসাগর ডিঙ্গাইয়া সুদূর অষ্ট্রেলিয়া বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে এক গোষ্ঠীর লোকের যাতায়াত কখন ও কি ভাবে হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়ার পথে বিভিন্ন অঞ্চলে নেগ্রিটো, মেলানেশিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন গোষ্ঠীর উপস্থিতির সহিত ভারতবর্ষ ও বহু দূর ব্যবধানে অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়ার একগোষ্ঠীর লোকের উপস্থিতির সামঞ্জস্য সাধন করা প্রয়োজন হয়। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, Palaeo-botany, Palaeontology, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং অনুমানের সাহায্যে এই সকল প্রশ্নঘটিত জটিলতার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উপরে অতি সংক্ষেপে এই প্রয়াসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বিভিন্ন আমলের অনুন্নত মনুষ্য সমাজের সামাজিক প্রথা, ব্যবহার প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বোর্ণিওর ডায়াক (Dyaks) ও আন্না-মালাই পর্বতমালার কাদারদিগের মধ্যে বৃক্ষে বাস করিবার প্রথা (tree-climbing), মালয়ের জাকুন (Jakuns) এবং কাদার ও ত্রিবাঙ্কুরের মাল-বেদানদিগের দাঁত ঘষিয়া সুচাল করিবার প্রথা, শকাই, পাচ্ছান, সেমাং এবং কাদারদিগের মধ্যে নক্সা কাটা বাঁশের চিরুণীর ব্যবহার এবং বর কর্তৃক

কনেকে ঐরূপ চিরুনী উপহার দিবার প্রথা ইত্যাদির উল্লেখ করেন, দক্ষিণ ভারতবর্ষের ও ইন্দোনেশিয়ার আদিবাসীদিগের মধ্যে কৃষ্টিগত ও তাহা হইতে জাতিগত সম্পর্ক প্রমাণ করিবার জন্য। এই শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্য অস্বীকার করিবার হেতু নাই, কিন্তু ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীর অনুমানকে এই সকল উপজাতির একগোষ্ঠীত্বের প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহার পরিপোষক হিসাবে এই কৃষ্টিগত সাদৃশ্যের যুক্তি ব্যবহার করা হয় বলিয়া আমরা যে জটিলতার উল্লেখ করিয়াছি সেই জটিলতা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে দক্ষিণভারতের আদিবাসীদিগকে যাঁহারা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড নাম দিয়া থাকেন তাঁহারা বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর সহিত তাহাদের দৈহিক লক্ষণের অসাদৃশ্য স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে অন্য যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহা অমীমাংসিত রাখিয়া এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, দক্ষিণভারতে নেগ্রিটো, মেলানেসিয়ান বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ান গোষ্ঠী হইতে পৃথক লম্বামুণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, চেপ্টানাক, খর্বকায়, কুঞ্চিত কেশ (euplocomi) একটি মনুষ্যগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায় যাহার নাম প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী বলা হইয়া থাকে।

অতঃপর দক্ষিণভারতের এই গোষ্ঠীর সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদিগের সম্পর্কের আলোচনা করা হইবে। ধর্ম ও ভাষায় দক্ষিণ ভারতের অন্য গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিবেশীদিগের সহিত এই প্রোটোলয়েড গোষ্ঠীর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।
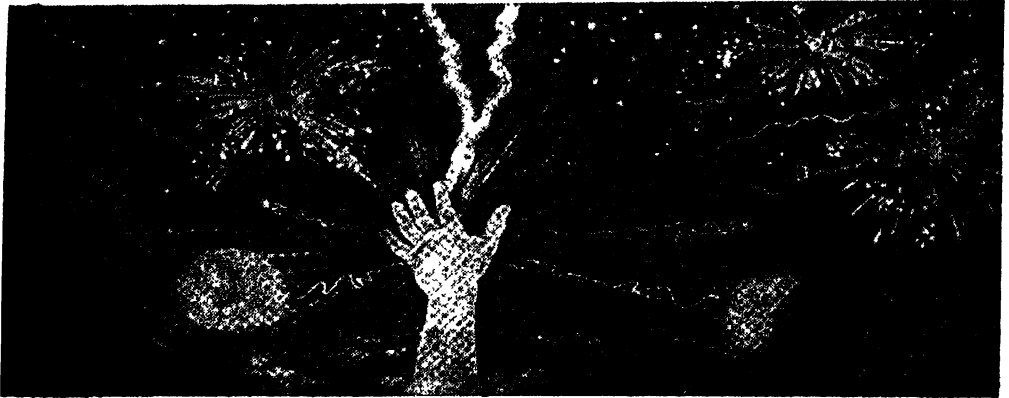
সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের কোনটার যদি সঙ্গে কোন কিছুর সংঘর্ষ ঘটে, তবে সেটা চুরমার হয়ে চতুর্দিকে ছিটকে পড়তে পারে। বিক্ষিপ্ত টুকরাগুলি অন্যকারো সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তাদেরও বিধ্বস্ত করতে পারে। এর ফলে উদ্ভূত প্রচণ্ড তেজ আশেপাশের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। 'নিউক্লিয়ার ফিসনের' ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এরকম না হলেও অনেকটা এই ধরণের।

দেশ ও কাল ভেদে পঞ্জিকার রূপ ও তাহার সংস্কার

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখানে প্রথমে আমরা পঞ্জিকাগণনার মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা করিব।

দিন

দিনের সংজ্ঞা কি? সূর্যাস্ত হইতে সূর্যাস্ত কাল, সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যাহ্ন, এ সমুদয়ই দিনের সংজ্ঞা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মধ্যরাত্রি হইতে পরবর্তী মধ্যরাত্রি কাল—এই সাম্প্রতিক সংজ্ঞাটি পৃথিবীর অনেক জাতিই নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া ধার্য করিয়াছে এবং ব্যবহারিক জগতে উহাই স্বীকৃত হইয়াছে। পুনশ্চ, যদি কোন নির্ভুল ঘড়ির সাহায্য লওয়া যায় তবে দেখা যাইবে যে দিনমানের এই দৈর্ঘকালটি স্থির নয়, হ্রাসবৃদ্ধিশীল। এজন্য জ্যোতির্বিদগণ দিনের একটি মৌলিক একক-সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাই 'মধ্যম সাবন দিন' (Mean solar day)। ইহা কৃত্রিম। প্রকৃত মৌলিক একক হইল 'নাক্ষত্রদিন' (sidereal day)। উহা পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষর উপর একবার আবর্তনের কাল; সুতরাং উহা নিত্য ও ধ্রুব।

বৎসর

সময়ের বৃহত্তর মানের একক হইল 'বৎসর'। বৎসর নানারূপে গণনা করা হয়; তন্মধ্যে পঞ্জিকা রচনায় 'সৌরবর্ষ' (tropical year) আবশ্যক হয়। একই ঋতুর পর পর পুনরাগমন কালের মধ্যবর্তী সময় হইল এই বর্ষ। ইহার মান মধ্যম সাবনদিনের একক হিসাবে দাঁড়ায় এইরূপ—

সৌরবর্ষ = ৩৬৫'২৪২১৯৮৭৯ — ১০$^{-৮}$ × ৬১৪ × জ *

অতএব বর্ষের দৈর্ঘকাল ধ্রুব নয়। সুমেরীয় যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে) বর্ষের দৈর্ঘ ছিল ৩৬৫'২৪২৫ দিন; বর্তমান যুগে এই দৈর্ঘ কমবেশী ৩৬৫'২৪২২ দিন। আমরা সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এই শেষোক্ত দৈর্ঘটিকে বর্ষমান হিসাবে ব্যবহার করিতে পারি।

স্পষ্টত, পুরাকালে এতটা সূক্ষ্মভাবে বর্ষমান স্থিরীকৃত হয় নাই! প্রকৃতপ্রস্তাবে পৃথিবীর বেশীর ভাগ জাতিই তাহাদের জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থায় বর্ষমান ধরিয়াছিল ৩৬০ দিনে, এবং বর্ষের মাস মোট ১২টি ও প্রতিমাস ৩০ দিনে। তাঁহারা পর্যবেক্ষণ করেন যে, মোটামুটি বছরে ১২টি চান্দ্রমাস (এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যা কাল) থাকে, এবং প্রত্যেকটি চান্দ্রমাসের কাল ৩০ দিন; এই জন্যই মনে হয় সৌরবর্ষকে ঐরূপে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল অচিরেই তাঁহারা উপলব্ধি করেন। প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসে এই ভ্রম নিরসন ও তাহার সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে এক গল্পিকা আছে;

---

* এই সংকেতটি ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের পরবর্তী কালে প্রযোজ্য। সংকেতটির 'জ' অর্থে 'এক জুলিয় শতাব্দী' (= ৩৬৫২৫ দিন)। জ্যোতির্বিদগণের মতে পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষের উপর উহার আবর্তনকাল স্থির থাকার পরিবর্তে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে; ইহার কারণ ভূ-গর্ভস্থ বস্তুর পরস্পর ঘর্ষণ (internal friction) এবং সাগরোত্থিত জোয়ার-ভাঁটা জনিত ঘর্ষণ (friction caused by tides)।

অবশ্য উহা আদিম মনোভাবেরই পরিচায়ক। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক এইরূপে উহার বিবরণ দিয়াছেন :

"পৃথ্বীদেব 'সেব' ও নভোদেবী 'নুটে'র এক সময় অবৈধ যৌনমিলন ঘটে ; তাহাতে দেবাদিদেব 'রে' (সবিতা) ক্রুদ্ধ হইয়া নুটকে অভিসম্পাত করেন যে, এই মিলনোৎপন্ন সন্তান কোন বর্ষের কোন মাসে প্রসূত হইবে না। অগত্যা নুট উপদেশের জন্য জ্ঞান দেবতা 'থথ' এর শরণাপন্ন হন। থথ তখন চন্দ্রদেবীকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার দীপ্তির ১/৭২ কলা জয় করিয়া লইলেন। বিজয়লব্ধ এই দীপ্তি দিয়া থথ পাঁচটি দিনের সৃষ্টি করিয়া সবিতা রে-কে উপহার দিলেন। ক্রুদ্ধ রে হইতে পরিতুষ্ট হন। এইরূপে সৌরবর্ষের দৈর্ঘ ৫ দিন বাড়িয়া যায় ও চান্দ্রবর্ষের দৈর্ঘ ৫দিন কমিয়া যায়। এই অতিরিক্ত ৫টি দিন কোন মাসের সহিত সংযুক্ত হইল না, মাসের মান ৩০দিনই থাকিল এবং বর্ষের শেষভাগে উহাদের জুড়িয়া দেওয়া হইল। নুট ও সেবের মিলনজাত পঞ্চদেবতার জন্মদিন উৎসব ঐ ঐ দিনে ধার্য হইল। এই পঞ্চদেবতার নাম—ওসিরিস, আইসিস্, নেফথিস্, সেৎ ও অনুবিস্। ইঁহারাই হলেন মিশরীয় দেবসমাজের প্রধান দেবতা।"

গল্পিকাটির তাৎপর্য এই যে, সভ্যতার প্রাথমিক যুগে মিশরীয়গণ ঠিক ধরিতে পারেন নাই যে, সৌরবর্ষমান প্রায় ৩৬৫ দিন ও চান্দ্রবর্ষমান প্রায় ৩৫৫দিন (প্রকৃত মান ৩৫৪দিন)। পরে যখন তাঁহারা ভুল বুঝিতে পারেন তখন তাহা সংশোধনার্থে উক্ত আখ্যানটির সৃষ্টি করেন।

চন্দ্র ও চান্দ্রমাসের সাহায্যে কালনির্ণয় করা প্রাচীন মিশরীয়গণ বর্জন করেন। উহাদের মাসগণনা ছিল ৩০দিনে এবং সপ্তাহের পরিবর্তে প্রতিমাসে ১০দিনের ৩টি 'দশাহ' বিভাগ ছিল। প্রাচীন ইরাণীয়গণ কিছু অদলবদল করিয়া মিশরীয় পঞ্জিকাই ব্যবহার করিত। ইহার বহুযুগ পরে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফরাসীগণতন্ত্রের পঞ্জিকা (Revolutionary Calendar) রচনার নিমিত্ত উক্ত প্রাচীন মিশরীয় পঞ্জিকার কতিপয় প্রয়োজনীয় অঙ্গ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বর্তমানেও প্রাচীন মিশরীয়গণের বংশধর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কপ্ট (Copt) দিগের মধ্যে এই পঞ্জিকাই প্রচলিত আছে।

কিন্তু বর্ষমান যে প্রকৃতপক্ষে ঠিক ৩৬৫দিন নয়, এ সত্য মিশরীয়গণ শীঘ্রই বুঝিতে পারে। কথিত আছে যে, মন্দিরের পুরোহিতগণ আকাশে লুব্ধকনক্ষত্রের 'বার্ষিক উদয়'* (helisoal rising) পর্যবেক্ষণ করিয়া ও নীলনদের বার্ষিক বন্যার মিশর রাজধানীতে আগমন লক্ষ্য করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

মিশর দেশ নদীমাতৃক ; ইহার মধ্য দিয়া নীলনদ প্রবাহিত না হইলে মিশর সাহারা মরুভূমির অঙ্কশায়ী হইয়া যাইত। এই নদের উৎপত্তিস্থল মিশর হইতে বহুদূরে মধ্য আফ্রিকা ও আবিসিনিয়ার পর্বতশ্রেণীতে। এই দুই স্থানে প্রচুর বারিপাতের ফলে নীলনদে বন্যা উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকাল হইতেই মিশরীয়গণ এই বন্যার জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালীর সাহায্যে নীলনদের উভয়পার্শ্বে প্রবাহিত করাইয়া দিয়া শস্যাদি রোপন করিত ('অববাহিক সেচন'—Basin Irrigation)। এজন্য বন্যার সময় পূর্ব হইতে সঠিক নিরূপণ করা তাহাদের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কর্ম ছিল। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, বন্যা ঠিক ৩৬৫দিন অন্তর অন্তর আসে না ;—একবছর যদি বন্যা আসে থথ মাসের ১লা তারিখে, চারবছর পরে আসে দোসরা তারিখে, আট বছর পরে তেসরা তারিখে। এইভাবে স্থূলত ১,৪৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে

*শেষ অস্তমিত হইবার পর কিছুকাল অদৃশ্য থাকিয়া পুনরায় উষাগমে পূর্বগগনে যে উদয় হয় তাহাকে 'বার্ষিক উদয়' বলা হয় ; আহ্নিক উদয়-অস্ত ২৪ ঘণ্টার বিভিন্ন সময়ে জ্যোতিষ্ক মাত্রেরই হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্যোদয়ের সমকালীন উদয়ের সহিত বার্ষিক উদয়ের সম্পর্ক বুঝিতে হইবে।—অনু

পুনরায় প্রথম বর্ষের মত থথের ১লা তারিখে নীলনদের বন্যা দেখা যাইবে। এই ১,৪৬০ বর্ষ-ব্যাপী বন্যার আবর্তন কালকে 'সথিক-চক্র' (sothic Cycle) বলে। বন্যার আগমনকাল কোন পার্থিব কারণে বিলম্বিত হইতে পারে, কিন্তু গগনচারী নক্ষত্রের (আপেক্ষিক) গতি প্রতিরোধ করে কে ?...অত্যুজ্জ্বল তারকা লুব্ধক হইল মিশরীয় দেবী আইসিস্। পূজাপার্বণের জন্য লুব্ধকের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত। বহুযুগব্যাপী অবিরাম পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল যে, পূর্বদিকচক্রবালে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে লুব্ধকের দুই ক্রমিক উদয়কালের মধ্যবর্তী কালকে মিশরীয়গণের ৩৬৫ দিন ব্যাপী বর্ষকাল বলা চলে না, কারণ এই কাল ৩৬৫ দিন অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা বেশী। অর্থাৎ, সূর্য আকাশমার্গের কোন বিন্দু হইতে সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আসে ৩৬৫ দিন পরে নয়, স্থূলত ৩৬৫¼ দিন পরে।

এই লব্ধজ্ঞান পুরোহিতগণ সাধারণ্যে প্রচারের পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখেন। বৎসরারম্ভে লুব্ধকের অবস্থিতি হইতে, অথবা কোন নথিপত্র দেখিয়া তাঁহারা সথিক-চক্রের সুরু হইতে কত বৎসর অতীত হইয়াছে গণনা করিতেন, এবং তাহা হইতে—নীলনদের বন্যা মিশরীয় পঞ্জীর কোন্ বিশিষ্ট তারিখে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছাইবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন। নীলনদের বার্ষিক বন্যা মিশরীয় অর্থনৈতিক জীবনে অতিপ্রয়োজনীয় ঘটনা। পুরোহিত সম্প্রদায় এইরূপে পঞ্জিকার উপর আধিপত্য তথা জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেন। কথিত আছে, মিশরাধিপতি ফারাওগণের সিংহাসন আরোহণকালে প্রতিশ্রুতি দিতে হইত যে, তাঁহারা কদাপি পঞ্জিকাসংস্কার কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

গ্রীকবংশীয় টলেমিদের শাসনকালে (খ্রীঃ পূঃ ৩২০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৪০ পর্যন্ত) যাহাতে ৩৬৫¼ দিনে বৎসর ধার্য হয় তাহার প্রভূত প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পুরোহিতগণ এইরূপ প্রবর্তনের প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাহা ফলবতী হয় নাই। রোমকগণ মিশর অধিকার করিবার পর সসিজেনেস্ (Sosigenes) নামীয় এক গ্রীকমিশরীয় বর্ণসঙ্কর জ্যোতিষী রোমের তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক জুলিয়স সীজরের সাক্ষাতে উল্লিখিত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেন। রোমকপঞ্জী ছিল এক গোলমেলে খিচুড়ি, কিন্তু সীজার ধর্মসম্রাট হিসাবে উহার সংস্কার সাধন করেন, এবং সেই সংস্কৃত পঞ্জীর নাম হয় "জুলিয়-পঞ্জী"। ঐ পঞ্জী ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত যুরোপে প্রচলিত ছিল।

'সৌরবর্ষ ৩৬৫.২৫ দিনে শেষ হয়'—এই মূল স্বীকার্যকে ভিত্তি করিয়া জুলিয়-পঞ্জী প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যাটি ৩৬৫.২৪২২ ; অতএব বছরে মোটামুটি ভুল হয় .০০৭৮ দিন। এই বার্ষিক ভুল সঞ্চিত হইয়া ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রায় ১৩ দিনে দাঁড়াইল। এজন্য, সীজরের সময়ে যে মকর ক্রান্তির (Winter Solstice) তারিখ ছিল ২৪শে ডিসেম্বর, এবং আনুঃ ৩৫৪ খ্রীঃ অব্দে* ২১শে ডিসেম্বর, তাহা ১৫৮২ অব্দে আগাইয়া ১১ই ডিসেম্বরে পৌঁছিল। ক্লেভিয়স (Clavius) ও লিলিয়স (Lilius) নামক জ্যোতির্বিদযুগলের পরামর্শে পোপ গ্রেগরী এক ইস্তাহার জারী করেন এই মর্মে যে, উক্ত ১৫৮২ অব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখটিকে ধরা হইবে ১৫ই অক্টোবর বলিয়া, কারণ এই উপায়ে মকর-ক্রান্তির তারিখটিকে ১১ই ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বরে পিছাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, গ্রেগরীর নির্দেশ ছিল যাবতীয় শতাব্দী-সংখ্যার শেষের দুই অঙ্কে 'শূন্য' থাকিলে উহাদের অধিবর্ষরূপে গণ্য করা হইবে না, কিন্তু যদি শতাব্দীর অঙ্কগুলি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবেই উহা অধিবর্ষ বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সংশোধন হেতু

* এই সময় খ্রীষ্টাব্দের প্রবর্তন সুরু হয়।

সৌরবর্ষের মান ৩৬৫·২৪২৫ দিন দাঁড়ায়, তাহাতে বাৎসরিক ভুলের মাত্রা থাকিয়া গেল ·০০০৩ দিন। এই শেষোক্ত ভুল সংশোধন করিতে হইলে ৩৩০০ বছর পরে তাহা করিতে হইবে ১ দিন বাদ দিয়া। যাবতীয় রোমান্ ক্যাথলিক দেশে গ্রেগরী-পঞ্জী গৃহীত হয়, কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট্ ও গ্রীক্‌ধর্মসংঘভুক্ত দেশগুলিতে (যথা, রুশ ও বল্কান রাষ্ট্রে) উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট্-ধর্মী দেশগুলিতে এই পঞ্জী-ই প্রচলিত হয়, কিন্তু রুশিয়া ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত জুলিয়-পঞ্জীই অনুসরণ করিত, এবং তাহার পর হইতেই সোভিয়েট-রাষ্ট্র উহার পরিবর্তে গ্রেগরী-পঞ্জীকে স্থান দিয়া আসিতেছে।

জুলিয়-গ্রেগরীয় মিশ্রপঞ্জী যে বর্তমানে জগাখিচুড়িতে পর্যবসিত হইয়াছে তাহার কারণ কি? রোমকগণ মিশরীয় 'বৎসর' গ্রহণ করিয়া নিজেদের 'মাস' গুলি বজায় রাখিল। পয়লা মার্চ রোমকবর্ষের প্রারম্ভ, এবং উহার প্রথম দশটি মাসের নাম ছিল—মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, কুইন্‌টিলিস (Quintilis), সেক্স্‌টিলিস (Sextilis), সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর—একুনে ৩০৪ দিন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃহত্তর মাস ৩১ দিনে, ও বাকীগুলি ক্ষুদ্রতর মাস ৩০ দিনে। প্রথম চারিটি মাস 'মার্শ' প্রভৃতি—চার দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত; ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাস হইল যথাক্রমে কুইন্‌টিলিস ও সেক্সটিলিস; ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম মাসগুলির অর্থজ্ঞাপক যথাক্রমে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাস। দশ মাসের পর আরও দুইটি মাস প্রক্ষিপ্ত হইল; উহাদের প্রথমটি "জানুস" দেবতাকে উৎসর্গীকৃত হইল, কিন্তু ২য়টি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী কোন দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত মাস হইল না। কোন এক অজ্ঞাত কারণে খ্রীঃ পূঃ ১৩৫ অব্দে বৎসরের প্রারম্ভদিন ১লা মার্চ হইতে ১লা জানুয়ারীতে সরাইয়া আনা হয়।

ইহার পর যখন জুলিয়স সীজর (খ্রীঃ পূঃ ১০০—৪৪) পঞ্জিকায় সংস্কার সাধন করেন তখন দাসভাবাপন্ন রোমের পৌরপরিষদ (Senate) ফরমান প্রচার করে যে, সীজরের সম্মানার্থে ৫ম মাসটির নূতন নামকরণ হইবে "জুলাই" এবং ইহা ৩১ দিনের বৃহত্তর মাস হিসাবে পরিগণিত হইবে। তাঁহার উত্তরাধিকারী আগষ্টাস ষষ্ঠমাসটিকে নিজের নামে রাখিবার জন্য ঐ পরিষদকে প্ররোচিত করেন। এই মাসের দিনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৩০ *, কিন্তু পৌরপরিষদ মনে করিলেন যে যদি সম্রাটের নামধারী মাসের দিনসংখ্যা ৩০ করা হয়, তাহা হইলে উঁহার পূর্ববর্তী সীজরের তুলনায় তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। এজন্য এই আগষ্ট মাসও ৩১ দিনে হইয়া উহা বৃহত্তরমাসে পরিণত হইল। এই বাড়তি দুইটি দিন দেবপ্রসাদে বঞ্চিত হতভাগ্য ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ছাঁটাই করা হইল, এজন্য ফেব্রুয়ারীর দিনসংখ্যা হইল ২৮। জনৈক সমালোচকের মতে, রোমের দুই স্বৈরাচারী নৃপতির খেয়াল চরিতার্থে যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইল তাহাকে পঞ্জিকার 'সংস্কার' বলা চলে না, পঞ্জিকার 'অঙ্গবিকার' বলা চলে।

এমন কি পোপ গ্রেগরীর সংস্কারকেও আমরা অসম্পূর্ণই বলিব। তাঁহার উচিত ছিল বড়দিনের (Christmas day) তারিখটিকে ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বরে সরাইয়া আনা। কিন্তু, ২৫শে ডিসেম্বরের পূর্বরাত্রে যীশুখ্রীষ্টের জন্মলাভ হয় এই ধারণা জনসাধারণের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, স্বয়ং খ্রীষ্টের পার্থিব প্রতিভূ পোপ্ পর্যন্ত সেই ধারণা বিগ্‌ড়াইয়া দিতে সাহসী হন নাই। পারস্যদেশের জোতির্বিদ্, কবি ও স্বাধীন চিন্তাবিলাসী দার্শনিক ওমর খৈয়ম কৃত পঞ্জিকা সংস্কারের তুলনায় গ্রেগরীয় সংস্কার বহুলাংশে

---

* কারণ, ১০ মাসের দিন সংখ্যা ৩০৪+জুলাই মাসের ৩১+ষষ্ঠ মাস ৩০=৩৬৫।—অনু

নিকৃষ্ট, কারণ ওমর সুলতান মেলিক শার আদেশে ১০৭৯ অব্দে 'জালালি-পঞ্জী' নামে এক সৌর পত্রিকার প্রবর্তন করেন, তাহাতে বৎসরের প্রারম্ভ ধরা হয় মহাবিষুবের (Vernal Equinox) দিন হইতে।

মাস

দিন ও বৎসরের ন্যায় 'মাস'ও একটি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক কালবিভাগ। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথম দুইটি সূর্য সম্পর্কিত, কিন্তু শেষোক্তটি পূর্বে সূর্য্যের পরিবর্তে চন্দ্রের সম্পর্কিতই ছিল। ইংরাজী পদ "মন্থ"টি প্রকৃতপক্ষে "মুন্থ" পদটিরই অপভ্রংশ। আকাশমার্গে চন্দ্র সূর্যের সংযোগ (Conjunction) হইতে অনুরূপ পুনঃ সংযোগ পর্যন্ত সময় (ভাষান্তরে, এক অমাবস্যার অব্যবহিত পরের দিন হইতে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত সময়) হইল 'মাস' (চান্দ্রমাস)। প্রকৃতপক্ষে, চন্দ্র আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং উহার মার্গের কোন বিশিষ্ট অবস্থান (ধরা গেল, মঘানক্ষত্র) হইতে সেইস্থানে চক্রাকারে ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহা প্রায় ২৭⅓ দিন। ইহাই চন্দ্রের 'নাক্ষত্র কাল' (Sidereal Period)। কিন্তু, যেহেতু সূর্যও সেই দিকে পরিভ্রমণ করে, অতএব চন্দ্র, সূর্যের সহিত পূর্ব সংযোগ স্থলে ফিরিয়া আসিবে কিছু বেশী সময়ে। ইহার কাল ২৯·৫৩০৫৮৮১ দিন (জ্যোতিবিদ্ নিউকোমের মতে)। চান্দ্রমাসের (Lunation) দৈর্ঘ এই শেষোক্ত সংখ্যক দিন; ইহাকেই মোটামুটি ৩০ দিন ধরিয়া ১৫ দিন ব্যাপী এক একটি পক্ষকাল নির্দেশ করা হয়।

পুরাকালে অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অমাবস্যার অব্যবহিত পরে যে দিন চন্দ্রের ক্ষীণ কলাটি পশ্চিম দিগন্তে প্রথম দৃষ্টিগোচর হইত সেই দিনটিকেই মাসের প্রথম দিন ধরা হইত। তাহার পর হইতে ক্রমিক ২য়, ৩য়, ইত্যাদি চাঁদের দিনগুলিই মাসের দোসরা, তেসরা, ইত্যাদি বলা হইত। ইস্লামধর্মী দেশগুলিতে তারিখ গণনার এই পদ্ধতি আজও অনুসৃত হইতেছে। মহরমের চাঁদ হইল ১০ম চাঁদ (শুক্লা একাদশীর)। অনুরূপ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, রোমক, ব্যাবিরুশ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহাই হিন্দুদের 'তিথি' গণনার ভিত্তি, যাহা পূর্বে ছিল 'চান্দ্রদিন'। এইটিই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে ধর্মোৎসবের দিন নির্ধারণে। অধিকন্তু, হিন্দুগণ মাসকে দুই অর্ধভাগে ভাগ করেন। প্রথমার্ধ শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ক্ষীণ কলাটি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং দ্বিতীয়ার্ধ কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মান চন্দ্রকলা মাসান্তে অমাবস্যায় লয় প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রের রাশিমণ্ডলকে ২৭টি (পূর্বকালে ২৮) ভাগে বিভক্ত করা হয়; এক একটি ভাগ হইল এক একটি নক্ষত্র বা চন্দ্রের কক্ষ (ঘর), এবং উহাদের নামকরণ হয়, যে যে কক্ষে যেরূপ প্রকট তারকাপুঞ্জ বিদ্যমান তাহাদের নামানুসারে। শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যদি চাঁদ থাকে মঘানক্ষত্রে, তবে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে চাঁদ থাকিবে (১৮০° পরে) শতভিষা নক্ষত্রে; এইরূপে দুই অষ্টমীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। নক্ষত্র দ্বারা চন্দ্রের অবস্থান সূচিত হইত প্রাচীন বাবিলন ও চীনে, কিন্তু এই প্রথার উৎপত্তির সন্ধান মিলা দুরূহ। তিথিগণনা যে বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণমূলক ছিল তাহা সমর্থিত হয় মহাভারত প্রমুখাৎ প্রাচীন সাহিত্য হইতে। মহাভারতে আছে যে কখনও কখনও ত্রয়োদশতম চান্দ্রদিনে পূর্ণিমা পড়িত। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অমাবস্যা হইতে ত্রয়োদশ দিনের মধ্যে পূর্ণিমা হইতে পারে না; মনে হয়, কখনও কখনও চাঁদের সর্বক্ষীণ কলাটি পর্যবেক্ষকগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, তাহার কারণ চন্দ্রের অবস্থান সূর্যের বোধ হয় অধিকতর নিকটবর্তী ছিল (অথবা অন্য কোন কারণে)। ত্রয়োদশতম দিনে

পূর্ণিমা হইলে অনুমিত হইত যে, ইহা রাজ্যের বা রাজ্যাধিপতির কোন অমঙ্গল সূচনা করিতেছে। সাধারণত, অমাবস্যার অগ্রপশ্চাৎ ধরিয়া দুই তিন দিন চাঁদ অদৃশ্য থাকে। তিন রাত্রি শোকপালন প্রথা যে এত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে তাহার মূলকারণ সম্ভবত এই তিন দিন ব্যাপী চন্দ্রের অদর্শন।

বহুসংখ্যক ধর্মানুষ্ঠানে সৌর ও চান্দ্র উভয় সম্পর্কই বর্তমান; যেমন ব্যাবিলনে ইহুদীদের "পাস-ওভার" (**Pass-over**) পর্বের তারিখ নির্ধারণে এবং আমাদের দেশে বসন্ত ঋতুতে চান্দ্র চৈত্র-মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব লৌকিক প্রথার প্রচলনে সৌর ঋতুর সঙ্গে চান্দ্র মাসের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সপ্তাহে একটি 'অবসর দিবস' (রবিবার) এবং অপর ছয়টি দিন 'কর্মদিবস' (**week days**)—এইরূপ প্রথা পুরাকালে ছিল না; এবং এতাবৎ কাল পর্যন্ত হিন্দুর প্রধান প্রধান উৎসবের দিন স্থির করিতে কর্ম দিবস অবসর দিবসের কোন বালাই নাই।

সৌর মাস

প্রায় এক বছরে বারোটি চান্দ্র মাস হয়; এইটি প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই বছরের বারোমাসের ধারণা জন্মে। বস্তুত, ১২ চান্দ্র-মাসের দিনসংখ্যা ৩৫৪.৩৬৭০৬ দিন, অর্থাৎ প্রকৃত সৌরবর্ষের মান অপেক্ষা ১০.৮৭৫ দিন কম। এই উভয় বৎসরের মধ্যে সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে গুরুতর কারণ আছে। আদিমযুগের জাতীয় জীবনে ধর্মকর্ম প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। উদাহরণ স্থলে ধরা গেল, কোন ঘটনা (যথা, কোন দেবপূজা) শারদীয় পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কোনও বৎসরে শরতের শেষ দিনে ঐ পর্বটি পড়িল; পরবর্তী বৎসরে পর্বকাল ১০.৮৭৫ দিন আগাইয়া আসিবে। এইরূপে ৫ বছর অতীত হইবার পর উক্ত পর্বের পূর্ণিমা তিথিটি প্রায় দুইমাস আগাইয়া আসিয়া বর্ষা-ঋতুতে পড়িবে। এজন্য, ঋতুর সহিত যোগাযোগ বজায় রাখিতে হইলে উভয় বৎসরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা প্রয়োজন। মুসলমানগণ কিন্তু ঋতুর সহিত পর্বের কোন সংশ্রব রাখেন না। প্রাচীন জাতি উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি রাখা সমীচীন বোধ করিয়াছিল। তাঁহাদের ব্যবস্থা হইল এইরূপ যে, ঐ ঘটনার তারিখকে আগাইয়া আনা হইবে এবং প্রতি ৫ বৎসর পরে দুইটি মাসকে 'মলমাস' বা অশুদ্ধ মাস গণ্য করিয়া যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান করা এই কালের ভিতর নিষিদ্ধ হইবে। এইরূপে কৌশল করিয়া পাঁচ বছর পরে পুনরায় পর্বটিকে শরতের শেষাশেষি ফেলিবার বন্দোবস্ত হইল। কোন কোন জাতি আড়াই বছর পরে একটি মলমাস ধরিল, অপরে সমতুল্য কোন বিধানের ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু, সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কিত অসঙ্গতি এত সহজে মিটিবার নয়। ইহা একটি দস্তুর মত কঠিন সমস্যা! প্রকৃতপক্ষে, মাস ও বৎসরের ভিতর ঐক্য সাধন করিতে গিয়া প্রাচীন জাতির বুদ্ধিমত্তা চরমে আলোড়িত হইয়াছিল। কোন কোন জাতি মুসমানদিগের ন্যায়, সূর্য-সম্পর্ক একেবারে বর্জন করিল; অপরাপর জাতি, মিশরীয়গণের ন্যায়, চন্দ্র-সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিল। হিন্দু ও ব্যাবিলোনীয়গণের ন্যায় অনেক জাতি—যাঁহারা উভয় সম্পর্ক বজায় রাখিতে অভিলাষী ছিল—তাঁহারা এরূপ এক জটিলতার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িল যে, ধর্মানুষ্ঠানের পর্বগুলির তারিখ নিষ্পত্তির মধ্যস্থতাকার্যে ব্রতী একমাত্র পুরোহিতবর্গই ক্ষমতালাভে সমর্থ হইল।

পঞ্জিকা সংস্কারে হিন্দুর প্রয়াস

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দী হইতে হিন্দুগণের পঞ্জিকাসংস্কার-কার্যে তীব্র প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, কারণ সেই সময়েই হিন্দুর জ্যোতিষ-বিজ্ঞান এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দু-

জ্যোতিষের আদর্শ প্রামাণিকগ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত' সেই সময়েই রচিত হয়। ইহার মতে, সৌরবর্ষের শুরু মহাবিষুব সংক্রান্তির (Vernal Equinox) সঙ্গে সঙ্গে ; অর্থাৎ, সেই সময়ে (আনুঃ ৫০৫ খ্রীঃ অঃ) সূর্যের রেবতীনক্ষত্রে (g-Piscium) সংযোগ হইলে বৎসরারম্ভ হয়। সৌরবর্ষের প্রথম মাস হিন্দুমতে বসন্ত-ঋতুর দ্বিতীয় মাস ; কিন্তু ইউরোপীয় মতে উহা বসন্তের প্রথম মাস। চান্দ্রপরিচয়ে এই মাসের নাম বৈশাখ। সৌরপরিচয় (১ম তপসিলের ২য় স্তম্ভে বর্ণিত) হইল ঋতুবাচক, ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। ইহার পূর্ববর্তী চৈত্রমাসে চান্দ্রবর্ষের আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ সূর্য মহাবিষুব (V. E.) অতিক্রম করিবার পূর্বে এক মাসের ভিতরেই অমাবস্যার অব্যবহিত পরের দিনে (মতান্তরে, পূর্ণিমার পরের দিন) চান্দ্রবর্ষ আরম্ভ। এই পদ্ধতি প্রাচীন ব্যাবিরুশ-পদ্ধতির বর্ষারম্ভের সহিত তুলনীয়। শেষোক্ত পদ্ধতি হিসাবে চান্দ্রবর্ষ আরম্ভ হয় 'নিসান্নু' মাসে, অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপদে, কিন্তু মহাবিষুবের পূর্বাপর একমাসের মধ্যে হইতে হইবে। ১ম তপসিলে তুলনামূলক বিষয়গুলি দেখান হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় প্রায় ৫০০ অব্দে হিন্দুগণ বিজ্ঞানানুগ পঞ্জিকা-সংস্কার আরম্ভ করিলেন—মহাবিষুবে সৌরবর্ষ আরম্ভ হইল, সৌর ও চান্দ্র গণনাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইল, ইত্যাদি ; কিন্তু একটি মারাত্মক ভুলে পঞ্জিকার স্থায়ী রূপটি পণ্ড হইয়া গেল—কারণ সৌরবর্ষের মানটি ৩৬৫·২৫৮৭৫ দিনে ধরা হয় বলিয়াই। এই সংখ্যা প্রকৃত সৌরবর্ষের মান অপেক্ষা ·০১৬৫ বেশী। অতএব, ১৪০০ বৎসর পরে বর্ষশেষ দিন মহাবিষুবে সূর্যের সংক্রমণে না ঘটিয়া উহা ঘটিবে ২৩·১ দিন পূর্বে। পুনশ্চ, হিন্দুমতে রেবতীনক্ষত্র সন্নিকটস্থ মহাবিষুব (V. E.) বিন্দুর অবস্থানটি ধ্রুব, যে বিন্দুটিকে ৫০০ খ্রীঃ অব্দে মহাবিষুব বিন্দু হিসাবে ধরা হইয়াছিল।

এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যদিও অয়নান্তবিন্দুর (equinoctial points) অয়নচলনের (precession) মৃদুগতির বিষয় তাৎকালিক হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের অবিদিত ছিল না, কিন্তু গতিসম্পর্কিত ধারণা ভ্রমাত্মক ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন অয়নান্তবিন্দুর গতি সূর্য-বিমুখী অবিচ্ছিন্ন এক দিকের গতি নয় উহা দোলন যন্ত্রের ন্যায় দোদুল্যমান মৃদু গতি, অর্থাৎ কিছুকাল একদিকে যাইয়া পুনরায় বিপরীত দিকে পরাবর্তন করে। অতএব, তাঁহারা স্থির করিলেন যে সৌরবর্ষ (tropical year) ধরিবার কোন আবশ্যকতা নাই, তৎপরিবর্তে নাক্ষত্রবর্ষ * (Sidereal year) ধরিলেই চলিবে, উহাতে অয়নান্ত-বিন্দুর কোন গতি নাই ("নিরয়ণ")। য়ুরোপেও অয়নচলন সম্বন্ধে অনুরূপ ভ্রমাত্মক কল্পনা (theory) প্রচলিত ছিল, তাহাকে বলা হইত 'বিক্ষেপগতি' (trepidation)। পরে, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের উপপত্তিগুলি যখন গ্রহের গতির সঠিক নিরূপণে সমর্থ হইল তখন লোকে আর উক্ত বিক্ষেপগতির পরিকল্পনায় আস্থা স্থাপন করিল না। ইহা সুবিদিত যে, অয়নচলন ব্যাপারটি গতিবিজ্ঞানের তথ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং উহার প্রধান কারণ হইল যে, পৃথিবীর আকার সুগোলের পরিবর্তে গোলাভাস (Spheroidal)। অয়নচলনের মান গতিবিজ্ঞানে কষিয়া বাহির করা হইয়াছে ;—উহা গোলাভাস পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ (Polar axis) ও নিরক্ষীয়াক্ষ (Equatorial axis) সম্পর্কে যে দুইটি জাড্যের ভ্রামক (moments of inertia) আছে তাহার অন্তর ফলের সহিত সমানুপাতিক (proportional), এবং এই অয়নচলন একমুখী (unidirectional)।

কিন্তু, এই সব তথ্য হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে পৌছায় নাই, তাঁহারা এখন পর্যন্ত সেই প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত এবং অপরাপর 'সিদ্ধান্ত' অনুযায়ী

* নাক্ষত্রবর্ষের মান ৩৬৫·২৫৬৩৬৩ দিন ; কিন্তু হিন্দুমতে উহার মান ·০০২৪ দিন বেশী।

পঞ্জিকা রচনার কাজ করিয়া চলিয়াছেন। হিন্দুর পাঁজিতে যে মহাবিষুব সংক্রান্তির তারিখ নির্দিষ্ট হয়, তাহার ২৩ দিন পরে সূর্য এ বিন্দু অতিক্রম করে এবং ধর্মানুষ্ঠানের সময়গুলির সঙ্গে ঋতু-পর্যায়ের যে সঙ্গতি রক্ষা প্রয়োজন তাহার যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে। গণনার পদ্ধতিটি দূষিত হওয়ায় উহার মূলে কুঠারাঘাত করাই শ্রেয়ঃ। হিন্দু পঞ্জিকা-ধৃত তারিখের উদ্ধত বেগ প্রতিরোধ করিয়া ২৩ দিন উহাকে হঠান আবশ্যক।...কারণ, বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত নির্মম মাধ্যাকর্ষণশক্তির অমোঘ নিয়ম বন্ধ করিয়া দিয়া প্রকৃতিদেবী হিন্দু পঞ্জিকাকারকে বাধিত করিবে না!...আমাদের দেশে স্বর্গত মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখাৎ কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তি হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কার কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক এবং ধর্মধ্বজী কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে সমুদয় প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই।

অতএব ফল দাঁড়াইতেছে এই যে, হিন্দুর পূজা পার্বনাদির প্রকৃত দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য সাধারণ্যে প্রচারিত পঞ্জিকাসমুদয় ভ্রান্ত মতবাদ ও অবলুপ্ত গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'কুসংস্কারের বিশ্বকোষ' রূপে পরিগণিত হইয়াছে; অথচ, আশ্চর্য এই যে, কুসংস্কার-পসারী পঞ্জিকাকারগণ ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া জনসাধারণের কাছে বাহবা লইতেও ছাড়িতেছেন না।

তপসিল ১ [তুলনামূলক]

	হিন্দু		ব্যাবিলোনীয়	ম্যাসিডনীয়	ফরাসী বিপ্লবীয়
	সৌর	চান্দ্র			
মহাবিষুব (V. E.)					
এপ্রিল	মাধব	বৈশাখ	নিসান্ন্	আর্টিমেসিয়স	অঙ্কুরিতা
মে	শুক্র	জ্যৈষ্ঠ	এয়ারু	দেইসিয়স	পুষ্পিতা
জুন	শুচি	আষাঢ়	শিবান্ন্	পানেনস	প্রান্তরিকা
কর্কটক্রান্তি (S. S.)					
জুলাই	নভস্	শ্রাবন	ডুজু	ল-ইয়স	শস্যশালী
আগষ্ট	নভস্যা	ভাদ্র	আবু	গর্পিয়া-ইয়স	নিদাঘ
সেপ্টেম্বর	ঈশা	আশ্বিন	উলুলু	হায়েরবেরেটিয়স	ফলবান্
জলবিষুব (A. E.)					
অক্টোবর	উর্যস্	কার্তিক	তস্হতু	ডিয়স	দ্রাক্ষারসী
নভেম্বর	সহস্	অগ্রহায়ণ	আব্রা স্মনা	আপেলা-ইয়স	কুজ্ঝটী
ডিসেম্বর	সহস্যা	পৌষ	কিসিলিবু	অডিনা-ইয়স	হৈমন্তিকা
মকরক্রান্তি (W. S.)					
জানুয়ারী	তপস্	মাঘ	ধবিতু—	পেরিটিয়স	তুষারিকা
ফেব্রুয়ারী	তপস্যা	ফাল্গুন	সুবুদ্	ডিস্‌ট্রস	প্রাবৃট
মার্চ	মধু	চৈত্র	অদ্দরু—রু	জ্যান্থিকস	পবন

দ্রঃ ষষ্ঠস্তম্ভে বর্ণিত বাংলা প্রতিশব্দগুলি ফরাসী শব্দের তর্জমা মাত্র।—অনু

দ্রষ্টব্য। হিন্দুমতে মহাবিষুবের পূর্বে ও পরে একমাস করিয়া একুনে দুইমাসকাল বসন্ত ঋতু; অনুরূপে, জলবিষুবের পূর্বে ও পরে একমাস করিয়া দুইমাস শরৎ। য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে মহাবিষুবের দিন হইতে শুরু করিয়া তিনমাসকাল বসন্ত ঋতু। হিন্দুর সৌরমাসের নাম (২য় স্তম্ভ) অপ্রচলিত হওয়ায় চান্দ্রমাসগুলির নামই চলিয়া আসিতেছে এবং উহা দ্বারা অধুনা সৌরমাসও বুঝাইতেছে। কুশান রাজত্ব ভারতে যতদিন স্থায়ী ছিল ততদিন পর্যন্ত ভারতে ম্যাসিডনীয় মাসগুলি প্রচলিত ছিল। গোঁড়া ইহুদীরা এখনও ব্যাবিলোনীয় মাস ব্যবহার করে, যদিচ তাহাদের বানান কিছু কিছু অদলবদল হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবীয় বর্ষ ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর জলবিষুবের দিনে শুরু হয়। প্রতি-মাস (ষষ্ঠ স্তম্ভে দর্শিত) ৩০ দিনে, ও ৩টি দশাহচক্রে বিভক্ত। প্রাচীন মিশরীয়গণের ন্যায় বর্ষশেষে তাহারা ৫টি অতিরিক্ত দিন (১৭ই সেপ্টেম্বর—২১শে সেপ্টেম্বর) গণনা করিয়া ঐ-ঐ দিনে জাতীয় উৎসব সমাধা করিত। উৎসবগুলি নিম্নলিখিত নামে উৎসর্গীকৃত হইত :—

(১) ধর্ম, (২) প্রতিভা, (৩) শ্রম, (৪) অভিমত, (৫) পুরস্কার। ফরাসী-বিপ্লবীদের অনুকরণে ইহুদীগণ ও ম্যাসিডনীয় গ্রীকগণ পরে জলবিষুবের দিনে বর্ষারম্ভ করিত। এই নিবন্ধের প্রস্তাবগুলি গ্রাহ্য হইলে বৎসরের ১২টি মাস প্রথম-স্তম্ভের পর্যায়ে ধরা বিধেয়।

সপ্তাহচক্র

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৎসর ও মাসের ন্যায় 'সপ্তাহ' প্রাকৃতিক কালবিভাগ নয়, উহা কৃত্রিম; উহার সহিত প্রাকৃতিক ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। স্থূলত, ইহা চান্দ্রমাসের এক-চতুর্থাংশ কাল। কিছু-দিন একটানা কাজ করিবার পর মানুষের স্বাভাবিক একটা অবসাদ আসে। সেই জন্যই বোধ করি একটি দিন বিশ্রামের মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে বলিয়া সপ্তাহের সৃষ্টি হইয়াছে। আদিতে পক্ষার্ধ কালকে সপ্তাহ বলা হইত। কিন্তু চন্দ্রের ভ্রমণগতি অনেকটা ছন্দহীন হওয়ায় পক্ষার্ধ কালটি স্থির থাকিতে পারে না, এজন্য একটি ধ্রুব-সংখ্যার প্রয়োজন হয়ত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগের আর্যদের 'ষড়াহ' ছিল, অর্থাৎ, ছয়দিনের কালচক্র। সাতদিনের চক্র উদ্ভূত হয় প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে উহাদের 'পঞ্চাহ' ছিল—চান্দ্রমাসের ষষ্ঠাংশ হিসাবে পাঁচদিনের কালচক্র—তৎপরে চান্দ্রমাসের এক চতুর্থাংশ সপ্তাহের সৃষ্টি। এক এক গ্রহ-দেবতার নামানুযায়ী সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণ হয়। পুরাকালে আচরিত রীতি ছিল যে, কোন ব্যবস্থায় শুচিতা আনিতে হইলে উহাতে দেবতার নাম আরোপিত হইত। পঞ্জিকা-রচনা কার্যে ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানা কুসংস্কারের উৎপত্তি করিতে সপ্তাহের শুচিতা সম্বন্ধীয় অনেক পৌরাণিক আখ্যায়িকা উদ্ভূত হইয়াছে। এ কারণে এই কালচক্রের উদ্ভব-রহস্য কিছু সবিস্তারে আলোচনা করিতেছি :—

ব্যাবিলোনীয়গণের ধারণা ছিল যে আকাশমার্গে ভ্রাম্যমান্ জ্যোতিষ্কমাত্রই গ্রহ। উহারা গ্রহগুলিকে পৃথিবী হইতে উহাদের আপাত দূরত্বের পরিমাণ হিসাবে পর্যায়ক্রমে সাজাইল এবং প্রত্যেক গ্রহাধি-পতি কে-কি কার্যভারপ্রাপ্ত তাহাও দেখাইল। যথা,—

গ্রহ	শনি ১	বৃহস্পতি ২	মঙ্গল ৩	রবি ৪	শুক্র ৫	বুধ ৬	সোম ৭
ব্যাবিলোনীয় দেবতা ও	নিনিব	মার্দুক	নার্গল	শামশ	ইষ্টার	নাবু	সিন
উহাদের কার্যভার	মহামারী	রাজা	যুদ্ধ	বিচার	প্রেম	জ্ঞান	কৃষি

দিন আবার ২৪ ঘণ্টায় বিভক্ত হইল। সাতটি দেবতা পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকে এক ঘণ্টা করিয়া মনুষ্য-কুলের উপর দৃষ্টি রাখিল। দিনের প্রথম ঘণ্টায় যে দেবতার দৃষ্টি রাখিবার ভার সেই দেবতার অধিষ্ঠিত গ্রহের নামানুসারে বারের নামকরণ হইল। যথা, শনিবারে প্রথম ঘণ্টায় নিনিব, (=শনি) হইল দৃষ্টিক্ষেপী দেবতা, এজন্য বারের নাম 'শনিবার'। শনিবারে, পর-পর ঘণ্টাগুলিতে দেবতাদের কর্তৃত্ব-ক্রম নীচে দেখান গেল :—

দিয়াছিল, যথা, বাইবেলে ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টি রহস্যের উপাখ্যানটির সৃষ্টি করিয়া ব্যাবিলনীয়দের নিকট যে দিনটি ছিল 'অশুভ' ইহুদীরা তাহাকে বলিল বিশ্রাম দিন (Sabbath day), কারণ তাহাদের মতে ঐ দিনটিই জগৎ সৃষ্টির ৭ম দিন, যে দিন সৃষ্টিকর্তা জোহাবা বিশ্রাম লইয়া ছিলেন। এই স্যাব্যাথ দিনটিতে এত বেশী পরিমাণে পবিত্রতা আরোপিত হইয়াছে যে পৃথিবীর যাবতীয় ইহুদী ঐ দিনে কাযকর্ম করে না।

ঘণ্টা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
দৃষ্টিক্ষেপী দেবতা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪

ঐদিন শনির প্রভুত্ব অধিকন্তু ৮ম, ১৫শ ও ২২তি ঘণ্টায়। ২৩তি ও ২৪তি ঘণ্টায় যথাক্রমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল এবং ২৪-ঘণ্টা অন্তে ২৫তি ঘণ্টায় (অর্থাৎ পরবর্তী দিনের ১ম ঘণ্টায়) ৪নং দেবতা 'রবি' দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, এজন্য সেইদিন 'রবিবার'। এই পদ্ধতি অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে, সপ্তাহের দিনগুলির ক্রমিক নাম এইরূপ—শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র।

ব্যাবিলোনীয়গণের শনিবার ছিল অমঙ্গলবার, উহা মড়কের অধিরাজকে উৎসর্গীকৃত, এজন্য ঐ দেবতার রোষভয়ে ভীত হইয়া তাহারা ঐদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখিত। কোন শিশুর জন্মক্ষণ (লগ্ন) যে ঘণ্টার মধ্যে পড়িত সে সেই ঘণ্টার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিশেষ দশায় পতিত হইত। কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার রীতির উৎপত্তি ঐ সময় হইতে হইয়াছিল অনুমিত হয়।

সাতদিনের সপ্তাহ গণনায় প্রধান প্রচারক ছিল ইহুদীজাতি ; উহারা অংশত মিশর এবং বহুলাংশে ব্যাবিরুশ ও আসিরিয়া দেশ হইতে সভ্যতা অর্জন করিয়াছিল, এবং সপ্তাহ কালচক্রটি গ্রহণ করিয়া উহাতে নূতন করিয়া শুচিতার প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিল বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টি রহস্যের উপাখ্যানটির সৃষ্টি করিয়া। ব্যাবিলো-নীয়দের নিকট যে দিনটি ছিল 'অশুভ' ইহুদীরা তাহাকে বলিল 'বিশ্রাম দিন' (sabbath day), কারণ তাহাদের মতে ঐ দিনটিই জগৎসৃষ্টির ৭ম দিন, যেদিনে সৃষ্টিকর্তা জেহোভা বিশ্রাম লইয়া ছিলেন। এই স্যাব্যাথ দিনটিতে এত বেশী পরি-মাণে পবিত্রতা আরোপিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় ইহুদী ঐদিনে কাজকর্ম করেনা। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, রোমকগণ এই ব্যাপার-টার অজুহাত লইয়া স্যাব্যাথ দিনে তাহাদের রাজধানী জেরুজেলম আক্রমণ করে এবং বিনা-যুদ্ধে নগরী দখল করে। কারণ যাজক সম্প্রদায় দ্বারা চালিত ইহুদীকুল কখনও স্যাব্যাথ দিনে যুদ্ধরূপ পাষণ্ডীকার্য লিপ্ত হইতে পারে না ; বরং, উহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল যে, এই দেবদূষক কার্যের জন্য জেহোভা রোমকদের সমু-চিত শাস্তিরই বিধান করিবেন, কিন্তু জেহোভা চুপ করিয়াই ছিলেন।

ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ৩২৩ খ্রীঃ অব্দের পরে Constantine রোমক সাম্রাজ্যে ৭দিনের সপ্তাহ প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্টান-

পণ ইহুদীদের স্যাবাথদিনকে 'প্রভুর দিন' না ধরিয়া পরবর্তী রবিবারে ঐদিন ধার্য করে। ইহার ফলে কয়েকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাইবেল মতে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয় ইহুদীদের pass over পর্বের দুইদিন পূর্বে। Pass-over পর্বের দিন যীশুশিষ্যরা তাঁহার কবর স্থান দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন যে, তাঁহার দেহ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা প্রচার করিয়া দেন যে, যীশু সশরীরে স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছেন। বাইবেলের কোথাও উক্ত হয় নাই যে, তিনি 'কোন বারে' ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তখন পর্যন্ত ইহুদীদের মধ্যে বারের প্রচলন হয় নাই। Pass-over পূর্ব অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তী-পূর্ণিমায়।

কিন্তু, সম্রাট Constantineএর আজ্ঞানুসারে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যখন যীশুর পুনরুত্থানের দিন ঠিক করিলেন তখন "বারের" প্রচলন সুরু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত 'রবিবারে' (খ্রীষ্টীয় মতে Lord's day-তে) কবর হইতে উঠাইতে হইবে এবং এই 'রবিবার' হইবে বসন্ত ঋতুর পৌর্ণমাসীর নিকটতম রবিবার। অতএব, এই রবিবারের দুইদিন পূর্ববর্তী শুক্রবারে যীশু মানবজাতির কল্যাণার্থ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে "গুডফ্রাইডে" বলা হয়। গুডফ্রাইডে হইতে পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত চারিদিনকে "ঈষ্টার" পর্ব বলে। কিন্তু ইহাতে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ফল এই হইল যে, ২২শে মার্চ হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫দিনের মধ্যে ঈষ্টার পর্ব পড়িতে পারে। ইহাই মুখ্য পর্ব। অন্যান্য গৌণ পর্বের দিনগুলি কবে পড়িবে নীচে সংকেত দ্বারা সূচিত হইল :—

ঈষ্টার (যীশুর পুনরুত্থান দিবস)

গুডফ্রাইডে (−২)	লো—সনডে (+৭)
পাম-সনডে (−৭)	রোগেশন্ (+৩৫)
কোয়াড্রাজেসিমা- সনডে (-৪২)	অ্যাসেন্সান (+৩৯)
অ্যাশ্-ওয়েড্নেসডে (-৪৬)	হুইট-সনডে (+৪৯)
কুইন্ কোয়েজেসিমা-সনডে (-৪৯)	ট্রিনিটি (+৫৬)
…ইত্যাদি	কর্পাস্-কৃষ্টি (+৬০)

উক্ত তালিকায় বন্ধনীর অন্তর্গত বিয়োগ চিহ্ন (−) সূচিত করিতেছে ঈষ্টারের পূর্বে ও যোগচিহ্ন (+) ঈষ্টারের পরে। যথা, "গুড্-ফ্রাইডে (−২)" অর্থে যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হইবার দিনটি ঈষ্টার পর্বের ২ দিন পূর্বে, এবং "অ্যাসেন্সন্ (+৩৯)" পর্ব উক্ত ঈষ্টারের ৩৯ দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়।

যে কোন বৎসরে ঈষ্টারের তারিখটি যাহাতে অনায়াসে নির্নীত হইতে পারে তাহার সহজ সংকেত বাহির করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বিখ্যাত গণিতবিশারদ গাউস (Gauss), কিন্তু তিনি বিশেষ কৃতকার্য হন নাই।

সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান জাতিগুলি অন্যান্য জাতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া দোষারোপ করে, কিন্তু তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানের পর্ব নির্ধারণ কার্যে ত্রিদেবতার পরিতুষ্টি সাধন করিতে হয়। যথা, সূর্য (মহাবিষুব), চন্দ্র (পূর্ণিমা) এবং ব্যাবিলোনীয় সপ্তগ্রহ দেবতা-গোষ্ঠী (সপ্তাহ); কিন্তু হিন্দুরা ধর্মকার্যে মাত্র চন্দ্র সূর্যরূপ যুগল দেবতাকে সন্তুষ্ট করে। কাজেই, খ্রীষ্টানরা যে অন্যধর্মীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। তাহাদের উচিত সর্বাগ্রে স্বধর্মীকে স্তূপীকৃত কুসংস্কাররাশি হইতে বিমুক্ত করা এবং পরে অন্যধর্মীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অপবাদ দেওয়া।

গ্রহমাত্রেই দেবতা এবং উহারা গাণিতিক নিয়মানুসারে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে—এই ব্যাবিলোনীয় অন্ধবিশ্বাস হইতে সাতটি বারের সপ্তাহচক্র উদ্ভূত হয়। তাহাতে ফলিত জ্যোতিষে কুসংস্কারের এইরূপ প্রবল বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে উহা প্রাচ্যের চীন-ভারত হইতে প্রতীচ্যের রোমকরাজ্য পর্যন্ত সভ্যজগতকে একেবারে ভাসাইয়া দেয়। খ্রীষ্টানদের বাইবেল, হিন্দুদের পৌরাণিক সাহিত্য এবং চৈনিক

দার্শনিকদের লাওৎসে মতবাদ (Laotzian school) উল্লিখিত সূত্রাবলম্বনে কুসংস্কারের ভিত্তির উপর যে আচার-অনুষ্ঠানের গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিল তাহা অদ্যাবধি পৃথিবীর এক বৃহৎ মানব-সমাজকে (উদাহরণস্থলে, খ্রীষ্টান পর্বগুলির দ্বারা) শাসন-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি আরবীয়গণ মূর্তিপূজার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

হিন্দুর ধর্মজীবনে ইহার ফলাফল দেখা যাউক। সপ্তাহ প্রচলিত হইবার পূর্বে অন্যান্য প্রাচীনজাতির ন্যায় হিন্দুগণের শুভাশুভ দিন নির্ধারণের এক সুসংবদ্ধ নিয়ম ছিল, উহা তিথি ও নক্ষত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদাহরণস্থলে, পুষ্যানক্ষত্রান্তর্গত পূর্ণিমা অতিশয় শুভদিন; এইদিনে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে ভোজন করাইলে যেরূপ পুণ্যলাভ হয় (সম্রাট অশোকের বহু শিলালিপিতে এই মর্মের উক্তি আছে) অন্য সাধারণ দিনে তাহা হয় না। অশোকের শিলালিপি কিংবা সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্যে, যথা, মহাভারত প্রভৃতিতে, কুত্রাপি সাপ্তাহিক বারের উল্লেখ নাই। কোন বীরপুরুষের জন্মবিবরণী তিথি, নক্ষত্র এবং কখন কখন ঋতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বার উল্লেখের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট বুধগুপ্তের আমলে ইরাণীয় শিলালিপিতে, যাহার কাল ৪৮৪ খ্রীঃ অব্দে। এই সনের পূর্ববর্তী কোন সময়ে সাপ্তাহিক বারের নিশ্চিত প্রচলন হইয়াছিল, সম্ভবত ২০০ খ্রীঃ অব্দের কিছু পরেই; কারণ এই শেষোক্ত সময়ের কুশানগণের শিলালিপিতে বারের কোন উল্লেখ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, শকদ্বীপ হইতে সপ্তাহচক্র ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

উহার প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ নব নব আখ্যান সৃষ্টির এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া ভারতের গণমনকে কুসংস্কারের কৌশলময় উর্ণনাভপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। স্মরণাতীত কালে উৎপন্ন প্রধান প্রধান ধর্মানুষ্ঠানের দিনক্ষণ চন্দ্রগতি-সাপেক্ষ হইয়া ধার্য হইয়া আসিতেছিল, জ্যোতিষীগণ সে সবে হস্তক্ষেপ করিল না। সেগুলি মলমাসের সাহায্যে ঋতুর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ধার্যই রহিল, কিন্তু বার ও তিথি সংযোগে উৎপন্ন কয়েকটি শুভাশুভ দিনের নির্ঘণ্ট উদ্ভূত হইয়া মানুষের কর্মজীবনকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। বিবাহের জন্য অমুক মাসের অমুক দিনের অমুক লগ্ন শাস্ত্রীয়, অমুক ক্ষণটির অতীতে যাত্রা শুভ, অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিনের অমুক ক্ষণে গৃহ-প্রবেশ প্রশস্ত, ইত্যাদি। জাতক শিশুর জীবনগতি জন্মকালীন অমুক গ্রহ-দেবতার দশায় এবং অমুক-অমুক গ্রহের অপঃ দৃষ্টির সাহায্যে নির্ণীত হইবে। জ্যোতিষী-নির্দিষ্ট শুভদিন ব্যতীত কোন নৃপতি সিংহাসনে আরোহণ করিবেন না, অথবা, কোন শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবেন না। রোমকদের জেরুজেলম অধিকার অথবা ধর্মাধিপ রোম-সম্রাটের নিযুক্ত ভাড়াটিয়া ঘাতক কর্তৃক ভ্যালেনষ্টাইনের (Wallenstein) হত্যা প্রভৃতির ন্যায় ভারতেও অনেক জাতীয় দুর্দৈব আসিয়াছিল জ্যোতিষীর পরামর্শগুণে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বিজ্ঞানের যতই প্রচার ও উন্নতি হউক কুসংস্কার টিকিয়া থাকিবেই। পৃথিবীর ঐতিহাসিক কতিপয় ঘটনার সন্ধিক্ষণে প্রভূত প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে সাতদিনের সপ্তাহ ও তৎসম্পর্কিত কুসংস্কারের স্তূপ নির্মূল করিবার জন্য। ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃবর্গ মিশরীয়গণের ন্যায় দশাহচক্র প্রচলন করেন; বল্‌শেভিকরা প্রথমে পাঁচদিন, তারপর ছয়দিনের চক্র লইয়া পরীক্ষা করিবার পর অবশেষে সাতদিনের সপ্তাহ অবলম্বন করে। প্রাচীন ইরাণীদের কোন সাপ্তাহিক বার ছিল না, কিন্তু মাসের দিনগুলির পরিচয় ছিল কোন দেবতার নাম বা মূলনীতিজ্ঞাপক প্রতিশব্দের নামে, যথা, আহুর মাজ্‌দা দিবস,

মিথ্‌) দিবস প্রভৃতি। পরে তাহারাও সাতবারের সপ্তাহ গ্রহণ করে। পরিকল্পিত সনাতন পঞ্জীতে সপ্তাহবিভাগ বজায় আছে। কোন কোন ইহুদী যাজকের মতে বর্ষশেষে সপ্তাহবহির্ভূত একটি অতিরিক্ত দিন বা কোন অধিবর্ষে দুইটি অতিরিক্ত দিন ধার্য করা মহাপাপ।

পূর্ববর্ণিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সন্তোষবিধায়ক কোন সার্বজনীন বিশ্বপঞ্জিকা রচনা করা কল্পনা-কুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়। সার্বজনীন-পঞ্জিকা-কারদের কর্তব্য হওয়া উচিত, জ্যোতিষের অভ্রান্ত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত তথ্যরাজি অবলম্বনে একখানি 'অর্থনৈতিক পঞ্জিকা' প্রস্তুত করা। সপ্তাহ-চক্রকে অব্যাহত রাখা কর্তব্য, কারণ ছয়দিন শ্রম-কর্ম অন্তে একদিনের অবসর মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে প্রশস্ত। কিন্তু পঞ্জিকার রচনাবিন্যাস ধর্মগত কোন পটভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ জনৈক চৈনিক জ্ঞানপিপাসুর মতে 'ধর্ম বহু, যুক্তি একমাত্র'।

আদর্শ পঞ্জিকার আবশ্যকীয় উপাদান

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে প্রতীত হয় যে, কোন আদর্শ পঞ্জিকা রচনায় নিম্নবর্ণিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে :—

(ক) জ্যোতিষিক তথ্যগুলিকে যথাযথ শুদ্ধভাবে পঞ্জিকায় অনুসরণ করিতে হইবে।

উক্ত দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অধিবর্ষ সম্পর্কিত গ্রেগরীয় নিয়ম ১০৭৯ খ্রীঃ অব্দে পারস্যে ওমর খৈয়ম্‌ প্রবর্তিত ব্যবস্থার তুলনায় নিকৃষ্ট। গ্রেগরীয় বিধানে ৪০০ বৎসরে ৯৭টি অধিবর্ষ হয়, গড় বর্ষমান ৩৬৫·২৪২৫ দিন ধরিয়া। তজ্জনিত ৩৩০০ বৎসরে ১ দিনের ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু, তৎপরিবর্তে যদি ১২৮ বছরে ৩১টি অধিবর্ষ ধরা যায় তবে গড় বর্ষমান ৩৬৫·২৪২১৯ দিন হয়; এজন্য ১ লক্ষ বছরে মোট ১ দিনের ব্যতিক্রম ঘটে। সুতরাং, শেষোক্ত ব্যবস্থা-ই গ্রেগরীয় বিধান অপেক্ষা বরণীয়।

(খ) জ্যোতিষে বর্ণিত কোন সুনির্দিষ্ট খ-বিন্দুতে সূর্য সংক্রমণ হইবার সময়ে বর্ষারম্ভ হওয়া সমীচীন। যথা, মহাবিষুব (ম. বি.), জলবিষুব (জ. বি.), কর্কট-ক্রান্তি (ক. ক্রা.) অথবা মকর ক্রান্তি (ম. ক্রা.) বিন্দুতে।

ইহাদের মধ্যে ম. বি. হইতে শুরু করিয়া পারস্যের নববর্ষের প্রথমদিন (নাও রোজ) ধরা হইয়াছিল। যত নববর্ষের দিন আছে তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা জ্যোতিষসম্মত। খ্রীষ্টানগণ পয়লা জানুয়ারীতে নববর্ষ আরম্ভ করে, ইহার আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এতদ্বারা সাম্রাজ্যবাদী রোমকগণের কথাই স্মরণ হয়, * যাহারা জানুস-দেবতার স্মরণার্থে পয়লা জানুয়ারীতে বর্ষ-প্রবেশ ধরিয়াছিল। ইহা পরিত্যাজ্য; কারণ জানুস-দেবতা বহুপূর্বেই মরজগত হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন!

বৎসরের অন্যান্য তিনটি মুখ্যবিন্দুর মধ্যে ম. ক্রা. হইতে কখনও কখনও বর্ষগণনা হইত এবং পৃথিবীর উত্তর-গোলার্ধে অবস্থিত যাবতীয় অধিবাসী ঐ দিনটিতে জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান করিত। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। মানব-সভ্যতার বাল্যভূমি উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে লোকে প্রচণ্ড শীত সহ্য করিয়া জীবন-ধারণ করিত; তাহারা লক্ষ্য করিত যে শীত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় একটু একটু করিয়া প্রতিদিন দক্ষিণ দিকের নিকটবর্তী হইতে থাকে। মকর-ক্রান্তিতে সূর্যের দক্ষিণায়ন চূড়ান্ত হইয়া উহা উত্তরমুখী হইতে শুরু করে মকর-ক্রান্তির আগমনে নিরানন্দময় শীত ঋতুর অবসান হইল ভাবিয়া আদিম মানুষ ঐ দিনটিতে নানাবিধ উৎসবের আয়োজন করিত। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রণিধানযোগ্য :—

* রোমকবর্ষ প্রথমে ১লা মার্চ তারিখে শুরু হইত, পরে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৩৫ অব্দে নববর্ষ ১লা জানুয়ারীতে পিছাইয়া যায়।

বৈদিকযুগে ভারতীয়গণ সূর্যের উত্তরায়ন প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিত এবং উহার সূচনা লক্ষ্য করিবার পরক্ষণেই যাগযজ্ঞবলি প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া দিত। [আজ পর্যন্ত উৎসবটি 'পৌষ পার্বণ' নামে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু এই পার্বণ ম, ক্রা, দিনে আর হয়না, কারণ প্রাচীন পঞ্জিকাকারগণ বর্ষমানের গণনায় যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা এতাবৎ অসংশোধিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে বলিয়া]। তৎপরে, আনুঃ ৫০০ খ্রীঃ অব্দে, সৌরবর্ষের প্রারম্ভ ম, বি, হইল, কিন্তু চান্দ্রবর্ষের আরম্ভকাল সম্পর্কে একাধিক নিয়ম প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন পারসিকগণ মকরক্রান্তিতে তাহাদের আলোকদেবতা মিথ্রার (সম্ভবত অংশুমান সূর্যে দেবত্বারোপ করিয়া) জন্মোৎসব দিন পালন করিত। চীনের পীত সম্রাট হুয়াংতাই (Huang-Ti, the yellow Emperor) খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ অব্দে তাহাদের জাতীয় পঞ্জিকার প্রচলন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ইস্তাহার জারী করেন যে, ম, ক্রা, দিনে স্বর্গসূর্য (অর্থাৎ সম্রাট স্বয়ং) জাতির পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন প্রজাপুঞ্জের তরফ হইতে। ইহার পর কন্‌ফুসি, বৌদ্ধ, তাও প্রভৃতি ধর্মান্দোলন হওয়া সত্ত্বেও চীনের ঐ ম, ক্রা, দিনের অনুষ্ঠানটি মাঞ্চুরাজত্বকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। য়ুরোপের উত্তরভূখণ্ডে আদিম টিউটন জাতি বিভিন্নপ্রকারে ম, ক্রা, দিনে উৎসবের (যথা, বড়দিনের উৎসব 'ইয়ুল') অনুষ্ঠান করিত।

বর্তমানে খ্রীষ্টানজগতে ২৫শে ডিসেম্বরের পূর্বরাত্রে যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভে ২৫শে ডিসেম্বর দিনটি ছিল 'ম, ক্রা,'র তারিখ। তবে একথা খুবই লক্ষ্য যে, 'ম, ক্রা'র দিনটি উহার জ্যোতিষিক বিশেষত্বের গুণেই গরীয়ান, উহার সহিত যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সম্পর্ক পরে ঘটিয়াছিল। পাঠকগণের অনেকেই শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, "আদৌ খ্রীষ্টীয়-ধর্মসমাজে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব বলিয়া কিছু ছিল না এবং খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে যীশুর জন্মদিন বিষয়ে কোন সর্ববাদিসম্মত অভিমত গড়িয়া উঠে নাই পঞ্জিকার কোন্ বিশিষ্ট তারিখে উহা পড়িতে পারে"*। তাৎপর্যটি এই যে, প্রাচীন খ্রীষ্টানগণ যীশুর জন্মকালীন সন ও তারিখ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল, এবং খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মকরক্রান্তির রাত্রে যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব পালন-রীতি বর্তমান ছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহা পরবর্তী যুগে কল্পিত হইয়াছে।

ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। বাইবেলের 'সুসমাচার' নামক খ্রীষ্টজীবনীগুলিতে যীশুর জন্মের সন তারিখের কোন উল্লেখ নাই এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 'মার্ক' লিখিত সুসমাচারে প্রকাশ যে, যীশু গ্যালিলি প্রদেশান্তর্গত 'ন্যাজারেথ' নামক গ্রামের এক দরিদ্র সূত্রধরের পুত্র এবং ৩০ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার সুসমাচার প্রচারে ব্রতী হন। সম্ভবত, তিনি ১৭ মাসের অধিককাল প্রচার-কায চালাইতে পারেন নাই। তাঁহার উপদেশসমূহ গোঁড়া ইহুদীদের বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যীশু ইহুদীদের pass-over পর্বে যোগ দিবার উদ্দেশ্যে সশিষ্য জেরুজেলম শহরে আসিলে, ঐ অনুষ্ঠানের দুইদিন পূর্বে উহাদের প্রধান যাজকের আজ্ঞাক্রমে তিনি ধৃত হন। প্রধান যাজক রোমক-শাসনকর্তার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার পরদিন তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। তাঁহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত জনৈক ধনী দরদী ব্যক্তির প্রার্থনায় তাঁহাকে এক পার্বত্যগুহায় সমাহিত করা হয়। যীশুর শিষ্যবৃন্দ 'সপ্তাহের প্রথম দিনে' তাঁহার সমাধি-স্থানে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার নশ্বরদেহ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

---

* 'Encyclopaedia Britannica' র ১৪শ সংস্করণে—"Christmas" শীর্ষক নিবন্ধ হইতে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ।

তাঁহার ক্রুশে বিদ্ধ হইবার 'দিন ও ঋতু' সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন মিলিতেছে—উক্ত pass-over পর্বটির উল্লেখ। খ্রীষ্টধর্মীগণ প্রাচীন কাল অবধি দুইটি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে—(১) গুড্-ফ্রাইডে (ক্রুশারোহণ দিবস) এবং (২) উহার পরবর্তী রবিবারে ঈষ্টার পর্বটি (পুনরুত্থান দিবস)। উভয় ক্ষেত্রেই বারের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু সুসমাচারগুলিতে বর্ণিত ইহুদীগণের "সপ্তাহ" যে অধুনা প্রচলিত "৭ দিনের সপ্তাহ" নয়, উহা পুরাতন চান্দ্রসপ্তাহ, তাহা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি বর্তমান আছে। অমাবস্যার পরবর্তী চতুর্দশতম দিনেই উক্ত pass-over পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে ৭ দিনের সপ্তাহের প্রচলন হয় নাই, এবং তথাকথিত 'প্রভুর দিবস' রবিবারকে কোন গূঢ় প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই,—খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের উপর ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব এইটি পরে ঘটাইয়াছিল।

৩২৩ খ্রীঃ অব্দে খ্রীষ্টধর্ম রোমকসাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। এই সময়ে কতকগুলি পৌত্তলিক উৎসব নবধর্মকে উপেক্ষা করিয়াই জনপ্রিয় রহিয়া যায়। খ্রীষ্টীয় যাজকগণ পৌত্তলিক উৎসবগুলির সহিত যীশুর জীবনচরিতের সমন্বয় সাধন করিলেন। এই ব্যবস্থা বেশ কৌশলী, কারণ ইহাতে 'রথ দেখা, কলা বেচা' দুই-ই বজায় থাকিল।

এ কথা সকলেই জানেন যে, যখন সাম্রাজ্যবাদী রোম পৌত্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে তখন খ্রীষ্টধর্ম ও মিথ্রধর্মের কোন্‌টি গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ দোলায় অতিবাহিত করে। মিথ্র উপাসনার রাজসিক অনুষ্ঠান যোদ্ধৃভাবাপন্ন রোমক-জাতির প্রাণে একটা তীব্র আবেদন জাগাইয়াছিল। একটি বর্ণনায় অনুমিত হয় যে, মিথ্র—যিনি জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠতার দেবতা—তাঁহার জন্ম হয় মকর-ক্রান্তিতে। বর্মাবৃত তরুণ যোদ্ধৃবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তিনি অজ্ঞান ও কামের প্রতীক এক ষণ্ডের পিছু অনুধাবন করিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। ইহার অর্থ, অবিদ্যা ও প্রধান রিপুর বিজেতা সর্বথা জ্ঞান ও ধর্ম। শুধু পারস্য নয়, রোমকরাজ্যের সর্বত্রই এই মিথ্রজন্মোৎসব পর্বটি অনুষ্ঠিত হইত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

৩২৩ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে রোমে খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রধর্মরূপে গ্রাহ্য হয়—ইহার কারণ এই যে সম্রাট Constantineএর ধারণা হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টানদের দেবতার প্রসাদেই তিনি বিপক্ষগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাওয়ায় খ্রীষ্টান যাজকগণ প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্র-উপাসকগণের উপর অনেক সুবিধা লাভ করেন। উঁহারা মিথ্রপূজার রাজসিক অনুষ্ঠানগুলি আত্মকরণ করিয়া নিজেদের অবস্থার সুবিধা করিতে লাগিলেন। যথা, মিথ্রদেবের জন্মোৎসব খ্রীষ্ট জন্মোৎসবের ভোজে পরিণত হইল। জুলিয়পঞ্জীতে ডিসেম্বর মাসের ২৪।২৫ তারিখে মকরক্রান্তি হইত আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে; কিন্তু ৩৫৫ খ্রীঃ অব্দে, যখন আমরা Christmasএর প্রথম উল্লেখ দেখি, তখন উক্ত সংক্রান্তি ২১শে ডিসেম্বরে আগাইয়া গিয়াছে এবং তৎসত্ত্বেও পূর্বধৃত ২৫শে ডিসেম্বরটিই খ্রীষ্টের জন্মদিন হিসাবে রহিয়া গিয়াছে।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, মকরক্রান্তির দিনটি বৎসরের এক অতি প্রয়োজনীয় মুখ্যদিন, যে দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় জাতির মুখ্য অনুষ্ঠানগুলির দিন ধার্য হইয়াছে। হিন্দু, প্রাচীন খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতি বৎসরের অন্যান্য প্রধান দিনগুলি হইতেও পর্বদিন নির্ধারিত করিয়াছে। নিম্নে ইহার এক সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল :—

বৎসরের মুখ্য দিবস	খ্রীষ্টান	ভারতীয় (বৈদিক)	চৈনিক	পারসিক	ইহুদী
ম. ক্রা. ২৫শে ডিসেম্বর	খ্রীষ্টের জন্ম	বার্ষিক যাগ-যজ্ঞাদির সূচনা	সম্রাট কর্তৃক পুঃ পুরুষ অর্চনা	মিথ্রার জন্মদিনোৎসব	—
ম. বি. ২৫শে মার্চ	খ্রীষ্টের আধান	—	—	নওরোজ (বর্ষ প্রবেশ)	—
ক. ক্রা. ২৪শে জুন	পাদ্রী জোহানের জন্ম	হরিশয়ন (অম্বুবাচী)	—	—	—
জ. বি. ২৪শে সেপ্টেম্বর	পাদ্রী জোহানের আধান	—	—	—	নববর্ষ প্রবেশ (আদিপ্রবেশ)

উক্ত তালিকার ১ম. স্তম্ভে প্রদত্ত তারিখগুলি খ্রীঃ ১ম. শতকের জুলিয়পঞ্জী অনুসারে উধৃত। ৩৫৫ খ্রীঃ অব্দে তারিখগুলি প্রকৃত পক্ষে ৪ দিন করিয়া পিছাইয়া যায়, তৎসত্ত্বেও পূর্বতারিখগুলি অপরিবর্তিত রাখা হয়।

প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মীগণ এইরূপে সূর্যের গতির সহিত পাদ্রি জোহান ও যীশুখ্রীষ্টের জীবনের তুলনা করিয়াছেন। ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) দক্ষিণার্ধে সূর্যের গতি যেন জোহানের প্রতীক এবং উহার উত্তরার্ধে সূর্যের গতি খ্রীষ্টের প্রতীক। কল্পিত হইয়াছে যে ২৪শে সেপ্টেম্বর জলবিষুব সংক্রান্তিতে জোহানের আধান এবং ইহার ২৭২ দিন পরে, ২৪শে জুন কর্কটক্রান্তিতে তাঁহার আবির্ভাব। অনুরূপে, খ্রীষ্টের আধান ২৪শে মার্চ মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ও আবির্ভাব ২৫শে ডিসেম্বর মকরক্রান্তির দিনে, অর্থাৎ ২৭৫ দিন পরে।

অব্দের সূচনা

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির গ্রাহ্য একটা অব্দ (era) বা সন স্থির করা অত্যাবশ্যক, যেটি সনাতনপন্থী প্রভৃত কার্যে ব্রতী সুধীবৃন্দ একেবারে উপেক্ষা করেন এই বিশ্বাসে যে একমাত্র খ্রীষ্টাব্দই সকল জাতিই অনুসরণ করিবে। আমরা দেখাইব যে 'খ্রীষ্টাব্দ' সার্বজনীন সমাদর ত পায়-ই নাই এবং তাহার বিশ্বপঞ্জিকা হিসাবে এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যও থাকিতে পারে না।

সার্বজনীন অব্দটি এরূপ হওয়া সঙ্গত যে, উহার সহিত সহজবোধ্য কোন জ্যোতিষিক ব্যাপারের যোগাযোগ থাকিতে পারে এবং উহা দেশ ও ধর্ম নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক হওয়া প্রয়োজন। এই আদর্শের মাপ কাঠিতে জগতের কতগুলি হাল ও পুরাতন অব্দ সন্তোষজনক তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। গোঁড়া ইহুদীরা সৃষ্টি-অব্দ (Era of Creation) নামে এক অব্দ ব্যবহার করে। এই অব্দের সূচনা হয় ৭ই অক্টোবর খ্রীঃ পূঃ ৩৭৬১ অব্দে। ইহুদী যাজকগণের মতে এই তারিখেই বাইবেলে উক্ত জেহোবা কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হয়। ইহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।

খ্রীষ্টীয় অব্দ

খ্রীষ্টান্ জাতি খ্রীষ্টের কল্পিত আবির্ভাব কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছে। খ্রীষ্টান যাজকগণ একটি কল্পিত আখ্যায়িকার সৃষ্টি করেন যেটি ডায়োনিসি-

য়স্ এক্সিজুয়াস্ (Dionysius Exiguus) নামে জনৈক পাদ্রীর প্রচেষ্টায় আনুঃ ৫০০ খ্রীঃ অব্দে প্রচার লাভ করে। ইহার পূর্বে খ্রীষ্টজন্মের কাল কোন সময়ে কেহই জ্ঞাত ছিল না এবং খ্রীঃ ৫০০ অব্দের পূর্বে রোমকরাজ্যে প্রচলিত যে অব্দটি ছিল সেটি গণনা হইত রোমনগরীর কল্পিত পত্তনের অব্দ (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩) হইতে। ইহাও খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় এক অপ্রাকৃত আবিষ্কার।

কয়েক বৎসর পূর্বে আঙ্কারা (Ankarah)-তে একটি রোমকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা হেরড (Herod) যিনি বাইবেলোক্ত শিশু যীশুর বধের চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪ অব্দে মারা যান। এক্ষেত্রে যীশুর কল্পিত জন্মবর্ষ অপেক্ষা অন্তত ৬। ৮ বছর পূর্বে (৪ বছর পূর্বে ত বটেই !) যীশুর জন্মকাল ফেলিতে হয়। অতএব দেখা গেল যে, আধুনিক যুগে এমন কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ পাওয়া যায় না যাহাতে খ্রীষ্টের পৌরাণিক আখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া এই যুগের অব্দ-সূচনা গড়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর অন্যান্য অব্দ, যথা—প্রাচীন গ্রীকদের অলিম্পীয় (Olympian) অব্দ, রোমকগণের রোমনগরী প্রতিষ্ঠাব্দ [মনে হয়, এই উভয় অব্দ ব্যাবিলন-রাজ 'নবোনাস্সার' প্রবর্তিত অব্দ হইতে উৎপন্ন], বৌদ্ধ নির্বাণাব্দ, হিন্দুর সম্বৎ ও শকাব্দ, আর্যভট্ট কৃত কলিযুগাব্দ—সমস্তই অপ্রাকৃত অব্দ—যাহাদের উৎপত্তিকাল দুজ্ঞের্য় রহস্যাবৃত। অধুনা অপ্রচলিত কয়েকটি অব্দ, যথা, গুপ্তাব্দ (৩১৯ খ্রীঃ অব্দে প্রবর্তিত) ও সেলুসিডীয় (Seleucidean) অব্দ (৩১৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম নিসান্ মাসে প্রবর্তিত হয় সেলুকসের বিজয়োৎসব উপলক্ষে) এই দুইটির প্রারম্ভকাল সুপরিস্ফুট। কিন্তু, কোন বিশিষ্ট জাতির ঐতিহাসিক জীবনের কোন বিশিষ্ট বৃহৎ ঘটনার স্মারক হিসাবে একটি অব্দের পত্তন সার্বজনীন সমাদর লাভ করিতে পারে না। এজন্য মনে হয় ঐরূপ স্মারকের পরিবর্তে কোন বৈজ্ঞানিক তথা জ্যোতিষিক সময় ধরাই সমীচীন।

ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণ যখন সমাজের এবং বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের, বহুযুগের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার দূরীকরণে প্রয়াসী হইলেন, তখন তাঁহারা ফরাসী গণতন্ত্রের উপযোগী নবাব্দ নির্বাচনের ভার দিলেন ফরাসীর বিদ্যায়তন French Academyর উপর। বিখ্যাত জোতির্বিদ্ লাপলাস্ (Laplace)-এর পরামর্শ গ্রহণ করায় তিনি রাষ্ট্রকে (Republique) উপদেশ দিলেন যে, ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দটি নবাব্দ সূচনার পক্ষে উপযোগী। এই লাপলাসীয় প্রস্তাবটি নেতৃগণের মনঃপূত না হওয়ায় উঁহারা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে নবাব্দ গণনা শুরু করিলেন, কারণ এই দিনই হইল উক্ত ফরাসী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার তারিখ এবং ইহা অধিবর্ষ হওয়ায় ঐবছর জলবিষুব ২২শে সেপ্টেম্বরে পড়িয়াছিল।

অন্যান্য অব্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ফরাসী বিপ্লবীয় অব্দটিও অচল হইয়া গেল। অধুনা বর্তমানযুগে ভাবপ্রবণতা খর্ব করিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তিবল বৃদ্ধির প্রয়োজন আসিয়াছে। অব্দাঙ্কের পত্তন কিরূপ হইবে ?—এই প্রশ্নটির সমাধান হইবার পূর্বে জ্যোতির্বিদগণের বৈঠকে উহা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দ্বারা মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক। যোসেফ স্কালিগার (১৫৪০-১৬০৯) উদ্ভাবিত জুলিয়-অব্দ সার্বজনীন অব্দের কতকগুলি সর্ত পালন করে সত্য, এবং নিরবচ্ছিন্ন কালের মাপক হিসাবে জ্যোতির্বেত্তাগণ ব্যবহারও করেন। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই সুদূর অতীতের গর্ভে, জানুয়ারী ১, ৪৭১৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে [—৪৭১২ খ্রীঃ অব্দে], ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

উপসংহার

পঞ্জিকাসংস্কার বিষয়ে আমরা আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি :—

(১) সার্বজনীন পঞ্জিকা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মজীবন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং উহাতে পৃথিবীর যাবতীয় জাতির কেবল অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যসাধনের বস্তু বর্তমান থাকিবে।

(২) বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের নিজ নিজ ধর্মসংক্রান্ত ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ইচ্ছানুরূপ সন্নিবিষ্ট করিয়া লইতে পারিবে এবং এই সন্নিবেশ যুক্তিসঙ্গত হইবে।

(৩) জ্যোতিষে বর্ণিত কোন নির্দিষ্ট সময় হইতে সার্বজনীন পঞ্জিকার অব্দ ধরিতে হইবে। যথা, জুলিয়স স্কেলিগার ধৃত সূচনা-কাল অথবা লাপলাস্ প্রস্তাবিত ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই পঞ্জিকায় খ্রীষ্টাব্দ, বৌদ্ধ নির্বাণাব্দ অথবা অপর কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামানুসরণে ধৃত অব্দ, অথবা কোন বিশিষ্ট জাতির জীবনে সংগঠিত স্মরণীয় ঘটনা হইতে প্রারব্ধ অব্দ, সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

(৪) সার্বজনীন পঞ্জিকায় থাকিবে মাস ও সপ্তাহ বিভাগ এবং বৎসরারম্ভ হইবে ম, ক্রা, দিনে। সুতরাং, 'বড়দিনের' পূর্ববর্তী দিনে বর্ষ-শেষ হইবে এবং 'বড়দিন' ও নববর্ষপ্রবেশ এক-দিনেই পড়িবে। এই দিনটিতেই যথাবর্ণিত পারসিক, ইহুদী, হিন্দু ও চৈনিক পর্বগুলি পড়িতেছে। মাসের যে রোমক নাম বর্তমান আছে তাহার উচ্ছেদ করিয়া মাসের পরিভাষা যুক্তিসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্থলে, বসন্ত ১, ২, ৩,; গ্রীষ্ম ১, ২, ৩,; শরৎ ১, ২, ৩; শীত ১, ২,৩। অথবা, খ্রীষ্টান দেশগুলিতে জানুয়ারী প্রভৃতি রোমক নামগুলি রাখা যাইতে পারে এই সর্তে যে, নববর্ষ (জানুয়ারী মাস) আরম্ভ হইবে ম, ক্রা, দিনটিতে। সেইরূপ অন্যান্য দেশে সেই দেশীয় নাম রাখা যাইতে পারে; 'জানুয়ারীর' পরিবর্তে হিন্দুরা 'মাঘ' ও ইহুদীরা 'ধবিতু' রাখিতে পারে।

(৫) অন্যান্য বিষয়ে পূর্বোক্ত 'দ্বাদশমাসী বর্ষ-পঞ্জীর' সপক্ষে প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপরিলিখিত অভিমতগুলি গৃহীত হইলে মকরক্রান্তিতে শীত ১ মাসে (জানু,—মাঘ) রবিবারে বর্ষপ্রবেশ হয়। মহাবিষুব পড়িবে শীত ৩ মাসের ২৮তারিখে (মার্চ—চৈত্র), মাসকাবারের দুইদিন পূর্বে কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে। ইহার কারণ এই যে, ম. ক্রা, ও ম, বি, এর অন্তর্বর্তী কালের পরিমাণ ৮৯দিন ৩০মিনিট। এইরূপে, ক, ক্রা, পড়িবে গ্রী ৩ মাসের (জুন-আষাঢ়) ৩০শে ও জ, বি, পড়িবে শ ৩ মাসের (অক্টো,—কার্তিক) ১লা তারিখে। ঐসমস্ত দিনে বিভিন্ন জাতির যে সব ধর্মকৃত্য নির্দিষ্ট ছিল সেগুলিকে পুনরায় ঐ ঐ তারিখে ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। অন্যান্য পর্বগুলি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অথবা প্রবৃত্তি অনুসারে চন্দ্রসূর্যের গতির অনুবর্তীই থাকিবে।

যে সব উৎসব বিশিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের অপরিবর্তনীয় রাখা যাইতে পারে! যথা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিবস (৪ঠা জুলাই), ফরাসীদেশে Bastille দুর্গ আক্রমণ দিবস (১৪ই জুলাই), রাশিয়ার জারের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পাদ্রী গেপন (Father Gapon) ও তাহার সঙ্গীর হত্যার দিবস (৫ই অক্টোবর)।

উল্লিখিত নববিধানে মাত্র একটি দিনের গোলযোগ হইবে সত্য, কিন্তু পঞ্জিকাটি সুবিধাজনক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় এতদ্বারা বিভিন্ন মানবজাতিকে সংহত করিয়া একতার বন্ধন সুগম করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এই অনুবাদের অনেকস্থলে বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে মূল ইংরাজী প্রবন্ধের অতিরিক্ত কয়েকটি শব্দ, বাক্য, ও অনুচ্ছেদের অংশ সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস, লেখকের বিষয়বস্তুর কোনওরূপ অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রবন্ধ রচনাকার্যে আলোচনা দ্বারা সহায়তার জন্য আমি অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী।—অনু

অধ্যাপক লরেন্স্ ও তাঁর গবেষণা

শ্রীবিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

আজ কারো কাছে অজ্ঞাত নেই যে অ্যামেরিকার বৈজ্ঞানিক ডাঃ লরেন্স্ তাঁ'র যুগান্তকারী আবিষ্কার সাইক্লোট্রনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। ১৯৪০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে সুইডেনের কন্‌শুল্ জেনরল্ Carl E. Waller stedt, সুইডেনের রয়েল একাডেমী অফ সায়েন্সের তরফ থেকে, লরেন্স্‌কে নোবেল্ পুরস্কার দিয়ে যথাযোগ্য সম্মানিত করেন।

অ্যার্নেস্ট্ লরেন্স্ জন্মান অ্যামেরিকার যুক্তপ্রদেশস্থিত দক্ষিণ ড্যাকোটার অন্তর্গত ক্যান্টন্ সহরে, ১৯০১ সালের ৮ই অগস্ট। তাঁ'র পিতামহ নরওয়ে থেকে এসে ১৮৪০ সালে উইস্কন্সিনের অন্তর্গত ম্যাডিসনে বসতি স্থাপন করেন।

লরেন্সের প্রাথমিক শিক্ষা হয় Canton ও Prirre-এর বিদ্যালয়ে এবং গ্রাজুয়েট্ হ'বার আগে তিনি সেণ্ট্ ওলাফ্ কলেজে ও তাঁ'র পরে দঃ ড্যাকোটার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে Dean Lewis Akeley তাঁ'কে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্য উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেন। লরেন্স্ তাঁ'র গ্রাজুয়েশনের জন্য মিনিসোটা, শিকাগো এবং শেষে য়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। ১৯২৫ সালে য়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি' পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন। এমন সময় ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লরেন্সের আহ্বান এল। সেই যে তিনি ক্যালিফর্ণিয়ায় গেলেন তারপর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু আহ্বানও তাঁ'কে টলাতে পারল না।

১৯২৪ সালে মে মাসে তাঁ'র প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হল। সেথেকে পর পর ষোল্‌ বছর ধরে ছাপ্পান্নটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁ'র প্রথম গবেষণা পত্রের নাম "The Charging Effect Produced by the Rotation of a Prolate Iron Spheroid in a uniform Magnetic Field"। এই গবেষণা পত্রের সঙ্গে তাঁ'র পরের গবেষণার কোনও যোগাযোগ নেই। তবে তাঁ'র ডক্টরেটের প্রবন্ধ ছিল আলোক-তড়িৎ বিষয়ে।

তিনি এই বিষয়ে য়েল্ ও ক্যালিফর্ণিয়াতে আরও গবেষণা করেন। য়েল্-এ যখন লরেন্স 'ন্যাশনল্ রিসর্চ ফেলো' ছিলেন তখনই তিনি পারার পরমাণুর 'আইয়নিজেশন্ পোটেন্‌শ্যল্' মেপেছিলেন। পারার উদাসীন বা নিউট্র্যাল পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রনকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলতে হ'লে একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তিটাকেই বলে পারার পরমাণুর 'আয়নাইজেশন্ পোটেন্‌শ্যল্'। লরেন্সের এই পরীক্ষার পরই পারার পরমাণুর প্রকৃতি প্রথম সঠিক ভাবে নির্ধারিত হ'ল। এই পরীক্ষার ফলে কোয়ান্টাম-থিওরী বা শক্তিকণাবাদের মূল ধ্রুব-সংখ্যা বা প্ল্যাংক্‌স্ কনষ্ট্যাণ্ট্ 'h'-এর মান হিসাব করার একটা দিক খুলে গেল। বোধহয় কারো কাছে অজানা নেই যে, 'অ্যাটম' মানে অবিভাজ্য (গ্রীক্-এ, 'আ', না-অর্থে উপসর্গ + 'তেম্‌নো', আমি কাটি); কিন্তু আজকাল পরমাণুকে ভাঙা পদার্থবিদ্‌দের একটা প্রায় খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লরেন্স্ যখন পারার পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রনকে ছিঁড়ে আল্‌গা ক'রে ফেল্‌লেন এবং তা' করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা' সঠিক ভাবে মাপলেন, তখন, এক কথায় তিনি' পারদ পরমাণুকে ভাঙলেন; কিন্তু কোনও পরমাণুর বাইরের দিকে

ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনকে সরাতে খুবই সামান্য শক্তি-লাগে—পারার ক্ষেত্রে মাত্র দশ ভোল্ট্ লাগে এবং পরমাণুর ভাঙন কথাটি বর্তমানে কেবল নিউক্লিয়াস বা পরমাণু কেন্দ্রে কোনও বদল ঘটানর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। পরমাণু কেন্দ্রে বদল ঘটান মাত্রেই, সেই পরমাণুর আগাগোড়া রাসায়নিক পরিবর্তন (এক ন্যুট্রন্ যোগ-বিয়োগ ছাড়া) অর্থাৎ, তা'কে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত করে' দেওয়া। সেই ভাঙন ঘটাবার জন্য দশ নয়, লক্ষ-লক্ষ ভোল্ট্ শক্তি দরকার এবং কৃত্রিম উপায়ে সেই ভীষণ শক্তি তৈরী করার একটা ব্যবহারিক আবিষ্কারই আজ লরেন্স্‌কে তাঁ'র খ্যাতি এনে দিয়েছে।

পরমাণু ভাঙার গবেষণায় গভীর ভাবে মনো নিবেশ করবার আগে লরেন্সের অন্যান্য নানা বিষয়ে কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক জীবনের আরম্ভ থেকেই লরেন্সের কৌতূহলের আশ্চর্য প্রশস্ততা দেখা গেছে। এই নানা রকম বৈজ্ঞানিক কাজের একটি হচ্ছে, J. W. Beams-এর সঙ্গে এক সেকেণ্ডের $১০^{১২}$ ভাগের তিনভাগ সময়ান্তরটুকু, ব্যবহারিক উপায়ে পাওয়ায় সাফল্য লাভ। তিনি ক্যালিফর্ণিয়ায় আসার পর তাঁ'র ছাত্রদের নিয়ে Kerr Cell-এর সাহায্যে এই ব্যবহারিক পদ্ধতি, বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থাগুলি পরীক্ষা করা বিষয়ে কাজে লাগালেন।

লরেন্সের আর একটি কাজের কথা উল্লেখ-যোগ্য—সেটি হচ্ছে e/m, অর্থাৎ একটি ইলেক্ট্রনের চার্জ বা আধানের সঙ্গে তা'র বস্তুমাত্রার অনুপাত বা'র করবার একটি নূতন এবং খুব সঠিক উপায় উদ্ভাবন। এই তো গেল পরমাণবিক ভাঙন বিষয়ক গবেষণাক্ষেত্রের বাইরে লরেন্সের বৈজ্ঞানিক কাজ।

এখন থেকে ১৭ বৎসর আগে ফেব্রুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যায়, জার্মান্ পদার্থবিদ্ R. Wideroe-র লেখা একটি প্রবন্ধে ডাঃ লরেন্সের চোখ পড়ল। তিনি প্রবন্ধটি পড়েন নি। কিন্তু Wideroe-র যন্ত্রটির দিকে তাঁ'র দৃষ্টি আকর্ষিত হ'ল। এই যন্ত্রের সাহায্যে Wideroe ২৫,০০০ ভোল্ট্ শক্তিতে পোটাসিয়ম্ পরমাণুকে যে শক্তি দিতে পেরেছিলেন, তা' ৫০,০০০ ভোল্ট্ তড়িৎ বিভব থেকে তৈরী হ'তে পারে। যে তত্ত্বটা Wideroe তাঁ'র যন্ত্রে খাটিয়েছিলেন সেটা নূতন ছিল না,—আরও দশ বছর আগে তা' পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু তিনিই সেটাকে প্রথম তাঁ'র যন্ত্রে প্রয়োগ করলেন। তাঁ'র এই প্রবন্ধটি লরেন্সের মনে পরমাণু কেন্দ্রের ভাঙন ঘটান বিষয়ে একটা নূতন চিন্তা এনে দিল। তিনি ভেবে দেখলেন যে, যদি কোনও কণাকে বিশেষ সময়ান্তরে ক্রমাগত আপেক্ষিক ভাবে কম জোরের ধাক্কা দেওয়া যায়, তা'হ'লে ধাপে ধাপে সেই কণার গতি এত দূর বাড়ানো যায় যে, তা'র সাহায্যে পরমাণবিক ভাঙন সম্ভব হয়। Wideroe তাঁ'র যন্ত্রে দু'টি ফাঁপা স্তম্ভক বা সিলিণ্ডার সোজাসুজি জুড়ে একটি লম্বা স্তম্ভক তৈরী করেছিলেন। লরেন্স্ সেই নক্সায় ঐ রকম স্তম্ভকের একটি সারি আঁকলেন, কিন্তু দেখলেন, যে-সব কম বস্তুমাত্রার পরমাণুর সাহায্যে কেন্দ্রিক ভাঙন ঘটানর সবচেয়ে সুবিধা, সেই সব কণা দিয়ে পরমাণু কেন্দ্র ভাঙতে হ'লে তাঁ'র যন্ত্রের দৈর্ঘ অনেক বেড়ে যায়। তারপরেই তিনি ভাবলেন এ'ক্ষেত্রে কোনও বৃত্তাকার পথ ব্যবহার করা যায় কিনা। একটা বৈদ্যুতিক কণা যদি এমন একটা চৌম্বক বলক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে যে, সেই বলক্ষেত্র কণাটির গতিপথের সঙ্গে সমকোণে আছে, তা'হ'লে সেই কণা একটি বিশেষ বৃত্তে একটা ধ্রুব গতিতে ঘুরবে। তা'ছাড়া, একটি অর্ধবৃত্ত ঘুরে আসতে একটি কণার যে সময় লাগে, তা' নির্ভর করে কণাটির আধান ও বস্তুমাত্রার ওপর এবং চৌম্বক বলক্ষেত্রের শক্তির ওপর। এই সময়টা কণার গতির ওপর নির্ভর করে না। কণার গতি যতই বাড়ে ততই তা'র বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ বেড়ে বেড়ে যায়। এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি লরেন্স্ তখনই একটি গাণিতিক

অনুপাতের আকারে লিখে ফেললেন, যা'তে করে Wideroe-র প্রবন্ধ দেখ্‌বার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি বর্তমান সাইক্লোট্রনের একেবারে প্রধান কাজের সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারলেন।

১৯১৯ সালে প্রথম লর্ড রুথারফোর্ড কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন্ পরমাণু ভেঙে একটি নতুন রকম অক্সিজেন্ পরমাণু তৈরী করেন। তারপর তিনি নাইট্রোজেন্-এর মতই কতকগুলি হাল্কা মৌলিক পদার্থের কৃত্রিম ভাঙন ঘটাতে সক্ষম হ'ন। কিন্তু আরও ভারী পরমাণু ভাঙতে হ'লে আরও বেশী শক্তিশালী কেন্দ্রবিধ্বংসী কণা দরকার। খুব বেশী বিভবান্তরের (Potential difference) মধ্যে সেই কণা ছেড়ে দিলে তবেই তা'র সাহায্যে ভারী ভারী পরমাণু ফাটানো সম্ভব হ'ত; কিন্তু অত বেশী ভোল্টেজ সহ্য করবার মত নল তৈরী করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সেপথে না গিয়ে লরেন্স্ যে পথ দেখালেন সেটা একেবারে একটা নূতন পথ। বেশী ভোল্টেজের সাহায্য না নিয়ে খুব শক্তিশালী কণা তৈরী করবার জন্য তিনি যে কেবল সাইক্লোট্রনই বানিয়েছেন তা' নয়, তিনি liuear resonance accelerator নামে আর একটি যন্ত্রও তৈরী করেন। এই যন্ত্র Wideroe-র যন্ত্রের মতই ভারী ভারী কণার গতিবৃদ্ধির জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু হাল্কা কণার পক্ষে এই যন্ত্র Wideroe-র যন্ত্রের মতই মোটেই সুবিধার নয়। তাই লরেন্স্ আবার 'ডব্‌ল্ লিনিয়র অ্যাক্সেল্যারেটর' নামে আরও লম্বা একটি যন্ত্র তৈরী করলেন। ১৯৩৪ সাল পর্যন্তও তিনি ভাবতেন যে, খুব শক্তিশালী ন্যুট্রন তৈরী করার পক্ষে তা'র এই শেষোক্ত যন্ত্র সাইক্লোট্রনের চেয়েও বেশী কাজের হ'বে। শেষ পর্যন্ত যদিও সাইক্লোট্রনই সব যন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী কাজের ব'লে প্রমাণিত হয়ে গেল এবং এ'র দিকেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ল।

১৯৩০ সালের জানুয়ারীতে লরেন্স্ এবং তাঁ'র ক্যালিফর্ণিয়ার প্রথম পি-এইচ্-ডি ছাত্র Edlefson চার ইঞ্চি ব্যাসের প্রথম সাইক্লোট্রন তৈরী করেন। সেটা তৈ'রী হয়েছিল কাঁচ ও লাল মোম দিয়ে। সেপ্টেম্বরে বার্কলির 'ন্যাশ্‌ন্যল্ অ্যাক্যাডেমি অব্ সায়েন্সেজ্'-এর সভায় লরেন্স্ ও এডলেফ্‌সন্ প্রথম তা'দের নূতন পদ্ধতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পত্র পড়েন। এরপর লরেন্স্ এবং M. S. Livingston একই মাপের একটি ধাতব সাইক্লোট্রন তৈরী করেন। এই ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে হাইড্রোজেন-এর একটি আণবিক আইয়ন্ রশ্মি তৈরী করা হয়। এই রশ্মির যে শক্তি, তা' ৮০,০০০ ভোল্ট শক্তিতে তৈরী হ'তে পারে। কিন্তু সেই যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিভবান্তর ছিল ২০০০ ভোল্ট।
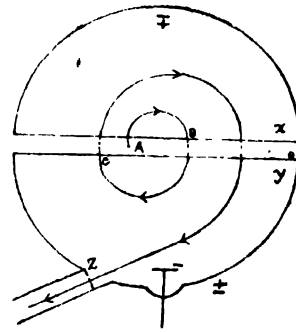
এই খানে সাইক্লোট্রনের একটা বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)। মূলতঃ সাইক্লোট্রনে একজোড়া ফাঁপা অর্দ্ধবৃত্তাকার ধাতব কক্ষ আছে (x ও y)। অনেকটা যেন একটা বড়ির বাক্সকে মাঝামাঝি দু'খণ্ড ক'রে আলাদা ক'রে ফেলা হয়েছে। একটি কক্ষ (D-র মত দে'খতে ব'লে 'dee') প্রথমে ধনাত্মকভাবে এবং আর একটি ঋণাত্মকভাবে আহিত থাকে; কিন্তু তারপর থেকে কক্ষদ্বয়ের আধানের পোল্যারিটি বার বার অত্যন্ত দ্রুত (উদাহরণস্বরূপ, সেকেণ্ডে ৩০ × ১০⁶ বার), পরি-

বর্তিত হ'তে থাকে। এই কক্ষদ্বয়কে একটি বায়ু নিষ্কাশিত স্থানে রাখা হয় এবং তা'দের সঙ্গে সমকোণ করে' অর্থাৎ ছবিটির উপর পাতার সঙ্গে সমকোণ করে', উপরে ও নীচে একটি চুম্বকের দু'টি মেরু লাগানো থাকে, যা'তে কক্ষদ্বয়ের সঙ্গে সমকোণে একটি চুম্বক-বলক্ষেত্র পাওয়া যায়। X-কক্ষ একেবারে প্রথমেই ধণাত্মকভাবে আহিত ধরে' নিয়ে যদি A-র কাছে একটি ধণাত্মক কণা (উদাহরণঃ অ্যাল্‌ফা কণা) ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সেই কণা x-কক্ষের দিকে আকৃষ্ট হ'বে। কিন্তু চুম্বকবলক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে' এই কণা ক্রমেই বেঁকতে বেঁকতে একটা বৃত্তাকার পথে x-কক্ষের B-স্থান দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঠিক বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে y-কক্ষের আধান হয়ে যায় ঋণাত্মক; তাই দুই কক্ষের মধ্যে বিভবান্তরের সাহায্যে বর্ধিত গতিতে কণাটি y-কক্ষে ঢোকে। আবার বৃত্তাকার পথে c-স্থান দিয়ে বেরোয়। এমনি করে' অনবরত ক্রমবর্ধমান ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে z স্থানটি দিয়ে কণাটি বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে' তা'র পরমাণুর ভাঙন ঘটায়। একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষক। ঘূর্ণায়মান কণাগুলি যখন তা'দের ঘোরার পথে এক ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তাকার পথ থেকে আর এক ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তাকার পথ নেয় তখন বৃহত্তর অর্ধবৃত্তাকার পথ ঘুরে আসতে কোনও সময়ের পরিবর্তন হয় না।

এখন, অমুক 'ব্যাসের' সাইক্লোট্রনের অর্থ খুবই স্পষ্ট—অর্থাৎ, চার ইঞ্চি ব্যাস বলতে একটি 'ডী'-র ব্যাসের দৈর্ঘ বোঝায়।

যা'-হ'ক, নূতন উৎসাহে লরেন্স্ এরপর এগার ইঞ্চি ব্যাসের একটি সাইক্লোট্রন বানালেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ১½ মিলিয়ন্ ভোল্ট শক্তির হাইড্রোজেন্ আইয়ন্ তৈরী করা হ'ল। এত শক্তিশালী কণা-রশ্মি এর আগে আর কখনও কোনও বিজ্ঞানাগারে তৈরী হয়নি। ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মে এই কণা-রশ্মি লিথিয়ম্ পরমাণুর ভাঙন ঘটাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই বছরেই কেম্‌ব্রিজের রদারফোর্ড এর বিজ্ঞানাগারে Cockroft ও Walton ১০০,০০০ ভোল্ট শক্তির প্রোটনের সাহায্যে ৭ পরমাণবিক ওজনের লিথিয়ম্ পরমাণু ভেঙে দু'টি আলফা কণা পান। কিন্তু এই পরীক্ষাই যখন বার্কলির রেডিয়েশ্‌ন্ ল্যাবরেটরীতে লরেন্স্ আবার করেন তখন তা'র অদ্ভুত শক্তিশালী যন্ত্র দিয়ে ঐ ভাঙ্গন সহজেই ঘটাতে পারেন। অ্যামেরিকায় সেই প্রথম মৌলিক পদার্থের ভাঙ্গন। কিন্তু তা'র পর থেকে এখন পর্যন্ত এই সাইক্লোট্রনই বৈজ্ঞানিকদের কাছে ভাঙ্গন ঘটাবার সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র বলে গণ্য হয়েছে। হাল্কা লিথিয়ম্ পরমাণু ভাঙবার জন্য যদিও দশ লক্ষ ভোল্টের প্রোটন্‌ই যথেষ্ট ছিল, তবুও ভারী ভারী মৌলিক পরমাণু ভাঙবার জন্য যে আরও বেশী শক্তিশালী কণা প্রয়োজন তা' লরেন্সের ভাল করেই জানা ছিল এবং খুব শক্তিশালী কণা তৈরী করতে হ'লে যে ১১ ইঞ্চি ব্যাসের যন্ত্রের চেয়ে ঢের বড় যন্ত্র দরকার তা'ও তিনি জানতেন। সাইক্লোট্রনে কেন্দ্র-বিধ্বংসী আইয়নের চলার পথকে বৃত্তাকার করবার জন্য যে চুম্বক দরকার তা'র মেরুগুলির ব্যাস অন্ততঃ 'ডী'-র ব্যাসের সমান হওয়া দরকার। লরেন্স্ ফেডারেল টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ভাইস্-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক L. F. Fullerকে অনুরোধ করলেন একটি বড় চুম্বক তৈরী করবার জন্য। ঠিক সেই সময় Fuller-এর কাছে একটি বিরাট চুম্বক পড়ে ছিল। চীন গবর্ণমেণ্ট বেতারপ্রেরকের জন্য একটি চুম্বক তৈরী করতে দেন; কিন্তু সেটিকে পাঠাবার আগেই তাঁ'রা জানান যে, ঐ ধরণের চুম্বকে আর কোন দরকার নেই। ১৯৩২ সালে এই চুম্বক দিয়েই প্রথম ঠিক বড় সাইক্লোট্রন্ তৈরী হ'ল। এই যন্ত্রটির ব্যাস ৩৭ ইঞ্চি। ওজন ৭৫ টন।

এখনকার যে সবচেয়ে বড় সাইক্লোট্রন, সে'টা

William H. Crocker Radiation Laboratoryতে আছে। এর ওজন ২২০ টন। এই যন্ত্র থেকে যে কণা-রশ্মি বেরিয়ে আসে তা'র ব্যাস কয়েক ইঞ্চি এবং সেই রশ্মি প্রায় ৫ ফিট বাতাসকে ভেদ করতে পারে। বহু 'ডয়টেরিয়ম' বা ভারী হাইড্রোজেন্-এর পরমাণু-কেন্দ্র মিলে এই রশ্মি তৈরী। এই রশ্মি সাইক্লোট্রন্ যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে সেকেণ্ডে ২৫,০০০ মাইল বেগে, অর্থাৎ আলোর যা' বেগ, তা'র প্রায় ১/৭·৫ ভাগ বেগ। সেকেণ্ডে সাইক্লোট্রন থেকে ৬×১০^{১৪} এ' রকম কণা বেরিয়ে আসছে। বেরিলিয়মের উপর সাইক্লোট্রন রশ্মি ফেলে এই মৌলিক পদার্থের ভাঙন ঘটান সম্ভব হয়েছে এবং এই ভাঙনের ফলে প্রচুর ন্যূট্রন্ কণা বেরিয়ে এসেছে। রেডিয়ম্ থেকে ঠিক সমান শক্তি ও ঘনত্বের ন্যূট্রন্-রশ্মি পেতে হ'লে ২০০ পাউণ্ড রেডিয়ম্ লাগবে, অথচ এক আউন্স রেডিয়মের দাম প্রায় ১,০০০,০০০ ডলার। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে যে সংখ্যার অত্যন্ত শক্তিশালী কণা তৈরী হ'তে পারে, আর কোন উপায়ে এখনও পর্যন্ত তত সংখ্যার ও তত শক্তিশালী কণা তৈরী করা যায়নি। এই ক্ষেত্রেই এই যুগান্তকারী যন্ত্রের এত ব্যবহারিক মূল্য।

বর্তমানে প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্র ভাঙা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রায় এক একটি নূতন পদার্থ তৈরী হয়েছে। সাইক্লোট্রনের একটা বড় বিশেষত্ব, পরমাণু-কেন্দ্রিক শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে স্ফুরিত করা। বোধ হয় কারো কাছে অজানা নেই যে, জগতের প্রায় সমস্ত শক্তির আধার পরমাণু-কেন্দ্র এবং বর্তমানে জানা গেছে যে, এমন কি কম গতিশীল ন্যূট্রন্ কণা য়ুরেনিয়ম্ পরমাণু-কেন্দ্রের দ্বিধা-বিভাজন ঘটাতে সক্ষম। এই বিভাজনে ২×১০^{৮} ইলেক্ট্রন্ ভোল্ট শক্তি স্ফুরিত হয়। এক ভোল্ট্ বিভবান্তরের মধ্য দিয়ে একটি ক্রমবর্ধমান গতিশীল ইলেক্ট্রন্ যে শক্তি লাভ করে সেই শক্তিকে বলে ১ ইলেক্ট্রন্-ভোল্ট্। এক ইলেক্ট্রন্‌ভোল্ট্ $১·৬০ \times ১০^{-১২}$ আর্গএর সমান।

সাইক্লোট্রনের সাহায্যে যে প্রত্যেক সুস্থিত মৌলিক পদার্থকে অন্য রকম মৌলিক পদার্থে বদলানো হয়েছে তা' আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই তেজস্ক্রিয়। বর্তমানে সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাণবিক বন্ধন-বিশিষ্ট অবস্থাগুলির বা আইসোটোপের মোট সংখ্যা প্রায় ৩৮৬। তা'র ওপর আবার কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংখ্যা প্রায় ৩৩৫; এর মধ্যে ২২৩-টি অর্থাৎ প্রায় ২/৩ অংশই সাই-ক্লোট্রনে তৈরী।

কৃত্রিম উপায়ে আবিষ্কৃত বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থ আজ প্রাণতত্ত্ব এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। আরও কতকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ কেবল পদার্থবিদ্ ও রসায়নবিদের কৌতূহল আকর্ষণ করে। যেমন, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল যে, ৮৫ ও ৮৭ পরমাণবিক সংখ্যা'বিশিষ্ট eka-iodine ও eka Caesium এই দু'টি মৌলিক পদার্থ ছাড়া পর্যায়-সারনীর অর্থাৎ পিরিয়ডিক টেব্‌লের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থই বুঝি পাওয়া গেছে। তারপর ধারণা হয় যে, ৪৩ ও ৬১ পরমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট masurium ও illinium-এর অস্তিত্বের পক্ষে কোনও জোরালো যুক্তি ও প্রমাণ নেই। কিন্তু 'রেডিয়েশন্ বিজ্ঞানাগারের' একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক Emilio Segré সাইক্লোট্রনের সাহায্যে ৪৩ সংখ্যক পদার্থের একটী তেজস্ক্রিয় আকার পেয়েছেন। এই বিজ্ঞানাগারেরই Dale Corson, J.G. Hamilton, E. Segré ও K. R. Mackenzie-র মিলিত চেষ্টায় সাইক্লোট্রনেরই সাহায্যে ৮৫ সংখ্যক eka-iodine এর একটি তেজস্ক্রিয় আকার পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে পারির Irene Curie-Joliot বিজ্ঞানাগারে eka-Caesium আবিষ্কৃত হয়েছে।

"Tracer atoms" হিসাবে ব্যবহার করার

জন্যই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের, প্রাণতত্ত্বে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এত বড় স্থান। তেজস্ক্রিয় সোডিয়ম্ যদি সাধারণ নুনের মত খাওয়া যায়, তবে তা'র পরমাণুগুলি আশ্চর্য দ্রুতগতিতে দেহের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তেজস্ক্রিয় সোডিয়মের টিকে থাকার গড় সময় ২১ ঘণ্টা। যখন এই সোডিয়ম্ তা'র তেজস্ক্রিয়ার ফলে বদলে সম্পূর্ণ অন্য একটি মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত হয় তখন গাইগের্-ম্যুলের্ কাউণ্টারের সাহায্যে দেহের ভেতরে তা'র প্রত্যেক পরমাণুর অবস্থিতি নির্দেশ করা যায়, কারণ তা'থেকে দ্রুত গতির কণিকা বেরিয়ে আসে। এই তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি দেহের বিভিন্ন অংশে ঘোরার ফলে শরীরের মধ্যে রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা যায়। অধ্যাপক **A. V. Hill**-এর মতে এই 'নির্দেশক পরমাণুর' (**tracer atom**) ব্যবহার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই প্রাধান্য পাবে।

নূতন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি যে কেবল 'নির্দেশক মৌলিক পদার্থ' হিসাবেই ব্যবহৃত হয় তা'ই নয়; এমন কি, ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ করেছে। ক্রনিক্ লিউকেমিয়া রোগে এর প্রয়োগের দরুণ খুবই আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। সাইক্লোট্রন্ থেকে তৈরী ন্যুট্রন্-রশ্মির সাহায্যে ক্যানসারের মত রোগেরও চিকিৎসার আশাপ্রদ সম্ভাবনা আগেই দেখা গেছে।

রেডিয়েশন্-বিজ্ঞানাগারে লরেন্সের ভাই চিকিৎসাবিদ্ জন্ লরেন্স থাকায়, আর্নেস্ট্ তাঁ'র সহযোগীতা সম্পূর্ণভাবে পেয়েছেন।

আজ দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যাই বা কোথায় যায়, আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে বাদ দিয়ে প্রাণতত্ত্বই বা কোথায় যায়! পরমাণবিক পদার্থ-বিদ্যার অঙ্কুর অবস্থায় সাইক্লোট্রনের স্থানও সেই রকম। তবে বিজ্ঞান-জগতে এর স্থান আরও একটু বিশেষ ধরণের, কারণ এর সাহায্যে এমন কতকগুলি পদার্থ তৈরী হয়েছে যে, সেগুলির প্রত্যেকটিরই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনুভূত হয়ে আসছিল। সেইজন্য আর্নেস্ট্ লরেন্স্‌কে একজন বিখ্যাত ও যথার্থ আবিষ্কারক বলা যায়।

সাইক্লোট্রনের উৎকর্ষসাধন, বহু কার্যক্ষম ও উৎসাহী কর্মীর মিলিত চেষ্টার ফল; কিন্তু লরেন্সেরই প্রতিভা ও অনুপ্রেরণা এই সকল কর্মীদের চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সমবায় চেষ্টার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই রেডিয়েশন্-বিজ্ঞানাগারে দেখা গেছে।

"* * * দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।" বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন; কার্ত্তিক ১২৮৯)

হাস, মুরগীর খাদ্য-নির্বাচন

শ্রীভবানীচরণ রায়

আমাদের দেশে হাঁস ও মুরগীর চাহিদা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সেরূপ প্রসার আজও হয় নাই। বিজ্ঞানের আলোচনা এখনও কেবল পাঠ্য পুস্তকে, দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয় স্তম্ভে, তাও ½ কিম্বা ¼ 'কলমে' আর "ড্রইং রুমের" স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই সুদূর পল্লী-গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পালিত হাঁস ও মুরগীর পাল প্রত্যহ যখন সহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা হয় ক্রেতারা তখন কেবল পালকের বাহার দেখিয়াই সেইগুলি ক্রয় করেন। পালকের নীচে সযত্নে আচ্ছাদিত অস্থিচর্মসার পাখীর দেহে কোন রোগ আছে কিনা, খাদ্য হিসাবে উহার মূল্য কতখানি এসব বিষয় একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না, অথচ এই সব রোগজীর্ণ পাখীর মধ্য দিয়া যে নানা প্রকারের পীড়া প্রত্যহ সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে সে কথা কাহারো অজ্ঞাত নয়। এই কথাও সকলে জানেন যে, কেবল সিদ্ধ করিলেই সকল রকমের বীজাণু ও বিষের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। তাহা হইলে যক্ষ্মারোগের বীজাণু ও সাপের বিষ মানুষের পক্ষে এমন মারাত্মক হইয়া থাকিত না।

ব্যাপক দৃষ্টিতে কৃষি পরিকল্পনায় হাঁস, মুরগীর স্থান অকিঞ্চিৎকর নয়। আমরা যে এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত নহি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত কয়েক মাসে আমি কয়েকটি প্রবন্ধে এই সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং হাঁস, মুরগীর প্রসারহেতু যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়া-ছিলাম তাহা প্রণিধানযোগ্য হইলেও দেশ ও দশের কাজে লাগে নাই। আশা করি দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পথে বাধা সৃষ্টি হইবে না। আমার এই পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃত সুতরাং তাহাতে কোন বিশেষ একটি সমস্যা লইয়া আলোচিত হয় নাই। কেহ কেহ হয়ত গুটিকয়েক হাঁস, মুরগী লইয়া কাজ করিতেছেন অথবা করিতে চান, তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে হাঁস, মুরগী পালনের জন্য কিরূপ খাদ্য নির্বা-চন করা যায় সেইটুকুই আলোচনা করিব। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেখানে মানুষের খাদ্যাখাদ্য নির্বা-চনের অবসর বিরল সেখানে হাঁস, মুরগীর খাদ্য বিচার অবান্তর কিনা। সুতরাং প্রারম্ভেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের খাদ্যে প্রোটিন বস্তুর অভাবে যে কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ডিম বা মাংসই সেই অভাব কিয়দংশ পূরণ করিতে পারে। হাঁস, মুরগীর খাদ্য নির্বাচনে মানুষের সঙ্গে কোন বিরোধ আশঙ্কা করা ব্যস্তবাগীশের লক্ষণ বলিয়াই মনে হয়।

হাঁস ও মুরগীকে আমরা সাধারণতঃ ডিম অথবা মাংসের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। নিয়মিত ভালো ডিম পাইতে হইলে যেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন মাংসের জন্য পালিত হাঁস ও মুরগীর খাদ্য তাহা হইতে বিভিন্ন। খাদ্যের সমপরিমাণ ডিম অথবা মাংস পাইতে হইলে তাহা খাদ্যের গুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। অন্যান্য প্রাণীদের মত জল, স্নেহপদার্থ প্রোটিন, ও লবণজাতীয় দ্রব্যের সমাবেশে হাঁস-মুরগীর দেহ ও ডিম উভয়ই পরিপুষ্ট হয়। চিত্রে ডিম ও দেহে উক্ত পদার্থগুলির আনুপাতিক সম্পর্ক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে পরিপুষ্ট ডিম পাইতে,

হইলে দেহের পুষ্টিও সমভাবে প্রয়োজন। এইজন্য জল, স্নেহ, শ্বেতসার, প্রোটিন, লবণজাতীয় দ্রব্য ও ভিটামিন্ এই কয়েকটি উপাদানের অবস্থিতি খাদ্যে একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেহরক্ষণ ও পোষণ কার্যে ইহাদের ক্রিয়া সকল প্রাণীমাত্রেই একই প্রণালীতে সাধিত হয়। খাদ্য-বস্তু নরম করিতে এবং পরিপাক কার্যে সহায়তা করিতে যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করান প্রয়োজন। অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ধান্যবর্গীয় শস্যে অবস্থিত শ্বেতসারই প্রধান। ইহাতে চর্বি বৃদ্ধি করে এবং দেহগঠনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদন করে। প্রোটিন ক্ষীয়মান দেহতন্তুর সংরক্ষণ করে এবং মাংস, পালক এবং ডিম প্রস্তুতি

প্রায় ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রোটিনের এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খাদ্যে প্রোটিন যত বেশী থাকিবে খাদ্যের পরিমাণ সেই অনুপাতে কমানো যায়। অর্থাৎ ১৩% প্রোটিন খাদ্যের ৪ সের এবং ১৭% প্রোটিন খাদ্যের ৩ সের সমান কার্যকরী। বিশেষ-ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন অধিক সংখ্যক ডিম দরকার হাঁস-মুরগীকে রীতিমত যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন খাওয়ান একান্ত প্রয়োজন। প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইলে ডিমের সংখ্যাও বাড়ে বটে, কিন্তু ১৬%এর বেশী প্রোটিন যুক্ত খাদ্য দিতে গেলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ধান্যবর্গীয় খাদ্যের সঙ্গে মাখন তোলা দুধ, ঘোল ইত্যাদি জান্তব প্রোটিন মিশ্রিত
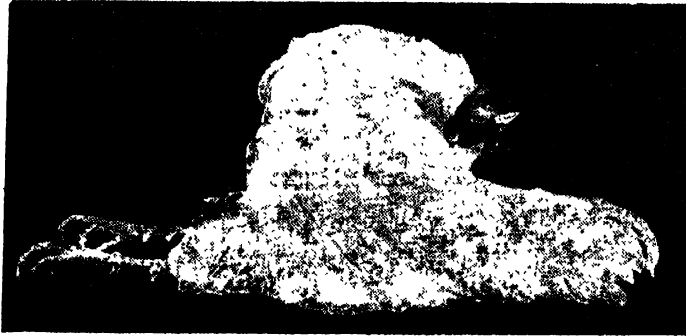
ভিটামিন-বি'র অভাবে মুরগীটার এই অবস্থা

কার্যে সহায়তা করে। ধান্যবর্গীয় শস্যে যেসব প্রোটিন থাকে তাহাতে উপরোক্ত কার্য সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য প্রয়োজনীয় জান্তব প্রোটিন হাঁস, মুরগীর খাদ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রোটিন খাদ্যের গুণাগুণের উপর যেমন মাংস ও ডিম প্রস্তুতি বহুলাংশে নির্ভর করে, তেমন এই সব খাদ্য ব্যয়বহুলও। এই জন্যই আর্থিক সঙ্গতি বজায় রাখিয়া খাদ্য নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

দেহের আয়তন বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার মূলতঃ প্রোটিণের গুণ ও পরিমাণের উপরই নির্ভর করে।

করিয়া দেওয়া উচিত, তরল অবস্থায় মাছি ইত্যাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করা উচিত। নয়তো রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এ ছাড়া মানুষের খাদ্য হিসাবে পরিত্যক্ত মাংসের কিমা এবং শুক্‌না মাছের গুঁড়া দ্বারা জান্তব প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের জন্য সয়াবিন, তুলা, তিসি, নারিকেল চীনবাদাম ইত্যাদির "ছিবড়া" ব্যবহার করা যাইতে পারে। উল্লিখিত জিনিষ-গুলির মধ্যে সয়াবিন ব্যতীত কোনটিই অধিক পরি-মাণে খাদ্যে মিশ্রিত করা সমীচীন নহে।

স্নেহজাতীয় পদার্থ দেহপুষ্টির কাজে খুব কমই

ব্যবহৃত হয়। উপযুক্ত পরিমাণ শ্বেতসার হইতেই দেহাভ্যন্তরে চর্বি সংশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং পৃথক্ চর্বি খাদ্যে মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হয় না।

প্রয়োজনীয় লবণের মধ্যে ক্যালসিয়ম্, সোডিয়ম্, ক্লোরিণ্ ও ফসফরাস্ ইত্যাদিই প্রধান। মার্বেল, ঝিনুকের খোসা ইত্যাদি ক্যালসিয়ম্ সরবরাহ করিতে পারে। দেখিতে হইবে যে, ক্যালসিয়মের সঙ্গে যেন বেশী ম্যাগনেসিয়ম্ না থাকে। সোডিয়ম ও ক্লোরিণ সাধারণ লবণেই পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া দুধ বা ঘোলের মধ্যেও পরিমিত লবণ থাকে। হাঁড়ের গুঁড়া বা মাছের কাঁটা ইত্যাদির গুঁড়া প্রয়োজনীয় ফসফরাসের চাহিদা মিটাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সামান্য উত্তাপে (৪৫° সেন্টিগ্রেড্) শুকানো গোবর হাঁস, মুরগীর খাদ্য হিসাবে চমৎকার কার্য করে। ইহা মাত্র অল্প পরিমাণে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়।

ভিটামিনের প্রয়োজন প্রাণীজগতের সর্বত্র। সতর্কতা অবলম্বন করিলে সাধারণ খাদ্যে ভিটামিন্ সংরক্ষণ অসম্ভব নয়; কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথক্‌ভাবে ভিটামিন্ দেওয়া দরকার হইয়া পড়ে। অধিক সংখ্যক ফোটনযোগ্য ডিম পাইতে হইলে হাঁস-মুরগীকে ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাদ্য পরিমিত ভাবে দেওয়া দরকার। ডিমের কঠিন আবরণ প্রস্তুতিকার্যে ক্যালসিয়ম্ ও ফসফরাস যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তপ্রবাহে চালিত হয় তজ্জন্য ভিটামিন 'ডি' অত্যন্ত প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন যে সব ক্ষেত্রে হাঁস বা মুরগী বাহির হইতে পারে না অর্থাৎ যখন আবদ্ধ অবস্থায় পালিত হয় সেখানে সূর্য্যালোক হইতে ভিটামিন "ডি" আহরণ সম্ভব নয় এবং অভাব পূরণের জন্য ঐ ভিটামিন্ খাদ্যে থাকা উচিত। ভিটামিন "জি" বা রিবোফ্ল্যাবিন ডিমের ফোটন-যোগ্যতা নির্ধারণ করে। উপরোক্ত তিনটি ভিটামিন বাদে অন্যান্য-গুলি সাধারণ খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণেই থাকে। ভিটামিনের জন্য পালং, কপিপাতা ইত্যাদি সবুজ শাকসব্জী যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো দরকার। মাখনতোলা দুধ, ঘোল, পরিত্যক্ত মাংসের কিমা অথবা মাছের গুঁড়া ইত্যাদি "রিবোফ্ল্যাবিনের" চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে

এক সপ্তাহ উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের পর আগের মুরগীটাই এই অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়াছে।

একশত সাধারণ মুরগী-শাবককে সুস্থ ও সবল দেহে পালন করিবার জন্য যে পরিমাণ আহার্য প্রয়োজন হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

বয়স (সপ্তাহ)	মাসিক আহার্য (সের)
৪	৫৮-৯৫
৮	২২৫-২৫৫
১২	৪১৫-৪৮৫
১৬	৬৪৫-৭১৫
২০	৮৫০-১০৭৫
২৪	১৩৫০-১৫০০

উল্লিখিত খাদ্যব্যবস্থা সাধারণ দেহগঠন ও ডিম প্রস্তুতির জন্যই প্রয়োজন। যে সকল হাঁস, মুরগীর দেহে পরিমিত মেদবৃদ্ধি করিয়া তাহাদের মাংস

ভোজ্য হিসাবে ব্যবহৃত করা হয় তাহাদের খাদ্য-ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। মেদবৃদ্ধি করিবার যে প্রক্রিয়া আছে তাহাতে মাংস নরম ও সুপাচ্য হয়। সাধারণ গৃহস্থও এই প্রক্রিয়া সাহায্যে সহজেই মেদবৃদ্ধি করিতে পারেন। তজ্জন্য প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত বর্ণিত হইল।

বাজার, এমনকি কৃষিফার্ম হইতে হাঁস বা চলিবে। এই সময় হাঁস বা মুরগীকে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ রাখা দরকার সুতরাং বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্ধকারে থাকার দরুণ ভিটামিন "ডি" আহার্যে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৫ হইতে ২১ দিনের মধ্যেই মেদবৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর অতি সরল প্রক্রিয়ায় মাংস সুপাচ্য ও নরম করা হয়। হাঁস বা
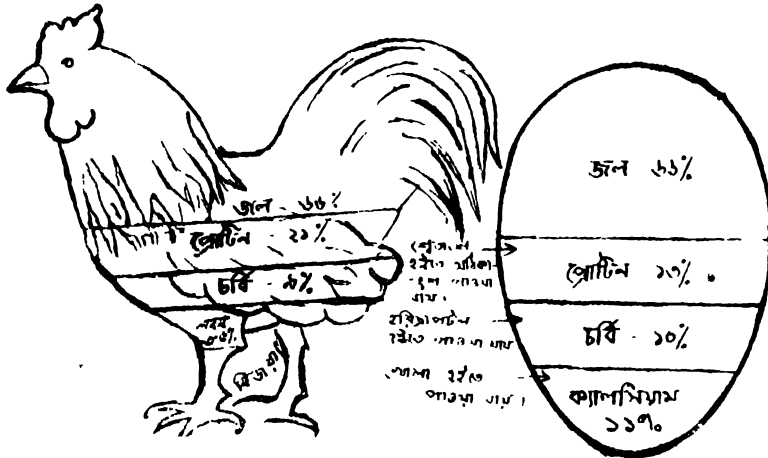
মুরগীর শরীর ও ডিমের মধ্যে কোন কোন পদার্থ কি পরিমাণে আছে তাহা দেখান হইয়াছে।

মুরগীকে প্রথমেই ডি, ডি, টি দ্বারা বীজাণু-মুক্ত করিতে হইবে। অতঃপর ম্যাগ সাল্‌ফ্‌ খাওয়াইয়া অন্ত্রস্থ যাবতীয় ময়লা বাহির করিয়া দিতে হইবে। পরিশেষে লাল আলু, ঘোল, ভুট্টাচূর্ণ এবং সামান্য শুক্‌না গোবর গুঁড়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কাদা-কাদা অবস্থায় খাইতে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জল না দিয়া ১৫ হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত এই আহার্য-ব্যবস্থা

মুরগীকে এমনভাবে হত্যা করা হয় যাহাতে মুক্ত রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণভাবে নির্গত হইয়া যায়। হত্যা করিবার অর্ধঘণ্টা পূর্বে এক চামচ শির্কা (ভিনিগার) মুখে ঢালিয়া দিয়া হাঁস বা মুরগীকে নিম্নাভিমুখী করিয়া অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় মাংস অন্তঃপরিশোধিত হইয়া নরম ও সুপাচ্য হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পাখীরও কৌতূহল !

জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর জানবার জন্যে
তোমাদের কৌতূহল জাগ্রত হোক।

বিকিনিতে পরীক্ষামূলক অ্যাটমবোমা-বিস্ফোরণের দৃশ্য
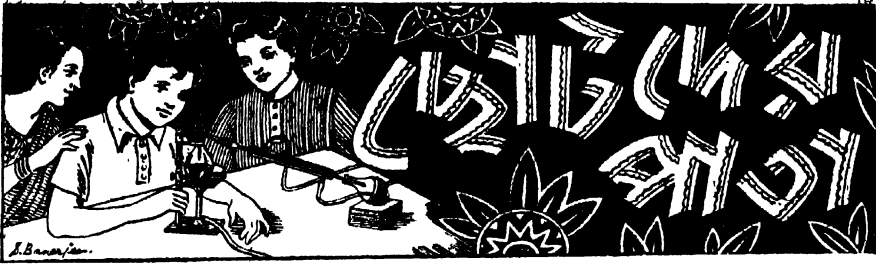
জেনে রাখ

পরমাণুর শক্তি

অ্যাটম-বোমার খবর তোমাদের অজানা নেই। গত মহাযুদ্ধের সময় অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের ফলে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি সহর দুটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলাফল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পরে আমেরিকান গভর্ণমেন্ট বিকিনিতে অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, একথাও তোমরা জান। যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ বোমা, রকেট, টর্পেডো, মাইন প্রভৃতি
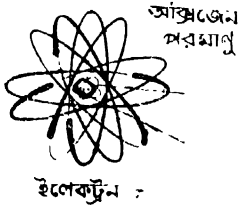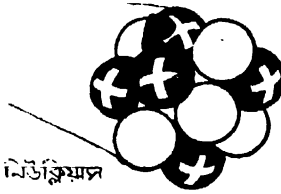
১নং চিত্র। বাঁয়ে—অক্সিজেন পরমাণুর ভিতরের দৃশ্য। ডানে—নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তুটাকে বড় করে দেখান হয়েছে। যোগ চিহ্নিত কালো গোলকগুলো ধনতড়িতাবিষ্ট প্রোটন কণিকা। বাকীগুলো নিউট্রন।

অনেক রকম মারণাস্ত্রের কথা তোমরা শুনেছ। কিন্তু অ্যাটম-বোমার শক্তি ওগুলোর চেয়ে ঢের বেশী। অ্যাটম-বোমার এই প্রচণ্ড শক্তি কেমন করে' পাওয়া যায়? পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বিবিধ পরীক্ষার ফলে অ্যাটম বা পরমাণু থেকে যে উপায়ে শক্তি বে'র করবার চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছেন সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু'একটি কথা বলছি।

'অ্যাটম' কথাটাকেই বাংলায় আমরা বলি 'পরমাণু'। পরমাণুর ভিতরকার শক্তি বা'র করেই অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কিন্তু অ্যাটম বা পরমাণু হলো পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ। ঐরূপ সূক্ষ্মতম অংশ থেকে এমন প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব ঘটে

কেমন করে? কথাটা বুঝতে হলে পরমাণুর ভিতরে কি আছে সে খবর জানা দরকার। এক সময়ে ধারণা ছিল, পরমাণু পদার্থের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ তাকে আর ভাঙা যায় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত রকমের বহুবিধ পরীক্ষার ফলে পরমাণুর ভিতরকার অনেক রহস্য জানতে পেরেছেন। একাধিক ক্ষুদ্রতর কণিকার সমবায়ে পরমাণু গঠিত হয়ে থাকে। পরমাণুর বাইরের দিকে থাকে ইলেকট্রন নামে এক বা একাধিক ঋণ-তড়িৎ কণিকা। ইহাদের ভর বা বস্তুপরিমাণ অতি নগণ্য। পরমাণুর
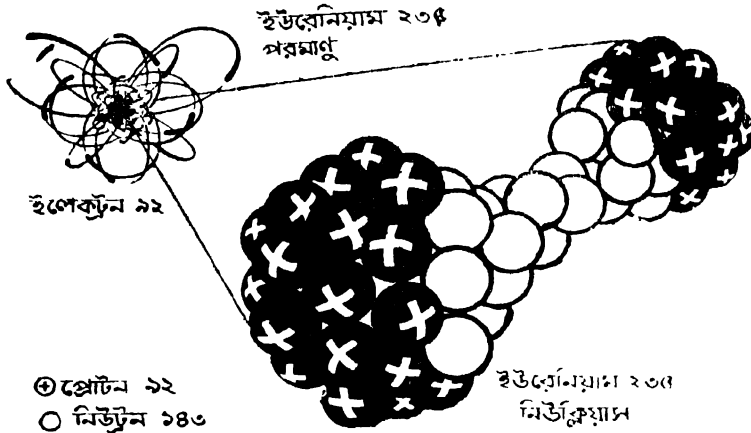
২নং চিত্র। বাঁয়ে—ইউরেনিয়াম২৩৫এর পরমাণুর ভিতরকার দৃশ্য। ডানে—কেন্দ্রীয়বস্তুটাকে বড় করে দেখান হয়েছে। যোগ চিহ্নিত কালো গোলকগুলো ধন-তড়িতাবিষ্ট প্রোটন কণিকা। নিউট্রনগুলো সাদা। সেগুলো মধ্যস্থলে অবস্থান করে নিউক্লিয়াসটাকে একটা অসমান ডাম্বেলের মত আকৃতি দিয়েছে।

ভিতরের অংশটাকে বলা হয়—নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তু। সৌরজগতে গ্রহগুলো যেমন বিভিন্ন কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, ইলেকট্রনগুলোও তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুর চারদিকে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে। পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুর মধ্যে আছে প্রোটন নামে এক বা একাধিক ধনতাড়িতাবিষ্ট কণিকা আর নিউট্রন নামে তড়িতাবেশশূন্য কণিকা। পূর্বেই বলেছি ইলেকট্রন কণিকার ভর নগণ্য। কাজেই পরমাণুর ভর তার নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় পদার্থের উপর নির্ভর করে। কোন একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলো প্রোটন থাকবে, তাড়িতিক সাম্যাবস্থা ঠিক রাখবার জন্যে তাদের চারদিকে ততগুলো ইলেকট্রন সংগ্রহ করে নিতে হবে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় এই ইলেকট্রনগুলোর কক্ষ পরিবর্তনের ফলেই শক্তির আবির্ভাব ঘটে। কয়লা বা গ্যাসোলিন পোড়ালে যে শক্তি পাওয়া যায় তা' হলো রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার যতটা শক্তি পাওয়া যায়, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া, পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু সম্বন্ধে আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার। কোন পদার্থের পরমাণুর বস্তু-পরিমাণ বা গুরুত্ব যে একই রকমের হবে এমন কোন কথা

নেই। কারো গুরুত্ব কম, কারো বা একটু বেশী হতে পারে। কারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তুতে যে নিউট্রন থাকে, একই পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুতে তাদের সংখ্যা সমান নয়। অ্যাটম-বোমার প্রধান উপাদান ইউরেনিয়াম ঠিক এই রকমেরই একটা মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম পরমাণুর প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসে ৯২টা প্রোটন থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। কাজেই গুরুত্বেরও পার্থক্য হতে বাধ্য। ইউরেনিয়ামের কতকগুলো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ১৪২টা নিউট্রন থাকে। এগুলোকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম ২৩৪, অর্থাৎ ৯২টা প্রোটন + ১৪২টা নিউট্রন = ২৩৪। কতকগুলো ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১৪৩টা করে' নিউট্রন পাওয়া যায়। এগুলোকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম ২৩৫, অর্থাৎ ৯২টা প্রোটন + ১৪৩টা নিউট্রন = ২৩৫। আবার কতকগুলো ইউরেনিয়াম পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬ হতে দেখা যায়। এগুলোকে বলে, ইউরেনিয়াম ২৩৮, অর্থাৎ ৯২ + ১৪৬ = ২৩৮। সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর মধ্যে ২৩৮ পরমাণুর সংখ্যাই বেশী। ইউরেনিয়াম ২৩৪ সামান্য দু'চা'রটা পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৫-ই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। ইউরেনিয়াম ২৩৫কে পৃথক করার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, যেকোন পদার্থের পরমাণু না নিয়ে অ্যাটম-বোমায় কেবল ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার করা হয় কেন? পরমাণু সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে দেখা গেছে—অনেক উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে। তারমধ্যে অন্ততঃ কয়েকটা উপায়ে পরমাণু থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়ে থাকে। পরমাণুর চেয়ে ছোট অথচ দ্রুতগামী ঢিল ছুঁড়ে পরমাণুকে ভাঙতে পারলে তা' থেকে শক্তি বেরিয়ে আসে—একথা বিজ্ঞানীদের অনেককাল থেকেই জানা ছিল। কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা থাকলে তাঁরা অনেককাল আগেই পরমাণুর শক্তি সাহায্যে এঞ্জিন বা মোটর ইত্যাদি চালাতে পারতেন। একটা পরমাণু ভাঙবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ঢিল ছুঁড়তে হয়। তার মধ্যে দৈবাৎ এক আধটা লেগে যায় মাত্র। কারণ, কোন পদার্থ আমাদের কাছে যতই নিরেট বলে মনে হোক না. কেন, তার অনেকটাই ফাঁকা জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউরেনিয়াম ২৩৫
জেনন ৫৪
ষ্ট্রনসিয়াম ৩৮
ইউরেনিয়াম ২৩৫
রুবিডিয়াম ৩৭
সিজিয়াম ৫৫
ইউরেনিয়াম ২৩৫
ক্রিপ্টন ৩৬
বেরিয়াম ৫৬

৩নং চিত্র। কালো রঙের তীরের ফলার মত নিউট্রন-বুলেট, ইউরেনিয়াম২৩৫ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়েছে। ফলে, নিউক্লিয়াস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় খানিকটা শক্তি বা'র করে সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটা নিউট্রন-বুলেট ছেড়ে দিয়েছে। এই নিউট্রন আবার অন্য নিউক্লিয়াসকে দ্বিখণ্ডিত করবে। এটাই হলো চেইন-রিয়্যাক্‌শনের নমুনা। ইউরেনিয়াম২৩৫ এভাবে ভাঙবার ফলে ৩৪ নম্বরের সেলিনিয়াম থেকে ৫৭ নম্বরের ল্যান্থেনাম পর্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া গেছে।

অতি জোরালো তাড়িতিক শক্তির টানে পরমাণুগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলে পদার্থকে নিরেট বলে মনে হয়। পরমাণুগুলোর মধ্যে শূন্যস্থান থাকা সত্ত্বেও অ্যাটম-বোমা নির্মাতারা এমনই একটা উপায় উদ্ভাবন করেছেন যাতে বেশীরভাগ ঢিল বা বুলেট বেশীরভাগ পরমাণুকে ঠিক জায়গায় আঘাত করে' শক্তি উৎপাদন তো করেই, অধিকন্তু প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে দু'টা করে নতুন বুলেট (নিউট্রন কণিকা) নির্গত হয় এবং সেগুলো আরও অন্যান্য পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিদীর্ণ করতে পারে। বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা এতদিন প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে যতটা শক্তি আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এই নতুন প্রক্রিয়ায় তার বহু গুণ বেশী শক্তি সংগ্রহ করা যায়। ইউরেনিয়াম২৩৫ এর উপর নিউটন-বুলেট ছুঁড়েই এ ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ইউরেনিয়াম২৩৮ এর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রবিষ্ট করে নতুন মৌলিক
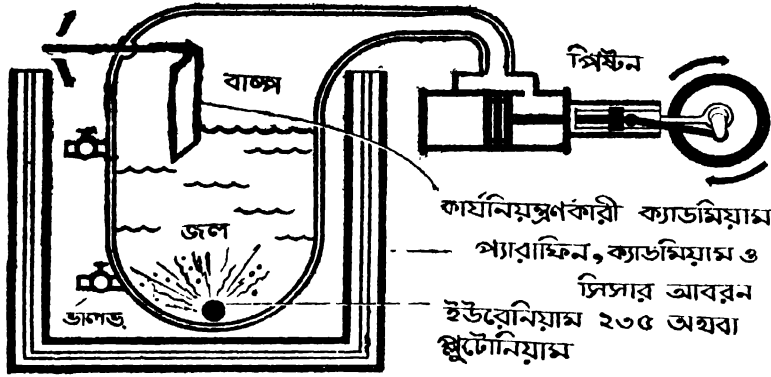
৪নং চিত্র। অর্ধজলপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের তলায় ইউরেনিয়াম২৩৫এর ভাঙন ঘটালে তা' থেকে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং প্রদর্শিত উপায়ে বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাতে পারে। ক্যাডমিয়ামের সাহায্যে এই শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এর নাম প্লুটোনিয়াম, তড়িন্মাত্রা ৯৪ এবং গুরুত্ব ২৩৯। ইউরেনিয়াম২৩৫ এর মত প্লুটোনিয়াম থেকেও সহজে শক্তি বের করে আনা যায়। অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় এই শক্তি উৎপাদন করা যায় বলে হয়তো ইউরেনিয়াম ২৩৫ এর চেয়ে প্লুটোনিয়ামেরই সুবিধা বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে নিউট্রন বুলেটের আঘাতে ইউরেনিয়াম২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু সহজেই ভেঙে যায়। এই ভাঙনকে বলা হয় 'ফিসন্'। কিন্তু অন্যান্য পদার্থের চেয়ে ইউরেনিয়াম২৩৫ এর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তু সহজে ভাঙে কেন? অক্সিজেন পরমাণুর কথা ধরা যাক্। অক্সিজেন পরমাণু ও ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনগুলো কিভাবে সজ্জিত আছে ১ নম্বরের ছবি দেখলেই তা' পরিষ্কার বোঝা যাবে। অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তুতে আছে ৮টা প্রোটন এবং ৮টা নিউট্রন। এই প্রোটন ও নিউট্রনগুলো একটা গোলাকার পিণ্ডের মত হয়ে রয়েছে। এই গোলাকার পিণ্ডটার বাইরের দিকে ৮টা ইলেকট্রন বিভিন্ন তলের বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইউরেনিয়াম২৩৫ এর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তুতে আছে ৯২টা প্রোটন আর ১৪৩টা নিউট্রন। এগুলো একসঙ্গে ডেলা

বেঁধে থাকলেও একটা বলের মত গোল হয়ে থাকে না; কতকটা যেন একটা অসমান ডাম্বেলের মত। ২নম্বরের চিত্র দেখ। এরকম পার্থক্যের কারণ কি ?

নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত কণাগুলোর উপর দু'টা পরস্পর বিরোধীশক্তি ক্রিয়া করে থাকে। এর একটি হচ্ছে—তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি। এই বিকর্ষণশক্তি প্রোটনগুলোকে পরস্পরের নিকট থেকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। একমাত্র এই শক্তি থাকলে নিউক্লিয়াস আপনাআপনিই ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যেত। কিন্তু তড়িতাবেশ থাকুক আর নাই থাকুক, নিউক্লিয়াসের মধ্যে কণিকাগুলো যখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তখন তাদের মধ্যে একটা প্রবল 'নিউক্লিয়ার' আকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখা যায়। এই আকর্ষণ শক্তিই তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তিকে কার্যকরী হতে দেয়না। অপেক্ষাকৃত হাল্কা অক্সিজেন পরমাণুর ভিতরের কণিকাগুলোর মধ্যে এই আকর্ষণ শক্তি, তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তির চেয়ে অনেক প্রবল। কাজেই অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু অনেকটা নিটোল গোলকের মত হয়ে থাকে। কিন্তু ইউরেনিয়ামের মত ভারী পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুতে বিকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবলতর। যখন এই শক্তি যথেষ্ট প্রবল থাকে তখন সামান্য একটু অবস্থা বিপর্যয়ের ফলেই নিউট্রনের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করে' প্রোটনগুলো প্রায় সমান অংশে দু'দলে পৃথক হয়ে পড়ে এবং উভয় দলে যেন একটা টানাটানি চলতে থাকে। একটা জলের ফোঁটাকে ধীরে ধীরে ছোট বড় দুটা ফোঁটায় বিচ্ছিন্ন করবার মুখে যেমন সূক্ষ্ম একটু জলের সংযোগ-সূত্র থাকে, অবস্থাটা অনেকটা সেরকমের। এ অবস্থায় নিউট্রন যদি বুলেটের মত ওই সংযোগ স্থলে আঘাত করে তবে কেন্দ্রীয়বস্তুটা দুই অসমান অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরূপভাবে পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটাকে পরমাণবিক ভাষায় বলা হয়—'ফিসন্'। ইউরেনিয়াম পরমাণুর 'ফিসন্' ঘটবার ফলে অনেক কম গুরুত্ব সম্পন্ন দু'টা বিভিন্ন পদার্থের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তুর উৎপত্তি ঘটে। ৩ নম্বরের ছবিগুলো দেখলেই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারবে। 'ফিসন্' ঘটবার সময় আর একটা ব্যাপারও ঘটে থাকে। সেটা হলো এই যে, প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড তেজ এবং দুটা করে নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই নিউট্রন আবার অন্য নিউক্লিয়াসের 'ফিসন্' বা ভাঙন ঘটায়। এভাবে অতি অকিঞ্চিৎকর সময়ের ব্যবধানে

৫নং চিত্র ইউরেনিয়াম ও গ্র্যাফাইট পর পর পর সাজিয়ে নীচের দিকের নিউট্রন-উৎপাদক আধার থেকে নিউট্রন প্রয়োগে পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই পাত্রের মধ্যে একদিক দিয়ে ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করালে অপরদিক দিয়ে সে জল গরম হয়ে বেরিয়ে আসবে।

পর পর অগণিত নিউক্লিয়াস ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটে। পরমাণবিক ভাষায় একে বলে—'চেইন-রিয়্যাকশন্'। ইউরেনিয়াম২৩৫-এর নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা নিউট্রন আঘাত করলে ঠিক এ ব্যাপারই ঘটে থাকে।

কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড শক্তি আসে কোথা থেকে?

একটা ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন ঘটলে কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা ছোটবড় দুটা টুকরাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটা পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু ভেঙে ১৩৮ গুরুত্ব সম্পন্ন একটা বেরিয়াম ও ৮৬ গুরুত্ব সম্পন্ন একটা ক্রিপটন্ নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হলো। এ-দুটার গুরুত্ব একত্রে হবে ২২৪। কিন্তু ভাঙবার পূর্বে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসটার গুরুত্ব ছিল ২৩৫। পাওয়া গেল ২২৪ ও দুটা নিউট্রন=২২৬। কিন্তু বাকী ৯ বস্তুপরিমাণ কোথায় গেল? এই ৯ বস্তুপরিমাণই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তোমরা এই কথাটুকু মনে রাখতে পার যে, আইনষ্টাইনের সূত্রানুসারে কোন বস্তুর সমানানুপাতিক শক্তিতে রূপান্তরের পরিমাপ হলো $E = mc^2$, অর্থাৎ E = শক্তি, m = বস্তুপরিমাণ, c = আলোর গতি।

সরাসরি পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করে ব্যবহারিকক্ষেত্রে আপাতত রকেট জাতীয় আকাশ যান পরিচালনের ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে। প্রচণ্ড চাপের গ্যাসের ধাক্কায় রকেট পরিচালিত হয়। পরমাণু-শক্তি সাহায্যে সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে রকেটকেই সহজে কার্যকরী করা সম্ভব। তবে সরাসরি না হলেও কতকটা পরোক্ষভাবেই পরমাণু-শক্তিকে কাজে লাগবার চেষ্টা চলেছে। কোন আবদ্ধ পাত্রে জলের নীচে ইউরেনিয়াম২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়ামের 'ফিসন্' ঘটালে জল গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হবে। এই বাষ্পের সাহায্যে যেকোন রকমের এঞ্জিন চালাতে পারা যায়। ৪ নম্বরের চিত্র দেখ। ৫ নম্বরের চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থায় একটা প্রকোষ্ঠে গ্র্যাফাইট ও ইউরেনিয়াম পর পর সাজিয়ে তাতে রেডিয়াম-বেরিলিয়াম আধার থেকে উৎপন্ন নিউট্রন প্রয়োগ করলে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই প্রকোষ্ঠের এক দিক দিয়ে ঠাণ্ডা জল পরিচালিত করলে তা' উত্তপ্ত বা বাষ্পে পরিণত হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই গরম জল বা বাষ্প প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যেতে পারে। গ. চ, ভ,

করে দেখ

'ব্যালেন্সিং'-এর বিচিত্র কৌশল

(১)

বাঁকের দুদিকে ভারী বোঝা ঝুলিয়ে মোট বইতে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। কোন কিছুর উপর একটা লাঠি খাড়া করে ধরে ঝুলানো বোঝা সমেত বাঁকটাকে তার উপর ঠিকভাবে বসিয়ে দিলে সেটা দাঁড়ি পাল্লার মত ঝুলে থাকবে। কিন্তু লাঠিটাকে ধরে না রাখলে সেটা যে কোন একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে যাবে। সহজ বুদ্ধিতেই এটা তোমরা বুঝতে পার। কিন্তু ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একটুকরা কাঠকে কোন উঁচু জায়গায় শয়ানভাবে রেখে, ভারী বোঝা সমেৎ বাঁকটাকে তাতে কৌশলে বসিয়ে দিলে সেটা সেখান থেকেই ঝুলতে থাকবে, বলপ্রয়োগ না করে তাকে ফেলতেই পারবে না। কেমন করে এটা করা যায় সেটা বুঝিয়ে বলছি। তোমাদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত নও তারা অনায়াসেই করে দেখতে পার।

প্রথমে নম্বর ১ছবি খানাকে ভাল দেখে নাও। ছোট্ট কাঠখানার সঙ্গে আটকানো একটা ভার-বাঁক শূন্যে ঝুলে আছে প্রথমে এক ইঞ্চি চওড়া, আধ ইঞ্চি বা তারও কিছু কম পুরু এবং প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা একটুকরা কাঠ সংগ্রহ করে তাঁর একদিকে টেরছাভাবে একটা খাঁজ কেটে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো আছে খাঁজটা যেন সেরকমেরই হয়। এবার দুহাত কি আড়াই হাত লম্বা একটা বাঁশের বাখারি যোগাড় কর। বাখারিটা প্রায় এক ইঞ্চি কি আরও কিছু বেশী চওড়া এবং স্প্রিংএর মত নমনীয় হওয়া দরকার। দড়িবাঁধা কোন ভারী জিনিষ এবার বাখারিটার দুপ্রান্তে বেঁধে দাও। দড়ির প্যাঁচটাকে ছবির মত করে বাখারির সামনের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। বাখারিটাকে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট কাঠখানার খাঁজের মধ্যে বসিয়ে দাও। এবার কাঠখানাকে ধরে উঁচুতে তুললেই বুঝতে পারবে, বাঁকের ভারকেন্দ্রটা গিয়ে পড়েছে শয়ান ভাবে স্থাপিত কাঠখানার অপর প্রান্তে। ভার-বাঁক সমেত কাঠখানার বিপরীত প্রান্ত টেবিলের ধারে, আঙুলের ডগায় কি টাঙানো দড়ি—যেখানেই রাখ, বাঁকটা সেখানেই ঝুলে থাকবে; দুলিয়ে দিলেও সে পড়ে যাবে না।
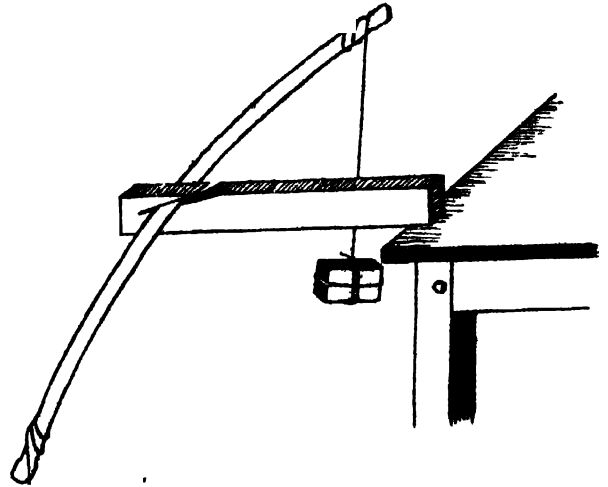
১নং ছবি। ভার ঝুলানো একটা বাঁককে একটুকরা কাঠের খাঁজের মধ্যে বসিয়ে সে কাঠখানাকে শয়ানভাবে টেবিলের এক কোণে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভার-বাঁকটা শূন্যে ঝুলছে।

(২)

২ নম্বরের ছবি খানার মত হাল্কা কাঠ বা টিনের একটা ঘোড়া সংগ্রহ কর। ইস্পাতের একটা পুরু তার যোগাড় করে তার এক প্রান্তে বেশ ভারী একটা সীসার বল শক্ত করে এঁটে দাও। ঘোড়াটার ওজনের অনুপাতে সীসার বলটাকে বড় কিম্বা ছোট করবে। তারটা ছবির মত বাঁকানো হওয়া চাই। এবার সীসার বল সমেত তারটাকে ঘোড়ার বুকে বেশ শক্ত করে বসিয়ে দাও।

বলটাকে ঘোড়ার বুকে আটকে দিলেই বুঝতে পারবে, শরীরের ভারকেন্দ্র গিয়ে পড়েছে তার পিছনের পায়ের উপর। এ অবস্থায়—ঘোড়াটাকে পিছনের পায়ের উপর যে কোন সংকীর্ণ জায়গায় বসিয়ে দাও না কেন, সে শূন্যে অবস্থান করবে।
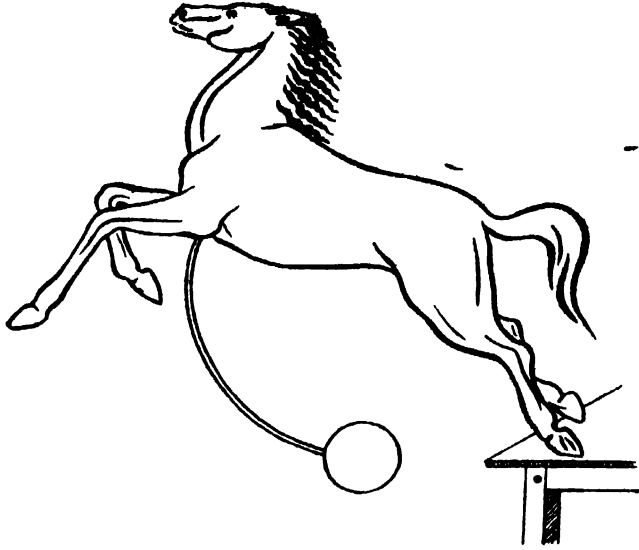
২নং ছবি। কাঠের ঘোড়াটার বুকের কাছে একপ্রান্তে ভারী বল আঁটা স্প্রিঙের মত একটা তার বসানো আছে। টেবিলের এক কোণে পিছনের পায়ের উপর সে শূন্যে অবস্থান করছে।

(৩)

হাল্কা একটা লম্বা নলের তলার দিকটা যদি পারা বা সীসা ভর্ত্তি করে ভারী করে দেওয়া যায়—তবে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? নলটা সর্বদাই খাড়া হয়ে থাকবে। চেপে ধরে কাৎ করতে পার বটে, কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাত্রই সে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ ব্যবস্থা অন্য উপায়েও করা যায়। ৩ নম্বরের ছবি দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

দুই ইঞ্চি লম্বা একটুকরা কর্ক বা হাল্কা কাঠের উপরের দিকে মাথা এবং নীচের দিকে পায়ের মত তৈরী করে নাও। স্প্রিঙের মত দুটা বাঁকানো ইস্পাতের তার, কর্ক বা কাঠটার গায়ে হাতের মত করে বেশ এঁটে বসিয়ে দাও। তার দুটার প্রান্তভাগে পুতুলটার ওজনের অনুপাতে দুটা সীসার বল বসিয়ে দিতে হবে। দেখবে, বল দুটা বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুতুলটা খাড়া হয়ে থাকবে। এঅবস্থায় যেখানে রাখবে পুতুলটা সেখানেই খাড়াভাবে অবস্থান করবে। প্যাকাটি, বাঁশের কাটি এবং মাটির ঢেলা দিয়েও এটা করতে পার। খ. চ. ভ.

৩নং ছবি। কর্কের পুতুল। স্প্রিঙের তারের দুটা হাতে দুটা ভারী বল। পুতুলটাকে যেখানে রাখা যায়—সেখানে খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে।

মাছ কি খাড়া দেয়াল বেয়ে উপরে উঠতে পারে ?

পোকামাকড় সংগ্রহ করবার জন্যে কলকাতার দক্ষিণে ফলতায় গিয়ে একদিন গঙ্গার ধারে বাঁধের উপর দিয়ে চলছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়লো—জলের ধারে ঢালু জমির কাদামাটির উপর টিকটিকির মত কতকগুলো প্রাণী ঘোরাফেরা করছে। অনেকেই তারা ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটাছুটি করছিল। মাঝে মাঝে দুচারটার ঝগড়াঝাটি, মারামারিও দেখতে পেলাম। এদের চলাফেরার অদ্ভুত - রকম-সকম দেখে খুবই কৌতুহল হলো। দূর থেকে ভাল করে দেখবার উপায় ছিল না বলে ওরা কোন জাতের প্রাণী সেটা বুঝতে পারিনি। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই দেখলাম—ওই ধরণের আরও অনেকগুলো প্রাণী জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কৌতুহল দমন করতে না পেরে নীচে নেমে গিয়ে কাদার উপর থেকে কয়েকটাকে ধরে আনবার মৎলব করলাম। কিন্তু কাদায় নেমে নাকাল হওয়াই সার হলো। ওরা এমনই চটপটে এবং

উভচর মাছ। কানকোর কাছের পাখনা দেখতে পায়ের মত।

ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে পারে যে, সহজে ধরা অসম্ভব। অবশেষে লোক জনের সহায়তায় তাদের অনেকগুলোকে ধরে, জ্যান্ত অবস্থায় দূরে চালান দেবার মত পাত্রের মধ্যে বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে এলাম।

কলকাতায় এনে মাছগুলোকে পরীক্ষাগারের বড় কাঁচের চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলাম। সেগুলো ব্যাঙের মত জলের উপর মুখ বার করে দিব্যি আরামে সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগলো। জলের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই স্ফূর্তিতে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। পরেরদিন পরীক্ষাগারে গিয়ে দেখি—চৌবাচ্চা খালি; এতগুলো মাছের একটাও সেখানে নেই।

রাতারাতি এতগুলো মাছ উধাও হয়ে গেল কেমন করে? খুবই বিস্ময়ের কথা। অনুসন্ধান করে জানলাম—চাকর, বেয়ারা রোজকার মতই দরজা বন্ধ করে গেছে এবং সকালে দরজা খুলেছে। কেউ কিছু দেখে নাই বা কোন হদিসও দিতে পারলে না। আদ্যোপান্ত এদের জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করবো ভেবেছিলাম তা' আর হয়ে উঠলো না। কাজেই ক্ষুণ্ণমনে বসে বসে এদের রহস্যময় অন্তর্ধানের কথা চিন্তা করছিলাম। অকস্মাৎ নজর পড়লো ছাতের কাছে স্কাই-লাইটটার দিকে। ঘরে বাতাস চলাচলের জন্যে স্কাই-লাইটের সার্সিটা হেলানোভাবে খোলা ছিল। দেখি—সেই স্কাই-লাইটের সার্সিটার উপরে দুটা মাছ ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ মেলে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে যেন আমার দিকে চেয়ে আছে।

উভচর মাছগুলো জল থেকে কাঁচের গা বেয়ে উপরে উঠছে। কাঁচের ভিতর দিয়ে পেয়ালার মত বুকের; শোষকযন্ত্র পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। মাছ দুটা অত উঁচুতে উঠলো কেমন করে? মাছের পক্ষে অতখানি উঁচু খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠাতো সম্ভব নয়! কাছে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের ব্যবহারে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র বুঝা গেল না। বরং আরো যেন কৌতূহলী হয়ে উঠলো। কারণ পর্যায়ক্রমে একটা চোখ বন্ধ করে আর একটাকে শিঙের মত উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। মাছের এমন অদ্ভুত কাণ্ড এবং এমন অদ্ভুত চাউনি আর কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। কাজেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাছ দুটারও কিন্তু সেখান থেকে নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এর মধ্যেই আমার কাছ থেকে খানিকটা দূরে বাঁ-দিকের জানালার কাঁচের সার্সির উপর টিকটিকির মত একটা কিছু বেয়ে নড়তে দেখলাম। কাছে যেতেই দেখি—অবাক কাণ্ড! খাড়া, মসৃণ কাঁচের গা বেয়ে তিনটা মাছ উপরের দিকে ওঠবার চেষ্টা করছে। খানিকটা উঠে দম নেবার জন্যে কিছুক্ষণের জন্য কাঁচের গায়ে আটকে বসেছিল। ব্যাপারটা তখন জলের মত পরিষ্কার

হয়ে গেল। চৌবাচ্চার মসৃণ কাঁচের গা বেয়ে যে মাছগুলো উপরে উঠতে পারে—একথা মোটেই ভাবতে পারিনি। কাজেই চৌবাচ্চাটাকে খোলাই রেখে দিয়েছিলাম। সুযোগ বুঝে
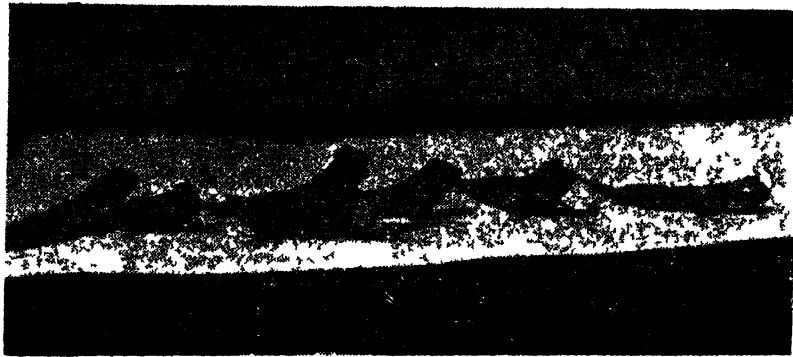
উভচর মাছগুলো ডাঙার উপর হেঁটে চলেছে।

সবগুলো মাছই চৌবাচ্চাটার গা বেয়ে বাইরে পালিয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে তারপর আলমারি ও টেবিলের নীচে আরও কয়েকটা মাছের সন্ধান পাওয়া গেল।

পরীক্ষাগারের পাশেই ডোবার মত ছোট্ট একটা জলাশয় আছে। সেই জলের মধ্যে বড একটা শুকনো ডাল পুতে রাখা হয়েছিল বিশেষ একটা প্রয়োজনে। একটা কাজের জন্যে বিকেলের দিকে সেখানে গিয়ে দেখি—এক অবাক কাণ্ড! জল থেকে অনেক উঁচুতে ডালটার উপর ওখানে সেখানে অনেকগুলো পলাতক মাছ দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করছে। আমায় দেখেই কয়েকটা মাছ ড্যাব্‌ড্যেবে চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

উভচর মাছ কাদার মধ্যে চুপ করে বসে আছে।

কেউ কেউ একটা চোখ নিচু করে আর একটাকে উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। ওদের চাউনিতে সে সময় কি যে বিস্ময়, কি যে একটা কৌতুকের ভাব ফুটে উঠেছিল সেটা

না দেখলে বলে বুঝানো যায় না ! বোধ হয়, চৌবাচ্চা থেকে পালিয়ে এসে নতুন পরিবেশে এবং মুক্তির আনন্দেই ওরা ওরূপ করছিল। ধরতে যাওয়া মাত্রই সবগুলো লাফিয়ে জলে পড়লো। ছাকনি-জালে সেগুলোকে পুনরায় বন্দী করে আনলাম।

ওগুলো এক জাতের উভচর মাছ। গায়ে ছোট ছোট নীলরঙের ছিটেফোঁটা দাগ আছে। দূর থেকে দেখতে কতকটা টিকটিকির মত মনে হয়। মুখের দিকটা অনেকটা ব্যাঙের মত। ডাঙায় চলবার সময় মাথাটাকে ব্যাঙের মত উঁচু করে রাখে। সাঁতার কাটবার সময়ে চোখ দুটো অন্ততঃ জলের উপরে থাকে। কানকোর পাশের পাখনা দুটা ঠিক যেন হাতের মত। বুকের কাছে পেয়ালার মত ছোট্ট একটা গোলাকার পাখনা আছে। এই পাখাটার সাহায্যেই এরা যে কোন স্থানে শক্ত-ভাবে এঁটে থাকতে পারে। এদের চোখ দুটা যেন বোঁটার মাথায় বসানো। একটা কি দুটা চোখকেই ইচ্ছামত ভিতরে সংকুচিত বা বাইরে প্রসারিত করতে পারে।

মাছগুলো গাছে চড়ে ডালের উপর ঘোরাফেরা করছে।

ছোট্ট পেয়ালার মত বুকের পাখনাটাকে এরা শোষণযন্ত্রের মত ব্যবহার করে। এই শোষণযন্ত্রটাকে ইচ্ছামত সংকুচিত বা প্রসারিত করে এরা কাঁচ বা যে কোন মসৃণ পদার্থের গা বেয়ে খাড়াভাবে উঠতে পারে এবং খাড়া-ই হোক কি ঢালুই হোক, যেকোন স্থানে অনায়াসে শক্তভাবে আটকে থাকতে পারে। ডাঙার উপর চলবার সময় কানকোর পাশের পাখনা দুটাকে পায়ের মত দেখায়; পাখনা দুটাকে পায়ের মত ব্যবহার করেই এরা হেটে বেড়ায় অথবা লাফিয়ে চলে। কিন্তু সাঁতার কাটবার সময় পাখনা দুটা পাখার মত ছড়িয়ে থাকে। তাতে জল কেটে দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে পারে। শিকারের সন্ধানে কাদামাটির উপরেই এরা বেশী সময় ঘোরাফেরা করে থাকে। তবে পারতপক্ষে শুকনা ডাঙায় যেতে চায় না। এই মাছগুলো খুবই ঝগড়াটে বলে মনে হয়। কারণ পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মারামারি প্রায়ই লেগে থাকে।
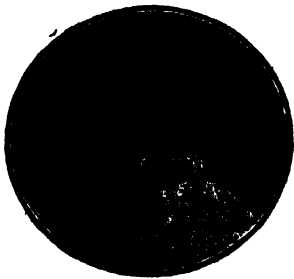
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরি-
চালিত মাসিক পত্রিকা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

—নিয়মাবলী—

১। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রতি ইংরাজী মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲, ষান্মাষিক সডাক ৪৷৷৹, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ আনা। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৩। পরিষদের সাধারণ সদস্য পদের বার্ষিক চাঁদা ১০৲ টাকা, ষান্মাষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। সদস্যগণ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন।

৪। টাকাকড়ি এবং পরিষদ ও পত্রিকা সম্পর্কীয় চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

৫। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে পরিষদের অফিস—বসুবিজ্ঞান মন্দির, ৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ১২টা থেকে ৬টার মধ্যে অফিস-তত্ত্বাবধায়কের সহিত সাক্ষাৎ করা যায়।

৬। রচনা এক পৃষ্ঠায় লিখে উপরোক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে রচনা ১২০০ শব্দ মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭। অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরত দেওয়া হয় না।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন

১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন বিষয়বস্তুই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।

২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়।

৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রবন্ধ প্রকাশে অযথা বিলম্ব হতে পারে।

৪। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪।৫ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

৬। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদেশী শব্দগুলোকে বাংলা অক্ষরে লেখাই বাঞ্ছনীয়।

৭। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে না। টিকেট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে।

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ৯৩, আপার সার্কুলার রোডে পাঠাতে হবে।

৯। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরা ঠিকানা থাকা দরকার।

১০। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষা করে' অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের অধিকার থাকবে।

পরিষদের কথা

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রারম্ভিক বহুবিধ অসুবিধার মধ্যেও এই সামান্য কালের মধ্যেই পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। বিজ্ঞান লোকায়ত্তকরনের উদ্দেশ্যে পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের অভাবে আশানুরূপ ব্যাপকভাবে কার্যারম্ভ করা সম্ভব হয়নি; তথাপি জনসাধারণকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে লোক-বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা, জনপ্রিয় বক্তৃতা দান, বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা প্রভৃতি নানারূপ কাজ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে চলছে। বাংলায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক মাসিকপত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ক্রমেই সাধারণের উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করছে; ইহার 'ছেলেদের পাতা'য় যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সহজ ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে তাতে বিজ্ঞান বিষয়ে জাতিগঠনে প্রভূত সাহায্য করবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে কিশোর কিশোরীদের বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা ও প্রশ্নাদি-পূর্ণ যে সব পত্রাদি আসছে, তাতে জাতীয় বিজ্ঞান-চেতনা বিষয়ে যথেষ্ট আশা করা যায়।

জাতির বিজ্ঞান-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের জন্য আরও ব্যাপকভাবে কাজ করা প্রয়োজন। এজন্য ফিল্ম ও ছায়াচিত্র সহযোগে দেশের দিকে দিকে বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। কিশোর কিশোরীদের হাতে কলমে শিক্ষার জন্য সাধারণ যন্ত্র ও পরীক্ষাদির নক্সা, স্কেচ প্রভৃতির একটি স্থায়ী প্রদর্শনী এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও পত্রিকাপূর্ণ একটি পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। আশাকরি বর্তমান বর্ষে পরিষদের এই জনহিতকর প্রচেষ্টা সবিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হবে।

সহযোগিতার আহ্বান

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, দেশের সুধি সমাজের তথা সমগ্র জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট প্রচেষ্টা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না। এজন্য আমরা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এবিষয়ে সম্যক অবহিত হন। আশা করি প্রত্যেক সদস্য অন্যূন তিনজন নূতন সদস্য সংগ্রহ করবেন; এজন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্তমান সংখ্যায় এক খানা সদস্য পত্র সংযোজিত আছে; প্রয়োজন অনুসারে লিখিলেই আরও সদস্যপত্র পাঠান হবে। সদস্যগণকে বর্তমান ১৯৪৯ সালের বার্ষিক চাঁদা ১০৲ টাকা যথাসম্ভব সত্বর পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে, এতে কাজের যথেষ্ট সুবিধা হবে। ইতি—

নিবেদক

কর্মসচিব—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিবাহিতা আঙ্গামী তরুণী

অবিবাহিতা আঙ্গামী যুবতী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | ফেব্রুয়ারী—১৯৪৯ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আসামের নাগাগোষ্ঠী

(আঙ্গামী নাগা)

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অনেকেরই হয়তো একথা জানা নেই যে, বিংশ-শতাব্দীতে মানব-সভ্যতার এই চরমোন্নতির দিনেও আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশ আসামে এমন এক আদিম জাতি বাস করে যাদের কোনো কোনো শাখার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করে; যারা সাপ, ব্যাঙ, কাক, চিল, কুকুর, বিড়াল, হাতী ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণীর মাংস অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে থাকে। আসামের এই সর্বভুক আদিম জাতটির নাম নাগাজাতি। নাগারা প্রধানতঃ নাগাপাহাড়ে বাস করে। এরা আঙ্গামী, আও, সেমা, কাচা, রেঙ্গমা, লোটা, কনিয়াক, সাংটাম প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল-সমূহও টাংখুল, মারাম, কলিয়া, খইমাও, কাবুই, কুইরেং, চিরু, মারিং ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের নাগাদের দ্বারা অধ্যুষিত। আসামের সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে নাগারাই সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও হিংস্র প্রকৃতির। আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনাকে এরা খুব একটা বাহাদুরি বলে মনে করত। তখনকার দিনে কোন কোনো নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি নরমুণ্ডের মালিক না হওয়া পর্যন্ত বিবাহেচ্ছু যুবকের পক্ষে পাত্রীসংগ্রহ করাই ছিল অসম্ভব।

এই সমস্ত নাগাগোষ্ঠীর মধ্যে আঙ্গামী আর আওরাই হচ্ছে প্রধান। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আঙ্গামী নাগাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করব এবং প্রসঙ্গক্রমে আও নাগাদের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব। যাঁরা বিভিন্ন নাগাগোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চান তাঁরা আসাম গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হাটন, মিল্‌স্‌, হড্‌সন্‌ প্রভৃতির জাতিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকসমূহ পড়লে উপকৃত হবেন।

চৌদ্দ পনের বছর আগে মণিপুরে যাবার পথে কোহিমায় প্রথম আমি আঙ্গামী নাগাদের সংস্পর্শে আসি। তাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করবার আগে সেই ভ্রমণ-পথের এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আংশিক বর্ণনা দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সেদিন ছিল শরৎকালের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত। আসাম বেঙ্গল রেলপথের মণিপুর রোড ষ্টেসনে নেমে ইম্ফলগামী মোটরে এসে উঠলাম। নীচু গার্ডের গেট ছাড়িয়ে আমাদের মোটরখানা বনানীমণ্ডিত নাগা পাহাড়ে প্রবেশ করে হিলিমিলি রাস্তা বেয়ে চলতে লাগল। দু'ধারে দূরপ্রসারী মহাবন, স্থানে স্থানে বনস্পতিসমূহের শীর্ষদেশ থেকে পুষ্পখচিত লতাগুচ্ছ ঝলঝলে ঝালরের মত দোলায়মান। শ্যামল বনভূমি অতিক্রম করে মোটরখানা দুর্গম বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে ক্রমশঃ উর্ধে আরোহণ করতে লাগল। রাস্তার বাঁ-দিকে সুগভীর খাদের ওপারে সুবিন্যস্ত অনন্ত পর্বত-মালার বর্ণবৈচিত্র্য অপূর্ব। নিকটের পাহাড়শ্রেণী ঘন সবুজ, তার পরের সারি পাঁশুটে রঙের, আর সকলের শেষ সারিতে সংস্থিত আকাশস্পর্শী শৈল রাজি নীলাভ। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো সবুজ আর হল্‌দে রঙের শস্যক্ষেত্রগুলোর মাঝখানে সরু নোয়ানো বাঁশের ডগায় নাগারা সাদা-কালো বস্ত্রখণ্ডসমূহ টাঙিয়ে রেখেছে।

বেলা বারোটায় নাগাপাহাড়ের রাজধানী কোহিমায় এসে মোটর থামলে দেখি, রাস্তার ধারে একটা ঘরে একপাল নাগা মেয়ে-পুরুষ এক একটা মুরগীর খাঁচা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগা নামে পরিচিত।

পুরুষগুলো প্রত্যেকেই লম্বায় অন্তত ছ' ফুট। এদের মাংসপেশীবহুল সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের সৌষ্ঠব দু-দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। প্রায় সবাইকে বলা যেতে পারে ব্যূঢ়োরস্ক আর বৃষস্কন্ধ। আসামের আর কোন পাহাড়ী জাতির মধ্যে এমন সুগঠিত অবয়ববিশিষ্ট লোক তো আমার নজরে পড়েনি। আঙ্গামী মেয়েরাও বেশ ফরসা—দীর্ঘাঙ্গী। পুরুষদের গলায় শাঁখের টুকরো দিয়ে তৈরী মালা। সর্দারদের কণ্ঠাভরণের মাঝখানে আস্ত এক একটি শঙ্খ ঝুলানো; বাহুতে হাতীর দাঁতে প্রস্তুত রাজুবন্ধের মত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার গয়না। কাবুই প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের নগ্নকায় নাগাদের মত এদের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থাটি কিন্তু একেবারে আদিম নয়—গায়ে তাদের হাতাহীন কালো জামা, এদের কাছা না দিয়ে পরা কালো রঙের কটিবাসে গাঁথা সারি সারি কড়িগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনতে না পারলে আঙ্গামীরা পরিধেয়তে কড়ি গাঁথবার অধিকারী হত না। পরনের বস্ত্রখণ্ডে গাঁথা কড়ির সারির সংখ্যা থেকে কে কি পরিমাণ নরহত্যা করেছে, তা বোঝা যেত।

নাগা পাহাড়ের বাসিন্দা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগাদের মধ্যে আঙ্গামীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত অঞ্চল এদের দ্বারা অধ্যুষিত। আঙ্গামীদের দৈহিক কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিসীম। দুর্গম পার্বত্য পথে প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে দৈনিক ত্রিশ চল্লিশ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। এরা সমরপিপাসু বীরের জাত। ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পূর্বে প্রতিবেশী ভিন্নগোষ্ঠীর নাগাদের গ্রামে হানা দিয়ে প্রায়ই এরা নরমুণ্ড শিকার করত। ইদানীং এরা অকারণ নরহত্যা পরিত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু আজও এদের রণপিপাসা তেমনি বলবতীই রয়ে গেছে। এদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে পশুলোমে শোভিত কারুকার্যখচিত সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার বর্শা। ওস্তাদ যোদ্ধাদের বর্শাগুলি আগাগোড়া মানুষের মাথার লম্বা চুল দ্বারা ভূষিত থাকে। যুদ্ধে আততায়ীর অস্ত্রাঘাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এরা গণ্ডার, হাতী অথবা মোষের চামড়ার তৈরী, পাঁচ থেকে সাত ফিট উঁচু, ঢাল ব্যবহার করে। ওস্তাদ যোদ্ধাদের ঢালে মনুষ্যমূর্তি খোদিত থাকে।

আসামের অন্যান্য অনেক আদিম জাতির তুলনায় আঙ্গামী নাগারা ঢের বেশী বুদ্ধিমান। নূতন ভাবধারা ও আদর্শকে এরা অনায়াসেই

আত্মসাৎ করে নেয়। নাগাপাহাড়ে বেড়াতে গেলে আঙ্গামীদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতে হয়। এরা স্বভাবতঃ খুব মিতব্যয়ী, কিন্তু অতিথির জন্যে দরাজ হাতে খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। আঙ্গামীদের চরিত্রের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, এদের সদাহাস্যময় ভাব আর কৌতুকপ্রিয়তা। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এদের প্রাণ খুলে ফূর্তি-আমোদ করতে দেখা যায়। সামান্য কোন কৌতুককর ব্যাপার ঘটলেও এদের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের আর বিরাম থাকে না। এদের এই বাহ্যিক প্রসন্নতার অন্তরালে নিহিত আছে কিন্তু সুগভীর বিষাদের ভাব। মৃত্যুচিন্তা অনুক্ষণ তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তৎ সঞ্জাত ভীতি তাদের জীবনকে বিষময় করে তোলে। তাদের অধিকাংশ লোক-সঙ্গীতে এই বিষাদের ভাব সুপরিস্ফুট।

আগেকার দিনে নাগাদের মধ্যে যে যত বেশী নরমুণ্ডের মালিক হত, সেই তত বড় বীর বলে গণ্য হত। মনে প্রশ্ন জাগে যে, নাগাদের এই নরমুণ্ডসংগ্রহের মূলে ছিল কোন মনোবৃত্তি। একথার উত্তর হচ্ছে এই :—এদের সমাজে নরহত্যা ছিল চরম বীরত্বের পরিচায়ক। কোন নিদর্শনচিহ্ন দেখাতে না পারলে লোকে তার বীরত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবে, এই মনোভাব থেকেই তখনকার দিনে নাগাযোদ্ধা নিহত শত্রুর মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে আসবার চেষ্টা করত। গোটা দেহটা আনা সম্ভবপর না হলে হাত, পা, আর মাথাটি কেটে নিয়ে চলে আসত।, শেষে তারা দেখলে যে, দুর্গম পার্বত্য পথে এ সকল কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লটবহর নিয়ে আসা মহা হাঙ্গামা—শুধু মাথাটি নিয়ে এলেই তো লেঠা চুকে যায়। তারপর এদের সমাজে নরমুণ্ডসংগ্রহের রেওয়াজ হল। নাগাদের কাছে প্রাণীমাত্রেই শিকার-স্বরূপ। তার মধ্যে আগেকার দিনে, মানুষই সবচেয়ে বড় শিকার বলে গণ্য হত। তাদের কাছে মানুষের মাথায় আর মোষের মাথায় কোনো তারতম্য ছিল না। পুরুষদের হৃদয়ে পৈশাচিক নরহত্যার প্রেরণা সঞ্চার করত মেয়েরা। গলায় ভল্লুকের দাঁতের হার আর পরণের বস্ত্রখণ্ডে গাঁথা কড়ির সারি ছিল নরমুণ্ডচ্ছেদকের নিদর্শনচিহ্ন। গ্রামীণ উৎসবাদি উপলক্ষ্যে যখন স্ত্রী-পুরুষ একত্র সমবেত হ'ত তখন নরমুণ্ডচ্ছেদনের নিদর্শন-চিহ্নবর্জিত পুরুষদের—মেয়েদের বিদ্রূপহাস্যে বিব্রত হতে হত। আজকের দিনে আঙ্গামীদের মধ্যে নরমুণ্ডচ্ছেদন-প্রথা লোপ পেয়েছে—নরমুণ্ডচ্ছেদকের গলায় বরমাল্য দেবার জন্যে নাগা-কুমারীদের যে উৎকট আগ্রহ ছিল তাও আজ আর বিদ্যমান নেই।

এদের সমাজে আনুষ্ঠানিক এবং অনুষ্ঠানবর্জিত উভয়বিধ বিবাহই প্রচলিত আছে। আনুষ্ঠানিক বিবাহেরই সামাজিক মর্যাদা সমধিক। এতে খুব ঘটাও হয়ে থাকে।

কোন যুবক যদি বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে অথবা তার পিতা এক বুড়ীকে ঘটকালিতে নিযুক্ত করে কনের বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। প্রথমে একটা মুরগী মেরে, মৃত্যুকালে সেটির পদদ্বয় কোন্ অবস্থায় থাকে তা দেখে ভাবী বিবাহের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। যদি এই প্রক্রিয়ায় শুভফল সূচিত হয় তাহলেই শুধু ঘটকী প্রস্তাবে অগ্রসর হয়। কনের বাপের বাড়ীতে গিয়ে সে তার পিতামাতার সংগে কন্যা-পণ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে। সাধারণতঃ কন্যা-পণ একটি বর্শা, দুটো শূকর আর ষোলটি মোরগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিয়ের কথাবার্তা স্থির হলে পর বর বর্শা ইত্যাদি ক্রয় করে নিজের বাড়ীতে সযত্নে রেখে দেয়, ওদিকে কনে আসন্ন বিবাহ-উৎসবের জন্যে মদ্যপ্রস্তুতিতে ব্যাপৃত হয়। বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হবার পর নির্দিষ্ট দিনে কনের পরিবারের যুবকেরা বর্শা, শূকর, মুরগী ইত্যাদি সহ বরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং শূকর আর মুরগীগুলোকে সেখানে মেরে ভোজ লাগায়। সন্ধ্যার সময় এক ঝুড়ি ছোট ছোট করে কাটা

মাছের টুকরো, শূকরের একটা পা, আর পাঁচ ছয়টা লাউয়ের খোল ভরতি মদ্য সহ একদল শোভাযাত্রী কনের বাড়ী থেকে বরের বাড়ীর অভিমুখে রওনা হয়। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে সুসজ্জিতা কনে, তারপর একটি ছেলে আর কনের তিনটি সহচরী, তারপর মৎস্য-মাংস-মদ্যাদি বহনকারী দুই ব্যক্তি, সকলের শেষ সারিতে থাকে কনের পিতৃ-গোষ্ঠীর একদল যুবক। সংগীত-ধ্বনিতে বিজন পার্বত্য পথ মুখরিত করে তারা শোভাযাত্রার অনুগমন করতে থাকে। এই শোভাযাত্রা বরের বাড়ীতে পৌঁছবার পর প্রথমে বর কন্যাপক্ষীয়দের দ্বারা আনীত মাংসাদি আহার করে এবং মদ্য পান করে। ওদিকে পান-ভোজনে কনেও কম যায় না, প্রথমে সে নিজের সংগে-করে-আনা মাংস আর অন্ন আহার করে, তারপর ছোট একটি লাউয়ের খোলের মুখ খুলে কিয়ৎ-পরিমাণ ধান্যেশ্বরীর সদ্ব্যবহার করে। অতঃপর উভয়পক্ষের লোকদের মধ্যে পান-ভোজনের ধুম পড়ে যায়। ভোজন-পর্ব সমাধা হলে পর বর মোরাঙে অর্থাৎ অবিবাহিত যুবকদের যৌথ শয়নাগারে গিয়ে মাচানের উপর আসন গ্রহণ করে। আরো দু'একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর কেবল মাত্র একটি ছেলে আর কনের তিনটি সহচরী ছাড়া কন্যাপক্ষের আর সবাই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যায়। ছেলেটি আর মেয়ে তিনটি সেই রাত্রিটি বরের বাড়ীতেই কাটিয়ে দেয়—বর কিন্তু, মোরাঙেই বিবাহ-রজনী যাপন করে। পরদিন প্রভাতে কনের শাশুড়ী কনেকে একটি পাতার ঠোঙা ভরতি মদ্য প্রদান করে, নববধূ সেই মদ্যপানপূর্বক শ্বশ্রূমাতার মর্যাদা রক্ষা করে। প্রাতঃসূর্যের বিমল আলোকে চারিদিক যখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কনে তখন একটি মাটির কলসী কাঁকালে নিয়ে জলকে চলে। কলসীতে জল ভরে নিয়ে ঘরে এসে সে রন্ধনকার্যে রত হয়।

পরদিন বরকনে শস্যক্ষেত্রে গিয়ে একসংগে ক্ষেত্রকর্মে রত হয়, কর্মাবসানে ক্ষেতেই তারা এক পাতে খেতে বসে। পরবর্তী তিনদিন তাদের নিজেদের গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে কোথাও যাওয়া বারণ। এই তিনদিনের মধ্যে বিবাহের বাদবাকী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

নাগাপাহাড়ে দুটি মহকুমা—কোহিমা আর মককচঙ। মককচঙ মহকুমায় আও নাগাদের বাস। এদের রীতিনীতি আঙ্গামীদের থেকে বহুলাংশে পৃথক। আঙ্গামীদের সমাজে নরনারীর ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, কিন্তু আওদের নিকট নারীর সতীত্বের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। সমর্থ যুবতী আও মেয়েরা রাত্রিবেলায় আলাদা একটি ঘরে তিন চার জনে একত্রে শয়ন করে—যুবকেরা মোরাং থেকে সেখানে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রত্যেক মেয়েরই গণ্ডা গণ্ডা প্রণয়ী থাকে। এইরূপে যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার ফল দাঁড়ায় এই যে, বিবাহিত জীবনেও বারবনিতাদের সঙ্গে এদের বড় একটা প্রভেদ থাকে না। লোটা নাগারা আরো এক কাঠি সরেশ। কোনো লোটা পুরুষ যখন বাটী থেকে অন্যত্র যায় তখন সে তার ভাইদের, তার অনুপস্থিতি কালে নিজ-পত্নীর পতিত্ব করবার অনুমতি দিয়ে ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। নাগাদের সমাজে প্রচলিত এ সমস্ত প্রথা অবশ্যই বর্বরোচিত এবং নিন্দনীয়, কিন্তু তাবলে একথা ভুললে চলবে না যে, এটা তাদের সমাজ-জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক মাত্র। এদের এমন অনেক সামাজিক সুপ্রথা আছে যা আমাদের অনুকরণযোগ্য। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নাগামেয়ের নাম অনন্তকাল স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান থাকবে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন দেশবাসীকে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হবার জন্যে ডাক দিলেন তখন সেই উদাত্ত আহ্বান উত্তরপূর্ব ভারতের সুদূরতম প্রান্তস্থিত নাগাপাহাড়ে একটি নাগা-তরুণীর কানে পৌঁছে তাকে দেশে মুক্তি-সংগ্রামে যথাসর্বস্ব,

এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত করে তুলল। নাম তার গুইদালো—আদিম রক্তে তার হিংসার বীজ, সংগ্রামে শত্রুক্ষয়ের উদগ্র উন্মাদনা। তাই মহাত্মাজীর অহিংসার আদর্শ হয়তো সে বোঝে নি, তবে এটুকু সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল যে, ইংরেজ-শাসকদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে তার মাতৃভূমির কল্যাণ নেই—তাই নাগা-অনুচরদের নিয়ে সে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজনে মেতে উঠেছিল। সেই প্রধূমিত বহ্নি পূর্ণতেজে প্রজ্বলিত হয়ে উঠবার আগেই কৌশলী ইংরেজ তা নির্বাপিত করতে সক্ষম হয়—রাণী গুইদালোর অদৃষ্টে জোটে দেশের মুক্তি-সাধনার চরম পুরস্কার—চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাবাস। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তাকে সাহায্য করার অপরাধে গুইদালোর অনুচর হাইদেও আর যতুনাংকে প্রকাশ্য ভাবে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

রাণী গুইদালোর প্রয়াস তখন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি বটে, কিন্তু সপ্তদশ বর্ষের কিঞ্চিদধিক কাল পরে আজ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—ইংরেজ শাসক-সাম্প্রদায় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। দেশের ভাগ্যবিধাতা এখন ইংরেজ নয়—দেশ—শাসনের ভার ন্যস্ত হয়েছে আজ দেশবাসীর হাতে। স্বাধীন ভারতে নাগাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি হবে সে বিষয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে **Naga Hili National Council.**-এর সেক্রেটারী টি সেখরির নিকট একখানা পত্র লিখেছিলেন। তাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন **"I entiroly agree with your decision that the Naga Hillls Should Constitutionally be included in an autonomous Assam in a free India with local autonomy and due safeguards for the interest of the Nagas."**

যে জাতির মধ্যে রাণী গুইদালোর মত দেশপ্রেমিকা বীরাঙ্গনার আবির্ভাব হয়েছে আজকের স্বাধীন ভারতে মহাজাতি গঠনের দিনে সেই নাগাদের প্রতি আমাদের মহান কর্তব্য ও গুরু-দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা যেন সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন থাকি।*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলি হাটনের বই থেকে গৃহীত।

সৌরতেজের উৎস

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

সূর্যই আমাদের জীবনের সম্পদ। আমরা প্রতিপলেই সূর্যের তেজের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে থাকি। সৌর তাপের দ্বারা সাগর পৃষ্ঠের জল বাষ্পাকারে কোনও উচ্চতর স্তরে সঞ্চিত হলে তাকে নিম্নাভিমুখী করে আমরা জল-শক্তি আহরণ করি। পৃথিবীর উদ্ভিদ্-গুলির সবুজ পাতার উপর সূর্যরশ্মি বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডের বর্তমানে পতিত হয়ে তাকে বিয়োজিত করে। তখন উদ্ভিদগুলি কার্বন আহরণ করে নেয়—আমরা বায়ুর ভিতর দিয়ে বাঁচবার উপাদান অম্লজান পাই। সূর্যালোক ছাড়া, তাই, অরণ্যরাজির অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। এমনকি কয়লা বা তৈলের খনিও সৃষ্টি হতো না। মোটের উপর সূর্য না থাকলে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রাণ-হীন জড়পিণ্ডের মত অবস্থান করত। তাহলে প্রাণচঞ্চল জীব ও উদ্ভিদ জগতের লীলা বৈচিত্র্যের কোনও সম্ভাবনাই আমরা দেখতে পেতাম না। এখন আমাদের এই পৃথিবীকে যে সূর্যরূপে রসে সঞ্জীবিত করে রেখেছে—তার তেজের উৎস কোথায় এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। আর এই তেজের পরিমাণই বা কত? সাধারণতঃ পদার্থ বিদ্যায় 'আর্গ' কে আমরা তেজের একক ধরে থাকি। এক গ্র্যাম ভরের কোনও বস্তু, এক সেকেণ্ড কালের মধ্যে এক সেন্টিমিটার স্থান চালিত হলে যে গতীয়শক্তি বা কাইনেটিক এনার্জির উদ্ভব হয় তারই দ্বিগুণ পরিমাপকে আমরা 'আর্গ' আখ্যা দিয়ে থাকি। আর্গের পরিমাণ এত অল্প যে, একটা মশক উড়ে চললে কয়েক আর্গ তেজের প্রয়োজন হয়। এক পেয়ালা চা গরম করতে কয়েক হাজার কোটী আর্গকে কাজে লাগাতে হয়। এক গ্র্যাম ভাল কয়লা পুড়লে প্রায় ৩০ হাজার কোটি আর্গ তেজ পেয়ে থাকি। এই রকম প্রায় ১৩৫০০০০ আর্গ সৌরতেজ প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রতিবর্গ সেন্টিমিটার স্থানের ওপর লম্বভাবে পতিত হয়। কিন্তু সৌর দেহ থেকে যে বিরাট তেজের বিকিরণ হচ্ছে তার সামান্য অংশই পৃথিবীর উপর এসে পড়ে আর অধিকাংশই অসীম নক্ষত্র জগতের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে বিকিরিত হয়ে যায়। এই তেজের মোট পরিমাণ হবে সেকেণ্ডে প্রায় $৩'৮ \times ১০^{৩৩}$ আর্গ। এই তেজকে সূর্যের পৃষ্ঠের পরিমাণ $৬'১ \times ১০^{২২}$ বর্গ সেন্টিমিটার দিয়ে বিভক্ত করলে আমরা দেখতে পাই, সূর্যের পৃষ্ঠের প্রতিবর্গ সেন্টিমিটার স্থান সেকেণ্ডে $৬'২ \times ১০^{১০}$ আর্গ তেজ বিকিরণ কচ্ছে। পার্থিব জগতে আমরা এই পরিমাণ তেজের অস্তিত্ব শুধু কল্পনাই করতে পারি, বাস্তব পরীক্ষাগারে পাওয়া সম্ভব নয়। তেজ বেশী হলে তাপমাত্রাও অধিকতর হয়। বিজ্ঞানীরা সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নির্ধারণ করেছেন প্রায় ৬০০০ সেন্টিগ্রেড। পৃষ্ঠদেশের এই পরিমাণ তাপমাত্রা বজায় রাখতে হলে সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা হবে প্রায় ২ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই রকম বিরাট তাপমাত্রায় সূর্যের সমগ্র দেহ অত্যুত্তপ্ত বায়ব অবস্থায় রয়েছে। আর এই বায়ব-দেহের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চাপ হবে প্রায় ১০০০ কোটি বায়ুমণ্ডল বা অ্যাটমোস্ফিয়ারের সমান। এইরূপ চাপের ফলে বায়ব অবস্থায় হলেও সৌরকেন্দ্রের ঘনত্ব পার্থিব বায়বের, এমনকি তরল ও কঠিন পদার্থের চাইতেও অনেক বেশী। কেন্দ্র থেকে সৌরপৃষ্ঠের দিকে যতই অগ্রসর হই—ততই

চাপ কমতে থাকে—ঘনত্বও যায় কমে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, সৌরদেহের গড় ঘনত্ব জলের চাইতে ১'৪১ গুণ বেশী।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন আমাদের বিশাল নক্ষত্র জগতে প্রায় ২ হাজার কোটি বৎসর পূর্বে নক্ষত্রগুলির জন্ম আরম্ভ হয়েছিল। তাই আমরা যদি সূর্যের বয়স অন্ততঃ ২ হাজার কোটি বৎসর ধরি তবে হিসাবে দেখা যায় আমাদের সূর্য আজ পর্যন্ত প্রায় ২'৪ × $১০^{৫০}$ আর্গ তেজ বিকিরণ করেছে অর্থাৎ সৌরদেহের প্রতি গ্র্যাম ভর থেকে ১'২ × $১০^{১৭}$ আর্গ তেজ নির্গত হয়েছে। কি বিরাট তেজ এই সূর্যের! কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে, এই বিশাল তেজের উৎস কোথায়।

আদিম মানুষের মনেও এই প্রশ্ন উঠেছিল একদিন। সে তার জ্বলন্ত উনুনের অনুরূপ ভেবেছিল সূর্যকে। সৌরদেহের কোন পদার্থের অবিরাম দহন দ্বারা সৌরতেজের উদ্ভব হচ্ছে এই ধারণা মানুষের মনে অনেকদিন বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু সাধারণ দহনক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে আমরা সৌরতেজের ব্যাখ্যা করতে পারি না। এক গ্র্যাম কয়লা পুড়ে আমরা ৩'$১০^{১১}$ আর্গ তেজ পাই—কিন্তু সৌরদেহের এক গ্র্যাম ভর থেকে আমরা এর চেয়ে প্রায় ৫০০০০০ গুণ বেশী তেজ পেয়ে থাকি। সৌরদেহ কয়লার মত দাহ্য পদার্থ দিয়ে গড়া হয়ে থাকলে বহু হাজার লক্ষ বৎসর পূর্বে সূর্য পুড়ে ভস্মে পরিণত হত। অন্য কোনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারাও এই তেজের উদ্ভব সম্ভব নয়। তাপের দ্বারা কাঠ পুড়ে কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হয় একথা আমরা জানি। কিন্তু সৌর দেহের তাপ এত বেশী যে, সেখানে কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব নয়। বর্ণালী বিশ্লেষণে সূর্যে কার্বন ও অক্সিজেন পাওয়া গেছে বটে; কিন্তু অত্যধিক তাপের জন্য সেখানে তারা কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে পারে না। অত্যধিক তাপে যেমন জলীয় বাষ্প হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিয়োজিত হয়, তেমন সূর্যদেহের বিরাট তাপের ফলে সেখানে মৌলিক পদার্থগুলি বায়বাকারে সাধারণ মিশ্রিত পদার্থরূপে অবস্থান কচ্ছে। এ থেকে কোনও দহন বা রাসায়নিক ক্রিয়া যে সৌরতেজের উৎস নয়, একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হল।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান পদার্থবিদ্ হেল্‌ম্‌হোৎজ সৌরতেজ সম্বন্ধে একটা নতুন মতবাদ খাড়া করলেন। তাঁর মতে একদা সূর্য তার বর্তমান রূপ থেকে বহুগুণ বৃহত্তর ব্যাস ও আয়তন নিয়ে একটা বিরাট শীতল বায়ব পিণ্ডের মত অবস্থান করছিল। তখন সেই দেহপিণ্ডের বিভিন্ন অংশে পরস্পর যে বিরাট মহাকর্ষ শক্তি বর্তমান ছিল তার সংগে ঐ দেহের অন্তর্নিহিত পাতলা ও অল্পতর চাপের বায়ব পদার্থ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। তাই সূর্য তার নিজের ওজনের ক্রিয়ায় ভিতরকার বায়ব পদার্থকে ঘনীভূত করে নিজের ওজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আয়তন সংকুচিত করতে আরম্ভ করল। চাপ বাড়িয়ে বায়ব পদার্থকে ঘনীভূত করলে তাপও বেড়ে যায়। সূর্যের ক্ষেত্রেও হল তাই। সূর্যের বাইরের স্তরের ওজনের সংগে ভারসাম্য রাখবার জন্য দেহের ভিতরে যতটা চাপের প্রয়োজন তাই সৃষ্টি করতে সূর্যের এই সংকোচন চলতে থাকল। এই রকম সংকোচনের ফলে একদিন বাইরের ও ভিতরের অবস্থার সাম্য আসতে পারত; কিন্তু সূর্যপৃষ্ঠ থেকে বহুলাংশে তেজ চতুঃস্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সেই ক্ষতিটুকু পূরণ করবার জন্য সৌরদেহের আরও সংকোচনের প্রয়োজন হয়। হেল্‌ম্‌হোৎজের মতে সৌরদেহের এখনও সংকোচন হচ্ছে। এবং এই সংকোচনের ফলে যে মহাকর্ষ তেজ উন্মুক্ত হচ্ছে তাকেই আমরা সৌরতেজরূপে পাচ্ছি। মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান সূর্য্যের তীব্রতায় প্রতি শতাব্দীতে সৌরব্যাসার্ধের শতকরা '০০০৩ ভাগ অথবা ২কিলো-

মিটার সংকোচন প্রয়োজন। অবশ্য সৌর আয়তনের এই পরিবর্তন মানুষের ইতিহাসের সমগ্র কালের মধ্যেও ধরাপড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে অধুনা এই মতবাদ খাটে না। আদিম সূর্যের আয়তন যদি অসীমও ধরা যায়, তবে বর্তমান আকারে আজ পর্যন্ত তার সংকোচনের ফলে ২০×১০^{১৭} আর্গ তেজের উদ্ভব হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমাদের হিসাবে আজ পর্যন্ত প্রায় যে $২·৪ \times ১০^{৫০}$ আর্গ সৌরতেজের বিকিরণ তার সঙ্গে এই অংক মিলে না। এতে প্রায় হাজার গুণ তেজ কমতি পড়ে। তাহলেও আমরা হেল্‌ম্‌-হোংজের মতবাদকে মেনে নিতে পারি। সূর্যের আদিম অবস্থায় হয়ত এই মতবাদ কাজে লাগতে পারে কিন্তু সূর্যের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে, মহাকর্ষ শক্তিও সৌরতেজের উৎস নয়।

বিংশ শতাব্দীর উন্নততর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংগে সংগে আমরা সৌরতেজ সম্বন্ধে নূতন আলো পেয়েছি। তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থের পরমাণুর ভিতর প্রচুর তেজ নিবদ্ধ রয়েছে। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি সাধারণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রীণ থেকে আমরা এই রকম তেজ স্বতঃই পেয়ে থাকি। পরমাণুর কেন্দ্রে নিবদ্ধ এই তেজই যে সৌরতেজের উৎস এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানীরা এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সৌরদেহে সাধারণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ খুব বেশী নেই, তাই সেখানে সাধারণ মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভাঙাগড়া চলেছে। তারই ফলে বিশাল তেজের উদ্ভব হচ্ছে। আমাদের পার্থিব জগতের রাসায়নিক ক্রিয়ার মত, সেখানে মৌলিক পদার্থের পরস্পর রূপান্তরও স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। এ রকম রূপান্তর কি করে সম্ভব হচ্ছে তার উত্তর পেতে হলে সৌরদেহের পরিবেশের কথা ভাবতে হবে। সেখানে অত্যধিক তাপ মাত্রার ফলে এরূপ রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে। কয়েক শত ডিগ্রী তাপ মাত্রায় কয়লা যেমন দগ্ধ হয়ে মৌলিক পদার্থে বিয়োজিত হয় তেমনি বহুলক্ষ ডিগ্রী তাপ মাত্রায় পরমাণু-কেন্দ্রীন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতি মূল বস্তুকণায় বিশ্লিষ্ট হয়ে কেন্দ্রীনের তেজ-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। পরমাণু-কেন্দ্রীনের উপর তাপের এই বিশিষ্ট ক্রিয়াকে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ানামে অভিহিত করা হয়। ১৯২৯ খৃঃ অ্যাট্‌কিন্‌সন ও হাউটারম্যান্‌ নামক বিজ্ঞানীদ্বয় এই ক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। সাধারণতঃ আমরা কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীন চূর্ণ করবার জন্য কোন প্রোজেক্‌টাইল, যথা—নিউট্রন বা অন্য কোন অতিভেদক বস্তুকণা ঐ পদার্থ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করি; তেমনি সৌরদেহের অন্তর্বর্তী অত্যুচ্চ তাপমাত্রার জন্য সেখানে তাপোদ্ভূত গতির কাইনেটিক এনার্জি এতবেশী হয় যে, অনিয়মিত ভ্রাম্যমান বস্তুকণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, ফলে কেন্দ্রীনগুলি ভেঙে পড়ে। আমাদের পরীক্ষাগারে মৌলিক পদার্থের রূপান্তরের জন্য $১০^{-৮}$ আর্গ গতীয়শক্তির দরকার হয়। ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রায় সৌরদেহে যে তাপসম্ভূত গতীয়শক্তি পাওয়া যায় তাও এর কাছাকাছি, প্রায় ৫×১০^{-৯} আর্গ। বিজ্ঞানী গ্যামোর ভাষায় বলতে গেলে সাধারণ পরমাণু চূর্ণীকরণ হচ্ছে বিরাট একদল মানুষের ওপর সারিবদ্ধ একদল সৈনিকের সঙীন আক্রমণ আর তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া হচ্ছে কলহপ্রিয় উত্তেজিত এক জনতার প্রত্যেক অংশে এককালীন হাতাহাতি যুদ্ধ। এইরকম উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের অণু বা পরমাণুরূপ বর্তমান থাকেনা। এথেকে অনেক কম তাপমাত্রায়ও পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন সেখানে থাকে ইলেকট্রন-খোলস-মুক্ত অনিয়মিত ভ্রাম্যমান কতকগুলি কেন্দ্রীনের মিশ্রণ আর তাদের মাঝখানে বন্ধনহীন ইলেকট্রন-গুলি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রনরূপ রক্ষাকবচ থাকেনা বলে কেন্দ্রীনগুলির

পরস্পর সংঘর্ষ হয় ভয়ংকরভাবে। সাধারণ পরমাণু চূর্ণীকরণে প্রোজেকটাইলগুলি কতকাংশে পরমাণুর বহিঃস্তরের ইলেকট্রনগুলিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ায় কেন্দ্রীন চূর্ণীকরণ ক্রমশঃ বেশী কার্যকরী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—আমরা লিথিয়াম ও হাইড্রোজেনের একটি মিশ্রণকে যদি প্রয়োজনমত তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করি, যার ফলে তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া আরম্ভ হবে, তাহলে সমস্ত কেন্দ্রীনগুলি হিলিয়ামে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এই ক্রিয়া থামবে না। এই ক্রিয়া আরম্ভ হলেই যে পরমাণবিক তেজের উদ্ভব হবে, সেই তেজই এই ক্রিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলবার উপযুক্ত তাপ যোগাবে। তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া আরম্ভ করবার মত তাপমাত্রাটাই আমাদের যোগান দিতে হবে।

আমাদের পরীক্ষাগারে কয়েক হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রায় যে তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া সম্ভব হতে পারে তাতে কতকগুলি হাল্কা কেন্দ্রীন থেকে অল্প পরমানবিক তেজ পাওয়া যাবে, যা কোনও কাজে লাগে না। সৌরতেজের মত বিশাল তেজের সৃষ্টি করতে হলে যে তাপমাত্রা প্রয়োজন, তা সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এরূপ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এরূপ কোন উপাদানও আমাদের হাতে নেই, যার দ্বারা এই তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ার চুল্লী তৈরী হ'তে পারে; কারণ এই তাপমাত্রায় কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুই স্বরূপে থাকতে পারেনা। কিন্তু সৌরদেহে এরূপ ক্রিয়ার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে। বায়ব দেওয়াল দ্বারা আবৃত সূর্য স্বভাবতই উচ্চতাপ সহনশীল চুল্লীর কাজ করে। তার বাইরের স্তরগুলি পারস্পরিক মহাকর্ষ আকর্ষণের বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে না। তাই সৌরকেন্দ্রে তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া সহজেই চলতে পারে। সৌরদেহে এই ক্রিয়া আরম্ভ করবার মত তাপমাত্রা সৃষ্টি হল কি করে, এই প্রশ্ন উপস্থিত হলে আমাদিগকে পূর্বকথিত হেল্ম্‌হোৎজের মতবাদে ফিরে যেতে হবে। সূর্য অপেক্ষাকৃত শীতল এক বায়বপিণ্ড নিয়ে আরম্ভ করেছিল তার জীবন। মহাকর্ষজনিত সংকোচনের ফলে তার কেন্দ্রীয় উত্তাপ বেড়ে চলল। তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া আরম্ভ করবার মত তাপমাত্রা যখনই সৃষ্টি হল তখনই উদ্ভব হল পরমাণবিক তেজের। সৌরদেহের সংকোচন তখনই গেল থেমে। এই নবোদ্ভূত তেজই তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়াকে অবিচ্ছিন্নভাবে চালু রেখে সূর্যকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। সূর্যদেহের বাইরের স্তরগুলিও সৌরকেন্দ্রের তাপ বজায় রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। যদি কোনও কারণে সৌরকেন্দ্রে তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ার হার কমে যায়, তখনই সৌরদেহের সংকোচন আবার আরম্ভ হবে। ফলে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে গিয়ে তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ার হারকে সেই নির্দিষ্ট মানে বাড়িয়ে তুলবে। আবার যদি কখনও সৌরকেন্দ্রের এই ক্রিয়ার হার প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায় তবে সৌরদেহ প্রসারিত হয়ে কেন্দ্রের তাপ কমিয়ে দেবে। এইসব দিক বিবেচনা করলে সূর্যকে তাপ কেন্দ্রীনক্রিয়ার যোগ্যতম যন্ত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এখন সৌরকেন্দ্রে কোন পদার্থের দ্বারা কি প্রক্রিয়ায় এই তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া চলে, বিজ্ঞানী বেটে ও ওয়াইজস্যাকার প্রদত্ত নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়:—

$${}_{6}C^{12} + {}_{1}H^{1} \geqslant {}_{7}N^{13} + \text{গামারশ্মি}$$

$${}_{7}N^{13} \geqslant {}_{6}C^{13} + \overset{+}{e} \text{ (পজিট্রন)}$$

$${}_{6}C^{13} + {}_{1}H^{1} \geqslant {}_{7}N^{14} + \text{গামারশ্মি}$$

$${}_{7}N^{14} + {}_{1}H^{1} \geqslant {}_{8}O^{15} + \text{গামারশ্মি}$$

$${}_{8}O^{15} \geqslant {}_{7}N^{15} + \overset{+}{e} \text{ (পজিট্রন)}$$

$${}_{7}N^{15} + {}_{1}H^{1} \rightarrow {}_{6}C^{12} + {}_{2}He^{4}$$
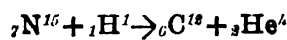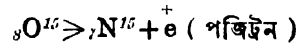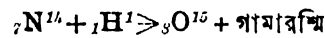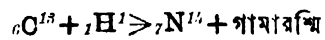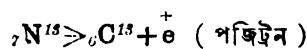
এই প্রতিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথমেই দেখতে পাই যে, এই প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। সৌরদেহের সাধারণ কার্বন তাপীয়

হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন প্রোটন রূপ প্রোজেক্টাইল দ্বারা চূর্ণিত হয়ে নাইট্রোজেনের অস্থায়ী সমস্থানিক বা আইসোটোপ N^{13}-এ রূপান্তরিত হয় ও সংগে সংগে কিছুটা গামারশ্মি তেজরূপে বিকিরণ করে। অস্থায়ী N^{13} আবার আপনা আপনি কার্বন সমস্থানিক C^{13} ও ও পজিট্রন নামক ক্ষুদ্রতম ধন বিদ্যুত কণায় পরিণত হয়। C^{13} এর কেন্দ্রীন আবার প্রোটন দ্বারা আহত হলে আমরা সাধারণ নাইট্রোজেন N^{14} ও কিছুটা গামারশ্মি পাই। N^{14} এর ওপর আবার তাপীয় প্রোটনের ক্রিয়ার ফলে অস্থায়ী অক্সিজেন সমস্থানিক O^{15} ও গামারশ্মির উদ্ভব হয়। O^{15} সঙ্গে সঙ্গেই নাইট্রোজেনের সমস্থানিক N^{15} ও পজিট্রনে বিয়োজিত হয়ে পড়ে। N^{15} এর ওপর আবার একটি তাপীয় প্রোটনের ক্রিয়ার ফলে আমরা হিলিয়াম ও সেই পূর্বেকার C^{12} ফিরে পাই। কার্বন বা নাইট্রোজেন যে কোন মৌলিক পদার্থ থেকে আরম্ভ করে আমরা একই পরিণামে পর্যায়-ক্রমে ফিরে আসি। ফলে দেখতে পাচ্ছি যে, তেজ উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্বন ও নাইট্রোজেন অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসছে। কিন্তু যে চারটি প্রোটনকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের আর অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাচ্ছি না। তারা স্থায়ী ভাবে হিলিয়াম আর পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নাইট্রোজেন বা কার্বন শুধু অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্টের কাজ করছে মাত্র—কেবল প্রোটন বা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনই নিজের বিনিময়ে সৌরতেজের সৃষ্টি করছে। সৌরদেহে প্রচুর হাইড্রোজেন থাকলে কার্বন বা নাইট্রোজেনের অনুপাতের ওপরই এই প্রতিক্রিয়াগুলির হার নির্ভর করবে। সূর্যে শত করা একভাগ নাইট্রোজেন বা কার্বন আছে। সৌর কেন্দ্রের ২ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপমাত্রায় এই পরিমাণ কার্বন বা নাইট্রোজেন বর্তমানে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াগুলি দ্বারা আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ তেজের উদ্ভব হওয়া সম্ভব তার সঙ্গে বাস্তবে যে সৌরতেজ আমরা পেয়েছি তা পরস্পর মিলে যায়। তাই বৈজ্ঞানিক বেটের এই সমাধানটি সর্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, সৌরকেন্দ্রে কার্বন বা নাইট্রোজেন থেকে এই প্রতি-ক্রিয়া একবার আরম্ভ হয়ে শেষ হতে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর লাগে। এই সময়ের মধ্যে সূর্যদেহে কিছুটা হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয় মাত্র। কিন্তু অবিরাম যদি সূর্যস্থিত হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যেতে থাকে তবে একদিন তার সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়া তো অসম্ভব নয়! বিজ্ঞানীরা সূর্যের সেই দুর্দিনের কথা ভেবেছেন। সাধারণ মানুষের অবশ্য চিন্তার কোনও কারণ নেই, কেন না এই হাইড্রোজেন ফুরিয়ে সূর্যের তথা পৃথিবীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে কোটি কোটি বছর লেগে যাবে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে সূর্যের তেজোময় দেহ শীতল জড়পিণ্ডে পরিণত হবে। তবে হাইড্রোজেন কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তেজও ক্রমশঃ কমে যাবে। বিজ্ঞানী গ্যামো দেখিয়েছেন যে, তা নয়; বরং বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হবে। হাইড্রোজেন যতই কমতে থাকবে, সূর্যের তেজ ততই বেড়ে চলবে। কারণ হাইড্রোজেন ক্রমশঃ হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলে হিলিয়াম সৌরকেন্দ্রের ঘনত্ব ও তাপমাত্রার দরুণ হাইড্রোজেন থেকে বেশী অস্বচ্ছ বলে সৌরকেন্দ্র থেকে সৌরপৃষ্ঠে তেজ বেরিয়ে আসতে হিলিয়াম্ অধিকতর বাধা দেবে। ফলে সৌরকেন্দ্রে তেজ অধিকতর ঘনী-ভূত হয়ে সেখানে তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলবে। হিলি-য়ামের পরিমাণ যতই বাড়বে সৌরকেন্দ্রের তেজ ও তাপমাত্রা ততই বেড়ে চলবে। সূর্যের ব্যাসার্ধও কিছুটা বেড়ে গিয়ে আবার কমতে আরম্ভ করবে। তখন আমাদের পৃথিবীর জীবজগতের মধ্যে আসবে বিপর্যয়। সৌরতেজের সেই বিরাট তাপমাত্রা সহ্য করবার মত ক্ষমতা থাকবে না প্রাণীদের। ধীরে ধীরে জীবজগৎ লুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবী সৌর-জগতের একপাশে পড়ে থাকবে জড়পিণ্ডের মত। আর সূর্য্য? হাইড্রোজেন যতদিন না ফুরোয় সূর্যের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা বেড়েই চলবে। কিন্তু হাইড্রোজেন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেলে সূর্য ফিরে পাবে তার সেই আদিম শীতল দেহ পিণ্ড। মহাকর্ষজনিত তেজের ফলে হয়ত আরও কিছুদিন সূর্য দীপ্তিমান থাকতে পারে। কিন্তু তার পর? তারপর তার জীবনে ঘনিয়ে আসবে অখণ্ড অন্ধকার। সূর্যের যৌবনোচ্ছল জীবন ও দীপ্তির ঘটবে সুচির পরিসমাপ্তি।

মেণ্ডেল ও তাঁর মতবাদ

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

গত শতাব্দীতে জীববিদ্যায় যুগান্তর এনেছিলেন এক মহাপুরুষ—নাম তাঁর গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল।

অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত 'হাইন্‌ত্‌মেনডর্ফ'-এর একটি কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি গ্রহণ করবার পর অগষ্টীয় পর্যায়ে যোগদান করে ভিয়েনার নিকটবর্তী 'ব্রুণ'র মঠে তিনি চলে যান। এখানে শেষ পর্যন্ত তিনি মঠাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। তাঁর গবেষণার কাজও তিনি চালান এখানেই, যার উপর ভিত্তি করে' সৃষ্টি হয় তাঁর মতবাদের। তাঁর জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল উঁচু প্রাচীর ঘেরা সামান্য জায়গাটুকুর ভিতর। পুরোনো সহরটির অধিবাসীদের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ ছিল পুরোপুরি ধর্ম এবং ঐ জাতীয় বিষয়ের।

ইউরোপে সে সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে একটা যেন উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। ফ্রান্সে 'পাস্তর' তার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, স্কটল্যাণ্ডে 'লিষ্টার' মানবিক কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করছেন, আর ইংলণ্ডে 'ডারউইন' চেষ্টা করছেন তার ক্রম-বিবর্তনের বজ্রপাত করবার।

এ সমস্তই যদিও মেণ্ডেলের খুব কাছেই হচ্ছিল তবুও তিনি এর কোন খবরই পান নাই। কারণ, প্রথমতঃ ব্রুণ সহরের সঙ্গে এই বিরাট বিশ্বের বিশেষ কোনই যোগাযোগ তখনকার কালে ছিল না এবং তাঁর মঠের কাজের জন্য ব্রুণ সহর থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিজ্ঞানী বন্ধু যা ডারউইন, পাস্তর এবং লিষ্টারের নিকট খুব মূল্যবান ছিল তা মেণ্ডেলের মোটেই ছিল না। জানবার প্রবল আকাজ্ঞা যাঁদের আছে তাঁরা এরকম দুরবস্থায় খুব কমই পুড়ে থাকেন।

গ্রেগর ছিলেন কৃষকের সন্তান। অর্থাৎ এমন একটি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা জীবনপাত করত কোন কিছু ফলাবার চেষ্টা করেই। জীবনের প্রথম প্রভাতে তাই মেণ্ডেলকে কাঠের লাঙ্গল দিয়ে চাষ-আবাদ করে নিজ হাতেই মাঠে বীজ বপন করতে হয়েছে। ক্ষেতে বীজ বপন করে তিনি দেখেছেন যে, বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সৃষ্টি করে ছোট চারার এবং এরাই বড় হয়ে শাখায় ফুল ফোটায় এবং তাথেকেই সৃষ্টি হয় ফলের। ক্ষেতের ফসল পাকলেই তাকে তুলতে হয় ঘরে। এই সব দেখে মেণ্ডেলের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জেগেছিল—তাইত গম থেকে গমেরই সৃষ্টি কেন হয়, এবং কেনই বা মটর শুঁটি থেকে মটর শুঁটির সৃষ্টি হয়?

ডারউইন তাঁর একটি মতবাদ প্রমাণ করবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য পাঁচ বৎসর ধরে গোটা পৃথিবীটাই হাতড়ে বেড়িয়েছিলেন। মেণ্ডেল এসব কিছুই করতে পারেন নি; কিন্তু এই জাতীয় খুটিনাটি অসুবিধা তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি এবং যে সব সুযোগসুবিধা তিনি পেয়েছিলেন তারই যথাযোগ্য ব্যবহার তিনি করেছিলেন। তাঁর হাতকয়েক জমির তিনি এমন সুব্যবহার করেন যে, ডারউইনের 'প্রাকৃতিক মনোনয়ন' বাদকে ধ্বংস করতে অনেক দূর তিনি এগিয়ে যান। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে ডারউইন কিরকম অবাকই না হতেন যদি তিনি জানতেন যে, ব্রুণ'র মত ক্ষুদ্র সহরের অজানা এক ধর্মযাজক তাঁর এই বিরাট গবেষণার ভিত্তি সরিয়ে ফেলার জন্য কাজে ব্যস্ত।

তাঁর জানবার আকাঙ্খা ছিল অদম্য এবং তাঁর ঐ গণ্ডীর ভিতর থেকে কোনো কিছু জানতে হলে

পরীক্ষা করে প্রশ্নের মীমাংসা করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায়ই ছিল না। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কায়দাকানুনও তাঁর তেমন রপ্ত ছিল না, যে জন্য গোড়া থেকে তাঁকে কাজ সুরু করতে হয়েছিল।

তাঁর প্রশ্ন ছিল:—যদি দুটি উপজাতিকে পরস্পর প্রজনন করানো যায় তবে তাদের ফলাফল কি হবে। পরীক্ষার গাছগুলি থেকে পোকা মাকড়কে তফাৎ রাখবার জন্য তাঁকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হত এবং নানান উপসর্গের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যে বিশেষ প্রকৃতিটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন শুধু—সেই দিকেই দৃষ্টি রাখতেন। সাধারণ মটর-শুঁটির লম্বা এবং বেঁটে উপজাতিকে নিয়ে প্রজনন করালেন ঐ একটি প্রকৃতির ফলাফল নির্বাচনের জন্যই। তৃতীয় পুরুষের ফলাফল দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি নূতন করে পরীক্ষা করলেন লাল অথবা সাদা ফুল, হলুদ অথবা সবুজ বীজ, এবং সমান ও অসমান বীজ নিয়ে।

প্রতিবারেই ফলাফল হতে লাগল একই। শেষকালে এমন হোলো যে, তিনি নির্ভুল গাণিতিক নিয়মে গণনা করে বলতে পারতেন তৃতীয় পুরুষের ফলাফল। কিন্তু মেণ্ডেল ছিলেন খুব সাবধানী এবং আট বৎসর ধরে তিনি পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর গাছগুলির উপর, কোনবার এদিক দিয়ে কোনবার বা ওদিক দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করে যেতে লাগলেন তাঁর পরীক্ষার ফলাফল, যতদিন না বুঝতে পারলেন যে, একটি 'প্রাকৃতিক বিধানে'র সংস্পর্শে তিনি এসেছেন।

এবার তিনি তাঁর পরীক্ষা এবং তারই আশ্চর্য ফলাফলের একটি ছোটখাট সত্য বিবরণ রচনা করলেন। লায়েল ও ডারুইন, হাক্সলি ও স্পেনসার প্রভৃতির সবগুলি খণ্ড একত্রিত করলে যেমন হবে তার চাইতেও অনেক বেশী পরিমাণে ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গকারী এই প্রবন্ধটি অলক্ষিতে প্রকাশিত হোলো ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্রুণ'র প্রাকৃতিক ইতিহাস সভার কার্য-বিবরণীতে।

যাই হোক, এই প্রবন্ধটি যখন বের হোলো তখন তেমন কোন ঘটনাই ঘটল না। ব্রুণ সহরটি ছিল চলতি পথের বাইরে, এবং এর প্রাকৃতিক ইতিহাস সভার সভ্যরা ছিলেন অজানা লোক—যারা শেষ পর্যন্তও অজানাই রয়ে গেলেন। এরা ছিলেন সহরতলীর পেশাদার এবং ব্যবসায়ী লোক এবং সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন বিজ্ঞানের সাধারণ সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য। মেণ্ডেলের প্রবন্ধ পড়বার উপযুক্ত কেউই তাঁদের ভিতর ছিলেন না, যিনি পড়ে বুঝতে পারতেন যে, তার হাতের প্রবন্ধটি অতি উচ্চ:শ্রেণীর এবং যুগান্তর আনয়নকারী।

এই প্রবন্ধের কোন কথাই ব্রুণ সহরের বাইরে যেতে পারলনা এবং মেণ্ডেল আশার স্বপ্নে বাগানে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন, বাইরের বিজ্ঞান জগতের কারুর কাছে থেকে কোন রকম সাড়া পাবার আশায় বুক বেঁধে। কিন্তু তারপর ১৭ বৎসর ধরে এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কারুর কাছে থেকেই ডাক তিনি পেলেন না এবং মেণ্ডেল তাঁর মঠের অধ্যক্ষ হবার পর দেহত্যাগ করলেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে।

কেউ জানেনা এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর কোন কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং কি পরীক্ষাই বা তিনি করেছেন। তিনি তাঁর একটা কাজের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় কেউই তার কোন খোঁজ করল না আর কোন প্রচেষ্টাই তিনি পুনর্বার করলেন না। ভাগ্যক্রমে তার বাণীর স্থৈর্যাসিটা রয়ে গেল যা কোনক্রমে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না। ব্রুণ'র প্রাকৃতিক ইতিহাস সভা এই প্রবন্ধটিকে একটি স্থায়ী আকার অন্ততঃ পক্ষে দিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন ক্রমবিবর্তন বাদকে আলোক দান করবার জন্য এবং এই

ভাবেই তাঁরা ধূলিধূসরিত এই পত্রিকা হাতে পেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এরই মধ্যে আছে শক্তিশালী স্থির আলো যা আলোকময় করেছে জীবনের রহস্যময় বনানী। সবাই যখন বুঝলেন যে, একটি মহাপুরুষের বিরাট কাজের সংস্পর্শে তাঁরা এসেছেন অমনি পৃথিবীর সকল দিকে সকল প্রান্তে মেণ্ডেলের আবিষ্কারের জয় ঘোষণা তাঁরা করলেন। নিরালায় ব্রুন'র সমাধি-ক্ষেত্রে ঘুমিয়ে থেকে ৩৫ বৎসর পর মেণ্ডেল এইভাবে যশের উচ্চশিখরে স্থান পেলেন।

বিজ্ঞানের সমস্ত ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। তার উপর বিশেষ করে আরও একটা বিষয় মেণ্ডেলের স্থান অনন্যসাধারণ করে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই—প্রবন্ধটি যদিও ৩৫ বৎসরের পুরানো তবুও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন তাকে পাওয়া যায় বিজ্ঞান-জগৎ তাকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে এগিয়ে যেতে পারছিলো না। মেণ্ডেল যতটা এগিয়েছিলেন শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের ততটা এগিয়ে যাবার সকল প্রচেষ্টাই এতকাল ব্যর্থ হয়েছে। এবার পৃথিবীর সকল প্রান্তে বহুছাত্র মেণ্ডেলের বিধান পরীক্ষা করে দেখল, মেণ্ডেল তত্ত্বের সত্য নিরূপণের জন্য এবং প্রতিবারেই তারা দেখতে পেল মেণ্ডেল সব বিষয়ে সঠিক তত্ত্বই লিপিবদ্ধ করেছেন। অশীতি বর্ষ পরে আজও মেণ্ডেলবাদ দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ় ভিত্তির উপর, জীববিদ্যায় নানান জাতীয় গবেষণার ফলস্বরূপ।

মেণ্ডেল তাঁর ছোট্ট বাগানটিতে খাবার মটর-শুঁটি এবং মিষ্টি মটরশুঁটির চাষ করতে অনেক সময় অতিবাহিত করতেন এবং প্রায় ১০,০০০ গাছের সকল বিষয়ের সঠিক খবর লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, যেখানে জন্মদাতা গাছের ভিতরে অমিল খুব বেশী যেমন 'লম্বা' এবং বেঁটে' গাছ সেখানে তাদের পরস্পর প্রজননের ফলে সৃষ্ট প্রথম পুরুষের বাহ্যতঃ কোন অমিল থাকেনা এবং সমস্ত গাছগুলিই লম্বা হয়ে থাকে। পিতা কিংবা মাতার স্বকীয় বিশেষত্ব সন্তানে সঞ্চারের পরম্পরাপেক্ষা এই প্রকার শক্তির আবিক্যের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'প্রবল' অথবা 'প্রকাশ্য-প্রকৃতি-নির্দেশক' এবং অপরটির নাম 'অপ্রকাশ্য'। বেঁটে এবং লম্বা গাছের প্রজন-নের ফলে সৃষ্ট প্রথম সংকর পুরুষের সবগুলি গাছই লম্বা হল। এইগুলিকে স্বনিষেক করার ফলে যে বীজ পাওয়া গেল তাদের দ্বারা সৃষ্ট গাছগুলির মধ্যে যতগুলি বেঁটে গাছ পাওয়া গেল তার ঠিক তিন গুণ পাওয়া গেল লম্বা গাছ। তিনি ধরে নেন যে—বীজগুলির মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম পদার্থ ছিল যা দীর্ঘত্ব এবং খর্বত্বের প্রকৃতি নির্দেশ করে এবং এই ভাবেই তিনি তাঁর ফলাঃ ফলের ব্যাখ্যা করেন। জন্মদাতা অমিশ্র বেঁটে গাছটির রেণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে বেঁটে হবার সূক্ষ্ম পদার্থই বর্তমান। কিন্তু অমিশ্র লম্বা গাছগুলিতে শুধুমাত্র লম্বা গুণটিই থাকে। আমরা যখন বেঁটে এবং লম্বা পরস্পর প্রজনন করাই লম্বার ডিম্বা-ণুকে বেঁটের রেণু দিয়ে নিষিক্ত করে অথবা বিপরীত ভাবে, তখন তাদের সন্তানসন্ততি সমস্তই লম্বা হয়ে থাকে, যদিও তাদের কোষ বেঁটে এবং লম্বা উভয় গুণই বহন করে। অথচ, যখন পরাগকোষ এবং ডিম্বাণু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রক্রিয়া এদের একটি গুণ পরিত্যাগ করে, যার জন্যে অর্ধেক রেণু বহন করে লম্বা গুণটি এবং অপরার্ধ বেঁটে গুণটি বহন করে। ডিম্বাণুর বেলায়ও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। ডিম্ব-নিষেকের ফলে সূক্ষ্ম পদার্থগুলির যোগাযোগ যেভাবে হয় তাহচ্ছে :—

বেঁটে, বেঁটে : বেঁটে, লম্বা : লম্বা, বেঁটে : লম্বা, লম্বা : অর্থাৎ, বেঁটে এবং লম্বার যোগাযোগের ফলে যখন সৃষ্টি হয় লম্বা সংকরের, তখন মোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশ হবে 'বেঁটে' এবং বাকী তিন চতুর্থাংশ হবে 'লম্বা'।

স্বভাবতঃ প্রজনন পদ্ধতি মাত্রেই মোটেও সহজ ছিলনা কোন সময়েই, যেহেতু প্রকাশ পেতে পারে নানান প্রকৃতি যাদের তাড়ানর দরকার হয় প্রজননের সাহায্য নিয়েই। এবং যেখানে পূর্ববর্তী প্রজননকারীরা বাধ্য হত অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে কাজ করতে। সেদিক দিকে 'মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব' তাদের তবু একটা পথনির্দেশ করেছে এবং মেণ্ডেলবাদ যে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক

গবেষণার একটি সর্বপ্রধান আবিষ্কার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাকৃতিক বিশেষত্বের এক জোড়া করে নিয়ে যেমন 'দীর্ঘত্ব' ও 'খর্বত্ব', লালফুল ও সাদাফুল, হলুদ বীজ ও সবুজ বীজ, সমান এবং অসমান শুঁটি, মেণ্ডেল রচনা করেন তাঁর 'প্রথম বিধান' অথবা, জম্পতীর অর্থাৎ 'গ্যামিটে'র অমিশ্রতার বিধান', যাতে তিনি বলেন যে, যে কোন 'জম্পতী' অর্থাৎ প্রজনক কোষ, পুরুষ অথবা স্ত্রী, 'খর্বত্ব', 'সবুজ' অথবা 'হলুদ' বীজের সঙ্গে মিলিত হতে পারতো। আধুনিক গবেষকরা এই 'দ্বিতীয় বিধান''এর অনেক ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছেন এবং কতকগুলি বিশেষত্বের দলবদ্ধ ভাবে সঞ্চার প্রমাণ করেছেন। ঐ সমস্ত 'সংযুক্ত'. বিশেষত্ব কচিৎ বিচ্ছেদ্য। মেণ্ডেলের এই বিধানের আরও অনেকগুলি গোলোযোগ আছে যা আজকাল নিত্য নূতন গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারছি।
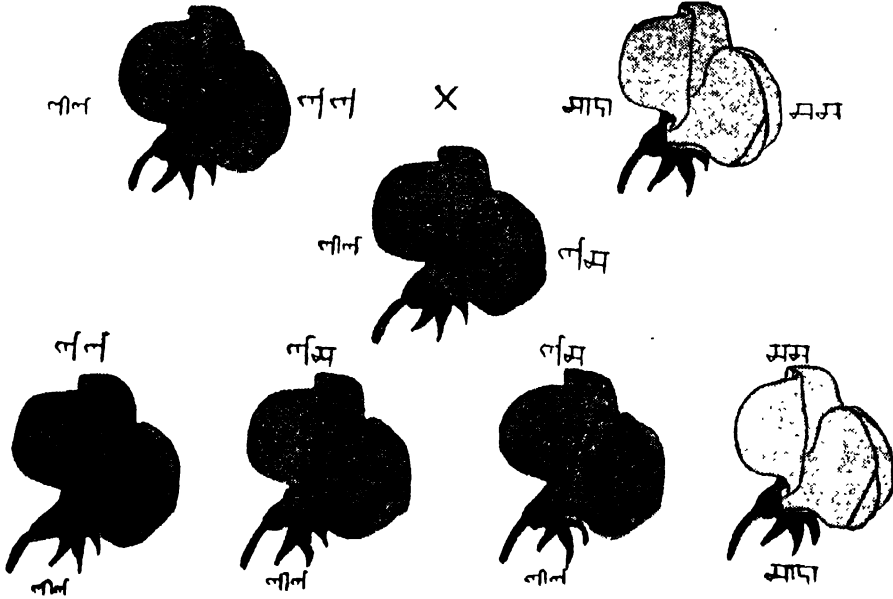
প্রথম চিত্র : মিষ্টি মটরশুঁটির পুষ্পবর্ণ সংরোধনকারী এক জোড়া বিশেষত্বের (**ল** এবং **স**) উত্তরাধিকার এবং তাহার প্রকাশ চিত্রে দেখান হইয়াছে। লাল এবং সাদা ফুলওয়ালা গাছের প্রজননের ফলে সৃষ্ট প্রথম সংকর পুরুষের সবগুলি গাছেরই ফুল লাল; লালবর্ণ এখানে সম্পূর্ণ প্রবল প্রকৃতি-নির্দেশক' ভাবে প্রকাশিত। লাল সংকর স্বনিষেক করার ফলে পরবর্তী পুরুষের তিনচতুর্থাংশ হবে লাল এবং এক-চতুর্থাংশ হবে সাদা।

যেকোন একজোড়া বৈকল্পিক বিশেষত্বের কেবল মাত্র একটি প্রকাশককে বহন করতে পারে।

এরপর মেণ্ডেল পরীক্ষা করলেন উত্তরাধিকার-সূত্রে দুই জোড়া বিশেষত্ব পাবার বিষয়ে। যেমন তিনি পরাগ-নিষিক্ত করলেন একটি 'লম্বা, হলুদ বীজওয়ালা গাছকে একটি বেঁটে সবুজ বীজওয়ালা' দ্বারা। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর 'দ্বিতীয় বিধান' বা 'অবাধ শ্রেণীবিভাগের বিধান'। এই বিধান অনুযায়ী বিশেষত্বগুলি অবাধে শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে থাকে, এবং সেই জন্যই 'দীর্ঘত্ব' বা

মেণ্ডেলীয় উত্তরাধিকার-সূত্রের জ্ঞানের কিন্তু অর্থনৈতিক মূল্য খুব বেশী, উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজননের ব্যাপারে। প্রাণীজগতে কোন বিশেষ রোগ থেকে মুক্ত থাকা, পাখীদের বেশী ডিম পাড়বার ক্ষমতা, ভাল দুগ্ধবতী গাভী সৃষ্টি করা, ধান, পাট, আলু গম ইত্যাদির উন্নয়ন ও রোগ থেকে রক্ষা পাবার ক্ষমতা, তুষারাক্রান্ত অথবা বর্ষাপ্লাবিত দেশগুলির ফসল আগে পাকবার ক্ষমতা ইত্যাদি সবই মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রজননের ফলস্বরূপ।

রসায়নের গোড়ার কথা

শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত

মানব সভ্যতার খাতা খতিয়ে দেখলে খোঁজ পাওয়া যায়, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সুরু হয়েছিলো এদেশেই। জিজ্ঞাসার চিহ্ন বুকে এঁটে জন্ম নিয়েছিলো সে। জ্ঞানবৃক্ষের ফলে প্রথম কামড় দিয়েই মানুষ তার সত্বাকে প্রশ্ন করেছিলো 'কে তুমি, কে তোমার সৃষ্টিকর্তা, কি হেতু তোমার উদ্ভব'। সে প্রশ্নের জবাব কতদূর মিলেছে কেবল ইতিহাসই তার নজীর দিতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কল্পনা করেছেন পরমেশ্বরকে অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সর্বতোএব সর্বরূপে। তাঁকে তাঁরা ভেবেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সর্ববৃহৎ অপেক্ষা বৃহত্তর সর্বব্যাপী মহাশক্তির আধার রূপে। তখন কোথায় ছিলো পাশ্চাত্য জগৎ আর তার স্বার্থান্বেষী বর্বর সভ্যতা। বহুদিনের ব্যবধানে সেই সুপ্রাচীন মহান্ চিন্তাধারা থেকে ভারত আজ বিচ্ছিন্ন। তারই প্রাচীন মতবাদ আজ নবরূপে তার সামনে এসে তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তাই আমরা ভুলেছি যে, ভারতের প্রাচীন ঋষি কণাদ বলেছিলেন সমগ্র বিশ্বই অবিনশ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার দ্বারা গঠিত। বহু শতাব্দী পরে সেই মতবাদকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করলেন ডাল্‌টন পরমাণুবাদের সৃষ্টিকর্তারূপে।

আজ বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ইথরের দ্বারা ব্যাপৃত, যার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ তথ্য আজও অজ্ঞাত। কিন্তু সর্বপ্রকার শক্তি এই ইথারেরই তরঙ্গমাত্র। সুদূর অতীতে কোন শুভক্ষণে স্থির ইথর তরঙ্গসঙ্কুল হয়ে সৃষ্টি করেছিলো বিদ্যুৎশক্তির কণাসমূহের, যাদের ঘাতসংঘাতে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসমূহ নানা অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছিলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। আজ ভারতবাসী অবাক হয়ে শুনছে পাশ্চাত্যের এই নতুন তত্ত্ব। সে ভুলেছে তারই উপনিষদে প্রথম সৃষ্টির বর্ণনা—

> "জনমি ওঙ্কারে শব্দতরঙ্গ
> কোটি বজ্রনাদে ছুটে,
> অযুত বিদ্যুৎ স্ফুরণে সহসা
> তিমিরে আলোক ফুটে।"

পরমাণুবাদের প্রথম সূত্র হিসাবে পদার্থ দ্বিবিধ—মৌলিক ও যৌগিক। যে পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ সর্বসম তাকে বলে মৌলিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একখণ্ড গন্ধককে যদি ক্রমাগত চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়, তখন এরূপ এক অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে যখন তাকে আর ভাঙ্গা যাবে না। কিন্তু অবস্থাতেও সেই সর্বক্ষুদ্র অংশ ও বৃহৎ খণ্ডটির মধ্যে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কোন প্রভেদ থাকবে না। এইরূপ পদার্থকে মৌলিক পদার্থ ও এই সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বা অ্যাটম বলা হয়। এইসকল পরমাণু সমূহের সাহায্যেই রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি সম্ভব হয়।

এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ হতে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। খড়ি এইরূপ একটি যৌগিক পদার্থ যাকে ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে গেলে এরূপ একটি অবস্থায় পৌছানো যাবে যখন সর্বক্ষুদ্র মুক্ত কণাটির গুণাগুণ বৃহৎ খণ্ডটির মতই থাকবে। কিন্তু এরপরও যদি একে ভাঙ্গা যায় তাহলে এ থেকে সৃষ্টি হবে ত্রিবিধ মৌলিক পদার্থের—ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন। এরূপ পদার্থকে যৌগিক পদার্থ ও এই সর্বক্ষুদ্র মুক্ত কণাটিকে অণু বা মলিকিউল বলে। মৌলিক পদার্থের পরমাণুসমূহ সর্বদা মুক্ত অবস্থায় থাকে না। সাধারণতঃ একই মৌলিক পদার্থের

দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র যুক্তভাবে অবস্থান করে। মৌলিক পদার্থের এই সর্বক্ষুদ্র মুক্ত অংশকেও অণু বা মলিকিউল নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে মৌলিক অক্সিজেন গ্যাসের অণু দ্বি এবং যৌগিক জলের অণু ত্রিপরমাণুক। যেমন অক্সিজেন ও জলের অণুকে যথাক্রমে এরূপে লেখা যায়।

O—O এবং H—O—H
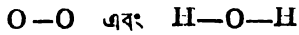
যেখানে O এবং H অর্থে যথাক্রমে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুকে বোঝানো যায়।

পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে নির্দিষ্ট সংখ্যক ধনাত্মক বিদ্যুতকণা, এদের ধনকণা বা প্রোটন নামে অভিহিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিদ্যুতশক্তিরহিত কণাও ধনকণাগুলির সঙ্গে একত্র হয়ে নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকোষের সৃষ্টি করে। এদের বলে ক্লীবকণা বা নিউট্রন। এই পরমাণুকোষের চারপাশে অবস্থান করে আরও কতকগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুতকণা। এদের সমষ্টিগত সংখ্যা ধনকণা সমষ্টির সমান। অন্যথায় সমগ্র পরমাণুটি বা পদার্থটি একটি বিশেষ বিদ্যুত-শক্তিবিশিষ্ট হোতো। এই ঋণাত্মক বিদ্যুতকণা-গুলিকে ঋণকণা বা ইলেকট্রন বলা হয়। এই ঋণ-কণাসমূহ বিপরীত বিদ্যুতাকর্ষের ফলে পরমাণু-কোষটির চারপাশে ডিম্বাকার পথে পরিভ্রমণ করে। সূর্য যেমন তার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তার নিজস্ব গ্রহগুলিকে রক্ষা করে, পরমাণুকোষও ঠিক সেরূপে বিদ্যুতাকর্ষের সাহায্যে তার ঋণকণাগুলিকে আগলে রাখে।

ঋণকণাগুলির গুরুত্ব প্রায় ৯×১০^{-২৮} গ্র্যাম বা $\frac{১}{১০৩০}$ সের, বৈদ্যুতিক ভরণ বা চার্জ $৪.৭৭ \times ১০^{-\bullet}$ একক এবং ব্যাস ১.৯×১০^{-১৩} সেন্টিমিটার (৪৬ সেন্টিমিটার = ১ হাত)।

ধনকণা ও ক্লীবকণা ঋণকণাপেক্ষা আকারে ও গুরুত্বে অনেক বড়। ওজনদাঁড়ির একপ্রান্তে একটি ধনকণা বা ক্লীবকণা রাখলে অপর পাল্লায় ১৮৪০টি ঋণকণা চাপাতে হবে। এ থেকেই বোঝা যায় ঋণকণার ওজন কত নগণ্য এবং পরমাণুকোষের ওজনই পরমাণুর ওজন। পরমাণুকোষ ভীষণভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। তার চতুষ্পার্শে ঋণকণাগুলি সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে। পরমাণুকোষের আয়তন বাইরের কক্ষটির তুলনায় অতি নগণ্য। পরমাণুটির আয়তন বাইরের এই কক্ষের আয়তনের সমান। কোষ ও কক্ষের মধ্যে আছে বিরাট ফাঁকা। একটি সাধারণ মানুষের শরীরের সমস্ত পরমাণুকোষ যদি কক্ষ বাদ দিয়ে একত্র ঘনসন্নিবিষ্ট করা যায় তাহলে তার আয়তন হবে একটি ধূলিবিন্দুর সমান, কিন্তু তার ওজন হবে একমণেরও ওপর কিন্তু তার কক্ষসমূহের আয়তনের সমষ্টি সমগ্র মানুষটির আয়তনের সমান। মানুষ তার বহির্জগতের তুলনায় কত নগণ্য!

প্রত্যেকটি সেল বা কক্ষের ঋণকণাগ্রহণশক্তি বিভিন্ন এবং নির্দিষ্ট। পরমাণুকোষ হতে যত দূরে যাওয়া যায় কক্ষগুলির আয়তন ও তাদের ঋণকণার সংখ্যা ততই বেড়ে চলে। দূরের ঋণকণাগুলির অন্তর্নিহিত তেজ ও ক্ষমতা বেশী থাকে। কক্ষগুলিকে যথাক্রমে K, L, M, N, O, P, Q, নাম দেওয়া হয়। K, L, M, N, নামক কক্ষগুলির ঋণকণা গ্রহণশক্তি যথাক্রমে ২, ৮, ১৮, ৩২। সর্বোচ্চ বা বহির্কক্ষের ক্ষমতা সর্বাধিক।

হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ। এর পরমাণুকোষ এক ধনকণা বিশিষ্ট, সুতরাং এর কক্ষেও একটিই ঋণকণা বিরাজ করে। তাই হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা সরল পদার্থও বটে। কোনো পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা অপেক্ষা যতগুণ ভারী তাকে সেই পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব বলে। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থেরই পরমাণুকোষস্থিত ধনকণার সংখ্যা একে-বারে নির্দিষ্ট। এই ধনকণার সংখ্যাই পদার্থটির চরম বৈশিষ্ট্য। এই সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে পদার্থটির প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাগুণ। এই বিশিষ্ট

সংখ্যাকে বলে পদার্থটির পরমাণবিক সংখ্যা। একটি সংখ্যা কমালে বা বাড়ালে সৃষ্টি হয় প্রচুর প্রভেদ। তাই তামার পরমাণবিক সংখ্যা ২৯ এবং দস্তার পরমাণবিক সংখ্যা ৩০।

যদি কোন কঠিন মৌলিক পদার্থের উপর রঞ্জনরশ্মি বা এক্সরে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে পদার্থটি হতে একপ্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এই রশ্মি প্রিজমের দ্বারা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি সরু ও মোটা লাইন পাওয়া যায়। এই লাইনগুলি হতে রশ্মিটির তরঙ্গদৈর্ঘ জানা যায়। এই তরঙ্গদৈর্ঘের সহিত মৌলিক পদার্থটির পরমাণবিক সংখ্যার একটি চমৎকার সম্পর্ক আছে। সম্বন্ধটি এই সূত্রটির দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

$$v = A (N - I)^2$$

যেখানে v = বিচ্ছুরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ, N = মৌলিক পদার্থটির পরমাণবিক সংখ্যা এবং A একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক বা কনষ্ট্যান্ট।

মৌলিক পদার্থটি যদি তরল কিংবা বায়বীয় হয় তাহলে তার যে কোন কঠিন যৌগের দ্বারাও এই পরীক্ষা করা যায়। এরূপে মসলির রঞ্জনরশ্মিরবিশ্লেষণ বা এক্স রে স্পেক্ট্রা দ্বারা যেকোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এ হতেই জানা যায় যে, পৃথিবীতে হাইড্রোজেন হতে আরম্ভ করে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত ৯২ টির বেশী মৌলিকপদার্থ থাকতে পারে না এবং এর মধ্যে ১ থেকে ৯২ পর্যন্ত পরমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ৯২ টি মৌলিকপদার্থ থাকা সম্ভব। মস্‌লি তাঁর প্রারব্ধ কাজ শেষ করে যেতে পারেননি, অতি অল্পবয়সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। এরই ফলে আজ অনেক অজানা পদার্থের সন্ধান মিলেছে। আজ ৮৫ ও ৮৭ পরমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থদ্বয় ব্যতীত সকল পদার্থ ই বিজ্ঞানীমহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাকী দুটিরও অনেক খোঁজ মিলেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের ও পৃথক করা যাবে। প্রাচীনবিজ্ঞানের জন্মদাতা হিসাবে যদি আর্কিমেডিসকে বিজ্ঞানীদের শীর্ষে স্থান দেওয়া যায় তাহলে নব্যবিজ্ঞানের জন্মদাতা হিসাবে মসলির অবদানও কিছু কম নয়।

মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্নও আজ অনেকাংশে সফল হয়েছে। তারা চেয়েছিলো সব জিনিসকে পরশপাথর বুলিয়ে সোনায় পরিণত করতে। সে পরশমণির সন্ধানও আজ বিজ্ঞান পেয়েছে। তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় তারা অনেক নূতন পদার্থের সন্ধান দিতে পেরেছিলো। খোঁজ করতে গিয়ে তারা মানুষের মূত্রের মধ্যে সন্ধান পায় স্বতঃ উজ্জ্বল ফসফরাসের, যা থেকে অন্ধকারে সবুজবর্ণের আলো বেরোয়। তাকেই তারা স্বর্গীয় কিছু বলে ভেবেছিলো। আজ অবশ্য আমরা জানি যে, তার ও জোনাকীপোকার আলোয় কোন তফাৎ নেই। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তারা তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোতে পারেননি। আধুনিক বিজ্ঞানে আজ তাও সম্ভব হয়েছে। এক জাপানী বৈজ্ঞানিক আজ পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা জানি স্বর্ণের পরমাণবিক সংখ্যা ৭৯ এবং পারদের ৮০। সুতরাং পারদের পরমাণুকোষস্থ ধনকণাসংখ্যা ১ মাত্রায় কমিয়ে দিতে পারলেই তা' স্বর্ণে রূপান্তরিত হতে পারে। বাস্তবিকই দ্রুতগামী শক্তিশালী কণার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে পরমাণুকোষ ধ্বংস করে নূতন পরমাণু সৃষ্টি করা আজ সম্ভব হয়েছে। একে বলে 'ট্র্যান্সমিউটেশন অফ এলিমেন্টস্' বা পরমাণ্বন্তর-ক্রিয়া। পরমাণু বিধ্বংসী সাইক্লোট্রন নামক যন্ত্রের দ্বারা এই রূপান্তর ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

আগেই বলেছি পরমাণুর ধনকণার সংখ্যা ঋণকণার সংখ্যার সমান। তাই ঋণকণার সংখ্যা পরমাণবিক সংখ্যারই সমান এবং তার সঙ্গেই বেড়ে চলে। পরমাণুগুলির কক্ষসমূহ যতদূর সম্ভব ভর্তি থাকে। বাড়তিগুলি খুচরা অবস্থায় থাকে। K বা প্রথম কক্ষটি দুটির বেশী ঋণকণা রাখিতে পারে না,

তাই হিলিয়ামের (পরমাণবিক সংখ্যা — ২) কক্ষটি পূর্ণই থাকে। L বা দ্বিতীয় কক্ষটিতে ৮ টি ঋণকণা ধরে। তাই হিলিয়ামের উর্ধ্বের পদার্থগুলির দ্বিতীয় বা বাইরের কক্ষের ঋণকণা সংখ্যা ১, ২ করে ৮ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। ৮ টি হলে কক্ষটি সম্পৃক্ততা লাভ করে। বিরল-বায়ুগুলির বহির্কক্ষগুলি সব সময় ৮ টি ঋণকণার দ্বারা সম্পূর্ণ থাকে। অন্য সব মৌলিক পদার্থেরই বহির্কক্ষ ৮ এর কম ঋণকণার দ্বারা অসম্পৃক্ত থাকে। ঋণকণাগুলি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হয়ে পরমাণুকোষের চারপাশে পরিভ্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের মেরুদণ্ডের উপরও যুগপৎ আবর্তন করে। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণুই বিরাট সৌরমণ্ডলের প্রতীক স্বরূপ।

মৌলিক পদার্থসমূহের ধনকণাসংখ্যা একেবারে নির্দিষ্ট হলেও ক্লীবকণাসংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। ফলে একই মৌলিক পদার্থের দুটি পরমাণুতে ক্লীবকণা-সংখ্যা সমান না হতেও পারে। তাই একই পদার্থের পরমাণুদ্বয়ের পরমাণবিক গুরুত্ব তফাৎ হতে পারে। কারণ ক্লীবকণা বেড়ে বা কমে গেলে পরমাণুটির ওজনও বেড়ে বা কমে যায়। কিন্তু এটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পরমাণু দুটির ধনকণাসংখ্যা একেবারে সমান এবং তারা একই পরমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট। সুতরাং তারা একই মৌলিক পদার্থ হতে উদ্ভূত।

একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পরমাণুগুলিকে পরস্পরের সমপদ বা আইসোটোপ বলে, কারণ এরা পর্যাবর্তক সারণী বা পিরিয়ডিক টেবলের সমস্থানে অবস্থিত। মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু সব পরীক্ষার দ্বারাই তাদের পরমাণবিক গুরুত্ব একই পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় এই সকল পরমাণবিক গুরুত্ব দশমিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। যেমন ক্লোরিনের পরমাণবিক গুরুত্ব—৩৫·৪৫৭; তামার—৬৩·৫৭; দস্তার—৬৫·৩৮। অথচ এরকম হওয়া উচিত নয়। কারণ পরমাণবিক গুরুত্ব পরমাণু-কোষস্থ ধনকণা ও ক্লীবকণা সমষ্টির ওজনের সমান এবং পরমাণুর মধ্যে ভগ্ন ধনকণা বা ক্লীবকণা থাকাও সম্ভব নয়। এটাও বিশেষভাবে জানা আছে যে, প্রতিটি ধনকণা বা ক্লীবকণা সমান ওজন বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকেই একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। তাহলে এই ভগ্নাংশ সংখ্যা এলো কোথা থেকে? এর উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রায় সকল মৌলিক পদার্থেরই বিভিন্ন ওজনের কয়েকটি সমস্থ থাকে। এক একটি মৌলিক পদার্থে এরা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত থাকে। মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব নির্ধারণ করবার সময় আমরা এইসকল নানাবিধ অনুপাতে মিশ্রিত নানা ওজনবিশিষ্ট সমস্থগুলির ওজনের গড় নির্ণয় করি। গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে, ক্লোরিন গ্যাস ৩৫ ও ৩৭ পরমাণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট দুটি ক্লোরিন সমস্থের মিশ্রণে গঠিত। এর ফলে আমরা ক্লোরিন গ্যাসের মোটামুটি পরমাণবিক গুরুত্ব পাই ৩৫½।

সমস্থগুলির প্রাকৃতিক গুণসমূহের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকলেও তাদের রাসায়নিক গুণসমূহ একেবারে সর্বসম। পরমাণবিক-বোমা প্রস্তুতিতে হাইড্রোজেন ও ইউরেনিয়মের ২ ও ২৩৫ পরমাণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট ডয়টেরিয়ম ও ইউ ২৩৫ নামক সমস্থদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নির্দিষ্ট সংখ্যক ধন, ঋণ ও ক্লীবকণা মিলে যখন পরমাণুর সৃষ্টি করে তখন কিছু পদার্থ কেন্দ্রীক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সমস্থগুলির পরমাণবিক সংখ্যাও একেবারে পূর্ণসংখ্যা হতে পারে না যদিও এই তফাৎটি অতি নগণ্য। লুপ্ত অংশ ও পূর্ণসংখ্যাটির অনুপাতকে বন্ধনাংশ বা প্যাকিং ফ্রাক্সন বলে।

মৌলিক পদার্থগুলিকে পরমাণবিক সংখ্যা

অনুসারে সাজাবার সময় কতকগুলি অদ্ভুত সঙ্গতি চোখে পড়ে। এর ফলে পিরিয়ডিক ল বা ক্রমাবর্তন নীতিটি উদ্ভূত হয়েছে। পদার্থগুলির ভৌতিক ও রাসায়নিক গুণসমূহ ক্রমাবর্তন হিসাবে তাদের পরমাণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পদার্থগুলিকে পরমাণবিক সংখ্যা পরম্পরায় সাজালে তাদের ভৌতিক গুণ ও রাসায়নিক ব্যবহারসমূহ প্রতি সংখ্যা অন্তর এক বিশেষ নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যার পর গুণ ও ব্যবহার সমূহের পুনরাবৃত্তি হয়। হাইড্রোজেনকে বাদ দিয়ে বিরল বায়ু হিলিয়াম (পরমাণবিক সংখ্যা = ২) থেকে পদার্থসমূহ পরমাণবিক সংখ্যা অনুসারে একটি সারিতে সজ্জিত করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত হিলিয়ামের ন্যায় প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাগুণপ্রাপ্ত আরেকটি বিরল বায়ু না এসে পৌছায়। এই বিরল বায়ু নিয়ন থেকে আবার আরেকটি সারি আরম্ভ হয়। এইরূপে সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজালে যে ছকটি তৈরী হয় তাকে বলে পর্যাবর্তক সারণী। নীচে প্রথম দুটি সারি দেখানো হোলো।

করতে থাকে (পূর্বেই বলা হয়েছে পদার্থের পরমাণবিকসংখ্যা = কক্ষস্থ ঋণকণাসংখ্যা)। এই প্রথম সারির অবশিষ্ট পদার্থগুলির সম্বন্ধেও এক নিয়মই খাটে এবং শেষপর্যন্ত ৭ম সঙ্ঘস্থ ফ্লুওরিনের দ্বিতীয় বা বহির্কক্ষে ৭ টি ঋণকণা পরিভ্রমণ করে।

দ্বিতীয় সারিতে নিয়নে দ্বিতীয় বা বহির্কক্ষটি ৮ টি ঋণকণার দ্বারা সম্পৃক্ততা লাভ করে। এই সারির পরবর্তী পদার্থগুলিও একই নিয়ম অনুসরণ করে। সহজেই দেখা যাচ্ছে যে, পদার্থগুলির বহির্কক্ষের ঋণকণার সংখ্যা পদার্থটির সঙ্ঘসংখ্যার সমান। এ নিয়ম প্রায় সর্বত্রই প্রতিপালিত হয়, তবে পরের সারিগুলিতে কিছু গোলমাল দেখা যায় অবশ্য তারা আর একটা বাঁধাধরা নিয়ম অনুসরণ করে। এই সকল পদার্থে ২য় বা L কক্ষ বিরলবায়ু আর্গনে ৮ টি ঋণকণার দ্বারা পূর্ণ হবার পর পরমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে M বা ৩য় কক্ষ প্রথম ১টি ও পরে দুইটি ঋণকণা নেয়; কিন্তু আর ঋণকণা নিতে পারে না, ফলে ঋণকণাগুলি বাইরের তৃতীয় কক্ষে না গিয়ে দ্বিতীয় কক্ষে গিয়ে

সঙ্ঘ সংখ্যা	O	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নির্দেশ প্রথম সারি পরমাণবিক সংখ্যা	He হিলিয়াম ২	Li লিথিয়াম ৩	Be বেরিলিয়াম ৪	B বোরন ৫	C কার্বন ৬	N নাইট্রোজেন ৭	O অক্সিজেন ৮	F ফ্লুওরিন ৯
নির্দেশ দ্বিতীয় সারি পরমাণবিক সংখ্যা	Ne নিয়ন ১০	Na ন্যাট্রিয়াম ১১	Mg ম্যাগনেসিয়ম ১২	Al এ্যালুমিনিয়াম ১৩	Si সিলিকন ১৪	P ফস্ফরাস ১৫	S সালফার ১৬	Cl ক্লোরিন ১৭

আগেই বলেছি হিলিয়ামের একমাত্র K কক্ষ দুটি ঋণকণার দ্বারা পূর্ণ। লিথিয়ামের প্রথম দুটি ঋণকণার দ্বারা K কক্ষ পূর্ণ থাকে অবশিষ্ট তৃতীয় ঋণকণাটি খুচরা অবস্থায় দ্বিতীয় বা L কক্ষে বিচরণ

ভীড় করতে থাকে এবং ৮ এর পর ৯, ১০, ১১ করতে করতে দ্বিতীয় কক্ষে ১৮টি ঋণকণা জমা হয়। এতে দ্বিতীয় কক্ষটি একেবারে ভরাট হয়ে যায়। এর পর আবার তৃতীয় কক্ষে নিয়ম করে

৩, ৪, ৫ করে পর পর ৮টি ঋণকণা জমে বিরল বায়ু ক্রিপ্টনের সৃষ্টি করে। এখান থেকে চতুর্থ সারি আরম্ভ হয়। চতুর্থ বা N কক্ষে ২টি ঋণকণা জমবার পর আবার পূর্বের মত ভিতরের M সারি ভর্তি হতে আরম্ভ করে। এই সকল অদ্ভুত ব্যবহার সম্পন্ন পদার্থগুলিকে বহুরূপী পদার্থ বা ট্র্যানজিসন্যাল এলিমেণ্ট বলা হয়। এই পদার্থগুলি মাঝে মাঝে ভিতরের কক্ষের ঋণকণাগুলিকে বাইরের কক্ষে স্থানান্তরিত করে, তখন এদের গুণও অনেকাংশে বদলায়। আমাদের সাধারণ ব্যবহারের অধিকাংশ ধাতুই এই দলে পড়ে যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, দস্তা ইত্যাদি। এদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সকল ধাতুর যৌগিকগুলি রঙ্গিন হয় যা অপর পদার্থসমূহের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। শূন্য সঙ্ঘস্থ বিরল বায়ুগুলির বহির্কক্ষ সর্বদাই ৮টি ঋণকণার দ্বারা পূর্ণ (হিলিয়াম দুটিতেই সম্পৃক্ততা লাভ করে) থাকে। অন্য সঙ্ঘস্থ পদার্থগুলির বহির্কক্ষ সর্বদাই অসম্পূর্ণ, তারা চায় তাদের বহির্কক্ষ পূর্ণ করতে ও বিরল বায়ুগুলির মত সম্পূর্ণতা লাভ করতে। তাদের এই ব্যগ্রতার ফলেই সম্ভব হয়েছে রাসায়নিক সংযোগ। সোডিয়াম (বা ন্যাট্রিয়াম) এর তৃতীয় বা বহির্কক্ষে মাত্র একটি ঋণকণা একলা ঘুরে বেড়ায়, সে চায় অন্য কোন দলে ভীড়তে। অপরপক্ষে ক্লোরিনের তৃতীয় বা বহির্কক্ষে ৭টি ঋণকণা ভীড় করে আছে, আর মাত্র একটি সঙ্গী পেলেই তারা খুসী হয় এবং আর কিছুই চায় না। সুতরাং দয়াপরবশ সোডিয়াম তার নিঃসঙ্গ ঋণকণাটিকে অনুগ্রহ করে মুক্তি দেয় এবং ব্যাকুল ক্লোরিন পরমাণুও তাকে আগ্রহে লুফে নেয় এবং তার বাইরের ঘরটি ভরাট করে ফেলে। সোডিয়ামেরও এতে নিজস্ব স্বার্থ আছে, কারণ যদিও তার তৃতীয় কক্ষ লোপ পেয়েছে তবুও তার দ্বিতীয় কক্ষ ৮টি ঋণকণার দ্বারা পূর্ণই আছে। ফলে উভয়ের সন্তোষ ও সংযোগে সৃষ্টি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ। সোডিয়াম ধাতু ক্লোরিন বায়ুর সংস্পর্শে এলেই দগ্ধ হয় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় লবণের।

এইরূপে যে সকল পদার্থের বহির্কক্ষে চারের কমসংখ্যক ঋণকণা থাকে, তাদের পরমাণুগুলি এই বাড়তি ঋণকণা ত্যাগ করবার জন্য ব্যস্ত থাকে, ঋণকণা ত্যাগ করলে তারা ধনাত্মক বিদ্যুতশক্তিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে যাদের বহির্কক্ষে চারের বেশী ঋণকণা থাকে তারা চায় অন্য পরমাণু হতে ঋণকণা আহরণ করে ঋণাত্মক বিদ্যুতশক্তিসম্পন্ন হয়ে পড়তে। তাই ৪র্থ সঙ্ঘের পূর্ববর্তী পদার্থগুলি ধনবৈদ্যুতিক এবং পরবর্তী পদার্থগুলি ঋণবৈদ্যুতিক।

একটি পরমাণু যতগুলি ঋণকণা গ্রহণ বা ত্যাগ করে' সম্পৃক্ততা বা স্যাচুরেশন লাভ করে, সেই বিশেষ সংখ্যাকে পদার্থটির আকর্ষ বা ভ্যালেন্সি বলে। এরূপে সোডিয়াম ও ক্লোরিন উভয়েরই আকর্ষ ১। চতুর্থ সঙ্ঘের পূর্বের পরমাণুগুলির আকর্ষ তার বহির্কক্ষের ঋণকণার সংখ্যা বা সঙ্ঘ সংখ্যার সমান। চতুর্থ সঙ্ঘের পরবর্তী পরমাণুগুলির আকর্ষ তার ঘাটতি ঋণকণা সংখ্যার সমান, এদের আকর্ষ—৮ সঙ্ঘসংখ্যা। 0 সঙ্ঘস্থ বিরল বায়ুগুলি সম্পৃক্ত সুতরাং তাদের কোন আকর্ষ নেই এবং তারা স্বভাবতঃ কোন রাসায়নিক যৌগ গঠন করে না, কারণ কিছু দিতে বা নিতে তারা অক্ষম। দেওয়া ও নেওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে রসায়নের ভিত্তি।

দাঁত ক্ষয় হয় কেন?

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পায়নি—এমন লোক বিরল। দাঁত যদি ভাল করে পরিষ্কার করা না হয় তাহলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে অভুক্ত খাদ্য কণিকা আটকে থাকে, সেগুলি পচে নানা দন্ত-রোগের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, দাঁত ক্ষয় হয়ে গেছে বা শক্ত দাঁতের অভ্যন্তরে ফাটল বা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে—এই ক্ষয় ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে দাঁতের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, ফলে দাঁত নড়ে ওঠে ও অকালে পড়ে যায়। কেন দাঁত ক্ষয় হয়?—এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়; বস্তুতঃ পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত দাঁত ক্ষয় হবার কারণ রহস্যাচ্ছাদিত ছিল।

শত শত বৎসর ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে, একরকম পোকার আক্রমণেই দাঁতের ভিতর গর্ত বা ফাটলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। চীনের গ্রামাঞ্চলে আজও এমন অনেক হাতুড়ে দন্ত চিকিৎসক দেখা যায়—যারা পথে পথে ঘুরে লোকের দাঁত থেকে পোকা বের করার কেরামতি দেখিয়ে থাকে। উইলো গাছের গোড়াতে একরকম ছোট ছোট শুক্‌নো পোকা দেখা যায়, হাতুড়েরা ঐ পোকা সংগ্রহ করে রাখে। বাম হাতের তালুতে কয়েকটি পোকা লুকিয়ে রেখে একজোড়া কাঠির সাহায্যে রোগীর দাঁত পরীক্ষা করার সময় কৌশলে সেই পোকা ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের গর্তে ঢুকিয়ে দেয়—ঠিক যাদুকরের হাত সাফাই আর কি! দাঁতের লালা বা স্যালিভার সংস্পর্শে এসে পোকাগুলো ফুলে আকারে বড় হয়ে যায়, তখন সেই ডাক্তার কাঠির সাহায্যে পোকাগুলো বের করে এনে অপেক্ষমান কৌতুহলী দর্শকের চোখের সম্মুখে তুলে ধরে নিজের বাহাদুরী জাহির করে প্রমাণ করে দেয় যে, দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণ হলো এই পোকাগুলোর উপস্থিতি।

স্বাস্থ্যবান লোকেরও দাঁত ক্ষয় হতে দেখা যায়; বয়স্কলোকের চেয়ে শিশুদের এই রোগ বেশী হয়ে থাকে। দাঁত ক্ষয় হবার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু বিজ্ঞানী তাদের নিজস্ব মতবাদ বা থীওরী প্রচার করেছেন। চিনি নাকি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর। যে সমস্ত দাঁতে মিষ্ট দ্রব্যের মিষ্টতা অনুভূত হয়—অর্থাৎ মিষ্ট অনুভূতি বহন করে, সে দাঁতগুলোর ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। শিশুদের মধ্যে কারও কারও এই ধরণের 'মিষ্ট-দাঁত' থাকে, আবার অনেকেরই থাকেনা, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। অনেকে বলেন যে, পরিষ্কার দাঁত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না—কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে, যারা নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করেন তাদের দাঁতেও এই ধরণের গহ্বর দেখা দিয়েছে।
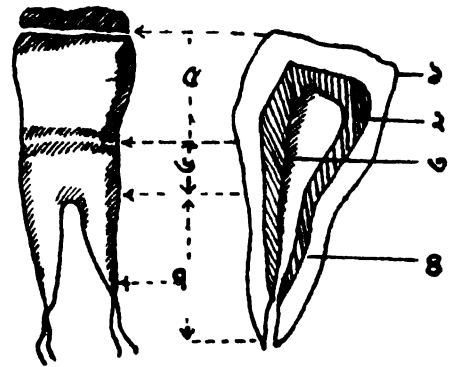
১নং চিত্র: দন্তের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী।
১। এনামেল ২। ডেণ্টিন ৩। মজ্জাকোটর
৪। সিমেণ্টাম্‌ ৫। শিরোদেশ
৬। গলদেশ ৭। মূলদেশ

মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে দাঁত তৈরী হয়েছে। সমস্ত দেহের উপরিভাগ এপিথিলিয়্যাল টিস্থ নামক একপ্রকার পেশী অর্থাৎ চর্মের আস্তরণে আচ্ছাদিত। এর ভিতর দিয়ে জীবাণু সহজে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু দাঁত এই ধরণের কোন পেশী বা চর্মদ্বারা আবৃত নয়। দাঁতের যে অংশ পরিদৃশ্যমান—তাকে বলা হয় ক্রাউন বা শিরোদেশ এবং যে নিম্নাংশ চোয়ালের হাড়ের ভিতর প্রোথিত রয়েছে, তার নাম রুট্ বা মূলদেশ; শিরোদেশ ও মূলদেশের মধ্যবর্তী অংশের নাম গলদেশ বা নেক। দাঁতের উর্ধাংশ অর্থাৎ শিরোদেশ, এনামেল নামক একপ্রকার কঠিন ও মসৃণ আচ্ছাদনে আবৃত। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে মনে হয় যেন কতকগুলো ছোট ছোট শক্ত সাদা ত্রিশিরা কাঁচ দাঁতের উপরিভাগে সংবদ্ধ রয়েছে। গলদেশের ও মূলদেশের এই আবরণীকে বলা হয় সিমেণ্টাম্। এই বহিরাবরণের ভিতরেই রয়েছে ডেণ্টিন নামক অপেক্ষাকৃত নরম ও পুরু একটা স্তর। এই স্তর অভ্যন্তরস্থ শাঁস বা মজ্জা ভর্তি একটা গহ্বরকে ঘিরে আছে (১নং চিত্র)।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, দাঁতের এনামেল, অম্ল বা অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় বলেই দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কিছুকাল পরেই ওয়াট্ নামক একজন ইংরেজ দেখিয়ে দেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কারও দন্তগহ্বর বাদামী, কারও সাদা রংএর। নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক এবং সালফ্যুরিক প্রভৃতি বিভিন্ন অম্লের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই নাকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রংএর উৎপত্তি। কিন্তু আমরা কি এই সমস্ত অ্যাসিড পান করে থাকি? অবশ্য কিছুদিন আগে একটা খবর বেরিয়েছিল যে, লেবুর রস দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ এতে সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে। আবার অনেকে বলেন যে, দাঁতের ভিতর প্রদাহের জন্যই এই ক্ষয় রোগের উৎপত্তি। কিন্তু দেখা গেছে যে, শক্ত দাঁতের কাঠামোর ভিতর কোন মাংসপেশী বা রক্তনালী নেই, কাজেই প্রদাহ হওয়া সম্ভব নয়। দাঁতের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম ফস্ফেট ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। একমাত্র অ্যাসিডেই এই সব পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর আবিষ্কার করেন যে, এক প্রকার অতিক্ষুদ্র জীবাণু দুধকে দধিতে পরিণত করে—ল্যাকটিক্ অ্যাসিড তৈরী হয় বলেই দধি টক। অভুক্ত শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্য দাঁতের গায়ে পচনের ফলে জীবাণুর ক্রিয়ায় অ্যাসিডে পরিণত হতে পারে। কাজেই আমরা যদি শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্য আহার না করি তাহলে মুখ-গহ্বরে বিদ্যমান জীবাণুগুলো, যারা অম্ল তৈরী করে, তারাও এই জাতীয় খাদ্যাভাবে উপবাসে থাকবে, আর আমাদেরও দাত ক্ষয় হবেনা। কিন্তু জীবাণুদের উপবাস করাতে গেলে যে আমাদেরও উপবাসে থাকতে হবে। কারণ, আমাদের বিশেষকরে ভারতীয়দের প্রধান খাদ্যই যে শ্বেতসার জাতীয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দাঁতের ক্ষয়, খাদ্যে শ্বেতসারের কম বেশীর ওপর মোটেই নির্ভর করেনা।

বহু দন্ত-গবেষক বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন যে, মুখে একজাতীয় জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দাঁত ক্ষয়ের সম্বন্ধ রয়েছে এবং এই জীবাণুগুলিই দাঁতকে ধ্বংস করে থাকে। কিন্তু তাদের এই গবেষণায় মৌলিকত্ব কিছুই নেই—জীবাণুই যে রোগ সৃষ্টি করে, তাঁতো সবাই জানে। তারা 'ফল' কে 'কারণ' ভেবে ভুল করেছেন। দাঁতের ক্ষয় জীবাণুর আক্রমণের ফলে হয়, কিন্তু কিরূপে হয়—শক্ত দাঁতের ভিতর কিরূপেই বা তারা প্রবেশলাভ করে?—এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তারা দিতে পারেননি।

প্রথম মহাযুদ্ধে দীর্ঘকাল পরিখা বা ট্রেঞ্চে

আত্মগোপন করে থাকার সময় সৈনিকদের মুখে একপ্রকার প্রদাহ বা ক্ষত হয়েছিল—চিকিৎসকেরা এনামেল ভেদ করে জীবাণুর পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করাতো সহজ নয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বা

২য় চিত্র

৩য় চিত্র : জীবাণুর ক্ষয় কার্য

৪র্থ চিত্র : এনামেলের ক্ষয়
১। জীবাণু স্তর
২। ক্ষয় কার্য্যের প্রসার
৩। এনামেল
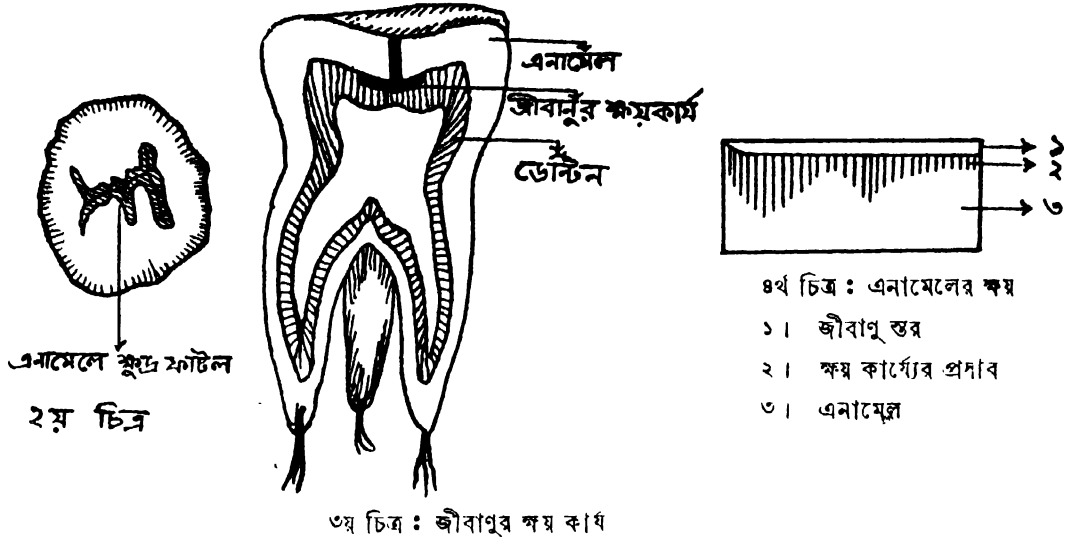
এর নাম দিয়েছিলেন—'ট্রেঞ্চ মাউথ।' তাদের মুখের ভিতর এক প্রকার জীবাণুর আধিক্য দেখা গিয়েছিল। সেই জীবাণু, দুর্বল দেহ অর্থাৎ স্বাভাবিক-রোগ-প্রতিরোধ শক্তিহীন কয়েকটি পশুর দেহে সূচী-প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, তাদের মুখেও ঐ রোগ দেখা দিয়েছে। নিউইয়র্কের কয়েকজন দন্ত-চিকিৎসক লক্ষ্য করেছেন যে কয়েকটি স্কুলের ছেলেদেরও পরীক্ষার সময় এই রোগ হয়েছে—বেশী রাত জেগে পড়া, ঘুমকে তাড়াবার জন্যে অধিক মাত্রায় চা, কফি ও সিগারেট পানের ফল। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে—মুখের পেশীগুলির স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে গেছে—কাজেই জীবাণুগুলি এই সুযোগ নষ্ট করেনি। জীবাণু সর্বত্রই বিদ্যমান—আমাদের দেহে এরা প্রবেশও করে, কিন্তু দেহের জীবনীশক্তি এদের বংশ-বিস্তারে বাধা দেয় বলেই সহজে রোগ হতে পারে না।

দাঁতের বেলায়ও কি এটা সম্ভব? শক্ত বাইরের কোন আঘাতে এই এনামেল ভেঙ্গে গেলে—একমাত্র সেই ফাটল পথেই জীবাণুর অভিযান সফল হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বোডেকার নামে একজন আমেরিকান দন্তচিকিৎসক আবিষ্কার করেন যে, এনামেলের ভিতর দিয়ে এক প্রকার জৈবরজ্জু লম্বালম্বিভাবে দাঁতের উপরিভাগ হতে ডেন্টিন পর্যন্ত চলে গেছে। তিনি ভাবলেন যে, হয়তো এনামেল ও ডেন্টিনকে কার্যক্ষম রাখার জন্যে এই রজ্জু পথে তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে এই আবিষ্কার সেই সময় কোন প্রভাব বিস্তার না করায় এটা চাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি বার্ণহার্ড গটলিয়েব প্রমুখ আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে এখন নিঃসন্দেহে জানা গেছে যে, দাঁতের এই জৈবনালী পথেই জীবাণুর অভিযান সুরু হয়—দুর্ভেদ্য দন্তদুর্গের এটাই একমাত্র প্রবেশ পথ—যে পথ বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সুক্ষ্মদৃষ্টির সম্মুখে এতদিন ধরা পড়েনি, কিন্তু তাঁদের চেয়েও ধুরন্ধর জীবাণুর

চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। এই জৈবরজ্জু-গুলির কতকগুলো মোটা। এই মোটাগুলোকে বলা হয়েছে ল্যামেলি—দাঁতের উপরিভাগ থেকে বরাবর
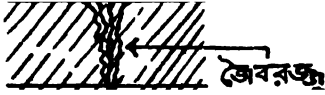
৫ম চিত্র : দাঁতের উপরিভাগ হতে এনামেল ও ডেন্টিন ভেদ করে লম্বমান জৈব রজ্জু।

ডেন্টিন্ পর্যন্ত লম্বভাবে প্রসারিত। অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলেই যদি দাঁতের ভিতর গহ্বরের সৃষ্টি হত, তাহলে দাঁতের উপরিভাগই ক্ষয়প্রাপ্ত হত সবচেয়ে বেশী—তপ্ত সূর্যালোকে বরফ যেমন গলে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই অ্যাসিড সংস্পর্শে এনামেল ক্ষয়প্রাপ্ত হত। কিন্তু দেখা গেছে যে, ডেন্টিনের ভিতরেই ফাটল সৃষ্টি হয় সবচেয়ে বেশী—ওপরের এনামেল খোসার মতো থাকে অটুট। জীবাণু এই জৈবরজ্জু পথে প্রবেশ করে শক্ত এনামেলের কোন ক্ষতি করতে না পেরে—তাকে একরকম এড়িয়ে গিয়েই ভিতরের অপেক্ষাকৃত নরম ডেন্টিনের ওপরেই প্রথম আঘাত হানে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে যে, ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেলের চেয়ে অক্ষত এনামেল অ্যাসিডে বেশী দ্রবণীয় হয়ে থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেল জীবাণুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়েছে। জীবাণুর দেহ প্রধানতঃ প্রোটিনজাতীয় পদার্থে গঠিত। এই প্রোটিন অম্লের ক্রিয়াকে প্রতিহত করে। ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেলে জীবাণু-দেহের প্রোটিন থাকে বলেই এরা অম্লের ক্ষয়কারী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে বেশী সমর্থ। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অ্যাসিডে আক্রান্ত এনামেল নাকি জীবাণুর অভিযান পথে বাধা সৃষ্টি করে (তাহলে লেবুর রস খাওয়া ক্ষতিকর হবে কি ?)। জীবাণুর ক্ষয়কারী কার্যেও নাকি অ্যাসিড তৈরী হয়। এই অ্যাসিড এনামেলের কিছু ক্যালসিয়মকে দ্রবীভূত করার ফলে ক্যালসিয়ম লবণের দ্রাবণ প্রস্তুত হয়—সেই দ্রাবণ চুইয়ে চুইয়ে দাঁতের উপরিভাগে এসে পড়ে। সেখানে কম অ্যাসিড থাকার জন্যে বা অবস্থাভেদে কিছুটা ক্যালসিয়ম লবণ আবার রূপান্তরিত হয়ে একটা অদ্রবণীয় শক্ত পদার্থে পরিণত হয়ে যায়—এই শক্ত আস্তরণকে বলা হয় **Hyper Calcified Strip.** কাজেই ঐরূপে জীবাণুর আক্রমণ পথে আবার দৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি হয়।

জীবাণু যখন সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছে—এবং পথও যদি খোলা থাকে, তাহলে প্রত্যেকের দাঁতই এই ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হবার কথা, কিন্তু তা হয় না। সম্ভবতঃ মুখনিঃসৃত লালা সেই জৈব-রজ্জুর বহির্দ্বারে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়ম লবণের শক্ত জমাট দেয়াল তৈরী করে আক্রমণ-মুখ বন্ধ করে দেয়। এই স্বাভাবিক উপায়ে যাদের দাঁতের এই পথ রুদ্ধ না হয়, তাদেরই হয়তো এই রোগ সহজে আক্রমণ করে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে এই পথ বন্ধ করার উপায় কি ? জিঙ্ক ক্লোরাইড ৪০% ও পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের ২০% জলে দ্রাবণ একত্র মিশ্রিত করলে অ.বনীয় শ্বেতবর্ণের শক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। পূর্বোক্ত দুই পদার্থের দ্রাবণ জৈবরজ্জুর বহির্দ্বারে ঢেলে দিলে, ডেন্টিন্ পর্যন্ত সমস্ত রজ্জুর ভিতর সেই কঠিন দুর্ভেদ্য পদার্থ জমাট বেঁধে যায়। ঠাণ্ডা জলে যদি দাঁত শির শির করে ওঠে—তাহলে বুঝতে হবে জীবাণুর আক্রমণ পথ খোলা আছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই পথ বন্ধ করার পর দাঁতে আর ঠাণ্ডা উপলব্ধি হবে না। শৈশবে ছেলেদের দুধ-দাঁত পড়ে যাবার পর নূতন স্থায়ী দাঁত ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃত্রিম প্রণালীতে যদি সেই জীবাণু প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

অনেকে বলেন যে, ক্লোরিন গ্যাসের জলে-দ্রাবণ

মুখে নিয়ে কুলকুচো করলে নাকি দাঁতের রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি বাড়ে। বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাসে জীবাণু মরে যেতে পারে এবং দাঁতের ক্যালসিয়মের সঙ্গে ফ্লোরিনের ক্রিয়ার ফলে অদ্রবণীয় শক্ত ক্যালসিয়ম-ফ্লোরাইড তৈরী হয়ে সেই রন্ধ্র পথে হয়তো জমে যায়, কাজেই পথ বন্ধ হতে পারে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সাফল্য নিশ্চিত নয়।

দাঁত ক্ষয়ের কারণ সম্বন্ধে গটুলিয়েবের এই অভিনব মতবাদে দন্ত চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। এই ক্ষয়রোগ অত্যন্ত সুদূর প্রসারী—দাঁতের ডেন্টিন ভেদ করে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অভ্যন্তরের মজ্জাপূর্ণ কোটরে প্রবেশ করে—সেখানে স্নায়ুতন্তুর আধিক্যের জন্য ভয়ানক ব্যথা সৃষ্টি হয়, তারপর ক্রমে চোয়ালের রক্তথলিতে প্রবেশ করে দেহের অন্য অংশকেও আক্রমণ করে থাকে। কাজেই পূর্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার কার্য শুধু প্রত্যহ দন্ত-মার্জনাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। 'পরিষ্কার দাঁত ক্ষয় হয় না'—একথা আজকাল আর সত্যি নয়। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় খাদ্যের সমতা ও পুষ্টিকারিতা বজায় রেখে খাদ্য নির্বাচন দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষেও একান্ত অপরিহার্য।

ন্যাচারল্ গ্যাস

শ্রীদ্বারকারঞ্জন গুপ্ত

ন্যাচারল্ গ্যাসের নামই তার উৎপত্তির পরিচয় দেয়। এর মূল ব্যবহার হলো জ্বালানী হিসাবে। এর তাপমূল্য প্রতি কিউবিক মিটারে ৯৪০০ ক্যালরী। জ্বালানী হিসাবে গ্যাসীয় পদার্থের প্রয়োগ খুব বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গোটা-কতক সুবিধার জন্যে এদের মূল্য বাজারে বেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া এদের সাহায্যে শক্তিকে বেশ দক্ষতার সংগে কর্মে রূপান্তরিত করা যায়।

১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ন্যাচারল্ গ্যাসকে নিষ্ক্রিয় বলা হত। কতদিন এই ধারণা চলতো তা বলা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা দেখেছি গোলযোগ বা এ্যাক্সিডেন্টের সংগে কত নতুন আবিষ্কারের সূত্র জড়ানো আছে। নিউটনীয় আপেল ফলের কথা কে না জানে? বেকারেলের ফটোগ্রাফিক প্লেট আর ইউরেনিয়াম সল্টের গল্পও বোধহয় অনেকের জানা আছে। এখন আমাদের আলোচ্য গোলযোগের কথা বলি। আমেরিকার একটা তেলের কারখানায় গ্যাস লাইন খারাপ হয়ে যায়। ফলে গ্যাসের অপচয়

হয় প্রভূত। কয়েকজন রাসায়নিক এর প্রতিকারের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন পাইপের ভিতর বাতাস ঢোকাতেই হয়েছে এই গোলযোগের সূত্রপাত।

এখানে বলে রাখা ভাল যে ন্যাচারল্ গ্যাসের প্রধান উপাদান হল দুটো। একটা হচ্ছে মিথেন (CH_4) আর একটা ইথেন (C_2H_6)। পূর্বোক্ত রাসায়নিকগণ এইবার ন্যাচারল্ গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তাঁরা একটা ইস্পাত নির্মিত পাত্রে ন্যাচারল্ গ্যাস পুরলেন। তারপর তার সংগে উচ্চ চাপের বাতাস মিশ্রিত করলেন। পরীক্ষার শেষে পাত্রের ভিতর দিককার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা উড অ্যালকোহল ($C_3H\ OH$), ফরম্যাল ডিহাইড (HCHO) আর ফর্মিক অ্যাসিড (HC-OOH) লেগে রয়েছে দেখা গেল। অর্থাৎ বায়ুর সংমিশ্রণে আর উচ্চ চাপে ন্যাচারল্ গ্যাসের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটেছে। ফলে উদ্ভব হয়েছে এই যৌগিক পদার্থগুলি।

এই পরীক্ষাই ন্যাচারল্ গ্যাসের জীবনে নতুন আলোকপাত করল। ইংগিত করল সম্মুখে তার বিপুল সম্ভাবনার কথা।

পূর্বেই বলেছি ন্যাচারল্ গ্যাসের উপাদানের ভিতর মিথেন আর ইথেনই হল প্রধান। এ ছাড়া এর ভিতরে আছে প্রোপেন (C_3H_8), ব্যুটেন (C_4H_{10}), পেনটেন (C_5H_{12}), হেক্সেন (C_6H_{14}), হেপটেন (C_7H_{16}) আর হিলিয়াম। আজকাল প্রায় সব জায়গাতেই ন্যাচারল্ গ্যাসের ভিতর থেকে মূল্যবান উপাদানগুলি পূর্বেই বের করে নেওয়া হয়। পরে অবশিষ্ট গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার কার্বাইড ও কার্বন কেমিক্যালস কর্পোরেশন, সাউথ চার্লস্টোনে তাদের কারখানায় আগেই ইথেন বের করে নেয়।

কোথাও কোথাও মিথেনের সংগে অক্সিজেন (উপযুক্ত চাপ আর তাপে) মিশিয়ে তৈরী করা হয়। প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে ফরম্যাল ডিহাইডের মূল্য অসীম। আধুনিক যুগে প্লাষ্টিক শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। এই একটি শ্রেণীর নাম ব্যাকেলাইট। ক্ষারজাতীয় একরকম ঘনকরনীয় পদার্থের সহযোগে ফেনল আর ফরম্যালডিহাইড ঘনীভূত হয়ে ব্যাকেলাইটে পরিণত হয়।

ইথেন আর প্রোপেন থেকে ইথাইল অ্যালকোহল আর অ্যাসেটিক অ্যাসিড তৈরী হয়। আবার অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে রেয়ন নামে একরকম কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হচ্ছে। আজকাল ন্যাচারল্ গ্যাসের অণু থেকে বিচিত্র উপায়ে হাইড্রোজেন আর কার্বন নিষ্কাশণ করে নেওয়া হয়।

আজকাল বাজারে যে উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হচ্ছে তা এই ন্যাচারল্ গ্যাস থেকে নিষ্কাশিত হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে তৈরী করা হয়। তুলাবীজ থেকে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ থেকে উদ্ভূত তেলকে এই হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে হাইড্রোজেনেট করা হয়। এই হাইড্রোজেনেটেড্ তেলকেই বলা হয় উদ্ভিজ্জ ঘৃত।

আবার এই হাইড্রোজেনকে বাতাসের নাইট্রোজেনের সংগে মিশিয়ে তৈরী করা হয় অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া থেকে অনেক রকমের মূল্যবান কৃষি সার (যেমন অ্যামেনিয়াম সালফেট প্রভৃতি) পাওয়া যায়, তাছাড়া অ্যামোনিয়ার সংগে অক্সিজেন মেশালে উদ্ভব হয় নাইটিক অ্যাসিডের, এই হল নিষ্কাশিত নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের ব্যাপার। নিষ্কাশিত অবস্থায় যে কার্বন পাওয়া যায় তা থেকে উত্তম ছাপার কালি আর মোটরের টায়ার হয়।

ইথেন আর মিথেন থেকে পাওয়া যায় —অ্যাসিটিলিন। আর অ্যাসিটিলিন থেকে নাইলন নামে একরকমের কৃত্রিম রেশম তৈরী

হচ্ছে। ইথেন, প্রোপেন অথবা ব্যুটেন থেকে প্রাপ্ত ইথাইলিন দিয়ে ফল-সংরক্ষণের কাজ হয়। ক্লোরিন মিশ্রিত ন্যাচারল্ গ্যাস থেকে পাওয়া যায় ক্লোরোফরম ($CHCl_3$)। ডাক্তারীশাস্ত্রে ক্লোরোফরমের দানের কথা সবাই জানে, তাছাড়া এই মিশ্রণ থেকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) নামে এক রকমের দ্রাবকও তৈরী হয়। ইথার ($C_2H_5.O.C_2H_5$) আর সাইক্লোপ্রোপেন (C_3H_6) নামে আর দু'রকমের চৈতন্যহারক রসায়নিক পদার্থও এই ন্যাচারল্ গ্যাস থেকে পাওয়া যায়। আজকাল ডাক্তারীশাস্ত্রে বিশুদ্ধ ক্লোরোফরম ব্যবহার করা হয় না, এর সঙ্গে ইথার প্রভৃতি অন্যান্য চৈতন্যহারক পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়।

এরপরে আসা যাক্ সভ্যজগতের প্রিয়প্রসঙ্গ মোটরগাড়ী সম্বন্ধে ন্যাচারল্ গ্যাসের প্রয়োগে। বিজ্ঞানীরা বলেন পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার নাকি সভ্যজগতে এত বেশী বেড়ে গেছে যে, ভবিষ্যতে পৃথিবী একদিন পেট্রোল-শূন্য হয়ে পড়বে, তখন পেট্রোল-শূন্য পৃথিবীকে চালাবে এই ন্যাচারল্ গ্যাস। সহজেই ঘনীভূত হয় এইরকম এক বাষ্পীয় পদার্থের সংগে ন্যাচারল্ গ্যাস মেশালে তাকে বলে ওয়েট গ্যাস। নিম্নতাপ আর প্রচুর চাপ দিয়ে এই ওয়েট গ্যাস থেকে পাওয়া যায় কয়েক রকমের গ্যাসোলিন। কয়লা থেকে যে গ্যাসোলিন পাওয়া যায়—এই গ্যাসোলিন তার অর্ধমূল্য। দেখা গেছে ন্যাচারল্ গ্যাস থেকে উৎপন্ন গ্যাসোলিনের দাম পড়ে মাত্র ৫ পেন্স থেকে ৬ পেন্স। ন্যাচারল্ গ্যাসোলিন থেকে নানাধরণের হাই অকটেইন গ্যাসোলিন পাওয়া যায়। বিমান পোতের ক্রম-বর্ধমান উন্নতি প্রচেষ্টার মূলই হচ্ছে এই নানা-ধরণের হাই অকটেন গ্যাসোলিন। আমেরিকান তরলীকৃত ন্যাচারল্ গ্যাস ২৫০০০ বিভিন্ন শ্রেণীর এঞ্জিন চালাচ্ছে।

১৯২০ সাল থেকে প্রায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ন্যাচারল্ গ্যাস তার জীবনের নতুন রাস্তা ধরে বেশ দ্রুতগতিতেই ধাবিত হচ্ছিল বলা যায়! তার প্রত্যেক পদক্ষেপে নতুন নতুন শক্তির স্ফুরণ দেখা গেছে। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে তার জীবনে যেন আবিষ্কারের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—বিশেষ করে বিস্ফোরক তৈরীর ব্যাপারে। যুদ্ধে ট্রাইনাইট্রোটোলুয়ল (T. N. T.) একটি বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ। এর প্রস্তুতির জন্যে দরকার হয় টলুইন ($C_6H_5.CH_3$) নামে একরকম রাসায়নিক দ্রব্য। গত প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা কোক থেকে টলুইন উৎপাদন করেছিল ২৫০ লক্ষ গ্যালন। কিন্তু এবারে দরকার লাগলো অনেক বেশী টলুইনের। কয়লার চুল্লীগুলো তা' সরবরাহ করতে পারলো না। অল্পমূল্যে যাতে টলুইন তৈরী করা যায় রাসায়নিকেরা তার ভার নিলেন। আর তাঁরা তা' সম্ভবও করেছিলেন।

এযুদ্ধে আমেরিকার আর একটা বড় অভাব ছিল রবারের। রাসায়নিকেরা দেখলেন ন্যাচারল্ গ্যাস থেকে পাওয়া যায় ব্যুটেন। ব্যুটেন থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু নিষ্কাশন করে নিলে পাওয়া যায় ব্যুটাডিয়েন ($CH_2 : CH.CH : CH_2$). আর একরকম উপায়ে এই ব্যুটাডিয়েন তৈরী করা যায়। ন্যাচারল্ গ্যাস থেকে প্রাপ্ত ইথাইল অ্যালকোহলের সংগে বাতাস মিশিয়ে গরম কপার-গ্যজের সংস্পর্শে আনলে অ্যালডিহাইড মিশ্রিত অ্যালকোহল পাওয়া যায়। আবার এই শেষোক্ত মিশ্রণকে গরম অ্যালুমিনার উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে পাওয়া যায় ব্যুটাডিয়েন। ক্ষারজাতীয় পদার্থের সহযোগে ব্যুটাডিয়েন থেকে সিন্থেটিক রবার পাওয়া যায়।

এছাড়া ব্লেড, বিছানার স্প্রিং প্রভৃতি ধাতুনির্মিত দ্রব্যগুলির প্রস্তুতির সময়ে ন্যাচারল্ গ্যাসের প্রয়োজন হয়। কোন ধাতুকে উত্তপ্ত করবার সময় বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তা' ঐ ধাতুর ওপর একরকম কাল স্তরের সৃষ্টি করে।

যদি ন্যাচারল্ গ্যাস দিয়ে বাতাকে অক্সিজেন শূন্য করে নেওয়া হয় তাহলে ঐ রকমের কোনও কাল শুর পড়বার সম্ভাবনা থাকে না।

এর পরের অধ্যায় হলো ন্যাচারল্ গ্যাসের বিপুল সম্ভাবনার দিক। কত রকমের বিভিন্ন আর বিচিত্র পদার্থ যে এ থেকে প্রস্তুত হতে পারে তা' গল্পের মতো এক এক সময় অবিশ্বাস্য মনে হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন তাঁরা নাকি সবে-মাত্র ন্যাচারল্ গ্যাসের যাদুপুরীর চৌকাট্ পার হয়েছেন। তাঁদের সামনে এখন পড়ে রয়েছে বিশাল আর রহস্যময় প্রাসাদের সবটাই। ডাঃ এগ্লোফ একবার বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ন্যাচারল্ গ্যাস থেকেই প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক সিন্থেটিক দ্রব্য তৈরী হবে

সিনেমা, রেস্তোরা প্রভৃতিকে এয়ার কনডিসন্ড্ করবার কাজে ন্যাচারল্ গ্যাসকে লাগাবার চেষ্টা চলছে। তরলীকৃত ন্যাচারল্ গ্যাস বাষ্পে পরিণত হবার সময় তার চারপাশ থেকে উত্তাপ টেনে নেয়। ফলে চারপাশে প্রচণ্ড শৈত্যের সৃষ্টি হয়। এই ঠাণ্ডা নিয়েই বাতাসকে তরল করা যায়। ইস্পাতের পাত্রে ঐ তরল বাতাস ভরে একটা যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে বাতাসে পরিণত করলে ঐ সমস্ত স্থানগুলোকে এয়ার কণ্ডিসন্ড্ করা যাবে।

এই ন্যাচারল্ গ্যাসের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য রয়েছে আমেরিকাতে। পেট্রোলিয়াম যেমন কূপ খনন করে মাটির তলা থেকে তোলা হয়, ন্যাচারল্ গ্যাসও সেই রকমে পাওয়া যায়। আমেরিকাতে ন্যাচারল্ গ্যাসকে কেন্দ্র করে আজকাল এত কারখানা গজিয়েছে তা' ভাবলে আশ্চর্য লাগে। তার বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণই হলো তিন ট্রিলিয়ন। আগে ন্যাচারল্ গ্যাসের হতো প্রচুর অপচয়। একে শুধু জ্বালানী হিসাবেই ব্যবহার করা হতো, কিংবা ন্যাচারল্ গ্যাসোলিন পৃথক করে নিয়ে অবশিষ্ট গ্যাস নষ্ট করা হতো। বিজ্ঞানীদের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়েছে এই অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক শক্তির অপচয়। বিজ্ঞানে আর শিল্পে ঘটেছে বিরাট বিপ্লব। আজ বিপুল ব্যবহারিক শক্তি নিয়ে ন্যাচারল্ গ্যাস সভ্যমানুষ তথা সভ্যসমাজের অপরিহার্য পথপ্রদর্শক হয়েছে।

পেনিসিলিন

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

আজকাল 'পেনিসিলিন' নামক ঔষধটি প্রায় সব চিকিৎসকই ব্যবহার করেন এবং সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই এর নাম জানেন। নানা দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ রূপে পেনিসিলিন ব্যবহৃত হচ্ছে। পেনিসিলিনের কাহিনীতে তিনটি ঘটনা সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ১৯২৯ সালে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক এর আবিষ্কার, দ্বিতীয় হল ১৯৩২ সালে রাইস্‌ট্রিক কর্তৃক এর রাসায়নিক গুণাগুণ বর্ণনা এবং তৃতীয় হল ফ্লোরি কর্তৃক পেনিসিলিনকে ঔষধরূপে ব্যবহারের যোগ্যতা ঘোষণা। অনেকের মতে ১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অক্সফোর্ডের স্যর উইলিয়ম ডান্ স্কুল অব প্যাথলজির ডাঃ ই, চেন্ পেনিসিলিনের রাসায়নিক গুণ এবং গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সম্ভবতঃ প্রথম গবেষক।

১৯২৯ সালে লণ্ডনে সেন্টমেরী হাসপাতালের ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন যদিও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন ১৯২৮ সালে। এই সময়ে তিনি কৃত্রিম মাধ্যম সাহায্যে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই বীজাণুর জন্ম ও পরিণতি সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। এই সময় একদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে, টেবিলের উপর রক্ষিত কয়েকটি অনুশীলন পাত্র বা কালচার প্লেটের মধ্যে একটির একস্থানে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই বীজাণুগুলি মরে গিয়েছে। তাঁর গবেষণার ছত্রাক পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীর বলে এই অদ্ভুত বীজাণু ধ্বংসী পদার্থের নাম দেন 'পেনিসিলিন'। ১৯৪০ সালে এচ, ডব্লু, ফ্লোরির তত্ত্বাবধানে একদল বৈজ্ঞানিক কর্মী ছত্রাক থেকে কতকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পেনিসিলিন বিযুক্ত করতে সক্ষম হন। ১৯৪১ সালে আমেরিকায় মিঃ ডসন্ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পেনিসিলিন বিযুক্তকরণের সম্মান অর্জন করেন এবং ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান গবেষকমণ্ডলীর মধ্যে মিঃ হিল্‌ম্যান ও মিঃ হেরেল পেনিসিলিনের বীজাণুধ্বংসী গুণাগুণের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৯৪২ সাল থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে পেনিসিলিন তৈরী করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তবে ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই-এর আগে পেনিসিলিন তৈরীর তথ্য সাধারণ্যে প্রচার করা হয়নি, কারণ যুদ্ধকালে তা গোপন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

পেনিসিলিনের বীজাণুধ্বংসী শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করে জানা গিয়েছে যে, গ্র্যাম পজিটিভ্ মাইক্রো-অর্গানিজম্‌স্-এর উপর পেনিসিলিনের প্রভাব খুব বেশী। গবেষণাগারে বীজাণুগুলিকে একরকম প্রাথমিক রং ধরিয়ে পরে আইওডিন মাখিয়ে তাদের রঙের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। এইভাবে রং করার পরে, যে সব বীজাণুর রং এলকোহলের সংস্পর্শে এনেও নষ্ট হয় না—সেইসব বীজাণুকে বলা হয় 'গ্র্যাম পজিটিভ্' এবং যাদের রং নষ্ট হয়ে যায় তাদের বলা হয় 'গ্র্যাম নেগেটিভ্'। এই রকম 'গ্র্যাম নেগেটিভ্' বীজাণুতে পেনিসিলিন নিষ্ক্রিয়। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন 'গ্র্যাম নেগেটিভ্' বীজাণুজাত নিসেরিয়া গণোরিয়ার বীজাণু পেনিসিলিন নষ্ট করতে পারে। বহু গবেষণা চালিয়ে কোন কোন রোগ বীজাণুতে পেনিসিলিন সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অথবা স্বল্পক্রিয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে হৃদপিণ্ড এবং রক্তস্রোতের রোগে—যেমন

ব্যাক্টেরিমিয়া, ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস বীজাণুসম্ভূত এণ্ডোকারডাইটিস্ এবং সাপুরেটিফ্ পেরিকার-ডাইটিস্ রোগে পেনিসিলিন বিশেষ উপকারী। অবশ্য গ্র্যাম নেগেটিভ বীজাণুজাত ব্যাকটেরিমিয়া রোগে পেনিসিলিন কোনও কাজ দেয় না। কেন্দ্রীয় স্নায়ুচক্রের রোগে—যেমন ম্যানিন-জাইটিস্ এবং মস্তিষ্কের আঘাত বা ফোড়ায় ইহা একটি মহৌষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যবস্থাযন্ত্রে নালী ঘা প্রভৃতি রোগে পেনিসিলিন খুব ভাল কাজ দেয়। হাড়ের রোগ যেমন অষ্টিওমায়লাইটিস্ রোগে পেনিসিলিন সক্রিয়। চর্মরোগ—যেমন একৃজিমা, সেলুলাইটিস্ এমনকি পোড়া ঘা, কার্বাঙ্কল প্রভৃতি পেনিসিলিন প্রয়োগে সেরে যায়। মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়াতেও সুফল দেয়। গণোরিয়া ইত্যাদি ব্যাধি পেনিসিলিন প্রয়োগে আরোগ্য হয়, কিন্তু সিফিলিস রোগে পেনিসিলিন স্বল্পক্রিয়। এই সব রোগে ব্যবহারের জন্য পেনিসিলিন ক্যাপ-স্যুল এবং বড়ি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ডাক্তারবাবুদের মতে এই ক্যাপস্যুল বা বড়ি ফ্যাসনদুরস্ত কিন্তু কর্মদুরস্ত নয়।

এছাড়া ম্যালেরিয়াতে পেনিসিলিন কোনও কাজে আসে না। টাইফয়েড রোগে পেনিসিলিন 'অচল' এ ধারণা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে—কারণ পরিমাণে বেশী ব্যবহার করে অথবা সঙ্গে সালফানো-মাইড পর্যায়ের ঔষধ ব্যবহার করে কিছুটা ফল পাওয়া যাচ্ছে। চক্ষুরোগ—যেমন অপথ্যালমাইটিস্ রোগে পেনিসিলিন উপকারী। জল অথবা আসল বসন্তে পেনিসিলিন নিষ্ক্রিয়, তবে পেনিসিলিন প্রয়োগ করলে দ্বিতীয় সংক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সহজ উপায়ে আমরা সাধারণতঃ যে সব রোগের নাম শুনে থাকি অথবা যে সব রোগের নাম উচ্চারণ করতে দাঁতে জিবে সংঘর্ষ লেগে রক্তপাত না হয়, মাত্র সেগুলি রউপর পেনিসিলিনের ক্রিয়া ও সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। পেনিসিলিন ব্যবহারের সাফল্য সব সময়েই রোগবীজাণুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু পেনিসিলিনের কাহিনীর এইটুকুই সব নয়। পেনিসিলিন ব্যবহারের চেয়ে তার উৎপাদন আরও বড় সমস্যা। শুধু তাই নয়, তাকে এমনভাবে তৈরী করে বাজারে ছাড়তে হবে যাতে হাতুড়েরা প্রয়োগ করতে গিয়ে পাল্টা হাতুড়ির ঘা না খান। একে বলা হয় 'ফুল প্রুফিং' করা।

পেনিসিলিন তৈরীর সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াকৌশল খুব সোজা। 'পেনিসিলিয়াম নোটাটাম' নামে একপ্রকার ছত্রাক বা ছাতা বা ভেপনো নানা জাতীয় রাসায়নিক লবণ মিশ্রিত জলে জন্মানো হয়। এই ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন ঐ লবণ মিশ্রিত জলে সঞ্চারিত বা নিঃসৃত হয়। পরে ঐ জলটুকু ছত্রাক থেকে ছেঁকে নিয়ে তা থেকে পেনিসিলিন নিষ্কার্শন করা হয়। এখন থেকে এই প্রবন্ধে এই জলকে আমরা মাধ্যম বলে উল্লেখ করব। নিষ্কাশন-প্রথা বহু প্রকার। পেনিসিলিন একটি অম্লজাতীয় ঔষধ এবং খুব সোজাসুজি জল বা মাধ্যম থেকে অন্য রাসায়নিকের সঙ্গে মিশে যায়। যেমন ধরুন, ক্লোরোফর্ম, ইথার, এমিল এ্যালকোহল্, অ্যাসিটেট প্রভৃতির সঙ্গে পেনিসিলিন যদি অম্লজাতীয় হয় তবে খুব শীঘ্র মিশে যায়। সেই জন্য অনুশীলন মাধ্যম অম্ল করে এমিল অ্যাসিটেটের সঙ্গে নেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এতে পেনিসিলিন মাধ্যম ছেড়ে অ্যাসিটেটের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর এমিল অ্যাসিটেট্, মাধ্যম থেকে আলাদা করে সামান্য ক্ষার মিশ্রিত জলে মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় পেনিসিলিন অ্যাসিটেট ত্যাগ করে জলের সঙ্গে মিশে যায়। আবার অ্যাসিটেট থেকে জলটুকু আলাদা করে ক্লোরোফর্মের সঙ্গে মিশালে, পেনিসিলিন জল ছেড়ে ক্লোরোফর্ম আশ্রয় করে। এখন ঐ পেনিসিলিন মিশ্রিত ক্লোরোফর্ম জল থেকে আলাদা করে চুণ মিশ্রিত জলে গুলে পেনিসিলিনের চুণ জাতীয় লবণে পরিণত করে

ব্যবহারোপযোগী করে নেওয়া হয়। এই উপায়ে ফ্লোরি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম পেনিসিলিন তৈরী করেন।

পেনিসিলিন নিষ্কাশন কাগজে কলমে খুবই সোজা; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা অনেক সতর্কতা এবং অধ্যবসায় সাপেক্ষ। কিন্তু এর চেয়েও সতর্কতা এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন পেনিসিলিন ছত্রাক উৎপন্ন করার কার্যে। 'পেনিসিলিয়াম্' এক প্রকার জীবিত গাছ অর্থাৎ ছত্রাক হলেও সাধারণ গাছের মত এর বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে এবং খুব যত্ন নিয়ে চাষ করতে হয়। তবে সাধারণ চাষ-আবাদে আমরা যেমন বিশেষভাবে গাছের যত্ন করি এক্ষেত্রে তা একেবারেই করা হয় না। ছত্রাকের যত্ন না নিয়ে ছত্রাক নিঃসৃত রসের যত্ন করা হয়। দেখা গেছে, যে মাধ্যমে ছত্রাক চাষ করা হয়েছে তার প্রতি এম, এল-এ অর্থাৎ এক গ্র্যাম সোডিয়াম পেনিসিলিনের যাটলক্ষ-ভাগের একভাগ পরিমিত মাধ্যমে মাত্র ১০ ইউনিট পেনিসিলিন পাওয়া যায়। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় এটুকু কত সামান্য! সাধারণতঃ একটি রোগীর কয়েকদিন ধরে তিন চার ঘণ্টা অন্তর প্রতিবারে ন্যূনকল্পে ১৫০০০ ইউনিট প্রয়োজন হয়। সেইজন্য পরবর্তী গবেষণার বিষয়বস্তু হল—কি উপায়ে একই পরিমাণ ছত্রাক থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ পেনিসিলিন তৈরী করা যায়। দেখা গিয়েছে যে, ২৪° ডিগ্রী উত্তাপে সাত থেকে দশদিন পর্যন্ত ছত্রাক পালন করলে ঐ ছত্রাক থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ পেনিসিলিন পাওয়া যায়। ছত্রাক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিঃসৃত পেনিসিলিনের পরিমাণও বাড়ে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অবস্থা বা সময় আসে যখন সব চেয়ে বেশী পেনিসিলিন পাওয়া যায়। তারপর গাছ আরও বাড়লে পেনিসিলিন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য খুব যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে ছত্রাকের পেনিসিলিন উৎপাদনের চরম অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। গাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বেশী পরিমাণ কার্বণ ডাই-অক্সাইড ছাড়ে এবং পচা ঘাসের স্তূপে পচনক্রিয়ায় জন্য যেমন স্বতঃই একটা উত্তাপ জন্মায় এক্ষেত্রেও সেইরূপ কিছুটা উত্তাপ বিকীর্ণ হয়। সেইজন্য ২৪° ডিগ্রী তাপ রক্ষা করার জন্য উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।

এর পরের সমস্যা হল—সাধারণ চাষের মত অধিক ফসলের জন্য জমি ও সার কেমন হওয়া উচিত। পেনিসিলিন গবেষণার প্রথমাবস্থায় সকল বিজ্ঞানী ও তাঁদের সহকর্মীরা কৃত্রিম মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসি-

ফ্লেমিঙের অনুশীলনী পাত্র, যাতে তিনি প্রথম পেনিসিলিয়াম নোটাটাম্ দেখতে পান।
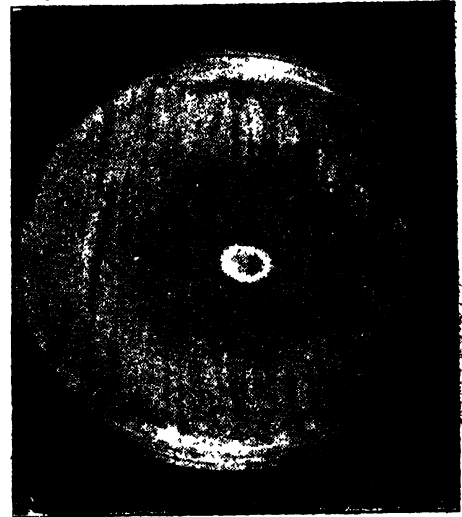
য়াম ও লৌহের ফস্ফেট, সালফেট, ক্লোরাইড ও নাইট্রেটের সঙ্গে শতকরা ৪ ভাগ গ্লুকোজ বা শর্করা জলে মিশিয়ে এই কৃত্রিম মাধ্যম তৈরী করা হত। এই রকম মাধ্যমকে বলা হয় "জাপেক্স-ডক্স মাধ্যম।" এই মাধ্যম নিয়ে নানা গবেষণা চলে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায়। শেষে আমেরিকানরা একটি সুন্দর মাধ্যম আবিষ্কার করে ফেললেন। সেটি কৃত্রিম নয়, একটি অন্যবস্তুর উপোৎপাদন

বা বাই-প্রোডাক্ট। শ্বেতসার তৈরী করার জন্য ভুট্টা, মকা, জনার, জোয়ার ইত্যাদি শস্য জলে ভিজানো হয়। এই সময় একটি পচনপ্রক্রিয়া বা ফারমেনটেশন হয়। প্রথমে এই শস্য ভিজানো জল ফেলে দেওয়া হত, কিন্তু দেখা গেল যে, দুগ্ধজাত শর্করা বা ল্যাকটোজ মিশিয়ে এই জল পেনিসিলিয়াম নোটাটাম চাষ করার জন্য আদর্শ মাধ্যম বা জমির কাজ দেয়। এই বাই প্রোডাক্ট ব্যবহার করে প্রতি
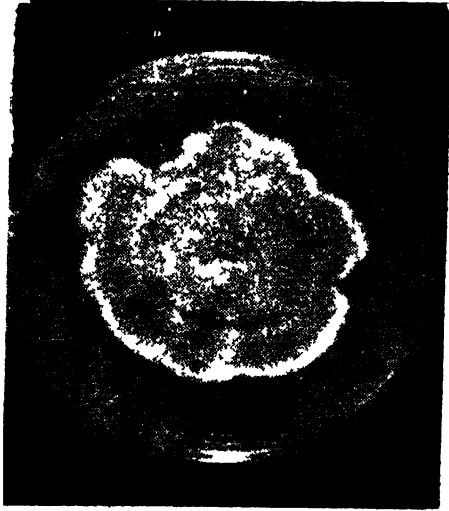
ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অনুশীলনী-পাত্রে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক উৎপাদিত হয়েছে। তাথেকে নিঃসৃত পেনিসিলিন ষ্ট্যাফ্রাইলোকক্কাস বীজাণু-গুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত করে দিয়েছে।

"এম এল" পরিমাণ মাধ্যমে ২০০ ইউনিট পেনিসি-লিন পাওয়া যায়। এরপর যখন পেনিসিলিনের রাসায়নিক গঠন ও গুণাগুণ প্রকাশিত হল তখন যে সমস্ত রসায়ন যোগে ছত্রাকের মধ্যে পেনিসিলিন জন্মায় সেইগুলি সরাসরি প্রয়োগ করার চেষ্টা চললো। তবে ঐ সব রাসায়নিক বস্তুগুলি আজও সাধারণের অজ্ঞাত—ব্যবসার খাতিরে।

পেনিসিলিনের আরও একটি দিক আছে। যেমন সাধারণ আলুর নানা জাত আছে তেমনি পেনিসিলিনকেও শক্তির অনুপাতে নানা জাতিতে ভাগ করা হয়েছে। গবেষণাগারে ছত্রাকে রঞ্জন-রশ্মি অথবা বেগ্‌নীপারের আলো বা আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি খাইয়ে বা অন্য রসায়নের, যেমন মাষ্টার্ড গ্যাসের সংস্পর্শে এনে ছত্রাকগুলির জীবকোষ বা ক্রোমোসোম্‌স্‌কে প্রভাবিত করে তার বংশানুক্রমিক ধারা বদলে নবজাত ছত্রাকের গুণাগুণ ও দ্রুত উৎপাদন সম্বন্ধে নানা গবেষণা চালানো হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, এইভাবে বংশধারা বদল করতে করতে এমন একরকম ছত্রাকের জন্ম দিতে সক্ষম হবেন যা থেকে আশাতীত পরিমাণ পেনিসিলিন উৎপাদন সম্ভব হবে।

সাধারণ চাষ-আবাদে আগাছা জন্মালে ফসলের ক্ষতি হয়। পেনিসিলিন চাষেও নানাজাতীয় আগাছা জন্মায় এবং পেনিসিলিন নষ্ট করে দেয়। এদের বলা হয় "পেনিসিলিনেজ্‌"। পেনিসিলিয়াম সাধারণতঃ দুধের বোতলে চাষ করা হত। আগাছার উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য বোতলগুলি শোধন করে শোধিত তুলোর দ্বারা মুখগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে পেনিসিলিন ছত্রাকের বীজ ছাড়বার জন্য বোতলের মুখগুলি খুলে অল্পশোধিত জলে ভাসিয়ে বোতলের ভিতর ছড়িয়ে দিয়ে মুখগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যেসব পছন্দসই ছত্রাক থেকে বীজ সংগৃহীত হয় সেগুলি খুব যত্ন নিয়ে রক্ষা করা হয় যাতে বাইরের কোনও বীজাণু বা বাজে ছত্রাকের সংস্পর্শে এসে আসল ছত্রাকগুলি জাতিভ্রষ্ট বা শক্তিহীন না হয়ে পড়ে। বারংবার বীজ আহরণের ফলেও ছত্রাকের গুণাগুণ বা বংশধারা যাতে বদল হয়ে না যায় তার উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। হয়ত অনেকেই জানেন যে, গবেষণাগারে একই রোগ-জীবাণু থেকে বার বার বীজাণু প্রজনন করলে দেখা যায় যে, কালক্রমে বীজাণুর বংশানুক্রমিক ধারা বদলে যায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং ক্ষতিকরার ক্ষমতাও কমে যায়।

পেনিসিলিন বীজের ক্ষেত্রেও ঐ রকম ঘটে বলে 'বীজাগারটি' বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত হয়।

নৈমিত্তিক সমস্যা :—সাধারণতঃ ছত্রাকের উৎপাদন পরিমাণ বেশী করার জন্য মাধ্যমের উপরিতলের আয়তনও সেই অনুপাতে বেশী হওয়া প্রয়োজন। প্রথম প্রথম দুধের বোতলগুলি ১০° ডিগ্রি শয়ান অবস্থায় রাখা হত। এই হেলিয়ে রাখার কারণ হল যাতে বোতলগুলির ছিপি ভিজে না যায়। এইভাবে রেখে দেখা গেছে মাধ্যমের গভীরতার তারতম্য ঘটে এবং এর জন্য চাষের সমতা রক্ষা করা যায় না ও অনেক ছত্রাকও নষ্ট হয়। শেষে "গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরী" সম্প্রদায়ের মত হাতলওয়ালা একরকম কাচের পাত্র তৈরী করলেন—তার হাতলটা করলেন ফাঁপা, যার মধ্য দিয়ে বীজ ভিতরে ছড়ানো যাবে। এতে অসুবিধা হলো শোধন করার—তার গঠন বৈচিত্র্যের জন্য। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল, পরপর একটির উপর একটি চ্যাপটা পাত্র সাজিয়ে। এতে একটি পাত্র উপচে আর একটি পাত্র ভর্তি হত; কিন্তু অসুবিধা হল জমির সঙ্গে সমান্তরাল করে ঠিকমত বসানোর। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ভিনিগার তৈরীর উপায়টি কাজে লাগানো হয়। এই প্রথায় ছত্রাক-বীজ মিশ্রিত উদাসী বস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ একটি স্তম্ভের মধ্য দিয়ে শোধিত মাধ্যম ধীরে ধীরে চুইয়ে নওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, নির্গত জলীয় মাধ্যমে পেনিসিলিন আছে। এই ভাবে নিরবচ্ছিন্ন জলীয় মাধ্যমের নির্গমন ঘটে, যতদিন পর্যন্ত স্তম্ভটি, হয় ছত্রাক বাহুল্যে না হয় পেনিসিলিনেজ জন্মে পেনিসিলিন নষ্ট হয়ে না যায়। এই প্রথাও পরে পরিত্যক্ত হয়।

গোড়া-থেকেই জলের উপরিভাগে ছত্রাক চাষ না করে জলের ভিতরে কি ভাবে চাষ করা যায় তার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রথম প্রথম যে সব পরীক্ষা হয় তার ফল অতি নৈরাশ্যজনক। শেষে মার্কিন কর্মীরা এতে সাফল্য লাভ করেন। আজকাল জলের নীচে ছত্রাকের চাষ বৃটেন ও আমেরিকায় সর্বত্র অনুসৃত হচ্ছে। এইরূপ এক একটি জলাধারে ৫০০০ থেকে ১০০০০ গ্যালন মাধ্যম ধরে এবং এক একটি জলাধার থেকে ৫ লক্ষ দুধের বোতলে উৎপন্ন পেনিসিলিনের সমপরিমাণ পেনিসিলিন পাওয়া যায়। এই বিরাট জলাধারে বাতাস চলাচলের যন্ত্রপাতি এবং বাইরের বীজাণু থেকে রক্ষা করার জন্য রক্ষা কবচগুলি বিভিন্ন দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর একটি গবেষণা চলে, কাচপাত্রের স্থলে কোনও ধাতুপাত্র ব্যবহার করা যায় কি না। ধাতুর সংস্পর্শে এলে পেনিসিলিন নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু গবেষণা চালিয়ে দেখা গেল "ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল" ব্যবহারে কোনও ক্ষতি হয় না। আগে জলের উপর ছত্রাক জন্মানো হত, কিন্তু জলের নীচে ছত্রাক জন্মানোর জন্য মাধ্যমের গুণাগুণ কিছুটা বদল করার প্রয়োজন হল। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছুর পরিবর্তন সাধন অনুভূত হল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পেনিসিলিন গবেষণার শৈশবাবস্থায় মাধ্যমকে কাঠকয়লার দ্বারা শোধন করা হত। তারপর যখন ভুট্টা, জনার ইত্যাদি ভিজানো জল মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার সুরু হল তখন এই পুরাতন শোধন পদ্ধতি ছেড়ে, গবেষণা করে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল।

আজকাল জলীয় মাধ্যম থেকে ছত্রাক ছেঁকে নিয়ে, মাধ্যম অম্ল করে, এমিল অ্যাসিটেটের সঙ্গে মিশ্রিত করে, ঘূর্ণীযন্ত্রে ঘুরিয়ে দুটিকে খুব দ্রুত আলাদা করে ফেলা হয়। এই ঘূর্ণীযন্ত্র কারখানায় তেল থেকে জল আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পেনিসিলিন তৈরীর পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি পূর্বেই বলেছি। পেনিসিলিন তৈরী করার সব চেয়ে গোপনীয় তথ্য হল, প্রতিবারে অম্ল ও ক্ষার মিশ্রণের অনুপাত; কারণ এই অনুপাতের উপরই তার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। পেনিসিলিন সাধারণতঃ

শুকনো অবস্থাতেই ভাল থাকে। তাই পেনিসিলিন তৈরীর সর্বশেষ প্রক্রিয়া হল 'শুষ্ককরণ'। পেনিসিলিনকে শুষ্ক করবার আগে "সিজ্ ফিল্টার" নামক একপ্রকার ছাঁকনীর সাহায্যে ছেঁকে নেওয়া হয়। এতে যদি কোন বাইরের বীজাণু পেনিসিলিন আশ্রয় করে বা অজ্ঞাতসারে মিশে যায়, তা নষ্ট করে দেয়। এরপর হল 'শুষ্ককরণ'। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ শতকরা ১০ ভাগ পেনিসিলিন আছে, এমন জলীয় অংশ এক একটি 'ভায়াল' বা

পেনিসিলিয়াম নোটাটাম ছত্রাকের চেহারা বড় করে দেখানো হয়েছে।

অ্যামপ্যুলের মধ্যে ভরে কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে শূন্য অঙ্কের নিম্নে ৩০° ডিগ্রি উত্তাপে জমিয়ে ফেলে খুব বেশী ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে জলটুকু নিষ্কাশন করে লওয়া হয়। এই প্রথাকে বলা হয় ফ্রিজ ড্রায়িং। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'রক্তাধান বা ব্লাডব্যাঙ্কে' রাখার জন্য আমাদের দেহের তরল রক্ত এই ভাবে শুকিয়ে রক্তকণিকায় পরিণত করে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর পেনিসিলিন লেবেল এঁটে বাজারে বিক্রয় করা হয়।

পেনিসিলিন' কিসে ভাল থাকে অথবা কিসে নষ্ট হয়ে যায় তা নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা গেছে, ধাতু, অম্ল বস্তু এবং উত্তাপ বিশেষ ক্ষতিকর। ডাক্তারখানায় পেনিসিলিন কিনতে গেলে দেখবেন শৈত্যাধার বা রেফ্রিজারেটার থেকে বা'র করে আপনাকে দেওয়া হল। এই ঠাণ্ডায় রাখার কারণ হল উত্তাপ থেকে বাঁচানো। অবশ্য আজকাল উত্তাপসহ পেনিসিলিন বাজারে পাওয়া যায়। পেনিসিলিনকে বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত করতে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়।

এর পরের প্রশ্ন হল—বিশুদ্ধতার। সাধারণতঃ সাধারণ রোগে শতকরা ৩০ থেকে ৮০ ভাগ বিশুদ্ধ পেনিসিলিন ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের দানাবাঁধা পেনিসিলিনও পাওয়া যায় এবং তা বিশেষক্ষেত্রে, যেমন মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত হয়।

পেনিসিলিনের বিষক্রিয়া নাই বললেই চলে; তবে সাধারণতঃ যা একটু দেখা যায় তা কোনও বাইরের দূষিত পদার্থ বা বীজাণু থেকে ঘটে। এই জন্য পেনিসিলিনের কয়েকটি শুকনো নমুনাও পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে পেনিসিলিনেজ্ দিয়ে পেনিসিলিন নষ্ট করে ব্রথ বা ব্লাডঅগারে মিডিয়ামে রাখা হয়। যদি অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের শক্তির বাইরে বহুসূক্ষ্ম কোনও বীজাণু থাকে তা এই সংস্পর্শে এসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ ছাড়া খরগোস ও ইঁদুরের দেহে প্রয়োগ করে উত্তাপবৃদ্ধি ও যন্ত্রণা হয় কিনা তা দেখা হয়। কিন্তু এই সব দূষিত পদার্থগুলি যে কি, তা আজও জানা যায় নাই।

পেনিসিলিনের বাৎসরিক উৎপাদন হারে ক্রমবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে পেনিসিলিন কিরূপ ব্যাপকভাবে তৈরী এবং ব্যবহৃত হচ্ছে তা বুঝা যায়। নিম্নে লক্ষের অঙ্কে একটি উৎপাদন হারের হিসাব দেওয়া হল।

সাল	আমেরিকা	ইংলণ্ড
১৯৪৩	১৭০০০ ইউনিট	৩০০০ ইউনিট
১৯৪৪	১৩৮০০০০ „	৩২০০০ „
১৯৪৫	৫৭০০০০০ „	২৬০০০০ „
১৯৪৬	৮০০০০০০ „	২৬০০০০০ „
১৯৪৭	১০০০০০০০ „	৪০০০০০০ „

মাটির মধ্যে একরকম বীজাণু পাওয়া যায় যাদের উদ্ভিদ অথবা প্রাণী কিছুই বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলেন "অ্যাক্টিনোমাইসিস্"। এরা মাটির শক্তিবর্ধক। এদের মধ্যে একশ্রেণীর বীজাণু একপ্রকার রস নিঃসরণ করে, যার সংস্পর্শে অনেক রোগ-বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এই "অ্যাক্‌টিনোমাইসিস" বীজাণু থেকে অনেক রকম জীবাণুধ্বংসী ঔষধ তৈরী হয়েছে। নানা জাতীয় ছত্রাক থেকেও ঐ রকম ঔষধ তৈরী হয়েছে। সাধারণভাবে এদের বলা হয় "অ্যান্টি-বায়োটিক্‌স্"। পেনিসিলিন এই অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্ পর্যায়ের ঔষধ। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টি অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্ আবিষ্কৃত হয়েছে। দু'চারটির নাম দিচ্ছি যথাঃ—ব্যাসিট্রেসিন্, ক্লোরোমাইসেটিন্, এরোস্পরিণ, ফিউমিগ্যাসিন্ এবং অরিওমাইসিন্ বা অর্বাণ। অর্বাণ কথাটির ল্যাটিন অর্থ হল সোনা। অরিওমাইসিন ঔষধটির অবিকল সোনালী রং, তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে—সোনা। এ ছাড়া আর একটি ঔষধ হল—'ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন'। এই ঔষধটি যক্ষা রোগে উপকারী, তবে ফুসফুসের যক্ষায় এর বিশেষ কোনও গুণের কথা শুনা যায় নাই। যেখানে পেনিসিলিন কোনও কাজ দেয় না সেখানে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন বিশেষ কার্যকরী। আবার যেখানে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন নিষ্ক্রিয় সেখানে পেনিসিলিন সক্রিয়।

'পেনিসিলিন—জি' নামে এক রকম ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়; চীনাবাদামের তেল ও মৌমাছির মোমে এই ঔষধ রক্ষিত হয়। পেনিসিলিন প্রয়োগ করার পর রোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে তা বেরিয়ে যায় এবং সেইজন্য প্রয়োগের পর দু' তিন ঘণ্টার বেশী রোগীর দেহে থাকে না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য পেনিসিলিন-জি'র একটি নূতন সংস্করণ তৈরী হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে—পেনিসিলিন-এফ। পেনিসিলিন-জি এর সঙ্গে "প্রোকেন্ ও এ্যালুমিনিয়ম মনোষ্টিয়ারেট" যোগ করে দেওয়া হয়। এর জন্য এই পেনিসিলিন রোগীর দেহে দু'তিন ঘণ্টার জায়গায় প্রায় ১০০ঘণ্টা থাকে।
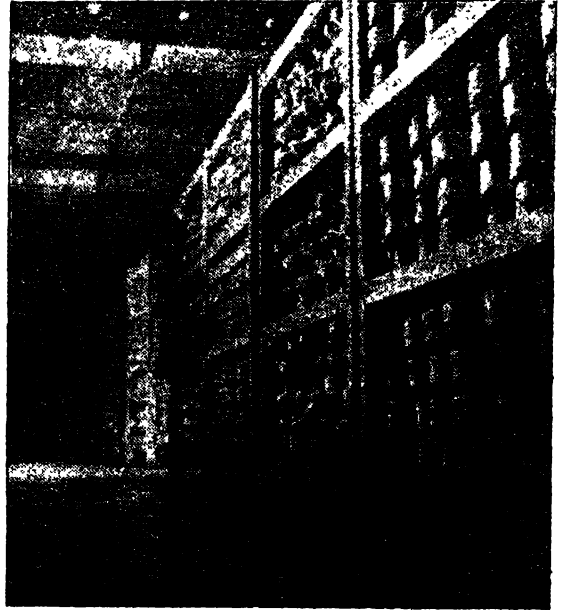
পূর্বে হাজার হাজার বোতলের মধ্যে গরম ঘরে যেভাবে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক উৎপাদন করা হতো তার দৃশ্য।

সম্প্রতি একরকম বায়বীয় পেনিসিলিন তৈরী হয়েছে—পেনিসিলিনের সঙ্গে হিলিয়াম গ্যাস মিশিয়ে। এই বায়বীয় পেনিসিলিন সাধারণতঃ শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা চলছে। বিজ্ঞানীরা

আশা করেন যে, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনও এই রকম গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে—ফুস্‌ফুসের যক্ষা চিরকালের মত নিরাময় করা সম্ভব হবে।

সালফ্যানোমাইড পর্যায়ের ঔষধগুলি, যেমন সিবাজল, সালফাডিয়াজাইন, সালফাগুয়ানিডাইন্‌, সালফামেরাজাইন ইত্যাদি ফিল্মতারকাদের মত সর্বজন পরিচিত। এগুলি প্রয়োজনের উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ না করলে—একটু কম হলে—রোগীর রোগ না সেরে অনেক সময় বেড়ে যায়। তার কারণ হল, ঔষধের মাত্রা কম হলে রোগ বীজাণু না মরে—ঔষধ প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করে। শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে আয়ুও তাদের বাড়ে। সেই জন্য ঐ জাতীয় ঔষধ ডাক্তারবাবুদের বিনাপরামর্শে ব্যবহার করা ঠিক নয়। পেনিসিলিনও অনুরূপ দোষযুক্ত। ষ্ট্রেপটোমাইসিন অধিকদিন ধরে ব্যবহার করলে তারও ঐ দোষ দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ১৯৪৪ সালে আমেরিকার ডাক্তার সেল্‌স্‌ম্যান ও ওয়াক্সম্যান আবিষ্কার করেন। যে ছত্রাক থেকে এটি আবিষ্কৃত হয় তার নাম হল—ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসেস্‌ গ্রিসেয়াস।

যতদূর জানা যায় আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী যখন বোম্বাইয়ে পীড়িত হন তখন বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্‌ অব সায়েন্স গবেষণাগার থেকে পেনিসিলিন তৈরী করে বিমানে বোম্বাই পাঠানো হয়। খুব সম্ভবতঃ সেটা ১৯৪২ সাল। এইটিই আমাদের দেশে প্রথম পেনিসিলিন প্রয়োগের উদাহরণ বলা যেতে পারে।

গত ২রা জানুয়ারী '৪৯ সালের খবরে প্রকাশ যে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন. কে. বসু, নিখিল ভারত ভেষজ-সম্মেলনের ৯ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেছেন—'ভারতবর্ষকে ভেষজশিল্পের ব্যবস্থার প্রতি সতর্ক হতে হবে। পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের মত ঔষধ তৈরীর আশু ব্যবস্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতে কোনও অত্যাবশ্যক ঔষধের অভাব হবে না।' শ্রীযুক্ত বসুর এই সতর্কবাণী সময়োচিত সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পেনিসিলিন কারখানা স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দশকোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং আমেরিকায় এর যন্ত্রপাতির 'অর্ডার' দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ে হপ্‌কিন্স ইনষ্টিটিউটে এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই প্রসঙ্গে আর জি. কর. হাসপাতালের (পূর্বতন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ) উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ সহায়রাম বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছত্রাক নিঃসৃত রস থেকে "পলিপোরিণ" নামে একটি ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। টাইফয়েড, কলেরা, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই ও ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই বীজাণুসম্ভূত নানা রোগে প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আমাদের দেশে এ জাতীয় গবেষণার কোনও সুষ্ঠু বন্দোবস্ত নাই অথবা সাফল্য লাভ করলে আর্থিক সাহায্য দেবার মত লোক আমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে একান্ত অভাব। সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে পেনিসিলিন আবিষ্কর্তা ডাঃ ফ্লেমিং এবং আমেরিকায় ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কর্তা ডাঃ ওয়াক্সম্যানের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া লণ্ডনে কিউগার্ডেনে তিনি আরও গবেষণা করেছেন।

আজকাল পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন পচনপ্রক্রিয়ার দ্বারা ছত্রাক থেকে উৎপন্ন করা হয়। এই পচনপ্রক্রিয়ায় যে সব বীজাণু তৈরী হয় সেগুলি 'বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স' গবেষণাগারে সংগ্রহ করে রাখার বন্দোবস্ত আছে। যে কোন গবেষক প্রয়োজন হলে সেখান থেকে নমুনা পেতে পারেন।

আজকাল বাজারে পেনিসিলিনের বড়ি, ক্যাপস্যুল, মলম ইত্যাদি নানা সংস্করণ কিনতে পাওয়া যায়। তবে সব চেয়ে মজার খবর হল পেনিসিলিন নস্যিও নাকি বেরিয়েছে—আমেরিকার বাজারে। হয়ত শীঘ্রই ভারতের বাজারেও এই বিলাস-সামগ্রী কিনতে পাওয়া যাবে। এই নস্যি নিলে সর্দিকাশি নাকি সেরে যায়।

বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু

শ্রীহৃষীকেশ রায়

সূর্য পৃথিবীর সকল তাপের আধার; আবার পৃথিবীর উপরিভাগে নানা কারণে এই সূর্য-তাপের অসাম্যতাই বায়ু প্রবাহের কারণ। জল বা অন্যান্য তরল পদার্থ যেমন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, উচ্চ চাপযুক্ত বায়ুও সেইরূপ নিম্নচাপযুক্ত বায়ুর দিকে ধাবিত হয় চাপ সাম্যতা রক্ষার জন্য। বায়ুমণ্ডলে এই চাপবৈষম্য সূর্য-তাপের ক্রিয়াতে সংঘটিত হয়। ফলতঃ বায়ুর গতি নির্ভর করে তাপ তথা চাপের তারতম্যের উপর; কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে তরল বা বাষ্পীয় পদার্থ সর্বদাই চাপের সমতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট।

স্বাভাবিক নিয়মে বায়ু সূর্যোত্তাপে উষ্ণ হইয়া যায় যে, সমচাপে একই আয়তনের শীতল বাতাস উষ্ণ বায়ু অপেক্ষা ভারী এবং সঙ্কোচনে বায়ুর তাপ বর্ধিত ও প্রসারণে তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, জলীয়-বাষ্পযুক্ত বায়ু শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা লঘু, ফলে ইহার চাপও কম। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বর্ধিত হইলে, নিকটে প্রশস্ত জলাশয় থাকিলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বর্ধিত হয়।

উপরোক্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, বায়ুর উষ্ণতা ও তাহার মধ্যে জলীয় বাষ্পের তারতম্যে বায়ু-চাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং তাহার সাধনের প্রচেষ্টাই বায়ু-প্রবাহের মূল কারণ। এখানে
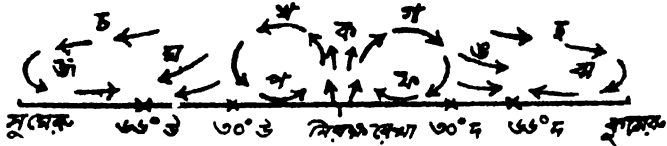
ক—লঘু ও উষ্ণ বায়ুর উর্ধ্বগতি—(নিম্নচাপ); খ ও গ—উচ্চচাপযুক্ত ঘন ও শীতল বায়ুর নিম্নগতি; প—উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু; ফ—দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু; ঘ—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু; ঙ—উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু; চ ও ছ—মেরু অভিমুখী লঘু বায়ু; জ ও ঝ—শীতল মেরু বায়ু।

প্রসারিত হইলে উহার আয়তন বর্ধিত হয় এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়। তখন এই লঘু বায়ু উর্ধ্বে শীতল স্তরে উঠে এবং পূর্ববর্তীস্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়;—যেমন হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে। সেই সময় চারিদিকের শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত বায়ু সেইদিকে প্রবাহিত হইয়া আসে। বিপরীত ক্রমে, শৈত্যের প্রভাবে বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া কম স্থান অধিকার করে এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বও বর্ধিত হয়। এই ভারী বায়ু অর্থাৎ উচ্চচাপযুক্ত বায়ু তখন নিম্নচাপ মণ্ডলের দিকে ধাবিত হয়। এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও সূর্য-রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয় তথাপি বায়ুর তাপ বর্ধিত করিবার ইহার তেমন শক্তি নাই। পর্বতের সানুদেশে বরফ না জমিলেও ইহার উচ্চতর প্রদেশে বরফ দেখা যায়। সূর্য-রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং তাহার সংস্পর্শে আসিয়া তাপের পরিচলন স্রোতের দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত হয়। আবার ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইলে ঠিক এইরূপে বায়ুমণ্ডলও শীতল হয়। ইহা ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠের উপাদানের তারতম্য অনুসারে তাপেরও হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এমন কি, জল ও

স্থল ভাগের উপরও তা.পর বৈষম্য দেখা যায়, কারণ স্থল যতশীঘ্র উত্তপ্ত বা শীতল হয় জল তাহা হয় না। পুর্বোল্লিখিত তাপবলয়ের ন্যায় পৃথিবী-পৃষ্ঠকে সাতটি সুনির্দিষ্ট চাপবলয়ে বিভক্ত করা যায়—

(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ ও শান্ত বলয়—নিরক্ষ প্রদেশে বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় দুইটি কারণে; প্রথমতঃ সূর্য এই অঞ্চলে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের বিশেষ তারতম্য না থাকায় প্রখর সূর্যকিরণে বায়ু উষ্ণ হইলে উহা লঘু হয় এবং উহার ঘনত্ব কমিয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ নিরক্ষ প্রদেশে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশী, সেজন্য সূর্যোত্তাপে জল বেশী বাষ্পীভবন হয় এবং বাতাসের সহিত মিশিয়া বাতাসকে আরও লঘু করে। এই লঘু জলীয় বাষ্প পরিগভিত বায়ু ক্রমাগত উর্ধ্বে উঠে বলিয়া এই অঞ্চলের আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চল নিরক্ষীয় প্রদেশের উত্তরে ৫° ও দক্ষিণে ৫° পর্যন্ত বিস্তৃত; অবশ্য স্থানবিশেষে এই সীমার পরিবর্তন হয়। মোটামুটি ইহার বিস্তার প্রায় ২০০ মাইল। পালের জাহাজের যুগে এই অঞ্চলের সমুদ্রে জাহাজ চালান ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। এখানে বায়ু স্বভাবতঃ উর্ধ্বগামী এবং সমান্তরাল ভাবে কোন বায়ুপ্রবাহ না থাকায় এই বায়ুপ্রবাহ শূন্য স্থানকে নিরক্ষীয় শান্ত-বলয় বলে।

(২-৩) কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ ও শান্ত বলয়—নিরক্ষীয় প্রদেশের উষ্ণ ও লঘু বায়ু উর্ধ্বে উঠিয়া উভয় মেরুর দিকে প্রবাহিত হয় এবং প্রসারিত ও শীতল হইয়া ২৫° হইতে ৩৫° অক্ষাংশের মধ্যে উভয় ক্রান্তিবৃত্ত অঞ্চলে নামিয়া আসে। আবার মেরুপ্রদেশ হইতেও এইরূপ ভারী বায়ু উর্ধ্বপথে আসিয়া এই অঞ্চলে নিম্নে নামিয়া পড়ে। এই দুই বায়ুপ্রবাহ ক্রান্তীয় অঞ্চলে মিলিত হওয়ায় এখানে বায়ুচাপের বৃদ্ধি হয় এবং বায়ু কেবল অধোমুখী হয় বলিয়া এখানকার বায়ুমণ্ডল স্বভাবতঃ শান্ত। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের এই দুই অঞ্চলকে যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় শান্তবলয় বলে। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর কর্কটীয় শান্ত বলয়ের অপর এক নাম অশ্ব-অক্ষাংশ। কারণ প্রাক্ বাষ্পীয়পোতের যুগে পালের জাহাজগুলিকে অনেক সময় বায়ুপ্রবাহের অভাবে এখানে অপেক্ষা করিতে হইত। পানীয় জলের অভাব নিবারণের জন্য অনেক সময় জাহাজে বোঝাই অশ্বগুলিকে নাবিকগণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত। নিরক্ষীয় শান্ত বলয় অঞ্চলের ন্যায় এই দুই অঞ্চলের বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না, সেইজন্য এই দুই অঞ্চলের বায়ুতে বৃষ্টিপাত খুব কমই হয়। ফলে এই দুইটি শান্তবলয়ে সাহারা, কালাহারী, আটাকামা, রাজপুতনা, আরব প্রভৃতি পৃথিবীর বিশাল মরুভূমিগুলি অবস্থিত।
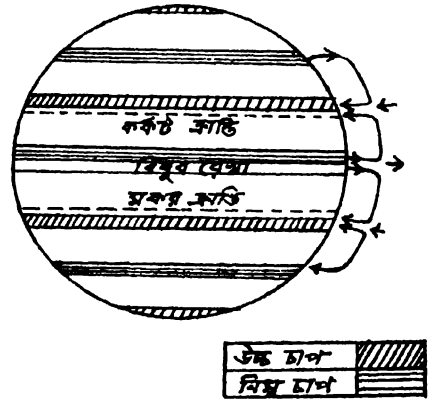
বায়ুচাপ বলয় এবং বায়ুর উচ্চ স্তরের স্রোত।

(৪-৫) সুমেরু ও কুমেরু-বৃত্ত অঞ্চলের নিম্নচাপ বলয়—পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে এই অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেজন্য ৭০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের নিকটবর্তী-স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

(৬-৭) উত্তর ও দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলীয় উচ্চচাপ বলয়—অতিরিক্ত শৈত্যের প্রভাবে এবং সূর্য-রশ্মির প্রখরতার অভাবে এখানকার জলীয় বাষ্পশূন্য বায়ুতে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়।

এই সকল উচ্চ ও নিম্নচাপযুক্ত বায়ু-বলয়গুলিই

প্রকৃতপক্ষে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে; কিন্তু পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য সূর্যের আপাত উত্তর ও দক্ষিণ গতির ফলে উক্ত চাপ বলয়গুলিও উত্তর ও দক্ষিণে সরিয়া যায়। কারণ তাপের তারতম্য বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে, এবং সেই তাপের উৎস সূর্য। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাপ বলয়গুলির এইরূপ স্থান পরিবর্তনের জন্য বায়ু বলয়গুলিও উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে প্রায় ১১° উত্তরে ও শীতকালে প্রায় ১১° দক্ষিণে সরিয়া যায়। এইজন্য কোন কোন স্থানে শীতকালেও পশ্চিমা বায়ুর জন্য বৃষ্টি হয়। এইজন্য বৃষ্টিকে সূর্যের অনুগামী বলা যায়।

সূর্যের আপাত-গতি, তাপ বলয় ও বায়ু বলয়ের পরস্পর সম্বন্ধ। তীর চিহ্নগুলি বায়ুর গতিপথ নির্ণয় করিতেছে।

নিম্নস্তরের বায়ু প্রবাহের সূত্রগুলি যদিও আমরা কিছু জ্ঞাত হইয়াছি; উচ্চস্তরের বায়ু সম্বন্ধে বহু পর্যবেক্ষণ করিয়াও ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। ব্যোমপথে বিচরণের সুবিধার জন্য উচ্চস্তরের বায়ুর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের বিশেষ আবশ্যক; কারণ এরোপ্লেনের যন্ত্র-কৌশলের যত উন্নতিই হোক, তাহার ব্যবহার নির্ভর করে বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের উপর; অবশ্য সকল দেশের বিজ্ঞানীরাই নানাপ্রকার বেলুনের সাহায্যে এই তথ্য উদ্‌ঘাটনে যত্নবান।

বায়ুপ্রবাহের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে ইহা অবশ্যই জানা আবশ্যক যে, বায়ু যে-দিক হইতে প্রবাহিত হয় সেই দিকের নামানুসারে বায়ুর নামকরণ হয়। যেমন উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুর নাম উত্তর-পূর্ব বায়ু।

সাধারণতঃ বায়ুপ্রবাহ নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং ঐ উভয় মেরু হইতে নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকিলে অর্থাৎ পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন না করিলে বায়ু প্রবাহ সোজা উত্তর-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-উত্তরে প্রবাহিত হইত; কিন্তু পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির ফলে বায়ু প্রবাহের দিক সোজা না হইয়া উত্তর গোলার্ধে ইহা ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাঁকিয়া যায়। উচ্চ হইতে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হইবার সময় বায়ু সাধারণতঃ এই সূত্রানুসারে প্রবাহিত হইলেও পার্বত্য উপত্যকা বা নগরীর রাস্তায় এই সূত্রের কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। উচ্চ হইতে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হইবার সময় বায়ু যে কতখানি বাঁকিয়া যাইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সূত্র নাই; তবে সাধারণতঃ ইহা ৪৫° র অধিক

কোণ করে না ; কিন্তু অনেক সময় সমপ্রেষ রেখার সমান্তরাল হইয়াও প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বায়ুপ্রবাহের এই বঙ্কিমতার সূত্রটি ফেরেল * আবিষ্কার করায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে ফেরেল সূত্র।
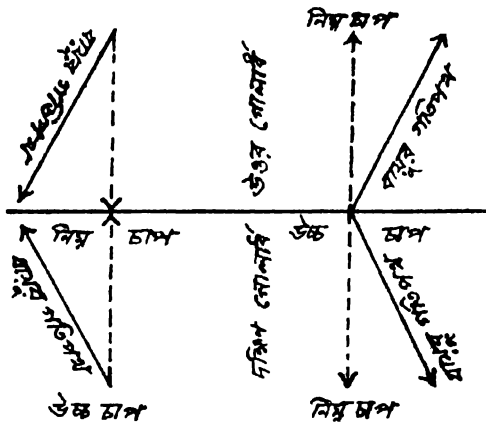
উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের দিক্

ফেরেলের এই সূত্রের সত্য নির্ধারণ করেন প্রতিফলনকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক গণিতজ্ঞ জন্ হ্যাড্‌লী (১৬৮২-১৭৪৪)। কিন্তু হ্যাড্‌লীর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য নয় বলিয়া পরবর্তী গণিতজ্ঞগণ সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হন। হ্যাড্‌লীর সিদ্ধান্ত অনুসারে বায়ুর গতিপথ যত বঙ্কিম হওয়া উচিত প্রকৃতপক্ষে তাহার আরো অধিক। পৃথিবীর যে আহ্নিকগতির জন্য বায়ুর এই বঙ্কিমগতি তাহার ক্রিয়ার আরো তথ্যের তাঁহারা সন্ধান করেন, এবং দেখান যে কেন্দ্রাপসারী শক্তিই † অনেকাংশে বায়ুপ্রবাহের দিক্ পরিবর্তন জন্য দায়ী

পৃথিবী আপন অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তর মেরুতে দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে নীচের চিত্রে "উ" স্থানে তাহার, বহির্বৃত্তের দ্বারা নিরক্ষরেখার এবং ৬০° উত্তর অক্ষাংশের অবস্থান অন্তর্বৃত্তের দ্বারা কল্পনা করা যায়। নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত যে কোন স্থির পদার্থ "ক" প্রকৃতপক্ষে উক্ত অক্ষের চারিদিকে ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল বেগে ঘুরিতেছে। এক্ষণে ইহাকে যদি ৬০° অক্ষাংশে অবস্থিত "খ"-এর দিকে চালিত করা যায়, তাহা হইলে "ক" অক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০০ মাইলেরও অধিক হইবে। কিন্তু খ-এর গতিবেগ পূর্বদিকে ঘণ্টায় মাত্র প্রায় ৫০০ মাইল ; ফলে "ক" ঠিক "খ"-এ না পৌছিয়া ডানদিকে বাঁকিয়া ঐ রেখার উপরেই "খ" হইতে অগ্রবর্তী কোন স্থানে পৌছায়। অপরপক্ষে কোন পদার্থকে যদি ঐরূপে "খ" হইতে "ক" এর দিকে চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা ঠিক "ক"-এ না পৌছিয়া ডানদিকে বাঁকিয়া নিরক্ষরেখার উপরিস্থিত "ক"-এর পশ্চাতে কোন স্থানে আসিয়া পৌছিবে। ৬০° অক্ষাংশে অবস্থিত কোন স্থির পদার্থকে যদি পূর্বদিকে চালিত করা যায় তাহা হইলে ইহা সোজা পূর্বদিকে না যাইয়া ডানদিকে বাঁকিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে যাইবে। কারণ পদার্থটি যখন স্থিরভাবে ছিল সে-সময় ইহার গতিবেগ অক্ষের চারিদিকে প্রায় ৫০০ মাইল; কিন্তু এক্ষণে ইহার গতিবেগ বর্ধিত হওয়ায় ইহার কেন্দ্রাপসারী শক্তিও বর্ধিত কার্যকরী হইয়াছে, তাহাই কেন্দ্রাপসারী শক্তি। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সুতায় বাঁধা পদার্থটিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি সুতার দৈর্ঘ্য কমান যায় তবে পদার্থটির গতিবেগ বর্ধিত হয় ; আবার বিপরীতক্রমে সুতার দৈর্ঘ্য বর্ধিত করিলে, পদার্থটির গতিবেগ কমিয়া যায়।

* মার্কিন দেশবাসী উইলিয়াম ফেরেল (১৮১৭-৯১) একজন বিখ্যাত আবহতত্ত্ববিদ্। জোয়ারের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিবার উপযুক্ত একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

† **কেন্দ্রাপসারী শক্তি**—কোন একটি ভারী পদার্থকে সুতার একপ্রান্তে বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইলে, পদার্থটি সর্বদা সুতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য এই যে প্রয়াস, তাহাতে যে পরিমাণ শক্তি

হইয়াছে; ফলে পদার্থটির গতিপথের পরিবর্তন সাধিত হইল। আবার স্থির পদার্থটিকে যদি পশ্চিম-দিকে চালিত করা যায়, তাহা হইলে ইহার
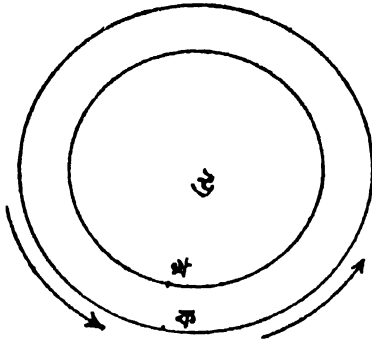
ফেরেলের সূত্রের প্রমাণ

কেন্দ্রাপসারী শক্তির হ্রাস হওয়ার ফলে পদার্থটি পশ্চিমাভিমুখে না গিয়া উত্তর-পশ্চিমে যাইবে অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও পদার্থটি ডানদিকে বাঁকিয়া নূতন পথে যাইবে। এইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত কোন পদার্থকে যদি চালিত করা যায় তাহা হইলে তাহার গতিপথ বামদিকে বাঁকিয়া যাইবে। প্রমাণটি ৬০° অক্ষাংশ ধরিয়া করিলেও ইহা সকল অক্ষাংশের পক্ষে সমভাবে সত্য। ইহাই ফেরেল সূত্রের মূল তত্ত্ব।

হ্যালী, হাডলী, ব্রাণ্ডস, বাইস্ ব্যাল্ট, ফেরেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ বায়ুপ্রবাহের যে সকল কার্যকারণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বায়ু-প্রবাহকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) নিয়ত বায়ু (খ) সাময়িক বায়ু (গ) আকস্মিক বায়ু (ঘ) স্থানীয় বায়ু। সুনির্দিষ্ট নিয়মে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইলেও জল ও স্থলের অবস্থান অনুসারে দেশভেদে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়; বোধহয় একথা বলাও অসঙ্গত হইবে না যে, প্রত্যেক মহাদেশেরই বায়ু প্রবাহের নিজস্ব ধারা আছে। নিয়ত বায়ু নিম্ন-বর্ণিত তিন ভাগে বিভক্ত—

আয়ন বায়ু—নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তপ্ত ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ লঘু বায়ু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাওয়ায় ঐ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, সেজন্য কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বায়ু সর্বদা নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেল সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ইহা উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু নামে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নামে খ্যাত। প্রাক্ বাষ্পীয়পোত যুগে পালের জাহাজ এই বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিত, সেজন্য বাণিজ্যের ইংরাজী প্রতিশব্দ Trade-এর অপভ্রংশ Tread অর্থাৎ পথ হইতে আয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু নামকরণ হইয়াছে, কারণ এই বায়ু-প্রবাহ সমস্ত বৎসরব্যাপী নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশী, সেজন্য আয়ন বায়ুর গতিপথের কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষিত হইলেও, দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের আধিক্য থাকায় এই বায়ুপ্রবাহ প্রায়ই প্রতিহত হয় না। সূর্যের আপাত গতির জন্য বায়ুচাপ বলয়গুলির সীমানার পরিবর্তন হওয়ায়, আয়ন বায়ুর গতিপথের সীমা-রেখারও পরিবর্তন লক্ষিত হয়। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১০ মাইল গতিতে কর্কট ক্রান্তি হইতে ৫° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া যত নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হয় ততই ইহার গতিবেগ কমিতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১৪ মাইল বেগে মকর ক্রান্তি হইতে নিরক্ষরেখার দিকে অগ্রসর হয়। সাধারণতঃ এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না; কিন্তু জলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহা জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে বলিয়া তখন ইহাতে বৃষ্টি হয়।

প্রত্যায়ন বায়ু—কর্কট ও মকর ক্রান্তির নিকটস্থ প্রদেশের উচ্চচাপ বলয় হইতে বায়ু নিম্ন-চাপ যুক্ত সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশের অভিমুখে ফেরেল সূত্র অনুসারে যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমে ৩০° হইতে ৬৫°

ক্ষাংশের মধ্যে প্রবাহিত হয়। শেষ গতিতে ইহা পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে পশ্চিমা বায়ুও বলে। আয়ন বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হয়, এই বায়ুপ্রবাহ উভয় গোলার্ধেই তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু এবং শীতকালে ঝড়ের আধিক্য, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নিম্নতাপ প্রভৃতি কারণে বাষ্পীয়পোতও ইহার সম্মুখীন হইতে চায় না। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ এতবেশী যে, ইহা আমেরিকায় পশ্চিমে পার্বত্য বাধা অতিক্রম করিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইউরোপের পশ্চিমে কোন পর্বত না
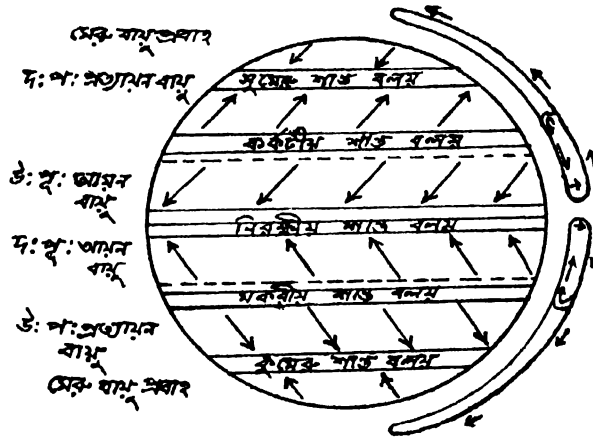
বায়ু-প্রবাহ

দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু বলে। এই বায়ুপ্রবাহ উষ্ণ হইতে শীতল প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুতে বৃষ্টি হয়। স্থলভাগের আধিক্য হেতু উত্তর গোলার্ধে ইহা আয়ন বায়ুর ন্যায় নিয়ত নয়; ইহার গতিবেগ ও দিক প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে তেমন স্থলভাগ না থাকায় প্রত্যায়ন বায়ু এখানে অনেকটা নিয়ত; তবে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের ৪০° হইতে ৫০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এই বায়ু নিয়ত বেগে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই অঞ্চলের এই বায়ুপ্রবাহের নাবিকগণ প্রদত্ত নাম "গর্জনশীল চল্লিশা"।

উত্তর গোলার্ধের অশ্ব-অক্ষাংশ মধ্যবর্তী প্রদেশে আকাশ স্বভাবতঃ নির্মল এবং বায়ু খুব ধীরে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে এই প্রদেশে ঝড় হইলেও শীতকালে অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়া ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর* ফলভোগী হয়। দক্ষিণ-গোলার্ধে "গর্জনশীল চল্লিশা" প্রবাহিত প্রদেশে থাকায় প্রত্যায়ন বায়ু মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টিপাতের সহায়তা করে; অবশ্য যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া যায় বৃষ্টিপাতও তত কম হয়। পশ্চিমা বায়ুতে সাধারণতঃ সমস্ত বর্ষব্যাপী বৃষ্টিপাত হইলেও শরৎ ও শীতকালে বৃষ্টিপাত অধিক এবং বসন্তে খুবই কম হয়।

মেরু বায়ু—সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের জলীয় বাষ্প শূণ্য অতি শীতল উচ্চচাপযুক্ত বায়ু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্নচাপ বলয়ের অভিমুখে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে সারা-বৎসর নিয়মিতভাবে অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে। প্রবাহপথে কোন পর্বতাদিতে বাধা না পাইলে এই বায়ুপ্রবাহ বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া আসে। এই উভয় বায়ুপ্রবাহকে মেরু বায়ু বলে।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সূর্যের আপাত গতির জন্য বায়ু বলয়গুলির কখনও উত্তরে, কখনও দক্ষিণে সরিয়া যাওয়ার ফলে এই সকল নিয়ত বায়ুর প্রবাহপথের সীমারেখারও পরিবর্তন সাধিত হয়।

***ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**—সাধারণতঃ ৩০° হইতে ৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। এখানে আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি সুমিষ্ট ও রসাল ফল জন্মায়। এই জলবায়ু সকল প্রকারে মনুষ্যবাসের অনুকূল।

বিজ্ঞান ও আমরা

শ্রীদিলীপকুমার দাস

গবেষণাগারের বাইরে থেকে আজ বিজ্ঞানের ডাক এসেছে, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনায় বিজ্ঞান আজ নিযুক্ত। তার কর্মক্ষেত্র সুদূর প্রসারিত, কর্ম-চঞ্চল বিজ্ঞানকে ও তার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করবার শুভক্ষণ আজ সমগ্র মানবসমাজের নিকট উপস্থিত। এই শুভক্ষণে আমাদের মধ্যে যে সাড়া জেগে ওঠা উচিত ছিল সে সাড়া কিন্তু জাগেনি, কেন? সেকথা ভাল করে ভেবে দেখবার দিন আজ এসেছে।

একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন যে, আমরা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানবিমুখ রয়েছি আমরা সকলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নই বলেই। দেশের নিরক্ষর এক বৃহৎ অংশের কথা ছেড়ে দিয়েও আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অতি ক্ষুদ্র যে শিক্ষিত সমাজ রয়েছে সেই সমাজভুক্ত শিক্ষিতেরাও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। তাঁরা বিজ্ঞানকে রেখেছেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে। বিজ্ঞানের স্থান, তাঁদের মতে, এমন এক এলাকায় যে, সেখানে সবাইকার প্রবেশাধিকার নেই। তাঁরা বিজ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেখেই নিরস্ত হয়েছেন, প্রয়োজন বোধ করেননি বিজ্ঞানের যাথার্থ্যটুকু উপলব্ধি করতে। এর কারণ অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থার গলদ, যার মূলে আবার রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষিতই করে, জ্ঞানের আলো জ্বালাতে পারে না। সকল প্রকার শিক্ষাকেই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছি ও তারই পরিণাম আজকের বিজ্ঞান বিমুখতা।

পাশ্চাত্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের চাইতে অনেক বেশী সচেতন। ওদেশে যে বিজ্ঞানের প্রসার খুব অনুকূল অবস্থার মধ্যে হয়েছে তা নয়, তাহলে ওরা আমাদের চাইতে বেশী সচেতন হলো কি করে?

মানবসমাজে এমন একদিন ছিল যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজের যোগ্য কিংবা অযোগ্য সেটা স্থির করা হতো সেই ব্যক্তি সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী কোন শ্রেণীর অন্তর্গত তা থেকে। অর্থাৎ (উদাহরণ হিসেবে বলা হচ্ছে) কোনও রজকের দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ হ'বার যোগ্যতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে তখনকার সমাজে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সামাজিক কারণোদ্ভূত প্রতিপত্তিশীল একশ্রেণীর লোক ক্ষমতাহীন অপর একশ্রেণীর লোককে সকলপ্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে অনেক কাজেরই অযোগ্য করে তুলেছিলেন। উক্ত ক্ষমতাহীনেরা যে সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার মধ্যে শিক্ষা প্রধান। আমাদের দেশের উদাহরণ দিয়েই বলা যেতে পারে যে, সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী নিম্নশ্রেণী-ভুক্ত কোনও ব্যক্তিকে যদি শিক্ষিত হতে দেখা যায় তাহলে উচ্চশ্রেণীভুক্তেরা বলে থাকেন, 'দেখ, ছোটলোকের কাণ্ড দেখ', অর্থাৎ ঐ তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা যেন যেকোনও প্রকার শিক্ষার অযোগ্য। মানুষের এই ভুল অবশ্য আজ ভেঙেছে। মানুষ গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। সাধারণতঃ তার দৈহিক গঠনভংগী অভি-যোজিত হয় সামাজিক পরিবেশের সংগে, আর মানসিক দৃষ্টিভংগী অভিযোজিত হয় সামাজিক পরিবেশের সংগে। এই দুই পরিবেশের মাঝে যদি কোনও মানুষ সুস্থভাবে গড়ে ওঠে, তাহলে সব কাজই সে করতে পারে; কিন্তু সব কাজে সবাই সমানে পটু হতে পারে না। এই বিষয়ে গবেষণা

করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, সকল প্রাণীর গঠন-ভংগীর মূলে যে Gene রয়েছে। মানুষের কোনও কোনও কাজে পটুতালাভের প্রকারভেদের মূলেও Geneএর তারতম্য রয়েছে, Geneএর বিভিন্নতা-হেতু সবাই একই কাজে সমান পটু হতে পারে না।

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রেণীবৈষম্য কোন ব্যক্তি কোন কাজের যোগ্য অথবা অযোগ্য সেটা নির্ণয় করতে পারে না। অথচ একদিন শ্রেণী-বৈষম্যের অন্যায় ব্যবস্থাই এক শ্রেণীর লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পথে বাধা স্থাপন করে এসেছে ও উক্ত শ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞতা হেতু ঐ ব্যবস্থাকেই তাদের অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিয়েছে। পাশ্চাত্যে এই অন্যায় ব্যবস্থা বেশীদিন চলতে পারে নি। সেখানে সব অন্যায় দূরীভূত না হলেও কিছুটা হয়েছে ও সেই জন্য ওদের দেশের এক বৃহৎ অংশ শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে। শিক্ষালাভের ফলস্বরূপ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওরা আজ বেশ সচেতন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওদের চেতনা লাভের আরও একটা কারণ আছে। পাশ্চাত্য সমাজে আদর্শবাদী ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয় শিল্প ও ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির সংগে সংগে। আবার শিল্প ও ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির সংগে সংগে বিজ্ঞানেরও বিকাশ হয় প্রয়োজনের তাগিদে। বিজ্ঞান বিকাশের সংগে পাশ্চাত্যে গড়ে ওঠে একটা বৈজ্ঞানিক পরিবেশ, সেইজন্যই বোধ হয় আজ ওরা বিজ্ঞানমুখী হতে পেরেছে। পাশ্চাত্য সমাজের পরিবর্তন লাভের যুগে আমরা বিশেষ পরিচিত হতে পারিনি তখন যুদ্ধ বিগ্রহের দরুণ শাসনতান্ত্রিক যে অব্যবস্থা চলছিল তারজন্য। তারপর আমাদের কাঁধে এসে চাপলো বিদেশী শাসনভারের বোঝা। বিদেশী শাসনকর্তাদের ছিল চৌকিদারী মনোবৃত্তি, তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেনি শাসিতের শিক্ষা কিংবা শিল্প বিস্তারের। বরং তাঁরা জিইয়ে রাখলেন এমন এক শ্রেণীর লোককে যাদের পরজীবী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই পরজীবীদের আহার জোগাতেই দেশের লোক হয়ে গেছে নিঃস্ব—অব্যবস্থাকেই সজীব রেখে রয়ে গেল অজ্ঞতা ও অশিক্ষা।

বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আজ মানব সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন উঠেছে। মানব-সমাজের একাংশ হয়ে আমরাই বা এ সম্বন্ধে নীরব থাকব কেন? শিক্ষাব্যবস্থার গলদের দরুণ আমরা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারিনি ও সেজন্য বিজ্ঞানমুখীও হতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল, জনৈক ধনী অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে গণিতশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে মন্তব্য করতে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হিসাব তো একই হ্যায়,' অতএব বি. এ, এম. এ, ক্লাসে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করে এমন কি আর লাভ হবে! বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রসারের ব্যাপারে আমরা যদি ঠিক এই মনোভাবই পোষণ করি, তাহলে মস্ত বড় ভুল করব। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ ও তার কুফল যখন আমরা জানতে পেরেছি তখন নিশ্চয়ই ভুলপথে চলে আমরা আমাদের অজ্ঞতাকে চিরস্থায়ী করে রাখব না।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আগে শিক্ষিত হবে তারপর তারা বিজ্ঞানমুখী হবে এই আশায় থাকলে আমরা অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পেছনে পড়ে থাকব। বিজ্ঞান প্রচারের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রয়ো-জনীয়তা সম্বন্ধে যদি আমরা আমাদের নিরক্ষর জন-সাধারণকে সজাগ করে তুলতে পারি তাহলেও দেশ বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠবে। জনসাধারণের উন্নতিসাধনে আজ বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা হচ্ছে—একথা স্মরণ রেখেই আমাদের শিক্ষিত সমাজকে দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞানের প্রয়ো-জনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করে তোলবার ভার গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত শক্তি-সমূহ যে ধ্বংসকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার জন্য দায়ী, বিজ্ঞান নয়, মানুষের অশুভবুদ্ধি—একথাটুকুও স্মরণ রেখে তাদের বিজ্ঞান প্রচারের কাজে নামতে হবে। বিজ্ঞান প্রচারের দ্বারা সুস্থ মানব-সমাজ গঠনে যেটুকু সহায়তা করা হবে, তাতে বিজ্ঞানের যথার্থ রূপই প্রকাশ পাবে।

পদার্থের গঠনরহস্য ও পারমাণবিক শক্তি

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোর[1] পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন অনেক সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। যখন কোন ইলেকট্রন কোন বিশেষ কক্ষে ঘোরে তাহার একটি বিশেষ শক্তি আছে, কারণ উহা একটি তড়িৎ-ক্ষেত্রে ঘুরিতেছে। ওই কক্ষোপযোগী শক্তি নিত্য, উহার হ্রাসবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই; অতএব উহা হইতে কোন শক্তি-উৎপাদিত বা অপসারিত হইবে না। কক্ষ, কেন্দ্রক হইতে যত দূরবর্তী হইবে, তত উহার শক্তিও বাড়িয়া যাইবে এবং কোন ইলেক্ট্রন যদি দূরবর্তী কক্ষ হইতে নিকটবর্তী কক্ষে লাফাইয়া পড়ে, তাহার খানিকটা শক্তি ক্ষয় হওয়া সম্ভব এবং এই খোয়ান শক্তি পরমাণু হইতে শক্তি বিকিরণ করিবে। এই ভাবেই উত্তেজিত গ্যাস হইতে আমরা আলোক পাই। অতএব বোর ভাবিলেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণু ১ নম্বর চিত্রানুযায়ী গঠিত।
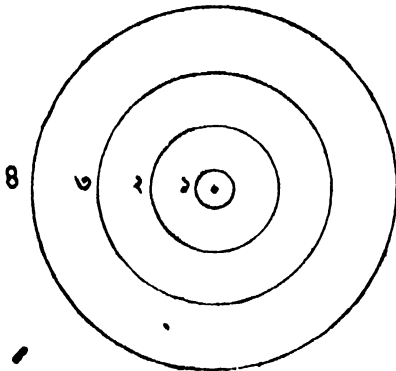
১নং চিত্র

কেন্দ্রক 'ক'র চতুর্দিকে কয়েকটি বৃত্তাকার কক্ষ আছে এবং ইলেকট্রনটি যে কোন কক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোরে। বোর আরও ভাবিলেন যে, প্রত্যেক কক্ষের উপযোগী শক্তি যখন নিত্য, উহার একটি নির্ধারিত মূল্য আছে এবং অপর কক্ষ-শক্তি হইতে বিভিন্ন। ১ম কক্ষে ইলেক্ট্রন যখন ঘূর্ণায়মান, উহার শক্তি ধরা যাক্ $শ_১$, ২য় কক্ষে $শ_২$ ইত্যাদি। ২য় কক্ষ হইতে ১ম কক্ষে যদি ইলেক্ট্রন লাফাইয়া পড়ে, $শ_২—শ_১$ শক্তি নিশ্চয় মুক্ত হইয়া যাইবে এবং এই শক্তি তরঙ্গাকারে বহির্জগতে বিকিরিত হইবে। এই তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা ($শ_২-শ_১$) এর সহিত সমানুপাতিক। ইতিমধ্যে আর একটি বিষয়ের উদ্ভাবন হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্ল্যাঙ্ক বলিলেন যে, পরমাণু থেকে শক্তি বিকিরিত হয়—সবিরামভাবে ধাপে ধাপে ও এই ধাপের মূল্য hn বা hnএর কোন গুণিতক। n হচ্ছে বিকিরকের স্বাভাবিক কম্পন সংখ্যা ও h কে বলা হয় প্ল্যাঙ্ক কন্‌ষ্ট্যাণ্ট বা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। অতএব বোরের মুক্ত শক্তি $শ_২—শ_১ = hn$। এ বিষয়ে আইনষ্টাইন কি বলেছেন একটু বলিব। ব্যোমতরঙ্গ, বিশেষতঃ খুব বেশী কম্পনসংখ্যার আলোক তরঙ্গ অতি বেগনি রশ্মি বা রঞ্জনরশ্মি অনেক কঠিন পদার্থের উপর পড়িয়া ইলেকট্রন নিষ্কাশিত করে। ইহাকে ফটো-ইলেকট্রিক ব্যাপার বলে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন বলিলেন যে, এই ব্যাপার নিম্নলিখিতভাবে ঘটে :—

$$\frac{1}{2} m. v^2 \text{ (energy বা শক্তি) } + p = hn$$

যদি p পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রনকে বহিস্কৃত করিবার উপযোগী শক্তি বা কার্য হয়, $\frac{1}{2} m. v^2$ হচ্ছে সেই শক্তি যাহা লইয়া ইলেক্ট্রন পদার্থকে ছাড়িয়া যাইতেছে, আর ইলেক্ট্রন যখন কক্ষান্তর হয় p হইল ইলেক্ট্রনকে কক্ষান্তর করিবার শক্তি। এখন বোর ও আইনষ্টাইন ইলেক্ট্রনিক ও বিকিরিত

(১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১ম বর্ষ, পৃঃ ৫৯

শক্তি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা আমাদের দিলেন। এক কথায় বলা যায় যে, এই নূতন মতানুসারে শক্তি যখন ব্যোমে বিকিরিত হইয়া বেড়ায়, তখন আমরা পাই যে, শক্তিপুঞ্জ (hn) একের পর একে ধাপে ধাপে চলিতেছে আলোকের বেগে। এই শক্তিপুঞ্জকে ফোটন বা লাইট কোয়াণ্টা বলে। এই সময় এক বিতর্ক উঠিল দুইটি মত লইয়া—প্ল্যাঙ্কের মতে শুধু নিষ্কাশিত শক্তির প্রবাহ সবিরাম শক্তি-পুঞ্জ প্রবাহ এবং আপতিত অবিরাম ব্যোমতরঙ্গকে পরমাণুর আভ্যন্তরিক বিশিষ্ট বিধিব্যবস্থা অবিরাম শক্তিপুঞ্জ প্রবাহে পরিণত করে। টম্‌সন্‌-আইন্‌ষ্টাইনের মতে পরমাণু ব্যোমতরঙ্গশক্তি শোষণ করে সবিরাম ভাবে এবং নিষ্কাশিত শক্তিও সবিরাম; ব্যোমতরঙ্গ যদি আসিয়া পড়ে hn শক্তি লইয়া কোন মুক্ত ইলেকট্রনের উপর, উহার কিছু ভাগ উহাকে দিয়া বাকী শক্তি (hn) লইয়া একটু বাঁকিয়া প্রবাহিত হইবে। অতএব n_o, n অপেক্ষা কম অর্থাৎ আপতনশীল তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা অপেক্ষা নিষ্কাশিত তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা কম, যথা সবুজ আলোক পরমাণুতে পড়িয়া লাল হইয়া বাহির হইতে পারে; অতি বেগুনি রশ্মি বেগুনি হইয়া নিষ্কাশিত হইতে পারে।

গ্যাস উত্তেজিত হইলে আলোক দেয় একথা অনেকে জানেন। সেই আলোক কলম বা প্রিজম্‌ দিয়া বিশ্লেষিত হইলে অনেকগুলি উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হয়। প্রত্যেক রেখাটি একটি নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যার তরঙ্গের প্রতিরূপ। প্রত্যেকটির কারণ একটি নিদিষ্ট কক্ষ হইতে অপর একটি নির্দিষ্ট কক্ষে ইলেকট্রনের লম্ফন। সাধারণভাবে থাকিলে হাইড্রোজেনের উক্তরূপ কোন রেখা দেখা যায় না, কেবল ইলেকট্রন বিচ্যুত হইলে বা কোন রকমে উত্তেজিত হইলে অর্থাৎ ইলেকট্রন কক্ষ বদলাইলেই উহা প্রকাশিত হয়। অতএব উহার প্রত্যেক রেখার উপযোগী কম্পনসংখ্যার সহিত মিলাইয়া বোর কক্ষের সংখ্যা স্থির করিলেন এবং অঙ্ক কষিয়া ইহাও স্থির করিলেন যে, কক্ষগুলির ব্যাসার্ধ $১^২, ২^২, ৩^২, ৪^২ \cdots$'র সমানুপাতিক। পদার্থ উদ্ভুত আলোক বা ব্যোমতরঙ্গ কলম দ্বারা বিশ্লেষিত হইলে যে বর্ণ বিন্যাস বা রেখা বিন্যাস পাওয়া যায়, তাহার সহিত উক্ত পরমাণুর ইলেকট্রন ঘুরিবার কক্ষগুলির সম্বন্ধ কত নিকট তাহার একটা ধারণা করা গেল। হাইড্রোজেন ও একটি ইলেকট্রন-বর্জিত হিলিয়াম—উভয় পরমাণুরই ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন একটি করিয়া ও কক্ষগুলি উপরোক্তভাবে সাজান; অতএব উভয়ের রেখা বিন্যাস ঠিক একমতই হওয়া উচিত; কিন্তু সামান্য একটু পার্থক্য লক্ষি হইলত। এ পার্থক্যের কারণ কি? এ দুটির ভিতর একমাত্র পার্থক্য হইতেছে যে, হিলিয়াম কেন্দ্রক হাই-ড্রোজেন কেন্দ্রকের চতুর্গুণ ভারী। এখন ভাবা হইল যে, প্রত্যেকের কেন্দ্রক ও ইলেকট্রন উভয়ই ঘূর্ণায়মান সাধারণ ভার কেন্দ্রের চতুর্দিকে ও হিলিয়াম্‌ কেন্দ্রক হাইড্রোজেন কেন্দ্রক অপেক্ষা চতুর্গুণ ভারী, অতএব অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট বৃত্তাকারে ঘুরিবে এবং ইলেকট্রন ঘুরিবার কক্ষগুলিও বদলাইয়া যাইবে। ইহা অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ হয়। কোয়াণ্টাম মতবাদ-প্রয়োগ করিয়া সমারফেল্ড দেখালেন যে, হাইড্রোজেনের ২য় কক্ষ ২টি হওয়া উচিত—$২_১$ ও $২_২$—একটি উপবৃত্তকার ও অপরটি বৃত্তাকার, ৩য় কক্ষ ৩টি—$৩_১$, $৩_২$, $৩_৩$; ৪র্থ ৪টি—$৪_১$, $৪_২$, $৪_৩$, $৪_৪$ ইত্যাদি। তিনি আরও বলিলেন যে, পরাক্ষ (Major axis): উপাক্ষ (Minor axis)—পূর্ণ সংখ্যা : লঘী সংখ্যা, অর্থাৎ $২_২$, $৩_৩$, $৪_৪$ গুলির পরাক্ষ ও উপাক্ষ সমান। সুতরাং ওগুলি বৃত্তাকার—$২_১$ এর পরাক্ষ : উপাক্ষ $= ২:১$; অতএব কক্ষটি

উপবৃত্তাকার। এইভাবে বোর ও সমারফেল্ড হাইড্রোজেন পরমাণুর চিত্র আঁকিলেন যথা—

রেখার মধ্যে কোথাও কোথাও যে দ্বিত্ব লক্ষিত হয় তাহার কারণ আবিষ্কৃত হইল। তড়িৎশক্তিক্ষেত্রজ
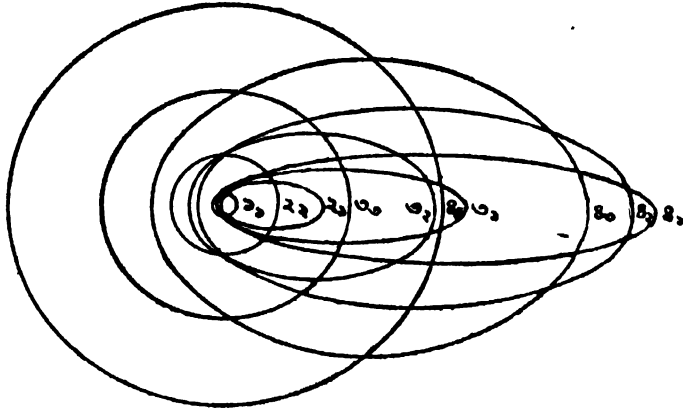
২নং চিত্র

উপবৃত্ত-কক্ষগত ইলেকট্রনের গতিবেগ কম বেশী হইবে তাহার সংস্থিতি অনুযায়ী। অতএব নবমতানুসারে তাহার জড়মানও সেই হিসাবে কম বেশী হইবে এবং অঙ্ক দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, বৃত্তকক্ষগত ইলেকট্রন ও উপবৃত্তগত ইলেকট্রনের শক্তি কিছু পৃথক এবং এইভাবে বর্ণ-বিন্যাসের রেখার মধ্যে কোথাও কোথাও যে দ্বিত্ব লক্ষিত হয় তাহার কারণ আবিষ্কৃত হইল। তড়িতশক্তি

৩নং চিত্র

বা চৌম্বকশক্তিক্ষেত্রজ রেখা বিন্যাসের বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে অনেক সমস্যারও সমাধান হইল। বোর মতবাদ এইভাবে বহু সমস্যার সমাধান করিতে লাগিল এবং উহা পরীক্ষা করিতে করিতে নয় দশ বৎসর কাটিয়া গেল। এই সব পরীক্ষার ফল বিশেষ করিয়া ১৯২৩ সালে বোর মৌলিক পাদর্থের পর্যবৃত্ত ছকটি (জ্ঞান বিজ্ঞান ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫৬) নূতন করিয়া গড়িলেন। ৩য় চিত্রে উহা দেওয়া হইল। এই নূতন ছক অনুসারে ১ম পর্যায়ে পড়িল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম; ২য় পর্যায়ে Li, Be, B, C, N, O, F ও Ne; তৃতীয়ে Na, Mg, Al...A; ৪র্থে K, Ca, Se...Br, Kr; ৫মে Rb, Sr...X; ৬ষ্ঠে Cs, Ba···Ni ও ৭মে বাকীগুলি। এই ছকে একরকম গুণযুক্ত পরমাণুদের সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে, যথা—He, Ne, A, Kr, Xe, ও Nb একরকমগুণযুক্ত এবং Na, K, Rb, Cs, ৮৭ সংখ্যক অনাবিষ্কৃত পরমাণু, Cu, Ag ও Au এক রকম গুণযুক্ত ইত্যাদি। তারপর তিনি প্রত্যেকের বৃত্তকক্ষ ও উপবৃত্ত কক্ষের সংখ্যা নিরূপণও করিয়াছিলেন।

এখন একটা কথা ঠিক করিয়া বলা যায় যে, বিভিন্ন পরমাণু ইলেকট্রন ও প্রোটনের বিভিন্ন অনুপাতে সমাবেশ মাত্র; অনুপাত বদলাইয়া গেলে পরমাণুও বদলাইয়া যাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণাবলীও বদলাইয়া যাইবে। অতএব ইলেকট্রন ও প্রোটনের অনুপাত ও বিন্যাস বদলাইতে পারিলে এক বস্তু অপর বস্তুতে পরিণত হইতে পারিবে। পদার্থের এই রূপান্তর পরীক্ষাগারে করা হইয়াছে এবং প্রকৃতিতে আপনা আপনিও হইতে দেখা গিয়াছে।

পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিবার ক্ষমতা সকল রশ্মির সমান নয়। সাধারণ অলোকরশ্মি অপেক্ষা রঞ্জন-রশ্মির এই ক্ষমতা বেশী, গামা রশ্মির ক্ষমতা আরও বেশী। এই সময় আর এক প্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইল তাহার এই ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী, তাহাকে ব্যোমরশ্মি বলা হয়। পরমাণু ভেদ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ খুব বাড়িয়া গেল ইহার দ্বারা। বিজ্ঞানীরা গামা ও ব্যোমরশ্মি খুব ব্যবহার করিতে লাগিলেন এজন্য। এইভাবে পরীক্ষা করিতে করিতে পরমাণুর ভিতর হইতে ইলেকট্রনের মত পরা-আধানযুক্ত এক জিনিস নিষ্কাশিত হইতে দেখিলেন অ্যাণ্ডারসন্[১]; সে আজ ১৬ বৎসরের কথা। ইহার নাম দেওয়া হইল পরা-ইলেট্রন বা পজিট্রন। ইলেকট্রন কথাটা ব্যবহার হইত দুই অর্থে—পদার্থ-কণাটির ভর ও আধানের একক যাহা ওই কণাতে পাওয়া যায়। যখন প্রথম অর্থটি মাথায় থাকে ইলেকট্রনের নাম দেওয়া হইল নিগেট্রন, নূতন শব্দ পজিট্রনের সহিত মিলাইয়া। পারমাণবিক বিশ্লেষণ ভাল করিয়া করিবার জন্য বহু প্রথা অবলম্বন করিলেন বহু বিজ্ঞানী, যথা—C. C. Lauritsen ও R. D. Benett,[২] Cassen[৩], Lawrence,[৪] Tuve.[৫] Cockroft ও Walton,[৬] Curie-Joliot[৭] ইত্যাদি। এই সব পরীক্ষা যখন চলিতেছিল, বিকিরণগুলি ভাগ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে Chadwick[৭] দেখিলেন যে, পরমাণুতে একঅংশ আছে যাহা প্রায় প্রোটনের মত ভারী, কিন্তু তাহার কোন আধান নাই। ইহার নাম দেওয়া হইল নিউট্রন। এই আবিষ্কারের ফলে বোরের মতবাদ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। বোরের মতটা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া,

১ Scienee Lxxvi (1932) 238
২ Phys. Rev. XXXII (1928), 850।
৩ Phys. Rev. XXXVI (1930) 988।
৪ Phys. Rev. XLIV (1933), 35।
৫ Journal of the Franklin Institute CCXVI (July 1933),।
৬ Proc. Roy. Soc. A C XXXVII (1932), 229।
৭ Compt. Rend. CXCIV (1934) Jan 18, 273.। ৭ Nature, Feb. 1932, CXXIX' 34, 312। Proc. Royal Sic. 3., CXXXVI (1932), 692 & CXLII (1933),।

Chadwick বলিলেন যে, নিউট্রন আর কিছুই নয়, কেবল ঘনিষ্ট ভাবে আবদ্ধ একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রন। আমরা জানি যে, কেন্দ্রকে পারমাণবিক ওজনের সঙ্গে সমসংখ্যক প্রোটন আছে; আর এই সংখ্যা হইতে পরমাণু-সংখ্যা বাদ দিলে কেন্দ্রকের ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রকের ভিতরে যতগুলি ইলেক্‌ট্রন আছে, সেগুলি ততগুলি প্রোটনের সঙ্গে মিলিয়া ততগুলি নিউট্রন করিবে এবং বাকী প্রোটনগুলির সংখ্যাই পরমাণু-সংখ্যা বা কেন্দ্রক আধান। তাহা হইলে নিউট্রনের ওজন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনের সমান হওয়া উচিত, কারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে একটি প্রোটন ও তার বাহিরে একটি ইলেক্‌ট্রন ঘূর্ণায়মান। Chadwick পরীক্ষা করিয়া নিউট্রনের ওজন বাহির করিলেন ১'০০৬৭ অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১'০০৭৭ হইতে '০০১ কম। তিনি বলিলেন প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন বদ্ধ হইতে গিয়া কিছু শক্তি ক্ষয় হইয়াছে এবং তদনুরূপ ওজনও কমিয়া গিয়াছে। অতএব সেই ভাবে দ্রুত হিলিয়াম দিয়া Be পরমাণুকে ভেদ করিলে কার্বন্ ও নিউট্রন পাওয়া যাইতে পারে, যথা—

পঃ ওঃ — ৯   পঃ ওঃ — ৪   পঃ ওঃ — ১২   ১
Be + He → C + ₀n
পঃ সঃ — ৪   পঃ সঃ — ২   পঃ সঃ — ৬
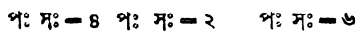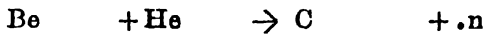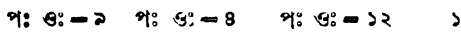
[পঃ সঃ — পরমাণু সংখ্যা ; পঃ ওঃ — পরমাণু ওজন]

এই ভাবে B (বোরোন) থেকে N (নাইট্রোজেন) ও n (নিউট্রন) পাওয়া যাইতে পারে, যথা—

পঃ ওঃ — ১১   পঃ ওঃ — ৪   পঃ ওঃ — ১৪   ১
B + He → N + ₀n
পঃ সঃ ৫   পঃ সঃ — ২   পঃ সঃ — ৭
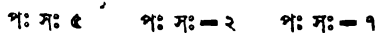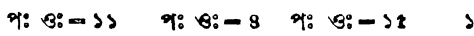
কিন্তু Anderson ও Chadwickএর এই দুটি আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের একটু গোলমালে ফেলিয়া দিল—তাহা হইলে পরমাণুর মৌলিক উপাদান কি? পরা ইলেক্‌ট্রন অপরা ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন, না পরা ইলেক্‌ট্রন, অপরা ইলেক্‌ট্রন ও নিউট্রন। Maxwell অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটে বা আছে, সকলেরই মূল তড়িৎচুম্বক ঘটিত। হাইসেনবার্গও Wave Mechanics এর সাহায্যে matterকে উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু এখন এই নিউট্রনকে লইয়া কি করা যাইবে? বেশ প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন আসিয়া জুটিয়াছিল, সব matter বৈদ্যুতিক ব্যাপারে পরিণত হইতে যাইতেছিল, ওগুলিও তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে যাইতেছিল; বিজ্ঞানীরাও জগতের আদিকারণ বা মূলতত্ত্ব বাহির করিবার আশা করিতেছিলেন। জগতের আদিকারণ বাহির করিবার জন্য সকল দেশের সকল যুগের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত—সকল পদার্থ ও শক্তির একটি মূলকারণ আবিষ্কৃত হইলে বিজ্ঞজগৎ ধন্য হইয়া যাইবে। Sir James Jeans বলিয়াছিলেন "If we want a concrete picture of a creation we may think of the finger of God agitating the æther।" বহুপূর্বে উপনিষদের ঋষিরাও স্থির করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, যথা "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি"—ঐতরেয়োপনিষৎ। "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। "তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ। বৈদিক সন্ধ্যা বন্দনাতেও দেখি "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত" অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায় (তপসঃ) জন্মাইল (অধ্যজায়ত) কম্পন ও তরঙ্গ (ঋতং) ও সত্য। এই ইচ্ছাকেই "আদিকম্পন" বা বিক্ষেপ বলা হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে সৃষ্টি একটা নূতন কিছু নয়, কেবলমাত্র "চিদাকাশে স্পন্দনাত্মক সংকল্প।" আধুনিক বিজ্ঞানীরা ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনকে পাইয়া "আদিকারণ"এর গন্ধ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিউট্রনের আবিষ্কারে চিন্তিত হইলেন যে, প্রোটনটা মূল না নিউট্রনটা মূল; ১ম পক্ষে নিউট্রন দাঁড়ায় প্রোটন + ইলেক্‌ট্রন অর্থাৎ সঙ্কুচিত হাই-

ড্রোজেন পরমাণু; ২য় পক্ষে প্রোটন হয় নিউট্রন+পজিট্রন। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য Chadwick প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নিউট্রনাদির ওজন বাহির করিতে লাগিলেন। প্রথমটা প্রোটনের মূলত্বের দিকেই প্রমাণগুলি জমা হইতে লাগিল। বোথে ও বেকার,[১] রসেটি,[২] কুরী জোলিয়ট[৩] প্রমাণ করিলেন যে, যখন আলফারশ্মি বেরিলিয়াম (Be) বা বোরোন (B) এর ভিতর বেগে চালান হয় তখন পূর্বোল্লিখিত সম্বন্ধ অনুসারে নিউট্রন নিষ্কাশিত হয় এবং এই সঙ্গে গামা রশ্মিও পাওয়া যায়। গামা বাহির হওয়া মানে কিছু শক্তিক্ষয়—এই শক্তির অনুরূপ পদার্থ কোথা হইতে পাওয়া গেল? এই সব বিষয় ও প্রচুর নিউট্রন উৎপাদন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে লাগিলেন বহু বিজ্ঞানী, যথা Craw[৪], Lauritsen[৪], Solpan[৪], Rutherford[৫], Chadwick[৬] Fowler[৭] Delaseo[৭]। বহু লেখা বা গ্রাফ টানা হইল, বহু রূপান্তর প্রতীক লেখা হইল তাঁহাদের পরীক্ষার ফল হইতে; উদাহরণ স্বরূপ একটি নীচে দিলাম:—

$${}_4Be^9 + {}_1H^2 \rightarrow {}_5B^{10} + {}_0n^1 + r$$
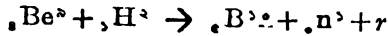
পরীক্ষাগারের বাহিরেও বিজ্ঞানীরা চুপ করিয়া ছিলেন না। তাঁহারাও এই সব লইয়া অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Oppenheimer ও Plasset[৮]। এই সকল বিবেচনা করিয়া ও নিজেরা আরও পরীক্ষা করিয়া Chadwick ও Goldhaber[৯] অবশেষে স্থির করিলেন যে, নিউট্রনের ওজন প্রোটন অপেক্ষা বেশী এবং উহাদের পার্থক্যও ইলেকট্রনের ওজনের অপেক্ষা বেশী। ১৯৩৮ সালে Bethe[১০]ও নিউট্রনের এই ওজন সমর্থন করেন। তাহা হইলে শুধু প্রোটন ও নিগেট্রন মিলিয়া নিউট্রন তৈরী হয় না, আর নিউট্রন ও পজিট্রন দিয়ে প্রোটন হইতেই পারে না। নিউট্রন আবিষ্কৃত হওয়ায় আর একটি সমস্যা উপস্থিত হইল; পূর্বে বোর পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনগুলিকে এক সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিবার ভার লইয়াছিল ইলেকট্রন; এখন কেন্দ্রকে আর ইলেকট্রনের কোন স্থান নাই, কেবল প্রোটন ও নিউট্রন। অতএব বলা হইল যে, নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যাহা প্রোটনগুলিকে পৃথক হইতে দেয় না, অর্থাৎ নিউট্রনকে একটা খুব যোজন শক্তিযুক্ত মূল বা আদি পদার্থ বলিয়া গণ্য করা হইল। ইহার সবটা বৈদ্যুতিক কারণ হইতে উৎপন্ন নাও হইতে পারে। এক্ষণে পরমাণুকেন্দ্রক সম্বন্ধে বোরের মত আর চলিল না। কেন্দ্রকে নিউট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিগেট্রন সবই থাকা সম্ভব, আবার শুধু নিউট্রন ও প্রোটনও থাকিতে পারে। এই সকল আবিষ্কারের পর আর বলা চলে না যে, কেন্দ্রকে আছে (পারমাণবিক ওজন—পারমাণবিক সংখ্যা) সংখ্যার ইলেকট্রন, বরং বলা উচিত যে, এই-সংখ্যাটি নিউট্রনের সংখ্যা—প্রোটনের সংখ্যা। কেন্দ্রক হইতে কখন কখন বিটারশ্মি অর্থাৎ নিগেট্রন ও কখন কখন পজিট্রন নিষ্কাশিত হইতে দেখা গিয়াছে; সে সম্পর্কে বলা হইল যে, একটি নিগেট্রন যখন বাহির হয়, একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়। আবার যখন পজিট্রন বাহির হয় একটি প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় ভর বা যোজন শক্তি যেটুকু বদলাইল তাহা হইতে গামা বা অন্য বিকিরণের শক্তি যোগাইয়া গেল। আমাদের জানা ছিল দুইটি তত্ত্ব, Principle of conservation of mass ও

১ Zeit. f. Physik Lxxvi, 1932, 421
২ Zeit. f. Physik Lxxvii 1932, 165
৩ Jour'd Phys. et le Radium N, 1933, 21
৪ Phys. Rev. XLN, 1933. 514, 783
৫ Proc, Roy. Soc. CXLI, 1933, 722।
৬ Nature Cxxxiv, Aug. 18 1934. 237
৭ Phys Rev. Li. 1937, 391।
৮ Phy. Rev. XLIV 1933, 53.
৯ Roy. Soc. proc. CLI. 1905, 479।
১০ Phys. Rev. Liii 1938, 313.

Principle of conservation of energy অর্থাৎ জগতের সমগ্র জড়মান নিত্য, তাহার কম বেশী হইবার উপায় নাই এবং সেই ভাবে জগতের সমগ্র শক্তিও নিত্য। এবং mass ও energyকে একেবারে বিভিন্ন ভাবা হইত। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, mass হইতে energy হইতে পারে ও energy হইতে mass হইতে পারে এবং যে কোনরূপ শক্তি বিকিরক শক্তি (radiant energy) হইয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্বেই, ডেভিসন, জারমার,[১] টমসন[২] প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা কেলাসের ভিতর দিয়া ইলেকট্রন প্রবাহ চালাইয়া ব্যবর্তন (diffraction) পাইয়াছিলেন। ব্যাবর্তন তরঙ্গের মধ্যেই সম্ভব। দুইটি পদার্থের মধ্যে সম্ভব হয় না; দুইটি তরঙ্গ মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিনষ্ট করিতে পারে; কিন্তু দুইটি পদার্থ মিলিত হইয়া নিজেদের নষ্ট করিতে পারে না, ইহা আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত জ্ঞান ছিল। এই ভাবে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও কম্পনসংখ্যা নিরূপিত হইয়া গেল। সেই সময়ই প্রমাণ হইয়াছিল যে, পদার্থকণা তরঙ্গবৎ আচরণ করিতে পারে ও তরঙ্গও পদার্থবৎ আচরণ করিতে পারে। এই করিয়া Wave Machanics নামে এক শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল এবং উহা প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম্ বাদকে সাবালক করিয়া তুলিল। এখন আমাদের বুঝিতে হইতেছে যে, matter ও radiation একই জিনিসের বিভিন্ন ভঙ্গীমাত্র। অতএব Principle of conservation of mass এর ধারণা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ২য় তত্ত্বটির ভিতরেই mass এর ধারণা রহিয়া গেল। কেবল আইনষ্টাইন্ mass ও energyর মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিলেন, যথা—$E = mc^2$ যেখানে E = energy বা শক্তি, m = mass বা জড়মান ও c = আলোক তরঙ্গের বেগ। তড়িৎ আধানের জাড্য বা ইনার্সিয়া অতএব ভরও আছে, পদার্থ চলিলে তাহার ভর বাড়িয়া যাইবে। সূর্যদেব আমাদের শক্তিদান করিতে করিতে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন।

পজিট্রন আবিষ্কার করিবার জন্য ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পাইবার পরই Anderson আর একটি জিনিস আবিষ্কার করিলেন; ব্যোমরশ্মির সঙ্গে ইলেকট্রনের মত একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিস তিনি লক্ষ্য করিলেন[১]—ইহার পরমাণু ভেদ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী। এই আবিষ্কারের পর হইতে ইহার ওজন বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। দেখা গেল যে, উহা ইলেকট্রন অপেক্ষা ২০০।২৫০ গুণ ভারী ও প্রোটন অপেক্ষা খুবই হালকা; এজন্য Anderson উহার নাম দিলেন mesotron, যাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মধ্যবর্তী কণা। এই নাম লইয়া অনেক বিতণ্ডা হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জগতের বড় বড় বিজ্ঞানীদের এক বৈঠকে উহার অনেক নাম প্রস্তাবিত হইল, যথা—mesotron, meson, mesoton, baryton, yukon, heavy electron। ভোট পাইল সর্বাপেক্ষা বেশী, প্রথম দুইটি। আমেরিকা, জাপান ও ইংলণ্ডে mesotron নাম ব্যবহার হয়, অন্যান্য দেশে mesotron, meson, mesoton ও heavy electron, এই চারিটি নামই চলিতেছে। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক একটু গুলাইয়া গিয়াছিল, মূল বা "আদি কারণ" সম্বন্ধে। ইহাও দেখা গেল যে, মেসোট্রন হইতে ইলেকট্রনও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে Euler[২] ও পরে Laph[৩] এর মৌলিক গবেষণার পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠকদের মন আকৃষ্ট করিবে।

যাহা যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সব পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর

১ Phys Rev xxx (1927) , 707
২ Nature cxix (1927) , 809

১ Phy. Rev. May 15, 1937
২ Zeit. f. feat. Phys. XVIII Qet' 1937, 577
৩ Phys. Rev. LXIX (1946), 321

ওজনের গুণিতক হওয়া উচিত। Aston[১], Dempster[২], Mattauch[৩], Barkas,[৪] Pollard[৫] প্রভৃতি এক অভিনব উপায়ে সব পরমাণুর ওজন প্রত্যয়জনক ভাবে বাহির করিলেন। দেখা গেল কোন পরমাণুর ওজনই হাইড্রোজেনের ঠিক গুণিতক নয়। Aston বলিলেন যে, এক সঙ্গে গাদিয়া যাওয়াতে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির স্থৈতিক শক্তি অর্থাৎ পোটেনশ্যাল এনার্জি কমিয়া গিয়াছে, কাজেই ভরও (mass) কম দেখা যায়। পদার্থের যে রূপান্তরের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাতেও তাহা হইলে শক্তিক্ষয় সম্ভব, কারণ রূপান্তর মানে হাইড্রোজেন কম বেশী হইয়া যাওয়া এবং সেই প্রক্রিয়াতে ভরও বদলাইয়া যাইবে; এই শক্তি বাহিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য। ইউরেনিয়াম্ বা থোরিয়াম্ এর মত অনটল পদার্থের অটল পদার্থে পরিণত হওয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক এবং এই প্রক্রিয়াতেও শক্তি বিকিরণ হয়, কিন্তু কোন অটল পদার্থের রূপান্তর জোর করিয়া করিলে হাইড্রোজেন গাদিয়া গিয়া যে শক্তি উৎপন্ন করিবে তাহা ইউরেনিয়াম বিকিরণের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। অর্থাৎ সংশ্লেষণ যে শক্তি দিবে, তাহার তুলনায় বিশ্লেষণকারণ শক্তি খুব কম। যেখানে দেখা যায় পরমাণুর প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন এর ওজন যোগ দিলে পরমাণুর ওজন অপেক্ষা বেশী হয় সেখানে বলিতে হইবে যে, পরমাণু তৈরী হইবার সময় কিছু mass কমিয়া গিয়াছে, অতএব তাহার উপযুক্ত শক্তি যুক্ত হইয়া যাইবে। উহাই কেন্দ্রকের যোজন শক্তির সমান। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে, হিলিয়ামের যোজন শক্তি খুব বেশী, অতএব উহা বেশ অটল বা স্থির; ইহাই আলফা কণা এবং ইহাই বহু পদার্থ হইতে আলফা রশ্মিরূপে বিকিরিত হয়। জগতে যত হিলিয়াম পাওয়া যায় তত আর কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। জগতে পদার্থ সব বোধ হয় অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অবস্থাতেই পরিণত হইতে চায়। Bowen মাপ করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যোমে হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা বেশী, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ হিলিয়াম ও অন্যান্য সব খুব কম। এখন আমাদের সমস্যা হইল সূর্যাদি তারকারা যে শক্তি বিকিরণ করে সে সবের কারণ কি পদার্থের রূপান্তর? Jeans ও Eddinton[১] বহুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, উহার কারণ matter এর energyতে পরিণতি; আইনষ্টাইনের মতানুসারে ($E = mc^2$)। Millikan ও Cameron প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ব্যোমরশ্মি সূর্যাদি তারকা হইতে আসে না, পৃথিবী হইতেও উৎপন্ন হয় না; এই কারণে ও অন্য কারণে ইহাও প্রমাণ হইল যে, উহা ব্যোমে হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ামাদি পরমাণু প্রস্তুত হইবার সময় উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ শক্তিতে পরিণত হয় না, পদার্থ রূপান্তরিত হইবার কালে তাহার খানিকটা শক্তিতে পরিণত হয়।

এখন দেখা যায় যে, তেজষ্ক্রিয় পদার্থের স্বাভাবিক ভাঙ্গন হইতে যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা এত কম যে, তাপ বা বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে একেবারেই সক্ষম নয়; তবুও এই শক্তি কার্যে লাগাইবার চেষ্টা আজ ৪০।৪২ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল এবং রেডিয়াম ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এক বাটী জল সমুদ্র হইতে লইয়া তাহার সমস্ত হাইড্রোজনকে হিলিয়ামে পরিণত করিতে পারিলে যে শক্তি মুক্ত হইবে তাহাতে খুব বড়

১ Roy. Soc. Proc. CLXIII (1937) 391 ॥
২ Phys. Rev, LIII (1938) 74, 869
৩ Kernphy Sikalisahe Tabellen (1942).& Phys. Zeit XLI (1940),
৪ Phys. Rev. LV (1938), 691
৫ Phys. Rev. LVII (1940), 1186

১ Nature Lxx (1904), 101, Nature XCIX (1917), 445

একটা জাহাজকে ইংল্যাণ্ড হইতে আমেরিকাতে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু এই কার্যের জন্য যতটা চাপ ও তাপ প্রয়োজন তাহা বিশ্বনিয়ন্তা দিয়াছেন শুধু তারকাদের, আমাদের হাতে তাহার অতি অতি অল্পাংশও নাই। কাজেই ইউরেনিয়ম্ পরমাণুর ভাঙ্গনের মাত্রা বাড়াইবার চেষ্টা আরম্ভ হইল প্রায় দশ বৎসর পূর্বে নিউট্রনের সাহায্যে। নিউট্রনের কোন আধান নাই অতএব উহার দ্বারা কোন পরমাণুর ভিতর অর্থাৎ পরমাণুর পরা অপরা আধানযুক্ত কণার মধ্য দিয়া চালাইলে নির্বিবাদে চলিয়া যাইবে। বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বালাই থাকিবে না, অথচ পরমাণুর ভাঙ্গন খুব বাড়িয়া যাইবে এবং এই ভাঙ্গন হেতু রূপান্তর ঘটিবেও খুব এবং অনেক শক্তি মুক্ত হইয়া যাইবে। এযাবৎ পরমাণু ভাঙ্গার চেষ্টা যত বিজ্ঞানীরা করিয়াছেন রাদারফোর্ড তাঁহাদের অগ্রণী এবং তিনিই প্রথম দেখান যে, অ-তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতেও বিকিরণ করা যায় অবশ্য সাময়িক ভাবে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের মত ধারাবাহিক ভাবে নয়; তিনিই প্রথম নাইট্রোজেন পরমাণুকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। এখন তাঁহার তিরোধনের পর উক্তরূপে নিউট্রন দ্বারা চালাইয়া ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম পরমাণুর ভাঙ্গন পরীক্ষা সম্পর্কে প্রথমেই মনে পড়ে জার্মাণীর Otto Hhn[১] ও E. Strassman[২]এর নাম। জার্মাণী ত্যাগী Dr. Lise Metner[২] ও O. R. Frich[২] ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন নিউট্রন চালাইয়া এবং অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি বাহিরে আনিতে সক্ষম হইলেন। ইহাকে "Uranium Fission" বলা হইল। এই বিস্ফোরণের ফলে ইউরেনিয়াম হইতে পাওয়া গেল দুইটি অটল পরমাণু, বেরিয়াম্ (পরমাণু সংখ্যা ৫৬) ও ক্রীপটন্ (পঃ সঃ ৩৬); এ দুইটির পঃ সঃ যোগ করিলে হয় ৯২ অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের পঃ সঃ। মন্দ গতি নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণ করিতে গেলে ২৩৫ পরমাণু ওজনের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ[৩] ব্যবহার সুবিধাজনক। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভারী বেরিয়াম্ আইসোটোপ ও ক্রীপ্টন্ আইসোটোপের পরমাণু ওজন ১৩৮ ও ৮৬, উভয়ে মিলিয়া হয় ২২৪, ইহা ২৩৫এর অনেক কম। অতএব বেরিয়াম্ ও ক্রীপ্টন্ ছাড়া কিছু নিউট্রনও বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই বহিষ্কৃত নিউট্রন পার্শ্ববর্তী ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেদ করিয়া বিভক্ত করিবে ও আরও নিউট্রন মুক্ত হইবে—এই ভাবে নিউট্রনের সংখ্যা আপনা আপনি বাড়িয়া যাইবে ও fission এর কার্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলিবে। এই ব্যাপারটিকে "Chain reaction" বলে। ঘোর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে উক্ত আবিষ্কারটির কথা ফার্মি প্রভৃতি আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বলেন। আমেরিকার বহু পরীক্ষাগারে এই ভাবে শক্তি বৃদ্ধি বা সৃষ্টির চেষ্টা হইতে লাগিল[৪]। এক বৎসরের ভিতর প্রায় ২০০ প্রবন্ধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

মুক্ত নিউট্রনের সংখ্যা যত বাড়িবে ততই উহা ইউরেনিয়াম ২৩৫ পরমাণুকে বিভক্ত করিয়া মুক্ত শক্তি বাড়াইয়া দিবে। প্রমাণ হইল যে, অতি কম সময়েই এই শক্তি অসম্ভব রকমের শক্তিযুক্ত একটা বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিতে পারে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ২৩৫ পঃ ওজনের ইউরেনিয়াম পৃথক করা

১ Natur Wissens Chaften (Jan 6, 1939)

২ Nature (Feb 11, 18, 1939)

৩ আমার প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, পরমাণুর গুণাবলী নির্ভর করে পঃ সঃ'র উপর, পঃ ও'র উপর নয়; পঃ সঃ অর্থাৎ কেন্দ্রকের আধান বজায় রাখিয়া রূপান্তর করিতে পারিলে, ভিন্ন ভিন্ন পঃ ওজনের—অথচ একরকম-গুণযুক্ত পরমাণুর সৃষ্টি সম্ভব—এইরূপ পরমাণুদের প্রথম বা আসল পরমাণুর আইসোটোপ বলে।

৪ Phys Rev. Feb. 15, 1939 : & Comptes rendus Jan, 30, 1939 :

বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। এই হইল একরকমের "ইউরেনিয়াম্ এটম্-বোম।" এস্থলে Ur. ২৩৮ কে Ur. ২৩৫ করা হইল। আবার পরমাণু-ওজন বাড়াইয়া আর একরকম "এটম-বোম"এর সৃষ্টি করা যায়। ২৩৮ পঃ ওঃ 'র ইউরেনিয়াম পরমাণু দ্রুত নিউট্রনের দ্বারা বিচলিত হইলে উহার কিছু গ্রাস করিয়া ২৩৯ ওজনের পরমাণুতে পরিণত হইতে পারে। ইহা হইতে বিটারশ্মি নির্গত হয় এবং পরমাণু সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩; ইহার নাম দেওয়া হইল নেপচুনিয়াম্। ইহা হইতেও বিটারশ্মি নির্গত হয়, নির্গত হইলে পঃ সঃ দাঁড়ায় ৯৪ ; পঃ ওঃ ২৩৯। এই বস্তুটায় নাম দেওয়া হইল প্লুটোনিয়াম। ইহা যদিও শুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা বড় শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য তথাপি ফিসনের উপযোগী অর্থাৎ ইউরেনিয়াম ২৩৫ এর মত নিউট্রনের দ্বারা বিচলিত ও বিভক্ত হইয়া ইহা "প্লুটোনিয়াম বোম" প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাই দ্বিতীয়রূপ বোম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জাতীয় শক্তি সৃষ্টির জন্য প্রচুর নিউট্রন প্রয়োজন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লরেন্স সাইক্লোট্রন নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করেন; তাহা হইতে অতিমাত্রায় শক্তিধারা নির্গত হয়। ইহার সাহায্যে দ্রুত-প্রোটন করিয়া উহা বেরিলিয়াম এর ভিতর চালাইলে প্রচুর নিউট্রন পাওয়া যায়। বিটাট্রন নামক যন্ত্রদ্বারা বিপুল শক্তিযুক্ত ইলেক্ট্রন প্রবাহ প্রস্তুত করা যায় এবং উহা ফিসন্ প্রস্তুত কার্যে লাগান হইতেছে। সম্প্রতি ব্রিটেনে সিন্‌ক্রোট্রন নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে অতিমাত্রায় ফিসন্ প্রস্তুত হইতেছে; ইহাতে পরমাণুগুলি দুই ভাগে না হইয়া বহু ভাগে বিভক্ত হইতেছে। গত ২৭শে ডিসেম্বরের খবর যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যোমরশ্মি উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। আর্নেষ্ট পোলার্ড বলেন যে, ইহার দ্বারা পরমাণুর গঠনরহস্য আরও স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়া উঠিবে এবং অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

এই ফিসন্ প্রস্তুতের ব্যাপারে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল যে, স্বাভাবিক তেজক্রিয়াতে যে পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয় তাহার বহুগুণ বেশী মুক্ত হয় ফিসন্ প্রস্তুত প্রণালীতে এবং এই প্রণালীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যটিকে বাড়াইয়া যায়।

এই পারমাণবিক শক্তি মানবদেহে অদ্ভুতরূপ প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গিয়াছে যাঁহারা ইহা লইয়া গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের ভিতর কাহারও কাহারও পুরুষত্বহানি হইয়াছে। এই বোমাবিধ্বস্ত হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে সব লোক বাঁচিয়া আছে, তাহারা নাকি অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এ শক্তির প্রভাবে মানব জাতির আকৃতি ও প্রকৃতি বদলাইয়া যাইতে পারে, আবার ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, ওই শক্তি শ্রম-শিল্প ও কৃষিশিল্পের প্রভূত উন্নতিও করিতে পারে। উহার দ্বারা চিকিৎসাপ্রণালীও খুব উন্নত হইতে পারে। যদিও হিরোশিমা ও নাগাসাকির কথা মনে হইলে উক্তরূপ শক্তিসংগ্রহ বড় ভয়াবহ বলিয়া মনে হয় তথাপি এই শক্তি মানবসভ্যতার এক নূতন যুগের অবতারণা করিতে যাইতেছে। হিসাব করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, কয়লা ও তৈল, যাহা এযুগের প্রধান শক্তি-উৎস তাহা শীঘ্রই নাকি ফুরাইয়া যাইবে এবং সেজন্য সবাই বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন দেখা যায় যে, ১ গ্র্যাম ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণে যে শক্তি দিবে তাহা বহু মণ কয়লা পোড়াইয়াও পাওয়া যাইবে না। অতএব হিরোশিমার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এই প্রভূত শক্তি দ্বারা বিজ্ঞানীরা মানবসভ্যতার মোড় ঘুরাইয়া জগৎকে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে এই তথ্য দ্বারা জগতের আদিকারণ আবিষ্কার করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।
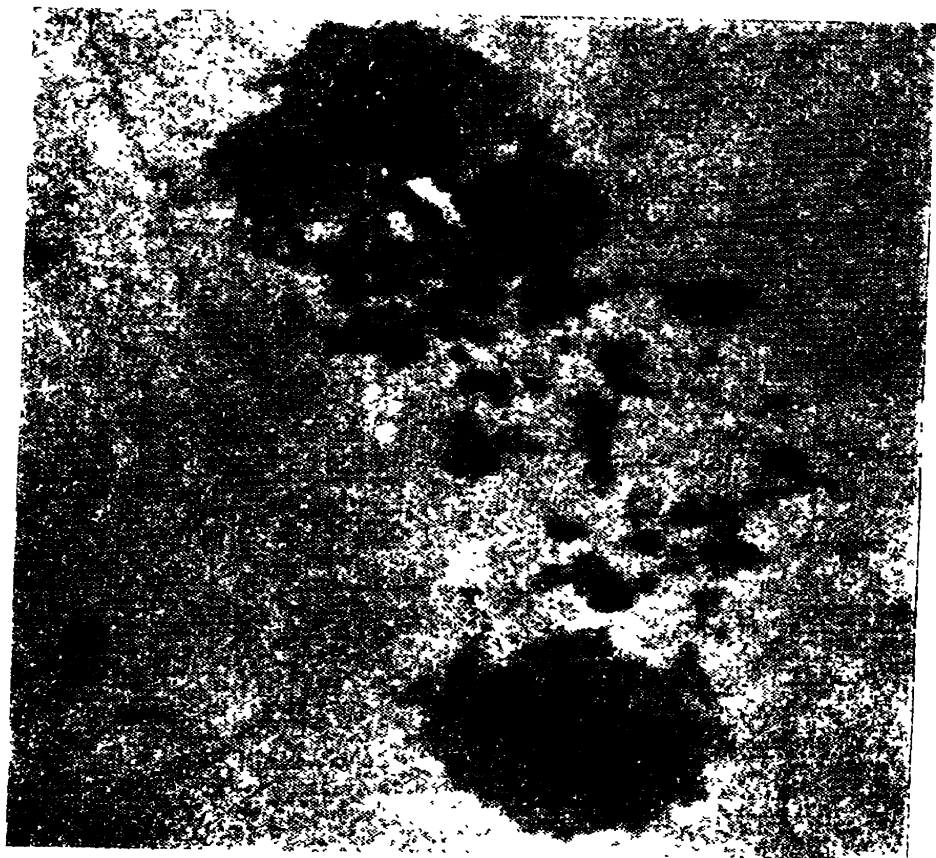
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পাখীরও কৌতূহল।

জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর জানবার জন্যে
তোমাদের কৌতূহল জাগ্রত হোক।
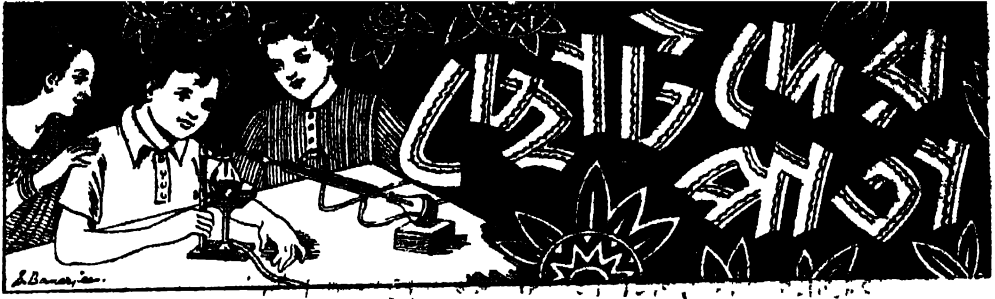
করে দেখ

কাঁচের গায়ে নক্‌সা আঁকবার সহজ ব্যবস্থা

কাঁচ জিনিষটা এমনই শক্ত যে, হীরার কলম বা অনুরূপ কোন কঠিন পদার্থ ছাড়া তাতে আঁচড় কাটাই যায় না। অথচ ফলফুল, লতাপাতা প্রভৃতি বিচিত্র রকমের নক্‌সা-আঁকা কাঁচ তোমরা হামেশাই দেখে থাক। দেখলে মনে হয়, কাগজের উপর কলম অথবা তুলি দিয়ে যেমন সহজে আঁকা যায়, কাঁচের গায়েও যেন তেমনি সহজেই ওগুলো আঁকা হয়েছে। ইচ্ছে করলে তোমরাও অতি সহজে কাঁচের উপর ওইরকমের নক্‌সা বা যাকিছু আঁকতে পার।
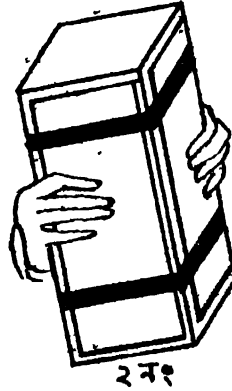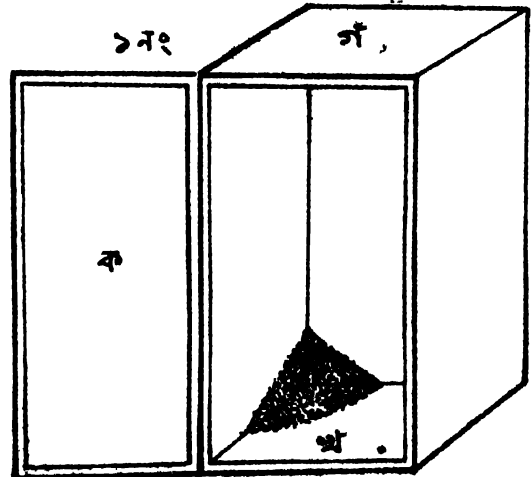
একখানা প্লেটগ্লাস বা আর্শির গায়ে তোমার নামটা স্থায়ীভাবে লিখতে চাও—কেমন করে তা' করা যায়? প্রথমে কিছু হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড যোগাড় করতে হবে। কাঁচের যে জায়গাটাতে লিখবে, খানিকটা মোম বা প্যারাফিন গলিয়ে পাতলা করে সেখানটায় লাগিয়ে দাও। মোমটা ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলে সরুমুখ একটা লোহার শলা দিয়ে বেশ চেপে চেপে

তোমার নামটা লিখে ফেল। এবার ওই লেখাটার উপর দু'এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে দাও। বিশেষ নজর রাখবে যেন অ্যাসিড গড়িয়ে মোমের বাইরে কাঁচের গায়ে কোথাও না লাগে। খালি কাঁচের উপর যেখানেই অ্যাসিড লাগবে সেখানটাই খারাপ হয়ে যাবে। পাঁচ, সাত মিনিট পরে সবসমেত মোমটাকে সাবধানে তুলে ফেলে কাঁচখানাকে বেশ করে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই দেখবে, কাঁচের গায়ে তোমার লেখাটা বেশ গভীরভাবে হুবহু ফুটে উঠেছে।

কিন্তু কাঁচের গায়ে ফুলফল, লতাপাতা বা অন্য কিছু নক্সা অথবা ছবি তুলতে হলে এভাবে সুবিধা হবে না। তার জন্যে খুব সহজ একটা উপায় বলে দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো, অনায়াসেই করতে পারবে।

ধর, ৪″×৪″ ইঞ্চি একখানা কাঁচের গায়ে নক্সা তুলতে হবে। এজন্যে দশ কি বারো ইঞ্চি লম্বা, ৪″×৪″ ইঞ্চি চওড়া চুরুটের বাক্সের মত হাল্কা একটা কাঠের বাক্স যোগাড় করা দরকার। লম্বা বাক্সটার নীচের দিকটা থাকবে খোলা অর্থাৎ নীচের দিকে কাঠ থাকবে না। আর সব দিকের পাতলা কাঠগুলো থাকবে আলগাভাবে বসানো। পাতলা কাঠগুলোকে বাক্সের মত সাজিয়ে রবারের ফিতা দিয়ে আটকে দিলেই চলবে। যদি দশ ইঞ্চি কি বারো ইঞ্চি লম্বা কাঁচের গায়ে নক্সা তুলতে চাও তবে বাক্সটা ১নং ছবির মতও করতে পার। ১নং ছবির মত বাক্সে ক ডালা খানার পরিবর্তে কাঁচ বসাতে পার। ইচ্ছামত খ অথবা গ ডালার স্থানেও কাঁচ বসানো যেতে পারে। তারপর রবারের গোল ফিতা দিয়ে উপরে, নীচে অথবা পাশাপাশি বেঁধে দিলেই চারদিক বন্ধ একটা বাক্স হয়ে যাবে। মোটরের অব্যবহার্য টিউব থেকে ফিতার মত চওড়া করে কয়েকটা ফালি কেটে নিলেই বাঁধবার কাজ চলবে। আর চাই খানিকটা এমারি পাউডার এবং সর্ষের দানার মত বা তার চেয়ে কিছু বড় কতকগুলো সীসার গুলি বা ছররা। এমারি পাউডার খুব সস্তা দরে ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম বা পালিসের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। তবে এমারি পাউডার না পেলে কাঁচের মিহি গুঁড়ো বা ভাল বালি হলেও কাজ চলতে পারে। লোহার
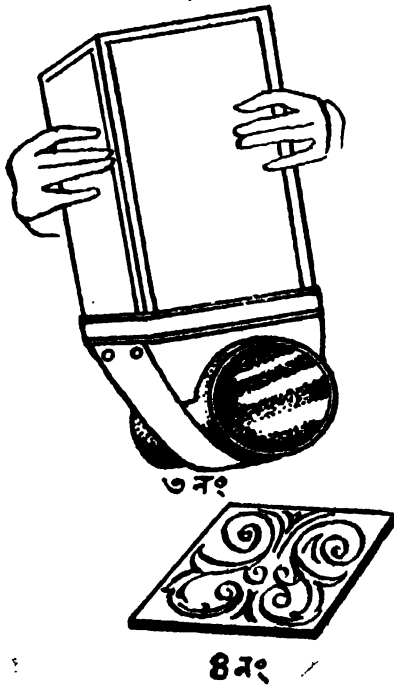
হাতায় খানিকটা সীসা গলিয়ে তরল থাকতে থাকতে একটা সরু তারের ছাঁকনির উপর ঢেলে দিবে। ছাঁকনীর নীচে থাকবে এক গামলা জল। সর্ষের দানার মত ছোট ছোট সীসার ছর্‌রা গামলার তলায় পড়বে।

কাঁচের গায়ে যেরকমের নক্‌সা তুলতে চাও পোষ্টকার্ডের মত পুরু কাগজে ধারালো ছুরি দিয়ে সেরকমের নক্‌সা কেটে নাও। ছুরি দিয়ে কেটে তুলে ফেললে নক্‌সার জায়গাগুলো হবে ফাঁকা। এবার কাঁচখানাকে পরিষ্কার করে তার গায়ে নক্‌সার কাগজখানা বেশ করে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। কাগজের কোন একটু অংশ যেন আলগা হয়ে বা উঠে না থাকে। ৪নং চিত্র দেখ। প্রায় পোয়াখানেকের মত সীসার ছর্‌রা ও এমারি পাউডার একত্রে মিশিয়ে খোলা মুখে বাক্সটার মধ্যে ঢেলে দাও। নক্‌সা-আঁকা কাগজের দিকটা ভিতরের দিকে রেখে কাঁচখানাকে বাক্সের খোলা মুখে বসাও। এবার রবারের ফিতা পরিয়ে দিলেই কাঁচখানা বাক্সের গায়ে শক্তভাবে এঁটে থাকবে। বাক্সটাকে ২নং চিত্রের মত করে উপরে নীচে কিছুক্ষণ বেশ করে ঝাঁকুনি দিতে থাক। কিছুক্ষণ এরূপ করবার পর দেখবে কাগজের নক্‌সার ফাঁকে ফাঁকে কাঁচের বিভিন্ন জায়গাগুলো বেশ ঘোলাটে দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ ঝাঁকুনির পর ঝাপসা জায়গাগুলো আরও সাদা এবং অস্বচ্ছ হয়ে উঠবে। তখন কাঁচখানাকে খুলে বেশ করে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই দেখবে, কেমন সুন্দর নক্‌সা ফুটে উঠেছে।

কাঁচের গ্লাস, বোতল বা অন্য কোন গোলাকার জিনিসের গায়ে নক্‌সা তুলতে হলে বাক্সটার খোলাদিকটাকে কেটে অর্ধগোলাকার করে নিতে হবে, যেন গোলাকার জিনিসটার খানিকটা অংশ বেশ এঁটে বসে যায়—একটুও ফাঁক না থাকে। তারপর রবারের ফিতা দিয়ে সেটাকে বাক্সের সঙ্গে এঁটে দাও। ৩নং ছবিটাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। কেবল কাঁচ নয়, এ অবস্থায় যে কোন ধাতুর পাত, ঘটি, বাটী, গ্লাসের উপরেও নক্‌সা আঁকা যেতে পারে।

গ. চ. ভ.

চোখের ভুল

অনেকের ধারণা, আমরা চোখের সামনে যা দেখি তা সবই ঠিক; অর্থাৎ কোন কিছুর আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি চোখের সামনে বার বার ভাল করে দেখবার পর স্বভাবতঃ-ই মনে হবে—প্রত্যক্ষ যা কিছু দেখা যাচ্ছে তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আমাদের চোখ অদ্ভুত রকমের ভুল করে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে যা ঠিক নয়, বার বার দেখা সত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রে তা-ই ঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি। এথেকেই তোমরা বুঝতে পারবে—আমাদের চোখ কতটা ভুল করে।

১নং চিত্র দেখ। কম্পাসের সাহায্যে একখানা কাগজকে গোল করে কেটে নাও। গোলাকার কাগজখানার ধার থেকে কিছুটা চওড়া করে বৃত্তের চাপের মত খানিকটা অংশ
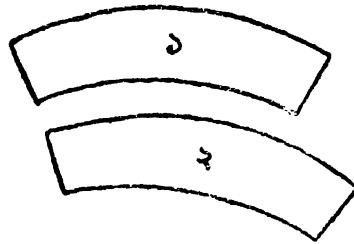
১নং চিত্র

কেটে বা'র কর। ধনুকের মত বাঁকানো এই কাগজের টুকরাটাকে সমান দু'খণ্ডে ভাগ করে নাও। টেবিলের উপর ছবির মত করে কাগজের টুকরা দুটাকে বসাও। এবার যাকে জিজ্ঞাসা কর—কাগজের টুকরা দুটার মধ্যে কোনটা বড় ?—সে-ই বলবে—২নং টুকরাটাই বড়। আচ্ছা, এবার ২নং টুকরাটাকে উপরে বসিয়ে দাও। দেখবে, তাতে আবার ১নং টুকরা টাকে বড় দেখাচ্ছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে দুটাই সমান, একটার উপর অপরটা ফেলে দেখলেই বোঝা যাবে। মাঝের ফাঁক কমিয়ে দুটা টুকরাকে যদি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে বসাও তবে এই ছোট-বড়র পার্থক্য আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে।
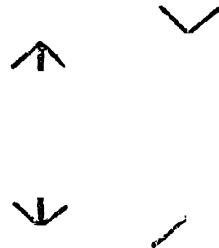
২নং চিত্র ৩নং চিত্র

২নং চিত্রে-একটা সরল রেখার উপর লম্বভাবে আর একটা সরল রেখা টানা হয়েছে। কেবল শয়ান-রেখাটা মোটা, আর লম্ব-রেখাটা সরু। এর ফলে মনে হচ্ছে লম্ব-রেখাটা বড় আর শয়ান-রেখাটা ছোট। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। ওটা আমাদের চোখের ভুল। মেপে দেখ, দুটা রেখাই দৈর্ঘ্যে সমান।

৩নং চিত্রে পাশাপাশি দুটা সরল রেখা টানা হয়েছে। বাঁ-দিকের রেখাটার উপর ও নীচের দু'প্রান্তে সোজাভাবে তীর-চিহ্নের মত ছোট্ট লাইন টানা। ডান দিকের রেখাটার উপর ও নীচের দুপ্রান্তে উল্টাভাবে তীর-চিহ্ন আঁকা হয়েছে। এর ফলে ডান দিকের রেখাটাকে বাঁ-দিকের রেখাটার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মেপে দেখ, দুটা রেখাই সমান।

কোন কোন ক্ষেত্রে চোখের ভুলে এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-এর অংশবিশেষে এরকমের অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়। ৪নং চিত্র দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এই চিত্রের

৪নং চিত্র

শয়ানভাবে অবস্থিত লম্বা, মোটা লাইন দুটা প্রকৃত প্রস্তাবে সমান্তরাল। চোখের ভুলে মনে হয়, লাইন দুটা মোটেই সমান্তরাল নয়।
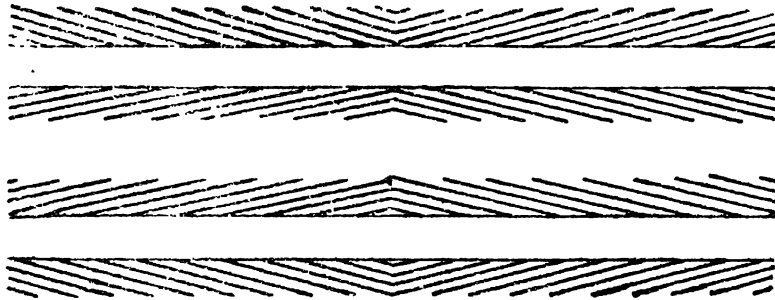
৫নং ও ৬নং চিত্র

উপরের ৫নং চিত্রে সমান্তরাল লাইন দুটার দুদিকে ছোট ছোট কতকগুলো টের্‌ছা লাইন টানা হয়েছে। নীচের ৬নং চিত্রে সমান্তরাল লাইন দুটার গায়ে বিপরীত দিকে টের্‌ছা লাইন দেওয়ার ফলে উভয়-ক্ষেত্রেই লাইনগুলোকে সমান্তরাল মনে হচ্ছে না। ৫ নম্বরের লাইন দুটা ভিতরের দিকে এবং ৬ নম্বরের লাইন দুটা বাইরের দিকে বেঁকে আছে বলে মনে হয়। অথচ পাশ থেকে লম্বালম্বি ভাবে দেখলে অথবা আধবোজা চোখে দেখলে লাইনগুলোকে সমান্তরালই দেখা যাবে।
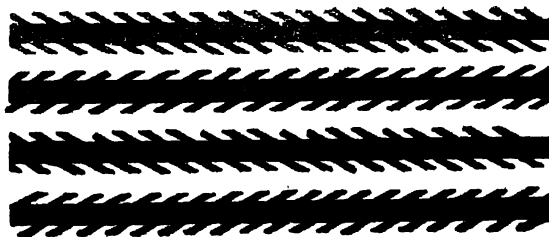
৭নং চিত্র

৭ নং চিত্রের মোটা, লম্বা লাইনগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে সমান্তরাল। কিন্তু লম্বা লাইন-গুলোর গায়ে—পরস্পর বিপরীতমুখী—কতকগুলো টের্‌ছা লাইন থাকায় ওগুলোকে মোটেই সমান্তরাল মনে হয় না।

৮ নং চিত্রে মোটা কালো অংশটার ভিতর দিয়ে টেরছাভাবে উপর থেকে নীচের দিকে একটা লাইন টানা হয়েছে। বাঁ-দিকে টেরছা লাইনটার সমান্তরালে আর একটা লাইন
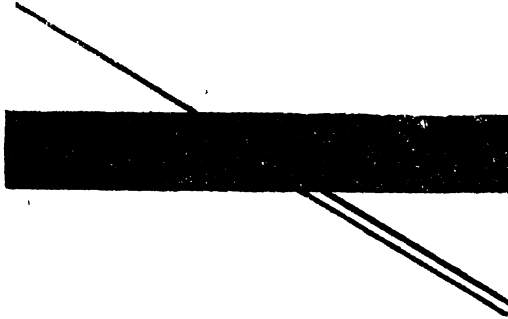
৮নং চিত্র

রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন উপরের টেরছা লাইনটা নীচের বাঁ-দিকের লাইনটার সমসূত্রে রয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

[কিছুকাল যাবৎ সূর্যের গায়ে আবার কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে খবরও বেরিয়েছে। সূর্য-কলঙ্কের ব্যাপারটা কি—এসম্বন্ধে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাতায় কিছু আলোচনা করবার জন্যে আমাদের পাঠক, পাঠিকাদের কেউ কেউ বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে সূর্য-কলঙ্ক সম্পর্কে এস্থলে মোটামুটিভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।]

সূর্য-কলঙ্ক

লণ্ডন, ২৬শে জানুয়ারি—রয়টারের খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি সূর্য-গোলকের গায়ে যে দুটি বৃহৎ কলঙ্ক দেখা যাচ্ছে তার প্রভাবে পৃথিবীর শর্ট-ওয়েভ বেতারবার্তা এবং তারবার্তা আদানপ্রদানে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটছে। বেতার ও তারবার্তার ইতিহাসে এধরণের বিপর্যয় খুব কমই ঘটেছে। দুতিন দিন পর্যন্ত এঅবস্থা থাকবে। সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বার্তাপ্রেরক কোম্পানীগুলো প্রাণপণ চেষ্টায় কাজ চালু রাখবার চেষ্টা করছেন। দুপুর-বেলায় আজ এখানকার রেডিওগুলো অচল হয়ে যায়। এমন কি, তারবার্তা প্রেরণে পর্যন্ত বিঘ্ন হচ্ছে। ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে এগারোটায় আটলান্টিক মহাসাগরের পারবর্তী স্থানে তার প্রেরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

বার্লিন থেকে রয়টারের সংবাদে জানা যায় যে, তাঁদের রেডিওতে সমস্ত দূরবার্তাগুলো গ্রহণ করবার সময় হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছিল। পূর্ব-ইয়োরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং অসিডনক থেকে শর্ট-ওয়েভ বেতারবার্তা একেবারেই শোনা যায়নি।
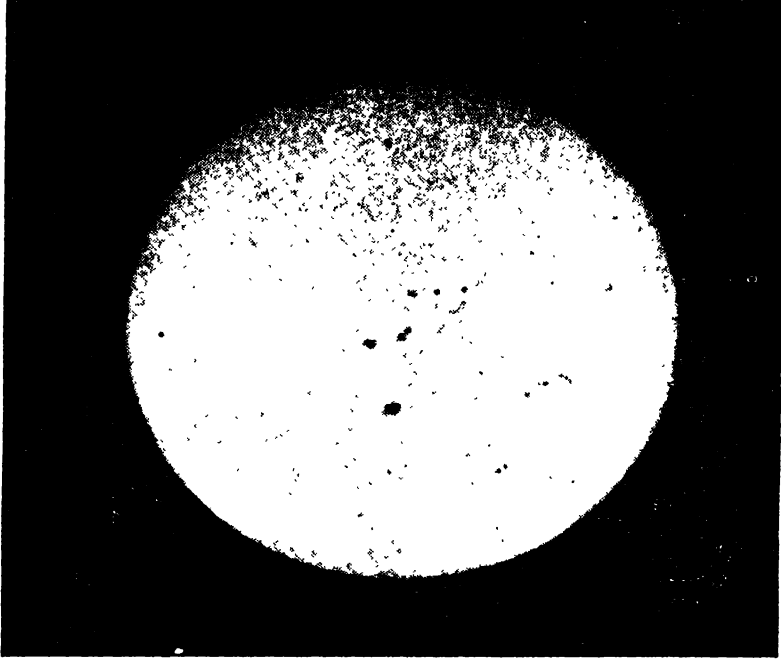
সূর্যগোলকের গায়ে ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। ওগুলোই সূর্য-কলঙ্ক।

খালি চোখে সূর্যটাকে দেখায়—উজ্জ্বল একটা পরিষ্কার থালার মত। কিছুকাল ধরেই এই উজ্জ্বল থালাটার গায়ে কতকগুলো কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। এই কালো দাগগুলোই সূর্য-কলঙ্ক। আমাদের ল্যাবরেটরী থেকে টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রত্যহই এই দাগগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। লেখবার সময় পর্যন্ত সূর্যের দুপাশে এবং মধ্যস্থলে ছোট বড় কতকগুলো দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হয়—আরও কিছুকাল এই দাগগুলো দেখতে পাওয়া যাবে।

সূর্যের বাইরের দিকের উত্তাপের মাত্রা প্রায় ১২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট; কিন্তু অভ্যন্তরভাগের উত্তাপের মাত্রা প্রায় ৮০,০০০,০০০ ডিগ্রি। এই ধারণাতীত উত্তাপ থেকেই আমাদের পরিচিত তাপ ও আলোর উৎপত্তি হচ্ছে। তাছাড়া তাড়িতিক-চুম্বক শক্তিরও নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বেতার তরঙ্গসমূহ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। মহাশূন্যে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যার ফলে বায়ুমণ্ডলের তাড়িতিক অবস্থা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। মহাশূন্যে আমাদের কাছাকাছি সূর্যই এমন একটা

বিরাট পদার্থ, পার্থিব যাবতীয় ব্যাপারে যার প্রভাব সুস্পষ্ট। যাঁরা রেডিও ব্যবহার করেন তাঁরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন—দিনের চেয়ে রাত্রিতেই বেশী সন্তোষজনক কাজ পাওয়া যায়। দিন ও রাত ভেদে রেডিও তরঙ্গের এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে—সূর্যমণ্ডল। তাছাড়া সূর্যের গায়ে কালো দাগগুলো দেখা দিলে রেডিও-তরঙ্গে যখন তখন ভয়ানক বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। কেমন করে সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তি ঘটে এবং তাদের আবির্ভাবে কেনইবা বৈদ্যুতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়—সেকথাই বলছি।

সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর ভয়াবহ ঘূর্ণীবাত্যার মত সৌরমণ্ডলেও স্থানে স্থানে ভীষণ রকমের ঘূর্ণীবাত্যার অস্তিত্ব রয়েছে। সূর্যের এই ঘূর্ণীবাত্যার কাছে পৃথিবীর প্রচণ্ডতম ঘূর্ণীবাত্যাও অতি নগণ্য। পৃথিবীর মত সূর্যও পশ্চিম থেকে পুবদিকে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, এই ঘোরবার সময়টা সূর্যপৃষ্ঠে সর্বত্র সমান নয়। সূর্যের বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানগুলো প্রায় সাড়ে চব্বিশ দিনে একবার ঘুরে আসে। কিন্তু দেখা যায়, ৩৫ ডিগ্রি ল্যাটিচুডের মধ্যে অবস্থিত কালো দাগগুলোর একবার ঘুরে আসতে লাগে প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ দিন এবং ৬০ ডিগ্রি ল্যাটিচুডের নিকটবর্তী স্থানের একবার ঘুরতে প্রায় একত্রিশ দিন লেগে যায়। এই তারতম্যের ফলে সূর্যমণ্ডলের স্থানে স্থানে ঘূর্ণীবাত্যার উৎপত্তি ঘটা বিচিত্র নয়। এই ঘূর্ণীই হয়তো আমাদের কাছে সৌরকলঙ্কের মত প্রতিভাত হয়ে থাকে। ১৯০৮ সালে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরীর ডাঃ হেল তাঁর নতুন উদ্ভাবিত স্পেক্ট্রোহেলিওগ্রাফ নামক যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, সূর্যের গায়ের কালো দাগগুলো চৌম্বক-ঝটিকা বা চৌম্বক-ঘূর্ণী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রায় দেড় শতাব্দীরও অধিককাল ধরে সূর্য-কলঙ্কের আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে যেসব নির্ভুল বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে, তাথেকে দেখা যায়—প্রায় প্রতি এগারো বছরে নিয়মিত ভাবেই যেন এদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তাছাড়া এই দেড়শো বছরের বিবরণ থেকে আরও জানা যায়—সূর্য-কলঙ্ক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর চৌম্বক-শক্তিরও নানারকম বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল।
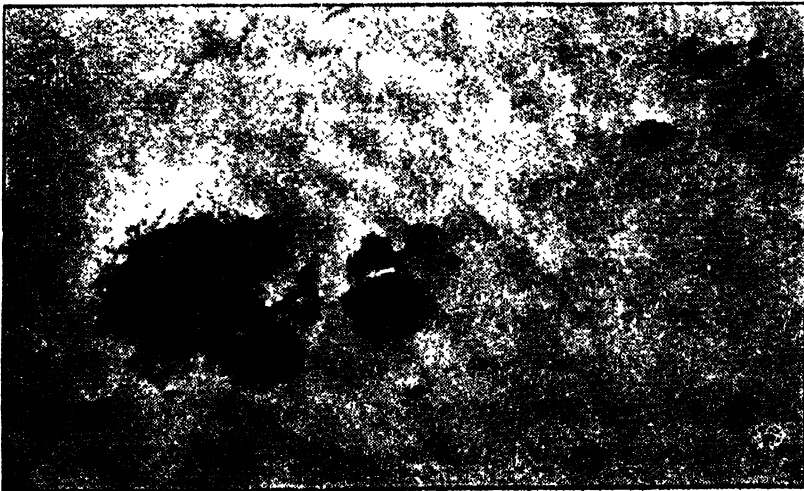
সূর্য-কলঙ্ক

চৌম্বক-ঝটিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মেরুপ্রদেশে অরোরা নামে এক অপূর্ব আলোর খেলা সুরু হয়ে যায়। এই অরোরার ব্যাপার উভয় মেরুপ্রদেশেই ঘটতে পারে। উত্তর মেরুপ্রদেশে এই আলোর খেলাকে বলা হয়—অরোরা বোরিয়ালিস বা উত্তরের আলো; আর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের অরোরাকে বলে—অরোরা অষ্ট্রেলিস। আকাশের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতায় লাল, নীল, সবুজ, হলদে, সাদা প্রভৃতি বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত যেন একটা আলোর ঝালর ঢেউ খেলে ঝুলতে থাকে। কখনও একটা, কখনও বা বিভিন্ন রঙের একাধিক পর্দা যেন প্রকাণ্ড আলোর পতাকার মত আকাশের গায়ে ভেসে ভেসে অবশেষে মিলিয়ে যায়। কখনও খুব উঁচুতে, কখনও বা খুব নীচুতে বিচিত্র বর্ণের কোঁচকানো পর্দার মত হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। ৫০।৬০ মাইল, এমন কি তারও উপরে সময় সময় অরোরার আলোর খেলা চলতে থাকে। অরোরার আলো প্রখরতায় চাঁদের আলোর চেয়ে বেশী নয় বটে, কিন্তু বর্ণগৌরবে অতুলনীয়। সূর্য থেকে নির্গত বিদ্যুৎকণিকার প্রভাবে উত্তেজিত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অতি উচ্চ অনিবিড় স্তরে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি থেকেই অরোরার উৎপত্তি ঘটে। সূর্য-কলঙ্কের ঘূর্ণী সম্ভবতঃ চৌম্বকক্ষেত্রের মত কাজ করে এবং তার প্রভাবে সূর্য থেকে নির্গত তড়িৎ-কণিকাগুলো সংহতভাবে একদিকে প্রচণ্ডবেগে পরিচালিত হয়ে থাকে। সূর্য-কলঙ্ক যদি পৃথিবী থেকে হ্রস্বতম দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুৎকণাগুলোর বেশী সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনা। এরূপ সংঘর্ষের ফলে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে 'আইওনিজেশন' ঘটে; অর্থাৎ বায়ুস্তরের অণুগুলো ধন এবং ঋণ তড়িতাবিষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ধন তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো উর্ধ্বদিকে পরিচালিত হয় এবং কতকাংশ পৃথিবীর বিষুব রেখার উর্ধ্বভাগে গিয়ে বজ্র ও বিদ্যুৎ স্ফুরণে নিঃশেষিত হয়ে যায়। অপরাংশ মেরুপ্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়ে অরোরার সৃষ্টি করে। এই তাড়িতিক প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতেও উদ্দীপ্ত-তড়িতের উন্মেষ ঘটে। তড়িতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কাজেই এই উদ্দীপ্ত-তড়িৎস্রোত চুম্বক-শলাকার স্থানচ্যুতি ঘটিয়ে দেয়। এ থেকেই চৌম্বক-ঝটিকার ব্যাপারটা টের পাওয়া যায়।

সূর্যের গায়ে কালো দাগ দেখা দিলে রেডিও তরঙ্গের গতায়াত ব্যাহত হয় কেন? এর সঠিক কারণ নির্দেশ করা মুস্কিল। কারণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে কারো কারো মতে বলা যায়—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৫০।৬০ মাইল উর্ধ্বে কেনেলী-হিভিসাইড্ স্তর এবং তদূর্ধ্বে অনুরূপ অন্যান্য স্তরের অস্তিত্ব রয়েছে। সূর্য থেকে নির্গত বিদ্যুৎ কণাগুলো বায়ুমণ্ডলে অনবরত সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে। এই সংঘর্ষের ফলে উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডল বিশেষভাবে 'আইওনাইজ্ড্' হয়ে পড়ে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে নির্গত রেডিও তরঙ্গ এই স্তরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এ ভাবেই রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে থাকে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবে 'আইওনিজেসন্' অর্থাৎ তড়িতাবেশ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আরও প্রবলভাবে চলতে থাকে। এর ফলে 'আইওনাইজ্ড্' স্তর আরও অনেক নীচের দিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে, ফলে রেডিও তরঙ্গ গ্রহণে অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

গ. চ. ভ.

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান—

গত ২রা ফেব্রুয়ারি, রামমোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান হয়েছে; পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের শিক্ষা বিস্তারে পরিষদের কাজের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর বিবেচনাধীন সরকারী তহবিল থেকে পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেন যে, প্রয়োজন হলে প্রচার বিশেষজ্ঞ কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আরও টাকা বরাদ্দ করবেন।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। পরিষদ সম্পাদক ডাঃ সুবোধনাথ বাগচী বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতির বক্তৃতা—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার অপরাহ্নে রামমোহন লাইব্রেরী হলে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের এক সভায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে' এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত বিদেশী ভাষার মারফৎ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকেরা বিদেশী ভাষায় ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েছেন। ছাত্রেরাও বিদেশীভাষায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এভাবে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন বার বার শিক্ষকদের মনে উদিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সে প্রশ্নের কোন মীমাংসা করার সুযোগ হয়নি। কারণ তখন চাকুরিই ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কথা তখন ওঠেনি। কিন্তু আজ সে প্রশ্নের মিমাংসার দিন এসেছে। বাঙালী বহু ঘা খেয়ে শিখেছে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া একান্ত দরকার এবং উহাই বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের শ্রেষ্ঠ পথ।

অতীতের সম্পদ নিয়ে অহেতুক গর্ব না করে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবার জন্যে যুক্তি দেখিয়ে অধ্যাপক বসু বলেন যে, আজ জাতিকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে হবে। এজন্যে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে অনায়াসে জনসাধারণের নিকট শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পৌঁছে দেওয়া যায়। এবিষয়ে জনসাধারণের মনে উৎসাহের সৃষ্টি করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ছাড়া তা সম্ভব হবেনা।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন—

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ স্যার কে. এস. কৃষ্ণানের পৌরহিত্যে গত জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান এবং বিদেশ থেকে পাঁচশো-এরও বেশী বিজ্ঞানী এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। নিম্নোক্ত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সভাপতিত্ব করেন। যথা—পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক আর, এস, কৃষ্ণান, গণিতবিজ্ঞানে এস, চাওলা রসায়নবিজ্ঞানে ডাঃ পি, বি, গাঙ্গুলী, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে অধ্যাপক নির্মল বসু, প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞানে ডাঃ এম, এল, রুনওয়াল, উদ্ভিদবিদ্যায় এস, এস, রঙ্গোয়া, দেহতত্ত্ববিজ্ঞানে ডাঃ বি, বি, সরকার, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে অধ্যক্ষ টি, কে, এন, মেনন, চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসাবিজ্ঞানে ডাঃ এম, বি, সোপারকর ভূতত্ত্ব ও ভূবিজ্ঞানে ডাঃ সি, মহাদেবন, কৃষিবিজ্ঞানে ডাঃ আর এস, বাসুদেব, ইউ, এস নায়ার, এঞ্জিনিয়ারিংএ অধ্যক্ষ সংখ্যাতত্ত্ব-বিজ্ঞানে ডাঃ এস, আর, সেনগুপ্ত।

৩৬ বছর পূর্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার নির্জনকক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই প্রথম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অতি আশাবাদীরাও বোধহয় ভাবতে পারেননি যে, কালে এটা এমন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ১৯১৪ সালে কলকাতায় স্যার আশুতোষের সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। মূল অধিবেশনে রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ও জাতিতত্ত্ব এই পাঁচটি শাখায় ভাগ করা হয়েছিল। বর্তমানে মূল অধিবেশনকে তেরটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

—১৯৪৮ সালের কার্যবিবরণী—

১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের উদ্বোধন করেন। এবং শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তারপর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রথম সাধারণ অধিবেশনে কার্যকরী সমিতি ও মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলী সহ মোট ২৩ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। কাজের সুবিধার জন্য ক্রমে কার্যকরী সমিতি সম্প্রসারিত করিয়া সদস্য সংখ্যা ২৮ জন করা হয়। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নামের পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :—

প্রতিষ্ঠা—

কার্যকরী সমিতি—

১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)
২। শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র (সহঃ সভাপতি)
৩। শ্রীসত্যচরণ লাহা (ঐ)
৪। শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ঐ)
৫। শ্রীসুবোধনাথ বাগচী (কর্মসচিব)
৬। শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ কর্মসচিব)
৭। শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)
৮। শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত (কোষাধ্যক্ষ)*
৯। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
১০। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
১১। শ্রীরুক্মিনীকিশোর দত্তরায়
১২। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস
১৩। শ্রীজীবনময় রায়
১৪। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
১৬। শ্রীসুকুমার বসু
১৭। শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
১৮। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৯। শ্রীপরিমল গোস্বামী
২০। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
২১। শ্রীসত্যব্রত সেন
২২। শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
২৩। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৪। শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল
২৫। শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
২৬। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, (সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান)
২৭। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র শ্যাম
২৮। শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী (মন্ত্রণা সচিব)

---

* শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত মহাশয় কার্যব্যপদেশে কলিকাতা ত্যাগ করায় পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। কার্যকরী সমিতি ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সর্বসম্মতিক্রমে কোষাধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করেন এবং শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত মহাশয়কে পরিষদের কার্যে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই বৎসর কার্যকরী সমিতির মোট ১০টি অধিবেশন হয় এবং পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

বিজ্ঞানের ১৬টি শাখার মোট ১৫১ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লইয়া মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হয়। ১৮ই মার্চ তারিখে মন্ত্রণা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু ও শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী যথাক্রমে মন্ত্রণা পরিষদের সভা-নায়ক ও মন্ত্রণা-সচিব পদে নির্বাচিত হন।* প্রত্যেক শাখার একজন সভাপতি ও একজন আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়। এই বৎসর মন্ত্রণা পরিষদের দুইটি অধিবেশন হয়। মন্ত্রণা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে পরিভাষা সংকলন, লোকপ্রিয় বক্তৃতা দান প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি স্থির করা হয়।

মন্ত্রণা পরিষদ—

আলোচ্য বছরে পরিষদের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে, এবং ক্রমে এর কর্মপরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। এ পর্যন্ত পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৭৬৯ জন; তন্মধ্যে সাধারণ সদস্য ৭৪৫ জন ও আজীবন সদস্য ২৪ জন। এ বছরে পরিষদের সাধারণ সদস্য শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আমরা হারিয়েছি—তাঁর মৃত্যুতে আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। প্রথম সাধারণ সভায় পরিষদ আচার্য শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ও ডাক্তার শ্রীসুন্দরী মোহন দাস এই দুইজন প্রবীনতম বিজ্ঞানসেবী সাহিত্যিককে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচন করেছেন।

সদস্য সংখ্যা

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ—

পরিষদের কার্য নির্বাহের জন্য বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মন্দিরের একখানা ঘর পরিষদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য পরিষদ বিশেষ উপকৃত হয়েছেন এবং সহযোগিতার জন্য কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত 'নিয়মাবলী উপসমিতি' পরিষদের নিয়মাবলী রচনা করে খসড়া পেশ করেছেন। ইহা কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর সকল সদস্যের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এই নিয়মাবলী আগামী বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হবে।

নিয়মাবলী—

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অনিবার্য নানারূপ ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও পত্রিকা দিন দিনই লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং আশা করি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় লোকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রবন্ধাদিও অধিকতর সহজবোধ্য ও সাধারণের উপযোগী হয়ে উঠবে। এই এক বছরে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মোট সংখ্যা ১৩২; তন্মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা পৃথকভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হল। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ছোটদের বিভাগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও তথ্যের কথা সহজভাবে আলোচিত হচ্ছে। এর ফলে ছাত্রমহলে পত্রিকার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা—

পত্রিকা পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য একটি পত্রিকা সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই পত্রিকা সমিতির সদস্যগণের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

* প্রথম সাধারণ অধিবেশনের বিবরণী ও মন্ত্রণাপরিষদের 'প্রথম' অধিবেশনের বিবরণী মার্চ মাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ছাপা হয়েছে।

১। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (সম্পাদক)
২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (সহযোগী সম্পাদক)
৩। শ্রীসজনীকান্ত দাস
৪। শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত
৫। শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। শ্রীপরিমল গোস্বামী
৭। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
৮। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৯। শ্রীসত্যব্রত সেন
১০। শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১১। শ্রীজীবনময় রায়
১২। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
১৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৪। শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
১৫। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

এই পত্রিকাসমিতির অধিবেশন বছরের প্রথম দিকে প্রতি সোমবার হ'ত; কিন্তু কয়েকমাস পরে অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতির দরুণ এই সমিতির কাজে অসুবিধা ঘটতে থাকে। বছরের শেষ দিকে পত্রিকা সমিতির অধিবেশন কদাচিৎ হয়। পত্রিকার উন্নতি সাধনের জন্য এই সমিতির কার্যকরীভাবে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। পত্রিকা সমিতির অধিবেশন মাসে অন্ততঃ একবার হওয়া বাঞ্ছনীয়; এবং তাতে পত্রিকা সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় সমবেতভাবে আলোচিত ও নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

পত্রিকা সমিতি—

পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় বাবদ অর্থাগম হয় সত্য, কিন্তু এখনও পত্রিকা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেনি। পত্রিকার আয় আলোচ্য বছরে হয়েছে মোট ১২২৯৮৶০ আনা, অথচ পত্রিকা-খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮,৪৪৪॥১৫ আনা। তারপর, পত্রিকা সুচারুরূপে চালাতে হলে, আমাদের আদর্শানুযায়ী একে গড়ে তুলতে হলে আরও ব্যয় করা প্রয়োজন। পত্রিকা প্রকাশে সহযোগী সম্পাদককে সাহায্য করা ও প্রুফ দেখার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন—উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাল প্রবন্ধাদি লেখার জন্য লেখকগণকে পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পত্রিকার কাগজ ও ব্লক ইত্যাদির উন্নতি সাধন করা কর্তব্য। এর প্রত্যেকটি বিষয়ই যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। বর্তমান বর্ষে পত্রিকা সমিতির এসব বিষয়ে সুচারু বিধিব্যবস্থা করা উচিত বলে মনে হয়।

পত্রিকার আয়ব্যয় ও ভবিষ্যৎ উন্নতি—

কার্যকরী সমিতির ২৯শে এপ্রিল' ৪৮ তারিখের অধিবেশনে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রকাশের জন্য একটি 'পুস্তিকা প্রকাশ সমিতি' গঠিত হয়; এবং এই সমিতির সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর পুস্তিকা প্রকাশের ভার অর্পণ করা হয়। এই সকল পুস্তিকা সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীশিশির কুমার মিত্র মহাশয়ের উপর। সাধারণের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে পুস্তিকা রচনার ভার বিশিষ্ট বিজ্ঞানিগণের উপর দেওয়া হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাহায্যে পরিষদের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রকাশের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। এদিন এই গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যা, 'তড়িতের অভ্যুত্থান' প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যা, 'আমাদের খাদ্য' রচনা করেছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনীলরতন ধর মহাশয়; ইহাও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। আমরা আশা করছি, এই গ্রন্থমালা প্রকাশের কাজ আমরা নিয়মিত করে যেতে পারব। এই সকল পুস্তিকা জনসাধারণের নিকট সহজে যাতে পৌছাতে পারে তার জন্য এর দাম করা হয়েছে

পুস্তিকা প্রকাশ সমিতি—

লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা—

মাত্র আট আনা। পরিষদের বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য এতে যথেষ্ট সফল হবে বলে আমরা আশা করছি।

মন্ত্রণা পরিষদের বিভিন্ন শাখার মনোনীত প্রতিনিধিগণের উপর পরিভাষা সংকলনের কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। পরিভাষার কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি পরিভাষা মণ্ডলী গঠিত হয়; বিশেষজ্ঞ হিসাবে এই মণ্ডলীতে অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য, শ্রীচারু চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস—মহাশয়গণকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিভাষা সংকলনে মাত্র কয়েকটি শাখার কাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে; এবং একাজ মোটেই সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে না। আমি এদিকে বিভিন্ন শাখার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

পরিভাষা সংকলন—

আলোচ্য বছরের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের প্রস্তাবক্রমে পরিষদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারিভাষিক শব্দ সংকলনের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। সরকারের সাহায্য ও আনুকুল্য পেলে এক বৎসরের মধ্যে আই-এ ও আই-এস-সি শ্রেণীর পাঠোপযোগী সম্পূর্ণ পরিভাষা সংকলন করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

জনসাধারণের বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে মন্ত্রণাসচিব শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের উপর। নিয়মিতরূপে এই প্রকার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয়নি। আলোচ্য বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে অধ্যাপক শ্রীনীলরতন ধর মহাশয়ের একটি লোকপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক মহাশয় বিজ্ঞান কলেজে 'ভূমির উন্নয়ন' সম্বন্ধে এই বক্তৃতা দেন—নানারূপ পরীক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের সহজ-বোধ্য বাংলা ভাষায় এই বক্তৃতাটি বিশেষ উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় পরিষদের উদ্যোগে সিটি কলেজ গৃহে একটি বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রগণকে শরীরে রক্ত চলাচল বিষয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। আমরা আশা করছি, বর্তমান বছরে আপনাদের সাহায্যে এরূপ বক্তৃতার ধারাবাহিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

লোকপ্রিয় বক্তৃতা—

জনশিক্ষার জন্য লোকপ্রিয় বক্তৃতাদির ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের সাহায্যে হলে বিশেষ কার্যকরী হয়। এজন্য পরিষদের নিজস্ব চলচ্চিত্র, এপিডায়াস্কোপ, লাউডস্পীকার প্রভৃতি যন্ত্র থাকা প্রয়োজন। এজন্য পরিষদের সভাপতি অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রচার করেছেন মাত্র ২০,০০০৲ টাকা সংগ্রহের জন্য। এর ফলে এযাবৎ মাত্র ৫৪৯৭৲ টাকা আমরা পেয়েছি; যে সকল ভদ্রমহোদয় এই দান করেছেন তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল; পরিষদের পক্ষ থেকে আমি এই সকল ভদ্রমহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের কাছেও আমি সবিশেষ আবেদন জানাচ্ছি আপনারা যেন পরিষদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেন। আমি আশা করছি আপনাদের সাহায্যে এই টাকা শীঘ্রই আমাদের হাতে এসে পৌঁছুবে।

উল্লিখিত ঐ সামান্য পরিমাণ অর্থ নিয়েই আমরা একাজে অগ্রসর হয়েছি। একটি ১৬ মিঃ সবাক চলচ্চিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র আমরা কিনেছি এবং তার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন যন্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব অনুযায়ী এই প্রচার কার্যের ভার দেওয়া হয় শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের উপর। এই যন্ত্রসাহায্যে বক্তৃতা দানের প্রারম্ভিক ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। আশা করছি, বর্তমান বছরে এরূপ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র বক্তৃতার কাজ নিয়মিতভাবে সুরু করা যাবে। এই উদ্দেশ্য সফল করে

চলচ্চিত্র সহযোগে বক্তৃতা—

তুলতে হলে বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রাদিসহ যাতায়াতের জন্য গাড়ী কেনা প্রয়োজন—এদেশের উপযোগী শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুগুলির ছবি তোলা আবশ্যক—এই কাজের ব্যবস্থা বন্দোবস্তের জন্য কর্মী নিযুক্ত করাও দরকার। এদিক দিয়ে আপনাদের সকল রকম সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ পেলে বিশেষ উপকৃত হব।

বিজ্ঞান প্রচারের জন্য একটি স্থায়ী বিজ্ঞান-প্রদর্শনী স্থাপন করা প্রয়োজন ; তাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ছবি, নক্সা, স্কেচ, বিজ্ঞানিগণের চিত্র, গবেষণার ইতিহাস প্রভৃতি ও পুস্তকাদি রক্ষিত হবে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ছোটদের বিভাগে সে সব পরীক্ষাদির বিষয় প্রকাশিত হয়, তা হাতে-কলমে দেখে বুঝবার জন্য বহু ছাত্রছাত্রী প্রায়ই এসে থাকে ; কিন্তু তাদের দেখাবার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি বলে ফিরিয়ে দিতে হয়। এদিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর কিছু প্রাথমিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সায়ান্স এসোশিয়েশনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের প্রচার। বর্তমানে এই এসোশিয়েশন মৌলিক গবেষণায় ব্রত এবং কাজের

সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন—

সুবিধার জন্য এসোশিয়েশন শীঘ্রই অন্যত্র উঠে যাবে। আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট সায়ান্স এসোশিয়েশনের বাড়ীটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান প্রচারের অন্যান্য কাজের জন্য পরিষদকে দান করতে অনুরোধ করেছি। আশা করি এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাব এবং আমরা সকলে সমবেতভাবে সরকারের নিকট এই দাবী জানাব। নিখিল ভারত প্রদর্শনীর আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ হইতে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্যও আমরা সরকারের নিকট আবেদন করেছি। পরিষদের কাজ অধিকতর ব্যাপক ও কার্যকরীভাবে চালাবার জন্য আমরা সরকারের নিকট বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্যের আবেদনও করেছি। পরিষদ যে জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছে তা সম্যক সফল করে তুলতে হলে সরকারের সাহায্য করা নিতান্তই প্রয়োজন ও অবশ্যকরণীয় বলেই মনে করি। এ কথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়রূপে গড়ে তুলতে না পারলে দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। *

* এই প্রসঙ্গে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, পরিষদের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার উপযোগিতা স্বীকার করেন এবং পরিষদের সাফল্য কামনা করেন। সরকারের বিপুল অর্থাভাব থাকা

প্রধান মন্ত্রীর দান—

সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে সরকারের সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ ৫,০০০৲ টাকা পরিষদকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আরও ৫,০০০৲ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। আমরা এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি, ভবিষ্যতেও পরিষদ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে।

পরিষদের গত বছরের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট ও উদ্বৃত্তপত্র মুদ্রিতাকারে আপনাদের নিকট উপস্থিত করেছি। বর্তমান বর্ষের জন্য আনুমানিক বাজেটও এই সঙ্গে পেশ করছি এবং আশা করছি, পরিষদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলবার জন্য আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়মিতভাবে পাব। পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট ঐকান্তিক অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা সকলে পরিষদের এই বহুমুখী বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা আশানুরূপ সফল করার জন্য প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী কর্মভার গ্রহণ করুন, যাতে এই শিশু প্রতিষ্ঠান অচিরে শক্তিশালী হয়ে ব্যাপকভাবে জাতীয় কর্তব্য পালন করতে পারে। ইতি—

সহযোগিতার আবেদন—

শ্রীসুবোধ নাথ বাগচী
কর্মসচিব—

——পরিশিষ্ট——

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ১৯৪৮ সালের সংখ্যাগুলিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধসংখ্যা এইরূপ—

পদার্থ বিদ্যা ৩০, গণিত ৩, উদ্ভিদ বিদ্যা ৫, নৃতত্ত্ব ৮, ভূতত্ত্ব ৮, মনোবিদ্যা ২, কৃষি বিজ্ঞান ১৭, শারীরবৃত্ত ২, প্রাণীবিজ্ঞান ৬, রাশিবিজ্ঞান ২, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান ৫, চিকিৎসাবিজ্ঞান ৭, বিজ্ঞানসাহিত্য ২০, বিজ্ঞানিগণের জীবনী ৪।

পরিষদের বিজ্ঞান প্রচার তহবিলে দান করেছেন—

শ্রীঅক্ষয়কুমার সুর ১০০০৲, শ্রীকরমচাঁদ থাপার ১০০০৲, শ্রীঅমূল্যচরণ সুর ১৲, শ্রীবি, বি, মজুমদার ২৲, শ্রীদিলীপকুমার দাস ৫৲, শ্রীশক্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীশেফালিকা বসু ১০৲, শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচী ৫৲, শ্রীছবিল দাস ১০০০৲, শ্রীকালীপদ সেন ৫০০৲, শ্রীমহেশলাল শীল ২০৲, শ্রীঅমৃতলাল জেচঞ্চলী ২০০৲, বাস্তাকোলা কলিয়ারী ১০০৲, শ্রীচারুচন্দ্র চাটার্জী ১০০৲, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভড় ২৲, শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষাল ১৲, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ৫০০৲, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ ১০০০৲, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ৫০৲ টাকা।

বিজ্ঞান প্রচারের দান—

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন

১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন বিষয়বস্তুই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।

২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়।

৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রবন্ধ প্রকাশে অযথা বিলম্ব হতে পারে।

৪। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪।৫ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

৬। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদেশী শব্দগুলোকে বাংলা অক্ষরে লেখাই বাঞ্ছনীয়।

৭। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে না। টিকেট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে।

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ৯৩, আপার সারকুলার রোডে পাঠাতে হবে।

৯। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরা ঠিকানা থাকা দরকার।

১০। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষা করে' অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের অধিকার থাকবে।

সদস্য তালিকার পরিশিষ্ট

এ বছর পরিষদের ১৯৫৮ সালের সদস্যগণের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে নিম্নলিখিত সদস্যগণের নাম ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়নি, এ জন্যে আমরা বিশেষ দুঃখিত। এই নামগুলি নিম্নে মুদ্রিত হল—

সা ৬৯৬
শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
৪৮, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট
হাটখোলা। কলিকাতা

সা ৭০০
শ্রীরবিন বন্দ্যোপাধ্যায়
জাগরণী সংঘ
২২, টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

আ ১৭
Sri Paresh Chandra Bhattacharya
11, Toglog Road, New Delhi

আ ১৮
Sri. Kumud Sen
4, Sonehari Bagh Road
New Delhi

আ ২০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৩৩, মিশন রো। কেন্ট হাউস
কলিকাতা

আ ২১
শ্রীকানাইলাল সাহা
১২৮।৪৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

আ ২২
শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ
১৮।২৮, ডোভার লেন
বালিগঞ্জ। কলিকাতা

সা ৭০২
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
পি ৫২ বি, কে, পাল এভিনিউ
শোভাবাজার। কলিকাতা

আ ১৯
শ্রীবীরকুমার মুখোপাধ্যায়
বাকুলিয়া হাউস
খিদিরপুর। কলিকাতা

সা ৬৯৭
শ্রীদিলীপকুমার দাস
C/o, শ্রীনলিনীকান্ত দাস
পোঃ বানার হাট
জলপাইগুড়ি

সা ৬৯৮
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন
বেঙ্গল পেপার মিলস্
রাণীগঞ্জ, ই, আই, আর

সা ৬৯৯
Sri Dibyendu Bikash Roy
Section Officer,
Central P. W D.
P. o.—Jharsuguda, B.N.Ry

সা ৭০৩
শ্রীগোষ্ঠবিহারী নন্দী
১৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৪

সা ৭০৪
Sri Satyaprosad Roy Choudhury
Officer on special duty
Soil Conservation,
Ministry of Agriculture
Govt. of India, New Delhi

আ ২৩
Sri Makham Lall Shom
Supdt. of Collieries
P. o.—Bokaro
Hazaribagh

আজীবন সদস্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের সদস্য নম্বর সা-৪ স্থলে আ ৪ হইবে।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

সমাজের বিজ্ঞান-চেতনা গঠন লক্ষ্যে রাখিয়া সমাজের কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য বাৎসরাধিক হইল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা। এতদুদ্দেশ্যে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রণয়ন করা, লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালন করা, লোকরঞ্জনী ছায়া ও আলোক-চিত্র সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনা করা প্রভৃতি বহুবিধ অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য সমাধান করার পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বাংলার বৈজ্ঞানিক সুধিমণ্ডলীর সাহচর্য ও সাহায্যে পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎকাল অর্থাভাবে আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই উপযুক্তরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

লোকশিক্ষায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারে ফিল্‌ম ও ল্যাণ্টার্ন ছবি সহকারে বক্তৃতার কার্য-কারিতা সর্বজনবিদিত। দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কর্তব্য সত্বর পালন করিতে সমধিক আগ্রহান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রয়োজন মাইক্রোফোন, লাউড-স্পীকার, এপিডায়াস্কোপ ও সবাক-চলচ্চিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র। যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পাওয়া যায়, আপাততঃ তাহাই হইবে আমাদের বিষয় বস্তু। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলির সবাক চিত্র তোলা সম্ভব হয় তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রারম্ভেই আমাদের আবশ্যক অন্ততপক্ষে ২০,০০০ টাকা। দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় ও আশুসম্পাদ্য কর্তব্য পালন করিবার দায়িত্ব সমগ্র দেশবাসীর। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই যেন যথাসাধ্য চাঁদা পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করেন। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এ যাবৎ চাঁদা ও দান পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা আশা করি দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আর এক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ অর্থ আমাদের নিকট পৌঁছিবে।

স্বাঃ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে—

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি, **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ**
৯২, আপার সারকুলার রোড। **কলিকাতা**

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | মার্চ—১৯৪৯ | তৃতীয় সংখ্যা

হিমালয়ের ইতিকথা

শ্রীঅজিতকুমার সাহা

হিমালয় পর্বতমালা আজ ভারতের উত্তরদিক বরাবর সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মহিমময় পর্বতমালা তার বিরাটত্বে, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, তার মহনীয়তায়—সব বিষয়েই পৃথিবীর আজকালকার যে কোন পর্বতমালাকে হার মানায়।

কিন্তু হিমালয় পর্বত গঠনের ইতিহাস—যার মালমসলা সব ছড়ান রয়েছে হিমালয়েরই বুকের পাথরের মধ্যে—তাথেকে আমরা জানতে পারি যে, হিমালয় অতি অল্পদিন হলো তার এই বর্তমান বিরাটত্ব পেয়েছে। পৃথিবীর বয়স ২০০—৩০০ কোটি বছর; আর হিমালয় প্রথম মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করে মাত্র ৫।৬ কোটি বছর আগে। আজ যেখানে হিমালয়, মাত্র ৬।৭ কোটি বছর আগেও তার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বিরাজ করত এক সুবিশাল সাগর। যে এভারেষ্ট শৃঙ্গ আজ সাগর জল-তলের উপর ৫½ মাইল উঁচু, তাও একদিন ছিল সাগরের তলায়। বেশীদিন আগে নয়—মাত্র ৬।৭ কোটি বছর আগেও সেখানে সাগরের তলায় সঞ্চিত হচ্ছিল কাদা, বালি, চুণ। আর সেই সমুদ্র-তলে বসবাস করত সে যুগের কত বিচিত্র সামুদ্রিক জীব যাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী সে যুগে সঞ্চিত পলল-শিলার মধ্যে রক্ষিত জীবাশ্ম।

হিমালয় গঠনকারী উপাদানের উৎপত্তি।

যে সমস্ত প্রস্তরশ্রেণী দিয়ে হিমালয় গঠিত, তাদের উপাদান, গঠনবিন্যাস, জীবাশ্ম ইত্যাদি পরীক্ষা করে ভূ-তাত্ত্বিকেরা হিমালয়ের ইতিহাসের একটা মোটামুটি বিবরণ দিতে সমর্থ হয়েছেন। বারবার পর্বতগঠনকারী ভূ-আলোড়নের ফলে এই অঞ্চলের প্রস্তরশ্রেণী এত বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, এখানকার আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানতে পারা যায়। তবে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগেরও (৫০ কোটি বছর আগে) আগে এঅঞ্চলের স্থানে স্থানে সমুদ্রজলে পলল-শিলা সঞ্চয় এবং আগ্নেয় উদ্ভেদ ঘটেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তারপর ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ থেকে কার্বনিফেরাস যুগ পর্যন্ত বর্তমান মধ্য-হিমালয়ের উত্তরে (যেমন কাশ্মীরে স্পীটি অঞ্চলে) সমুদ্র জলতলে কাদা, বালি চুণ ইত্যাদির অবক্ষেপ ঘটে। আর সেই সময়ে সাগর জলের মধ্যে বাস করত অধুনা নিশ্চিহ্ন কত জীব

—যেমন, ট্রিলোবাইট, ব্র্যাকিওপড্, ল্যামেলিব্র্যাঙ্ক, কোর‍্যাল ইত্যাদি।

কার্বনিফেরাস যুগের শেষভাগে (২৪।২৫ কোটি বছর আগে) সারা পৃথিবীময় এক প্রচণ্ড ভূ-আলোড়ন হয় ; এর ফলে সৃষ্টি হলো চীনদেশ থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুবিশাল সাগর। এই সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল গণ্ডোয়ানা নামে অভিহিত এক বিরাট মহাদেশ। এখনকার দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও অ্যাণ্টার্কটিকা যে সে যুগে পরস্পর যুক্ত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং এই বিরাট যুক্ত মহাদেশই পূর্বোক্ত গণ্ডোয়ানা মহাদেশ। কালক্রমে দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও অ্যাণ্টার্কটিকা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিভাবে এই সমস্ত মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তাদের বর্তমান অবস্থায় এসেছে সে সম্বন্ধে মোটামুটি দুটি বিভিন্ন মতবাদ আছে—

(১) ঐ সমস্ত মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল স্খলিত হয়ে গিয়ে সমুদ্রজলে ডুবে যাওয়ার ফলে মহাদেশগুলো তাদের বর্তমান রূপ পেয়েছে।

(২) মহাদেশীয় সঞ্চরণবাদ অর্থাৎ থিওরী অফ কন্টিনেণ্টাল ড্রিফ্ট্ অনুসারে মহাদেশসমূহ ভূত্বকের নীচেকার এক স্তরের উপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। যুরাসিক যুগের পর (প্রায় ১২।১৩ কোটি বছর আগে) গণ্ডোয়ানা মহাদেশের বিভিন্ন অংশ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ ভেসে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তারা তাদের বর্তমান অবস্থানে এসে পৌঁচেছে।

যাহোক, এই সুবিশাল সাগরের তলায় কার্বনিফেরাস যুগের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে ইয়োসিন যুগ (৬।৭ কোটি বছর আগে) পর্যন্ত প্রায় অবিরতভাবে কাদা, বালি ও চূণ সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রের তলায় কয়েক মাইল পুরু স্তরশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই সব স্তর এখন আমরা দেখি আল্পস্, কার্পেথিয়ান, ককেসাস, এশিয়া মাইনর, ইরাণ, বেলুচিস্তান ও হিমালয় অঞ্চলে। ভারতের উত্তরে টেথিস সাগর মোটামুটি এখনকার মধ্য-হিমালয়ের তুষারধবল শৃঙ্গশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিমালয়ের পূর্বে ও পশ্চিমে, ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগে ও বেলুচিস্তানের অনেকাংশে এই সাগর ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সাগরেরই এক শাখা পশ্চিম পাঞ্জাবের সল্ট্ রেঞ্জ অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

টেথিস সাগরে যখন অবিরত পলি সঞ্চিত হচ্ছিল সে সময়ে সঙ্গে সঙ্গে সাগরতল অবনমিত হতে থাকে। ফলে, ঐ অঞ্চলে অনেকখানি পুরু স্তরের সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল। এইরকম পলি-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত অধঃগামী অনতিপরিসর সমুদ্র-তলকে জিওসিঙ্কলাইন বলা হয়। পলি-সঞ্চয়ের সময়ে হিমালয় অঞ্চলের সমুদ্র-তলের গভীরতা সব সময়ে একরকম ছিল না, তবে অধিকাংশ অবক্ষেপই ঘটেছিল নাতিগভীর জলে। এই প্রায় অবিরত পলি অবক্ষেপের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'তিনবার কিছু বিরামের চিহ্ন দেখা যায়। সে সময়ে সাগরতল সাময়িকভাবে জলতলের চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছিল। যুরাসিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে (১৩ কোটি বছর আগে) হিমালয়ের অনেক জায়গাতেই স্তরক্রমের মধ্যে একটা অল্পবিস্তর ফাঁক দেখা যায়। ক্রেটাসাস যুগের শেষভাগে (৭।৮ কোটি বছর আগে) হিমালয় অঞ্চলে কিছু আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের নিদর্শন আছে। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, কুমায়ুন হিমালয়, বেলুচিস্তান ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে গ্র্যানাইট, গ্যাব্রো, পেরিডোটাইট ইত্যাদি শিলার উদ্ভব হয়। তাছাড়া কিছু আগ্নেয় লাভা এবং ভস্মও সমসাময়িক স্তরের ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত দেখা যায়। এই সমস্ত আগ্নেয়োচ্ছ্বাস উপদ্বীপময় ভারতের প্রায় সমসাময়িক ডেকান ট্র্যাপ আগ্নেয়োচ্ছ্বাসেরই এক অভিব্যক্তি। ইয়োসিন যুগে হিমালয় অঞ্চলে টেথিস সাগর ক্রমশঃ অগভীর হতে আরম্ভ করে। প্রথমে তিব্বত অঞ্চল থেকে সাগর অপসারিত হয় ; পরে টেথিসের চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি

ছাড়া ছাড়া হ্রদ বাদে সমস্ত হিমালয় অঞ্চলই স্থলে পরিণত হলো।

হিমালয়ের উত্থান

হিমালয় গঠনকারী প্রথম ভূ-আলোড়ন আরম্ভ হলো উচ্চ-ইয়োসিন যুগে (প্রায় ৫ কোটি বছর আগে)। এই আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূমিক চাপের ফলে শিলাশ্রেণীর স্থানচ্যুতি ও সংঘট্ট হতে লাগল। এই ভূ-আলোড়নের ফলে মধ্য-হিমালয় অঞ্চল মাথা তুলে দাঁড়াল। পরবর্তী অলিগোসিন যুগেও এই পর্বতগঠনকারী আলোড়ন চলেছিল। তারপর কিছুদিনের জন্য ভূ-আলোড়নের একটা বিরাম হলো।

কিন্তু আবার মধ্য-মায়োসিন যুগে (প্রায় ২২ কোটি বছর আগে) এক প্রচণ্ড ভূ-আলোড়ন সংঘটিত হলো। এর ফলে মধ্য-হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত বহির্হিমালয় অঞ্চল উন্নীত হলো এবং মধ্য হিমালয়স্থিত প্রস্তরশ্রেণী আরও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এরপর হিমালয়ের বর্তমান পাদপ্রদেশে এক নীচু অঞ্চলের সৃষ্টি হয় এবং হিমালয় অঞ্চল ও দক্ষিণের উঁচু অঞ্চল থেকে বাহিত কাদা, বালি ইত্যাদি সেই নীচু অঞ্চলে সঞ্চিত হতে থাকে (শিওয়ালিক-সিস্টেম)। এই নীচু অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করত এক শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্য। কত বিচিত্র জীবজন্তুই না বাস করত সেই অরণ্যে! সেই সমস্ত জীবজন্তুদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সে যুগে ৩০ রকমের হস্তীজাতীয় প্রাণী-প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। আধুনিক যুগে আমরা ভারতে মাত্র একজাতীয় হাতী (এলিফাস্ ইণ্ডিকাস্) দেখতে পাই।

তারপর প্লায়োসিন যুগের শেষভাগে (১০-৩০ লক্ষ বছর আগে) দেখা দিল হিমালয় গঠনকারী তৃতীয় ভূ-আলোড়ন। এই আলোড়নের ফলে হিমালয়ের পাদপ্রদেশের পর্বতরাজি মাথা তুলে দাঁড়াল। মধ্য-প্লাইস্টোসিন্ যুগ পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত) চলেছিল এই আলোড়ন। কিন্তু তারপরও অল্প বিস্তর আলোড়ন আজ পর্যন্ত চলছে।

কাশ্মীরের শ্রীনগর উপত্যকা থেকে জম্মুকে আড়াল করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা। এই পর্বত যে মাথা তুলে দাঁড়ায় প্লাইস্টোসিন যুগের শেষভাগে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ সময়ে এ অঞ্চল ভূ-আলোড়নের ফলে ৫০০০´-৬০০০´ ফিট উঁচু হয়ে যায়। পঞ্জাবের আম্বালা ও হোসিয়ারপুর জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কতকগুলো চ্যুতিরেখা বরাবর প্লায়োসিন্ যুগের প্রস্তরশ্রেণী সিন্ধু-গঙ্গা-বাহিত পলিমাটির উপর ঠেলে উঠে এসেছে। এই পলিমাটি প্লাইস্টোসিন যুগেরও পরে সঞ্চিত। সুতরাং এই সমস্ত চ্যুতিরেখা বয়সে অতি নবীন—এদের সৃষ্টি হয়েছে গত ২৫,০০০ বছরের মধ্যেই।

অনেকেরই মত, হিমালয়ের ঊর্ধ্বোন্নতির অধিকাংশই ঘটেছে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ গত ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে। এমন কি, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষ হয়তো বেশ সহজেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারত, কারণ তখনকার হিমালয় ছিল এখনকার চেয়ে অনেক নীচু।

হিমালয়ের উৎপত্তির কারণ

এই তো গেল হিমালয় পর্বতমালা গঠনের ইতিহাসের একটা মোটামুটি খসড়া। কিন্তু কেন তার এই অভ্যুত্থান? কোন্ শক্তির বলে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত প্রস্তরশ্রেণী ভাঁজবিশিষ্ট, চ্যুত ও সংঘট্ট হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে তুলল এই বিরাট সৌধ?

হিমালয় ও অন্যান্য বিরাট বিরাট পর্বতমালা গঠনের কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নেই। এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি-

ভাবে এটুকু বলা যায়—হিমালয়, আল্পস ইত্যাদি পর্বতমালার উত্থান সম্ভব হয়েছে শক্তিশালী অনুভূমিক চাপের ফলেই। পৃথিবীর অভ্যন্তর ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে; কিন্তু ভূত্বক ততটা সঙ্কুচিত হচ্ছে না; কারণ ভূত্বক সূর্যকিরণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে কিছু তাপ লাভ করছে। পৃথিবীর এই আভ্যন্তরীণ সঙ্কোচনের ফলে ভূত্বকে একরকম অনুভূমিক চাপ সৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে যে, এই কারণে যে পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হতে পারে তা পর্বতগঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

অনেকে মনে করেন, ভূত্বকের নীচেকার পদার্থের মধ্যে একরকম পরিবাহন-স্রোতের ফলে পর্বতমালাসমূহ গঠিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের তলায় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে উত্তাপ ক্রমশঃ বেড়ে গিয়েছে। ভূত্বকের নীচেকার পদার্থ যদিও গলিত নয়, তথাপি চাপের প্রভাবে সে অঞ্চলের পদার্থ কিঞ্চিৎ গতিশীল হতে পারে। ভূত্বকের নীচে এই অঞ্চলের মধ্যে তাপের অসমতা থাকার ফলে একরকম অতি মন্থর পরিবাহন-স্রোতের সাহায্যে ঐ অঞ্চলে তাপের সমতা প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ক্রমাগত তাপ নির্গত হওয়ার ফলে তাপের সমতা কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। ভূত্বকের নীচেকার এই অঞ্চলের কয়েক জায়গায় অপেক্ষাকৃত বেশী গরম ও হাল্কা পদার্থ নীচ থেকে উপরে উঠে ভূত্বকের তলায় গিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। ভূত্বকের ঠিক নীচেকার এই অনুভূমিক স্রোত বিপরীতমুখী অনুরূপ স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিম্নমুখী স্রোতে পরিণত হয়। এই নিম্নমুখী স্রোতের ফলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারী পদার্থ উপর থেকে নীচের দিকে যায়। যে সমস্ত জায়গায় পরস্পর বিপরীতদিক থেকে আগত দুই অনুভূমিক স্রোত সম্মিলিত হয়ে নিম্নমুখী স্রোতে পরিণত হয় সেখানে ভূত্বকের গায়েও বেশ কিছুটা চাপ পড়ে এবং জিওসিঙ্কলাইনের সৃষ্টি হয়। তারপর ক্রমশঃ পরিবাহন-স্রোত অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি-সম্পন্ন হতে থাকে; ভূত্বকের গায়ে চাপও ক্রমশঃ বেশী হতে থাকে এবং জিওসিঙ্কলাইনে সঞ্চিত প্রস্তরশ্রেণী চাপের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে পর্বতমালা সৃষ্টি করে। এই সময়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পরিবাহন-স্রোতের ফলে ভূত্বকের নীচেকার অঞ্চল কতকটা তাপসমতা পায়; সুতরাং পরিবাহন-স্রোতও পর্বতমালার গঠনের পর ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসে।

হিমালয় গঠনের সময় ঐ অঞ্চলের প্রস্তরশ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত ঠেলে উঠে এসেছে, অনেকেরই এই মত। উত্তরদিক থেকে আগত চাপের ফলে হিমালয় গঠনকারী নরম পলল-শিলাসমূহ উপদ্বীপময় ভারতের দৃঢ়, স্থায়ী শিলাশ্রেণীর গায়ে লেগে বাধা পেল; ফলে ঐ সমস্ত শিলা ভগ্ন, চ্যুত ও সংঘট্ট হয়ে গিয়ে হিমালয় পর্বত তৈরী করেছে। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, মহাদেশীয় সঞ্চরণবাদ অনুসারে যুরাসিক যুগের পরে যখন ভারতীয় মহাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ বর্তমান অবস্থানে সরে আসছিল, সেই সময়ে উত্তর তীরে সঞ্চিত নরম পলল-শিলা তার গায়ে ধাক্কা লেগে সঙ্কুচিত হয় এবং ভারতীয় মহাদেশের উপর ঠেলে উঠে আসতে চেষ্টা করে; তার ফলেই নাকি হিমালয়ের উৎপত্তি হয়েছে।

ঠাকুরদা'র আমলের রসায়ন

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

যে কালের কথা বলতে চাইছি সেকালের বর্ষীয়ানেরা বলেন, "ওরে তোরা তো যন্ত্রপাতি-ওয়ালা লেবরেটরী পাচ্ছিস, আমাদের কালে বিজ্ঞান কি রকম পড়ানো হতো জানিস? অধ্যাপক পেন্সিল খাড়া করে দেখিয়ে বলতে সুরু করতেন—"সাপোজ, দিস্ ইজ এ থার্মোমিটার।" থার্মোমিটার চোখে দেখতাম না, অথচ বিগ্‌ পে বি, এ, পাশ করে বেরিয়ে এলাম!" যখন যন্ত্রপাতি দেখিয়ে ছেলেদের ক্লাশ নেওয়া চলেনি তখনও কিন্তু সামান্য সামান্য রাসায়নিক গবেষণা বাঙলাদেশে সুরু হয়েছিল। প্রথম সুরু হয়েছিল কলিকাতার মেডিকেল কলেজে। বিদেশাগত ডাক্তারেরা জানতে পেরেছিলেন—চরক, সুশ্রুত দুটি প্রাচীনতম ভেষজ-সংগ্রহ, আরও জানতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ বনৌষধিতে পূর্ণ। তাই গবেষণা সুরু হয় বনৌষধি নিয়ে এবং তাথেকে রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন করার জন্যে। মেডিকেল কলেজে রসায়নের অধ্যাপক হয়ে আসেন ডকটর ও'সাগ্রেসি। তিনি অনেক বনৌষধি থেকে রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং পরে ১৮৪০ সালে "বেঙ্গল ফার্মাকোপিয়া" বলে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ক্রমে বৈজ্ঞানিকদের মন যায় খনিজ পদার্থের দিকে। আর একটা বড় কারণ হলো লেখাপড়া জানা দস্যুরা সোনাদানা লুণ্ঠন করাটাকে স্থূল, কৃষ্টিবিহীন কাজ মনে করে থাকেন। তাঁরা অবশ্য সোনার খনি লুণ্ঠন করতে চাইলেন, কিন্তু এমনভাবে চাইলেন, যাতে প্রকাশ্য দিবালোকে করলেও কেউ কোন সন্দেহ করবে না। বিদেশীদের সে সংস্কৃতি সার্থক হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জিওলজিকেল সার্ভে বসেছিল। উদ্দেশ্য, এ দেশের কোথায় কি খনিজ পদার্থ আছে তাথেকে বৃটিশ বণিক কতখানি পরিমাণ লাভ করতে পারবে, তার পরিমাপ করা। আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশের লোভ আকর্ষণ ঘুচতে বাধ্য হয়েছে, নজর গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে আজ কোমর বেঁধে জিওলজিকেল ও বোটানিকেল সার্ভে চলেছে। যাক্ সে কথা। ১৮৩৩ সালে জেমস প্রিন্সেপ খনিজ জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলেন। এ সব গবেষণা সুরু হবার অনেক আগে বাঙলায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা। আজকের দিনেও একথা বলতে হবে যে, এ সমিতির উদ্দেশ্য সৎ-ই ছিল, অর্থাৎ লোকচক্ষুর আড়ালে কেবলমাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত লুণ্ঠন করাই অভিপ্রায় ছিল না। এই সমিতির মুখপত্রে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনাও হতো। পিয়ারসন ষ্ট্রীকনিন নামক উপক্ষার কেমন করে দেশজ নাক্‌সভোমিকা থেকে তৈরী করা যায় তার আলোচনা তখনকার দিনে করেছিলেন। আজও এদেশ থেকেই কাঁচামাল হিসাবে নাক্সভোমিকা বিদেশে রপ্তানি হয়। ষ্ট্রীকনিনে রূপায়িত হয়ে আবার এদেশে তা' বিক্রয় হয় চড়া দামে। অবশ্য দেশী কয়েকটি কোম্পানী আজকাল স্বল্প পরিমাণে ষ্ট্রীকনিন প্রস্তুত করে থাকেন। ত্রিহুতে প্রাপ্ত সোডা সম্বন্ধে ষ্টিফেনসন লেখেন। আর ১৮৪৩ সালে ও'সাগ্রেসি সেঁকোবিষের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। ১৮৫২ সালে পিডিংটন রূপা বা সোণা ও পারদের মিশ্রণ থেকে পারদ পৃথক করার প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করলেন। কোন্নগরে ডি ওয়ালিড কোম্পানীর নাম অনেকে শুনে থাকবেন। সেই ডি ওয়ালিড বর্মার খনিজ

তেলের মোম সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন ১৮৬০ সালে। ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজে কিছু বাঙ্গালী ছাত্র ও শিক্ষক ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁরাও বিদেশী অধ্যাপকের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। ১৮৬৭ সালে ডাক্তার কানাইলাল দে বাঙলাদেশের বহু বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেন এবং ভারতীয় আফিম থেকে পরফাইরক্সিন নামে উপক্ষার আবিষ্কার করেন। রামচন্দ্র দত্ত ও শেষের দিকে চুনীলাল বসু অধ্যাপক ওয়ার্ডেনকে বনৌষধির গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। বলা-বাহুল্য ডাইমক যে উত্তরকালে ফার্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা বলে তিনখণ্ড ভারতীয় ভেষজের রাসায়নিক ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তাতে বাঙালী কর্মীরা প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন।

এমনিভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে অল্পস্বল্প ভেষজের গবেষণা চলছিল, যাকে আধুনিক কালের মতে নির্জলা রাসায়নিক গবেষণা বলতে পারি নে। ১৮৭৩ সালে আলেকজাণ্ডার পেড্লার রসায়নের অধ্যাপক হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। তিনি বললেন, বিজ্ঞান শিক্ষা হাতেকলমে করা দরকার, কেবল বই পড়লে চলবে না। তাই এম, এ, ক্লাশে সর্বপ্রথম একআধটু প্র্যাকটিকেল ক্লাশ জুড়ে দেওয়া হলো। এই হলো বলতে গেলে সর্বপ্রথম নব উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রারম্ভ। রাসায়নিক গোষ্ঠীতে চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকালের সব রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষকের তালিকা খুলে দেখুন, চন্দ্রভূষণ বাবুর নাম সর্বাগ্রে চোখে পড়বে। পেড্লার সাহেব তাঁর গবেষণার বিষয় বিলাতে লিখে পাঠাতেন। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে, কেমিক্যাল সোসাইটিতে তাঁর এদেশে-করা বহু গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব কাজে দুটি বাঙালী সহকারীর নাম উল্লেখযোগ্য,—আমাদের চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী আর পুলিনবিহারী সুর।

তখনকার দিনে মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন সেরা ডাক্তার। তাঁর খেয়াল হলো বিলাতের রয়েল ইনষ্টিটিউট বা বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর দি এড্ভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স এর মত আমাদের দেশেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কেন্দ্র করা দরকার। তাঁর এ খেয়াল চরিতার্থ করতে টাকা দেবে কে? অবশ্যই রাজদপ্তর নয়। তিনি নিজেই প্রচুর অর্থব্যয়ে ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন্ অফ সায়েন্স স্থাপিত করেন। অবশ্য তাঁর সমসময়ে এই গবেষণা-কেন্দ্রে ততটা গবেষণা সুরু হয়নি। পদার্থবিজ্ঞানে ও রসায়ন শাস্ত্রে এখানে গবেষণা সুরু হয়েছে ছাব্বিশ বৎসর পরে। পরবর্তীকালে অধ্যাপক রামন এখান থেকে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

যাহোক, এমনি ভাবে এখানে খানিক, ওখানে খানিক করেই গবেষণার কেন্দ্র ও গবেষণার প্রবৃত্তি এদেশে গড়ে উঠছিল; কিন্তু তেমন শৃঙ্খলায়িত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি। আধুনিক কালের রসায়ন শিক্ষার ও গবেষণার দিশা দেবার কাল ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ১৮৮৯ সালে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গেলেন এডিনবরায় অধ্যাপক ক্রামব্রাউনের কাছ থেকে রসায়নের গবেষণা শিখতে। ১৮৮৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতা সুরু করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রেরও অনেক পূর্বে ১৮৭৫ সালে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এডিনবরায় রসায়ন শিক্ষা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা কোন রাসায়নিক শিক্ষার দান পাইনি। তিনি ফিরে এসে অন্য কাজে ব্রতী হন। যদিও ইতিহাস স্থলে তিনিই হলেন রসায়নশাস্ত্রে প্রথম ডি, এস্‌সি, উপাধিধারী বাঙ্গালী এবং ভারতীয়ও বটেন। ১৮৯৪ সাল থেকে বলতে গেলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগ পেলেন সত্যকার গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে। ১৮৯৬ সালে তাঁর অমর গবেষণা মারকিউরাস নাইট্রাইট প্রস্তুতি, এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়।

এর পরে যে যুগ এল, তাতে যেন মরা গাঙে

বান ডাকল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করেন—ভারতীয় রসায়নীর ইতিবৃত্ত; পৃথিবীর রসায়নের ইতিহাসে যা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সে রসায়নের কথা হলো স্মরণাতীত যুগের কথা, যার সাল-তারিখ নিয়ে আ'জও ঐতিহাসিকদের বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। এই প্রাকৃতিক সম্ভারে সমৃদ্ধশালিনী ভারতে বিদেশীদের লোভ ও লুণ্ঠনের অবধি নেই। সেযুগেও কত রাষ্ট্র পরিবর্তন কালক্রমে ঘটে গেছে। কত সংস্কৃতির ইতিহাস, কত প্রাচীন সংস্কৃতির পদাঙ্ক লুপ্ত হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক আলোচনা এদেশ থেকে দেশান্তরে চলে গেছে। তারপর মধ্যকালে সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগ। যখন বিজ্ঞান আলোচনার কোন চিহ্নই আমরা খুঁজে পাই না। এখন এল আবার গবেষণার যুগ, যা গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এবং তার মূলে, পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—আছেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর শিক্ষা প্রতিভা ও উৎসাহ নিয়ে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, সংস্কৃতির জন্য কার্জন কমিশন বসে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হয়। এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা করার উৎসাহ দেবার কথা হয়। এর আগে যা' গবেষণা হয়েছিল তা' প্রায়ই ঐ জিওলজিকেল ও বোটানিকাল সার্ভেতেই আবদ্ধ ছিল। ১৯১০ সালে সাইমনসেন মাদ্রাজ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক হয়ে আসেন। তিনি পরে দেরাদুন ও ব্যাঙ্গালোরে থেকে ভারতীয় গাছপালায় পাওয়া তার্পিন তেল জাতীয় ও কর্পূর জাতীয় পদার্থের অমর গবেষণা করে গেছেন। এখান থেকে গবেষণা করেই তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ সাল থেকে বিশ বছরের ভিতর ভারতবর্ষে একটি রসায়নশাস্ত্রের গবেষকমণ্ডলী গড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে গড়ে উঠেছে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, যার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হল গত বছর, এবং এ বছরের প্রথমে তার রজত-জয়ন্তী উৎসব হলো প্রয়াগে।

১৯২৪ সালে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কয়েকমাস পরে সমিতির মুখপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৫ সালে বিলাতের 'নেচার' পত্রিকা এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "তেরটি রসায়ন বিষয়ক মৌলিক গবেষণা প্রসঙ্গ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র একটি ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের রচনা। অন্যগুলিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের গবেষকদের নাম যুক্ত দেখা যাইতেছে। তেরটির মধ্যে চারিটি মৌলিক প্রবন্ধ কেবলমাত্র কলিকাতার কলেজ অফ সায়ান্স হইতে আসিয়াছে। এবং ইহাই সঙ্গত, কেন না এই প্রতিষ্ঠানটি বহুবৎসর ধরিয়া ভারতে রাসায়নিক গবেষণার মেরুদণ্ড হইয়াছে।" ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রফুল্লচন্দ্র হন তার সুযোগ্য কর্ণধার। তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্য এই কেন্দ্রের গবেষণার সম্মান আজও রক্ষা করে আসছেন।

শর্করা বিজ্ঞান

(ইন্দ্রনাথ)

ফুলে মধু আছে, ফলে মিষ্ট রস আছে—সেই আদিম যুগ থেকেই মানুষ একথা জানে। ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা প্রাণী-মাত্রেরই সহজাত স্বাদবোধের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু আদিম মানব জানিত না, পদার্থের এই মিষ্টত্ব নিষ্কাশিত করা যায় কি উপায়ে। বহুকাল মানুষ স্বভাবসৃষ্ট বিবিধ ফলফুলের মিষ্টস্বাদ গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিল। এযুগের নিত্যব্যবহার্য বিবিধ প্রকারের চিনি প্রস্তুতের প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আরম্ভ হইয়াছে। ধীরে ধীরে শর্করাশিল্পের বিভিন্ন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়া ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আজ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক যুগে জীবনের নানাপ্রকার সুখসম্ভোগ ও তৃপ্তিবিধান চিনির উপর নির্ভর করে।

মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন বহুবিধ। নব নব জ্ঞানের বিকাশ ও নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষের নিত্য নূতন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। পার্থিব সুখসম্ভোগ ও তৃপ্তিই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মানুষ উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য। মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিয়া মানুষ তাহার বহুবিধ প্রয়োজনের সমাধান করিয়াছে। কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান মূলতঃ সৃষ্ট পদার্থ লইয়া—ইহার বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর ও গুণ বিচারের মধ্যেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। পদার্থ সৃষ্টির মূলরহস্য প্রকৃতপক্ষে রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির অতি তুচ্ছতম পদার্থেরও সৃষ্টিরহস্যের মূল তথ্য মানবজ্ঞানের অতীত। ফুল ফোটে—ফোটা ফুলের সকল বিবরণ বিজ্ঞান জানে; কিন্তু কি করিয়া ফোটে, কি করিয়া ফুলে সৌরভ বিকাশ হয়, কোথা হইতে কেমনে প্রস্ফুটিত পুষ্পের অভ্যন্তরে মধু সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়—বিজ্ঞান এই সব বিষয়ের আনুষঙ্গিক যুক্তি ও তথ্যাদি প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল বৈচিত্র্যের মূল সৃষ্টি-রহস্য বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব বা অস্পষ্ট—বলে, ইহা স্বাভাবিক—ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

যাহা হউক, স্বভাবসৃষ্ট মিষ্টরসের নিষ্কাশন, উৎকর্ষ সাধন ও ব্যবহারিক রূপদান বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে এবং তাহার ফলে জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ খাদ্য ও পানীয়ই চিনি ব্যতীত প্রস্তুত হইতে পারে না। জীবজগতের পক্ষে চিনির আবশ্যকতাও উপেক্ষণীয় নহে। খাদ্যবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রাণীমাত্রেরই দৈহিক গঠন ও ক্রমবৃদ্ধির পক্ষে চিনি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ইহা জীবের প্রাণশক্তির উৎস—জীবদেহের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষার জন্য চিনির একান্ত প্রয়োজন। উদ্ভিদ্ জগতেও সর্বত্র ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্তমান আছে। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক উপায়েই চিনি জীবদেহে সঞ্চারিত হইতেছে এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জীবদেহে ইহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। মোট কথা, সকল প্রকার বর্ধনশীল পদার্থেই জীবনীশক্তি ও ক্রমবৃদ্ধির আবশ্যকীয় উপাদানরূপে চিনি বর্তমান রহিয়াছে।

খাদ্য হিসাবে নানাভাবে চিনি ব্যবহৃত হয়। চা, কফি প্রভৃতি আধুনিক যুগের দৈনন্দিন পানীয় চিনি ব্যতীত প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে চিনি চাই। লজেন্স, টফি, চকোলেট, বিস্কুট

প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী চিনি ব্যতীত প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। মদ্য প্রস্তুতের উপকরণ হিসাবে চিনির ব্যবহার আছে। মোটকথা, আধুনিক বহুবিধ শিল্পবাণিজ্য শর্করা শিল্পের উপর নির্ভরশীল। শর্করা বাণিজ্য বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যের অন্যতম। বিভিন্ন দেশে অসংখ্য চিনির কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে—অসংখ্য বাণিজ্যপোত চিনি আমদানী, রপ্তানির কাজে নিয়োজিত আছে; চিনির ব্যবসায়ে দেশবিদেশের অসংখ্য বণিক প্রভূত অর্থোপার্জন করিতেছে। কিন্তু ভারতে শর্করা শিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই—অদ্যাপি এদেশ নিজ প্রয়োজনের উপযুক্ত পরিমাণ চিনিও প্রস্তুত করিতে পারে না; চিনির জন্য আমরা বহুলাংশে নির্ভর করি বিদেশের আমদানীর উপর। শর্করা-শিল্পের উন্নতি অবশ্য পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে এবং নূতন অনেক কলকারখানাও স্থাপিত হইতেছে; কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট পরিমাণে চিনি এদেশে প্রস্তুত হইতে আরও অনেক দিন লাগিবে। যে সকল অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যে আমরা এতকাল উন্নতিলাভ করিতে পারি নাই, তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। পরাধীনতার অভিশাপ দূর হইয়াছে।

যাহা হউক, আধুনিক যুগের এমন প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর বিষয় সকলেরই কিছু কিছু জানা দরকার। চিনির মিষ্টত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ, প্রকারভেদ ও সাধারণ তথ্যাদি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

চিনির প্রকারভেদ

মূল উপাদানের তারতম্যানুসারে নানা প্রকার চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশ্য বিভিন্ন রকম চিনির মধ্যে রাসায়নিক গঠন ও উপাদানের বিভিন্নতা তেমন কিছু নাই। কিন্তু মিষ্ট রসাত্মক যে মূলবস্তু হইতে যেরকম চিনি প্রস্তুত হয় তাহার নিজস্ব একটা স্বাদ, গন্ধ ও মিষ্টত্বের তীব্রতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, মোটামুটি চিনিকে প্রধানতঃ দুই প্রকারে ভাগ করা যায়, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব। উদ্ভিজ্জ চিনি নানা প্রকার—ইক্ষু, খেজুর, দ্রাক্ষা প্রভৃতির রস ও মধু হইতে এই সকল উদ্ভিজ্জ চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। জান্তব চিনি প্রাণিগণের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হয়; দুগ্ধের মধ্যে যে চিনির অংশ বর্তমান থাকে তাহাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথক করিয়া এইরূপ চিনি পাওয়া যায়। ইহাকে দুগ্ধজাত চিনি বা 'সুগার অব মিল্ক' বলা হয়।

চিনির বৈশিষ্ট্য

মিষ্টত্বই চিনির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কেবল মাত্র মিষ্টস্বাদযুক্ত হইলেই কোন বস্তু চিনিত্ব প্রাপ্ত হয় না। এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যাহা মিষ্টত্বের বিচারে চিনির তুল্য, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও সহজ প্রয়োজন বা ব্যবহারে উহার কিছুমাত্র সার্থকতা নাই। বরং উহা বিশেষ অনিষ্টকর। বিজ্ঞানীমাত্রেই জানেন 'সুগার অব লেড' নামক রাসায়নিক পদার্থের স্বাদ বেশ মিষ্ট, কিন্তু উহার মিষ্টত্বে মুগ্ধ হইয়া উহাকে চিনির পর্যায়ভুক্ত করিতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য; কারণ উহা একটি তীব্র বিষ। আমাদের একান্ত পরিচিত নির্দোষ ধাতু, রৌপ্যও রাসায়নিক সংযোগে বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে, কিন্তু পদার্থটি অতিশয় সুমিষ্ট। ইহার নাম 'সিলভার হাইপোসালফাইট'। আবার ভূগর্ভস্থ কোন কোন মৃত্তিকা, যাহাকে আমরা খনিজ মৃত্তিকা বা গ্লুসিনা নামে অভিহিত করি, তাহাও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ মিষ্টস্বাদযুক্ত হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। এরূপ আরও অনেক পদার্থ মিষ্টত্ব থাকা সত্ত্বেও চিনি নহে; কারণ ইহাতে চিনির নির্দোষ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহারিক গুণ নাই। এই সকল মিষ্ট পদার্থকে ধাতব বা খনিজ চিনি নাম দেওয়া যাইতে পারে। চিনি বলিতে সাধারণতঃ বিভিন্ন

উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সংগৃহীত মিষ্টরসাত্মক বস্তুকেই বুঝায়।

বর্তমান যুগে 'স্যাকারিন' নামক যে অতি তীব্র মিষ্ট পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, রসায়ন বিজ্ঞানের উহা একটি পরম বিস্ময়। কে কবে কল্পনা করিয়াছিল যে, সুকঠিন নীরস কয়লার মধ্যে এমন গাঢ় মিষ্টত্ব লুক্কায়িত ছিল! খনি হইতে উত্তোলিত কঁাচা কয়লা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই স্যাকারিন নিষ্কাশিত হয়। ইহা আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য চিনি অপেক্ষা ২৫০ গুণ বেশী মিষ্ট। স্যাকারিন মানুষের শরীরের তেমন অপকার কিছু করে না সত্য, কিন্তু উহাকে চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করাও চলে না ; কারণ ইহা যেমন স্বাদের বৈশিষ্ট্য হেতু রসনাসুখকর নহে, তেমন আবার ইহার মিষ্টত্বের তীব্রতা এত অধিক যে, সামান্য কিছু বেশী হইলেই তিক্ত স্বাদ হইয়া যায়। বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিমাণ রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিলে মিষ্ট-স্বাদ পাওয়া যায়। আজকাল ব্যবসায়ীরা লেমনেড, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে স্যাকারিন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্যাকারিনকে প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ভিজ্জ চিনি মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালের বৃক্ষাদি, বন-জঙ্গল মাটির তলায় চাপা পড়িয়া ভূগর্ভের চাপ ও তাপের ফলে কয়লায় পরিবর্তিত হইয়াছে, একথা সকলেই জানেন। ঐ সকল উদ্ভিদের মধ্যে যে মিষ্ট-রস বা চিনি ছিল, তাহাই এখন কয়লার মধ্য হইতে পরিবর্তিত আকারে স্যাকারিনরূপে আমরা পাইয়া থাকি।

কৃত্রিম চিনি

রাসায়নিক উপায়ে ইদানীং কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা বিজ্ঞানের এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। এই আবিষ্কারের ফলে প্রকৃতির সৃষ্টি-রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মানুষ প্রকৃতির দান গ্রহণ করিয়াই জীবনধারণ করে। প্রকৃতিদেবী আপন খেয়ালে বিভিন্ন রূপ-রস-স্বাদ-গন্ধ যুক্ত বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ দ্বিধাহীন চিত্তে প্রয়োজন অনুসারে ঐ সকল স্বভাব-সৃষ্ট পদার্থ চিরদিন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে—পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন এতকাল সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জয় করিতে চলিয়াছে—প্রকৃতির সৃষ্টিকে বিজ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ নবরূপ দান করিতেছে। 'কৃত্রিম চিনি' প্রস্তুত প্রণালীও এই বৈজ্ঞানিক উদ্যমের অন্যতম ফল।

শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের গুণ, মৌলিক উপাদান, স্বাদ কিছুই শর্করা জাতীয় নহে। ময়দা, আটা, চাউল প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। আমরা জানি যে, এগুলি জলে দ্রবণীয় নহে—জল দিলে ইহাদের একটা সাদা ঘোলাটে সংমিশ্রণ মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু চিনি বা শর্করা জাতীয় সকল পদার্থই জলে গলিয়া যায়। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, শ্বেত-সারকে অতি সহজেই শর্করায় পরিণত করা যায়। এতদুভয়ের মধ্যে অতি সামান্যমাত্র মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। শ্বেতসারে জল দিয়া কিঞ্চিৎ গন্ধকাম্ল সহযোগে উত্তপ্ত করিলে উহা চিনিতে পরিণত হয়। প্রক্রিয়াটি মোটামুটি এইরূপ :—সকলেই জানেন, কোন শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ক্রমে উত্তাপ বৃদ্ধি করিলে উহা জলের সহিত মিশিয়া জেলী বা মণ্ডবৎ পদার্থের সৃষ্টি হয়। তারপর উত্তাপ বৃদ্ধি করিলেও সাধারণতঃ উহার আর কোন পরিবর্তনই লক্ষিত হয় না। কিন্তু অতি সামান্য পরিমাণ (সাধারণতঃ প্রতি ১০০ ভাগ শ্বেতসারে ১ ভাগ) গন্ধকাম্ল (সালফ্যুরিক এসিড) মিশাইয়া উত্তাপ দিলে সমস্ত শ্বেতসার চিনিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই চিনির মণ্ডকে উপযুক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া সাধারণ চিনির ন্যায় ব্যবহারযোগ্যও করা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এইরূপ কৃত্রিম চিনি মিষ্টত্বে, সাধারণ গুণাবলীতে, এমন কি রাসায়নিক

বিশ্লেষণেও সাধারণ চিনি হইতে কোন অংশে বিভিন্ন নহে।

বিশেষ পদার্থের এই মৌলিক রূপান্তর প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যের কিছু আভাস দিতেছে। প্রকৃতিদেবী বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া এক অজ্ঞাত নৈপুণ্যের বলে বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্বেতসার সৃষ্টির পরে উহার উপাদানগুলির সহিত আবার একটু গন্ধকাম্ল গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিদেবী যেন সুকৌশলে একটি পৃথক পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ সকলই উদ্ভিজ্জ বস্তু; বিভিন্ন উদ্ভিদের মৃত্তিকা হইতে রসগ্রহণের প্রণালী ও ক্ষমতা একরূপ নহে। এই বিভিন্নতার জন্য উদ্ভিদদেহে মৃত্তিকার বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্নরূপ খাদ্য-উপাদান গ্রহণের প্রণালী ও ক্ষমতাই নানারূপ উদ্ভিদজাত পদার্থের সৃষ্টির মূলীভূত কারণ।

যাহা হউক, বর্তমান যুগে এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিয়া বহু দেশ চিনির প্রয়োজন মিটাইয়াছে। আলু একটি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। কোন কোন দেশে এই আলু হইতে কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিদ্ধ আলু শীতল জলে মণ্ড করিয়া সাল্‌ফ্যুরিক এসিড (১ : ১০০) মিশাইয়া উত্তাপ দিলে একপ্রকার বিশেষ মণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মণ্ডই চিনি। এই চিনির মণ্ড মধুর তরলাংশের মত সহজে দানাযুক্ত (কেলাসিত) হয় না—এই বিষয়ে স্বভাবজাত তরল মধু-চিনি ও এই কৃত্রিম আলু-চিনির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য বিষয়ে এই কৃত্রিম আলু-চিনি অবিকল সাধারণ চিনির গুণসম্পন্ন। ইউরোপের কোন কোন দেশে এইরূপ আলু-চিনি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহা সাধারণ চিনির স্থান অধিকার করিতে পারে নাই এবং সেভাবে ব্যবহৃতও হয় না। ইহাকে চিনির গাঢ় কৃত্রিম সরবৎ বলা যাইতে পারে। মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য এই কৃত্রিম চিনির মণ্ড প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পচন ক্রিয়ার সাহায্যে ইহা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়।

মদ্য প্রস্তুত করা ছাড়াও এই কৃত্রিম আলু-চিনির মণ্ড ফরাসী দেশে নানাবিধ মিষ্টসামগ্রী প্রস্তুত করবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার মূল্য সাধারণ চিনি অপেক্ষা অনেক কম, সুতরাং মিষ্টান্ন বিক্রেতাগণ ইহা ব্যবহার করিয়া প্রচুর লাভবান হয়। এই মণ্ড হইতে মদ্য প্রস্তুতের প্রণালীও সহজ এবং অল্প ব্যয়সাপেক্ষ; সুতরাং এই মদ্য অসম্ভব সস্তা দরে বিক্রীত হয় এই কারণেই ফরাসী দেশে মদ্য এত সস্তা এবং এত অধিক প্রচলিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন দেশে এইরূপ আলু বা অন্যকোন শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ হইতে কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করা আইনবিরুদ্ধ।

বর্তমানে এই কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত-প্রণালী ক্রমে ক্রমে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কাগজ, ছিন্নবস্ত্র, কাঠেরগুঁড়া প্রভৃতিকেও উপরোক্ত রাসায়নিক উপায়ে চিনিতে পরিণত করা হইতেছে। এই সকল পদার্থ প্রকৃত ও বিশুদ্ধ শ্বেতসার জাতীয় নহে; এইজন্য গন্ধকাম্ল মিশ্রিত করিয়া ইহাদিগকে কিছু বেশী সময় উত্তাপ দিতে হয়। মনে হয়, এরূপ ক্ষেত্রে রাসায়নিক কার্য দুইটি স্তরে সম্পন্ন হইয়া থাকে—প্রথমে কাগজ ইত্যাদি রূপান্তরিত হইয়া শুদ্ধ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং পরে ঐ শ্বেতসার কৃত্রিম চিনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। যাহা হউক, এরূপ উপায়েও কোন কোন দেশে চিনি প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু উহা সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী চিনিরূপে গণ্য নহে।

দ্রাক্ষা-চিনি

বিশুদ্ধ দ্রাক্ষাফল ভাঙিলে কখন কখন তন্মধ্যে সাদা সাদা দানা দৃষ্ট হয়, ইহাই স্বভাবজাত দ্রাক্ষা-চিনি (সুগার অব গ্রেপ্‌স্)। দ্রাক্ষা হইতে

সাধারণতঃ চিনি প্রস্তুত হয় না, কারণ উহা নিষ্কাশন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে ইহার মূল্য পড়ে অত্যধিক। দ্রাক্ষা-চিনি বা গ্রেপ-সুগার সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ চিনি এবং ইহার স্বাদ ও গুণ যথেষ্ট বেশী। দ্রাক্ষাফল সাধারণতঃ ফলরূপেই ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক দ্রাক্ষাফল বহুদিন স্থায়ী হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আঙ্গুর, কিসমিস, মনাক্কা প্রভৃতি দ্রাক্ষাফলের বিভিন্ন রূপ।

দ্রাক্ষাফল বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পচাইলে প্রথমতঃ এক প্রকার মৃদু মদ্য প্রস্তুত হয়; কিন্তু পচন ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে একপ্রকার অম্লরস যুক্ত মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় ভিনিগার। প্রাশ্চাত্য দেশের রন্ধন কার্যে ভিনিগার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা বিশেষ প্রণালীমতে প্রস্তুত এক প্রকার মদ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই আয়ুর্বেদমতে দ্রাক্ষারিষ্ট প্রস্তুত করিয়া বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। ইহা মদ্যগুণসম্পন্ন একটি তেজস্কর ঔষধ।

মধু-চিনি

মৌমাছিরা ফুল হইতে বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করিয়া আশ্চর্য উপায়ে মৌচাকে সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি প্রথমে ফুলের অভ্যন্তরস্থ মধুস্থলী হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মুখমধ্যে রক্ষা করে এবং মৌচাকে ফিরিয়া সুকৌশলে ঐ সংগৃহীত মধু মৌচাকে সঞ্চয় করে। মৌচাক হইতে আমরা যে মধু পাই তাহা ফুলের স্বভাবসৃষ্ট মধু হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহাতে মনে হয়, মৌমাছিরা ফুলের মধু যখন সংগ্রহ করে, তখন উহাদের মুখনিঃসৃত লালা মিশ্রিত হইয়া স্বভাবজাত মধুর কিছু বিকৃতি ঘটে। আবার বিভিন্ন স্থানের মধুর বিভিন্ন স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—বিভিন্ন ফুলের মধুর বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধ হইবে ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে। কোন্ কোন স্থানের মৌচাকের মধু পান করিয়া বমন ও শিরঃপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা মধুর নিজস্ব কোন দোষ নহে। যে বৃক্ষের পুষ্প হইতে ঐ মধু সংগৃহীত হইয়াছে উহা তাহারই কোন বিষাক্ত রস বা অপর কোন রূপ বিষক্রিয়ার ফল।

যাহা হউক, মৌচাক হইতে সংগৃহীত মধু উন্মুক্ত পাত্রে কিছু দিন রাখিয়া দিলে উহা ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে। এই পরিবর্তনের মুখ্য কারণ, মধুর মধ্যস্থ চিনির ভাগ সূর্যালোক ও বায়ুর সংস্পর্শে স্বাভাবিক উপায়ে পৃথক হইতে থাকে। কিছু দিন পরে ঐ ঘনীভূত মধু বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে রাখিয়া ছাঁকিলে উহার তরল অংশ বাহির হইয়া যায় এবং বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে কঠিন দানাযুক্ত চিনি পাওয়া যায়। এই ভাবে সংগৃহীত মধু-চিনি বিশুদ্ধ নহে; ইহাতে পুষ্পরেণু ও নানারূপ রঙীণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। দ্রবণ-প্রণালীর সাহায্যে ঐ সকল পদার্থ পৃথক করিয়া ফেলিলে বিশুদ্ধ বর্ণহীন মধু-চিনি পাওয়া যায়। দ্রাক্ষা-চিনি ও মধু-চিনির মধ্যে বিশেষ কোন রাসায়নিক পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

ঘনীভূত মধুর কঠিন অংশ চিনিরূপে পৃথক করিয়া লইলে যে অর্ধতরল পদার্থ নির্গত হয় রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাহাও চিনি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই অংশের একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, ইহা সহজে দানায় পরিণত হয় না —নতুবা এতদুভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। উভয়েই জল ও পচনবীজ বা 'ইষ্ট' সংযোগে সমভাবে পচনক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্তনে মদ্যে পরিণত হয়। মধুর মধ্যে চিনির সকল গুণই বর্তমান—মানব দেহের রক্তোপযোগী তাপসৃষ্টি, মিষ্টত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই মধু চিনির তুল্য; অবশ্য মধুর কিছু অতিরিক্ত ঔষধ-গুণও আছে। এইজন্য আয়ুর্বেদে বিভিন্ন ঔষধের সহকারী অনুপানরূপে মধু ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, মোটামুটি হিসাবে মধুকে পুষ্পমধ্যে সঞ্জাত স্বভাব-

জাত বিশুদ্ধ ও স্বাদু তরল চিনিই বলা যাইতে পারে।

সাধারণ চিনি

সাধারণতঃ চিনি বলিতে ইক্ষু-চিনিই বুঝায়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত বাজারে যত প্রকারের চিনি বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আখ-কলের পেষণযন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পেশিত করিয়া প্রথমে উহার মিষ্টরস সম্যক বাহির করিয়া লওয়া হয়। পরে ঐ রস উপযুক্তরূপ গাঢ় করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বর্ণহীন ও দানাদার (কেলাসিত) করা হইয়া থাকে। চিনির দানা পৃথক করিয়া লইলে যে অর্ধতরল পদার্থ পড়িয়া থাকে—তাহাই রাব-গুড় বলিয়া পরিচিত। বিশেষ প্রক্রিয়ায় পচাইয়া এই রাব-গুড় হইতে এলকোহল বা মগু প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই রাব-গুড় কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে উৎকৃষ্ট সারের কাজও করে।

খেজুররস হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার উৎপাদন প্রণালী আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। খেজুরগাছের অগ্রভাগ কাটিয়া এরূপ সুমিষ্ট রস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খেজুররস অগ্নির উত্তাপে উপযুক্তরূপে গাঢ় করিয়া খেজুরগুড় প্রস্তুত হয়; ক্রমে উহা বিশেষ অবস্থাতে দানাযুক্ত হইতে থাকে। ইহার তরলাংশ পৃথক করিয়া ফেলিলে দানাদার **খেজুরী-চিনি** পাওয়া যায়। এইরূপ সাধারণ উপায়ে প্রস্তুত চিনি কিঞ্চিৎ লালচে বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। স্বাদে ও গন্ধে ইহাকে ইক্ষু-চিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। তাল গাছের রস হইতেও একপ্রকার গুড় প্রস্তুত হয়। এই তালগুড়ও খেজুরগুড়ের ন্যায় একই উপায়ে গাঢ় করিয়া তৈয়ারী করা হয়। বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে তালের গুড় প্রস্তুত করিয়া বহু লোক জীবিকার্জন করিয়া থাকে। তালগুড় সহজে দানাযুক্ত হয় না; সুতরাং ইহার চিনি প্রস্তুত করা সুকঠিন। কিন্তু কোন বিশেষ উপায়ে তালের গুড় হইতে তালমিশ্রি তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। তালমিশ্রি শ্বাসকাশের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয়। বাজারের সাধারণ মিশ্রি ইক্ষু-চিনিকে গলাইয়া সুকৌশলে বড় বড় দানাযুক্ত কঠিন জমাট অবস্থায় পরিণত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

"দুই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে, তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-গৃহে সেগুলি কোনমতে লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ৬ হাজার ছেলে আই. এস-সি., ২ হাজার ছাত্র বি. এস-সি. ও ৪০০ ছেলে এম. এস-সি. পরীক্ষা দেয়—ইহাদের মধ্যে শতকরা কেন, হাজারকরা একজনও পরবর্তী কালে বিজ্ঞান আলোচনা করে কিনা সন্দেহ। বাঙালীর চিত্তবৃত্তির এই নিদারুণ দৈন্যই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে।" **আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।**

নৃতত্ত্বের পরিচয়

শ্রীকান্তি পাকড়াশী

সাধারণভাবে নৃতত্ত্বের সঠিক পরিচয় ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীসমাজে আজো হয়নি। একটা ভাসা ভাসা ধারণামাত্রই রয়েছে। এই ধারণার ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নৃতত্ত্বের উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন মোটেই বোঝেন না। এই অস্পষ্ট ধারণার জন্যেই আবার নৃতত্ত্বের অনুধ্যানে মনোযোগী পড়ুয়া পাওয়া মুস্কিল। নৃতত্ত্বের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক আমাদের মধ্যে খুব কম, কারণ নৃতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষাজগতে অল্প প্রচার ও শিক্ষাবিদদের দায়িত্বহীন অবহেলা, নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান বর্তমানে আমাদের দেশে এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। প্রচুরভাবে শিক্ষার্থীরা নৃতত্ত্বের গবেষণায় আগ্রহশীল হয়ে ওঠেনি এখনও, কারণ নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতিক্রিয়ায় এই বিশ্বাসই এখন বেশ চালু যে, নৃতত্ত্ব কতকগুলি কৌতূহলী ঘটনাবলীরই এক সঙ্কলন মাত্র, যেখানে বিভিন্ন বিদেশীয় (exotic) মানবগোষ্ঠীর গঠনাকৃতি, তাদের রীতিনীতি, ভাববিশ্বাস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। সভ্য জীবনের পথে এই সমস্ত বিদেশীয় মানবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক উপস্থিতি যে একধরণের আনন্দজনক উপলক্ষ সে চিন্তাও বেশ জোরালো; কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে যে, আমাদের দেশে নৃতত্ত্বের প্রকৃত পরিচয় আজো অস্পষ্ট। নৃতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী দৃষ্টিভংগীর যথাযথ চর্চা ব্যাপকভাবে সুরু হওয়ার প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান। আন্তরিকভাবে নৃতত্ত্বের অনুধ্যান ও গবেষণা বর্তমানে অনিবার্য হয়ে উঠেছে, দেশের প্রতিদিনের বিভিন্ন গুরুতর সামাজিক সমস্যার সমাধানে। নৃতত্ত্বের প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান দৃষ্টিভংগী যখন মানুষের অতীত ও বিশেষকরে বর্তমান জীবনের অনুধ্যানে উৎকর্ষ লাভ করছে তখন বর্তমান অবস্থায় নৃতত্ত্বের সম্পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অত্যাবশ্যক।

নৃতত্ত্ব যে কতকগুলি ঘটণারই সংকলন মাত্র, এই ধারণা সাধারণভাবে চালু থাকলেও এই সংকলনের উপাদানগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যান কিন্তু সে চলতি ধারণাতে নেই। সুতরাং নৃতত্ত্বের বিভিন্ন সংস্থিতির পুরোপুরি জ্ঞান পেতে হলে এই বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান সবার আগে পাওয়া প্রয়োজন। এই প্রারম্ভিক জ্ঞানার্জনের সুরু থেকেই এই সত্যতা বুঝতে হবে যে, সামাজিক ক্রমিক গতিবিধির সূত্র নির্ধারণে নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও অধ্যয়ন এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। সামাজিক পরিবর্তন ও অনুবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ কিভাবে ও কোন পথে সমাজের নানাস্তরে প্রভাবান্বিত হচ্ছে সে গবেষণার মূলভিত্তিই গড়ে উঠেছে নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর ওপর। সমাজের অসমান স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে নীচের মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনের ধারাবাহিকতায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি নৃতত্ত্বের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। এই অনুসন্ধানে 'সভ্য' ও 'অসভ্য' জীবনযাত্রার অন্তর্সম্পর্কটা বুঝে নেওয়ার গভীর প্রচেষ্টাও রয়েছে। সমাজের বিবর্তনে এই সম্পর্ক কিভাবে পরিবর্তিত হয় সে গবেষণাও নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানে প্রয়োজনীয় স্থান নিয়েছে।

নৃতত্ত্বের গবেষণায় যেহেতু মানুষের শারীরিক

গঠনাকৃতির বিবর্তন ও বৃদ্ধি এবং প্রকৃতির সংগে মানুষের লড়াই ও কৃতকার্য হওয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস অনুধ্যান করা হয় সে কারণে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির মধ্যে যে এক দায়িত্বপূর্ণ স্থান দাবী করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর বলিষ্ঠ প্রয়োগে নৃতত্ত্বের মান ক্রমেই সাধারণ শিক্ষার্থীমহলে এক আলোড়ন তুলছে ক্রমে ক্রমে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উপশাখার গবেষণা ও অনুধ্যান বহুদিন থেকেই পৃথক পৃথক পথে উৎকর্ষ লাভ করে আসছে বটে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নৃতত্ত্বের বিশেষ গবেষণা ও অনুধ্যান অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের ব্যাপক-চর্চার মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়েছিল বহুদিন। বিখ্যাত বিবর্তনবাদের প্রসারের পরেই নৃতত্ত্বের বিশেষস্থান জীববিজ্ঞানে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বর্তমানে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানের সংগে নৃতত্ত্বের প্রকৃত পার্থক্য নৃতত্ত্বের বিশেষ অধ্যয়নের ব্যাপকতায় সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ আলাদা এক বিজ্ঞান-শাস্ত্র হিসাবে তাই নৃতত্ত্বের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বেড়েই গিয়েছে।

নৃতত্ত্বের বিশেষ অনুধ্যানের ক্রমোন্নতিতে সমস্ত পুরোনো ধারণা বদলে গেল গুরুতরভাবে। এই অনুধ্যানে শারীরিক নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানীরা প্রথমেই সম্মুখীন হলেন সে সব শবচ্ছেদবিদ্যাবিশারদদের যাঁরা শতাব্দী ধরে শরীরের বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম গঠনাকৃতি নিয়ে গবেষণা করে আসছেন গভীরভাবে। অন্যদিকে আবার শারীর ও মনোবিজ্ঞানীরা যথাক্রমে শারীরিক কার্যক্ষমতা ও মন নিয়ে অনুসন্ধান করে আসছেন বহুদিন। সুতরাং এক্ষেত্রে নৃতত্ত্বের বিশেষ গবেষণা কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝা দরকার। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সংগে নৃ-তত্ত্ববিদদের সম্পর্ক কতখানি প্রত্যক্ষভাবে সত্য সে বিচারের প্রয়োজনও এক্ষেত্রে আছে। শবচ্ছেদ-বিদ্যার, শারীর ও মনোবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের শতাব্দীবাহী অনুধ্যান ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পরেও নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান সাধারণ জ্ঞানার্জনে কতখানি প্রকৃত সাহায্য দিতে পারে সে বিচারের ওপরেই সবসময় নির্ভর করছে নৃতত্ত্বের আপন সত্তার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা।

এই বিচারেই বোঝা যায় যে, নৃতত্ত্বের অনুধ্যান ও গবেষণা এবং শবচ্ছেদবিদ্যার, শারীর ও মনো-বিজ্ঞানের অনুধ্যান ও গবেষণার মধ্যে প্রচুর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যার জন্যে নৃতত্ত্ববিদদের এক পৃথক স্থান পণ্ডিতসমাজে সমাদর লাভ করেছে। প্রধানতঃ মানুষের শরীর ও মনের সমস্ত বিশেষ লক্ষণযুক্ত গঠনাকৃতি ও কার্যক্রম নিয়েই শবচ্ছেদবিদ্যাবিদদের এবং শারীর ও মনোবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও অধ্যয়ন। এই অধ্যয়নে নগণ্য পার্থক্যগুলি হয়, একেবারেই অগ্রাহ্য করা হয় নতুবা সেগুলি কোন বিশেষ অর্থহীন বিশেষত্ব হিসাবে প্রণিধান করা হয় সময় সময়। এখানে কোন পরিষ্কার দৃষ্টিভংগী এই পার্থক্যগুলি নিখুঁতভাবে বিচার করার কাজে পাওয়া যায় না। মরফোলজিক্যাল, গঠনতাত্ত্বিক শারীর-ও মনোবিজ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত শরীর ও মনের উপস্থিতি ও কার্যক্ষমতার ওপরে সমস্ত বিশেষ মনোযোগই উপরোক্ত গবেষণার বিশেষ অংগ। এখন এই পার্থক্যগুলি কোন বিশেষ বিজ্ঞানীমহলে গুরুত্বহীন ও অকার্যকরী হতে পারে; কিন্তু এই পার্থক্যগুলিই আবার বহুসময় বহু সমস্যার সমাধানে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তার মান নৃতত্ত্বের গবেষণায় বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষকে সবসময় জাতীয় অথবা সামাজিক গোষ্ঠীর এক সাধা-রণ সভ্য হিসাবেই বিচার করা হয়। নৃতত্ত্বের গবেষণায় সমবায় বা গোষ্ঠীজীবনের গুরুত্ব ব্যক্তি-বিশেষের প্রাধান্যে সবসময় যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়বস্তুর বিচারই করতে হয় ব্যাপকভাবে। সমষ্টিগত জীবনের সমবেত কার্যকলাপই নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানের প্রয়োজনীয় উপাদান।

সমবায় জীবনের গুরুত্ব বোঝবার ও বোঝাবার দায়িত্বই নৃতত্ত্বের চরম দায়িত্ব। এখন বহু ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যগুলির পরিসর ও সীমানির্ধারণ করা ও ব্যক্তিবিশেষের নির্দিষ্ট সমবায়-জীবনের সমস্ত বিশেষ গুণ নিরূপণ করার কাজই নৃতত্ত্বের অন্যতম এক প্রধান দায়িত্ব। নৃতত্ত্বের বিভিন্ন সংস্থিতিতে শরীরব্যবচ্ছেদবিদ্যা বিষয়ক বিশেষ গুণগুলি, শারীর-বিজ্ঞানগত কার্যানুধ্যান ও মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি বিজ্ঞানসম্মত পথে অনুষ্ঠান ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়।

সুতরাং এই অবস্থায় নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত প্রসার সহজেই ত্বরান্বিত করতে হবে সামাজিক কল্যাণের জন্যে। নৃতত্ত্ব আবার একক বিজ্ঞানশাস্ত্র হিসাবে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করতে পারে না, কারণ ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক গঠনাকৃতির শারীর ও মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত জ্ঞানের প্রাচুর্যেই নৃতত্ত্বের মূল উপাদানগুলি আরো উৎকর্ষ লাভ করেছে। ব্যক্তিবিশেষের শরীর ও মনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পাওয়া জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নৃতত্ত্ববিদরা এক জীবনের সীমা ছাড়িয়ে সমবায় জীবনের ব্যাপকতায় তাদের গবেষণা ও অধ্যয়নের পথ ঠিক করে নিয়েছেন। সমবায়-জীবনের উন্নত-তর বিকাশের পথে ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব কোন্ পথে কতখানি পরিবর্তন আনতে পারে বা এনেছে সে বিশেষ অনুধ্যানের দায়িত্বও নৃতত্ত্বের নিখুঁত গবেষণার ফলে পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সমবায়-জীবনের সকল কার্যকলাপই হচ্ছে নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানের প্রাথমিক ভিত্তি। ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতি এখানে গৌণ। সমবায় জীবনের পরিসর সমাজের কোন স্তরে কতখানি ব্যাপক সে বিশেষ গবেষণার দায়িত্বও নৃতত্ত্ববিদ্-দের। সুতরাং সমাজ শৃঙ্খলার মূল ধারাটি বুঝতে হলে নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগী একান্ত-ভাবে অনুসরণ করতেই হবে। সমাজ বিবর্তনের স্পষ্টোপলব্ধি তাই আজ নৃতত্ত্বের পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক অবদানের কল্যাণেই পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি সমবায়-জীবনে এক সাধারণ সভ্য হিসাবেই গণ্য করা হয় নৃতত্ত্বের অনুধ্যানে। সমবায়-জীবনের সকল সভ্যের মিলিত কার্যকলাপের নিশ্চিত কারণ ও ধারা দুইয়ের বিচার বিশ্লেষণই নৃতত্ত্ববিদদের প্রধান কর্তব্য। সামাজিক সমবায় জীবন গঠনের সংগে ব্যক্তিবিশেষের ডিষ্ট্রিবিউশন বা বণ্টনের অন্তর্সম্পর্ক উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করাও নৃতত্ত্বের দায়িত্ব।

ব্যক্তিবিশেষের অনুধ্যানে শারীরবিজ্ঞানবিদরা তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে সে ব্যক্তির শারীরিক বিশৃঙ্খলাগুলি গবেষণা করে দেখেন। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলকারণ অনুসন্ধান নৃতত্ত্ববিদ-দের গবেষণা। অত্যধিক পরিশ্রমে মানুষের হৃদ-পিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যকলাপে যে ব্যতিক্রম আসবেই সে জ্ঞান শারীরবিজ্ঞানবিদদের বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তে যথাযথভাবে আমরা পাই সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সামাজিক অবস্থার চাপে সমবায় জীবনের প্রত্যেক সভ্যের এই রকমের কঠিন পরিশ্রম করতেই হয় সে বাস্তব অবস্থার প্রত্যক্ষতা বিচার করাই হলো নৃতত্ত্ববিদদের অন্যতম প্রধান গবেষণা। আবার ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবৃত্তি অথবা মনোবৃত্তিগত আচরণ মনস্তত্ত্ব-বিদদের অনুধ্যানে পরিষ্কার বোঝা যায় নিশ্চয়; কিন্তু যে জাতীয় অথবা সামাজিক অবস্থার বাধ্য-তায় সমবায় জীবনের আচরণ সমষ্টিগতভাবে গড়ে উঠছে সে অবস্থার বিচার বিশ্লেষণই নৃতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান নৃতত্ত্বেরই বিশেষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে আরম্ভ করতে হয়। সমাজ ও সামাজিক জীবনধারায় উপযুক্ত গবেষণাই যখন নৃতত্ত্বের মূলভিত্তি সে অবস্থায় সমাজ সম্পর্কীয় সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রারম্ভিক জ্ঞানার্জনে নৃতত্ত্বের মৌলিক

উপাদানগুলির মনোযোগী অনুধ্যান একান্তভাবেই অপরিহার্য।

জাতীয় অথবা সামাজিক সমবায়-জীবনে যে কোন ব্যক্তি সাধারণ এক সভ্য হিসাবেই গড়ে ওঠে এবং সমবায়-জীবনের বিবর্তনে আচরণও করে এই সভ্য হওয়ার দায়িত্বে। ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক গঠন পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতায় ও জীবনধারণের বিশেষ অবস্থার অনুকূলেই গড়ে ওঠে। এখানে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক অবস্থার ওপরেই শরীরের বিভিন্ন কার্যকলাপ গভীরভাবে নির্ভর করে সব সময়। এই কারণেই যে জনগোষ্ঠী একমাত্র মাংসাহারের ওপর আপন অভিরুচি মাফিক অথবা প্রয়োজনের চাপে জীবনধারণ করে তাদের শারীরিক কার্যকলাপ, সব্জি আহারের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর শারীরিক কার্যকলাপ থেকে বিভিন্ন হবেই অথবা বিপরীত দিকে একই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়গোষ্ঠীর লালন-পালন সম্ভব করে তুললে তাদের শারীরিক আচরণে সাদৃশ্য সব সময়েই আমরা পাব।

নৃতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী করে অনুভব করতে হয় যখন শবচ্ছেদবিদ্যায়, শারীর ও মনোবিজ্ঞানের মূলধারাটি অনুসরণ করা যায়। এই অনুসন্ধানের ফলেই বোঝা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষের ওপরই নির্ভর করে ঐ সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয়ীভূত ঘটনাগুলির গবেষণা ও অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করতে হয়। এ অধ্যয়ন সম্পূর্ণভাবে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিবর্জিত, কারণ ব্যক্তিবিশেষকে এককভাবে পৃথক করা এবং সামাজিক ও জাতীয় প্রভাব অপ্রকৃতভাবে বর্জন করে গঠন ও কার্যকলাপের ব্যতিক্রমজনিত সমস্যাগুলি সাধারণ সূত্রাকারে প্রকাশ করা দুইই আনুমানিকভাবে সম্ভব। মূলতঃ সামাজিক বিষয়ীভুক্তগুলির অনুধ্যানে, যেমন অর্থনৈতিক জীবনে, সমবায়-জীবনের সামাজিক সংগঠনে, ধর্মসম্পর্কীয় ধারণা ও বৃত্তিতে এই উপরোক্ত প্রচেষ্টা একেবারেই অচল। ব্যক্তি-বিশেষের অনুধ্যানে সে ব্যক্তির সমবায়-জীবনের অন্যান্য সভ্যের বিচার সম্পূর্ণ হয় না আর হতেও পারে না। উপরন্তু সমবায় জীবনের বিভিন্ন সংস্থিতির এক বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান সাধারণভাবে সে সমবায়-জীবনের সকল সভ্যের বিবিধ কার্য-কলাপের ওপর কিছু আলোকপাত করেই। ব্যক্তিবিশেষের অনুধ্যানে সমবায়-জীবনের প্রকৃত অবস্থাও পরিষ্কার করে বোঝা যায় না। এই কারণেই নৃতত্ত্ববিদগণ সমবায়-জীবনের অনুধ্যানে অধিকতর আগ্রহশীল।

মনস্তত্ত্ববিদগণ সুনিপুণ শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করেন। যদিও এই কার্যপ্রক্রিয়া সবজায়গাতেই মৌলিকভাবে একই ধরণের, কিন্তু এই সৃষ্টির কাজে এই অর্থই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শিল্পীই একমাত্র সৃষ্টিকারক হিসাবে প্রাধান্য পেতে পারেন না, কারণ যে কোন সময়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব গভীরভাবে শিল্পীর মনে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে এবং এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় আদৌ কোন সুনিপুণ শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা হয়ত আসতে নাও পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মনের প্রতিক্রিয়া কোন পথে ও কোন অবস্থায় সৃষ্টিকারককে স্বভাবতঃই আলোড়িত করে সে বাস্তব অবস্থার অনুধ্যান নৃতত্ত্বের কর্তব্য। ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রভাবও এঅবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ন্ত্রিত করে, মনে রাখা দরকার। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন সংস্থিতির স্পষ্টোপলব্ধি ছাড়া মানুষের সাংস্কৃতিক প্রগতির রূপ কোনমতেই বোঝা যায় না বলে নৃতত্ত্ববিদগণ সংস্কৃতির সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান সাধারণ শিক্ষার্থী মহলে প্রসারিত করতে তৎপর। যেহেতু পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থা, ঐতিহ্যগত প্রভাব, অর্থনৈতিক গঠন ও স্বাভাবিক বুদ্ধিচিন্তার সমবেত প্রয়োগে সমবায়-জীবনের বিকাশ ও প্রসার সম্ভব হয়ে ওঠে, সে কারণে সমাজ ও মানুষের যে কোন অনুধ্যানে এই সমস্ত উপরোক্ত

প্রাথমিক বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নৃতত্ত্বের গবেষণায় ও অনুধ্যানে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্যে।

এখন যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ও বিচার করতে চেষ্টা করেন তাদের সামাজিক গোষ্ঠীর অধ্যয়ন নিখুঁতভাবে করতেই হবে, কারণ ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি এখানে গৌণ। সামাজিক গঠনের যে কোন অধ্যয়নে ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি প্রধান নয় বরং সামাজিক সমবায়-জীবনের বিবিধ কার্যকলাপই সে অধ্যয়নের মূল উপাদান। সামাজিক গঠন রীত্যানুযায়ী অনুধ্যান করা সম্ভব। সে সংগঠনের বিভিন্ন অংশের নিকট সংযোগ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাগুলিও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব, নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি-ভংগী নিয়ে। একক ও সমবায়-জীবনে এই সংগঠনের প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন প্রভাবের অনুধ্যান নৃতত্ত্ববিদদের অন্যতম প্রধান অংগ। সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন সংস্থিতিতে মানুষ কোন পথে ও কিরকম কার্যকলাপে আপন সত্তাটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে প্রকৃতির সংগে স্বাভাবিক সংগ্রামে, সে তথ্য নৃতত্ত্বেরই সুষ্ঠুপ্রয়োগে প্রণিধান করা সহজ। সমাজ-প্রগতির যে নিজস্ব এক শক্তি রয়েছে সে সত্যতার অনুসন্ধান নৃতত্ত্ববিদের বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণে পরিষ্কারভাবে করা যায়। ব্যক্তিগত উন্নতির প্রচেষ্টা ও সমষ্টিগত প্রগতির প্রয়োজনীয়তা সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সমষ্টি-জীবন থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ কতখানি বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে সে বিচারও এখানে আবশ্যক। সমাজের সমগ্র গঠনটা ব্যক্তিবিশেষের অনুধ্যানে বোঝবার চেষ্টা নৃতত্ত্ববিদের ধর্ম নয় বরং সমগ্র সমাজের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনে কি ধরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনে সে বাস্তব অধ্যয়নই হচ্ছে নৃতত্ত্বের মূল ব্রত।

ভাষাতত্ত্ববিদরা ভাষার গঠন ও প্রণালী নিয়ে অধ্যয়ন করেন। ভাষায় প্রকাশ করার আদর্শ, শারীরিক প্রক্রিয়াজনিত স্বর ও শব্দের পরিবর্তনগুলি, ভাষা মারফত মানসিক অবস্থার উপস্থিতি ও অর্থ পরিবর্তনের স্বাভাবিক বাস্তব কারণ ইত্যাদি সমস্তই ভাষাতত্ত্ববিদের অনুধ্যানে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। স্বর বা শব্দের অভিব্যক্তিতে ও নিয়ন্ত্রণে শরীরের কোন কোন অংশের প্রত্যক্ষ সংযোগ যে অত্যাবশ্যক সে সত্যতা ভাষাতত্ত্ববিদদের বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানে আমরা পাই। ভাষার প্রসারে সামাজিক সংস্থিতিটা কিন্তু নৃতত্ত্ববিদরা অধ্যয়ন করেন। দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তা ও মনের ভাব প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবেই ভাষার প্রয়োজন নৃতত্ত্ববিদদের আকৃষ্ট করেছে এই ভাষাগত বিবিধ তথ্যের অনুসন্ধানে। ভাষা ও সংস্কৃতির পরস্পরের অন্তর্সম্পর্কটি নৃতত্ত্ববিদরা বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা করেন গভীরভাবে। সংস্কৃতির প্রসার সংরক্ষণে ভাষার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা নৃতত্ত্ববিদদের সচেষ্ট করে তুলেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিগত সম্পর্কটা বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার কাজে। ভাষার মিল অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হয়েছে নৃতত্ত্বের নিখুঁত অনুধ্যান ও গবেষণায়। ভাষার প্রসার ও পরিসর অনুসন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে একটা সত্যকারের মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব এই গবেষণায়। সংস্কৃতির প্রসার এই পথেই উপলব্ধি করা সহজ। নৃতত্ত্ববিদদের অনুধ্যানে ভাষা ও সংস্কৃতির নিকট সম্পর্কটাই অন্যতম প্রধান বিষয়।

ব্যক্তিবিশেষের সংগে অপর সভ্যের সম্পর্ক বাস্তব অবস্থায় বিচার করতে উদ্যোগী হলে পর যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজেরই গতিবিধির প্রতি জোরালো নজর রাখতেই হবে। যে কোন অবস্থাতে ব্যক্তিবিশেষকে আমরা এক বিচ্ছিন্ন অংশ বা ইউনিট হিসাবে বিচার করতে পারিনা। ব্যক্তিবিশেষের বিচার তার সামাজিক যোজনায়

মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হবে। সমাজ-জীবনের গতি চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন কোন প্রাকৃত সূত্র বাস্তব অবস্থায় পাওয়া সম্ভব কিনা তাও এই সংগে সাধারণ সমাজ-সম্বন্ধীয় স্বীকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই অনুধ্যান করতে হবে। একক জীবনের গঠন ও অভিব্যক্তির সংগে সমাজ-সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্যের যে নিকট সংযোগ রয়েছে সে বিচারও এখানে অত্যাবশ্যক। সমাজ-জীবনের সমষ্টিগত প্রভাব এককজীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে যে আবশ্যকীয় গঠনমূলক সাহায্য করে সে প্রভাবের গুণগত গবেষণা নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর সাহায্যেই সম্ভব।

এই প্রকারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বাস্তবে দৃষ্ট ঘটনাবলীর অন্তর্সম্পর্কই প্রধান। সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই ব্যক্তিবিশেষের জীবন গড়ে ওঠে। এই কারণেই কোন শিশুগোষ্ঠীর উন্নতিতে তাদের জাতীয় জন্ম, পিতামাতার অর্থনৈতিক জীবন ও স্বচ্ছলতা সমস্তই গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এই প্রত্যক্ষ কারণগুলির পরস্পর কার্য-প্রণালীর জ্ঞানই আমাদের শারীরিক উন্নতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সহজ করে তোলে। সমষ্টিগত জীবনের উপযুক্ত অবস্থা নিশ্চয় করে ইঙ্গিত করার ক্ষমতাও এই জ্ঞানোপলব্ধিতে পাওয়া সম্ভব।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত অপরিহার্য সামাজিক তথ্যাদি সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। সমাজ ও সামাজিক জীবনে বাস্তব অবস্থার অনিবার্য প্রভাব কিভাবে পরিবর্তনগুলি অলঙ্ঘনীয় করে তোলে সে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এই তথ্যাদিরই উপযুক্ত চর্চায় উৎকর্ষ লাভ করে। সমাজ-শৃঙ্খলার বিভিন্ন অবস্থাতে মানবগোষ্ঠীর বিবিধ কার্যকলাপের এক বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নই নৃতত্ত্বের চরম লক্ষ্য। সমাজের নীচুস্তরের আদিম মানবগোষ্ঠীর বিশেষ জীবনধারার বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান নৃতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখেছে জীববিজ্ঞানের পরিসরে। জীব-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রয়োজনীয় গবেষণার ফলাফলের উপযুক্ত সাহায্য নিয়ে নৃতত্ত্ব আপন গবেষণার পথ দৃঢ় করে তুলছে সাধারণভাবে। আজ আমাদের দেশে নৃতত্ত্বের ব্যাপক অধ্যয়ন চালু করতেই হবে, নইলে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ নানাভাবে বিশৃঙ্খলতার স্বাভাবিক কারণগুলি প্রকট করে তুলবেই দিনে দিনে 'সভ্য'-মানুষের নিকট-সম্পর্কের জটিলতায়। দেশের সমগ্র জন-গোষ্ঠীর মধ্যে আদিম মানবগোষ্ঠী বেশ একটু গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে বসে আছে। 'সভ্য'-মানুষের সংগে আদিম-মানুষের সংযোগ প্রতিদিনই স্বাভাবিক হয়ে আসছে এবং সে সংগে সামাজিক সমস্যাও বেড়ে যাচ্ছে ভীষণ ভাবে। এই সমস্যা সমাধানে নৃতত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগ অপরিহার্য বলেই সাধারণ শিক্ষার্থী মহলে নৃ-বিজ্ঞানের উপযুক্ত অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করতেই হবে আজ।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণতঃ কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। বিজ্ঞান-দর্শন বলিয়া যে একটি নূতন দর্শন-শাখা গঠিত হয়েছে, সে ভ্রান্ত ধারণগুলি দূর করা তাহার কাজ। এক্ষণে আমরা কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১। একটি ভুল ধারণা এই যে, বিজ্ঞান জড়-পদার্থকে কয়েকটি মৌলিক কণার সমষ্টি মনে করে। অনেক বিজ্ঞানবিদ্ যাঁহারা বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা করেন না অথচ বিজ্ঞানকে সাধারণের জন্য সরল করিতে চাহেন এমনিভাবে কথা বলেন যে, সকলের এই মনে হয় যে, একটি যে কোন বস্তুর যথার্থতা কতকগুলি কণাসমষ্টি মাত্র। অথচ এই সকল কণা (যেমন ইলেকট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি) বস্তুর গুণাবলী বর্জিত ও বিমূর্ত; ইহাদের দ্বারা কোন বস্তুর মূর্ত গুণাবলী সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকাদের মধ্যে জলীয় গুণ নাই; ইহাদের সংমিশ্রণে জলের জলীয় ভাব কিরূপে জন্মে? সুতরাং একদল দার্শনিক বলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলী সম্বলিত বস্তু সকলই সত্য, বিজ্ঞান বর্ণিত বিমূর্ত বস্তু সকল সত্য নয়। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বৃথা দ্বিখণ্ডিত করে যখন সে সগুণ বস্তু সকলের কারণ হিসাবে নির্গুণ কণাদের উপস্থাপিত করে। কিন্তু আমরা বলিব যে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই নালিশ একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ বিজ্ঞান কখনও বলে না যে, অণু-পরমাণু দ্বারা জড় জগতের সমস্ত গুণ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বিজ্ঞান শুধু ইহাই বলে যে, এই জগতের অনেকগুলিই গুণ বিশ্লেষণ করা যায় এবং ইহাদের মূলে কয়েকটি মৌলিক বস্তুকণা পাওয়া যায় যাহাদের বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন জাগতিক বস্তুর উদ্ভব হয়। কি করিয়া এমন হয় এবং ইহার অন্যান্য কি কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বিজ্ঞান জানে না এবং এ বিষয়ে কিছু বলে না। কারণ ইহা দর্শনের বিষয়ীভুক্ত। দর্শন বলে যে, কোন বস্তুর উপাদান কারণ-ই তাহার সমগ্র কারণ নয়, উপাদানগুলির সংমিশ্রণের ফলে কয়েকটি নূতন গুণের উদ্ভব হয়, যেগুলির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান জগৎ বৈচিত্র্যকে অণু-পরমাণুর সহিত একীকরণ করে না, ইহা শুধু দেখায় যে, বস্তুর কয়েকটি গুণ ও প্রকৃতি অণু-পরমাণুর সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণাবলীকে অগ্রাহ্য করিতে বা গৌণ মনে করিতে পারে না, কারণ তাহাদের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কণাগুলিকে মুখ্য বা অধিকতর সত্য মনে করিতে পারে না, তাহাদের স্থান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর (যেমন কাঠ, লোহা, মাটি) উপরে নয়। বিজ্ঞান-দর্শন বিজ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যা করে এবং ইহা বিজ্ঞানের বক্তব্যকে বিশদভাবে সাধারণের সম্মুখে রাখে। সুতরাং ইহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ভুল ধারণাটি, (যাহা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিলাম) দূর করিতে চেষ্টা করে।

২। আর একটি ভুল-ধারণা এই যে, বিজ্ঞান যাহা সরল বা প্রাথমিক তাহাকেই সত্যতম মনে করে। যেমন পদার্থ, গতি ও সংখ্যা, ইহারা জগতের মূলে,—এমন কথা অনেকে বিজ্ঞানসম্মত মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে। বিজ্ঞান ইহা সমর্থন করে না এবং ইহা সত্যও নয়। কারণ পদার্থ, গতি বা সংখ্যা ইহাদের মধ্যে কোনটিই যথার্থরূপে সরল বা প্রাথমিক নহে। ইহাদের

সরলতা আপাত এবং তাহার কারণ শুধু এই যে, আমরা এগুলিকে বিশ্লেষণ না করিয়া এমনিই সন্তুষ্ট থাকি। প্রকৃতপক্ষে ইহারা জটিল। পদার্থ বলিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলীর নানা সংমিশ্রণ বোঝায়, গতিকে বিশ্লেষণ করিলে স্থান ও কাল এ উপনীত হইতে হয় এবং সংখ্যাও কোন একটি প্রাথমিক সংজ্ঞা নয়। সুতরাং ইহা ভুল যে, জগৎ পদার্থ মাত্র, বা গতির ক্রীড়া বা সংখ্যা হইতে উদ্ভূত। কণাগুলি প্রাথমিক বস্তু হইতে পারে, কিন্তু তাহারাই সব নয়, কারণ তাহাদের নানারূপ সম্বন্ধ ও সমাবেশ কেন হয় তাহাও বিবেচ্য। উপদান কারণই সব নয়; দার্শনিক মতে রূপকারণ নিমিত্ত কারণ ও শেষ কারণ বা ভোক্তা কারণও আছে। শেষের দুই প্রকার কারণকে বিজ্ঞানে গৌণ মনে করিলেও দ্বিতীয়টি, (রূপকারণ) অবশ্য স্বীকার্য। রূপ অর্থে কণাগুলির নিয়মাবলী বোঝায়, তাহারা কি নিয়মে বিন্যস্ত এবং কি নিয়মে চলে। পদার্থ ও তাহাদের রূপ লইয়াই জগৎ এবং সেইজন্য ইহাদের মধ্য কোন একটিকে প্রধান মনে করা ভুল। ইহারা প্রত্যেকেই পরম সত্যের একটি দিক বা অংশ, এবং সেইজন্য আংশিক সত্য। পরম সত্য এই পরিদৃশ্যমান মূর্ত জগৎ, অন্য সমস্তই ইহাকে বিশ্লেষণের ফল।

৩। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞানে কোন প্রশ্নের একেবারে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়, ইহাতে ভুল বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুতরাং তাঁহারা বিজ্ঞানের কোন তথ্য, বা নিয়মকে অভ্রান্ত মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা মনে করে না। কারণ এই যে বিজ্ঞান ইহা পরীক্ষামূলক। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহাকে বার বার লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার মাপজোক করিতে হইবে। প্রতিবারের মাপ একেবারে এক হয় না, কারণ কোন বস্তুই একেবারে অপরিবর্তনীয় হয় না এবং পরীক্ষকের মাপিবার অল্পবিস্তর ভুলচুকও হয়। সুতরাং অনেকগুলির মাপ ফলের মধ্যক লইতে হয় এবং ইহাকেই যথার্থ মাপ বলা হয়। অথচ এই সংখ্যাটি হয়তো কোনবারই পাওয়া যায় নাই। যেমন কোন একটি বস্তুর ভার জানিতে হইলে অনেকগুলি পরীক্ষা করিতে হয়। তাহাদের ফল হয়তো হয় ৪.২১৩, ৪.২০২, ৪.১৯০, ৪.২৩১, এবং তাহাদের মধ্যক ৪.২০৯। এই গড়-পড়তা মাপ ফলের উপর নির্ভর করিয়াই বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা সূত্রগুলি তৈরী হয়। সুতরাং তাহারা যে একেবারে ঠিক তাহা বলা চলে না। এ ছাড়া আরও একটি কথা আছে। বিজ্ঞানের সূত্রগুলি যেমন পরীক্ষামূলক তেমনি আবার তাহা আমাদের কতগুলি পূর্বপ্রতিজ্ঞা-নির্ভর। যেমন গতি-বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়মাবলীই আমাদের স্থান-কালের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেইগুলি পরিবর্তিত হইলেই নিয়মগুলিও পরিবর্তিত হইবে। এবং আমাদের ন্যায়ের ও গণিতের নিয়মগুলিও বিজ্ঞানের নিয়মগুলির আধার ভূমি। সুতরাং দেখা যায় যে বিজ্ঞান একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গম্য গুণাবলীর উপর প্রতিষ্টিত, অপরদিকে মানব মস্তিষ্কের কয়েকটি ভিত্তিমূলক প্রাথমিক ধারণার উপরও নির্ভরশীল। সুতরাং ইহার ধ্রুবত্ব ও সার্থকতা সন্দেহাতীত নহে। সেই জন্য বিজ্ঞানকে অন্ধভাবে মানিয়া না লইয়া তাহাকে বিচার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। বিজ্ঞান-দর্শন বিজ্ঞানের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও সীমা নির্দেশ করিতে যত্নবান। যেমন সাহিত্যের সমালোচনার প্রয়োজন হয় তেমনি বিজ্ঞানেরও সমালোচনা আবশ্যক। বিজ্ঞান-দর্শন এই সমালোচনাই করে এবং ইহাতে বিজ্ঞানের ও দর্শনের উভয়েরই উপকার হয়।

তেজস্ক্রিয়া

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবহারিক পদার্থ-বিজ্ঞানের যে কয়টি আশ্চর্যজনক আবিষ্কার দেখা গেছে, তার ভিতর প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করেছে পদার্থের 'তেজস্ক্রিয়া'। এই তেজস্ক্রিয়া খুব অল্প কয়েকটি পদার্থের ভিতরই দেখা যায়। ১৮৯৬ সালে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেন্‌রী ব্যাকারেল দেখতে পেলেন যে, ইউরেনিয়াম সংযুক্ত বিভিন্ন পদার্থ এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অর্থাৎ কাছাকাছি স্থাপিত কোন ফটোগ্রাফীর প্লেটকে আপনাথেকেই এরা সক্রিয় করে তোলে। কোন তড়িৎযুক্ত পদার্থ যদি ইউরেনিয়াম ধাতুর কাছে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, পদার্থটি তড়িৎ বিহীন হয়ে গেছে। এথেকে স্বতঃই এটা মনে হবে যে, ইউরেনিয়াম থেকে নিশ্চয়ই এমন কিছু নির্গত হচ্ছে যাদ্বারা তড়িৎযুক্ত পদার্থটি নিস্তড়িৎ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গেই পদার্থের নতুন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কৃত হলো। পরে দেখা গেল যে, শুধু ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়াম নামে আর একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতুরও এই বৈশিষ্ট্য আছে। হেন্‌রী ব্যাকারেলের এই আবিষ্কারের প্রায় দু'বছর পরে ফরাসী বৈজ্ঞানিক কুরী-দম্পতি দেখতে পেলেন যে, পিচব্লেণ্ড নামক এক প্রকার পদার্থে এই বৈশিষ্ট্য অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান। খাদযুক্ত পিচব্লেণ্ডকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বহুভাগে বিভক্ত করে তাঁরা দেখলেন যে, এই বৈশিষ্ট্য খুব অল্প পরিমাণ স্থানে আবদ্ধ এবং এই অল্প পরিমাণ সক্রিয় অংশকে পুনরায় রাসায়নিক বিভাগ দ্বারা তাঁরা অতি সামান্য অংশ পেলেন যার তেজস্ক্রিয়া অত্যন্ত অধিক। এই সামান্য সক্রিয় অংশের নাম দেওয়া হলো 'রেডিয়াম'। কুরী-দম্পতি অবিশ্বাস্য রকমের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে কয়েক টন পিচব্লেণ্ড থেকে মাত্র কয়েক গ্রেণ রেডিয়াম বা'র করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই রেডিয়ামের বর্তমান মূল্য অত্যন্ত অধিক। পরবর্তী কয়েক বৎসরে তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুশীলন করে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে এবং এই সমস্ত তথ্যাদি বিচার-বিবেচনা করে ১৯০৩ সালে রাদারফোর্ড ও সডি তেজস্ক্রিয় পদার্থের "স্বতস্ফূর্ত ক্ষয়" নামক প্রতিপাদ্যের অবতারণা করেন। এই প্রতিপাদ্য অনুসারে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রিকগুলি আপনা থেকেই ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুগুলি এতই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর যে, কালক্ষেপের সঙ্গে এর কেন্দ্রিকগুলি অবধি ভেঙ্গে পড়ে এবং যেটা একসময়ে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিক বলে দেখা গেছে, কিছু সময় পরে নানারকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সেটা ভেঙ্গে সীসার পরমাণুর কেন্দ্রিকে পরিণত হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই রূপান্তর মুহূর্তে ঘটে না; নির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্তরে এর রূপান্তর হয়। এই রূপান্তর হবার সময় এই পদার্থ থেকে তিনরকম রশ্মির উদ্ভব ঘটে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা, বিটা ও গামা-রশ্মি।

গোড়াতে কোন বাচবিচার না করেই এদের প্রত্যেককে রশ্মি বলা হয়েছিল, কারণ সূর্য-রশ্মির মত এরা প্রত্যেকেই খানিকটা পুরু হাওয়া, ধাতব পদার্থ বা অন্য কোন পদার্থ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু পরে পরীক্ষা-দ্বারা এদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এটা সকলেরই জানা ছিল যে, তড়িৎসম্পন্ন ধাবমান

কোন কণার গতিবেগ চুম্বক শক্তির দ্বারা ভিন্নমুখী করা যায়। বিদ্যুৎসম্পন্ন কণাটির ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক বিদ্যুতের উপর নির্ভর করবে, কোনদিকে কণাটির গতিপথ ঘুরবে। চৌম্বকক্ষেত্রের অবস্থান এবং কোনদিক থেকে কণাগুলি আসছে জানতে পারলেই ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক কণাগুলি কোনদিকে ঘুরবে তা সহজেই বলা যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত বিভিন্ন রশ্মি চৌম্বকক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে এরূপ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আল্‌ফা-রশ্মি ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত এবং বীটা-রশ্মি ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। কিন্তু যতটা সম্ভব শক্তিশালী চুম্বকশক্তি প্রয়োগ করেও গামা-রশ্মির গতিপথের কোন পরিবর্তন করা গেল না। গামা-রশ্মি চুম্বকশক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে পথে আসছিল সোজা সেই পথেই বেরিয়ে গেল। এই ব্যাপার থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, গামা-রশ্মি কোনরূপ কণা দ্বারা গঠিত নয় অথবা কণাদ্বারা গঠিত হলেও তা কোনরূপ বিদ্যুৎবাহী নয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিস্তড়িৎ। পরে দেখা গেছে, প্রথম সিদ্ধান্তটাই ঠিক অর্থাৎ গামা-রশ্মি কোনরূপ কণা দ্বারা গঠিত নয়।

আল্‌ফা-কণা :—যেহেতু আল্‌ফা-রশ্মি ধনাত্মক কণা দ্বারা গঠিত সেহেতু তাদের সাধারণতঃ আল্‌ফা-কণা বলে অভিহিত করা হয়। ১৯০৯ সালে রাদারফোর্ড ও রয়েড্‌স্ এই আল্‌ফা-কণাকে ক্রমাগত খুব পাতলা একটি কাঁচের পর্দার (১ মিলিমিটারের ১০০ ভাগের একভাগ পুরু) ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে একটি কুঠুরীর ভিতর ঢোকাতে লাগলেন। যেখানে থেকে কণাগুলির বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না—অনেকটা ইঁদুরধরা কলের মত। এই প্রক্রিয়া বেশ খানিকটা সময় চালাবার পর দেখা গেল, কুঠুরীতে আল্‌ফা-কণা জমায়েত হবার পরিবর্তে জমায়েত হয়েছে হিলিয়াম গ্যাস, যেটা হাইড্রোজেনের পরেই সবচেয়ে সরল গ্যাস। এই পরীক্ষা দ্বারা বোঝা গেল যে, ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী আল্‌ফা-কণা হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিক ছাড়া আর কিছুই নয়। আলফা-কণা ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী বলে কুঠুরীর দেওয়াল থেকে ঋনাত্মক বিদ্যুৎবাহী ইলেকট্রনকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেছে এবং দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়েছে।

আল্‌ফা-কণা অপরিমিত গতি নিয়ে ছোটে। কি ধরণের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এরা বিকিরিত হচ্ছে তার উপর এদের গতি নির্ভর করে। থোরিয়াম সি-ড্যাস্ (Thorium C´) থেকে নির্গত সবচেয়ে দ্রুতগতি আল্‌ফা-কণার গতি সেকেণ্ডে ১২,৮০০ মাইল এবং সবচাইতে কম গতিসম্পন্ন আল্‌ফা-কণা যা ইউরেনিয়াম ১ থেকে বিকিরিত হচ্ছে তার গতি সেকেণ্ডে ৮৮০০ মাইল। এই গতির পরিমাণ সাধারণ হাওয়ার আণবিক গতির প্রায় ৩০,০০০ গুণ। এই অপরিমিত গতি নিয়ে যে কণা বিচরণ করে তারা যে তাদের পথের সমস্ত অণুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্‌ফা-কণার বিরাট ভেদশক্তির মূল কারণ এইটাই।

বীটা-কণা :—চুম্বকশক্তির দ্বারা বীটা-রশ্মির গতিকে প্রভাবান্বিত করার পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বীটা-রশ্মি ঋণাত্মক ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত—ঠিক যে ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্রিককে পরিভ্রমণ করে ঘুরে বেড়ায়, তার মত। যেহেতু আল্‌ফা-কণার ধনাত্মক বিদ্যুৎ-পরিমাণের সমান, সেহেতু, একটি পরমাণু থেকে যখন একটি আল্‌ফা কণা বেরিয়ে যায়, তখন পরমাণুটির ধনাত্মক বিদ্যুৎ পরিমাণ কম হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পরমাণুটি তখন ঋণতড়িৎসম্পন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই, পরমাণুতে, ঋণাত্মক ও ধনাত্মক তড়িৎ-পরিমাণ সমান রাখতে হলে একটি আল্‌ফা-কণা বিচ্ছুরণের সঙ্গে দুটি ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ অবশ্যম্ভাবী। বীটা-কণা আল্‌ফা-কণার চাইতেও দ্রুত-

গতিসম্পন্ন এবং অনেক বীটা-কণার গতি আলোকের গতির (১৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে) খুবই কাছাকাছি।

পদার্থের গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তাথেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক পরমাণুকেন্দ্রিক প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। প্রোটন ধনতড়িৎসম্পন্ন; কিন্তু নিউট্রন নিস্তড়িৎ এবং উভয়ের ভর প্রায় সমান। তাহলে পরমাণু-কেন্দ্রিকে ইলেকট্রনের কোন স্থান নেই। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে তিন রকম রশ্মি নির্গত হয় তারা সরাসরি কেন্দ্রিক থেকেই আসে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, বীটা-কণা ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই প্রশ্ন হতে পারে যে, এই ইলেকট্রন আসছে কোথা থেকে। সব-চেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে—একটি নিউট্রনকে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সংযোগ দ্বারা গঠিত ধরে নেওয়া। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিচ্ছুরণের সময় একটি নিউট্রন ভেঙ্গে এই দুটি পদার্থ বেরিয়ে আসে; ইলেকট্রনটি ছুটে বেরিয়ে যায়; কিন্তু প্রোটনটি স্থির থাকে। আল্‌ফা এবং বীটা-কণা যখন কোন গ্যাসের ভিতর দিয়ে ছুটে যায় এবং গ্যাসের অণুগুলির সঙ্গে ধাক্কা খায় তখন তাদের গতিপথ কিরূপ হয় তা খুব সুন্দররূপে পরীক্ষা করা যায় এক অভিনব উপায়ে, যাহা অধ্যাপক উইলসন আবিষ্কার করেছিলেন। অধ্যাপক উইলসনের এই আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। অধ্যাপক উইলসন একটি কুঠুরীকে জলীয় বাষ্পদ্বারা পূর্ণ করে তার ভিতর আল্‌ফা অথবা বীটা-কণাকে ঢুকিয়ে দিলেন। কণাগুলি বাষ্প ভেদ করে ছুটে যাওয়াতে তার পিছন পিছন যে রেখা তৈরী হলো তিনি তার ছবি ফটোগ্রাফের সাহায্যে তুলে নিলেন। আল্‌ফা অথবা বীটা-কণাকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তারা যে পথরেখা তৈরী করে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—ঠিক যেমন বহু উঁচুতে অবস্থিত উড়োজাহাজকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু উড়োজাহাজ যে পশ্চাৎরেখা সৃষ্টি করে তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। আল্‌ফা অথবা বীটা-কণা উইলসন কুঠুরীতে যে পথরেখা ফেলে তা পর্যালোচনা করে ঐ কণা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। উইলসন নির্মিত এই কুঠুরীর নাম মেঘ-প্রকোষ্ঠ এবং এই আবিষ্কারের ফলে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন

গামা-রশ্মি :—আগেই বলা হয়েছে যে, গামা-রশ্মি কোনরূপ কণা দ্বারা গঠিত নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বকক্ষেত্র এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না; কারণ তারা এক্‌স্‌-রে বা রঞ্জন-রশ্মির মত অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। রঞ্জন-রশ্মির সঙ্গে গামা-রশ্মির তফাৎ শুধু এই যে, গামা-রশ্মি পরমাণু-কেন্দ্রিক থেকে নির্গত হয়, কিন্তু রঞ্জন-রশ্মি তা হয় না। এই অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গসম্পন্ন গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভব হয়েছে।

১৯১৪ সালে রাদারফোর্ড এবং অ্যানড্রেড ব্র্যাগ স্পেক্ট্রোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রেডিয়াম-বি থেকে উদ্গত গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মেপেছেন। পরে এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা হয়েছে। এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ যা রেডিয়াম্‌-সি থেকে বহির্গত হয় তার দৈর্ঘ্য ·০১৬ এ্যাংষ্ট্রম্ ইউনিট। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঞ্জন-রশ্মি তৈরী করতে হলে রঞ্জন-রশ্মির নলটির বিভব-প্রভেদ ৭৭০,০০০ ভোল্ট রাখতে হবে।

গামা-রশ্মির বস্তুভেদ করবার ক্ষমতা অস্বাভাবিক। তিরিশ সেন্টিমিটার পুরু লোহার পাতকে অনায়াসে ভেদ করে গামা-রশ্মি অগ্রসর হতে পারে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিচ্ছুরণকে বন্দুক ছোঁড়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে; আল্‌ফা-কণা হচ্ছে ছুটন্ত গুলি; বীটা-কণা বন্দুকের ধোঁয়া এবং গামা-রশ্মি হচ্ছে আলোর ঝল্‌কানি। বিচ্ছুরণের পরে যে সীসার পরমাণু পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে গুলিহীন

বন্দুক এবং বিচ্ছুরণের পূর্বেকার তেজস্ক্রিয় পরমাণু হচ্ছে টোটাভরা বন্দুক। এই তেজস্ক্রিয় বন্দুকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা আপনা থেকেই অবিরত ছুটে যায়। বন্দুকের ঘোড়ার মত তেজস্ক্রিয় বন্দুকের ঘোড়া আবিষ্কারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—অন্ততঃ কোনরূপ প্রয়োজনীয় ফল এপর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রিকগুলির আপনা থেকে ভাঙ্গন দেখে, কৃত্রিম উপায়ে খুব জোরালো কোন কণা দ্বারা কেন্দ্রিক ভাঙা যায় কিনা, এরকম একটা প্রশ্ন মনে জাগা খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ আপনা থেকে ভাঙ্গে এরকম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংখ্যা খুব কম। কাজেই কৃত্রিম ভাঙ্গন আবিষ্কার করে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে সহজে রূপান্তরিত করতে পারলে মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন সার্থক করা যেতে পারে। দেখা গেছে যে, কেন্দ্রিকের উপাদানগুলিকে একসঙ্গে বেঁধে রাখবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন—যাকে বন্ধন-শক্তি বলা যেতে পারে—তার পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন ইলেক্ট্রন-ভোল্ট। কাজেই এই ধরণের শক্তিবিশিষ্ট কোন কণা দ্বারা কেন্দ্রিককে আঘাত করলে হয়ত কেন্দ্রিকের ভাঙন ঘটতে পারে আশা করা যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ধরণের শক্তিবিশিষ্ট কণা বলতে মাত্র তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আল্‌ফা-কণাই ছিল। সম্প্রতি দ্রুতগতিসম্পন্ন অন্যান্য কণার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এদের সাহায্যে পদার্থের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া অতি সহজ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে।

১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম রেডিয়াম সি থেকে নির্গত আল্‌ফা-কণা দ্বারা নাইট্রোজেনের কৃত্রিম ভাঙন দেখান। যখন তিনি আল্‌ফা-কণাকে নাইট্রোজেনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, নাইট্রোজেন-কেন্দ্রিক তখন আল্‌ফা-কণাটিকে বেমালুম আত্মসাৎ করে বসল। ফলে কেন্দ্রবস্তুর ভিতর কণাদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে সামঞ্জস্য ছিল তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল এবং এই সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে নাইট্রোজেন কেন্দ্রিক একটি প্রোটন বা'র করে দেয়। ফলে দেখা গেল যে, নাইট্রোজেন-কেন্দ্রিক অক্সিজেন-কেন্দ্রিকে পরিণত হয়েছে। এভাবে বহু পরমাণুকে আল্‌ফা-কণার সাহায্যে বিধ্বস্ত করে তা থেকে কৃত্রিম উপায়ে নতুন নতুন পরমাণু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। গত দশ বছরের ভিতর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার প্রণালীর অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আল্‌ফা-কণার পরিবর্তে অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ধনাত্মক আয়ন্ দ্বারা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া পরিচালনা করা হচ্ছে। এবিষয়ে যাঁরা গবেষণামূলক কাজ করেছেন, তাঁদের ভিতর ককক্রফ্‌ট্ ও ওয়াল্টনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ সালে ককক্রফ্‌ট্ ও ওয়াল্টন ৫০০,০০০ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি সমন্বিত প্রোটন দ্বারা লিথিয়াম-কেন্দ্রিক বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

লর্ড রাদারফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্রিক ভেঙে এক অপূর্ব শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, যে শক্তি পরবর্তীযুগে আণবিক বোমায় পরিণত হয়ে সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করেছে।

স্ফীতিশীল জগৎ

শ্রীকেশব ভট্টাচার্য

হয়তো এটা প্রকৃতির খেয়ালই হবে যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঠিক যখন য়ুরোপের পূর্বপ্রান্তে বর্তমান শতাব্দীর সব চাইতে বৈপ্লবিক ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা চলছিল, ঠিক তখনই য়ুরোপের অপর প্রান্তে ডি, সিটার নামে একজন গণিতবিদের একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে অনুরূপ এক বিপ্লবের সাড়া পড়ে গেল। ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক।

এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীর সবাই বিশ্বাস করত সূর্য ও নক্ষত্রে ভরা এই বিশ্বজগৎটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর চারদিকে সমস্ত বিশ্বজগৎটা ঘুরছে, এ দম্ভ এত সহজে মানুষের মনে স্থান পেল কি করে কে জানে! এই টলেমীয় মতবাদের দাম্ভিকতাকে পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান উড়িয়ে দিয়েছে। তার জায়গায় এসেছে সূর্যকেন্দ্রিক জগতের কল্পনা। এই মতবাদ বলে যে, সূর্য-ই স্থির আছে এবং তার চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহগুলি পরিক্রম করছে। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌রা মনে করেন যে, এই বিশ্বজগতে কোন নক্ষত্রই একেবারে স্থির নেই। নক্ষত্রগুলি এই বিরাট শূন্যের মধ্যে কেউ বা একলা, কেউ বা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অন্ধভাবে ছোটার ফলে পরস্পর সংঘর্ষও ঘটতে পারে তো! কিন্তু তার উত্তর হল এই যে,—এই জগতে শূন্য অর্থাৎ 'স্পেস্,' বস্তু অর্থাৎ 'ম্যাটার' অপেক্ষা এত অতিমাত্রায় বেশী এবং তার ফলে একটি নক্ষত্র আরেকটি থেকে এতই দূরে যে, যত প্রচণ্ড গতিতেই তারা ছুটোছুটি করুক না কেন, এদের পরস্পর সংঘর্ষের সম্ভাবনা এক লাখের ভিতর একবারের বেশী নয়। খুবই কদাচিৎ এই ধরণের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন একবার ঘটেছিল একটি নীহারিকা থেকে ছুটে খসে গিয়ে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি উৎপত্তির সময়। কিন্তু এই যে নক্ষত্রমণ্ডলীর ইতস্ততঃ চলাফেরা এছাড়াও অন্য এক ধরণের অদ্ভুত গতিশীলতা এদের আছে—যা কি না এখানে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় এবং এই শেষোক্ত গতির তুলনায় পূর্বোক্ত গতি নেহাৎই নগণ্য।

কোন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রে যখন আমরা আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাই তখন প্রথম যে ভাবটা মনে আসে সেটা হচ্ছে ভয়ের ও অপরিসীম বিস্ময়ের। পৃথিবী তো দূরের কথা, সারা সৌর-জগৎটাই এই সমস্ত বিশ্বজগতের মাপ কাঠিতে—পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের বেলাভূমির বালুকারাশির তুলনায় একটি বালুকণার যা প্রাধান্য, তার একটুও বেশী নয়। মোটামুটিভাবে তবু একটা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যথা, দশহাজার কোটি নক্ষত্রের (১০০,০০০,০০০,০০০,) সম্মিলনে একটি ছায়াপথমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। আবার এই রকম দশহাজার কোটি ছায়াপথমণ্ডলী এক হয়ে একটি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে। এই সংখ্যাগুলি বিশ্ব-জগতের বিরাটত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে খানিকটা সাহায্য করবে। আমরা যে বিশ্বজগতে আছি এর বাইরেও অন্য কোন এমনি বিশ্বজগৎ আছে কি নেই সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্‌রা কোন উত্তর দিতে অক্ষম। আপাততঃ আমাদের নিজেদের বিশ্বজগতের দিকেই দৃষ্টি ফেরান যাক। যে ছায়াপথমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের সৌরজগৎ একটি নগণ্য সভ্য, তিনি মাঝারি সাইজের, অন্যান্য ছায়াপথমণ্ডলীর তুলনায়।

এই বিরাট বিশ্বজগতের খুব অল্প ভগ্নাংশই মানুষের টেলিস্‌কোপের কাছে ধরা দিয়েছে। এর অধিকাংশ রাজত্বই পড়ে রয়েছে তার সব দেখাশোনার বাইরে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্‌কোপ দিয়ে সবচেয়ে দূরবর্তী যে নীহারিকা দেখা গিয়েছে (সেণ্ট জেমিনি) তার দূরত্বও মাত্র ১৫০০ লক্ষ আলোকবর্ষ। একটি আলোকবর্ষ হচ্ছে সেই দূরত্ব যা পেরিয়ে আসতে আলোর একবছর লাগে। মনে রাখবেন, মাত্র এক সেকেণ্ডে আলোর গতি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল।

এখানে আমরা শূন্য এবং তার জ্যামিতিক ধর্ম সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করব। ইউক্লিডের অনুবর্তীরা মনে করতেন যে, এই যে শূন্য, এর সীমাও নেই, শেষও নেই, কোনো পরিমাপ এর করা যায় না এবং এটা লম্বা একটানা বয়ে চলেছে। এই রকম 'স্পেস'কে 'ফ্ল্যাট স্পেস' বলে। কিন্তু এইসব জ্যামিতিবিদ্‌দের মতবাদের গলদ ধরে দিয়েছেন বর্তমান শতাব্দীর গণিতজ্ঞরা, যথা—আইনষ্টাইন এবং ডি, সিটার। তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অন্যরকম মনে হলেও আমাদের এই শূন্য মোটেই 'ফ্ল্যাট' নয়, এটা দোমড়ান বা বাঁকানো। এই ধারণাটাই এমন বৈপ্লবিক যে, প্রথমে বিজ্ঞানীরাও এটাকে মেনে নিতে রাজী হন নি। শূন্য—যা ধরা ছোয়া যায় না, যা নেহাৎই শূন্য—কিছু-না, তাকেও যে আবার বস্তুর মতো দোমড়ান কেউ কল্পনাও করতে পারে—তা ভাবা যায় না। অথচ আজ আর এর বিরুদ্ধে কোনো বিজ্ঞানীর মুখেই প্রতিবাদ শোনা যায় না। নিঃসংশয়ে সমস্ত বিশ্বের গণিতজ্ঞরা আজ এটা গ্রহণ করেছেন। আজ যে প্রশ্নের সম্পূর্ণভাবে এখনও মীমাংসা হয় নি, সেটা হচ্ছে এই যে, এই দোমড়ান 'স্পেস' এর দুটো খোলা মুখ আবার ঘুরে গিয়ে একসঙ্গে মিশেছে, না, মেশে নি অর্থাৎ এই 'স্পেস'টা 'প্যারাবোলা' বা 'হাইপারবোলার' মত খোলা মুখওয়ালা, না, বৃত্ত বা 'ইলিপ্‌স্' এর মত আটকানো। আইনষ্টাইন এটাকে আটকানো মনে করেন এবং তাঁর General theory of relativity তে তিনি সেই ভাবেই অগ্রসর হয়েছেন। ডি, সিটারও ঐ মতে বিশ্বাসী। অথচ এই শূন্য এবং অ-শূন্য এর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যেমন আমাদের পৃথিবী সীমাবদ্ধ অথচ পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এর সীমারেখা বের করা অসম্ভব। ঘুরে ফিরে সে আবার যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলো সেখানেই এসে পৌঁছুবে। শূন্যের মধ্যেও যদি তেমনি কেউ লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী এক অভিযানে যাত্রা করে, তাহলে কখনও সে এর শেষ প্রান্ত বা সীমারেখা খুঁজে পাবে না, সেও ঘুরে সেই পুরোনো জায়গায়ই ফিরে আসবে, যদিও তার মনে হবে—সে একবারও দিক্‌ পরিবর্তন করেনি এবং বরাবর সোজাই চলেছে। আলো যে সোজা সরলরেখায় চলে না, এই দোমড়ান 'স্পেসের' গা বেয়ে বেয়ে বেঁকে চলে, সূর্যের গত "পূর্ণগ্রহণের" সময় জ্যোতির্বিদরা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। আইনষ্টাইনের বাঁকানো এবং আটকানো 'স্পেস'এর সপক্ষে এটা একটা বড় যুক্তি।

বিশ্বজগতের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিন্তু আইনষ্টাইন ও ডি, সিটার বিভিন্ন মত পোষণ করেন। আইনষ্টাইন বলেন যে, এই বৃত্তাকার স্পেস—যা কিনা বাঁকানো আটকানো হতে বাধ্য—এর কোনো গতি নেই; এ স্থির ও অনড়; এবং এর মধ্যে বস্তুর অস্তিত্ব (অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) রয়েছে। কিন্তু ডি, সিটার বলেন যে, এই বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে এবং এর মধ্যে কোনো বস্তু নেই, তার মানে এই শূন্যের মধ্যে বস্তুর ঘনত্ব এতই কম যে, প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং আইনষ্টাইনের মতবাদ হচ্ছে 'Universe with matter, but without motion; আর ডি, সিটার বলেছেন, 'Universe with motion, but without

matter': এই দুই বিপরীত মতের মিল হবে কী করে? এবং এর কোনটাই বা সত্যি? গণিতজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ কখনই সম্পূর্ণ স্থিতিশীল হতে পারে না; এটা একটা অপ্রতিষ্ঠ সাম্যে রয়েছে। হয় এটা আস্তে আস্তে কুঁচকে শেষে একটা বিন্দুতে পরিণত হবে, নয়ত ক্রমশঃ স্ফীত হতে হতে শেষে এমন অবস্থা হবে যে, তারপর আর এরপক্ষে স্ফীত হওয়া সম্ভব নয়। এখন, বিশ্বজগৎ যতই স্ফীত হবে ততই তার ভিতরকার শূন্যের পরিমাণ বাড়তে থাকবে, কিন্তু এর মধ্যেকার নক্ষত্রের সংখ্যা একই থাকায় সমগ্র বস্তুর পরিমাণ বাড়তে বা কমতে পারে না। কাজেই 'স্পেস' বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতে বস্তুর ঘনত্ব ক্রমশঃ কমতে থাকবে। কমতে কমতে শেষে একদিন তার ঘনত্ব প্রায় শূন্যে পরিণত হবে। সুতরাং আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ কোটি কোটি বৎসরব্যাপী এক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ স্ফীত হতে হতে অবশেষে একদিন ডি, সিটারের বিশ্বজগতে আমাদের পৌঁছে দেবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আইনষ্টাইন বা ডি, সিটার—এঁদের দুজনের পরিকল্পনাই সমান ঠিক বা সমান ভুল। বর্তমানে আমাদের বিশ্বজগৎ এই পরিবর্তনের মালার এক মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে। আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ আজ অনেক পুরোনো দিনের বিস্মৃত ইতিহাস, আবার ডি, সিটারের বিশ্বজগতও বহুদূরের কুয়াশায় ঘেরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন। অনেক ঝড় আমরা পেরিয়ে এসেছি, আরও অনেক দুর্যোগ এখনও বাকি। এই বিশ্বজগৎ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে, স্ফীততর হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। যে সকল গণিতজ্ঞ তাঁদের অসাধারণ গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন তাদের মধ্যে **Lemaitre, Prof. N. Sen.** এবং **Weyl** এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আগেই বলেছি যে, আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ সঙ্কুচিতও হতে পারে বা স্ফীতও হতে পারে। সে যে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত না হয়ে স্ফীত হচ্ছে তারই বা প্রমাণ কি? বর্তমান পণ্ডিতেরা এবিষয়ে একমত—বিশ্বজগৎ নিশ্চিতই স্ফীত হচ্ছে। কেন একমত পরে বলছি।

এখন আমাদের দেখতে হবে বিশ্বজগতের এই ক্রমস্ফীতির ফলে নক্ষত্রমণ্ডলীর এবং ছায়াপথগুলির আপেক্ষিক দূরত্বের কী পরিবর্তন হচ্ছে। ধরা যাক একটি সাবানের বুদ্বুদের কথাই। ক্রমশঃ বাতাস পুরে পুরে যেন একে ফুলিয়ে তোলা হচ্ছে। এখন এই বুদ্বুদের গায়ে যদি অসংখ্য বিন্দু থাকে এবং এই বুদ্বুদটি ফুলতেই থাকে তাহলে একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দুর আপেক্ষিক দূরত্ব আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে না কি? এখানে বিশ্বজগৎকে যদি ওই স্ফীতিশীল বুদ্বুদের সঙ্গে এবং তার গায়ের বিন্দুগুলির সঙ্গে নক্ষত্রদের তুলনা করা যায়, তাহলে ঐ উপমার দ্বারাই বোঝা যাবে যে, বিশ্বজগৎ স্ফীত হতে থাকলে ছায়াপথমণ্ডলীর মধ্যেকার এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে এবং মনে হবে যেন তারা কোনো এক অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় একে অপরের কাছ থেকে প্রবল বেগে ছুটে পালাচ্ছে। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই এখানে বলবেন,—উপমাটা কিন্তু নেহাৎই বাজে হলো। সাবানের বুদ্বুদের গায়ের ওপরে যে বিন্দুগুলি বসান রয়েছে সেটা দ্বৈমাত্রিক, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে শুধু। আর বিশ্বজগতে এই বিন্দুগুলির সঙ্গে যাদের উপমা দেওয়া হয়েছে, সেই নক্ষত্রগুলি ছড়ান রয়েছে সারা 'স্পেসে' অর্থাৎ ত্রিমাত্রিকে—যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিন মাত্রাই রয়েছে। তুলনাটা কি ঠিক হল? এর উত্তর দিতে হলে আমাকে আর এক ধরণের 'স্পেসে'র সাহায্য নিতে হবে—যেটাকে পণ্ডিতেরা বলেন চতুর্মাত্রিক 'স্পেস' এবং এটা সাধারণ স্থান ও কাল দিয়ে তৈরী হয়েছে বলে একে **'space-time-continuum'** ও বলে। এই 'স্পেসে'র তিনটি মাত্রা হচ্ছে সাধারণ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এবং চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে কাল বা সময়। সাবানের বুদ্বুদের উপমায় ফিরে গেলে

আমরা দেখতে পাব—বুদ্বুদটি ত্রিমাত্রিক কিন্তু বুদ্বুদের গা'টা দ্বিমাত্রিক এবং এদের উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আমার পূর্বোক্ত অত্যদ্ভুত চতুর্মাত্রিক 'স্পেসে'র সঙ্গে ত্রিমাত্রিক 'স্পেসে'র সম্বন্ধও ঠিক সেই রকমই। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক বুদ্বুদটি তার স্ফীতির দ্বারা ঐ দ্বিমাত্রিক তল এবং তার উপরের বিন্দুগুলিকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করে, এই নূতন চতুর্মাত্রিক বিশ্বজগৎও তার স্ফীতির দ্বারা ঐ ত্রিমাত্রিক 'স্পেস' এবং তার অভ্যন্তরে অবস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলী ও ছায়াপথগুলিকে সেইভাবেই প্রভাবান্বিত করছে। উপমাটা আগে যতটা খারাপ লাগছিল, এখন আর হয়ত ততটা লাগছে না, তবুও এর ফলে চতুর্মাত্রিক শূন্য সম্পর্কে আমাদের বাস্তব ধারণার খুব বেশী পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয়না। এ সম্বন্ধে গণিতের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই করা হয়েছে এবং হচ্ছে; কিন্তু যেখানেই বাস্তব ধারণার প্রশ্ন ওঠে সেখানেই জ্যোতির্বিদরা খুব বেশী কিছু বলতে পারেন না। প্রফেসর এডিংটন, যিনি পূর্বোক্ত উপমাটা প্রথম ব্যবহার করেন, তিনিও বোঝাবার ব্যাপারে ঐ উপমাটির চেয়ে বেশীদূর এগোতে পারেননি।

অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এখানে পাঠকেরা প্রশ্ন করতে পারেন যে, এ সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা বড় রকমের গাণিতিক ধাপ্পাবাজি নয় তার প্রমাণ কি? বিজ্ঞানে কোন মতবাদই শেষ অবধি টিকে থাকতে পারে না যদি না পরীক্ষার জগৎ থেকে তার কোনো সমর্থন মেলে। 'স্পেস' যে বক্র এবং আটকানো সেটা প্রমাণিত হয়েছে ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণের সময়—একথা আমরা আগে বলেছি। বিশ্বজগতের স্ফীতিশীলতাও যে গুটিকয়েক লোকের বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট পরিকল্পনা নয়, তারও প্রমাণ বেশ কিছুদিন হলো পাওয়া গিয়েছে। আমরা এখানে একটিমাত্র পরীক্ষার উল্লেখ করব। ধরুন আপনি ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার পাশ দিয়ে হুইস্‌ল্ দিতে দিতে একটি এঞ্জিন বেরিয়ে গেল। এঞ্জিনের হুইসেলের শব্দ যখন আপনার কানে এসে পৌঁছুলো তখন তার তীক্ষ্ণতা অনেক কমে গেছে অর্থাৎ শব্দের কম্পনাংক কমে গেছে। পদার্থবিদ্যায় একে ডপ্লার এফেক্ট বলে। ডপ্লার এফেক্ট আলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি কোনো ছায়াপথ বা নক্ষত্র আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে সেই ছায়াপথের বা নক্ষত্রের আলোর কম্পনাংকও কমে যাবে। আমরা যতগুলি আলো শুধু চোখে দেখতে পাই তার ভিতর লাল আলোর কম্পনাংকই সবচেয়ে কম। কাজেই বিশ্বজগৎ যদি স্ফীত হতে থাকে অর্থাৎ ছায়াপথ এবং নীহারিকাগুলি যদি পৃথিবী থেকে দূরে পালিয়ে যেতে থাকে তাহলে ঐ সব নক্ষত্রের আলো থেকে যে বর্ণালী পাওয়া যাবে তারও ডপ্লার এফেক্ট অনুযায়ী লালের দিকে সরে যাওয়া উচিত। সত্যি সত্যিই কতকগুলি ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার বর্ণালী পরীক্ষার ফলে এ ভবিষ্যৎবাণীর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরীর প্রসিদ্ধ পরীক্ষাবিৎ Dr. Hubble এবং Dr. Humason এর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা আরও দেখিয়েছেন যে, নীহারিকাগুলির গতিবেগ যত বেশী হয়, বর্ণালীর লালের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতাও ততই বাড়তে থাকে। Dr. Zwicky কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আপত্তি জানিয়েছেন। আলোর কণিকা মতবাদ বা কোয়াণ্টাম থিওরী অনুযায়ী বোঝা যায় যে, যদি কোন রশ্মির কম্পনাংক কমে, তাহলে রশ্মির সঙ্গে জড়িত শক্তির পরিমাণও কমে যেতে বাধ্য। এই শক্তির হ্রাস নানাকারণেই ঘটতে পারে। আলো লালের দিকে সরে যাচ্ছে দেখেই বলা চলে না যে, এর দ্বারা বিশ্বজগতের গতিশীলতা সূচিত হচ্ছে। একদিকে নীহারিকা, ছায়াপথ—অন্যদিকে আমাদের সৌরমণ্ডলী—এদের ভিতরে

যে বিরাট শূন্য সেখানে খণ্ড খণ্ড বস্তুর টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। কোন নীহারিকার আলো যখন এই শূন্যের ভিতর দিয়ে সৌরমণ্ডলের দিকে আসতে থাকে তখন ঐ সব বস্তুখণ্ড আলো-কে আকর্ষণ করে। এদের হাত এড়িয়ে আসার চেষ্টায় আলো তার শক্তির কিছুটা হারায়, ফলে আলো লালভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এক-সময়ে Dr. Zwickyর এই মতবাদ কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানীমহলে এর ততটা প্রসিদ্ধি নেই। প্রফেসর এডিংটনের মতে এই মতবাদ অনুযায়ী বর্ণালীর লালের দিকে ক্রমাপসরণের সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিছুটা লাল হয়ত ওজন্যে হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওটাই প্রধান কারণ হতে পারে না। বিশ্বজগৎ যে স্ফীতই হচ্ছে, সঙ্কুচিত হওয়া যে তার পক্ষে সম্ভব নয়—সেটাও এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। কেন না, বিশ্বজগৎ যদি সঙ্কুচিত হত, তাহলে নক্ষত্রগুলির আপেক্ষিক দূরত্ব কমতেই থাকত, বাড়ত না এবং যে কোন পৃথিবীবাসীর মনে হত যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ নক্ষত্রগুলি দ্রুতগতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে (পৃথিবী থেকে ছুটে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে না)। এ ক্ষেত্রে এই সব নক্ষত্রের আলোর কম্পনাংক ক্রমশঃই বেড়ে উঠত (ঠিক যেমনি কোন এঞ্জিন যখন হুইস্‌ল্ দিতে দিতে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তখন তার তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ শব্দের কম্পনাংক বাড়তে থাকে)। কাজেই এ অবস্থায় বর্ণালী লালের দিকে সরে না গিয়ে বেগনির দিকে সরে যেত। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল থেকে আমরা জেনেছি যে, তা হয় না। বিশ্বজগতের সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনাকে তাই বাতিল করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

প্রফেসর এডিংটন বলেন, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এই নবতম ধারণা আমাদের সময়ের প্রত্যয়কে গুরুতর নাড়া দিয়ে গেছে। তাঁর মতে, সময় জিনিসটার অস্তিত্বই জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বজগতের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে। বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সময় সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে তোলা অসম্ভব। বিভিন্নতা ও আপেক্ষিক গতি থেকেই সময়ের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, আবার ওঠে—এরই মধ্যেকার সময়কে আমরা আমাদের হিসেবের সুবিধার জন্য মোটামুটি ২৪টা ঘণ্টায় ভাগ করে নিয়েছি, তাকে আবার ভাগ করেছি মিনিটে, সেকেণ্ডে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ যদি অনড়, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অংশ যদি আরেক অংশের সঙ্গে হুবহু একই রকমের হত তাহলে সময়কে আমরা চিনতুম কি করে? এডিংটনের মতে, সৃষ্টির সুরুতে ছিল শুধু প্রোটন আর ইলেকট্রন, আর সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করত একটা নিরবচ্ছিন্ন নিরবয়বতা, সেখানে সময়েরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই হল আইনষ্টাইনের বিশ্বজগতের রূপ। তারপর একদিন যেমন করেই হোক্—বিশ্বজগৎ চলতে সুরু করেছে, সৃষ্টি হয়েছে বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের, সৃষ্টি হয়েছে নীহারিকার, নক্ষত্রমণ্ডলীর—সাহারার মত বিরাট শূন্যের মাঝখানে এক একটি মরুদ্যানের। সেই সঙ্গে সুরু হয়েছে এদের পারস্পরিক আবর্তন এবং সময়ের অভিযান। তারপর বহু পরিবর্তনের পর আবার একদিন যখন আমরা ডি, সিটারের বিশ্বজগতে উপস্থিত হব, সেদিনও সময়ের আর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ সেদিনও সমস্ত আপেক্ষিক গতি থেমে যাবে। সময় সম্পর্কে এই ধারণা প্রায় বাইশ শতাব্দী আগে Platoর 'Republic'এ বলা কথাগুলির অনেক কাছে আমাদের নিয়ে আসে: "Time and the heavens came into being at the same instant, in order that, if they were even to dissolve, they might be dissolved together."

সময় সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার মতো এডিংটনের এ ধারণা আজও পর্যন্ত দার্শনিকতার স্তরেই থেকে গেছে এবং এ দার্শনিক ধারণা গ্রহণ করা, বা না করা রুচির উপর নির্ভর করে, কিন্তু বিশ্বজগতের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে কথাগুলি এতক্ষণ মোটামুটিভাবে বলা হলো, সেগুলির অধিকাংশই যে বৈজ্ঞানিকতার ভিত্তি লাভ করেছে এবং এদের তাৎপর্যও যে সুদূরপ্রসারী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শৈশবের সমস্যা

শ্রীগৌরবরণ কপাট

"খোকা শুধায় মাকে ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছে হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

ইহা অপেক্ষা ভাল উত্তর মা আর বোধ করি খুঁজিয়া পান না। আধুনিক মনঃসমীক্ষণ ঠিক এই সত্যই প্রমাণ করিয়াছে। নারীর মনে সন্তান লাভের ইচ্ছা চিরন্তনী। তবে কখনও সে ইচ্ছা মনের গহনে বা আসংজ্ঞান মনে অবদমিত থাকে, আবার কখনও বা সংজ্ঞান মনে জাগিয়া উঠে। শিশু যেন মায়ের এই ইচ্ছারই প্রতীক। যে শিশু মায়ের এতই কামনার ধন এবং যে শিশু জাতির ভবিষ্যত তাহার সম্যক বিকাশ লাভের দিকে নজর দেওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা আমরা সকলেই উপলব্ধি করি। শিশু প্রধানতঃ দুইটি শক্তির সমন্বয়ে বিকাশ লাভ করে; একটি বংশগতি এবং অপরটি পরিবেশ। কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়া শিশু জন্ম গ্রহণ করে। বিকাশ লাভের উপযোগী পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত বংশগত গুণাবলী সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়। কোন গুণ শিশুর মধ্যে আছে কি নাই এবং কোন গুণ কি পরিমাণ বিকাশ লাভের ক্ষমতা রাখে তাহা বংশানুক্রমিতার দ্বারা নির্ণীত হয়। পরিবেশ অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে। সুতরাং পরিবেশ প্রতিকূল হইলে শিশুর সহজাত গুণাবলী যথাযথ বিকশিত হয় না। আমরা জানি যে, স্বভাবের নিয়মে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শরীর ও মনের কলেবর বাড়িয়া যায়। মনোবিদ্‌গণ বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বর্ধনের মান নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বাভাবিক বর্ধনের হার প্রত্যেক শিশুর বেলায় খাটে না। নিয়ম যেখানে আছে, ব্যতিক্রম ত সেইখানেই। যেখানে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে শিশুর পরিণতি লাভের পথে নানা বিঘ্ন ঘটে এবং শিশু জীবনে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান না হইলে শিশুর ভবিষ্যত কর্মজীবনের পথ রুদ্ধ হইয়া আসে। আধুনিক শিশু-মনোবিদ্যা এই ব্যাপারে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছে এবং প্রতীকারেরও কিছু কিছু উপায় নির্ধারণ করিয়াছে। শৈশবের এই এই বিভিন্ন সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করাই আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনগ্রসরতা—স্কুলের একই ক্লাশে যতগুলি ছেলেমেয়ে পড়ে, লেখাপড়ায় তাহারা যে সমান হইতে পারে না, একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কখনও কখনও তাহাদের পার্থক্যটা ভয়ানক বেশী প্রকট হইতে দেখা যায়। শিক্ষকতা কার্যে যাহারা রত আছেন তাহারা এ ব্যাপার প্রায়শঃ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। লেখাপড়ায় কেহ কেহ বা খুব ভাল, কেহ কেহ বা মাঝারী রকমের; আবার কোন কোনটি এমন থাকে যে, একেবারেই কিছু নয় অর্থাৎ যে ক্লাশে পড়ে তাহার অনুপযুক্ত। আমরা তাহাদিগকে অনগ্রসর বলিব। এখন প্রশ্ন, এই অনগ্রসরতার হেতু কি এবং ইহার প্রতীকারের কোন উপায় আছে কি না? এই অনগ্রসরতার হেতু নির্ণয় করিতে গিয়া ফরাসীদেশের বিখ্যাত মনোবিৎ বিনেট্ সাহেব কতকগুলি অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। এই সমস্ত অভীক্ষার সাহায্যে তিনি জড়বুদ্ধি

শিশুদিগকে বুদ্ধিমানদের দল হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন। বিনেট্ সাহেবের এই অভীক্ষাগুলি নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুদ্ধি মাপিবার মানদণ্ড হিসাবে এই অভীক্ষাগুলি ব্যবহৃত হইতেছে। এই মানদণ্ডে শিশুর বুদ্ধিকে অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যে সমস্ত শিশু মাঝারি রকমের তাহাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। সাধারণ বুদ্ধির অঙ্ককে ১০০ ধরা হয়। বুদ্ধির অঙ্ক ৮০ হইতে নীচের দিকে হইলে মনোবিদ্যার ভাষায় জড়বুদ্ধিতা বলা হয়। এই জড়বুদ্ধিতাকে আমরা আবার তিন স্তরে ভাগ করিয়া থাকি। (৮০—৫০) এই ধরণের বুদ্ধির অঙ্ক যাহাদের, তাহাদিগকে আমরা মোরন পর্যায়ভুক্ত করি। স্কুলে আমরা যে রকমের শিক্ষা দিয়া থাকি, সে শিক্ষা ইহাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। সাধারণ হাইস্কুলের বড়জোর সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীর উপযুক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা ইহাদের আছে ; ইহার বেশী আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না। মোরনের আরও নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগকে ইম্‌বেসাইল বলা হয়। ইহাদের বুদ্ধির অঙ্ক ৫০—২৫ এর মধ্যে। লেখাপড়ায় ইহারা বড়জোর তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যা অতি-কষ্টে আয়ত্তে আনিতে পারে। জড়বুদ্ধিতার সর্ব নিম্নশ্রেণীকে আমরা জড়ধী এই আখ্যা দিয়া থাকি। ইহাদের বুদ্ধির অঙ্ক ২৫এর বেশী নয়। ইহাদের সাধারণ জ্ঞানের একেবারেই অভাব। আগুনে হাত দিলে যে হাত পুড়িয়া যায় এবং রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইলে গাড়ী চাপা পড়িবার সম্ভাবনা আছে, ইহাও বোঝে না। সত্যিকথা বলিতে কি অপরের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত পৃথিবীতে বাস করা ইহাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

অনগ্রসরতার প্রতীকার করিবার আগে প্রথমেই জানা দরকার আসল গলদ কোথায় ? কারণ যে কেবল মানসিক তাহা নহে ! শরীরে থাইরয়েড নামক যে গ্রন্থি আছে তাহা যদি যথাযথ সক্রিয় না হয় তাহা হইলে একদিকে শরীরও যেমন পুষ্ট হয় না অন্যদিকে মানসিক বর্ধনের খুবই অভাব দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা থাই-রয়েড নির্যাস ব্যবস্থা করিলে আশ্চর্য রকমের সুফল দেখা যায়। মানসিক শক্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়, অনগ্রসরতাও কাটিয়া যায়। কিন্তু যেখানে শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় ত্রুটি ধরা পড়ে না অথচ মানসিক বিকাশের অভাব, তাহার কারণ কি ? কারণ নির্ণয় ব্যাপারে মানসিক পরীক্ষার সাহায্য লইতে হইবে। বুদ্ধি অভীক্ষার দ্বারা যদি জানা যায় যে, শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ হইতে অনেক কম, তবে তাহাকে সাধারণ লেখাপড়ায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। পরীক্ষায় পাশ করাবার জন্য এরূপ শিশুকে যদি জোরজবরদস্তি করা হয় তবে সুফলের চেয়ে কুফলের আশঙ্কাই বেশী। বছরের পর বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার দরুণ তাহাদের মনে হীনতাভাব আসে। এই হীনতা ভাবের যথাযথ সমাধান না হইলে উদ্বায়ুর আকার ধারণ করে। অনেক সময় নানারকম বদভ্যাস দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের পূর্বাহ্নে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, চেষ্টা করিয়া আমরা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে বাড়াইতে পারিনা। যতটুকু তাহার মধ্যে নিহিত আছে কেবলমাত্র ততখানি অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভের সহায়তা করিতে পারি। এই সমস্ত শিশুর পক্ষে সাধারণ শিক্ষা যে সুবিধাজনক হয় না তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এদিকে অযথা উদ্যম নষ্ট না করিয়া হাতের কাজে লাগানই যুক্তিসঙ্গত। অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন অনেক শিশুকে শিল্প শিক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিতে দেখা যায়। এই জাতীয় শিশুদের কারো কারো মধ্যে আবার কোন একটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যায়। মানসিক পরীক্ষার দ্বারা শিশুর এই বিশেষ দক্ষতার আভাষ পাওয়া যায়। যাহাতে তাহার এই বিশেষ সামর্থ্যকে

কাজে লাগাইতে পারে সে দিকে সুযোগ দিলে তাহার যথার্থ উপকার করা হইবে।

অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে যে জড়বুদ্ধিতার কথা আলোচনা করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে বংশানুক্রমিক। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশও অনগ্রসরতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা ও অশান্তির জন্য শিশুরা সম্পূর্ণরূপে লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না। এখানে পরিবেশ পরিবর্তিত হইলে অনগ্রসরতা কাটিয়া যায়।

এবারে আর এক ধরণের সমস্যার কথা বলি, যেখানে বুদ্ধির অনুপাতে লেখাপড়ায় অগ্রসরতা দেখা যায় না। অনেক অভিভাবককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান কিন্তু লেখাপড়ায় আদৌ মন দেয় না। কিন্তু মন যে কেন দেয় না তাহা তিনি খোঁজ রাখেন না। আমাদের মতে সে লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না, তাই দেয় না এবং না দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। লেখকের সহিত ঠিক এই ধরণের একটি ছেলের বিশেষ পরিচয় ছিল। ছেলেটির বয়স ১৪ বছর। বুদ্ধির অঙ্ক অসাধারণ, যাহার জন্য তাহাকে প্রতিভাবান বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার লেখাপড়া আদৌ সন্তোষজনক নয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাহার বন্ধুদের অপেক্ষা আদৌ উচ্চস্তরের নয়। তাহার পিতা অনুযোগ করেন, লেখাপড়ার প্রতি শিশুর অবহেলা এবং অমনোযোগিতা। অভিভাবক এবং শিক্ষকের শাসন এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই। এ ছেলেটির সম্পর্কে অনুসন্ধানে যাহা জানা গিয়াছে তাহা সত্যই অনুধাবনযোগ্য। ছেলেটির মস্ত বড় অসুবিধা এই যে, পাঠ্যবস্তুতে সে কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারে না। যখনই সে চেষ্টা করে কোন একটি বিষয়ে মন দিতে, তখন আজেবাজে নানা চিন্তা আসিয়া তাহার সংজ্ঞান মনকে অভিভূত করে। তাহার অনুরাগ বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। সে বুঝিতে পারে তাহার অবস্থা, কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে দমন করিতে পারে না। পরীক্ষার ঘরেও ঠিক এই ব্যাপার চলে। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় তাহার মন অন্যদিকে চলিয়া যায়। জানা সত্ত্বেও সে লিখিতে পারে না। ঠিক এই কারণেই তাহার পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। ছাত্রজীবনে ইহা একটি মস্ত বড় সমস্যা নয় কি? এ বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ অনেকখানি আলোর সন্ধান দিয়াছে। আমাদের সংজ্ঞান মন অহরহ নির্জ্ঞান মনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। নির্জ্ঞান মন সংজ্ঞান মনের প্রতিটি চিন্তা এবং প্রতিটি ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংজ্ঞান মনের যে বাসনা চরিতার্থ হয় না তাহা নির্জ্ঞান মনে অবদমিত হইয়া থাকে। এই অবদমিত বাসনাগুলি অন্য নানা ছদ্মবেশে সংজ্ঞান মনে প্রবেশাধিকারের চেষ্টা করে। সংজ্ঞান মন ও নির্জ্ঞান মনের মধ্যে অহরহ এইভাবে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। যে শিশুটির কথা আলোচনা করিলাম—যে চেষ্টা করিয়াও লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না তাহার কারণও এই মানসিক দ্বন্দ্ব। লেখাপড়ায় কেন যে সে মন দেয় না তাহার আসল কারণ সংজ্ঞান মনে নাই। তাই সে জানে না, কেন সে মন দিতে পারে না। এরকম ব্যাপারে আমরা মনঃসমীক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে বলি।

অস্বাভাবিক ভয়। আর এক জনের কথা বলি। এখানেও একটি ছেলে, বয়স দশ বছর। মানসিক পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়, তাহার বুদ্ধির অঙ্ক ১২০ অর্থাৎ সাধারণ শিশুর অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের ভয়। স্কুলে গিয়া সে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়। পড়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বড় ভয় হয় এবং অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলে। তাহার সন্দেহ হয়, বুঝি বা তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। এই অস্বাভাবিক ভয়ের কারণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া সে পড়াশুনা করিতে পারে না। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই ছেলেটির অস্বাভাবিক ভয়ের হেতু তাহার

বাড়ীর পরিবেশ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের প্রভাবে শিশুদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। যে শিশুটির কথা বলিতেছি তাহার পিতার নানা রকম উৎকণ্ঠা আছে। গাড়ী করিয়াও তিনি বেশীদূর যাইতে সাহস করিতেন না, পাছে রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা হয়। তিনি ছেলেটিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন যেন সে খুব সাবধানে রাস্তা পার হয় এবং সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিয়া আসে। এই শিশুটির পিতাকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল যে, তিনি তাঁহার ভয়ের কথা শিশুর সহিত কখনও আলোচনা করেন না। কিন্তু তাহা না হইলে কি হয়, বাড়ীর সাধারণ আবহাওয়াতে যে ত্রাসের ইঙ্গিত ছিল শিশু পরোক্ষভাবে তাহার অনুকরণ করিয়াছে। মনোবিশারদ, শিক্ষক এবং শিশুটির পিতা এই তিন জনের সমবেত চেষ্টায় এই শিশুটির ভয়ের মাত্রা অনেকখানি কমিয়া যায়। তাহার আচরণের অনেক পরিবর্তন দেখা যায় এবং লেখাপড়ারও বিলক্ষণ উন্নতি হয়। শিশুদের মধ্যে অল্প বয়সে এই যে অস্বাভাবিক ভয়, এ এক মস্ত বড় সমস্যা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিকূল পরিবেশে শিশুদের মধ্যে নানা বিষয়ে ভয়ের উদ্ভব হয়। যে ছেলের মধ্যে খুব বেশী ভয় আছে তাহার ব্যক্তিত্ব সবল হইতে পারে না। সে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির হয় এবং প্রত্যেক কাজে অস্বাভাবিক রকমের সাবধানতা অবলম্বন করে। অপরের সঙ্গে সহজে সে ভাব করিতে পারে না এবং অন্যের কথানুসারে চালিত হয়। স্কুলে এই সব ছেলেকে লইয়া বিশেষ মুস্কিলে পড়িতে হয়, কারণ সামান্য ব্যাপারে ইহারা ভয়ানক রকমের ক্ষুব্ধ হয়। যৌনদ্বন্দ্ব হইতে অনেক সময় শিশুদের মনে অস্বাভাবিক ভয় জাগে। যৌন বিষয়ে সঠিক ধারণা না পাইলে শিশুদের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ মাতাপিতা এই বিষয়ে কোন কিছুই বলিতে চান না—জিজ্ঞাসা করিলেও নয়। এজন্য এ বিষয়ে জানিবার আগ্রহ ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। ফলে নানা জায়গায় তাহারা অনেক রকমের বিকৃত জ্ঞান লাভ করে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, যৌন সম্বন্ধীয় বিকৃত জ্ঞান নানাবিধ উদ্বায়ুর মূল।

স্বভাব বৈকল্য—ছেলেদের মধ্যে স্বভাব বৈকল্য আমরা প্রায়শঃ লক্ষ্য করিয়া থাকি। অনেক ছেলে খাবার ব্যাপারে ভয়ানক গোলমাল করে। এ খাব না ও খাব না, এই ভাবে বাড়ীর সকলকে উত্যক্ত করে—নিত্যনূতন বায়না ধরে, স্কুলে যাইবার সময় হইলে পেট বেদনা কিংবা মাথাব্যথার অনুযোগ করে, স্কুলের নাম করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে আবার ভয়ানক কলহপ্রিয় হয় এবং সকলের উপরে নিজেকে জাহির করিতে চায়। আঙ্গুল চোষা, দাঁত দিয়া নখ কাটা, মিথ্যা কথা বলা এমনকি ছোটখাট জিনিস চুরি করার মত বদ্ অভ্যাসও কারো কারো মধ্যে দেখা যায়। এই সমস্ত বদ্ অভ্যাসই মানসিক বিকলতার পূর্বলক্ষণ, সুতরাং পূর্বাহ্নে অনুধাবনযোগ্য। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই জন্য দায়ী— যেমন আর্থিক অসচ্ছলতা, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, অভিভাবকের অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্য, পরিবারে দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধি, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি, মাতা-পিতার অত্যধিক কঠোর শাসন, জন্মগত শারীরিক অঙ্গবিকলতা, অসৎসংসর্গ প্রভৃতি। মানসিক পরীক্ষার সাহায্যে স্বভাব বিকলতার যথার্থ হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায়

আজকাল অনেক স্কুলে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অতি অল্প বয়স হইতে শিশুদের মন পরীক্ষা করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি, কারণ মানসিক বিকাশের কোন ত্রুটি ধরা পড়িলে তাহা সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ আমরা মনে করি শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ থাকে; কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি এ ধারণা যুক্তিযুক্ত? এমন হইতে দেখিয়াছি যে, শারীরিক অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী কিন্তু মানসিক রুগ্ন এবং সাধারণ লোকের সহিত সমাজে বাস করিবার একেবারে অনুপযুক্ত। পরিণত জীবনে অনেকের মধ্যে যে নানারকমের মানসিক বিকলতা দেখা যায়, এই শৈশবাবস্থাতেই তাহার সূচনা হইয়া থাকে। শিশুজীবনে যে সকল অস্বাভাবিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহার যথাযথ সমাধান করা ব্যবহারিক মনোবিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য।

কৃত্রিম চর্বি

শ্রীবাণেশ্বর দাস।

ভেজিটেবল ঘি ব্যবহার আজকাল আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আসল যখন দুষ্প্রাপ্য তখন চাহিদা পড়ে নকলেরই। তাই দেখা যায় ভেজিটেবল ঘিয়ের এত চাহিদা যে, মাঝে মাঝে তার খোঁজ করতে হয় চোরাবাজারে। সুস্বাদু পাকপ্রস্তুতিতে ভেজিটেবল ঘি প্রায় আসল ঘিয়েরই সমতুল্য। ভেজিটেবল ঘি বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। ভেজিটেবল ঘিয়ের দামও আসল ঘিয়ের প্রায় একচতুর্থাংশ। এবম্বিধ নানা কারণে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ভেজিটেবল ঘি প্রায় সম্পূর্ণভাবে আসল ঘিয়ের স্থান অধিকার করেছে। এর চলনেই অল্পবিত্তেরা সুযোগ পেয়েছে ঘিয়ের সুস্বাদ গ্রহণের।

তৈল ও চর্বির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাধারণতঃ চর্বি গলে ২০° সেন্টিগ্রেডের উপরে। সাধারণ উত্তাপে তৈল তরল অবস্থাতেই থাকে। অনেক তৈলের অণু অসম্পৃক্ত থাকে অর্থাৎ তাদের আরো হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রহণের ক্ষমতা থাকে। আধুনিক যুগে এই সকল অণুর ভিতরে হাইড্রোজেন প্রবেশ করানোও সম্ভব হয়েছে নিকেল অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্টের উপস্থিতিতে। শুধু নিকেল ধাতুর উপস্থিতিতেই প্রক্রিয়ার বেগ অনেক বেড়ে যায় এবং তৈল খুব তাড়াতাড়ি হাইড্রোজেন গ্রহণ করতে থাকে এবং ক্রমে ঘন হতে হতে কঠিন সাদা উদ্ভিজ্জ চর্বি জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়।

তৈল ঘনীকরণে সাধারণতঃ তিনটি কাঁচামালের প্রয়োজন। (১) নিকেল ক্যাটালিষ্ট, (২) তৈল, (৩) হাইড্রোজেন গ্যাস। প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি তরল ও তৃতীয়টি বায়বীয়। ঘনীকরণকালে একটি অপরটির সঙ্গে ভালভাবে সংস্পর্শে আসা প্রয়োজন। সুতরাং তাদের সম্যক মিশ্রণ আবশ্যক, যা সহজসাধ্য নয়।

তৈল ঘনীকরণের কাঁচামাল :—হাইড্রোজেন গ্যাস—তৈল ঘনীকরণে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনের (৯৯·৭ %) প্রয়োজন হয়। এই হাইড্রোজেন নানা উপায়ে প্রস্তুত করা যায়। জলকে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। এর সঙ্গে বিশুদ্ধ অক্সিজেনও পাওয়া যায়, যা খুব বেশী দামে বিক্রয় হয়। এর ফলেই ব্যয়সাধ্য পদ্ধতিটির প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

লবণজলকে বিদ্যুতের দ্বারা বিশ্লেষণ করলে একাদিক্রমে কষ্টিকসোডা, হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুত হয়। এদের প্রত্যেকটিই খুব মূল্যবান। জল-বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হলে এই ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

যেখানে বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য নয় কিম্বা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য সেখানে জলীয়বাষ্পকে জলন্ত কোক্ বা কাঠকয়লার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে প্রচুর হাইড্রোজেন মিশ্রিত গ্যাসের সৃষ্টি হয়, যা হতে সহজেই হাইড্রোজেন পৃথক করা যায়।

তৈল—বহুবিধ তৈল এই প্রণালীতে ঘনীভূত করা হয়। যেমন নারিকেল, তুলাবীজ, রেড়ীবীজ, চীনাবাদাম নিঃসৃত উদ্ভিজ্জ ও নানাবিধ জান্তব তৈল। প্রথমতঃ ক্ষার সহযোগে এই সকল তৈল হতে অম্ল ও যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় কলুষিত পদার্থ দূর করা হয়। তারপর তৈলটিকে কাঠকয়লা বা 'ফুলার' মৃত্তিকা দ্বারা বিরঞ্জিত করা হয় ৭০° হইতে ৮০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

ক্যাটালিষ্ট—নিকেল ক্যাটালিস্ট দুই উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। (১) শুষ্ক প্রণালী—এই প্রণালীতে

নিকেল ক্যাটালিস্টের ধারণার্থ কয়েক প্রকার খনিজ-মৃত্তিকা (যথা 'ফুলার' মৃত্তিকা) ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি নিকেল সালফেট দ্রাবণে শতকরা ২০ ভাগ 'ফুলার' মৃত্তিকা দিয়ে আলোড়িত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সোডিয়াম কার্বনেট সহযোগে নিকেল কার্বনেট অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। একে এখন ধুইয়ে পরিস্রুত করে ছাঁকা এবং শুষ্ক করা হয়। এর-পর এই নিকেল কার্বনেটকে যতদূর সম্ভব নিম্নতাপে (৩০০° হতে ৪০০° সে) হাইড্রোজেন গ্যাস সহযোগে বিজারিত বা রিডিউস্‌ড্ করে নিকেল ক্যাটালিস্টে পরিণত করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাকে তৈলের ভিতরে রেখে দেওয়া হয় যাতে তার কার্যকরী ক্ষমতা কমে না যায়।

(২) আর্দ্র প্রণালী—এই প্রণালীর চলন আজ সর্বত্র। প্রথমে কিছু নিকেল খণ্ডকে পরিষ্কার করে ফরমিক এসিডের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করাতে হয় এবং তাতে নিকেল ফরমেট নামক পদার্থ প্রস্তুত হয়। এখন একে শুষ্ক করে গরম করতে হয়। তার পর ইহাকে তৈলের সহিত মিশ্রিত করে ২৪০° সে. পর্যন্ত গরম করা প্রয়োজন। এই তাপ প্রয়োগে, মিশ্রণটি প্রথমে কৃষ্ণ তারপর হরিৎ বর্ণ ধারণ করে এবং অবশেষে তা উজ্জ্বল ঘনকৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলে প্রক্রিয়া শেষ হয়। কখনো কখনো প্রক্রিয়াকালে কিছু হাইড্রোজেন গ্যাস তৈলের মধ্যে প্রবাহিত করানো হয়।

তারপর এই ক্যাটালিস্টকে পরিস্রুত করে কিছু পরিষ্কার তৈলের সহিত ভালভাবে মিশিয়ে ক্যাটালিস্ট প্রস্তুত হয়।

তৈলঘনীকরণকালে হাজার ভাগ তৈলের ওজনের মাত্র ২।৩ ভাগ ক্যাটলিস্ট প্রয়োজন হয়। প্রক্রিয়ার শেষে প্রায় সমুদয় ক্যাটালিস্টই পরিস্রুত করে বা'র করে নেওয়া হয় এবং তাকে ক্রমাগত প্রায় ৫।৬ বার ব্যবহার করা যায়।

ঘনীকরণ প্রণালী—প্রথমে মিশ্রণ-যন্ত্রে বিজারিত ক্যাটালিস্ট বা আগের বারের ব্যবহৃত ক্যাটালিস্ট ছাঁকা হয়ে গেলেই নিয়ে আসা হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে তৈলের সহিত আলোড়নের দ্বারা সম্যকভাবে মিশ্রিত করা হয়।

নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্যাটালিস্ট মিশ্রণ গরম করে প্রক্রিয়া-যন্ত্রে নিয়ে আসা হয় এবং ঘনীকরণীয় তৈলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই বদ্ধ প্রক্রিয়া পাত্রটির মধ্যে একটি নল কুণ্ডলাকারে সমস্ত পাত্রটি বেষ্টন করে আছে। এই নলটির মধ্য দিয়ে অত্যধিক উত্তপ্ত বাষ্প প্রবাহিত করা হয় এবং পাত্রমধ্যস্থ তৈল ১৪০°-১৮০° সে, পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়।

এরপর পাত্রমধ্যস্থ চাপ কিছু কমিয়ে ভিতরের বায়ু নিষ্কাশিত করে নেওয়া হয়। এখন প্রক্রিয়া-পাত্রের নিম্নস্থ একটি অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট শায়িত নলের মধ্য দিয়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০ সের চাপে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করানো হয়। ফলে তা অসংখ্য সূক্ষ্মধারায় সমস্ত তৈলের মধ্য দিয়ে ওপরে ওঠে এবং উত্তমরূপে গ্যাস ও তৈলের সংস্পর্শ সাধিত হয়। এছাড়াও সম্যক মিশ্রণের নিমিত্ত একটি যান্ত্রিক মন্থনদণ্ড দ্বারা সমস্ত জিনিসকে দ্রুত আলোড়িত করা হয়।

অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত হাইড্রোজেন গ্যাস যন্ত্রের উপরিভাগ হতে নিষ্কাশিত করে পুনরায় তলাকার জলের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়।

অনেক সময় উদ্বৃত্ত তাপকে কমাবার জন্যে পাত্রের নিম্নদেশ হতে কিয়ৎ পরিমাণে বা'র করে নিয়ে তাপবিনিময় যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে ঠাণ্ডা করা হয়। এই শীতল তৈলপাত্রটির উপরিভাগ হতে সূক্ষ্ম কণাকারে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তা উর্ধ্বগামী হাইড্রোজেন গ্যাসেরও সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়।

প্রায়ই যান্ত্রিক আলোড়নের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে আর্দ্র উপায়ে প্রস্তুত কোলোয়েডাল বা সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট নিকেল ক্যাটালিষ্ট ব্যবহৃত হয় এবং কেবলমাত্র হাইড্রোজেন বুদ্বুদের দ্বারাই মিশ্রণ সুষ্ঠুভাবে আলোড়িত হয়।

আজকাল একটি নিরবচ্ছিন্ন তৈলঘনীকরণ প্রথার প্রচলন হচ্ছে। কয়েকটি নিকেল তার নির্মিত পিঞ্জর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিকেল খণ্ডে বোঝাই করা হয়। এরকম কয়েকটি পিঞ্জর ওপর ওপর করে প্রক্রিয়া-পাত্রটিতে সজ্জিত করা হয়। উপরিভাগ হতে নামে তপ্ত তৈলধারা, আর নিম্নভাগ হতে ওঠে হাইড্রোজেন গ্যাস। পথিমধ্যে উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি হয় ঘনীভূত তৈলের। উদ্বৃত্ত গ্যাস ও তৈল উভয়েরই ব্যবস্থা আছে পুনপ্রর্বাহের। এক্ষেত্রে পাত্রটি ১৮০°সে, পর্যন্ত গরম রাখা হয় এবং হাইড্রোজেনের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৩০—৪০ পাউণ্ড।

তৈল সম্পূর্ণরূপে ঘনীকৃত হইলে তাহার গলন-বিন্দু দাঁড়ায় প্রায় ৬০°সে। এইরূপ তৈল পাকের পক্ষে উপযোগী নয়, তাই সাধারণতঃ তৈলের আংশিক ঘনীকরণ করা হয়। পাকোপ-যোগী তৈলের দেহের উত্তাপে গলে যাওয়া প্রয়োজন। সেইজন্যে মাঝে মাঝে কিয়ৎ পরিমাণে ঘনীভূত তৈল বের করে তার গলনবিন্দু বা প্রসারণ নির্দেশ দ্বারা ঘনীভবন কতদূর ঘটল তা অনুমান করা যায়। সাধারণতঃ গলনবিন্দু ৩৪° থেকে ৩৫° সে'র মধ্যে পৌছলে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এক একটি প্রক্রিয়াযন্ত্র বা অটোক্লাভের গ্রহণক্ষমতা ১৩০—১৪০ মণ। এখন অটোক্লাভশুদ্ধ তৈলকে কিছুটা ঠাণ্ডা করা হয়। এরপর তলাকার নল দিয়ে তৈল পরিস্রবণ যন্ত্র বা ফিল্টার প্রেসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে হয়। ফলে অন্যবিধ ময়লা সমেত সমস্ত নিকেল ক্যাটালিষ্ট ছাঁকন-যন্ত্রের মুখে আটকে যায় এবং উন্নত বর্ণের পরিষ্কার পরিশ্রুত তৈল বহির্গত হয়। এ অবস্থায় তৈলের উত্তাপ ৫০° হতে ৭০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকা উচিত।

এরপর পাকনিমিত্ত প্রয়োজনীয় তৈলের দুর্গন্ধ নাশ করতে হয়।

ঘনীভূত তৈলকে ২০০°-২২৫° সে, পর্যন্ত উত্তপ্ত করে অত্যধিক উত্তপ্ত জলীয়বাষ্প প্রবাহিত করতে হয়। পাত্রটির উপরিভাগে চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়। উভয় প্রথাতেই দুর্গন্ধময় জৈব পদার্থগুলি এই তাপে ও গ্যাসপ্রবাহে বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায়।

এরপর তৈলের সঙ্গে রঞ্জক পদার্থ, সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন মিশিয়ে টিনে ঢালা হয়। এখন এই টিনগুলিকে ২৪ ঘণ্টা হিমকক্ষে রাখা হয়, এতে ঘনীভূত তৈলের দানার গঠন উন্নত ধরণের হয়। এই তৈল এখন ভেজিটেবল ঘি নামে বাজারে বিক্রয় হয়।

সমস্ত তৈলকে একসঙ্গে আংশিক ঘনীভূত না করে আর এক প্রথায় তৈল ঘনীভূত করা যায়। কিয়ৎপরিমাণের তৈল সম্পূর্ণরূপে ঘনীভূত করা হয়, তারপর একে গলিয়ে সাধারণ তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ৫০°—৫৫° সেন্টিগ্রেডে একটি ঘূর্ণ্যমান চক্রা-কৃতি পাত্রের ওপর ধীরগতিতে ঢালা হয়। এই পাত্রের ভিতরে—৫° হতে+১০° ফারেনহাইট তাপের শীতল লবণজল প্রবাহিত করা হয়। মিশ্রিত তৈল এই শীতল গাত্রের সংস্পর্শে আসামাত্রই জমে কঠিন অস্বচ্ছ আবরণের সৃষ্টি করে। পাত্রটির গাত্র সংলগ্ন এই আবরণ ছুরি দিয়ে তুলে ফেলা হয় এবং তা তলাকার মন্থনপাত্রটির মধ্যে পড়ে। এই পাত্রটির মধ্যে একটি দ্রুত ঘূর্ণ্যমান মন্থনদণ্ড ক্রমাগত আঘাতে কঠিন আবরণটিকে ভেঙ্গে ছোট ছোট অস্বচ্ছ দানার সৃষ্টি করেএবং তা ব্যবহারোপযোগী হয়।

এরূপে নানাবিধ উপাদেয় সুস্বাদু ও সুপাচ্য অথচ সস্তা কৃত্রিম অদনীয় চর্বি প্রস্তুত করে বাজারে বিভিন্ন নামে বিক্রয় করা হয়।

ব্যবহার :—আজকাল সভ্যজগতের সর্বত্র পাক-প্রস্তুতিতে দামী মাখন বা ঘিয়ের পরিবর্তে ঘনীভূত তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ব্যবহার শুধু যে অল্প ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, সাধারণ তৈল বা প্রাণিজ চর্বি

অপেক্ষা পুষ্টিকর বলে ধনীসম্প্রদায়ও ঘনীভূত তৈল ব্যবহার করে থাকেন।

স্থায়িত্বগুণে সাধারণ তৈল অপেক্ষা ঘনীভূত তৈল অনেক উৎকৃষ্ট। সযত্নে রাখলে ঘনীভূত তৈল বৎসরাধিক থাকে। তাছাড়া সাধারণ তরল তৈল অপেক্ষা কঠিন ঘনীভূত তৈল নিয়ে কাজ করা বা দূরদেশে পাঠানো অনেক সুবিধাজনক।

দেহের পুষ্টিবর্ধনে স্নেহময় পদার্থ আবশ্যকীয় পুষ্টিকর খাদ্যাদির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আজকালকার দিনে খাঁটি ঘি দুর্লভ, দুর্মূল্য ও বিলাসিতার বস্তু। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্তেরা এর ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌছতে পারে না। এই জন্যে অধিকাংশ ঘৃতেই স্বাস্থ্যহানিকর ভেজালে মিশ্রিত থাকে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ঘনীভূত তৈল উপকারিতায় খাঁটি ঘিয়ের সমকক্ষ নয়, তবে ভেজালমিশ্রিত ঘৃতের তুলনায় ইহা বহুগুণে উপকারী। ভেজিটেবল ঘি সাধারণতঃ পাকপ্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সরিষা বা নারিকেল তৈল অপেক্ষা সস্তা এবং এর উপকারিতাও বেশী।

তাই আমাদের ভেজিটেবল ঘিয়ের উৎপাদন বাড়াতে হবে। শুধু লাভের দিক থেকে নয় মানবিকতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, যে জাতি যথেষ্ট চর্বিজাতীয় খাদ্য পায়না তাকে সস্তা ও পুষ্টিকর স্নেহময় পদার্থ সরবরাহ করাও মহত্ত্বের পরিচায়ক। নিপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীর রুক্ষদেহ ও মনকে স্নিগ্ধকরে তুলতে হবে।

সাধারণ উদ্ভিজ ও প্রাণিজ তৈলকে ঘনীকরণ করলে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা যায়। এই প্রথায় সস্তা ও নিকৃষ্ট ধরণের তৈলের দুর্গন্ধও দূর হয়। ঘনীভূত রেড়ীর তৈল আজকাল লুব্রিকেটর প্রস্তুতির কাজেও লাগে। চর্মশিল্পে আবশ্যক চর্বির স্থলে ঘনীভূত তৈলের ব্যবহার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি বিদ্যুত-বিশ্লেষণ দ্বারা হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি অক্সিজেন পাওয়া যাবে। কেবল অক্সিজেন বিক্রয় হতে যন্ত্রচালনের অধিকাংশ ব্যয় পূরণ হতে পারে।

সম্ভবতঃ কলকাতাতেই ঘনীভূত তৈল সবচেয়ে বেশী বিক্রয় হয়। কলকাতার আশেপাশে কয়েকটি কল স্থাপন করলে তা লাভজনকভাবে চলতে পারে এবং বাঙ্গালী অর্থসরবরাহকারীগণ তাঁদের অর্থ নিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেতে পারেন।

"শুধু কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করলেই বিদ্যা হয় না। * * * মানুষ হওয়া চাই। জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়। যারা আপন চেষ্টার বলে মানুষ হয় তারাই মানুষ। পুরুষকার আমার হাতে মুঠোর মধ্যে। আমার মনের দৃঢ়তা, আমার একনিষ্ঠা, আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিষ্ফলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে—আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবনযাত্রাকে সফল করিতে হইলে নিজেই পথ দেখিয়া লইতে হইবে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

মিকির জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীরাজমোহন নাথ

শ্রেণীবিভাগ—আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার গোলাঘাট মহকুমা ও নগাঁও জেলার মধ্যবর্তী মিকির পাহাড়ে মিকির জাতির বাস। ইহাদের অনেকে বর্তমানে উভয় জেলার সমতলভূমিতেও বাস করে। সমতলবাসীরা 'থলুয়া' মিকির বলিয়া পরিচিত। এই দুই জেলা ব্যতীত দরং জেলা, উত্তর কাছার এবং খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়েও অল্প সংখ্যক মিকিরের বাস আছে। ইহাদের মোট সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বর্তমানে গোলাঘাট মহকুমা, নগাঁও জেলা এবং উত্তর কাছাড়ের কিয়দংশ লইয়া একটি পৃথক মিকির পাহাড় জেলা গঠিত হইয়াছে।

মিকিররা পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ইংতি, তেরাং, তেরণ, তিমুং, এবং ইংহি বা হানচে বা রংপি। প্রত্যেকটি শ্রেণীতে আবার কয়েকটি কুল বা গোত্র আছে। যথা—

(১) ইংতি—পাঁচ কুল—কাথার, তারো, কিলিং, ইংলেইং, হেনচেক্।

তিমুং শ্রেণীর একব্যক্তি ইংতি শ্রেণীর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরজামাই হইয়া থাকে। তাহারই সন্তানসন্ততিরা ইংতি-কিলিং কুলের সৃষ্টি করিয়াছে। আদিতে কিলিং, তিমুং শ্রেণীরই একটি কুল ছিল। নগাঁও জেলার পশ্চিম অঞ্চলে এই কুলের নামানুসারে কিলিং নদীর নামকরণ হইয়াছে। হেনচেক্ সকলের নীচ কুল, শুধু ইংলেইং কুলের লোকেরাই তাহাদের সহিত আদান-প্রদান ও আহার-বিহার করে।

(২) তেরাং—পনর কুল—ক্রো, ক্রোনিহাং, ক্রোরমচেৎচো, ক্রোনেলিফ, ক্রমোচুকি বা ক্লিংথং, বে, বে-ডোম, বেরংহাং, বেচিংথং, বেকিক, বেংকৎ, তেরেং-দিলি, তেরেং রম্‌চেৎচো, তেরেং-ইং-নান্, তেরেং-ইং-জান্।

(৩) তেরণ—পাচকুল—মিলিক, মিলিগ, লংনি লিগুক, কন্‌কাট (বা আই, বা তরপ)

(৪) তিমুং—ত্রিশ কুল—রংপি, রংফার, কিলিং, ক্লেংরংফার, তক্‌বি, তক্‌তেকি, পাতর, ডেরা, ফোরা, চেনার, চেংনারমিজি, চেনারলিগো, নংফাক্ ফাংছে', ফাংছোতেং, তেরই, ফাংছো-জুইতি, ফান্‌ফাংছেন, তিমুংচিংথং। বাকী এগার কুলের নাম জানা যায় না। ইংহি বা রংপি শ্রেণীর একটি লোক তিমুং শ্রেণীর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরজামাই হইয়া থাকে এবং তাহার সন্তানসন্ততি হইতে তিমুং-রংপি কুলের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) ইংহি বা হানচে বা রংপি—চৌদ্দ কুল—বনরুং, হানচে, কেম্নাপ, লেক্‌থে, ইংহি, তুছ, রংহাং ক্রামছা, রংচিহন, কেরেং, রংহি, তুতাব রংপি-চিংথং, রংপি আম্রি। রংপি রাজবংশীয় শ্রেণী। তেরন সৈন্য শ্রেণী এবং ইংতিরা পুরোহিত শ্রেণী। অন্যান্যরা কৃষি বা অন্যান্য ব্যবসায়ী শ্রেণী।

আকৃতি ও সাজপোষাক—মিকির পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাধারণতঃ খর্বাকৃতি এবং তাহাদের দেহের বর্ণ পীতাভ। তাহাদের মুখাকৃতি গোল ও নাক চেপ্টা। মেয়েরা পুরুষাপেক্ষা সুশ্রী। পুরুষেরা কদাচিৎ দাড়িগোঁফ রাখে, এবং মস্তকের চারি পার্শ্বের চুল ক্ষুর দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিয়া উড়িয়াদের মত তালুর পশ্চাতে মধ্যবর্তী স্থানে এক গোছা চুল রাখে। ঐ চুল লম্বা হইলে মেয়েদের মত প্যাঁচ দিয়া খোপা বাঁধে। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে যুবকেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তাহাতে ভৃঙ্গরাজ

পাখীর সুদীর্ঘ পুচ্ছ নিবেশিত করিয়া সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে।

পুরুষেরা সাধারণতঃ লেংটি পরিধান করে। সৌখীন যুবকদের লেংটির অগ্র এবং পশ্চাৎ উভয় দিকে হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত ঝুলান থাকে। নিজের হাতে বোনা কাপড়ের দ্বারা এক প্রকার হাতকাটা কোট পরিধান করে, এবং ঐ কোটের নিচের দিকে সুতার ঝালর কোমর পর্যন্ত ঝুলান থাকে।

মেয়েরা কোমর হইতে হাঁটুর অল্প নীচ পর্যন্ত এক প্যাঁচ দিয়া একখানা কাপড় পরিধান করে, এবং ইহাকে কোমরে ভাল করিয়া আটকাইয়া রাখিবার জন্য কাপড়ের একগাছা ফিতা ব্যবহার করে। এই ফিতার অগ্রভাগ দুইটি সামনের দিকে কাপড়ের উপর ঝুলিয়া থাকে। ফিতাতে নানারূপ নক্সা আঁকা থাকে এবং অগ্রভাগে সুতার বা উলের দুইটি ফুল বাঁধা থাকে। বুকে একখানা স্বল্পপরিসর কাপড় বাঁধা থাকে এবং কখন কখন একখানা পৃথক চাদর দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখা হয়। অবিবাহিতা মেয়েরা সর্বদা একখানি পৃথক কাপড়ের পট্টি দ্বারা শক্তভাবে বক্ষদেশ আবৃত করিয়া রাখে সন্তানাদি হওয়ার পর স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ বক্ষদেশ অনাবৃত রাখে।

মিকির মেয়েরা নিজেরাই পরিবারের কাপড় প্রস্তুত করে। নিজেদের বাগানের তুলা হইতে সুতা কাটিয়া উহা দ্বারা নিজেদের তাঁতে পুরুষ ও মেয়েদের কাপড় বোনা হয়। মেয়েরা সাধারণতঃ কাল ও হলুদ রং এর কাপড় পছন্দ করে।

কাপড় বোনার তাঁত অতি সহজ ধরণের। ঘরের খুঁটির সহিত দীর্ঘ টানা সুতার এক ভাগ বাঁধা থাকে এবং অপর ভাগ এক গাছা বেতের বা চামড়ার ফিতার সহিত বাঁধিয়া উহা কোমরে জড়াইয়া রাখা হয়। এক টুকরা চওড়া কাঠ ও দুই টুকরা বাঁশের কঞ্চিদ্বারা পড়েন সুতা পুরিয়া দেওয়া হয়। কাপড় সাধারণতঃ এক হাত বা দেড় হাত চওড়া করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

মিকিররা গাছ, লতা, পাতা দ্বারা সুতায় পাকা রং করে:—কাল রং—(১) বুঙ্গির নামক এক প্রকার পাহাড়ী লতা সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

(২) বুঠি নামক এক প্রকার গুল্মের পাতা ও গাছ হইতে প্রস্তুত করা হয়। এই গুল্ম বাগানে লাগান হয়, এবং ইহা বারমাস সবুজ থাকে।

(৩) দুলি-নামক এক প্রকার গুল্মের পাতা হইতে প্রস্তুত করা হয়। এই গুল্ম জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বাগানে লাগান হয়, এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মরিয়া যায়।

হলুদ রং—জানতারলং নামক এক প্রকার গাছের ছাল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

লাল রং—লাক্ষা সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

পুরুষ ও মেয়েরা কানে বাঁশের চোঙ্গা কাটিয়া দেড় ইঞ্চি পরিমাণ গোলাকার আংটি বা সীসার পাত দ্বারা মুড়িয়া কাঠের দুল পরিধান করে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়েরা মন্দিরের আকৃতি বিশিষ্ট রৌপ্যনির্মিত ভারী কর্ণাভরণ পরিধান করে। হাতে রূপার ও সীসার কঙ্কনও পরে। সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করা রীতিবিরুদ্ধ। অবিবাহিত মেয়েরা সাধারণতঃ লাল ও নীলবর্ণের পুতির বা কাঁচের মালার আট দশ লহর গলায় পরিধান করে। বিবাহের পর ঐ রূপ হার পরিধান করা হয় না। কোন কোন সৌখীন যুবকেরাও ঐ রূপ পুতির মালার হার ব্যবহার করে।

যৌবনে পদার্পণ করিবার পর বা একটু পূর্বে মেয়েরা নীলবর্ণের উল্কি পরে। সীঁথি হইতে আরম্ভ করিয়া কপাল, নাক ও ঠোঁটের উপর দিয়া চিবুক পর্যন্ত উল্কির একটি সোজা রেখা টানিয়া দেওয়া হয়। বেত বা লেবু গাছের কাঁটা দ্বারা উদ্দিষ্ট স্থান বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং এক প্রকার গাছের পাতার রস ঐ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হয়। যে পাতা দ্বারা কাপড়ে কাল রং করা হয়, ঐ পাতার রসই উল্কিতে ব্যবহৃত হয়।

উল্কিকে 'আতুখ' বলা হয়। যে ব্যক্তি উল্কি

পরায়, তাহাকে চার আনা পয়সা বা একখানা কাপড় অথবা মেয়েদের কোমরবন্ধ-ফিতা দক্ষিণা দিতে হয়। যে পর্যন্ত না উল্কির ঘা শুকায়, মেয়েকে ততদিন নির্জন ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, কাহারও সম্মুখে বাহির হওয়া নিষেধ। অন্যলোকে দেখিলে নাকি উল্কির রং ভাল হয় না। উল্কিপড়া দেখিলেই বুঝিতে হইবে—মেয়েটি ঋতুমতী হইয়াছে বা শীঘ্রই হইবে।

যৌবনে পদার্পণ করিলেই যুবক যুবতীরা মাহুদী নামক এক প্রকার গাছের পাতার রস দ্বারা দাঁতগুলি কাল কুচকুচে করিয়া রাখে। ইহা সৌন্দর্যের পরিচায়ক। অনেক বয়স্কা মেয়েরাও এই অভ্যাস বজায় রাখে, কিন্তু বয়স্ক পুরুষেরা কদাচিৎ ইহা ব্যবহার করে।

থলুয়া মিকিরদের সাজ-পোষাক ও আচার ব্যবহার সমতলবাসী অন্যান্য লোকদের অনুকরণে অনেকটা আধুনিক ধরণের হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্মও অনেকাংশে প্রচলিত হইয়াছে।

মিকিরদের ঘর—স্থলে হউক বা পর্বতেই হউক মিকিররা কাঠ, বাঁশ, বেত ও ছন দ্বারা মাচান ঘর তৈরী করে। প্রতি পরিবারে সাধারণতঃ একখানিই লম্বা ঘর থাকে এবং ইহার মধ্যে পরিবারের সকলে নিজের জিনিসপত্র লইয়া বাস করে।

ঘরগুলি সাধারণতঃ উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ঘরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত বারান্দা থাকে, তাহারই দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া মাচানে উঠিবার সিঁড়ি থাকে। একখণ্ড কাঠে খাঁজ কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করা হয়।

ঘরের মধ্যে দৈর্ঘ্য বরাবর তিনটি দেয়াল থাকে এবং এতদ্বারা ঘরটিকে তিন কামরায় বিভক্ত করা হয়। ডানদিকের কামরাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশের একমাত্র দরজা। এই কামরার নাম—'কাম'; ইহাতে অতিথি অভ্যাগত থাকে। অন্য সময় বয়স্কা অবিবাহিতা ও বৃদ্ধা মেয়েরা ইহাতে ঘুমায়। কামঘরের মধ্যস্থলে ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষিয়া বাঁশের একটি লম্বা মাচান থাকে। এই মাচানকে তিবুং বলে।

কামঘরের বামদিকে মধ্যবর্তী ঘরের নাম "কুট"। কামঘরের দেয়ালের মধ্যভাগে 'কুট' ঘরে যাইবার দরজা। ঐ দরজার বরাবরে ঘরের মধ্যভাগে আগুন জ্বালান থাকে। মাচানের উপর মাটি রাখিয়া কাঠের আগুন জ্বালান হয়। এই আগুনেই রান্নাবান্না করা হয়। চুল্লীর পশ্চাদ্ভাগে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের ও সম্মুখভাগে বাড়ীর কর্তা-গিন্নীর বিছানা থাকে। এইঘরে মাচান থাকে না; মেজেতেই সকলে শয্যা পাতে। এই ঘরেরই সম্মুখদিকে দেয়ালের পাশে ধানের ভাণ্ডার থাকে। বাঁশের বেত দ্বারা নির্মিত বৃহদাকার টুকরীতে ধান রাখা হয়। ভাণ্ডারের অংশকে 'ভামথেক' বলে। 'কুট' ঘরের বামদিকে অপেক্ষাকৃত নীচু মাচানযুক্ত ক্ষুদ্র পরিসর "ভো-রই" কামরা। ইহার মধ্যে ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি থাকে এবং অন্যান্য জিনিসও রাখা হয়।

সম্মুখের বারান্দাকে 'সঙ্কুপ' বলে। ইহাতে জ্বালানি কাঠ ও জলের চোঙ্গা থাকে এবং পুরুষ অতিথিদিগকে রাত্রে শুইবার জন্য এখানে স্থান দেওয়া হয়। পশ্চাৎদিকের অনুরূপ বারান্দায় বসিয়া রাত্রে প্রস্রাবাদি শৌচক্রিয়া সমাধা করা হয়।

কোন কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত বারান্দার অগ্রভাগে পৃথক একচালাযুক্ত আর একটি অতিরিক্ত বারান্দা থাকে। ইহাকে 'হাংফারলা' বলে। অতিথি অভ্যাগত বেশী হইলে তাহাদিগকে ঐ স্থানে থাকিতে দেওয়া হয়।

আসবাব পত্র—মিকিররা বৃহদাকার (আট, নয় ইঞ্চি ব্যাস) বাঁশের পাঁচ ছয় ফুট দীর্ঘ খণ্ডের ভিতরের গাঁটগুলি ফেলিয়া দিয়া উহা জল রাখিবার জন্য ব্যবহার করে। এই চোঙ্গাকে 'লাং-বং' বলে। মেয়েরা চার পাঁচটি চোঙ্গা ভর্তি করিয়া দূরস্থিত ঝরণা বা নদী হইতে পানীয় ও অন্যান্য কাজের জন্য জল লইয়া আসে।

রন্ধনের জন্য মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। মিকিররা কুমারের চাক ব্যবহার করিতে জানে না; হাতের দ্বারা সাধারণ রকমের বাসন প্রস্তুত করে। গাছের ডাল কাটিয়া কাঠের হাতা প্রস্তুত করা হয়।

বাঁশের বেতের দ্বারা মিকিররা অনেক প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করে। গৃহের আসবাব-পত্র বা ধান, চাউল প্রভৃতি রাখিবার জন্য বাঁশের বেতের ঝুড়ি প্রস্তুত করে। জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য "চিংনাম আপ্রে" নামক ত্রিকোণাকার বাঁশের বেতের ঝুড়ি প্রস্তুত করা হয়। উহার তলা প্রায় অর্দ্ধ-হস্ত পরিমাণ চওড়া এবং সমকোণ বিশিষ্ট, দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হাত এবং মুখ গোলাকৃতি, ব্যাস প্রায় এক হাত। বাঁশের বেতদ্বারা নির্মিত প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া এক গাছি ফিতা, মালবোঝাই করা ঝুড়িতে জড়াইয়া ঝুড়িটিকে পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং ফিতার অপর দিক কপালের উপর রাখিয়া মাল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই ফিতার নাম 'চিংনাম'।

মিকিরদের নির্মিত বাঁশের চাটাই অতি বিখ্যাত। ঐ চাটাই ঘরের দরজা জানালা, ছাদ নির্মাণ প্রভৃতি নানান কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাঁশের চোঙ্গা কাটিয়া জোড়া দিয়া তাহার মধ্যে বাঁশের বেতের পাতলা 'রীড' লাগাইয়া মিকিররা সুমধুর সুরের বাঁশী প্রস্তুত করে। মৃতদেহ বহন করিবার সময় বাঁশের বেতের সুন্দর দোলা ও বাঁশের আঁশ দ্বারা নানা প্রকার ফুল প্রস্তুত করা হয়।

মিকিরদের একমাত্র লৌহনির্মিত অস্ত্র দা এবং ত্রিকোণাকৃতি কোদাল। কোদাল দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া কৃষিকার্য করে এবং দা দ্বারা জালানি কাঠ কাটা, জঙ্গল কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের খুঁটি পালিশ করা, তক্তা প্রস্তুত এবং নক্সাযুক্ত কারুকার্যও সমাধা করা হয়। গাছ খোদাই করিয়া এক প্রকার ছোট ছোট নৌকাও নির্মাণ করা হয়।

গাছ খোদাই করিয়া মিকিররা দুই প্রকার ঢোল প্রস্তুত করে। এক প্রকার প্রায় তিন হাত দীর্ঘ এবং অন্য প্রকার তবলার মত ছোট। ঢোলে সাধারণতঃ হরিণের চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়।

মিকিররা ধান, তুলা, তিল, কচু, সরিষা ও লঙ্কার চাষ করে। মিকির পাহাড়ে বেত, বাঁশ, নানা প্রকার মূল্যবান কাঠ, অগুরু ও বংশলোচন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষাও উৎপন্ন হয়।

আহার-বিহার—মিকিরদের দৈনন্দিন আহার দুই বেলা—প্রাতে ও রাত্রে—ভাত, তরকারী এবং দুপুরে সাধারণতঃ মদ্যপান করা হয়। অন্য দুইবেলাও ভাতের সঙ্গে কিছু পরিমাণ মদ পান করা হয়। তরকারীর সঙ্গে একটু লবণ, টুকরা টুকরা করিয়া লঙ্কা ও তিলের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। কোনও তরকারীতে ঝোল দেওয়া হয় না, ভাজাও ব্যবহার করা হয় না; কোনও রকমে সিদ্ধ হইলেই হইল।

মাছ, শুক্‌না মাছ, মাংস ও শুক্‌না মাংস সিদ্ধ করিয়া বা বেশীর ভাগ পোড়াইয়া খাওয়া হয়; এবং ইহার সঙ্গে একটু লবণ ও কাঁচা লঙ্কা হইলেই যথেষ্ট হয়। সকল প্রকার মাছই তাহারা খায়। শুক্‌না মাছ ও মাটির নীচে রাখিয়া পচান পুঁটি মাছ (হিঁদল) তাহাদের প্রিয় খাদ্য। মাংসের মধ্যে ছাগল, শূকর, হরিণ, বন্যমহিষ, মিথুন, গোসাপ, মুরগী, পায়রা ও হাঁস প্রশস্ত। গ্রাম্য মহিষ বা গরুর মাংস তাহারা খায় না। মিকিররা গরু, মহিষের দুধ কখনও পান করে না। এণ্ডি ও মুগার পোকা মিকিরদের সুস্বাদু খাদ্য।

পরিবারের সকলেই একসঙ্গে বসিয়া আহার করে; কিন্তু পুত্রবধু বা জামাতা কখনও শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করে না।

মিকিররা চাউল হইতে চিড়া প্রস্তুত করে, কিন্তু খৈ বা পিঠা প্রস্তুত করিতে জানে না।

তাহারা চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করে। ইহা তাহাদের প্রিয় খাদ্য ও পানীয়। কেহ কেহ সারাদিন মদ পান করিয়াই কাটাইয়া দেয়, ভাত খাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। স্ত্রী, পুরুষ,

ছেলে-মেয়ে সকলেই এই মদ পান করে। উৎসবাদিতে মদ অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। মিকিরদের মদ তিন প্রকার—(১) লাউপানী বা হোরলাং—অপরিষ্কার চাউলের ভাত রাঁধিয়া বেতের চাটাই বা কলাপাতার উপর বিছাইয়া রাখা হয় এবং অল্প ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত বাখর বা ঔষধ মিশান হয়। মাহুদী ও ছোট বৃহতী (বেকৈর) গাছের পাতা গুঁড়া করিয়া (তাহার সহিত কখনও বা ধুতুরার পাতা বা বীজ মিশ্রিত করা হয়) চাউলের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে শুকাইয়া রাখা হয়। ইহাকে বাখর বলে।

তারপর ঐ ভাত একখানা কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। গ্রীষ্মকালে দুই দিন এবং শীতকালে তিন চার দিন পরই ভাতে মাদকতাপূর্ণ এক প্রকার গন্ধ উৎপন্ন হয়। তখন ঐ ভাত একটি প্রশস্ত-মুখ মাটির কলস বা হাঁড়িতে রাখা হয়। দুই তিন দিন পরে ঐ ভাত পচিয়া মদ প্রস্তুত হয়। তখন বাঁশের বেতের দ্বারা নির্মিত একটি ছাঁকুনি ঐ ভাতের মধ্যে বসাইয়া রাখা হয় এবং অল্প অল্প করিয়া রস ছাঁকুনির মধ্যভাগে জমা হয়। ঐ রসই হোরলাং। ইহা সাধারণতঃ একটি লাউয়ের শুষ্ক খোলার মধ্যে ভর্তি করিয়া রাখা হয়, এবং প্রয়োজন মত ঐ লাউ হইতেই পান করা হয়।

(২) হোরপো—উপরোক্ত হাড়ির পচাভাতের সঙ্গে জল মিশ্রিত করিয়া ভাত চিপিয়া যে রস নিঃসারিত করা হয়, তাহাকে হোরপো বলে। বড় বড় উৎসবাদিতে হোরপো ব্যবহার করা হয়। একশত জন লোকের জন্য দুই মণ চাউলের হোরপোর প্রয়োজন হয়। ভাতগুলি শূকরকে খাইতে দেওয়া হয়।

(৩) আরাক বা ফটিকা—একটি মাটির কলসে হোরপো ভর্তি করিয়া মাটি ও খড় দিয়া শক্তভাবে কলসের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; এবং কলসের গলার একটু নীচে দুই পার্শ্বে বাঁশের ছোট দুইটি নল লাগাইয়া নীচে আগুনের মৃদু উত্তাপ দেওয়া হয়। কলসস্থ মদের বাষ্প আগুনের উত্তাপে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাঁশের নলের মধ্যে গিয়া ঠাণ্ডা হইয়া জলাকারে নলের নীচে রক্ষিত পাত্রে পতিত হয়। ঐ জলই মদের নির্যাস বা আরক। এই মদ সাধারণতঃ বোতলে রাখা হয়।

সমাজ-শৃঙ্খলা—মিকিরদের প্রত্যেক গ্রামে একজন গাঁওবুড়া বা মাতব্বর ব্যক্তি থাকে। যে কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কতকজন-লোককে নিজের দলভুক্ত করিয়া তাহাদের মতানুসারে গাঁওবুড়া পদে অভিষিক্ত হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের গাঁওবুড়া ও গ্রামস্থ সকল লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন শূকর ও মুরগীর মাংস সহ মদ্যপান করাইয়া গাঁওবুড়া পদে অভিষিক্ত হইতে হয়।

গাঁওবুড়াই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহার আদেশ সকলের শিরোধার্য। গাঁওবুড়ার নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করা হয়। গাঁওবুড়ার পদ সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক, কিন্তু কোন গাঁওবুড়ার উপযুক্ত পুত্র না থাকিলে অন্যলোক নির্বাচিত হইতে পারে। গাঁওবুড়ার অভিষেকের সময় যদি ঐ গ্রামের কেহ আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাহার প্রাধান্য মানিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে নিজের দলবল সহ ঐ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। হয় সে অন্য স্থানে গিয়া নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া উপরোক্ত ভাবে নূতন গ্রামের গাঁওবুড়া পদে অভিষিক্ত হইবে, নতুবা অন্য কোনও গ্রামে গিয়া ঐ গ্রামের গাঁওবুড়ার অধীনে বাস করিবে।

মিকির পাহাড়ে গ্রামের নাম নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। একই গ্রামের নাম বৎসরের পর বৎসর গাঁওবুড়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তিমুংশাখার মন নামক গাঁওবুড়ার নামানুসারে একটি গ্রামের নাম—মন-তিমুং গ্রাম; মনের ছেলে সার্থে গাঁওবুড়া হইলে গ্রামের নাম পরিবর্তিত হইয়া সার্থে-তিমুং হইয়া যাইবে। আবার

যদি কোনও কারণে সার্থে গাঁওবুড়া দলবলসহ পুরাতন গ্রাম ত্যাগ করিয়া নূতন একস্থানে গিয়া একটি গ্রাম স্থাপন করে, তাহা হইলে ঐ গ্রামের নামও সার্থে-তিমুং হইবে। সুতরাং ম্যাপ দেখিয়া গ্রামের স্থান নির্দেশ করিতে যাওয়া মোটেই যুক্তি-যুক্ত নয়।

সামাজিক বিধি ব্যাপারে গাঁওবুড়া এক লাউ হোরলাং পাওয়ার অধিকারী। সামাজিক পঞ্চায়েত বা বিচারে গাঁওবুড়ার মীমাংসাই চরম। যদি গাঁওবুড়া ছেলেমানুষ হয় বা খুব চালাক চতুর না হয়, তাহা হইলে সমাজস্থ বৃদ্ধ ও জ্ঞানী-লোকেরা বিচারের মীমাংসা করিয়া দেয়, কিন্তু গাঁওবুড়াকেই রায় প্রকাশ করিতে হয়। কোনও গাঁওবুড়ার বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে পাঁচ বা সাত গ্রামের গাঁওবুড়াকে মিলাইয়া বিচার করান হয়।

পঞ্চায়েতের দণ্ড সাধারণতঃ সিকি বা দুয়ানী হিসাবে হয়। কঠোর শাস্তির পরিমাণ একশত সিকি। ইহা ছাড়া দোষ অনুযায়ী শূকর মাংস ও মুরগীর মাংস সহ সমাজকে মদ খাওয়াইবার শাস্তিও দেওয়া হয়।

মিকির ভাষায় যুবককে 'রিছ-মার' ও অবিবাহিতা যুবতীকে 'ওকার-জং' বলে। প্রত্যেক গ্রামে বার বৎসর হইতে পঁচিশবৎসর পর্যন্ত বয়স্ক অবিবাহিত যুবকদের লইয়া একটি সঙ্ঘ সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক গাঁওবুড়ার বাড়ীতেই যুবক সঙ্ঘের জন্য একটি পৃথক ঘর প্রস্তুত করা হয়, এবং যুবকরা রাত্রে ঐ ঘরেই নিদ্রা যায়। ঐ ঘরকে 'রিছ-বাছা' বলে। আসামী ভাষায় ইহাকে ডেকা-চাং বলে। পৃথক ঘর করা সম্ভব না হইলে অথবা যুবকের সংখ্যা কম হইলে—গাঁওবুড়ার বাড়ীর 'সঙ্কুপ'ই 'রিছ-বাছা'-রূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যেক যুবক নিজের বাড়ী হইতে পাতায় বাঁধিয়া ভাত, তরকারী ও মদ লইয়া সন্ধ্যায় 'রিছ-বাছা'য় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সকলে একত্রে বসিয়া রাত্রে আহার করে। আহারের সময় একে অন্যকে ভাত, তরকারী বা মদ দিয়া সাহায্যও করে।

গাঁওবুড়া যুবক সঙ্ঘের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

সঙ্ঘের দলপতি—ক্লেংছারপো; সহকারী দলপতি—ক্লেংদুন; এবং তাহাদের সেনাপতি যথাক্রমে ছদার কেথে ও ছদার ছো।

ছাঙ্গো-কেরই—সঙ্ঘের সভ্যরা প্রতিদিন রীতি-মত রিছ-বাছাতে আসে কিনা, না আসিলে তাহার কারণ নির্ণয় করা ইত্যাদি কার্যের তত্ত্বাবধানকারী।

চেং-ক্রপ্-পি—প্রধান ঢোল বাদক।

চেং-ক্রপ-ছো—সহকারী ঢোল বাদক।

ফাং-ক্রি—ক্লেংছারপোর আজ্ঞাবহ।

মোতান আরই—দলপতির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সঙ্গী।

মোতান আরভি—দলপতির বাম পার্শ্বস্থ সঙ্গী।

লাং-বং-পো—পানীয় জলের চোঙ্গা বাহক।

ছিন্-হাক্-পো—কৃষিকার্য বা অন্যান্য কার্যের সরঞ্জাম বহনকারী।

বার্-লন্—কৃষিকার্যের সময় জমি জরিপ করিবার নল-বাহক।

যুবক-সঙ্ঘ গ্রামের সকল কার্যের প্রধান সহায়ক। সঙ্ঘের কার্যকে জির-কেদাম্ বলে। গ্রামের প্রত্যেকের কৃষিকর্মে যুবক-সঙ্ঘ পালাক্রমে সাহায্য করে। তাহারা নিজেরাও পৃথকভাবে কৃষিকর্ম করে, এবং উৎপন্ন ফসলাদি বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সঙ্ঘের ঢোল, সাজ-পোষাক প্রভৃতি ক্রয় করে এবং মধ্যে মধ্যে ভোজের আয়োজন করে। যদি কোনও বাড়ীতে রিছ-মার বা যুবক না থাকে, কিন্তু যুবতী থাকে, তাহা হইলে যুবক-সঙ্ঘ ঐ বাড়ীরও কৃষিকর্মে সহায়তা করে। ঐ বাড়ীর যুবতীরা যুবক-সঙ্ঘের যুবকদের জন্য কোট ও লেংটি প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য।

শ্রাদ্ধ মিকিরদের একটি প্রধান উৎসব। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। যুবক-সঙ্ঘ

ব্যতীত এই কার্য কোনও মতে সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি কোনও গ্রামে শৃঙ্খলাবদ্ধ যুবক-সঙ্ঘ না থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধের পূর্বে কয়েকটি যুবককে একত্র করিয়া একটি সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হইবে, নতুবা অন্য গ্রামের যুবক-সঙ্ঘের আশ্রয় লইতে হইবে।

যুবক-সঙ্ঘের মধ্যে কোনওরূপ ব্যভিচার বা অন্যায় ঘটিলে ক্লেং-ছার-পোই প্রধান বিচারক। প্রয়োজন হইলে গাঁওবুড়ার সাহায্য লওয়া হয়।

গার্হস্থ্য জীবন—পিতাই বাড়ীর প্রধান কর্তা; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি সকলেই তাহার অধীন ও আজ্ঞাবহ। মেয়েরা পুরুষদের ন্যায় মাঠে কৃষির সকল প্রকার কার্য করে, অধিকন্তু রান্নাবান্না, ধান ভানা ও কাপড় বুনা মেয়েদেরই কাজ।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হয়। মেয়ে পিতার কোনওরূপ সম্পত্তির অধিকারিণী হয় না। বিবাহের সময়ও মেয়েকে কোনও প্রকার যৌতুক দেওয়া হয় না, এমনকি যে কাপড় ও অলঙ্কার পরাইয়া মেয়েকে প্রথম স্বামীর ঘরে পাঠান হয়, বিবাহের চারদিন পরে মেয়েকে ঐ কাপড় ও অলঙ্কার পিতৃগৃহে প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করা মিকিরদের মধ্যে একপ্রকার বাধ্যতামূলক রীতি, কিন্তু মামার সম্পত্তির উপর জামাতার কোনও অধিকার নাই।

কুমারীরা প্রথম ঋতুমতী হইলে কোনও উৎসব করা হয় না বা সেই রকম কোনও বিশেষ রীতি-নীতি মানিতে হয় না। মাসিক রজোদর্শনের সময় বিবাহিত মেয়েরা চারদিন রান্নাবান্না করে না, কিন্তু বাড়ীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক না থাকিলে এই বিধান অমান্য করিলেও কোন দোষ হয় না। রজোবন্ধ হইলে স্নান করা বাধ্যতামূলক নহে; শীতকালে স্নান করার প্রশ্নই উঠে না।

দৈনন্দিন স্নান করা সম্পর্কেও কোন বাঁধাধরা রীতি নাই। গরমের দিনে ইচ্ছা হইলে কেহ দৈনিকও স্নান করে, কেহবা সাত আটদিন পরে একদিন স্নান করে। গরমের দিনে গ্রামের মেয়েরা কখন কখন দল বাঁধিয়া নদীতে স্নান করিতে যায়। স্নানে যাইবার পূর্বে গ্রামময় তাহাদের এই অভিযানের কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে কোনও পুরুষ ভুলক্রমেও যেন সেই দিকে না যায়। সাধারণতঃ সকল মেয়েরাই উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতে নামে। তখন যদি কোনও পুরুষ দৈবাৎ স্নানের জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সামাজিক শাসনে তাহাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

কয়লা ও কয়লাজাত পদার্থ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে জ্বালানি হিসাবে কয়লার প্রয়োজন আমরা নিত্য অনুভব করি। যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন আলকাতরার স্পর্শ এড়াইবার জন্য আমরা সদাই সচেষ্ট, তাহারাই যে কিরূপে কত রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ, বিস্ফোরক, সুগন্ধি দ্রব্য ও আরও কত বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বর্তমান সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে তাহা এক প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা সম্ভবপর নহে। আলকাতরা হইতে আনুমানিক দুই সহস্র রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত রঞ্জক দ্রব্য প্রাকৃতিক রঞ্জক দ্রব্যকে অপসারিত করিয়াছে। হীরক, কয়লারই রূপান্তর। হীরক যেমন আলোকরশ্মির সাহায্যে রঙবেরঙের সৃষ্টি করে, কয়লাজাত আলকাতরাও সেরূপ নানারকম রঞ্জক দ্রব্যের সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া কয়লাকে কখনও কখনও কৃষ্ণবর্ণ হীরক নামে অভিহিত করা হয়।

এই কয়লার উৎপত্তি লইয়া অনেক মতভেদ আছে; কিন্তু বিজ্ঞানীরা সকলেই এই খনিজ পদার্থটিকে উদ্ভিজ্জবস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানীদের মতে উত্তরকালে গাছপালার বিয়োজন ঘটিয়াছে, মৃত্তিকার প্রচণ্ড চাপে উহারা জমাট বাঁধিয়াছে, উহাদের অঙ্গার জাতীয় উপাদান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে উহারা কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বিয়োজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ অনুসারে কয়লাকে বিজ্ঞানীরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা— (১) পিট্ জাতীয় কয়লা (২) মেটে রঙের লিগ্‌নাইট জাতীয় কয়লা (৩) সাধারণ অর্থাৎ বিটুমিনাস কয়লা (৪) অ্যানথ্রাসাইট জাতীয় কয়লা প্রথমোক্ত দুই জাতীয় কয়লা অপেক্ষাকৃত নরম, ইহাদের মধ্যে অঙ্গার জাতীয় উপাদানের পরিমাণ কম এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত কম তাপ উৎপাদনে সমর্থ। শেষোক্ত দুই জাতীয় কয়লা বেশ শক্ত। ইহাদের মধ্যে অঙ্গার জাতীয় উপাদানের পরিমাণ বেশী এবং ইহারা বেশী পরিমাণে তাপ উৎপাদনে সক্ষম। পিট্ জাতীয় কয়লায় আদিম বৃক্ষের অনেক চিহ্ন বর্তমান।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই মূল্যবান খনিজ পদার্থটি বর্তমান। আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। আমেরিকায় কয়লার স্তর ঘন এবং পুরু। এই কয়লার সহিত লৌহশিল্প ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কয়লার ভাণ্ডারের খুব কাছাকাছি লৌহপ্রস্তর বিদ্যমান আছে বলিয়া শিল্পজগতে আমেরিকা আজ এত উন্নত। যুক্তরাজ্যের স্থান আমেরিকার পরেই। আমাদের দেশে প্রায় সকল প্রদেশেই কয়লা পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় তিন কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলা ও বিহারই পাঁচভাগের প্রায় চারিভাগ সরবরাহ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ কম ছিল এবং বেশীরভাগই তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত হইত। কিভাবে এই তাপ হইতে শক্তি উৎপাদন করা যায় বিজ্ঞানীরা তাহা লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জেমস্ ওয়াট যখন এই তাপ সহযোগে বাষ্প উৎপাদন করিয়া শকট চালাইতে সমর্থ হইলেন তখন হইতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইল। বর্তমান বৈদ্যুতিক শক্তির মূলে রহিয়াছে এই কয়লা। তাপ সহযোগে উৎপন্ন বাষ্প দ্বারা চালিত টারবাইন সাহায্যে ডায়নামো ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা

হইয়া থাকে। সভ্যজগতে জল স্রোতের সহায়তায়ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম মার্ডক কয়লা হইতে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস তৈয়ার করিয়া কয়লাকে এক নূতন রূপে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করিলেন। এই গ্যাসের দহনে তাপ উৎপাদিত ও আলো উৎসারিত হয়। তাঁহার এই পরিশ্রমের ফল শীঘ্র দেখা দিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নল দ্বারা বাহিত হইয়া ম্যাণ্টলের সাহায্যে প্রজ্জলিত হইয়া এই গ্যাস লণ্ডনের রাস্তাঘাট আলোকিত করিল। বর্তমানে সমস্ত সভ্যদেশে এই গ্যাসের প্রচলন ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এইবার কয়লা হইতে প্রাপ্ত কোক্ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ব্লাষ্ট-ফারনেস্ নামক এক প্রকার চুল্লীর মধ্যে কোকের সাহায্যে লৌহপ্রস্তর বা হিমাটাইট নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ গলাইয়া লৌহ তৈয়ার করা হয়। বর্তমান যুগে এই লৌহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। লৌহপ্রস্তর গলাইবার জন্য যে শ্রেণীর কয়লা বা কোক্ প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশে খুব যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কোকের সহিত চুণের সংমিশ্রণে ক্যালসিয়াম কারবাইড নামক একপ্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে য়্যাসিটিলিন নামক এক প্রকার গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাসকে বার্ণারের সাহায্যে জ্বালাইয়া আলোক উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা এই গ্যাস হইতে সংশ্লিষ্ট-রবার ও প্লাষ্টিক তৈয়ার করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অনেকেরই হয়ত জানা আছে যে, রবার এক জাতীয় বৃক্ষের আঠা। রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে এই জাতীয় বৃক্ষের একান্ত অভাব বলিয়া বিজ্ঞানীরা সংশ্লিষ্ট-রবার তৈয়ার করিয়া একটি বড় সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক স্থানে কয়লাকে উন্মুক্ত স্থানে জ্বালাইয়া জল দিয়া আগুন নিবাইয়া দিয়া কোক্ তৈয়ার করা হয়; কিন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ায় কতকগুলি দাহ্য গ্যাস, আলকাতরা এবং অতি মূল্যবান কতকগুলি উপোৎপাদ্য বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ এক প্রকার চুল্লীর মধ্যে বায়ুর সহিত সংযোগবিহীন কয়লাকে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে শুধু যে কোক্ পাওয়া যায় তাহা নহে, উপরোক্ত মূল্যবান বস্তুগুলিও উদ্ধার করা যাইতে পারে। ইংরাজিতে এই প্রথাকে বলা হয়—কার্বনিজেসন অফ কোল।

কয়লার এই কার্বনিজেসনের জন্য সিলিকা নির্মিত এক প্রকার ইটের তৈরী চুল্লীর মধ্যে বায়ুর সংস্রব বিবর্জিত অবস্থায় কয়লাকে প্রায় ৭০০°—৮০০° সেণ্টিগ্রেড তাপে দগ্ধ করা হয় এবং ১৬।১৭ ঘণ্টা উত্তপ্ত করিবার পর কয়লাকে চুল্লী হইতে বাহির করিয়া জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া কোক্ তৈয়ার করা হয়। চুল্লী হইতে নির্গত গ্যাস নল সহযোগে বাহিরে নীত হয় এবং ক্রমশঃ শীতল হইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে গ্যাসের কতক অংশ আলকাতরা, অ্যামোনিয়া, বেন্‌জল্ প্রভৃতি কতকগুলি তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। অবশিষ্ট গ্যাস হইতে গন্ধক ও অন্যান্য পদার্থ উদ্ধার করিয়া তাহাকে জলের উপর জালার মধ্যে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

এখন এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। অ্যামোনিয়া হইতে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ তৈয়ার হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট সার। জমির উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে এই সার বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বর্তমানে ভারত সরকার বিহারে সিধ্‌রি নামক স্থানে জিপসাম্ নামক এক প্রকার উৎপাদন হইতে এই সার প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ছাড়া অ্যামোনিয়া অল্প ব্যয়ে তাপ হ্রাস করিবার জন্য চিকিৎসাবিদ্যায় ও আরও নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইবার আলকাতরার কথায় আসা যাক। উন-

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আলকাতরার বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না। অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক উইলিয়ম পার্কিন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আলকাতরা হইতে একপ্রকার বেগুনি বর্ণের রঞ্জক দ্রব্য তৈয়ার করিয়া এই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থটির একটি নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহার চাহিদা হইল এবং পাতন কার্যও আরম্ভ হইয়া গেল। আলকাতারাকে ভঙ্গ-পাতন করিয়া কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যায় যথা—(১) হালকা তৈল (২) মাঝারি তৈল (৩) ভারী তৈল (৪) অ্যান্থ্রাসীন তৈল (৫) পিচ্

এই পাতনের ফলে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন তৈল হইতে যে কত সহস্র মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত করা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। হাল্কা তৈল হইতে বেন্জিন্, টলুয়িন্, জাইলিন্, রবার দ্রব করিবার জন্য দ্রাবক ন্যাপথা প্রভৃতি পাওয়া যায়। বেন্জিন্ হইতে আবার অ্যানিলিন, ফুক্‌সিন্ জাতীয় নানারকমের রঞ্জক দ্রব্য, নানাপ্রকার ঔষধ ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। টলুয়িন হইতে ট্রাই-নাইট্রো টলুয়িন নামক এক প্রকার ভীষণ বিস্ফোরক দ্রব্য, স্যাকারিন নামক এক প্রকার অত্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য ও আরও নানাপ্রকার রঞ্জক দ্রব্য তৈয়ার করা হইয়া থাকে।

মাঝারি তৈল হইতে ফেনল্ বা কার্বলিক অ্যাসিড, ক্রেসল, ন্যাপথালিন প্রভৃতি কতকগুলি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। ফেনল্ হইতে পিক্‌রিক অ্যাসিড নামক বিস্ফোরক দ্রব্য, বেকেলাইট নামক এক প্রকার প্লাষ্টিক্, নানাপ্রকার ঔষধপত্র ও রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ন্যাপথালিনের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত; কীটনাশক হিসাবে ইহার ব্যবহার আমাদের অবিদিত নহে। এই ন্যাপথালিনের সব বেশী ব্যবহার হয় কৃত্রিম নীল তৈয়ার করিবার জন্য। পূর্বে এই নীল এক জাতীয় গাছের পাতা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পাওয়া যাইত। আমাদের দেশে পূর্বে এই জাতীয় গাছের চাষ হইত এবং ইহার পশ্চাতে নীলকরদের যে কি নির্মম অত্যাচার ছিল তাহা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' পাঠে জানা যায়। বর্তমানে ন্যাপথালিন হইতে প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট-নীল প্রাকৃতিক নীলকে সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত করিয়াছে এবং আমাদের দেশে নীল-চাষের ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

ভারী তৈল হইতে ন্যাপথালিন, ক্রিয়োজোট তৈল, কুইনোলিন্ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কাষ্ঠাদি সংরক্ষণের জন্য ক্রিয়োজেট তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে আবার মোটর চালাইবার জন্য ডিসেল তৈলও পাওয়া যায়। অ্যান্থ্রাসীন তৈল হইতে মূল্যবান অ্যান্থ্রাসীন, কার্বাজোল প্রভৃতি পাওয়া যায়। গ্রেব ও লাইবারম্যান নামক দুইজন রসায়নবিদ অ্যানথ্রাসীন হইতে অ্যালিজারিন নামক একপ্রকার পাকা রক্তবর্ণ রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই রঞ্জক দ্রব্যটি পূর্বে মঞ্জিষ্ঠা বা মাদার নামক একপ্রকার লতাগাছের শিকর হইতে পাওয়া যাইত। ফ্রান্সে এই জাতীয় লতাগাছের চাষ হইত। গ্রেব ও লাইবারম্যানের আবিষ্কারের ফলে এই সংশ্লিষ্ট-বর্ণটি প্রাকৃতিক রঞ্জক দ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করে।

আলকাতরা পাতনের ফলে যে কঠিন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটি পাতনপাত্র ঠাণ্ডা করিলে পাওয়া যায় তাহার নাম পিচ্। রাস্তাঘাট মেরামতে ইহার ব্যবহার আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। আলকাতরা হইতে জাত অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বস্তুর হিসাব দেওয়া হইল। আল-কাতরার উপোৎপাদ্য রাসায়নিক দ্রব্য হইতে যে কত সহস্র বিভিন্ন বর্ণের রঞ্জক দ্রব্য তৈরী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রঙের বাজারে জার্মানীর এতদিন একাধিপত্য ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকা জার্মানীকে অনুসরণ করিয়া রঞ্জক দ্রব্যের বাণিজ্যে একটী বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। এই রঞ্জক

দ্রব্যের জন্য আমাদিগকে বিদেশীদের নিকট হাত পাতিয়া থাকিতে হয়; আমাদিগকে প্রায় ছয়কোটি টাকার রঞ্জক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বিহারের কুসুণ্ডা নামক স্থানে এবং আরও কতকগুলি স্থানে এই আলকাতরা পাতনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হইতে বেন্‌জল্, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়োসোট তৈল প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান ছাড়া বিশেষ কিছু উদ্ধার করা হয় না।

কয়লা এবং কয়লাজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। কয়লা হইতে কিরূপে পেট্রোল পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

অনেকেই হয়ত জানেন যে, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পেট্রোলিয়াম নামক এক প্রকার খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্য, পারস্য, রাশিয়া, ইরাক, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে এবং বার্মা, আসাম, জাপান প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে এই তৈল সংগ্রহ করা হয়। ইংলণ্ড এবং জার্মানী এই জাতীয় খনিজ তৈলে সমৃদ্ধ নহে। কয়লা হইতে কিরূপে মোটর চালাইবার উপযোগী পেট্রোল পাওয়া যাইতে পারে তাহা লইয়া বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং অবশেষে সফলকাম হইয়াছেন। নিকৃষ্ট জাতীয় কয়লাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এবং সম পরিমাণ ‘ভারী তৈল’ সহযোগে প্রলেপ দিয়া সামান্য পরিমাণ দ্রুতকের সাহায্যে উপযুক্ত চাপে এবং তাপে হাইড্রোজেন নামক এক প্রকার হাল্কা গ্যাস যোগ করিয়া বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সংশ্লিষ্ট-পেট্রোল, ডিসেল্ তৈল প্রভৃতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া অল্প তাপে কয়লাকে দগ্ধ করিয়াও মোটর চালাইবার উপযোগী পেট্রোল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড পূর্বোক্ত উপায়ে পেট্রোল তৈয়ার করিয়া বহুল পরিমাণে নিজের প্রয়োজন মিটাইতেছে। পৃথিবীতে কয়লার ভাণ্ডার নিঃশেষ হইবার বহু পূর্বে পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইবে; সুতরাং কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ার করিতে পারিলে যে একটি বড় সমস্যার সমাধান হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশ কয়লা-সম্পদে সমৃদ্ধ; কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়লাজাত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইয়াছে। জাতীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর উপত্যকা ও মোর পরিকল্পনায় অল্পব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জাতীয় সরকারের সহযোগীতায় এবং বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এই সমস্ত শিল্প গঠিত হইলে আমাদের দেশ শুধু যে স্বাবলম্বীই হইবে তাহা নহে, উপরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

করে দেখ

জল তোলার পাম্প

পাম্প আর পিচকিরি প্রায় একই রকমের যন্ত্র। কিন্তু দুটা যন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা সবাই জান—বাঁটটা উপরের দিকে টানলে পিচকিরির নলটা জলে ভর্তি হয়; আবার বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিলে নলের জলটা সেই মুখ দিয়েই জোরে বেরিয়ে যায়। পাম্পের বাঁটটাও উপরের দিকে টানলে নলটা জলে ভর্তি হয়, কিন্তু বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেললে নলের জলটা উপরের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এজন্যেই নীচ থেকে উপরে জল তোলবার কাজে পাম্পের প্রয়োজন। কিন্তু কি কৌশলে পাম্পের সাহায্যে নীচের জল উপরে তোলা হয় সে কথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান না। তোমরা নিজেরাই যাতে পরীক্ষা করে দেখতে পার সেজন্যে একটা সহজ কৌশলের কথা বলে দিচ্ছি। দুটা কাচের টেষ্ট টিউব যোগাড় করতে হবে। একটা মোটা আর একটা সরু। সরু টেষ্ট টিউবটা এমন মাপের হওয়া চাই যেন মোটা টেষ্ট টিউবটার মধ্যে বেশ সহজ ভাবে ঢুকে যেতে পারে। সরু টেষ্ট টিউবটা মোটা টেষ্ট টিউবটার ঠিক গায়ে গায়ে লেগে ঢুকে গেলে বেশ কাজ হবে। নচেৎ কিছু ফাঁক থাকলেও অসুবিধা হবে না। এরকমের এক জোড়া টেষ্ট টিউব যোগাড় করা মোটেই শক্ত নয়।

এবার টেষ্ট টিউব দুটার তলার দিকে ছিদ্র করে নিতে হবে। কাজটা খুব শক্ত নয়, গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিলে সে ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই টিউব দুটার তলায় ছিদ্র করে দিতে পারে। নচেৎ তোমরা নিজেরাও করে নিতে পার। উপায়টা বলে দিচ্ছি। ষ্টোভ জ্বালিয়ে টেষ্ট টিউবের তলার দিকটা তার একটা শিখার উপর ধরে থাক। কিছুক্ষণ আগুনের শিখার উপর রাখলেই দেখবে টিউবের তলাটা লাল হয়ে উঠেছে। আরও একটু গরম কর। কাচটা খুবই নরম হয়ে যাবে। এবার টেষ্ট টিউবের খোলা মুখটা তোমার মুখে লাগিয়ে জোরে ফুঁ দাও। সঙ্গে সঙ্গেই তলার দিকটা ফুটো হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবে। তার পর লাল

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
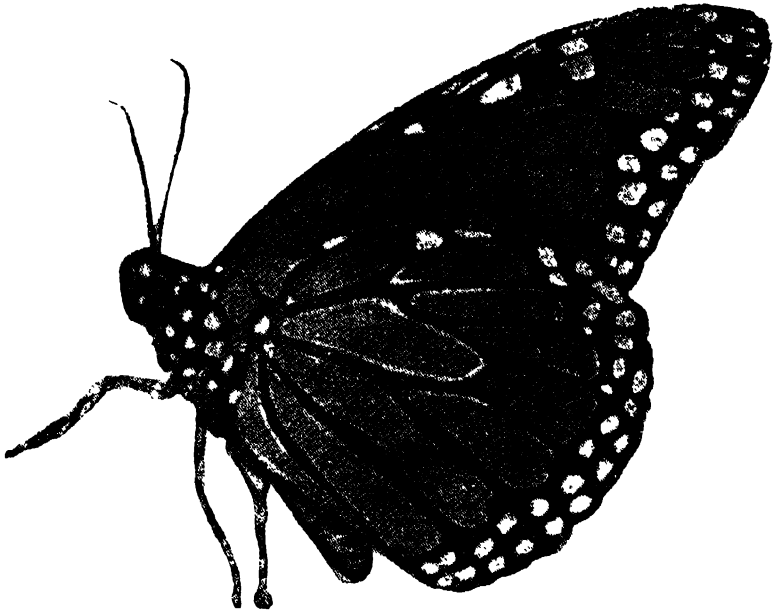
প্রজাপতি যেমন ফুলে ফুলে বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করে, তোমরাও তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সংবাদ আহরণ করে উন্নত হও।

দ্রুতবেগে ডানা কাঁপিয়ে মৌমাছিরা চাকে হাওয়া দিচ্ছে

১০১ পৃ. দেখ।

থাকতে থাকতেই কোন কিছু একটা শক্ত জিনিস দিয়ে চেপে চেপে টিউবের তলার দিকটা সমান করে নাও এবং টিউবটাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দাও। ষ্টোভের বদলে ব্লো-ল্যাম্প ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। স্যাকরাদের বাঁক-নলের সাহায্যে কাজটা আরও ভালভাবে করা যেতে পারে। এবার সরু টেষ্ট টিউবটার মুখের মাপ মত একটা কর্কের ছিপি যোগাড় কর। ছিপিটার মধ্য দিয়ে একটা সরু ছিদ্র কর। ছিদ্রটার মধ্যে দুমুখ খোলা সরু একটা কাচের নল ঢুকিয়ে দাও। কাচের নলটাকে ছবির মত করে বাঁকিয়ে দিতে হবে। ছিদ্র করা সরু টেষ্ট টিউবটার মধ্যে ছোট্ট একটা সীসার বল বা মার্বেল রেখে নল পরানো কর্কটাকে তার মুখে বেশ করে এঁটে দাও। ছিদ্র করা মোটা টেষ্ট টিউবটার তলায়ও একটা সীসার বল বা মার্বেল রাখতে হবে। সরু টেষ্ট টিউবটা যদি মোটা টেষ্ট টিউবটার ভিতরের মাপের সমান হয় তবে তাকে মোটা টেষ্ট টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। যদি ভিতরের টেষ্ট টিউবটা মোটা টেষ্ট টিউবটার চেয়ে অনেকটা সরু হয় তবে তার মাঝামাঝি জায়গায় সুতা বা ন্যাকড়া জড়িয়ে পিচকিরির বাঁটের মত করে নিতে হবে। এই হলো তোমার সম্পূর্ণ যন্ত্র।

১নং চিত্র
টেষ্ট টিউব পাম্প

এবার সম্পূর্ণ যন্ত্রটার নীচের দিকের খানিকটা অংশ এক পাত্র জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরে সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে নীচে উঠালে, নামালেই দেখবে, পাত্রের জল উপরে উঠে বাঁকানো নলটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।
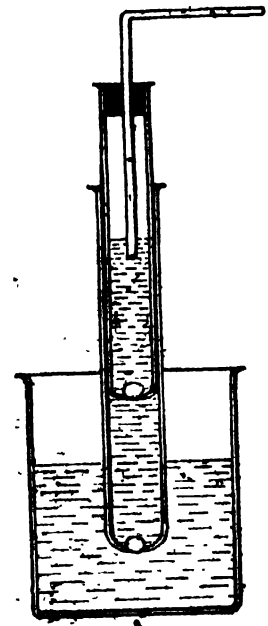
সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে টানলেই দেখবে, পাত্রের জল মোটা টিউবটার ছিদ্রের মুখের মার্বেলটাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকছে। এবার সরু টিউবটাকে নীচের দিকে চাপ দিলেই মার্বেলটা মোটা টিউবের ছিদ্রটাকে বন্ধ করে রাখবার দরুণ জল বেরিয়ে যেতে না পেরে সরু টিউবের ভিতরকার মার্বেলটাকে ঠেলে তার ভিতরে ঢুকে যাবে। দ্বিতীয় বার টেনে আবার চাপ দিলেই বাড়তি জলটা বাঁকানো নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। মার্বেল দুটা জল ঢোকবার ও বেরিয়ে যাবার পথে কপাট বা ভাল্‌ভের কাজ করছে। ১ নম্বরের ছবিটা ভাল করে দেখে নিলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারবে।

এবার সত্যিকার কাজ চালাবার মত আসল পাম্প তৈরী করবার ব্যবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি তোমাদের উৎসাহ থাকে তবে একটু চেষ্টা করে অনায়াসে কাজ চালাবার মত একটা ফোর্স-পাম্প তৈরী করে নিতে পার।

২ নম্বরের ছবিটা দেখ। এই ছবিটাতে একটা পাম্পেরই ১, ২, ৩ করে বিভিন্ন

কার্যপন্থা দেখানো হয়েছে। একটা লোহা বা পেতলের মোটা চোঙের নীচের দিকে গ-চিহ্নিত একটা পাইপ লাগানো আছে। পাইপটার শেষপ্রান্ত নীচু জায়গায় কোন পুকুর বা চৌবাচ্চার জলে ডোবানো। চোঙটার উপরের দিকে এক পাশে রয়েছে জলের কলের মত একটা খোলা-মুখ নল। উপরে পিচকিরির বাঁটের মত একটা লম্বা বাঁট। বাঁটের নীচের প্রান্তে এঁটে দেওয়া হয়েছে বেশ পুরু একখানা চাকৃতি। চাকৃতিটার মধ্যস্থলে বেশ মোটা একটা ছিদ্র। ছিদ্রটার উপরে খ-চিহ্নিতপুরু এক টুকরা চামড়া এক পাশে আঁটা রয়েছে। এক পাশে আঁটা থাকার দরুণ চাকৃতিটা কব্জা-আঁটা ডালার মত একদিকে একটু উঁচু, নীচু হতে পারে। চোঙের নীচের দিকে গ-চিহ্নিত নলটার মুখেও ক-চিহ্নিত এক টুকরা পুরু চামড়া কব্জার মত আঁটা রয়েছে।
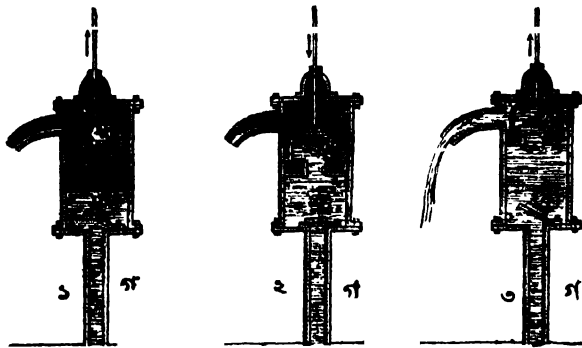
২নং চিত্র
ফোর্স-পাম্পের ভিতরের কৌশল দেখানো হয়েছে

১ নম্বরে, বাঁটটাকে উপরের দিকে টানা হয়েছে। ফলে, খ-চিহ্নিত চামড়ার ডালাটা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ক-চিহ্নিত চামড়ার ডালাখানাকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে পুকুরের জল গ-চিহ্নিত নল দিয়ে চোঙের মধ্যে ঢুকছে। ২ নম্বরে, বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ক-চিহ্নিত চামড়ার ডালাখানা নলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং খ-চিহ্নিত ডালাখানাকে খুলে জল উপরে উঠে যাচ্ছে। ৩ নম্বরে, বাঁটটাকে পুনরায় উপরের দিকে টানা হচ্ছে। ফলে চাকৃতির উপরের জলটা পাশের নল দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে। চামড়ার ডালার বদলে বড় মার্বেলও ব্যবহার করতে পারে কোন রকমে টিউবওয়েলের পাম্প বা স্টিরাপ পাম্প খোলা অবস্থায় দেখতে পারলে ব্যাপারটা আরও সহজে বুঝতে পারবে।

ক্যামেরার সাহায্যে ছবি আঁকবার সহজ উপায়

গত ডিসেম্বরের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' ছবি আঁকবার সহজ উপায়ের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম, তাতে এ বিষয়ে উৎসাহী কেউ কেউ জানিয়েছে—"ছবি আঁকবার যে কৌশলের কথা বলেছেন তা খুবই কার্যোপযোগী, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে তৈরী করে নেওয়া কষ্টকর। আমরা কষ্টকরে ওরূপ একটা যন্ত্র তৈরী করেছি বটে, কিন্তু যন্ত্রটা খুব সাধারণ

হলেও অনেকের পক্ষেই লেন্স, চোঙ প্রভৃতি সংগ্রহ করে তৈরী করা সহজ নয় কাজেই কোন কিছুর অবিকল ছবি আঁকবার জন্যে যদি আরও কোন সহজ উপায়ের কথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' মারফৎ জানিয়ে দেন তবে অনেকেরই উপকার হবে।"

নকল করবার কায়দায় কোন কিছুর অবিকল ছবি আঁকবার অন্য কোন সহজ উপায়ের কথা বলতে না পারলেও যন্ত্র তৈরী করবার ঝঞ্ঝাট নেই এমন আর একটা ব্যবস্থার কথা বলে দিচ্ছি। অবশ্য যাদের ছবি তোলবার ক্যামেরা আছে তারাই এ ব্যবস্থার সুবিধা পেতে পারে। ক্যামেরার পিছনের দিকে ২নং ছবির মত করে ত্রিকোণ একটা পাতলা কাঠের বাক্স বসাতে হবে। শক্ত পেষ্ট-বোর্ড বা প্লাই-উড থেকে সহজেই এরকমের একটা বাক্সের মত তৈরী করে নিতে পারবে। বাক্সটার মধ্যে যেন ক্যামেরার পিছনের দিকের খানিকটা অংশ ঢুকে গিয়ে শক্তভাবে বসতে পারে। বাক্সটার উপরে, ৩ নম্বরে ক্যামেরার পিছনের ঘষা কাঁচ খানা বসাবার ব্যবস্থা করবে। বাক্সটার নীচের টেরছা দিকটাতে কাঠ বা পেষ্ট-বোর্ড থাকবে না; সেখানে ওই রকম টেরছাভাবে ৪ নম্বরের মত একখানা আর্শি বা দর্পণ বসাতে হবে। দর্পণের দিকটা থাকবে ভিতরে। এবার যে কোন জিনিসের দিকে ক্যামেরা বসিয়ে ফোকাস করলেই দেখবে, উপরের ৩ নম্বরের ঘষা কাঁচখানায় তার পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠেছে। ঘষা কাচের উপর ট্রেসিং পেপার ফেলে অনায়াসেই অবিকল ছবি আঁকতে পারবে। ১নং ছবি দেখ। এতে তোমাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্স তৈরীর কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না। এই অতিরিক্ত ত্রিকোণ বাক্সটা ইচ্ছামত খুলে রাখতে পার আবার ছবি আঁকবার প্রয়োজন হলে ক্যামেরার সঙ্গে অনায়াসে বসিয়ে নিতে পার।
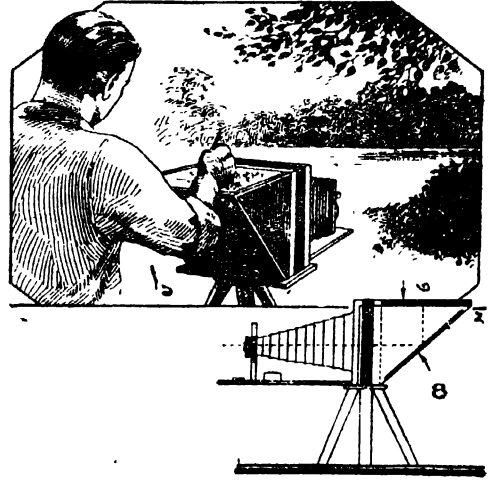
৩নং চিত্র
ক্যামেরা দিয়ে ছবি আঁকবার ব্যবস্থা

কাঠের আসবাব পত্র জোড়বার সহজ ব্যবস্থা

কাঠের আসবাব পত্র জুড়তে হলে আমরা সাধারণতঃ পেরেক বা স্ক্রু ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অনেক স্থলে পেরেক বা স্ক্রু ব্যবহার অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। পেরেক বা স্ক্রু ব্যবহার না করেও সহজ উপায়ে এবং যথেষ্ট পাকাপোক্তভাবে এসব জোড়বার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রয়োজনমত চওড়া এবং লম্বা পাতলা একখণ্ড লোহা বা অন্য কোন ধাতুর পাতকে
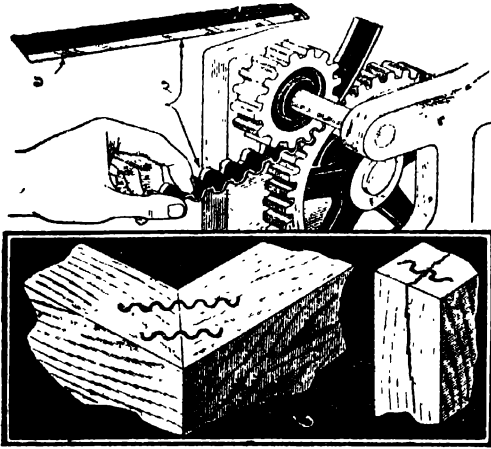
৪নং চিত্র
কাঠের জিনিস জোড়বার ব্যবস্থা

প্রথমতঃ 'ফাইল' বা উখায় ঘষে একটা ধার খানিকটা ধারালো করে নিতে হবে (চিত্রের ১নং দেখ)। তারপর লেদ বা অন্য যে কোন মেসিনের দুটো দাঁতওয়ালা চাকার মধ্যে পাতখানাকে একদিক দিয়ে ঢুকিয়ে চাকাটাকে ঘোরালেই দেখবে, সেটা ঢেউ খেলানো হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে (চিত্রের ২নং দেখ)। উপরের ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারবে। তার পর নীচের ছবির মত করে (চিত্রের ৩নং দেখ) ওই ঢেউ খেলানো পাতখানাকে হাতুড়ির ঘা দিয়ে কাঠের মধ্যে বসিয়ে দিলে পেরেক বা স্ক্রুর চেয়েও মজবুতভাবে জুড়ে থাকবে।

মোটা লোহার পাতকে ইচ্ছামত বাঁকানোর উপায়—

৫নং চিত্র
লোহার মোটা পাত বাঁকানোর ব্যবস্থা

ধর লোহার পাত বাঁকিয়ে তুমি ১নম্বরের ছবির মত চেয়ার বা টেবিল তৈরী করতে চাও। কিন্তু লোহার মোটা পাতকে কেমন করে সহজে বাঁকাতে পার? ২ নম্বরের ছবিটা দেখ। মাঝখানটা খানিকটা চেরা, এরকমের ছোট্ট এক টুকরা লোহার পাইপ যোগাড় কর। পাইপটা খাড়াভাবে 'ভাইসে' বেঁধে নিয়ে ছবির মত করে অতি সহজে যে কোন আকারে তুমি লোহা বা যে কোন ধাতুর পাতকে ইচ্ছামত বাঁকাতে পারবে। গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

মৌমাছির কথা

তোমাদের কারোর কাছেই বোধ হয় মৌমাছি অপরিচিত নয়। কিন্তু তাদের চাল-চলন সম্বন্ধে তোমরা কোন খবর রাখ কি? ছোট্ট প্রাণী হলেও এদের আচার ব্যবহার খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ফুল থেকে বিন্দু বিন্দু মধু নিয়ে মৌমাছি চাকে সঞ্চিত করে রাখে। রসনা পরিতৃপ্তির জন্যে মানুষ তাদের সঞ্চিত মধু কেড়ে নেয়। মধুর লোভে স্মরণাতীতকাল থেকেই মৌমাছির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। যথেচ্ছ মধু আহরণের উদ্দেশ্যে মানুষ মৌমাছির চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে নিয়ে ক্রমে মৌমাছি পালনের কৌশল আয়ত্ত করে। অবশেষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী থেকে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে মৌমাছির জীবনের অনেক অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এ বিষয়েই কয়েকটি কথা বলছি।

বিভিন্ন জাতীয় ছোট, বড়, মাঝারি প্রভৃতি রকমারি মৌমাছি দেখা যায়। প্রত্যেকটা চাকে সাধারণতঃ একটা রাণী, কিছু পুরুষ এবং অগণিত কর্মী-মৌমাছি থাকে। রাণী কেবল ডিম পেড়েই খালাস। ডিম সংরক্ষণ, বাচ্ছাদের লালন-পালন, রাণী ও পুরুষদের আহার জোগান,
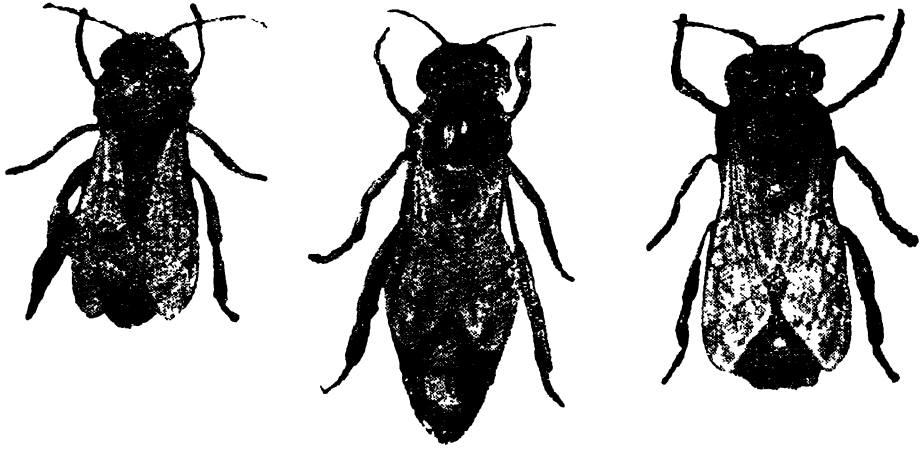
১নং চিত্র

বাঁদিক থেকে ডানদিকে—কর্মী, রাণী ও পুরুষ মৌমাছি

চাক নির্মাণ, মধু আহরণ প্রভৃতি যাবতীয় কাজই কর্মীরা করে থাকে। চাকের খোপে খোপে রাণী ডিম পেড়ে যায়। ডিম ফোটবার পর কর্মীরা 'রয়েল-জেলী' খাইয়ে বাচ্চাগুলোকে বড় করে তোলে। মধুর সঙ্গে ফুলের রেণু মিশিয়ে কর্মীরা 'রয়েল-জেলী' প্রস্তুত করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—'রয়েল-জেলীর' কম, বেশী পরিমাণের ওপরই স্ত্রী, পুরুষ বা কর্মীর উৎপত্তি নির্ভর করে। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই যে, একই রকমের ডিম থেকে মৌমাছিরা

সুবিধা বা ইচ্ছামত স্ত্রী, পুরুষ বা কর্মী মৌমাছি উৎপাদন করতে পারে। ইচ্ছা করলে তোমরা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পার। মৌমাছিরা কেমন করে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে সে সম্বন্ধে এতদিন সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। মৌমাছিদের কোন ভাষা আছে কিনা অথবা কেমন করে তারা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে—এ সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিস্ অনেকদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। তোমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে মৌমাছি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার মোটামুটি বিবরণ জানিয়ে দিচ্ছি।

ভন ফ্রিস্ বহুদিন মিউনিকে প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। যুদ্ধের সময় নাৎসীরা তাঁকে বিতাড়নের চেষ্টা করেছিল; কিন্তু জন-সংভরণ বিভাগ মৌমাছি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার মূল্য বুঝতে পারায় যুদ্ধ চলা পর্যন্ত তাঁর বিতাড়ণ স্থগিত রাখা হয়। বর্তমানে তিনি গ্রাজ নামক অষ্ট্রিয়ার একটি সহরে গবেষণা চালাচ্ছেন।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই ভন ফ্রিস্ মৌমাছি সম্বন্ধে গবেষণা করেআসছেন। বহুদিনের প্রচলিত বিশ্বাস ভেঙ্গে প্রথমেই তিনি প্রমাণ করেন যে, মৌমাছিরা রং-কাণা বা বর্ণান্ধ নয়। তাঁর প্রথমকার পরীক্ষাগুলোর ফলে তিনি বুঝেছিলেন, মৌমাছিদের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করবার জন্যে নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে; কারণ যখনই কোন মৌমাছি মধুর সন্ধান পায়, তার অল্প কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যায় যে, একই মৌচাক থেকে অসংখ্য মৌমাছি সেই খাদ্য সংগ্রহ করছে। কি ভাবে মৌমাছিরা খবরাখবর করে দেখবার জন্যে ভন ফ্রিস্ কৃত্রিম মৌচাক তৈরী করেন। মৌচাকের ভিতরটা কাঁচের প্লেটের মধ্যদিয়ে দেখা যায়। পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি দেখেছিলেন, মৌমাছিরা মধু অহরণযোগ্য কোন স্থান থেকে ফিরে এসে মৌচাকের উপর বিশেষ অংগভংগী করে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই অঙ্গভংগীকে তিনি মৌমাছির নাচ বলে বর্ণনা করেছেন। ভন ফ্রিস্ দু'রকমের নাচ দেখেছিলেন। ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকার নাচ এবং দেহ-আন্দোলিত নাচ। শেষোক্ত নাচে মৌমাছি তর নিম্নাংগটি এক পাশ থেকে আর এক পাশে খুব দ্রুত আন্দোলিত করে খানিকটা সোজা দৌড়ে যায় এবং তারপর একটা পাক খায়। এই নাচের ফলে চাকের অন্যান্য মৌমাছিগুলো তার দিকে আকৃষ্ট হয়। কতকগুলো মৌমাছি তখন নর্তকের খুব কাছে গিয়ে তার গতি-ভংগী অনুকরণ করতে থাকে। অবশেষে তাকে অনুসরণ করে সেই মধু আহরণে যাত্রা করে। খবরদাতা মৌমাছির গাত্রসংলগ্ন মধু অথবা রেণুর গন্ধে অন্যান্য মৌমাছিরাও বুঝতে পারে যে, কি ধরণের খাদ্য পাওয়া যাবে।

কতকগুলো পরীক্ষা করে ভন ফ্রিস্ বুঝতে পারলেন যে, মৌমাছির সংগৃহীত মধু বা গাত্রসংলগ্ন রেণু এদের সংবাদ আদান-প্রদানের একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরীক্ষার জন্যে তিনি মৌমাছিগুলোকে সুগন্ধি মধু এমন ভাবে খাইয়েছিলেন যে, তাদের গায়ে যেন কিছু না লাগতে পারে। তা সত্ত্বেও দেখাগিয়াছে যে, মধু সংগ্রহের স্থানে মৌমাছিগুলো ঠিকমতই

আনাগোনা করছে। অপর একটি পরীক্ষায় ফ্লক্স নামক ফুলের গন্ধযুক্ত মধু খাওয়ানো কতকগুলো মৌমাছিকে সাইক্লামেন ফুলের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাইক্লামেন ফুল থেকে চাকে ফিরে যাবার দূরত্ব কম হলে তাদের গায়ে ঐ ফুলের গন্ধ কিছু থাকতে পারে; কিন্তু দূরত্ব বেশী হলে সাইক্লামেনের গন্ধ সাধারণতঃ উবে যায়। দূরত্ব বেশী হওয়ায় এক্ষেত্রে মৌমাছিগুলো ফ্লক্স-এর গন্ধ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। গন্ধ থেকে মৌমাছিরা ঠিক বুঝতে পারে, কোন ফুলে ঐ গন্ধযুক্ত মধু পাওয়া যাবে। একবারের পরীক্ষায় একটি বাগানে মধুহীন হেলিক্রিসাম নামক একরকম ফুলে চিনির রস দিয়ে কয়েকটি মৌমাছিকে খাওয়ান
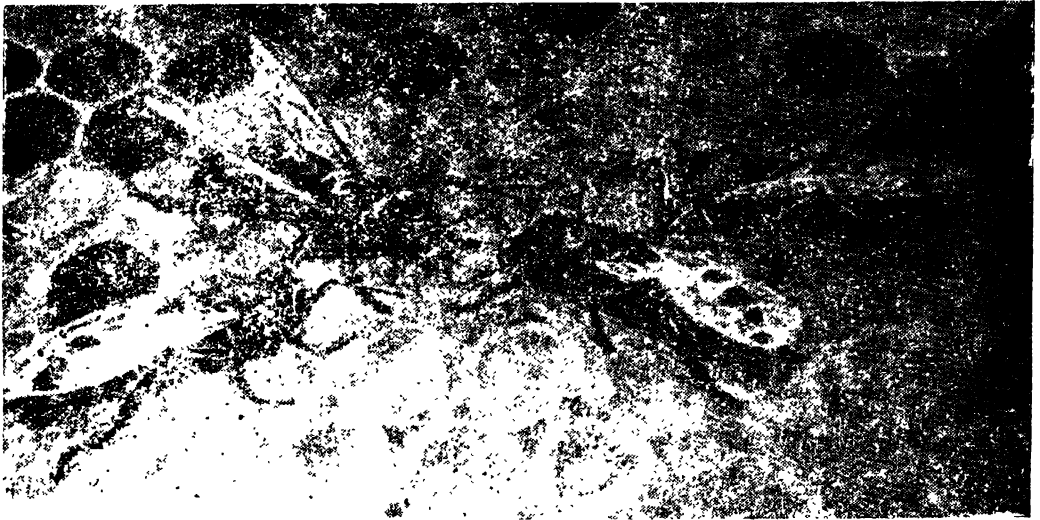
২নং চিত্র

চাকের মধ্যে মৌমাছিরা পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করছে।

হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথী মৌমাছিগুলো বাগানের প্রায় সাতশো বিভিন্ন জাতের ফুলগাছের মধ্যে হেলিক্রিসাম ফুলগাছ খুঁজে বের করেছিল।

মৌমাছির সংবাদ-নির্দেশক নাচের উৎসাহ নির্ভর করে মধু সংগ্রহের আয়াসের উপর। যখন কোন ফুলের মধু শেষ হয়ে আসে মৌমাছির নাচেও তখন ঢিমে তাল দেখা দেয়।

কিন্তু ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকার এবং আন্দোলিত নাচের দ্বারা মৌমাছিরা কি রকমের ভাব আদান-প্রদান করতে চায়, ভন ফ্রিস্ এই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো খাদ্যের রকমফেরের উপর নাচের রকমফের নির্ভর করে না, বোধহয় খাদ্য সংগ্রহের স্থানের দূরত্বের উপর এই নাচের তারতম্য ঘটে। এই অনুমানের বশবর্তী হয়ে তিনি পরীক্ষা সুরু করলেন। একটা মৌচাক থেকে দুদল মৌমাছি নিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে তাদের আহার সংগ্রহ করতে শেখালেন। একদল মৌমাছিকে নীলরঙে রঞ্জিত

করে চাক থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখান হলো। অপর দলটিকে লালরঙে রঞ্জিত করে ৩০ মিটার (প্রায় ৩২৮ গজ) দূরে খাবার দেওয়া হলো। ভন ফ্রিস্ দেখতে পেলেন—নীল মৌমাছিগুলো বৃত্তাকারে নাচছে, আর লাল মৌমাছিগুলো নাচছে আন্দোলিতভাবে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি নিকটবর্তী আহার-স্থানকে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল, ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে নীল মৌমাছিগুলো বৃত্তাকার নাচের পরিবর্তে আন্দোলিতভাবে নাচছে। বিপরীতক্রমে, লাল মৌমাছিগুলির আহার-স্থান দূর থেকে চাকের কাছে সরিয়ে আনায় দেখা গেল, তারা আন্দোলিত নাচের বদলে বৃত্তাকারে নাচছে।

এর ফলে মোটামুটি বোঝা গেল যে, নাচের দ্বারাই মৌমাছিরা আহার-স্থানের দূরত্ব অন্ততঃ কিছুটা বুঝতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মৌমাছিরা দু'মাইল দূর থেকেও খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে আনে। সুতরাং আরও সঠিক নির্দেশক সংবাদ মৌমাছিদের দরকার হয়। তাই ভন ফ্রিস্ মৌমাছির আন্দোলিত নাচকে আরও গভীর-ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। তারফলে তিনি দেখতে পেলেন যে, মৌমাছিরা নাচের সময় যে পাক খায় তার পৌনঃপুনিকতার দ্বারা দূরত্ব সম্বন্ধে একটা সঠিক নির্দেশ পায়। আহার্য যখন ১০০ মিটার দূরবর্তী স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়, সংবাদদাতা মৌমাছি তখন নাচের মধ্যে ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে প্রায় দশটি ছোট পাক দেয়। দু'মাইল দূরত্ব বোঝাতে হলে মৌমাছি ঐ সময়ের মধ্যে তিনটি বড় পাক দেয়।

এই নাচ শুধু আহার-স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধেই খবর দেয় না, দিকেরও সঠিক নির্দেশ করে। অপর একটি পরীক্ষা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয়েছে। একটি টেবিলের উপর মৌমাছির আহার্য রেখে তা একটি নির্দিষ্ট দিকে রাখা হয়েছিল এবং চারবার পরীক্ষার সময় সেটি চার রকমের দূরত্বে রাখা হয়েছিল। সমান ঘ্রাণ বিশিষ্ট কয়েকটি থালা অন্য তিনদিকেও রাখা হল। কম দূরত্বে (প্রায় ১০ মিটার) যখন আহার্য ছিল মৌমাছি-গুলো সমস্ত দিকেই সমানভাবে ঐ খাদ্য খুঁজেছিল। কিন্তু যখন ২৫ মিটার দূরে খাদ্য ছিল তখন মৌমাছিগুলো ঠিক দিকের সন্ধান পেয়েছিল এবং বহুসংখ্যক মৌমাছি খাবারের থালাটি ঘিরে ধরেছিল, অপরপক্ষে অন্যদিকের থালাগুলোতে মৌমাছির সংখ্যা ছিল অনেক কম।

যে সকল মৌমাছি খাদ্য-সংগ্রহে কৃতকার্য হয় তাদের গন্ধনিঃসারক গ্রন্থি থেকে আহার স্থানের বাতাসে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধ অনুসন্ধানকারী অন্য মৌমাছিকেও প্রকৃত স্থান খুঁজে বা'র করতে সাহায্য করে। এক একটা মৌচাকের মৌমাছিদের এক এক রকম বিশিষ্ট গন্ধ থাকে। এক গন্ধ বিশিষ্ট মৌমাছি অন্য গন্ধবিশিষ্ট মৌচাকে প্রবেশাধিকার পায় না। প্রত্যাবর্তনকারী মৌমাছিরা মৌচাকস্থ অন্য মৌমাছিকে আহার স্থানের নির্দেশ দেয় ওড়বার সময় সূর্যকে পূর্বদিকে রেখে। ভন ফ্রিসের মনে হলো

যে, মৌমাছির নাচ দিক নির্দেশ করে সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে। মৌমাছির নাচ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বুঝলেন যে, মৌমাছিরা ওড়বার সময় সূর্যের দিকে লম্ব ভাবে ওড়ে,

৩নং চিত্র

মৌমাছিরা মধুর সন্ধান পেয়েছে

যদিও দেখা যায় যে তারা শয়ান বা তির্যকভাবে উড়ছে। মৌচাক থেকে সূর্যকে যখন ঠিক আহার স্থানের উপরে দেখা যায় তখন মৌমাছিরা মাথা উপরের দিকে রেখে লম্বভাবে উড়ে যায়। আহার-স্থান বিপরীত দিকে থাকলেও তারা লম্বভাবে ওড়ে. তবে মাথা নীচের দিকে রেখে। যখন আহার্য সূর্যের সঙ্গে এক রেখায় থাকে না তখন মৌমাছিরা সূর্য এবং আহার-স্থানের মধ্যে তির্যক কোণে ওড়ে। সারাদিন সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গতি নির্দেশেরও পরিবর্তন ঘটে। মেঘে ঢাকা থাকলেও মৌমাছিগুলো সূর্যের অবস্থান টের পায়।

মৌচাকে পরিপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে মৌমাছির এই নাচ অনুষ্ঠিত হলেও, মৌমাছিরা সংবাদদাতা নর্তকের সঠিক অনুকরণ করে এবং সঙ্কেতগুলি পুরোপুরিই বুঝতে পারে। ফটোগ্রাফিক লাল আলোর সাহায্যে মৌচাকের ভিতরের ঘটনাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। এই লাল আলো মৌমাছির চোখে অদৃশ্য। পাহাড় বা উঁচু বাড়ী তাদের পথের মধ্যে পড়লে মৌমাছিরা কি করে তা দেখবার জন্য ভন ফ্রিস্ পরীক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, মৌমাছিগুলো পাহাড় বা উঁচু বাড়ী বেষ্টন না করে তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শুধু পোষা মৌমাছি নয়, সাধারণ মৌমাছির ক্ষেত্রেও একই রকমের ফল পাওয়া গেছে।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন ৫-৩০টায় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের বক্তৃতাগৃহে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। পরিষদের কর্মসচিব কর্তৃক প্রদত্ত গত বছরের কার্যবিবরণী এবং বর্তমান বছরের আনুমানিক বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়। তারপরে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং পরিষদের উদ্দেশ্যসাধনে সমবেত সভ্যবৃন্দের ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। পরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৪৯ সালের জন্যে কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে নির্বাচিত হন।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন (সহঃ সভাপতি), শ্রীসুবোধনাথ বাগচী (কর্মসচিব), শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅসীমকুমার রায় (সহঃ কর্মসচিব ', শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ)।

কার্যকরী সমিতি—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরবরণ কপাট, শ্রীদিবাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন মজুমদার, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীজীবনময় রায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীসুকুমার বসু, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়।

পরিষদের সারস্বত কার্যের সহায়তা করবার জন্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দেড় শতাধিক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে সারস্বত সংঘের সভাসদ নির্বাচন করা হয়। পরিষদের নিয়মাবলী চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে, শীঘ্রই উহা রেজেষ্ট্রী করা হবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ—নয়াদিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাষণে বলেন, —মানুষের অনুভূতিতে যা কিছু ধরা দেয়, সেই সংবাদকে সম্বল করে মানুষ পেতে চায় এই লীলাময় বিশ্বজগতের পরিচয়। বাইরের বিচিত্র প্রকাশকে বিজ্ঞানী তন্ন তন্ন করে জানতে চায় এবং সেই সূত্রে তন্ময় হয়ে অন্বেষণ করে জগতের মৌলিক রূপকে। প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করেছে জিজ্ঞাসু মনের কাছে দ্বৈতরূপে। শক্তি ও পদার্থ—জৈব ও অজৈবরূপে ছড়িয়ে আছে অজস্র প্রকারে আমাদের সামনে। কোথাও এই বস্তুরাশিতে আছে প্রাণস্পন্দন, আবার কোথাও তার প্রকাশ হয়েছে নিষ্প্রাণ নম্র, কঠিন, তরল বা বায়বীয় রূপে। পদার্থের এই বিভিন্ন রূপ ছাড়া প্রকৃতির আর যে পরিচয় মানুষ লাভ করে, তা হলো শক্তির খেলা। এই শক্তির পরিচয় পাই আমরা ধ্বনিতে, জলে, আলোতে বা বিদ্যুতের প্রবাহে। আলো বা উত্তাপ, বিদ্যুৎ বা ধ্বনির অভাবে বস্তুরাশির বৈচিত্র্য সম্ভব হতো না—নিত্য নব রূপান্তরে বস্তুজগৎ লীলাময় হয়ে উঠত না। যা বস্তু নয় অথচ যার সহায়তা না পেলে বস্তুরাশির রূপান্তর সম্ভব নয়, প্রকৃতির সেই প্রকাশাংশের নামকরণ হয়েছে শক্তি বা এনার্জি। পদার্থের সঙ্গে শক্তির সমন্বয় না হলে বস্তুজগতের প্রকাশ হতো নিশ্চল, নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডের সমষ্টিরূপে।

পদার্থের আছে ভর (মাস্) এবং এই ভরের উপরে মহাকর্ষের প্রভাবে পদার্থে হয় ওজনের সৃষ্টি। আলো, উত্তাপ, ধ্বনি, বিদ্যুৎ—এদের কারো ওজন

নেই। এরা কতকগুলো তরঙ্গস্পন্দন মাত্র। এরা হলো শক্তির প্রতীক। এই বস্তুজগতের মৌলিক উপাদানের সন্ধানে বিজ্ঞানী নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিরানব্বই প্রকার পরমাণু দ্বারা সকল প্রকার বস্তুরাশি সংগঠিত। সর্বাপেক্ষা কম ওজনের পরমাণু হাইড্রোজেন, আর সব চেয়ে ভারী ইউরেনিয়ামের পরমাণু। এই বিরানব্বই রকম পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের ফলেই পদার্থরাশির রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুদের মিলনে জল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড উত্তাপের বিকিরণ হয়। আবার এই জলের অণুকে আমরা ভাঙ্গতে পারি বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিয়ে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজের পরমাণুতে এই রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কোন ধ্বংস সাধিত হয় না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকটি পরমাণুর এক প্রকার বিচিত্র স্বভাবের সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম থেকে নিরন্তর এক প্রকার তেজোরশ্মি নির্গত হচ্ছে। বাইরের উস্কানি বা প্রতিবন্ধকতায় এই তেজ বিকিরণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই তেজ বিচ্ছুরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তেজ বিচ্ছুরণের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণু অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইহা ইউরেনিয়াম পরমাণুর স্বতঃস্বভাব। শুধু ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি আরো কয়েকটি মৌলিক পদার্থ স্বতঃতেজ বিচ্ছুরণ করে নিজেদের পরমাণু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই সকল তেজস্ক্রিয় পরমাণু ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়ে এবং ওজনে কমে যখন সীসার পরমাণুতে পরিণত হয় তখন তেজ বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যায়। এই আবিষ্কারে মৌলিক পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হলো। যাকে ভাঙ্গা যায় না, গড়া যায় না, এমন যে অপরিবর্তনশীল পদার্থকণা, তাকেই তো নাম দেওয়া হয়েছিল মৌলিক পদার্থের পরমাণু। সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়া এই মৌলিক পরমাণুদের ভাঙ্গন-গড়নের সহিত জড়িত নয়। কিন্তু এই ভাঙ্গন-গড়ন নূতন এক প্রচণ্ড শক্তিখেলার পরিচয় দিয়েছে। এই পরমাণুদের ভাঙ্গন থেকে যে তেজ বিকিরণ হয়, তার বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, তিন রকম রশ্মি দ্বারা এই তেজোরাশি সংগঠিত। একটিতে পাওয়া গেল পজিটিভ বিদ্যুৎসংযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু, দ্বিতীয়টিতে পাওয়া গেল ইলেকট্রন বা নিগেটিভ বিদ্যুৎকণা, তৃতীয়টিতে বিদ্যুৎহীন আলোকতরঙ্গ, রঞ্জনরশ্মি। যাঁরা রেডিয়ো-ভাল্‌ব দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে ভাল্‌বের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ ইলেকট্রনের সংখ্যা ও গতির উপর নির্ভর করে। আর অনেকেই হয়ত রঞ্জনরশ্মির দ্বারা জীবন্ত দেহের ভিতর কঙ্কালের ছবি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। নানা পরীক্ষার ফলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, যে বিরানব্বইটি মৌলিক পরমাণুকে আমরা জড় জগতের উপাদান বলে স্থির করেছিলাম, আসলে তারা মৌলিক নয়। এই তথাকথিত মৌলিক পরমাণু যখন ভাঙ্গে, তখন নূতন রকম কণার সন্ধান পাওয়া যায়—পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং নিগেটিভ বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রন, যার ওজন হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের দুহাজার ভাগের একভাগ। আর সন্ধান পাওয়া যায় নিউট্রন কণার যার ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটন যাকে আমরা নিউট্রন এবং পজিট্রনের সমষ্টি বলে ধরতে পারি। এই পজিটিভ বিদ্যুৎগুণবিশিষ্ট কেন্দ্রকে আচ্ছাদন করে আছে একটি নিগেটিভ বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন। ইহা ছাড়া আরও একটি কণার সন্ধান পাওয়া গেছে যা ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দুশো গুণ ভারী ; কিন্তু প্রোটনের তুলনায় অনেক হালকা। এর নাম হচ্ছে মেসন, ইহা পজিটিভ বা নেগেটিভ বিদ্যুৎগুণবিশিষ্ট হতে পারে

এবং বৈদ্যুতিক গুণহীনও হতে পারে। আজ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বিরানব্বইটি পরমাণুর অপরিবর্তনশীল মৌলিকত্ব অস্বীকার করছি এবং মেনে নিয়েছি যে, এই বিচিত্র ও অজস্র বস্তুরাশির মূলে আছে মাত্র কয়েকটি অতিমৌলিক কণা—ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন, নিউট্রন ও প্রোটন যাদের আমরা মৌলিক পরমাণু বলতাম, তাদের সংগঠনের নমুনাটি হচ্ছে এই রকম। এই তথাকথিত পরমাণুদের কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন, মেসন ও নিউট্রন কণার সমষ্টি। এই কেন্দ্রেই পরমাণুর সমস্ত ওজন নিবদ্ধ; এই কেন্দ্রকে আচ্ছাদন করে আছে ইলেকট্রনকণা। ইলেকট্রন কণার সংখ্যা কেন্দ্রীয় প্রোটন কণার সমান, সেজন্য পরমাণু বিদ্যুৎ গুণহীন। কিন্তু অনেক রকম উস্কানি দ্বারা ইলেকট্রন কণাদের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং ইলেকট্রনমুক্ত পরমাণু পজিটিভ বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন হয়। শুধু কেন্দ্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরমাণুর তুলনায় লক্ষ গুণের বেশী। বিজ্ঞানী অনেক নক্ষত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আভ্যন্তরিক উত্তাপের মাত্রা এখন জানতে পেরেছেন এবং এই চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যে, কোন কোন নক্ষত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর লক্ষগুণ ও তাপের মাত্রা প্রায় এক কোটি ডিগ্রি। এই অত্যুগ্র উত্তাপের উস্কানিতে সব নক্ষত্রেই পরমাণু কেন্দ্রদল ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। সাধারণতঃ সর্বলঘু হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন কণাকে আবেষ্টন করে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন কণা। আবার ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে আছে বিরানব্বইটি প্রোটনকণা। তথাকথিত মৌলিক পরমাণুর রাসায়নিক গুণ নির্ধারণ করছে কেন্দ্র-বহির্ভূত এই ইলেকট্রন কণার সংখ্যা এবং সন্নিবেশ ভঙ্গী। কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিউট্রনের সংখ্যা কমবেশী হলে পরমাণুর ওজন বদলে যায়; কিন্তু বাইরের ইলেকট্রনের সংখ্যা ও সন্নিবেশ না বদলালে তার রাসায়নিক গুণের কোন পার্থক্য হয় না। তাই বিভিন্ন ওজনের পরমাণু সমগুণান্বিত হতে পারে আবার সমওজনের পরমাণুর বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন হতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানলোকে শক্তি ও পদার্থের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। পরবর্তী গবেষণায় আলোকরশ্মির চাপ দিবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে, প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানী কম্পটন আবার নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেছেন, আলোকরশ্মির ভরও (মাস্) আছে, ভরবেগও (মোমেনটাম) আছে। আলোকরশ্মির যদি ভর থাকে, তবে মহাকর্ষের প্রভাবে আলোকতরঙ্গের চলার পথও বদলে যাবে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যদেহের পাশ দিয়ে যে আলোকরশ্মি পৃথিবীর দিকে আসে তা সূর্যের আকর্ষণে কতকটা বেঁকে যায়। তাই যদি হলো তবে পদার্থ থেকে শক্তির স্বাতন্ত্র্য রইল কোথায়? তাই নূতন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানতে হচ্ছে, শক্তিতে পদার্থের গুণ আছে অর্থাৎ বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান বহু নয়, এক এবং শক্তি ও পদার্থ এই অদ্বিতীয় উপাদানের দ্বয়ী প্রকাশ মাত্র।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আবার প্রমাণ করলেন যে, শুধু তেজোরশ্মির ভর বা ওজন আছে তা নয়—যখন কোন পদার্থপিণ্ডে গতিসঞ্চার হয় তখনই তার ভর বা ওজনও বেড়ে যায়। সাধারণ গতিবেগে চলনশক্তির পরিমাণ এত অল্প যে, পদার্থের দেহপিণ্ডে ভরবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু যখন এই গতি আলোকের গতির কাছাকাছি যায়, তখন ভরবৃদ্ধির লক্ষণ ধরা পড়ে। তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম পরমাণু যে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ করে সেই ইলেকট্রনের গতিবেগের সঙ্গে তার ভরের মাত্রা বদলে যায়। আজ আমরা স্বীকার করি যে, কোন অতি-মৌলিক কণা যদি আলোকরশ্মির গতিবেগ পায়, তবে তার দেহে অনেক ভরবৃদ্ধি হবে। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, কোন কণাই আলোকের গতিবেগের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

শক্তিতে পদার্থের গুণ আছে, এই সিদ্ধান্ত করে আইনষ্টাইন ক্ষান্ত হন নি—তিনি শক্তি ও পদার্থের পারস্পরিক অদলবদলের একটি সহজ সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন—শক্তির সৃষ্টি বা লোপের সঙ্গে পদার্থের লোপ বা সৃষ্টি সর্বদাই জড়িত। কোন পদার্থ লোপ পেলে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ পাওয়া যাবে ঐ, পদার্থের ভারকে আলোকের গতিবেগের বর্গফল দিয়ে গুণ করে। বার লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তির উদ্ভব হয় কোন এক সের পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে সেই পরিমাণ শক্তির জন্ম হয়।

প্রশ্ন উঠে, বিশ্বজগতে পদার্থ কি কোথাও স্বতঃই শক্তিতে পরিণত হচ্ছে? চারিটি সর্বলঘু হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে যদি একটি হিলিয়াম পরমাণুর জন্ম হয়, তবে প্রায় শতকরা আধভাগ পদার্থের লোপ হবে এবং এই লুপ্ত পদার্থের প্রকাশ হবে শক্তিরূপে। হাইড্রোজেন থেকে যদি এক সের হিলিয়ামের জন্ম হয় তবে যে শক্তির উদ্ভব হয় তা এক সের কয়লা পোড়ালে যে উত্তাপ হয়, তার দুই কোটী গুণ। সূর্যদেহে ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চলছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্তন হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণুতে। সূর্যের অভ্যন্তরে তাপের মাত্রা হচ্ছে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি। আমাদের এই পৃথিবী সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই শত কোটি বৎসর ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এই সুদীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী সূর্য থেকে যে তাপ পাচ্ছে, তার কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য হয় নি। সৌরদেহের বিপুল উত্তাপে হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন পরমাণুরা ইলেকট্রন বিযুক্ত হয়ে পরমাণুর কেন্দ্ররূপে পরস্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাত করে এবং এর ফলে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সৃষ্টির সময় যে শক্তির উদ্ভব হয় সেই তেজোশক্তির পরিমাণ বিজ্ঞানী বেথে স্থির করেছেন এবং কোটি কোটি বৎসর ধরে মহাদ্যুতি সূর্যদেবের এই তেজ বিকিরণের সমস্যা সমাধান করেছেন। পদার্থ ধ্বংস হলে যে শক্তির প্রকাশ হয় সে শক্তিকে যন্ত্র পরিচালনার কাজে লাগাতে পারলে শিল্প-জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মানব সমাজের গঠনমূলক কাজে প্রয়োগ না করে পরমাণু-ভাঙা শক্তিকে চরম বিধ্বংসকারী বোমা প্রস্তুতের কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে।

দুই লক্ষ মণ কয়লা পুড়ে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, এক সের ইউরেনিয়াম ভাঙনের ফলে সেই পরিমাণ শক্তির জন্ম হওয়া সম্ভব। এই পরমাণু-ভাঙা শক্তির প্রয়োগ হয়েছে নূতন বোমায়। ভাঙনের সময় এই বোমার ভিতরে কোটি কোটি ডিগ্রি উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং এই বিপুল উত্তাপের ফলে জাপানের যুদ্ধের শেষভাগে এক একটি বোমাতে এক একটি সহর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে পরমাণু-ভাঙা এই শক্তি গঠনমূলক কাজে প্রযুক্ত হয়ে মানবসমাজের কল্যাণসাধন করবে, না পরমাণু-বোমারূপে পৃথিবীতে চরম ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করবে—আজ মানবসমাজের সামনে এই সঙ্কটাকীর্ণ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে।

এই বিশ্বজগতের অন্তিম স্বরূপ সন্ধানে বিজ্ঞানী আজ উপলব্ধি করছেন যে, শক্তি ও পদার্থ অভিন্ন। বিশ্বজগতের এই একক অন্তিম পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান আরো জানিয়ে দিয়েছে—বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের অন্তিম রূপ হলো বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি পদার্থের মৌলিক উপাদানের প্রকৃতি ও পরিচয় পেলেই বিশ্বজগতের অন্তিম রহস্য জানা সম্ভব। এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞানী আরো আবিষ্কার করেছেন যে, ইলেকট্রন কখনও তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায় আবার কখনও কণারূপে প্রকাশ পায়। ইলেকট্রনের কণা-রূপও সত্য, তরঙ্গরূপও সত্য। শক্তি ও পদার্থ অন্তিম পরিচয়ে ভিন্ন নয়। আবার অন্তিম রূপায়ণে শক্তি ও পদার্থ—কণাও বটে তরঙ্গও বটে। একই আদি উপাদানের এই দ্বৈত প্রকাশভঙ্গী উপলব্ধি করে বিজ্ঞানী-মন আজ বিস্ময়াপ্লুত ও স্তম্ভিত।

'একমেবাদ্বিতীয়ম' ভারতীয় চিন্তাধারার এই আদিম সূত্রের আমরা আজ নতুন ব্যাখ্যা পেয়েছি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রথম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের বিবরণী

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি' ৪৯ তারিখ অপরাহ্ণ ৫-৩০ টার সময় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের বক্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় একশত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় পরিষদের সাধারণ সদস্য জ্যোতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

কার্য-বিবরণী—১৯৪৮ সালের উদ্বৃত্ত পত্র—১৯৪৯ সালের বাজেট

তারপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসুবোধনাথ বাগচী ১৯৪৮ সালের কার্যবিবরণী উপস্থিত করেন এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গত বৎসরের পরিষদের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত উদ্বৃত্ত পত্র ও বর্তমান বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণ

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উপযোগিতা বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে সদস্যগণের সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান।

—১৯৪৯ সালের কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি নির্বাচন

পরিষদের ১৯৪৯ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়:—

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃ সভাপতি—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
কর্মসচিব—শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
সহঃ কর্মসচিব—শ্রীঅসীমকুমার রায়
শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্যকরী সমিতির সদস্য—

১। শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
২। শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪। শ্রীগৌরবরণ কপাট
৫। শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়
৬। শ্রীমধুসূদন মজুমদার
৭। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
৮। শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়
৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস
১০। শ্রীজীবনময় রায়
১১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
১২। শ্রীসুকুমার বসু
১৩। শ্রীপরিমল গোস্বামী
১৪। শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়

পরিষদের নিয়মাবলী

'নিয়মাবলী উপসমিতি' কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সংশোধন প্রস্তাব সাপেক্ষভাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সংশোধনগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল—

১। ৮ (ক) সংখ্যক নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে "প্রথম কিস্তি অন্যূণ পঞ্চাশ টাকা হইতে হইবে।" যোগ করা হয়।

২। ১৫ (ক) নিয়মে তৃতীয় বাক্যাংশের "প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি এবং" এই কথাগুলি বাদ দেওয়া হয়।

৩। ১৫ (খ) সংখ্যক নিয়ম সংশোধনান্তে এইরূপ দাঁড়ায়—

কার্যকরী সমিতিও ১লা জানুয়ারীর পরের কোন অধিবেশনে কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলীর প্রত্যেক পদে নির্বাচনের জন্য একটি করিয়া নাম এবং কার্যকরী সমিতির সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচনের জন্য এক বা একাধিক নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন।"

৪। ১৬নং নিয়মে "তিনবার" এর স্থলে "পাঁচবার" করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫। ২৫ (গ) সংখ্যক নিয়মের শেষ লাইনে "অনুমোদনের জন্য" এই কথার বদলে "বিজ্ঞপ্তির জন্য" এই পাঠ গৃহীত হয়।

৬। ২৫ (খ) নিয়মের দ্বিতীয় লাইনে "একাধিক শাখা সংঘের বা উপসংঘের" স্থলে "একাধিক শাখা সংঘের বা একাধিক উপসংঘের" এই পাঠ গৃহীত হয়।

৭। ২৫ (ঘ) নিয়মের শেষে "প্রতিবর্ষে সারস্বত সংঘের অন্যূণ ডুইটি বিষয়ী অধিবেশন হইবে।" এই কথাটি যোগ করা হয়।

অতঃপর নিয়মাবলী সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব ডুইটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

(ক) এই সভায় গৃহীত নিয়মাবলী ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে বলবৎ হইবে। পূর্ব নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিষদের সমস্ত নির্বাচন ও কার্যকলাপ অত্রগৃহীত নিয়মাবলী অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে; এবং আবশ্যকস্থলে যথাযথ ব্যবস্থা করিবার অধিকার কার্যকরী সমিতির থাকিবে।

(খ) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ নং আইন অনুযায়ী এই সমিতি রেজেষ্টারী করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হইবে এবং এতদর্থে বর্তমান নিয়মাবলীর আবশ্যক ধারাগুলি স্মারকলিপির অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার কার্যকরী সমিতিকে দেওয়া হইল।

সারস্বত সংঘ

ইহার পর ১৯৪৮ সালের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে মন্ত্রণাপরিষদের সভাসদরূপে নির্বাচিত মহোদয়গণকে এবং নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি সারস্বত সংঘ গঠিত হয়।

১। শ্রীরাজচন্দ্র বসু, ষ্টেটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা। ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ১, কোরিস চার্চ লেন, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ, ইঞ্জিনিয়ার, কাশীপুর কোং লিঃ, পোঃ আলমবাজার, জেঃ ২৪ পরগণা। ৪। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা—১২। ৫। শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ৬। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, ১১২, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। ৭। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১।১।এ, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ৮। শ্রীসুবোধচন্দ্র লাহিড়ী, ৫৬এ, ক্রীক রো, কলিকাতা—১৪।

(মন্তব্য—নিয়মানুযায়ী কার্যকরী সমিতির সকল সভ্যই পদাধিকারবলে সারস্বত সংঘের সভাসদ হইবেন।)

সভায় স্থির হয় যে, সারস্বত সংঘের সভাসদগণের পরিষদের সভ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যাহারা এ পর্যন্ত সদস্য হন নাই তাহাদিগকে পুনরায় স্মারকপত্র পাঠাইয়া সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

হিসাব পরীক্ষক

অতঃপর ১৯৪১ সালের জন্য পরিষদের হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন রেজিষ্টার্ড হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত করার প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, এবং রেজিষ্টার্ড অডিটর শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে এই কার্যে নির্বাচিত করা হয়।

অনুমোদক মণ্ডলী

সর্বশেষে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত পাঁচ জন সদস্য লইয়া অনুমোদক মণ্ডলী গঠন করা হয়—

শ্রীপরিমল কান্তি ঘোষ, শ্রীঅরুণকুমার সেন, শ্রীঅশোককুমার বসু, শ্রীরমণীমোহন রায়, শ্রীপরিমল বিকাশ সেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গত বৎসরের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিষদের সভাপতি ও কর্মসচিব মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

স্বাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(সভাপতি)

স্বাঃ সুবোধনাথ বাগচী
(কর্মসচিব)

স্বাঃ পরিমলকান্তি ঘোষ
,, পরিমলবিকাশ সেন
,, অশোককুমার বসু
,, রমণীমোহন রায়
,, অরুণকুমার সেন

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | এপ্রিল—১৯৪৯ | চতুর্থ সংখ্যা

দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের অপরিবর্তনীয় মাপকাঠি

শ্রীহীরালাল রায়

দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব মাপবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কোন প্রকার যুক্তি বা সঙ্গতি নাই। অনেক পরিবর্তনের পরে এখন প্রধানতঃ দু'রকম মাপকাঠির চলন আছে। ইংরেজীভাষী লোকদের নিজেদের এবং তাদের অধিকৃত দেশে ইঞ্চি, ফুট, গজ ইত্যাদির মাপ প্রচলিত এবং অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই মিটারের ব্যবহার চলছে। প্রায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে স্বীকৃত হয় যে, উত্তর মেরু থেকে প্যারিসের উপর দিয়ে বিষুবরেখা পর্যন্ত দ্রাঘিমার যে অংশ, তার এক কোটি ভাগের এক ভাগকে 'মিটার' বলা হোক এবং এটাই হবে দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি। এই মিটারের দশমীকরণ দ্বারাই সমস্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে দৈর্ঘ্য, বর্গফল এবং ঘনফল প্রকাশ করা হয়। ইংরেজী বর্জিত পৃথিবীতেও এই মাপকাঠিই প্রচলিত।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন বিজ্ঞানী প্যারিসে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন—যেহেতু কোন নৈসর্গিক কারণে—যেমন, কোন ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর আকার এবং পরিমাণের পরিবর্তন হয়ে মিটার পৃথিবীর দ্রাঘিমার চতুর্থাংশের কোটি ভাগের একভাগ না-ও থাকতে পারে, সুতরাং মিটারের দৈর্ঘ্য কোনও অপরিবর্তনীয় দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনা করে রাখা হোক। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রাকৃতিক মাপকাঠির পরামর্শ দিলেন এবং অনেকে শূন্যে কোন আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে মাপকাঠি করতে বল্লেন। কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপতেও কোন প্রকার ভুল যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক বৎসর পর্যন্ত সন্দেহাতীত কোন প্রণালী পাওয়া যায়নি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাইকেল্‌সন্ ও মর্লি নামক দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী পৃথিবী এবং ইথারের আপেক্ষিক গতি নির্ণয়ের জন্যে যে অপ্‌টিক্যাল ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন তার দ্বারাই আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা হয়।

যদিও প্রথমে মিটারের দৈর্ঘ্য প্যারিসের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমা গিয়েছে তার কোটি ভাগের একভাগ হওয়ার কথা ছিল তথাপি প্রচলিত মিটার একটি প্ল্যাটিনাম দণ্ডের দৈর্ঘ্যের সমান ছিল। দুই-মাপে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমানে প্রচলিত আন্তর্জাতিক প্রোটোটাইপ মিটারের জন্ম হয়। এর সঙ্গেও পূর্ব প্রচলিত

প্ল্যাটিনাম দণ্ডের দৈর্ঘ্যের বিশেষ প্রভেদ নেই। কিন্তু এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হলো তা হচ্ছে—ওজন ও মাপের আন্তর্জাতিক সংঘে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম দণ্ডে যে দুটি দাগ অঙ্কিত আছে তাদের মধ্যবিন্দুর মধ্যে বরফ গলার তাপমানে যে দূরত্ব তাই আন্তর্জাতিক প্রোটোটাইপ মিটার।

যদিও এই দৈর্ঘ্য নিপুণভাবে নির্ধারিত হলো তথাপি কোন ফিজিক্যাল কনষ্ট্যাণ্ট অর্থাৎ প্রাকৃতিক মাপকাঠির সঙ্গে এর কোন নিকট সম্পর্ক রইলো না।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাইকেল্‌সন্ ও মর্লি আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপবার প্রণালী বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং পারদের উজ্জ্বল সবুজ আলোক রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে মাপকাঠি করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু মাইকেল্‌সন্ যখন বাস্তবিক তাঁর ইণ্টারফেরো-মিটার দিয়ে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপতে চেষ্টা করেন তখন দেখলেন যে, পরমাণুরা যে আলো বিকিরণ করে তার কোন রেখাই সাদাসিধে মনোক্রোমেটিক অর্থাৎ একবর্ণ নয়। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে, পারদের বর্ণালীর উজ্জ্বল সবুজ রেখাও অত্যন্ত জটিল—তা একেবারেই একবর্ণী নয়

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাইকেল্‌সন্ প্রথম মিটার ও ক্যাড্‌মিয়ামের বর্ণালীর লোহিত রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে নির্ভুল সম্বন্ধ নিরূপণ করেন। তার পরে এপর্যন্ত আরও আটবার বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। ১৯০৭ সনে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রধান মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত হয়। এই দৈর্ঘ্য হচ্ছে $১০^{-১০}$ মিটার এবং একেই অ্যাংষ্ট্রোম নাম দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, অণু সমূহের গড় ব্যাসও এক অ্যাংষ্ট্রোম্। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই মাপকাঠিই বিজ্ঞানীরা দৈর্ঘ্য জ্ঞাপনে ব্যবহার করছেন।

এপর্যন্ত নয় বার ক্যাড্‌মিয়ামের বর্ণালীর লোহিত রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা হয়েছে। মাইকেল্‌সনের পরীক্ষায় এর পরিমাণ সাধারণ বাতাসে ছিল ৬৪৩৮.৪৬৯১ অ্যাংষ্ট্রোম। অন্য যাঁরা এই পরীক্ষা করেছেন তাঁদের ফল ও গড়ফলের মধ্যে প্রভেদ সত্তর লক্ষের মধ্যে এক। জড় পদার্থ দিয়ে যে মাপকাঠি তৈরী হয় তার পরিমাণে কোন বিকৃতি ঘটবে না, এ কথা জোর করে বলা যায় না। এই জন্যেই এই বিশেষ আলোক-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে মাপকাঠি করা হয়েছিল।

ষাট বছর আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, বর্ণালীর ভিন্ন ভিন্ন রেখা একবর্ণী। মাইকেল্‌সন্ই প্রথমে তাঁর ইণ্টারফেরোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করে এই ধারণা যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করেন। প্রাকৃতিক পারদের উজ্জ্বল সবুজ রেখাকে তিনি মিশ্রবর্ণরূপে দেখতে পান এবং ক্যাড্‌মিয়ামের বর্ণালীর লোহিত রেখাতে সকলের চেয়ে কম মিশ্রণ ধরা পড়ে। সেইজন্যে এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকেই তিনি মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাইকেল্‌সনের এই আবিষ্কারের অর্থাৎ বর্ণরেখার মিশ্র প্রকৃতির কেউ কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি। মৌলিক পদার্থের আইসোটোপের অস্তিত্ব ধরা পড়ল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু যত দিন না মৌলিক পদার্থের বর্ণালীর কোয়াণ্টাম থিওরী প্রকাশিত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত মাইকেল্‌সনের আবিষ্কারের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ১৯৩১ সাল এর প্রকৃত কারণ জানা গিয়েছিল। গাণিতিক হিসাবে থিওরীতে এবং বীক্ষণাগারের পরীক্ষা, উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে, প্রাকৃতিক পারদের উজ্জ্বল সবুজ রেখা ষোলটি বিভিন্ন অংশে গঠিত।

প্রাকৃতিক পারদে সাতটি আইসোটোপ আছে। অক্সিজেনের তুলনায় তাদের ভর-সংখ্যা ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪। পারদের বর্ণালী-রেখায় এদের সকলেরই দান আছে, কাজেই মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা খুবই জটিল এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়।

বর্ণালী-রেখায় আপত্তিজনক মিশ্রণ যদি

বাদ দিতে হয় তবে পারদের সেই আইসোটোপই নেওয়া উচিত যার ভর-সংখ্যা যুগ্ম। কেবলমাত্র সম্প্রতি এই রকম আইসোটোপ প্রাকৃতিক পারদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু তাও বর্ণালী পরীক্ষা করার মত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়নি।

কিন্তু অন্য উপায়ে ১৯৮ ভর-সংখ্যার পারদ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭ ভর-সংখ্যার সোনা থেকে এই বিশেষ পারদ পাওয়া যায়। ১৯৩৪ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফার্মি এবং তাঁর সহকর্মীরা ঘোষণা করেন যে, সোনাকে যদি নিউট্রন বুলেট দ্বারা আঘাত করা যায় তাহলে সোনার পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন যুক্ত হয়ে প্রথমে তীব্র তেজস্ক্রিয় সোনা পাওয়া যায়; তা ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে হতে পারদ ১৯৮তে পরিণত হয়। এই পারদের পরিবর্তন ঘটে না, ইহা স্থায়ী। কিন্তু এভাবে যে পারদ ১৯৮ পাওয়া গিয়েছিল তার পরিমাণ এত কম যে, তেজস্ক্রিয়া ভিন্ন তার অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফার্মি বেরিলিয়াম চূর্ণ এবং রেডনকেই নিউট্রনের উৎস ভাবে নিয়েছিলেন; এই প্রণালীতে বেশী পরিমাণে পারদ ১৯৮ পাওয়া সম্ভবপর নয়। ১৯৪০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালভারেজ সাহেবের সহিত প্রস্তাব করেন যে, সাইক্লোট্রন প্রসূত নিউট্রনগুলি যদি সোনার উপর বর্ষিত হয় তবে অধিক পরিমাণে পারদ ১৯৮ পাওয়া যেতে পারে এবং তা দিয়ে এর গুণ পরীক্ষা সম্ভব হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হলো। এক মাস অনবরত এক আউন্স সোনার উপর সাইক্লোট্রন-প্রসূত নিউট্রন-বুলেট বর্ষণ করে যেটুকু পারদ ১৯৮ পাওয়া গেল তাই দিয়ে ইলেক্ট্রোড-বিহীন একটি অতিক্ষুদ্র বাতি তৈরী হলো এবং তা মাত্র পাঁচ মিনিট আলো বিকিরণ করলো। এই পাঁচমিনিট আয়ুষ্কালের মধ্যেই তার সবুজ আলো রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে, তার গঠন একেবারেই জটিল নয়।

এই পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে হ্বিন্‌স এবং অ্যালভারেজ আর একটু দীর্ঘায়ু পারদ-১৯৮ বাতি তৈরী করতে চাইলেন। যুক্তরাজ্যের ন্যাশন্যাল্ ব্যুরো অফ ষ্ট্যাণ্ডার্ড্‌স্ এই উদ্দেশ্যে চল্লিশ আউন্স বিশুদ্ধ সোনা ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দিলেন এবং তার উপর এক বৎসর বা ততোধিককাল সাইক্লোট্রন-প্রসূত নিউট্রন-বুলেট বর্ষণ করতে অনুরোধ করলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাজ্য ব্যাপৃত হয়ে পড়লো এবং ক্যালিফোর্ণিয়ায় একাজ আর হলো না। ১৯৪৫ সালে এই চল্লিশ আউন্স সোনা ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে টেনেসিতে পাঠানো হয়। এক বৎসর পরে নিউট্রন বুলেট-বিদ্ধ এই সোনা থেকে ন্যাশন্যাল্ ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ড্‌স্ তির্যক পাতন দ্বারা সাট মিলিগ্রাম পারদ উদ্ধার করেন—যা বিবিধ পরীক্ষায় বিশুদ্ধ পারদ ১৯৮ বলে প্রমাণিত হয়। এই পারদ দ্বারা কয়েক রকমের বাতি তৈরী করা হয়েছে এবং কোন্‌টি থেকে বিশুদ্ধতম সবুজ আলোর রেখা পাওয়া যায় তার পরীক্ষা চলছে।

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রকম কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় সহজতম বাতি ইলেক্ট্রোড বিহীন হওয়া উচিত। কাচের বা কোয়ার্ট্‌জের নল বায়ুবিহীন করে তাতে পারদের বাষ্প খুব কম চাপে প্রবেশ করিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। এই পারদ বাষ্পপূর্ণ নল যদি উচ্চ কম্পনের স্থির-তড়িৎ-ক্ষেত্রে ধরা যায় তাহলে পারদ-বাষ্প থেকে তার পারমাণবিক আলোক বিকিরণ আরম্ভ হয়। এরকম তরল বাষ্প এবং কম তাপমানে আলোক বিকীর্ণ হলেই তীক্ষ্ণ আলোকরেখা পাওয়া যায়। এখন এই প্রকারে প্রাপ্ত বিশুদ্ধতম সঙ্গীবিহীন আলোক রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার জন্যে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত মিটারের বর্জন এই সকল পরীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। সকলেই স্বীকার করেন যে, মিটার এবং তার দশমীকরণ ব্যবস্থা বিজ্ঞানের প্রচলনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং এই ব্যবস্থা এখনও চলবে। গত মহাযুদ্ধের সময় সর্বত্র বোমা-বর্ষণ চলেছিল এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধে কেবল মাত্র এশিয়ায় নয় ইউরোপেও আণবিক বোমা বর্ষণ চলতে

পারে ; তখন সকল ন্যাশন্যাল্ ব্যুরো অফ স্ট্যাণ্ডার্ড্সে রক্ষিত আন্তর্জাতিক প্রোটোটাইপ মিটার সমূহ বিনষ্ট হতে পারে। সুতরাং এমন কোন মাপকাঠি নেওয়া উচিত যার পরিবর্তন হবে না। এই উদ্দেশ্যেই মাইকেল্সন্ ক্যাড্মিয়ামের আলোক-রেখা বেছে নিয়েছিলেন। এই আলোক-রেখা জটিল (নানা আলোক-রেখার সমষ্টি) প্রমাণিত হওয়ায় বিশুদ্ধ একক-রেখার অনুসন্ধান করতে গিয়েই পারদ ১৯৮ এর আলোক রেখা নিয়ে পরীক্ষা চলছে। একটি ধাতুদণ্ডের দুটি রেখার মধ্যবিন্দুর দূরত্বকে দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে নেওয়ায় অনেক আপত্তি আছে কোন অঙ্কিত রেখাই জ্যামিতিক রেখা নয় ; তার প্রস্থ আছে ধাতু-দণ্ডের উপর অঙ্কিত এই দৈর্ঘ্যকে একেবারে অপরিবর্তনশীল বলা যায় না। মানুষের মন স্বকৃত কৃত্রিম পরিবেষ্টনীর মধ্যেও প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে এবং নির্ভুল মানদণ্ড পাওয়ার জন্যেই পারদ ১৯৮ এর সবুজ আলোক-রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে দূরত্বের মাপকাঠি করার প্রস্তাব হয়েছে। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় ৫'৪৬১ অ্যাংষ্ট্রোম্ অথবা $৫'৪৬১ \times ১০^{-১০}$ মিটার।
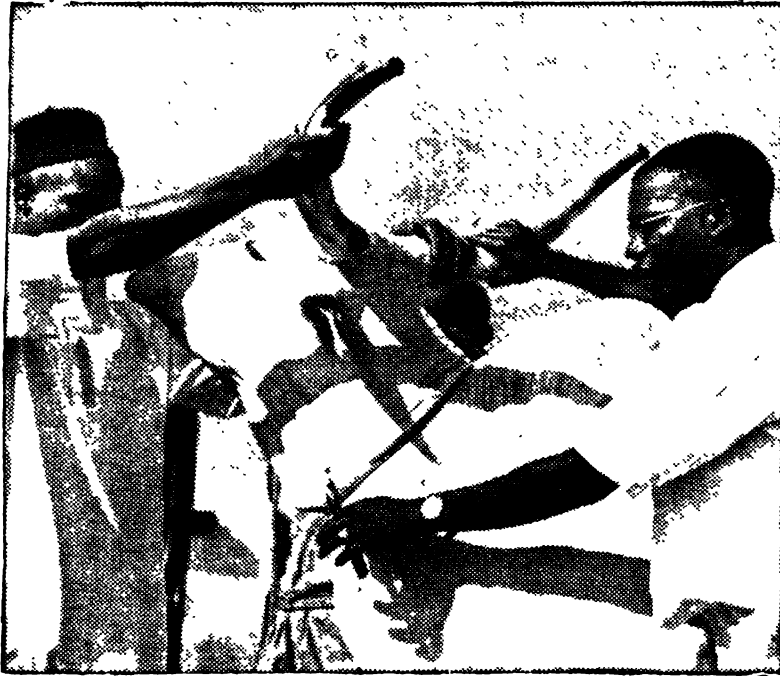
গরুকে অ্যান্ট্রিসাইড্ ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে।

আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চলে সিসি অথবা সেট্সি মক্ষিকার (Tsetse) উপদ্রব এতদূর বেড়ে গেছে, যার ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের গবাদি পশু নিয়ে স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে 'অ্যান্ট্রিসাইড' নামে নতুন এক প্রকার ওষুধের সাহায্যে সিসি মক্ষিকা-বাহিত সমস্ত রকমের ট্রাইপ্যানোসোমিয়াসিস্ শ্রেণীর ব্যাধির সংগে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে। এই ওষুধ প্রতিষেধকের কাজ ছাড়াও চিকিৎসার কাজে আশ্চর্য ফল দিয়েছে এবং তাতে কোন রকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। হাইপোডারমিক ইনজেকশনের সাহায্যে চিকিৎসা হয়ে থাকে—কোন শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। একবার ইনজেকশনের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি চার থেকে ছ'মাস অবধি থাকে। ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের ম্যানচেষ্টার গবেষণাগারে স্বর্গতঃ ডাঃ কার্ড এবং ডাঃ ড্যাভের নেতৃত্বে গবেষণা চালিয়ে এই ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়।

ক্রোম চামড়া

শ্রীসুশীলরঞ্জন সরকার

কাঁচা চামড়া স্থায়ী বা পাকাকরণকে ইংরেজিতে বলে ট্যানিং। যে সমস্ত স্থানে চামড়া সংস্কার বা ট্যান করা হয় তাদের ট্যানারী বলে। এরূপ বহু ট্যানারী কলকাতার আশেপাশে রয়েছে। চীনেদের ট্যানারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। বেশীর ভাগই তারা ক্রোম চামড়া তৈরী করে। কলুটোলা ও নারকেলডাঙ্গার কাঁচা বাজার থেকে চামড়া কিনে নিয়ে আসে। স্থানীয় ট্যানারীগুলো প্রায় সকলেই নোনা চামড়া ব্যবহার করে। কাঁচা চামড়া পচে যায়, তাই লবণ দিয়ে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। কাঁচামাল সরেস হলে চামড়াও ভাল তৈরী হয়। তাই একটু দেখেশুনে কিনতে হয়।

ক্রোম চামড়া তৈরী করতে হলে ক্রোম ট্যানিং করতে হয়। আমরা সাধারণতঃ যাকে ক্রোম বলি তাহলো বড় গরুর চামড়া ক্রোম ট্যান করা,—জুতোর ওপরের অংশেই এর ব্যবহার। যে সব ট্যানারী ক্রোম চামড়া তৈরী করে তারা মাঝারী আকারের কাঁচা চামড়া কিনে আনে। প্রথমে চুনঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাদের আলাদা চুনঘর নেই তাদের অন্ততঃ একপাশে কয়েকটা চৌবাচ্চা রয়েছে দেখা যাবে। চামড়াগুলো নিয়ে একটা চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করে ভিজিয়ে রাখা হয়। চামড়ার ময়লা, লবণ সব জলে ধুয়ে যায়; আর যতটা পারে জল শোষণ করে নিয়ে সেগুলো সদ্য খুলে নেওয়া চামড়ার মত হয়ে দাঁড়ায়। এবার চামড়াগুলো তুলে নিয়ে ওজন নেওয়া হয়। চামড়ার গায়ে তখন লোম রয়েছে। লোম সব তুলে ফেলতে হবে। তাই সোডিয়াম সালফাইড (যাকে চামাররা বলে বিষ) ভিজে চামড়ার ওজনের শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ নিয়ে গরমজলে গলিয়ে ফেলা হয়। তারপর একটি চৌবাচ্চাতে উপযুক্ত পরিমাণ জল নিয়ে তাতে শতকরা ১০ ভাগ চুন আর ঐ বিষের দ্রবণ মিশিয়ে দেওয়া হয়। চামড়াগুলো এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। ২।৪ দিন ওখানে থাকে। তুলে নিলে দেখা যাবে, প্রায় লোমশূন্য হয়ে এসেছে। চামড়ার সবার ওপরের স্তর, যাকে আমরা ছালচাল বলি, তার মধ্যে লোমের গোড়া আটকানো থাকে। চুন ও বিষের রাসায়নিক-ক্রিয়ার ফলে ঐ স্তর নষ্ট হয়ে যায়—তাই অতি সহজেই লোমগুলো খসে পড়ে। এই অবস্থায় চামড়ার ওজন বেশ বেড়ে যায় ও অনেকটা পুরু হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাঁচা চামড়ার গন্ধও আর থাকে না।

এবার চামড়াগুলো চৌবাচ্চা থেকে তুলে নিয়ে ধুয়ে ফেলা হয় ও বাকী লোমগুলো চেঁচে ফেলে দেওয়া হয়। এর পরে আর একটা চৌবাচ্চায় আগের মত জল আর কেবল চুন দেওয়া হয়। তাতে চামড়াগুলো ডুবিয়ে রাখে। পরের দিন এসে উল্টো পিঠের অতিরিক্ত মাংস, চর্বি সব চেঁচে ফেলা হয় বিশেষ ধরণের ধারাল ছুরি দিয়ে। অনেক ট্যানারিতে মেসিনেও একাজ সারা হয়। এর পর অনেক সময় মোটা চামড়ার পুরু দিক মেসিনের মধ্যে দিয়ে চেরাই করে ফেলে। এই অদ্ভুত যন্ত্রটির নাম স্প্লিটিং মেসিন। চুনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার তাকেই তাড়াতে হবে। চুন হলো ক্ষারধর্মী, তাকে বিনষ্ট করতে হলে অম্ল অর্থাৎ অ্যাসিড চাই। চামড়াগুলো ধুয়ে নিয়ে ওজন করে ফেলা হয়—দেখা যাবে অনেকটা ওজন বেড়েছে। এই বর্ধিত ওজনের শতকরা ১ ভাগ অ্যাসেটিক, বোরিক অ্যাসিড অথবা অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ক্লোরাইড দিয়ে এ কাজ সমাধা করা চলে। প্রত্যেক ট্যানারীতে

কাঠের বড় বড় ড্রাম রয়েছে দেখা যাবে। এগুলো বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে ঘোরানো হয়। এই ড্রামে চামড়াগুলো উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে কয়েক ঘণ্টা চালান হয়। অনেকে হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক এর মত তেজী অম্লও ব্যবহার করে থাকে। খানিকটা ক্ষার থাকা অবস্থাতেই চামড়া বের করে নিয়ে বীজাণুক্রিয়া করাবার জন্যে বর্ণিত ওজনের শতকরা ½ ভাগ প্যাংক্রিওল দিয়ে ১ থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত চালান হয়। প্যাংক্রিওল হলো একটি কৃত্রিম বেট্ (Bate), বাজারে পাওয়া যায়। এর কাজ হলো খসখসে, অসম চামড়াকে নরম, সমতল করে দেওয়া। কিন্তু দেখতে হবে বীজাণুক্রিয়া যাতে বেশী না হয়ে যায়, তাতে চামড়ার সবিশেষ ক্ষতি হয়।

খুব ভাল করে ধুয়ে নিয়ে একটি ড্রামে বর্ণিত ওজনের শতকরা ১০ ভাগ খাবার লবণ ও ১½ ভাগ গন্ধকাম্ল আর পরিমাণমত জল দিয়ে ধোয়া চামড়াগুলো ফেলে দেওয়া হয় তার মধ্যে। আস্তে আস্তে ড্রাম ঘোরানো হয় ঘণ্টা দুয়েক। তারপর বের করে নিয়ে কাঠের বেঞ্চির ওপর সাজিয়ে রাখা হয়। ড্রামের মধ্যে যে লবণ দ্রবণ রইল তাকে বলে পিকল-লিকার। (একে জারক রস বলা চলে। অনেকে এতে ফটকিরিও খানিকটা দিয়ে থাকে।) এর মধ্যে তখনও খানিকটা অম্ল থাকে। ট্যানিং-এর জন্যে অম্ল-মাধ্যমের প্রয়োজন বলে ওটা ফেলে না দিয়ে ওর মধ্যেই ট্যানিং করা হয়ে থাকে। ট্যানিং এর জন্যে দরকার ক্রোম লিকার, যা থেকে চামড়া ক্রোম টেনে নেবে। এই ক্রোম আসে ক্রোমিয়াম ধাতুজ লবণ থেকে। সোডিয়াম বাইক্রোমেট, গন্ধকাম্ল ও গুড় দিয়ে ক্রোম-লিকার তৈরী করা হয়। ১০০ : ১১৫ : ২৫ এই অনুপাতে সাধারণতঃ মেশানো হয়ে থাকে। একটি কাঠের ঢোলের মধ্যে বাই-ক্রোমেট, অম্ল আর কিছু জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই পাত্রের ভিতরটা সীসার পাত দিয়ে মোড়া। গুড় জলে গুলে ঐ মিশ্রণের ওপর ধীরে ধীরে ঢেলে দেওয়া হয়। সারারাত সে ভাবে থাকে। পরের দিন পরীক্ষা করে দেখা হয়, ঠিক তৈরী হয়েছে কিনা। তারপর চামড়াগুলো পিকল-লিকারে ফেলে দিয়ে ড্রাম চালিয়ে দেওয়া হয়। পরে ২।৩ বারে পরিমাণ অনুসারে ক্রোম-লিকার যোগ করা হয়। ৫ থেকে ১২ ঘণ্টা চালালেই চামড়া ট্যান হয়ে যায়। পরীক্ষা করার সহজ উপায় আছে। একটুকরা চামড়া কেটে নিয়ে ফুটন্ত জলে ফেলে দেওয়া হয়। যদি কুঁচকে ছোট হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে এখনও ট্যান হয়নি।

ট্যানিং হয়ে গেলে চামড়া পচবার আর ভয় থাকে না। এবার রোদে আধশুকনো করে নেওয়া হয়। অনেক ট্যানারীতে মেসিনে একাজটা করে নেয়। এই অবস্থায় চামড়া অনেকটা পুরু থাকে। তাকে প্রয়োজনমত পুরু রাখতে হলে উল্টোদিকের খানিকটা চেঁচে ফেলা হয়, সেভিং মেসিনের মধ্যে চালিয়ে। ১.৫ থেকে ১.৭ মিলিমিটার পুরু রাখা হয়ে থাকে। সেভিং করে ওজন নেওয়া হয়। এরপর করা হয় বাছাই। যেগুলোর দানা অর্থাৎ গ্রেন ভাল থাকে সেগুলো লাল বা ব্রাউন ক্রোমের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়। এবার রং করতে হবে। রং করবার আগে চামড়ার অম্ল ও ক্ষার উভয়ই নষ্ট করে ফেলা প্রয়োজন। শেষ ওজনের ওপর শতকরা ২ থেকে ২½ ভাগ সোহাগা দিয়ে এই 'নিউট্র্যা-লাইজেসন' করা হয়। অনেকে আবার সোডা বা সোডিবাইকার্ব ব্যবহার করে। কালো রং এর চামড়া তৈরী করতে রং হিসেবে ক্লোরাজোল-ব্ল্যাক ব্যবহার করা চলে। শেষ ওজনের ওপর শতকরা ১ ভাগ রং দিয়ে আধঘণ্টাটাক চালান হয়। পরে আবার আধঘণ্টা ফ্যাট-লিকার দিয়ে চালাতে হয়। রেড়ির তেলকে গন্ধকাম্ল দিয়ে 'সালফোনেশন' করা হয়। একে বলে টার্কিরেড্-অয়েল। তাতে নরম সাবান ও মাছের তেল

মিশিয়ে ক্রোম চামড়ার ফ্যাট-লিকার তৈরী করা হয়। তৈরী অবস্থায়ও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ব্রাউন ক্রোমের জন্য চামড়াগুলো একই ভাবে রং করা হয়। এক্ষেত্রে ন্যাপথালীন, ফস্ফীন্ আর এই রং ব্যবহার করা চলে। আর শেষ ওজনের শতকরা ১/৮ ভাগ খয়ের দিয়ে মিনিট পনেরো চালান হয়, রংটা যাতে ঠিক ধরে।

এরপরে কাঠের বেঞ্চির ওপর আবার সাজিয়ে রাখা হয়। পরের দিন ঢালু পাথরের টেবিলের ওপর ফেলে জল পিষে বের করে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে চামড়ার কোঁচকানো অংশও সমতল হয়ে যায়। পেট ও ঘাড়ের কাছটা অনেক সময় শক্ত থাকে, তাই খানিকটা বাদাম তেল বেশ করে মালিশ করে দেওয়া হয়। তারপর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ জায়গায় গরম-ঘর থাকে। না থাকলে বর্ষাকালে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। শুক্নো চামড়াগুলো আবার ভিজে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে রেখে পরিমাণমত নরম করে নেওয়া হয়। তারপর একটি যন্ত্রের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। যন্ত্রটির নাম স্টেকিং মেসিন্। চামড়াটা টেনে টেনে নরম করে দেওয়া এর কাজ। যতটা বাড়বার দরকার এই সময়ে বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের একটা বোর্ডের উপর পেরেক এঁটে টান করে মেলে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় ২।১ দিন থাকবার পর খুলে নিয়ে দাগগুলো ছেঁটে ফেলা হয়। তখন যদি শক্ত থাকে আবার ষ্টেক্ করা হয়, তা না হলে একেবারে বাফিং মেসিনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই যন্ত্র চামড়ার খরখরে উল্টোপিঠটা বেশ মসৃণ করে দেয়। এরপর জলে সামান্য অ্যাসেটিক্ অ্যাসিড মিশিয়ে ব্রুশ দিয়ে সোজা পিঠ ভাল করে ধুয়ে ফেলা হয়। এর ওপর পালিশ বা সিজ্ন্ লাগাতে হয়। পিগ্মেণ্ট, রং, গালা, কেসীন, শিরিষ, টার্কিরেড অয়েল, সোহাগা ও ফরম্যাল-ডিহাইড দিয়ে পালিশ তৈরী করা হয়। তিনবার পালিশ লাগাবার পর শুকিয়ে গেলে গ্লেজিং মেসিনে পালিশ করে নেওয়া হয়। তারপর পছন্দমত গ্রেন বা দানা তোলা হয়। পরে ইস্ত্রি করে মাপবার মেসিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কতবর্গ ফুট এর পরিমাপ, এই অভিনব যন্ত্রটি ঠিক বলে দেবে। এরপরে মাল প্যাক করে বাজারে বিক্রীর জন্যে পাঠানো বাকী থাকে।

কাঁচা থেকে পাকা অবস্থায় পরিণত হতে ক্রোম চামড়ার পনের দিন থেকে মাস খানেক পর্যন্ত সময় লাগে। চীনেরা আরও অল্পদিনে ও কম খরচে চামড়া তৈরী করে। চায়না ক্রোমের দামও সস্তা। অনেক ট্যানারীর মাল খুব ভাল হয় এবং বিলেতে রপ্তানী হয়ে থাকে। আগে অশিক্ষিত চামাররা এই শিল্প চালাত। আজকাল শিক্ষিত চর্মবিদগণ এই শিল্পে অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করছেন। তাই অদূর ভবিষ্যতে ভারতে চর্মশিল্প অন্যতম প্রধান শিল্প হয়ে দাঁড়াবে আশা করা যেতে পারে।

মধু ও মৌমাছির ইতিহাস

শ্রীবিমল রায়

আদিমপূর্ব মানব যখন তাহার বাসস্থান পরিবর্তন করিতে করিতে অবশেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া অধিকতর নিরাপদ ও আরামপ্রদ গুহায় আশ্রয় লইল ও ফল মূলের ক্রম-দুষ্প্রাপ্যতাহেতু কালে কালে আমিষ খাদ্য গ্রহণ সুরু করিল তখন হইতেই সহজলভ্য খাদ্য হিসাবে মৌমাছির চাকে সঞ্চিত মধুর বিষয় তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কারণ তখনকার ঘন সন্নিবিষ্ট অরণ্যে মধুপূর্ণ মৌমাছির চাকের প্রাচুর্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেই সুদূর অতীত কালেই আদিম মানবের সহিত মৌমাছির বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল ও তাহা শত শত বৎসরের ঘনিষ্টতায় ও স্বার্থে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া এখনও অটুট রহিয়াছে। আজিও মৌমাছিকে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলা যায়। আজিও মৌমাছির নিকট হইতে আমরা আহার, পানীয়, আলো ও ঔষধ পাইয়া থাকি।

আদিমকাল হইতেই মানবসমাজ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রাণী ও উদ্ভিদের কোন্ কোন্ গুলি তাহাদের প্রয়োজনীয়, কোন্‌গুলি বা অপ্রয়োজনীয় তাহা তাহারা ভাল করিয়াই জানিয়াছিল। কাজেই সুদূর অতীত কালেই যে মৌমাছি মানবের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ছিল তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে! প্রকৃতির ভাণ্ডারে মৌমাছির ন্যায় মানবজাতির পক্ষে এইরূপ প্রয়োজনীয় জীব যদি সৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে প্রকৃতিকে কেহই অকৃপণ বলিত না।

মৌমাছি ও মধুর ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানবজাতিরই ইতিহাস। গবাদি পশুর ন্যায় মৌমাছিও ভ্রাম্যমান আদিম মানবের বিশ্বস্ত সাথী থাকিয়া তাহার সহিত দুর্গম কানন, গিরি-প্রান্তর, দুস্তর সাগর, মরু ও নদনদী লঙ্ঘন করিয়া মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূক-চিরসাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। মধু ও মৌমাছির বিস্তৃত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদানের সামান্যতম চেষ্টাও অসম্ভব। কারণ মানবজাতির ইতিহাস—এমন কি মানবজাতি হইতেও মৌমাছির অস্তিত্ব বহু পুরাতন।

জার্মেনীর বাল্টিক অঞ্চলে, সুইজারল্যাণ্ড ও মধ্য ইউরোপের স্থানে স্থানে অ্যাম্বার প্রস্তরে প্রস্তরীভূত অবস্থায় মৌমাছির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহার আকৃতি প্রায় বর্তমান কালের মৌমাছির অনুরূপই ছিল। মেঙ্গেল বলেন, ইহা বর্তমান ইটালীয় মৌমাছির মতই দেখিতে ছিল। টনি কেলেন মনে করেন, মনুষ্য জন্মের বহুপূর্বেই আদমীয় বা প্রাক-আদমীয় মৌমাছি (**Apis adamitica or pre adamitica**) পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল। শত সহস্র বৎসর পূর্বের টার্সিয়ারী স্তরের বালুকাপ্রস্তরে মৌমাছির যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাও প্রায় বর্তমান কালের মৌমাছির অনুরূপ।

অতি প্রাচীনকালেই মধু যে আদিম মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, স্পেনের স্পাইডার গুহার প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রক্তবর্ণে চিত্রিত এই চিত্রগুলিই পৃথিবীর আদিমতম চারুকলা।

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কোনও আদিম অধিবাসী ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতির মানব, এমন কি বন্য হিংস্র মানবেরাও মধুর জন্য মৌমাছি পালন করিত। সমগ্র আমেরিকার ভূখণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ায় কোনও মৌমাছি (**Apis mellifica**)

ছিল না, তথাকার আদিম অধিবাসীরা হুলশূন্য মক্ষিকার ন্যায় মধু সংগ্রহকারী এক প্রকার পতঙ্গের (Mellipona) সঞ্চিত মধু সংগ্রহ করিত।

রাজা মেনেস, মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা "মৌমাছি পালক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৪০০০ হইতে ৫০০০ বছরের মধ্যে। টনি কেলেন মিশর দেশে প্যাপিরাস কাগজে লিখিত ভোজ্য-তালিকা হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তথাকার ভোজনাগারে খাইবার জন্য মধু বিক্রয় করা হইত।

৩০০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূঃ রচিত ঋগ্বেদেও বহুস্থানে মধুর উল্লেখ আছে। ভারতীয়দের নিকট মধু সর্বপ্রকার মধুরতা ও আরোগ্যের প্রতীক ছিল। এখনও মধু না হইলে হিন্দুদিগের কোনও ধর্মকার্যই সুসম্পন্ন হয় না।

আদি হইতে মৌমাছির বিবর্তনের ইতিহাস ও রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই দেখা যাইত যে, বর্তমান মানবের আদিপুরুষের ন্যায় মৌমাছিও মধ্য-এসিয়ার কোনও স্থানে প্রথম আবির্ভূত হইয়া এসিয়ার সর্বত্র এবং ইউরোপ ও আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল দেশেই আদিম মৌমাছিপালনের প্রথা বর্তমান ছিল এবং কোনও কোনও স্থানে এখনও আছে।

আমাদের দেশে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর বাংলা ও আসাম প্রদেশে, কোনও স্থানে শূন্যগর্ভ বৃক্ষকাণ্ডে, কোনও স্থানে বা বাসগৃহের দেওয়ালে রক্ষিত গর্তে মৌমাছি পালিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থানে ঋজুভাবে স্থাপিত নারিকেল, খর্জুর বা তালবৃক্ষের খণ্ডিত অংশ এই জন্য ব্যবহৃত হয়। মধ্য ভারত, ছোটনাগপুর ও দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে বাস বা অন্য গৃহের দেওয়ালে স্থাপিত মৃৎপাত্রে মৌমাছি পালিত হয়। সর্বত্রই মধু জমাইবার কাল অন্তে দুই একটি চাকপত্র বাদে মধু, অপরিণত মৌমাছি, শুক ও ডিম্বের সহিত সকল চাকপত্র বাহির করিয়া নিয়া একটি বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া নিংড়াইয়া মধু বাহির করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহার সহিত কিছু পরিমাণ অপরিণত মৌমাছি, শুক ও ডিম্বের রস মিশ্রিত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে বনজাত মৌমাছির চাক হইতে অতি বর্বর প্রথায় অগ্নি দ্বারা সমস্ত মৌমাছি ধ্বংস করিয়া কিয়ৎপরিমাণ মধু সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহার নিষ্কাশন প্রণালীও পূর্ববৎ এবং ইহা শীঘ্রই মনুষ্য-খাদ্যের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। এই উভয় প্রকার মধুকেই বিশুদ্ধ মধু বলা চলে না এবং ইহাতে বিশুদ্ধ মধুর মনোরম গন্ধ, স্বাদ ও উপকারিতার আশাও কম।

ল্যাংস্ট্রথ চাকে মৌমাছির চারণ-পথ আবিষ্কার করিয়াই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালন প্রথার সূত্রপাত করেন। তাহার পর আধুনিক চাকবাস, চাকপত্র-ভিত্তি ও কেন্দ্রাপসারী গতি দ্বারা মধু-নিষ্কাশন যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার আদিম মৌমাছি-পালন প্রথার বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালন পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। একদা মৌমাছি শূন্য দেশ আমেরিকা আজকাল বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালনে সর্বাধিক অগ্রসর।

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ভারতের বাংলাদেশেই সর্বাগ্রে ডাক ও তার বিভাগীয় মে, ডগলাস্ নামক এক ইংরেজ কর্মচারীর চেষ্টায় ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালন প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাঁহার লিখিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক 'Hand Book of Bee keeping in India" পাঠে জানা যায় যে, এই কার্যের জন্য সম্ভবতঃ তিনি ইটালীয় মৌমাছি ইউরোপ হইতে আনাইয়াছিলেন। ইহা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল বা কেন স্থায়ী হয় নাই, তাহার কোনই বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহার পর পুনরায় সি, সি, ঘোষ লিখিত ও গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের

(**Bee keeping, Bulletin No. 46 A. R. I.**) টি, বি, ফ্লেচার লিখিত ভূমিকায় দেখিতে পাই, ১৯১০ বা ১৯১১ সালে পুসার সরকারী কৃষিশালায় ইউরোপীয় মৌমাছি (ইটালিয়ান মৌমাছি) আমদানী করা হইয়াছিল। ইহাও ধারাবাহিক ভাবে চলে নাই এবং কি কারণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহারও কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে যে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালনের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল সেই বাংলার মৃত্তিকা হইতে কিরূপে ইহা নিশ্চিহ্ন হইল তাহা সত্যই রহস্যাবৃত।

ইহার পর রেভা. নিউটন নামক এক ইংরেজ পাদরীর দ্বারা পুনরায় মাদ্রাজে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালন প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাঁহার প্রবর্তিত চাক-বাস—নিউটন হাইভ বলিয়া ভারতের সর্বত্র পরিচিত। এই সময় হইতে ভারতে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে মাদ্রাজ হইতে অন্যান্য প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। আজকাল ভারতের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালনে সবচেয়ে অনগ্রসর। কিন্তু বাংলাদেশ, এক কালে যে স্থানে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালনের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই স্থানই মৌমাছি-পালনে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ইহাই দুঃখের বিষয়।

"আমাদের দেশ, কৃষকের দেশ। কৃষির উন্নতির জন্য বাঙালী এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই করে নাই। গভর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া নিজ কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি পাইলে চলিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে এক চেষ্টা আছে তাহাতে আমরা কতটুকু সাহায্য করিতে পারিয়াছি? সৈয়দ সওখাত হোসেন, অম্বিকাচরণ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জি প্রভৃতি বার জন গভর্ণমেণ্টের অর্থে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিলাত গিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কৃষিকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন না। **Statutary Civilian** ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া চাকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হইল। এমনি আরও কতজন বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দেশে তাঁহারা বিশেষ কোন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এজন্য স্বতঃই মনে হয় যে, বিদেশী বিদ্যায় কোন ফললাভ হইতেছে না।"

* * * *

"আমি ৫ বার বিলাতে গিয়াছি। সেখানে যাইয়া এ দেশের ছাত্রগণ কি শিক্ষা করে তাহা দেখিয়াছি। বৎসর বৎসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া দেশের বহু টাকা মিথ্যা অপব্যয় হইতেছে। এ সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে চলিতেছে না। প্রায় ২ হাজার ছাত্র সেখানে যায়—তাহাদের খরচের জন্য আমরা প্রায় ১ কোটি টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে পাঠাই।"

* * * *

"ফলিত রসায়নের কথা শুনিয়াছেন। এই বিদ্যা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির উপায় শিক্ষাদান করে। কিন্তু এই বিদ্যার্জ্জন করিয়া যাহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিলেন না। বাঙালী 'কেতাবী' হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার এ গতিরোধ করিতে হইবে।

বাঙালী চাকুরীর আশায় বিদ্যাশিক্ষা করে—জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য নহে। ইহারই ফলে তাহার বিদ্যার্জ্জন ও অর্থোপার্জ্জন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীক্ষা পাশ ও তাহারই ফলে চাকরি প্রাপ্তি যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহাতে যথার্থ জ্ঞানলাভ আশা করা যায় না। এবং চাকরির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ পাশ করা ছাত্রদেরও অন্ন-সমস্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আমাদের খাদ্য ও তাহাতে প্রাণীজগতের দান

শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ বিশ্বের সকল সমস্যার মূলে যে খাদ্য সমস্যা সেকথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। এই খাদ্য প্রধানতঃ আমরা উদ্ভিদ বা প্রাণীজগৎ হইতে পাইতেছি। ইহা ছাড়া দুই একটা দ্রব্য আমরা জড়জগৎ হইতেও পাই। উদাহরণ স্বরূপ লবণ, জল ইত্যাদির নাম করা যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতৃদুগ্ধই তাহার একমাত্র খাদ্য। মাতৃদুগ্ধের মত এমন সর্বগুণান্বিত খাদ্য আর নাই। কৃত্রিম খাদ্য যাহা বোতলে বা টিনে বিক্রয় হয় তাহা মাতৃদুগ্ধের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। এমনকি তুলনাই চলে না। মাতৃদুগ্ধের গুণ ও পরিমাণ নির্ভর করে মায়ের স্বাস্থ্যের উপর। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের, বিশেষতঃ যাহারা সহরে বাস করেন তাহাদের প্রায়ই ভগ্নস্বাস্থ্য দেখা যায়। কাজেই শিশুদের স্বাস্থ্য ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিতেছে। কি করিয়া মায়ের ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহার বিষয় আজও বিশেষ ভাবে গবেষণা হয় নাই। পরাধীন ভারতে হয় নাই বলিয়া স্বাধীন ভারতে হইবে না, এটা কেমন কথা! এ বিষয়ে আমি আপনাদের, বিশেষতঃ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে সকল মায়ের দুধ থাকে না তাঁহাদের শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করা অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে। আপনারা সকলেই বনবীর ও ধাত্রী পান্নার কাহিনী শুনিয়াছেন। সম্রাট আকবরেরও শিশুকালে একজন ধাত্রী ছিল যাঁহার স্মৃতি রক্ষাকল্পে প্রকাণ্ড সৌধ দিল্লীর কুতব মিনারের অতি সন্নিকটে আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য মায়ের দুধ যেমন কম পড়ে, স্বাস্থ্যবতী মায়ের আবার দুধ পরিমাণে অনেক বেশী পাওয়া যায়। শিশুকে সেই দুধ দিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হইতে পারে। উদ্বৃত্ত দুধ গরীব লোকের সামান্য অর্থোপার্জন অথবা বেশীর ভাগ নিরর্থক ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। ইউরোপে, বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রাক্কাল হইতে ব্লাড ব্যাঙ্কের মত মিল্ক-ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত দুধ যাহাতে অন্যান্য শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাকল্পে সামান্য দিনের জন্য রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা করিয়া রাখা হয়। বেশীদিন রাখিতে হইলে দুধকে শুষ্ক গুঁড়ায় পরিণত করা হয়, প্রয়োজনমত জলে গুলিয়া ব্যবহার করা চলে। এই পদার্থে দান কত শিশুকে যে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর আমাদের অজ্ঞতার জন্য ভারতের কত শিশু যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহারও সংখ্যা নাই।

সাধারণতঃ খাদ্যের উপাদান ৫ প্রকার—(১) শ্বেতসার জাতীয় (২) ছানা জাতীয় (৩) স্নেহ জাতীয় (৪) লবণ জাতীয় (৫) জল। ইহা ছাড়া আরও ২।১টা উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন হয়, যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে পারে। উহার মধ্যে খাদ্যপ্রাণই প্রধান। আগে যে মায়ের দুধের কথা বলিয়াছি তাহাতে মূল উপাদানগুলি বর্তমান আছে। মায়ের দুধের নিকটতম দুধ হইল গাধার দুধ। এজন্যই স্বাস্থ্যহীন, শিশু ও রোগীর খাদ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। ধোপাদের গাধা বা সহরে দুধের জন্য গাধা রাখা হয়। গাধার দুধের দাম অত্যন্ত বেশী। কলিকাতায় ইহার

সের ৮৲। গাধার দুধের পরই ছাগীদুধের কথা বলা যাইতে পারে। ছাগীদুধের প্রধান সুবিধা এই যে, ইহাতে স্নেহ জাতীয় পদার্থ অত্যন্ত কম। ফলে যাহাদের স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন নাই, সে সকল শিশু এবং রোগগ্রস্ত লোকের খাদ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার চলে। বিশেষতঃ যে সকল রোগী রক্তচাপ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একেবারে ধন্বন্তরী। আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী প্রত্যহ এই ছাগীদুগ্ধ পান করিতেন। তাঁহারও রক্তচাপের আধিক্য ছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে গোদুগ্ধের ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে। শুনা যায় যে, একমাত্র আরবদেশেই বলদ ও গাভী এক সঙ্গে হালে ব্যবহার করা হয় এবং উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করা হয়। গোদুগ্ধকে অমৃতবৎ মনে করা হয় বলিয়াই ভারতে গাভীকে ভগবতী বা ভগবানের স্বরূপ বলিয়া মনে করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীনকালে নানাপ্রকার ধনরত্নের মধ্যে গোধনই বেশ বড় স্থান পাইত। গোধন অধিকার করিবার জন্য সেকালের সকলেরই দৃষ্টি ছিল। আমরা জানি, মহাভারতের বিরাটরাজের গোধনের কথা। আজ কিন্তু সেই গোধনের দুর্গতির সীমা নাই। পৃথিবীতে যত গাভী, একমাত্র ভারতে প্রায় তত গাভী এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বর্তমান ছিল। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হইলে কি হয়, দুগ্ধের পরিমাণ হিসাবে সকল দেশকে উহা হার মানাইয়াছে। বিশেষতঃ বাংলায় ছটাকে গরু বা অস্থিসার গাভী এত বেশী যে, তাহার সংখ্যা নাই। ব্যবসায় হিসাবে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক। আজ পৃথিবীর মধ্যে বাংলায় গরুর দুধ সবচেয়ে দুর্মূল্য। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ইহা একেবারেই ভাল নয়। রোগগ্রস্ত গাভী যে কি মারাত্মক তাহা সাধারণের ধারণা নাই। গো-চিকিৎসা বিভাগ বহুদিন ধরিয়া ভারতে তথা বাংলায় থাকিলেও বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। স্বাধীন ভারতে এই বিভাগের মৌলিক গবেষণার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আশু কর্তব্য।

মহিষের দুগ্ধ প্রায় গোদুগ্ধের মত, কেবল তাহাতে স্নেহজাতীয় উপাদান একটু বেশী। গো-মহিষের দুগ্ধ হইতে যত প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে ঘৃতই সর্বপ্রধান বলা যাইতে পারে। এই ঘৃতের আদর প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে ঋণ করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করা হইত; কিন্তু ঘৃতের বেলায় চার্বাক মুনি সেই নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

প্রাণীবিজ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ হইতে যে যে জীবজন্তু আমরা খাদ্য হিসাবে পাই, তাহা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে চিংড়ি ও কাকড়ার কথা। এই দুই প্রকার প্রাণী যদিও সাধারণ লোকের নিকট মাছের অতি নিকট—আত্মীয় বলিয়া পরিচিত, তবুও প্রাণীবিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ হিসাবে ইহাদের স্থান মাছ হইতে অনেক নিম্নস্তরে। ইহারা অমেরুদণ্ডীজীব কিন্তু মাছ হইল মেরুদণ্ডী। বিসদৃশ হইলেও চিংড়ি বা কাকড়ার অতি নিকটতম প্রাণী হইল পতঙ্গ। গলদা বা বাগদা চিংড়ি অতি উপাদেয় এবং যাহা ঘি বলিয়া সাধারণের ধারণা উহা যে মাছের ঘিয়ের সহিত তুলনা করা হয় তাহা ঠিক নয়। চিংড়ির ঘি হইল উহাদের পরিপাক-সহায়ক যন্ত্র (যাহাকে হিপাটোপ্যাংক্রিয়াস্ বলে)। কাকড়ার ঘিও ঐ একই প্রকার যন্ত্র। কুচা বা কাদা চিংড়ি হইল নিঃসহায়ের একমাত্র সম্বল।

পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যে মানবের আহার্য হিসাবে উহাদের দেহ বড় একটা ব্যবহৃত হয় না, যদিচ বাইবেলে পড়া যায় যে, প্রভু যীশু এক সময়ে পঙ্গপাল খাইয়া ছিলেন। চীনে অবশ্য আরশুলা খাওয়ার কথা শুনা যায়। পতঙ্গ হইতে যে খাদ্য বিশ্বব্যাপী সকল জাতের লোকের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে

তাহা হইল মধু। এই মধু ফুল হইতে মৌমাছিরা আহরণ করিয়া চাকে জমা করে। ফুলের মধু এবং চাকের মধুর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। একটা কাঁচা ও অপরটা গাঁজাইবার পরের মধু। দ্বিতীয়টা ঐ প্রক্রিয়ার ফলে বহুদিন রাখা যায়। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, সাধারণের ধারণা, মধু মৌমাছিদের নিত্য খাদ্য; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। মধু মৌমাছি-শিশুদের খাদ্য ও নূতন চাক করিবার প্রাক্কালে ইহা খাইয়া মৌমাছিরা শরীর হইতে মোম বাহির করিবার কাজে লাগায়। আমাদের দেশে চাক নিংড়াইয়া মধু বাহির করা হয়; কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে চাক বাঁধিবার পূর্বে ছোট একটি নকল চাকের পিছনে হুক্ লাগাইয়া গাছে বা দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে ঐ নকল চাক বেষ্টন করিয়া মৌমাছিরা নূতন চাক তৈয়ার করিতে পারে। সময়মত ঐ আসল চাক হুক হইতে খুলিয়া লইয়া গ্রামোফোনের মত একটি কলের উপর রাখিয়া খুব জোরে পাক দেওয়া হয়। ইহার ফলে মধু চাক হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসে। মধু এইভাবে বাহির করার পর চাকটিকে হুকের সাহায্যে পুনরায় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় ও মৌমাছিরা আবার সেই খালি চাকে মধু আহরণ করিতে থাকে। এইভাবে একই চাকে পুনঃ পুনঃ মধু পাওয়াতে লাভের অঙ্ক অনেক বেশী হয় এবং চাক না ভাঙ্গাতে খাটি মধু অর্থাৎ মোম বাদে মধু পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ফুলের মধু অনেক নষ্ট হয় এবং ইহাতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বেকার যুবক ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সকলের নিম্নস্তরের প্রাণী। আমিষ খাদ্য হিসাবে ইহার চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র। যুগ যুগান্তর হইতে আমরা মাছ খাইয়া আসিতেছি; কিন্তু মাছের বিষয় সাধারণ জ্ঞানও একেবারে নাই। মাছের চাষ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রজননের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পেট, ডিমের জন্য বড় দেখায় না। বাহির হইতে অন্য কোন সাধারণ ভেদ দেখা যায় না। তবে কোন কোন মাছের স্ত্রী-পুরুষভেদ নানাউপায়ে জানা গিয়াছে। প্রজননের অনেক আগেই স্ত্রী-পুরুষ উভয় প্রকার মাছ যাহাতে জলে থাকে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কারণ যদি সবই পুরুষ বা সবই স্ত্রী মাছ হয় তবে প্রজনন সম্ভব নয়। বাংলার অনেক মাছের স্ত্রী পুরুষ পার্থক্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ পোনামাছ অর্থাৎ রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবউসের প্রজনন পুকুরের স্থির জলে হইতে দেখা যায় না। নদীতে ইহাদের শিশু অবস্থায় স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। পূর্বে ধারণা ছিল, প্রজননের সময় সাধারণতঃ মাছেরা নদীর উৎপত্তিস্থানের নিকট গিয়া ডিম পাড়ে; কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, নদীর সবত্র এই প্রজনন হইতে পারে। তবে নদী সংলগ্ন নীচু জমিতে বৃষ্টির জল জমিয়া একাকার হইয়া গেলে তাহার উপর এই প্রজনন নির্ভর করে। এই নীচু জমি ধানক্ষেত বা পতিত জমিও হইতে পারে। বৃষ্টির জল জমিয়া নদীর জলের সহিত মিশিয়া গেলে বড় বড় মাছ (স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই) নদী হইতে এই জলে প্রজননের জন্য চলিয়া যায় ও তথায় বিহারের ফলে স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ে ও পুরুষ মাছ তাহা নিষিক্ত করে। বৃষ্টির জলে অক্সিজেন গ্যাস বেশী থাকে। এই বেশী অক্সিজেন গ্যাসই স্ত্রী মাছের পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের অগ্রভাগের উত্তেজনা আনে। ফলে ডিম পরিপক্ক হয় ও প্রজননের জন্য তাহারা পুরুষ মাছের সঙ্গ খোঁজে। পুরুষ মাছের সঙ্গ পাইলে তাহারা ডিম প্রসব করে। স্যার কে, জি, গুপ্ত যে ৭০০০০৲ খরচ করিয়া মাছের চাষ সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহাতে

লেখা আছে যে, পোনামাছের ডিম প্রসবের পর জলে ভাসে, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। পোনার ডিম পাড়ার পর জলে ডুবিয়া যায়। কৈ, খলিসার ডিম জলে ভাসে। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরবর্তী অনুসন্ধানকারীরা নিজেরা না দেখিয়া (কে, সি, দে, সাউথওয়েল, ডাঃ নাইড়ু) সকলেই পোনামাছের ডিমকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু এমনভাবে লিখিলেন যেন তাহারা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

নদী ব্যতীত সাধারণতঃ পোনামাছ ডিম পাড়ে না। তবে বিশেষ বিশেষ পুকুরে পোনামাছের প্রজনন বাংলায় মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে। যে জাতীয় পুকুরে প্রজনন হয় তাহাকে বাঁধ বলে। বাঁধ কেবলমাত্র পুকুর নয়। পুকুর সংলগ্ন আরও অনেকটা জমিতে মাটির দেওয়াল দেওয়া হয়। মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের জমি কলিকাতার মত সমান নয়। উঁচু নীচু জমি পাশাপাশি থাকে। উঁচু জমির নিকট নীচু জমিতে পুকুর থাকে। পুকুর সংলগ্ন নীচু জমির তিন দিকে মাটির দেওয়াল ও চতুর্থ দিকে উঁচু জমি থাকাতে জল গড়াইয়া বাঁধে পড়ে। এই ঘেরা স্থানটায় পুকুরের অনুপাতে ৮।১০ গুণ জায়গা থাকে। বর্ষায় বৃষ্টির জল উঁচু জমি হইতে প্রবল বেগে বাঁধে আসিয়া পড়ে। পুকুরের পুরাণ জল এই বৃষ্টি জলের দ্বারা স্থানভ্রষ্ট হয়। অর্থাৎ উঁচু জমির উল্টা দিকে মাটির দেওয়ালের গায়ে একটা গর্ত থাকে যাহা দিয়া পুরাণ জল বাহির হইতে পারে। অনেকটা বাহির হইলে সেই গর্তের মুখ খড় ও মাটি দিয়া বন্ধ করা হয়। তখন বাঁধটা একেবারে এক ফুট গভীর জলে থৈ থৈ করিতে থাকে। এই জল একেবারে বদ্ধ। এখন বড় বড় পোনামাছের স্ত্রী-পুরুষ পুকুরের গভীর জল ছাড়িয়া এক ফুট গভীর বাঁধের জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। পরিশেষে স্ত্রীমাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষেরা উহা নিষিক্ত করে। বদ্ধ জলে ডিম প্রসব করে বলিয়া ডিমের জন্য স্রোত অত্যাবশ্যক আগেকার এই ধারণা একেবারে ভুল। বৃষ্টির জল ছাড়া কোন মাছেরই প্রজনন হয় না, তবে কোন কোন মাছের সামান্য বৃষ্টির জল পাইলেই প্রজনন উদ্দীপনা—আসে। যেমন, শোল, শাল, ল্যাটা প্রভৃতি

সব মাছের ডিম এক সময় ফোটে না। পোনার ডিম ফুটিতে ১৮।২০ ঘণ্টা সময় লাগে। স্যার কে, জি, গুপ্ত তাঁহার রিপোর্টে ৭ দিন লাগে লিখিয়াছেন। এটা নিশ্চয়ই তাঁহার স্বচক্ষে দেখা নয় বিলাতী পোনামাছের ১৫ দিন সময় লাগে এদেশে মিঃ সাউথওয়েল নামে বেঙ্গল ফিসারিস্-এর একজন ডিরেক্টর ছিলেন, মিঃ কে, জি, গুপ্তের পর তিনি এ বিষয়ে ১২ দিন সময় লাগে লিখিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সকলেই নিজে না দেখিয়া লালদিঘীর দপ্তরে বসিয়া বা নিরক্ষর জেলের মুখে শুনিয়া বা অনুমান করিয়া বিলাতী মাছের দেশী সংস্করণের মত ১৮।২০ ঘণ্টার স্থানে ৭ বা ১২ দিন লাগে লিখিয়া গেলেন এবং পরবর্তী সকলেই রুই-কাৎলার সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস লিখিতে একই কথা না দেখিয়াই টুকিতে থাকিলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক মৎস্য বিভাগের বয়স হইয়াছে ২৫।৩০ বা ৫০ বৎসর, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসরণকল্পে অত্যন্ত কম কাজই হইয়াছে। বেশীর ভাগ স্থানে অকাজ হইয়াছে। মাছের দ্রুত বৃদ্ধিকল্পে এই সকল মৎস্যবিভাগ হইতে যে কৃত্রিম খাদ্য নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে ন্যূনকল্পে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। মাদ্রাজ মৎস্য বিভাগ—তিল তৈলের খৈল বা বাদাম তৈলের খৈল, বোম্বাই—ভাত ও টোমাটো সিদ্ধ, ত্রিবাঙ্কুর—চিংড়ির গুঁড়া, তুলার বীজের গুঁড়া ও মেষ প্রভৃতির জীবের যকৃৎ, বিহার—ভেড়ার পিষ্ট হৃদয় বা যকৃৎ, ধানকলের বা তাড়িখানার আবর্জনা, পাঞ্জাব—রান্নাঘরের আবর্জনা প্রভৃতি মাছের

কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কৃত্রিম খাদ্যের দোষ এই যে, এসব পুকুরে বা নদীতে একেবারেই দেওয়া যায় না। যতটা দেওয়া যাইবে, মাছ তাহার কিছুটা খাইবে, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ পচিয়া জল নষ্ট করিবে। তখন সেই জল বাহির করা এবং তাহার পরিবর্তে ভাল জল দিয়া ভর্তি করা অসম্ভব। পরীক্ষাগারে ছোট কাঁচের পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া ও তাহাতে নূতন জল ভরা সহজ, কিন্তু নদী বা পুকুরে তাহা হয় না। কোন মৎস্য বিভাগ এ সব কৃত্রিম খাদ্য লইয়া গবেষণার আগে দেখিলেন না যে, প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে মাছেরা কি খায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে গত ১২ বৎসরের মধ্যে এসব বিষয়ে নানা তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছে। কোন লোক যেন জীবন্ত জীব অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণী ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য মাছের চাষে ব্যবহার না করেন। করিলে তাহা অপব্যয়ই হইবে। জীবন্ত পদার্থ অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ বা প্রাণী ব্যতীত কোন খাদ্য দিবার ব্যবস্থা একেবারে অচল। কৃত্রিম উপায়ে গামলা বা মাটির হাঁড়িতে এসব কালচার করিয়া তবে জলে দেওয়া চলে। শৈবাল, এককোষী প্রাণী, ক্ষুদ্র চিংড়ি প্রভৃতি দিলে মাছেরা খাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা জীবন্ত বলিয়া আবার বাড়িবে ও ভবিষ্যতে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার চলিবে। নানা প্রকার লবণ জাতীয় দ্রব্য গামলার জলে দিলেও সামান্য শৈবাল থাকিলে তাহা বাড়ে। জলে এককোষী প্রাণী ও ক্ষুদ্র চিংড়ি থাকিলে সেই গামলায় শুষ্ক ঘাসের বা শুষ্ক কচুরী পানার তড়পা ডুবাইয়া রাখিলে ইহারা সংখ্যায় বাড়ে। আবার এককোষী প্রাণী ও ক্ষুদ্র চিংড়ির খাদ্য হইল ক্ষুদ্র শৈবাল।

নদী বা বাঁধ হইতে মৎস্যশিশুদের প্রথমে ছোট ডোবায় ফেলা উচিত। কারণ পোনা-মাছের শিশুর সহিত বহুবিধ মাংসাশী মাছের শিশু থাকে। ইহাদের ছোট অবস্থায় রুই কাৎলার শিশু হইতে পৃথক করা সাধারণের পক্ষে শক্ত; কিন্তু না করিয়া সবশুদ্ধ একেবারে পুকুরে ফেলিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। মাংসাশী মাছ—যেমন চিতল, বোয়াল প্রভৃতি অতি শিশু অবস্থা হইতেই অন্য মাছের, বিশেষতঃ রুই-কাৎলা প্রভৃতির পোনা খাইতে থাকে। মেদিনীপুরে এই বোয়াল মাছের বাচ্চা ও রুই কাৎলার বাচ্চা, একই দিনে যাহাদের জন্ম হইয়াছে সেইরূপ দুই প্রকার মাছের বাচ্চা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, একটি বোয়ালের বাচ্চার সহিত ১০০টি রুই-কাৎলার বাচ্চা এক সঙ্গে রাখিলে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এই বোয়ালের বাচ্চাটি কত রুই-কাৎলার বাচ্চা খায়। ২৪ ঘণ্টা অন্তর যতগুলি বাচ্চা খাইয়া ফেলে সেগুলি আবার অন্য আধারে রক্ষিত সমবয়স্ক বাচ্চা দিয়া পূরণ করিলে ৪০ দিনে ১০৯৬টি রুই-কাৎলার বাচ্চা—মাত্র একটি বোয়াল-বাচ্চা খাইয়াছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, বোয়ালের বাচ্চা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতে থাকে। ৪০ দিন বয়সের রুই দৈর্ঘ্যে ৩৫ মিলিমিটার, কিন্তু বোয়াল ২৯২ মিলিমিটার। এখন কথা হইতেছে যে, পরীক্ষার সময় বোয়াল-বাচ্চাটি যেভাবে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১০০টি রুই-কাৎলার বাচ্চা পাইয়াছিল সেটা পুকুরে পাওয়া সম্ভব কিনা। পুকুরে একটা বা দুইটা বোয়ালের বাচ্চা না থাকিয়া অনেকগুলি থাকার সম্ভাবনাই বেশী। তাহার উপর বড় বোয়ালও থাকিতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য মাংসাশী মাছ ও মাছ-শিশু যে থাকিবে না তাহাও বলা শক্ত। ফলে অনেক সময় পোনা ফেলিয়াও উপযুক্ত ফললাভ করা হইয়া উঠে না। এই সকল কারণে মাছ না বাড়িয়া একেবারে লুপ্ত হইলে লোকে বলিয়া থাকে "চারা ফেলিলাম, কিন্তু একেবারে পচিয়া গেল।" সাধারণতঃ এসব চারা পচে না, অন্য মাছ বা মাছ-শিশুরা খাইয়া ফেলে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চারা চেনা

কতটা আবশ্যক। সাধারণতঃ জেলেরা যে বলে—এটা রুই, ওটা মৃগেল, এটা কাৎলার চারা—সেটা প্রায়ই ভুল। নির্ভুলভাবে প্রত্যেকটি চারা নির্দ্ধারণ করিতে কোন জেলেকে আজ পর্যন্ত দেখি নাই। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, তাহাদের নির্দ্ধারণ একেবারে নির্ভুল। খানিকটা বড় হইলে অবশ্য অনেকেই বলিতে পারে, কিন্তু সে বলায় কোন লাভ নেই। চারা যত ছোট কেনা যায় ততই লাভের অঙ্ক বড় হয়। খুব ছোট অবস্থায় মেদিনীপুরের রুই-কাৎলার চারা তাম্রলিপ্তহারের বৌটার ঢাকনিতে ১০ ধরে। এই ১০০০টি চারার (যদিচ সাধারণতঃ তাহাকে ডিম বলে) দাম ১৲ হইতে ১৷৹ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চারা অতি ছোট অবস্থায় কিনিতে হইবে এবং এত কেনার সময় বুঝিতে হইবে যে, কোন মাছের চারা ছাড়া হইবে। না জানিলে রুই বলিয়া পুঁটির চারা ছাড়া হইয়া যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য-গবেষণাগার কর্তৃক আবিষ্কৃত তালিকা হইতে সাধারণ খাদ্য-মৎস্যের নিষিক্ত ডিম ও অতি ছোট মৎস্য-শিশু চেনার ব্যবস্থা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নিষিক্ত ডিম জলে ডোবে বা ভাসে এবং আকার, রং, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানিলে তাহা কি মাছের ডিম বলা যায়। সেইরূপ মাথা আকারে বড়, ছোট গোঁফ আছে কি না, লাল কানকুয়া দেখা যায় কিনা, ল্যাজে ফোঁটা আছে কিনা, পিঠের পাখনার রং কিরূপ, ঠোঁট কিরূপ ইত্যাদি হইতে বলিতে পারা যায় যে, ইহা কোন মাছের শিশু।

মাছের চাষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—(১) মিঠাজলের (২) লোনাজলের ও (৩) সামুদ্রিক। মিঠাজলের মাছের জীবনেতিহাস গত ১২ বৎসরে অনেকগুলি জানা গিয়াছে। লোনা ও সামুদ্রিক মাছের বিষয় এখনও অন্ধকারে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মৎস্যবিভাগ খুলিয়া তাহাদের জীবনেতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলিতেছে। মিঠা জলের মাছের চাষের জন্য জলের নানা ব্যবস্থা প্রয়োজন। অতি গভীর জল মাছ-চাষের জন্য ভাল নয়। কারণ জল যদি অতি গভীর হয় তবে খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী, দুই-ই সূর্য্যালোক না পাওয়াতে বাড়ে না এবং খাদ্যাভাব ঘটায় মাছও বাড়ে না। নূতন কাটা পুকুরে শৈবাল, ক্ষুদ্র চিংড়ি প্রভৃতি সহজে পাওয়া যায়, সে কারণে ছোট চারা মাছ ভাল বাড়ে। কিন্তু জলজ গাছ না থাকাতে পরিণত বয়সের মাছের বাড় হওয়া দূরে থাক তাহারা রোগা ও মাথা মোটা অবস্থায় পরিণত হয়। আবার পুরাতন পুকুরে ছোট চারা ভাল বাড়ে না, কারণ তাহাদের খাদ্য—ক্ষুদ্র শৈবাল, ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী ও ক্ষুদ্র চিংড়ি কম জন্মায়। কত জলে কত বাচ্চা পোনা ফেলা চলে—এটা একটা সাধারণ জিজ্ঞাস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের মত এই যে, দৈর্ঘ্যে ৫০ ফুট, প্রস্থে ৫০ ফুট, উচ্চে ১০ ফুট জলে প্রথম অবস্থায় ২ হাজার পোনার শিশু দেওয়া যাইতে পারে। ৬ মাস পরে তাহা হইতে এক চতুর্থাংশ তুলিয়া লওয়া উচিত। তাহা না হইলে মাছের স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব ঘটিবে। আরও ৬ মাস পরে অর্দ্ধেক তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আবার নূতন চারা ১০০০ দিতে হইবে। ৫ বৎসরে প্রথম বৎসরের সবটাই তুলিতে হইবে, তাহা না হইলে স্বাদ কমিয়া যাইবে ও বাড়ও এত হ্রাস পাইবে যে, ব্যবসা হিসাবে তাহা ক্ষতিজনক।

দুই বা আড়াই টাকায় ক্ষুদ্র পোনা শিশু ২০০০ পাওয়া যায় ও ৬ মাস পরে ছুট বাদ দিয়া সেই দুই হাজার হইতে ১২০০ মাছ অন্ততঃ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি অন্ততঃ ১ ছটাক ওজনে হইবে। তাহা হইলে বুঝুন এ ব্যবসায়ে লাভ কত। শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মাছের পরের প্রাণী হইল উভচর শ্রেণী। ইউরোপে ফরাসী রাজ্যে এই শ্রেণীর মধ্যে ব্যাঙের

পিছনের পা খুব সুস্বাদু হিসাবে খাওয়া হয়।

ইহার পর সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে টিকটিকি, গোসাপ এবং সাধারণ সাপ খাওয়ার প্রচলন ভারতে কোন কোন আদিম অধিবাসীর মধ্যে দেখা যায়। সরীসৃপের মধ্যে কচ্ছপ সর্বসাধারণের খাদ্য। ইহাদের ডিমও খাওয়া হয়। কচ্ছপের মাংস ভাল বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আমরা মাছের বা কচ্ছপের ডিম খাইলেও সাধারণতঃ ডিম বলিলে তাহা পাখীর অর্থাৎ হাঁস বা মুরগীর ডিম বলিয়াই মনে করি। ডিম অত্যন্ত পুষ্টিকর। একটি মুরগীর ডিম এক গ্লাস গরুর দুধের অপেক্ষা বলকারক। হাঁস ও মুরগীর ডিম যাহা সাধারণতঃ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা প্রায়ই খাওয়া বা অনিষিক্ত ডিম। নিষিক্ত ডিমে প্রায়ই ভ্রূণ থাকে ও তাহা লোকে খাইতে পছন্দ করে না। আমাদের দেশী মুরগীর ডিম আকারে অতি ছোট, বিলাতী মুরগীর ডিম আমাদের দেশের হাঁসের ডিমের মত বড়। আজকাল আমাদের দেশী হাঁস ও মুরগীর ডিমের দাম অত্যন্ত বেশী; এমন কি বিলাত হইতেও বেশী। অধিক সংখ্যক ডিম পাইতে হইলে হাঁস ও মুরগীকে যথেষ্ট পরিমাণে ছানা জাতীয় (প্রোটিন) খাদ্য খাওয়ান একান্ত প্রয়োজন। শুঁটকি মাছের গুঁড়া দ্বারা জান্তব প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। তাহাছাড়া চিনা-বাদামের নরম খোলা, নারকেলের ছিবড়া প্রভৃতিও ব্যবহার করা চলে। স্নেহজাতীয় পদার্থ বা শ্বেতসার খাওয়াইলে হাঁস ও মুরগীর দেহ মোটা হয়। হাড়ের গুঁড়া বা মাছের কাঁটা হইতে যথেষ্ট ফস্‌ফরাস পাওয়া যায়। তাহাছাড়া হাঁস ও মুরগী যাহাতে বীজাণুমুক্ত থাকে তাহার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের গরম দেশের উপযুক্ত নানা ব্যবস্থার জন্য মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত এদিকে বিশেষ কিছু হয় নাই। এদিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ডিমে তা' দেবার জন্য তা'-কলের ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, কিন্তু এবিষয়ে চীন, জাপানে মাটির জালার মত এক প্রকার তা'-কল পাওয়া যায় যাহার মধ্যে ১০০০টি ডিমে তা' দিয়া বাচ্চা ফোটান যায় ও তাহার মোট দাম মাত্র ১৫্। আমরা এসব বিষয় খোঁজ রাখি না, কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাস দিবারাত্র পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করি।

মাংস হিসাবে পাঠা, ভেড়া, গরু, হরিণ এবং খরগোস ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যে সমস্ত জ্ঞান থাকিলে মাংসের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহার দিকে একেবারে নজর নাই। এদিকে মৌলিক গবেষণার একান্ত প্রয়োজন।

জড়-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বিশ্বে অনেক আরামপ্রদ দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দূরত্বকে মানুষ একেবারে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হইয়াছে। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভূত উপকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু জীব-বিজ্ঞানও জড়-বিজ্ঞানের সমকক্ষ তো বটেই, বরং তাহা হইতে আরও বেশী উচ্চ স্থান পাইতে পারে। কারণ জীবন না থাকিলে জড়-বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব জড়-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান অন্ততঃ সমানভাবে আমাদের অনুশীলন করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। জ্ঞান বিতরণই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রসায়নঘটিত খাদ্য

শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

জার্মান বিজ্ঞানীরা অনেকবার দুঃসাধ্য সাধন করিয়া দেশের দায় উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তি শুধু যে জার্মেনীরই উপকারে লাগিয়াছে তাহা নহে, সেগুলি সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধন করিতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাসায়নিক হাবের বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈয়ারী করার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এবারও তাঁহারা অনেক কিছু করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুই একটির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস জার্মেনীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে খাদ্য। শান্তির সময় জার্মেনীর শিল্পসম্ভারের বিনিময়ে এইগুলি সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই; কিন্তু যুদ্ধের সময় বিদেশের উৎস বন্ধ হইয়া গেলে দেশবাসীকে বিষম দায়ে ঠেকিতে হয়। সবচেয়ে বড় দায় খাদ্যের। মানুষের খাদ্যের জন্য কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ একান্ত প্রয়োজন। ইহার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট শস্য হইতে সংগৃহীত হয়। প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ ইউরোপে প্রধানতঃ গরু, ভেড়া, ছাগল, মাছ হইতে সংগৃহীত হয়। গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশু আবার তাহাদের খাদ্যের জন্য নির্ভর করে ক্ষেত্রজ হরিৎ পদার্থের উপর। যুদ্ধের সময় জার্মেনীর যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হইত তাহাই তাহার ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইত না। পশুর খাদ্য একরূপ থাকিত না বলিলেই হয়। কাজেই মাংস, মাখন ইত্যাদি পশুজাত দ্রব্যের দারুণ অভাব দেখা দেয়।

সেইজন্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই জার্মেনীর বিজ্ঞানীরা প্রচলিত খাদ্যবস্তুর বদলে অন্য কোন জিনিস খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না, তাহার খোঁজ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৫-১৬ সালে ডিক্কেল খাদ্যরূপে 'ঈষ্ট' নামক পদার্থের ব্যবহারোপযোগীতা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্বেতসার, শর্করা ইত্যাদি গাঁজাইবার জন্য যে সকল খমির ব্যবহার হয়, ঈষ্ট তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য মদের ভাঁটিতে, রুটি ও কেক তৈরীর কারখানায় ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মদের ভাঁটির তলায় ঈষ্টের পুরু স্তর জমিয়া যায়। ডিক্কেল দেখান যে, ঈষ্টের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ছাড়াও নানাপ্রকার উপকারী ভিটামিন আছে। কাজেই ঈষ্ট ঝোলে, তরকারীতে কিংবা রুটির সঙ্গে মাখাইয়া খাইলে খাদ্যের মূল্যবান পরিপোষক হয়। ইহার পরে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, ঈষ্ট অল্প পরিমাণে নিয়মিত ব্যবহার করিলে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা হয়। অতএব কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

শর্করা বা শ্বেতসার গাঁজাইবার পর মদের ভাঁটির তলায় যে স্তর জমে তখনকার দিনে সেইগুলি ছিল ঈষ্ট সংগ্রহ করিবার একমাত্র উৎস। কিন্তু নিয়মিতভাবে খাদ্যের পরিপোষক হিসাবে ঈষ্ট ব্যবহার করিতে হইলে একটা জাতির পক্ষে মদের ভাঁটি হইতে সংগৃহীত ঈষ্ট মোটেই পর্যাপ্ত নহে। শ্বেতসার ও শর্করা উভয়ই মানুষের মূল্যবান খাদ্য। যুদ্ধের সময় জার্মেনীতে এই সকল জিনিসের দারুণ অভাব ঘটে, কাজেই মদ তৈয়ারীর পরিমাণও সঙ্কুচিত করিতে হয়। কাজেই

ঈষ্টের পরিমাণ আরও কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের সময় শ্বেতসার হইতে খাদ্য ছাড়া মোটর স্পিরিট, গ্লিসারিন, ঔষধাদি, ল্যাকটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও তৈয়ারী করিতে হয়।

এই সকল কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগ-পর্বেই জার্মান বিজ্ঞানীরা ঈষ্ট উৎপাদনের জন্য অন্য উৎসের সন্ধান করিতে থাকেন। শ্বেতসার ও শর্করা ছাড়া আরও অনেক প্রকারের কার্বো-হাইড্রেট পাওয়া যায়। কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের সব চেয়ে বড় উৎস হইতেছে সেলুলোজ। যাবতীয় উদ্ভিদের শারীরিক কাঠামো সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। কাজেই কোন দেশেই ইহার অভাব নাই। বেশীর ভাগ জায়গাতেই ইহাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান যুগে এই অনাদৃত বস্তুটিকে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য বিজ্ঞানীরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন এবং অসামান্য সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন। রেয়ন, প্লাষ্টিক ইত্যাদি সেলুলোজ হইতেই প্রস্তুত হয়। গত মহাযুদ্ধের পূর্বেই জার্মান বিজ্ঞানীরা সেলুলোজ হইতে দ্রাক্ষা-শর্করা তৈয়ারী করার উপায় আবিষ্কার করেন। সেলুলোজ ঘটিত এই দ্রাক্ষা-শর্করাকে গাঁজাইয়া ঈষ্ট তৈয়ারীর প্রণালীই যুদ্ধের সময় জার্মেনীতে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়।

করাতের গুঁড়া বা বাজে কাঠের টুকরা হইতে দ্রাক্ষা-শর্করা প্রস্তুতের জন্য প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী অবলম্বিত হয়। উদ্ভাবকের নাম অনুসারে একটির নাম বেগিয়ুস প্রণালী, আর একটির নাম শোলার প্রণালী। দুইটি প্রণালীতেই সেলুলোজকে হাইড্রো-লিসিস্ বা আর্দ্র-বিশ্লেষণ দ্বারা শর্করায় পরিণত করা হয়। এই প্রণালীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া খুব সরল। সেলুলোজ ও শর্করার অণুগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত একই। কেবল সেলুলোজের অণু অনেকগুলি শর্করার অণুর সহিত গুরুত্বে সমান। কতকগুলি শর্করার অণু কোন অজ্ঞাত উপায়ে গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া সেলুলোজ অণু গঠন করে—এরূপ অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। আর্দ্র-বিশ্লেষণ দ্বারা শুধু সেই গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সেলুলোজের গুরু অণুগুলি ভাঙ্গিয়া শর্করার হাল্কা অণুতে পরিণত করা হয়।

বেগিয়ুস প্রণালীতে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করা হয় গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে। সকল প্রকার কাঠের গুঁড়া বা টুকরা, খড়, ফলের বীজের টুকরা এই প্রণালীতে ব্যবহার করা চলে। কাঠের টুকরা ব্যবহার করিলে সেগুলি যন্ত্রের সাহায্যে এমনভাবে কাটিতে হয় যাহাতে দৈর্ঘ্যে এক সেন্টিমিটারের বেশী না হয়। কাটা টুকরাগুলি বা গুঁড়াগুলি যন্ত্র সাহায্যে শুষ্ক করিয়া লওয়া দরকার। এই প্রক্রিয়ার ফলে উদ্গত গরম গ্যাসকে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের মধ্য দিয়া চিমনির পথে বাহির হইতে দেওয়া হয়। যে দিক দিয়া গরম গ্যাস যন্ত্রের মধ্যে ঢোকে, তাহার উল্টা দিক দিয়া কাঠের গুঁড়া বা টুকরাগুলিকে যন্ত্রের মধ্যে ঢোকান হয়। টুকরাগুলি যখন আস্তে আস্তে গরম যন্ত্রের মধ্য দিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া আসে তখন তাহার আর্দ্রতা শতকরা ছয় ভাগে নমিত হইয়া যায়। এরপর কাঠগুলিকে অ্যাসিডে সিক্ত করিবার জন্য আরকপাত্রে ঢালা হয়। এই পাত্রগুলির ভিতরকার আয়তন প্রায় ৫০ ঘন মিটার এবং উহার দেওয়ালে রাবার বা অ্যাসিড-রোধক ইটের আস্তর দেওয়া থাকে। পাত্রে শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণের গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দেওয়া হয়। এতখানি গাঢ় অ্যাসিড এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বহিয়া আনা বিপজ্জনক বলিয়া অধিকাংশ কারখানা-তেই উহা ক্লোরিন ও দীপক গ্যাস (Producer Gas) হইতে টাট্‌কা তৈয়ারী করার ব্যবস্থা আছে। বেগিয়ুস প্রণালীতে আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি সাধারণ বায়ুচাপে ও সাধারণ উত্তাপেই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, তবে খুব গাঢ় অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় বলিয়া সেলুলোজ হইতে যে সকল শর্করা তৈয়ারী হইতে পারে তাহার মধ্যে কয়েক শ্রেণীর শর্করা নষ্ট হইয়া

যায়। ইহাতে যে পরিমাণ সেলুলোজ অব্যবহার্য হইয়া যায়, তাহা নিবারণ করার জন্য অনেক কারখানাতে জারকপাত্রে দেওয়ার আগে পৃথক আর এক পাত্রে কাঠগুলিকে খুব লঘু অ্যাসিডে (শতকরা ১ ভাগ) ঘণ্টা চারেক ফুটাইবার পর জলে ধুইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। জারকপাত্রে প্রায় ৫৫ঘণ্টা থাকিলে আর্দ্র-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়। এক সঙ্গে প্রায় ১৪টি পাত্র ব্যবহৃত হয়। প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে পাত্রে সিরাপের মত যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহার শতকরা ৩২ ভাগ শর্করা, ২৮ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও বাকী জল থাকে। এই সিরাপকে একত্র করিয়া ৪০ ডিগ্রি উত্তাপে, ৩ হইতে ৪½ সেন্টিমিটার চাপে যন্ত্রে ফুটান হয়। ইহাতে জল ও অ্যাসিড উভয়ই কিছু পরিমাণ উবিয়া যায় এবং শর্করার পরিমাণ শতকরা ৬০ হইতে ৬৩ এবং অ্যাসিডের পরিমাণ ২ হইতে ৫ এ পরিণত হয়। এখন ইহার মধ্যে আবার জলীয়বাষ্প চালাইয়া ফুটান হয়। তাহার পরও যে সামান্য অ্যাসিড সিরাপের মধ্যে থাকিয়া যায় তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য চুন দেওয়া হয়। চুন যোগ করার পর যে সিরাপ থাকে তাহার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ১০ ভাগ পেন্টোজ শ্রেণীর শর্করা, বাকী দ্রাক্ষা-শর্করা থাকে। ইহাকে এখন সরাসরি খমির যোগে সন্ধিত করা চলে।

শোলার-প্রণালীতে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বদলে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। খরচ কিছু কম হইলেও এই প্রণালীতে অধিকতর বায়ুচাপ ও উত্তাপের প্রয়োজন। কিন্তু কাঠগুলিকে শুকাইবার আবশ্যকতা থাকে না। কাঠের গুঁড়া বা টুকরাগুলিকে শতকরা ০.৫ হইতে শতকরা ০.৮ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ভিজান হয়। ১০০ ভাগ কাঠে ৮ হইতে ১২ ভাগ অ্যাসিড ও ১২০০ ভাগ জল লাগে এবং ১৩০° হইতে ১৯০°র উত্তাপ ও তদুপযুক্ত বাষ্পীয় চাপের প্রয়োজন। প্রক্রিয়ার শেষে যে সিরাপ পাওয়া যায়, তাহাতে খড়ি বা চুনের সাহায্যে অ্যাসিড নষ্ট করিবার পর যন্ত্র সাহায্যে ছাকিয়া লওয়া হয়। এই প্রণালীতে সন্ধানোপযোগী শর্করার পরিমাণ কিছু কম উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত উভয় প্রণালীতে প্রস্তুত সিরাপকে সন্ধিত করিয়া এলকোহলে পরিণত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় সেই ভাঁটির তলায় ঈষ্ট জমিয়া থাকে। টরুলা ইউটিলিস নামে এক প্রকার খমির ব্যবহার করিলে এবং ভাঁটিতে সালফেট, ফসফেট ইত্যাদি কতকগুলি লবণ দিলে ঈষ্টের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। গাঁজাইবার শেষে ভাঁটিতে যে দ্রব থাকে তাহাকে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে গাঢ় করিয়া যে সাস্পেন্সন্ বা ঈষ্ট অবলম্বন পাওয়া যায় তাহাকে জলে ধুইয়া যন্ত্র সাহায্যে শুকাইয়া লইলে যে ঈষ্ট পাওয়া যায় তাহাকে সরাসরি খাদ্যে ব্যবহার করা চলে। উপরোক্ত প্রণালীগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার শেষে যে সকল দ্রব থাকিয়া যায় তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অ্যাসিড, শর্করা প্রভৃতি উদ্ধার করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কাঠের মধ্যে সেলুলোজ ছাড়া লিগ্নিন নামে এক প্রকারের জিনিস থাকে। ইহা উপরোক্ত আর্দ্র-বিশ্লেষণের পরে পাত্রের তলায় থাকিয়া যায়। উহাকে শুকাইয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা যায়, আবার না শুকাইয়া ভাঁটিতে যে দ্রব থাকে তাহার সহিত মিশাইয়া উত্তম সার প্রস্তুত করা যায়। তবে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারই বেশী প্রচলিত। বের্গিয়ুস-প্রণালী দ্বারা ১০০০ ভাগ কাঠ হইতে ২৫০ হইতে ৩১০ ভাগ এবং শোলার প্রণালী দ্বারা ১০০০ ভাগ কাঠ হইতে ২০০ ভাগ শুক্নো ঈষ্ট তৈয়ারী করা যায়।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী; তাহাদের খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন পাওয়া যায় একমাত্র ডাল ও দুধে। দুধ এত অল্প পাওয়া

যায় যে, নিরামিষাশী বেশীর ভাগ লোকেরই খাদ্যের মধ্যে প্রোটিনের অংশ এত কম থাকে যে, দেহের সম্পূর্ণ পুষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। জার্মেনীতে যেভাবে ঈষ্ট প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে আমিষের সংস্রব নাই। আমাদের দেশে অনেক সেলুলোজ আমরা আবর্জনা হিসাবে পরিত্যাগ করি; যেমন ধানের তুষ। এইগুলি ব্যবহার করিয়া যদি ঈষ্ট প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে চাষীরও কিছু আয় হয়, আর খুব সস্তায় প্রোটিন ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের উৎপাদন করা যায়। আমাদের দেশের নিরামিষাশী সাধারণ লোক যে খাদ্য নিত্য ব্যবহার করেন তাহা শরীরের পরিপূর্ণ পুষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রচারের দ্বারা যদি সাধারণ লোককে ঈষ্ট ব্যবহারে অভ্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে অল্প খরচে ও অল্লায়াসে খাদ্যের মধ্যে পুষ্টির ভাগ বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে ভারত সরকারের বিজ্ঞান দফ্তরের কিছু বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে

স্নেহজাতীয় পদার্থও খাদ্যের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ এবং ইহার প্রধান উৎস হইতেছে পশুজাত মাখন বা চর্বি অথবা উদ্ভিদজাত তৈল। যুদ্ধের সময় জার্মেনীতে উভয় প্রকারের উৎসই বন্ধ হইয়া যায়। জার্মান বিজ্ঞানীরা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা দেশের অভাব দূর করার জন্য কয়লার গুঁড়াকে মাখনে পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

রসায়নের ছাত্ররা জানেন যে, জলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া জলীয়বাষ্প চালাইলে যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইড থাকে। ইহাকে জলীয় গ্যাস বলে। এই গ্যাসকে যদি ৫ হইতে ১৫ বায়ুমণ্ডলের চাপে ১৯০° হইতে ২০০° উত্তাপে কোবাল্ট চূর্ণের উপর দিয়া চালানো যায় তাহা হইলে উহা প্যারাফিন জাতীয় কতকগুলি হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়। ইহাকে ফিসার-ট্রপস্-প্রণালী বলে। এই প্রণালীতে উদ্ভূত হাইড্রোকার্বনকে পেট্রোলের বদলে ব্যবহার করা হয়। ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি দেশে, যেখানে খনিজ পেট্রোলের উৎস নাই সেখানে এই প্রণালীর অনেকগুলি কারখানা আছে। আমাদের দেশেও এই ভাবে পেট্রোল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করার জন্য সরকারী পরিকল্পনা আছে। এই প্রণালীতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহার সঙ্গে খানিকটা মোমের মত জিনিসও পাওয়া যায়। ইহাকে মোমবাতি তৈয়ারীর কাজে লাগানো যায়। কিন্তু মোমবাতি না করিয়া এই বস্তুটিকে ১১০° উত্তাপে গলাইয়া কিছু পটাশ পার্মাঙ্গানেট্ মিশাইয়া তাহার মধ্য দিয়া হাওয়া পাম্প করিয়া দিলে উহার শতকরা ৩৫ ভাগ অ্যাসিডে পরিণত হয়। তখন উহা হইতে পারমাঙ্গানেট্ জলে ধুইয়া বাহির করিয়া দিয়া সোডা দ্রবের সঙ্গে ফুটাইলে সাবান পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য এই অবস্থায় কিছু পরিমাণ সোডা-ক্ষারও যোগ করা হয়। প্রক্রিয়ার শেষে যে তরল পদার্থ ভাঁটিতে থাকে তাহার মধ্যে সাবানের একটি স্তর আর অবিকৃত হাইড্রোকার্বনের একটি স্তর থাকে। উহাদের পৃথক করিয়া লইয়া হাইড্রোকার্বন স্তর হইতে আবার পূর্বোক্ত প্রণালীতে আরও অ্যাসিড তৈরী করা হয়। সাবানের স্তরটিকে ৩০ বায়ুমণ্ডলের চাপে ১৫০° উত্তাপে অটোক্লেভযন্ত্রে ফুটাইলে খানিকটা অবিকৃত প্যারাফিন বাহির হইয়া আসে। তাপ ক্রমশঃ ৩৮০ ডিগ্রীতে উঠাইলে সাবানের সহিত মিশ্রিত আরও কতকগুলি অবাঞ্ছিত বস্তু উবিয়া যায়। এখন গলিত সাবানকে অনেকখানি জল ও সামান্য সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ফুটাইলে আর্দ্র-বিশ্লেষণ সুরু হয় এবং শেষে সাবানের অ্যাসিড পৃথক হইয়া আসে। এখন অ্যাসিডকে লঘুচাপে আংশিক পাতন করা হয়। এই আংশিক

পাতনের মধ্যঅংশে যে অ্যাসিড সংগৃহীত হয় তাহাদের অণুসকলে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা ১১।১২ থাকে। এই অংশ হইতে মাখন প্রস্তুত করা যায়।

মাখন তৈয়ারীর জন্য অ্যাসিডের সহিত নিম্ন-শ্রেণীর গ্লিসারিন যোগ করিয়া শতকরা ০'২ ভাগ টিন বা দস্তার গুঁড়া মিশাইয়া, উহাকে অতি লঘু চাপে ধীরে ধীরে প্রায় ২০০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। তারপর মিশ্রণটিকে ঠাণ্ডা করিয়া লঘু সাল-ফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা ধুইলে টিন বা দস্তার গুঁড়া গলিয়া বাহির হইয়া যায়। এখন বিশ্লেষণ দ্বারা অ্যাসিডের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া তাহাকে প্রমাণিত করার মত হিসাব করিয়া লঘু সোডা-ক্ষার মিশাইতে হয়। তারপর ঐ মিশ্রণ হইতে স্নেহবস্তর তরটিকে পৃথক করিয়া শূন্য-পাতন বা ভ্যাকুয়াম ডিষ্টিলেশন দ্বারা জলশূন্য করা হয়। এখন জলশূন্য স্নেহপদার্থগুলিকে অস্থি-অঙ্গারযোগে বর্ণ ও গন্ধ শূন্য করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এই ছাঁকা তরল স্নেহপদার্থ আবার বাষ্পীয় পাতন দ্বারা শুদ্ধতর করিয়া শতকরা ২০ ভাগ বিশুদ্ধ জল, একটু লবণ ও ক্যারোটিন নামক ভিটামিন মিশাইলেই অবিকল গাওয়া মাখন পাওয়া যায়। ইহা যে শুধু মাখনের মতন দেখিতে তাহাই নয়, পুষ্টিশক্তিতেও উহা মাখনের সমান। ভারতীয় কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছেন যে, রুটিতে মাখাইলে মাখন হইতে ইহার কিছু পার্থক্য বুঝা যায় না, কিন্তু শুধু খাইলে একটু মোমের মত স্বাদ পাওয়া যায়। এইভাবে প্রস্তুত মাখন আমাদের দেশে খাদ্যাভাবে কেহ ব্যবহার করিতে রাজী হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু ফিসার-ট্রপ্‌স্ প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত হাইড্রোকার্বন হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে থাকিলে যে সকল তৈল ইত্যাদি সাবান তৈয়ারীর কাজে লাগে সেগুলি বাঁচিয়া যায় এবং লোকের খাদ্যের কাজে লাগে। ইহার যে প্রয়োজন নাই তাহা নয়, কেন না তৈলের দাম যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, দেশে ব্যবহারোপযোগী তৈলের প্রাচুর্য নাই। আর প্রাচুর্য থাকিলেও সারা পৃথিবীতে জৈব তৈলের এত অভাব যে, ইহা রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে আমরা স্বচ্ছন্দে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস আমদানী করিতে পারি। কাজেই এই-ভাবে হাইড্রোকার্বন প্রস্তুত প্রণালীর চেষ্টা আমাদের দেশেও হওয়া উচিত।

ফিসার-ট্রপ্‌স্ বা অনুরূপ প্রণালীতে ব্যবহারের জন্য যে গ্যাস লাগে, তাহা এমন নিম্নশ্রেণীর কয়লা হইতে প্রস্তুত করা যায়, যাহা জ্বালানী বা ধাতু নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহার করা যায় না। সম্প্রতি মাদ্রাজে লিগনাইট্ নামক নিম্নশ্রেণীর কয়লার বিস্তৃত খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার কিয়দংশ এইভাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে। আর এই সকল প্রক্রিয়াগুলি আরও সস্তায় চালাইবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইতে পারে। কোবাল্ট চূর্ণের বদলে লৌহচূর্ণ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফলে আভাষ পাওয়া যাইতেছে যে, বেশী কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যাসিড হইতে যে মাখন বা সাবান তৈয়ারী করা যায়, লৌহচূর্ণ ব্যবহার করিলে তাহার পরিমাণ বেশী হয় এবং প্রক্রিয়াটি কম তাপেও চালানো যায়। এবিষয়ে গবেষণা আমাদের দেশেও নিরর্থক হইবে না।

প্রবন্ধটি শেষ করিবার আগে একটি কথা বলা প্রয়োজন। জার্মেনীর শিল্পবিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদের শিল্পকৌশলগুলি অন্যদেশের লোকের জানিবার উপায় থাকে না, জানিলেও তাহার ব্যবহার করা চলেনা; কেন না শিল্প প্রক্রিয়াগুলি পেটেণ্ট অধিকার দ্বারা রক্ষিত থাকে। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিজেতা শক্তি জার্মেনীর পেটেণ্ট বর্ণিত শিল্পকৌশলগুলিকে সাধারণ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন এবং এইসব প্রক্রিয়া খুঁটিনাটি স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা নির্ধারিত করিয়া প্রকাশ করিয়া-ছেন। এই সংক্রান্ত অনেকগুলি পুস্তক ব্রিটিশ সরকারের ষ্টেশনারী অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলিতে বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রচেষ্টার খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলিকে কাজে লাগাইতে কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। ঐগুলি আনাইয়া আমাদের দেশের শিল্পবিজ্ঞানীদের ও শিল্পপতিদের গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। এরূপ সুযোগ আর দ্বিতীয়বার পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী পাঠাগারগুলিতেও এই পুস্তিকাগুলির সম্পূর্ণ সংগ্রহ থাকা প্রয়োজন। উপরিবর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি এইরূপ পুস্তিকা হইতেই সংগ্রহ করা এবং বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, পুস্তিকাগুলির মধ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া আছে।

ট্র্যানজিষ্টর

বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্যে প্রবাহিত ইলেকট্রন স্রোতের আড়াআড়িভাবে তড়িৎ প্রভাবান্বিত তারের জালতি বসিয়ে ইলেকট্রন স্রোতকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন—১৯০৬ সালে লি ডি ফরেষ্ট নামে আমেরিকার একজন তরুণ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। এব্যবস্থায় ইলেকট্রন-প্রবাহকে বাধা দেওয়া, কমিয়ে দেওয়া বা ইচ্ছামত বন্ধ করে দেওয়া যায়। তাছাড়া ক্ষীণ ইলেকট্রন প্রবাহ একপ্রান্ত দিয়ে নলের মধ্যে ঢুকে বহুগুণে বর্ধিত হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। ডি ফরেষ্টের এই আবিষ্কার খুব সরল, সাধারণ হলেও একে ভিত্তি করেই ব্যবহারিক তড়িৎ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অপরিসীম অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এ থেকেই এসেছে আজকের রেডিও, টেলিভিসন, রেডার, এক্স রে ক্যামেরা, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র এবং আরও অনেক কিছু। ইলেকট্রনিক টিউবের সাহায্যেই এসকল অপূর্ব যন্ত্রাদির অভাবনীয় কার্য-কারিতা সম্ভব হয়েছে। ডি ফরেষ্টের আবিষ্কারের পর হতে এপর্যন্ত ইলেকট্রনিক টিউবেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে অসাধারণ; তাছাড়া ইলেকট্রন সম্পর্কিত অনেক নতুন রহস্যও জানা গেছে। এত দিন এ-ব্যাপারে বায়ুশূন্য নল অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতো; কিন্তু এখন দেখা গেছে সে ধারণা ঠিক নয়। সম্প্রতি বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানী এসম্বন্ধে এমন একটা ব্যাপারের সন্ধান পেয়েছেন যাকে ডি ফরেষ্টের আবিষ্কারের মতই সরল এবং গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে—বায়ুশূন্য নলের পরিবর্তে কঠিন ক্রিষ্ট্যালের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় ট্র্যানজিস্টর নামে অতি সরল গঠনের একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। বায়ুশূন্য নলের সাহায্যে যেসব কাজ করা সম্ভব, ট্র্যানজিস্টরের সাহায্যেও সেরূপ অনেক কিছুই করা যেতে পারে। তাছাড়া বায়ুশূন্য নলের চেয়ে এর কতকগুলো সুবিধাও আছে। ট্র্যানজিস্টরে বায়ুশূন্য নল, গ্রিড, প্লেট অথবা ক্যাথোড ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। ভ্যাকুয়াম টিউবে উত্তপ্ত ক্যাথোড নেই বলে উত্তাপেরও দরকার হয় না। তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্র্যান্‌-জিস্টর কাজ করতে থাকে। কতকটা একারণেই ভ্যাকুয়াম টিউবের চেয়ে ট্র্যানজিস্টরে তড়িৎ-শক্তির ব্যয় অনেক কম। একটা ফ্ল্যাসলাইট-বালব্ জ্বালতে যতটা তড়িৎ-শক্তি লাগে, এতে লাগে তার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ট্র্যানজিস্টর যন্ত্রটা অতি ক্ষুদ্র; লম্বায় একটা পেপার ক্লিপের অর্ধেকের বেশী নয়। পেন্সিলের মাথায় যেমন ছোট্ট ইরেজার থাকে সেরকমের ছোট্ট একটা ধাতব চোঙের মধ্যে এক টুকরা

জার্মেনিয়াম বসানো আছে। জার্মেনিয়াম খুব শক্ত অথচ ভঙ্গুর একরকম চকচকে পদার্থ। তড়িৎ-প্রবাহের পক্ষে পদার্থটা অর্ধপরিচালক। এর ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন স্বচ্ছভাবে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালিত হয়, অপরদিকে সেরূপ হয় না। অর্থাৎ জার্মেনিয়ামের একদিকে 'অলটারনেটিং' তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করলে অপরদিক দিয়ে 'ডাইরেক্ট' তড়িৎ-প্রবাহ বেরিয়ে আসবে। কাজেই জার্মেনিয়ামকে স্বাভাবিক 'রেক্টিফায়ার' বলা যেতে পারে।

ট্র্যান্‌জিস্টরের সংযোগ ব্যবস্থা

চোঙের মধ্যে স্থাপিত জার্মেনিয়াম টুকরাটির বিভিন্ন স্থানে তিনটি তার সংলগ্ন থাকে। ফটোগ্রাফ এবং অঙ্কিত চিত্র থেকে ট্র্যান্‌জিস্টরের প্রকৃত রূপ এবং সংযোগ ব্যবস্থা বোধগম্য হবে। উপরের দিকে দুটি মোটা তড়িৎ-প্রান্ত অতি সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে জার্মেনিয়ামের সঙ্গে সংলগ্ন করা হয়েছে। সংযোগস্থল দুটির মধ্যেকার দূরত্ব '০০১, অথবা '০০২ ইঞ্চির বেশী নয়। তৃতীয় তারটা জার্মেনিয়ামের নীচের দিক থেকে সাধারণ গ্রাউণ্ড-লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত। এর কোন একটিতে তাড়িতিক সংকেত উপস্থিত হলে জার্মেনিয়াম, ভাল্‌ভের মত কাজ করে' অপর দুটি তারের মধ্যে প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইনপুট সার্কিটে (যেখান থেকে কথাবলা বা গানবাজনা করা হয়) তড়িৎ-শক্তির অ্যাম্পিয়ারেজ এবং ভোল্টেজে যে যে পরিবর্তন হবে, আউটপুট সার্কিটেও (শোনবার দিকটাতে) জার্মেনিয়াম ভাল্‌ভ্‌ ঠিক সেসব পরিবর্তন ঘটিয়ে তুলবে। কাজেই এই উপায়ে এক সার্কিট থেকে অন্য সার্কিটে পরিচালিত করবার সময় তাড়িতিক সংকেতের শক্তি প্রায় একশো গুণের মত বেড়ে যেতে পারে।

গ. চ. ভ.

ট্র্যানজিস্টর

(প্রকৃত জিনিসটার প্রায় আট গুণ বর্ধিতাকার ফটো)

উপর হইতে আলোকপাত

একপাশ হইতে আলোকপাত

সম্মুখ হইতে আলোকপাত

আলো-ছায়ার সামঞ্জস্য আলোকপাত

আলোর আড়ালে অগ্রভূমি

'আলোকচিত্রে আলোক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

আলোকচিত্রে আলোক

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

আলোকচিত্রে আলোকই উহার প্রাণ স্বরূপ। বিষয়বস্তুর উপর কিভাবে আলো পড়িলে তাহার চিত্র সজীব, সুন্দর ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে সকলের আগে তাহা বুঝিয়া দেখা দরকার।

আলোকরশ্মি চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু কোন বস্তুবিশেষের উপর প্রতিফলিত হইলে সেই বস্তুটি দৃশ্যমান হইয়া উঠে। যেখানে আলোক নাই সেখানে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন অন্ধকারে সব কিছুই অদৃশ্য।

একই আলোকের ক্রিয়া একই বস্তুর উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটিয়া থাকে। বস্তুটির গঠন বা অবস্থা ভেদে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আলোকের ক্রিয়ারও তারতম্য প্রকাশ পায়। যে স্থান হইতে যে তেজে আলো প্রতিফলিত হয় সেই স্থান সেই অনুপাতে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। আলোকপাতের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কোন অংশ সুস্পষ্ট, কোন অংশ অস্পষ্ট, কোন অংশ বা একেবারে অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়। যেখান হইতে যত বেশী আলো প্রতিফলিত হয়, বিষয়বস্তুর সেই স্থানটি তত বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যেখানে যে অনুপাতে কম আলো ফোটে, সেই স্থানটি সেই অনুপাতে অন্ধকারময় মনে হয়। আলোকরশ্মি রুদ্ধ হইয়া যেখানে আলোকপাতের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে সেই অংশ পরিপূর্ণ অন্ধকার দেখায়।

ছবিতে আলো-ছায়ার এই খেলা ফুটাইয়া তুলিতে চিত্রশিল্পীকে মোটেই বিব্রত হইতে হয় না। হাতের তুলিতে ইচ্ছামত রঙ প্রয়োগ করিয়া যে ছবি তিনি আঁকেন তাহাতে আলো ও ছায়ার সামঞ্জস্য বজায়ই থাকে। কিন্তু এ স্বাধীনতা আলোকচিত্রকরের নাই। যন্ত্রের দাস তিনি। কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া তাঁহাকে কাজ করিতেই হইবে; নতুবা আশানুরূপ ফল পাওয়ার উপায় নাই। এই কারণে যে বস্তুর আলোকচিত্র তুলিতে হইবে সেই বস্তুর উপর যথাযথভাবে আলো পড়িয়াছে কিনা সেই দিকে সর্বপ্রথমে সতর্ক দৃষ্টি দিলে তাঁহার আলোকচিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

বিষয়বস্তুর চতুর্দিকের দৃশ্যাদির অবস্থানের উপরে আলোকের ক্রিয়া অনেকখানি নির্ভর করে। পার্শ্ববর্তী পদার্থের সান্নিধ্য, দূরত্ব বা অভাব অনুযায়ী বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাতের তারতম্য ঘটে। আশেপাশে পদার্থ থাকিলে সেই সব পদার্থে আলোকরশ্মি প্রতিহত হইয়া বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। আশেপাশে ঐরূপ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে আলোকরশ্মি এইভাবে ফিরিয়া আসিয়া বিষয়বস্তুর উপরে পড়িতে পারে না, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, ফলে, বস্তুর উপর আলোকের ক্রিয়া কম হয়।

আলোকচিত্রে আরও একটি কারণে দিবালোকের ক্রিয়া কম বা বেশী হইয়া ফুটিয়া উঠে। একই আলোকে বিষয়বস্তুর খুব নিকটে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তুলিলে ছবিতে যে উজ্জ্বলতা আসিবে, ক্যামেরা দূরে লইয়া ছবি তুলিলে সে উজ্জ্বলতা আরও বেশী করিয়া চিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। এক কথায়, ক্যামেরা বিষয়বস্তুর যে অনুপাতে নিকটে বা দূরে থাকিবে, ছবিতে দিবালোকের ক্রিয়াও সেই অনুপাতে কম বা বেশী হইয়া প্রকাশ পাইবে।

কৃত্রিম আলোক যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করা চলে। প্রাকৃতিক দিবালোককে আয়ত্ত করা তত সহজ নহে।

তথাপি কিন্তু ছবিকে মনোরম করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ এই দিনের আলোককে প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবার কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। আলোকচিত্রের ব্যাপারে সাধারণতঃ দুই প্রকার দিবালোককে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। প্রথমটি প্রখর, সাক্ষাৎ সূর্যালোক এবং দ্বিতীয়টি, আচ্ছন্ন, ম্লান সূর্যালোক। পরিষ্কার আকাশের তীব্র সূর্যকিরণে যাবতীয় পদার্থের একাংশ অতিরিক্ত ভাবে দীপ্তিমান ও অপরাংশ গভীর ছায়াযুক্ত হইয়া যায়। অপর পক্ষে, মেঘান্তরিত রৌদ্রে বা অন্য কোন উপায়ে আংশিক আচ্ছন্ন অনুজ্জ্বল সূর্যকিরণে পদার্থসমূহের সমস্ত অংশই প্রায় সমভাবে আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায়। প্রখর সূর্যকিরণে ছবির বিষয়বস্তু থাকিলে ছবিতে আলো ও ছায়ার বিপরীত প্রভা উৎকট ভাবে ফুটিয়া চক্ষুকে পীড়া দিতে থাকে। কিন্তু সূর্যকিরণকে খানিকটা মৃদু করিয়া কাজে লাগাইলে এই চক্ষুপীড়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ঘষা কাঁচ বা মিহি সাদা কাপড় অথবা ঐ জাতীয় কোন আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া রৌদ্রকে প্রয়োজনমত নিস্তেজ করিয়া বিষয়বস্তুর উপর নিক্ষেপ করিলে আলো ও ছায়ার এইরূপ অতিবিরুদ্ধভাব প্রকাশ পায় না। মধ্যাহ্ন সূর্যালোক যথাসাধ্য বর্জন করাই কর্তব্য। বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন-কিরণে মানুষের কোন ছবি তোলা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়; কারণ মাথার উপর আলো খাড়া ভাবে থাকিলে ঐ ব্যক্তির চেহারার স্থানে স্থানে এরূপ গভীরভাবে ছায়াপাত হয় যে, চিত্রে ঐ সব স্থান অত্যন্ত শ্রীহীন দেখায়। চক্ষু, নাসিকার নিম্নদেশ, গলদেশ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ঘটে, কারণ মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণকে এই সকল স্থান আড়াল করিয়া রাখে। দ্বিপ্রহরে যদি ছবি তুলিতেই হয়, তাহা হইলে প্রখর রৌদ্রে না তুলিয়া যেখানে দিবালোক ক্ষীণ, সেইখানে ছবির বিষয়বস্তুকে রাখিয়া বেশীক্ষণ এক্সপোজার দিয়া ছবি তুলিতে হইবে।

ছবি তুলিবার সময় দৃশ্যের উপর কিভাবে আলোকপাত হওয়া উচিত তাহা নির্ভর করে যে বস্তুর ছবি তোলা হইবে তাহার গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপর। এমনভাবে আলোকপাতের ব্যবস্থা বা বিন্যাস হওয়া উচিত যাহাতে দৃশ্যবস্তুর আলোকিত অংশের সহিত উহার ছায়াযুক্ত অংশের বৈসাদৃশ্য উৎকটভাবে ছবিতে ফুটিয়া না উঠে। সম্মুখ হইতে যাহাতে দৃশ্যবস্তুর উপর গিয়া আলো পড়ে সাধারণতঃ সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু দৃশ্যবস্তু যদি চেপ্‌টা বা সমতল ধরণের না হয় তাহা হইলে তাহার উপর সোজাসুজি সামনের দিক হইতে আলো না ফেলিয়া একটু কোণের দিক হইতেই ফেলা সঙ্গত। সমতল দৃশ্য সম্পর্কেও আলোকপাতের ব্যবস্থা এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাতে ঐ দৃশ্যের সমস্ত অংশে সমানভাবে আলোর পরিবেশন হয়। অসমতল দৃশ্যবস্তুর উপরে ঠিক সম্মুখ হইতে আলো ফেলিলে সে বস্তুর ছবিতে গঠন-বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই হানি ঘটিয়া থাকে। কোন নরমূর্তির ছবি তুলিতে গেলে এই ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেক মানুষেরই দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় নাসিকাটি বেশ উন্নত; অথচ ঠিক সামনে হইতে আলো ফেলিয়া যে কোন মানুষের ছবি তুলিলে দেখা যাইবে যে, যাহার বাঁশীর মত নাক তাঁহার নাকও চেপ্‌টা হইয়া মুখের অন্যান্য অংশের সঙ্গে প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে তাঁহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেহারাও বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়। ফলে আর যাহাই হোক, ছবি জীবন্ত হইয়া উঠে না। ঠিক সামনে হইতে না ফেলিয়া, আলোক যদি একটুখানি পাশ হইতে দৃশ্যের উপর ফেলা যায়, অথবা ক্যামেরা যদি একপাশে একটু সরাইয়া ছবি তোলা হয়, তাহা হইলে ছবিতে এই প্রকার ত্রুটী থাকে না। এক পাশ হইতে ফেলা এই আলোকের দীপ্তি যদি তীব্র হয় তাহা হইলে

সে দীপ্তিকে পূর্ববর্ণিত উপায়ে আচ্ছাদনের সাহায্যে হ্রাস করিয়া লইতে হইবে। এবং প্রয়োজনমত বিষয়বস্তুর অপর দিকের ছায়াযুক্ত অংশে অনুজ্জ্বল প্রতিফলক (রিফ্লেক্টর) বা ম্লান দর্পণের সাহায্যে আলোকপাত করিতে হইবে। প্রথম আলো অপর দিকের আলোর তুলনায় কিছু বেশী উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক; কারণ প্রথম আলোর কাজ হইবে, দৃশ্যবস্তুর প্রতিরূপকে ছবিতে যথাসম্ভব প্রস্ফুটিত করা। অপর দিকের আলোর প্রয়োজন অন্যরূপ; তাহার কাজ হইল, বস্তুর ছায়াযুক্ত অংশে যথাযোগ্য আলোকপাত করিয়া ছবিতে সেই অংশ যথোচিত পরিস্ফুট করিয়া তোলা, যাহাতে প্রতিরূপের দুই অংশের ভিতর আলো-ছায়ার অতিবিরুদ্ধভাব প্রকাশ না পায়। এই কারণে শেষোক্ত আলোক সমান উজ্জ্বল হইলে চলিবে না; তুলনায় ম্লান হওয়া আবশ্যক। যদি প্রথম আলো তীব্রই থাকিয়া যায় তাহা হইলে সেই আলোয় আলোকিত অংশকে লক্ষ্য করিয়া ক্যামেরায় উচিতমত এক্সপোজার দিলে দেখা যায় যে, ছবিতে প্রতিরূপের ছায়াযুক্ত অংশ অত্যন্ত কালো হইয়া উঠিয়াছে এবং তেমনি আবার অনুজ্জ্বল দিকের উপযুক্ত এক্সপোজার লইলে দেখা যাইবে যে, ছবির উজ্জ্বল দিকটা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ যে সব ছবি তোলা হয় তাহার অধিকাংশই হইল সেই সব দৃশ্যের ছবি, যাহার সম্মুখভাগের উপর ক্যামেরা-লেন্সের পিছন হইতে আলো পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি কিন্তু অনেক সময় এমন অবস্থায় তোলা হয় যখন সেই দৃশ্যের অগ্রভূমি আলোর আড়ালেই থাকে অথচ তাহার পশ্চাদ্‌ভূমি আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এইরূপ আলোক-সমাবেশে তোলা ছবি প্রায়ই মনোরম হয়।

বস্তুর বর্ণভেদে তাহার উপর আলোকের ক্রিয়ারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। চক্‌ জাতীয় সাদা জিনিসের উপরে শতকরা নব্বই ভাগ, সাদা কাপড়ের উপরে আশি ভাগ, ধূসর রঙের জিনিসের উপরে চুয়াল্লিশ ভাগ, লাল বস্তুর উপরে বিশ ভাগ এবং কালো রঙের উপরে মাত্র পাঁচ ভাগ আলোকের উজ্জ্বলতা পাওয়া যায়।

সাদা ধুতি বা প্যাণ্ট ও কালো কোট একই সময় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে কিছুদিন বাদে দেখা যায় যে, সাদা ধুতি বা প্যাণ্টটি বেশ ময়লা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কালো কোটটি তখনও ময়লা হয় নাই। আসলে কিন্তু দুইটি পরিচ্ছদই সমান ময়লা হইয়া যায়। বর্ণভেদে বস্তু দুইটির উপর আলোকের ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে বলিয়াই ঐ রূপ মনে হয়। কালো রঙ প্রায় সমস্ত আলো শুষিয়া লয়, খুব সামান্যই প্রতিফলিত করে।

আলোকপাতের ফলে চারিদিকের দৃশ্যাবলী হইতে বর্ণচ্ছটাসমূহ যে যে রূপ লইয়া আমাদের চোখের পর্দায় ফুটিয়া উঠে, সেই সব বর্ণমালা লেন্সের ভিতর দিয়া ক্যামেরার প্লেট বা ফিল্মের উপর পড়ে, কিন্তু সেই সেই রূপে ফোটে না। একটি দৃশ্যে যতগুলি রঙই থাকুক না কেন, সেই সব রঙের বিভিন্ন রূপ প্লেটে ধরা পড়িবে একমাত্র আলো ও ছায়ার রূপ ধরিয়া। এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে প্লেটের উপরে এই আলো-ছায়া বেশী বা কম হইয়া ফুটিবে। সমস্ত প্রকারের রঙই যে আবার সমস্ত শ্রেণীর প্লেট বা ফিল্মে ধরা পড়িবে তাহাও নয়। এক এক শ্রেণীর প্লেট বা ফিল্ম মাত্র কয়েকটি করিয়া বর্ণদ্যুতি গ্রহণ করে। সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর প্লেট বা ফিল্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—সাধারণ বা অর্ডিনারি, ক্রোম ও প্যান। বর্ণচ্ছটাগুলির ক্রিয়া উহাদের উপর নিম্নলিখিত রূপ হইয়া থাকে:—

অর্ডিনারি বা সাধারণ	বেগুনি, গাঢ়নীল, নীল ও সবুজ

ক্রোম :—বেগুনি, গাঢ়নীল, নীল, সবুজ ও হলদে
প্যান :—বেগুনি, গাঢ়নীল, নীল, সবুজ, হলদে, জরদা ও লাল।

যদিও একথা সত্য যে, প্লেট বা ফিল্মের শ্রেণী অনুসারে বিশেষ বিশেষ বর্ণের দ্যুতি উহাদের উপর কাজ করিয়া থাকে তথাপি কিন্তু নীলচ্ছটার ক্রিয়াশক্তি সব রকম প্লেট বা ফিল্মের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের আলোকচিত্র লইলেই দেখা যায় যে, সে দৃশ্যে যদি সুনীল আকাশ থাকে তাহা হইলে আকাশের সেই নীলিমার ঔজ্জ্বল্য প্লেটের উপর এত বেশী উগ্র তেজে কাজ করিয়াছে যে, ছবিতে সমস্ত আকাশটি অস্বাভাবিক সাদা হইয়া ফুটিয়াছে। বর্ণবিশেষের আলোক-প্রতিফলন বিষয়ে এই ধরণের উগ্রতা লেন্সের মুখে উপযুক্ত "ফিল্টার" (বিশেষ রঙের পরকলা) ব্যবহার করিয়া সংযত করিয়া লওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ "ডেভেলপার" (প্লেট, ফিল্ম বা পেপারের উপর ছবি ফুটাইবার জন্য মিশ্র তরল পদার্থ) ব্যবহারেও ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোকপ্রভাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্লেট বা ফিল্মে তুলিয়া লওয়া সম্ভব হয়।

এক্সপোজার লইবার সময় আলোক সম্বন্ধে আরও দুইটি বিষয় বিশেষ বিচার করিয়া দেখা দরকার। প্রথমটি, বর্ণ-বিচার এবং দ্বিতীয়টি, প্লেট ও ফিল্মের শ্রেণী ও শক্তি-বিচার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বস্তুর উজ্জ্বলতা ক্যামেরায় ধরা পড়ে তাহার বর্ণ অনুযায়ী। সুতরাং ছবি তুলিবার সময় বস্তুর বর্ণ কি, তাহা লক্ষ্য করিয়া কি অনুপাতে তাহার ঔজ্জ্বল্য ছবিতে আসিবে তাহা বিচার করিয়া তবে ক্যামেরায় এক্সপোজার দেওয়া উচিত। একাধিক রঙের বিষয়বস্তু হইলে উহার প্রধান অংশের যে রঙ তাহার ঔজ্জ্বল্যের শক্তি হিসাব করিয়া এক্সপোজার লইতে হইবে। মনে করুন, একটি লোকের ছবি তোলা হইতেছে। ঐ লোকটির মাথার টুপির রঙ সাদা, গায়ের কোটের রঙ কালো, পরিধানের পরিচ্ছদের রঙ ধুসর এবং মুখমণ্ডলের রঙ স্বাভাবিক শরীরের রঙের মত। ছবি তুলিবার সময় লোকটির মুখের ছবিই ভাল করিয়া তোলা উচিত, কারণ মুখই তাহার আকৃতির প্রধান অংশ। সুতরাং ক্যামেরায় এক্সপোজার দিবার সময় তাহার মুখের রঙের কি পরিমাণ ঔজ্জ্বল্য ক্যামেরায় আসিবে তাহা হিসাব করিয়া সেই মত এক্সপোজার দিতে হইবে। এইরূপ পক্ষপাতিত্বের ফলে লোকটির আকৃতির অন্যান্য অংশের ঔজ্জ্বল্য সমানানুপাতে ছবিতে না আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ত্রুটীর অনেকখানিই এড়ানো যায় লেন্সের উপরে ফিলটার ব্যবহার করিয়া এবং যে প্লেট বা ফিল্মে ছবি তুলিতে হইবে সেই প্লেট বা ফিল্মের যথোপযুক্ত বাছাই করিয়া। ইহার পরেও যে সামান্য ত্রুটী এখানে ওখানে থাকিয়া যায় সে ত্রুটী প্রিণ্ট তুলিবার সময় সংশোধন করিয়া লওয়া যায় এবং তার ফলে সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হয়।

আলোকের ক্রিয়া যাহাতে আবশ্যকমত গ্রহণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে লেন্সের সঙ্গে "অ্যাপারচার বা ষ্টপ" এর ব্যবস্থা থাকে। এই অ্যাপারচার ইচ্ছামত ছোট বা বড় করিয়া প্রয়োজনমত আলোক ক্যামেরার ভিতরে প্লেট বা ফিল্মে নেওয়া চলে। যে ক্ষেত্রে আলোকের শক্তি নির্ণয়ে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে কিছু বেশী এক্সপোজার দেওয়া কর্ত্তব্য; কারণ যে নেগেটিভে কম এক্সপোজার দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সামান্য বেশী এক্স-পোজার দেওয়া নেগেটিভ হইতে সহজ প্রক্রিয়ায় সুন্দর প্রিণ্ট প্রস্তুত করা সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোক-প্রভাকে ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া আলোকযন্ত্রের যথোচিত কাজে লাগাইবার নানাবিধ উপায় মানুষের হাতে রহিয়াছে এবং এই সকল উপায়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিলে আলোকচিত্রের আদ্যোপান্ত কাজ অক্লেশে সম্পন্ন হয়।

আলোকচিত্রে আলোকের ক্রিয়া কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে ক্যামেরায় "ফোকাসিং স্ক্রীন্" আছে সেই ক্যামেরায় ঐ স্ক্রীন্ বা পর্দায় যে সব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে তাহাদের উপর আলোকের সমাবেশ কিরূপে ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যাঁহার ক্যামেরায় ফোকাসিং স্ক্রীন্ নাই, ছবি তুলিতে তুলিতে কয়েকখানি ছবির পরই এসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা জন্মিয়া যায়। একেবারে নির্ভুল ভাবে আলোক-শক্তি বিচার করিয়া ছবি তুলিবার ইচ্ছা করিলে আলোকচিত্রকরকে "এক্সপোজার মিটার"-এর সাহায্য লইতে লইতে হইবে।

দিবালোককে সাধারণতঃ কি কি উপায়ে আয়ত্ত করা সম্ভব তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দিবালোক-নিয়ন্ত্রণের ঐসব উপায় যদি দুরূহ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আলোকচিত্রকর অনায়াসে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্য লইতে পারেন। নানা শক্তির বিজলী-বাতিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া ছবি তুলিবার জন্য দৃশ্যবস্তুর উপর যথোচিত আলোকপাত করা মোটেই কঠিন নহে।

পেনিসিলিনের পরে

শ্রীদিলীপকুমার দাস

ব্যবহারিকক্ষেত্রে পেনিসিলিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যখন আর কোনও সন্দেহ রইলো না, তখন বিজ্ঞানীরা মেতে গেলেন ছত্রাক-মহল থেকে রোগ-উপশমকারী আরও ওষুধ উদ্ধার করবার প্রচেষ্টায়। পরিশ্রমসাধ্য অসংখ্য পরীক্ষার দ্বারা তাঁরা অনেক নূতন সংবাদ জানতে পারলেন। তাঁরা দেখলেন শুধু ছত্রাকই নয়, নিম্নস্তরের এককোষী উদ্ভিদ কতকগুলো অ্যাল্‌গিরও ক্ষমতা আছে—রোগজীবাণু প্রতিরোধ করবার। এই বিষয়ে বিজ্ঞানজগতে নব উদ্দীপনায় যে অভিযান সুরু হয়েছে তাতে পাস্তুর, মেচ্‌নিকফ্, লিষ্টার এঁদের সাধনাই সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে।

এই প্রবন্ধটিতে পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর পেনিসিলিন ধরণের যে কয়টি ওষুধের কথা জানা গিয়েছে তারই কয়েকটির কথা আলোচনা করব।

লণ্ডন স্কুল অব্ হাইজিন এ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ হারল্ড রেইস্ট্রিক, পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীভুক্ত, কিন্তু পেনিসিলিয়াম নোটাটাম থেকে ভিন্ন, পেনিসিলিয়াম প্যাটুলাম আবিষ্কার করেন। পেনিসিলিয়াম প্যাটুলাম থেকে প্রাপ্ত প্যাটুলিন অনেক রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী হলেও পেনিসিলিনের মত শক্তিশালী নয়। ডাঃ রেইস্ট্রিক প্যাটুলিন সম্বন্ধে ইম্পিরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ ফাণ্ড (লণ্ডন)-এর ডাঃ গাইকে জানান। ডাঃ গাই ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পেনিসিলিন ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু সফলকাম হননি। প্যাটুলিনের কথা জানতে পেরে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত প্রাণীদের উপর তিনি প্যাটুলিন প্রয়োগ করলেন। এবারও তিনি সফলকাম হতে পারলেন না। ডাঃ গাই এই অসাফল্যে নিরাশ হলেও কতকটা আকস্মিক ভাবে প্যাটুলিনের একটা গুণের কথা জানতে পারলেন। এই সময়ে ডাঃ গাই ভীষণভাবে সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যেই তাঁর নাসিকাভ্যন্তর পরিষ্কার করলেন প্যাটুলিন দিয়ে। তার পরের দিনই ডাঃ গাই সম্পূর্ণরূপে সুস্থবোধ করলেন।

এরপর সর্দিরোগাক্রান্ত তাঁর সহকর্মীরাও পরীক্ষামূলকভাবে প্যাটুলিন ব্যবহার করে সুফল পেলেন। সর্দি নিরাময়ে প্যাটুলিন যে বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী, সেকথা আরও কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলেও জানা গেছে যে, প্যাটুলিন সকল প্রকার সর্দি নিরাময় করতে সমর্থ নয়। কারণ, সর্দির জীবাণু একাধিক এবং ঐ জীবাণুগুলোর কেবলমাত্র একটিই প্যাটুলিনের কাছে হার মানে। সর্দির জীবাণু ছাড়া আরও কতকগুলো রোগজীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা প্যাটুলিনের থাকলেও বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে বলে মানুষের শরীরে এই ওষুধ প্রয়োগ করা যায় না।

এই ঘটনার পর ডাঃ ফ্লোরি এবং ডাঃ চেইন পেনিসিলিয়াম ক্ল্যাভিফর্মে নামক ছত্রাক থেকে 'ক্ল্যাভিফর্মিন' নামক একটি পদার্থ বের করেন। কিন্তু তাঁরা 'ক্ল্যাভিফর্মিন' সম্বন্ধে গবেষণা করে জানতে পারেন যে, এর রাসায়নিক গঠনবিন্যাস এবং ফর্মুলা, প্যাটুলিনের রাসায়নিক গঠনবিন্যাস এবং ফর্মুলার সংগে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

যক্ষ্মা-জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধকারী এক ছত্রাকের সন্ধান কয়েক বৎসর আগে পাওয়া গিয়েছে। এই ছত্রাকটিও পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীভুক্ত। ডাঃ ভি, কে, মিলার ও ডাঃ এ, সি, রেকেট এই ছত্রাক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত প্রাণীদের উপর প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছেন। মানুষ সাধারণতঃ যে যক্ষ্মা-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় সেই জীবাণুর কালচারে উক্ত ছত্রাকটি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মিশ্রণ কতকগুলো গিনিপিগের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেবার পরও গিনিপিগগুলোকে সুস্থ থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই ছত্রাক যক্ষ্মা জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলতে না পারলেও, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন করে ফেলে। মানুষের যক্ষ্মা নিবারণে এই ছত্রাকটি সহায়তা করবে কিনা, এখনও নিশ্চিত জানা যায় নি। এর সহায়তা না পেলেও, ভবিষ্যতে ছত্রাক-জগৎ থেকে যে আমরা যক্ষ্মা আরোগ্যকারী ওষুধ পেতে পারি, তার আভাস এই উদাহরণ থেকেই পাচ্ছি।

অ্যাস্পারজিলাস ক্ল্যাডেটাস নামক ছত্রাক নিঃসৃত 'ক্ল্যাভসিন' জীবাণু-নাশক বলে জানা গেছে এবং জীবাণু-নাশক হিসেবে যে পেনিসিলিনের চাইতেও বেশী শক্তিশালী সেকথাও জানা গেছে। যেসব রোগজীবাণুকে দমন করবার শক্তি পেনিসিলিনের নেই, সেই সকল রোগজীবাণুও ক্ল্যাডেসিনের কাছে হার মেনেছে। ক্ল্যাডেসিন বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হলে মানুষের শরীরের অনিষ্ট হতে পারে, সেজন্য এই ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

অ্যাস্পারজিলাস শ্রেণীভুক্ত আরও একটি ছত্রাক থেকে ফ্লেভাসিডিন নামে একটা জীবাণুনাশক ওষুধ পাওয়া গিয়েছে। ফ্লেভাসিডিন ও পেনিসিলিনের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। যে সব জীবাণুকে পেনিসিলিন পরাভূত করতে পারে, ফ্লেভাসিডিনও ঠিক সেই জীবাণুগুলোকে পরাভূত করে। ইনজেকসনের দ্বারা প্রাণীদেহে ঢুকিয়ে দেবার পর ফ্লেভাসিডিনও পেনিসিলিনের মত অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে আসে।

ডাঃ ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কারের পাঁচ বছর পরে রুশীয় মহিলা বিজ্ঞানী ডাঃ নাখিমোভস্কাইয়া অ্যাক্টিনোমাইসিস শ্রেণীভুক্ত একটি উদ্ভিদের রোগজীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। তিনি বারবার পরীক্ষা করে অ্যাক্টিনোমাইসিসের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। এরপর তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, কোন্ কোন্ জীবাণুকে উক্ত অ্যাক্টিনোমাইসিস পরাভূত করবার শক্তি রাখে। এদিক দিয়ে সমস্ত তথ্য অবগত হবার পর তিনি তাঁর এক সহকর্মীর সংগে অনুসন্ধান করতে লাগলেন, অ্যাক্টিনোমাইসিস শ্রেণীর কতগুলি উদ্ভিদ রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে। তাঁরা এই শ্রেণীর আশীটি উদ্ভিদ পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে সাতচল্লিশটিকেই তাঁরা রোগজীবাণু ধ্বংস

করবার ক্ষমতার অধিকারী দেখতে পান। তাঁদের এই সকল পরীক্ষার ফলাফল ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও পেনিসিলিন বিখ্যাত হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, ডাঃ নাখিমোভস্‌কাইয়ার বহু পরিশ্রমে আবিষ্কৃত এই তথ্যগুলি চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনও কাজেই লাগানো হয়নি।

অক্সফোর্ডের ডাঃ চেইন ও ডাঃ গনর্‌ডনার একটি অ্যাক্‌টিনোমাইসিস থেকে জীবাণুনাশক পদার্থ বের করতে সমর্থ হন। তাঁরা এই পদার্থটির নাম দেন প্রো অ্যাক্‌টিনোমাইসিন। প্রাণীদেহের উপর বিষক্রিয়ার জন্য এই জীবাণুনাশক শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি।

ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান ও ডাঃ এইচ, বি, উডরাফ অ্যাক্‌টিনোমাইসিস ল্যাভেনডুলি থেকে 'ষ্ট্রেপটো-থ্রিসিন' নামক একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক বের করতে পেরেছেন। ব্লাড-পয়জনিং, ইরিসিপ্লাস, স্কারলেট ফিভার, এই সব ব্যাধি ছাড়াও গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে সংক্রামক গর্ভপাতের যে রোগ দেখা যায়, সেই রোগ ষ্ট্রেপটোথ্রিসিন দমন করতে পারে। ষ্ট্রেপটোথ্রিসিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হবে সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত জানা যায়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, এর থেকে সুফলই পাওয়া যাবে।

ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা অ্যাক্‌টিনোমাইসিস অ্যানটিবায়োটিকাস থেকে পাওয়া যেতে পারে, অনধিক এরূপ তিনটি রোগজীবাণুনাশক ওষুধের কথা জানতে পেরেছেন। এর মধ্যে একটি কতগুলো রোগজীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ করে; আর একটি, বিষপ্রয়োগে যেমনভাবে জীবাণু মারা যায় তেমনিভাবে কতকগুলো রোগ-জীবাণু মেরে ফেলে। অবশিষ্টটির কার্যক্ষমতা প্রায় সব রোগজীবাণুর উপর দেখা যায়। বর্তমানে এই ওষুধগুলো যে অবস্থায় পাওয়া গেছে তাতে মানুষের শরীরে কিংবা অন্য কোনও প্রাণীদেহে প্রয়োগ করা যায় না।

রকফেলার হাসপাতালের ডাঃ ডুবোস্‌ মাটিতে অবস্থানকারী একটি শক্তিশালী (রোগ প্রতিরোধক হিসেবে) জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন। এর নাম হলো ব্যাকটেরিয়াম ব্রেভিস, ডাঃ ডুবোস্‌ এই জীবাণু থেকে টাইরোথ্রিসিন নামক একটি পদার্থ বের করেন। এই পদার্থটিই রোগজীবাণু মেরে ফেলতে পারে। এরপর ডাঃ ডুবোস ও তাঁর সহকর্মীরা জানতে পারেন যে, এই পদার্থটি আবার গ্র্যামিসিডিন ও টাইরোসিডিন নামক দুটি বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই দুটির মধ্যে বেশী শক্তিশালী হলো গ্র্যামিসিডিন। গ্র্যামিসিডিন গ্র্যাম-পজিটিভ বিভাগের সব জীবাণু-কেই মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু গ্র্যাম নেগেটিভ বিভাগের জীবাণুর কিছুই করতে পারে না। এদিক দিয়ে পেনিসিলিনের সংগে গ্র্যামিসিডিনের সাদৃশ্য থাকলেও মানবদেহে দুটার প্রয়োগবিধির মধ্যে পার্থক্য আছে। রক্তের লোহিতকণিকা ধ্বংস করে বলে গ্র্যামিসিডিনের ইন্‌জেকশন হয় না। দেহের বাইরে কোনও আঘাতে কিংবা রোগাক্রান্ত স্থানে এই ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। অপর ওষুধ টাইরোসিডিন শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রবার্টসন ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করেছেন যে, ক্লোরেলা নামক অ্যালগা এমন একটি পদার্থ তৈরী করে যেটি ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস ও স্ট্রেপ্টোকক্কাসের বৃদ্ধি রোধ করতে পারে। তাঁরা এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন ক্লোরেলিন।

অস্ট্রেলিয়ান মহিলা জীবাণুতত্ত্ববিদ, মিস্‌ ন্যান্‌সি অ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ জানতে পেরেছেন যে, ব্যাঙের ছাতা জাতীয় কতকগুলো ছত্রাক রোগজীবাণু নাশ করবার অধিকারী। এই ছত্রাকগুলো যেসব রোগ-জীবাণু নাশ করতে পারে তার মধ্যে যক্ষ্মা-জীবাণু অন্যতম। অ্যাক্‌টিনোমাইসিস গ্রিসিয়াস থেকে প্রাপ্ত স্ট্রেপ্টোমাইসিনের নাম আজকাল অনেকেই

জানেন। কলকাতায় প্লেগ রোগীদের মধ্যে এই ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। আরও কতকগুলো ব্যাধিতে এই ওষুধটি সফলতার সংগেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং চিকিৎসকমহল এথেকে অনেক আশাই করছেন।

সর্বশেষে বলছি 'পলিপোরিন'-এর কথা। এই ওষুধটি আবিষ্কার করেছেন কলকাতার আর,জি, কর মেডিক্যাল কলেজের ছত্রাকতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সহায়রাম বসু। পলিপোরিন পাওয়া গেছে পলি-স্টিক্টাস স্যাংগুনিয়াস নামক ছত্রাক থেকে। কলকাতার হাসপাতালগুলোতে পলিপোরিন ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া গেছে তা খুবই আশাপ্রদ। টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড রোগ দমনে পলিপোরিনের কার্যক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। এই দুটি ছাড়াও আরও কতগুলো ব্যাধি—যার মধ্যে কতগুলো পেনিসিলিনের কাছে অপরাজেয়, পলিপোরিন দমন করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পলিপোরিনের আর একটি মস্তবড় সুবিধে হচ্ছে যে, এটি গৃহাভ্যন্তরস্থ সাধারণ তাপে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে না। বর্তমানে পলি-পোরিন বিশুদ্ধভাবে পাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এখানে ছত্রাক ও অন্যান্য নিম্নস্তরের উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত যেসব ওষুধের অল্পবিস্তর সংবাদ আমরা পেলাম সেই সব ওষুধের মধ্যে অনেকগুলোই বিষক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বিজ্ঞানীরা যদি এই ওষুধগুলোর জীবাণুনাশের ক্ষমতা বজায় রেখে এদের বিষক্রিয়াটুকু নষ্ট করে দিতে পারেন, তাহলে মানবসমাজ যে ওষুধগুলো থেকে উপকার পাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি সারা পৃথিবীতে স্নেহ-পদার্থের নিদারুণ অভাব ঘটার ফলে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি সূর্যমুখী ফুলের ওপর পড়েছে, কারণ এই ফুল থেকে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিজ্জ তৈল পাওয়া সম্ভব। উদ্ভিজ্জ-তৈলের জন্য বৃটেনে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করা হচ্ছে। সূর্যমুখী ফুল অবশ্য বৃটেনে নতুন নয়, বহুশত বছর ধরে এই ফুল উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করে আসছে। সূর্যমুখী ফুলের চাষ মোটেই কঠিন নয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি এর কোন ক্ষতি হয় না। সার দেওয়া বা জঙ্গল পরিষ্কার করারও প্রয়োজন হয় না। বৃটেনে এক একর জমিতে চাষ করে এক টন ফুলের বীজ পাওয়া গেছে। সূর্যমুখীর বীজে শতকরা ৩৩ ভাগ তৈল এবং ৩০ থেকে ৪০ ভাগ প্রোটিন থাকে।

সূর্যমুখীর ফুলে ভিটামিন 'বি' এবং 'ই' প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই বীজ থেকে কেবল যে তৈলই পাওয়া যায় তা নয়; এগুলি খেতেও বেশ সুস্বাদু। বল্কান্‌বাসীদের নিকট সূর্যমুখীর বীজ অতি প্রিয়খাদ্য।

পরিকল্পনা-প্রসূত অর্থনীতিতে আবিষ্কারকের স্থান

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে বিত্তহীন অক্লান্তকর্মী মনীষীবৃন্দের কঠোর সাধনা। গোড়ার দিকে জেম্‌স্‌ ওয়াটের স্টীম-এঞ্জিন, কার্ল গুস্তভ লাভালের স্টীম-টারবাইন, ডিজেলের তৈলচালিত যন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মক্ষেত্রের আরও অন্যান্য দিকে নানাপ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। পরবর্তীকালে, টমাস এডিসনের বৈদ্যুতিক আলো, মার্কনির বেতার-বার্তা, ব্যোম-যান, বায়বীয় পোত প্রভৃতি বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অগণিত নূতন আবিষ্কার মানুষকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্তমান স্তরে এনে দিয়েছে।

অতীতকালে কোনও আবিষ্কার বা উদ্ভাবন সহসাই সংঘটিত হতো। ধারাবাহিক ও সুষ্ঠ গবেষণার রীতি প্রচলিত ছিল না। বিজ্ঞান ও কারুশিল্পের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কালে গতানুগতিকতার যুগ শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ প্রয়োজন গবেষণা ও নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন।

ভারতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি প্রথম স্থাপিত ১৯৩৮ সালে। এই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির অনুকরণে, কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতের তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার পরিকল্পনা ও পরিপুষ্টি এই নামে একটি নূতন দপ্তর খোলেন; কিন্তু ঐ দপ্তরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে—এই অজুহাতে কিছুদিন পর দপ্তরটি বন্ধ করে দেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, পরিকল্পনাকে একটি সাময়িক ও স্থিতিশীল কাজ হিসাবে ভাবা অন্যায়; জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনা এমন একটা জিনিস, যাকে সময়োপযোগী করে রূপ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিকল্পনা আর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ একই গাছের দুটি শাখা—পরিকল্পনা হচ্ছে উপপাদ্য গবেষণা, আর এর কার্যে পরিণতি একটা বাস্তব ব্যাপার। কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ ছিলেন দার্শনিক; কিন্তু তাঁদের চিন্তা ও আদর্শকে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে বাস্তব রূপ দান করেন লেনিন ও ষ্ট্যালিন। তাই মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের শিক্ষা আজ জীবন্ত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে বিরাজ করছে। পরিকল্পনার কাজ ও পদ্ধতি এবং যা পরিকল্পিত হয়েছে তাকে কার্যে পরিণত করা, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যারা পরিকল্পনা করতে পারেন তারাই উহাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারেন এটা মনে করা খুবই ভুল, যদিও ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রায়ই একথা মনে করা হয় যে, আই, সি, এস, কর্মচারীবৃন্দ শিল্প, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে আবশ্যকমত যে কোন পরিকল্পনা করতে পারেন এবং সেই সঙ্গেই আবার আবশ্যক হলে যন্ত্র চালানো, কাচের কারখানার চুল্লি জ্বালানো ইত্যাদি সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করতেও সমান পারদর্শী। বাস্তবিক এরূপ অভ্যস্ত হওয়ায় বহুবার বহু সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের। এখন যদি আমরা এই সকল সমস্যার সমাধান চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বপ্রথম জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম হয়।

রাশিয়ার জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি বিভাগ বা গস্-প্ল্যান অন্তর্যুদ্ধ ও বিপ্লবের পরেই স্থাপিত হয় এবং ইহাই এই প্রকার সংগঠনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পকলাবিদ প্রভৃতি সকল রকমের কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আধুনিক রাশিয়ার নির্মাণ ও পুনর্গঠনের বৃহৎ পরিকল্পনার কাজ সম্পাদিত হয়। এই পন্থার প্রথম চেষ্টা হিসাবে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করায় মাত্র ৪ বৎসরে পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে শেষ করার গৌরবে যারা গৌরবান্বিত লেখকও তাহাদের অন্যতম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যথাসময়ে কার্যকরী করা হয়। এই সকল পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার মূলে রয়েছে লেনিনের কর্মময় প্রতিভা। লেনিন তাঁর অন্তরের ভাবকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে দুটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে রাশিয়ার সুদূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত উন্নত করতে চেয়েছিলেন। তাদের একটি বিদ্যুৎ ও অপরটি শিক্ষা। বিজলি বাতিকে রাশিয়ায় ভ্ল্যাডিমার ইলিচ লেনিনের নামানুসারে সাধারণতঃ ইলিচের বাতি বলা হয়। বর্তমান কালে কোন দেশে মাথা পিছু কত কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাই বিচার করে সেই দেশ কতদূর সভ্য তাহা স্থির করা হয়। তাই বলা যেতে পারে বৈদ্যুতিক শক্তি সভ্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড। আবার বিবেকানন্দের কথায় বলতে হয়, শিক্ষার প্রসারেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। রাশিয়ার অগ্রগতির মূলে রয়েছে শিক্ষার প্রসার ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি। পরিকল্পনাগুলির বাস্তব রূপায়ণে বৈদ্যুতিক শক্তিকে লেনিনের কথায় বলা যায় "শিল্পের বাহন"। এই পরিকল্পনাগুলিই শিল্প ও শিক্ষার সার্বজনীন প্রসারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু কি করে এই সকল কার্য এত শীঘ্র সফলতার পথে অগ্রসর হলো?

দেশের শ্রেষ্ঠ কর্মী, শিল্পী ও মনীষীবৃন্দকে পরিকল্পনাগুলি কার্যকরীকরণে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করা হলো। রাশিয়ার দূরবর্তী অঞ্চল সমূহের সাধারণ গ্রাম্য লোক পর্যন্ত এই কার্য সম্পাদনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। লেনিনের প্রেরণায় মস্কোতে আবিষ্কারকদের কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হয়। কারখানা, কল, খাল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিটি জায়গায় আবিষ্কার ও কার্যকরীকরণ নামে এক স্থানীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যুবক, বৃদ্ধ, দক্ষ শিল্পী, দক্ষতাহীন শিল্পী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেরই প্রস্তাব কার্যকরীকরণে সাদরে গ্রহণ করা হতো। কোন আবিষ্কার কার্যকরীকরণে গৃহীত হলে সরকার থেকে সেই প্রস্তাবের বার্ষিক লাভ হতে শত করা দশভাগ (১০%) আবিষ্কারককে দেওয়া হয়। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ, তার পর গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের শেষে সমস্ত দেশে এমন একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে, লেনিন প্রতিষ্ঠিত নূতন রাষ্ট্রের পক্ষে এই সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবিষ্কার করা সত্যিই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। প্রায় দুই শত বৎসরের ঔপনিবেশিক শাসনের কর্তৃত্বাধীনে থেকে ভারতও আজ প্রায় সেই অবস্থাপ্রাপ্ত—লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দমিত। সরকারের নির্দিষ্ট অনুসন্ধানকারীদল সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি অঞ্চলে এই সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে প্রতিভাবানদের খোঁজ করে বাহির করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। এই সকল সাধারণ কর্মীকে তারা কিশোরই হউন কিংবা বৃদ্ধই হউন, সরকারের পক্ষ থেকে সকল রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো যাতে তাঁদের প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়। এই উপায়ে রাশিয়ার জনতার শক্তি দিন দিন বেড়ে গিয়ে রাশিয়াকে সম্পদশালী করে তুলল। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী ষ্ট্যালিনও সাধারণ মানুষের প্রতিভা বিকাশের সকল রকম সুযোগ দিয়ে সাধারণ

মানুষের প্রতিভাকে সম্মানিত করেছেন। পার্টির একটি সভায় ষ্টালিন বলেন—বাগানের কর্মাধ্যক্ষ যেমন প্রত্যেকটি চারা গাছকে যত্নের সহিত রোপণ করেন আমাদের সরকারও ঠিক সেইভাবে আমাদের দেশের প্রতিটি লোককে অক্লান্ত যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে পালন করবে।

আবিষ্কারকের কর্মশক্তি বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করায় বিশ্ববিখ্যাত "ষ্ট্যাকানভ" আন্দোলনের সূচনা হয়। দেশের শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সামাজিক জীবনের প্রায় সকল স্তরে এর প্রভাব এত বেশী লক্ষিত হয় যে, একে সাময়িক ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় বলা যেতে পারে। এর ফলে আবিষ্কারকের কর্মশক্তি সামাজিক, রাজনৈতিক, গঠন ও শাসনমূলক কার্যাবলীতে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—এর বিস্তার লাভ হয়েছে—অশিক্ষা দূরীকরণে, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য সম-সংযোজন পদ্ধতিতে, দলবদ্ধ চাষ করাতে, কারিগরি শিক্ষা প্রদানে, কর্মী তৈরীকরণে, বৈদেশিক দক্ষ লোককে কর্মে নিয়োজনে। এইরূপে রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাধান করায় জাতীয় অর্থনীতিতে ও দেশরক্ষায় আবিষ্কারক ও কার্যে পরিণতকারী কর্মীগণ যে বিরাট অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা বিশেষ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কোন জাতির জীবনে ও পরিপুষ্টিতে আবিষ্কারকের যে কি অসাধারণ প্রভাব তা মিল্টন রাইট প্রণীত "আবিষ্কার, পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক" নামক পুস্তকের একটি উদ্ধৃতাংশ হতে আরও পরিষ্কার হবে। তিনি বলেছেন—"আমেরিকার আবিষ্কারসমূহ হতে বাৎসরিক যে লাভ হয় তার মূল্য পৃথিবীর খনি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকের বার্ষিক উৎপাদনমূল্য হতে বেশী"। লেখক ইউ, এস্, এস্, আর-এর সর্বইউনিয়নিক আবিষ্কারকদের সভার একজন সভ্য। ১৯৩৬ সালে তাঁকে সভ্য কার্ড দেওয়া হয়। অতদিন আগে সভ্য কার্ড পেলেও তাঁর ক্রমিক নং ১৮৫৫৮৬; এথেকেই বোঝা যায়, কি বিরাট লোকসংখ্যাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বিপুল শক্তি আবিষ্কার ও গবেষণার জন্য নিয়োগ করা হয়; কিন্তু তাদের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বিদেশের বাজার দখল করা এবং যতখানি অঞ্চল সম্ভব নিজের প্রভাবে এনে তাহাতে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করা। প্রায় প্রত্যেক দেশেই গুপ্ত গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। এমন কি উপনিবেশ সমূহে অনেক সময় প্রভুশক্তির আদেশে গবেষণা পরিচালনা করা হয়, কিন্তু সেই দেশের লোকের সেই গবেষণা পরিচালনে কোনও হাত থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে ডিজেল এঞ্জিন বিষয়ে গবেষণার কোনও মানে হয় না, কেননা ভারতে এখনও ডিজেল এঞ্জিন তৈরীর কোনও কারখানা স্থাপিত হয়নি। এই গবেষণার ফল কেবল মাত্র বিদেশী প্রভুশক্তির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। শান্তিবৈঠকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে অ্যাটম বোমার পরীক্ষা চলেছে—এমনই আবিষ্কারের মহিমা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

পক্ষান্তরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কঠোর চাপে উপনিবেশ সমূহ থেকে মেধা ও প্রতিভা লোপ পেতে চলেছে। বলাবাহুল্য সে মেধা ও প্রতিভা পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণে যথেষ্ট সুযোগ না দিলে জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়।

বর্তমান সময়ে সরভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির পরিবেষ্টিত ভিত্তিতে এবং জাতীয় সরকারের সক্রিয় সমর্থনে ভারতের সুপ্ত স্থিতিশীল শক্তিকে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতিভাকে উজ্জীবিত করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জাতীয় আবিষ্কারক সমিতি স্থাপন করা সত্বর প্রয়োজন। এই কমিটির প্রথম কাজ হবে—নিঃশেষিত প্রতিভার

পুনরুজ্জীবন ; আর দেশের যে সমস্ত লোকের জন্মগত ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা আছে তাঁদের যথোচিত পরিচালনা করা।

এই কমিটির উদ্দেশ্য মোটামুটি এইরূপ হবে :—

(১) আবিষ্কারকদিগকে তাঁদের কার্যক্রম বা আবিষ্কারকে কাযে পরিণত করতে বা যথাযোগ্য আকার দিতে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সংক্রান্ত উপদেশ দিতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের আবিষ্কারের তত্ত্বগত ও কারিগরি ভিত্তি জোগাতে হবে।

(২) বিশিষ্ট আবিষ্কারকদিগকে তাদের আবিষ্কারের নমুনা তৈয়ার করতে সম্ভবমত সুবিধা দিতে হবে।

(৩) পেটেন্ট আবিষ্কার ও বাণিজ্য মার্কা বিষয়ে এমন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন যা দেশী ও বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(৪) আবিষ্কৃত জিনিসের বাণিজ্যগত মূল্য আবিষ্কারক যাতে পায় তা দেখতে হবে অর্থাৎ আবিষ্কৃত দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) যে সমস্ত মৌলিক গবেষণা কাজে লাগালে জাতীয় উন্নতি সাধিত হতে পারে তাদের আরও বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার জন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

(৬) শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও যাতে পেটেন্ট অধিকার অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে আবিষ্কারকদিগকে আইনের উপদেশ দিতে হবে।

(৭) বিশিষ্ট আইনজ্ঞদিগকে, যাঁরা বিদেশী ও ভারতীয় পেটেন্ট রাইট ও ট্রেড মার্ক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, এই কমিটিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করতে হবে। তদ্দ্বারা আবিষ্কারকের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ উভয়ই ঠিক ভাবে রক্ষিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ কমিটি-গুলিকে জাতীয় জীবনের অন্যান্য সকল বিভাগ—যেমন, শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

(৮) ভারতীয় অবস্থার সহিত খাপ খাইয়ে আবশ্যক মত পরিবর্তন বা পরিবর্জন করে ভারতীয় পেটেন্ট অধিকার গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে বিদেশী পেটেন্ট বা নক্সার সেলামী স্বরূপ প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা যাবে।

"যে ভাষা রুশ ভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহাসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুশ রসায়ণ-শাস্ত্রবিৎ Mendoleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুশ-ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ভিলার্ড গিব্‌স্

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিলার্ড গিব্‌স্ এর নাম পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানী-গোষ্ঠীতে তাঁর মত মননশীল ব্যক্তি আট দশজনের বেশী পাওয়া যাবে না। তাঁর প্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রকে আজও উজ্জ্বল করে রেখেছে। তিনি গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা বেশী করেন নি। শুধু গণিত প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত ব্যাপক এবং মূল্যবান ফল লাভ করা যায়, তিনি জীবনব্যাপী সাধনাতে তাই দেখিয়ে গিয়েছেন। বীজগণিতকে তিনি একটা উচ্চাঙ্গের যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এর মত বিশিষ্ট এবং শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্র মানুষের হাতে দুটি আবিষ্কৃত হয়নি।

গিব্‌স্‌কে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ পদার্থবিৎ বলা যায়। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় আমেরিকার লোকেরা তাকে বিশেষ চিনত না। অথচ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তার গবেষণা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আধুনিক আলোক-তত্ত্বের স্রষ্টা ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, এবং ইলেকট্রনের আবিষ্কারক জে, জে, টম্‌সন্—দুজনেই তাঁর প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা হয়ত অবান্তর হবে না। গিব্‌স্-এর সময়, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আমেরিকাতে কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপ থেকে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক নিয়ে সেখানে নিযুক্ত করা হতো। একবার ঐরূপ একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট একজন গণিতজ্ঞ পদার্থবিদের সন্ধানে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। তিনি টম্‌সনের কাছে গিয়ে তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। টম্‌সন্ একটু বিস্মিত হয়ে তাকে বললেন যে, তিনি অযথা অর্থব্যয় করে অতদূরে এসেছেন; কারণ আমেরিকাতেই একজন খুব উপযুক্ত লোক রয়েছে এবং তাঁর নাম ভিলার্ড গিব্‌স্। গিব্‌স্-এর চিরস্মরণীয় গবেষণার সংবাদ এর দশ বছর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। এদিকে, ভদ্রলোক তাঁর নাম শোনেননি। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ভোল্‌কট্‌ গিব্‌স্-এর কথা বলছেন না!" ভোল্‌কট্‌ গিব্‌স্ তখনকার দিনে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক। টম্‌সন্ অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙ্গে দিলেন এবং ভিলার্ডের গবেষণার কথা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক বিশেষ আশ্বস্ত হননি, সুতরাং গিব্‌স্‌কেও সেই পদে নিযুক্ত করা হয়নি।

গিব্‌স্-এর গবেষণার বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক অত্যন্ত জটিল। সেই গবেষণার দ্বারা, বিজ্ঞান এবং শিল্পজগতে যে সব বিভিন্ন পথে প্রবেশ করেছে বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সে বিষয়েই আলোচনা করব।

গিব্‌স্ এর জন্ম হয় ১৮৩৯ সালে। তিনি আমেরিকার নিউ হাভেনের সুপ্রাচীন বিদ্যালয়—হপ্‌কিন্‌স্ গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে ঈয়েল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হন। ছাত্র হিসাবে কৃতী ছিলেন, এবং গণিতে ও গ্রীক্-ল্যাটিনে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৬৩ সনে ডক্টর উপাধি নিয়ে ঈয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি টিউটরের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রাকৃতিক দর্শন এবং ল্যাটিন—এ দুটি

বিষয় পড়াতেন। বছর তিনেক পরে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইউরোপে চলে যান। সেখানে তিন বছর ধরে প্যারিস্, বেলিন ও অন্যান্য স্থানের খ্যাতনামা অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনেন এবং তাঁদের গবেষণার ধারা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। ইউরোপে তখন তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি এবং আলোক—এই তিনটি বিষয়ে যুগান্তকারী গবেষণা হচ্ছে। তাপশক্তির সঙ্গে অন্যান্য শক্তির সম্পর্ক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে থারমোডাইনামিক্‌স্ নামক নূতন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। গণিতেও অনেক নূতন গবেষণা-ধারার প্রবর্তন হচ্ছে এবং রসায়ন শাস্ত্রের বহুল সমৃদ্ধি হচ্ছে। এক কথায়, সেখানকার বিজ্ঞানাকাশ আলোকে আলোকময় হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনে ফ্যারাডে, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, ক্রুক্‌স্, রস্‌কো ও ডারউইন, জার্মেনিতে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্, হফ্‌ম্যান্, বুনশেন, লিবিগ ও ভোলার, ইটালিতে ক্যানিজারো, ফ্রান্সে পাস্তুর ও ডুমা—এদের একনিষ্ঠ সাধনার বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারগুলি যেন সজীব হয়ে উঠেছে। ঐ আবহাওয়াতে কিছুদিন থাকলে একাগ্র গবেষণা-প্রবৃত্তি জন্মানো স্বাভাবিক। গিব্‌স্-এরও তাই হয়েছিল।

১৮৬৯ সালে তিনি নু্য হাভ্‌নে ফিরে আসেন। আমেরিকাতে তখন বিরাট শিল্পের ভিত্তিস্থাপনা হচ্ছে। সেই শিল্পধারার সঙ্গে সমতা রাখবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারগুলিতে বিজ্ঞানচর্চার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হচ্ছে। অনেক নূতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং পুরাতন গবেষণাগারগুলি নূতন ছাঁচে ঢালা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি করা হচ্ছে। ঈয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েও গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনার জন্যে একটি নূতন পদের সৃষ্টি করা হয় এবং গিব্‌স্‌কে সেখানে নিযুক্ত করা হয়। বত্রিশ বছর তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর গবেষণাগুলি ঐ সময়েই প্রকাশিত হয়। তাঁর অধ্যাপনা সম্পর্কে দু'একটি কথা এখানে বলতে হয়। তাঁর বক্তৃতাগুলি তিনি অতিশয় যত্নসহকারে প্রস্তুত করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময় সেগুলি ছাত্রদের উপযোগী করে বলতে পারতেন না। ফলে, ছাত্রেরা তাঁর ক্লাশে মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি চেষ্টা করেও নিজেকে সংশোধন করতে পারেননি। তিরিশ বছর অধ্যাপনা করার পরও তিনি নিজেই একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতা থেকে ছাত্ররা খুব লাভবান হয়না। তাঁর গবেষণার সন্ধান যে তখন বেশী লোকে রাখত না তারও একটা কারণ এখান থেকে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে—তাঁর মনন ছিল গভীর, কিন্তু প্রকাশ অতি সংক্ষিপ্ত। মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরির একটি খেয়ালী বিজ্ঞানী, Publication factor নামক একটি অভিধা রচনা করেছিলেন। যে ব্যক্তির যতখানি জ্ঞান আছে তার সবটুকু যদি তিনি লিখে প্রকাশিত করেন তবে তার Publication factor হবে—এক। তিনি যতখানি জানেন তার দশগুণ লেখা প্রকাশিত করলে Publication factor হবে দশ। গিব্‌স্-এর Publication factor ছিল বোধ হয় ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। অল্প কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ এবং দু'একখানি পুস্তিকা ছাড়া আর কিছু তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর রচনাগুলি সুখপাঠ্য হত না এবং তাতে উদাহরণ, রূপক ইত্যাদি প্রায়ই থাকত না।

অধ্যাপনায় ব্রতী হয়ে কিছুদিন তিনি ইউরোপ থেকে যা দেখেশুনে এসেছিলেন তাই নিয়ে অনুশীলন করতেন। তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করার অভ্যাস তাঁর ছিলনা। এ বিষয়ে তাঁর একটা মজ্জাগত সঙ্কোচ ছিল। যাই হোক, ১৮৭৩ সালে, অর্থাৎ দু'বছর অধ্যাপনার পরে, তিনি থারমোডাইনামিক্স সম্বন্ধে দুটি মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় থারমোডাইনামিক্স-এর

প্রয়োগ কত ব্যাপক তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। বস্তুতঃ একেও একটি শক্তিশালী যন্ত্র বলা যায়, যার সাহায্যে বিজ্ঞানের কোন কোন শাখার প্রভূত সমৃদ্ধি হয়েছে। প্রকৃতি থেকে শক্তি সন্ধান করতে গিয়ে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকারের শক্তি যে মূলতঃ একই শক্তির বিভিন্নরূপ মাত্র তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। প্রকৃতির রাজ্যে অহরহঃ যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, ছোট হোক আর বড় হোক, প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে শক্তির লীলাবৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। শক্তি কখনও এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাচ্ছে, কখনও বা এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। শক্তির এই সব খেয়ালের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয়। শক্তি আমরা সৃষ্টি করতে পারি না, কিন্তু তার রূপান্তর ঘটাতে পারি। তাই সেই রূপান্তরের তথ্যগুলিই আমাদের বেশী করে জানা দরকার। এই তথ্যগুলি থারমোডাই-নামিক্স এর অন্তর্গত। কোন বস্তু বা বস্তুসমবায় থেকে কি পরিবর্তন ঘটিয়ে কতটা কার্যকরী শক্তি আহরণ করা যায়—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর থারমোডাইনামিক্স এর সূত্র থেকে সহজেই গণনা করা যায়। শিল্পজগতে এই জাতীয় তথ্য যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তা বলাই বাহুল্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন—তাপশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, চৌম্বক শক্তি ইত্যাদি। কিন্তু সেই বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাপ-শক্তি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সকল জাতীয় শক্তিই শেষ পর্যন্ত তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হতে যেন ব্যগ্র। অবশ্য এই পরিবর্তন সকল অবস্থাতেই হয় না। সময় সময় অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি করে দিতে হয়। কিন্তু সে যাই হোক, সকল জাতীয় শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু তাপশক্তিকে মাত্র আংশিকভাবে অপরশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, সম্পূর্ণভাবে কখনই পারা যায় না। তাপশক্তির সহায়তায় জল থেকে বাষ্প উৎপাদন করে বাষ্পীয় এঞ্জিনের উদ্ভাবন হয়েছিল। সেখানে তাপশক্তিকে এঞ্জিনের গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এঞ্জিন ব্যবহারের প্রথম যুগে নানারকম গবেষণা হত, কি করে কম কয়লা খরচ করে বেশী কাজ পাওয়া যায়। এঞ্জিনে কয়লা বা তেল জ্বালিয়ে যতটা তাপ উৎপন্ন হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না। এঞ্জিনের যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য কতকটা ক্ষতি অবশ্য হতে পারে, কিন্তু তাপশক্তির বিশেষ ধর্মই বেশীর ভাগ ক্ষতির জন্য দায়ী। কতখানি তাপশক্তি থেকে কতখানি কার্যকরী শক্তি পাওয়া সম্ভব এবিষয়ে থারমোডাইনামিক্স-এর সূত্র থেকে সমাধান পাওয়া যায়। সেইখানেই থারমোডাইনা-মিক্স-এর প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়েছিল।

গিব্‌স্-এর ১৮৭৩ সনের প্রবন্ধ দুটি ছিল থারমোডাইনামিক্স্ বিষয়ক—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রবন্ধ দুটিতে শক্তিঘটিত তথ্য অনুসন্ধানের দুটি নূতন পন্থার নির্দেশ ছিল। এগুলি ঠিক প্রথম শ্রেণীর গবেষণা নয়। কিন্তু ম্যাক্স্‌ওয়েল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ওর মধ্যেই এমন সংকেত দেখতে পেলেন যার সাহায্যে তখনকার দিনের অনেকগুলি জটিল সমস্যার সমাধান হবে বলে তাঁর আশা হলো। তিনি গিব্‌স্-এর আবিষ্কৃত বিষয় তাঁর Theory of Heat নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটিতে বন্ধুদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা করতেন। সুতরাং দেশের লোকের চোখে না পড়লেও গিব্‌স্-এর কাজ বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এর পর ১৮৭৫ সালে ৩৬ বৎসর বয়সে গিব্‌স্ তাঁর অমর অবদান—'মিশ্র পদার্থের সাম্যাবস্থা' নামক ১৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে

"কনেক্‌টিকাট্‌ একাডেমি অফ আর্টস্‌ এ্যাণ্ড সায়েন্সেস্‌"-এর মুখপত্রে প্রকাশ করবার জন্যে দেন। তিনি যদিও এই সমিতির সভ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁর আপাত নীরস গণিতাংশ, দীর্ঘ রচনাটির সঠিক মূল্য সম্বন্ধে সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে বিস্তর গবেষণা হয়েছিল। কেউ ছাপানোর অযোগ্য বলে মনে করলেন, কেউ বা স্বপক্ষে রায় দিলেন। গিব্‌স্‌-এর পদমর্য্যাদার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত ছাপানোই স্থির হলো। পর পর কয়েকটি বিভিন্ন সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো (১৮৭৫-৭৬)। এর পর ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে একই বিষয়ে তাঁর গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ১৮১ পৃষ্ঠা লেগেছিল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় মিলে সমস্ত রচনাটিতে ঠিক ৭০০টি গাণিতিক সমীকরণ ছিল।

গিব্‌স্‌-এর রচনাটি ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, অসওয়াল্‌ড, লা শাতেলিয়ের প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নিকট বিশেষ আদৃত হয়েছিল এবং কয়েক বৎসর পরে এর জার্মান্‌ এবং ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এতদিন শক্তিতত্ত্বের আলোচনা পদার্থ-বিজ্ঞানেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু গিব্‌স্‌ই প্রথম রসায়নের ক্ষেত্রে শক্তিতত্ত্বের বিচারের গোড়াপত্তন করেন। বস্তুতঃ Chemical Energetics নামক আধুনিক শাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপনা গিব্‌স্‌ই করেছেন। তাঁর রচনাটিতে রাসায়নিক বস্তুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুমূল্য কতকগুলি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রচনার প্রথম দিকে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী কতকগুলি গাণিতিক সূত্র ছিল। আজকাল সেগুলি Phase Rule নামে খ্যাত। এই সূত্রগুলি গবেষণা এবং উৎপাদনের কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রয়োগ করা হয়েছে তার সঠিক হিসাব করা কঠিন। অল্প কয়েকটির কথা এখানে আলোচনা করা যাবে। লৌহ, তাম্র ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশনের সময় দেখা যায় যে, নিষ্কাশিত ধাতুর সঙ্গে গন্ধক, অঙ্গার, সিলিকন ইত্যাদি নানা পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কোন কোন সময় অন্য ধাতুও মিশ্রিত থাকে। এই সমস্ত পদার্থগুলি কতক আসে খনিজ পদার্থ থেকে আর কতক আসে অন্যান্য বস্তু—যেগুলি নিষ্কাশন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়—সেগুলি থেকে। এই পদার্থগুলি কখনও কখনও প্রধান ধাতুটির সঙ্গে সাধারণভাবে মিশ্রিত থাকে, কখনও বা ধাতুটির সঙ্গে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে থাকে। অনেক সময়, যেমন স্টিল উৎপাদনে, বিভিন্ন পদার্থের এমন একটি জটিল মিশ্রণের সৃষ্টি হয় যে, কতগুলি পদার্থ তাতে আছে এবং তাদের স্বরূপই বা কি, তা' স্থির করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই অতিরিক্ত পদার্থগুলি সব সময়ই যে ধাতুর অনিষ্ট করে তা' মোটেই নয়। বরং কোন কোনটি পরিমাণ মত থাকলে তাতে ধাতুর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। গিব্‌স্‌-এর Phase Ruleএর সাহায্যে স্থির করা যায় যে, কি অবস্থায়, কত তাপ বা চাপে, অথবা অপর কোন প্রভাবের ফলে কোন্‌ কোন্‌ উপাদান সৃষ্টি হবে বা স্থায়ী হবে। এই পন্থাতে বিশেষ বিশেষ উপাদান সৃষ্টি করা বা না করা রাসায়নিকের আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। স্টিল ছাড়া অন্যান্য বহু ধাতু ও মিশ্রধাতুর ক্ষেত্রেও গিব্‌স্‌-এর সূত্র থেকে বহুবিধ সাহায্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য বহু রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদনে —বিশেষতঃ যেখানে বিভিন্ন পদার্থের জটিল সংমিশ্রণের সৃষ্টি হয়—সেরকম ক্ষেত্রে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে।

১৯১৩ সনে জার্মেনিতে বিদেশ থেকে নাইট্রেট আমদানি বন্ধ হওয়াতে, জার্মেন সরকার অধ্যাপক হাবরকে কৃত্রিম উপায়ে অ্যামোনিয়া তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অ্যামোনিয়া থেকে অক্‌সিজেন সহযোগে নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট প্রস্তুত করা চলত। হাবর Phase Rule এর সাহায্য নিয়েই নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অ্যামোনিয়া থেকে যুদ্ধকালীন জার্মেনিতে

একদিকে যেমন নাইট্রিক এসিড এবং নাইট্রো-গ্লিসিরিণ ও অন্যান্য বিস্ফোরক প্রস্তুত হতো, তেমনি প্রচুর কৃত্রিম নাইট্রেট সার প্রস্তুত করে দেশে খাদ্যাভাবের সমাধান করা হয়েছিল। হাবেরের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া সভ্যতার ইতিহাসে রসায়নের একটি অমূল্য দান এবং এই আবিষ্কারের জন্য সুইডিশ একাডেমি তাঁকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

অ্যামোনিয়া ছাড়াও বহু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে গিব্‌স্-এর সূত্রের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। জটিল মিশ্রণের মধ্যে বস্তুবিশেষ কি কি অবস্থাতে অধিক উৎপন্ন হয়, কিভাবে তাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা যায় ইত্যাদি সমস্যা আজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। তার ফলে শত শত ঔষধ, রঞ্জনদ্রব্য, প্লাসটিক ও দ্রাবক বিশুদ্ধ অবস্থাতে এবং কাঁচা মালের অনুপাতে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। রক্তে ও দেহের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন লবণের সাম্যাবস্থা, সিরাম, প্লাজ্‌মা ইত্যাদির উৎপাদন ও বিশুদ্ধীকরণ—এই জাতীয় সমস্যাতে গিব্‌স্-এর **Surface tension, Semi permeable membrane** ও **Osmotic pressure**-এর গবেষণা অনেক কাজে লেগেছে। এই গবেষণা-গুলিও গিব্‌স্-এর ঐ একই রচনাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যার্‌ল্‌স্ হ্রদ থেকে প্রচুর পটাশ ও অন্যান্য লবণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমেরিকার এই রাসায়নিক শিল্পটিতে গিব্‌স্-এর সূত্রের চূড়ান্ত প্রয়োগ করা হয়েছে। শুনলে অবাক হতে হয় যে, হেন্‌রি এডাম্‌স্ নামক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর "বিশ্ব ইতিহাসের ধারা" সম্পর্কে যে গবেষণা করেছিলেন তাতে তিনি **Phase Rule**কে কাজে লাগিয়েছিলেন (**Tendency of World History—Henry Adams, 1909**)। হল্যাণ্ডের পদার্থবিৎ ভান-ডার ওয়াল্‌স্ তাঁর গ্যাসের সাম্যাবস্থা সংক্রান্ত কাজে এবং ঐ দেশেরই রাসায়নিক রুজবুম্ তাঁর স্টিলের উপাদান সম্পর্কে গবেষণাতে **Phase Rule** এর বহুল প্রয়োগ করেছিলেন। এছাড়া বহু গবেষক এখনও **Catalysis, Adsorption** ইত্যাদি গবেষণার ক্ষেত্রে সহজ সংকেত পাবার জন্যে উৎসুকচিত্তে গিব্‌স্-এর প্রবন্ধ পাঠ করে থাকেন।

১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তারপর প্রায় ১৫ বছর তিনি থারমোডাইনামিক্‌স্-এর অধ্যাপনা এবং গবেষণা আর করেননি। প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যে তেমন সমাদৃত হয়নি। হয়ত সেই কারণেই উক্ত ক্ষেত্রটির প্রতি গিব্‌স্-এর মন বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু ১৮৮২ থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে তিনি ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের আলোক সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্পর্কে আমেরিকান জ্যর্নাল অফ সায়েন্সে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। তারপর সুদীর্ঘ দশ বছর তিনি আর কোন লেখাই প্রকাশ করেননি। এই দশ বছরে, অর্থাৎ ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে বিজ্ঞানে তিনটি বিরাট আবিষ্কার হয়। একটি হলো ইলেকট্রন, দ্বিতীয়টি এক্‌স্-রে এবং তৃতীয়টি রেডিয়াম। তারপর ১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্কের "কোয়াণ্টাম মতবাদ" প্রকাশিত হয়। এতগুলি আবিষ্কারের ফলে বস্তু এবং শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা সমস্ত ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গিব্‌স্ ঐ সময়ে কোন লেখা প্রকাশ করেননি। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কোন আবিষ্কার না করে তিনি নিজের লেখা প্রচার করতে অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করতেন। তাঁর শেষ স্মরণীয় কাজ, '**Elementary Principles of Statistical Mechanics**' নামক গণিত-পুস্তক। তার পূর্বে '**Elements of vector Analysis**' নামে গণিতের অপর একটি মৌলিক রচনা তিনি নিজের ছাত্রদের জন্য প্রচার করেছিলেন।

গিব্‌স্ ১৯০৩ সালে মারা যান। তিনি চিরকুমার ছিলেন। প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকদের অনেকের মধ্যে নানাপ্রকার খামখেয়ালী হাব-ভাব দেখা যায়। গিব্‌স্-এর সেরূপ কিছু ছিল না। তাঁর ঘরের কাজকর্ম বহুদিন পর্যন্ত তাঁর বোনেরা করতেন। কিন্তু তিনি ঘরকন্নার কাজে তাদের বেশ সাহায্য করতেন। খাবার সময় কাঁচা আনাজ মিশিয়ে স্যালাড তৈরী করা তাঁর নিত্যকর্মের অন্তর্গত ছিল এবং প্রত্যহই অজুহাত দেখাতেন যে, জটিল মিশ্রণের ব্যাপারে ঘরের অপর কারুর তাঁর মত জ্ঞান নেই। কথা শুনে বোনদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটত।

সূর্য ও নক্ষত্রজগৎ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

মহাশূন্যে অবস্থিত লক্ষ কোটি নক্ষত্র নিয়ে বিশ্বজগতের বৃহত্তর পরিবার বিজ্ঞানীর চোখে পরম বিস্ময়ের বস্তু। আমাদের সূর্য এই পরিবারের একটি নক্ষত্র মাত্র। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা তাঁদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এই নক্ষত্ররাজ্যে প্রবেশ করেছেন—এদের সম্বন্ধে আজ বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মহাশূন্যকে দ্বিখণ্ডিত করেছে দুগ্ধশুভ্র মেঘের বৃত্তাকার ক্ষীণউজ্জ্বল এক বিরাট আস্তরণ। একে আমরা বলি ছায়াপথ। এই ছায়াপথে রয়েছে অসংখ্য নীহারিকা। এই নীহারিকাগুলি প্রায় ৪০ বিলিয়ন নক্ষত্রের সমষ্টি। এই নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটির বিশিষ্ট নাম থাকা সম্ভব নয়। যদি এক সেকেণ্ডে এক একটি নক্ষত্রের নামকরণ করা যায় তবে আমাদের ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্রগুলির নামকরণ করতে প্রায় ১৭০০ বছর লাগবে। আমাদের এই ছায়াপথের বাইরেও রয়েছে অসংখ্য নীহারিকা এবং আরও বহু সংখ্যক নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে এই সমস্ত নক্ষত্রের দূরত্ব এত বেশী যে, আলোর গতিবেগ এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হলে কোন কোন নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে হাজার হাজার বছরও লেগে যায়। বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে এই বিশাল নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন।

মানুষের কাছে নক্ষত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে প্রথম বিস্ময় হচ্ছে এদের সংখ্যা। খালি চোখে আমরা ৬০০ এর কিছু বেশী সংখ্যক নক্ষত্র দেখতে পাই। ডাচ্ জ্যোতির্বিদ্ ক্যাপ্‌টিনের হিসাবমত আমাদের ছায়াপথে প্রায় ৪০ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। আমাদের ছায়াপথ ছাড়া অন্য ছায়াপথগুলিরও প্রত্যেকটিতে প্রায় ঐরূপ সংখ্যক নক্ষত্র আছে অনুমান করা হয়। কিন্তু মহাশূন্যের অতলগর্ভে নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা বিজ্ঞানীর ধারণার অতীত। তারপর আসে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এদের দূরত্বের কথা। আমরা পৃথিবীর মাপকাঠি দিয়ে এই সব বহু দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব বা এদের পরস্পরের ব্যবধান মাপতে পারি না। তাই বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের একটা নতুন মাপকাঠি তৈরী করেছেন। এর নাম 'আলোক বৎসর'। এক বৎসরে আলো যত মাইল ছুটতে পারে সেই সংখ্যা অর্থাৎ ৫৯০০ বিলিয়ন মাইল বা ৯৩৬৩০০০,০০০ কিলোমিটারকে বলা হয় এক আলোক-বৎসর। এই মাপকাঠিতে মাপতে গেলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দূরের ও কাছের নক্ষত্রগুলির দূরত্ব আমরা পাই এবং এই মাপকাঠির এককে প্রকাশ করে থাকি। তবু নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণাও মানুষের পক্ষে একটা বিস্ময়ের বস্তু। কারণ আমাদের ছায়াপথের দূরবর্তী নক্ষত্রগুলি থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত লেগে যায়, আর অন্য ছায়াপথের নক্ষত্র থেকে আলো আসতে কয়েক লক্ষ বছরও লাগে। এই বিপুল দূরত্ব কল্পনারও অতীত! তবু এই অজানাকে জানতে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত; তাঁদের কাজের বিরাম নেই। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি।

নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নক্ষত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূর্য আমাদের খুব কাছে রয়েছে বলে সূর্যপৃষ্ঠের প্রতি একক আয়তনে বিকিরণের পরিমাণ থেকে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আমরা সহজে মাপতে পারি। কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্র দূরে রয়েছে বলে এই উপায়ে তাদের তাপমাত্রা মাপা যায় না।

সেজন্যে পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করতে হয়। প্রথমে কোন বস্তু উত্তপ্ত হলে লাল রং-এর বিকিরণ হয়—তাপ বাড়ালে হরিদ্রাভ রং পাই। আরও তাপ যখন বাড়তে থাকে, আমরা ক্রমশঃ শ্বেতাভ ও শেষে নীলাভ রং-এর বিকিরণ দেখতে পাই। বর্ণালীর লাল থেকে ভায়োলেটের দিকে তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। এখন আমরা বলতে পারি যে, কোনও নক্ষত্র যদি লাল রং-এর হয় তবে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হবে—আর নীলাভগুলি হবে অধিকতর উত্তপ্ত। আরো সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা জানতে হলে নক্ষত্র হতে নির্গত বর্ণালীগুলিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আলো নির্গমণের সময় নাক্ষত্রিক বায়ুমণ্ডল কতক নির্বাচিত আলো-তরংগ শোষণ করে নেয়। ফলে আমরা বর্ণালীগুলিতে কতকগুলি আলোহীন কৃষ্ণরেখা (Fraunhofer's Line) দেখতে পাই। এই শোষণ ক্ষমতা বস্তু-পরমাণুর তাপমাত্রার উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করে; ফলে আমরা বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালীর কৃষ্ণ রেখার তারতম্য দেখতে পাই। তাদের তারতম্য ও তীব্রতা থেকেই নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার আপেক্ষিক পরিমাপ সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী স্বনামধন্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা কোয়াণ্টাম মতবাদের ভিত্তিতে শোষিত বর্ণালী ও শোষক বায়বের একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন।

বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালী গ্রহণ করে এগুলিকে দশভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। জ্যোতিবিজ্ঞানে এই বর্ণালীগুলিকে হার্ভার্ড বর্ণালীশ্রেণী নামে অভিহিত করা হয়। দশটি ইংরেজী বর্ণমালা দিয়ে এই বর্ণালীশ্রেণীর নামকরণ করা হয়েছে। যথা—"O, B, A, F, G, K, M, R, N, S" আমাদের সূর্য থেকে G শ্রেণীর বর্ণালী পাওয়া যায়। সিরিয়াস্ ও ক্রুগার ৬০বি নক্ষত্র যথাক্রমে A ও M বর্ণালী শ্রেণীর অন্তর্গত। কোনও নক্ষত্র-বর্ণালী দুটি বর্ণালী শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে পড়লে দশমিক চিহ্নের দ্বারা তাকে প্রকাশ করা হয়। যথা $A_2 \rightarrow A$ ও F বর্ণালীশ্রেণীর দুই দশমাংশস্থিত বর্ণালী। $K_5 \rightarrow K$ ও M বর্ণালীশ্রেণীর পাঁচ দশমাংশস্থিত বর্ণালী। নক্ষত্রের বর্ণালী বৈশিষ্ট্যের সংগে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রায় যে সম্বন্ধ রয়েছে তা' নিম্ন তালিকায় দেখা যাবে,—

বর্ণালীয়শ্রেণী	তাপমাত্রা
B	২০০০০°
A	১০০০০°
F	৭০০০°
G	৬০০০°
K	৫১০০°
M	৩৪০০°

উল্লিখিত তালিকাটি কেবল সূর্যের মত সাধারণ পর্য্যায়ের নক্ষত্রের পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু দানবদানব শ্রেণীর বৃহত্তর নক্ষত্রগুলির সমান বর্ণালীতে তাদের বৃহদায়তনের জন্য তাপমাত্রার তারতম্য হয়।

বর্ণালীশ্রেণী	তাপমাত্রা
G	৫৬০০°
K	৪২০০°
M	৩২০০°

'O' বর্ণালীশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা ২০০০০° থেকে ১০০০০০° পর্যন্ত; আর R. N. বর্ণালী ৩০০০° চেয়ে কম। সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে আমরা তাদের জ্যামিতিক আয়তনও তুলনামূলক ভাবে মাপতে পারি। সূর্যের ব্যাসকে একক ধরলে সিরিয়স্, ৬১ সিগনী, ক্রুগার ৬০ বি নক্ষত্রগুলির ব্যাস হবে যথাক্রমে ১'৮, ৫'৯ ও ০'৫।

অধ্যাপক রাসেল বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালীশ্রেণী, বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য ও পরম মান (absolute magnitude) ও ব্যাস নিয়ে একটি লৈখিকচিত্র অংকন করেন। এই চিত্রে দেখা যাবে যে, নিম্নের ডানদিক থেকে উপরের বামদিক পর্যন্ত একটা

নির্দিষ্ট সারিতে যে নক্ষত্রগুলি ভীড় করে আছে, ভরের পার্থক্য থাক্‌লেও তাদের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। নীচের শীতলতর ক্ষীণ লালবামনগুলি থেকে উপরের উজ্জ্বল ও নীলাভ নীলদানব পর্যন্ত মাঝখানে আমাদের সূর্যকে নিয়ে এই যে নক্ষত্র গোষ্ঠী এরা সাধারণ পর্যায়ের (main sequence অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই চিত্রে নিম্নে বাঁদিকের কোণে যে নক্ষত্রগুলি দেখা যায় তারা আয়তনে অত্যন্ত ছোট বলে এদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা খুব বেশী হলেও এদের ঔজ্জ্বল্য খুব কম। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে, হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত-বামন।

রাসেলের চিত্র থেকে বিভিন্ন নক্ষত্রগুলির
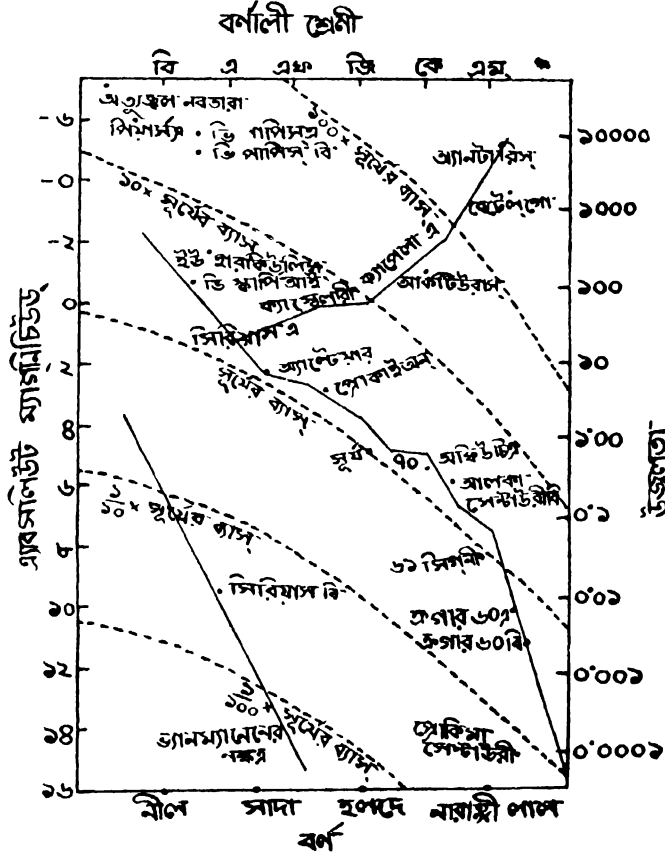
রাসেলের চিত্র

সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র ছাড়া উপরের ডান-দিকের কোণে নক্ষত্রগুলি আয়তনে এত বৃহৎ যে, এদের পৃষ্ঠতাপমাত্রা কম হলেও ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী। এদের নাম দেওয়া হয়েছে রেড জায়েণ্টস্ বা লালদানব। ক্যাপেলা, ব্যাটেল্‌গো প্রভৃতি নক্ষত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (রাসেলের

বর্ণ, বর্ণালী, ঔজ্জ্বল্য, পরম মান ও তাদের ব্যাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বর্ণালীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরম মান হচ্ছে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য জ্ঞাপক মাপকাঠি। নক্ষত্রগুলি বিভিন্ন দূরত্বে রয়েছে বলে তাদের সঠিক ঔজ্জ্বল্য আমরা সমানভাবে দেখতে পাই না। যেমন ওয়াই

সিগ্‌নী নক্ষত্র সূর্য থেকে অনেক বেশী দূরে রয়েছে বলে তার সঠিক ঔজ্জ্বল্য সূর্য থেকে ৩০০০০ গুণ বেশী হলেও আমরা তা পৃথিবী থেকে অনুভব করতে পারি না। তাই নক্ষত্রদের সঠিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করতে হলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নক্ষত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য কত হবে সেটা জানা দরকার। দশ পার্সেক (Parsec) বা প্রায় তিন আলোক-বৎসর দূরত্বে থাকলে নক্ষত্রের যে ঔজ্জ্বল্য অনুভব করা যায় তাকেই সেই নক্ষত্রের পরম মান বা অ্যাবসোলিউট ম্যাগ্নিচ্যুড বলা হয়। [এক পার্সেক=১″ লম্বনযুক্ত নক্ষত্রের পৃথিবী থেকে দূরত্ব; লম্বন=নক্ষত্র থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের কৌণিক দৈর্ঘ্য। Parsec= 206265 Astronomical units] ভেগা নক্ষত্রের পরম মান হচ্ছে ০·৬। সাধারণতঃ এথেকে উজ্জ্বলতর নক্ষত্রগুলির মান বিয়োগচিহ্ন দ্বারা ও ক্ষীণতর নক্ষত্রগুলির মান যোগচিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ২½ পরম মান দ্বারা ১০ : ১ আনুপাতিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা হয়। এই হিসেবে সূর্যের পরম মান হচ্ছে ৪·৮৫। পাশাপাশি এই চিত্রে সূর্যের সংগে অন্যান্য নক্ষত্রের আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্যও দেখান হয়েছে। নক্ষত্রের বর্ণ আমরা সাধারণ চোখে সঠিকভাবে দেখতে পাইনা। কারণ নক্ষত্র থেকে আলো আসতে তাকে যে সব বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে হয় তাতে অনেক আলোক তরংগ শোষিত হয়। এই সব বিবেচনা করে মার্টিন, গ্রীভ্‌স্ ও ডেভিড্‌সন্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণ স্থির করেছেন। রাসেলের চিত্রে নক্ষত্রের বর্ণ, বর্ণালীবৈশিষ্ট্য, তথা তাপমাত্রার সামঞ্জস্য পাশাপাশি দেখান হয়েছে। নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার তুলনামূলক মাপের দ্বারা, আর বড় নক্ষত্রের বেলায় ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে তাদের ব্যাস মাপতে পারা যায়। সমব্যাস বিশিষ্ট নক্ষত্রগুলির ওপর রেখা টেনে সূর্যের অনুপাতে বিভিন্ন নক্ষত্রের ব্যাসও আমরা এই চিত্রে দেখতে পাই।

এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, রাসেলের চিত্রে সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ও ব্যাসের একটা নির্দিষ্ট ও নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। লালদানব ও শ্বেতবামন শ্রেণীর অসাধারণ নক্ষত্র গুলির কথা বাদ দিয়ে এখন সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র-গুলির কথা আলোচনা করা যাক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসেলের চিত্রের নিম্নের ডান কোণে অবস্থিত লালবামন থেকে আরম্ভ করে সূর্যকে নিয়ে উপরের বাম কোণ পর্যন্ত নীল-দানব শ্রেণীর নক্ষত্র পর্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য, ব্যাস ও ভর নিম্ন তালিকায় দেওয়া হলো।

	সূর্যের সহিত আপেক্ষিক		
নক্ষত্র	ঔজ্জ্বল্য	ব্যাস	ভর
সিরিয়স্ এ	২৪	১·৫০	২·৩৫
প্রোকাইঅস্-এ	৬·৫	১·৮০	১·৪৮
আল্‌ফা সেণ্টাউরী-এ	১·১৪	১·০৭	১·১০
সূর্য	১·০০	১·০০	১·০০
আল্‌ফা সেণ্টাউরী-বি	০·৩২	১·২২	০·৮৯
ক্রুগার ৬০-এ	০·০০১৫	০·২০	০·২৭
ক্রুগার ৬০-বি	০·০০০৪	০·১২	০·১৪

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায় যে, নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য ও ব্যাসের সঙ্গে যে রকম সম্বন্ধ রয়েছে তেমনি ভরের সঙ্গেও একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর বিবর্তনকালের দ্বারা যেমন সূর্যের ভর মাপা যায়, তেমনি যুগ্মতারা বা বাইনারি স্টারগুলির প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গতির দ্বারা তাদের আবর্তনকাল মেপে প্রত্যেকের ভর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যে নক্ষত্রগুলির ভর পাওয়া গেছে তাদের ঔজ্জ্বল্য ও ভরের সম্বন্ধ বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিজ্ঞানী এডিংটন প্রথমেই বলেন যে, নক্ষত্রগুলির ভর বেশী হলেই ঔজ্জ্বল্য ও খুব দ্রুত বেড়ে যাবে। ওয়াই সিগ নি নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে ১৭ গুণ ভারী অথচ ৩০০০০ গুণ বেশী উজ্জ্বল। সিরিয়স্-এ সূর্যের চেয়ে ২·৪ গুণ ভারী অথচ মাত্র ২৪ গুণ উজ্জ্বলতর। এদিকে ক্ষীণ ক্রুগার ৬০ বি সূর্যের চেয়ে ·০০০৪ গুণ উজ্জ্বল হয়েও সূর্যের ভরের $\frac{১}{১০}$ হবে মাত্র। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ভরের আধিক্যের সংগে সংগে তার ঔজ্জ্বল্য সমান তালে পা ফেলে চলে না। ভর বাড়ার সংগে ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বেশী বেড়ে যায়। ফলে ভারী নক্ষত্রগুলিতে হাল্কা নক্ষত্রের চাইতে প্রতি গ্র্যাম বস্তুতে বেশী পরিমাণ তেজ বিকিরণ হয়। সূর্যের মত তাপ কেন্দ্রীনক্রিয়া দ্বারাই যদি নক্ষত্রদেহে তেজের উদ্ভব হয়—তবে তেজ বিকিরণের হার বিভিন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, বিভিন্ন নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার বিভিন্নতা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য বিকিরণের হারে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন নক্ষত্রের ভর, কেন্দ্রীয় ঘনত্ব, কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ও তেজ বিকিরণের হার দেখান হলো।

নক্ষত্র	ভর (সূর্যের সহিত আপেক্ষিক)	কেন্দ্রীয় ঘনত্ব (জলের সহিত আপেক্ষিক)	কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড	তেজবিকিরণের হার $\frac{\text{আর্গ}}{\text{গ্র্যাম . সেকেণ্ড}}$
ক্রুগার ৬০ বি	০·১	১৪০	১৪ × ১০৬	০·০১
সূর্য	১·০	৭৫	২০ × ১০৬	২
সিরিয়াস	২·৪	৪১	২৫ × ১০৬	৩০
ওয়াই সিগনী	১০·০	৬·৫	৩২ × ১০৬	৩৬২০

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায় যে, নক্ষত্রদেহে ২০ মিলিয়ন ডিগ্রি থেকে ৩২ মিলিয়ন ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়লে প্রতি গ্র্যাম বস্তু থেকে তেজ বিকিরণের হার ১৮০০ গুণ বেড়ে যায়। তাপ কেন্দ্রীয় ক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়লে এই ক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়ে তেজ বিকিরণের হার বাড়িয়ে দেবে—এটা স্বাভাবিক কথা। তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়াদ্বারা সৌরদেহে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন নাইট্রোজেন বা কার্বনের উপস্থিতিতে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে তেজ বিকিরণ করে। গণনায় দেখা গেছে যে, এইরূপ সমান ক্রিয়ার দ্বারাই সাধারণ পর্যায়ের সমস্ত নক্ষত্র তেজ বিকিরণ করে। বিভিন্ন নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার বিভিন্নতায় তেজ বিকিরণের হারও কম বেশী হয়।

কিন্তু সাধারণ পর্যায়ের হাল্কা নক্ষত্রগুলির বেলায় একটু তফাৎ আছে। ক্রুগার ৬০বি'র কথা ধরা যাক্। এইসব শীতলতর নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা এত কম যে, এদের দেহস্থিত মন্দগতি তাপনীয় প্রোটনকণিকা কার্বন বা নাইট্রোজেনের মত ভারী কেন্দ্রীন ভাঙ্গতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়।

বিজ্ঞানী ক্রিচফিল্ড আবিষ্কার করেন যে, এইসব নক্ষত্রদেহে কেবল প্রোটন দ্বারাই তেজের উদ্ভব হয়। কার্বন বা নাইট্রোজেনের সংগে প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতে দুটি তাপীয় প্রোটন থেকে একটি ভারী হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন বা ডয়েটারন-এর উদ্ভব হয়, এই ডয়েটারন আবার ভারী হিলিয়মে রূপান্তরিত হয়ে কিছুটা তেজ বিকিরণ করে।

$${}_1H^1 + {}_1H^1 \rightarrow {}_1D^2 + \overset{+}{e}$$
$${}_1D^2 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^3 + \text{তেজ} \cdots\cdots \text{ইত্যাদি}$$
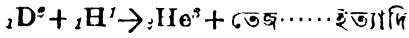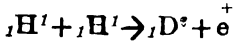
এই ভারী হিলিয়াম আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধারণ হিলিয়ামে পরিণত হয়। সাধারণ পর্যায়ের ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি বা তার চেয়ে কম তাপমাত্রার নক্ষত্রে এই প্রক্রিয়া দ্বারা তেজ পাওয়া যায়। হাল্কা ক্ষীণ নক্ষত্র ও সূর্য বা সিরিয়াসের মত ভারী নক্ষত্রের মধ্যে তেজ বিকিরণ প্রক্রিয়ার এই তফাৎটুকু দেখা যায়।

নক্ষত্রদেহে হাইড্রোজেন যতই নিঃশেষিত হতে থাকে ততই তার তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্য বেড়ে চলে। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২য় বর্ষ, পৃঃ ৭৪ দ্রষ্টব্য) ফলে রাসেলের চিত্রে সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির যে অবস্থান রয়েছে, তাথেকে ক্রমশঃ এরা খানিকটা বাঁয়ে ও উপরের দিকে সরে আসবে। ক্রমশঃ অধিকতর তাপমাত্রা বিকিরণ করে নক্ষত্রগুলি তাদের সাবেক তেজ বিকিরণের ১০০ গুণ বর্ধিত হওয়ার পর আবার নিম্নতর ঔজ্জ্বল্য পাবে। এইরূপে ১০ বিলিয়ন বছর পরে আমাদের সূর্য সিরিয়াস নক্ষত্রের মত উজ্জ্বলতর হবে—আর সিরিয়াস নক্ষত্র ইউ অফিউটি নক্ষত্রের মত দীপ্ততর হয়ে উঠবে। অবশ্য এই দীর্ঘকাল পরে বর্তমান নক্ষত্রগুলির এই ঔজ্জ্বল্যে আজকের আকাশের চাইতে সেদিনের আকাশ যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। কারণ সেদিকে আবার যেসব নক্ষত্রের হাইড্রোজেন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবে তাদের দীপ্তি যাবে কমে। আবার যে সমস্ত নক্ষত্রগুলির ভর বেশী, অধিকতর ঔজ্জ্বল্যের জন্যে তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হবে তাড়াতাড়ি। সমান পরিমাণ হাইড্রোজেন নিয়ে বিভিন্ন ভরের দুটি নক্ষত্র যদি তাদের জীবন আরম্ভ করে তবে ভারী নক্ষত্রটি হাল্কা নক্ষত্রের অনেক আগে দীপ্তিহীন হয়ে পড়বে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিরিয়াস নক্ষত্রদেহে সূর্যের চাইতে ১৫ গুণ দ্রুত গতিতে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হচ্ছে; ফলে সূর্যের চাইতে ১৫ গুণ সময় পূর্বে সে তার দীপ্তি হারাতে আরম্ভ করবে।

নক্ষত্রগুলির এইরূপ বিবর্তনের ফলে একটা নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এডিংটনের মতে নক্ষত্র দেহের ভর ও ঔজ্জ্বল্যের যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল—নাক্ষত্রিক বিবর্তনের ফলে দেখা যায় যে, কোনও নক্ষত্রে ১০গুণ ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেলেও তার ভর বাড়বেনা। ফলে সমান ভরের নক্ষত্রদেহে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য দেখা যাবে। অথবা একই পরিমাণ উজ্জ্বল দুটি নক্ষত্রের ভর অসমান দাঁড়াবে। তাহলে এডিংটনের মতবাদ কি ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে? এই প্রশ্নের মীমাংসায় আসতে হলে নক্ষত্র-বিবর্তনের ধারা উপলব্ধি করতে হবে। যেহেতু হাইড্রোজেন ফুরাতে আরম্ভ করলেই নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য বাড়তে থাকে এবং যতই হাইড্রোজেন কম থাকে নক্ষত্রদেহের বিকিরণের হার ততই বেড়ে চলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নক্ষত্রগুলি তার প্রাথমিক জীবনে হাইড্রোজেন খুব ধীরে ধীরে খরচ করে—ঔজ্জ্বল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে পারমাণবিক তেজ বিকিরণের হার, তথা হাইড্রোজেন ক্ষয়ের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে নক্ষত্রের প্রাথমিক জীবন হয় তার উজ্জ্বলতর জীবনের চাইতে দীর্ঘতর। গণনায় দেখা যায় যে, আমাদের সূর্য তার বিবর্তনকালে ১০গুণ ঔজ্জ্বল্যে বর্ধিত হতে তার জীবনকালের শতকরা

৯০ ভাগ ব্যয় করবে, আর ১০ থেকে ১০০গুণ ঔজ্জ্বল্যে পেতে বাকী ১০ভাগ মাত্র ব্যয়িত হবে। অধ্যাপক গ্যামো বলেন, কোনও লোকসমাজে যদি শৈশবকাল সমগ্র জীবনের ৯০ ভাগ সময় অধিকার করে থাকে, তবে সেই সমাজে শিশুর সংখ্যাই হবে অধিক। এই কারণে আমাদের আকাশে বিবর্তন কালের প্রথমার্ধে অবস্থিত নক্ষত্রই বেশী দেখা যায়।

ভর-ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে এই নক্ষত্রগুলিকে অধিক সংখ্যায় পরীক্ষা করে উক্ত মতবাদ খাড়া করা হয়েছিল। যে কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঘটনাক্রমে পরীক্ষা করা হয়েছিল তারা এই মতবাদ প্রায়ই অমান্য করেছে। আর এক-দিক দিয়ে দেখা যায়—আমাদের নক্ষত্রজগতের শৈশব এখনো অতিক্রান্ত হয়নি; মাত্র ২ বিলিয়ন বছর পূর্বে তার জন্ম। আমাদের সূর্যেই হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হতে প্রায় ১০বিলিয়ন বছর লাগবে। নক্ষত্রজগতের জন্মলাভের পর এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাই সূর্য বা তদ্রূপ কোনও নক্ষত্রের অল্প পরিমাণ বিবর্তন হওয়াই সম্ভব। কেবল হাইড্রোজেন নিঃশেষিত প্রায়, অধিকতর-উজ্জ্বল সাধারণ পর্যায়ের উপরের দিকের নীলদানব শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি বিবর্তনের দ্বিতীয়ার্ধে অল্পস্থায়ী জ্যোতির্ময় জীবন লাভ করেছে মাত্র। তাই সেখানে ভর-ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধের স্পষ্টতঃই বিপর্যয় দেখা যায়।

অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভাঙ্গাগড়ার ফলে নক্ষত্রের দীপ্তি ও বিবর্তন তার সমগ্র জীবনকালের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। হাইড্রোজেন থেকে তেজ রূপান্তরিত করার মত কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা পাওয়ার পূর্বে আমাদের সূর্য ও নক্ষত্রগুলি যে শৈশব অবস্থায় ছিল, আবার সমস্ত হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তারা যে বার্ধক্যের অবস্থা প্রাপ্ত হবে,—নক্ষত্রজগতের এই সব নানা সমস্যা রয়েছে বিজ্ঞানীদের সম্মুখে। এ সব সমস্যার সমাধানও হয়েছে কিছু কিছু। সংক্ষেপে বলতে গেলে, লালদানব হচ্ছে নক্ষত্রের শৈশব অবস্থা তার বিপরীত দিকে রাসেলের চিত্রের নিম্নে বাঁ দিকের কোণে ভীড় করে আছে স্থবির শ্বেত বামনের দল।

সামুদ্রিক ডিম্ব

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত বার্বাডোস অঞ্চলের সামুদ্রিক ডিম্ব শিল্পের কথা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। এখানে প্রতি বৎসর ঝড়ের ঋতুতে অভিজ্ঞ ডুবুরীরা সমুদ্র গর্ভ থেকে ডিম্ব সংগ্রহ করে। এই অঞ্চলে ডিম্বের ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০০ পাউণ্ডের (৬৬,৬৬৭ টাকা) লেন দেন হয়।

জেলেরা কোন বিশেষ ধরণের ডুবুরীর পোষাক পরে না। হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের কাছে কেবলমাত্র ছুরি থাকে। জলমগ্ন পাহাড়ের গা থেকে তারা ডিম্বগুলি সংগ্রহ করে। বার্বাডোসবাসীদের নিকট এই ডিম্ব অতি উপাদেয় খাদ্য।

সামুদ্রিক ডিম্ব নামে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলি একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী। ওপরের শক্ত খোলাটি ভাঙ্গলেই ভেতরে পাঁচটি ডিম্ব পাওয়া যায়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

হাঁস যেমন জল থেকে দুধ পৃথক করে নেয়,
তোমরা সেরূপ বিষয়বৈচিত্র্যের মিশ্রণ
থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ আহরণ কর।

উপরের বাঁ-দিকের গুলো নেপেন্থিস্ জাতীয় শিকারী গাছ। ডান দিকের গুলো শিকারীর শিঙ্গা বা সারাসেনিয়া। মাঝের গাছটাও এক জাতের সারাসেনিয়া। নীচে বাঁ দিকে ড্রসেরা বা সূর্য-শিশির। মধ্যে বাটারওয়ার্ট। ডানদিকে—ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ বা ডায়োনিয়া।

২৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য
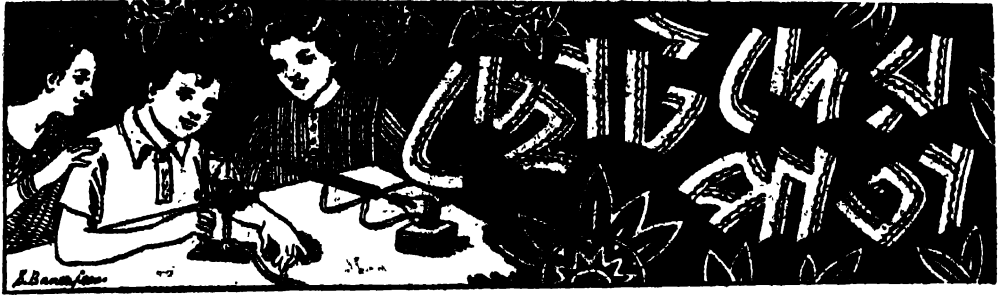
করে দেখ

টাট্‌কা ডিম কি জলে ভাসে ?

ভূগোলে নিশ্চয়ই তোমরা 'ডেড্‌-সি'র কথা পড়েছ। 'ডেড্‌-সি' একটা প্রকাণ্ড হ্রদ। সাঁতার না জেনে জলে নামলে ডুবে মরতে হয়—একথা কাউকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু সাঁতার না জেনেও জলে ডুবতে হয় না, এমন বিস্ময়কর জলাশয়ও পৃথিবীতে রয়েছে। 'ডেড্‌-সি'-ই এরকমের একটা প্রকাণ্ড জলাশয়। সাঁতার জানে না এমন কেউ 'ডেড্‌-সি'র জলে পড়ে গেলেও তার ডুবে মরবার আশঙ্কা নেই। শোলার মত সে জলের উপরেই ভেসে থাকবে।

কেন এমন হয়, বলতে পার? সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে হালকা বলে শোলা জলে ভাসে; কিন্তু সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে মানুষের শরীর ভারী। কাজেই মানুষ জলে ডুবে যায়। 'ডেড্‌-সি'র জলের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। 'ডেড্‌-সি'র জলে প্রচুর পরিমাণ লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সেজন্যে সাধারণ পরিষ্কার জলের চেয়ে 'ডেড-সি'র জলের ঘনত্ব অনেক বেশী। কাজেই সম-আয়তনের জলের চেয়ে হালকা হওয়ায় মানুষ 'ডেড্‌-সি'র জলের উপর ভেসে থাকে।

ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বোঝবার জন্যে খুব সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। দুটা কাঁচের গ্লাস লও। একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পর্যন্ত পরিষ্কার জলে ভর্তি কর। দ্বিতীয় গ্লাসটারও অর্ধেকটা অবধি পরিষ্কার জল ভর্তি করে তাতে বেশ খানিকটা নুন ঢেলে দাও। নুনটা জলে গলে গেলে জলটা পরিষ্কারই দেখাবে। এবার একটা হাঁসের ডিম এনে পরিষ্কার জলের গ্লাসে ছেড়ে দাও। ডিমটা গ্লাসের তলায় ডুবে যাবে। কারণ টাট্‌কা ডিম তার সম-আয়তনের জলের চেয়ে ভারী। ১নং চিত্র দেখ। এবার ডিমটাকে গ্লাস থেকে তুলে এনে দ্বিতীয় গ্লাসের নুন-গোলা জলে ছেড়ে দাও। দেখবে, ডিমটা এবার গ্লাসের তলায় ডুবে না গিয়ে জলের উপর ভেসে থাকবে। ২নং চিত্র দেখ। এথেকেই বুঝতে পারবে—'ডেড্‌-সি'র জলে মানুষ কেন ডুবে যায় না।

এবার ডিমটাকে তুলে এনে তার গায়ে এক জায়গায় খানিকটা নরম মোম এঁটে দিয়ে তার সংগে কিছু সীসা বা লোহার কুচি জুড়ে দাও। সীসা বা লোহার কুচি লেগে থাকায় ডিমটা আগের চেয়ে কিছুটা ভারী হবে। ডিমটাকে এখন আবার নুন-গোলা জলের গ্লাসে
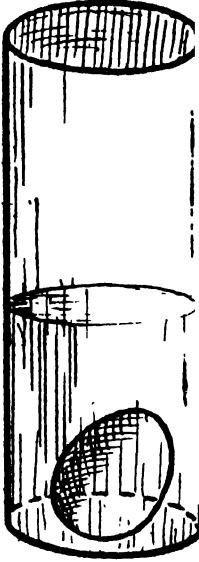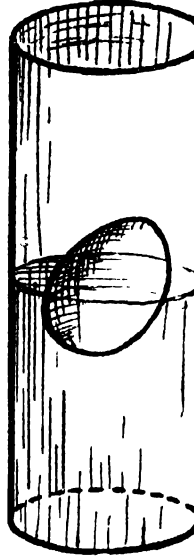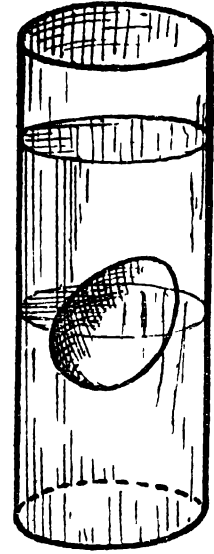
১নং চিত্র　　২নং চিত্র　　৩নং চিত্র

ছেড়ে দাও। বেশী ভারী হয়ে থাকলে ডিমটা ধীরে ধীরে গ্লাসের তলায় চলে যাবে। এক আধটা কুচি তুলে নিলে খানিকটা হাল্কা হওয়ার দরুণ ডিমটা আবার উপরের দিকে ভেসে উঠতে থাকবে। আচ্ছা, এবার চেষ্টা করে দেখ দেখি—ছু-একটা কুচি খুলে নিয়ে অথবা এঁটে দিয়ে এমন ওজন করতে পার কিনা, যাতে ডিমটা জলের উপরে ভেসেও উঠবে না বা একেবারে ডুবেও যাবে না—জলের মধ্যিখানটায় ভেসে থাকবে ?

একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি যাতে অতি সহজেই ডিমটাকে জলের মধ্যিখানটায় ভাসিয়ে রাখতে পারবে। একটা ফানেল (বাংলায় যাকে ফুঁদেল বলা হয়) সংগ্রহ করে তার লম্বা চোঙটাতে ছোট্ট একটা রবারের নল পরিয়ে দাও। ফানেলটাকে পরিষ্কার জলের গ্লাসটার উপর ধরে রবারের নলটা গ্লাসের তলা অবধি চালিয়ে দাও। এবার দ্বিতীয় গ্লাসটার নুন-গোলা জল ধীরে ধীরে ফানেলের মধ্যে ঢালতে থাক। নুন-গোলা জলটা গ্লাসের নীচের দিকেই থাকবে। পরিষ্কার জলটা উপরে থেকে গ্লাসের কানা অবধি ভর্তি করবে। ডিমটাকে এবার এই গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে ডিমটা গ্লাসের জলের মাঝামাঝি ভেসে আছে। ৩নং ছবি দেখ।

গ. চ. ভ.

গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি

কাপড়ের লোহার দাগ তোলবার ব্যবস্থা

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ—জামা-কাপড়ে লোহার দাগের মত দাগ ধরে গেলে ধোপার বাড়ী দিয়েও তা তুলতে পারা যায় না। এরূপ দাগ ধরে যাওয়ার ফলে অনেক সময় জামা-কাপড় সম্পূর্ণরূপে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। এই দাগ তোলবার একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। পরীক্ষা করে দেখো। খানিকটা অক্স্যালিক অ্যাসিড (oxalie acid) যোগাড় করতে হবে। ওষুধ বিক্রেতার দোকানে অক্স্যালিক অ্যাসিড কিনতে পাওয়া যাবে। জিনিষটা করকচের দানার মত এবং ধবধবে সাদা। একটুখানি জিভে ছোঁয়ালে খুব টক স্বাদ লাগবে। ছোট কাঁচের গ্লাস বা চায়ের কাপে প্রয়োজন মত কিছু অক্স্যালিক অ্যাসিডের দানা অল্প জলে গুলে নাও। ওই জলটাকে তুলি দিয়ে কাপড়ের দাগের উপর দু'একবার লাগাতে লাগাতেই দেখবে—দাগ ক্রমশঃ ফ্যাকাসে হতে হতে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কোরা কাপড় সাদা করবার ব্যবস্থা

তোমরা সবাই দেখেছ—কোরা কাপড়ে একটা লালচে রং থাকে। সাবান, সোডা বা যে কোন ক্ষারই ব্যবহার কর না কেন সহজে এই লালচে রং উঠানো যায় না। তোমাদের একটা সহজ উপায়ের কথা বলে দিচ্ছি, করে দেখো—কত সহজে প্রায় দু'-এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে লালচে রঙের কোরা কাপড় ধবধবে সাদা হয়ে যায়। একটা বালতিতে কিছু পরিষ্কার জল লও। জলের পরিমাণ এতটা হওয়া চাই যাতে এক-খানা কোরা কাপড় ডুবিয়ে রাখা যায়। এবার পরিষ্কার ন্যাকড়ায় করে খানিকটা ব্লিচিং পাউডার বালতির জলে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া কর। ব্লিচিং পাউডার গুলে গিয়ে জলটা খড়ি-গোলার মত সাদা হয়ে যাবে। ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে সাদা কাঁকরের মত কতকগুলো জিনিস অবশিষ্ট থাকবে। সেগুলো যেন বালতির জলের মধ্যে না পড়ে। কারণ এই কাঁকরগুলো কাপড়ের যেখানে লেগে থাকবে সেখানটাই ফুটো হয়ে যেতে পারে। এবার কাপড়খানাকে বালতির জলে বেশ করে ভিজিয়ে ডুবিয়ে রাখ। ১৫।২০ মিনিট পরে পরে কাপড়টাকে একটু উল্টেপাল্টে দিতে হবে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কাপড়টা সাদা হয়ে যাবে। তখন তুলে নিয়ে কাপড়টাকে বেশ করে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই হলো। প্রথম পরীক্ষা করবার সময় একটু কম ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করো। কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রয়োজন মত ব্লিচিং পাউডার দিয়ে অল্প সময়ে কাপড় সাদা করতে পারবে।

সেলুলয়েডের জিনিষ জোড়বার ব্যবস্থা

চশমার ফ্রেম, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি জিনিস ভেঙে গেলে বা ফেটে গেলে সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে। ধর, একটা দামী ফাউন্টেন পেন হাত থেকে পড়ে ফেটে গেল। কি করে সেটাকে মেরামত করা যায়? একটা সহজ উপায়ের কথা বলে দিচ্ছি। পরীক্ষা করে দেখতে পার। প্রথমে খানিকটা অ্যামাইল অ্যাসিটেট, অ্যাসিটোন এবং সেলুলয়েডের বাতিল টুকরা যোগাড় করতে হবে। অ্যামাইল অ্যাসিটেট ও অ্যাসিটোন কেমিষ্টের দোকান থেকে কিনতে পার। সেলুলডের ভাঙ্গাচোরা টুকরা যোগাড় করা মোটেই কষ্টকর নয়। বাতিল ফিল্ম পরিষ্কার করে টুকরা টুকরা করে কেটে নিলেও চলবে। এবার একটা কাঁচের শিশিতে তিন ভাগ অ্যামাইল অ্যাসিটেটের সংগে এক ভাগ অ্যাসিটোন মিশিয়ে তার মধ্যে কয়েকটা সেলুলয়েডের টুকরা ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেলুলয়েড গলে যাবে। এবার আরও কিছু সেলুলয়েড মিশাও। এভাবে বেশ কিছুটা সেলুলয়েড গলে যাবার পর পদার্থটা ঘন আঠার মত হয়ে যাবে। শিশিতে ভাল করে ছিপি এঁটে রেখে দাও! ভালভাবে ছিপি আঁটা না থাকলে পদার্থটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যাবে।

এবার সরু একটা কাঠির ডগায় করে খানিকটা আঠালো পদার্থ তুলে নিয়ে কলমটার ফাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আঠালো পদার্থটা শুকিয়ে ফাটল বন্ধ হয়ে যাবে। প্রয়োজনমত দু'তিনবারও লাগাতে পার। যদি ফাটল খুব চওড়া হয় তবে সুবিধামত স্থানে সরুতার বা সুতা দিয়ে জোরকরে বেঁধে তারপরে আঠালো পদার্থটা লাগাতে হবে এবং ওই অবস্থাতেই অন্ততঃ একদিন রেখে দিবে। চশমার ফ্রেম ইত্যাদি যে কোন জিনিষ এভাবে জুড়তে পার। সেলুলয়েডের ফিল্ম প্রভৃতির মত পাতলা জিনিষ জুড়তে হলে ওই রকমের আঠার দরকার হবে না। একটু অ্যামাইল অ্যাসিটেট লাগিয়ে একটার উপর আর একটা খানিকক্ষণ চেপে রাখলেই বেশ জুড়ে যাবে।

উনুন ধরাবার সহজ ব্যবস্থা

প্রায় প্রত্যেক গৃহস্তের ঘরেই অন্ততঃ দু'বেলা উনুন ধরানো একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কলকাতার মত সহরে ঘরে ঘরে উনুনে আঁচ দেবার সময় ধোঁয়ার জ্বালায় যে কি দুর্ভোগটা ভুগতে হয় তা কাউকে বলে বোঝাবার দরকার করে না। বিশেষ করে শীতকালের তো কথাই নেই। ধোঁয়ায় রাস্তাঘাট পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে যায়। এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের দেশে ধোঁয়া বের করে দেবার জন্যে চিমনি ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। আমাদের দেশে যে ধরণের উনুন ব্যবহৃত হয় তাতে কাঠ বা ঘুঁটের উপর কয়লা সাজিয়ে আঁচ দিলে খুব বেশী ধোঁয়া উঠবেই। তবে প্রথমে ঘুঁটে বা কাঠে

আগুন ধরিয়ে একটু জোরে হাওয়া দিলে সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। ওই সময়ে অল্প অল্প করে কিছু ছোট ছোট হাল্কা কয়লা দিলে সেগুলো তাড়াতাড়ি ধরে যাবে। হাওয়া দিতে দিতে তার উপর আরও কিছু কুচো কয়লা ছড়িয়ে দিলে সেগুলো ধরতেও দেরী হবে না। আগুনের শিখা থাকলে তাতে ধোঁয়া থাকবে অনেক কম এবং কয়লাও ধরবে খুব কম সময়ে। প্রথম থেকে সমান ভাবে হাওয়া দিলেই এটা সম্ভব হতে পারে। হাওয়ায় আগুনের শিখা বজায় থাকবে এবং সামান্য ধোঁয়াটুকুও উপরে উঠে যাবে। কুচো কয়লা ধরে গেলে তার উপর বড় কয়লা সাজিয়ে দিলে হাওয়া ছাড়াও সেগুলো আস্তে আস্তে ধরে যাবে। অতি সামান্যই ধোঁয়া উঠবে। এরূপ না করলে উনুনে অসম্ভব রকমের ধোঁয়া উঠবেই এবং সেই ধোঁয়া সোজা উপরের দিকে না গিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

এটা হলো একটু পরিশ্রমের কাজ, কারণ প্রথম থেকে কিছুক্ষণ অনবরত হাওয়া দিতে হয়। এর চেয়ে আর একটা সহজ ব্যবস্থার কথা বলছি। উনুনের মুখের প্রায় সমান গোলাকার, দুফুট কিংবা তিনফুট লম্বা, দুমুখ খোলা একটা টিনের বা লোহার ড্রাম-ঘুঁটে, কয়লা সাজানো উনুনের মুখের উপর বসিয়ে দিলেই হলো। উনুনের মুখ ও ড্রামের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থাকলেও তেমন কিছু অসুবিধা হবে না। উনুনে আগুন ধরিয়ে ৫।৭ মিনিট হাওয়া দিয়ে আগুনের শিখাটা উঠিয়ে দিলেই সুবিধা। দেখবে, হাওয়া বন্ধ-করলেও আগুন জোর জ্বলতে থাকবে এবং যা কিছু ধোঁয়া উপরে উঠে যাবে। উনুনও ধরে যাবে অনেক কম সময়ে। লক্ষ্য করে দেখো—ড্রামটা বসিয়ে দিলেই মনে হবে যেন তলা থেকে উনুনের মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস উপরে উঠে যাচ্ছে। জ্বলন্ত উনুনের মুখে দুমুখ খোলা একটা ড্রাম বসিয়ে দিলে উনুনের ভিতর দিয়ে কেন প্রবল বেগে বাতাসের স্রোত বইতে থাকে সেকথা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখলেই কারণটা বুঝতে পারবে।

গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

শিকারী গাছের কথা

প্রাণীদের মধ্যে একে অন্যকে হত্যা করে' জীবন ধারণ করে—এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখে থাকবে। কিন্তু উদ্ভিদেরা জ্যান্ত প্রাণীদের ধরে খায়—এরূপ ব্যাপার কখনও প্রত্যক্ষ করেছ কি? তোমাদের অনেকেই হয়তো এরূপ শিকারী উদ্ভিদের কথা পড়েছ; কিন্তু আমাদের দেশেও যে এরূপ অনেক শিকারী উদ্ভিদ রয়েছে সে খবর বোধহয় অনেকেই রাখ না। একটু কষ্ট স্বীকার করে খোঁজ করলে আমাদের দেশে.

এমনকি কলকাতার আশেপাশে খালেবিলে অথবা বালুকাময় পতিত জমিতে এধরণের অনেক উদ্ভিদ দেখতে পাবে।

বিভিন্ন জাতের গাছপালা যে অপূর্ব কৌশলে জীবন্ত প্রাণীদের ধরে উদরস্থ করে—একথা জানা গেছে বহুকাল পূর্বেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এপর্যন্ত এধরণের প্রায় সাড়ে চারশ' বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ৪০।৪৫ বছর পূর্বেও শিকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে এমন সব রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত ছিল, যা শুনে ভয়ে

নেপেন্‌থিস্‌ নামক শিকারী উদ্ভিদ।
পাতার ডগার সূক্ষ্ম বোঁটা থেকে শিকার ধরবার ঘটগুলো ঝুলে আছে। বোর্ণিও দ্বীপে এগাছগুলো জন্মে থাকে।

গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। অনেকে আবার প্রত্যক্ষদর্শীর মত, কোন কোন উদ্ভিদের মানুষ-শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাঝে মাঝে এখনও যে এমন দু-একটা কাহিনী না শোনা যায়, এমন নয়।

প্রশান্তমহাসাগরের দক্ষিণ দিকে এল বান্নুর নামে একটা দ্বীপ আছে। লোকে এটাকে বলে—মৃত্যুর দ্বীপ। ১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন আর্করাইট বলেছেন যে, তিনি এই দ্বীপে একরকমের অদ্ভুত ফুল দেখেছিলেন। ফুলটা নাকি এত বড় যে, একটা মানুষ অনায়াসে তার ভিতরের গর্তের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। গর্তটা নাকি ছোটখাট একটা গুহার মত। ভিতরটা যেমন রঙচঙে তেমনই সুগন্ধে ভর্তি। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যদি কেউ সেই ফুলের গর্তে ঢুকে পড়ে তবে আর রক্ষা নেই। গন্ধের অপূর্ব মাদকতা শক্তির বলে সে সেখানে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সংগে সংগে ফুলের পাপড়িগুলো উল্টে এসে তার বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়। শিকার হজম হয়ে গেলে পাপড়ি মেলে ফুলটা আবার নতুন শিকারের সন্ধানে হাঁ করে বসে থাকে।

আমেরিকান্ ন্যাচারেলিষ্ট মিঃ ডানষ্টান একরকম শিকারী লতাগাছের কথা বলেছেন। নিকারাগুয়ার জলাভূমিতে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর কুকুরটা নাকি এরকমের একপ্রকার লতা-গাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে মেক্সিকোর সিয়েরা ম্যাডার নামক অঞ্চলের সর্প-বৃক্ষ নামে একরকম প্রাণী-শিকারী উদ্ভিদের বিবরণ জানা যায়। এই উদ্ভিদের নাকি সাপের মত কতকগুলো ডাল বেরোয়। এই ডালগুলো ভয়ানক স্পর্শ-কাতর। পাখী বা অন্য কোন ছোট প্রাণী এর উপর বসামাত্রই ডালগুলো তাকে জড়িয়ে ফেলে এবং বেমালুম গাছের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। এক পর্যটনকারী বলেছেন যে, দৈবাৎ এরকম একটা ডালের সংস্পর্শে আসামাত্রই ডালটা তার হাত জড়িয়ে ধরে। অতিকষ্টে ছাড়িয়ে আনতে পারলেও হাতটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়—ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছ সম্বন্ধে। আফ্রিকার পূর্বদিকে ম্যাডাগাস্কার একটা বৃহৎ দ্বীপ। এই দ্বীপে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। ডাঃ কার্ল লাইক নামে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছের কথা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি নাকি স্বচক্ষে এরকম একটা দৃশ্য দেখেছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি, ১৯২০ সালেও এই বিবরণীর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। ডাঃ লাইকের বিবরণ থেকে জানা যায়—এই মানুষ-খেকো গাছটা নাকি দেখতে বিরাট একটা আনারস গাছের মত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করে থাকে। গাছের কাণ্ডটা প্রায় দশফুট উঁচু প্রকাণ্ড একটা পিপের মত। গাছটার মাথার দিক থেকে ১০।১২ ফুট লম্বা এবং ফুটখানেক চওড়া ৮টা চ্যাপ্টা পাতা ঝুলে থাকে।

পাতাগুলোর ডগার দিকটা ক্রমশঃ সরু হতে হতে সূচের মত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে তাছাড়া পাতার গায়ে অসংখ্য বিষাক্ত কাঁটাও আছে।

একবার রাত্রিবেলায় এরূপ একটা গাছের কাছে একটি মেয়েকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ডাঃ লাইককে এই অনুষ্ঠানটা দেখাতে নিয়ে যায়। অধিবাসীরা একটি যুবতী স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে এসে তাকে গাছটার উপরে উঠিয়ে সেখানে সঞ্চিত একরকমের তরল পদার্থ পান করতে বাধ্য করলো। ডাঃ লাইক লিখেছেন—"আমি ভেবেছিলাম, মেয়েটা গাছের উপর থেকে লাফিয়ে পড়বে এবং ব্যাপারটার ওখানেই যবনিকাপাত হবে। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তা নয়; ওখানে কি ঘটছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করে একটা অস্বাভাবিক ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে গাছটাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং অসাড় বলে মনে হচ্ছিল, সে যেন অকস্মাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

যে সবুজ পাতাগুলোকে শক্ত এবং অনমনীয় মনে হয়েছিল সেই পাতাগুলোই মেয়েটাকে সাপের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে মোচড় দিতে লাগলো। মেয়েটা যখন বস্তুপিণ্ডের মত নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, সেই সময় এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য নজরে পড়লো যা জীবনে কখনও ভোলবার নয়। সেই বিরাট পাতাগুলো খুব ধীরে ধীরে খাড়া হতে লাগলো। তারপর চাপ-দেওয়া মেসিনের মত প্রচণ্ড চাপে ভীষণ-দর্শন কাঁটাগুলোকে শরীরে বিদ্ধকরে মেয়েটাকে সম্পূর্ণরূপে মুড়ে ফেললো।"

বৃহদাকারের একজাতের নেপেন্থিস্।
একটা মাছি নেপেন্থিসের ঘটির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আজ পর্যন্ত এরূপ কোন শিকারী গাছের খবর পাওয়া যায়নি। যেসব শিকারী গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা কীট-পতঙ্গ বা ছোটখাট পাখী এবং টিকটিকি, ব্যাং, ইঁদুর প্রভৃতি

প্রাণীদের শিকার করেই দেহসাৎ করে মাত্র। এদের শিকার ধরার কৌশল যেমন বিচিত্র তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। শিকারী উদ্ভিদের অনেকেই জলে অথবা জলাভূমিতে জন্মে থাকে। তাই নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করবার জন্যে তারা প্রাণীদেহ আত্মসাৎ করবার উপায় বেছে নিয়েছে। অবশ্য প্রাণীজ নাইট্রোজেন ছাড়াও চলে এমন অনেক গাছ আছে; কিন্তু প্রাণীজ নাইট্রোজেন সংগ্রহের ফলে এদের দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির অনেক সহায়তা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাঙেরছাতা জাতীয় অনেক উদ্ভিদ আছে যারা খাদ্যের জন্যে প্রাণীদের উপরই নির্ভর করে থাকে। বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের ফাঁদ পেতে শিকার আয়ত্ত করে। কারোর থাকে গর্ত-ফাঁদ, কারোর আঠালো পাতার ফাঁদ, কারোর বজ্র-আঁটুনি ফাঁদ আবার কারোর থাকে ইঁদুর-ধরা ফাঁদ। গর্ত-ফাঁদের মধ্যে ঘটি-লতা, শিকারীর শিঙ্গা প্রভৃতির ফাঁদের কৌশলই বোধ হয় সবচাইতে সরল। কারণ শিকার ধরবার জন্যে এদের মোটেই নড়াচড়া করতে হয় না। ঘটি বা শিঙ্গার ঢাকনাটা খুলে হাঁ-করে বসে থাকে। লোভের বশে কীট-পতঙ্গ এসে গর্তের ভিতরে ঢুকে যায়। নীচের দিকে মুখকরা শোঁয়ার দরুণ আর বেরিয়ে আসতে না পেরে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ আমেরিকার হেলিয়ামফোরা, উত্তর আমেরিকার সারাসেনিয়া, আমাদের দেশীয় নেপেন্থেস্ প্রভৃতি শিকারী-উদ্ভিদেরা এভাবেই শিকার ধরে থাকে। অন্যান্য শিকারী-উদ্ভিদগুলোর কেউ উজ্জ্বল রং, কেউ গন্ধ, কেউ মধু এবং কেউবা সুমিষ্ট আঠার সাহায্যে শিকারকে আকৃষ্ট করে ফাঁদে চেপে ধরে। ভেনাস ফ্লাই-ট্র্যাপ, ডাইওনিয়া, ব্ল্যাডারওয়ার্ট, সূর্য-শিশির, জেন্‌-লিসিয়া, ড্রসোফাইলাম, ইউট্রিকুলেরিয়া প্রভৃতি এধরণের উদ্ভিদ।
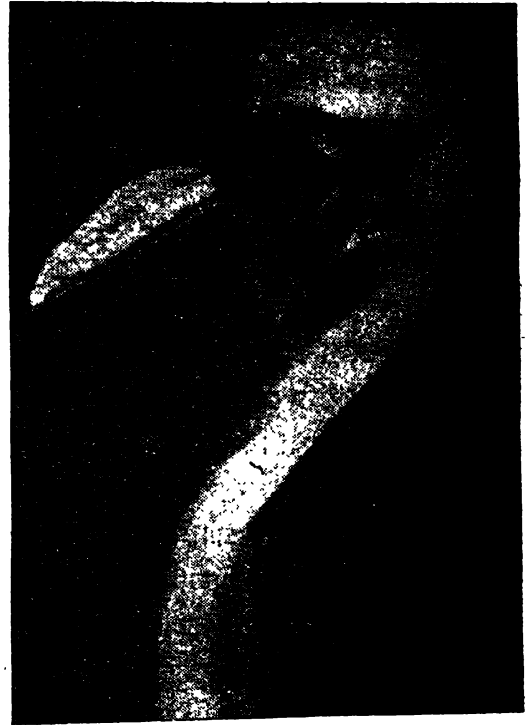
সূর্য-শিশির, ড্রসোফাইলাম প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদগুলোর পাতার গায়ে ছোট ছোট ফোঁটার মত আঠালো পদার্থ লেগে থাকতে দেখা

ডালিংটনিয়া নামে সর্পাকৃতি শিকারী উদ্ভিদ। পোকা-মাকড় মুখের ভিতরে ঢুকে গেলে আর বেরুবার উপায় থাকে না। জিভের মত পাখনা দুটো তার বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়।

যায়। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ পাতার উপর উপবেশন করলে আঠায় জড়িয়ে যায়। অনেক উদ্ভিদের আঠা যেমন একটু টানলেই সূতার মত লম্বা হয়ে আসে এদের আঠা সেরকমের নয়। মশা-মাছি পাতার উপর বসামাত্রেই এই আঠা ডেলার মত তাদের গায়ে লেগে যায়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবার ফলে ক্রমশঃ অনেকগুলো আঠার ডেলা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লেগে যাওয়ায় সে আর উড়ে পালাতে পারে না এবং উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এভাবে আটকা পড়ে মশার মত প্রাণী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হজম হয়ে গেছে। ডায়োনিয়া প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদের পাতার দুধারে দাঁতের মত কতকগুলো সংকোচনশীল শোঁয়া আছে। কোন কীট-পতঙ্গ পাতার উপর বসামাত্রই ধারগুলো দাঁতে দাঁতে মুড়ে গিয়ে শিকারকে ইঁদুর-কলের মত চেপে ধরে। কোন কোন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ অদ্ভুত উপায়ে শিকার ধরে থাকে। এরা সাধারণতঃ ইল-ওয়ার্ম নামে একরকমের কৃমিজাতীয় পোকা শিকার করে। তোমরা বোধ হয় 'ল্যাসো'র কথা শুনেছ। অতি সহজ উপায়ে বুনো জীব-জন্তু ধরবার জন্যে 'ল্যাসো' ব্যবহৃত হয়। একপ্রান্তে আলগাভাবে ফাঁস পড়ানো একটা লম্বা দড়িকে বলা হয়—'ল্যাসো'। দড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে শিকারী অব্যর্থ লক্ষ্যে ধাবমান জন্তুর উপর ছুড়ে দেয়। ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে গিয়ে জন্তুটা আটকা পড়ে যায়। অনেক শিকারী 'ল্যাসো' দিয়ে বাঘ, ভাল্লুক, অজগর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকেও জীবন্ত ধরে আনে। ড্যাক্‌টিলেরিয়া নামে একজাতীয় ছত্রাকের সূতার মত লম্বা শিকড়ের ডগার দিকে 'ল্যাসোর' মত ফাঁস থাকে। ঘোরাফেরা করবার সময় কোন কৃমি-পোকা অসাবধানে ওই ফাঁসের মধ্যে ঢুকে পড়লে আর রক্ষা নেই! সংগে সংগেই ফাঁসের কোষগুলো ফুলে উঠে শিকারটাকে চেপে ধরে। পরে নতুন নতুন ছত্রাক-সূত্র বেরিয়ে এসে শিকারের দেহের ভিতর প্রবেশ করে। কোন কোন ছত্রাক-সূত্রের ফাঁসটা থাকে ভয়ানক আঠালো। শিকার সেই আঠায় আটকে যায়।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশেও কয়েক রকমের শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের কয়েকটার শিকার-প্রণালী যতটা লক্ষ্য করেছি, সেকথা বলছি। অনেকদিন আগে আমাদের লেবেটরীর (বসু বিজ্ঞান মন্দিরের) গাছ-ঘরে শিলং বা ওদিককার কোন অঞ্চল থেকে আনা কয়েকটা ঘটি-লতা গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছগুলো প্রায় মানুষের সমান উঁচু। পাতাগুলো বেশ লম্বা এবং চওড়া। পাতার ডগায় একটা সরু, লম্বা বোঁটা। প্রত্যেকটা বোঁটার শেষের দিকে বেশ বড় একটা ঘট খাড়াভাবে থাকে। ঘটটা লম্বায় ৪।৫ ইঞ্চির কম নয়। ঘটগুলো দেখতে সাধারণ মাটির ঘটেরই মত; কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটা ঘটই একদিকে খানিকটা বাঁকানো। প্রত্যেকটা ঘটের মুখে কব্জা-ওয়ালা ঢাকনার মত একটা ছোট্ট পাতা আছে। এই ঢাকনা-পাতাটাকে সবসময়েই প্রায় আধবোজা অবস্থায় থাকতেই দেখেছি। ঘটের কানাটা দেখে মনে হয় যেন মানুষের

হাতের তৈরী। কোন সুনিপুণ কারিগর যেন একগাছা সূক্ষ্ম তার স্প্রিংয়ের মত করে কানাটার গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। কতকটা অস্বাভাবিক পরিবেশে থাকার জন্যে বোধ হয় গাছগুলোর উপর অনেকদিন পর্যন্ত কোন পোকা-মাকড়ের আনাগোনা দেখতে পাইনি। যাহোক, ওদের শিকার-কৌশলটা প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহে কয়েকটা ঘটের ঢাকনার উপর খানিকটা চিনির রস ছড়িয়ে দিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে সুরু করলাম। প্রায় ঘন্টা তিনেক বাদে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। চিনির লোভে একটা, দুটা করে ক্রমশঃ অনেকগুলো বড় বড় ডেয়ো-পিঁপড়ে এসে পাতার উপর ভীড় জমাতে লাগলো। কিন্তু একটারও ঘটের ভিতরে ঢোকবার আগ্রহ দেখা গেল না; চিনি খেতেই সবাই ব্যস্ত। পরের দিন গিয়ে দেখি—চিনির চিহ্নমাত্র নেই—তবুও পিঁপড়েরা লোভ ছাড়তে পারেনি; পাতার উপর, ঘটির গায়ে—বোধ হয় চিনির সন্ধানেই আনাগোনা করছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখলাম, অতিমাত্রায় কৌতূহলী একটা পিঁপড়ে ঘটের কানা বেয়ে খানিকটা ভিতরে চলে গেছে। ভেবেছিলাম, হয়তো ঢাকনাটা তখনই বন্ধ হয়ে গিয়ে পিপড়েটাকে আটক করে ফেলবে। কিন্তু ঢাকনাটার সেরকমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পিপড়েরা কিন্তু আর ভিতরে না গিয়ে, খানিক বাদেই বেরিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, দুটো পিঁপড়ে এসে প্রায় এক সংগেই ঘটের ভিতরে উঁকি মেরে দেখছে। একটা একটু বেশী ভিতরে গিয়ে নীচের দিকে মুখকরা সূক্ষ্ম শোঁয়াগুলোর উপর টাল সামলাবার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যেই হঠাৎ যেন পিঁপড়েটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুসন্ধানে বোঝ-লাম—পিঁপড়েটা পা পিছলে ঘটের ভিতরে পড়ে গেছে। দিন তিনেক পরে একটা ঘট চিরে তার ভিতরে অর্ধ গলিত বড় একটা উইচিংড়ি এবং গোটা সাতেক ডেয়ো-পিঁপড়ে পাওয়া গেল।
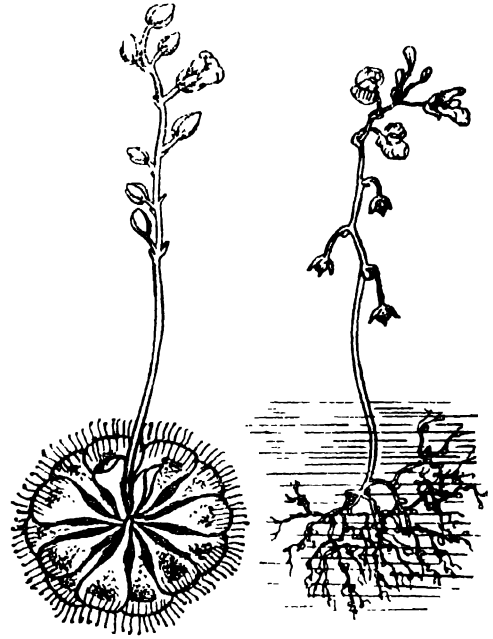
আমাদের দেশীয় শিকারী উদ্ভিদ।
ডানে—জলজ শিকারী উদ্ভিদ, ইউট্রিকুলেরিয়া।
বাঁয়ে—বালুকাময় স্থানের শিকারী উদ্ভিদ ড্রসেরা

শান্তিনিকেতনের কাছে কোপাই নদীর দিকে যাবার সময় মনে হলো—বালির উপর এদিকে ওদিকে যেন পানের পিক পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি, একরকমের ছোট ছোট

গাছ। দেখতে অনেকটা ছোট্ট টোকাপানার মত। ধারগুলো টকটকে লাল। এজন্যেই দূর থেকে পানের পিক বলে মনে হয়। পাতার চার দিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া। এরা কীট-পতঙ্গ শিকার করে' শরীর পোষণ করে। গাছগুলো ড্রসেরা জাতীয়। অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করবার পর একটা পাতার উপর ছোট্ট একটা পোকা দেখতে পেলাম। পোকাটার পিছনের দিকটা হু'একটা শোঁয়ায় জড়িয়ে যাওয়ায় সে সেগুলোর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল; কিন্তু এদিকে যে আবার অন্যান্য শোঁয়াগুলো মুড়ে এসে তাকে বন্দী করবার উদ্যোগে ছিল—এবিষয়ে মোটেই কোন ধারণা ছিলনা। প্রায় ঘণ্টা খানেক সময়ের মধ্যে শোঁয়াগুলো মুড়ে গিয়ে পোকাটাকে বেমালুম বন্দী করে ফেললো। এ অবস্থায় খানিকটা মাটি সমেত গাছটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। একদিন পরে পাতাটার সেই কোঁচকানো অংশটুকু ছিড়ে তার মধ্যে পোকাটার শরীরের সামান্য এক আধটুকু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।

অ্যাল্‌ড্রোভ্যাণ্ডা নামক—জলজ শিকারী-উদ্ভিদ

বর্ষাকালে মাণিকতলা খালের মধ্যে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সংগে একরকমের জলজ শিকারী উদ্ভিদ পেয়েছিলাম। উদ্ভিদগুলো ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয়। দেখতে সাধারণ জল-ঝাঁঝির মত, কিন্তু রংটা ফিকে সবুজ এবং পাতাগুলো খুব সরু। ডাঁটার প্রত্যেকটা গাঁটের কাছ থেকে অনেকগুলো করে ছোট ছোট, অর্ধ গোলাকৃতি পেটিকা জন্মে থাকে। এই পেটিকাগুলোই শিকার ধরবার যন্ত্র। জলজ কীটাণুগুলোকে পেটিকায় আবদ্ধ করে উদরসাৎ করে থাকে। নিম্নশক্তির বাইনোকুল্যার মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে এদের শিকার কৌশল যা' প্রত্যক্ষ করেছি তা' খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তোমরা ইচ্ছা করলে অনায়াসে খাল-বিল থেকে এই শিকারী উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ঘরে বসে, মাইক্রস্কোপের অভাবে অন্ততঃ—ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়েও তাদের শিকার ধরবার কৌশল প্রত্যক্ষ করতে পার।

গ. চ. ভ.

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী বীরবল সাহনী

গত ৯ই এপ্রিল তারিখে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর বীরবর সাহনী মাত্র ৫৮ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন একজন বিশ্ববিশ্রুত গবেষক। এই বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌয়ে তিনি ইনষ্টিটিউট অব প্যালিওবটানি নামে এক গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পৃথিবীতে এরূপ প্যালিওবটানির গবেষণাগার আর একটিও নেই। তিনিই ছিলেন এই গবেষণা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিনায়ক। গত ২রা এপ্রিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই ইনষ্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যুক্তপ্রদেশ সরকার ইনষ্টিটিউটের জন্যে প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন। গবেষণাগার নির্মাণে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ভারত সরকার এককালীন দেড়লক্ষ এবং বাৎসরিক দেড়লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

ডক্টর সাহনী পাঞ্জাবের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক রুচিরাম সাহনীর পুত্র। লাহোরে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কেমব্রিজ ও মিউনিকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কেমব্রিজের এস-সি, ডি এবং লণ্ডনের ডি, এস-সি উপাধি লাভের পর তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা ছাড়াও তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৯৩০ সালে কেমব্রিজে এবং ১৯৩৫ সালে আমষ্টারডামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্যালিওবটানি শাখার তিনি সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ সালে ডক্টর সাহনি রয়েল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৪৩-৪৫ সালে দুবার তিনি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্ এর সভাপতি এবং ১৯৪০ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি-পদে নির্বাচিত হন। তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ও ন্যাশনাল এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সস্-এর সহ সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর ফেলো এবং ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধর মুখার্জি লেকচারার নির্বাচিত হন। পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারেরি ডি, এস সি উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন। ষ্টকহলমে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনের সভাপতির পদেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ, গ্রন্থাগার এবং শিলীভূত উদ্ভিদের যাবতীয় মূল্যবান সংগ্রহ প্যালিওবটানি ইনষ্টিটিউটে দান করে গেছেন।

রেডিও ইলেকট্রনিক্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন

গত ২০শে এপ্রিল, বহু গণ্যমান্য এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রেডিও ইলেকট্রনিক্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ রায়কে ভিত্তি-প্রস্তর

স্থাপনের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, পঁচিশ বছর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার বিজ্ঞানকে স্নাতকোত্তর অধ্যায়নের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এর ব্যাপক প্রসারের জন্যে এম এস সি ক্লাসে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অধ্যয়ন করবার প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে। ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্যের জন্যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কেও এজন্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকুল্যে হরিণঘাটার রেডিও ষ্টেসন স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বর্তমান যুগে রেডিও-ফিজিক্স্ ও রেডিও-ইলেকট্রনিক্স্ সম্পর্কে গবেষণার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে ডাঃ রায় হার্টজ্ কর্তৃক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভাবন থেকে আজ পর্যন্ত এর ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ট্রায়োড-ভাল্ভ্ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের যুগ আরম্ভ হয়। গত দুটি মহাযুদ্ধের সময় বেতার ঘোষণার মারফৎ এর বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে এবং এর সাহায্যেই বেতারের কার্যকারিতা সম্ভব হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে স্যার জগদীশ এধরণের সূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গ সম্বন্ধ গবেষণা করেছিলেন। আজ যুদ্ধ এবং শান্তির সময় একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিমান-পথের নিরাপত্তা, শিল্প ও ঔষধপত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং বিশেষকরে দেশরক্ষা ব্যাপারে সামরিক কাজের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

সুতরাং জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের আলোচনা ও গবেষণায় দেশের গভর্ণমেণ্ট সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিবেন বলে আশা করা যায়। তিনি আরও আশা করেন যে, এই প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে এ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং দেশের বাইরে থেকেও ছাত্রেরা এসে এসম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করবেন।

ডাঃ শিশির কুমার মিত্র ডাঃ রায়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, বিজ্ঞানী এবং এঞ্জিনিয়ারর যাতে মৌলিক গবেষণা ও শিক্ষায় দ্বারা দেশের শিল্প ও অন্যান্য কাজের উন্নতি বিধান করতে ও দায়িত্ব নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাতে সাফল্য লাভের দ্বারাই এ প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বিবেচিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতে এই প্রথম। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে এতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। এই প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি তৈরীর জন্যে ভারত সরকার তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের জন্যে দুলক্ষ দশ হাজার এবং অন্যান্য ব্যয়ের জন্যে ৪৯ হাজার টাকা সাহায্য করেছেন।

বিজ্ঞান কলেজে মনস্তত্ত্ব প্রদর্শনী

গত ১২ই এপ্রিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞান কলেজের মনস্তত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ব্যবস্থাপিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী ১৯৫০ সালে ফলিত মনস্তত্ত্বের একটি পৃথক বিভাগ খোলা হবে।

মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ এস, সি, মিত্র বলেন যে, জীবিকা নির্বাচনে যুবকদের সাহায্য করা এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগ কেমন করে সমাজকে সাহায্য করতে পারে তা দেখাবার জন্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজ-মঙ্গল বিজ্ঞানে মনস্তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। আমাদের দেশের সমাজ সেবকদের এ বিষয়ে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষা, শিশু-অপরাধে চিকিৎসা এবং শিল্পমন

যথাযথভাবে গড়ে তোলবার জন্যে মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে ডাঃ মিত্র বলেন যে, প্রারম্ভে চিকিৎসা করা হলে শিশু-মনের অনেক ব্যাধি নিরাকৃত হয়ে থাকে। এছাড়া অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যেসব অশান্তি দেখা দিয়েছে তার কারণ কেবলমাত্র অর্থ-নীতিকই নয়। অনেক ক্ষেত্রে এটা প্রধান কারণও নয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়েছে—মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কিছুটা পরিবর্তন দ্বারা শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে।

ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা বলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনস্তত্ত্ব গবেষণা সম্পর্কে সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক। তিনি মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অদূর ভবিষ্যতে এই দেশেও মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে মনস্তত্ত্ব মূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হবে।

ভারতে পেনিসিলিনের কারখানা

এ, পি'র খবরে প্রকাশ—ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে পেনিসিলিনন, সালফা এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধ তৈরীর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনাটি কিভাবে তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে ভারত সরকারকে রিপোর্ট দাখিলের জন্যে মিঃ নেভিল ওয়াদিয়াকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। পেনিসিলিন তৈরীর কারখানাটি পুণা থেকে ১৬ মাইল দূরে দেহু রোডে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্মেলন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

এই কারখানার সমগ্র ব্যয়ের কতক অংশ ভারত সরকার এবং কতক অংশ প্রাদেশিক সরকার বহন করবেন।

দামোদর বাঁধ-নির্মাণ পরিকল্পনা—১০ই মার্চ, নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ, দামোদর বাঁধ-নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ আরম্ভ করবার পরিকল্পনা, নক্সা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই প্রথম দফার কাজ শেষ করবার জন্য প্রায় বারো কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত দপ্তরের ১৯৪৮ সালের কার্যাবলীর রিপোর্ট পেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কমিশনের পরিকল্পনা বিভাগের মধ্যে দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে দামোদর ও শাখানদীর উপর আটটি বাঁধ নির্মাণ অন্যতম। যেসব জায়গায় বাঁধগুলো তৈরী হবে তার অধিকাংশস্থলেই প্রাথমিক কার্য শেষ হয়েছে এবং তিলায়া বাঁধের কাজ চলতি বছরেই আরম্ভ হবে।

কেন্দ্রীয় জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ও নৌ চলাচল কমিশনের উপর দেশের জলপ্রবাহ কাজে লাগাবার ভার ন্যস্ত হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন উপত্যকার উন্নয়ন কার্যও উক্ত কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। হিরাকুণ্ড বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও সম্বলপুরে মহানদীর উপর একত্রে সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ, কলিকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণের দায়িত্বও উক্ত কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বোকারোতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন— ১২ই মার্চ, ইউ, পির খবরে প্রকাশ, বোকারোতে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, নক্সা প্রভৃতির জন্যে দামোদরভ্যালী করপোরেশন ও ইণ্টারন্যাশন্যাল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লি:র মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের (প্রায় পৌনে ৫ কোটি টাকা) এক চুক্তিপত্র সম্প্রতি কলিকাতায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে ইতিপূর্বে এতবড় চুক্তি এদেশে আর হয়নি। ১৯৫১ সালের শেষভাগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করা হবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা। এই নদী পরিকল্পনা দ্বারা পূর্ত কার্যকল্পে জল সঞ্চয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করা যাবে। সাঁওতাল পরগণার কতকগুলো খরস্রোতা পার্বত্য নদী পশ্চিমবঙ্গের সমভূমির উপর দিয়ে ভাগীরথী নদীতে এসে পড়েছে। ময়ূরাক্ষী বা মোর নদীই এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে ৪০ মাইল প্রবাহিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের ভিতর প্রবেশ করেছে এবং সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী একটি খাত এখানে এসে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিলেছে। বীরভূমের মধ্য দিয়ে এই জলধারাটি দ্বারকা নদীর সংগে মিলেছে এবং তৎপরে দত্তবাটির নিকট ভাগীরথী নদীতে পড়েছে। এছাড়া দ্বারকা নদীতে কোপাই ও ব্রাহ্মণী এসে মিশেছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—মসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর পৎপারে জলাধার নির্মাণ এবং সিউড়ীর নিকটে তিলপাড়ায় বাঁধ নির্মাণ।

১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা রচিত হয়, কিন্তু এর ব্যয় বেশী হবে বলে অনুমিত হয়। তজ্জন্য নূতনকরে বর্তমান পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে এই পরিকল্পনার ফলে এই এলাকায় আরও তিনলক্ষ টন ধান এবং কোটি টাকার আখ ও রবিশস্য উৎপন্ন হবে। এই বাঁধ হতে তিন হাজার কিলোওয়াট জলজ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে এবং বর্ষায় আরও এক হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সিউড়ী ও দুমকা সহর আলোকিত করা যাবে এবং ইহা দ্বারা বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার কুটিরশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। এই পরিকল্পনা বাবদ সাত কোটি টাকা ব্যয় হবে। পূর্তকার্য ও জলতাড়িত বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ যে আয় হবে তা থেকে এর খরচ পূরণ করা যাবে। তিন চার বৎসরের মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে এবং পনের হাজার লোক এই কার্যে নিযুক্ত হবে। যে সকল লোক এই অঞ্চল হতে উৎখাত হবে তাহাদের পুনর্বসতির জন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং এই বাবদ ২ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

প্রি-ফেব্রিকেটেড গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা—

স্বাস্থ্যসচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রি-ফেব্রিকেটেড্ গৃহ-নির্মাণ সংক্রান্ত শ্রীযুক্ত কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, এই ধরণের গৃহ, নক্‌সা এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি বর্তমান বছরের মাঝামাঝি এসে পৌছবে বলে আশা করা যায়।

বছরে কতগুলো বাড়ী কত ব্যয়ে তৈরী হতে পারে জিজ্ঞেস করা হলে স্বাস্থ্যসচিব বলেন—নমুনা স্বরূপ যে ১০টি বাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে সেগুলোকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসানো হবে। সপ্তাহে প্রায় ১০০টি গৃহ তৈরী হবে বলে আশা করা যায়। জমির দাম বাদে প্রত্যেকটি গৃহের মূল্য প্রায় ২৫০০৲ টাকা পড়বে।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যসচিব বলেন যে, যুক্তরাজ্যে প্রি-ফেব্রিকেটেড্ গৃহের আয়ুষ্কাল অনুমান ৭৫ বছর। ভারতবর্ষে এগুলো কতকাল স্থায়ী হবে তা অভিজ্ঞতার বিষয়; তবে ৫০ বছরের কম স্থায়ী হবে না। এতে তিন খানা ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার ও একটি আঙিনা থাকবে।

বিজ্ঞান পরিষদের শিলং শাখা

গত ১০ই এপ্রিল '৪৯ আসামের খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীরাজমোহন নাথ মহাশয়ের পৌরহিত্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শিলং শাখার উদ্বোধন হয়। বহু বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু দেশবরেণ্য ব্যক্তি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের এই প্রচেষ্টার প্রতি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। আসাম গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এডভাইসর, শ্রীকরুণাদাস গুহ মহাশয় এই শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করি, এই শাখার সুযোগ্য কর্মসচিব শ্রীরামপদ দাশ মহাশয়ের পরিচালনায় এই শাখার কার্য সুষ্ঠুভাবে চলবে এবং পরিষদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আসামের প্রবাসী বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুসন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিষদের এইরূপ শাখা স্থাপিত হলে বিজ্ঞানকে লোকায়ত্ত করণের উদ্দেশ্য দ্রুত সফলতা লাভ করবে বলে আশা করি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

(বর্তমান বর্ষের নূতন সদস্যগণের নামের তালিকা)

১৯৪৯ সালের ২৮শে মার্চ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ পরিষদের নূতন সদস্য হয়েছেন :—

সা ৫৭৪
শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
পূর্ণ ফার্মেসী
১১৫, আপার চিৎপুর রোড।
কলিকাতা

সা ৫৭৫
শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ
১, গোবড়া রোড
কলিকাতা—১৪

সা ৫৭৬
শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৮, অশ্বিনী দত্ত রোড।
কলিকাতা—২৯

সা ৫৭৭
শ্রীমতি মনিকা দত্ত,
অবধায়ক: রায় সাহেব এল্, বি দত্ত
থানা রোড। শিলঙ। আসাম,

সা ৫৭৮
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ,
মরিয়ানবাড়ী টি, ষ্টেট,
শিমূলবাড়ী—ডাকঘর, দারজিলিং।

সা ৫৭৯
শ্রীইভা ঘোষ দস্তিদার,
৫৭, হরিশ মুখার্জি রোড।
পোঃ ভবানীপুর। কলিকাতা—২৫

সা ৫৮০
Sri Sithi Bhusan Datta,
Chemistry Dept.
Delhi University, Delhi.

সা ৫৮১
Sri Arun Kumar Nath.
'Mimasa Ridge' Nongthymmain.
Po—Sillong, Assam.

সা ৫৮২
শ্রীসমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
ঝরিয়া ফায়ার ব্রিকস্ এণ্ড পটারী ওয়ার্কস্।
পোঃ ধানসার। জেঃ মানভূম,

সা ৫৮৩
শ্রীরামেন্দু ভূষণ দত্ত
ধানসার কলিয়ারী
পোঃ ধানসার, জেঃ মানভূম।

সা ৫৮৪
শ্রীকালীকৃষ্ণ বকসী
ধানসার কলিয়ারী
পোঃ ধানসার, জেঃ মানভূম।

সা ৫৮৫
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য
এসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার
কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ২

সা ৫৮৬
শ্রীকানাই লাল পাল
৯০, দেশবন্ধু রোড, আলমবাজার,
জেঃ ২৪ পরগণা

সা ৫৮৭
শ্রীশশাঙ্কশেখর মান্না
C/o, মুলটীপ্যারি শ্রীমণ্ড
ইনষ্টিটিউসন, পোঃ মুলটি
জেঃ ২৪ পরগণা

সা ৫৮৮
শ্রীশ্যামলেন্দু দত্ত
৭৪।১, তালপুকুর রোড
বেলেঘাটা কলিকাতা ১০

সা ৫৮৯
শ্রীরমাতোষ সরকার
৪৫নং অবিনাশ শাসমল লেন
বেলেঘাটা। কলিকাতা ১০

সা ৫৯০
শ্রীঅজিত কুমার সাহা
৪সি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

সা ৫৯১
শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬।৪।সি. শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট
বহুবাজার, কলিকাতা ১২

সা ৫৯২
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত
C/o, ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স,
পোঃ বানারপুর
জেঃ জলপাইগুড়ি।

সা ৫৯৩
শ্রীজয়দেব কুমার বসু
১।১এ মারহাট্টা ডিচ্ লেন
কলিকাতা ৩

সা ৫৯৪
শ্রীসুধাংশু বরণ মিত্র
১৮, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা ৬

সা ৫৯৫
শ্রীশান্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায়
গর্জ্জমান চা বাগান
পোঃ বানারহাট। জেঃ জলপাইগুড়ি।

সা ৫৯৬
শ্রীশান্তি কুমার নিয়োগী
৯, নিয়োগী পাড়া লেন। আতপুর।
পোঃ শ্যামনগর। জেঃ ২৪ পরগণা

সা ৫৯৭
শ্রীবরুণ কুমার পাণ্ডা
২, নস্কর পাড়া বাই লেন।
খুরুট। পোঃ সাত্রাগাছি। হাওড়া

সা ৫৯৮
Sri Sudhir Chandra Das Gupta
C. I. S. Historical Section
Film + Photo Sub-section
Ministry of Defence, Simla

সা ৫৯৯
শ্রীমাধবেন্দ্র নাথ পাল
লালদিঘী। পোঃ বহরমপুর।
জেঃ মুর্শিদাবাদ। পশ্চিম বঙ্গ।

সা ৬০০
শ্রীভূদেব চৌধুরী
৮।২৫, ফার্ণ রোড। বালিগঞ্জ।
কলিকাতা

সা ৬০১
শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়
৩৮, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৬০২
শ্রীবিনোদ বিহারী তলাপাত্র
৩৪ বি, লেক টেম্পল রোড।
কলিকাতা। (দক্ষিণ)

সা ৬০৩
নল সেনগুপ্ত
৩৪, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট
C/o, তলাপাত্র ব্রাদার্স, কলিকাতা

সা ৬০৪
শ্রীব্রজেশ্বর মজুমদার
৪৫নং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সা ৬০৫
শ্রীসুবল চন্দ্র বনিক
২৩২নং বাঘমারী রোড
C/o, রামেশ্বর ছাত্রাবাস
কলিকাতা

সা ৬০৬
শ্রীকুমার কৃষ্ণ বসাক
৪৯এ, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সা ৬০৭
শ্রীদ্বারকা নাথ মল্লিক
২৩৭ পি, মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা

সা ৬০৮
শ্রীঅমর কুমার রুদ্র
২, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা

সা ৬০৯
শ্রীতুলসী দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৬, স্বামী বিবেকানন্দ রোড
আলমবাজার, ২৪ পরগনা

সা ৬১০
শ্রীঅমিয় নাথ সরকার
৫০এ; রিচি রোড, কলিকাতা ১৯

সা ৬১১
শ্রীসুশীল রঞ্জন সরকার
৯, রামকৃষ্ণ বাগচী লেন
কলিকাতা ৬

সা ৬১২
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত
১০, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সা ৬১৩
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১২, গৌর লাহা ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সা ৬১৪
শ্রীবিশ্বনাথ সেন
অবধায়ক : শ্রীসীতারাম ঘটক
গ্রাম: বৈষ্ণব ঘাট।
পো: গড়িয়া। ২৪পরগণা

সা ৬১৫
শ্রীরমাপদ দাস
বিজ্ঞান শিক্ষক, গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুল
শিলঙ। আসাম

সা ৬১৬
শ্রীনির্মলেন্দু বিশ্বাস
C/o, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, শিলঙ
আসাম

সা ৬১৭
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
৪০ ১এ হাজরা রোড। কলিকাতা ১৯

সা ৬১৮
শ্রীনিত্যেশকুমার চক্রবর্তী
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট পোঃ হাটখোলা।
কলিকাতা

সা ৬১৯
শ্রীঅধীরকুমার পাল
৩৮।১ বিডন রো। কলিকাতা ৬

সা ৬২০
নৃপেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
এস, ডি, ও, বনগ্রাম
পোঃ বনগ্রাম, ২৪ পরগণা

সা ৬২১
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
C/o শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী
গভর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা ১

সা ৬২২
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১৩ জি, নেতাজী সুভাষ রোড।
রুম নং ৪৭, কলিকাতা

সা ৬২৩
শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
২৭ ই, মহেন্দ্র সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

সা ৬২৪
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস
২৩, ওয়েষ্ট সেভেন ট্যাঙ্কস এষ্টেট
কলিকাতা ২

সা ৬২৫
শ্রীসুশীল রঞ্জন চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া। পোঃ জলপাইগুড়ি
জেঃ জলপাইগুড়ি।

সা ৬২৬
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৮১, শিবপুর রোড,
হাওড়া।

সা ৬২৭
শ্রীনির্মলচন্দ্র নিয়োগী
৩৯, পরাশর রোড।
কলিকাতা।

সা ৬২৮
শ্রীদিলীপকুমার সাহা
২৭।১ এফ, সিমলা রোড
কলিকাতা ৬

সা ৬২৯
শ্রীশচীন্দ্রকুমার ঘোষ
অবধায়ক : শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ
পো+গ্রাঃ জগাছা। হাওড়া।

সা ৬৩০
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শক্তিপ্রেস—২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সা ৬৩১
শ্রীনলিনবিহারী গুপ্ত
১০৫, বিবেকানন্দ রোড।
কলিকাতা ৬

সা ৬৩২
শ্রীসুধীরনাথ সান্যাল
১০৫, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা ৬

সা ৬৩৩
শ্রীসুশান্তচন্দ্র ঘোষাল
১০৫, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

সা ৬৩৪
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
৩৩, বিডন ষ্ট্রীট। কলিকাতা-

সা ৬৩৫
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
৬০।১৩ এ, গৌরীবেড়ে লেন,
কলিকাতা

সা ৬৩৬
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়,
২১নং, রামলাল মুখার্জী লেন,
'রামবাস'। সালিখা। হাওড়া

সা ৬৩৭
শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী
পি ৫১৫, অশ্বিনী দত্ত রোড।
পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা

সা ৬৩৮
Sri Mihir Kumar Bose.
Technical officer,
Radio Development Unit,
Civil Aviation, Fac tory Road
New Delhi.

সা ৬৩৯
শ্রীসুশীলকুমার চৌধুরী
কেদার নাথ ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌,
পোঃ সাঁত্রাগাছি। হাওড়া

সা ৬৫৮
শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা
৪০ এ, সাউথ এণ্ড পার্ক,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯

সা ৬৫৯
শ্রীসলিলমোহন চট্টোপাধ্যায়
অম্বিকা কুণ্ডু লেন।
পোঃ সাঁত্রাগাছি। হাওড়া

সা ৬৬০
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী,
৩০২, আপার সারকুলার রোড।
কলিকাতা—৯

সা ৬৬১
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
২, কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা—১২

সা ৬৬২
শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র দত্ত,
৫, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা—২৯

সা ৬৬৩
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র,
সাউটিয়া। পোঃ গোমুণ্ডা।
জেঃ মেদিনীপুর,

সা ৬৬৪
শ্রীশিবদাস ঘোষ,
৪৬, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট। কলিকাতা

সা ৬৬৫
Sri Sisir Kumar Gupta.
Dy. Commissioner,
The Andamans,
Port Blair, Andamans.

সা ৬৬৬
শ্রীভূদেবচন্দ্র চক্রবর্তী,
কুক্কুট প্রজননবিদ, হরিণঘাটা কৃষি ক্ষেত্র,
পোঃ বড়জাগুলি, জিং—নদীয়া

সা ৬৬৭
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মান্না
কানাইলাল বিদ্যামন্দির,
ফ্রেঞ্চ সেকসন। চন্দননগর

সা ৬৬৮
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৪৯।১।এ, টালিগঞ্জ রোড।
কলিকাতা—২৬

সা ৬৬৯
শ্রীঅমলচন্দ্র বাগচী,
৮১, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স,
কলিকাতা

সা ৬৭০
শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩, গেলাৎ বাবু লেন।
কলিকাতা—২

সা ৬৭১
Sri Ganapati Chatterjee.
Jamal Road, Patna.

সা ৬৭২
শ্রীপূর্ণেন্দু মজুমদার,
৫, মতিলাল নেহেরু রোড,
কলিকাতা

সা ৬৭৩
শ্রীহিতেন্দ্রনারায়ণ দাশ,
মকদমপুর। জিং—মালদহ,
পশ্চিমবঙ্গ

সা ৬৭৪
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ,
৭, বিপিন পাল রোড
কলিকাতা—২৬

সা ৬৭৫
শ্রীনিহাররঞ্জন দাশগুপ্ত,
অধ্যাপক, ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্‌স,
ধানবাদ—ই-আই-আর।

সা ৬৭৬
শ্রীকানাইলাল পালিত
ফাউণ্ড্রি ডিপার্টমেণ্ট,
কুলটী কারখানা।
কুলটী, বর্ধমান।

সা ৬৭৭
শ্রীসুবোধকুমার রায়
'এ' ক্লাস এপ্রেণ্টিস্ মেস
কুলটী। বর্ধমান

সা ৬৭৮
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঠাকুর,
'এ' ক্লাস এপ্রেণ্টিস মেস্,
কুলটী বর্ধমান

সা ৬৭৯
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ।
কাটোয়া—বর্ধমান

সা ৬৮০
শ্রীহিমাংশুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বেঙ্গল পেপার মিলস,
রাণীগঞ্জ। বর্ধমান

সা ৬৮১
শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
জেনারেল ম্যানেজার,
শ্রীহনুমান কটন মিলস্, জগন্নাথপুর।
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

সা ৬৮২
শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার,
বালি। হাওড়া।

সা ৬৮৩
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫এ, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা

সা ৬৮৪
শ্রীবিনয়ভূষণ সিংহ
৬৷১৷এ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সা ৬৮৫
শ্রীশিবেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
৬৮ সি, দুর্গাচরণ ডাক্তার লেন
তালতলা। কলিকাতা।

সা ৬৮৬
শ্রীসুধাংশুলাল সরকার
১১৭, আপার সারকুলার রোড।
কলিকাতা—৪

সা ৬৮৭
শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়
৯৫ এ, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট
বালি, হাওড়া।

সা ৬৮৮
শ্রীসুধীর চন্দ্র লাহা
৭, নন্দলাল বোস লেন
বাগবাজার, কলিকাতা।

সা ৬৮৯
শ্রীগৌর চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
১১০, আশুতোষ মুখার্জী রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা।

সা ৬৯০
শ্রীহিরণ প্রভা বর্ম্ণ
৫৫, প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা ২৬

সা ৬৯১
শ্রীজ্যোতি কুমার দে
১০।১।এ, হালসী বাগান রোড
কলিকাতা

সা ৬৯২
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়
১২৪।এইচ/ডি, আউটার সার্কেল
সাউথপার্ক, জামসেদপুর। বি. এন. আর

সা ৬৯৩
শ্রীবিনয় কৃষ্ণ পাল
৪০, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট
হাটখোলা, কলিকাতা।

সা ৬৯৪
শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র
লোমনা কলিয়ারী কোং লিঃ
পোঃ ঝরিয়া, মানভূম।

সা ৬৯৫
শ্রীসুবোধ চন্দ্র লাহিড়ী
৫৬, ক্রীক রো,। কলিকাতা ১৪

সা ৬৯৬
শ্রীসমীরকুমার বসু
১৯, বিপিন পাল রোড
কলিকাতা

সা ৬৯৭
শ্রীদেবীপ্রসাদ বর্ম্ণ
বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা

সা ৬৯৮
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার
৩৫।১৩, পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা ২০

সা ৬৯৯
শ্রীগৌরচাঁদ বড়াল
৬, স্যাকড়াপাড়া লেন
বহুবাজার। কলিকাতা।

সা ৭০০
Sri Sailendra nath Chatterjee
11, Timarpur Road
Civil lines, New Delhi

সা ৭০১
শ্রীফণীভূষণ সরকার
Tura—P. W. D. Tura
Garo Hills. Assam

সা ৭০২
শ্রীভূপেশচন্দ্র পাল
৫৩, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সা ১০৩
শ্রীনিতাইলাল দত্ত
৩৩।২, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সা ১০৪
শ্রীকমলেশ রায়
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা।

সা ১০৭
কর্মসচিব
শিবপুর ডি, বি, ইনষ্টিটিউট
শিবপুর। হাওড়া।

সা ১০৯
শ্রীঅজয় হোম
১৬৯ বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।
পোঃ শ্যামবাজার। কলিকাতা ৪

সা ১১০
শ্রীনিত্যরঞ্জন গুপ্ত
২০, রাজা বসন্ত রায় রোড।
কলিকাতা ২৬

সা ১১১
শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দে
১৯, রায় মথুরা নাথ চৌধুরী ষ্ট্রীট
বরাহনগর, ২৪ পরগণা।

সা ১১২
শ্রীসরোজ কুমার দত্ত
পোঃ মহুলিয়া, জেঃ সিংভূম

সা ১১৩
শ্রীঅনুপ কুমার মৈত্র
১৪।এ, লেক টেরাস্।
পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

সা ১১৪
Sri Susil Kumar Pramanik
Meterological office
Ganeshkhind Road.
Poona 4

বর্তমান বছরে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ পরিষদের আজীবন সদস্য হয়েছেন :—

আ ২৪ শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ
৩২।১এ, নন্দন রোড, কলিকাতা ২৫

আ ২৫ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মৈত্র
১, কোরিস চার্চ লেন, কলিকাতা ৯

আ ২৬ শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত
১৫৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আ ২৭ শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
পি ১০৬, লেক টেরাস
পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

আ ২৮ শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়
৯১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯

বিজ্ঞান প্রচার তহবিলে দান

পরিষদের বিজ্ঞান প্রচার তহবিলে ঐ বছর নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে—

শ্রীঅরবিন্দ কুমার দত্ত ১০৲, শ্রী পি, সি, চ্যাটার্জি ১০০৲, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জি ৫১৲, শ্রীদ্বিপেনকুমার বসু ৪৲ শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী ৫০৲, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন ১০০৲, শ্রীহৃষিকেশ রায় ৫৲।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | মে—১৯৪৯ | পঞ্চম সংখ্যা

ঔষধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় তাহাকে ওষধি বলে। ওষধি হইতে ঔষধ কথার উৎপত্তি। গাছগাছড়া বলিয়া যে কথাটা চলিত আছে তাহার শেষ অংশ অর্থাৎ "গাছড়া" বলিতে এই ওষধি বুঝায়। বাস্তবিক যে সমস্ত বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা অনেকাংশে এই ওষধি হইতেই পাওয়া যায়।

ঔষধ সমূহের ইতিহাস সাধারণতঃ সুদূর অতীতের গর্ভে নিমগ্ন। কখনও বা আমাদের পূর্বপুরুষদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বা অনন্যসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির ফলে, কখনও বা ঘটনাচক্রে সেগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; কিন্তু ইতিহাস বেশীর ভাগ ঔষধ সম্বন্ধেই কোন খবর রাখে না।

আয়ুর্বেদোক্ত কোন কোন ঔষধ আমরা এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা পুনরাবিষ্কার করিতেছি। চ্যবনপ্রাশের অন্যতম উপাদান আমলকীতে যে ভিটামিন-সি প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা আমরা এখন শিখিয়াছি। কুরচী ও বাসকের ক্রিয়াবান উপাদান অবিমিশ্রভাবে পাওয়া গিয়াছে। পানের রসে চাভিকল এবং চাভিবেটল নামক ফেনল বর্গের দুইটি যৌগিক আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলি পচন নিবারক। অবশ্য আয়ুর্বেদ-ভাণ্ডারের বহুরত্ন এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

বর্তমানে রসায়নাগারে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলিকে সংশ্লেষণজাত বা সিন্থেটিক ঔষধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

রসায়নাগারে যে-সমস্ত যৌগিক প্রস্তুত হয় তাহার খুব অল্প অংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যৌগিক বিশেষ প্রস্তুত হইবার বহু বর্ষ পরে, কখনও বা কয়েক শতাব্দী পরে উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে ইথারের কথা বলিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভ্যালেরিয়াস কর্ডাস সুরাসার হইতে প্রথমবার ইথার প্রস্তুত করেন। কিন্তু ইহার দ্বারা যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া তাহার উপর অস্ত্রোপচার করা যায় তাহা জ্যাকসন ও মর্টন নামক বোষ্টনের দুইজন চিকিৎসক ১৮৪৬ সালে প্রথমে আবিষ্কার করেন। এই সময় পর্যন্ত অস্ত্র চিকিৎসকগণ রোগীকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া এবং যন্ত্রণা অভিব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার উপর অস্ত্রোপচার করিতেন। প্রবন্ধ লেখক ১৯০১ সালে মধ্যপ্রদেশের কোন

হাসপাতালে এইরূপ আসুরিক চিকিৎসা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কারণ রোগীর জ্ঞান অপনোদন করিয়া অস্ত্রোপচার কালে যে একাধিক চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে, তাহা সে সময়ে প্রাগুক্ত হাসপাতালে ছিল না।

অধুনা বহুপ্রচলিত ক্লোরোফর্মের ব্যবহার মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে প্রবর্তিত হয়। ১৮৩১ সালে জার্মান রাসায়নিক পণ্ডিত লীবিগ ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করেন এবং তাহার ১৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে ডাক্তার সিমসন্ ইহা চৈতন্য অপনোদনের জন্য ব্যবহার করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর একটি প্রধান আবিষ্কার কুইনাইন। ১৬৩৮ সালে পেরুর রাজপ্রতিনিধি কাউণ্ট চিন্‌কনের পত্নী সেই স্থানেই জ্বর-রোগে আক্রান্ত হন এবং পরে বৃক্ষ বিশেষের ছালের নির্যাস সেবনান্তে আরোগ্য লাভ করেন। এইভাবে কুইনাইনের ব্যবহার ইয়ুরোপে প্রবর্তিত হয়, যদিও পেরুর আদিম অধিবাসী ইন্‌কারা বহুকাল পূর্ব হইতেই ঐ ছালের ব্যবহার জানিত।

ইন্‌কারা কোকা নামক একটি ওষধির পাতা, ক্ষুধা এবং ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। ১৮৬০ সালে জার্মান রাসায়নিক পণ্ডিত ভোয়েলারের জনৈক ছাত্র নীমান তাহার পি-এইচ ডি'র থিসি-সের রচনা সম্পর্কে এই পাতা হইতে কোকেইন্ নিষ্কাশিত করেন। ভোয়েলার সেই সময় লিখিয়া ছিলেন "ইহার স্বাদ ঈষৎ তিক্ত। ইহা জিহ্বার উপর রাখিলে জিহ্বার স্নায়ুর উপর এক নূতন ধরণের ক্রিয়া করে। যেস্থানে রাখা যায় সেস্থান অল্প কালের জন্য অসাড় হইয়া যায়।"

ভোয়েলার চক্ষুর উপরেও কোকেইনের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বলেন যে, ইহা অ্যাট্রো-পিনের ন্যায় চক্ষুতারকার বিস্তৃতি উৎপাদন করেনা। এই সমস্ত পরীক্ষার জন্য ভোয়েলার বিশুদ্ধ কোকেইন ব্যবহার করিয়া ছিলেন যাহা সহজে দ্রবীভূত হয় না। কোকেইন লবণ দ্রাবকের সহিত যুক্ত করিলে যে কোকেইন হাইড্রোক্লো-রাইড লবণ উৎপন্ন হয় তাহা জলে সহজেই দ্রবী-ভূত হয় এবং তাহার ক্রিয়াও বিশুদ্ধ কোকেইনের ক্রিয়া অপেক্ষা অনেক প্রবল। কোকেইন আবিষ্কারের ১৯ বৎসর পরে ভন আনরেপ নামক জার্মেনীর অন্তর্গত ভুরট্‌স্‌বুর্গের জনৈক চিকিৎসক স্থানীয় অসাড়তা উৎপন্ন করিবার জন্য কোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন এবং তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮০ সালে ভিয়েনার ডাঃ কোলার নামক জনৈক চিকিৎসক মনুষ্যদেহের সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন অঙ্গ, চক্ষুর অসাড়তা উৎপন্ন করিয়া উহার উপর অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। মানবজাতীর ধন-ভাণ্ডারে যে মহারত্ন বহু শতাব্দী অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাতভাবে পড়িয়াছিল এতদিন পরে তাহা ব্যবহারে আসিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মান রাসায়নিক কেকুলে তাঁহার তথাকথিত বেনজিন মতবাদ প্রচার করেন এবং বলিতে গেলে ইহা হইতেই নব্য জৈব-রসায়নের উৎপত্তি হয়। রসায়নাগারে প্রস্তুত পদার্থসমূহের গুণাগুণ পরীক্ষাকালে সেগুলি ঔষধার্থে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়েও পরীক্ষা চলিতে থাকে এবং ইহারই ফলে অ্যাস্‌পিরিন, ফেনাসেটিন প্রভৃতি বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হয়।

এইরূপ পরীক্ষার আর একটা দিক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কোকেইন আবিষ্কারের পর এই যৌগিকটির আভ্যন্তরীণ পরমাণু-বিন্যাস এবং তাহার পর ইহা রসায়নাগারে প্রস্তুত করিবার প্রণালীও আবিষ্কৃত হয়। রসায়নাগারে কোকেইন প্রস্তুত করা বহুশ্রম ও ব্যয়সাধ্য। এজন্য ইহার এমন কোন অনুকল্প প্রস্তুত করা যায় কিনা যাহার পরমাণু-বিন্যাস কিয়ৎপরিমাণে কোকেইনের অনুরূপ এবং যাহাতে কোকেইনের গুণাবলী কতকাংশে

বর্তমান আছে, অথচ যাহা প্রস্তুত করা তেমন শ্রম ও ব্যয়সাধ্য নহে—এই বিষয়েও নানা প্রকার গবেষণা চলিতে থাকে। ইহারই ফলে নভোকেইন, বিটা ইযুকেইন ইত্যাদি কোকেইনের সমধর্মী ঔষধাবলী রসায়নাগারে প্রস্তুত হইয়াছে।

অনেক ঔষধ আবার অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত সালফা-ঔষধগুলি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আপনারা জানেন যে, রঞ্জক পদার্থসমূহ এখন বহু পরিমাণে রসায়নাগারেই প্রস্তুত হইতেছে। রঞ্জক বিষয়ক গবেষণার ফলে রাসায়নিক যৌগিক সমূহের আভ্যন্তরীণ গঠন এবং পরমাণু-বিন্যাসের সহিত তাহাদের গুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে অনেক গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে সালফোনামাইড ($-SO_2 NH_2$) পরমাণুসমষ্টির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন রঞ্জক পদার্থে এই পরমাণুসমষ্টি সন্নিবেশিত করিলে তদ্দ্বারা রঞ্জিত পদার্থের রং অধিকতর স্থায়ী হয় এবং উহা সূর্যালোকে নষ্ট হয় না। এই আবিষ্কারের ফলে সালফোনামাইডযুক্ত যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রণ্টোসিল রেড তাহার অন্যতম।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কোন পদার্থ দেখিতে হইলে যদি উহা রঞ্জিত করিতে পারা যায় এবং উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর রঞ্জক পদার্থের ক্রিয়া যদি বিভিন্ন হয়, তবেই উহার অভ্যন্তরীণ গঠন সুচারুরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষাকালে ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রণ্টোসিল রেড নামক রঞ্জকটিও এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

ইহার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া স্ট্রেপটোকক্কাস জাতীয় জীবাণু পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সেগুলি যে শুধু রঞ্জিতই হয় তাহা নহে, তাহারা শীঘ্র মরিয়া যায়।

স্ট্রেপটোকক্কাসের উপর প্রণ্টোসিল রেডের এই অপ্রত্যাশিত ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসকগণ প্রথমে পরীক্ষাগারে স্ট্রেপটোকক্কাস আক্রান্ত মুষিকাদির উপর এবং পরে রোগীদের উপর প্রণ্টোসিল রেডের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। ইহার ফলে দশ বার বৎসর পূর্বে প্রণ্টোসিল রেড বহুল পরিমাণে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

প্যারিস সহরস্থিত পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে ট্রেফুই দম্পতি এবং তাঁহাদের সহকর্মীগণ আবিষ্কার করেন যে, কোন রোগীকে প্রণ্টোসিল রেড খাওয়াইলে তাহার মলমূত্রের সহিত প্রণ্টোসিল রেড অণুর একটি প্রধান অংশ সালফানিলামাইড রূপে বহির্গত হয়। ইহার কিছুকাল পরে পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম গবেষক ফুর্নো আবিষ্কার করেন যে, প্রণ্টোসিল রেডের পরিবর্তে সালফানিলামাইড ব্যবহার করা যাইতে পারে

সালফানিলামাইড সহজে প্রস্তুত করা যায়। ইহা সুলভ; এজন্য প্রণ্টোসিল রেডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। তবে ইহার কতকগুলি দোষও আছে। ইহা সেবনে মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিবমিষা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইংল্যাণ্ডের ঔষধব্যবসায়ী মে এবং বেকারের পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় যে, সালফানিলামাইডের মধ্যে যে সালফোনামাইড পরমাণুসমষ্টি আছে তাহার একটি হাইড্রোজেন পরমাণু পিরিডিন নামধেয় বলয়-যৌগিকের সহিত বিনিময় করিলে সালফাপিরিডিন (M. B. 693) নামক যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহা নানাপ্রকার কক্কাস-জাত ব্যাধি, বিশেষতঃ নিউমোনিয়াতে উত্তম ফল প্রদান করে। পিরিডিন বলয়-যৌগিকের পরিবর্তে থাইয়াজল নামক বলয়-যৌগিক ব্যবহার করিলে সালফা-থাইয়াজল (বা থাইজামাইড বা সিবাজল) নামক অধুনা বহুপ্রচলিত ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সালফোনামাইড পরমাণুসমষ্টির এক বা উভয় হাইড্রোজেন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলয়-যৌগিক বা পরমাণুসমষ্টির সহিত বিনিময় দ্বারা বহু তথাকথিত সালফা-ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে এবং চিকিৎসকগণও প্রচুর পরিমাণে এইগুলি ব্যবহার করিতেছেন।

সিমেণ্ট রসায়ন

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত,

ও

শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই যুদ্ধোত্তর গঠন পরিকল্পনার রূপ দিতে ব্যস্ত। এর জন্যে যে দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সে হচ্ছে লোহা আর সিমেণ্ট। লোহা না হলে আধুনিক কোন বাড়ী, সেতু বা কারখানা তৈরী করা চলে না। আবার সিমেণ্ট না হলেও শুধু লোহা দিয়ে ওসব তৈরী সম্ভব নয়। বর্তমানে আমাদের সরকার জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কয়েকটি পরিকল্পনা কাজে লাগাতে ব্যস্ত। এর ভিতর দামোদর পরিকল্পনাই অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ও ব্যয়বহুল। এসব পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যে যেমন চাই প্রচুর পরিমাণ লোহা, তেমনই চাই লক্ষ লক্ষ টন সিমেণ্ট। অনেক বছর আগে, সিমেণ্ট যখন এদেশে প্রথম আসে, অনেকেই তাকে বলত বিলেতি মাটি। কারণ এই বিশেষ মাটির এদেশে প্রথম আমদানী হয় বিলেত থেকেই। সিমেণ্ট এখন আর অভিনব জিনিস নয়। বিলেতি মাটি নামটা প্রায় উঠে গেছে। ইংরেজী না জানা লোকেরাও বলে সিমেণ্ট।

সিমেণ্ট এখন আমাদের দেশেও তৈরী হচ্ছে প্রচুর। তবুও বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই কালো বাজারে এর দামও খুব চড়া। বণ্টন ব্যবস্থার ও সাধারণ ব্যবসায়ী চরিত্রের যখন আশু উন্নতির কোন লক্ষণ নেই, তখন অতিরিক্ত উৎপাদন ছাড়া বর্তমান সিমেণ্ট-সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ সমাধান রাষ্ট্রের হাতে। বিজ্ঞানীর হাতে আছে—সিমেণ্টের রাসায়নিক রূপ দানের ক্ষমতা। বর্তমান প্রবন্ধ সেই রূপ দানেরই আলোচনা।

রাসায়নিক উপাদান।		পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।	উচ্চ এলুমিনা বিশিষ্ট সিমেণ্ট।	ব্লাষ্ট ফারনেস স্ল্যাগ থেকে তৈরী সিমেণ্ট
১। ক্যালসিয়াম অক্সাইড	(CaO)	৬০-৬৭	৩৬-৪৫	৩৮-৫০
২। ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইড	(MgO)	০·৫-৫·৫	০·১-১·৫	১-৭
৩। সিলিকন ডাইঅক্সাইড	(SiO_2)	১৭-২৫	৪-১০	২৮-৩৮
৪। এলুমিনিয়াম অক্সাইড	(Al_2C_3)	৩-৮	৩৫-৪৪	৮-২৪
৫। ফেরিক অক্সাইড	(Fe_2O_3)	০·৫-৬·০	১-১৪	০·১-২·০ (৫ ও ৬ একত্রে)
৬। ফেরাস অক্সাইড	(FeO)	অতি-সামান্য	০-১০	
৭। টাইটেনিয়াম অক্সাইড	(TiO_2)	০·১-০·৪	১·৫-২·৫	০·১-১·০
৮। জলহীন সালফিউরিক	(SO_3)	১·০-৩·০	০·০১-১·০	০-১·৫
৯। অ্যালকালি অক্সাইড	(Na_2O+K_2O)	০·৪-১·৩	০·১-০·৬	১-২
১০। সালফার		শূন্য	শূন্য	০·৫-২·০

সিমেণ্ট একটি যৌগিক পদার্থ। লাইম, সিলিকা, এলুমিনা ইত্যাদি পদার্থসমূহ সিমেণ্টের উপাদান। পরিমাণমত জলের সংস্পর্শে সিমেণ্ট জমে শক্ত হয়ে ওঠে, এটাই হলো এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শক্ত হওয়াকে বলে সেটিং। বিভিন্ন রকমের সিমেণ্ট আছে। তার মধ্যে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিক মাত্রায় এলুমিনা থাকে এমন সিমেণ্ট ও লৌহশিল্পের স্ল্যাগ থেকে তৈরী স্ল্যাগ সিমেণ্টেরও নাম এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। এসব সিমেণ্টের উপাদানের শতকরা হিসেব উপরে দেওয়া হলো।

উপরের তালিকায় যে স্ল্যাগের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে চূর্ণ করলে স্ল্যাগ সিমেণ্ট তৈরী হয়। ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্ল্যাগ সিমেণ্টের ভিতর শতকরা ৬৫ ভাগের বেশী স্ল্যাগ থাকা অনুচিত। বলে রাখা ভাল যে, পোর্টল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের একটি জায়গার নাম। সেখানকার খড়ি-পাথর দিয়ে প্রথম সিমেণ্ট তৈরী হয়। সেই সময় থেকেই সাধারণ সিমেণ্টকে বলা হয় পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।

সিমেণ্ট তৈরী করতে হলে কাঁচা মাল হিসেবে বিশেষ রকমের পাথর ও মাটির দরকার। পাথর, ক্যালসিয়াম অক্সাইড যোগায়। মাটি বা ক্লে থেকে পাওয়া যায়—সিলিকা ও এলুমিনা। সিমেণ্টের ভিতর আর যেসব জিনিস থাকে, আসলে তা সিমেণ্টের খাদ। প্রথমে কাঁচামাল-গুলো সিমেণ্টের কারখানায় খুব ভাল করে বল-মিলে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। ভিজা-পদ্ধতি অনুযায়ী এই শুকনো গুঁড়োর সঙ্গে জল দিয়ে কাদার মত জিনিস তৈরী করা হয়। জলের পরিমাণ থাকে ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ। পরে সিমেণ্ট তৈরীর প্রকাণ্ড চুল্লীর ভিতর ওই কাদা আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই চুল্লী একটি বিরাট লোহার পাইপ বিশেষ। পাকা গাঁথনির উপর এই পাইপ এমনভাবে শয়ান অবস্থায় থাকে যে, গিয়ারযুক্ত চাকার সাহায্যে নিজের অক্ষের চারদিকে আস্তে আস্তে ঘুরতে পারে। শয়ানভাবে থাকলেও চুল্লীর অবস্থান কিন্তু জমির সমান্তরাল নয়। এক ধার অন্য ধার থেকে খানিকটা উঁচু। উঁচু দিক থেকে চুল্লীর ভিতর কাদা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করে কয়লার গুঁড়ো আর চাপযুক্ত বাতাস। এই দুই-এর সম্মিলনে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। চুল্লীর ভিতর ঢুকেই কাদা শুকিয়ে যায়। চুল্লীর নীচু পথ বেয়ে আর একটু এগুলেই শুকনো কাদার ভিতরের কার্বন ইত্যাদি জলে যায়। কার্বনবিহীন পাথর ও মাটির মিশ্রণ যখন চুল্লীর পথ বেয়ে আরও অগ্রসর হয়—উত্তাপ তখন ১৩০০°—১৫০০° সেণ্টিগ্রেডের ভিতর। তখনই মাটি আর পাথর একত্রে রাসায়নিক সংঘটনে সিমেণ্টে রূপান্তরিত হতে সুরু করে। শেষ পর্যন্ত গুঁড়োর আকারে চুল্লীর ভিতর থেকে সিমেণ্ট বেরিয়ে আসে। এই গরম সিমেণ্ট ঠাণ্ডা করে পরে চূর্ণ করা হয়। চূর্ণ করার সময় মিশানো হয় জিপসাম। এর রাসায়নিক নাম জলযুক্ত ক্যাল-সিয়াম সালফেট। তৈরী সিমেণ্ট শক্ত হতে কত সময় নেবে সেটা নির্ভর করে জিপসামের মাত্রার উপর। খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হবে, এমন সিমেণ্ট তৈরী করতে হলে গুঁড়ো সিমেণ্টকে যথাসম্ভব সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর চূর্ণে পরিণত করতে হয়।

যাতে এলুমিনার মাত্রা বেশী সে-রকমের সিমেণ্ট তৈরী করতে বক্সাইট ও পাথরের দরকার। এ-দুটি জিনিস একত্রে চূর্ণ করে ১৬০০° সেণ্টিগ্রেড তাপে গলাতে হয়। তাহলেই এই সিমেণ্ট তৈরী হবে। বক্সাইট যতদূর সম্ভব খাঁটি হওয়া প্রয়োজন। সিলিকার মাত্রাও এই সিমেণ্টে কম থাকা দরকার।

ব্যবহার ও উপাদানের মাত্রা হিসেবে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের বিভিন্ন নামকরণ হয়। যেমন—সাধারণ সিমেণ্ট, সালফেট প্রতিরোধক সিমেণ্ট ও নিম্ন-তাপ

সিমেণ্ট। এছাড়া তেল-কূপের জন্মে আমেরিকায় এক রকম বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট তৈরী হয়। এই সিমেণ্ট শক্ত হয় ধীরে ধীরে; কিন্তু এর চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের অন্তর্গঠন

১৮৮৩ সালে লা স্যাটেলিয়ার সর্বপ্রথম সিমেণ্টের অন্তর্গঠন বা রাসায়নিক তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথমে সিমেণ্টের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ এই যে, সিমেণ্টের রাসায়নিক গঠন বিশেষ জটিল ধরণের। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে Phase Rule, আলোক-বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে সিমেণ্টের রাসায়নিক অনেক রহস্য আমরা জানতে পেরেছি। পরীক্ষাধীন অল্প পরিমাণ সিমেণ্ট খুব গরম করে ঠাণ্ডা জলের ভিতর ফেলে দেওয়া হয়। সিমেণ্ট কতকগুলি যৌগিক পদার্থের সমষ্টি। তাই প্রত্যেকটি উপাদানের পরীক্ষা ফেজ-রুলের ভিত্তিতে এক সঙ্গে সম্ভব নয়। সেজন্মে দুই, তিন বা চার ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সিমেণ্টের অংশগুলো আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের ভিতর এই সব জিনিসের পরিচয় পাওয়া গেছে—

ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ($3CaO, SiO_2$)

ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ($2CaO, SiO_2$)

ট্রাইক্যালসিয়াম এলুমিনেট ($3CaO, Al_2O_3$)

টেট্রাক্যালসিয়াম এলুমিনোফেরেট ($4CaO, Al_2O_3, Fe_2O_3$)

পেনটাক্যালসিয়াম ট্রাইএলুমিনেট। ($5CaO, 3Al_2O_3$)

সিমেণ্টের ফেজ-রুল অনুযায়ী পরীক্ষার জন্মে নানা রকমের যৌগিক মিশ্রণ (Systems of components) সম্ভব। এদের ভিতর দুটি তিন-যৌগ সম্পন্ন মিশ্রণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো—CaO-Al_2O_3-SiO_2 এবং CaO-Al_2O_3 Fe_2O_3। আর চার-যৌগ ঘটিত সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মিশ্রণ হলো $2CaO, SiO_2$-$3CaO, Al_2O_3$-$4CaO, Al_2O_3$-Fe_2O_3, MgO। এসব এবং আরও অন্যান্য মিশ্রণের ফেজ-রুল ঘটিত নক্সা তৈরী হয়েছে। এসব নক্সা থেকে প্রমাণ হয় যে, সিমেণ্টের চুল্লীর ভিতর নিম্নলিখিত যৌগ-সমূহ একসঙ্গে পারস্পরিক রাসায়নিক সাম্য রক্ষা করে' অবস্থান করে—

$3CaO, SiO_2, 2CaO, SiO_2, 3CaO, Al_2O_3, 4CaO, Al_2O_3, Fe_2O_3, MgO$। পাথর-চূর্ণের মাত্রা বেশী হলে কিছু CaO স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে পারে।

কাঁচা মালের ভিতর পটাসিয়াম ঘটিত যৌগের মাত্রা বেশী থাকলে সিমেণ্টের ভিতর $K_2O, 23CaO, 12SiO_2$ জাতীয় পদার্থ থাকতে পারে। কাঁচা মালের গঠন অনুযায়ী এই সব পদার্থ সোডিয়াম, পটাসিয়ামের জায়গা নিতে পারে।

সিমেণ্টের ভিতর যেসব যৌগ থাকে, তারা ১৩০০°—১৫০০° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে যে রাসায়নিক সাম্য রক্ষা করে সাধারণ তাপ মাত্রাতেও তাই করবে—একথা মনে করার কোন কারণ নেই। আসলে উচ্চ তাপের সাম্যকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে সেই সাম্য সাধারণ তাপেও বজায় রাখা হয় পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের ভিতর। এই ঠাণ্ডা করার কাজ যদি ধীরে ধীরে করা হয় তাহলে উচ্চ তাপের সাম্যকে নিম্ন তাপে রক্ষা করা যায় না। কারণ তাহলে বিভিন্ন তাপ-সীমায় রাসায়নিক সাম্যের পরিবর্তন সুরু হয়ে যায়। হঠাৎ ঠাণ্ডা করলে এই পরিবর্তনের সময় এত কম হয়ে পড়ে যে, আগেকার সাম্যই প্রায় বজায় থাকে। কারণ অল্প তাপ থাকলে এসব ক্ষেত্রে আর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

উচ্চ এলুমিনাবিশিষ্ট সিমেণ্ট

এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনও অতি অল্প। এই সিমেণ্টে যেসব যৌগ সনাক্ত করা হয়েছে, তারা হচ্ছে— CaO, Al_2O_3 ; $5CaO, 3Al_2O_3$; $3CaO, 5Al_2O_3$; $2CaO, Al_2O_3, SiO_2$; $2CaO, SiO_2$ এবং CaO, TiO_2। এই সিমেণ্টের ভিতর আয়রন অক্সাইড কিভাবে থাকে তা সঠিক জানা যায়নি।

সিমেণ্টের জলসংযোগ

জলের সঙ্গে সিমেণ্টের রাসায়নিক যোগই সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার প্রধান কারণ। শক্ত সিমেণ্টের ভিতর নিম্নোক্ত যৌগাবলী পাওয়া যায়ঃ—

(১) $3CaO, 2SiO_2$, aq.

(২) $2CaO, SiO_2$, aq.

(৩) $Ca(OH)_2$, মুক্ত অবস্থায়।

(৪) জল সংযুক্ত এলুমিনার যৌগসমূহ

জিপসাম না থাকলে জল সম্পন্ন ক্যালসিয়াম এলুমিনেট সৃষ্টি করে। জিপসাম থাকলে ক্যালসিয়াম সালফো এলুমিনেট সৃষ্টি হয়। ট্রাই ক্যালসিয়াম এলুমিনেটের শক্ত হওয়ার সময় বাড়িয়ে দেয় জিপসাম। জলের সঙ্গে রাসায়নিক যোগের জন্যে যে তাপ সৃষ্টি হয়, জিপসাম থাকলে তার মাত্রাও কম হয়।

সিমেণ্ট শক্ত হবার পর রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে এসব যৌগ-মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয়ঃ— $CaO\text{-}Al_2O_3\text{-}H_2O$, $CaO\text{-}SiO_2\text{-}H_2O$, $CaO\text{-}Fe_2O_3\text{-}H_2O$ এবং এ-থেকে উদ্ভূত চার ও পাঁচ যৌগসম্পন্ন মিশ্রণ। সিমেণ্টে $CaSO_4$ থাকলে এরূপ আর এক দল মিশ্রণ গঠিত হয়। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের ভিতর যে ক্ষার থাকে, তা' সিমেণ্টের জলসংযোগ ক্রিয়ায় বিশেষ অংশ নিয়ে থাকে।

সিমেণ্ট যদি অতিরিক্ত জলের সঙ্গে ভাল করে মিশানো হয়, তাহলে এর কয়েকটি উপাদান খুব তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হয়। তখন দেখা যায় যে, প্রতি লিটার দ্রবণের ভিতর নিম্নোক্ত পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থ থাকেঃ—

CaO — ১ থেকে ২ গ্র্যাম।

SO_3 — ১ " ১০ "

Na_2O — ০.০২ " ২ "

K_2O — ০.০২ " ২০ "

Al_2O_3 ও SiO_2 → কয়েক মিলিগ্র্যাম মাত্র।

সিমেণ্টে জিপসাম না থাকলে Al_2O_3-র মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০৩ গ্র্যাম পর্যন্ত হতে পারে।

জলের ভিতর সিলিকা ও এলুমিনা পরিমাণ মত একত্রিত হলে তারা এলুমিনা-সিলিসিক অ্যাসিডের জেল্-এ (Gel) পরিণত হয়। এই জেল্ হয় বলে সিমেণ্ট তাড়াতাড়ি শক্ত হয় এবং তার ভার বহনের ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম হয়। এর কারণ এই যে, ওই জেল্ ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেটের দানার উপর আবরণ সৃষ্টি করে। সুতরাং সিমেণ্টকে যদি স্বাভাবিকভাবে শক্ত ও পরিমাণমত ভারসহ করতে হয় তাহলে তার ভিতর Al_2O_3-র পরিমাণ খুব কম থাকা উচিত। কম থাকলে, সিমেণ্টের সিলিকেট প্রয়োজন মত জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দৃঢ় অন্তর্বন্ধন সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। সিমেণ্টের সঙ্গে যে জিপসাম শেষকালে মিশানো হয়, তা' জল ও এলুমিনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফো এলুমিনেটে পরিণত হয় এবং এলুমিনাকে অবাঞ্ছিত জেল্ সৃষ্টি করতে বাধা দেয়। সাধারণভাবে বলা চলে যে, যেসব পদার্থ সিমেণ্টের এলুমিনাকে অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত করতে পারে তার প্রত্যেকটি সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার সময়-বর্ধক। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার সময় কমিয়ে দেয় তার প্রত্যেকটি এলুমিনাকে আরও দ্রবণশীল হতে সাহায্য করে।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের মত এলুমিনা সিমেণ্টেরও

রাসায়নিক জলসংযোগ পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার সময়ের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার জন্যে জিপসাম মিশানো হয় না।

এর শক্ত হওয়া নির্ভর করে ভিতরকার দানাহীন গ্লাসের পরিমাণের উপর। দানাহীন গ্লাসের পরিমাণ যত বেশী থাকে, শক্ত হওযার সময়ও তত বাড়ে। গ্লাসের সবটা দানাদার হলে এই সিমেণ্ট জলের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয়। সুতরাং শক্ত হওয়ার সময় আসলে নির্ভর করছে এই ধরণের সিমেণ্টের চুল্লী থেকে বের হবার পর তাকে ঠাণ্ডা করার গতির উপর। সাধারণতঃ Al_2O_3-র তুলনায় CaO-র পরিমাণ যত বেশী থাকে তত তাড়াতাড়ি জলের সংস্পর্শে এই সিমেণ্ট শক্ত হয়।

যেসব সিলিকেট ও এলুমিনেট সিমেণ্টের গুণাবলী সম্পন্ন, তারা জলের সঙ্গে অতি-সম্পৃক্ত দ্রাবণ সৃষ্টি করে। এ-কথা জলযুক্ত $CaSO_4$-র পক্ষেও সত্য, অর্থাৎ $2CaSO_4, H_2O$, প্লাসটার অব প্যারী দ্বারাও অতি-সম্পৃক্ত দ্রাবণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে ১৮৯৩ সালে Micahaelis সিমেণ্ট সংক্রান্ত 'কলয়ড্যাল' মতবাদ উপস্থিত করেন। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য এই যে, সিমেণ্টের প্রধান উপদানসমূহ প্রথমে অতি-সম্পৃক্ত দ্রাবণ প্রস্তুত করে; পরে জলযুক্ত জিলেটিনাস বা আঁঠাল অধঃক্ষেপ তৈরী হয়। এই অধঃক্ষেপ পরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আরও জল গ্রহণ করে তা' শক্ত হতে পারে। ১৮৮২ সালে লা স্যাটিলিয়ার এই মতবাদ উপস্থিত করেছিলেন যে, সিমেণ্টের শক্ত হবার কারণ জলের সাহায্যে অন্তর্যুক্ত দানাদার রাসায়নিক দ্রব্যের সংগঠন। আধুনিক কালে এক্স-রে ও অন্যান্য আলোক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জমাট সিমেণ্টের ভিতর সত্যিই দানাদার রাসায়নিক দ্রব্যাবলী বিদ্যমান। এসব দানাদার বস্তু শক্ত জেল্-এর রাসায়নিক গুণসম্পন্ন। সুতরাং এই দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, তারা পরস্পর নির্ভরশীল।

"সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে (বৈজ্ঞানিক) অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্যদেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেস্থান হইতে প্রতিদিন নূতনতত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর! মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সে-ই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু

শ্রীহৃষীকেশ রায়

সাময়িক বায়ু-প্রবাহ—নিয়ত বায়ু সমস্ত বর্ষব্যাপী নিয়মিতভাবে ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয়। জল ও স্থলের অবস্থান এবং সূর্যের আপাত গতির জন্য বায়ুমণ্ডলে সাময়িকভাবে চাপের যে তারতম্য হয়, তাহারই ফলে সাময়িক বায়ুর উৎপত্তি। দিনরাত্রি বা ঋতুভেদে এই বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়। দিনরাত্রি ভেদে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু নামে খ্যাত এবং অপরটির নাম মৌসুমীবায়ু।

আমাদের জানা সকল পদার্থের মধ্যে জলের উষ্ণতা বর্ধিত করিতে অধিক পরিমাণ তাপের আবশ্যক হয় অর্থাৎ সম-পরিমাণ জল ও অন্য যে কোন পদার্থের উষ্ণতা সমভাবে বর্ধিত করিতে হইলে, অন্য পদার্থটির যে পরিমাণ তাপ আবশ্যক জলের তাহা অপেক্ষা পরিমাণে অধিক তাপ আবশ্যক হইবে। জলের তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও কম। এই দুইটি কারণের জন্য সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থলভাগ দিনের বেলায় শীঘ্র উত্তপ্ত হওয়ায় তাহার উপরিস্থ বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া যায় এবং সেই স্থলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়; কিন্তু সমুদ্র তখনও স্থলের সমান উষ্ণ না হওয়ায় সমুদ্রের শীতল উচ্চ চাপযুক্ত বায়ু তখন স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয়। ইহাই সমুদ্রবায়ু। রাত্রিকালে বায়ু প্রায়ই শান্ত থাকে; কিন্তু সূর্যোদয়ের কিছু পরে বায়ু প্রথমে ধীরে প্রবাহিত হয়। যতই সূর্যরশ্মির তীব্রতা বর্ধিত হয়, বায়ুর গতিবেগও ততই বর্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে বেলাশেষে সূর্যরশ্মির তীব্রতা কমিলে বায়ুও প্রায় শান্তভাব ধারণ করে

আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইতে থাকে, কিন্তু সমুদ্র-জল স্থলের ন্যায় শীঘ্র শীতল হইতে পারে না। ফলে, সমুদ্রের উপরের বায়ুতে নিকটস্থ স্থলভাগ অপেক্ষা চাপ কম হয় এবং সেজন্য স্থল হইতে সমুদ্রের অভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাই স্থলবায়ু।

ক্রান্তীয় বৃত্তের নিকটস্থ সমুদ্র ও তাহার উপকূলবর্তী স্থানে এই উভয় প্রকার বায়ুর যেরূপ প্রাবল্য লক্ষিত হয়, অন্যত্র সেরূপ নয়। এই দুই প্রকার বায়ুপ্রবাহের প্রভাব বায়ুর নিম্নস্তরে দেখা গেলেও ৫০০ হইতে ১০০০ ফিট ঊর্ধ্বে ইহার কোন প্রভাব নাই। সমুদ্র উপকূল হইতে দেশের অভ্যন্তরেও ২০ হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত সমুদ্র-বায়ুর গতিবিধি দেখা যায়। সমুদ্রবায়ুর উৎপত্তির জন্য দিবাভাগে সূর্যের প্রখর কিরণ, নির্মেঘ আকাশ এবং অন্য প্রকারের বায়ুপ্রবাহের অভাব আবশ্যক। বায়ুর নিম্নস্তরে সমুদ্রবায়ু দিবাভাগে জল হইতে স্থলের দিকে এবং স্থলবায়ু রাত্রিকালে স্থল হইতে জলের দিকে প্রবাহিত হইলেও বায়ুর উচ্চস্তরে ইহার গতি ঠিক বিপরীতমুখী অর্থাৎ বায়ু যেন বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমুদ্রবায়ু অপেক্ষা স্থলবায়ুর গতিবেগ কম, কারণ দিবাভাগে জল ও স্থলের তাপ মাত্রার যত পার্থক্য থাকে, রাত্রিকালে তাহা থাকে না। সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু প্রভাবান্বিত সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে দিবাভাগ ও রাত্রিভাগের উষ্ণতার তারতম্য বিশেষ লক্ষিত হয় না। সেইজন্য সমুদ্র তীরবর্তী স্থান এত আরামপ্রদ। সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানের ন্যায় বৃহৎ হ্রদের উপকূলেও এইরূপ বায়ু-প্রবাহ অনুভব করা যায়

দিবাভাগে ও রাত্রিতে সমুদ্র ও তাহার উপকূলবর্তী স্থানে তাপের তারতম্য অনুসারে যেমন সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর সৃষ্টি হয়, তেমনি সূর্যের আপাতগতির ফলে বিভিন্ন ঋতুতে ভূ-পৃষ্ঠে তাপের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য—বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মে, বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। ইহাই মৌসুমীবায়ু নামে খ্যাত। মৌসুমী কথাটি আরবীয় শব্দ, ইহার অর্থ ঋতু। সেইজন্য এই বায়ুপ্রবাহের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর সঙ্গে মৌসুমীবায়ুর যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলের পূর্বদিকের স্থলভাগে মৌসুমীবায়ু দেখা গেলেও, পূর্ব এশিয়াতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত ইহার প্রভাব দেখা যায়।

সমুদ্র বায়ু

আয়নবায়ুর সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, ক্রান্তীয় বলয়ের অন্তর্গত নিরক্ষীয় অঞ্চলেই ইহার প্রভাব; কিন্তু ভারত মহাসাগরের উত্তরে ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে স্থলভাগ থাকায় আয়নবায়ুর নিজস্ব সত্তা লোপ পাইয়া মৌসুমীবায়ুর সৃষ্টি হয়।

অপাত গতিপথে সূর্য ২১শে মার্চের পর নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া যখন উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে অগ্রসর হয়, সে সময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ খুবই উত্তপ্ত হয়; কারণ এই সময় সূর্য এই সকল অঞ্চলে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং ইহাই তাহাদের গ্রীষ্মকাল। উক্ত স্থলভাগগুলি দিনের পর দিন ক্রমে অধিকতর উত্তপ্ত হওয়ায় সেখানকার বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া লঘু হয় এবং ঊর্ধ্বগামী হইয়া সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি অপেক্ষাকৃত শীতল থাকায় সেখানে বায়ুর উচ্চ চাপ থাকে। বায়ুচাপের এইরূপ অসাম্যের জন্য মহাসাগরের জলীয় বাষ্প পরিগর্ভিত উচ্চ চাপযুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবলভাবে বহিতে থাকে। এই বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিলে ফেরেল-সূত্র অনুসারে ইহা উত্তর-পূর্ব দিকে গতি পরিবর্তন করিয়া গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুরূপে পরিচিত হয়। ইহার প্রবল গতিবেগের জন্য উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু বন্ধ হইয়া যায় এবং এই সময়েই আমাদের দেশে কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়। জাপান, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশের দক্ষিণ-পূর্বে প্রশান্ত মহা-

সাগর থাকায় ঐ দেশগুলিতে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী-বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ু নামে পরিচিত। গ্রীষ্ম-কালীন মৌসুমীবায়ু সাধারণতঃ এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। ইহা প্রতি বৎসর প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হয়। এই সময়ে আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশে আষাঢ় মাসের প্রারম্ভ হইতে স্থানের বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূ-ভাগ উক্ত মহাসাগরের জলরাশি অপেক্ষা শীতল হওয়ায় সেখানের বায়ুতে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। এই বায়ু-চাপের বৈষম্যহেতু এশিয়ার স্থলভাগের উচ্চচাপযুক্ত শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে বহিতে থাকে। উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু তখন উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ুরূপে ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া ভারত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর
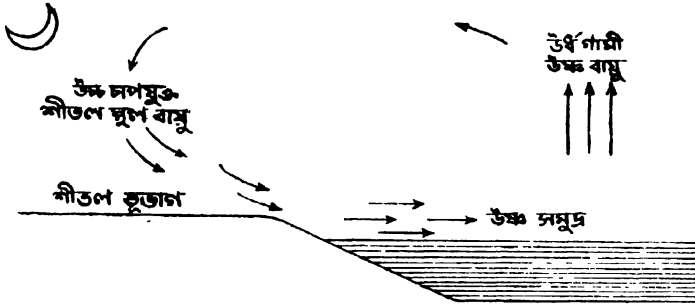
স্থল বায়ু

কার্তিক মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী-বায়ুর প্রভাব অনুভব করা যায়। এই সময়ে নিরক্ষীয় নিম্নচাপযুক্ত শান্তবলয় এবং কর্কটীয় উচ্চচাপযুক্ত শান্ত বলয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শীত-গ্রীষ্মের বার্ষিক গড় তাপের ব্যবধান অধিক হওয়ায় স্থলবায়ু বা সমুদ্রবায়ুর ন্যায় মৌসুমীবায়ুর উচ্চতা কম না হইয়া ঊর্ধ্বে প্রায় ১০,০০০ ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ইহা সমুদ্রের উপর দিয়া কয়েক সহস্র মাইল পথ বেগে অতিক্রম করে।

আবার ২২শে সেপ্টেম্বরের পর সূর্য যখন আপাত গতিপথে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া মকর-ক্রান্তির দিকে অগ্রসর হয়, সে-সময় উত্তরের স্থলভাগ শীতল হইলেও এশিয়ার দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি ক্রমে ক্রমে উষ্ণ হয় এবং উহার উপরিস্থ বায়ুও উষ্ণ হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। ফলে সে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে ও দক্ষিণ চীন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধের শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকাল, সেজন্য এই বায়ু-প্রবাহকে শীতকালীন মৌসুমীবায়ুও বলে। ইহার স্থিতিকাল সাধারণতঃ অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমীবায়ুর আবি-র্ভাবের জন্য আমাদের দেশে যেমন কালবৈশাখী*

* বাংলাদেশে সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসের বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া যে ঝড় উঠে তাহাকেই কালবৈশাখীর ঝড় বলে। ইহা খুব ব্যাপক হয় না, ইহার বিস্তার মাত্র চারি পাঁচ মাইল। কালবৈশাখীর ঝড় বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস, হিমালয়ের শীতল বাতাস এবং পশ্চিমের শুষ্ক উষ্ণ বাতাস মিলিয়া স্থলের উপর উৎপন্ন হয়। এ সময় মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি দেখা যায়।

ঝড়ের সৃষ্টি হয়, শীতকালীন মৌসুমীবায়ুর প্রারম্ভে সেইরূপ আশ্বিনে-ঝড়ের উৎপত্তিও বিরল নয়। এই সূত্রে গত ১৩৪৯ সালের ঝড় উল্লেখযোগ্য।

উত্তর-পূর্ব বা শীতের মৌসুমীবায়ু শীতল, শুষ্ক, মরুময় দেশ হইতে স্থলভাগের উপর দিয়া আসে বলিয়া ইহা জলীয় বাষ্প বিরল। কিন্তু হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিবার সময় তুষার হইতে এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া যাইবার সময় জলরাশি হইতে ইহা প্রচুর জলীয় বাষ্প আহরণ করিয়া মাদ্রাজ উপকূলে এবং সিংহলে শীতকালেও প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। পাঞ্জাবের উত্তরাংশেও এ-সময় কিছু বৃষ্টিপাত হয়; সামান্য হইলেও ইহাতে চাষের কাজ চলে। আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া এই বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিলে ফেরেল-সূত্র অনুসারে বামদিকে বাঁকিয়া উত্তর-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু রূপে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত করে; কারণ এ-সময় অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল হওয়ায় সেখানকার বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আফ্রিকার গিনি উপকূলে এবং উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো উপকূলে মৌসুমীবায়ুর প্রভাব লক্ষিত হয়।

মৌসুমীবায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এইরূপ বায়ুপ্রবাহ গ্রীষ্মমণ্ডলের বিশেষত্ব। ইহার উৎপত্তির জন্য সাধারণতঃ বিশাল স্থলভাগের দক্ষিণে বিশাল জলরাশি বা বিশাল জলরাশির উত্তরে বিশাল স্থলভাগের অবস্থিতি আবশ্যক। বিশাল এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত দক্ষিণাংশে ভারত মহাসাগর থাকায় ভারতবর্ষ মৌসুমীবায়ুর বিশেষ প্রভাবাধীন।
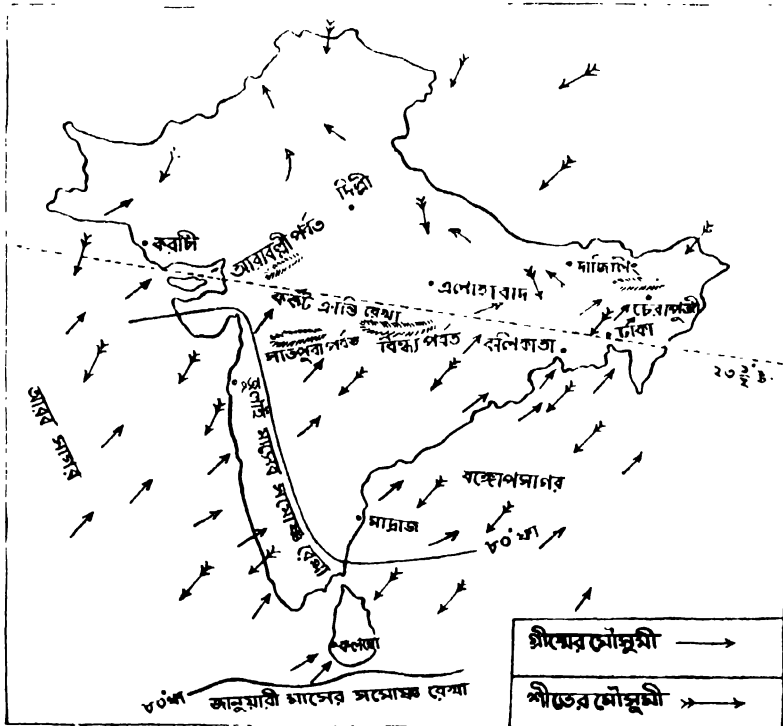
ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মৌসুমীবায়ু প্রবাহ।

মৌসুমীবায়ুর দেশ বলিতে প্রধানতঃ ভারতবর্ষকেই বুঝায়। অক্ষাংশ, সমুদ্র সান্নিধ্য, পর্বত সংস্থান প্রভৃতি যে সকল মূল কারণের উপর ভারতবর্ষের জলবায়ু নির্ভর করে তন্মধ্যে মৌসুমীবায়ু-প্রবাহই প্রধান। ভারতবর্ষ শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হইবার প্রধান কারণ এই মৌসুমীবায়ু। গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী প্রদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল উষ্ণ হয় এবং সেখানকার বায়ু উষ্ণ ও লঘু হইয়া ঊর্ধ্বগামী হওয়ায় উত্তর ভারতে বায়ুর নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য উচ্চ চাপযুক্ত শীতল জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবাহিত হয়। আরব সাগরীয় মৌসুমীবায়ুর শাখাটি অত্যুচ্চ পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে (প্রসার প্রায় ৩০।৪০ মাইল) গড়ে ১০০″ বৃষ্টিপাত করে; কিন্তু রাজপুতনা ও সিন্ধু প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় সেখানে কোন পর্বতের বাধা না পাওয়ায় উক্ত দুই স্থানে এই মৌসুমীবায়ু হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। অবশ্য আরাবল্লী পর্বতে এই বায়ুর প্রবাহপথে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় তাহার পাদদেশে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমঘাট পর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া এই বায়ু বিনা বাধায় উত্তর-পূর্ব দিকে বহিয়া যায় বলিয়া মৌসুমীবায়ুর গতিপথে অবস্থিত হইলেও দাক্ষিণাত্যের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৪০″। আরও উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে প্রতিহত হইয়া মৌসুমীবায়ু নর্মদা ও তাপ্তী নদীর উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত করে এবং এই দুই পর্বত অতিক্রম করিয়া বরাবর আসামের দিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর যে অংশ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাও আসামে আসিয়া পূর্বোল্লিখিত আরব সাগরীয় মৌসুমীবায়ুর সহিত মিলিত হয়। এই উভয় বায়ু-প্রবাহের মিলিত ক্রিয়ার ফলে আসামের অন্তর্গত খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাতের স্থান চেরাপুঞ্জিতে বার্ষিক গড়ে ৫০০″ বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বে শিলং বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে* অবস্থিত হওয়ায় এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৮২″। আসামের পর্বতে প্রতিহত এই মিলিত বায়ুস্রোত দিক পরিবর্তন করিয়া বৃষ্টিপাত করিতে করিতে আসাম হইতে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হয়। যতই পশ্চিমে অগ্রসর হয়, বৃষ্টিপাতও তত কম হয়—দার্জিলিং-এ ১২০″, কলিকাতায় ৬০″, পাটনায় ৪৫", এলাহাবাদে ৪০″, দিল্লীতে ২৮″, লাহোরে ২০″, পেশোয়ারে ১২″; কারণ বৃষ্টিপাতের জন্য বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসে।

পূর্বোল্লিখিত আপাত গতিপথে সূর্য ২২শে সেপ্টেম্বরের পর নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া যখন মকরক্রান্তির নিকটবর্তী প্রদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়, সে-সময় ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের উপরের বায়ু উষ্ণ ও লঘু হইয়া ঊর্ধ্বগামী হইলে সেই স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল হইলেও আমাদের তখন শীতকাল। এই সময় মধ্য-এশিয়া হইতে শীতল ও শুষ্ক উচ্চচাপযুক্ত বায়ু হিমালয় অতিক্রম করিবার কালে তুষার রাশি হইতে কিছু জলীয় বাষ্প আত্মস্থ করিয়া উক্ত নিম্নচাপযুক্ত ভারত মহাসাগরীয় বায়ুরাশির দিকে

* সমুদ্র হইতে আগত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্বতগাত্রে বাধা পাইয়া ঊর্ধ্বগামী হইলে, উহা প্রসারিত ও শীতল হইয়া বৃষ্টিপাত করে এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায়। পর্বত অতিক্রম করিয়া সেই বায়ু অপর পার্শ্বে গেলে তাহাতে আর বৃষ্টি হয় না। পর্বতের ঐ বৃষ্টিবিরল অংশকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে।

ধাবিত হয়; পথে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কিছু বৃষ্টিপাত করে। ইহাই শীতকালীন উত্তর পূর্ব মৌসুমীবায়ু। ইহার একাংশ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া যাইবার সময় কিছু জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজ ও সিংহলের উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেইজন্য এই দুই স্থানে বৎসরে দুইবার বর্ষাকালের আবির্ভাব হয়। এই বায়ু-প্রবাহ আরও অগ্রসর হইয়া নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিলে ফেরেল-সূত্র অনুসারে বাম দিকে বাঁকিয়া উত্তর-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুরূপে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত করে।

উপরোক্ত আলোচিত বিষয় হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের আসাম, পূর্ববঙ্গ, মালাবার উপকূল, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে প্রতিবৎসর বৃষ্টিপাত নিশ্চিত। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতনা, বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশে, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের কতকাংশে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত হওয়ায় কৃষিকার্যের অসুবিধা হয়। সেজন্য মৌসুমীবায়ু-পুষ্ট দেশ হইলেও ভারতবর্ষে প্রায়ই খাদ্যাভাব দেখা যায়।

ভারতবর্ষের কয়েকটি সহরের বৃষ্টিপাতের বিবরণ—

	সহরের নাম	সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা	অক্ষাংশ	গড় উষ্ণতা (জানুয়ারী)	গড় উষ্ণতা (জুন)	গড় বৃষ্টিপাত
১।	কলিকাতা	৭৫ ফিট	২২°৩৪´ উঃ	৬৫° ফাঃ	৮১° ফা	৬১"
২।	বোম্বাই	৩৭ "	১৮°৫৫´ উঃ	৭৫° "	৮০° "	৭৪"
৩।	মাদ্রাজ	২২ "	১৩°৪´ উঃ	৭৫° "	৮৭° "	৪৯"
৪।	এলাহাবাদ	৩০৯ "	২৫°২৮´ উঃ	৬৪° "	৮৫° "	৪২"
৫।	লাহোর	৭০২ "	৩১°২´ উঃ	৫৫° "	৯০° "	২১"
৬।	দিল্লী	৭১৮ "	২৮°৩৮´ উঃ	৫৮° "	৮৬° "	২৮"
৭।	করাচী	৪৯ "	২৪°৫´ উঃ	৬৫° "	৮৪° "	৮"
৮।	শিলং	৪৯২০ "	২৫°২৪´ উঃ	৫০° "	৭০° "	৮২"
৯।	সিমলা	৭২২৪ "	৩১°৬´ উঃ	৬৪° "	৬৮° "	৬৮"

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ন্যায় জলবায়ুর প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মৌসুমী অঞ্চলের বৃষ্টিবহুল প্রদেশে পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের অরণ্যে শাল, সেগুন, মেহগনি, চন্দন, আম, কাঁটাল প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। যতই অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তৃণভূমি ও গুল্মভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল অরণ্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যের ন্যায় গভীর না হইলেও এখানে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তী, হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু দেখা যায়। এই অঞ্চল নদীবহুল, সেজন্য এখানকার নদীর অববাহিকা খুব উর্বর। খাদ্য-শস্যরূপে ধান্যই প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। গম, ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ, ইক্ষু, পাট, কফি, চা প্রচুর জন্মে। অল্পায়াসে এই অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা যায় বলিয়া এখানে লোকবসতি অধিক, কিন্তু অধিবাসীগণ অলস ও শ্রমবিমুখ।

মৌসুমীবায়ু যে কেবল দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নহে, ইহার দ্বারা সমুদ্র-স্রোতও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত মৌসুমীবায়ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ গতিপথ পরিবর্তন করে। দক্ষিণ নিরক্ষীয় সমুদ্র-স্রোতের একটি শাখা গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, আরব সাগর ও ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল ঘুরিয়া বঙ্গোপসাগরে ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমীবায়ু প্রভাবে এই স্রোতের গতি বিপরীতমুখী হয়। সেইজন্য এই সমুদ্র-স্রোতকে মৌসুমী-স্রোতও বলে।

পরমাণু-শক্তি ও তারকা-দ্যুতি

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন মৌলের অণুর সান্নিধ্যে। এই কার্য প্রবর্তন করিতে প্রায়শঃ বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিতে হয় ও উত্তাপজনিত শক্তিই ঐ সব স্থলে আণবিক পরিবর্তন সূচিত কিংবা বর্ধমান করে। একথাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, উষ্ণতার আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে আণবিক চাঞ্চল্য এতদূর বর্ধিত হইতে পারে যে, পারমাণবিক পরিবর্তন ও মৌলান্তরের উদ্ভব সম্ভবপর হইবে। তবে আণবিক অপেক্ষা পারমাণবিক পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ অধিকতর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাত্র ৩ ইলেকট্রন-ভোল্ট্ কারয়িত্রী শক্তি প্রয়োগে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন অণুর রাসায়নিক সম্মিলনে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু উৎপন্ন হয়; কিন্তু লিথিয়াম ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে যে হিলিয়াম পরমাণু সমুৎপন্ন হয়, তাহাতে ১৭ Mev অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ গুণ কারয়িত্রী-শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং সামান্য উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পারমাণবিক পরিবর্তন আশা করা যায় না।

জড়-বিজ্ঞানের নিয়মে তাপ-সঞ্জাত শক্তি বস্তুর পরম উষ্ণতার (absolute temperature) সমানুপাতিক। সুতরাং উপরের দুইপ্রকার পরিবর্তনে শেষোক্ত ক্ষেত্রে উষ্ণতা প্রথমের ৪০ লক্ষ গুণ হইবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কয়েক শত ডিগ্রি উষ্ণতায়ই রাসায়নিক ক্রিয়া প্রবর্তিত ও বিবর্ধমান হয়; সুতরাং সেই অনুপাতে পারমাণবিক পরিবর্তন প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা হইবে প্রায় কোটি কোটি ডিগ্রী। তবে সকল ক্ষেত্রে যে একই প্রকারের উষ্ণতার প্রয়োজন হইবে তাহ নহে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কারয়িত্রী শক্তি মৌল-ছকের দুই প্রান্তেই ন্যূনতম। সুতরাং তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াসের বিপর্যয় দুই পর্যায়ে ফেলা যায়। (১) লঘুতর মৌলে তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াস সংযোজন ও (২) গুরুতর মৌলে তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াস বিখণ্ডন।

তাপের ক্রিয়ায় পদার্থের অভ্যন্তরস্থ কণাগুলির গতি-চাঞ্চল্য বর্ধিত হয়। তবে উষ্ণতা সর্বত্র এক হইলেও সকল কণার এক গতিবেগ হয় না। চলার পথে ভাগ্যক্রমে কণায় কণায় সংঘর্ষ বাধে এবং সেই জন্য তাহাদের অবাধ গতি-পথ সামান্য। পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থাবৈগুণ্যে, কতকগুলি কণা চলিবে দ্রুত গতিতে এবং কতকগুলি চলিবে অতি মৃদুগতিতে। অপর সকল কণার গতিবেগ হইবে মধ্যবর্তী। এইরূপ ক্ষেত্রে, হিসাবের সুবিধার জন্য ম্যাকস্ওয়েলের বেগ-পরিবেশন ধারা অনুযায়ী বস্তুকণার গতিজনিত শক্তির মধ্যমান নির্ণয় করা যায়। কারয়িত্রী শক্তি এই মধ্যমানের সমকক্ষ হইলেই তাপ-প্রবুদ্ধ কোন এক ক্রিয়া প্রবর্তিত হইতে পারে। ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রবর্তনে সাধারণতঃ উপরে বর্ণিত অতি দ্রুতগতি বা মৃদুগতি কণার গতিজনিত শক্তিই কার্যকরী হইয়া থাকে। নাইট্রোগ্লিসারিণ-অণুর কারয়িত্রী শক্তি ২'২ e.v.। তাপ প্রভাবে এই শক্তি সংজননে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা ২৫,০০০ ডিগ্রি। অথচ একথা সকলেরই জানা যে, উষ্ণতা প্রাপ্তির বহু পূর্বে ঐ অণু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে। সুতরাং স্বল্পতর উষ্ণতার কোন কোন দ্রুতগতি বিশিষ্ট কণার শক্তি উষ্ণতার সমানুপাতিক না হইলেও অধিকতর শক্তির আধার রূপে কার্য করে।

যাহাহউক, নিউক্লিয়াসীয় বিকার সাধনে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা কি প্রকারে হিসাবে পাইব? এ-সম্বন্ধে ১৯২৭ খৃঃ অব্দে অ্যাট্কিন্সন্ ও হাউটার

ম্যান্‌স্ উচ্চ গণিতের সাহায্যে এক নিয়মে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে উষ্ণতার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহা কল্পনাতীত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

সাইক্লোট্রোন যন্ত্র সাহায্যে সমৃদ্ধবেগ ডয়টারন ক্ষেপণীরূপে ভারী-জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডয়টারন-ডয়টারন নিউক্লিয়াসীয় ক্রিয়ার ফলে হিলিয়ামের এক লঘু সমপদের নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় ও একটি নিউট্রন বহির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ৩.২ **Mev** শক্তি বিকশিত হয়। পরীক্ষালব্ধ এই ফলের সাহায্যে উপরে বর্ণিত নিয়মে নানা উষ্ণতায় তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াসীয় বিকারে কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব করা হইয়াছে। দেখা যায়, ৩৪ লক্ষ ডিগ্রি উষ্ণতার কমে কোন শক্তির বিকাশই হয় না। ৪লক্ষ ডিগ্রি উষ্ণতায় এক গ্র্যাম ভারী-হাইড্রোজেন সেকেণ্ডে মাত্র •০০১ ক্যালরি শক্তি প্রদান করে। উপরে বর্ণিত ডয়টারন-ডয়টারন প্রতিক্রিয়া তাপ-প্রবুদ্ধ শক্তির সাহায্যে সাধিত করিতে হইলে এমন একটি উনুন চাই যাহার উষ্ণতা কয়েক লক্ষ ডিগ্রি। এ-প্রকার উষ্ণতা ভূ-পৃষ্ঠে কল্পনাতীত। কিন্তু ধরাধামে অসম্ভব হইলেও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও যে তাহা সম্ভব হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। আকাশের সূর্য ও তারকাগণের অফুরন্ত তেজ কি তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াসীয় বিকারে সম্ভূত হইতে পারে না? আকাশের তারকাগণের সহিত আমাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোধগম্য না হইলেও সবিতাকে জগজ্জীবনরূপে ব্যক্ত করা হয়। সন্তানের ন্যায় আমাদের এই পৃথিবী ও তৎপৃষ্ঠবাসী জীবকুল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সৌরকরের উপর নির্ভর করিয়া আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, তারকাগণও এক একটি সূর্য এবং অধিকাংশই আমাদের সূর্য অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর। আলোক শক্তির উৎসরূপে তাহারাও অন্যান্য অজ্ঞাত জগতের চাহিদা মিটাইতেছে। জীবজগতে সৌরকরের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়াই সন্ধানী মনে প্রশ্ন উঠে যে, এই তেজের উৎস কোথায়? অতীত এই তেজ বিকিরণের সাক্ষী রূপে দণ্ডায়মান। কোটি কোটি বৎসর এই ক্রিয়া অব্যাহত ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। কি প্রক্রিয়ায় এই শক্তিধারার প্রথম বর্ষণ সূচিত হইয়াছিল, কি ভাবে ইহা চলমান আছে এবং আপাতদৃষ্টে অফুরন্ত মনে হইলেও ইহার চরম পরিণতি কি?

ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে, প্রতি সেকেণ্ডে লম্বভাবে যে সৌরকর আপতিত হয়, তাহার শক্তি-পরিমাণ প্রায় সাড়ে তের লক্ষ আর্গ্‌স্। কিন্তু সূর্যের চারিদিকে মহাশূন্যে যে শক্তিধারা বিকীর্ণ হয়, তাহার তুলনায় এই শক্তি অতি সামান্য। অথচ এই শক্তি প্রভাবে ৮২৫ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটি বরফ গোলক এক সেকেণ্ডেই গলিয়া জল হইয়া যাইতে পারে।

সৌরপৃষ্ঠের উষ্ণত প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেণ্টি-গ্রেড। আমাদের পরিচিত ধাতব মৌলের মধ্যে টাংস্টেন সর্বাধিক তাপসহ। ইহা ৩৩৭০° ডিগ্রি উষ্ণতায় বিগলিত এবং ৫৯০০° ডিগ্রিতে গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সৌর-উষ্ণতায় জাগতিক কোন বস্তুর একমাত্র গ্যাসীয় অবস্থাই সম্ভবপর। সূর্যের অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, উষ্ণতা ক্রমে বর্ধমান হইয়া কেন্দ্র সমীপে ২ কোটি ডিগ্রিতে পৌছিয়াছে। এ-প্রকার উষ্ণতা প্রত্যেক তারকার বেলায়ই সম্ভবপর। সূর্য ও প্রত্যেক তারকাকেই আমরা এক একটি সুবৃহৎ চুল্লীরূপে কল্পনা করিতে পারি। প্রভূত মাধ্যাকর্ষণ বলে দৃঢ়সংবদ্ধ গ্যাসীয় আচ্ছাদন এই চুল্লীকে সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল চুল্লীর উষ্ণতায় নানাপ্রকার নিউক্লিয়াসীয় পরিবর্তন ও শক্তি সংকলন প্রবর্তিত থাকিয়া উহাদের বিকীর্ণ শক্তির যোগান দিয়া আসিতেছে।

বিগত শতাব্দীর বিজ্ঞান সৌরশক্তির উৎস

সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। ঐ শতাব্দীরই মধ্যভাগে জার্মান বিজ্ঞানী হেলম্‌হোল্‌ৎজ্‌ ও বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন সৌর ও নাক্ষত্র তেজের কারণ সম্বন্ধে এক মতবাদ প্রচার করেন। সে-মতে ইহাদের দেহের অতি ধীর সংকোচনের ফলেই এই অবিরাম তেজোদ্ভব সম্ভব হইতেছে। এইভাবে সংকোচনজাত শক্তি প্রায় ২ কোটি বৎসরের তেজ বিকিরণের হিসাব মিটাইতে পারে; কিন্তু ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের যে মতে ১০০ কোটি বৎসরেরও পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে জীব সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমর্থন, সংকোচন মতবাদে পাওয়া যায় না।

১৮৯৬ খৃঃ পরাব্দে তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কার হইতেই সর্বপ্রথম পরমাণুর অভ্যন্তরের অপ্রকট শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই সৌর ও নাক্ষত্র শক্তির কারণরূপে তেজস্ক্রিয়া অনুমিত হইলেও প্রায় ৩০ বৎসর পর পারমাণবিক পরিবর্তন ও তাহার সহিত সৌরশক্তির সম্বন্ধ যথাযথরূপে সাব্যস্থ হয়। মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানে তারকাগণের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধেও বহু তথ্য জ্ঞানগোচর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এডিংটনের জ্যোতিষতত্ত্ব, রাদারফোর্ডের মৌলান্তর গঠন সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনে গণিতের ব্যবহার, জ্ঞানাবারিধির সীমা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

সৌরদেহের উষ্ণতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই উষ্ণতায় সকল পদার্থ অতি লঘু গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ জ্যোতিষ্কগণের অভ্যন্তরে উষ্ণতার সঙ্গে চাপও অতি প্রচণ্ড। হিসাব মতে এই চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় $১০^{১২}$ গুণ। এই হিসাব প্রণালী অতি নির্ভুল। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সুতরাং সূর্যের আকার লইয়া হিসাব করিলে উহার প্রতি বর্গফুটে চাপ প্রায় $১০^{১২}$ টন পারদের ওজনের সমান। এই চাপে সেখানকার গ্যাস এত সংকুচিত হইবে যে, গ্যাসীয় অবস্থা অক্ষুন্ন থাকিলেও তাহার ঘনাংক, কোন প্রকার তরল বা কঠিন অবস্থানুযায়ী ঘনাংক অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হইবে। প্রকৃত সমস্যা এই যে, কিমিয়াশাস্ত্র-সম্মত সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনটিকে আমরা সূর্য ও অপরাপর ছোট বড় তারকার শক্তির উৎসরূপে ধরিতে পারি? ইহার সদুত্তর পাইতে হইলে পূর্বোক্ত অ্যাট্‌কিন্‌সন্‌-হাওটারম্যান্‌স্‌ ফরমুলা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে! প্রথমেই বলা দরকার যে, সৌর বা নাক্ষত্রিক প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্ণিত তাপ-প্রবুদ্ধ ডয়টারন-ডয়টারন প্রতিক্রিয়ার তুল্য নহে। কারণ এই প্রতিক্রিয়ার বেগ অতিদ্রুত, অত্যল্প সময়েই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া যায়। যদি ঐ সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলে কোন ডয়-টেরিয়াম বিদ্যমান থাকে তবে তাহা চক্ষের নিমেষেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। নানা পদার্থের তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াসীয় প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ লঘু মৌলের প্রতিক্রিয়া সুচিরস্থায়ী নহে। সুতরাং তাহার সহায়তায় অফুরন্ত জ্যোতির উৎসের সন্ধান মিলে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐ সকল জ্যোতিষ্কে কোন লঘু মৌল থাকিলে তাহা পূর্বেই তাপ-প্রবুদ্ধ শক্তি বিকাশের পর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে উপরোক্ত ফরমুলা অনুযায়ী লঘুতর মৌলের তাপ-প্রবুদ্ধ প্রতিক্রিয়াকে শক্তির উৎস প্রতিপাদনে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। কিন্তু প্রায় ১০ বৎসর পরে ১৯৩৭ খৃঃ পরাব্দে আমেরিকার বেথে ও জার্মানীর ভীজ্‌সাকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরীক্ষায় সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তাঁহাদের পরীক্ষার ফল মোটামুটি এই যে, কার্বন ও নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেনের সঙ্গে কিমিয়াবিদ্যানুযায়ী তাপ-প্রবুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, বরং নানাপ্রকার রূপান্তর গ্রহণের পর পূর্বাবস্থায় প্রত্যাগমন করে। সংক্ষেপে সমগ্র কার্যকে বলা হয়, কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র। এই চক্রের ক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে সহজে বোধগম্য হইবে।

প্রবল উষ্ণতায় সৌরমণ্ডলে 'আয়নিতি' প্রবর্তিত হওয়ায় অধিকাংশ নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন-আবরণ বিমুক্ত অবস্থায় কিংবা অনেক পরমাণু আয়নিত অবস্থায় বিচরণ করে। যাহা হউক, উল্লিখিত চক্র হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস বা প্রোটন প্রবর্তিত করে। (১) প্রোটন-কার্বন প্রতিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের সমপদ (পরমাণু ওজন ১৩) $N^{১৩}$ উৎপন্ন হয়। এই প্রতিক্রিয়া সাধারণ পরীক্ষাগারে কার্বনের উপর প্রোটন-ক্ষেপণী প্রয়োগে প্রদর্শণ করা যায়। কিন্তু এই $N^{১৩}$ নিউক্লিয়াস অস্থিরবস্থ; দেখা যায় যে, প্রায় ১০ মিনিট সময় মধ্যেই, (২) উহা একটি পজিট্রন ত্যাগ করিয়া কার্বনের এক স্থিরবস্থ সমপদে ($C^{১৩}$) পরিণত হয়। (৩) এই কার্বন-সমপদ ও প্রোটন প্রতিক্রিয়ায় নৈসর্গিক নাইট্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন হয় ($N^{১৪}$)। (৪) কিয়ৎকাল পরে $N^{১৪}$ ও প্রোটন প্রতিক্রিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অক্সিজেনের এক অস্থির সমপদ ($O^{১৫}$) গঠিত হয়। (৫) দুই মিনিট সময়ের মধ্যেই উহা একটি পজিট্রন ত্যাগ করিয়া স্থিরবস্থ $N^{১৫}$ পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। এই স্থির নিউক্লিয়াস ও প্রোটন প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে (৬) একটি আলফাকণা ($He^{৪}$) ও কার্বন নিউক্লিয়াস প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্রটি সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে কার্বন নিউক্লিয়াস অবিকৃতই রহিয়াছে ও হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হইয়াছে। চক্রে ইহাও সুপরিস্ফুট যে, উহার আরম্ভ ১, ২, ৩ ইত্যাদি চিহ্নিত যে কোন অবস্থান হইতেই ধরিতে পারা যায়। আরও বুঝা যাইতেছে যে, যতদিন সৌর বা নাক্ষত্র মণ্ডলে হাইড্রোজেন বর্তমান থাকিবে ততদিন এই চক্র অব্যাহত থাকিবে। একথাও সত্য যে, সৌর পদার্থের এক-তৃতীয়াংশই হাইড্রোজেন ও প্রায় শতকরা ১ ভাগ কার্বন। সুতরাং বেথের চক্রের হাইড্রোজেন বা কার্বনের কোন অভাব ঘটিবেনা। বেথের হিসাবমতই নিউক্লিয়াস হইতে নিউক্লিয়াসান্তর উৎপন্ন হইতে ও চক্র পূর্ণ
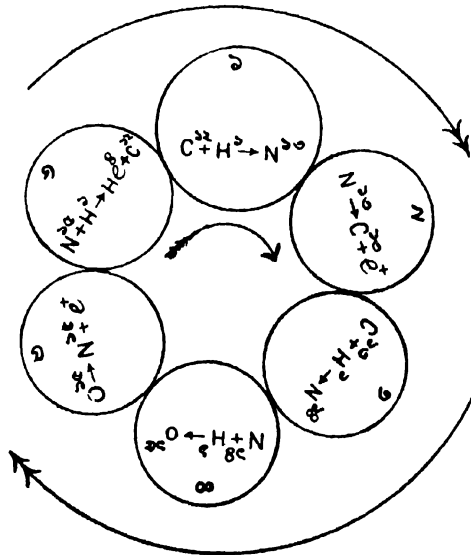
কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র।
C—কার্বন; H—হাইড্রোজেন; N—নাইট্রোজেন;
O—অক্সিজেন; He—হিলিয়াম; e^{+}—পজিট্রন।

হইতে সূর্যের বর্তমান উষ্ণতায় ৫০ লক্ষ বৎসর লাগিবে এবং এই কালের অবসানে হাইড্রোজেনের মাত্রা হ্রাস পাইলেও কার্বনের পরিমাণ অবিকৃত থাকিবে।

সুতরাং সূর্য ও তারকাগণের অভ্যন্তরে তাপ-প্রবুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ইন্ধন যোগায় হাইড্রোজেন। উহার মাত্রা হ্রাস পাইলেই কি তেজ বিকিরণ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না? বিজ্ঞানী বলেন, সে ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, তাপাদি শক্তির পরিবাহক হিসাবে হাইড্রোজেনের স্থান হিলিয়ামের উর্ধে। সুতরাং উপরে বর্ণিত রীত্যানুযায়ী হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হওয়ায় ভিতর হইতে তেজ নির্গমণও কষ্টসাধ্য হইবে। ইহাতে অভ্যন্তরে শক্তিবৃদ্ধি ও তজ্জনিত উষ্ণতা বৃদ্ধিতে নিউক্লিয়াসীয় প্রতিক্রিয়া প্রবলতর হইবে এবং শক্তি বিকাশের ধারাও বর্ধিত হইবে। অধ্যাপক গেমোর মতে এইভাবে সৌর-দ্যুতি ক্রমে বর্ধিত হইতেছে।

এই সকল আলোচনা হইতে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, জ্যোতিষ্কের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড উষ্ণতায় অবিরাম দহনে যে পারমাণবিক শক্তি উৎসারিত হইতেছে তাহাই সৌর-দ্যুতি ও তারকা-বিকীর্ণ তেজের প্রকৃত কারণ। যেহেতু সৌরশক্তিই মানবজাতির ব্যবহার্য সকল শক্তির মূল, সুতরাং জাগতিক শক্তির আধার—বায়ু, জল, কয়লা বা তৈল প্রভৃতির আদি কারণ পারমাণবিক শক্তি। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হয় যে, উক্ত প্রতিক্রিয়ায় তাপ-প্রবুদ্ধ পারমাণবিক শক্তি স্বভাবতই সৌরদেহে প্রবর্তিত হইয়া আমাদের সকল প্রকার শক্তির যোগান দিতেছে। তাহা প্রবর্তিত করার সাধ্য মানবের নাই। মানবের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে, বিশ্বসৃষ্টির পর, যুগযুগান্তের অবসানে যে সামান্য ইউরেনিয়াম ২৩৫ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহারই সাহায্যে বিশ্বের অফুরন্ত পারমাণবিক শক্তি-ভাণ্ডারের সামান্য কণা-মাত্রই আমরা লাভ করিতে পারি।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য

আমাদের দৃষ্টির সীমানার ঠিক বাইরে থেকে একটি রহস্যময় জগতের আরম্ভ। প্রকৃতি সেখানে বিচিত্র লীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে, অথচ মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির গতিপথ সেখানে রুদ্ধ। এই রহস্যময় জগতের প্রাথমিক আভাস পাওয়া গিয়েছিল সেদিন, যেদিন ডাচ বিজ্ঞানী লীউয়েনহুবেক ছোট ছোট কয়েকটি সরল মাইক্রস্কোপ তৈরী করে তার সাহায্যে প্রাণী-জগতের কয়েকটি ক্ষুদ্র অধিবাসীর বিচিত্র রূপ চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। তারপর কত-দিন কেটে গেছে, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লীউয়েনহুবেকের কাঁচা হাতের মাইক্রস্-কোপ রূপ-পরিগ্রহ করেছে, আজকের অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। শুধু অতীন্দ্রিয় জগতের অজানা রহস্য উদ্ঘাটনের রোমাঞ্চকর কৌতুহল নয়, মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সর্ববিধ কল্যাণে আজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। জ্ঞানের স্পৃহা ও বিশ্বকল্যাণে লব্ধ-জ্ঞানের ব্যবহারই যুগে যুগে প্রেরণা জুগিয়েছে বিজ্ঞানী-দের, উৎসাহিত করেছে যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টির

সংক্ষিপ্ত পরিধিকে প্রসারিত করবার উন্নত উপায় উদ্ভাবনে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৌড় যখন শেষ হয়ে গেল তখন আসরে আবির্ভূত হলো আর একটি বিস্ময়কর যন্ত্র—তার নাম ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ। জীবাণু-জগত থেকে অণু-জগতের দিকে ক্রমগতির পথে আর একটি পদক্ষেপের সূচনা ঘটল—জড়পদার্থের অণু-পরমাণুর কোন্ বিচিত্র সমন্বয়ে সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে প্রাণের স্পন্দন, সেই চিরন্তন রহস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়ার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানীরা।

দৃষ্টির পরিধি আমাদের একান্ত সংকীর্ণ। ইন্দ্রিয় হিসেবে চোখের স্থান সর্বাগ্রে হলেও চোখের মর্মভেদী শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রধানত দুটি। প্রথম হচ্ছে—অত্যন্ত কাছের জিনিস দেখতে আমরা অসমর্থ। বইয়ের লেখ একটু দূর থেকে খালি-চোখের কাছে ক্রমশ সরিয়ে আনলে দেখা যায়, চোখ থেকে দেড় বিঘৎ দূরের পর আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না; চোখের কষ্টও হতে থাকে। তখন আমরা বলি, চোখ আর ফোকাস করতে পারছে না। এই যে দেড় বিঘৎ বা দশ ইঞ্চি দূরত্ব, এই হচ্ছে চোখের সর্বনিম্ন দূরত্ব, যার চেয়ে কাছের জিনিসের প্রতিবিম্ব চোখ আর তার রেটিনার ওপর পরিষ্কার ভাবে ফোকাস করতে পারে না। দৃষ্টির প্রথম সীমা নির্দিষ্ট হলো এইখানে—দশ ইঞ্চির চেয়ে নিকটবর্তী কোন পদার্থকেই চোখ গ্রাহ্য করে না।

তারপরই আসে দ্রষ্টব্য পদার্থের আয়তনের কথা। কত ছোট জিনিস আমাদের পক্ষে শুধু চোখে দেখতে পাওয়া সম্ভব? পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক ইঞ্চির আড়াইশ' ভাগের এক ভাগের চেয়ে ক্ষুদ্র পদার্থের স্বরূপ দেখতে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। যে কোন পদার্থের দুটি বিন্দু যদি এক ইঞ্চির আড়াইশ' ভাগের এক ভাগ তফাতে থাকে তবে আমাদের চোখ তাদের পৃথক বলে কিছুতেই চিনে উঠতে পারে না। প্রজাপতির ডানার রেখা আমাদের চোখে এই জন্যেই ধরা দেয় না, ম্যালেরিয়ার বীজাণু শুধু-চোখে দেখতে পাওয়া এই জন্যেই অসম্ভব। সাধারণ ফুলের রেণু বা পাউডারের চূর্ণগুলির আকার যে কিরকম তা আমরা বহুল প্রয়াসেও কিছুতেই বলতে পারব না, যদি না চোখের সাহায্যের জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করি।

১নং চিত্র।
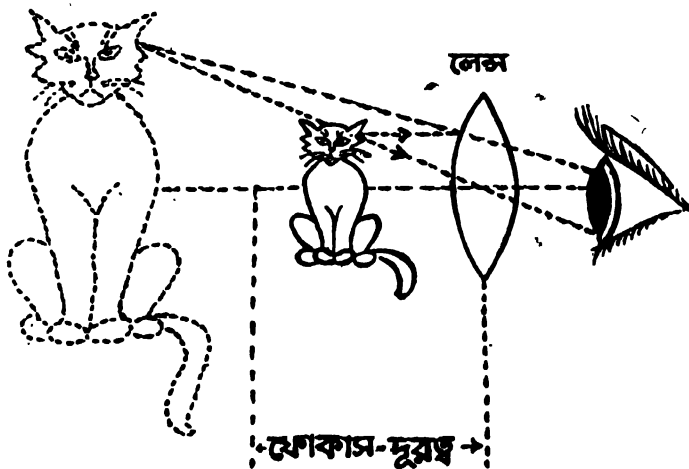
চোখের এই যে স্বল্প বিশ্লেষণ শক্তি, এই হচ্ছে অবাধ দর্শনের দ্বিতীয় সীমা। দ্রষ্টব্য পদার্থের দুটি অংশের দূরত্ব যদি এক ইঞ্চির আড়াইশ' ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয় তবে প্রকৃতপক্ষে তারা পৃথক হলেও চোখ তাদের পার্থক্য বিশ্লেষ করতে অসমর্থ।

ছোট ছোট লেখা পড়তে হলে আমরা সাধারণত ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে থাকি। চোখের সামনে রিডিং লেন্স ধরলে আমাদের দ্রষ্টব্য বস্তু বিবর্ধিত হয়ে ওঠে; কিন্তু খুব বেশী বিবর্ধন সম্ভব হয় না। রিডিং লেন্সই হচ্ছে সরল অণুবীক্ষণ এবং তার সাহায্যে ছোট ছোট লেখা খুব বেশী হলে কুড়ি গুণ বাড়িয়ে দেখা সম্ভব। ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য। সূর্যের আলোক রশ্মিকে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করে কাপড় বা কাগজ পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—এই ফোকাস-দূরত্ব যত ছোট হবে, পদার্থটাও প্রতিভাত হবে তত বৃহদাকারে এবং তার আকার সম্বন্ধে চোখও তত সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হবে। সাধারণত একটা রিডিং লেন্সের সাহায্যে কুড়ি, পচিশ গুণের বেশী বিবর্ধন সম্ভব নয়, কারণ ফোকাস-দূরত্ব যদি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয় তবে দ্রষ্টব্য বস্তুকে লেন্সের অত্যন্ত কাছে রাখতে হবে এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে আলোকিত করা হবে কষ্টসাধ্য।

আরো বেশী বিবর্ধন দরকার হলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র। একটি লেন্সের বদলে সেখানে ব্যবহার করা হয় দুটি লেন্স, তার প্রত্যেকটি আবার অনেকগুলি লেন্সের সমষ্টি। প্রতিবিম্বকে নিখুঁত এবং উজ্জ্বল করবার জন্যেই লেন্স সমষ্টির প্রয়োজন হয়। ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য।
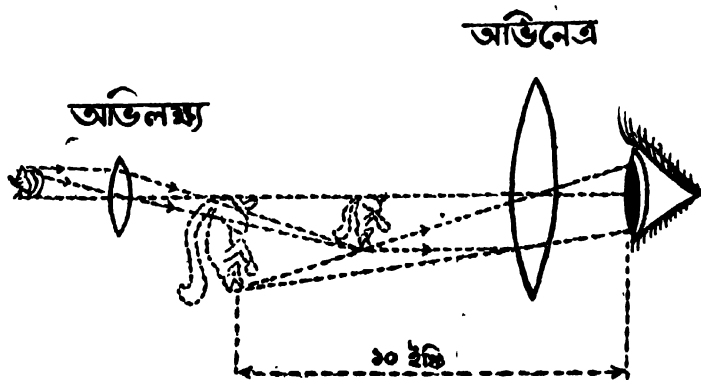
২নং চিত্র।

অভিজ্ঞতা শৈশবে প্রায় সকলেরই হয়েছে। বস্তুত ফোকাস কথাটার উৎপত্তিই অগ্নিকুণ্ডের মর্মার্থ থেকে। কাগজের কাছ থেকে যে দূরত্বে লেন্সটিকে রাখলে নিপতিত সূর্যালোক কাগজের মধ্যে একটি ছোট বিন্দু জুড়ে জ্বলন্ত হয়ে ওঠে, সেই দূরত্বকে আমরা বলি লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব এবং যে জায়গাটি জ্বলে ওঠে সেই বিন্দুটির নাম দিয়েছি ফোকাস-বিন্দু। দেখা যায় লেন্সের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পদার্থের প্রতিচ্ছায়াকে ক্রমাগত বাড়িয়ে গেলে আমাদের কোন সুবিধেই হবে না, যদি না যন্ত্রের বিশ্লেষণ শক্তি ক্রমশ প্রখর হতে থাকে। ম্যালেরিয়ার বীজাণু যদি মাইক্রস্কোপের নীচে ফেলে পরীক্ষা করতে চাই, তবে সেই মাইক্রস্কোপের বিশ্লেষণ-শক্তি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রত্যেকটি

বীজাণুকে আলাদা করে চেনা ও গোণা যায়। তা না হলে সমস্ত বিবর্ধনই বৃথা হয়ে যাবে। বিবর্ধিত প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন বীজাণুকেই আমরা পৃথক করে চিনতে পারব না। আমরা আগেই জেনেছি, চোখের বিশ্লেষণ শক্তি হচ্ছে এক ইঞ্চির আড়াইশ' ভাগের এক ভাগ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের এইটুকুই উদ্দেশ্য যে, প্রতিবিম্বের মধ্যে দুটি বিন্দুর (এ ক্ষেত্রে দুটি বীজাণুর, যদি আমরা শুধু বীজাণুই দেখতে চাই) দূরত্ব এক ইঞ্চির আড়াইশ' ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়েও বেশী হবে, যাতে চোখের পক্ষে তাদের পৃথক বলে চিনতে কোন কষ্ট না হয়। সুতরাং যন্ত্রের বিশ্লেষণ শক্তি যতখানি ততখানি সূক্ষ্ম বস্তুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে, তার বেশী নয়।

হিসেব করে দেখা গেছে, সর্বদিক শক্তিশালী আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণ সূর্যালোক ব্যবহার করলে তার বিশ্লেষণ শক্তি এক ইঞ্চির সওয়া লক্ষ ভাগের এক ভাগের নীচে কিছুতেই নামানো যায় না। বীজাণু গোষ্ঠির অনেক গুলিকে এতেই চেনা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের প্রকৃত চেহারা কিরকম সে সম্বন্ধে পুরোপুরিই অজ্ঞ থাকতে হয়। এদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে চাই আরো অধিক বিশ্লেষণ শক্তি। ১৯০০, খৃষ্টাব্দ থেকে ক্রমশ বিজ্ঞানীরা অবহিত হতে লাগলেন যে, অনির্দিষ্টভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ শক্তিকে বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে না। তার কারণ যন্ত্রের লেন্স যতই নিখুঁত ও শক্তিশালী হোক না কেন, বাধা আসবে আলোর দিক থেকে। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে ক্ষুদ্রতর পদার্থ বিশ্লেষ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তার কারণ পদার্থটির আয়তন তখন আলোক-তরঙ্গের অবিরাম গতির কোন বিকারই ঘটাতে সক্ষম হবে না। ফলে, তার কোন খবরই আলোর [illegible] আমরা জানতে পারব না। যে বীজাণু-গোষ্ঠী এতদিন বিজ্ঞানীর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ধরা পড়ছিল, তারা শুধু-চোখে অদৃশ্য হলেও আলোক-তরঙ্গের চেয়ে বহুগুণে দীর্ঘ। তা' সত্ত্বেও তাদের শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানা যাচ্ছিল না, কেবল আন্দাজে কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া।

সূর্যের বর্ণালীর সাত রঙের আলো ছাড়া অন্য কোন আলোয় আমাদের চোখ সাড়া দেয় না। এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী। এবং বেগনী আলোর সবচেয়ে কম। এদের চেয়ে আরো হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলট্রা ভায়োলেট বা অতি-বেগনী আলোর; কিন্তু আমাদের চোখ তাতে সাড়া দেয় না। চোখে না দেখা গেলেও আলট্রা-ভায়োলেটের সাহায্যে ফোটো তোলা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সূর্যালোকের বদলে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করলে তার বিশ্লেষণ শক্তি আরো চার পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়—অণুজগতের মর্মভেদ করতে হলে চাই আরো ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গ, আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অঙ্কের খাতায় অণুপরমাণু সম্বন্ধে যে গবেষণা করে এসেছেন তার নির্ভুল প্রমাণ চাই—চাই চাক্ষুস মীমাংসা। অণু-জগতের মধ্যে আলোকপাত করতে পারে অণুর ব্যাসের চেয়েও ছোট আলোক-তরঙ্গ, তার দৈর্ঘ্য হওয়া চাই—এক ইঞ্চির পঁচিশ কোটি ভাগের এক ভাগ বা আরো ছোট।

কোথায় পাওয়া যাবে এত ছোট আলো? এক্স্-রশ্মির আবিষ্কার বহুদিন পূর্বেই হয়েছে এবং তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আমাদের আংশিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এক্স্-রশ্মিকে ফোকাস করার উপায় আমাদের জানা নেই। এমন কোন লেন্স নেই যা তার গতি-পথকে বাঁকিয়ে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম। ফোকাস করতে না পারলে প্রতিবিম্ব পাওয়াও সম্ভব নয়, সুতরাং অণুবীক্ষণের কাজে এক্স্-রশ্মি সম্পূর্ণ
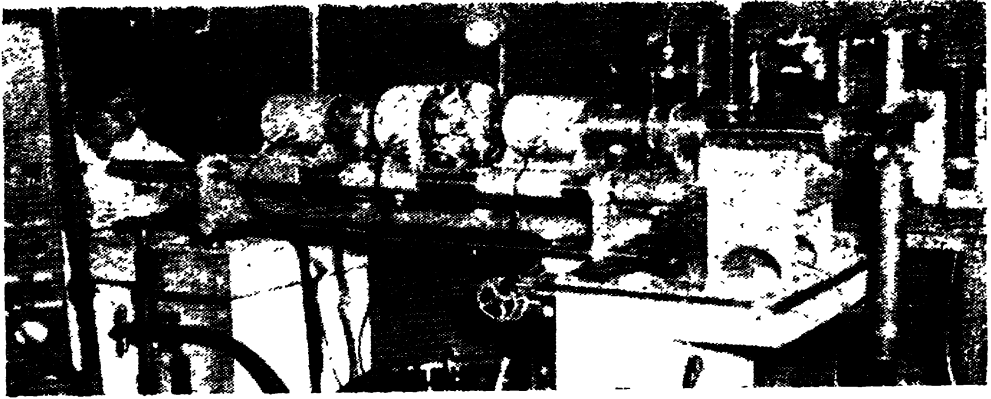
কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ।

(হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কর্তৃক গৃহীত ফটো)
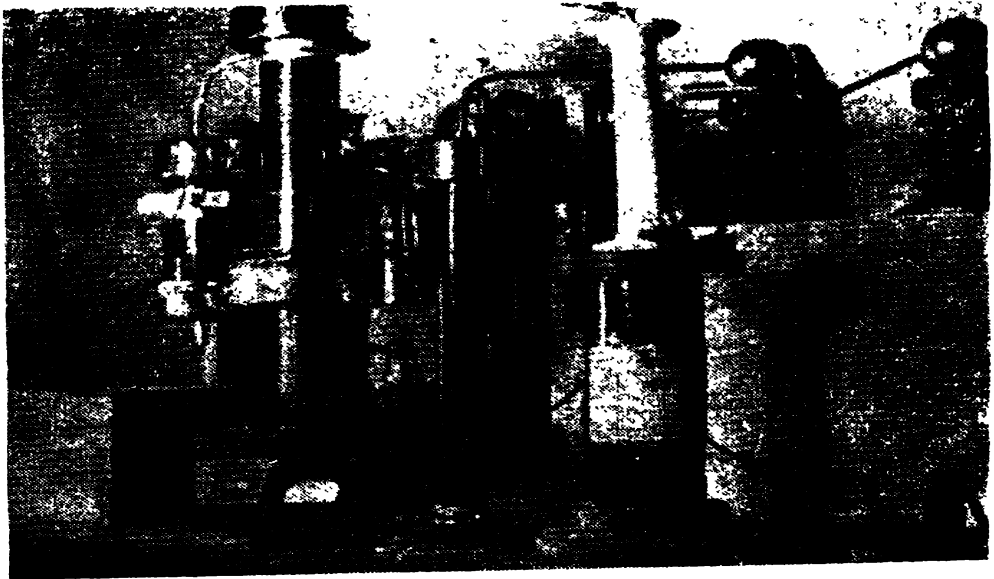
ইলেকট্রনের গতিবৃদ্ধির জন্যে এই যন্ত্র থেকে ৬০,০০০ ভোল্ট
বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত হয়।

আধুনিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের ছবি, Shadow Casting প্রক্রিয়ায় তোলা। × ৬০,০০০

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা স্ট্রেপ্টোকক্কাস্ জীবাণুর ছবি। × ১৫,০০০

বিজ্ঞান কলেজের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা জিঙ্ক অক্সাইডের ছবি। × ৬০০০

বাতিল। অণু-পরমাণু সম্বন্ধে পরোক্ষ গবেষণাই এক্স্-রশ্মি-ব্যবহারের উপযুক্ত ক্ষেত্র; প্রত্যক্ষ বিচারে তার সাহায্য নেওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য। নবাবিষ্কৃত আরো ক্ষুদ্র গামা-রশ্মি সম্বন্ধে এই একই কথা।

নৈরাশ্যের মধ্যে উৎসাহ এলো সম্পূর্ণ অভাবনীয় দিক থেকে। বৈদ্যুতিক বাল্বের তার যখন উত্তপ্ত হয়ে আলো দেয় সেই সময় তারের গা থেকে প্রচণ্ড বেগে ছিটকে বেরোয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুৎ-কণা। এদের বলা হয় ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের ব্যাস হচ্ছে এক ইঞ্চির প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি ভাগ। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, ইলেকট্রন যখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে, তখন তার প্রকৃতি ও ব্যবহার ঠিক আলোক-তরঙ্গের মত এবং তার গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও কমতে থাকে। সাধারণ বেগের ইলেকট্রন-তরঙ্গ এক্স্-রশ্মির দৈর্ঘ্যের সমপর্য্যায়ী হয়। এবং সবচেয়ে উৎসাহের কথা হলো এই যে, ইলেকট্রন-রশ্মিকে ফোকাস করবার মত বৈদ্যুতিক লেন্স উদ্ভাবন করা যেতে পারে। ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ হচ্ছে নেগেটিভ, সুতরাং পজিটিভ বিদ্যুৎ-বাহী প্লেটের সাহায্যে তাকে সহজেই আকৃষ্ট করা যেতে পারে এবং তার ফলে, একটু কৌশলের সাহায্যে তার গতিপথ বাঁকিয়ে নিয়ে এক জায়গায় ফোকাস করা মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। অঙ্কের সাহায্যে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ বিজ্ঞানী-মহলে প্রকাশ করেন সর্বপ্রথমে অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী বুশ্—তখন ১৯২৬ খৃস্টাব্দ।

১৯২৬ থেকে ১৯৪৮—কালের প্রবহমান স্রোতে বাইশ বছর আর কতটুকুই বা সময়! অণুবীক্ষণের কাজে আলোর বদলে ইলেকট্রনকে ব্যবহার করার যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বুশ, তা প্রথম পরিণতি লাভ করল ১৯৩২ খৃস্টাব্দে, যখন নোল্ এবং রুস্কা নামে দুইজন জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ তৈরী করে বিজ্ঞানী মহলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। তারপর দ্রুততালে চলল ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের জয়যাত্রা, নতুন রহস্যের আকর্ষণে প্রকৃতির হৃদয়কেন্দ্রে দুর্দম অভিযান—আজও সে যাত্রা শেষ হয়নি। গত দশ বৎসরে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তার বিশ্লেষণ শক্তির চরম সীমায় পৌছতে এখনও অনেক বাকি।

১৯৩৪ সালেই বেলজিয়ান বিজ্ঞানী মার্টন জীবাণু পরীক্ষার কাজে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ ব্যবহার করেন এবং তারপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞানীমহলে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ তৈরী ও নানাদিকে তার ব্যবহার সুরু হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আর, সি, এ কোম্পানী, ইংল্যাণ্ডে মেট্রোপলিটান ভিকার্স কোম্পানী এবং হল্যাণ্ডে ফিলিপ্স্ কোম্পানী ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ তৈরীর কাজে রত। ফিলিপ্স্ কোম্পানীর মাইক্রস্কোপটি সম্প্রতি বাজারে বেরিয়েছে এবং তার দাম অন্যূন এক লাখ টাকা। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ পৃথিবীতে আজও সস্তা নয়।

গত কয়েক বছরে অতি-আণুবীক্ষণিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় নানাস্থানে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ বসানো হয়েছে। ইংল্যাণ্ড লেণ্ড-লীজ চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাতটা ইলেকট্রন মাইক্র-স্কোপ আমদানী করেছে এবং নিজেরাও তৈরী করছে। সুখের বিষয় আমরা ও খুব পেছিয়ে নেই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ স্থাপন করা হয়েছে। ভারতবর্ষে এই প্রথম মাইক্রস্কোপ এবং নূতনত্বের দিক দিয়ে একে পৃথিবীতে অনন্য বলা চলে। এই মাইক্রস্কোপ তৈরীর খরচ ডাঃ বিমলা চরণ লাহা দিয়েছেন। তাঁর দানে ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডাঃ নীরজনাথ দাসগুপ্ত আমেরিকায়

গিয়ে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মার্টনের সহযোগিতায় মাইক্রস্কোপটির পরিকল্পনা করেন। এই যন্ত্রটির কিয়দংশ আমেরিকায় নির্মিত, বাকি সমস্তই সম্পূর্ণ করা হয়েছে এখানে—কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের কারখানায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এস্থলে দেওয়া হলো। ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

টাংস্টেন ধাতুর তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে তারটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং ইলেকট্রন নিক্ষেপ করতে থাকে। এই ইলেকট্রনগুলিকে এবার প্রচণ্ড বেগ দেওয়া হয় নিকটবর্তী একটি ছোট তড়িৎ-দ্বারে প্রায় ষাট হাজার ভোল্ট পজিটিভ বা ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করে। পজিটিভ তড়িৎ-দ্বার বা অ্যানোডের আকর্ষণে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক
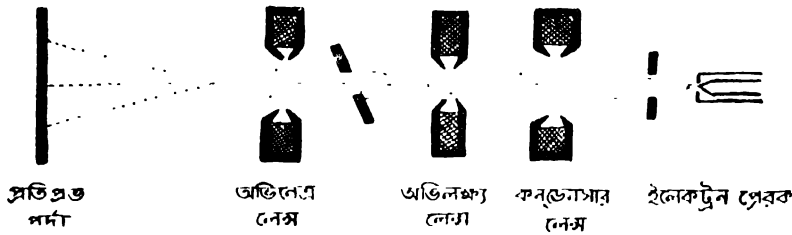
৪নং চিত্র
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের কার্যপ্রণালী রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে।

ইলেকট্রনগুলি তীব্রবেগে এসে পড়ে অ্যানোডের ওপর এবং অ্যানোডের মধ্যে একটি ছোট রন্ধ্রপথ দিয়ে তাদের একটি অংশ উল্কাবেগে মাইক্রস্কোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন তাদের বেগ সেকেণ্ডে ষাট হাজার মাইল।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপটি লম্বায় প্রায় ছয় ফুট এবং একটা দৃঢ় বেদীর উপর স্থাপিত। বাইরের কম্পন যাতে মাইক্রস্কোপকে বিচলিত না করতে পারে, সেজন্যে বেদীর চতুর্দিক ঘিরে দশ ফুট গভীর বালুকারাশির বেষ্টনী আছে। মাইক্রস্কোপের ভিতর থেকে পাম্পের সাহায্যে প্রায় সমস্ত বাতাস নিষ্কাশিত করে নেবার ব্যবস্থা রয়েছে। সব ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের এই একটি বিশেষ অসুবিধা—ইলেকট্রনের গতি অব্যাহত রাখবার জন্যে বায়ুশূন্য স্থান একান্ত প্রয়োজন। নইলে বাতাসের অণুগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইলেকট্রনগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। ফলে, কোন ইলেকট্রন-রশ্মির অস্তিত্ব থাকবে না এবং মাইক্রস্কোপের ভিতর বিদ্যুৎ-ক্ষরণ হতে থাকবে। ভাল ভাবে বাতাস পাম্প করে নেওয়া এ-জন্যেই প্রয়োজন।

এরপরেই আসে ইলেকট্রন-প্রেরকের কথা। চুলের কাঁটার মত দেখতে একটি ক্ষুদ্রকায়

ইলেকট্রন রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে দ্রষ্টব্য পদার্থের ওপর ফেলবার জন্যে একটি চৌম্বক লেন্স ব্যবহার করা হয়। লেন্স হিসেবে চৌম্বক লেন্স একটু উন্নতশ্রেণীর ও বেশী সুবিধাজনক। ইলেকট্রন-প্রেরকের পরই এই সমাহরণ বা কনডেনসার লেন্সের অবস্থান। প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত ইলেকট্রনগুলি সমাহরণ লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় চৌম্বক ক্ষেত্রের ফলে আবর্তিত হতে থাকে এবং লেন্স থেকে বেরিয়ে এসে সমাহৃত অবস্থায় আলোকিত করে তোলে পরীক্ষণীয় বস্তুটির একাংশকে। পদার্থের ঘনত্ব অনুযায়ী নিপতিত ইলেকট্রনগুলি চতুর্দিকে কমবেশী বিচ্ছুরিত হয়ে

যায় এবং বাকি রশ্মিটুকু প্রবেশ করে অভিলক্ষ্য লেন্সের মধ্যে। এই লেন্সের মধ্যে ঘূর্ণিপাক খেয়ে অবশেষে প্রথম প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে একটি প্রতিপ্রভ পর্দার উপর। প্রতিবিম্বটি তখন প্রায় একশ' গুণ বিবর্ধিত এবং আলোক-অণুবীক্ষণ অপেক্ষা প্রায় পঞ্চাশ গুণ বিশ্লিষ্ট। প্রতিপ্রভ পর্দায় ইলেট্রনের সংঘাত উজ্জ্বল সবুজাভ আলোর সৃষ্টি করে। একটি ছোট্ট জানালা দিয়ে প্রতিবিম্বকে তাইতে দেখা যায়। প্রথম প্রতিবিম্বের একাংশ পর্দার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে এবার তৃতীয় চৌম্বক লেন্স—অভিনেত্র লেন্সের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনগুলির আবার আবর্তন ও প্রায় একশ' গুণ বিবর্দ্ধন। দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ প্রতিবিম্ব পড়ে একটি খুব বড় প্রতিপ্রভ পর্দায় অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলে নেওয়া হয়।

তিনটি লেন্সের লৌহকক্ষাবদ্ধ বড় বড় তারের কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ হওয়া চাই—নিস্পন্দ ও স্থির। কারণ বিদ্যুৎ-প্রবাহের ওপরই নির্ভর করে লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব। এই দূরত্ব বিদ্যুৎ-প্রবাহের অস্থিরতার জন্যে যদি ক্রমাগত বদলাতে থাকে তবে প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে চঞ্চল ও আবছা।

এরপরই আসে মাইক্রস্কোপে পরীক্ষা করবার মত নমুনা তৈরীর কথা। সাধারণ অণুবীক্ষণে যে-সকল নমুনা ব্যবহৃত হয়, ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের ক্ষেত্রে তারা অচল। কারণ ইলেকট্রনের ভেদশক্তি অত্যন্ত পরিমিত, সুতরাং নমুনাগুলি এমন হওয়া চাই যে, ইলেকট্রনকে বিশেষ বাধা দেবে না। হিসেব করে দেখা যায়, তাদের ক্ষীণতা হওয়া চাই এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এ-হেন নমুনা তৈরী করতে নানাবিধ অভিনব পন্থা অবলম্বিত হয়। তার মধ্যে প্রধান হলো—জলের উপর কলোডিওন নামক পদার্থের একটি সূক্ষ্ম আবরণ ফেলে, বিশেষ ধারকে এঁটে তার ওপরে বীজাণুগুলিকে এক ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে শেষে শুকিয়ে নিয়ে মাইক্রস্কোপের ভিতরে পরীক্ষার্থে সন্নিবিষ্ট করা। কলোডিওন ব্যবহার করা হয় এজন্যে, যাতে নমুনাটি ধারকের সঙ্গে বেশ জোরে এঁটে বসে থাকে। ইলেকট্রন-রশ্মির প্রভাবে নমুনার নানা অংশের ঘনত্ব অনুযায়ী মাইক্রস্কোপের পর্দায় আলো, ছায়া দেখা যাবে। কারণ যেখানটা ঘন সেখান থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে বেশী, যেখানে কম সেখানকার চেয়ে। এই আলো-ছায়ায় রচিত প্রতিবিম্ব থেকে বস্তুটির আকার ও প্রকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়। অসুবিধা এই যে, ইলেকট্রনের সঙ্গে তীব্র সংঘাতের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই নমুনাটি নষ্ট হয়ে যায় এবং বায়ুশূন্য স্থানে পরীক্ষা চলতে থাকায়, কোন জীবন্ত প্রাণীর (জীবাণু) একটানা কার্যকলাপ লক্ষ্য করা অসম্ভব। তারা মরে যায়।

সাধারণত ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে কুড়ি হাজার থেকে এক লক্ষ গুণ বিবর্দ্ধন সম্ভব এবং এই যন্ত্রের বিশ্লেষণ শক্তি দেখা যায় প্রায় এক ইঞ্চির পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ আলোক-অণুবীক্ষণের চেয়ে প্রায় চল্লিশ গুণ। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম অণু-জগত দেখতে, অর্থাৎ এর চেয়ে আরো পঞ্চাশ গুণ বিশ্লেষণ শক্তি। তাতো পাওয়া গেল না—কিন্তু আজ পাওয়া গেল না বলে কোনদিনই যে পাওয়া যাবে না, এমন কোন কথা নেই। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের শৈশব আজো কাটেনি—বর্তমান চৌম্বক লেন্সের দুরপনেয় খুঁতগুলি তার বিশ্লেষণ শক্তিকে রেখেছে খর্ব করে। তা সত্ত্বেও ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিশ্লেষণ শক্তি এখনই যে অভূতপূর্ব সে কথা অবশ্য-স্বীকার্য। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, রসায়নে, ধাতুবিদ্যায় বহু জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে শুধুমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের চাক্ষুষ প্রমাণ থেকে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রথমেই জানা গেল 'ভাইরাস' নামে আমাদের আর একদল অদৃশ্য শত্রুর কথা। এরা সৃষ্টি করে সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের। ক্ষতি করে আলু, টোম্যাটো, তামাক প্রভৃতি ফসলের। অথচ সাধারণ মাইক্রস্কোপের অনুসন্ধানী-দৃষ্টি এড়িয়ে এরা আত্মগোপন করে থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের ধরা গেছে।

টাইফয়েড জ্বরে ব্যাক্টেরিয়োফাজের ব্যবহার ডাক্তারদের কাছে সুপ্রচলিত; কিন্তু ফাজ যে কি ভাবে কাযকরী হয়, তার সঠিক ধারণা করা ছিল বহুদিনের তর্কের বিষয়। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ফাজ কিভাবে টাইফয়েড বীজাণুকে আক্রমণ করবার পর তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অবশেষে তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়, তার সম্পূর্ণ ছবি তুলে সকল তর্কের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

এ রকম ভাবেই নানাবিধ পাউডার ও রঞ্জন-দ্রব্যের অনেক সঠিক ধারণা পাওয়া গেছে। যেমন, যে-সব প্রসাধনের পাউডার মাখলে মুখের সঙ্গে চমৎকার মিশে যায়, তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পাউডারের কণাগুলির ধারের দিকের গঠন ঠিক হুকের মত, সুতরাং তারা লোমকূপের মধ্যে এঁটে বসে। প্রজাপতি বা ঐ জাতীয় পোকার পাখনার কারুকার্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, এদের পিঠের ওপরে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি-আণুবীক্ষণিক দাগ, যার ফলে সাদা আলোক তরঙ্গের বিক্ষেপ ঘটে এবং সুন্দর সাত-রঙা বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি হয়। ধাতুর ত্বক পরীক্ষা, তুলা, সিমেন্ট প্রভৃতির গঠনপ্রণালী, ফোটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর আলোর এবং পরে ডেভেলপারের ক্রিয়া, নানাবিধ ভাইরাস ও জীবাণুর আকৃতি ও তাদের বিনাশ সাধনের উপায় অনুসন্ধান ইত্যাদি হচ্ছে গবেষণার কাজে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। দিনের পর দিন, নতুন দিকে নতুন রকম উপায়ে এই যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। প্রকৃতির রহস্য-লোকের বহু জটিল সমস্যা নিঃসংশয়ে সমাধান করার কাজে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ আজ অপরিহার্য বললেই চলে।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। অত্যন্ত সতর্কভাবে এই যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। এক একটা নিখুঁত মাইক্রোগ্রাফ তুলতে বহু আয়াসের প্রয়োজন। শুচিবায়ুগ্রস্তের মত সমস্ত ধূলি-মালিন্যের ছোঁয়াচ এড়িয়ে, সতর্কতার সঙ্গে নমুনাগুলিকে পরীক্ষার্থে তৈরী করতে হবে। সেই নমুনার নানারকমভাবে চিত্রগ্রহণ করে, চিত্রের চুলচেরা বিচার করে, নির্ভুল মাপজোক করবার পর কোন অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

আজকের ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ বিপুলকায় ও কতকাংশে মারাত্মকও বটে। বৈদ্যুতিক 'শক্' খেয়ে মৃত্যু ও এক্স্-রশ্মির হাত থেকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় কর্মীদের। বহুদিন আগে, আলোক-অণুবীক্ষণের শৈশবে, এক একটি আলোক-অণুবীক্ষণের দৈর্ঘ্যও হতো প্রায় ছয় ফুট। আজকের বহুগুণ শক্তিশালী অণুবীক্ষণের স্বল্পায়তনের সঙ্গে তার তুলনা করলে হাসি পাওয়া বিচিত্র নয়। সে-কথা ভাবলে, অনাগত ভবিষ্যতে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের আয়তন কোথায় দাঁড়াবে তা' আজকে বলা যায় না। তবে এ-কথা জোর করেই বলতে পারি যে, ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিশ্লেষণ শক্তির প্রভূত উন্নতি আমরা অদূর ভবিষ্যতেই দেখতে পাব।

এইখানে একটু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের যান্ত্রিক দোষ সমস্ত দূর হয়ে গিয়ে তার বিশ্লেষণ শক্তিকে সংহত করছে শুধু মাত্র ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। অণু-জগতের রহস্যের দ্বার তখন যাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ওজনে ভারি অণুগুলির আকৃতি দেখতে পাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু আমরা

যতদূর জানি, কোনো অণুই কখনো স্থির হয়ে বসে থাকে না, চিরন্তন চঞ্চলতায় তারা ইতস্তত ধাবমান। সুতরাং হাল্কা অণুদের দেখতে হলে তাদের চাঞ্চল্য দূর করে স্থিরভাবে বসাতে হবে। এই স্থিরভাবে বসানোই হবে প্রধান সমস্যা, কারণ তার চেয়েও হাল্কা ধারক চাই। আবার যদিও বা স্থির রাখা যায়, তাদের ওজন হাল্কা হওয়ায় ইলেকট্রনের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাতে তারা হয়ত স্থান চ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে—আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে ছিটকে পড়বে বাইরে। কাজেই অণু-জগতের রহস্য-লোকে হানা দেওয়া মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

•

আমাদের অদৃশ্য জগতের সন্ধানে ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ ছাড়া যে সমস্ত প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীরা আজ ব্যবহার করেন, নিম্নলিখিত ছকে তার আভাস পাওয়া যাবে।

পদার্থ	প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ (মাইক্রন = $\frac{1}{1000}$ মিলিমিটার) এ দেওয়া আছে	পৃথক বলে চেনবার জন্যে প্রয়োজনীয় বিবর্ধন	কিসের সাহায্য নিতে হয়
সাধারণ	...	১	চোখ
ঘড়ির কলকব্জা বা সোণার অলঙ্কার	২৫-১০০	৮	ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস
জলজ উদ্ভিদ	১০ ২৫	২০	অল্প শক্তির অণুবীক্ষণ
জীবাণু	১-২	২০০	শক্তিশালী অণুবীক্ষণ
জীবাণুর আকৃতি (Structuro)	০·২৫	৮০০	ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ বা অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ
বড় বড় ভাইরাস	০·১০	২০০০	ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ বা আলট্রাভ'য়োলেট অণুবীক্ষণ
কলয়েড (Colloid) কণিকা	০·০৫	৪০০০	ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ
ছোট ভাইরাস ও বৃহদাকার অণু	০·০১	২০,০০০	ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ বা আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ
ছোট অণু	০·০০২	১০০,০০০	ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ, রসায়ন ও একস্-রে
পরমাণু	০·০০০১	২,০০০,০০০	একস্-রে এবং আণবিক পদার্থ-বিদ্যার নানা প্রক্রিয়া।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

(আদিবাসী)

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বে এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলির সহিত বেদ্দা, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতির দৈহিক লক্ষণের কতকটা সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াও ভারতীয় উপজাতিগুলির পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী তাহাদিগকে প্রোটো-অষ্ট্র্যালয়েড নাম দিয়াছেন। এই প্রোটো অষ্ট্র্যালয়েড গোষ্ঠীকে বেদ্দা, অষ্ট্রেলিয়ান, নেগ্রিটো, ইন্দোনেশিয়ান ও মেলানেশিয়ান গোষ্ঠীগুলি হইতে ভিন্ন, স্বাধীন একটি মনুষ্যগোষ্ঠী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এখন দেখিতে হইবে, দক্ষিণ ভারতীয় এই প্রোটো-অষ্ট্র্যালয়েড গোষ্ঠীর সহিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের উপজাতিগুলির কিরূপ সম্পর্ক।

এই অঞ্চলকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা যাইতে পারে। (১) সাঁওতাল এলাকা :—এই এলাকার প্রধান অধিবাসী মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী সাঁওতাল। সাঁওতাল পরগণার বাহিরে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের এবং বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় ইহাদিগকে দেখা যায়। সৌন্তা ও করমানী সাঁওতাল গোষ্ঠীয়। সৌন্তাদিগকে মধ্যপ্রদেশে দেখা যায়। মাহিলীগণ এই গোষ্ঠীয়। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া ও মালের এই এলাকায় বাস করে। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার। (২) ছোটনাগপুর এলাকা :—হো, মুণ্ডা, ওরাওঁ এই এলাকার প্রধান অধিবাসী। ইহা ব্যতীত খারিয়া, করওয়া, চেরো, বিরহর, ভূইয়া, ভূমিজ, কোরা, অসুর, তুরী, বিরজিয়া প্রভৃতি উপজাতি এই এলাকায় বাস করে। ইহাদের মধ্যে ওরাওঁদিগের কুরুখ ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীয়, অন্যান্যের ভাষা মুণ্ডা গোষ্ঠীয়। হো দিগের প্রধান বাসভূমি সিংভূম জেলার কোলহানে। উড়িষ্যার কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ও ছোটনাগপুরের দেশীয় রাজ্য সেরাইকোলা ও খারসাওয়ানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডাগণকে ছোটনাগপুর ব্যতীত উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ও সাঁওতাল পরগণায় সামান্য সংখ্যায় দেখা যায়। ওরাওঁদিগের প্রধান বাসভূমি রাঁচি, লোহারডাঙ্গা ও পালামৌ। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, বিহারের চম্পারন, সাহাবাদ, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল এলাকাতেও ইহাদিগকে দেখা যায়। খারিয়াদিগকে এই এলাকার বাহিরে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে দেখা যায়। চেরো ও বিরহরদিগকে ছোটনাগপুর এলাকাতেই দেখা যায়। বিরজিয়া ও অসুরদিগকেও এই এলাকাতে দেখা যায়। করওয়াদিগকে এই এলাকার বাহিরে মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যে দেখা যায়। ভূমিজ, কোরা ও তুরীদিগকে এই এলাকার বাহিরে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ এলাকার প্রধান অধিবাসী গোন্দদিগকে রাঁচিতে দেখা যায়। (৩) উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য এলাকা :—এই এলাকার প্রধান উপজাতি খোন্দ, গোন্দ, শবর, জুয়াং, ভূইয়া প্রভৃতি।

ছোটনাগপুর এলাকার হো, মুণ্ডা, খারিয়া, ওরাওঁ, সাঁওতাল এলাকার সাঁওতালদিগকে এই এলাকায় বহু সংখ্যায় দেখা যায়। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিতে হো-র সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার, খোন্দের সংখ্যা প্রায় ৯৭ হাজার, শবরের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ, মুণ্ডার সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার। গোন্দদিগের প্রধান বাসভূমি মধ্যপ্রদেশ এলাকা। শবরদিগকে এই এলাকার বাহিরে—মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, রাজপুতানায় এবং অল্প সংখ্যায় যুক্তপ্রদেশে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই উপজাতির বিভিন্ন শাখা শোর, শাওরা, শাঁওর, শাহরিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে গোন্দ ও খোন্দদিগের ভাষা (গোন্দী ও কুই) দ্রাবিড় গোষ্ঠীয়, অন্যান্যের ভাষা মুণ্ডা গোষ্ঠীয়। (৪) মধ্যপ্রদেশ এলাকা :—প্রধান আদিবাসী উপজাতি গোন্দ। তাহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার। মারিয়া, মুরীয়া, বৈগা, পরজা, কয়া, ভাতরা, পরধান প্রভৃতি এই এলাকার অন্যান্য উপজাতি। ছোটনাগপুর এলাকার ওরাওঁ, খারিয়া, করওয়া, কোল বা মুণ্ডা প্রভৃতি এবং মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারত এলাকার ভীলদিগকে এই এলাকায় দেখা যায়। প্রায় ৭ হাজার সাঁওতালকে এই এলাকায় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ভাতরা, পরধান, পরজা, মারিয়া, মুরীয়া, ওরাওঁ, করকু এবং গোন্দদিগের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীয়। এই এলাকায় খারিয়া, করওয়া প্রভৃতি মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে। ভীল দিগের ভাষা আর্য গোষ্ঠীয়। (৫) মধ্যভারত এলাকা :—ভীল ও ভীল গোষ্ঠীয় ভীলালা, মীনা প্রভৃতি এই এলাকার প্রধান উপজাতি। মধ্যপ্রদেশের গোন্দ ও বৈগাদিগকে এবং কোল, করকু, শোর বা শৌরিয়া, ভূমিয়া, ভারিয়া প্রভৃতি উপজাতিকে এই এলাকায় দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা সামান্য। আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের প্রান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছি। গোন্দদিগকে ইন্দোর, ভূপাল এজেন্সী, বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডে দেখা যায়। করকুদিগকে ভূপাল ও ইন্দোরে এবং কোল, ভূমিয়া, বৈগা ও ভারিয়াদিগকে রেওয়া অঞ্চলে দেখা যায়। এই এলাকার ভীল গোষ্ঠী ও অন্যান্য উপজাতির অধিকাংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। (৬) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকা :—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে হায়দারাবাদ রাজ্যে মধ্যপ্রদেশের গোন্দ, করওয়া, কয়া, মধ্য ভারতের ভীল এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের গাদাবাদিগকে দেখা যায়। চেঞ্চুদিগকে এখানে ও মাদ্রাজের সীমানার মধ্যে দেখা যায়। মাদ্রাজের সীমানার মধ্যে চেঞ্চু ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের গোন্দ, খোন্দ, কয়া, পরজা, শাওরা বা শবরদিগকে দেখা যায়। খোন্দদিগের সহিত সম্পর্কিত কোন্দা ডোরাদিগকে মাদ্রাজের এলাকায় দেখা যায়। কুদিয়া উপজাতিকে কুর্গ ও মাদ্রাজের মধ্যে দেখা যায়। ইহার পরে আমরা দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতির অঞ্চলে প্রবেশ করি।

আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের কতকগুলি উপজাতিকে উপরে বর্ণিত ছয়টি এলাকার একাধিক এলাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসাবে সাঁওতাল এলাকায় সাঁওতাল, ছোটনাগপুর এলাকায় মুণ্ডা বা কোল, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য এলাকায় খোন্দ ও গোন্দ এবং মধ্যপ্রদেশ এলাকায় গোন্দ প্রধান অধিবাসী। মধ্যভারত ও দক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকায়—একদিকে এই তিনটি এলাকার বিভিন্ন উপজাতি ও অন্যদিকে পশ্চিম ভারত অঞ্চলের ভীল গোষ্ঠীকে উপস্থিত দেখা যায়।

প্রথম তিনটি এলাকার উপজাতিগুলিকে সাধারণতঃ মুণ্ডা গোষ্ঠী, ওরাও গোষ্ঠী এবং গোন্দ গোষ্ঠী—এই তিন ভাগ করা হয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা।

ওরাওঁ ও গোন্দ গোষ্ঠীর ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীয় বলা হয়। ওরাওঁ, তামিল ও ক্যানারী ভাষা এবং গোন্দ, তেলেগু ভাষার সম্পর্কিত। মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাগুলি প্রধানতঃ সাঁওতাল, ছোটনাগপুর ও উড়িয়্যার দেশীয় রাজ্য এলাকায় ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশ এলাকা ও অন্যান্য এলাকার কোল, করকু প্রভৃতি উপজাতির ভাষা, উড়িয়্যার দেশীয় রাজ্য, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের শবর ও গাদাবাদিগের ভাষা এই গোষ্ঠীর। সাঁওতাল এলাকার মালের, মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া প্রভৃতির ভাষা ওরাওঁ গোষ্ঠীর। মাল্টো এবং ওরাওঁদিগের ভাষা কুরুখ ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া বর্ণিত হইলেও ওরাওঁরা মুণ্ডা গোষ্ঠীর উপজাতি খারিয়া মুণ্ডা, কোল মুণ্ডা, ওরাওঁ মুণ্ডা, শবর মুণ্ডা প্রভৃতি মুণ্ডা উপজাতির শাখার নাম। গোন্দ গোষ্ঠীর ভাষা উড়িয়্যার দেশীয় রাজ্য এলাকা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকায় প্রচলিত। কয়া, মারীয়া, কুই, পরজি প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন শাখা।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আদিবাসী উপজাতিদিগের মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতিদিগকে নিম্নস্তরের অংশ বলিয়া গণনা করা হয়। বর্তমানে যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি সেই অঞ্চলের প্রধান উপজাতিদিগের কতক অংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়াছে। ফলে, কতকগুলি নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন করমানী হইতে কুর্মি, ওরাওঁ হইতে ধাঙ্গর, মুসাহর, গোন্দ হইতে ধালওয়ার, কামার, কাবার প্রভৃতি। এই সকল নূতন জাতি উপজাতীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দী বা উড়িয়া এবং সাঁওতাল এলাকায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। সিংভূমের কোলহান অঞ্চলে বাংলা, হিন্দী ও হো-ভাষা ব্যবহার করে এরূপ উপজাতীয় লোকের দেখা পাওয়া যায়। যাহারা নিজের ধর্ম মানিয়া চলে তাহাদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়া কর্মে বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইলেও অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত নামে হিন্দু দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের উপাস্যগণও পূজিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আদিবাসী উপজাতির দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গবেষণার বিশালক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

Sir Herbert Risley ছোটনাগপুর এলাকার বিরহর, ওরাওঁ, খারিয়া, মুণ্ডা, করওয়া, অসুর, সাঁওতাল এলাকার সাঁওতাল মালের, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাঁওতালদিগের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "—The Santals may be regarded as typical examples of the pure Dravidian stock." তাহাদের মস্তকের গঠন লম্বা (approaching the dolichocephalic), নাক চেপ্টা, প্রায় নিগ্রোদের মত এবং চুল অমসৃণ ও কুঞ্চিত। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, Risley-র দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীর প্রাক্-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। ডাঃ গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারত ও আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের সকল আদিবাসী উপজাতি এক গোষ্ঠীয়। এই গোষ্ঠীর নাম প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড এবং যাহারা মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা সাঁওতালী, খারওয়ারী, হো, করমানী, জুয়াং, খারিয়া, মুণ্ডারী, শবর, গাদাবা প্রভৃতি এবং কুরুখ, মাল্টো, গোন্দী, কুই, কয়া, পরজি প্রভৃতি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে এইরূপ প্রধান আদিবাসী অঞ্চলের সকল উপজাতি ও দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব আদিবাসী উপজাতি যাহারা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। মস্তকের গঠন, নাসিকা ও মুখের গঠন (Projection of the

face), চুলের প্রকৃতি, গায়ের রং ইত্যাদিতে দক্ষিণ ভারতের উপজাতি ও মধ্য ভারতের উপজাতিদিগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী এবং মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীদিগের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ পার্থক্য (বিশেষ করিয়া প্রথম দলের মধ্যে নাসিকার গঠনে) দেখা যায় তাহা অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল। এই অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি শুধু নেগ্রিটোর নাম করিয়াছেন। Erickstedt এর মতে এই দুই অঞ্চলের আদিবাসীর মূল গোষ্ঠী বেদ্দিদ। মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসী তাঁহার মতে বেদ্দিদ গোষ্ঠী, গোন্দ শাখাভুক্ত। Dixon এই অঞ্চলের আদিবাসীর মধ্যে প্রোটো-নিগ্রোয়েড, Hutton অস্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ এবং Haddon মোঙ্গলীয় লক্ষণের অস্তিত্ব দেখিতে পান। এই লক্ষণগুলি কি এবং কিভাবে উহা আসা সম্ভব হইতে পারে তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। নেগ্রিটো ও মোঙ্গলয়েড টাইপের গোলমুণ্ডের সহিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীর লম্বা মুণ্ডের সামঞ্জস্য সাধন করা কিভাবে সম্ভব তাহাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। হাদের অনুসরণ করিয়া একজন ভারতীয় পণ্ডিত এই অঞ্চলের আদিবাসীর মধ্যে প্যালিও মঙ্গোলয়েড লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব স্বীকার করা তিনি বাহুল্য মনে করিয়াছেন। Guiffrida Ruggeri এই অঞ্চলকে মুণ্ডা-কোল অঞ্চল নাম দিয়াছেন এবং তাঁহার মতে এই অঞ্চলের অদিবাসীরা বেদ্দা গোষ্ঠীয়। মুণ্ডা-কোল অঞ্চল এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল। আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর যাহাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহারা এই বেদ্দা গোষ্ঠীয় ও মুণ্ডা ভাষাভাষী আদিবাসী। আর্যগণ তাঁহাদের শত্রুদিগের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিরক্ষ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণের সহিত মিলে (Protomorphic equatorial characters), যথা—খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, চেপ্টা নাক।

Col. Sewell-এর মতের সমর্থন করিয়া Dr. Hutton বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের এই প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার নিজের মত এই যে, ভারতবর্ষের এই প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী পশ্চিম এশিয়া হইতে আসিয়া থাকিলেও এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক যে সকল লক্ষণ বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষেই সেগুলির উৎপত্তি বা বিকাশ হইয়াছে ("Its special features have been finally determined or permanently characterised in India itself.") ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ ও চেপ্টা নাক দেখা যায় তাহা এই গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা ও কালাত হইতে কাবেরী পর্যন্ত সর্বত্র, বিশেষতঃ সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে এই সংমিশ্রণ অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে। Giuffrida-Ruggeri র অভিমতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি রমাপ্রসাদ চন্দের মত গ্রহণ করিয়াছেন। যাস্কের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া চন্দ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে যে পঞ্চজনের উল্লেখ পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অর্থ চারি বর্ণ ও নিষাদ। শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে বেণ রাজার উরুদেশ হইতে নিষাদ জাতির উৎপত্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নিষাদগণ অরণ্য ও পর্বতে (বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ আছে) বাস করে। তাহারা খর্বকায় ও অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ। চন্দ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের নিষাদগণের বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে নিষাদগণকে দগ্ধ স্তম্ভের মত খর্বমুখ, অতিহ্রস্বকায় ও বিন্ধ্যশৈল নিবাসী বলা হইয়াছে

(১।১৬।৩৪-৩৬)। চন্দের মত এই যে, উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে বৈদিক আর্যগণ এই নিষাদদিগের সাক্ষাৎ পান; তাহারাই বৈদিক আর্যগণের অনার্য শত্রু। প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদদিগের যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিষাদগণ মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য-ভারতের গোন্দ ও ভীল; উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী উপজাতি ও অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের পানিয়ান, কাদির, শোলাগা, ইরুলা, মাল বেদার প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতিগুলির সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলি এক গোষ্ঠীর এবং আর্যগণ এই গোষ্ঠীর নাম দিয়াছেন নিষাদ। তাঁহার অভিমত এই যে, আর্য ভাষাভাষী ভীল গোষ্ঠী, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী গোন্দ, খোন্দ, ওরাওঁ প্রভৃতি ও দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলি এবং উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল এলাকার মুণ্ডা ভাষাভাষী উপজাতি-গুলি সকলেই, অর্থাৎ নিষাদ গোষ্ঠীর সকল শাখাই গোড়ায় মুণ্ডা ভাষা ব্যবহার করিত। ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নেগ্রিটো সংমিশ্রণ যাহাদের মধ্যে নাই, ভারত-বর্ষের সেই সকল আদিবাসী উপজাতিগুলিকে নিষাদ গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ("The term Nisadic should henceforth be used to designate the non-Negritoid Indian aborigenes). অর্থাৎ প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড-, প্রাক্ দ্রাবিড়ীয়, বেদ্দাইক প্রভৃতি নামের পরিবর্তে চন্দের ব্যাখ্যা মতে নিষাদ গোষ্ঠীর এই নাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। Hutton প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক দৈহিক লক্ষণের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এবং বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ানদিগের দৈহিক লক্ষণ হইতে দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতিগুলির দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরে ড: গুহের পরামর্শ সকলের গ্রহণ করা উচিত।

চন্দের মত এই যে, নিষাদ গোষ্ঠীর সকল শাখা গোড়ায় মুণ্ডা ভাষা ব্যবহার করিত। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদিগের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। এই ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কি বলেন সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। উত্তর পূর্ব সীমান্তের উপজাতিগুলির কথা বলিবার সময় এই প্রসঙ্গ পুনরায় উঠিবে।

মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। মুণ্ডা উপজাতির নাম হইতে এই সকল ভাষাকে মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা বলা হয়। মুণ্ডা ভাষা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর একটি শাখা এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার অন্যান্য শাখা (১) নিকোবর দ্বীপগুলির অধিবাসীদিগের ভাষা (২) আসামের খাশী ভাষা, (৩) উত্তর ব্রহ্মের স্যালউইন অববাহিকার পালং, ওয়া, রিয়াং প্রভৃতির ভাষা (৪) উপদ্বীপের শকাই ও সেমাংদিগের ভাষা এবং (৫) বহির্ভারতের মন-খ্মের (Mon-Khmer) ভাষা। এই সকল ভাষার কল্পিত মূলগোষ্ঠীর অষ্ট্রো-এশিয়াটিক নাম দিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানী Pater Schmidt। পণ্ডিত Sten Konow গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—পূর্ব হিমালয়ের যে সকল ভাষাকে তিব্বত ব্রহ্ম গোষ্ঠীয় বলা হয় তাহার কতকগুলির মধ্যে (Grierson-এর Pronominalised languages) মুণ্ডা ভাষার প্রভাবের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ বলা হইয়াছে যে, ভৌগলিক ব্যাপ্তি বিচার করিলে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার মত বিস্তার আর কোন ভাষার নাই। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে মাডাগাস্কার হইতে পূর্বে ইষ্টার দ্বীপ পর্যন্ত এই ভাষার বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে নহে প্রাগৈ-

তিহাসিক যুগের সুমেরীয় ভাষার সহিত মুণ্ডাভাষার সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা আমাদের পূর্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদিগের কল্পিত বিশাল দক্ষিণ মহাদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এরূপ বলা যাইতে পারে যে, Pater Schmidt এই অনুমানের পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ভাষা যখন ছিল তখন সেই ভাষা ব্যবহারকারী জাতিও ছিল এই যুক্তি লোকে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। অবশ্য কত গুলি কথার উপরে এই অর্ধ পৃথিবীব্যাপ্ত ভাষা দাঁড় করান হইয়াছে, সে বিচারের ভার তাহারা বিশেষজ্ঞদিগের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যাহা হউক, এইভাবে একটি অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলি, বৃহত্তর ভারতের কতকগুলি উপজাতি, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার এবং মাডাগাস্কার হইতে পূর্বদিকে প্রসারিত ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদিগের কল্পিত লুপ্ত যোজকের রেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলগুলির কৃষ্ণকায় অধিবাসী অষ্ট্রিক ভাষাভাষী। সম্ভবতঃ ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ অমিল বলিয়া দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন লম্বামুণ্ড, চেপ্টা নাক এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণকায় লাগোয়া স্যান্টা টাইপকে অষ্ট্রিক জাতির মধ্যে গণনা করা হয় নাই এবং আফ্রিকার প্রধান ভূভাগ বাদ পড়িয়াছে। (Haddon পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের প্রাচীন মনুষ্য গোষ্ঠীর সহিত লাগোয়া স্যান্টা টাইপের সম্পর্ক নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক।

পূর্বের একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ করিলে ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার ভূতাত্ত্বিক, পুনরায় ভাষা-তাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে কেন যে ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগকে এশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত কতকগুলি কৃষ্ণকায় মনুষ্য গোষ্ঠীর অঞ্চলের, বিশেষ করিয়া সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার সহিত যুক্ত করিবার উদ্যম দেখা যায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। Pater Schmidt-এর মত এখন প্রবল। ভারত-বর্ষের আদিবাসী নিষাদ গোষ্ঠী যে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের দিক দিয়া একটা পৃথক মনুষ্য গোষ্ঠী, কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া মুণ্ডা ভাষার একটি পৃথক গোষ্ঠীর ভাষা হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা নবীন এবং উপযুক্ত ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানী বলিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের নিষাদ গোষ্ঠী গোড়ায় বাহির হইতে আসিয়াছিল কিনা এবং আসিয়া থাকিলে কোন পথে আসিয়া-ছিল তাহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে এবং এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের আলোচনার ফলে এই তথ্য পাইতেছি যে, ভারত-বর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলি গোড়ায় এক গোষ্ঠীভুক্ত, এক ভাষাভাষী একটি জাতি ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ও খর্ব মুখ মনুষ্য গোষ্ঠীকে নিষাদ বলা হইয়াছে।

মিষ্টিক প্লাষ্টিক্‌স

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

দাদাকে শুধোলাম, "হরিশ বিলাত যেতে চায়, কেমিষ্ট্রি শিখতে। তা কি শেখা ভাল বলুন দেখি?" দাদা বললেন, "প্লাষ্টিক্‌স্।" আমি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলাম। দাদা বললেন, "সত্যি ঠাট্টা করছি নে। হরি হাই পলিমার্স শিখে আসতে না আসতেই হাজার টাকার গদিতে বসেছে।"

"সেটা আবার কি?"

"ঐ ত প্লাষ্টিক্‌স্।"

"তা' কোথায় শিখবে?"

"আমেরিকায়।"

"সে ত অনেক খরচ।"

"নইলে কুলীন হয় না।"

"কদিন লাগবে?"

"মাস তিনেক।"

"কি যে বলেন দাদা?" আমি হাসলাম।

দাদা বললেন, "আরে হাঁ, তিন মাস শিখলেই হাজার টাকা মাসে। এর বেশি শিখলে ত সরকার আর বেতন দিতেই পারবে না। যেমন মন্ত্রীরা মাইনে নেন না।"

"তাতো হলো। এখন জিনিসটা কি বলুন দেখি।"

"আমার বলার অধিকার কি বল! বিদেশ থেকে যাঁরা শিখে এসেছেন, তাঁদের কাছে যাও।"

দুয়ার ঠেলে একজন প্রবেশ করলেন। তাঁর পরণে পাৎলুন, তৎসহ লম্বা ঝুলের ফতুয়াগোছ হাতকাটা কোট, চকচকে গোলাপী রং তার। আমার দিকে চেয়ে দাদা বললেন, "এই এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম, ইনি প্লাষ্টিক্‌স্ বিশারদ। আমেরিকা গিয়েছিলেন।"

ভদ্রলোক বললেন "হোয়াড্ ইজ দ্যাট্।" যেন ফুটকড়াই চিবোলেন। বুঝলাম ইয়াঙ্কি বটেন।

দাদা বললেন, "ইনি তাঁর ভাইকে বিদেশে ট্রেনিং-এ পাঠাতে চান। তা' আমি বলছি প্লাষ্টিক্‌স্ সম্বন্ধে শিখে আসতে।"

"ইউ মিন হাই পলিমাড়।"

আমি সবিনয়ে ঘাড় নাড়লাম। তারপর তিনি যা' বললেন, অবশ্য ইয়াঙ্কি ভাষায়, তা' আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল। তার সারমর্ম নিবেদন করছি।

এখন বাজারে যেসব নানা রঙের স্বচ্ছ মনোহারী ছাতার বাঁট, ছাতার কাপড়, বর্ষাতি, ব্রাশ, গ্লাস, পেয়ালা, পিরিচ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে, এসবই প্লাষ্টিক্‌সে তৈরি। প্লাষ্টিক্‌স্ জিনিসটা যে কি, তা' সঠিক এক কথায় বলা যায় না। চেষ্টা করে বলতে হয়।

(১) প্লাষ্টিক গবেষণাগারে তৈরিকরা পদার্থ।

(২) রজন জাতীয় পদার্থ হলো এর আসল উপকরণ।

(৩) পদার্থটি তরল অবস্থায় কিংবা ময়দার তালের মতন করে তৈরী করা হয়, যাতে সহজে ছাঁচে ঢালা যায়।

(৪) তারপর ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়ে গেলে ছাঁচ থেকে তোলা হয়।

যদি প্রশ্ন করি, প্লাষ্টিক্‌স্ কয় প্রকার? উত্তরে একটি প্রলম্বিত তালিকা পেশ করতে হবে। ধৈর্য ধরে অবহিত হোন। প্লাষ্টিক্‌সের তিন পর্যায়। যথা—

(ক) রজন জাতীয় সংশ্লেষিত প্লাষ্টিক্‌স্।
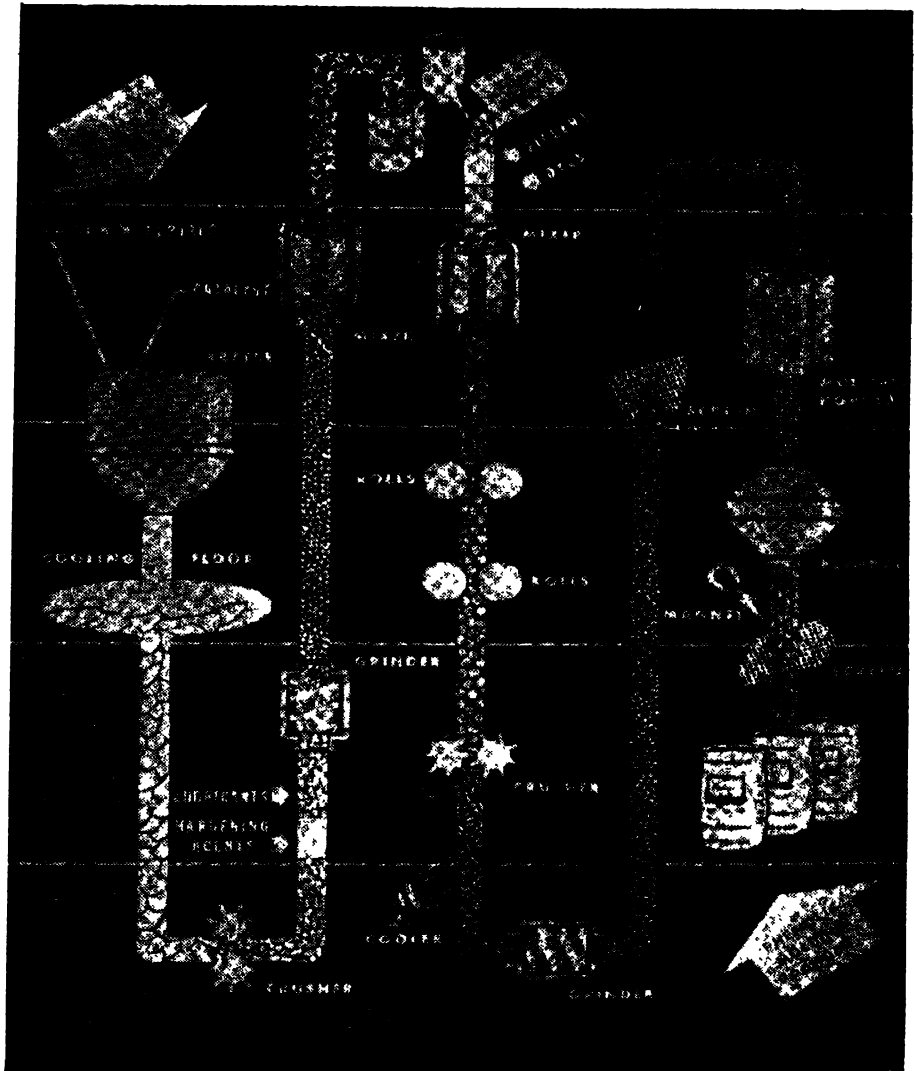
এই নক্সায় ফেনলিক মোল্ডিং পাউডার প্রস্তুত-প্রণালী দেখানো হয়েছে

এর আবার দশটি গোত্র। রসায়নের ভাষায় এদের গোত্র হলো,—(১) ফিনোলিয়, (২) ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইডিয় (৩) এক্রাইলিকিয় (৪) নাইলনিয় (৫) ভিনাইলিয় (৬) পলিষ্টাইরিনিয় (৭) এলাকিডিয় (৮) হাভেগিয় (৯) কুমারোন ইণ্ডিনিয় ও (১০) ফরফু্রাল-ফিনোলিয়।

(খ) তারপর সেলুলোজ প্লাষ্টিক্‌স্‌,—(১) সেলুলোজ এসিটেট (২) সেলুলোজ নাইট্রেট (৩) সেলুলোজ এসিটেট বিউটিরেট (৪) ইথাইল সেলুলোজ।

(গ) সর্বশেষে প্রোটিন প্লাষ্টিক্‌স্‌,—(১) ক্যাসিন বা ছানাজাতীয় (২) সয়াবীন (৩) জীয়িন বা ভুট্টা জাতীয়।

আরও কতকগুলি আছে। এঁরা হরিজন, পংক্তিবিহীন। এঁরা হলেন, বানাস, লিগনিন, মাইসালেক্স্ ও বিটুমিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "প্লাষ্টিক্স্ কোথা থেকে এল ?"

ভদ্রলোক বললেন, ইউ মিন হিষ্টিরী, আই এম নট ইন্টারেষ্টেড ইন ইট্।"

এই চিত্রে কাঁচামাল থেকে ছাঁচে ঢালবার উপযোগী ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড রেজিন প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার ক্রমিক পরিণতি দেখানো হয়েছে।

দাদা পরে বলেছিলেন, প্লাষ্টিক্সের ইতিবৃত্ত। ১৮৭১ সালে বেয়ার দেখেছিলেন যে, ফিনোল বা কারবলিক এসিড ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে একেবারে অপরিচিত এক পদার্থে পরিণত হলো। এর অনেক বছর পরে, ১৯০৯ সালে বেকল্যাণ্ড এই বিষয়ে পরীক্ষা চালান এবং রঞ্জন জাতীয় এক পদার্থ আবিষ্কার করেন, যা জনসমাজে বেকলাইট নামে পরিচিত। ১৯১০ সালে ফিনোলিয় রঞ্জন বা বেকলাইট প্রস্তুতের জন্যে কারখানা গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে এই নবজাত রং ভার্নিশ ইত্যাদি সরবরাহ হতে থাকে। ১৯২৭ সালে রঞ্জন সস্তায় উৎপন্ন করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এর আদিম উপাদান ফিনোল আর ফরম্যালডিহাইডও সস্তায় উৎপন্ন করার কথা ওঠে। যাক সে কথা। ফিনোলিয় রঞ্জন বা প্লাষ্টিক্সের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। যেমন ঘড়ির ঢাকনা, দরজার হাতল, ছুরি-কাঁটার বাঁট, ছাতার বাঁট ইত্যাদি।

১৯২৮ সালে নিক্তির ঢাকনায় সুদৃশ্য বাক্সের

জন্যে বড় বড় চাদর তৈরী করার কথা ওঠে। দেখা যায় যে, ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইডির প্লাষ্টিক্সের বেলায় চাপ দিয়ে বড় বড় চাদর তৈরী করা যায়। অবশ্য অনেকদিন আগেই ১৮৯৭ সালে রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে দেখা গিয়েছিল যে—ইউরিয়া, ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত হয়। তবে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া যে উত্তরকালে এক সুবৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করবে তা' অনুমান করা যায়নি। ইউরিয়া ঘটিত রঞ্জন কাচের মত স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। তাই যে কোন রং মিশিয়ে এই রঞ্জনকে বর্ণচ্ছটায় মনোহারী করে তোলা যায়। সুবিধা হলো যে, কাচের মত ইউরিয়া প্লাষ্টিক্স্ হলো স্বচ্ছ, আর কাচের চেয়ে হালকা, অথচ কাচের মত ঠুনকো
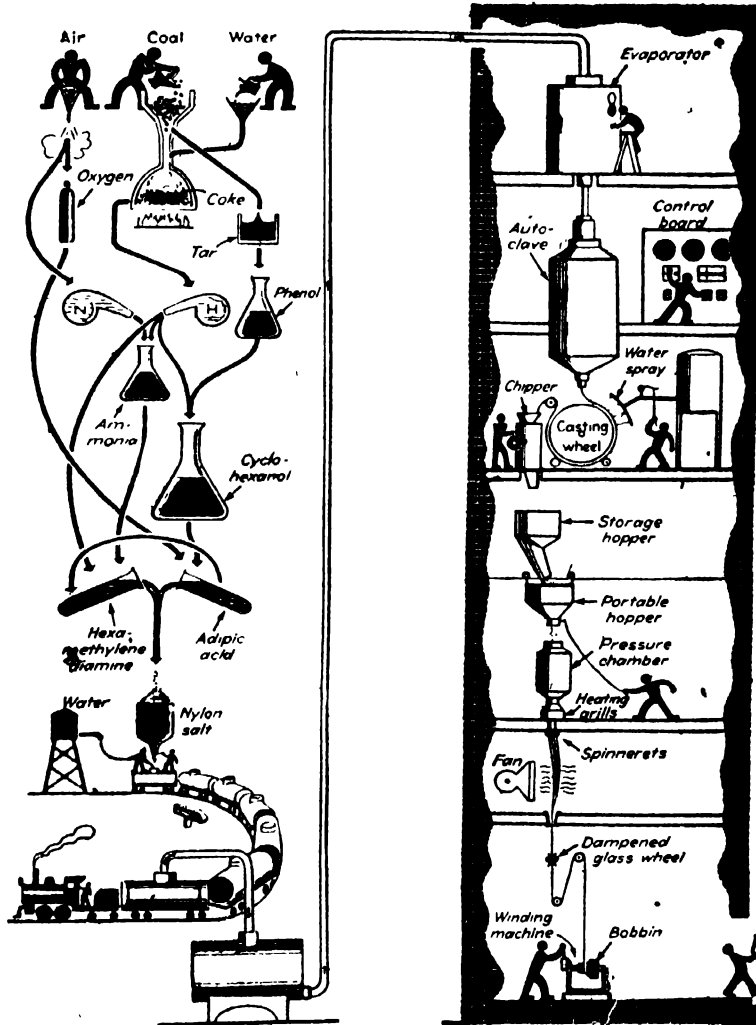
এই চিত্রে নাইলন-তন্তু প্রস্তুতের ক্রমিক প্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে।

নয়। যাকে বলে একেবারে বামুনের ঘরের গরু। এতে তৈরী হচ্ছে—বিমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘর বাড়ীর দরজা-জানলা, পেয়ালা-পিরিচ-রেকাবী তো বটেই। যত ব্যবহার হয়, যত বয়স বাড়ে তত এদের জলুস বাড়ে। তাই এদের চাহিদাও বাজারে বেড়ে চলেছে।

সব প্লাষ্টিক্সের আদি জন্ম বলতে গেলে জার্মেনীতে; প্রচার ও প্রসার হলো আমেরিকাতে। ১৯০১ সালে রোয়েম তৈরী করলেন এক্রাইলিক প্লাষ্টিক্স্। আর ১৯৩১ সালে পুটিং জাতীয় কাজে কাচের বন্ধনী হিসাবে এর ব্যবহার সুরু হলো আমেরিকায়। একে বলা হয় স্ফটিক স্বচ্ছ
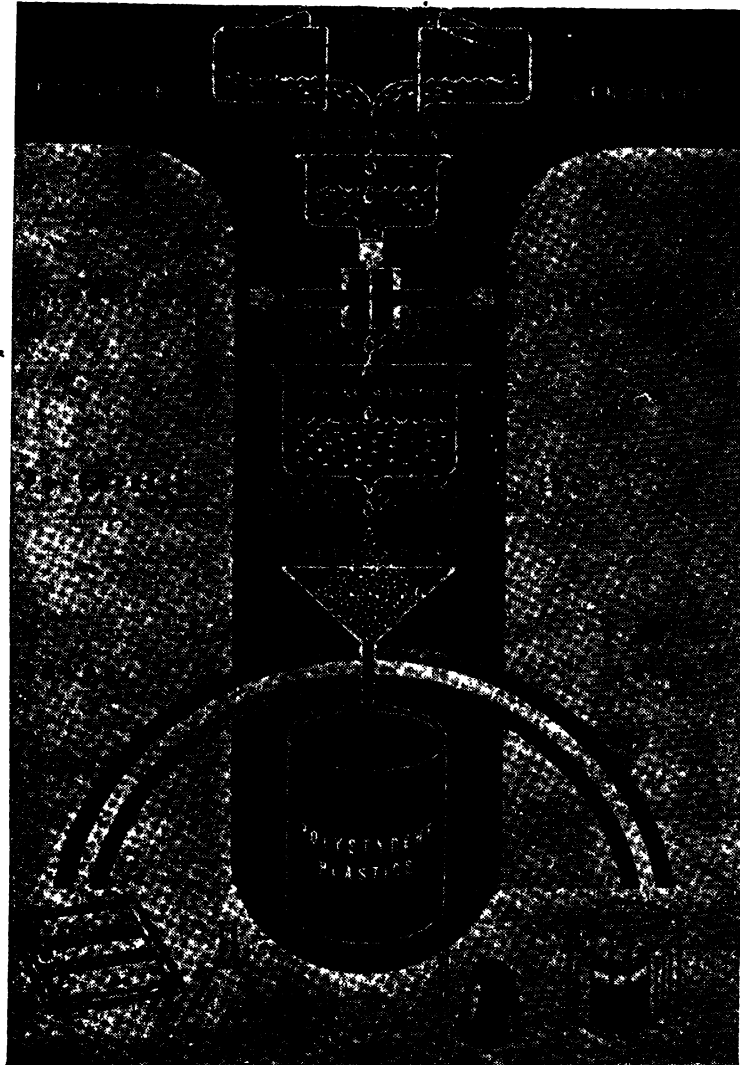
পলিষ্টিরিন মোল্ডিং পাউডার প্রস্তুতের ক্রমিক প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

প্লাষ্টিক্‌স। কাচ জোড়বার পক্ষে অদ্বিতীয়। কাচের পরিবর্তে এর ব্যবহারও প্রচলিত হয়েছে। চশমার ফ্রেম, জানলার কাচ, সূর্যকিরণ বাঁচানো চশমা—সব কিছুই করা চলছে। সার্সির কাচের পরিবর্তে ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। নাইলন বা কৃত্রিম রেশমজাতীয় তন্তু বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। নাইলন একজাতীয় প্লাষ্টিক্‌স্। ১৯৩৮ সালে এর প্রথম প্রচার হলো আমেরিকার ভবনে মহিলাদের মোজার তন্তুরূপে। জাতে এটি হলো খাঁটি আমেরিকান, জার্মান ছোঁয়াচ এর নেই। এখন ব্রাশের হাতল, এমন কি—ব্রাশের তন্তু পর্যন্ত, শুয়ারের লোমের পরিবর্তে এর সাহায্যে তৈরী হচ্ছে। হিন্দু বিধবারাও নিঃসংশয়ে শুচিতা রক্ষা করে নাইলনের ব্রাশে দাঁত মাজতে পারেন। নাইলনে কি না হয়,—হাতমোজা, প্যারাসুট, ছাতার কাপড়, হ্যাট, কোট, জুতা সবই। এমন কি, বললে বিশ্বাস করবেন না, মাছ ধরা মাজা সুতা ও টেনিশ র‍্যাকেটের তাঁতের পরিবর্তে আজকাল নাইলন ব্যবহার হচ্ছে।

আজকাল বাসে-ট্রামে মোটা পেটে স্বচ্ছ বেল্ট আঁটা দেখতে পাওয়া যায়। এই বেল্ট বা বন্ধনী ভিনাইল প্লাষ্টিক্‌সে তৈরী। একশ' বছর আগে ফরাসী বিজ্ঞানী রেনো এই পদার্থটি আবিষ্কার করেন। এর একটি গুণ হচ্ছে—রবারের মত এটি টানলে বাড়ে আর ছেড়ে দিলে ছোট হয়। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে রবারের বদলে এর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। ১৯২৭ সালে আমেরিকায় এটি পরিচিত হয়। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির পরকলা জোড়ার পক্ষে এই প্লাষ্টিক্‌সের ব্যবহার অনিন্দনীয় বলে যখন প্রকাশিত হলো তখন থেকে বিজ্ঞানীমহলে এর কদর বেড়ে গেল। ব্যবহার হতে থাকল—সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে, বিদ্যুৎবাহী তারের আবরণ হিসাবে, বর্ষাতি, ছাতা, কাচখণ্ডের বন্ধনীর জন্যে, চশমার ফ্রেমে।

আমি বললাম, "দাদা এত শিখেছেন, আপনি প্লাষ্টিক্‌সের অধ্যাপক হলেন না কেন?" দাদা হেসে বললেন, "আমি ত আমেরিকা যাইনি!"

"কি বলেন, ভায়াকে তা' হলে বলি আমেরিকা যেতে। কোথায় পড়বে?" দাদা বললেন, হারি ডি, গুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে। এইতো এতক্ষণ ছিল এখানে।

"ডি. গুপ্ত আবার কি? ম্যালেরিয়ার ওষুধ নাকি?"

"না হে, হরিধন গুপ্ত। উনি এখন ইয়াঙ্কি।"

ও, তাই বলুন! আপনি তো জানেন বঙ্গ-ইঙ্গর চাইতে বঙ্গ-ইয়াঙ্কের আতঙ্ক আমার ঢের বেশি।

দাদা আবার মুচকে হাসলেন।

মিসন বা মিসট্রন

শ্রীঅরুণকুমার সাহা

ইলেকট্রন নেগেটিভ বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা। ইহার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৪০ ভাগের এক ভাগ। প্রোটনের ভর প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। ইহার বিদ্যুৎভার ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী। ১৯৩২ সালে আমেরিকার অ্যাণ্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করেন। ইহাও ইলেকট্রনের সমপরিমাণ পজিটিভ তড়িৎযুক্ত, ভর ইলেকট্রনের সমান। ঐ বৎসরেই ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যাড্‌উইক পরমাণুর আর একটি মূল উপাদানের সন্ধান পাইলেন। এই বিদ্যুৎভারহীন উপাদান নিউট্রন নামে পরিচিত। ইহার ভর প্রায় প্রোটনের সমান।

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের এই অভিমত যে, সব পদার্থের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকের মূল উপাদান হইতেছে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন। হিলিয়াম কেন্দ্রে আছে ২টি নিউট্রন ও ২টি প্রোটন। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকে আছে ১৪৬টি নিউট্রন ও ৯২টি প্রোটন। এই কেন্দ্রকের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে কতকগুলি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। কেন্দ্রের পজিটিভ তড়িৎ ও বাহিরে বিক্ষিপ্ত সমস্ত ইলেকট্রনের নেগেটিভ তড়িৎ একই পরিমাণের। সমগ্র পরমাণু বিদ্যুৎভার-শূন্য।

রেডিয়াম বা ঐ জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে আল্‌ফা-রশ্মি নির্গত হয়। একটি আল্‌ফা-রশ্মিকণা একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক এবং ইহা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। কোন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রক হইতে বিটা রশ্মির উদ্ভব হয়। কেন্দ্রকের এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন অথবা পজিট্রন নির্গত হয়। কিন্তু কেন্দ্রক গঠিত হয় প্রোটন বা নিউট্রনের সমাবেশে। কেন্দ্রকে যদি ইলেকট্রন না থাকে তবে এই সকল রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উহার নির্গমই বা হয় কি প্রকারে? বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে কেন্দ্রকের মধ্যে নিশ্চয়ই ইহার উদ্ভব হয়।

প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। মনে করা যাইতে পারে যে, ইহারা একই বস্তুকণার দুইটি পৃথক রূপ। যখন এই জড়কণার বিদ্যুৎভার থাকে না তখন ইহা নিউট্রনের রূপ গ্রহণ করে। পজিটিভ তড়িৎ থাকিলে ইহা প্রোটন নামে পরিচিত হয়। বিজ্ঞানীরা এই জড়কণার এক নূতন নাম দিয়াছেন নিউক্লিয়ন। তড়িৎযুক্ত নিউক্লিয়নের নাম প্রোটন ও তড়িৎবিহীন নিউক্লিয়নকে নিউট্রন বলা যাইতে পারে।

যদি কেন্দ্রকে অবস্থিত কোন প্রোটন নিউট্রনে রূপান্তরিত হয় তবে উহার পজিটিভ বিদ্যুৎভার পজিট্রনের আকারে কেন্দ্রক হইতে নির্গত হয়। অন্যথায় যদি কোন নিউট্রন পজিটিভ তড়িৎ ধারণ করিয়া প্রোটনে পরিণত হয় তবে নেগেটিভ তড়িৎবাহী ইলেকট্রন কেন্দ্রক হইতে নির্গত হয়।

বিটা রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া এমন কয়েকটি বিষয় লক্ষিত হইয়াছে যাহার মীমাংসা করিতে গেলে নিউট্রিনো নামক বিদ্যুৎভারহীন কণিকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। নিউট্রিনোর ভর অতি সামান্য। ইহা তড়িৎবিহীন হওয়ায় পদার্থের মধ্য দিয়া বহুদূর অতিক্রম করিতে পারে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদ্বারা যদিও নিঃসন্দেহে এই কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রোটন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। নিউট্রনের বিদ্যুৎভার নাই। কিন্তু ইহারা কেন্দ্রকের অতি

অল্পপরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে কিসের বন্ধনে? এই বাঁধন খুবই দৃঢ়, নতুবা সমস্ত পরমাণু স্বতঃই রূপান্তরিত হইয়া যাইত এবং প্রত্যেক পদার্থের কেন্দ্রকই তেজস্ক্রিয় হইত। ঠিক কি ধরণের আকর্ষণে ইহারা (প্রোটন ও নিউট্রন) এইরূপ দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয় তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কেন্দ্রকের অংশের মধ্যে স্বতঃই শক্তির আদান-প্রদান চলিতেছে। কেন্দ্রকে অবস্থিত নিউট্রন হইতে ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো বাহির হইতেছে ও প্রোটন উহা গ্রহণ করিতেছে। এই প্রক্রিয়ায় নিউট্রন প্রোটনে ও প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হইতেছে। অথবা একটি প্রোটন হইতে নির্গত পজিট্রন ও নিউট্রিনোকে নিকটবর্তী নিউট্রন গ্রহণ করিতে পারে এবং এই প্রকারেও নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে বিদ্যুৎভারের বিনিময় হইতে পারে। উভয় কণাই বিদ্যুৎভার গ্রহণ করিতে চায়, কিন্তু দুইটি কণিকা একই কালে বিদ্যুৎবাহী হইতে পারে না। ফলে, এই দুই বস্তুকণার মধ্যে পজিট্রন বা ইলেকট্রনরূপে এই তড়িতের আদান-প্রদান হয়। এই প্রক্রিয়ায় শক্তির যে বিনিময় হয় উহাই নিউট্রন ও প্রোটনকে বাঁধিয়া রাখে।

দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রনের মধ্যে আকর্ষণও অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন উভয়েরই বিনিময় হয়।

যদি মনে করা হয় যে, এই প্রকার আদান-প্রদানে ইলেকট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি অংশ গ্রহণ করিতেছে তবে হিসাব করিয়া দেখা যায়, এই প্রকারে যে আকর্ষণী শক্তি হইবে উহা স্বল্প এবং কেন্দ্রককে বাঁধিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ১৯৩৫ সালে জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া ইলেকট্রনের সমপরিমাণ তড়িৎযুক্ত এমন এক পদার্থের কল্পনা করিলেন, যাহার ভর প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের মধ্যবর্তী। তিনি বলিলেন যে, এই কণিকার আদান-প্রদানই কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসকে অটুট রাখিবার শক্তি দিতেছে। এই কণিকা ক্ষীণজীবি, কেন্দ্রকের বাহিরে আসিলে ইহা স্বতঃই ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়।

১৯৩৬ সালে অ্যাণ্ডারসন কস্‌মিক-রশ্মি লইয়া অনুসন্ধান করিতে গিয়া এমন এক কণিকার সন্ধান পাইলেন যাহাকে ইউকাওয়া প্রবর্তিত কণিকা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই কণিকা মিসট্রন বা মিসন নামে পরিচিত হইল। ইহা ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় ২০০ গুণ ভারী এবং ইলেকট্রনের সমপরিমাণ পজিটিভ বা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত।

পৃথিবীর উপর বহির্ভাগ হইতে আগত পারমাণবিক কণা সকল নিয়তই বর্ষিত হইতেছে। ইহারাই কস্‌মিক-রশ্মি নামে খ্যাত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ বিজ্ঞানীরা আজ অবধিও পান নাই। তবে তাহারা এইরূপ ধারণা করেন যে, (যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর যে কণাগুলি বর্ষিত হয় তাহারা প্রোটন। ইহারা অতিশয় বেগবান ও ইহাদের শক্তি অসাধারণ। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে আসিয়া এই প্রোটন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি পরমাণুর কেন্দ্রকের অভ্যন্তরস্থ নিউট্রন বা প্রোটনের (নিউক্লিয়ন) সংস্পর্শে আসিয়া মিসন উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রোটন, নিউট্রনে অথবা নিউট্রন, প্রোটনে পরিণত হওয়ায় পজিটিভ অথবা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত মিসনের উদ্ভব হয়।

এই মিসট্রন ক্ষণস্থায়ী এবং কিছুকাল (এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ) পরে ইলেকট্রন, পজিট্রন বা নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়। কস্‌মিক-রশ্মির পরীক্ষামূলক গবেষণায় পৃথিবীর উপর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে সামান্য উর্ধে আমরা যে সকল কণিকার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি তাহারা প্রধানতঃ মিসট্রন, ইলেকট্রন ও পজিট্রন। দশ

প্রোটন
নিউট্রন
পজিট্রন
ইলেকট্রন
নিউট্রিনো
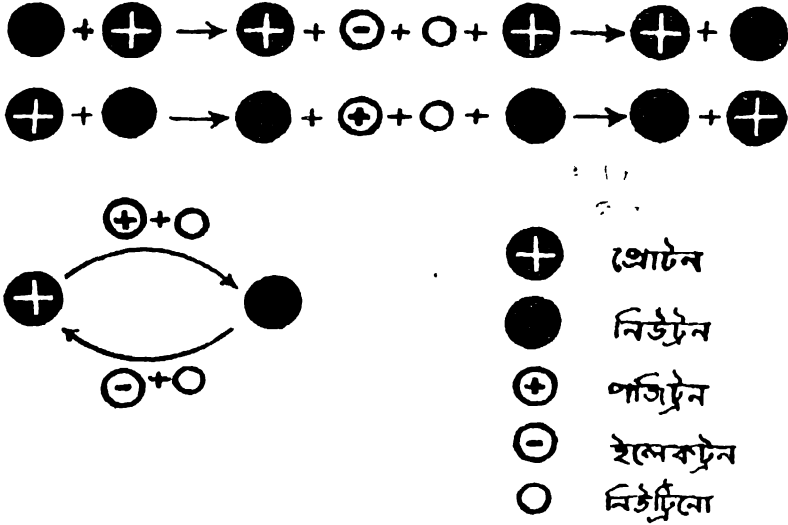
১নং চিত্র

সেণ্টিমিটার (সাড়ে চার ইঞ্চি) পুরু সীসা একমাত্র মিসট্রনই ভেদ করিতে পারে। কাজেই এই উপায়ে মিসনকে অন্যান্য কণিকা হইতে পৃথক করা যায়।

বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে মিসট্রনের রূপান্তরে ইলেকট্রনের উদ্ভব হয় কিনা—ইহা লইয়া পরীক্ষা চলিল। রাসেটী, রসি প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফল হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে—লৌহ, পিতল ইত্যাদিতে কেবলমাত্র (+) মিসনই পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়। নেগেটিভ মিসন হইতে নির্গত ইলেকট্রন লক্ষিত হয় না। কার্বন, বেরিলিয়াম ইত্যাদিতে সমস্ত মিসনই ইলেকট্রন বা পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়।

মিসন ও ইউকাওয়া প্রবর্তিত কণিকা যদি একই পদার্থ হয়, তবে কেন্দ্রককে বাঁধিয়া রাখে যে আকর্ষণী শক্তি, সেই বিপুল শক্তির দ্বারাই বহিরাগত মিসন কেন্দ্রকের দিকে আকৃষ্ট হইবে। অবশ্য কোন মিসন যদি কেন্দ্রকের সন্নিকটে উপস্থিত হইতে পারে তবেই এই শক্তি প্রযোজ্য হইবে। প্রতি কেন্দ্রকই পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। পজিটিভ মিসন সমধর্মী তড়িৎজনিত বিকর্ষণের ফলে কোন কেন্দ্রকের নিকটবর্তী হইতে পারে না। ইহা কেন্দ্রকে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ক্ষীণজীবি হওয়ায় যথাসময়ে রূপান্তরিত হইয়া পজিট্রন ও নিউট্রিনো উৎপন্ন করে। নেগেটিভ মিসন পজিটিভ কেন্দ্রকের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উহার সংস্পর্শে আসে। কেন্দ্রক এই মিসনকে গ্রহণ করে এবং ইহাতে কেন্দ্রকের এক রূপান্তর প্রক্রিয়ারও সৃষ্টি হইতে পারে।
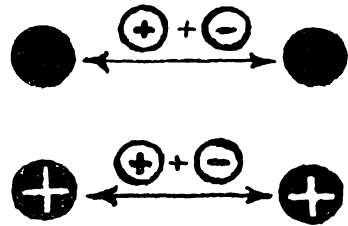
২নং চিত্র

কিন্তু কার্বন, বেরিলিয়াম প্রভৃতি কোন মিসনকেই গ্রহণ করে না। অতএব কেন্দ্রক ও মিসন পরস্পরের উপর যে শক্তি বিস্তার করে তাহা

খুব প্রবল নহে বিজ্ঞানীরা এক সমস্যায় পড়িলেন। ইউকাওয়া প্রবর্তিত মিসনের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মিসন কেন্দ্রকের নিকটবর্তী হইলে পরস্পরের উপর যে শক্তি প্রয়োগ করে তাহা স্বল্প। তবে কেন্দ্রককে বাঁধিয়া রাখিবার শক্তি সৃষ্টি হয় যে কণিকার আদান-প্রদানে তাহা কি মিসন নহে? কিন্তু বহিরাগত প্রোটন বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন কেন্দ্রকের সংস্পর্শে আসিয়া এত সহজে মিসন উৎপন্ন করে যে, বায়ুমণ্ডলের একেবারে উপরের স্তরেই প্রায় সমস্ত মিশনের উৎপাদন শেষ হইয়া যায়। অতি সহজেই যদি মিসন উৎপন্ন হয় তবে বিপরীত প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রকের মিসন গ্রহণের অনিচ্ছারই বা মীমাংসা হয় কি প্রকারে?

সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা আমরা যে সকল মিসনের পরিচয় পাই তাহারা এই মিসন হইতে রূপান্তরিত অপেক্ষাকৃত হাল্কা মিসন। ইহা আবার কিছুকাল (সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ) পরে ইলেকট্রন (বা পজিট্রন) ও নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়।

ফটোগ্রাফীর প্লেটের উপর যদি কোন বিদ্যুৎবাহী কণিকা নিপতিত হয় তবে উহার গতিপথ একটি সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা অঙ্কিত হয়। সমান বিদ্যুৎবাহী দুইটি কণিকার মধ্যে যেটি হাল্কা সেটি সূক্ষ্মতর রেখা অঙ্কিত করিবে। কস্‌মিক-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া এমন কয়েকটি ছবি মিলিল, যাহাতে দেখা গেল যে, ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় ৩০০ গুণ ভারী এক কণিকা হঠাৎ ২০০ গুণ ভারী মিসনে

মিসন

৩নং চিত্র

রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহারা উপরোক্ত ভারী ও হাল্কা মিসনরূপে পরিচিত হইল।
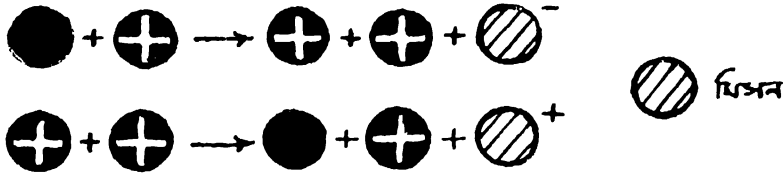
ইতিপূর্বে মোয়লার ও রোসেনফেল্ড এক নূতন মিসনবাদ প্রবর্তন করেন। হাইটলার প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী দেখাইলেন যে, এই প্রকার মিসনবাদ কস্‌মিক-রশ্মি সংক্রান্ত প্রায় সকল তথ্যেরই সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে পারে। এই মতবাদে দুই প্রকার মিসনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে প্রোটন হইতে এক প্রকার ভারী মিসনের উৎপত্তি হয়।

আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে মিসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের ভর ইলেকট্রনের প্রায় ৩০০ গুণ।

বর্তমানে আবার বিদ্যুৎভারহীন মিসনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইলেকট্রন হইতে প্রায় ১০০০ গুণ ভারী মিসনেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

বস্ত্র, সুতা ও তন্তুর পারস্পরিক গুণ-সম্বন্ধ

শ্রীকামাখ্যারঞ্জন সেন

প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্য অনেক হাজার গুণ বড় হওয়া সকল প্রকার বয়ন উপযোগী তন্তুরই প্রধান গুণ। এই গুণের জন্য সুতা প্রস্তুত করিতে, তন্তুতে পাক দেওয়া সহজসাধ্য হয়। যে কোনও সুতাকে উল্টা দিকে পাক দিলে তন্তুগুলি যখন পৃথক হইয়া যায় তখন দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট তন্তুর অধিকাংশই লম্বালম্বিভাবে একে অন্যের গা ঘেঁষিয়া রহিয়াছে। যদি সুতাটিকে কোনও অংশে আড়াআড়িভাবে কাটা যায়, তবে দেখা যায় যে, সুতার ঐ আড়ভূমি (cross-section) বহু তন্তুর সমাবেশে গঠিত। এইরূপ কোনও আড়ভূমিতে কত সংখ্যক তন্তুকে বর্তমান থাকিতে দেখা যাইবে, তাহা নির্ভর করে তন্তুর এবং সুতার ঐ অংশবিশেষের পরস্পরের সূক্ষ্মতার উপর। লম্বালম্বিভাবে থাকিলেও, তন্তুগুলি কিন্তু যে কোনও সুতায়ই, সুতার দৈর্ঘ্য বরাবর, পরস্পরের চেয়ে একটু সরিয়া সরিয়া থাকে (২ নং চিত্র)। অর্থাৎ কেবলমাত্র সমান দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ তন্তুর কতকগুলি আঁটি বাঁধিয়া, ঐ আঁটিগুলি সারি সারি, পর পর সাজাইয়া পাক দিলেই সুতা হয় না (১ নং চিত্র)। সুতা তৈরী তো দূরের কথা, তন্তুগুলিকে ঐ ভাবে সাজাইয়া পাক দিলেও আঁটিগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থাতে রাখা যাইবে না।
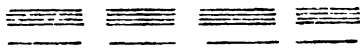
চিত্র নং-১
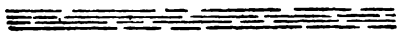
চিত্র নং-২

তন্তুগুলি সুতার যে কোনও অংশ হইতে কাটা আড়ভূমির সবগুলিতেই যে সমান সংখ্যায় বিরাজ করে, তাহা নহে; সে কথা আগেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কোনও আড়ভূমিতে বেশী পরিমাণে তন্তু থাকে, কোনওটাতে বা কম। এমন কোনও সুতার কল আজও তৈয়ারী হয় নাই যাহাদ্বারা সুতার সর্বত্র সমান সংখ্যক তন্তু ব্যবস্থিত করা সম্ভব; কিংবা যাহাদ্বারা সমস্ত তন্তুকে পরস্পরের সমান্তরাল ভাবে সুতায় নিহিত করা যায়। দ্বিতীয় কাযটি ভবিষ্যতে সম্ভব হইতেও পারে; প্রথমটি কিন্তু একেবারেই অসম্ভব। কারণ, পাজের ক্রমিক সূক্ষ্মতা সম্পাদন কালে, তৎকার্য সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক গুণবিশিষ্ট কোনও তন্তু কোথায়, কিভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহার উপর এই অসমতা নির্ভর করে। যন্ত্রান্তর্গত তন্তুর বিলিব্যবস্থায় গুণানুসারে উহাদের অবস্থান নির্দেশ করিবার ক্ষমতা 'পুরুষের ভাগ্যেরই' মতন "দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মানবাঃ"। ক্রমিক সূক্ষ্মতা সম্পাদন কালে কি ভাবে সুতায় অসমতার জন্ম হয় এবং সে বিষয়ে আঁশের বা তন্তুর কি প্রভাব, সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ("জ্ঞান ও বিজ্ঞান", আগষ্ট, ১৯৪৮, ৪৬৪ পৃঃ)। পাজের অন্তর্গত তন্তুসমূহের গুণাগুণ ছাড়াও যন্ত্রের অংশের সহিত তন্তুর ঘর্ষণজনিত যে স্থির-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার আকর্ষণে ও যন্ত্রের সহিত সংস্পৃষ্টকল্প তন্তুসমূহ শ্লথগতি হইয়া সুতার অসমতা উৎপাদনে সহায়তা করে। পূর্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অসমতার দরুণ সুতার ভারবহন ক্ষমতারও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

যেহেতু, সুতার ক্ষীণ অংশে তন্তুর সংখ্যা কম এবং স্থূল অংশে বেশী হইতে বাধ্য, সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে, পার্শ্ববর্তী যে কোনও স্থূল অংশ

হইতে ক্ষীণ অংশের ভারবহন ক্ষমতা কম হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আরও একটা বিষয় এখানে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কোনও সুতার এক সীমা স্থির রাখিয়া অপর সীমায় দৈর্ঘ্যাবলম্বী টান দিলে স্থূল অংশ হইতে পাক পার্শ্ববর্তী সূক্ষ্ম অংশে গমন করে। ফলে, সূক্ষ্ম অংশের ভারবহন ক্ষমতা বাড়ে এবং স্থূল অংশের ঐ ক্ষমতা আনুপাতিক ভাবে কমিয়া যায়। কাজেই, যদি সুতায় অবস্থিত অসমতা খুব তীব্র না হয়, তবে, কার্যতঃ, পরীক্ষাধীন অংশ-বিশেষে সুতার ভারবহন শক্তির কোনও উল্লেখযোগ্য তারতম্য হয় না। এবং অসমতা তীব্র হইলেও, সুতার ভারবহন ক্ষমতা সম্বন্ধে, আড়-ভূমিস্থিত তন্তুর সংখ্যার ভিত্তিতে যতটা হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়, প্রকৃতপক্ষে তার অপেক্ষা বেশী হয়।

সংখ্যা-বিজ্ঞানের ব্যবহারে জানা যায় যে, পরীক্ষার জন্য গৃহীত সুতার দৈর্ঘ্য বড় হইলে ভার-বহন ক্ষমতাও "লগারিদম্" নামক গণিতের একটি নিয়ম অনুযায়ী ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষণীয় দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ছোট হইলে, অন্যান্য আরও কতকগুলি কারণ বশতঃ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যতই বড় দৈর্ঘ্যের সুতা লইয়া পরীক্ষা করা যায় ততই নানাপ্রকার এবং অবিজ্ঞাতভাবে উৎপন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশের সংখ্যা পরীক্ষমান দৈর্ঘ্যের অভ্যন্তরে বৃদ্ধি পায়। ফলে, ঐ সুতার চরম সূক্ষ্ম অংশ, তদপেক্ষা ছোট দৈর্ঘ্যের একটি সুতায় সন্নিবিষ্ট ক্ষীণতম এবং দুর্বলতম অংশের অপেক্ষা সরু এবং অধিকতর দুর্বল হওয়ার সম্ভাব্যতা অধিক হয়। সেই কারণে সুতার ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভবনা বাড়ে। এই সম্ভাবনা বৃদ্ধির দরুণ একই সমান লম্বা বৃহত্তর পরীক্ষণীয় দৈর্ঘ্যের অনেক সংখ্যক সুত্রাংশের পরীক্ষালব্ধ গড়পড়তা ভারবহন ক্ষমতা কমিয়া যায়। কারণ, ভারবহন শক্তিদ্বারা সুতার মধ্যস্থিত চরম দুর্বলতাবিশিষ্ট অংশের শক্তি বুঝায়। যেমন, কোনও শিকলের দুর্বলতম আংটিই ঐ শিকলের শক্তি নির্ধারিত করে।

অতএব দেখা গেল যে, সুতার শক্তি নির্ধারণ করিতে শুধু মাত্র তন্তুর শক্তিই যথেষ্ট নয়, সুতার গঠন-বিশেষত্বও অতিমাত্রায় কার্যকরী পাক দেওয়ায় সুতার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কারণ, তন্তুসমূহ একে অন্যের সহিত ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত হওয়ায় তাহাদের চলার পথে পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ জনিত বাধা প্রবল হয়, এবং তন্তুসমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ হয়। পাক অবশ্য অনির্দিষ্টভাবে বাড়ান চলেনা; তাহাতে উপরিভাগের তন্তুগুলি অতিমাত্রায় প্রসারিত ও অন্তরস্থিত তন্তুগুলি অতিমাত্রায় মোচড়ান অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সুতার স্থিতিস্থাপকতাঘটিত পরিবর্তনের জন্য উহা সহজে বিভাজ্য হয়। কোনও বয়নক্ষম বস্তুর তন্তু প্রস্থের তুলনায় যত দীর্ঘ হয়, তত অধিকতর পাক দেওয়া সম্ভবপর হয়। আবার, সুতা যত সরু হয়, উহার পাক সহন ক্ষমতাও তত বাড়ে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সুতার শক্তি নির্ধারণে পাকের এবং তন্তুসমষ্টির শক্তির প্রভাব ছাড়াও তন্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘর্ষণজাত বাধা সৃষ্টির ক্ষমতার বিশেষ দায়িত্ব আছে। তন্তুর দৈর্ঘ্য যেমন এক দিকে পাক সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অপর দিকে ঘর্ষণজাত বাধার পরিমাণও বাড়ায়। প্রস্থ বৃদ্ধির ফলেও একদিকে যেমন সুতার উপযুক্ত পরিমাণ পাক দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, তেমনই অপরতঃ, কোনও নির্দিষ্ট সূক্ষ্মতাবিশিষ্ট সুতার আড়-ভূমিস্থিত তন্তুর সংখ্যাও স্বল্পতর হয়। ফলে সুতার শক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়।

সাধারণতঃ, সকল প্রকার সুতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পাক ইত্যাদি জনিত যে শক্তি বৃদ্ধি হয়, সুতার অসমতা প্রযুক্ত শক্তি হ্রাসের

তুলনায় তাহা অনেক কম। মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, কোনও সুতার ভারবহন ক্ষমতা ঠিক ততটুকু, কোনও গড় আড়-ভূমিতে সংশ্লিষ্ট তন্তুর মোট শক্তির যতটুকু পরিমাণ ঐ সুতার গঠন-বিশেষত্বজনিত হ্রস্বতা লাভের পরও অবশিষ্ট থাকে। সুতার গুণাগুণ, তন্তুর গুণাগুণের সহিত এইরূপ ভাবেই সম্বন্ধযুক্ত। এইবার বস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

যদি আমরা সাধারণ টানা-পোড়েন বিশিষ্ট বস্ত্র পরীক্ষা করি তবে দেখতে পাই যে, একই প্রকার সুতার ব্যবহার সত্ত্বেও টানা-পোড়েন যত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, বস্ত্র তত অধিক ভারবহন-ক্ষম, কিন্তু অনমনীয় হয়। টানা এবং পোড়েন, উভয় প্রকারে অবস্থিত সুতার অসমতা নিবন্ধন বস্ত্রের অসমতা বহুগুণ বর্ধিত হয়। ইহা সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী। বস্ত্রের এই প্রকার তীব্রতর ও বিস্তৃত অসমতা হেতু উহার ভার-বহন ক্ষমতা, বস্ত্রের ভূমির এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে বিভিন্ন হয়। টানার অনুলম্বী বলপ্রয়োগে, টানার সুতার সমবেত শক্তিকে পোড়েনের সুতাসমূহের চাপ ও ঘর্ষণে যথাবিহিত ভাবে পরিবর্তিত করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই মাত্র বস্ত্রের শক্তির পরিমাপ হয়। পোড়েনের অনুলম্বী বল প্রয়োগেও টানার সুতা সমভাবে ক্রিয়াশীল হয়। এক সঙ্গে টানা, পোড়েন, উভয় প্রকার সুতার ব্যবস্থাসম্ভূত মোট শক্তি বস্ত্রের বিদারণ (Bursting) শক্তি দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। সুতরাং বস্ত্রের ভারবহন বা বিদারণ শক্তি জানিতে হইলে টানা এবং পোড়েনের কার্যকরী অংশে বর্তমান সুতার সমবেত শক্তিকে, বস্ত্রের গঠন ব্যবস্থা এবং উভয় প্রকার সুতার অসমতা হইতে সঞ্জাত পরিবর্তন ইত্যাদির হিসাব করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। শুধু ভারবহন ক্ষমতা নয়, বস্ত্রের নমনীয়তা, স্থিতি-স্থাপকতা ইত্যাদি সব বিষয়েই টানা এবং পোড়েনের সুতা তদীয় এবং বস্ত্রের গঠন-প্রকৃতির সহিত একযোগে আপন আপন অংশের অভিনয় কায সম্পাদন করে। বিভিন্ন জাতীয় তন্তু দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রের নমনীয়তা কি প্রকারে বিশিষ্ট পথে গঠন-অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহা পাট মিশ্র তুলা, পাট ও ইউরেণা লোবাটা হইতে প্রস্তুত
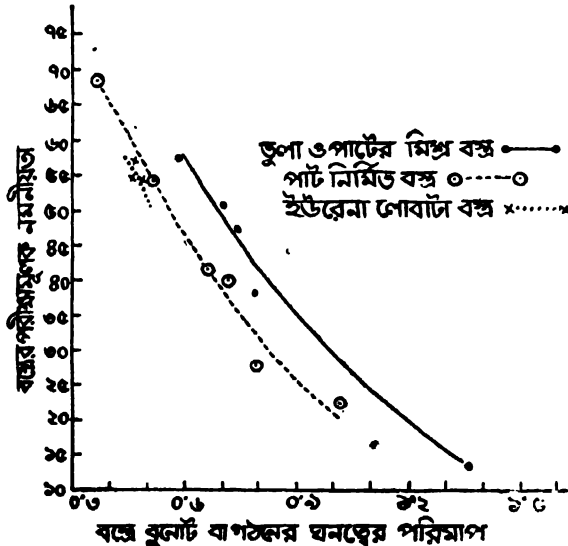
চিত্র নং ৩

ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের নমনীয়তার গতি-নির্ধারক রেখা দ্বারা ৩নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

সুতরাং, ইহা বোঝা সহজ যে, সুতার এবং বস্ত্রের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তন্তুর গুণাগুণ দ্বারা ঐ সব বস্তুর গঠন-প্রকৃতিজনিত অবস্থাগুলি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ সুতা ও বস্ত্রের গুণাগুণ মূলতঃ তন্তুর গুণাগুণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কাজেই তন্তুর কোন কোনও বিশিষ্ট গুণ, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারে। তন্তুর এইরূপ মৌলিক গুণ কি, তাহা জানিতে হইলে এইবার আমাদিগকে পিছন দিকে পদচারণা করিতে হবে। অর্থাৎ, বস্ত্রের প্রয়োজনীয় গুণ হইতে আমরা মূল তন্তুর গুণের হদিশ পাইতে চেষ্টা করিব।

সবাই জানেন যে, ব্যবহার উপযোগী বস্ত্র ক্রয়কালে প্রধানতঃ আমরা চাই যে, উহা টেকসই, মসৃণ এবং দৈর্ঘ্য, আয়তন ও পাক সববিষয়ে স্থিতিস্থাপক হয়। কাজেই, (১) উপযুক্ত ভার-বহন ক্ষমতা, (২) ঘর্ষণ জনিত তন্তুর আপেক্ষিক স্থানচ্যুতিতে বাধা, (৩) বল প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে দৈর্ঘ্যের বিস্তার সম্ভাবনা, আয়তনের প্রসার ও পাক দেওয়ার ক্ষমতা, এবং (৪) বল অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবার শক্তি—এগুলিই বস্ত্রের মৌলিক গুণ। ভাল বস্ত্র উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত তন্তুরও সেই হেতু এই কয়েকটি বিষয়ে উপযুক্ত গুণ থাকা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যথা—যথেষ্ট ভারবহন ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা উৎপতনশীলতা (resilience) এবং পরিমাণসিদ্ধভাবে ঘর্ষণাত্মক বাধা সৃষ্টির ক্ষমতা। সাধারণ ব্যবহারের উপযুক্ত বস্ত্রের জন্য প্রত্যক্ষভাবে শুধু এই কয়টি গুণেরই সর্বাধিক প্রয়োজন হইলেও বস্ত্রের গঠনে যে সুতা ব্যবহৃত হয় সেই সুতাকে উপযুক্ত গুণের অধিকারী-রূপে তৈয়ারী করিতে তন্তুর সুবিধাজনক প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য থাকাও প্রয়োজন।

কলে সুতা তৈরী করিতে অর্ধ ইঞ্চির অপেক্ষা ছোট তন্তু অব্যবহার্য, যদিও চরকায় ঐ রূপ ক্ষুদ্র তন্তুও ব্যবহার করা যায়। দীর্ঘতন্তু বিশিষ্ট বয়নবস্তুর আঁশ ৬ ইঞ্চি হইতে বৃহত্তর হইলে উহা কলে ছিঁড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে; অথবা উহাতে ভাঁজ পড়িয়া ব্যবহারিক ভাবে উহার দৈর্ঘ্য কমিয়া যায় এবং তদবস্থায় ঘর্ষণজাত বাধাসৃষ্টির প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। ভাল সুতা তৈরী করিতে, কাজেকাজেই, বস্তু ও যন্ত্রের আপেক্ষিকভাবে উপযুক্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তন্তুরও প্রয়োজন।

তুলা, আকন্দ ইত্যাদি তন্তুকে "ক্ষুদ্র-তন্তু" বলা হয়। কারণ, ইহাদের আঁশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২ ইঞ্চির বেশী নয়। যে-সব বয়নবস্তুর আঁশ বা তন্তু ২ ইঞ্চির অপেক্ষা অনেক বড়, সে সব বস্তুকে "দীর্ঘ-তন্তু" বলা যায়। পাট, তিসি, শণ, বিছুটি, চীনাঘাস, চুকই, ভাঙ ইত্যাদির তন্তু সবই দীর্ঘ-তন্তুর শ্রেণীভুক্ত। পশমের ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ উভয় প্রকার তন্তুই হইতে পারে। পুনর্জনিত (Re-generated) বা মনুষ্য-নির্মিত তন্তু প্রায় সবই দীর্ঘ-তন্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় কোন কোনও তন্তুকে তুলার কলে চালাইবার জন্য কাটিয়া প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমিত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট "স্ট্যাপল্" তন্তু তৈয়ারী হয়। উহা "ক্ষুদ্র তন্তু"।

দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, ভারবহন ক্ষমতা ইত্যাদি ছাড়া আরও কয়েকটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বয়নতন্তুর পক্ষে অপরিহার্য। বায়ু-বাহিত জলীয় বাষ্পের আদান-প্রদান ঐরূপ একটি প্রয়োজনীয় গুণ। কারণ কতটা জলীয় বাষ্প, বিবেচনাধীন কালে, কোনও তন্তু কোনও বিশেষ মুহূর্তে ধারণ করিতেছে, তাহার উপর ঐ তন্তুতে প্রযুক্ত বহিঃস্থ বলদ্বারা তদ্দেহে উৎপাদিত অবস্থা নির্ভর করে। আবার বয়নতন্তুকে ব্যবহারোপযোগী বস্তুতে পরিণত করিতে প্রায়ই রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। যথা—রং লাগান,

মার্সারাইজ করা, ক্রেপ করা, ভাঁজ-প্রবণতা অপসারিত করা ইত্যাদি। রাসায়নিক কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, রাসায়নিক পদার্থকে তন্তুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবেই। এবং তন্তুর গঠন-ব্যবস্থা এই প্রবেশ কতটা ব্যাহত করিতে পারে, তাহার উপরও রাসায়নিক পদার্থের কার্যকারিতা নির্ভর করিবে। সেইজন্য তন্তুর আপাতঃ ও প্রকৃত ঘনত্ব, তন্তুদেহে স্ফটিকত্বের পরিমাণ, তন্তুমধ্যে নানাদিকে প্রসার কালে আলোক রশ্মির প্রতিভঙ্গের (refraction) বিভিন্নতা ইত্যাদির নির্ণয়ও প্রয়োজন।

একটি তন্তুর অভ্যন্তরে কি পরিমাণ বায়ুগর্ভ রন্ধ্রায়তন বিদ্যমান, তাহা জানিতে হইলে তন্তুর আপাতঃ এবং প্রকৃত, এই উভয় প্রকার ঘনত্বই জানা প্রয়োজন। যদি ঘ তন্তুর আপাতঃ ঘনত্ব বুঝায় এবং $ঘ_0$ তন্তুর প্রকৃত ঘনত্ব নির্দেশ করে তাহা হইলে তন্তুর অভ্যন্তরস্থ বায়ুর সাধারণ চাপ ও তাপমান ধরিয়া লইয়া বায়ুর ঘনত্ব যদি ন হয়, তন্তুর মধ্যে বর্তমান বায়ুগর্ভ রন্ধ্রায়তনের শতকরা পরিমাণ সহজেই $\left\{১০০ \times \frac{ঘ-ঘ_0}{ঘ_0-ন}\right\}$ বলিয়া দেখান যায়। ইহা সিদ্ধান্ত করিতে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র তন্তুটির বস্তুমাত্রা, যাহা দৈর্ঘ্য দ্বারা গুণিত একক দৈর্ঘ্যের বস্তুমাত্রার সমান, যেমন একদিকে আপাতঃ ঘনত্ব দ্বারা আপাতঃ আয়তনকে গুণ করিলে লব্ধ গুণফলের সমান হয় (আপাতঃ আয়তন = দৈর্ঘ্য × আপাতঃ আড়ভূমি), তেমনি আবার অপরদিকে প্রকৃত আয়তন (= দৈর্ঘ্য × প্রকৃত আড়ভূমি) এবং প্রকৃত ঘনত্বের গুণফলের সহিত বায়ুগর্ভরন্ধ্র সমূহের মোট আয়তন (= আপাতঃ আয়তন হইতে প্রকৃত আয়তন বাদ দিয়া লব্ধ বিয়োগ ফল) এবং বায়ুর ঘনত্বের গুণফল যোগ করিলেও উহা পাওয়া যায়।

উপরের এই আলোচনা হইতে সম্যক প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনে ব্যবহারের উপযোগী বয়নতন্তুতে নিম্নোক্ত মূলগত পদার্থগুণ সমূহ বিদ্যমান থাকা দরকার।

ব্যবহারিক প্রয়োজন	তন্তুর প্রয়োজনীয় পদার্থ-বৈশিষ্ট্য
১। বয়নোপযোগিতা ; সুতার সমতা ও শক্তি	দৈর্ঘ্য
২। সুতার শক্তি ও সূক্ষ্মত্ব	সূক্ষ্মতা
৩। সুতা বা বস্ত্রের স্থায়িত্ব	ভারবহন ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা
৪। সুতা বা বস্ত্রের নমনীয়তা এবং বলপ্রয়োগে প্রসারিত দৈর্ঘ্যের বলাপসারণের সমসাময়িকভাবে প্রসার হইতে মুক্তির সামর্থ্য	দৈর্ঘ্যাবলম্বী স্থিতিস্থাপকতা
৫। মোচড়ান অবস্থা হইতে সুতা বা বস্ত্রের মুক্তির সামর্থ্য ; সুতা তৈয়ারীতে প্রযুক্ত পাকের স্থায়িত্ব	মোচড় বিষয়ক স্থিতিস্থাপকতা
৬। হাতের মুঠায় সুতা বা বস্ত্র চাপিয়া পরে মুঠা ঢিলা করিলে, হাতের বস্তুদ্বারা মুঠা পরিপূর্ণ হওয়ার অনুভূতি ; ব্যবহারান্তেও বস্ত্রের খাড়াভাবে ঝুলিবার ক্ষমতা (fall of garments)	আয়তন বিষয়ক স্থিতিস্থাপকতা
৭। ব্যবহারান্তেও বস্ত্রের আয়তনের অপরিবর্তনীয়তা	শ্লথগতিবিশিষ্ট স্থিতিস্থাপকতা (delayed elasticity বা creep).

ব্যবহারিক প্রয়োজন	তন্তুর প্রয়োজনীয় পদার্থ-বৈশিষ্ট্য
৮। বস্ত্র পরিধানকালে আরামদায়ক কোমলতার অনুভূতি ; এবং সুতার সমতা	ঘর্ষণ জনিত পরস্পরাপেক্ষিক গতির প্রতিরোধ শক্তি
৯। সুতা বা বস্ত্র কর্তৃক বায়ু-বাহিত জলীয় বাষ্প এবং রং শোষণ ক্ষমতা	আপাতঃ ও প্রকৃত ঘনত্ব
১০। সুতা বা বস্ত্রের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা	স্ফটিকত্বের পরিমাণ (crystallinity)
১১। সুতা ও বস্ত্রের নির্মায়ক তন্তুর অন্তঃস্থিত স্ফটিকাংশের এবং অস্ফটিকাংশের পরস্পরাপেক্ষিক পরিমাণ—ইহা সুতা বা বস্ত্রের স্থিতিস্থাপকতার নির্দেশক	দিক-বিশেষে বিভিন্ন পরিমাণে অভ্যন্তরে প্রসারিত আলোকরশ্মির বক্রতা সম্পাদন বা প্রতিভঙ্গ।

বিজ্ঞানের খবর

মানুষের কালো চামড়া কি সাদা হতে পারে ?

সম্প্রতি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ডার্মেটোলজি ও সিফিলোলজির এক অধিবেশনে নতুন এক রাসায়নিক পদার্থের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই রাসায়নিক পদার্থটি নাকি মানুষের কালো চামড়াকে সাদা চামড়ায় পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে।

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্-এর পাবলিক হেল্‌থ সার্ভিসের Dr. Louis Schwartz বলেছেন যে, গত যুদ্ধের সময় সিন্থেটিক-রাবার সম্পর্কিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক পদার্থের সংশ্রবে কাজ করার ফলে কয়েক শত নিগ্রোর গায়ের রং আংশিক-ভাবে সাদা হয়ে যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আকস্মিকভাবেই এই অপূর্ব রাসায়নিক পদার্থটির সন্ধান পাওয়া যায়।

দেখা গেছে, সিন্থেটিক অর্থাৎ কৃত্রিম রাবারে তৈরী মোটরের টায়ার, দস্তানা প্রভৃতি অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। কাজেই সিন্থেটিক-রাবারের জিনিসকে টেকসই করবার জন্যে এক রকমের অ্যান্টি-অক্সিডাইজিং রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার এ-রকমের একটা রাবারের কার-খানায় অনেক নিগ্রো শ্রমিক কাজ করতো। কাজ করবার সময় অসাবধানতা বশত এই রাসায়নিক পদার্থ তাদের শরীরে যেখানে যেখানে লেগে যায়, ৩০ দিনের মধ্যেই সেখানকার চামড়া চা-খড়ির মত সাদা হয়ে ওঠে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই রাসায়নিক পদার্থটির এই অদ্ভুত গুণের কথা জানতে পারা গেছে।

সিন্থেটিক-আলকাতরা থেকে উৎপাদিত এই রাসায়নিক পদার্থটি হচ্ছে—monobenzyl ether of hydroquinone. এই রাসায়নিক পদার্থটা শরীরে রঞ্জক পদার্থের প্রবাহকে চামড়ার বাইরের দিকে আসতে দেয় না। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায়

দেখা গেছে, এই রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে জীবজন্তুদের লোমের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানুষের গায়ে একবার এই রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে তার ফল ৪ মাস থেকে প্রায় ৩।৪ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে।

ক্যান্সারের চিকিৎসায় ইলেকট্রন

শিকাগো সহরের মাইকেল রীজ হাসপাতালের ডাঃ এরিখ উলমান সম্প্রতি এক নতুন পন্থায় ক্যানসারের চিকিৎসা করতে মনস্থ করেছেন। দেহের অভ্যন্তরে ক্যানসারকে প্রতিরোধ করতে বর্তমানে রঞ্জনরশ্মিই প্রধান উপায়। কিন্তু এই চিকিৎসার অসুবিধা হলো এই যে, রঞ্জনরশ্মির ভেদ শক্তি প্রচণ্ড হওয়ায় শুধু যে ক্যানসারই বিনষ্ট হয় তা নয়, তার সঙ্গে দেহের সুস্থ কোষগুলিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গভীর ক্যানসার চিকিৎসায় রঞ্জনরশ্মির ব্যবহার তাই আদৌ সন্তোষজনক নয়। ডাঃ উলমান সেজন্যে রঞ্জনরশ্মির বদলে ইলেকট্রনরশ্মি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করেছেন। অধুনা আবিষ্কৃত বিটাট্রন যন্ত্রের সাহায্যে চার কোটি ভোল্ট শক্তিশালী ইলেকট্রনরশ্মি দিয়ে মানুষের শরীরের আট ইঞ্চি পর্যন্ত ভেদ করা সম্ভব হবে এবং আভ্যন্তরীন যে-কোন ক্যানসারকে আক্রমণ করার জন্যে এই দূরত্বই যথেষ্ট বলে ডাক্তারেরা অনুমান করেন। ইলেকট্রনরশ্মির ভেদশক্তি পরিমিত হওয়ায় দেহের সুস্থ তন্তু ও কোষগুলির অনিষ্ট কম হবে এবং যেখানে ক্যানসার হয়েছে ঠিক সেই স্থান পর্যন্তই নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনরশ্মি দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব।

মাইকেল রীজ হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ আট বছর গবেষণার পর এই চিকিৎসা-কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ম্যালেরিয়া পরজীবির জীবনচক্র

ম্যালেরিয়া-বাহী মশা কামড়াবার পর প্রায় দশদিন বাদে লাল রক্তকণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট বা পরজীবির দর্শন মেলে। এর মধ্যে তারা কোথায় আত্মগোপন করে? এই রহস্যের উত্তর লণ্ডন স্কুল অফ হাইজিন এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার শর্ট ও গার্নহাম সম্প্রতি দিয়েছেন। গত চল্লিশ বছর ধরে এই বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল যে, পরজীবিগুলি মশক-দংশনের অনতিকাল পরেই রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ করে। শর্ট ও গার্নহাম নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এ-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইনকিউবেশন পিরিয়ড বা রোগস্ফুটনের সময়ে ম্যালেরিয়ার পরজীবিরা আশ্রয় গ্রহণ করে মানুষের যকৃতে এবং সেখান থেকে এক জটিল চক্রপথে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে রক্তকণিকার মধ্যে। এই স্ফুটনকালের মধ্যবর্তী সময়টাই যে রোগ নিবারণের প্রশস্ত সময় সে কথা বলাই বাহুল্য এবং প্যালুড্রিন ওষুধটির সে ক্ষমতা আছে বলেই অনেকে বিশ্বাস করেন। শর্ট ও গার্নহাম প্রথমে একটি বানরের ওপর পরীক্ষা করে সংক্রমণের আগে প্যারাসাইটদের অবস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হন এবং পরে তাঁরা মানুষের দেহেও এই তথ্যের প্রমাণ পান। উন্মাদ রোগের চিকিৎসায় কখনও কখনও রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমিত করে কৃত্রিম কম্পনের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং এ-রকম একটি রোগীকে পরীক্ষা করে তাঁরা তাঁদের মতবাদ দৃঢ় সংস্থাপিত করেছেন। তাঁদের পরীক্ষায় আরো জানা গেছে যে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম আক্রমণ ও তার পুনঃ প্রকাশের (relapse) মধ্যবর্তী নিষ্ক্রিয় সময়েও পরজীবিদের যকৃতে অবস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অরিয়োমাইসিন—নতুন বিশল্যকরণী

সম্প্রতি নিউইয়র্ক অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের এক সম্মেলনে ডাঃ বি, এম, ডুগার নতুন একটি জীবাণুনাশক ওষুধ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। Actinomycetes ছত্রাকের একটি নতুন প্রজাতি বা Species থেকে এই ওষুধটি নিষ্কাশন করা হয়েছে। অরিয়োমাইসিন—সোনার মত রং

বলে তার এই নাম—আজ পর্যন্ত যতগুলি জীবাণু-নাশক আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে নবতম। সব শুদ্ধ পৃথিবীতে আশীটি জীবাণুনাশকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের অর্ধেকের ওপর আসে বিভিন্ন ছত্রাক ও পিও থেকে এবং বাকিগুলি আসে ব্যাক্টেরিয়া থেকে। ডাক্তারেরা আজও পেনিসিলিনকেই পছন্দ করেন বেশী; স্ট্রেপ্টোমাইসিন হচ্ছে তার পরেই। এর কারণ পেনিসিলিন জীবদেহের উপর বিষক্রিয়া করে না। এদের অসুবিধা হলো এই যে, ভাইরাস নামক অদৃশ্য জীবাণুর ওপর এদের কোন ক্রিয়াই নেই এবং ঘন ঘন ইঞ্জেকসন দেওয়া দরকার। অরিয়ো-মাইসিন স্পটেড-ফিভার, টাইফাস, কিউ-ফিভার প্রভৃতি ভাইরাস রোগে অদ্ভুত ফল দেয় এবং মস্ত বড় সুবিধা হলো এই যে, অরিয়ো-মাইসিন খাওয়াও যেতে পারে, ইনজেকসন করাও যেতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, জলাতঙ্ক প্রভৃতি ভাইরাস-রোগের ওপরে কিন্তু অরিয়োমাইসিনের কোন ক্রিয়াই নেই। যক্ষ্মারোগের জীবাণুর ওপরে স্ট্রেপটোমাইসিনের চেয়েও অরিয়োমাইসিন বেশী ফলপ্রদ বলে ডাঃ ডুগার প্রমাণ পেয়েছেন। যক্ষ্মা রোগে স্ট্রেপটোমাইসিনের সার্থকতা সম্বন্ধে আজও বিতর্ক চলছে। অরিয়োমাইসিন ল্যাবরেটরীতে সাফল্য লাভ করলেও যক্ষ্মার বিরুদ্ধে মানুষের দেহের মধ্যে গিয়ে ব্যর্থ হবে কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার অবসর আছে। এইদিকে গবেষণা চলছে বলে জানা গেছে।

আণবিক শক্তির গবেষণা

বৃটেনে প্রথম আণবিক পাইলের কাজ গত বছর থেকে হারওয়েল রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্টে আরম্ভ হয়েছে। এর কর্ণধার হচ্ছেন ডাঃ জে, ডি, কক্‌ক্রফ্‌ট্। পাইলটির ডাকনাম দেওয়া হয়েছে **'গ্লীপ' (Gleep)** এবং এই নামটি **Graphite Low Energy Experimental Pile**, এই দীর্ঘ আখ্যার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। ১৯৪৭ সালে বিলেতের 'নেচার' পত্রিকায় প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী হাইসেন-বার্গের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে জানা যায় যে, ১৯৪২ সালেই জার্মানীতে একটি ছোট আণবিক পাইল্ তৈরী হয়েছিল। আণবিক শক্তির মূলতথ্য কারুর কাছেই অজানা নেই এবং ১৯৩৯ সাল থেকেই জার্মান বিজ্ঞানীরা আণবিক শক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করবার পরিকল্পনা করছিলেন। ইউরেনিয়াম ২৩৫কে ইউরেনিয়াম ২৩৮ থেকে পৃথক করার কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ার কথাও তাঁদের অজানা ছিল না। স্মরণ রাখা দরকার, ইংলণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রও এই সময় এই সমস্ত বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত ছিল। ভিয়েনার প্রফেসর থিরিং (ইনি নাৎসী মতবাদের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী থেকে বহিষ্কৃত হন) বলেছেন—এই সময় জার্মান পদার্থবিদদের মধ্যে একটা মনোভাব জেগে ওঠে যে, হিটলারের হাতে আণবিক বোমা পড়লে পৃথিবীতে বিপর্যয় আসবে এবং তাঁকে তার সন্ধান দেওয়া মানে অপরাধ করা। যাই হোক, জার্মেনী তখন আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার সামরিক কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যেসব মারণাস্ত্র সৃষ্টি করা যেতে পারে তার ওপরই জোর দিয়েছিলেন বেশী এবং দূর ভবিষ্যতের বৃহৎ পরিকল্পনা করতে তাঁরা নারাজ ছিলেন। নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জার্মান বিজ্ঞানীরা কথাবার্তা চালিয়ে ছিলেন, যাতে আণবিক শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ জাহাজ চালানো যেতে পারে, ইন্ধনের অভাব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে। এ থেকে বোঝা যায় যে, জার্মানরা আমেরিকানদের চেয়ে আণবিক গবেষণায় মোটেই পেছিয়ে ছিল না। কিন্তু এ-কথাও ঠিক, আণবিক বোমা তৈরী করতে তারা পারেনি।

টেলিগ্রামের যুগান্তর

একশ' বছরেরও বেশী হলো, ১৮৪৪ সালে প্রথম টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন আমেরিকার এঞ্জিনীয়ার স্যামুয়েল মর্স। বিদ্যুতের সাহায্যে কথার

আদান-প্রদানের সেই নবযুগের সূচনায় তিনি পাঠিয়েছিলেন মাত্র চার কথার একটি বার্তা— **What hath god wrought**। তারপর এলো ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, যার ফলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত আজ টেলিগ্রাফের তারের জালে আকীর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর এলো রেডিও টেলিগ্রাফ এবং গত অক্টোবর মাসে আমেরিকায় টেলিগ্রাফের ইতিহাসে এক নতুনতম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বিখ্যাত আর, সি, এ কোম্পানী 'আলট্রাফ্যাক্স' নামে এক নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তার সাহায্যে ১০৩৭ পাতার একখানা বই ওয়াশিংটনে মাত্র দেড়মিনিটের মধ্যে টেলিগ্রাম করেছেন কংগ্রেস লাইব্রেরীতে। বইখানা হচ্ছে একটি পৃথিবীবিখ্যাত উপন্যাস, তার নাম **Gone with the wind**। প্রথমে সমস্ত বইটিকে মাইক্রোফিল্মে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়। তারপরে আর, সি, এ কোম্পানীর এঞ্জিনীয়ারেরা এই চল্লিশ ফিট দীর্ঘ মাইক্রোফিল্মকে টেলিভিশনের সাহায্যে রেডিও তরঙ্গে পরিণত করে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাহকযন্ত্রে প্রেরণ করেন। প্রতি সেকেণ্ডে পনেরো পাতা করে তাঁরা 'স্ক্যান' করেছিলেন। গ্রাহক যন্ত্রে সমস্ত বইটা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিতহতে থাকে মাইক্রোফিল্মে এবং ইস্টমান কোডাক কোম্পানীর নবাবিষ্কৃত উষ্ণ ফোটোগ্রাফীর প্রক্রিয়ায় অবিলম্বে ডেভেলপ ও প্রিণ্ট হয়ে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, ভবিষ্যত পৃথিবীতে চিঠিপত্র যদি আলট্রাফ্যাক্সের সাহায্যে পাঠানো যায়, তাহলে আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে একদিনে চল্লিশ টন বিমান ডাকের সমানুপাতিক ডাক পাঠানো সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থার সুবিধা হচ্ছে এই যে, ডাক পাঠানোর জন্যে কোনরকম কোডের সাহায্য নিতে হবে না।

যন্ত্রণা নাশক নতুন ওষুধ

ক্যান্সার রোগের পরিণত অবস্থায় রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। সাময়িকভাবে এরূপ যন্ত্রণা উপশমের জন্যে মরফিন প্রয়োগ করা হতো। সম্প্রতি মরফিনের চেয়ে অনেক ভাল এক প্রকার ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ওষুধটির নাম—মেটাপোন। মেটাপোন, মরফিনের মতই আফিং থেকে তৈরী। যেসব ওষুধ গিলে খেলে, যন্ত্রনার উপশম হয় তাদের মধ্যে মেটাপোন সর্বোৎকৃষ্ট।

জার্মেনীতে তৈরী ডেমেরল্ নামে যন্ত্রণা নিবারক আর এক নতুন সিন্থেটিক ওষুধের কথা জানা গেছে। ডেমেরল কিন্তু আফিং বা মরফিনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কোন কোন রকমের হাঁপানি, গল-ব্ল্যাডার এবং সন্তান প্রসব কালীন যন্ত্রণায় ডেমেরল সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত হয়েছে। আফিং-এর নেশার মত এ-দুটি ওষুধেই রোগীর অভ্যস্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কাজেই অবসাদক ওষুধ সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত এ ওষুধ যাকে তাকে দেওয়া হয় না। এ ছাড়া, মেথাডন নামে যন্ত্রণা উপশমকারী আর একটি ওষুধের কথাও আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের জার্ন্যালে প্রকাশিত হয়েছে। এই ওষুধটিও গোড়াতে জার্মান রাসায়নিকেরাই উদ্ভাবন করেছিলেন। মেথাডন সাধারণভাবে ১০৮২০ নামে পরিচিত। এই ওষুধটি সব রকমের যন্ত্রনা উপশমের জন্যে ৪০০ রোগীর উপর পরীক্ষিত হয়েছে। সাধারণত তিন থেকে চার ঘণ্টা অবধি ওষুধের ক্রিয়া অব্যাহত থাকে; কিন্তু অনেকক্ষেত্রে আবার আট ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত রোগীকে যন্ত্রণামুক্ত থাকতে দেখা গেছে।
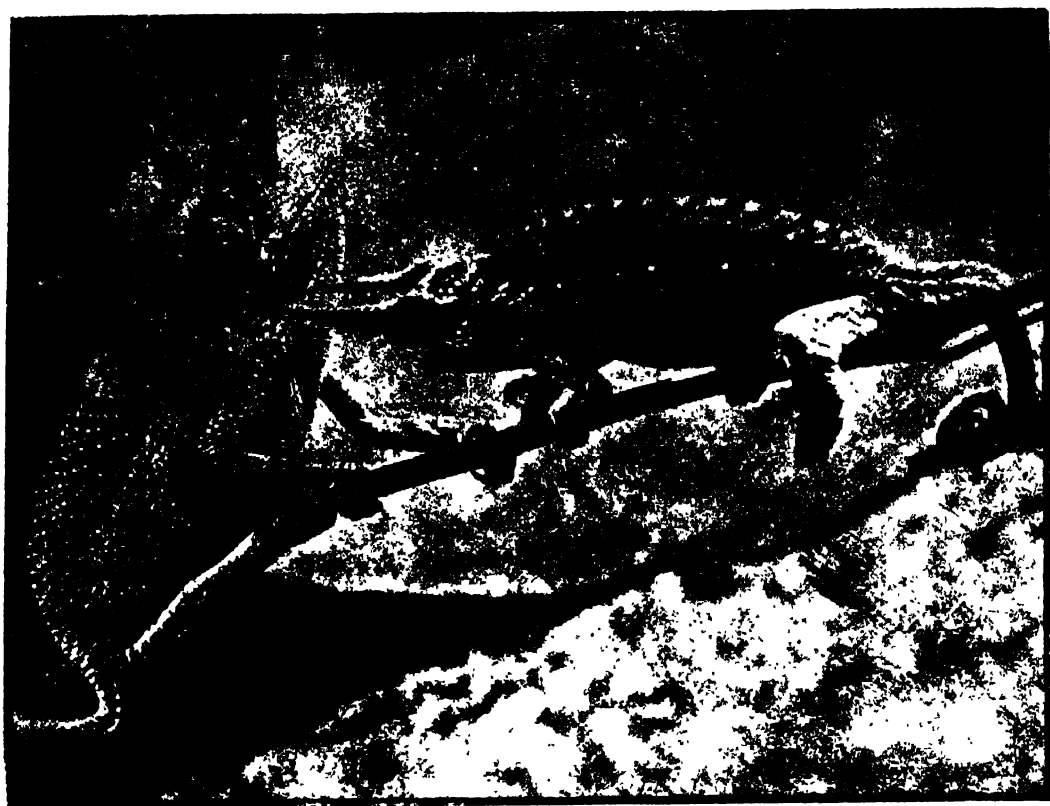
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

হাঁস যেমন জল থেকে দুধ পৃথক করে নেয়,
তোমরা সেরূপ বিষয়বৈচিত্র্যের মিশ্রণ
থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ আহরণ কর।

করে দেখ

ডুবুরি মাছ

তোমরা লক্ষ্য কবে থাকবে—অনেক মাছেবই পেটেব ভিতরে শিরদাঁড়ার নীচে বাতাসভর্তি একবকম পটকা থাকে। ইংবেজীতে এটাকে বলে—'সুইমিং ব্লাডার'। মাছ তাব পেশীর সাহায্যে এই পটকাটাকে সংকুচিত বা প্রসাবিত কবে ইচ্ছামত ডুবে যেতে পাবে অথবা ভেসে থাকতে পাবে। খুব সহজ একটা পবীক্ষায় তোমবা এ ধরণের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পাব।
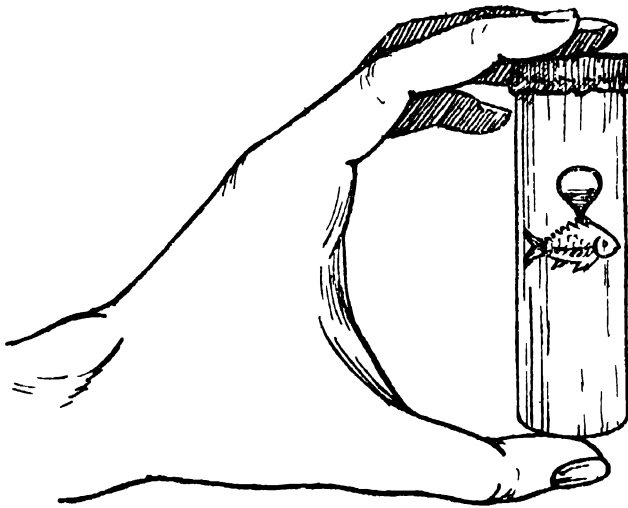
বড় মার্বেলের মত একটা ফাপা কাচেব বল যোগাড় কর। গ্লাস-ব্লোযাবদেব কাছে এরকমের অনেক বাতিল কাচের বল পাবে। অথবা তাদেব দিয়ে অনায়াসেই এবকমেব একটা ফাঁপা বল তৈরী কবে নিতে পাব। বলটার উপরের দিকে বোঁটাব মত একটু অংশ থাকবে। ওই বোটাব পাশে অর্থাৎ বলেব নীচেব দিকে ছোট্ট একটা ফুটো বাখতে হবে। কাচ দিয়েই হোক বা প্লাস্টেসিন দিয়েই হোক, ছোট্ট একটা মাছ তৈবী করে কাচেব বলটার বোঁটাব সঙ্গে ছবিব মত কবে জুড়ে দাও। এছাড়া একটা কাচের গ্যাস-জার অথবা মোটা 'টেস্‌ট-টিউব' যোগাড় কবতে হবে। গ্যাস-জাব বা টেস্‌ট-টিউব না পেলে মোটা-মুখ, খাটো গলাওয়ালা বোতলেও কাজ চলবে। বোতল অথবা গ্যাস-জারের প্রায় গলা অবধি জল ভর্তি করে তাতে কাচের বল সংলগ্ন মাছটাকে ছেড়ে দাও। ফাঁপা বলটা

জলের উপরে অনেকটা ভেসে থাকবে। ড্রপারের সাহায্যেই হোক, কি জলের কলের নীচে ধরেই হোক—বোঁটার পাশের ফুটোর ভিতর দিয়ে বলটার মধ্যে খানিকটা জল ভর্তি করে আবার সেটাকে জলে ছেড়ে দাও। যদি জল বেশী ভর্তি হয়ে থাকে তবে মাছ সমেত বলটা ডুবে গিয়ে জলের তলায় চলে যাবে। তাহলে ঝাঁকুনি দিয়ে বল থেকে খানিকটা জল বের করে দিয়ে এমন অবস্থায় আনবে যাতে বলটা জলের উপর সামান্য একটু মাত্র ভেসে থাকে। বোতল বা জারের মুখে এবার একটা রবারের ছিপি এঁটে দিয়ে তাতে জোর করে একটু চাপ দিলেই দেখবে—বল সংলগ্ন ভাসমান মাছটা জলের তলায় ডুবে যাবে। চাপ ছেড়ে দিলেই মাছটা আবার জলের উপর ভেসে উঠবে। ছিপির উপর চাপ দিলে বোতলের বাতাসের উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে খানিকটা জল ফুটো দিয়ে ফাঁপা বলটার ভিতরে ঢুকে যায়। জল ঢোকবার ফলে বলটা আগের চেয়ে খানিকটা ভারী হয় বলেই জলের নীচে তলিয়ে যায়। চাপ ছেড়ে দিলেই সেই জলটুকু আবার বেরিয়ে আসে এবং মাছ সমেত বলটাও জলের উপর ভেসে ওঠে। উপরের ছবির মত জিনিসটাকে করে দেখো—অজানা লোকেরা দেখে ভাববে—মাছটা যেন কথামত ওঠা-নামা করছে।

চোখের ভুল

এর আগে চোখের ভুল সম্বন্ধে তোমাদের জন্যে কয়েকটা ছবি দিয়েছিলাম। এবারে আরও কয়েকটা চোখের ভুলের ছবি দিলাম।

১নং চিত্র

এক নম্বর চিত্রে তিনটি লোকের ছবি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোন লোকটা সব চেয়ে বেশী লম্বা মনে হয়? যদি চোখের দেখার উপর নির্ভর কর তবে নিশ্চয়ই বলবে—৩ নম্বরের লোকটাই সবার চাইতে বড়। কিন্তু এবার কম্পাস দিয়ে তিনটে লোকেরই মাপ নাও। দেখবে—চোখ তোমাদের প্রতারণা করেছে। কম্পাসের মাপে ১ নম্বরের লোকটাই সব চাইতে লম্বা বলে প্রমাণিত হবে। ছবির পাশের লাইনগুলো 'পার্স্পেক্টিভে' আঁকা; কিন্তু লোকের ছবিগুলো 'পার্স্পেক্টিভে' আঁকা নয় বলেই এরকম দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে থাকে।
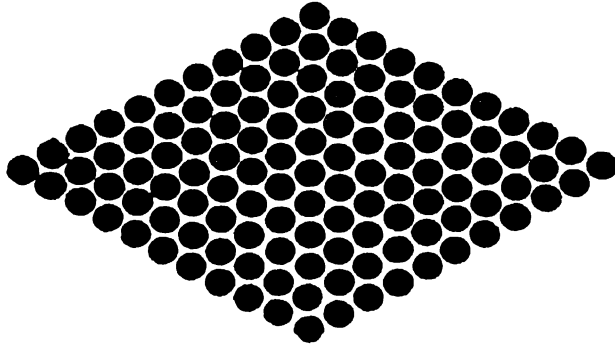
২নং চিত্র

দু'নম্বর চিত্রের কালো গোল দাগগুলো যেভাবে সাজানো আছে তাতে কোন দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে না। কিন্তু আধ-বোজা চোখে চেয়ে দেখ—গোল দাগগুলোকে ছ'কোণা দাগ বলেই মনে হবে।
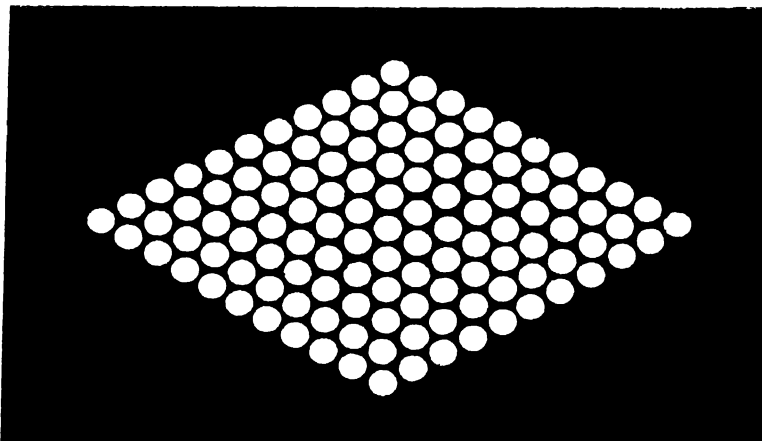
৩নং চিত্র

তিন নম্বরের ছবিটা দু'নম্বরের ছবিটারই নেগেটিভ ছাপা। অর্থাৎ দু'নম্বরের কালো গোল দাগগুলো তিন নম্বরের সাদা গোলগুলোরই সমান। কিন্তু দু'নম্বর ও তিন নম্বরের ছবি পাশাপাশি তুলনা করে দেখলেই মনে হবে—সাদা গোলগুলো কালোর চেয়ে বড়।
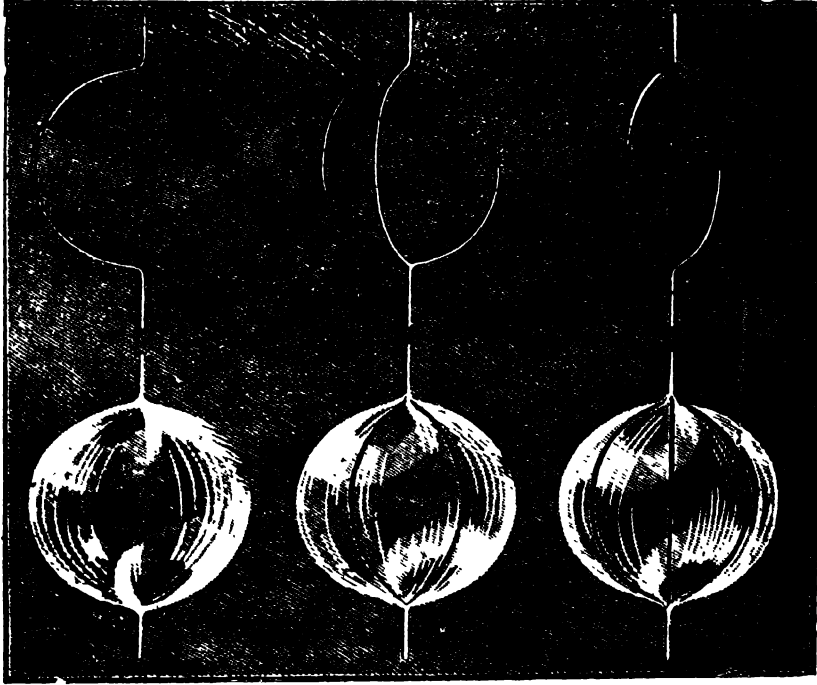
৪নং চিত্র

এ-পর্যন্ত চোখের ভুলের যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অন্য কারণেও আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে থাকে। যেমন, দ্রুত-চলমান অথবা দ্রুত-ঘূর্ণায়মান অবস্থায় কোন একটা জিনিস আমাদের চোখে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের বলে প্রতিভাত হয়। চার নম্বরের ছবিটার উপরের দিকে রয়েছে অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকানো কয়েকটা চকচকে তার। এই তারগুলোকে আঙুলে চেপে লাট্টুর মত জোরে ঘোরালেই দেখবে যেন আবছা গোছের বল ঘুরছে। (নীচের ছবি দেখ) এরূপ অর্ধ-বৃত্তাকার তিনটে তার ছবির মত করে, ঘোরালে বলটার গায়ে দু'টা কালো রেখা দেখা যাবে। অর্ধ-বৃত্তের বদলে তারের দু'টা গোল রিং সমকোণে বসিয়ে ঘোরালে বলটার গায়ে তিনটে কালো রেখা দেখা যাবে।

জেনে রাখ

অদৃশ্য জীব-জগতের বিস্ময়

অতিকায় জীবজন্তু থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত এই বিশাল জীব-জগতের অনেক কিছুই আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। তার পরেই আমাদের দৃষ্টি-শক্তি অচল এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল—দৃশ্যমান এই জীব-জগতের বাইরে আর কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিউয়েনহোয়েক মাইক্রস্কোপ নামে এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যায় ভিতর দিয়ে অতি সূক্ষ্ম জিনিসকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে এমন এক অদৃশ্য জীব-জগতের সন্ধান পাওয়া গেল যাদের চেহারা এবং আচার-ব্যবহার দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই অদৃশ্য জীব-জগতে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর—বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। যেখান থেকে এই অদৃশ্য জীব-জগতের আরম্ভ সেখানকার কথাই আজ তোমাদিগকে বলব। এরাই হলো অদৃশ্য জগতের অতিকায় জীব। এদের আমরা কীটাণু নামে অভিহিত করব। এদের মধ্যে অ্যামিবা, প্রোটোজোয়া প্রভৃতির নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। কিন্তু কখনও চোখে দেখেছ কি? না দেখে থাকলেও একদিন দেখবার সুযোগ পাবেই। এখন এদের কথা মোটামুটি জেনে রাখলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার যথেষ্ট সুবিধা হবে। এজন্যেই কীটাণু সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

গুটি বাঁধবার কৌশল প্রত্যক্ষ করবার জন্যে শোঁয়াপোকা পুষতে হয়েছিল।

তোমরা জান বোধ হয়, শোঁয়াপোকা হচ্ছে প্রজাপতির বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলো গাছের পাতা খেয়েই বড় হয়। কাজেই ছোট্ট একটা টবের গাছে কতকগুলো শোঁয়াপোকা ছেড়ে দিয়ে টবটাকে জলভরা বড় একটা এনামেলের পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলাম। জল দিয়ে টবটাকে ঘিরে রাখবার উদ্দেশ্য হলো—পোকাগুলো জল ডিঙিয়ে পালাতে পারবে না আর গাছটাও থাকবে সতেজ। দিন দুই পরেই দেখি, জলের উপর পাতলা একটা সর পড়েছে, আর কয়েকটা শোঁয়াপোকা সারবেঁধে সেই সরের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পরীক্ষাগারের আবদ্ধ পরিবেশ বোধ হয় ওদের সহ্য হচ্ছিল না; সেজন্যেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পরীক্ষাগারের টেবিলের উপর একই সময়ে রাখা আরও একপাত্র জল তো যেমন ছিল তেমনই আছে। তার উপরে তো সর পড়েনি। একটু সর তুলে নিয়ে মাইক্রস্কোপের নীচে রেখে দেখা গেল—অদ্ভুত কাণ্ড! শসা-বিচির মত চেপ্টা, দু'মুখ সূচালো কতকগুলো অদ্ভুত প্রাণী ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। শরীরটা অতি পাতলা একটা খোসার মত। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ভিতরের সব কিছু দেখা যায়। শরীরের চতুর্দিকে অতি সূক্ষ্ম নমনীয় কতগুলো শোঁয়া আছে। সেগুলোকে অতি দ্রুত আন্দোলিত করেই এরা জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে। এদের সাধারণ নাম হচ্ছে—প্যারামিসিয়াম।

এক ফোঁটা জলের মধ্যে প্যারামিসিয়াম
আহার সংগ্রহে ব্যস্ত

এনামেলের পাত্রটার তলা থেকে এবার ড্রপারে করে খানিকটা জল তুলে এনে মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে দেখলাম—আরও অদ্ভুত দৃশ্য! এতে প্যারামিসিয়াম দেখা গেল না বটে, কিন্তু অন্য একরকমের অদ্ভুত প্রাণী দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। নদীতে বয়া ভাসতে দেখেছ তো। বয়াগুলো জলের তলায় নোঙরের সঙ্গে লম্বা শিকল দিয়ে যেমন করে বাঁধা থাকে এই প্রাণীগুলোও যেন সেরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি বয়ার মত লম্বা সূতা দিয়ে বাঁধা। তবে আকৃতিটা ঠিক বয়ার মত নয়। বিজল-বাতির ঘণ্টাকৃতি সুদৃশ্য শেডের মত দেখতে। জলের মধ্যে শালুক-ডাঁটার ডগায় যেমন ফুল ফুটে থাকে এগুলোও দেখতে অনেকটা সেই রকম। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়—প্রত্যেকটা শেডের কাণা যেন বায়ুবেগে ঘুরছে। তাছাড়া আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ডাঁটা বা সুতায় বাঁধা শেডগুলো একই স্থানে নিশ্চলভাবে থাকে না। সুতা-বাঁধা অবস্থায় যতদূর ঘোরাফেরা সম্ভব তারই মধ্যে হেলেদুলে বেড়ায় এবং কিছুক্ষণ পর পর বাঁধা সুতাটা অকস্মাৎ স্প্রিঙের মত গুটিয়ে গিয়ে পদার্থটা জলের নীচে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে

যায়। এই প্রাণীগুলোকে বলা হয়—ভর্টিসেলা। শেডের মত পদার্থটার কাণার চার দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলো শোঁয়া সাজানো আছে। ওই শোঁয়াগুলোকে অতি দ্রুত গতিতে পর পর আন্দোলিত করে এরা জলের মধ্যে স্রোত উৎপন্ন করে। সেই স্রোতের টানে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুসমূহ তাদের মুখে এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখটাকে সংকুচিত করে জলের নীচে চলে যায়। এই হচ্ছে ওদের আহার সংগ্রহের প্রণালী।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলো ছাড়াও এখানে সেখানে বিন্দু বিন্দু জেলীর মত আরও কতকগুলো অদ্ভুত প্রাণী দেখা গেল। প্রথমে দেখে ওগুলোকে কোন প্রাণী বলেই মনে হয়নি—কারণ এখানে ওখানে এক একটা নিশ্চল তারকা-চিহ্নের মত পড়ে-ছিল। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো—তারকা-চিহ্নগুলো যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। যতই সময় যেতে লাগল তাদের আকৃতি ততই দ্রুত পরিবর্তিত হতে সুরু করল। জেলীর মত পদার্থটার একদিক দিয়ে নতুন ডালপালা গজিয়ে উঠে আবার অপর দিকেরটা মিলিয়ে যায়। এভাবেই তারা আহার অন্বেষণে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল। তোমরা অ্যামিবার নাম শুনেছ নিশ্চয়। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর নামই অ্যামিবা।
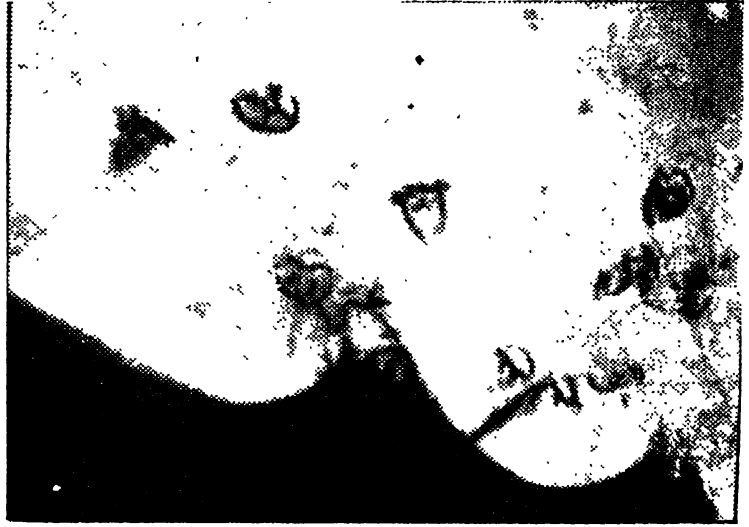
এক ফোঁটা জলে এরকমের অসংখ্য ভার্টিসেলা দেখা যায়

এক ফোঁটা জলের মধ্যে অদৃশ্য-জগতের এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোকে দেখে স্বভাবতই মনে হলো—এরা এলো কোত্থেকে ? কারণ অন্য পাত্রের জলে এরূপ কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—গাছের উপরের শোঁয়া-পোকার পরিত্যক্ত মল জলে পড়ে' তা-থেকেই এই প্রাণীগুলোর উৎপত্তি হয়েছে।

এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ডোবার জল থেকে শ্যাওলা জাতীয় একটুকরো পাতা এনে জল সমেত মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে দেখতে লাগলাম। প্রথমটায় গোল, লম্বা এবং একদিকে বাঁকানো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন জাতের কয়েকটা প্যারামিসিয়াম ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ বাদেই দেখি—ছোট্ট পাতাটার

সাধারণ স্টেন্টর। বাঁ-দিকের প্রাণীটা সবে মাত্র শরীরটা প্রসারিত করছে।

তলার দিক থেকে মুগুরের মত একটা পদার্থ ক্রমশ লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকটা লম্বা হয়ে সেটার মুগুরের মত মাথাটা হঠাৎ গ্রামোফোনের চোঙের মত হাঁ করে খুলে গেল। পরিবর্ধিত অবস্থায় সেটাকে একটা ভীষণ-দর্শন জীব বলেই মনে হবে। কিছুক্ষণ এভাবে হাঁ করে থেকে দেহটাকে সংকুচিত করে আবার পাতার নীচে চলে গেল। কেবল একটাই নয়—ইতিমধ্যে পাতাটার অন্যদিক থেকে ওরকমের আরও তিন-চারটা প্রাণী বেরিয়ে এসে হাঁ করে ছিল। এগুলোকে বলে—ষ্টেণ্টর। বিভিন্ন আকৃতির ছোট বড় নানারকমের ষ্টেণ্টর দেখা যায়। মুখটাকে গ্রামোফোনের চোঙের মত বিস্তৃত করে এরা খাবার সংগ্রহ করে। কোন কিছু মুখে পড়লেই দেহটাকে সংকুচিত করে ডেলার মত হয়ে যায়। জিনিসটা উদরস্থ হলেই আবার নতুন শিকারের সন্ধানে মুখ-

বৃহৎ আকৃতির একজাতের স্টেণ্টর। বাঁ-দিকের প্রাণীটা মুখ হাঁ করে খাবার সংগ্রহ করছে। ডানদিকেরটা সবেমাত্র মুখ খুলছে

খানাকে হাঁ করে রাখে। এদেরও গোলাকার মুখটার চারধারে কতকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া আছে। এই শোঁয়াগুলোকে পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলিত করে জলে স্রোত উৎপন্ন করে। সেই স্রোতেরটানে অতি ক্ষুদ্র কীটাণুসমূহ এদের বিশাল গহ্বরের মত মুখে এসে পড়ে।

ময়লা জল থেকে আর একরকমের শেওলা এনে মাইক্রস্কোপের তলায় রাখলাম। দেখা গেল—এতে ভর্টিসেলা রয়েছে কয়েক রকমের। কোনটা খেলনা বেলুনের মত, কোনটা অর্ধ গোলাকার চায়ের পেয়ালার মত, আবার কোনটা বা বিজলী বাতির শেডের মত। এর মধ্যে আর একটা নতুন রকমের প্রাণী চোখে পড়ল। প্রাণীটা দেখতে অনেকটা এলাচের মত। বোঁটার দিকটা পাতার গায়ে আটকানো। মুখের দিকটা প্রসারিত করে তার ভিতর থেকে বের করল অদ্ভুত একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার সামনের দিকে এক জোড়া চাকা ঘুরছে। চাকা-দুটো যে সত্যসত্যই ঘুরছে তা নয়—চাকার চারধারের সূক্ষ্ম শোঁয়াগুলোর পর পর আন্দোলনের ফলেই এরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে। এদের শরীরের ভিতরের দিকটায় নজর দিলে দেখা যায় যেন একটা এঞ্জিন চলছে—তার পিস্‌টন-রডটা অনবরত ওঠা-নামা করছে। এই প্রাণী গুলোর নাম হচ্ছে—রটিফার বা চক্র-কীটাণু। এছাড়া ওই ময়লা জলটুকুর মধ্যে ছবিতে আঁকা রশ্মিবিকিরণকারী সূর্যের মত আর এক রকমের কতগুলো প্রাণী দেখা গেল। এগুলো প্রায় নিশ্চল। অতি মন্থর গতিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরে যায়। পদার্থটা দেখতে সম্পূর্ণ গোল—চতুর্দিক থেকে লম্বা লম্বা কাঁটার মত জিনিস বেরিয়ে আছে। এগুলোকে বলা হয়—রেডিওল্যারিয়া। এরূপে ক্রমে ক্রমে আরও যে কত রকমের অদ্ভুত আকৃতির কীটাণুর দেখা পাওয়া গেল এখানে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করো। মাইক্রস্কোপের অভাবে অন্তত শক্তিশালী রিডিং-গ্লাস দিয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করতে পার। যে-সব অদৃশ্য কীটাণুর কথা বললাম—রিডিং-গ্লাস দিয়ে অবশ্য তাদের দেখতে পাবে না; তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, লতা-পাতা, ফুল-ফলের সূক্ষ্মাংশ সমূহ পরীক্ষা করে অনেক রহস্যের বিষয় জানতে পারবে।

রটিফার আহার সংগ্রহে ব্যস্ত

গ. চ. ভ.

বিবিধ

বিজ্ঞানের ভাষা

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত দিল্লী অধিবেশনে শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ বিজ্ঞানের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন পূর্ব হইতেই বাংলার মনীষীরা অনুভব করিয়াছেন। বর্তমান কালে এই প্রচেষ্টা ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই সম্পর্কে আমাদিগকে বহুপ্রকার বাধারও সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এই বিষয়ে কয়েকটি কথা আপনাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শিক্ষাবিষয়ক যেকোন বৃহৎ প্রচেষ্টাই স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা-সাপেক্ষ। ম্যাট্রিক পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা যেমন বাংলাভাষার মাধ্যমে হইতেছে, তেমনি উচ্চতর শিক্ষাদানও বাংলাভাষার সহায়তায়ই হইবে। এবিষয়ে এপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যাহা করিয়াছেন, অর্থাৎ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলা অথবা ইংরাজিতে দিবার অনুমতি দিয়াছেন, ইহা একেবারেই যথেষ্ট নহে। অবিলম্বে যাহাতে শুধু বাংলাতেই উত্তর দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা আরও দ্রুততর করিতে হইবে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরিভাষা-সংকলন কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম, তখনই দেখিয়াছিলাম, অন্যান্য প্রদেশের অনেক স্থানে পরিভাষা প্রণয়ন কার্য অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তারপর প্রায় আট দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। অথচ হিন্দী ভাষায় এই কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একখানি পুস্তকের প্রচার-পত্র দেখিলাম। বইখানি একখানি হিন্দী অভিধান। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। এই পাঁচ খণ্ডে প্রায় সমস্ত বিভাগের বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা আছে। বইখানির মূল্য আশী টাকা। বইখানি যে নির্দোষ বা নির্ভুল এ-আশা হয়তো এখনও করা যায় না, তথাপি এটি যে একটি মহৎ প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বইখানি বহুদিন ধরিয়া ক্রমশ রচিত হইয়াছে। ভারতের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। নেহেরু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশংসাপত্র আছে। অনেকগুলি প্রদেশের ডি, পি, আই গণ নাকি বইখানিকে বিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনের (College) জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। এইরূপ একখানি বই বাংলাদেশে কেন হইল না? রাজনৈতিক ও বিশ্বপ্রেম ঘটিত নানা উপসর্গে পীড়িত হইয়া এবং নানা মতবাদের কচকচিতে বিভ্রান্ত হইয়াই কি এই প্রচেষ্টা হইতে আমরা বিরত রহিয়াছি?

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার পরিভাষায় অসুবিধা হইবে মনে করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? হউক না কিছু কিছু বিভিন্ন পরিভাষা। কালক্রমে শব্দের ও পরিভাষার আদান-প্রদান হইবেই। এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশ একটা সামঞ্জস্য আসিয়া যাইবে। পরিভাষা প্রণয়নের সময়ে পূর্বপ্রকাশিত পুস্তক ও অভিধানগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহা হইতে পছন্দমত শব্দাদি চয়ন করিলে এই সামঞ্জস্য বিধানের অনেক সুবিধা হইবে। এখানে Priority-রও একটা মূল্য আছে।

বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রণয়ন অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ পুস্তক লিখিতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আবশ্যক। সমগ্র ভারতের ব্যবহার্য একটি পরিভাষা-গ্রন্থ প্রণীত হওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচ্য হইলেও, একই প্রদেশে, যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিভাষা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। একজন বাঙালী লেখক এক পরিভাষা ব্যবহার করিলেন, আবার একজন বাঙালী লেখক অন্য পরিভাষা ব্যবহার করিলেন—ইহা কখনই

বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্য একটি বাংলা পরিভাষা গ্রন্থ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পুস্তক রচনাও চলিবে। পরিভাষা রচনা সম্পূর্ণ হইবার পর পুস্তক রচনা আরম্ভ হইবে, ইহা কাজের কথা নহে। যেসকল শব্দের ভাল বাংলা পরিভাষা পাওয়া যাইতেছে না, অথবা প্রণীত হয় নাই, তাহার পরিবর্তে আপাতত ইংরাজি কথাটাকেই ব্যবহার করিলে কোন দোষ হইবে না। ভাষার জাতি নির্ভর করে ইহার ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতির উপর, বিশেষ্যের উপর নহে। সুতরাং বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক বিদেশীয় বিশেষ্যপদ থাকিলেও উহা শুদ্ধ বাংলা বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যদি বলি, 'বাসে ও ট্রামে উঠিয়া হাওড়া ব্রীজ পার হইয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ঢুকিয়া ইণ্টার ক্লাশের দুখানা টিকিটে কিনিয়া ট্রেনে পঁচিশ মাইল গিয়া, সেখান হইতে ট্যাক্সিতে, সাইকেলে ও রিক্শায় আরো দশ মাইল গিয়া রামপুর গ্রামে পৌছিলাম', তাহা হইলে এই বাক্যটির অন্তর্গত প্রায় সবগুলি বিশেষ্যপদ ইংরেজি হইলেও, ইহা বাংলাভাষা। তেমনি যদি কোন ইংরেজ বলে, **I ate Luchi, Polao, Kalia, Korma, Sandesh, Rajbhog, Singara, Kochuri, Jilipi, Pantua, Dalpuri, Rasogolla, and Mihidana.** তাহা হইলে এ বাক্যটি সম্পূর্ণ ইংরেজি বলিয়াই মনে করিতে হইবে, যদিও **I, ate** এবং **and,** এই তিনটি মাত্র ইংরাজি কথা। কারণ এই তিনটি কথাই সমস্ত বাক্যটির জাতি নির্ণয় করিতেছে। সুতরাং উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের সাময়িক অভাবে ইংরেজি বা অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহারে কোন সংকোচের কারণ আমাদের নাই। এবং ইংরেজি কথা ব্যবহারের জন্য বাংলাভাষার মানহানি হইবার আশঙ্কা নাই।

অন্য প্রাদেশিক ভাষার চাপ সম্বন্ধেও আমাদিগের অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে। আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের শরৎচন্দ্র বলিয়া মৌখিক খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেই ইহাদের সাহিত্যকে আমরা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না। রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন, বাংলাভাষার অস্তিত্ব, প্রসার এবং উন্নতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়াই আমি আশা করি। কিন্তু সেজন্য ঐকান্তিক চেষ্টা আবশ্যক। ইহার জন্য জনসাধারণ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্যিকবৃন্দের গভীর দায়িত্ব রহিয়াছে। রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইবে বা হইবে না, সেজন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী। জীবনের প্রতি কার্যে, সমাজের প্রতি ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক সর্বপ্রকার ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে। পথের নাম, বাস ও ট্রামের শীর্ষদেশের নাম-ফলক, টিকেটের রচনা, বিপণীর নাম ফলক প্রভৃতি সমস্তই বাংলায় লিখিতে হইবে। এত দিনেও যে এ সকল বিষয়ে আমরা অবহিত হই নাই, ইহা পরম আশ্চর্যের বিষয়। আলস্য, ঔদাসীন্য ও কাপুরুষতাকে উদারতা ও বিশ্বপ্রেমের মুখোস পরাইয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিলে বা আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে চলিবে না। বাংলা দেশে সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হইবে, ইহা অপেক্ষা সরলতর সত্য থাকিতে পারে না। কোন প্রকার যুক্তি, তর্ক, সুবিধা, অসুবিধার অজুহাতে এই সত্যকে বিকৃত করা চলিবে না। মাতার সহিত সন্তানের যে সম্পর্ক, বাংলাভাষার সহিত বাংলার মনন ও সংস্কৃতির সেই সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কোন যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে না। এই সত্য ভুলিলে, অথবা এই সত্য রক্ষায় যত্নবান্ না হইলে বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মহত্যায় বিলম্ব ঘটিবে না।

এক্স-রে'র সাহায্যে উদ্ভিদের উন্নতি সাধন।

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডাঃ কে, টি, জেকব পাটের বীজে বিভিন্ন পরিমাণের এক্স-রে প্রয়োগ করে সাড়ে বাইশ ফুট লম্বা এবং আড়াই ইঞ্চি মোটা বিরাট আকারের পাটগাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণভাবে ওই বীজ থেকে প্রায় ১৫ ফুট লম্বা এবং ১ ইঞ্চি মোটা সবচেয়ে ভাল পাটগাছ পাওয়া গেছে। সাধারণ ক্ষেত্রে পাটগাছ উৎপাদনে প্রায় ১৭ সপ্তাহ সময় লাগে; কিন্তু এক্স-রে প্রয়োগে আট সপ্তাহের মধ্যেই পাট উৎপন্ন করা যায়।

কলকাতা থেকে সাতাশ মাইল দূরবর্তী বিজ্ঞান-মন্দিরের কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে পাট ও তুলা সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি এই ফল পেয়েছেন। গবেষণাগারে এক্স-রে প্রয়োগের পর সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্রে যে ভাবে রোপণ করা হয়, বীজগুলোকে সে ভাবেই রোপণ করা হয়েছিল।

মিশ্র-প্রজনন এবং এক্স-রে প্রয়োগে ডাঃ জেকব ১'৪ ইঞ্চি দীর্ঘ লিণ্টের কার্পাস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। লায়ালপুর এবং মাদ্রাজের কার্পাসের লিণ্টের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ১'১ ইঞ্চির বেশী হয় না। উৎপাদন-পরিমাণও মাদ্রাজের উৎপাদনের চেয়ে আড়াইগুণ বেশী। এ-প্রদেশের জমির উর্বরতাই উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা নব্বই ভাগ কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ডাঃ জেকবের গবেষণায় সাধারণ ক্ষেত্রে ৮৮ থেকে ৯০ দিনের স্থলে মাত্র ৫০ দিনেই গাছে ফুল ধরেছে।

১৯২৭ সালে মুলারের এক্স-রে প্রয়োগ সম্পর্কিত গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর এক্স-রে প্রয়োগের গবেষণা সুরু হয়, ১৯৩৯ সালের পূর্বে এ বিষয়ে কেবল মৌলিক তথ্য সম্পর্কে গবেষণা হতো। যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা কৃষিকার্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের উপর এই প্রথা প্রয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে শ্রীরঞ্জন এবং ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে রামীয়া ভারতে এবিষয়ে চেষ্টা করেন। বর্তমানে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে পাট ও তুলার উপর নিয়মিতভাবে কাজ আরম্ভ হয়েছে। পাট ও তুলা সম্পর্কে শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী এবং শ্রীঅমিয় কুমার অধিকারী ডাঃ জেকবকে সাহায্য করছেন। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি পাট এবং পশ্চিম-বঙ্গ সরকার তুলা সম্পর্কে অর্থ সাহায্য করছেন।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতি

গত ২৮শে মে, শনিবার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতির উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—সুযোগ, সুবিধা এবং কার্য-পরিচালনে অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের আন্দোলন ক্রমশ বেড়ে উঠছে। এই উদ্দেশ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লো-ভাকিয়া, আমেরিকা, চীন এবং অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতি গঠিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে জানুয়ারী মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতির উদ্বোধন করেন। তিনি এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট। বৃটেনের বৈজ্ঞানিক- কর্মী সমিতির প্রেসিডেণ্ট, বিশ্ববিখ্যাত প্রোফেঃ ব্ল্যাকেট এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ স্যাপলি এই উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, গৌহাটি, কটক, রাণীগঞ্জ এবং নৈহাটিতে এর শাখা-সমিতি গঠিত হয়েছে।

ডাঃ গুহ বলেন – ভারতের বৈজ্ঞানিক-কর্মীদের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। অনেকক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের যোগ্যতা এবং বৈজ্ঞানিক-কর্মীদের যোগ্যতায় পার্থক্য না থাকলেও বৈজ্ঞা-নিক-কর্মীরা কম আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যোগ্য ও মেধাবী যুবকেরা এগিয়ে আসবে না। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্যবহৃত না হয়ে যাতে জনসাধারণের কল্যাণে গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে সেবিষয়েও বৈজ্ঞানিক-কর্মীদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা না থাকলেও তাঁরা অন্তত বাধা দিতেও সক্ষম হবেন। আলোচনান্তে সমিতির কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনে জনসাধারণকে আপ্যায়িত করা হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ জুন—১৯৪৯ ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ

শ্রীকেশব ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীমহলে বড় জোর হেগেলের নামটাই পরিচিত, দামটা নয়। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি নির্ধারণে এবং তার গতি নির্দেশে হেগেলের দান অবিস্মরণীয়। হেগেলের পূর্বে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীমহলে যে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, হেগেলই সর্বপ্রথম তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। এর আগে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়; আজ একে যেমন দেখা যাচ্ছে, বরাবরই এ এমনি ছিল ও ভবিষ্যতেও থাকবে। বিশ্বজগতের বৃহত্তম নক্ষত্রটি থেকে সুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধূলিকণাটি অবধি সৃষ্টির সুরু থেকে এমনিভাবেই চলে আসছে। মানুষ, বিভিন্ন জীবজন্তু, উদ্ভিদ জগৎ, অজৈব জগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ও বিশ্বজগৎ প্রভৃতির কী করে জন্ম হল, সে সম্পর্কে এঁদের কোন ধারণাই ছিল না। অজৈব ও জৈব জগতেরও যে একটা ইতিহাস থাকতে পারে, এদের প্রত্যেকেরই যে জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ ঘটতে বাধ্য—এ কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। তাই বিশ্বজগতের উৎপত্তির কথা যখনই উঠত তখনই এঁরা 'প্রথম প্রেরণা' বা First Impulse-এর শরণাপন্ন হতেন। এঁদের মতে সেই 'প্রথম প্রেরণা'র পর থেকে বিশ্বজগৎ যেভাবে চলতে সুরু করেছে, আজও ঠিক সেইভাবেই চলছে এবং অনন্তকাল ধরে এমনি অপরিবর্তনীয়ভাবে চলতেই থাকবে। হেগেলই সর্বপ্রথম এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির স্থলে—ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন। হেগেল বলেন যে, এই বিশ্বজগতে কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয় এবং থাকতেও পারে না। সমস্ত জিনিসই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। গতিহীন বস্তু কিংবা বস্তুহীন গতি—সমান অবাস্তব। পৃথিবী আপাত দৃষ্টিতে স্থির; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দুটি গতি আছে। একটি নিজের মেরুদণ্ডের উপর, অন্যটি সূর্যের চারদিকে। এমন কি, সূর্য—যাকে এতদিন স্থির বলে ধরা হয়েছিল, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে, সেই সূর্যও অন্যান্য নক্ষত্রের মত শূন্যের ভিতরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা বলে যে, গোটা বিশ্বজগৎটাই ক্রমশ স্ফীততর হচ্ছে। আপনার পড়বার ঘরে কাগজপত্র চাপা দেওয়ার জন্যে যে পাথরটি রয়েছে সেটি পর্যন্ত স্থির নেই। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এর যে গতি রয়েছে তার কথা ছেড়ে দিলেও, যে অণু-পরমাণু

দিয়ে এটির দেহ তৈরী তারা তো কখনও স্থির নেই। তারা সর্বদাই স্পন্দিত ও কম্পিত হচ্ছে। এমন কি, পরমাণুর অভ্যন্তরে যে ভারী নিউক্লিয়াসটি রয়েছে সেটি পর্যন্ত পরমাণুর ভরকেন্দ্রের (centre of mass) চারপাশে ঘুরছে। বাস্তব সত্যের কোন অনড়, অচল রূপ থাকতে পারে না। হেগেলের মতে 'অ্যাবসট্রাক্ট ট্রুথ' বলে কোনো 'ট্রুথ' নেই; 'ট্রুথ' বা সত্য সর্বদাই 'কংক্রিট্'। 'স্পেস' ও 'টাইমে'র গণ্ডীর ভিতরে বিশেষ কাঠামোর সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে সত্যের প্রকাশ। 'স্পেস' ও 'টাইম' উত্তীর্ণ "পরম সত্য" প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব সত্য। বিশ্ব-জগতের প্রতিটি জিনিস—কি বস্তু, কি মতবাদ—প্রত্যেকেরই যেমন গতি আছে, তেমনি গতির কতকগুলি নিয়মও আছে। বস্তু ও মতবাদ উভয়কেই সেই নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়। এই নিয়মগুলি কি—হেগেল তারই অনুসন্ধান করেন। ফলে গতিবিজ্ঞানের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হয়—যে নিয়মগুলি যে-কোন প্রকার গতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ এই গতিবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের মূল সূত্রগুলি যেমন সাধারণ, তেমনি সংখ্যায়ও অল্প। এদের ভিতরে নিম্নলিখিত তিনটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) পরিমাণগত পার্থক্য থেকে গুণগত পার্থক্যের উৎপত্তি কিংবা গুণগত পার্থক্য থেকে পরিমাণগত পার্থক্যের উৎপত্তি (The law of transformation of quantity into quality and vice versa) (২) বিপরীত-ধর্মী প্রকৃতির একত্র সমাবেশ (The law of interpenetration of opposites) এবং (৩) নেতির নেতি (The law of negation of negation)। হেগেল তার ভাববাদী পদ্ধতিতে চিন্তা-জগতের নিয়ম হিসেবে এই তিনটি সূত্রের বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রথমটির আলোচনা করেছেন তাঁর লজিক নামক বইয়ের গোড়ায় দিকে "The doctrine of being" অধ্যায়ে। দ্বিতীয় সূত্রটি লজিক বইয়ের গোটা দ্বিতীয় অংশটা এবং "The doctrine of essence" নামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়টি জুড়ে রয়েছে। তৃতীয় সূত্রটি হেগেলীয় দর্শনের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও মূলগত সূত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের এই তিনটি সূত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের প্রযোজ্যতা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(১) এই নিয়মানুসারে, প্রকৃতিতে একমাত্র পরিমাণের পরিবর্তনের ফলেই গুণের পরিবর্তন ঘটতে পারে কিংবা তার উল্টোটা। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, বস্তু অথবা শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলেই কেবলমাত্র গুণের পার্থক্য দেখা দিতে পারে। রসায়নের ছাত্রেরা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অ্যালোট্রো-পিক অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। হীরক ও গ্র্যাফাইট একই অঙ্গারের দুটি ভিন্ন অ্যালোট্রপিক অবস্থা, অথচ এদের গুণগত প্রভেদ সাধারণের চোখেও ধরা পড়বে। এ-প্রভেদের কারণ এই যে, হীরক ও গ্র্যাফাইটের ভিতর অণুগুলি ভিন্নভাবে সাজানো; উভয়ের শক্তির পরিমাণও আলাদা। গন্ধকের বেলায় এমনি অনেক অ্যালোট্রপিক অবস্থার দেখা পাওয়া যায়। যৌগিক পদার্থের বেলায়ও এ-কথা খাটে। একই ক্যালসিয়াম কার্বনেট চক হিসেবেও পাওয়া যায়, আবার মার্বল পাথর হিসেবেও পাওয়া যায়। অথচ দুটির রূপ একেবারে আলাদা—একটি পাউডার, অন্যটি ক্রিস্ট্যাল। এর কারণও ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অণুগুলির বিভিন্ন অবস্থান। বস্তুর গঠন সম্পর্কে কথাটা অন্যদিক দিয়েও খাটে। ধরা যাক, কোন একটি বস্তুর একটু টুকরো নিয়ে তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে ভাগ

করতে সুরু করলাম। প্রথমতঃ গুণের কোনই পার্থক্য ঘটতে দেখা যাবে না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটি সীমারেখায় এসে হাজির হব যেখানে ক্রমবিভাগের ফলে কেবলমাত্র একটি অণু পাওয়া যাবে। অণুটিকেও যদি আবার ভাগ করা যায় তাহলে পাওয়া যাবে পরমাণু, যার ধর্ম অণু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধরা যাক, অণুটি ছিল ক্যালসিয়াম কার্বনেটের, তাকে আবার ভাগ করলে পাওয়া যাবে ক্যালসিয়ামের একটি, অঙ্গারের একটি এবং অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু। অর্থাৎ মার্বল বা চক নিয়ে আমরা সুরু করেছিলাম; কিন্তু ভাগ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আমরা এমন তিনটি জিনিস পেয়ে গেলাম যাদের কারু সঙ্গেই মার্বল বা চকের অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। এমন কি, অণুটি যদি চক বা মার্বেলের মত কোন যৌগিক পদার্থের না হয়ে মৌলিক উপাদানের হতো তাহলেও এ নিয়ম খাটত। একটি অক্সিজেনের অণুকে ভেঙে ফেললে অক্সিজেনের যে দুটি পরমাণু পাওয়া যায়, তাদের ধর্ম অণুটি থেকে আলাদা। অক্সিজেনের পরমাণুর রাসায়নিক শক্তি অক্সিজেনের অণু থেকে অনেক বেশী এবং পরমাণুর সাহায্যে এমন অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটান সম্ভব, বাতাসের সাধারণ আণবিক অক্সিজেনের সাহায্যে যা আদৌ সম্ভব নয়। অথচ ক্রমবিভাগ ছাড়া অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন পরিবর্তনই ঘটান হয় নি। এই ক্রমবিভাগই বিভাজনের বিশেষ একটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ নূতন ধর্মের জন্ম দিল। বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের পর আমরা হেগেলের যুক্তির সূত্র ধরে আরও অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারি। ডালটনের অবিভাজ্য পরমাণুর ধারণাকে আমরা অনেকদিন হলো পেছনে ফেলে এসেছি। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরমাণু তো দূরের কথা, পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে ছাড়েন নি। অথচ পরমাণুকে ভাঙলে যে ইলেকট্রন ও পজিটিভ নিউক্লিয়াস পাওয়া যায় তার সঙ্গে পরমাণুর সাদৃশ্য কি? কিছুই নয়। পজিটিভ নিউক্লিয়াসকে আবার ভেঙে ফেললে পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতিসম্পন্ন জিনিস—একদিকে পজিট্রন, অন্যদিকে নিউট্রন। এমন কি, পরমাণুর কৃত্রিম ধ্বংসের ফলে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন পাওয়ার পর সন্দেহ করা হচ্ছে যে, নিউট্রনটি পর্যন্ত মৌলিক কোন বস্তু নয়, একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সমাবেশে এর দেহ গঠিত। বিজ্ঞানের প্রতিটি অগ্রগতির ফলে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সপক্ষে নূতন নূতন জোরালো সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। পরমাণুর কথা ছেড়েই দিলাম। যে অণুগুলি দিয়ে একটি বস্তুর দেহ গঠিত, তার সঙ্গেও বস্তুটির বৈসাদৃশ্য কি কম? বস্তুটি সমগ্রভাবে চলাফেরা করতে অক্ষম, অথচ তারই ভিতর অণুগুলি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, বিভিন্ন তাপমাত্রায় এরা একই বস্তুকে বিভিন্ন অ্যালোট্রপিক অবস্থায় পরিবর্তিত করছে। পরিমাণগত পার্থক্যের ফলে গুণগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়—একথার সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে হেগেল তাঁর বইয়ে বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন (হেগেল: "লজিক": সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৩) রসায়নশাস্ত্রের দৃষ্টান্তই বেশী। অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক—অক্সিজেনের তিনটে পরমাণু নিয়ে যে অণুটি গঠিত হয় তাকে বলে ওজোন। গন্ধে ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাধারণ অক্সিজেন (যা দুটি পরমাণু দিয়ে গঠিত) থেকে তার প্রভেদ অনেক। আবার যদি অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন কিংবা গন্ধক বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে তাদের ভিতরে রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটান যায়, তাহলে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হবে যাদের প্রত্যেকটির ধর্ম অন্যটি থেকে ভিন্ন—যথা, লাফিং গ্যাস (N_2O) একটি গ্যাস এবং N_2O_5 সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন কৃষ্টাল। অথচ দুটির ভিতর পার্থক্য কেবল চারটি অক্সিজেন

পরমাণুর। N_2O এবং N_2O_5-এর ভিতরে যে আর তিনটি অক্সাইড আছে, যথা—NO, N_2O_3, NO_2 তাদের সম্পর্কেও এই এক কথাই প্রযোজ্য।

জৈব রসায়নের সমগোষ্ঠীয় সিরিজগুলির বেলায় একথা আরও ভালভাবে খাটে। সাধারণ প্যারাফিনগুলির ভিতর নিম্নতম সভ্য হল—মিথেন (CH_4), দ্বিতীয় সভ্য ইথেন (C_2H_6) এবং তারপর যথাক্রমে প্রোপেন (C_3H_8), বিউটেন (C_4H_{10}) প্রভৃতি। এদের সাধারণ বীজগাণিতিক ফর্মুলা C_nH_{2n+2} অর্থাৎ প্রত্যেকটি উচ্চতর সভ্যের অণুর ভিতরে ঠিক নিম্নতর সভ্যের অণু অপেক্ষা একটি অঙ্গারের পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু বেশী আছে। সমস্ত গুণগত প্রভেদের উৎপত্তি এই পরিমাণগত প্রভেদের ফলেই। এই সিরিজের প্রথম তিনটি সভ্য গ্যাস, তারপরের সভ্যগুলি তরল এবং একেবারে উপরের দিকের সভ্যগুলি—যথা, $C_{16}H_{34}$ কঠিন। প্রাথমিক অ্যালকহল ও মনো-বেসিক অ্যাসিডগুলির সিরিজের বেলায়ও একথা খাটে। গুণগত পার্থক্য কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয়। সিরিজের নিম্নতম সভ্যগুলির বেলায় অঙ্গারের পরমাণুর চতুর্দিকে হাইড্রোজেনের পরমাণুগুলিকে কেবলমাত্র একই উপায়ে সাজানো যেতে পারে, কিন্তু উচ্চতর সভ্যের বেলায় এদের নানাভাবে সাজানো সম্ভব। ফলে একই যৌগিক পদার্থ নিজেকে নানাপ্রকারে সাজিয়ে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জৈব রসায়নের ভাষায় একে আইসোমেরিজম বলে এবং একই যৌগিক পদার্থের বিভিন্ন রূপগুলিকে আইসোমারস্ বলা হয়। মিথেন, ইথেন, প্রোপেনের কোন আইসোমার নেই; বিউটেন ও পেন্টেনের যথাক্রমে দুটি ও তিনটি আইসোমার আছে। কোন সিরিজে একটি অণুর ভিতরে বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের কটি করে পরমাণু আছে জানা থাকলে পূর্বাহ্নেই কষে আইসোমারের সংখ্যা বের করে দেওয়া যায়। এখানে সর্বশক্তিমান বিধাতার খামখেয়ালীর অবকাশ বড় কম। মানুষ তার তৈরী বিধাতাকে এখানে সুদৃঢ় নিয়মের বন্ধনে বন্দী করে ফেলেছে। হেগেলের এই প্রথম নিয়মটির ব্যবহার বাস্তবজীবনে আমরা অনেক সময়েই করে থাকি নিজেদের অজ্ঞাতসারে: অল্পস্বল্প ইথাইল অ্যালকহল রোগের সময় কিংবা শরীরের উদ্দীপনা আনার জন্যে অনেকেই খেয়ে থাকেন; কিন্তু ঐ জিনিসটিই যদি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করা যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। একদিকে উদ্দীপনাপূর্ণ জীবন, অন্যদিকে মৃত্যু—মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশী গুণগত পার্থক্য আর কিছু থাকতে পারে না। অথচ সমস্ত পরিণতিটাই নির্ভর করছে মাত্রাভেদের ওপর। আমরা এতক্ষণ রসায়ন-শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এখন পদার্থবিদ্যা থেকে কিছু উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। কিছু জল নিয়ে যদি তাকে গরম কিংবা ঠাণ্ডা করা যায়, তাহলে প্রথমে কেবল উত্তাপ বাড়তে বা কমতেই থাকবে, গুণগত কোন পরিবর্তনই হবে না; কিন্তু ক্রমে এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছুতে হবে যার পরে তাপ বাড়ালে বা কমালে যথাক্রমে বাষ্প অথবা বরফের সৃষ্টি হবে। (হেগেল: "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া": সংগৃহীত রচনাবলী: ষষ্ঠ খণ্ড: পৃষ্ঠা ২১৭)। প্রত্যেকটি বস্তুর জন্যেই একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে যখন সে জমে, গলে কিংবা বাষ্পীয় অবস্থায় উপনীত হয়। প্রত্যেকটি গ্যাসেরও তেমনি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে যখন উপযুক্ত পরিমাণ তাপ দিলে তাকে তরলাবস্থায় পরিণত করা যায়; গ্যাসটি এই তাপমাত্রার উপরে থাকলে যত তাপই দেওয়া হোক না কেন কখনই তাকে তরলাবস্থায় আনা যাবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে 'ফিসিক্যাল কনষ্টাণ্ট'গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বস্তুর এক একটি 'নোডাল পয়েণ্ট' ছাড়া আর কিছুই নয়, যে পয়েণ্টগুলিতে পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটালে সঙ্গে সঙ্গেই গুণগত পার্থক্য

দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে অ্যামাগাটের পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেগেল আরও একটি কথা বলেছিলেন। সেটি হচ্ছে—প্রাকৃতিক জগতে ধীর ক্রমবিবর্তন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি দ্রুত আকস্মিক পরিবর্তনও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বরঞ্চ ঠিক যে বিন্দুটিতে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়, সেখানে পরিবর্তন স্বভাবত দ্রুত ও আকস্মিকই হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ জল ৯৯° ডিগ্রিতেও ফোটে না। কিন্তু আর এক ডিগ্রি উত্তাপ বাড়লেই জল ফুটতে থাকে, তরল জল দ্রুত বাষ্পীয় জলের আকার ধারণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সবটুকু জল বাষ্পে পরিণত না হয় ততক্ষণ পযন্ত তরল জল ও বাষ্পের উত্তাপ ১০০° ডিগ্রিতেই আবদ্ধ থাকে। তেমনি তরল জল ঠাণ্ডা হতে হতে হঠাৎ-ই ০° ডিগ্রিতে বরফে পরিণত হয়, আস্তে আস্তে ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে নয়। অবশ্য ঠাণ্ডা হওয়াটা আস্তে আস্তেই হয়, কাজেই সেখানে ক্রমবিবর্তনের নিয়ম খাটবে। ঠিক তেমনি কোন গ্যাস তার 'ক্রিটিক্যাল' তাপমাত্রার নীচে হঠাৎ-ই তরলাবস্থা ধারণ করে—এ-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে 'অ্যামাগাটের কাভ' দ্রষ্টব্য। যে কোন আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করলে সেখানেও এই ব্যাপারই দেখা যাবে। সূর্যের সাদা আলোর ভিতরে সাতটি বিশুদ্ধ রং আছে, অথচ এই সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর বিভিন্নতার উৎস কোথায়? এদের প্রত্যেকটি আলোর কম্পনাংক বিভিন্ন, দৃশ্য আলোর ভিতরে লালের কম্পনাংক সবচেয়ে বেশী, বেগনির কম্পনাংক সবচেয়ে কম। কোন দুটি পাশাপাশি বিশুদ্ধ বর্ণের ভিতরেও বহু মাঝারি কম্পনাংকযুক্ত আলো থাকে; কিন্তু তাদের ভিতরকার বর্ণগত বৈষম্য ধরা মানুষের পক্ষে কঠিন। কম্পনাংক ক্রমশ বাড়বার বা কমবার ফলে শেষ অবধি এমন একটি বিন্দু আসে যেখানে গোড়াকার বর্ণটির সঙ্গে শেষ বর্ণটির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; দুটি রঙকে আলাদা করে চেনা যায়। এখানেও কম্পনাংকের পরিমাণগত ভেদের ফলেই বর্ণের গুণগত পার্থক্য ঘটছে। মৌলিক উপাদান গুলির আভ্যন্তরীণ গঠন বিচার করলেও আমরা দেখতে পাই যে, ৯২টি মৌলিক উপাদানের প্রত্যেকটিই নিউট্রন, পজিট্রন ও ইলেক্ট্রনের সমাবেশে তৈরী, যদিও এদের পরিমাণ বিভিন্ন মৌলিক উপাদানে বিভিন্ন রকম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেনের নিউট্রন সংখ্যা ১, পজিট্রন ১, ও ইলেকট্রন ১ পরবর্তী উপাদান হিলিয়ামের নিউট্রন ৪, পজিট্রন ২ ও ইলেকট্রন ২ এবং হিলিয়ামের পরবর্তী উপাদান লিথিয়ামের নিউট্রন সংখ্যা ৭, পজিট্রন ৩ ও ইলেকট্রন ৩। হাইড্রোজেন একটি গ্যাস, মোটামুটি সব উপাদানের সঙ্গেই এর রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। হিলিয়ামও একটি গ্যাস, তবে রাসায়নিক সংমিশ্রণের শক্তি এর একদম নেই বললেই চলে। পরবর্তী উপাদান লিথিয়াম একটি কঠিন ধাতু, বাতাস ও জলের সঙ্গে অতি দ্রুত এর রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটে। জলের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ক্ষার সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন কিংবা হিলিয়ামের এরকম রাসায়নিক ধর্ম একেবারেই নেই। হাইড্রোজেনের ১টি নিউট্রন থেকে হিলিয়ামের ৪টি নিউট্রন এবং হিলিয়ামের ৪টি নিউট্রন থেকে লিথিয়ামের ৭টি নিউট্রন—এগুলি আকস্মিক পরিবর্তনেরও অন্যতম উদাহরণ।

(২) হেগেলীয় যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে প্রত্যেকটি বস্তুর, প্রক্রিয়ার, কিংবা যে কোন বাস্তব সত্যের দুটি পরস্পর বিরোধী, বিপরীত রূপ আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতই নতুন আবিষ্কার হচ্ছে ততই প্রকৃতির পরস্পর বিরোধী সত্তার একত্র সমাবেশের পরিচয় আরও বেশী করে পাওয়া যাচ্ছে। এ অংশটি নিয়ে আলোচনার আগে হেগেলের আরেকটি বক্তব্যের

কথা এইখানে বলে নেওয়া দরকার। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুই গতিশীল, কেবল এই কথা বলেই হেগেল থেমে যান নি। এই গতির উৎস কোথায় হেগেল তারও অনুসন্ধান করেছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে হেগেল দেখতে পেলেন, গতির রহস্য ঐ বাস্তব সত্যের পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির মধ্যেই লুকোনো রয়েছে। প্রতিটি বস্তুরই একটি 'হাঁ-ধর্মী' ও একটি 'না-ধর্মী' প্রকৃতি আছে। সৃষ্টি অর্থাৎ গতি সম্ভবপর হয় এই দুটি বিপরীত-ধর্মী প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। এই থেকেই 'দ্বন্দ্ববাদ' কথাটির জন্ম হয়েছে। রসায়ন শাস্ত্রের কথাই ধরা যাক। ফ্যারাডের পরীক্ষার পর আমরা জানতে পেরেছি যে, দু'-ধরণের বিপরীত বিদ্যুৎসম্পন্ন মৌলিক উপাদান পৃথিবীতে আছে, একটিকে বলা চলে 'ইলেকট্রো-পজিটিভ', অন্যটিকে 'ইলেকট্রো-নেগেটিভ'। সমগ্র রসায়নশাস্ত্রই দাঁড়িয়ে আছে উপাদানের এই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ-প্রকৃতির ওপর। সমস্ত রাসায়নিক সংমিশ্রণ শেষ অবধি এরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লিথিয়াম একটি পজিটিভ-ধর্মী উপাদান, আবার ক্লোরিন একটি অতীব নেগেটিভ-ধর্মী উপাদান। এদের উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় লিথিয়াম ক্লোরাইড যার পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রকৃতি কিছুই নেই। আবার লিথিয়াম জলে মিশলে হয় ক্ষার, ক্লোরিন জলে গুলে হয় অ্যাসিড। ক্ষার ও অ্যাসিড—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জিনিস। সেই কারণেই এদের ভিতরকার আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল। এদের সংমিশ্রণে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় রসায়নের ভাষায় তাকে বলে—সল্ট্। রসায়নে এমনি ধরণের অসংখ্য সল্টের কথা জানা আছে। অবশ্য লিথিয়াম ও ক্লোরিন—উভয়ের ভিতরেও আবার পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি লুকিয়ে রয়েছে। লিথিয়ামও বিশুদ্ধ পজিটিভ নয়, আবার ক্লোরিনও বিশুদ্ধ নেগেটিভ নয়, তাই ক্লোরিন হাইড্রাইডের (HCl) মত লিথিয়াম হাইড্রাইড্ (LiH) তৈরী করা কিংবা লিথিয়াম ক্লোরাইডের (LiCl) মত আয়োডিন ক্লোরাইড (ICl) উৎপন্ন করাও সম্ভব হয়। লিথিয়ামের ভিতরেও কিছুটা নেগেটিভ প্রকৃতি আছে, আবার ক্লোরিনের ভিতরেও কিছুটা পজিটিভ প্রকৃতি আছে। এরই ফলে রসায়ন শাস্ত্রে সৃষ্টিবৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। রসায়নের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি বিপরীতধর্মী প্রকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :—যথা, হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়া; এরই বিপরীতধর্মী অক্সিডেশন প্রক্রিয়া, পলিমারিজেশন এবং ডিপোলিমেরিজেশন; একদিকে অ্যানালিসিস্ অন্যদিকে সিন্থেসিস্—এই উভয় পদ্ধতির সাহায্যে বহু জটিল অণুর আভ্যন্তরীণ গঠন নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে; একদিকে মৌলিক উপাদান, অন্যদিকে যৌগিক পদার্থ। হেগেল আরও একটি কথা বলেছিলেন, এখানে সেটি প্রাসঙ্গিক। সেটি হলো, 'অ্যাবসল্যুট্' সত্য বলে কোন সত্য নেই, সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক। অবশ্য আপেক্ষিক বলেই তারা কিছুমাত্র কম সত্য নয়। মৌলিক ও যৌগিক কথা দুটোই আপেক্ষিক, এদের কোন অ্যাবসল্যুট্ অর্থ নেই। বিশেষ একটি গণ্ডীর ভিতরে মৌলিক উপাদান ও যৌগিক পদার্থের মানে নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু তার বাইরে নয়। যাকে মৌলিক উপাদান বলে এতদিন আমরা মনে করে এসেছি, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে, সেগুলি বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। একই মৌলিক উপাদানের এই বিভিন্ন ওজনের পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বলে। এ ছাড়াও মৌলিক উপাদানগুলির বিভিন্ন অ্যালোট্রপিক অবস্থা থাকতে পারে। তেমনি আবার যৌগিক পদার্থগুলি কৃষ্ট্যাল-ধর্মীও হতে পারে কিংবা পাউডার-ধর্মীও হতে পারে। এ-বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়ে গেছে।

পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়, কিংবা স্থায়ী ও অস্থায়ী পরমাণু সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সাম্প্রাতিক আবিষ্কারের ফলে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যে সব পরমাণুর পরিবর্তনের কথা আমরা কোন দিন ভাবতেও পারি নি, বর্তমানে সেগুলিকেও কৃত্রিম উপায়ে অন্য মৌলিক উপাদানের পরমাণুতে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়েছে। তবুও রেডিয়াম, ইউরেনিয়ামের মত যে সব ভারী পরমাণু আপনা থেকেই ভেঙে পড়ছে, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে—সোডিয়াম, পটাসিয়ামের পরমাণুকে স্থায়ী নিশ্চয়ই বলতে হবে। আপেক্ষিকতার মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে স্থায়ী, অস্থায়ী কথা দুটার পার্থক্য আজও বজায় আছে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—কথাগুলির বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। লোহা একটি কঠিন পদার্থ, অথচ লোহারই একটি পরমাণুকে আমরা কী বলব? কঠিন, তরল না গ্যাসীয়? লোহার পরমাণুকে আমরা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় কিছুই বলতে পারি না। ঠিক তেমনি হাইড্রোজেন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হালকা গ্যাস, অথচ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে গ্যাসীয় বলা চলে না। কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়—এগুলি হচ্ছে সমষ্টির ধর্ম, বিচ্ছিন্ন অণু বা পরমাণুর ধর্ম নয়। কাজেই কঠিন, তরল প্রভৃতি যে কথাগুলি প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের চোখে অ্যাবসল্যুট সত্য বলে মনে হয়েছিল, আসলে দেখা যাচ্ছে সেগুলিও আপেক্ষিক সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এতক্ষণ আমরা রসায়নের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার পদার্থবিদ্যার দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যাক। নিউটনের গতির তৃতীয় নিয়মটিই তো দ্বন্দ্ববাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতিতে প্রত্যেক ক্রিয়ার উত্তরে সমপরিমাণ বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া আছে। বুলেট ছুড়লে কেবল বুলেটটাই এগিয়ে যায় না, বুলেট যে ছোড়ে তাকেও সে কিছুটা পেছনে ঠেলে দেয়। পদার্থবিদ্যায় দ্বান্দ্বিকতার আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:—বলবিদ্যায় একদিকে পোটেনশ্যাল অন্যদিকে কাইনেটিক এনার্জি; একদিকে আকর্ষণ, অন্যদিকে বিকর্ষণ; চুম্বকের একদিকে উত্তর মেরু, অন্যদিকে দক্ষিণ মেরু—চুম্বকের একটি মেরুকে অন্য মেরু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেমন অসম্ভব, দুদিকে সমধর্মী মেরুসম্পন্ন চুম্বক তৈরী করাও তেমনি অসম্ভব; বিদ্যুতের বেলায়ও তাই—একদিকে পজিটিভ, অন্যদিকে নেগেটিভ; এই দুটি বিপরীতধর্মী মেরু আছে বলেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ বইতে পারে, নতুবা বৈদ্যুতিক গতি অসম্ভব হতো। রোজই আমরা পরীক্ষাগারে ব্যাটারী নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের এই সূত্রটির ব্যবহার করে থাকি। গতিশীল ও স্থির—কথা দুটোও তেমনি আপেক্ষিক সত্য। প্রফেসর আইনষ্টাইন তাঁর Theory of Relativity-তেই বিশেষভাবে প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্বজগতের কোথাও অ্যাবসল্যুট স্থিরতা কিংবা অ্যাবসল্যুট গতি বলে কিছু থাকতে পারে না। 'ম্যাটার' এবং 'এনার্জি'ও দ্বন্দ্ববাদের অন্যতম উদাহরণ। বর্তমান শতাব্দীতে ডি ব্রগলি, শ্রোডিঙ্গার প্রভৃতি পদার্থবিদ্ প্রমাণ করেছেন যে, 'ম্যাটারে'র একদিকে যেমন বস্তু-প্রকৃতি অন্যদিকে তেমনি তরঙ্গ-প্রকৃতিও আছে। উল্টো দিক থেকে প্লাঙ্ক, হাইসেনবার্গ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এনার্জিরও তরঙ্গ এবং কণিকা—এই দুটি বিপরীতধর্মী প্রকৃতি রয়েছে। প্রফেসর নীল্‌স্ বোর দ্বন্দ্ববাদের ছাত্র না হলেও এসম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি যে ভাব ও ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা দ্বন্দ্বমূলক চেতনারই পরিচায়ক। তরঙ্গ ও কণিকা—এরা উভয়েই একই বাস্তব সত্যের বিপরীতধর্মের প্রতীক, এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

গণিতের মত বিশুদ্ধ চিন্তার জগতেও আমরা এই একই দ্বন্দ্ববাদের সাক্ষাৎ পাই। যোগ ও বিয়োগ, গুণ ও ভাগ, পজিটিভ ও নেগেটিভ, সরলরেখা ও বক্ররেখা, বাস্তব সংখ্যা ও কাল্পনিক সংখ্যা,

ডিফারেনশ্যাল ও ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস—এগুলি চিন্তার জগতে বহিঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্বভাবের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সমান্তরাল সরলরেখা অনন্তে গিয়ে মেশে—উচ্চতর গণিতের এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছে। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এইটাই গণিত আমাদের বরাবর শিখিয়েছে। কিন্তু পরমাণুর ভিতর দুটি নিউট্রন আর আর দুটি নিউট্রন যোগ করলে অনেক সময়েই চার হয় না; এই চারটি নিউট্রনকে একত্র বাঁধতে গিয়ে কিছুটা 'ম্যাস' এনার্জি হিসেবে ব্যয়িত হয়, তাই পরমাণুর ভিতরে দুয়ে দুয়ে যোগ দিলে প্রায়ই চারের কিছু কম হয়। তাই দুয়ে দুয়ে চার হওয়াটা যেমন সত্যি, না-হওয়াটাও তেমনি সত্যি।

জীবজগতের ভিতরে দ্বন্দ্ববাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো—পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই বিপরীতধর্মী প্রকৃতির অস্তিত্ব। এই দুই বিপরীতধর্মী প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই সমগ্র জীব-জগতের সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। জীবজগতের উচ্চতর পর্যায়ে পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন, কাজেই তাদের আলাদা করে চেনা যায়; কিন্তু নিম্নতর পর্যায়ে একই দেহের ভিতরে পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতি পাশা-পাশি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—হাইড্রা। এই ধরণের প্রাণীকে হার্মাফ্রোডাইট বলে। অ্যামিবার ভিতরে পুরুষ-স্ত্রী প্রকৃতির বিকাশই ঘটে নি। অ্যামিবাকে তাই নিজের দেহ খণ্ডিত করে বংশবিস্তার করতে হয়। জীববিদ্যায় দ্বান্দ্বিকতার দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়—একদিকে অজৈব প্রকৃতি, অন্যদিকে জৈব প্রকৃতি। এরই অন্তর্বর্তী অধ্যায়ে সম্প্রতি এমন ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের প্রাণ আছে, কারণ তারা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে। অথচ এই ভাইরাসগুলি বিশুদ্ধ প্রোটিনের অত্যন্ত বড় অণু ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসায়নিকেরা একে আলাদা করে এর গঠন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ক্ষেত্রফল বের করে ফেলেছেন। এমন কি, সম্প্রতি ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের ছবিও তোলা গেছে। এমন একদিন ছিল যখন জৈব ও অজৈব রসায়নের ভিতরকার ব্যবধান অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে বলে কেউ মনেও করতে পারে নি। মানুষ তখন ভাবতো জৈব পদার্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র উদ্ভিদেরই আছে। কিন্তু ভোলার যেদিন অজৈব পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইউরিয়ার মত একটি জৈব পদার্থ সৃষ্টি করলেন সেদিন থেকেই 'ভাইটাল ফোর্স' জাতীয় মতবাদের অবসান ঘটল। জৈব রসায়ন তার জৈব প্রকৃতি হারিয়ে অঙ্গারযুক্ত যৌগিক পদার্থের রসায়ন হয়ে দাঁড়াল। প্রাণ সম্পর্কেও আজ ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষ আজও মনে করে যে, বস্তু ও মন, জীবন ও মৃত্যু, প্রাণী ও নিষ্প্রাণ—এদের মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় চীনের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, বিধাতার সাহায্য ছাড়া তাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা আশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞানী তার পরীক্ষাগারে ভাইরাসগুলি যে প্রোটিন দিয়ে তৈরী, তার অণু গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। মানুষেরই হাতে জীবনের আদিম সংস্করণ জন্ম নেবে।

(৩) হেগেলের গতি বিজ্ঞানের তৃতীয় সূত্রটিরও পূর্বোক্ত সূত্র দুটির মত অজস্র উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রবন্ধের আয়তনের দিকে চোখ রেখে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব। কিন্তু দৃষ্টান্ত দেওয়ার আগে 'নেতির নেতি' কথাটির অর্থ সুবোধ্য করা দরকার। হেগেলের মতে কি প্রকৃতিতে, কি মানুষের সমাজে কোথাও গতি আগাগোড়া সরল রেখা ধরে চলে না, "স্পাইরাল" বেয়ে বেয়ে এগোয়। অর্থাৎ আমি যদি কোন একটি বিন্দু থেকে যাত্রা সুরু করি, তাহলে কিছুক্ষণ চলবার পর আমাকে মোড় ফিরতে হবে, অর্থাৎ এর পর থেকে দিক পরিবর্তন করে আমি ঠিক উল্টো দিকে চলতে থাকব। এই হলো প্রথম নেতি (First negation)। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর আবার গতি তার দিক পরিবর্তন করে। ফলে,

প্রথমবার মোড় ঘোরবার পর যেদিক লক্ষ্য করে আমি চলছিলাম, এবার চলা সুরু হলো তার বিপরীত দিকে। এই হলো দ্বিতীয় নেতি (2nd. negation) অর্থাৎ নেতিরও নেতি (negation of the negation)। কাজেই একেবারে গোড়ায় যেদিক ধরে যাত্রা সুরু করেছিলাম, দুবার মোড় ফেরার পর সেদিকেই আবার ফিরে এলাম পুনরাবৃত্তি ঘটলো। কিন্তু তাই বলে পুরনো বিন্দুটিতে আর ফিরে এলাম না, স্পাইরাল-ধর্মী গতির ফলে আমি পুরনো বিন্দুটি থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছি। কাজেই হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটছে না, পুনরাবৃত্তি ঘটছে কিন্তু উচ্চতর স্তরে। হেগেল একেই প্রতিজ্ঞা (Thesis), তারপর বিপরীত প্রতিজ্ঞা (Anti-thesis) এবং পরিশেষে সম্মিলিত প্রতিজ্ঞা (Synthesis) বলে অভিহিত করেছেন। তরঙ্গ, যা গতিরই একটি বিশেষ ভঙ্গিমা—তাও এগিয়ে চলে এই সূত্র অনুযায়ীই। অর্থাৎ উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়েই একটানা উত্থান বা একটানা পতন—গণিতের বিচারে যেমন অসম্ভব, বাস্তব-জীবনেও তেমনি। অথচ উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে তরঙ্গ পুরণো জায়গাটিতে আর ফিরে আসে না, সে এগিয়েই চলে। বস্তুর গঠন সম্পর্কে প্রাউট যখন তার মতবাদ উপস্থিত করেন তখন তাকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রাউট বললেন যে, বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের পরমাণুগুলি একই প্রাথমিক উপাদানে তৈরী এবং এই প্রাথমিক উপাদান হলো হাইড্রোজেনের পরমাণু। প্রাউটের মতবাদ তখন এই কারণেই গৃহীত হয়েছিল যে, মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণুর ওজন তখন ভালভাবে নিরূপিত না হওয়ায় ওজনগুলি সবই পূর্ণ-সংখ্যায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে ষ্টাস্ প্রভৃতি পরীক্ষাবিদদের সূক্ষ্ম পরিমাপের ফলে দেখা গেল—কোন পরমাণুর ওজনই পূর্ণসংখ্যা নয়। হাইড্রোজেন পরমাণুকে ১ বলে ধরে নিলে সব পরমাণুর ওজনই ভগ্নাংশ দাঁড়ায়। প্রাউটের মতবাদ তাই এই অধ্যায়ে বাতিল হয়ে যায়। এই হলো—প্রথম নেতি। এর বহুদিন পর জানা গেছে যে, পরমাণুগুলি সবই নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি দিয়ে তৈরী এবং মৌলিক উপাদানগুলির বিশুদ্ধ পরমাণুর ওজন প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ সংখ্যাই ; কিন্তু একই মৌলিক উপাদানের ভিতরে বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন ওজনের পরমাণু বা আইসোটোপ মেশানো থাকে বলেই শেষ অবধি গড়পড়তা ওজন ভগ্নাংশে দাঁড়িয়ে যায়। এর ফলে প্রাউটের মতবাদ আবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবার হলো—নেতির নেতি। কিন্তু তাই বলে কি আমরা প্রাউটের সময়কার জ্ঞানের স্তরে ফিরে গেছি? বস্তুর গঠন সম্পর্কে আজকে আমাদের জ্ঞান সে সময় থেকে কত বেড়ে গেছে! প্রাউট নিজেই জানতেন না যে, কেন উপাদানের পরমাণুর ওজন পূর্ণসংখ্যা হবে। কিন্তু আজ আমরা সে রহস্য উদ্ঘাটিত করেছি। পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই ঘটেছে, কিন্তু অনেক উচ্চতর স্তরে। আলোর গঠন সম্পর্কে নিউটন যে কণিকা মতবাদ উপস্থিত করেছিলেন সে সম্পর্কেও এই একই কথা। এক সময়ে তরঙ্গ মতবাদ কণিকা মতবাদকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছিল ; কিন্তু আজ প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম মতবাদের ভিতর দিয়ে আলোর কণিকা মতবাদ আবার ফিরে এসেছে ; যদিও এমনভাবে এ পুনরাবৃত্তি ঘটেছে যে, এর কথা নিউটনও ভাবতে পারেন নি। মেণ্ডেলিয়েফের পিরিয়ডিক টেব্‌লও এই সূত্রটির একটি চমৎকার উদাহরণ। ধরা যাক, লিথিয়াম থেকে আমাদের যাত্রা সুরু, লিথিয়ামই হলো 'প্রতিজ্ঞা'—তারপর চললো—বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন প্রভৃতি সম্পূর্ণ অন্যধর্মী বস্তু অর্থাৎ 'বিপরীত প্রতিজ্ঞা'। কিছুক্ষণ চলবার পর আবার ফিরে এলাম সমধর্মী সোডিয়ামে ; কিন্তু হুবহু পুনরাবৃত্তি এবারও ঘটলো না। সোডিয়ামের রাসায়নিক শক্তি লিথিয়ামের চেয়ে বেশী। ঠিক তেমনি দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তির সময় দেখতে পেলাম

সোডিয়াম থেকে পটাসিয়াম অধিকতর শক্তিশালী, যদিও উভয়েই সংধর্মী। প্রকৃতিতেও সর্বদাই এই ব্যাপারই ঘটছে। একটি ধানের বীজ মাটিতে পুঁতলে তা থেকে জন্মায় একটি গাছ। বীজের সঙ্গে তার কোনই সাদৃশ্য নেই। গাছ থেকে হয় ফুল, তারপর ফল, ভবিষ্যৎ ধানগাছের বীজ। কিন্তু একটি বীজ থেকে পেলাম বহু শত কিংবা বহু সহস্র বীজ। পুনরাবৃত্তি হলো অনেক উচ্চতর স্তরে।

পরিশেষে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে একটি কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। হেগেলের উপরোক্ত দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত বস্তুতান্ত্রিকতার সপক্ষেই যুক্তি জোগালেও হেগেল নিজে ছিলেন ভাববাদী। এর কারণ ছিল। হেগেলের আগে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীমহলে যে যান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিকতা (mechanical materialism) প্রচলিত ছিল, তাকে খণ্ডন করতে গিয়ে হেগেল কেবল যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেই নয়, বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে বসলেন। দ্বন্দ্ববাদের তৃতীয় সূত্রের যাথার্থ্য প্রমাণ করে হেগেল প্রতিক্রিয়ার দরুণ ভাববাদী হয়ে উঠলেন। যে পরম-সত্যকে হেগেল তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করেছেন, তারই অন্য সংস্করণ পরম-চিন্তা বা অ্যাবসল্যুট্ আইডিয়ার আশ্রয়ে শেষ অবধি তিনি ফিরে গেলেন।

বস্তুর বিভিন্ন ধর্মের কারণও যে বস্তুর নিজের মধ্যেই নিহিত, এই সহজ কথাটা সোজাসুজিভাবে না মানতে পারার ফলেই হেগেলকে তৃতীয় শক্তির আশ্রয় নিতে হলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দুটি বস্তুর ভিতরে যে আকর্ষণের নিয়ম নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন সেটি বস্তুরই নিজস্ব ধর্ম। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উৎস বস্তুর বাইরে অন্বেষণ করতে যাওয়ার প্রচেষ্টা হাস্যকর। দ্বন্দ্ববাদের সূত্রগুলি হেগেলের চোখে বস্তুজগতের আত্মবিকাশের নিয়ম হিসেবে দেখা দেয় নি, দেখা দিয়েছে পরম-চিন্তার ক্রমবিকাশের নিয়ম হিসেবে। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সূত্রগুলিকে তাই যেন জোর করে চিন্তার জগৎ থেকে বস্তুর জগতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—তারা বস্তুজগতের ভিতর থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে ওঠে নি। হেগেলের ভাববাদ তার দ্বন্দ্ববাদকে অকারণ রহস্যময় ও অবাস্তব করে তুলেছে। এই অনাবশ্যক রহস্যময়তার হাত থেকে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে মুক্ত করে তাঁরই শিষ্য কার্ল মার্ক্স একে বস্তুতান্ত্রিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

ধান গাছের রোগ নিবারণ ও চাউল-সংরক্ষণ প্রণালী

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

অবিভক্ত বাংলার প্রায় ত্রিশ লক্ষ একর কর্ষিত ভূমির মধ্যে ২৬ লক্ষ একর জমিতেই ধানের চাষ হয়ে থাকে। প্রতি একর জমিতে সমস্ত ভারতে ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০ মণ। ভারতের মোট উৎপাদনের তালিকায় বাংলার উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা উনত্রিশ। কিন্তু বাঙালীর প্রধান খাদ্য এই ফসলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ৫৫০,০০০ টন ধান বীজের জন্যে সঞ্চিত রেখে খাদ্য হিসাবে আরও দু'লক্ষ টন ধান আমাদের প্রয়োজন। বর্তমানে উভয় বঙ্গেরই লোক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির কোন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা এপর্যন্ত কোথাও ব্যাপকভাবে করা হয়নি, দেশের চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে আমদানীর পরিমাণ ক্রমশই বাড়াতে হয়েছে। অবশ্য ভারতের খাদ্য-মন্ত্রী বার বার আশ্বাস দিয়েছেন যে, ১৯৫০ এর ভিতরেই ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবে, বিদেশ থেকে আমদানীর আর প্রয়োজন হবে না। এর জন্যে দরকার কৃষি-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগান। উপযুক্ত সঞ্চয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবও ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের একটি প্রধান কারণ। মন্বন্তর-ক্লিষ্ট বাঙালী প্রচণ্ড ধৈর্য সহকারে দেখেছে—রাশি রাশি পচা, কীট-দষ্ট চাউল, আটা ফেলে দেওয়া হচ্ছে—গবাদি পশুকে খাওয়ান হয়েছে—নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং পরিশেষে অগ্নিতে তাদের সৎকার করা হয়েছে—অথচ এক মুঠো ভাত, এক বাটী ফেনের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার করে মরেছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায়-কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি—যন্ত্র সাহায্যে কর্ষণ, বপন ও কর্তন—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলসেচন—উন্নততর কৃত্রিম সার ব্যবহার—সমবায় প্রণালীতে চাষ ইত্যাদি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উদ্ভিদকে বাঁচান, তার দেহকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা, বীজকে সুস্থ ও অবিকৃত রাখা, শস্যের উপযুক্ত সঞ্চয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। আমাদের প্রধান ও অতিপ্রিয় ফসল ধান ও ধান গাছকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চাউল দীর্ঘ দিন অবিকৃতভাবে সঞ্চিত রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মানুষের যেমন শত্রুর অভাব নেই, উদ্ভিদেরও তেমনি শত্রুর সংখ্যা কম নয়। উদ্ভিদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর পাঁচটি শত্রুর কথা জানতে পারা গেছে। সাধারণত (১) জমির অবস্থা (২) আবহাওয়ার গতি ও অবস্থা (৩) ছত্রক বা ছাতা (৪) নানাপ্রকার জীবাণু ও বড় গাছ (৫) পঙ্গপাল ও পোকামাকড়ের অত্যাচার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আঘাত ইত্যাদির উপরই উদ্ভিদের আয়ু নির্ভর করে। গাছকে রোগ থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের জীবন চরিত জানা দরকার, তাদের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। শত্রুরও স্বভাবচরিত্র এবং গতিবিধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে চলবে না; তাহলেই রোগের ওষুধ নির্বাচন সঠিক হবে—চিকিৎসাও ঠিক পথে চালান সম্ভব হবে।

সাধারণত গাছের শিকড়ই ব্যাধির প্রবেশ পথ। দৃষ্টির অন্তরালে এই শিকড় আক্রান্ত হয়

বলে ঠিক সময়ে রোগ ধরা পড়ে না। আক্রমণ প্রবল হয়ে যখন উদ্ভিদ-দেহ শীর্ণ হয়ে ওঠে, পাতা ঝড়ে পড়তে আরম্ভ করে, দেহ ক্রমশ শুকিয়ে আসে তখন আর চিকিৎসার সময় থাকে না। শিকড় থেকে অসংখ্য মূলকেশ মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে' জলীয় খাদ্য শোষণ করে। এই মূলকেশগুলি অত্যন্ত নরম, কাজেই পোকা বা ছত্রক দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রয়োজন হলে এই মূলকেশগুলি উন্মুক্ত করে রোগের কারণ নির্ধারণ করা দরকার। বাইরের আঘাতে কোষ-প্রাচীর বা বল্কল যখন ছিন্ন হয়ে যায় তখন এই সকল ক্ষত মুখে ছত্রক ও রোগ-জীবাণু উদ্ভিদ-দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাজেই উদ্ভিদকে বাঁচাতে হলে আক্রান্ত অংশে অপারেশন দরকার—যেন রোগগ্রস্ত একটি কোষও অবশিষ্ট না থাকে। তারপর সেই ক্ষত স্থানে বা কোটরদেশে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে প্লাষ্টার করে দিতে হবে। অবশ্য লক্ষ্য রাখা চাই যে, অপারেশনের ছুরি যেন অভ্যন্তরস্থ স্তরস্তর (যাকে বলা হয় ক্যাম্বিয়াম লেয়ার) এবং রস সঞ্চালন-নালী ছিন্ন করে না দেয়—এজন্যে অভিজ্ঞ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ সার্জনের প্রয়োজন। এই প্লাষ্টার ভেদ করে কোন ছত্রক ইত্যাদি প্রবেশ করতে পারে না এবং উদ্ভিদ-দেহও সহজে ভেঙ্গে পড়তে পারে না। অবশ্য বড় বড় বৃক্ষের পক্ষেই এই ধরণের অস্ত্র প্রয়োগ সম্ভব। ক্ষুদ্র ও শীর্ণকায় ধান গাছের পক্ষে এই প্রণালী হয়তো কার্যকরী হবে না।

ছত্রক ও জীবাণুই গাছের প্রধান শত্রু। ধান গাছের পাতা, কাণ্ড ও শিকড়ে অসংখ্য প্রকার বিভিন্ন জাতীয় ছত্রকের অবস্থানের কথা জানতে পারা গেছে। যেমন—অ্যাসকোকাইটা ওরাইজা, সেরোসেপারা ওরাইজা, ডাইপ্লোডেলা ওরাইজা, গোনিয়াম ওরাইজা, পাকসিনিয়া ওরাইজা, সেপটোরিয়া কারভালা ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতের ছত্রক আক্রমণে বিভিন্ন ধরণের রোগ আত্মপ্রকাশ করে। যেমন পিরিকিউলারিয়া ওরাইজা নামক একপ্রকার ছত্রকের আক্রমণে ব্লাষ্ট বা পোড়ারোগ হয়ে থাকে। ধানের পক্ষে এই রোগ বড় ভয়ানক। প্রথমত পাতাগুলোর দু'পিঠে লাল বা বাদামী রঙের ছোপ বা দাগ হয়। ক্রমে সেগুলো ছাই রঙের স্ফোটকে পরিণত হয়। ক্রমে একটার গায়ে আর একটা জড়িত হয়ে আয়তনে বাড়তে থাকে এবং সমস্ত পাতায় ছেয়ে যায়। ফলে পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কখন কখনও পত্রদণ্ড ও কাণ্ডের সংযোগ-স্থল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত কোষগুলো শুকিয়ে যায় এবং পাতা খসে পড়ে। এই রোগের চরম অবস্থায় উদ্ভিদকাণ্ড আক্রান্ত হয়ে স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়ে। এই রোগের সূচনায় সিঞ্চন-যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত উদ্ভিদ-দেহে বোর্ডো মিক্চার সিঞ্চন করে ফল পাওয়া গেছে। সুপার ফস্ফেট, চূন, চুনাপাথর ইত্যাদি সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায়। বপনের আগে ধানের বীজকে কালিমেট বি দ্রাবণে (২%) ভিজিয়ে রেখে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে এবং এর ফলে উৎপাদন পরিমাণও নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রোটোয়াকাস কলোরানস নামক আর এক প্রকার ছত্রকের আক্রমণের ফলে যে রোগ হয় তাকে বলা হয়েছে ইয়েলোকারনেল রোগ। ধান-গুলো পরিপুষ্ট হলে এই রোগ দেখা দেয়। ধানের বহিরাবরণ বা কারনেল স্থানে স্থানে গাঢ় হলদে হয়ে যায়। জীবাণু নিঃসৃত হলদে ও বাদামী রঙের রস নির্গমনের ফলেই এই দাগ হয়। এই রস ধানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অত্যধিক উত্তাপ ও আর্দ্র জলবায়ু এই রোগের অনুকূল। এর প্রতিষেধক কিছু জানা যায়নি। আর একরকম রোগে পাতার শীর্ষদেশে সাদা দাগ দেখা যায়। ক্রমশ পাতার মধ্যদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আক্রান্ত অংশ সাদা ও কাগজের ন্যায় পাতলা হয়ে পরে শুকিয়ে যায়। মাঝখানের পাতা যখন আক্রান্ত হয় তখন ধানের

শীষ ঠিক পথে বের হতে পারে না এবং তাতে যে ধান জন্মে সেগুলোতে ফল ধরে না। জমিতে গন্ধক বা গন্ধকাম্ল প্রয়োগ, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট ও নাইট্রোজেন ঘটিত অন্যান্য সার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী আলোর রোগ নিবারণের ক্ষমতা আছে। সেলুলোজ অ্যাসিটেট গ্যাল্‌ভেনাইজড তারে প্রস্তুত সূক্ষ্ম জালের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ করে ভিটা-কাঁচ তৈরী হয়। এই কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যালোক প্রেরণ করলে অতিবেগুনী আলোর শতকরা আশী ভাগই পাওয়া যায়। বিলাতের কিউ গার্ডেনে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ভিটা-কাঁচের আবরণের নীচে বীজ খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয় এবং উদ্ভিদগুলোও বলিষ্ঠ, সজীব ও রোগমুক্ত অবস্থায় থাকে। আমাদের দেশেও ধানের ক্ষেতে এ-ধরণের পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। আর এক প্রকার চিকিৎসা হলো—অন্তর্নিক্ষেপ বা সূচী-প্রয়োগ প্রণালী। জমিতে লৌহের অভাবে পাতা হলদে হয়ে যায়, একে বলে-হলদে রোগ। সূচী-প্রয়োগের দ্বারা ফেরাস সালফেট দ্রাবণ উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করিয়ে পাতার সবুজবর্ণ ফিরিয়ে আনা যায়। ধান গাছের পক্ষে এটা সম্ভব কিনা—পরীক্ষণীয়।

রোগ দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করা চাষীর পক্ষে দুরূহ ও ব্যয়সাপেক্ষ। রোগ যাতে একেবারেই না হতে পারে—সে চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধান চাষের জন্যে উপযুক্ত জমি নির্বাচন করা দরকার যাতে জল সেচন ও জল নির্গমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। আগাছা ও আক্রান্ত গাছ সমূলে উৎপাটন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় ধানের জমিতে বিমান পোতের সাহায্যে ২-৪ডি নামক রাসায়নিক দ্রাবণ সিঞ্চন করে আগাছা ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তেমন ভাল ফল পাওয়া যায়নি। বীজ রোপনের পূর্বেও কতকগুলো কর্তব্য আছে। প্রথমত বীজ নির্বাচন—সুপুষ্ট ও সুপ্ত-জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বীজ দরকার, তাতে কোন রকম দাগ থাকলে চলবে না। লবণ জলে বীজগুলো ছেড়ে দিলে হাল্কা ও ক্ষয়গ্রস্ত বীজগুলো ভাসতে থাকবে এবং রোগমুক্ত বীজগুলো ডুবে যাবে। এ-ভাবে ভাল বীজ বেছে নিতে হবে। তারপর শোধন প্রণালী—তুঁতের জল (২%) অথবা ফরমা-লিন মিশ্রিত জলে (·৩%) বীজধান ১০।১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নিতে হবে। এতে নাকি ভাল ফল দেখা গেছে। তুঁতের জলে ধান ডুবিয়ে তারপর চূণের জলে (·৫%) ধুয়ে নেওয়া দরকার। এতে তুঁতে ধানের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। ধান রোপনের পূর্বে গরম জলে অল্পক্ষণের জন্যে ডুবিয়ে রেখে দেখা গেছে এতে হেলিমিনথোস্‌পোরিয়াম-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এই রোগগ্রস্ত বিভিন্ন প্রকার ধান (মরিচবাটি, লতিসেল, ঝাঙ্গি ইত্যাদি) চার ঘণ্টা কলের জলে ভিজিয়ে রাখার পর কাপড়ের পুটুলী করে ৫৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের গরম জলে ১২ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর এদের রোদে শুকিয়ে রোপন করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই প্রণালী অবলম্বনের ফলে ধানগাছে এই রোগ হয়নি এবং অঙ্কুরোদ্গমও বেশ তাড়াতাড়ি হয়েছে।

পঙ্গপাল অতি ভয়ঙ্কর শস্যবিনাশী শত্রু। এদের অবস্থান ও গতিবিধি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত দুরূহ। আকাশ কালো করে হঠাৎ একদিন তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে উপস্থিত হয় জীবন্ত মৃত্যুর মত—ক্ষেতের পর ক্ষেত ধ্বংস করে চলে অবলীলাক্রমে, তারপর আবার হঠাৎ রওনা হয় অজ্ঞাতস্থান অভিমুখে। পঙ্গপাল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অত্যন্ত নিরীহভাবে নিভৃত, দুর্গম স্থানে বাস করে। তখন এদের রঙ থাকে সবুজ, সহজে চেনা যায় না। কিন্তু ঝাঁক বাঁধার পরেই তাদের বর্ণ হল্‌দে ও

কালো হয়ে যায়। ভিজে তুষের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পঙ্গপালের আসার পথে ছড়িয়ে রেখে কৃষি-বিজ্ঞানী এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হাত থেকে শস্য রক্ষার জন্যে চেষ্টিত হয়েছেন। আমাদের দেশেও এই ধরণের পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

এবার চাউল-সংরক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। এই দুর্দিনে খাদ্য-সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু বস্তা ভরে গুদামজাত করলেই দীর্ঘ দিন শস্য সংরক্ষণ করা যায় না। পল্লীগ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে বৎসরের চাউল গোলাজাত করে রাখা হয়। অন্নসমস্যার দিনেও গোপনে রাখি করা চলত। তাদের চাউল-সংরক্ষণপ্রণালী বেশী কঠিন নয়। রৌদ্রযুক্ত শুষ্ক স্থানে গুদামঘর বা গোলাঘর তৈরী হতো। গোলাঘর খুব পরিষ্কার ও পোকামাকড়ের প্রবেশপথ বন্ধ করে চাউল গুদামজাত করা হতো। অবশ্য এর আগেই কড়া রোদে চাউল শুকিয়ে কুঁড়ো ঝেড়ে ফেলা দরকার। গ্রামের কোন কোন বাড়ীতে মাটির বড় বড় হাঁড়িতে চাউল রাখা হয়। সেই হাঁড়িগুলোতে বা অন্য কোন পাত্রে চাউল খুব ঠেসে ভরতে হয়, যাতে একটুও ফাঁকা জায়গা না থাকে এবং বাতাস ঢুকতে না পারে। তারপর সেই চাউলের ওপর ২।৩ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু ছাই ছড়িয়ে দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে তাতে মাটির প্রলেপ দিলে বাতাস প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়। শুকনো ছাইয়ের ভিতর দিয়ে কোন পোকার ভিতরে ঢোকবার সাধ্য নেই। কারণ পোকার নাক নেই, শরীরের ওপর ছোট ছোট ছিদ্র আছে, সেগুলোই শ্বাসযন্ত্রের কাজ করে। ছাইয়ের সূক্ষ্ম কণাগুলো সেই ছিদ্র পথ বন্ধ করে দেয়, কাজেই পোকাগুলো বাঁচতে পারে না। কিন্তু ছাইয়ে সামান্য ক্ষার জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান, এতে চাউল বস্তায় নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। বড় বড় শস্যাগারে চাউল না রেখে লোহার তৈরী ড্রামে রাখা উচিত। কারণ বস্তার ছিদ্রপথে অনায়াসেই কীট প্রবেশ করে। জলোহাওয়ার সংস্পর্শে এলে বস্তার চাউল আর্দ্র হয়ে যায়, ফলে শীঘ্র পচে যাবার আশঙ্কা থাকে। চা-খড়ির গুড়ো বা চুন মিশিয়ে রাখলেও চাউলে পোকা ধরতে পারে না বা কোন প্রকার অম্ল গন্ধ হয় না। কিন্তু চুন ক্ষার জাতীয় পদার্থ বলে বস্তা ক্ষয়ে যায় এবং চাউলও রস শূন্য খট-খটে হয়ে পড়ে। পাত্রের তলায় নিমপাতা বিছিয়ে তার ওপর চাউল ঢেলে ভিতরে মাঝে মাঝে নিমপাতা রেখে দিয়ে পাত্রটিকে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বাঁচাতে পারলে সহজে চাউলে পোকা ধরতে পারে না। কেউ কেউ বলেন যে, চাউলের সঙ্গে রশুন রাখলে নাকি পোকার আক্রমণ সহজ হয় না।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাউল-সংরক্ষণ সাধারণের পক্ষে ব্যয়সাধ্য হলেও সরকারী শস্যাগারে বা চাউলের গুদামে অনায়াসে এর প্রয়োগ করা চলে। ছোট একটা মাটির পাত্রে সামান্য পরিমাণ পারদ ভরে তার মুখ উত্তমরূপে মাটি দিয়ে বন্ধ করে তারপর সেটাকে চাউলের ভিতর রেখে দিতে হবে। পারদের বাষ্প সচ্ছিদ্র মাটির দেয়াল ভেদ করে চাউলের সঙ্গে মিশবে এবং এই বাষ্পের সংস্পর্শে এসে পোকামাকড়ও মরে যাবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিপদও আছে। কোন রকমে ধাক্কা লেগে যদি মাটির পাত্র ভেঙ্গে যায়, তাহলে পারদ চাউলের সঙ্গে মিশে গিয়ে চাউলকে বিষাক্ত করে দেবে। কারও মতে চাউলের সঙ্গে চূনের জল, ফিটকিরির জল, কর্পূরের জল ও হলুদের জল মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখলে পোকা ধরার ভয় থাকে না, কিন্তু এতে চাউল বিস্বাদ হতে পারে।

পোকাধরা চাউলের পোকা নষ্ট করে দেবার জন্যে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বাষ্প দেহে প্রবেশ করা মাত্র কীট-পতঙ্গ মরে যায়। চারদিক বন্ধ গুদামঘরের মধ্যে একটি পাত্রে অতি সাবধানে পটাসিয়াম সায়ানাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড রেখে দিতে হয়। এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড

গ্যাস উৎপন্ন হয়ে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে ও পোকা মরে যায়। কিন্তু এই উগ্র বিষ মানবদেহেরও অনিষ্ট করে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্যাস-রোধক পরিচ্ছদ পরে' এই কাজ করা চলে। কার্বন ডাই সালফাইড নামক একপ্রকার আরকেরও কীট-নাশক ক্ষমতা আছে। সাধারণ তাপেই এটা বাষ্পে পরিণত হয়। গুদামঘরে ২৪ ঘণ্টা এই বাষ্প আটকে রাখলে কীট মরে যায়, কিন্তু এটা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ বলে কোন দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। এই প্রকার বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করতে হলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী বায়ুরোধক গুদামঘর থাকা উচিত এবং এসব কাজে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ন্যাপথালিনও একপ্রকার কীট-নিবারক পদার্থ।

সবচেয়ে বেশী চাউল নষ্ট করে ইঁদুর। এদের উৎপাত কমান বড় সহজ নয়। বেরিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে ময়দা মাখিয়ে শস্যাগারের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখলে সেগুলো খাওয়ার ফলে ইঁদুর মরতে পারে। চটপটি নামক ফস্ফরাস ঘটিত এক প্রকার বাজীর সঙ্গে ঘি মাখিয়েও ইঁদুর মারা চলে। কোন পাত্রে জিঙ্ক সালফাইডের টুকরো রেখে দিলে, তা' বাতাসের জলীয়বাষ্প ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংস্পর্শে এসে ফস্ফাইন গ্যাস তৈরী করবে—এই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ইঁদুর বাঁচতে পারে না।

চাউল কিংবা ধান রক্ষা করার সবচেয়ে সহজ ও সুলভ উপায় হচ্ছে শুকনো বালির ব্যবহার। একটা বড় খালি চটের থলির ভিতর আর একটা ছোট চটের থলি ভরতে হয়। এই ছোট চটের থলিতে খুব ঠেসে চাউল ভরে বাইরের বড় থলিতে শুকনো বালি ভর্তি করা হয় অর্থাৎ দুটো থলির মধ্যবর্তী শূন্য স্থান, চারধার ও তলদেশ বালি দ্বারা পূর্ণ থাকে। তারপর চাউলের ওপরও এক ইঞ্চি পরিমাণ বালির স্তর দেওয়া যেতে পারে। এই বালির দেয়াল ভেদ করে পোকামাকড় ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, পারলেও বাতাসের অভাবে তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ছাইয়ের চেয়ে বালি অনেক বেশী কাযকরী, কারণ বালুকণা-গুলো সমআয়তন বিশিষ্ট, এগুলো অম্ল বা ক্ষার-ধর্মী নয়। কাজেই বস্তার কোন ক্ষতি করে না এবং একই বালি বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। অল্প ব্যয়সাধ্য বলে সাধারণ লোকেরাও এই প্রণালী অবলম্বন করতে পারেন। বড় বড় শস্যাগারেও এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজ করে দীর্ঘ দিন শস্য সংরক্ষিত রাখা যায়। এই দুর্দিনে একটি শস্যকণাও নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।

"অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল এবং তোমাতে ও আমাতে যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃ প্লাবিত করিবে না?"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

আণবিক শক্তির রহস্য

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, কারণ ঐদিন হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা ফেলা হয় এবং এই ঘটনার দিন থেকেই আণবিক যুগের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে। তখন থেকেই বিজ্ঞানী মহলে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়ে যায় যে, কি করে পরমাণুর বুকে লুকানো এই অপরিমিত শক্তিকে মানবের দৈনন্দিন কাজে লাগানো যেতে পারে। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির ধ্বংসলীলা দেখে বৈজ্ঞানিক জগতের বাইরে সাধারণ লোকের মনেও এই শক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সকলের মুখে আজকাল আণবিক বোমার কথা শুনতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে বর্তমান ঘোরালো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সকলেই এসম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। এই রহস্যময় আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এই বিষয় ভালভাবে জানতে গেলে পরমাণুর গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকেফহাল হওয়া প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন ডাল্টন্ নামে এক প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ সর্বপ্রথম পদার্থের গঠনতত্ত্ব ও পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের কিছু আভাষ দেন। তিনি বলেন যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থার নাম পরমাণু। এই পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে এবং সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। পরে ডাল্টনের এই মতবাদকে পরিবর্তন করে অ্যাভোগাড্রো বলেন যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা পরমাণু সন্দেহ নেই; কিন্তু এই পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হলে কয়েকটি পরমাণুকে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, যাদের নাম তিনি দিলেন—অণু। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন যে, জলের একটি অণু, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। যদি কিছু জল নিয়ে ভাগ করতে করতে যাই তাহলে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অবস্থায় পৌঁছলে তাকে জলের একটি অণু বলবো। এই অণুকে আরো ক্ষুদ্র করলে সে আর জল থাকবে না—ভেঙ্গে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হবে। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাকালীন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে আমরা বলি অণু এবং একটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। অ্যাভোগাড্রো আরো বললেন যে, কোন মৌলিক পদার্থের সব পরমাণুরাই সর্ববিষয়ে একরকম। খুব অল্পদিন আগে পর্যন্ত এই বিশ্বাস অটুট ছিল যে, এই অভঙ্গুর, অবিনাশী পরমাণু দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞান এই অভঙ্গুর পরমাণুবাদ বদলে দিয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুক্স্, লেনার্ড এবং বিশেষ করে সার জে, জে, টমসন—পরমাণু ভেঙ্গে ছোট করতে পারা যায় কিনা—এই পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে দেখালেন—যে-কোন পরমাণুই হোক না কেন, তাদের ভেঙ্গে যে ক্ষুদ্র কণিকা পাওয়া যায় তারা ওজনে সবাই সমান এবং প্রত্যেকেই সমপরিমাণ ঋণাত্মক তড়িদ্বাহী। ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত বলেই এদের নাম দেওয়া হলো—ইলেকট্রন। কিন্তু একটি পরমাণু শুধু ইলেকট্রন দ্বারা তৈরী হতে পারে না, কারণ যেহেতু ইলেকট্রন ঋণতড়িদ্বাহী সেহেতু

শুধু ইলেকট্রন দ্বারা তৈরী পরমাণুটিও নিশ্চয়ই ঋণতড়িদ্বাহী হবে। কিন্তু খুব ভালরূপ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, একটি গোটা পরমাণু কোন তড়িৎ-ই বহন করেনা। কাজেই পরমাণুর ভিতর কোথাও নিশ্চয়ই এমন পরিমাণ বিপরীতধর্মী ধনতড়িৎ লুকানো আছে যা সমস্ত ইলেকট্রনের ঋণতড়িতের সমান। তাহলেই সমগ্র পরমাণুটি নিস্তড়িৎ হবে। তখন বিজ্ঞানীমহলে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। বহু পরীক্ষার পরে এই ধনতড়িতের সন্ধান পাওয়া গেল এবং দেখা গেল যে, এই ধনতড়িৎ এক অতি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ, যার পরিমাপ হচ্ছে এক ইঞ্চির লক্ষ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এইভাবে ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড পরমাণু-গঠনপ্রণালীর একটি ছবি খাড়া করলেন। এই ছবি অনুসারে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে খুব সামান্য স্থান দখল করে ধনতড়িৎ বর্তমান এবং তার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে ঋণতড়িদ্বাহী ইলেকট্রন। কেন্দ্রস্থলের ধনতড়িতের নাম—কেন্দ্রিক। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রিকের চতুষ্পার্শে এমন গতিতে পরিভ্রমণ করছে যাতে তারা বিপরীত তড়িৎযুক্ত কেন্দ্রিকের উপর গিয়ে না পড়ে। ঠিক যেমন পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে এমন এক গতি নিয়ে ছুটছে যাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে সে সূর্যের উপর গিয়ে পড়ে না। এক কথায়, রাদারফোর্ড পারমাণবিক গঠনপ্রণালীকে সৌরজগতের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে তুলনা করলেন। কেন্দ্রিক, সূর্যের ভূমিকা এবং ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন গ্রহের ভূমিকা অভিনয় করছে।

কাজেই আমরা দেখছি যে, প্রত্যেক পরমাণুতে আছে—একটি কেন্দ্রিক ও পরিভ্রাম্যমান ইলেকট্রন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কোন্ পরমাণুতে কটা ইলেকট্রন থাকবে? সবরকম পরমাণুতে কি একই সংখ্যার ইলেকট্রন থাকবে, না বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন থাকবে? এর উত্তর বহুপূর্বে রুশীয় বিজ্ঞানী মেণ্ডেলীফ দিয়েছেন। মেণ্ডেলীফ সমস্ত মৌলিক পদার্থকে তাদের পারমাণবিক ওজন অনুসারে একটি ছকে সাজিয়েছিলেন। এই ছকের নাম—পিরিয়ডিক টেবল। এই পিরিয়ডিক টেবলে যে-মৌলিক পদার্থ যে-স্থান অধিকার করেছে, তাকে তার পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় এবং প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রন সংখ্যা তার পারমাণবিক সংখ্যার সমান। যেমন হাইড্রোজেন পিরিয়ডিক টেবলে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করাতে এর পারমাণবিক সংখ্যা ১ এবং সেহেতু এর পারমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। ২ পারমাণবিক সংখ্যার হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রন এবং ৩ পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত লিথিয়ামে তিনটি ইলেকট্রন কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। এইভাবে পিরিয়ডিক টেবল অনুসরণ করলে সর্বশেষে পৃথিবীর সবচাইতে ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। কাজেই এর কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে ৯২টি ইলেকট্রন পরিভ্রমণ করছে। আণবিক শক্তির আলোচনায় এই ইউরেনিয়াম অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করেছে।

যে-কোন মৌলিক পদার্থের—যথা, পারদ অথবা ক্লোরিন-এর একটাই পারমাণবিক সংখ্যা ও পারমাণবিক ওজন, এরূপ একটা ধারণা বহুদিন বলবৎ ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা বিভিন্ন ওজনের হতে পারে এবং এদের বলা হলো আইসোটোপ্স্। এই আইসোটোপ্সের আবিষ্কারে অ্যাস্টনের ভরলিপি যন্ত্র অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। যখন আইসোটোপসের অস্তিত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হলো তখন দেখা গেল যে, পরমাণুর পারমাণবিক ওজন পূর্ণসংখ্যার খুব কাছাকাছি হয়েছে। অধুনা প্রায় সব মৌলিক পদার্থের—এমনকি সর্বাপেক্ষা সরল হাইড্রোজেনেরও আইসোটোপ্স্ পাওয়া গেছে।

পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা পূর্ণসংখ্যা হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নাই, কারণ পরমাণুর

বহির্গঠনে পূর্ণসংখ্যার ইলেকট্রন বিদ্যমান। আইসোটোপস্ আবিষ্কারের পর যখন পারমাণবিক ওজনও পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশিত হলো তখন সকলেই মনে করলেন, আভ্যন্তরীণ বস্তুতেও—অর্থাৎ ওজন-বিশিষ্ট কেন্দ্রিকেও পূর্ণসংখ্যার বস্তু বর্তমান। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে ঐ বস্তু হাইড্রোজেন কেন্দ্রিক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এর নাম প্রোটন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমানেও গোল আছে। হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা এক। কাজেই এতে একটি ইলেকট্রন ঘুরছে, যার তড়িৎ-পরিমাণ কেন্দ্রিকে অবস্থিত একটি প্রোটন থেকে বিপরীত ও সমান। কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণু বিশ্লেষণে আর কোন গোল রইল না। কিন্তু মুস্কিল হবে পরবর্তী পদার্থ হিলিয়ামের বেলাতে। হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা দুই; কাজেই এতে দুটি ইলেকট্রন আছে এবং সমগ্র পরমাণুটি নিস্তড়িৎ হতে হলে কেন্দ্রিকে দুটি প্রোটন থাকা উচিত। কিন্তু এর পারমাণবিক ওজন ৪—অর্থাৎ এর কেন্দ্রিকে দুটি প্রোটনের বদলে চারটি প্রোটন আছে। তাহলে তড়িৎসামঞ্জস্য থাকে কি করে? এই সামঞ্জস্য আসতে পারে যদি এমন একটি কণিকা খুঁজে পাওয়া যায়, যার ভর প্রোটনের ভরের সমান অথচ সম্পূর্ণ নিস্তড়িৎ। আবার বিজ্ঞানীমহলে খোঁজ খোঁজ পড়লো অবশেষে ঠিক যেমনটি চাওয়া হয়েছিল ঠিক তেমন একটি কণার সন্ধান পাওয়া গেল। তার নাম দেওয়া হলো—নিউট্রন। প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্রিকে ঠিক ততটি প্রোটন থাকবে, যা দরকার হবে মোট ইলেকট্রনের ঋণতড়িতের সমান ও বিপরীত হতে এবং পরমাণুর বাকী ওজনের ঘাটতি, পূরণ করবে নিস্তড়িৎ নিউট্রন।

১৮৯৬ সালে হেনরী ব্যাকারেলের এক অভিনব আবিষ্কারের ফলে পারমাণবিক গঠনপ্রণালীর সম্বন্ধে নতুনভাবে পর্যালোচনা সুরু হলো। ব্যাকারেল দেখতে পেলেন যে, সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম সংযুক্ত যে-কোন জিনিস আপনা থেকেই ফটোগ্রাফীর প্লেটকে সক্রিয় করে তুলছে। এর কিছু পরে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের কুরী ও তাঁর স্ত্রী মাদাম কুরী এই ব্যাপারটা আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন—রেডিয়াম বলে এক দুষ্প্রাপ্য পদার্থে। তখন থেকে এই ব্যাপারকে পদার্থের তেজস্ক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়। তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে বহু গবেষণা করে রাদারফোর্ড ও সডি বললেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রিকগুলো এত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী যে, কালক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-থেকে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়—আলফা, বিটা ও গামা নামক তিন রকম রশ্মির আকারে। কেন্দ্রিকের ভঙ্গুরতা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তি নির্গমের কথা বিজ্ঞানীরা প্রথম জানলেন ১৯১৯ সালে, রাদারফোর্ড কর্তৃক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে। বিজ্ঞানীরা এদিকে আরো অগ্রসর হলেন। তক্ষুনি তাঁরা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন—কি করে এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া ঠিক পথে পরিচালিত করে তা থেকে নির্গত অমিত শক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

আমরা আগে দেখেছি যে, সব আইসোটোপসের কেন্দ্রিকের ভর পূর্ণসংখ্যা। কিন্তু এটা ঠিক নয় প্রোটনের ভর ঠিক ১ নয়—১'০০৮১। হিলিয়াম কেন্দ্রিকের ভর ৪'০০৩৯; কিন্তু হিলিয়াম কেন্দ্রিক দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দিয়ে তৈরী এবং সেই অনুসারে এর ভর হওয়া উচিত ৪'০৩৪০। বাকী ভর কোথায় গেল? ভরের অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদ্য অনুসারে এই বাকী ভর বিনাশ পেতে পারে না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন এই গণ্ডগোলের মীমাংসা করলেন তাঁর বিখ্যাত 'ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা' নামক প্রতিপাদ্য দ্বারা। এই প্রতিবাদ্যের অবতারণা করে আইনষ্টাইন বললেন—বাকী ভর শক্তিতে পরিণত হয়েছে—

যে শক্তি কেন্দ্রিকের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে—যথা, প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এই জন্যেই এই শক্তিকে বলা হয়—বন্ধন-শক্তি। তখন বিজ্ঞানীরা বললেন যে, কেন্দ্রিকের এই উপাদানগুলোকে যদি বিচ্ছিন্ন করতে পারা যায় তাহলেই এই শক্তি মুক্ত হবে এবং আমরা প্রচুর শক্তি আয়ত্তে আনতে পারবো। এইটাই হচ্ছে পরমাণুর অমিত শক্তির উৎস।

ব্যাকারেলের সময় থেকেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিক অতি ক্ষণস্থায়ী। এমনকি, মন্দগতি নিউট্রন দ্বারা আহত হলেও এর কেন্দ্রিক দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে এ ব্যাপারে দ্রুতগতি নিউট্রনের চাইতে মন্দগতি নিউট্রন বিশেষ কার্যকরী। তাহলে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রিকের এই ভাঙ্গনের জন্যে বিশেষ কোন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই—এটা অনেকটা বারুদে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোগের মত। পারমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবে ইউরেনিয়ামের কার্যকারিতার আর একটি কারণ হচ্ছে যে, ইউরেনিয়ামে পারস্পরিক প্রক্রিয়া অতি সুষ্ঠুভাবে ঘটে। ব্যাপারটা এইরকম:—প্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিক নিউট্রন দ্বারা আহত হয়ে ভেঙ্গে দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তি নির্গম হয় এবং কেন্দ্রিকের ভিতর থেকে কয়েকটি নিউট্রন ছুটে বেরিয়ে যায়। এই নিউট্রনগুলো আবার কাছাকাছি কেন্দ্রিকের ভাঙ্গন ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তি ও কয়েকটি নিউট্রনের নির্গম হয়। এই নিউট্রন-গুলো আবার অন্য কতকগুলো কেন্দ্রিককে আঘাত করে এবং এইভাবে পারস্পরিক প্রক্রিয়া চালু থাকে। ফলে অতি অল্প সময়ের ভিতর এত বেশী শক্তি জমায়েত হয় যে, তা থেকে হঠাৎ ভীষণ বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ব্যাপারে ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর চাইতে তার একটি আইসোটোপ্, ইউরেনিয়াম ২৩৫কে আরো বেশী সফলতা অর্জন করতে দেখা গেছে। কিন্তু যে পারস্পরিক প্রক্রিয়ার কথা উপরে বলা হলো সেটা যেমন গোলমেলে তেমনি কঠিন। তদুপরি ইউরেনিয়াম ২৩৫ অতি দুষ্প্রাপ্য; ১৪০ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৮-এ মাত্র ১ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫ আছে এবং স্বল্প পরিমাণ আইসোটোপ্‌কে আসল ধাতু থেকে বিচ্ছিন্ন করাও ভয়ানক জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। কাজেই এই জটিল ও দুরূহ ব্যাপারকে এড়িয়ে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে, তা হচ্ছে এই:—যখন সাধারণ গতিসম্পন্ন নিউট্রনকে ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর কেন্দ্রিকের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখন ওই কেন্দ্রিক নিউট্রনটিকে বেমালুম নিজের ভিতর আত্মসাৎ করে নেয় এবং একটি বিটাকণা বের করে দিয়ে নিজে অতি ক্ষণস্থায়ী নেপচুনিয়াম নামে নতুন একটি পদার্থের কেন্দ্রিকে পরিণত হয়। এই নেপচুনিয়াম কেন্দ্রিক এত ক্ষণস্থায়ী যে, শীঘ্রই এ-থেকে আর একটি বিটাকণা বেরিয়ে আসে এবং নেপচুনিয়াম কেন্দ্রিক, প্লুটোনিয়াম নামে আর একটি নতুন পদার্থের কেন্দ্রিকে পরিণত হয়। প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রিক কিছুটা স্থায়ী এবং ইউরেনি-য়াম ২৩৫-এর মত মন্দগতি নিউট্রন দ্বারা আহত হলে অতি সহজেই দুভাগে ভেঙ্গে যায়। এই কারণেই পারমাণবিক শক্তি আহরণের জন্যে প্লুটোনিয়াম সবচাইতে সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিকের ভাঙ্গনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়, যার পরিমাণ প্রায় দু'শ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, তা দেখে বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে গেলেন। হিসেব করে দেখা গেছে যে, কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ফলে এই যে শক্তির সৃষ্টি হয়, যা ঘটতে কয়েক মাইক্রোসেকেণ্ডের মাত্র প্রয়োজন, সেই শক্তি কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি তাপ ও কয়েক মিলিয়ন অ্যাটমসফিয়ার চাপ সৃষ্টি করে। এই প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফল কি হয়, তা হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা থেকে

সহজেই বুঝতে পারা যায়। যে-সমস্ত শক্তি এর পূর্বে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল, আণবিক শক্তির কাছে সে-সব নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

এই শক্তির প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে প্রথম থেকেই বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন, কি করে একে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগানো যেতে পারে। এই শক্তিকে যখন সত্য সত্যই সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী করা হবে তখন অর্থনৈতিক-জগতে যে একটা মহা আলোড়ন আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত কলকারখানা চালু রাখতে প্রায় ৩০,০০০ মিলিয়ন ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। এই শক্তিকে পেতে প্রায় ২০ মিলিয়ন টন কয়লা পোড়াতে হয়। কিন্তু আণবিক-যুগে আমরা এক বর্গ গজ আয়তনের একটি ছোট ইউরেনিয়াম অক্সাইডের খণ্ডকে বিধ্বস্ত করে এই শক্তি পেতে পারি। যুদ্ধের আগে যখন প্রথম ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিকের ভাঙ্গন আবিষ্কৃত হয়, তখন অনেকে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, ট্রেন প্রভৃতি চালাতে পেট্রোল, কয়লা প্রভৃতির আর কোন প্রয়োজন হবে না। বাড়ীতে আলো জ্বালাতে বা মেসিন চালাতে বৈদ্যুতিক শক্তিরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এঁরা বলেছিলেন যে, এমন সব 'পাওয়ার পিল' বা আণবিকশক্তি পূর্ণ ছোট ছোট কাল বাক্স আবিষ্কৃত হবে যা মোটরকার বা ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই গাড়ীগুলো অনায়াসে হাজার হাজার মাইল একসঙ্গে চলতে পারবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এখনই এতটা আশা করা ঠিক নয়।

"যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যালব্ধ নির্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগৎ হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধপুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, যতদিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং বহন করিবেন। * * * যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়! ভাঙ্গিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করুক।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র।

স্যাময় লেদার

শ্রীসুশীলরঞ্জন সরকার

মধ্য য়ুরোপের পাহাড়-পর্বতের জনবিরল অঞ্চলে একজাতীয় হরিণ চরে বেড়ায়, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে স্যাময়। অনেকটা ছাগলের মত দেখতে; খুব সাবধানী আর ক্ষিপ্রগতি, তাই এদের শিকার করা সোজা ব্যাপার নয়। দূরে পাহাড়ের গায়ে নিশ্চল পাথরের টুক্‌রোর মত মনে হয় এদের। শিকারীকে খুব সন্তর্পণে এগুতে হয়—তার একটু অসাবধানতা, সামান্যতম ত্রুটিও এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র বাঁশীর মত আওয়াজ এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ভেসে যায় সমস্ত দলটাকে সচকিত করে দিয়ে। চক্ষের নিমেষে হয় সকলে উধাও, আর কোন পাত্তা পাওয়া সম্ভব হয় না। শোনা যায়, আসামের জংগলে ছাগলীপছু নামে অনুরূপ একরকম জীব বাস করে। এদের মাংসও খুব সুস্বাদু। এরা স্যাময়ের সমগোত্রীয়ও হতে পারে।

স্যাময় সহজ লভ্য না হলে, তার চামড়া দুষ্প্রাপ্য হবে বৈকি! কিন্তু বাজারে তো বেশ স্যাময় লেদার বিক্রী হচ্ছে! চশমার খাপে কাচটিকে পরিষ্কার করবার জন্যে এক টুক্‌রো লেদার দেওয়া থাকে। আপনি যদি কবি হন তাহলে হয়তো ওই এক টুক্‌রো স্যাময় লেদারের অনুভূতি আপনাকে ওপরে বর্ণিত মধ্য য়ুরোপের পার্বত্য অঞ্চলে কোন এক স্যাময়ের তপ্ত অশ্রুর সঙ্গে পরিচিত করে দেবে। কিন্তু তখন কি আপনি জানবেন—ও মোটেই স্যাময়ের চামড়া নয়! যদিও ওই চামড়া খুব নরম আর মোলায়েম। প্রথম প্রথম এই সব হরিণের চামড়া থেকে স্যাময় লেদার তৈরী হতো; আজকাল চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে ওই দুর্লভ চামড়া সে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়নি। তাই চেষ্টা চললো, দুধের সাধ ঘোলে মেটানো যায় কিনা! ছাগল ও ভেড়ার চামড়া নিয়ে পরীক্ষা চললো। দেখা গেল, এদের নরম, পাৎলা চামড়া থেকে স্যাময় লেদার তৈরী করা যেতে পারে। আর এদের অভাবও নেই, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে।

চামড়া নাম শুনলেই আমাদের চোখ যে রকম জিনিস দেখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে স্যাময় লেদার সেদিক থেকে আমাদের নিরাশ করে। বেশ নরম আর মোলায়েম; সৌখীন ব্যক্তিদের আকর্ষণের বস্তু। একমাত্র তেল বা চর্বিই চামড়ার এই কোমল অনুভূতি আনতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে তেল দিয়ে চামড়া সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগী করার ব্যবস্থা চলে আসছে বহুকাল থেকে। চামড়া পাকা করার এটাই ছিল আদিম পন্থা। স্যাময় লেদার তৈরী করা হয় এই পন্থারই আধুনিক উন্নত ধরণে। এ-ক্ষেত্রে ভেড়ার চামড়াই সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চামড়ার ওপরের দানা বা গ্রেণযুক্ত স্তরটির এখানে কোন প্রয়োজন নেই, তাই সোডিয়াম সালফাইড ও চুনের সহ-যোগিতায় লোমশূন্য করে চামড়া স্প্লিটিং মেসিনে চেরাই করে ফেলা হয়। তার ফলে দানাযুক্ত স্তরটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর আর একটা উপযোগিতা আছে যার দরুণ চামড়া সহজেই তেল শোষণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মুস্কিল হলো, স্যাময় লেদার তৈরী করবার এই পদ্ধতির অনুসরণ করলে কয়েকটি বিশেষ ধরণের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি লাগে যা আমাদের মত গরীব দেশের অনেক ট্যানারীতেই নেই। তাই আমাদের অন্য উপায় খুঁজতে হয়েছে।

তেল দিয়ে ট্যান করা শ্যামর লেদার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শোষিত তেল নিজস্ব সংযুক্তি বজায় রাখতে পারে নি, চামড়ার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার বাতাসের অম্লজানের সংস্পর্শে এসে খানিকটা অ্যালডিহাইডও তৈরী হয়। অনেকের মতে এই অ্যালডিহাইড চামড়া পাকাকরণে সাহায্য করে থাকে। ফরম্যালডিহাইড পচনশীল কোন বস্তুকে অবিকৃত রাখতে পারে—এ তথ্য অনেক আগেই গোয়ালারা জানতো। বাসি দুধ যাতে পচে না যায় সেজন্যে তারা কয়েক ফোঁটা ফরম্যালডিহাইড দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তাজা দুধ বলে বিক্রী করতো। কিন্তু এই রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহের ওপর বিষ-ক্রিয়া করে বলে আইন করে ফরম্যালডিহাইডের এই ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ফরম্যালডিহাইড দিয়ে চামড়া ট্যান করতে বাধা নেই। শ্যাময় লেদার তৈরী করতে এই পদার্থ প্রয়োগের ফলে অনেকটা ভাবনা দূর হলো। প্রথমে ফরম্যালডিহাইডে চামড়া চালিয়ে নিয়ে তেলের মধ্যে ট্যান করা হয়। এই যুক্ত ট্যানিং-প্রক্রিয়ায় আজকাল ভারতের প্রায় সব শ্যাময় লেদার তৈরী হচ্ছে। সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়েই চলে যায়। ভেড়ার চামড়ার বদলে ছাগলের চামড়াই বেশী উপযোগী বলে জানা গেছে। কলকাতায় বেংগল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটে এ-বিষয়ে পরীক্ষাকার্য চালান হয়েছিল। তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাগলের চামড়ায় ভাল ফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে, চামড়ার ওপরের দানা-স্তর এখানে কোন কাজে আসে না, উপরন্তু তেল শোষণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ভেড়ার চামড়ার এই স্তর তুলে ফেলতে স্প্লিটিং মেসিন লাগে, কিন্তু অ্যালডিহাইডের প্রয়োগের ফলে ছাগলের চামড়া চেরাই করবার প্রয়োজন হয় না। আর একটা সুবিধা হলো—গ্লেজ্‌ কিড্‌ শিল্পে ছাগলের চামড়ার চাহিদা থাকায় দর একটু বেশী ; কিন্তু তাতে দানা-স্তরটি নিখুঁত হওয়া চাই। তাই এক্ষেত্রে যে সমস্ত চামড়ার দানা-স্তর খারাপ বা নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম দরে কিনে আনা চলে। তার ফলে উৎপাদন খরচা অনেকাংশে কম পড়ে।

মাঝারী আকারের কাঁচা চামড়া কিনে আনা হয়। ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে চুন ও সোডিয়াম সালফাইড মেশানো জলে চারদিন ডুবিয়ে রাখা হয়। তুলে নিয়ে লোমশূন্য করে আবার খালি চুন গোলা জলে চারদিন রেখে দেওয়া হয়। চারদিন পরে তুলে নিয়ে যদি কিছু মাংস লেগে থাকে তবে ভোঁতা ছুরি দিয়ে তুলে ফেলা হয়। চামড়া ভাল করে ধুয়ে ক্ষার-ধর্ম বিনষ্ট করবার জন্যে বোরিক, অ্যাসেটিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয়। এ-কার্য সমাধা করা হয় বিদ্যুৎ-চালিত ড্রামে। এরপর ভাল করে ধুয়ে নিয়ে আবার ড্রাম চালু করা হয়। সামান্য জলে একটু সোডা মিশিয়ে আর পরিমাণ মত ফরম্যালডিহাইড যোগ করে তাতে ২।৩ বারে যোগ করা হয়। চার কি পাঁচ ঘণ্টা পরে চামড়াগুলো বের করে নিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে সাজিয়ে রাখা হয়। পরের দিন যখন আধ শুকনো হয়ে আসে তখন সেভিং মেসিনে নিয়ে গিয়ে দু-পিঠই চেঁচে ফেলা হয়। যে দিকে দানা-স্তর আছে, সেই পিঠটাই বেশী পরিমাণে চাঁচা হয়। তারপর জলে ভিজিয়ে রাখা হয় ; পরের দিন ভাল করে নিংড়ে সমস্ত জলটা বের করে দেওয়া হয়। এবার হবে তেল দিয়ে ট্যানিং। একটা বালতিতে পরিমাণমত কড্‌মাছের তেল নিয়ে তাতে খানিকটা খড়ির গুঁড়ো যোগ করা হয়। তারপর হিসেবমত সোডা জলে গুলে বালতিতে ঢেলে ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়। ড্রামের মধ্যে চামড়াগুলো দিয়ে এই ইমালশন ২।৩ বারে যোগ করা হয়। সম্পূর্ণ তেলটা শোষিত না হওয়া পর্যন্ত প্রায়

৮।১০ ঘণ্টা পর্যন্ত ড্রাম চালানো হয়। চামড়া বের করে নিয়ে গরম ঘরে শুকোবার জন্যে পাঠানো হয়। সেখানে অম্লজানের সংস্পর্শে জারিত হয়ে রংটা হরিদ্রাভ হয়ে আসে। নির্দিষ্ট সময়ের পর সেগুলো নিয়ে এসে সোডিয়াম কার্বনেট মেশানো জলে তিনবার দেড় ঘণ্টা ধরে ধোয়া হয়। আবার আধ ঘণ্টা সাবান জলে ধোলাই করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জলের উত্তাপ ৪০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়া চাই। এরপর একটা মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপরে ফেলে দিয়ে জলটা বের করে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোঁচকানো অংশও সমতল হয়ে যায়। তারপর শুকিয়ে নিয়ে হাতে স্টেক্ করা হয়। ক্রোম চামড়ার মত স্টেকিং-মেসিনের দাপট এ নিরীহ স্যাময় সহ্য করতে পারে না, তাই বিশেষভাবে হাতে নরম করে নেওয়া হয়। ধারগুলো এবার ছাঁটাই করে নিলে মন্দ হয় না।

চামড়াটা অনেকটা নরম হয়ে গেলেও তখনও কিন্তু মোলায়েম অনুভূতি আসে না। সেজন্যে বাফিং-মেসিনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই যন্ত্রের প্রধান অংশ হলো খাড়াভাবে স্থাপিত একটা চাকা। চাকাটা ৮ ইঞ্চি চওড়া, আর এমারী কাপড় দিয়ে মোড়া। বিদ্যুৎ-শক্তিতে চাকাটা ঘোরে। এবার ওই ঘূর্ণায়মান চাকার ওপর চামড়াটাকে ফেলে একটা নরম বুরুশ দিয়ে আস্তে চেপে ধরা হয়; দেখা যাবে চামড়ার সূক্ষ্ম ভুষি বেরিয়ে আসছে। দু-পিঠেই বাফ্ করা হয়। এবার কোমল মখমলের মত হয়ে যাবে। রংটাও মাখনের মত হয়ে আসবে। এরপর ভাঁজ করে সামান্য ইস্ত্রি করবার পর প্যাক্ করে রেখে দেওয়া হয়। বাজারে ১৬″×১৭″ থেকে ২৫″×২৬″ মাপের স্যাময় লেদারের চাহিদা আছে। সেই অনুযায়ী সাইজ করে কাটা হয়। যদি মাঝখানে ছেঁড়া বা ফুটো থাকে তাহলে তেমন দাম পাওয়া যায় না। তবে নিখুঁত স্যাময় লেদার পাওয়া শক্ত। তাই হলুদে রঙের রেশমী সূতা দিয়ে নিপুণতার সঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হয়। যেগুলো বেশ পুরু, আর কোন ছেঁড়া নেই, একেবারে নিখুঁত সেগুলো প্রথম শ্রেণীতে ফেলা হয়। আর যাতে দু'তিনটা সেলাই আছে সেগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে; বাদবাকী সমস্ত বাতিল পর্যায়ে। অতএব খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালাতে হয়।

প্রয়োজন হলে স্যাময় লেদার ব্লিচ্ বা বিরঞ্জন করা চলে। এই উদ্দেশ্যে সূর্যালোক, সালফার ডাইঅক্সাইড ও পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট বিরঞ্জন-কারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিরঞ্জন হয়ে গেলে ইচ্ছামত রং করেও নেওয়া যায়। এই সব রঙীন স্যাময় দস্তানায়, ওয়েষ্টকোটে ও অন্যান্য পোষাকে, এমন কি পোর্টফোলিও, হ্যাণ্ডব্যাগ্ ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, অন্যান্য বহুবিধ কাজে স্যাময় লেদার ব্যবহার হয়ে থাকে। একে আবার ওয়াটার-প্রুফ্ অর্থাৎ জল নিরোধক করে তোলা যায়। প্রথমে সাবান জলে ডুবিয়ে নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিটেট বা ফটকিরির দ্রবণে ডুবানো হয়। ফলে অ্যালুমিনিয়াম-সাবান গঠিত হয়ে চামড়াটিকে জলের পক্ষে অভেদ্য করে তোলে। স্যাময় লেদার ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার করে ফেলা যায়। ঈষদুষ্ণ জলে সাবান বা সোডা গুলে তাতে ধুয়ে নিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিলেই চলে।

আমাদের দেশের জনসাধারণ অধিকাংশই দরিদ্র, তাই এই সমস্ত দামী চামড়া খুব বেশী ব্যবহার করে না তা-হলেও কাঁচামালের অভাব আমাদের দেশে নেই। তাই এই শিল্প এখানে গড়ে উঠতে সুযোগ পাবে। এখানে কয়েকটি ট্যানারী খুব ভাল স্যাময় লেদার তৈরী করছে। বিদেশে বাজার পেলে অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প খুবই লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

শ্রীকমলেশ রায়

ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখ্য কারণ, দেশের যন্ত্রশিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের অভাব। যন্ত্রশিল্পের অভাব আমাদের কৃষিকেও পঙ্গু করে রেখেছে। বর্তমান যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বা তৎসংক্রান্ত ব্যয় কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় অধিক। উন্নত দেশসমূহে কৃষি আয় অপেক্ষা শিল্প আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ। আমাদের অনুন্নত কৃষির তুলনায় আমাদের যন্ত্রশিল্প আরো অনুন্নত—কৃষির চতুর্থাংশমাত্র।

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের মুখ্য উপাদান বিদ্যুৎশক্তি। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীনতা দেখলেই উপলব্ধি হবে আমরা যন্ত্র-শিল্পে এত পিছিয়ে আছি কেন। আমাদের দেশে মাথা পিছু যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হয় তার প্রায় আড়াইশ' গুণ। একমাত্র নিউইয়র্ক সহরে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সারা ভারতবর্ষে তা উৎপন্ন হয় না। ১৯৪৩ সালে ভারতে ২১৮ কোটি ইউনিট (কিলোওয়াট আওয়ার) বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। ঐ বছর আমেরিকায় সরবরাহ হয় প্রায় ২২০০০ কোটি ইউনিট। এখানে ভারতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিমাণের তালিকা দেওয়া হলো।

১নং তালিকা

প্রদেশ	জল তাড়িত-বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	মোট উৎপাদন ক্ষমতা (কিলো ওয়াট)	বাৎসরিক সরবরাহ (কোটি কিলো-ওয়াট আওয়ার)
আজমীর-মাড়োয়ার	—	১,৩৯৪	০·২৩২
আসাম	৭০০	২,৪১৪	০·২৮৫
বেলুচিস্থান	—	১,২৫০	০·১৭৯
বাংলা	২,৩৭	৩৩৬,৪৪১	৬১·১৩২
বিহার	—	২৭,০৮৬	৬·৩৫৯
বোম্বাই	২৩২,১	৩১৬,০১৫	১০৭·৬৩৮
মধ্যপ্রদেশ	—	১৬,৬৩৩	২·৫০৯
কুর্গ	—	৭৮	০·০০৬
দিল্লী	—	২২,২৮৬	৪·৯২৩
মাদ্রাজ	৬৯,৬৫০	১২৩,০৩৫	২৮·৮২২
উঃ পঃ সীমান্ত	৯,৬০০	১০,৬৩০	১·১২২
উড়িষ্যা	--	১,২২১	০·০৯৭
পাঞ্জাব	৪৯,৭৫০	৮৯,১৩৫	১৪·০৩২
সিন্ধু	—	১৭,৩৯০	২·৯৭৭
যুক্ত-প্রদেশ	২২,৭০০	১৪০,৮১৫	২৮·১১৩
ষ্টেট্ সমূহ	৮১,২২২	১৪৪,৯৬০	৪২·৮৩৭
(মোট প্রায়)	(৪৬৭,৯০০)	(১,২৫০,৭৮০)	(৩০১·৩)

২নং তালিকা

নগর	উৎপাদন ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	বাৎসরিক সরবরাহ (কোটি কিলো-ওয়াট আওয়ার)
কলিকাতা	২৭৫,৩৭৫	৫১'২৮
বোম্বাই	২৪১,০০০	৯৬'৫৮
দিল্লী	২২,২৮৬	৫'৫৫
মাদ্রাজ	৪১,৫০০	৫'৪১
কাণপুর	৪৯,৫০০	১৪'২০
রুড়কী	৪৭,৯০০	৮'২৬
লক্ষ্ণৌ	১০,৫০০	১'৪০
এলাহাবাদ	৭,৯৩০	০'৯৯

উপরের তালিকায় অবিভক্ত ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৪৭ সাল) দেখান হয়েছে। অবিভক্ত ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১২½ লক্ষ কিলোওয়াট। ব্যবচ্ছেদের পরে কিঞ্চিদধিক ১১½ লক্ষ কিলোওয়াট ভারত ইউনিয়নের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় তালিকা থেকে দেখা যাবে, ভারতের এই উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেকই রয়েছে কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে। এই কারণে এ-দুটি নগরীর উপর কলকারখানা ও মনুষ্যবসতির চাপ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। ভারতে এখন বিদ্যুৎ ও নগর পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই পরিকল্পনা ব্যতিরেকে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠা ও জনবসতির ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তেমনি পশ্চিম-বঙ্গের মোট ৩,৩০,০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে ২,৭৫,০০০ কিঃ ওঃ, অর্থাৎ শতকরা ৮৩ ভাগই কলিকাতায় উৎপন্ন হয়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের ন্যূনতার জন্যে প্রদেশের সমস্ত কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীতে স্থাপিত হয়েছে। অন্য কোন সহরে বা অন্য কোথাও কলকারখানা উল্লেখ-যোগ্যভাবে গড়ে ওঠেনি। এই কারণে দুস্থ ও বাস্তুহারাগণও দুমুঠো অন্নের সংস্থানে কলিকাতাকেই একমাত্র গন্তব্যস্থল বলে ধরে নিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপে কথা এই যে, পশ্চিম-বঙ্গের কয়লার খনি অঞ্চলে (রাণীগঞ্জ ইত্যাদি) যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়া সঙ্গত, তা হয়নি।

বিহার ও উড়িষ্যা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে অঞ্চলেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের অভাব সবচেয়ে বেশী। একমাত্র জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাতেই এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৩৭ ভাগ জল-চালিত বিদ্যুৎ। আমাদের দেশে জল-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। আংশিক জরীপ ও আংশিক অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায়, ভারতে প্রায় পাঁচ কোটি কিলোওয়াট জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে।

---

* তালিকা দুটি ভারত গবর্ণমেণ্টের Public Electricity Supply, All India Statistics থেকে সঙ্কলিত।

এই হিসাবে আমরা এপর্যন্ত সে সুযোগের শতকরা এক ভাগ মাত্র সদ্ব্যবহার করেছি।

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নদী নিয়ন্ত্রণ ও জল-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে গভর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আশার কথা এই যে, আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এ-ছাড়া কয়লা ও তেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাঁটি নানা-স্থানে বসানো যেতে পারে। ভারতের ছোট ও মাঝারী বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাঁটিগুলির অধিকাংশই তৈল-চালিত। কয়লা-চালিত ও তৈল-চালিত ছোট ছোট বিদ্যুৎ-ঘাঁটির প্রয়োজন আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। ছোট ছোট সহরগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা এই উপায়ে মেটানো যেতে পারে। নতুন নতুন নগর এখন ক্রমশ গড়ে উঠবে, ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং সে সকল স্থানে নাগরিক সরবরাহের জন্যে বহু বিদ্যুৎ-ঘাঁটির প্রয়োজন হবে। লাভজনক ব্যবসা হিসাবেও বিদ্যুৎ সরবরাহের দিকে ব্যবসায়ীদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় ঘাঁটি বসানো সম্পর্কে বর্তমানে জল-তাড়িত বিদ্যুতের দিকে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই জাতীয় পরিকল্পনার পর্যায়ে পড়বে। দামোদর পরিকল্পনার অধীনে ২০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যান্য যে সকল নদী পরিকল্পনার কথা বর্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে, সেগুলি কার্যকরী হলে প্রায় ৫০,০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারবে।

"পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপরদিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

লাল-দানব ও সূর্যের শৈশব

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

সূর্য ও অন্যান্য সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলি তাদের জীবন-মধ্যাহ্নে যৌবনের উচ্ছলতায় দীপ্যমান রয়েছে। কিন্তু এই নক্ষত্রগুলির জন্মলাভের পর তাদের শৈশবকালের জীবন-রহস্য জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। সুদূর অতীতে এই নক্ষত্রগুলি কি অবস্থায় ছিল,তার স্বাক্ষর কোনরূপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত নেই। তবু আজও যে-সকল নক্ষত্র মহাশূন্যে তাদের শৈশব অবস্থায় দিন যাপন করছে, তাদের তথ্য অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা সূর্যের শৈশবজীবনের ইতিহাস রচনা করেছেন। বর্তমান কালের এসব শিশু নক্ষত্রগুলিকে লাল-দানব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ এই নক্ষত্রগুলি আয়তনে খুব বড়, অথচ পৃষ্ঠ তাপমাত্রা কম বলে লাল বর্ণের দেখায়। ক্যাপেলা-এ, মিরাসেটী, ডেল্টা, সেকেই প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি লাল-দানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। লাল-দানব নক্ষত্রশ্রেণীর কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা তাদের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রার চাইতে অধিক হলেও সূর্য এবং অন্যান্য সাধারণ নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা অপেক্ষা খুবই কম। সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা যেখানে ২০ মিলিয়ন ডিগ্রি, সেখানে ক্যাপেলা-এ লাল-দানবের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ৫ মিলিয়ন ডিগ্রি মাত্র—আবার α অরিগী-১ নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ১ মিলিয়ন ডিগ্রির চেয়েও কম। এরূপ অল্প তাপমাত্রায় সাধারণ তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেজ বিকিরণ করা এই নক্ষত্রগুলির পক্ষে কঠিন বিজ্ঞানী বেটে পরিকল্পিত কার্বন, নাইট্রোজেনের দ্বারা হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া এইসব নক্ষত্রগুলিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব সাধারণ নক্ষত্র বা সূর্যদেহ থেকে যে প্রক্রিয়ায় তেজ বিকিরণ হয়, এসব নক্ষত্রগুলিতে তা হয় না। বিজ্ঞানী গ্যামো ও টেলার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লাল-দানব নক্ষত্রগুলির তেজ বিকিরণের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। তাঁদের মতে লাল-দানবের অল্পতর কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার জন্যে কার্বন বা নাইট্রোজেনের পরিবর্তে লঘুতর মৌলের সঙ্গে তাপীয় প্রোটনের সংঘাতে তাপ কেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেজের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন অবস্থায় এই রকম তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখান হয়েছে।

(১) ${}_1D^2 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^3$ + তেজ
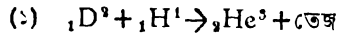
উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ডয়েটারন ও প্রোটন উভয়েরই বিদ্যুৎভরণ অল্প বলে এক মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও অধিক তেজের উদ্ভব হয়। এই ক্রিয়ার গতি খুবই দ্রুততর।

(২) (ক) ${}_3Li^6 + {}_1H^1 > {}_2He^4 + {}_2He^3$

(খ) ${}_3Li^7 + {}_1H^1 > {}_2He^4 + {}_2He^4$

(গ) ${}_4Be^9 + {}_1H^1 \rightarrow {}_3Li^6 + {}_2He^4$

(ঘ) ${}_5B^{11} + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + {}_2He^4 + {}_2He^4$
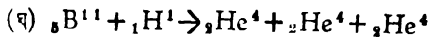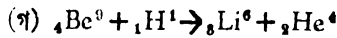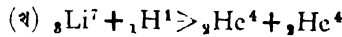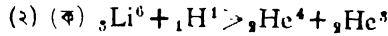
উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের তাপ কেন্দ্রীন ক্রিয়াগুলি প্রথম প্রকারের চাইতে মন্থর গতিতে চলে এবং ৩ থেকে ৭ মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই ক্রিয়া সম্ভব হয়।

(৩) ${}_5B^{10} + {}_1H^1 \rightarrow {}_6C^{11}$ + তেজ

তৃতীয় প্রকারের এই প্রক্রিয়া আরও মন্থর এবং সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার চেয়ে কিছু কম তাপমাত্রাতেই এই ক্রিয়া চলতে পারে। লঘুতর মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে উপরোক্ত প্রকারের তিন রকম প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে লাল-দানবশ্রেণীর নক্ষত্রগুলি তেজ বিকিরণ করে। এই প্রক্রিয়াগুলি অল্প

পরিমাণ কেন্দ্রীয় তাপে সম্ভব হয়। সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপে এই সমস্ত হাল্কা মৌলিক পদার্থের মধ্যে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া চলতে পারে না—বরং অত্যধিক তাপে এই সমস্ত পদার্থ আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। তাই সৌরকেন্দ্রে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি ধাতু বর্তমান নেই—একথা বলতে পারা যায়, যদিও সৌর-জীবনের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোনদিন এই সমস্ত পদার্থ তেজ-বিকিরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। তখন সৌর-কেন্দ্রের তাপমাত্রা ছিল অল্প এবং সেই যুগেই এই পদার্থগুলি তেজ বিকিরণ করে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কারণ উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াগুলিতে আমরা দেখেছি যে, সূর্যদেহে কার্বন বা নাইট্রোজেনের মত এই পদার্থগুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে না, বরং নিজেরাই নিঃশেষে হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়। সুদূর অতীতে সূর্যের শৈশবে যখন তার কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ছিল অল্প তখন সৌরদেহে বর্তমান বেরিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি হাল্কা মৌলিক পদার্থগুলির সঙ্গে তাপীয় প্রোটনের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার ফলে সূর্যে এই সমস্ত পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বর্তমান লাল-দানবশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধ্যেও এই সমস্ত হাল্কা পদার্থ নিঃশেষে দগ্ধীভূত হয়ে তেজ বিকিরণ করছে। বিভিন্ন লাল-দানব নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা বিভিন্ন বলে তাপ-কেন্দ্রীন প্রক্রিয়ায়ও বিভিন্নতা দেখা যায়। শীতলতম লাল দানব α অরিগী-১ ও রাসেলের চিত্রে তার প্রতিবেশী নক্ষত্রগুলি প্রথম প্রকারের ডয়েটারন ও প্রোটনের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেজ বিকিরণ করে। এই নক্ষত্রগুলিতে ঐ অবস্থায় লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ও বোরন প্রভৃতি পদার্থগুলির ভাণ্ডার অক্ষুন্ন থাকে। ক্যাপেলা-এ লাল-দানবের ডয়েটারন ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় সেখানে দ্বিতীয় প্রকারের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া (অর্থাৎ লিথিয়াম+প্রোটন প্রভৃতির) অবিরত ঘটছে। রাসেলের চিত্রে সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির পার্শ্ববর্তী লাল-দানবেরা তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ $_5B^{10}+{}_1H^1$-এর দ্বারা সংঘটিত তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেজ বিকিরণ করে। এদের ভিতরকার হাল্কা মৌলিক পদার্থ এই রকম তেজ বিকিরণের দ্বারা যখনই এর পর নিঃশেষিত হয়ে যায় তখনই এরা সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রদের দলে এসে পড়ে। এদের ভিতর কার্বন, নাইট্রোজেনের চেয়ে আর হাল্কা পদার্থ না থাকায় আমাদের সূর্য যে প্রক্রিয়ায় তেজ বিকিরণ করে এরাও সেই প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে।

বর্তমান আকাশের লাল-দানবগুলির এই রকম বিচিত্র জীবনযাত্রার তথ্যানুসন্ধান করে সূর্যও যে একদিন এই লাল-দানবরূপে তার বাল্যকালে অবস্থিত ছিল, বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিত হয়েছেন। কার্বন ও নাইট্রোজেনের চেয়ে হাল্কা পদার্থগুলির সহিত প্রোটনের যে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার ফলে লাল-দানবগুলি তেজ বিকিরণ করে, সৌরতেজ-বিকিরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার বেশ তফাৎ রয়েছে। সৌরদেহের কার্বন বা নাইট্রোজেন কেবল অনুঘটকের কাজ করে—কিন্তু লাল-দানবের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ায় বেরিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি লঘুতর মৌলিক পদার্থগুলি একেবারে বিনষ্ট হয়, পুনরায় ফিরে আসে না। তাই লাল-দানবের বিভিন্ন অবস্থার বিবর্তনের কাল সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রের জীবনকালের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। কারণ নক্ষত্রদেহে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকার দরুণ একেবারে নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ নক্ষত্রের জীবনকাল ফুরায় না বলেই সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রের আয়ু লাল-দানবের চেয়ে অনেক বেশী।

এখন আমরা সূর্য, তথা নক্ষত্র-জীবনের বিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। এই ধারণা অনুসারে প্রত্যেক নক্ষত্র প্রায় সমস্ত রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের পাতলা ও শীতল বায়বের একটি প্রকাণ্ড গোলকরূপে তার জীবন

আরম্ভ করে। এর বিভিন্ন অংশে মহাকর্ষণের ফলে গোলকটি সংকুচিত হয়। ফলে, এর কেন্দ্রস্থলে তাপমাত্রা যায় বেড়ে। যখন এই তাপমাত্রা ১ মিলিয়ন ডিগ্রিতে উপস্থিত হয় তখনই ডয়েটারন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া সুরু হয়। প্রথম প্রকারের এই প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যে তেজের উদ্ভব হয়, সেই তেজই তখন নক্ষত্রদেহের আর সংকোচন হতে দেয় না এবং প্রতিক্রিয়া চলবার মত ডয়েটারন নক্ষত্রদেহে নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত নক্ষত্রটি প্রায় স্থায়ী অবস্থায় অবিচলিত থাকে।

আবার যখন ডয়েটারনের ভাণ্ডার এত কমে আসে যে, তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া আর চলতে পারে না, তখন নক্ষত্র দেহে আবার সংকোচন আরম্ভ হয়। এই সংকোচনের ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে আবার এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছে যখন সেই তাপমাত্রায় লিথিয়াম ও হাইড্রোজেনের মধ্যে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া চলতে পারে। তখন পুনরায় সংকোচন বন্ধ হয়। এই রকম ভাবে পরপর তাপ-কেন্দ্রীন প্রতিক্রিয়াগুলির ভিতর দিয়ে নক্ষত্রটির কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ বেড়ে যায়। তারপর নক্ষত্রটি একদা সাধারণ পর্যায়ে এসে পড়ে। সেখানে কার্বন বা নাইট্রোজেনরূপ অনুঘটকের দ্বারা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম রূপান্তরিত হয়ে তেজ বিকিরণ করে। কার্বন বা নাইট্রোজেনের চেয়ে হাল্কা ধাতুগুলি, যারা লাল দানবের তেজ বিকিরণের উৎস, তাদের পরিমাণ নক্ষত্রদেহের শতকরা একভাগ মাত্র। নক্ষত্র-জীবনের স্বল্প-স্থায়ী শৈশবে লাল দানব অবস্থায় তাই এই হাল্কা ধাতুগুলির নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব অল্প হাইড্রোজেনই নিঃশেষিত হয়। সাধারণ পর্যায়ে অর্থাৎ জীবনের মধ্যাহ্নে এসে নক্ষত্রটি অবশিষ্ট সমগ্র হাইড্রোজেনের শেষাংশটুকু পর্যন্ত তেজ-বিকিরণের দ্বারা নিঃশেষ করে। সব হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্রদেহের চরম সংকোচন আরম্ভ হয়—নক্ষত্রটির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

ক্যাপেলা-এ লাল দানব সাধারণ পর্যায়ে একদিন বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী উজ্জ্বলতা পাবে ও আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র-গুলির অন্যতম হয়ে প্রকাশিত হবে। আমাদের সূর্য একদা ছিল অনুজ্জ্বল লাল-দানব—নিয়মিতভাবে বিবর্তনের দ্বারা সেই অনুজ্জ্বল নক্ষত্রই আজ আমাদের উজ্জ্বল সূর্যের স্থান অধিকার করেছে।

সূর্য, তথা নক্ষত্র-জীবনের শৈশব থেকে ক্রম-বিবর্তনকালের ধারা অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র-জগতের বহু রহস্য উদঘাটন করেছেন। লাল দানব নক্ষত্রগুলিই যে নক্ষত্র-জীবনের শিশু অবস্থা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পার্থিব জগতের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, নক্ষত্র-জগতের শিশুরা বয়স্কদের চাইতে আকারে অনেক বড়।

বিজ্ঞানী এডিংটন নক্ষত্র-বিবর্তনের একটি নতুন মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে নক্ষত্রমাত্রেই তাদের জীবনের প্রারম্ভে মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখনই তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া সুরু হয়। লাল-দানবের বিভিন্ন পর্যায়ের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া শেষ হলে ডয়েটারন, লিথিয়াম প্রভৃতি হাল্কা মৌলিক ধাতুগুলি নিঃশেষিত হয় এবং তারপরে নক্ষত্রদেহ সংকুচিত হয়ে শ্বেত-বামনের আকার ধারণ করে। এইরূপ শ্বেত-বামনে হাইড্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এখন এই হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনরূপ অনুঘটকের সাহায্যে যে তেজ বিকিরণ করে তার প্রতিক্রিয়া প্রথমাংশে হয় খুব দ্রুত। ফলে নক্ষত্র-দেহে বিস্ফোরণ ঘটে এবং নক্ষত্রটি নোভা বা নবতারা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন নক্ষত্রটির আকার ও ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট বেড়ে যায়। পরে এই তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া যখন মন্থর হয়ে আসে

তখন নক্ষত্রটি সাধারণ পর্যায়ে পড়ে। তখন আমাদের সূর্যের মত কিছুকাল তেজ বিকিরণ করে। তারপর পুনরায় তার শ্বেত-বামন অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। তখন নক্ষত্রদেহে হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যায়। মোটের উপর নক্ষত্র-জীবনে একবার লোভা ও দুবার শ্বেত-বামন অবস্থা ঘটা স্বাভাবিক নিয়ম। নক্ষত্র-জীবনের এর চেয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি।

এই লাল-দানবগুলির মধ্যে আর একটি বৈচিত্র্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। দেখা যায়, কোন কোন লাল-দানব নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য স্থির নয়। এই নক্ষত্র-গুলির সমগ্র দেহ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্পন্দিত হয়—তাদের বহিরাবরণ পর্যায়ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠে ও আবার সংকুচিত হয়। এদের নাম দেওয়া হয়েছে স্পন্দনশীল নক্ষত্র। জুড়ি-তারাগুলির মধ্যে পরস্পরের গ্রহণ দ্বারা ঔজ্জ্বল্যের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র-জগতে এই রকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু নক্ষত্রদেহের স্ফীতি ও সংকোচনের দ্বারা ঔজ্জ্বল্যের এই হ্রাস-বৃদ্ধি কেবল লাল-দানব শ্রেণীর নক্ষত্রের মধ্যেই দেখা যায়। এই স্পন্দনশীল নক্ষত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর স্পন্দনশীল নক্ষত্রগুলির সম্পূর্ণ স্পন্দন-কাল খুব অল্প—ছয় ঘণ্টা থেকে একদিন পর্যন্ত। ডেল্টা, সেফেই নক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এদের স্পন্দন-কাল এক সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ; তৃতীয় শ্রেণীর স্পন্দনশীল নক্ষত্র মীরাসেটী ও অন্যান্যের স্পন্দন-কাল দীর্ঘ—প্রায় এক বৎসরের মত। এখন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে—লাল-দানব নক্ষত্রের তিন শ্রেণীর তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার সঙ্গে তিন শ্রেণীর স্পন্দনশীল নক্ষত্রের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। দীর্ঘ-স্থায়ী স্পন্দনশীল মীরাসেটী প্রভৃতি ডয়েটারন-প্রোটন তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া থেকে তেজ আহরণ করে। ডেল্টা, সেফেই প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পন্দনশীল নক্ষত্রেরা লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ও ভারী বোরন প্রভৃতির প্রোটনের সঙ্গে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেজ পায়। স্বল্পকাল স্পন্দনশীল নক্ষত্রগুলির তেজের উৎস হচ্ছে—হাল্কা বোরন ও প্রোটনের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মধ্যে যে কী রহস্য নিহিত রয়েছে তা আমাদের অজ্ঞাত। বিজ্ঞানীরা আজও সে কথার উত্তর খুঁজে পাননি। তবু নক্ষত্র দেহের এ-রকম স্পন্দন কেন হয় তার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য দুটি নক্ষত্রের নিকট সান্নিধ্যে বা নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ স্বল্পতম বিস্ফোরণের ফলে এ রকম স্পন্দন ঘটতে পারে; কিন্তু এই কারণে স্পন্দন ঘটলে তা একটা বিশেষ শ্রেণীর নক্ষত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? তাই কেউ কেউ বলেন, নক্ষত্র থেকে নির্গত তেজ তার অভ্যন্তর ভাগ হতে বাইরে আসতে কিছুটা সময় নেয় এবং এই সময়ের মধ্যে সে তার নিজের সমগ্র দেহ-পিণ্ডটাকে উত্তপ্ত করে তোলে। অতঃপর নক্ষত্রের তেজ বাইরে বিকিরিত হয়। এই ঘটনাকে আমরা নক্ষত্রের স্পন্দনরূপে দেখতে পাই। অধ্যাপক গ্যামো বলেন, স্পন্দনশীল নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া ও মহাকর্ষীয় সংকোচন থেকে উদ্ভূত দু'শ্রেণীর তেজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাসেলের চিত্রে যে অংশে স্পন্দনশীল নক্ষত্রগুলি রয়েছে সে থেকে মনে হয়—এই নক্ষত্রগুলিতে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তেজ আর মহাকর্ষীয় সংকোচন-সম্ভূত তেজের পরিমাণ প্রায় সমান। তাই এই অবস্থায় নক্ষত্রগুলি উভয় প্রকার তেজই পর্যায়ক্রমে বিকিরণ করার প্রয়াস পায়, ফলে নক্ষত্রের স্পন্দন হয়। মতবাদটি সুন্দর হলেও সুনিশ্চিত নয়। হয়তো অদূর ভবিষ্যৎ একদিন নক্ষত্র-রাজ্যের এই রহস্যময় লাল-দানবদের জীবন-তত্ত্ব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। ফলে অনন্ত আকাশের গোপন যবনিকা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে।

মহাজাগতিক রশ্মি

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

কস্‌মিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি কথাটির উৎপত্তি হয়েছে মাত্র ২৩ বৎসর। এই রশ্মি-বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত তারও উদ্বোধন হয়েছে মাত্র ১৯১০ সাল থেকে।

সাধারণ বাতাসের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালন সম্পর্কে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানী সি, টি, আর উইলসন সর্বপ্রথম কস্‌মিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। অনেকের মতে এলষ্টার, গাইটেল প্রমুখ বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম এই অদৃশ্য রশ্মির সন্ধান পান। বায়ু বা অন্যান্য গ্যাস 'আয়নিত' না হলে বিদ্যুৎ পরিবাহন করতে পারে না। কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে সমস্ত প্রাথমিক ধারণা এবং অভিজ্ঞতা এই 'আয়নায়ন'এর পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্যে আয়নায়ন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার প্রয়োজন।

প্রত্যেক পরমাণুতে একটি ধনাত্মক (+) তড়িৎ-গ্রস্ত নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিন থাকে। এই কেন্দ্রিনকে ঘিরে আমাদের সৌরজগতে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলির মত কতকগুলি ঋণাত্মক (-) তড়িৎগ্রস্ত হাল্কা কণিকা অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে। সমস্ত ইলেকট্রনগুলির ভর এবং তড়িৎ-সংস্থান একই; কিন্তু বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রিনের ভর এবং তড়িৎ-সংস্থান বস্তুবিশেষে বিভিন্ন। এই জন্যেই আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন আকৃতির এবং প্রকৃতির নানা বস্তু দেখতে পাই। ওজনে সব চেয়ে হাল্কা কেন্দ্রিন হলো—হাইড্রোজেনের কেন্দ্রিন—তার নাম প্রোটন। প্রোটন হাল্কা হলেও একটি ইলেকট্রনের চেয়ে ১৮০০ গুণ ভারি। একটি 'নরম্যাল' বা অবিকৃত পরমাণুতে কেন্দ্রিনের ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনগুলির ঋণাত্মক তড়িৎ-সংস্থান পরস্পর শক্তিসাম্য বা 'নিউট্র্যালাইজ্‌ড' অবস্থায় থাকে। এই শক্তিসাম্য অবস্থার মধ্যে যদি কোনও পরমাণু কোন কারণে তার একটি ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলে, তখন বাইরের ইলেকট্রনগুলির তড়িৎশক্তির চেয়ে কেন্দ্রিনের তড়িৎশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে এবং এই ধনাত্মক তড়িৎশক্তির আধিক্য হেতু পরমাণুটিকে ধনাত্মক আয়ন বলা হয়। অর্থাৎ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংযোগ ঘটলে তা' ঋণাত্মক এবং ইলেকট্রনের বিয়োগ ঘটলে ধনাত্মক আয়ন বলা হয়। এই রকম বহু আয়নসমন্বিত গ্যাসকে বলা হয় 'আয়নিত গ্যাস'। দেখা গিয়েছে, এই আয়নিত গ্যাসের মধ্যে যদি কোনও তড়িৎগ্রস্ত বস্তু সম্পূর্ণ 'ইনস্যুলেটেড,' বা অন্তরিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে ধীরে ধীরে ঐ বস্তুটির তড়িৎ-সংস্থান বা 'চার্জ' লুপ্ত হয়ে যায়। এই বিলুপ্তি কেমন করে ঘটে? তড়িৎগ্রস্ত বস্তু তার বিপরীতধর্মী আয়নগুলিকে আকর্ষণ করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার তড়িৎশক্তি লোপ পায় বা উভয় শক্তির সাম্য স্থাপিত হয়। এর সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যে যে যন্ত্র সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় তার নাম 'গোল্ড-লিফ্‌ ইলেক্ট্রোস্কোপ'।

গাইটেল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, তড়িৎগ্রস্ত ইলেকট্রোস্কোপকে নিখুঁতভাবে অন্তরিত অবস্থায় রাখলেও স্বতঃই এর তড়িৎ-সংস্থান লুপ্ত হয়। এর কারণ সম্বন্ধে তখন বলা হতো যে, ভূগর্ভস্থ তেজস্ক্রিয় বা রেডিও-অ্যাকটিভ্‌ পদার্থ হতে বিচ্ছুরিত

রশ্মির জন্যেই ঐরূপ ঘটে। ১৯১০ সালে সুইস্ বিজ্ঞানী গকেল উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন যে, যদি ভূগর্ভস্থ তেজস্ক্রিয় রশ্মিই এর জন্য দায়ী, তবে যন্ত্রটিকে ঊর্দ্ধাকাশে প্রেরণ করলে তেজস্ক্রিয় রশ্মির তড়িৎক্রিয়া কমে যাওয়া উচিত। তিনি তাঁর মন্তব্যের সক্রিয় প্রমাণ উপস্থাপিত করার জন্যে বেলুনে করে একটি ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্র ৪৫০০ মিটার উঁচুতে প্রেরণ করেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। তড়িৎ-সংস্থান লুপ্তির হার ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ঊর্দ্ধাকাশে অনেক বেশী। ১৯১১ সালে ভিয়েনার অধ্যাপক হেস্ও ঐভাবে পরীক্ষা করেন। এছাড়া আরও পরীক্ষা করা হয়। রঞ্জন রশ্মি, আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি যে-সব বস্তু ভেদ করতে পারে না, তাই দিয়ে ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিয়েও দেখা গেল, যন্ত্রটিতে তড়িৎশক্তির বিলুপ্তি ঘটেছে। তখন বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন—তেজস্ক্রিয় রশ্মি এই তড়িৎ বিলুপ্তির কারণ নয়। আরও এমন কোনও রশ্মি আছে যার প্রভাবে এই তড়িৎ-বিলুপ্তি ঘটছে। কস্‌মিক-রে গবেষণায় গকেলের পূর্বোক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞানী রবার্ট অ্যাণ্ড্রুজ মিলিকান বলেছেন—গকেল নূতন এবং প্রয়োজনীয় কিছু আবিষ্কার করেছেন। অধ্যাপক হেস্ ১৯১১ সালে ৫২০০ ফিট ঊর্দ্ধে ইলেকট্রোস্কোপ পাঠিয়ে মন্তব্য করেন—যেহেতু রশ্মির প্রভাব দিনে এবং রাতে সমভাবেই বর্তমান—তখন সূর্য্য এর উৎপত্তিস্থান নয়। বিজ্ঞানী কোলাষ্টার ৯০০ মিটার পর্যন্ত গবেষণা করে হেসের মন্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯২৩ সালে বিজ্ঞানী বাউয়েন ও মিলিকান একটি বিশেষ বেলুনে, বিশেষভাবে তৈরী স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রোস্কোপ, ব্যারোমিটার এবং থার্মোমিটার, ৫০,০০০ ফিট ঊর্দ্ধে প্রেরণ করেন। ১৯২২ সালে বিজ্ঞানী অটিস্, ক্যামেরন এবং মিলিকান ক্যালিফোর্ণিয়াতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১৮০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত মুইর হ্রদের বরফ-ঢাকা জলে ১৫ ফিট নীচ পর্যন্ত ইলেকট্রোস্কোপ পাঠিয়ে কস্‌মিক রশ্মির ভেদকারী শক্তির পরিমাপ করেন এবং তাতে এই শক্তি তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মির চেয়ে ১৮ গুণ বেশী বলে প্রমাণিত হয়। রারনথি, ফেরো প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ১০০০ মিটার জলের নীচেও বিশেষ শক্তিধর বা 'সুপার পাওয়ার' কস্‌মিক রশ্মির সন্ধান পান।

কস্‌মিক রশ্মির স্বরূপ:—কস্‌মিক রশ্মির সাধারণভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে বিচ্ছুরিত রশ্মি তিন প্রকার—আল্‌ফা, বিটা এবং গামা। আল্‌ফা রশ্মি ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কেন্দ্রিন বা ইলেকট্রনমুক্ত হিলিয়াম পরমাণু। বিটা রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত ইলেকট্রন। আল্‌ফা এবং বিটা রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে এরা বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন কণিকাস্রোত এবং গামা রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না বলে বিজ্ঞানীরা বলেন—গামা রশ্মি, সাধারণ আলোক রশ্মি বা রঞ্জন রশ্মির মত তরঙ্গ-গঠিত, তবে গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম।

তরঙ্গ ঘটিত রশ্মিগুলির তরঙ্গ সাধারণত পুঞ্জাকারে বা বাণ্ডিলের মত একই গতিবেগে ছুটে চলে এবং সেই এক একটি তরঙ্গপুঞ্জকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'ফোটন'। বহু দীর্ঘ তরঙ্গ ঘটিত ফোটন (রেডিও তরঙ্গ ফোটন) এত কম শক্তিসম্পন্ন এবং এতখানি আয়তন জুড়ে বিস্তৃত থাকে যে, সাধারণত পর্যবেক্ষণ কালে এদের তরঙ্গ-বৈশিষ্ট্যটুকুই ধরা পড়ে। দেখা গেছে—এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমাগত ছোট করলে এক একটি ফোটন ক্রমশ ঘন বা 'কন্‌সেন্‌ট্রেটেড' হয়ে সাধারণ কণিকাসুলভ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আহরণ করে। যেহেতু অন্তর্বল বা 'এনার্জি' এবং ভর বা 'ম্যাস' পরস্পর তুল্যাঙ্ক বা

'ইকুইভ্যালেণ্ট', সেহেতু ক্ষুদ্র তরঙ্গের তরঙ্গপুঞ্জ বা ফোটনকে এমনভাবে ক্রিয়া করতে দেখা যায়—যেন তাদেরও ভর এবং সম্বেগ বা 'মোমেণ্টাম' আছে।

পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করার নানা উপায় আছে—তাপ, ঘর্ষণ এবং রশ্মিপাত। এছাড়া বেগযুক্ত ইলেকট্রন সংঘাত অথবা রঞ্জন রশ্মির দ্বারাও ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা যায়।

যেহেতু কস্‌মিক রশ্মি বহির্জগত থেকে পৃথিবীতে আসে সেজন্যে একথা ঠিক যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করার শক্তি তার আছে। তবে দেখা গিয়েছে, প্রায় সমস্ত রশ্মিগুলিই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ-কালের পূর্বের আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌছুতে পারে না। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে গামা রশ্মির ভেদশক্তি সব চেয়ে বেশী হলেও—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও সে ভেদ করতে পারে না। তাই এককালে বলা হতো, কস্‌মিক রশ্মি—গামা পারের আলো বা আল্‌ট্রা গামা-রে অর্থাৎ কস্‌মিক রশ্মি, গামা রশ্মিই বটে—তবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলে এদের ভেদকারী শক্তি খুব প্রবল। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে কস্‌মিক রশ্মি পাওয়া যায় তা অত্যন্ত জটিল। তারা ফোটন, ইলেকট্রন এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত বহু নূতন কণিকার সংমিশ্রণ। কস্‌মিক রশ্মি সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা পর্বতের উপর বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে ভেদকারী ক্ষমতা ১০০০০ থেকে ৩০০০০ ফিট উচুতে সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেক কম।

কস্‌মিক রশ্মির কণিকাগুলি পৃথিবীর বায়ুস্তরে পৌছাবার অনেক আগেই চৌম্বক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। যে সমস্ত কনিকা সোজা খাড়াভাবে চৌম্বক মেরুর দিকে ধাবিত হয়, তারা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা ব্যাবর্তিত বা 'ডিফ্লেক্‌টেড' হয় না। মেরু অঞ্চলের দিকে ধাবিত সমস্ত রশ্মিগুলিই বায়ুমণ্ডলে পৌছুতে সক্ষম; কিন্তু বিযুবরেখার সন্নিহিত অঞ্চলের দিকে ধাবিত রশ্মিগুলি সাধারণত তির্য্যক পথ গ্রহণ করে। কণিকাগুলির অন্তর্বল যত কম, পথ তত বাঁকা হয় এবং যে সমস্ত কণিকার ন্যূনতম অন্তর্বলও থাকে না তারা বিষুবরেখার অঞ্চলে পৌছুতে পারে না। ফলে দেখা যায়, কস্‌মিক রশ্মির আতিশয্য বিষুব অঞ্চলের চেয়ে মেরু-অঞ্চলে বেশী। সেজন্যে ইহা নিঃসন্দেহ ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রাথমিক বা প্রাইমারী রশ্মি—তড়িৎগ্রস্ত কণিকা। পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে বিষুব অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী কণিকা আসে। যেহেতু ধনাত্মক কণিকাগুলি 'খুব তির্যক কোণ' সৃষ্টি করে পূব দিক থেকে এবং ঠিক ঐভাবে ঋণাত্মক কণিকা পশ্চিম দিক থেকে পৃথিবীতে আসতে পারে না, সেহেতু সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পশ্চিমদিক থেকে আগত প্রাথমিক রশ্মিগুলি ধনাত্মক এবং সেগুলি—প্রোটন। তবে ঊর্দ্ধাকাশে বহু ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রন, এমনকি ফোটনও, প্রোটনের অনুগমন করে।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, অতি শক্তিধর কস্‌মিক রশ্মিগুলি প্রোটন তবে কস্‌মিক রশ্মির আরও বিকারের বিষয় স্পষ্ট ধারণা করা যায়। প্রোটনগুলি খুব বেশী দূর ভেদ করতে পারে না। কারণ তাদের অন্তর্বল বেশী হওয়ার জন্যে তারা কোনও কেন্দ্রিনের কাছাকাছি এলেই 'রিঅ্যাকটেড্' হয়। সাধারণত এই প্রতিক্রিয়ায় মেসন নামক কণিকার জন্ম হয় এবং তারা মূল প্রোটনের আদি গতিপথ গ্রহণ করে। মেসনের ভেদ-কারী ক্ষমতা প্রোটনের চেয়ে অনেক বেশী এবং প্রধানত এরাই ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌছায়—এমনকি অভ্যন্তর ভাগেও কিছুটা প্রবেশ করে। মেসন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এরা জন্মের এক সেকেণ্ডের ২০ থেকে ৩০ লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই আপনা আপনি বিচূর্ণ বা 'ডিস্‌-ইন্‌টিগ্রেটেড্' হয়ে যায়। এই বিচূর্ণ মেসন থেকে অত্যধিক বলসম্পন্ন ইলেক্‌ট্রনের অনেকগুলিই পুনরায় প্রতিক্রিয়া চালাবার শক্তি রাখে এবং

কোনও পরমাণু কেন্দ্রিনের নিকটবর্তী হওয়ার সময় যদি ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগ কমে যায় তাহলে কিছুটা অন্তর্বল ফোটনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছুটি ইলেক্‌ট্রনের যুক্ত ভর অপেক্ষা বেশী অন্তর্বল সম্পন্ন একটি ফোটন, ছুটি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রনের জন্মদান করতে পারে। ইলেক্‌ট্রন ছুটির জন্মের পর যদি কিছু অন্তর্বল অবশিষ্ট থাকে তবে তা' ওই ইলেক্‌ট্রন ছুটিকে গতিবেগ দান করতে নিঃশেষিত হয়। এখন ইলেক্‌ট্রন ছুটি যদি সবিশেষ অন্তর্বলসম্পন্ন হয় তবে তারা পুনরায় ফোটনের সৃষ্টি করতে পারে। এই ভাবে বারবার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা বহু ইলেক্‌ট্রন ও ফোটনের ঝর্ণার সৃষ্টি হয়।

কস্‌মিক রশ্মির যন্ত্রপাতি :—'আইও-নাইজেসন্ চেম্বার' বা আয়নায়ন আধারে আয়ন সংখ্যা বাড়াবার জন্যে কিছু পরিমাণ চাপযুক্ত গ্যাস ভরে দেওয়া হয়। আধারের আয়ন-সংখ্যা কস্‌মিক রশ্মির আতিশয্যের উপর নির্ভর করে

আয়নায়ন আধার কস্‌মিক রশ্মিপ্রভাব অবিচ্ছিন্ন ভাবে নির্ধারণ করে এবং গাইগার কাউণ্টার প্রত্যেকটি রশ্মিপ্রভাব পৃথকভাবে নিরূপণ করে। গাইগার-কাউণ্টার একটি চোঙা বা নলের মত দেখতে। এর মধ্যে ছুটি বিদ্যুৎ পরিবাহক থাকে। একটি পরিবাহক একটি সূক্ষ্ম তার, অপরটি একটি এককেন্দ্রিক নল। এই গাইগার-কাউণ্টারকে একটি অথবা কয়েকটি গ্যাসের সংমিশ্রণ দ্বারা ভরে দেওয়া হয়। কস্‌মিক রশ্মি এই আধারের মধ্য দিয়ে চলে গেলে একটি অথবা কয়েকটি মুক্ত বা ফ্রি ইলেক্‌ট্রনের সৃষ্টি করে। এখন পরিবাহক ছুটিতে তড়িৎশক্তি নিয়োগ করে ইলেক্‌ট্রনটিকে বেগবান করা হয়। বেগবান ইলেক্‌ট্রন গ্যাসের পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বহু আয়নের সৃষ্টি করে। এর ফলে একটি আকস্মিক স্পন্দনজনিত বিচ্ছুরণ বা 'ইম্‌পাল্‌সিভ্ ডিস্‌চার্জ' পরিবাহক ছুটিতে সংঘটিত হয়। এই বিচ্ছুরণ খুব ক্ষণস্থায়ী এবং এক সেকেণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে স্বতঃ প্রশমিত হয়। এই স্পন্দন বা পাল্‌স্, বেতারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাড়িয়ে নিয়ে অপর একটি গণনাযন্ত্রে পাঠানো হয়। এই যন্ত্রটি যখনই কাজ করে তখন ক্যামেরার ছবি তোলার মত 'ক্লিক্' করে শব্দ হয় এবং তা দূর থেকে শুনে গণনা করা যায়

একটি মাত্র গাইগার-কাউণ্টার সাধারণত আল্‌ফা, বিটা এবং কস্‌মিক রশ্মিতেও সাড়া দেয় এবং দেখা গিয়েছে, গণনার বেশীর ভাগ সংখ্যা তেজস্ক্রিয় রশ্মিজনিত। কস্‌মিক রশ্মিকে বেছে নেওয়ার জন্যে তিন বা ততোধিক গাইগার কাউণ্টার ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার পদ্ধতি দু-প্রকার। প্রথম, সারিবদ্ধভাবে আধারগুলিকে সাজানো যায়। কস্‌মিক রশ্মির ভেদকারী শক্তি বেশী বলে এবং অসম্ভব গতিবেগের জন্যে প্রায় একই সময়ে তিনটি আধারকেই বিচ্ছুরিত করতে পারে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির শক্তি কম, তাই ছুটির বেশী বিচ্ছুরণ করতে সক্ষম হয় না। যান্ত্রিক কৌশলে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে একসঙ্গে তিনটি কাউণ্টার বিচ্ছুরিত হলে একমাত্র তখনই যন্ত্রটি কাজ করবে, অন্যথায় কাজ করবে না। এভাবে সজ্জিত কাউণ্টারগুলিকে বলে—"কাউণ্টার্‌স্ ইন্ কোয়েনসিডেন্স।"

ত্রিভুজাকারেও কাউণ্টার সজ্জিত করা যায়। এক্ষেত্রে তিনটি আধারকে বিচ্ছুরিত করতে ন্যূনপক্ষে ছুটি কণিকার প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে অনেক বেশী সংখ্যক রশ্মিপাত গণনা করতে দেখা যায়। এইভাবে কাউণ্টার-সজ্জার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, কস্‌মিক রশ্মি দলবদ্ধভাবে পৃথিবীতে আসে এবং প্রায়ই এই দল এত অধিক সংখ্যক রশ্মির দ্বারা গঠিত হতে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরা এই রশ্মিপাতকে মহাজাগতিক-ঝর্ণা বা "কস্‌মিক সাওয়ার" বলে থাকেন।

মেঘপ্রকোষ্ঠ বা "ক্লাউড চেম্বার" নামক আর একটি যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হলেন বিজ্ঞানী সি, টি,

আর, উইল্‌সন্‌। এই যন্ত্রটি সর্বপ্রথম তেজস্ক্রিয় রশ্মির গবেষণার জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কস্‌মিক রশ্মির গবেষণাতেও এর দান কম নয়। মেঘ-প্রকোষ্ঠের মূলতত্ত্ব হল এই যে,—বাতাস জলীয় বাষ্প বা অন্য কোনও জলীয় পদার্থ দ্বারা অতিসিক্ত বা 'স্যাটুরেটেড' হলে, জলবিন্দু বিশেষকরে আয়নের চতুর্দিকে জমে যায়। যদি কোন তড়িৎ-গ্রস্ত কণিকা ওই আধারটির মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে চলার পথের পিছনে কতকগুলি আয়নের সারি চিহ্ন বা 'ট্রেল্‌স্‌' রেখে যায় এবং ওই আয়নগুলির গায়ে জলবিন্দু জমে একটি রূপালী সরু রেখার সৃষ্টি করে। ক্যামেরার সাহায্যে এই গতিপথের ছবি অতি সহজে তোলা যায়। মেঘপ্রকোষ্ঠকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে কণিকাটির শক্তিরও পরিমাপ করা যায়। কণিকাটি চৌম্বক শক্তির প্রভাবে বক্র গতিপথ অবলম্বন করে। কণিকাটির ভর, তড়িৎসংস্থান এবং অন্তর্বলের উপর তার গতিপথের বক্রতা নির্ভর করে। কস্‌মিক রশ্মির গবেষণাকালে মেঘপ্রকোষ্ঠের সব'চয়ে বড় অবদান হলো—পজিটিভ ইলেকট্রন বা পজিট্রন এবং নেগেটিভ ইলেকট্রন বা নেগেট্রন বা নিউট্রনের আবিষ্কার। পজিট্রন সাধারণ ইলেকট্রনের মত, একই ভর এবং একই পরিমাণ তড়িৎসংস্থান সম্পন্ন; শুধু তড়িৎ-সংজ্ঞা বিপরীত অর্থাৎ পজিটিভ বা ধনাত্মক। ১৯৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে অ্যাণ্ডারসন ও ব্ল্যাকেট স্বাধীনভাবে উভয়ে আবিষ্কার করেন। তাঁরা এও আবিষ্কার করেন যে, এদের গতিপথ সাধারণ ইলেকট্রনের মতই– তবে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভাবে ভিন্নমুখী। কস্‌মিক রশ্মির মধ্যে পজিট্রন আবিষ্কৃত হওয়ার পর গবেষণাগারে, পজিট্রন বিচ্ছুরিত করতে পারে এমন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এছাড়া কস্‌মিক রশ্মির মধ্যে কয়েকটি নূতন কণিকাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কণিকার ভর, প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী। সঠিক না বলতে পারলেও বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন ইলেকট্রনের চেয়ে এর ভর ২০০।৩০০ গুণ বেশী। এই কণিকাটির তড়িৎসংস্থানের বৈদ্যুতিক সংজ্ঞা বা চিহ্ন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুই-ই হতে পারে; কিন্তু পরিমাণ ইলেকট্রনের সমান। কণিকাটিকে মেসট্রন, ব্যারীটন বা মেসন নামে অভিহিত করা হয়। মেঘপ্রকোষ্ঠ যে শুধু বিভিন্ন প্রকার কণিকারই সন্ধান দিয়েছে তা নয়—কেমন করে এক জাতীয় রশ্মি অন্য এক জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে এসে, অপর আর এক জাতীয় রশ্মিতে পরিণত হয় তা দেখবার সুযোগ এই মেঘপ্রকোষ্ঠের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

কস্‌মিক রশ্মির অন্তর্বল:—১৯৩১ সালে কার্ল অ্যাণ্ডারসন এবং মিলিকান তড়িৎ-চুম্বক সাহায্যে সোজাসুজি কস্‌মিক রশ্মির অন্তর্বল পরিমাপ করেন—ছয় বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট * —কোন কোনটি দশ বিলিয়ন।

সমুদ্রপৃষ্ঠে শতকরা দুটির অন্তর্বল ৫০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। সবচেয়ে শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মির অন্তর্বল মাত্র ২.৬ মিলিয়ন। ইউরেনিয়াম পরমাণু বিধ্বস্ত করে ১০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু একটি মাত্র কস্‌মিক রশ্মি থেকে ১০ বিলিয়ন বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট পাওয়া যাবে।

কস্‌মিক রশ্মির উৎপত্তিস্থান:—কস্‌মিক রশ্মি সমগ্র মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। রশ্মির প্রভাবের উপর সূর্যের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ আছে কিনা তা নিয়ে হফ্‌ম্যান্‌, ষ্টেইক, লিণ্ডম্‌, হেস্‌, করলিন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। ১৯২৬ সালে ক্যামেরন ও মিলিকান দক্ষিণ আমেরিকাতে—যেখান থেকে ছায়াপথ আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না—এমন স্থান থেকে

*Electron Volt—Energy acquired by an electron on account of its fall through a potential difference of one Volt.

গবেষণা করে দেখেছেন যে, সেখানেও কস্‌মিক রশ্মির প্রভাব সমভাবে বর্তমান। এথেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কস্‌মিক রশ্মি ছায়াপথের ওপার থেকে আসছে। মিলিকান আরও বলেছেন যে, যদি পারমাণবিক রূপান্তর বা 'নিউক্লিয়ার ট্রান্সফরমেশন' থেকে কস্‌মিক রশ্মির জন্ম হয়েছে বলে ধরা হয়, তবে পৃথিবী, সূর্য এবং তারার দেশের সাধারণ অবস্থা এই রূপান্তর গ্রহণ কার্যের আদৌ উপযোগী নয়। এই মহা-সৃষ্টির মধ্যে যেখানেই পদার্থসমূহ বিশেষভাবে দানা বেঁধেছে সেখানকার চাপ এবং তাপ কোনটিই এই কার্যের অনুকূল নয়। যদি দিবা-রাত্রি ধরে কস্‌মিক রশ্মির আতিশয্যের কথা চিন্তা করা যায় তবে একথা বলা যায় যে, আমাদের সৃষ্টির বহির্ভূত বহুদূরের তারা জগতের মধ্যবর্তী স্থানে (ইন্‌টারষ্টেলার স্পেস্) কস্‌মিক রশ্মির জন্ম। ১৯২৫ সালে বিরাট মহাশূন্যতার এই অদ্ভুত বলবান শিশুটির নামকরণ করেন বিজ্ঞানী মিলিকান—"কস্‌মিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি।"

আজও কস্‌মিক রশ্মির জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। আইনষ্টাইন-ইকোয়েশন অনুযায়ী—পরমাণুর পূর্ণ অথবা আংশিক রূপান্তর থেকে কস্‌মিক রশ্মি জন্মলাভ করে। অনেকের মতে বোরন, কার্বন, অক্সিজেন, অ্যালুমিনিয়ম, সিলিকন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির আকস্মিক বিলুপ্তি বা 'অ্যানিহিলেশন্' থেকেও এর জন্ম হতে পারে। কিন্তু আজও সকল বিজ্ঞানী কস্‌মিক রশ্মির জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি।

ব্যবহারিক মূল্য :—এপর্যন্ত কস্‌মিক রশ্মির যে সব গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে তার ব্যবহারিক মূল্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কস্‌মিক রশ্মির আতিশয্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সম্বন্ধে সঠিক এবং বিশেষ মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রাণী এবং উদ্ভিদ-জগতে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির যে আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়, তার জন্যে কস্‌মিক রশ্মিই দায়ী। এই আকৃতিগত পরিবর্তন বা 'মিউটেশনই' জীবজগতে ক্রমোন্নতি সম্ভব করেছে; তবে এপর্যন্ত পূর্ববর্ণিত দৈহিক পরিবর্তন কস্‌মিক রশ্মির স্বভাবগুণ অথবা সংখ্যা-গুণে সংঘটিত হয়—তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী চিকিৎসক ডাক্তার ফিগ কয়েকটি পরীক্ষাকার্য চালিয়ে ক্যানসার রোগে কস্‌মিক রশ্মি চিকিৎসা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সাফল্যের সম্ভাবনার নাকি আশা পেয়েছেন।

উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ :—আজ যুদ্ধোত্তর গবেষণায় কস্‌মিক রশ্মিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু। সেজন্যে পরমাণু-কেন্দ্রিনের গঠন ও প্রকৃতি এবং এক বস্তুর কেন্দ্রিন থেকে অপর বস্তুর কেন্দ্রিনে রূপান্তর সম্পর্কীয় গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু বলে বিবেচিত হতে পারে। যে গবেষণা উপরোক্ত বিষয়ে আলোকসম্পাত করতে পারবে তা কস্‌মিক রশ্মি গবেষণায় বিশেষ সাহায্য করবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কস্‌মিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে যে সমস্ত প্রক্রিয়া ঘটে তার পূর্ণ তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয় নি এবং কস্‌মিক রশ্মির অন্তর্বল কতখানি তাও বর্তমানে একটি বিভ্রান্তকর সমস্যা। যদিও বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিলিকান—বস্তুর আকস্মিক সংগঠন ও বিচূর্ণন থেকে কস্‌মিক রশ্মির জন্ম—এই মতবাদ দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন তবুও অনেক বিজ্ঞানী তা সমর্থন করেন না।

কিছুদিন আগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বিজ্ঞানী আভেন অন্য একটি মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—গবেষণাগারে উচ্চতর শক্তির কণিকা সৃষ্টির জন্যে সাইক্লোট্রোন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রে সময়ানুপাতিক ব্যবধানে কুণ্ডলীকৃত পথে, চুম্বকক্ষেত্র প্রভাবে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান কণিকাকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রভাবে বেগবান করা হয়। তাঁর

মতে একটি যুগ্ম নক্ষত্র কোন কোনও অবস্থা-বিশেষে বিরাট প্রাকৃতিক সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের মত কাজ করে। তাঁর এই মতবাদ দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য হলেও তিনি সোজাসুজি কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

আমাদের এশিয়াবাসীদের কাছে একটি বিশেষ সংবাদ এই যে, মেসন আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বে ইয়োকুয়া নামে একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক কর্মী মেসনের মত একই গুণসম্পন্ন একটি কণিকার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। সেই সময় তিনি পরমাণু কেন্দ্রিনের মূলতত্ত্ব বা নিউক্লিয়ার থিওরী নিষ্পাদন করতে ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে মেসনের আবিষ্কার, তাঁর ঘোষণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কস্‌মিক রশ্মি গবেষণা ও ভারতবর্ষ :— ভারতবর্ষও এই রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণায় পশ্চাতে নয়! কলকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ডাঃ দেবেন্দ্র-মোহন বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং বোম্বাইতে টাটা ইনষ্টিটিউট্ অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চের ডাঃ হোমী জে, ভাবার নেতৃত্বে আজ দশ বৎসর যাবৎ গবেষণা চলছে এবং এঁরা সকলেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তরুণ কর্মী বোম্বাইয়ের পিয়ারা সিং গিল এবং কলকাতার মহিলা বৈজ্ঞানিক কর্মী বিভা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষ কস্‌মিক রশ্মি গবেষণার পক্ষে একটি বিশেষ সুবিধাজনক স্থান—কারণ পৃথিবীর চৌম্বক মেরু এবং ভৌগলিক মেরুর মধ্যে স্থানগত পার্থক্য বর্তমান। উত্তর চৌম্বক মেরু গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। এরই ফলস্বরূপ চৌম্বক বিষুবরেখা—ভৌগলিক বিষুবরেখার সঙ্গে হেলান অবস্থায় বর্তমান। এতে দেখা যায়, যদিও ভৌগলিক বিষুবরেখা ভারতবর্ষ থেকে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত তবুও ভূ-চৌম্বিক বিষুবরেখা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে গিয়েছে। যেহেতু কস্‌মিক রশ্মির আতিশয্যের চৌম্বক গুণ ভৌগলিক বিষুবরেখা থেকে নির্ণীত হয় না—সেজন্যে ত্রিবাঙ্কুর কস্‌মিক রশ্মির আতিশয্যের চৌম্বক গুণ সম্বন্ধে গবেষণার একটি প্রশস্ত স্থান। কারণ ভূ-চৌম্বিক বিষুবরেখা ত্রিবাঙ্কুরের খুব কাছ দিয়ে গিয়েছে।

গত ২৭ ডিসেম্বর '৪৮ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আর্নেষ্ট পোলার্ড জানিয়েছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কস্‌মিক রশ্মি গবেষণার জন্যে আধুনিকতম যন্ত্র নির্মাণ প্রায় শেষ হয়েছে। অণুর গঠনপ্রণালীর যে রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয় নি—এই যন্ত্রের সাহায্যে তা উদ্ঘাটিত হবে বলে আশা করছেন। শুধু তাই নয়, আণবিক কেন্দ্র-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যাবে। নভোরশ্মির গবেষণার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—আমরা নভোরশ্মির ধর্মের দ্বারাই অণুর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াসমূহ বুঝতে পারবো।

কস্‌মিক রশ্মিকে যদি মানুষ আয়ত্ত করতে পারে তাহলে মানুষ হবে অনেক শক্তিমান কিন্তু, সেই পরিমাণে তার গব হবে খর্ব।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীহৃষীকেশ রায়

যে সকল যুগ প্রবর্তনকারী মহাপুরুষ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করায় আমরা চিরধন্য, দরিদ্রের বন্ধু, ছাত্র-সুহৃদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অভাবনীয় কর্মশক্তির আধার, চিরকুমার আচার্যদেব বাংলার ছাত্র-সমাজে শিক্ষকরূপে প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া এক অভিনব যুগের সূচনা করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের তুলনা বোধহয় একমাত্র কুরুপিতামহ ভীষ্মের সহিতই সম্ভব।

বর্তমান ভারতের নাগার্জুন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংগালীর আলস্যে বড়ই মর্মাহত হইতেন। বাংগালী সন্তানের এই আলস্যের সুযোগে বিহারী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি অন্য প্রদেশবাসীর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিজয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। যে দেশে ধনপতি রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, বটকৃষ্ণ পাল, প্রাণকৃষ্ণ লাহা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের শিক্ষিত সন্তান সামান্য বেতনের কেরানীর কার্য করিয়া জীবনযাপন করিবেন ইহা তাঁহার গভীর মর্মপীড়াদায়ক ছিল। আচার্যদেব আজীবন আমাদিগকে ব্যবসায়ী-মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইতে বহু উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। বাংগালী আত্মনির্ভরশীল জাতিরূপে গঠিত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক কামনা। আজ প্রফুল্লচন্দ্র ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত সৃষ্ট ও পরিপোষিত সুবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংগালীর সাফল্য ঘোষণা করিতেছে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ হইয়াও দেশীয় শিল্প প্রচারে তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা আশানুরূপ সফল না হওয়ায় তিনি অতি দুঃখে বলিয়াছেন—"বস্তুত যদি আমার রাসায়নিক শিষ্য ও অনুশিষ্য 'ডক্টরদের' একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহা সত্যই বিস্ময়কর হইবে, কিন্তু তবু রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে আমরা ভারতবাসীরা শিশুর মতই অসহায়!"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন বিভিন্নমুখী বহু কর্মের সমষ্টি। কর্মই তাঁহার জীবনের ব্রত। বিজ্ঞান-চর্চার ন্যায় তিনি আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। আবার ১৯২২ এর উত্তর বঙ্গ বন্যায় আর্তত্রাণের জন্য আচার্য্যদেবকে আমরা বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কর্ণধাররূপে দেখি ; পার্শ্বে আমাদের চির তরুণ নেতাজী তাঁহারই নেতৃত্বে আর্তত্রাণে অগ্রসর।

যে কপোতাক্ষী নদীতীরে কবিবর মাইকেলের জন্মভূমি সাগরদাড়ী অবস্থিত, সেই কপোতাক্ষী তীরে খুলনা জেলার রাড়ুলিগ্রামে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। আচার্যদেবের পিতা হরিশ্চন্দ্র আরবী ও পারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃতও বেশ জানিতেন। পল্লীগ্রামের অধিবাসী হইয়াও বিদ্যাচর্চায় হরিশ্চন্দ্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না এবং বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য তৎকালীন সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের গ্রাহক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রপিতামহ কালেকটারের দেওয়ান এবং পিতামহ জজ সাহেবের সেরেস্তাদাররূপে বহু অর্থ উপার্জন করেন। এরূপ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও, পিতা হরিশ্চন্দ্র বিদ্যার্জনে কখনও বিরূপ ছিলেন না বরং বিদ্যাদানে পল্লীবাসীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় রাড়ুলিতে ছেলেদের জন্য মধ্য ইংরাজী ও মেয়েদের জন্য প্রাথমিক

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারই চেষ্টায় গ্রামাঞ্চলে প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিশ্চন্দ্র খুব মেধাবীও ছিলেন। পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সেই মেধার অধিকারী হন। প্রফুল্লচন্দ্রের মাতা ভুবন-মোহিনী দেবী খুলনা জেলার ভাড়াসিমলা গ্রামের নবকৃষ্ণ বসুর কন্যা। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যোৎসাহী মাতাপিতার সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হইয়াও জ্ঞানার্জনে কখনও বিরত হন নাই। তাঁহার নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় হইতেই হরিশ্চন্দ্র পুত্রগণকে (প্রথম জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, মধ্যম প্রফুল্লচন্দ্র, তৃতীয় নলিনীকান্ত) সুশিক্ষিত করিবার মানসে স্থায়ীভাবে সস্ত্রীক কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন পিতার সাহচর্যে এই অল্প বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র ইতিহাস ও ভূগোল পাঠে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পিতার পাঠাগারের সহায়তায় তাঁহার মন স্বতঃই জ্ঞান আহরণে যত্নশীল হয়।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি তৎকালীন শীর্ষ-স্থানীয় বিদ্যালয় হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইলেন। পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তক পাঠে তিনি কোনদিনই তৃপ্ত হইতেন না। নিউটন, গ্যালিলিও, সার উইলিয়াম জোন্স, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ মনীষীগণের জীবনচরিত পাঠে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। ইতিহাস তাঁহার অতি প্রিয় বিষয় ছিল; তাই তিনি বলতেন—"I am a chemist by mistake." কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গুরুতর রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাধির আক্রমণের ফলে তাঁহাকে সমস্ত জীবন সর্ববিষয়ে কঠোর মিতাচারী হইয়া কাটাইতে হয়। কিন্তু ব্যাধিই পরোক্ষে তাঁহাকে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ বিদ্যার্জনে সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন।

রোগমুক্তির পর প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে হরিশ্চন্দ্রের সংস্কারমুক্ত মনের প্রভাব প্রফুল্লচন্দ্রের মনের উপর বিস্তার লাভ করে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির সহিত পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। অবশেষে তিনি সভ্যরূপে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। অ্যালবার্ট স্কুল হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ইহার গতি পরিবর্তিত হইয়া তাঁহাকে বিজ্ঞান সাধনায় রত করে। ফলে, জগতে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে তিনি এফ, এ, (বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট) পড়েন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রও তাঁহার অবশ্য-পাঠ্য বিষয় ছিল। বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধকরূপে প্রফুল্লচন্দ্র বাহিরের ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সী কলেজেও রসায়নের ক্লাশে যোগ দিতেন এবং বৈজ্ঞানিক কোন বন্ধুগৃহে পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া সেইখানে পরীক্ষা সমূহ পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। একবার এইরূপ পরীক্ষা করিবার সময় ভীষণ বিস্ফোরণের হাত হইতে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। এফ, এ পাশ করিয়া রসায়নের প্রতি আকর্ষণের জন্য তিনি "বি" কোর্সে বি, এ (তখনকার দিনে বি, এস-সি হয় নাই, এবং ইংরাজী অবশ্য-পাঠ্য ছিল) পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র গোপনে "গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির" জন্য প্রস্তুত হন এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইহাই প্রফুল্লচন্দ্রের উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গমনের সোপান।

পুত্র বিলাত যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলে প্রফুল্লচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী তাহাতে আপত্তি করেন নাই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যান। আচার্য জগদীশচন্দ্র, লর্ডসিংহ ও মিঃ এস, আর, দাসের সাহচর্যে লণ্ডনে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এডিনবরায় যান। সেথানে অধ্যাপক টেইট ও ক্রাম ব্রাউনের ছাত্ররূপে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বি, এস-সিতে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা ও প্রাণি-বিদ্যা তাঁহার পাঠ্য বিষয় ছিল। তিনি জার্মান ভাষাও শিক্ষা করেন; ইহাতে তাঁহার উচ্চতর রসায়নশাস্ত্র পাঠের বিশেষ সুবিধা হয়। বি, এস-সি ডিগ্রি পাওয়ার পর তিনি ডি, এস-সি উপাধি লাভের জন্য মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করেন ও ব্যবহারিক পরীক্ষা দেন; ফলে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Doctor of Science উপাধি পান। ডক্টর রায়ের পূর্বে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেহ এই বাংগালীর মধ্যে সম্মানজনক উপাধি পান নাই। জ্ঞানরাজ্যে নূতন নূতন রত্ন আহরণে বাংগালী সন্তান যে জগতের কোন দেশের যুবকের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নয় তাহা প্রমাণিত হইল। এই সময়ে তিনি বৃত্তিরূপে "হোপ প্রাইজ" পান এবং জৈব রসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যের সুবিধার জন্য আরও এক বৎসর এডিনবরায় অবস্থান করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের প্রথমে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। লণ্ডন ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে চাকুরী পাইবার আশায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সি, এইচ,, টনীর (তখন ছুটিতে) নিকট হইতে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌টের নিকট যে পরিচয় পত্র আনেন, তাহার শেষে মিঃ টনী লেখেন "ডাক্তার রায়কে নিয়োগ করিলে তিনি যে শিক্ষা বিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এডিনবরায় ছাত্রজীবনে প্রফুল্লচন্দ্র কেবল অধ্যয়নেই রত ছিলেন না, নানা প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়া নিজের বিশেষ কৃতিত্ব ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় দেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়াও তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের ঘোষিত প্রবন্ধ প্রতিযোগীতায় যোগদান করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা। সম্ভবত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ বলিয়া প্রবন্ধটি পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত না হইলেও আদর্শের কাছাকাছি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে প্রফুল্ল-চন্দ্রের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ পাইবার আশায় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পেডলারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্লচন্দ্রকেও চাকুরী লাভের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তখনকার দিনে কোন ভারতীয়কে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে হইলে কর্তৃপক্ষ নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি দানের কোন অভাব হইত না। প্রফুল্ল-চন্দ্রের ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইল না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহায্যে তিনি কিছুদিন উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের চর্চায় অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাসিক মাত্র ২৫০৲ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। অবসর কালে অন্যান্য গবেষণা কার্যের সহিত তিনি ঘৃত ও সরিষার তৈলে ভেজাল পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ের কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাহার ফলাফল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "জার্ণাল অব দি এসিয়াটিক

সোসাইটী অব বেঙ্গল” নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ঐ একই সময়ে রসায়ন-জগতে “মার্কিউরাস নাইট্রাইট” তাঁহার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং এই একমাত্র আবিষ্কারের দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন।

প্রফুল্লচন্দ্রের সরল মধুর প্রকৃতি ছাত্রগণের হৃদয় জয় করে। তিনি চিরদিন ছাত্র সমাজের বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। আবাল্য অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রণালী অনুসরণ করিয়া তিনি ছাত্রগণের মধ্যে মহান প্রাচীন আদর্শের পুনঃ প্রবর্তন করেন। চিরপ্রচলিত অধ্যাপনার রীতি পরিবর্তন করিয়া তিনি নূতনভাবে শিক্ষণীয় বিষয়কে প্রাণবন্ত করিয়া শিক্ষা দান করিতেন। অধ্যাপনা ও মৌলিক গবেষণাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, ডক্টর রসিকলাল দত্ত, ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু প্রতিভাবান ছাত্র তাঁহার নিকট রসায়নশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। বস্তুত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষার গুণে তাঁহার এত অধিক সংখ্যক ছাত্র বিজ্ঞানের উচ্চতম উপাধি “ডক্টরেট” পাইয়াছেন যে, তাঁহাকে “ডক্টর”-দের জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে প্রথম “ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠী”র সৃষ্টি করিয়া তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে, উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাংগালীর ছেলেও মৌলিক গবেষণা কার্যে জগতে উচ্চ আসন পাইবার অযোগ্য নয়। তাঁহারই প্রভাবে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন আবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়। এইভাবে আপনার জ্ঞানগরিমাদীপ্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণান্তর তিনি সায়েন্স কলেজে অজৈব রসায়নের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু সায়েন্স কলেজেই অবস্থান করেন। ভারতবন্ধু ফরাসী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি বলেন—“His laboratory is the nursery from which issue forth the young chemists of new India”

ইতিহাসের প্রতি ছাত্রজীবনে যে আকর্ষণ ছিল, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দুরাও যে প্রাচীনকালে রসায়নশাস্ত্রের চর্চা করিতেন ইহার ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র দুই খণ্ডে “হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস” প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার ইতিহাস ও সাহিত্য-জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দেন। তিনি চরক, সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থ এবং দক্ষিণ-ভারত ও তিব্বত হইতে সংগৃহীত বহু প্রাচীন কীটদষ্ট গ্রন্থ হইতে লুপ্তপ্রায় ভারতীয় নানা রসায়নিক ঐতিহ্যের সন্ধানে পঞ্চদশ বর্ষকাল সুকঠোর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকিয়া আমাদিগকে এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী করিয়া যান। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার পরবর্তী যুগের ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল ও পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ এ-বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। “হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস” একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিজ্ঞান-জগতে তাঁহার এই অতুল্য দানের জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্মানসূচক “ডি, এস-সি” উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতবন্ধু সিলভ্যাঁ লেভি, প্রথিতযশা বিজ্ঞানী বার্থেলো, বিভিন্ন বৈদেশিক সংবাদপত্র বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের “আত্মচরিত”ও একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত বাংগালীকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সাময়িক পত্রিকায় তিনি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

রাসায়নিক গবেষণার জন্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্রের খ্যাতি দেশবিদেশে ছাইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন এক নূতন যুগের সূচনা; নবীন বিজ্ঞানী আরও জ্ঞান আহরণের

উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের গবেষণার ধারা প্রত্যক্ষ করিতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্টের খরচে ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার সুধীমণ্ডলী ভারতীয় বিজ্ঞানীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। এই সময়েই ভারতবন্ধু সিলভ্যা লেভি ও ফরাসী বিজ্ঞানাচার্য বার্থলোর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণামূলক ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করেন। ইহার পারিশ্রমিক সমূহ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কেই দান করিয়া আসেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে "Conference of the Empire Universities"-এ যোগদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সহিত লণ্ডন যাত্রা করেন। এই সময়ে তাঁহার অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বন্ধে সভায় পঠিত গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সেখানকার রাসায়নিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ডক্টর ডি, এইচ, ভেলী তাঁহাকে "আর্যজাতির খ্যাতনামা প্রতিনিধি" বলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানান। স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নানা সদ্‌গুণের যথোচিত সমাদর করিতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি দেন এবং পরে সম্রাট তাঁহাকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সর্বোচ্চ সম্মান "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র এই সকল রাজকীয় উপাধির প্রতি নির্বিকার ছিলেন। আরও একবার তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বহু ছাত্র সহ উচ্চাঙ্গের রাসায়নশাস্ত্রের চর্চা করিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে বিলাত যান দেশে ফিরিয়া রসায়নশাস্ত্রের অধিকতর উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াই সসম্মানে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন; কিন্তু বাংগালী যুবককে কর্মপ্রেরণা দান করিবার জন্য তাঁহার অন্তর সকল সময়েই সমুৎসুক ছিল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্যরূপে বিভিন্ন কারখানা দেখিবার সময় স্বদেশে ঐরূপ কারখানা স্থাপনের কল্পনা স্বদেশ-প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রের মনে উদিত হয়। তখনকার দিনে আমরা বিদেশী ঔষধ ও বিদেশী রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত হইতাম। প্রফুল্লচন্দ্রের ঐ কল্পনাই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড"-এর সূচনায় রূপায়িত হইয়াছিল। অতি সামান্যভাবে ইহার ভিত্তি পত্তন হইলেও আজ ইহার মূলধন অর্ধকোটি টাকা। রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র এখন ব্যবসায়ী প্রফুল্লচন্দ্রে পরিণত হইলেন। তিনি একাধারে রাসায়নিক, ঔষধ-প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা। কিন্তু তাঁহার গবেষণা-কার্য ব্যাহত না হইয়া আরও দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সূত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারীরূপে চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, সতীশচন্দ্র সিংহ, রাজশেখর বসু প্রভৃতির নাম এবং পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে প্রথিত-যশা চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্তমান রূপ ইহাদের সর্বপ্রকার সহযোগীতা ভিন্ন সম্ভব হইত না। বেঙ্গল কেমিক্যাল কেবল বিদেশী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিল না; আজ আমরা যে কালমেঘ, গুলঞ্চ, দশমূল প্রভৃতি বহু দেশীয় ভেষজের সুরাসার ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া রোগমুক্ত হইতেছি, তাহার প্রবর্তন করেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণায় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক কারখানা "বেঙ্গল কেমি-ক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড" আজ বাংগালীর ব্যবসায়-বুদ্ধি ও গৌরবের মূর্ত-প্রতীক। ইহা ব্যতীত তিনি আর্যস্থান ইনসিওরেন্স, প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলস্, খাদি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া বাংগালীকে ব্যবসায়ী মনো-

বৃত্তিসম্পন্ন করিয়া আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়াছেন।

দধিচির ন্যায় আত্মত্যাগী প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের আর একদিক আমাদের সম্মুখে বিকশিত হয় খুলনার দুর্ভিক্ষে এবং উত্তর বঙ্গের বন্যায়। আর্ত-দেশবাসীর কাতর স্বর তাঁহাকে গবেষণাগারের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। বরিশাল ও ফরিদপুরের বহু যুবক স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত খুলনাবাসীকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল, দেশবাসীর এমনই অবিচল আস্থা ছিল তাঁহার উপর। আবার যখন পর বৎসর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর বঙ্গে আত্রাই নদীর প্রবল বন্যায় দুই হাজার বর্গ মাইল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইল, অসাধারণ কর্মশক্তির আধার প্রফুল্লচন্দ্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (বেঙ্গল কেমিক্যালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি মহাপ্রাণ যুবক-দিগকে লইয়া "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" নামে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া নিজের সংগঠন শক্তির পরিচয় দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে কেবল বাংলা বা ভারতের মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রদেশ নয়, জাপান হইতেও প্রবাসী ভারতীয়েরা সাহায্য প্রেরণ করেন। বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য এইরূপে প্রায় সাতলক্ষ টাকা, বহু বস্ত্র ও জামা, এমন কি স্বর্ণালঙ্কারও সংগৃহীত হয়। এই সময়েই আচার্যদেব আত্রাই অঞ্চলে চরকার প্রবর্তন করিয়া খাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন এবং দেশবাসীকে মহাত্মা গান্ধীর চরকার বাণী উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণীবাত্যা ও বন্যার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা অন্তহীন দুঃখদুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। আর্তের সেবায় প্রফুল্লচন্দ্র কোনদিনই উদাসীন নন। তিনি দেখিলেন, বাংলাদেশ পুনঃ পুনঃ সরকারের অবহেলায় এইরূপ সংকটের সম্মুখীন হইতেছে। সেজন্য তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনায় "সংকটত্রাণ সমিতি" নামক একটি স্থায়ী সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" বাণীর সার্থকতা দান করেন।

সাধারণত দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের গবেষণাগারে গবেষণা কার্যে গভীরভাবে মগ্ন থাকেন; কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র অন্ন সমস্যা, শিক্ষা সংস্কার, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি দেশের নানা সমস্যার প্রতি তাঁহার চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করেন। এবং দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধানে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত চরকা ও খাদি প্রচারে ব্রতী হন। পূর্বোল্লিখিত আত্রাই-এর খাদি কেন্দ্রের জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করিয়া তিনি "প্রফুল্লচন্দ্র রায় ট্রাষ্ট" গঠন করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার গান্ধীর সহিত পরিচিত হইয়া পরবর্তী জীবনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মতকেই অনুসরণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের অনুমতি লইয়াই আমাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার টাউন হলে "রাউলাট আইন"-এর প্রতিবাদে যে সভা হয়, তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"I shall leave my test tube to attend to the call of my country." অপর এক সময়ে তিনি বলেন—"Science can wait, but Swaraj cannot,"

দেশের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ সমস্তই পরহিতে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি "স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ফেলোশিপ" নামে যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহার একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা জমা আছে। রসায়ন শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য ১০,০০০ টাকা দিয়া

"নাগার্জুন প্রাইজ" এবং প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ২০,০০০ টাকায় "আশুতোষ প্রাইজ"-এর সৃষ্টি করিয়া সমস্ত অর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি যে অর্থ পারিশ্রমিক পাইতেন তাহার সমস্তই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া আসিতেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্যান্য কোম্পানীর প্রায় ৫৬,০০০ টাকার শেয়ার তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করিয়া যান এইরূপ নিঃস্বার্থ দান জগতে বিরল।

প্রফুল্লচন্দ্র মনেপ্রাণে বাংগালী ছিলেন। বাংগালীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ তাঁহার সাধনার পীঠস্থান। এখানেই প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীর ভক্তিসিক্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন অপরাহ্ন ৬টা ২৭ মিনিটে অমরধামে প্রয়াণ করেন।

"বঙ্গ জননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে, কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোন ফল পাইব না, একথা বাহুল্যমাত্র। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বঙ্গসন্তানদিগের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান বোধ জাগরণ আবশ্যক। কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে, তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায়ায় প্রকৃষ্ট পথ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই মায়াবশেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্বীয় আবিষ্কার বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যদি এই সকল তত্ত্ব কেবল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশী অমূল্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনত করিত।

ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যে কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং তাহার প্রামাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দেশের সুধী শ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন বিদেশী ডুবুরীগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশামাত্র।

যে সকল বাধার কথা বলিলাম তাহার পশ্চাতে যে কোন অভিপ্রায় আছে, তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্ব্বলতা ঘটে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মত সমস্ত শত্রু রাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না। এই কারণেই আমি যে সত্য-অন্বেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম তাহা লইয়া গৌরব করা কর্ত্তব্য মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী করাই আমার লক্ষ্য ছিল।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

বিজ্ঞানের খবর

অজানার সন্ধান

দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ড্যানিয়েল, সি পীজ্ এবং রিচার্ড, এফ, বেকার নামে দুজন বিজ্ঞানী ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে জীবকোষের মধ্যে Genes-এর ফোটোগ্রাফ তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জেনেটিক্স্ নামক জীববিজ্ঞানের নবতম শাখায় রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে জীবদেহের বংশগতি, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে গত পনেরো বছরের মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে। Genes বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে—একথা বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। পীজ্ এবং বেকার ফল মাছির গ্ল্যাণ্ড থেকে ০·১ মাইক্রন বা এক ইঞ্চির আড়াইলক্ষ ভাগের একভাগ পুরু অংশ কেটে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে ছবি তুলে দেখেছেন যে, ক্রোমোসোমের মধ্যে কয়েক জায়গায় ছোট ছোট পদার্থের সন্ধান মেলে, জীবতত্ত্বের প্রমাণ থেকে যাদের Gene বলেই স্বীকার করে নিতে হবে। সাধারণত জীবতত্ত্ববিদ্‌রা যে সেকশন কাটেন মাইক্রোটোম যন্ত্রের সাহায্যে, তা' ১ মাইক্রনের চেয়ে সূক্ষ্মতর হয় না। এর জন্যে তারা নমুনা বা স্পেসি-

মাইক্রস্কোপে দেখবার জন্যে ইঁদুরের লিভারের ২৫৪,০০০ ভাগের ১ ভাগ পাতলা সেক্‌শনের দৃশ্য
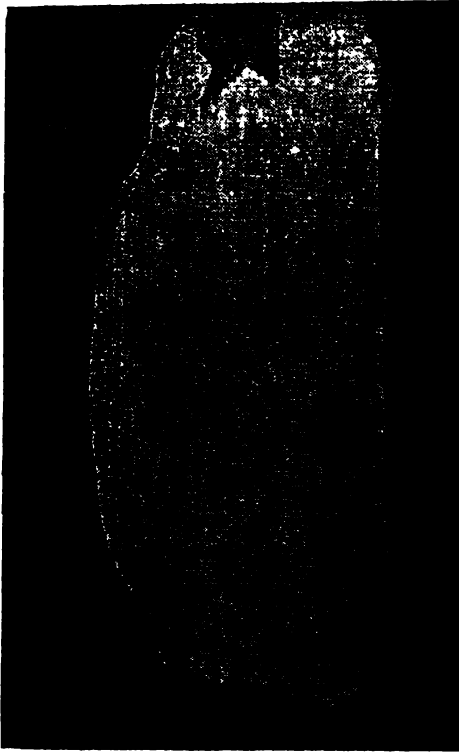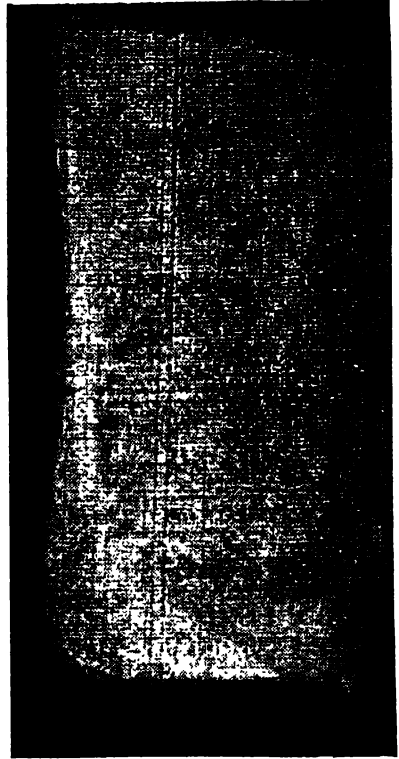
সেক্‌সন কাটবার পূর্বে ইঁদুরের লিভারের কিয়দংশ মোম এবং কলোডিয়নের মধ্যে বসানো হয়েছে।

মেনটিকে প্যারাফিন খণ্ডে আটকে যন্ত্রের সাহায্যে ধারালো ছুরি চালিয়ে সেকশন করেন। পীজ্ ও বেকার এই অংশীকরণ প্রক্রিয়াটি উন্নততর করেছেন —তাঁদের মাইক্রোটোমকে বদলে নিয়ে। ছুরির ফলাটিকে উন্নত করা হয়েছে, কাটবার সময় ফলার কোণ বদলে দেওয়া হয়েছে এবং একটা সেকশন কাটা হয়ে গেলে নমুনাটিকে এগিয়ে আনার কৌশল আরো সূক্ষ্মতর করা হয়েছে। এছাড়া তাঁরা নমুনা-উন্নত জ্ঞান লাভের জন্যে এই অংশীকরণ প্রক্রিয়া ও ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ প্রভৃত সাহায্য করবে।

মানুষের তৈরী বৃষ্টি

কিছুদিন আগে একটা প্রবল জনরব উঠেছিল যে, বৃষ্টিহীন মেঘে ড্রাই আইস (জমাট কার্বন ডাইঅকসাইড গ্যাস) ছড়িয়ে কৃত্রিম বর্ষণের সৃষ্টি করা যেতে পারে। শুকনো দেশকে তাহলে
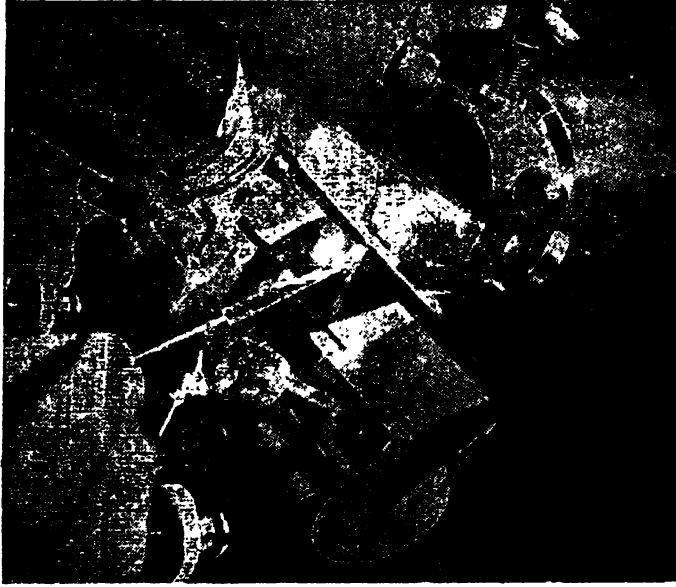
অতি পাত্‌লা সেক্‌সন কাটবার মাইক্রোটোম যন্ত্র

ধারকে শুধু প্যারাফিন ব্যবহার না করে নমুনাটিকে কলোডিওন নামক রজন জাতীয় পদার্থ ও প্যারাফিন দুয়েতেই ডুবিয়ে নিয়েছেন। এতে সেকশনগুলি এত সূক্ষ্ম হয় যে, তাদের অস্তিত্ব শক্তিশালী অনুবীক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করতে হয়। প্রায় সাতশ'টি সেকশন ওপর ওপর করে জুড়লে তবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাতার মত পুরু হবে। এই সঙ্গে পীজ ও বেকারের যন্ত্র ও কাটা অংশের কয়েকটি ছবি দেওয়া হলো।

ক্যানসার সম্বন্ধে গবেষণা ও জৈব-তন্ত্ত সম্বন্ধে

শস্যশ্যামল করে তোলবার পক্ষে কোন অসুবিধা থাকবে না। ফসলের জন্যে প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভর করবার প্রয়োজনও হবে না। মেঘ থেকে এই কৃত্রিম বর্ষণের ব্যবস্থা পরীক্ষা করবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগ ও বিমান বিভাগ সহযোগিতা করে ১৬০ বর্গমাইল বিস্তৃত এক ভূখণ্ডে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পাঁচটি বিমান, পঞ্চান্নটি গ্রাউণ্ড ওয়েদার স্টেশন এবং রেডার যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তাঁদের পরীক্ষা চলেছিল

নয়মাস ধরে। পরীক্ষার ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা এই :—

(১) ত্রিশ মাইলের ভিতর প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত না হলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য হয়ে থাকে।

(২) মেঘের মধ্যে জলকণার এমন কিছু বেশী Precipitation হয় না যাতে এই প্রক্রিয়ায় আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা হয়।

(৩) চল্লিশ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না।

এ ছাড়া আরও দেখা গেছে যে, কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক পদার্থ—যেমন, সিলভার আয়োডাইড, লেড অক্সাইড প্রভৃতির সাহায্যেও কৃত্রিম বৃষ্টিপাত করার চেষ্টা হয়েছে। সবশুদ্ধ ১১৭টি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ব্যাপকভাবে সিক্ত বায়ু-প্রবাহ হয়ে মেঘে স্বাভাবিক ভাবে Precipitation না হলে বৃষ্টিপাত হবে না। সুতরাং কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের জল্পনা-কল্পনা এবং তাথেকে রুক্ষ দেশকে শস্যশ্যামল করবার আশা পূর্ণ হবার খুব সম্ভাবনা নেই।

নিউট্রন গণনা

পরমাণুর কেন্দ্রের জটিল গঠনের মধ্যে নিউট্রন

মাইক্রোটোমে সেক্‌সন কাটবার জিনিসটা ঠিক আছে কিনা মাইক্রস্কোপের সাহায্যে দেখা হচ্ছে।

বর্ষণ সৃষ্টি করতে গেলে অনেক সময় বৃষ্টিপাত তো দূরের কথা বরং যেটুকু মেঘ আকাশে থাকে তাও নষ্ট হয়ে যায়। সবশুদ্ধ ৭৯টি পরীক্ষার মধ্যে দশটিতে মাত্র অঘটন ঘটতে দেখা গেছে। আবহাওয়াবিদ্‌দের মতে কিন্তু এইটেই স্বাভাবিক।

শুধু ড্রাই আইস নয়, জলকণা এবং অন্যান্য

কণার অস্তিত্ব বহুদিন প্রমাণিত হয়েছে। নিউট্রন বিদ্যুৎ বিহীন এবং প্রায় প্রোটনের সমান ভারি। বিদ্যুৎ বিহীন হওয়ায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তার অস্তিত্ব নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু এই বিদ্যুৎ-হীনতাই দিয়েছে তাকে পরমাণুর কেন্দ্র ভেদ করার প্রচণ্ড শক্তি—যার ফলে আণবিক বোমা নির্মাণ করতে

সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ইউরেনিয়াম ২৩৫ ধাতু বা প্লুটোনিয়াম ধাতুর কেন্দ্র নিউট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং ভগ্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত হয় চতুর্দিকে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর এই ভগ্নাংশগুলি বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন; সুতরাং এদের গণনা করা সহ গণনা থেকে নিউট্রনের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব এবং এই প্রণালীতে একটি নতুন ধরণের নিউট্রন কাউন্টার উদ্ভাবন করেছেন ডাঃ উইলিয়াম শুপ্ এবং ডাঃ কুয়ান হান স্থন নামে দু-জন পদার্থবিদ্—যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েষ্টিং হাউস গবেষণাগার থেকে।

পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন কিভাবে অবস্থান করে সে সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে হলে এই রকম একটা যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুপ এবং স্থনের যন্ত্রে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থের সঙ্গে স্বল্পমাত্রায় ইউরেনিয়াম ২৩৫ মিশ্রিত থাকে এবং একটি ফোটো-ইলেকট্রিক টিউবের গায়ে এই মিশ্রণটি লেপন করা হয়। তারপর টিউবটি একটি ধাতুর সিলিণ্ডারের মধ্যে রাখা হয়। এই সিলিণ্ডারের গায়ে দেওয়া থাকে দু ইঞ্চি পুরু প্যারাফিনের প্রলেপ, যাতে দ্রুত নিউট্রনের বেগ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্যারাফিনের আচ্ছাদন ভেদ করে যখন একটি নিউট্রন এসে প্রতিপ্রভ মিশ্রণে ধাক্কা মারে তখন ইউরেনিয়াম কেন্দ্র ভেঙে যায় এবং কেন্দ্রের ভগ্নাংশগুলি প্রতিপ্রভ পর্দার সঙ্গে সংঘর্ষে আলোকরশ্মির সৃষ্টি করে। নির্গত আলোক রশ্মির প্রভাবে ফোটো-মাল্টিপ্লায়ার টিউব থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং বহুগুণে দলে ভারি হয়ে সম্মিলিত হয় টিউবের প্রান্তে একটি গ্রাহকে—যা থেকে অন্যান্য কাউন্টারের মত তাদের ইলেকট্রনিক উপায়ে গণনা করা হয়ে থাকে।

চৈনিক পদার্থবিদ ডাঃ স্থন বলেছেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে শুধু যে নিউট্রন গণনা করা যাবে তা' নয়, রহস্যময় মেসন কণাদের সম্বন্ধেও নির্ভুল তথ্য পাওয়া যাবে।

বৃষ্টির ফোঁটা

এক ফোঁটা বৃষ্টি কি রকম দেখতে? অনেকের ধারণা অশ্রুবিন্দুর মতই তার চেহারা। কিন্তু জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণাগার থেকে ডি, সি, ব্লানচার্ড প্রমাণ করেছেন যে, এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। এজন্যে তাঁকে একটা বৃষ্টিপাত যন্ত্র তৈরী করতে হয়েছে। যন্ত্রের মধ্যে জলের ফোঁটা যখন পড়তে থাকে তখন নীচ থেকে একটি বাতাসের স্রোত তাকে বাধা দেয়—

আলট্রা-হাই-স্পীড ষ্ট্রোবোস্কোপিক ক্যামেরায় তোলা বৃষ্টির ফোঁটার ছবি।

অর্থাৎ স্থির আবহাওয়ায় বৃষ্টির অবস্থা সংক্ষেপে তৈরী করা হয়। এই অবস্থায় পতনোন্মুখ ফোঁটাগুলির ছবি তুলে নেওয়া হয়েছে আলট্রা হাই-স্পীড স্ট্রোবোস্কোপিক ফ্ল্যাশ ক্যামেরার সাহায্যে—এক সেকেণ্ডে প্রায় পঞ্চাশটি ফোটোগ্রাফ। তার একটি ছবি এখানে দেওয়া হলো। প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পঞ্চাশ বারই বৃষ্টিবিন্দুগুলি চেহারা বদলায়,—চ্যাপ্টা লজেন্সের মত থেকে

আরম্ভ করে কত যে বিচিত্র রূপ ধারণ করে তার ইয়ত্তা নেই। এগুলো হচ্ছে বড় ফোঁটা—ছোট বিন্দুগুলি অবশ্য গোলাকার ফুটবলের মত।

হিসেবী মেসিনের কাহিনী

গণিতের বিপুল ও জটিল গণনা এবং হিসেবের সাহায্যের জন্যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা তৈরী করেছেন কয়েকটি বিপুলকায় যন্ত্র—অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে তার [Electronic Numerical Integrator and Calculator] যন্ত্রটি এক সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার যোগ এবং প্রায় তিনশ বৃহদাকার গুণ করতে পারে। এর আসল ইউনিট হলো একটি সংরক্ষক ইউনিট (ACCUMULATOR)—রেডিও ভাল্‌ভের সাহায্যে সংখ্যাগুলোকে এই ইউনিটে জমা করা হয়। এনিয়াক ছাড়া বিলাতে ও আমেরিকায় আরো উন্নত যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, যার দ্বারা শুধু গণনার ফলাফল নয়, গণনার মাঝামাঝি যে
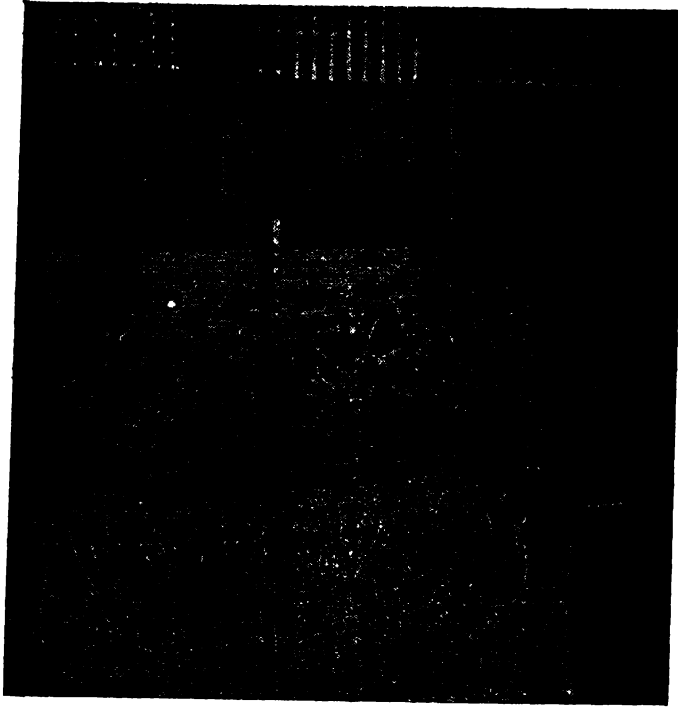
ENIAC বা ক্যালকুলেটিং মেসিনের একাংশের দৃশ্য।

কাজ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জে, পি, একার্ট ও ডাঃ জে, ডব্লিউ, মচলীর পরিকল্পনায় নির্মিত ENIAC যন্ত্র। ENIAC কোন ধাপের বার্তাও এই যন্ত্র বলে দিতে পারে। এদের নাম হচ্ছে Edvac, Univac, Edsac ও A. C, E.। এ ছাড়া আর একটি যন্ত্রও তৈরী হচ্ছে।
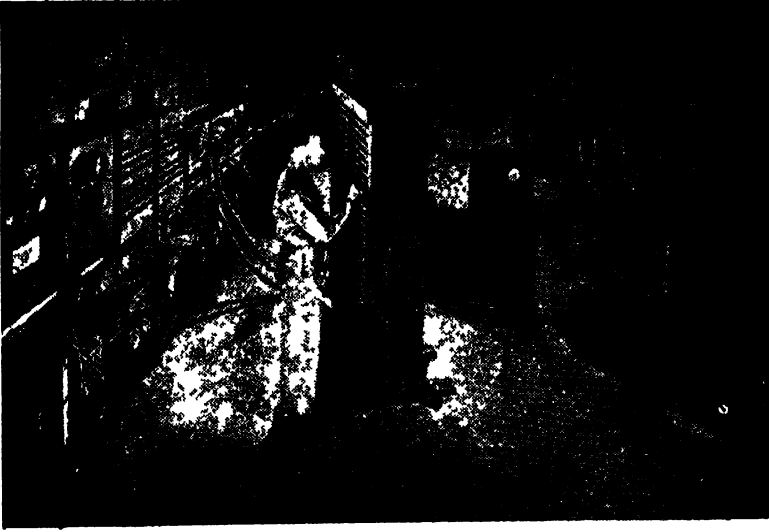
ক্যালকুলেটিং মেসিনের সাধারণ দৃশ্য।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানজগতে যে সমস্ত আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য তার প্রধান হচ্ছে এগুলি :—

(১) অরিয়োমাইসিন ও পলিমাইক্সিন নামক দুটি বীজাণুনাশকের আবিষ্কার। সালফা জাতীয় ঔষধ এবং অন্যান্য বীজাণুনাশকের চেয়ে কোন কোন রোগে এরা অনেক বেশী কাযকরী।

(২) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দু-শ' ইঞ্চি টেলিস্কোপ নির্মাণের সমাপ্তি। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি যুক্তরাষ্ট্রের মাউণ্ট পালোমার বীক্ষণাগারের জন্যে প্রায় বছর দশেক ধরে তৈরী হয়েছে। এর সাহায্যে মহাকাশের বহুদূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

(৩) খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে গ্লিসারিন তৈরী করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার। স্নেহজাতীয় পদার্থের ওপর নির্ভর করে কারখানাগুলিকে আর বসে থাকতে হবে না।

(৪) জড়জগতের রহস্যোদ্ঘাটনের পথে আর এক ধাপ এগিয়েছেন পদার্থবিদ্‌রা আমেরিকায় সিনক্রো-সাইক্লট্রন যন্ত্রে মেসন নামক বিদ্যুৎ কণাটি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই কণাটির সন্ধান এযাবৎ কাল শুধুমাত্র রহস্যময় কস্‌মিক রশ্মির মধ্যে পাওয়া যেত

(৫) নতুন ধরণের কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে। এই রাবার প্রাকৃতিক রাবারের চাইতে গুণে শ্রেষ্ঠতর।

(৬) জেট প্লেনের সাহায্যে শব্দতরঙ্গের চেয়েও দ্রুতগতি সম্ভব হয়েছে। গগন পর্যটনে এক নতুন যুগের সূচনা হলো এই থেকে।

(৭) ইউরেনাস গ্রহের পঞ্চম চন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই চাঁদটির আবর্তনকাল হচ্ছে ৩০ ঘণ্টা।

(৮) দুটি পরমাণু ধ্বংসী যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদের সাহায্যে কস্‌মিক রশ্মির মধ্যে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ কণাদের মত প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎকণা পাওয়া যাবে।

(৯) নিউট্রন কণার diffraction-ফোটোগ্রাফ থেকে জড়পদার্থের কেন্দ্রীয় রহস্যের জটিল তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

হাঁস যেমন জল থেকে দুধ পৃথক করে নেয়,
তোমরা সেরূপ বিষয়বৈচিত্র্যের মিশ্রণ
থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ আহরণ কর।

করে দেখ

ইলেকট্রিক মোটর

ইলেকট্রিক মোটর জিনিসটা আজকাল কারোর কাছে অপরিচিত নয়। তোমাদের কেউ যদি ইলেকট্রিক মোটর না-ও দেখে থাক, অন্তত ইলেকট্রিক ফ্যান দেখেছ নিশ্চয়। যার সাহায্যে ফ্যান ঘোরে সেটাও একরকমের ইলেকট্রিক মোটর। তড়িৎ প্রবাহিত তারের দু-প্রান্ত সংযোগ করলেই মোটর ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ তড়িতের সাহায্যে কেমন করে মোটর ঘোরে সেকথা পরে বুঝতে পারবে। অতি সহজ উপায়ে কেমন করে ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করে দেখতে পার সে কথাই আজকে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

এরকম ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করতে হলে খানিকটা কর্ক্, আলপিন, চুলের কাঁটা, পাতলা টিনের পাত, ঘোড়ার খুরের মত একটা চুম্বক-লোহা এবং খানিকটা ইনসুলেটেড্ সরু তামার তার যোগাড় করতে হবে।

১নং চিত্র

প্রথমে ১নং চিত্রের উপরের দিকের নমুনার মত লম্বা অথচ গোল একখণ্ড কর্ক্ লও। ধারালো ছুরি অথবা ক্ষুরের ব্লেড দিয়ে উপরের ডান দিকের ছবির মত করে কর্ক্টার দু-দিকে লম্বালম্বি দুটা খাঁজ কেটে নাও। ঠিক মধ্যস্থলে—কর্ক্টার দু-দিকে দুটা আলপিন বসাও। লম্বা একটা চুলের কাঁটা
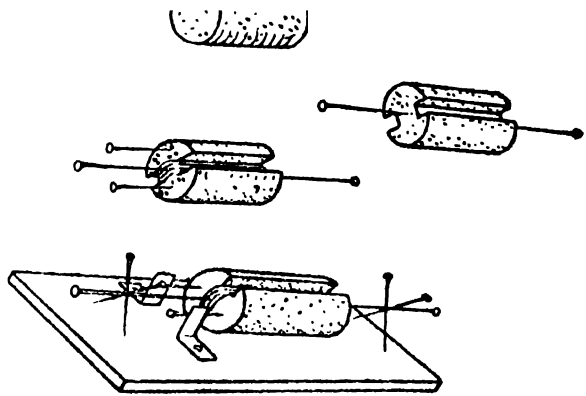
লম্বালম্বি এফোঁড়-ওফোঁড় করে বসালেও চলবে। জিনিসটা দেখাবে অনেকটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত। মাঝের ছবিটার মত করে কর্কের এক প্রান্তে দুদিকে আরও দুটা আলপিন বসাও। এবার সরু ইনস্যুলেটেড তামার তারটাকে কর্কের খাঁজের মধ্যে ছবির মত করে কয়েক ফেরতা জড়িয়ে দাও। তারের প্রান্ত ভাগ দুটি ভাল করে চেঁচে নিয়ে কর্কের প্রান্তভাগের আলপিন দুটির সঙ্গে চেপে জড়িয়ে দিতে হবে। তার জড়ানো কর্ক্‌টাই হলো মোটরের আরমেচার।

এবার পাতলা একখানা কাঠের বোর্ডের উপর আরমেচারের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী দুদিকে দুটো করে আলপিন × চিহ্নের মত টের্‌সাভাবে বসিয়ে দিতে হবে। আরমেচারটাকে আলপিনের ×-এর উপর বসিয়ে দাও। সিগারেটের টিনের মুখের পাতলা পাত থেকে ছোট দুখানা সরু ফালি কেটে নাও। ফালি দুখানা L অক্ষরের মত বাঁকিয়ে নিয়ে সরু পেরেক ঠুকে কাঠখানার উপর এমনভাবে বসাও যেন কর্কের পাশের আলপিন দুটার গায়ে আল্‌তোভাবে লেগে থাকে। ১নং চিত্রের নীচের ছবিখানা দেখেই ব্যবস্থাটা ঠিকমত বুঝে নিতে পারবে।

২নং চিত্রের উপরের ছবিটার মত করে ঘোড়ার খুরের মত একটা চুম্বক-লোহা আরমেচারের উপর দিয়ে বসিয়ে দাও। একটা টর্চের ব্যাটারীর দু-প্রান্ত থেকে দুটা তার নিয়ে টিনের পাত দুটার সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই আরমেচারটা ঘুরতে থাকবে। এথেকেই ইলেকট্রিক মোটর ঘোরাবার কৌশলটা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারবে।
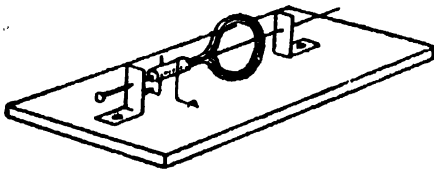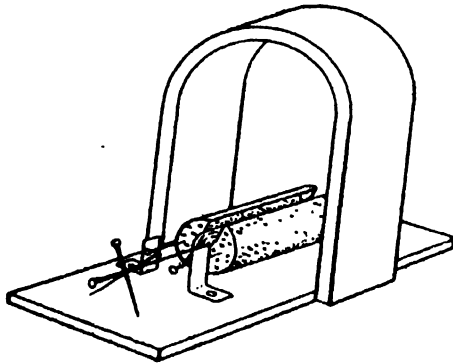
২নং চিত্র

কর্ক্‌ না দিয়ে শুধু ইন্‌সুলেটেড্‌ তামার তার জড়িয়েও আরমেচার তৈরী করতে পার। ২নং চিত্রের নীচের ছবিটা দেখ। একটা পেন্সিলের উপর তামার তারটাকে উপর্যুপরি কয়েক ফেরতা জড়িয়ে খুলে নিলেই একটা আংটির মত হবে। তারের দু-প্রান্ত বাইরে রেখে আংটির গায়ে সূতা জড়িয়ে বেশ করে বেঁধে নিলেই ভাল হয়। তারপর এর ভিতর দিয়ে লম্বা একটা চুলের কাঁটা চালিয়ে দাও। তারের প্রান্তভাগ দুটা যেদিকে আছে সেদিকে চুলের কাঁটার গায়ে সরু এক ফালি কাগজ বেশ একটু পুরু করে জড়িয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তার উপর তারের প্রান্ত দুটা পরস্পরের বিপরীত দিকে রেখে সূতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। আলপিনের খুঁটির বদলে খুব

পাতলা টিনের পাতে ফুটো করে আরমেচার ঘোরাবার ব্যবস্থা করতে পার। এর উপর চুম্বক-লোহা বসিয়ে পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় টর্চের ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ করে দিলেই আরমেচার ঘুরতে থাকবে। এ-ব্যবস্থায় আরমেচারটা কেন ঘোরে সে কথা তোমরা পরে জানতে পারবে।

এছাড়া অন্য রকমেও ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করতে পার। একটা লম্বা পেরেকের দু-দিকে ফুটো পয়সার মত দুখানা শক্ত কাগজের চাকতি বসিয়ে গাড়ীর চাকার মত কর। এই চাকতি দুটার মধ্যে পেরেকটার উপর ইনসুলেটেড সরু তামার তার দু-ফেরতা জড়িয়ে তারের মুখ দুটা বের করে রাখ। তারের মুখ দুটা টর্চের ব্যাটারীর দু-প্রান্তে সংযোগ করলেই দেখবে —পেরেকটা চুম্বকের মত অন্য লোহার টুকরাকে টেনে ধরছে। তারের মুখ ব্যাটারী থেকে সরিয়ে নিলেই পেরেকটার আর চৌম্বক শক্তি থাকবে না এটাকে বলা হয়— ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেট।
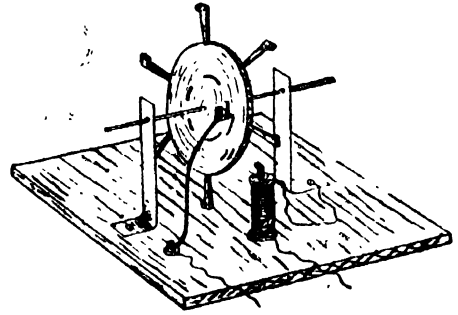
৩নং চিত্র

এবার পুরু কাগজ থেকে ৬ সেন্টিমিটার ডায়মেটারের তিনটে গোল চাকতি কেটে নাও। একখানা চাকতির চারধারে সমান দূরত্বে খাড়াভাবে ৬টা খাঁজ কাট। এই খাঁজগুলোর মধ্যে ৬টা চেপ্টা কাটা পেরেক বসিয়ে চাকতিটার দু-পিঠে অপর চাকতি দুখানা আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। পেরেকগুলোর মাথা চাকতিটা থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে। এবার দু সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে চাকতিটার মধ্য-স্থলে একটা বৃত্ত এঁকে তার লাইন ধরে সমান দূরত্বে ১২টা ছিদ্র কর। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ১৮ নম্বরের একগাছা খোলা তামার তার এফোঁড়-ওফোঁড় করে সেলাই করে দিলে চাকতির এক একদিকে ৬টা করে খোলা অংশ বেরিয়ে থাকবে। চাকতিটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চুলের কাঁটা এদিক-ওদিক ফুঁড়ে দাও। সেলাই করা তারের লম্বা মুখটা চুলের কাঁটার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। একখানা পাতলা কাঠের উপর টিনের পাতের খুঁটি এঁটে চাকতিখানাকে চাকার মত করে বসিয়ে দাও। সরু অথচ লম্বা একফালি টিনের পাত কাঠের উপর বসিয়ে উপরের দিকটা এমনভাবে বাঁকিয়ে দাও যাতে সেলাই করা তারটার গায়ে আল্‌তোভাবে চেপে থাকে। এবার পেরেকের উপর তার-জড়ানো ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটটাকে কাঠখানার উপর এমনভাবে বসাও যেন চাকতিটা ঘোরালে ধারের পেরেকগুলো পর পর ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটের পেরেকটার খুব কাছে আসে অথচ তার গায়ে ঠেকে না। ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটটার

তারের একপ্রান্ত টিনের পাতের খুঁটির সঙ্গে জুড়ে দাও। অপর প্রান্ত ব্যাটারীতে সংযোগ করতে হবে। ব্যাটারী থেকে আর একটা তার টিনের সরু বাঁকানো ফালিটার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেই চাকৃতিখানা ঘুরতে থাকবে। ৩নং ছবিটা ভাল করে দেখে নিলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

জেনে রাখ

পিঁপড়ের কথা

পিঁপড়ের সঙ্গে তোমরা সবাই বিশেষভাবে পরিচিত। একটু নজর দিয়ে দেখো—তোমাদের আশেপাশে কত রকম বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে অনবরত আনাগোনা করছে। এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোন খবর রাখ কি? একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই এদের অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। বনজঙ্গলের কথা বাদ দিলেও একমাত্র লোকালয়ে অনুসন্ধান করলেই অনেক রকমের পিঁপড়ে নজরে
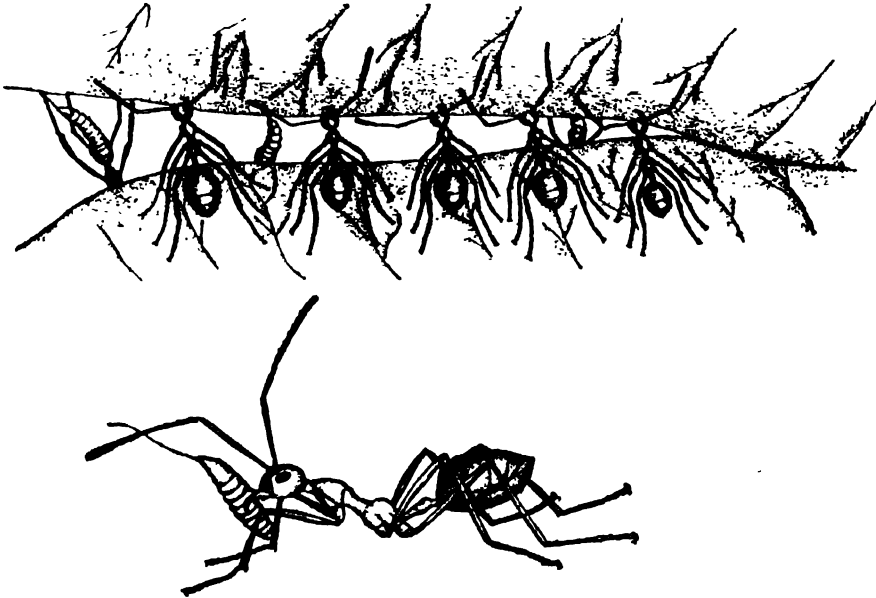
উপরে লাল-পিঁপড়েরা বাসা তৈরী করবার জন্যে দুটো পাতা জুড়ে দিচ্ছে। বাচ্চা মুখে করে লাল-পিঁপড়েরা যেভাবে সুতা বুনে দেয় নীচের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

পড়বে। তোমাদের কৌতূহল উদ্রেকের জন্যে অতি পরিচিত কয়েক জাতের পিঁপড়ের কথা আলোচনা করব।

কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে শিবপুরের বাগানে ঘোরাফেরা করবার

সময় হঠাৎ নজরে পড়লো—তিন চার ফুট উঁচুতে একটা পাতার ডগা থেকে কতকগুলো লাল-পিঁপড়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে দড়ির মত ঝুলে পড়েছে। ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে সেখান থেকে নড়বার উপায় ছিল না। সেই দড়ি বেয়ে দলে দলে পিঁপড়েরা নেমে এসে সেটাকে ক্রমাগত লম্বা করে তুলছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে পিঁপড়ের দড়িটা প্রায় ফুট দেড়েক লম্বা হয়ে নীচের আর একটা পাতার উপর এসে পড়লো। এই ঝুলানো দড়ির সেতু বেয়ে পিঁপড়েরা এবার দলে দলে নীচের ডালটার উপর এসে অনেকটা উত্তেজিত ভাবেই যেন ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো। কতক আসে আবার কতক ফিরে যায়। প্রায় পাঁচ সাত মিনিট এরকম ঘোরাফেরা করবার পর আনাগোনাকারী পিঁপড়ের অনেকেই পাতার ধারটাকে কামড়ে ধরে রইল এবং দড়ির প্রান্তভাগের অন্যান্য পিঁপড়েরা তাদের পিছনের পা ধরে প্রাণপণে টানতে সুরু করে দিল। এতগুলো পিঁপড়ের সমবেত প্রবল টানে নীচের পাতাটা উপরের পাতাটার কাছে এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির দৈর্ঘ্যও কমতে লাগলো। পাতা দুটা খুব কাছাকাছি আসতেই কতকগুলো লাল-পিঁপড়ে সারবন্দিভাবে একটা পাতার ধার কামড়ে ধরে পিছনের পা দিয়ে অপর পাতাটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। এ সময়ে বাচ্চা মুখে করে আরও কতকগুলো পিঁপড়ে এসে তাদের দিয়ে সূতা বের করে পাতা দুটাকে জুড়ে দিতে সুরু করলো। অনুসন্ধানে দেখা গেল—গাছটার উপরের ডালে একটা পিঁপড়ের বাসা রয়েছে। সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা এভাবে নতুন বাসার পত্তন করছিল। সাধারণত এরা কাছাকাছি পাতা জুড়েই বাসা তৈরী করে; কিন্তু সুবিধাজনক পাতা না পেলে সময় সময় এরূপ অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

লাল-পিঁপড়েরা মৃত কীট-পতঙ্গ উদরস্থ করেই জীবিকানির্বাহ করে। এরা দল ছেড়ে কদাচিৎ একাকী ঘুরে বেড়ায়। খাদ্য সংগ্রহ, বাসা তৈরীর কাজ দলবদ্ধভাবেই করে থাকে। কিন্তু সময় সময় এ নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা যায়। শিবপুরের বাগানে একদিন এদের এক অদ্ভুত শিকার-পদ্ধতি লক্ষ্য করেছিলাম। মোটা গাছের গুঁড়িতে উই-পোকা আকাবাঁকা লম্বা সুরঙ্গ তৈরী করেছে। লাল-পিঁপড়েরা উই-পোকা খেতে ভালবাসে; কিন্তু তাদের ধরা এদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে তারা আনাগোনা করে। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। কয়েকটা লাল-পিঁপড়ে কেমন করে যেন সন্ধান পেয়ে উইয়ের সুরঙ্গের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। একটা পিঁপড়ে তার শক্ত চোয়াল দিয়ে সুরঙ্গের সামান্য একটু অংশ ভেঙ্গে দিল। উই-পোকারাও ভয়ানক সজাগ। সুরঙ্গের মধ্যে কোথাও সামান্য একটু ছিদ্র হলেও সঙ্গে সঙ্গেই তারা মাটি দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ভগ্নস্থানের অবস্থা তদারক করতে যেই একটা উই পোকা তার মাথাটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের

করেছে অমনি লাল-পিঁপড়েটা তাকে যেন ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে বাসার দিকে চলে গেল। আবার আর একটা লাল-পিঁপড়ে এসে সেই ছিদ্রের মুখে ওৎ পেতে রইল। খানিক বাদে আর একটা উই-পোকা মুখ বাড়াতেই লাল-পিঁপড়ে তাকে কামড়ে ধরে নিয়ে গেল। শিকার মুখে করে একটা পিঁপড়ে বাসায় যায় আবার আর একটা ফিরে আসে, নতুন শিকারের সন্ধানে। প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৭।৮টা উই-পোকাকে এভাবে আক্রান্ত হতে দেখলাম।

ডিম থেকে বেরোবার কয়েকদিন পরে পিঁপড়ের বাচ্চার চেহারা।

ডিম এবং বাচ্চা পিঁপড়েদের একটা বিশেষ সম্পত্তি। সুযোগ পেলেই একদল আর একদলের ডিম, বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ নিয়েই সময়ে সময়ে এদের মধ্যে গুরুতর লড়াই বেঁধে ওঠে। লাল-পিঁপড়েদের লড়াই অতি গুরুতর ব্যাপার। দু'তিন দিন ধরে সমানে লড়াই চলতে থাকে। দুদলেরই হাজার হাজার হাজার কর্মী হতাহত হয়। বিজেতারা পরাজিতের অনেককেই বন্দী করে নিয়ে যায়। বন্দীরা তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষুদে-পিঁপড়েদের সঙ্গে অনেক সময় লাল-পিঁপড়ে ও ডেঁয়ো-পিঁপড়েদের যুদ্ধ বাঁধে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরকমের লড়াইতে ক্ষুদে-পিঁপড়েকেই জয়লাভ করতে দেখেছি।

কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে লালচে রঙের একজাতের ক্ষুদে বিষ-পিঁপড়ে দেখা যায়। এরা মাটির তলায় গর্তে বাস করে। এদের দংশন খুবই যন্ত্রণাদায়ক। বৃষ্টির জলে মাঠ-ঘাট ডুবে গেলে অদ্ভুত উপায়ে এরা আত্মরক্ষা করে। অনেকগুলো পিঁপড়ে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে বেশ বড় বড় ডেলার মত হয়ে যায়। তলার পিঁপড়েগুলো অনবরত উপরের দিকে ওঠবার চেষ্টা করে। ফলে, ডেলাগুলো জলের উপর ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক গড়িয়ে চলে। জল নেমে গেলে আবার নতুন গর্তের পত্তন করে। একবার এ-পিঁপড়েগুলোর সঙ্গে নালসো-পিঁপড়েদের এক অদ্ভুত লড়াই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সরু একটা গাছের গুঁড়ির চারদিক ঘিরে পিঁপড়েগুলো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে আস্তানা গেড়েছিল। গাছের উপর থেকে কতকগুলো নালসো-পিঁপড়ে গুঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে গিয়ে বাধা পায়। ফলে দু'চারটে অগ্রগামী নালসোর সঙ্গে বিষ-পিঁপড়েদের

সংঘর্ষ ঘটে। এ থেকেই বেঁধে যায় গুরুতর লড়াই। উপর থেকে দলে দলে নালসোরা এসে গাছের গুঁড়িটার কাছে জমায়েৎ হতে লাগলো। প্রথম আক্রমণের ধাক্কায় ক্ষুদেরা

বিভিন্ন বয়সের পিঁপড়ের বাচ্চা।

অনেকেই হটে গিয়ে গর্তে ঢুকতে লাগলো, যদিও হতাহতের সংখ্যা উভয়-পক্ষেই প্রায় সমান সমান। কিন্তু জয়-পরাজয়ের মিমাংসা হলো না। একপক্ষ গুঁড়ির উপর উন্মুক্ত জায়গায়, আর একপক্ষ গর্তের আড়ালে। একদিন একরাত্রি কেটে গেল—দু-পক্ষই দু-দিকে মোতায়েন। কেউ স্থান ত্যাগ করে না। দ্বিতীয় দিনে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। সকালের দিকে, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদে-পিঁপড়েরা গুঁড়িটাকে ঘিরে, মাটি তুলে দস্তুরমত 'ব্যারিকেড' নির্মাণ সুরু করে দিল। মাটির প্রথম 'ব্যারিকেড' তৈরী হবার পর তার উপর থেকে উই-পোকার সুরঙ্গের মত সুরঙ্গ তৈরী করতে করতে ক্ষুদেরা নালসোদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। নালসোরা সুরঙ্গের আড়ালে ক্ষুদেদের দেখতে পায় না, অথচ সেখান দিয়ে যাতায়াত করবার সময় ক্ষুদেরা সুড়ঙ্গের আড়াল থেকে হঠাৎ তাদের পায়ে কামড়ে ধরে। নালসোরা বেগতিক দেখে ধীরে ধীরে উপরের দিকে হট্‌তে লাগলো। তৃতীয় দিনের বিকেলের দিকে দেখা গেল—নালসোরা সেই জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে আর ক্ষুদেরা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাপৃত হয়েছে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতের ক্ষুদে-পিঁপড়ে, ডেঁয়ো-পিঁপড়ে, সুড়সুড়ে-পিঁপড়ে বিষ-পিঁপড়ে, কাঠ-পিঁপড়ে প্রভৃতির এরকমের আরও কত যে অদ্ভুত ব্যাপার নজরে

পড়েছে দু-একটি প্রবন্ধে তা বলে শেষ করা যায় না। তোমরা যাতে নিজের চোখে দেখতে উৎসাহিত হও সেজন্যে দু-একটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। এখন মোটামুটিভাবে পিঁপড়েদের সাধারণ জীবনের কয়েকটি কথা বলি।

বিভিন্ন জাতের যেসব রকমারি পিঁপড়ে সাধারণত আমরা দেখতে পাই তাদের বলে-কর্মী। এরা না পুরুষ, না স্ত্রী। পুরুষ ও স্ত্রীরা থাকে অন্তরালে, বাসার ভিতরে। তারা সচরাচর বাইরে বেরোয় না। কর্মীর সংখ্যা অগণিত; কিন্তু স্ত্রী আর পুরুষ থাকে গোটাকয়েক মাত্র। স্ত্রী আর পুরুষ উভয়েরই ডানা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-পিঁপড়েরা আকারে অনেক বড়। একমাত্র বংশবৃদ্ধি ছাড়া এদের আর কোন কাজই নেই। কর্মীরাই এদের যাবতীয় কাজ করে দেয়। বাসা তৈরী, খাদ্য সংগ্রহ, সন্তান পালন, শত্রুর সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি যা কিছু দরকার সবই কর্মীরা করে। বাসা পরিবর্তন করবার সময় ডিম, বাচ্চা এমন কি, স্ত্রী-পুরুষগুলোকে পর্যন্ত এরা বয়ে নিয়ে যায়। বাচ্চাদের মত স্ত্রী-পুরুষ গুলোকে মুখের কাছে খাবার নিয়ে খাইয়ে দেয়।

সাধারণত গ্রীষ্মকালেই রাণী-পিঁপড়েরা ডিম পাড়ে। এসময়ে রাণী ও পুরুষ
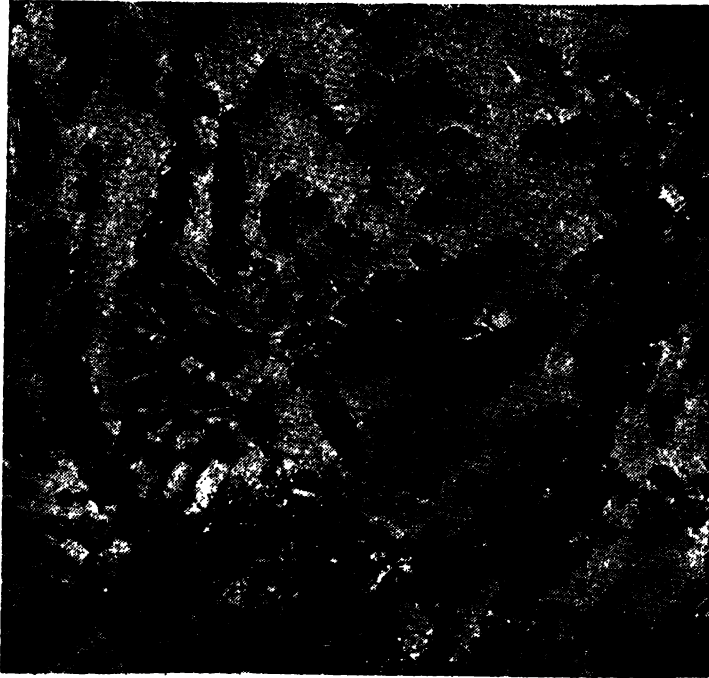
পিঁপড়ের বাসার ভিতরকার দৃশ্য। ডানা শূন্য এবং ডানাওয়ালা সব চেয়ে বড়গুলো রাণী-পিঁপড়ে। ডানাওয়ালা ছোট পিঁপড়েগুলো পুরুষ। বাকীগুলো কর্মী।

পিঁপড়েরা বাসা ছেড়ে দলে দলে আকাশে উড়তে থাকে। উড়ন্ত অবস্থায় যৌন-মিলন সংঘটিত হবার পর রাণীরা বাসায় ফিরে আসে অথবা ডিম পাড়বার জন্যে কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসময়ে রাণীদের ডানা খসে যায়। পুরুষেরা কেউ আর বাসায় ফিরতে পারেনা। নানা কারণে প্রায় সকলেই বিনষ্ট হয়ে যায়। রাণী কয়েক দফায় অনেকগুলো করে ডিম পাড়ে। অনেকগুলো ডিম একসঙ্গে ডেলা বেঁধে থাকে। এক একটা কর্মী এক একটা ডেলার সবগুলো ডিমের তদারক করে। দু-একদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চাগুলো দেখতে সরু সরু চা'লের মত। বাচ্চা বড় হয়ে গেলে তাদের আলাদা আলাদা ভাবে তদারক করতে হয়। কতকগুলো কর্মী-পিঁপড়ে বিশেষভাবে একাজের জন্যে নিযুক্ত থাকে। বিশেষ কোন খাদ্য খাওয়ানোর ফলে বাচ্চাগুলো পুরুষ, স্ত্রী অথবা কর্মী-পিঁপড়েতে পরিণত হয়। মোটের উপর, প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ ডিম থেকেই তারা কর্মী উৎপাদন করে। কারণ কর্মী ছাড়া পিঁপড়ে-সমাজ অচল। কর্মীরা সামান্য কিছু খাবার পেলেই সন্তুষ্ট—অথচ সারাদিন, এমন কি, রাত্তিরেও কাজে ব্যস্ত থাকে। কদাচিৎ এদের বিশ্রাম করতে দেখা যায়। এমনও দেখা গেছে—খাবার অভাবের সময় সামান্য যা কিছু পায় আগে বাচ্চা ও স্ত্রী-পুরুষগুলোকে খাইয়ে অবশিষ্ট কিছু থাকলে নিজেরা খায়, নয়তো উপবাসেই থাকে। শরীরের একাংশ বিচ্ছিন্ন করে দাও, দেখবে—কর্মী তার ডিম, বাচ্চা বা অন্য কোন রক্ষণাধীন জিনিস পরিত্যাগ করে কখনও আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে না।

বিবিধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পঞ্চম বার্ষিক মৃত্যু-তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৬ই জুন অপরাহ্ণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটহলে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতার সেরিফ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। সভার প্রারম্ভে ডাঃ লাহা আচার্যদেবের আলেখ্যের পাদমূলে মাল্য প্রদান করেন। সভাপতি, শ্রীচপলা কান্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ বীরেশ গুহ, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আচার্য রায়ের জীবনের বহু বিষয় উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। সকালে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমল সিংহের পৌরহিত্যে নিমতলা শ্মশানঘাটেও এরূপ অনুষ্ঠান হয়েছে।

জ্বালানি কাঠের বনপত্তন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত পতিত ও অনাবাদী জমিতে জ্বালানি কাঠের জন্যে বন পত্তনের এক প্রদেশব্যাপী পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করছেন বলে জানা গেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি গ্রামের পার্শ্বে দশ একর জমি খালি রাখা হবে, বন জন্মাবার জন্যে। যদি কোন গ্রাম বা গ্রামসমষ্টির নিকটে এরূপ খালি জমি না থাকে তবে ইউনিয়নের ভিত্তিতে এই বন পত্তন করা হবে।

যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বন রয়েছে তাদের নিজেদের বন-পত্তন পরিকল্পনা কিছু থাকলে তা সরকারকে জানাবার জন্যে এক বিজ্ঞপ্তি বের করেছেন। যদি গত সেটেলমেণ্টের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় যে, কোন বিশেষ স্থানে বন উৎখাত আরম্ভ হয়েছে তবে সরকারের বিজ্ঞপ্তির উত্তর পাওয়া মাত্র তাদের বন-পত্তন আরম্ভ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। সরকার চান যে, সকলে জঙ্গল কাটবার সময় তা যেন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যাতে বন একেবারে নিঃশেষে উৎখাত না হয়ে যায়। যদি বনের মালিক কোন প্রতিষ্ঠান সরকারের বিজ্ঞপ্তির উত্তর না দেয় কিম্বা তার নির্দেশ পালন না করে তাহলে উক্ত বন সরকারের নিজহাতে গ্রহণ করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার বন দখল করে নিলেও মালিক অবশ্য তার আয় হতে বঞ্চিত হবে না।

জানা যায় যে, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম অঞ্চলে মোট ভূমির শতকরা চৌদ্দ হতে আঠারো ভাগ বনাঞ্চল। বিশেষজ্ঞদের মতে মোট ভূমির শতকরা পঁচিশ ভাগ বন থাকা উচিত।

এ প্রসঙ্গে গত ১৯৪৮ সালের নভেম্বর সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত 'পশ্চিমবাংলার বনরাজি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কলকাতায় ভূগর্ভ-রেলপথ

কলকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কে যে ফরাসী এঞ্জিনিয়ারদের অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছে তাঁরা বর্তমানে নিম্নোক্ত চারটি লাইনে রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন বলে জানা গেছে। শেয়ালদ' হতে হ্যারিসন রোড দিয়ে হাওড়া; শ্যামবাজার থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে এস্‌প্লানেড; শ্যামবাজার হতে আপার সার্কুলার রোড ধরে শেয়ালদ'; সার্কুলার রোড ও ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মোড় হতে এস্‌প্লানেড। এই এঞ্জিনিয়াররা বর্তমানে কলকাতায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা ও সহরের যানবাহনের ব্যবস্থা

সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ করছেন। আরও দুজন নূতন এঞ্জিনিয়ার প্রথম দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। দলের নেতার নাম মসিয়ে ভ্রলিক্স।

হিমালয় অভিযানে সুইস অভিযাত্রীদল

সুইস ফাউণ্ডেশন ফর আলপাইন রিসার্চ কর্তৃক পরিচালিত সুইস অভিযাত্রীদল হিমালয় আরোহণে যাত্রাপথে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাদের অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক বর্ণনা দিয়েছেন। ম্যাডাম লোহনার নামে একজন মহিলাও এই অভিযাত্রীদলে আছেন। ১৯৪৭ সালের এরূপ একটি অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন—১৯৪৭ সালের মে মাসে তাঁরা ছয়জন মুসৌরী থেকে যাত্রা করে গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে ১৪ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থল গৌমুক পর্যন্ত পৌঁচেছিলেন। যাত্রীরা সাধারণত এর চেয়ে আর বেশীদূরে যেতে পারে না। গঙ্গোত্রীর নিকটে তাদের দল কেদারনাথ ও অন্যান্য শৃঙ্গে আরোহণ করে। এই শৃঙ্গগুলোর উচ্চতা প্রায় ২০হাজার ফিট। সেখান থেকে কালিন্দী খাল পার হয়ে তারা বদ্রীনাথ অঞ্চলে পৌঁছেন। এই মহিলা অভিযাত্রী তারপর ভারত-তিব্বত সীমান্তে বালবালা শৃঙ্গে আরোহণ করেন। আলমোড়ায় ফিরে এসে তাঁরা নন্দাদেবী পর্বতমালার নন্দঘুন্টি শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এবার মহিলাটি সিকিম, নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে কতকগুলি বিশিষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করতে চান। তাদের কার্যাবলীর আলোকচিত্র এবং স্বাভাবিক বর্ণের চিত্রাদি তোলবার জন্যে মিঃ ডিটার এবং মিঃ অ্যালফ্রেড সাটারও তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। এসব চিত্রাদি ভারতীয় জনসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি এদেশের নারীজাতি, বিশেষকরে কলেজের মেয়েরা হিমালয় অভিযানে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করলে সুখী হবেন বলে জানান।

জেনেভার ভুগোল ও চিকিৎসা পরিষদের ডাঃ ডুরান্ট এ দলের একজন সভ্য। উচ্চ পর্বত আরোহণে মানুষের আভ্যন্তরীণ কি পরিবর্তন হয়, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলীর উপর তার প্রতিক্রিয়া কি, উচ্চ ভূমির বাসিন্দা পাহাড়িয়াদের জীবন-যাপনের অবস্থার সঙ্গে সমতলভূমিতে অবস্থিত লোকদের অবস্থার তিনি তুলনামূলক পর্যালোচনা করবেন। এর ফলে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে। ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পেশাদার গাইড মিঃ এডলফ্‌ রুবিও এই দলে আছেন। তার মাতৃভূমি সুইজারল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স ও ইটালীর প্রসিদ্ধ পর্বত শৃঙ্গগুলিতে তিনি আরোহণ করেছেন।

অধ্যাপক আর, এস, রাহুল এই দলের একজন ভারতীয় সদস্য। তিনি তিব্বত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ পর্বতারোহী। তিনি বলেন—আমাদের সমগ্র সাহিত্যে হিমালয়ের ঐশ্বর্যের প্রচুর বর্ণনা আছে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয়দের নিকট হিমালয় একটি অপরিচিত বিভীষিকার স্থল। ভারতীয়দের দ্বারা এরূপ একটি অভিযাত্রীদল গঠিত হলে তা এত ব্যয়বহুল হবে না। ভারত সরকার এবং ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের হিমালয়ের ভৌগোলিক পর্য্যবেক্ষণের জন্যে বিশেষ-ভাবে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসকাল এই অভিযান চালানো যেতে পারে।

হিমালয়-শৃঙ্গে গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা

চৌদ্দ থেকে ষোল হাজার ফিট উচুতে হিমালয়-শৃঙ্গের কোন সুবিধাজনক স্থানে বিরাট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও জরীপ ইত্যাদির কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এ-বিষয়ে ভারত সরকার প্রস্তাব ও পরিকল্পনাসমূহ পরীক্ষা করে দেখবার পর গঠনকার্য সুরু হবে।

ভারতের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনেকটাই হিমালয় কর্তৃক প্রভাবান্বিত। হিমালয় বিস্তীর্ণ তুষারস্তর এবং বহু নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল। খনিজ ও বনজ সম্পদেও হিমালয় অতুলনীয় সমৃদ্ধিশালী। এসব নানা কারণেই হিমালয় অভিযানে বিবিধ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণাগারটি গঠিত হলে মিউনিক, মস্কো, মেক্সিকো, ফিলেডেলফিয়ার মত ভারতও এধরণের প্রথম শ্রেণীর একটি গবেষণাগারের অধিকারী হবে।

হিমালয়ের খনিজ সম্পদ

১৬ই জুন দেরাদুনের খবরে প্রকাশ, হিমালয়ের খনিজ সম্পদ সন্ধানের জন্যে ভারত সরকার প্রেরিত একদল বিশেষজ্ঞ চক্রতা পাহাড়ে পৌচেছেন। বিশেষজ্ঞদল প্রথমে যমুনানদীর উৎসমুখ যমুনোত্রী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৫ দিন সফর করে পরে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবেন।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় হিমালয়ের খনিজ সম্পদ সন্ধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন।

সাপের মড়ক

৫ই মে, বারাণসীর খবরে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে গুরুতরভাবে সাপের মড়ক দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় কয়েকখানি পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, বালিয়ার নিকটবর্তী ছয়টি গ্রামে কোন অজ্ঞাত রোগে হাজার হাজার সাপ স্তূপাকারে মরে পড়ে আছে। বালিয়ার পোষ্টমাষ্টারকে টেলিফোন করে জানা গেছে—এখবর সত্য। মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে যে, এপর্যন্ত প্রায় দশ হাজার সাপ এভাবে মারা গেছে। অসংখ্য কাক, চিল, শকুনি এসব সাপের মৃতদেহ উদরস্থ করছে। রাজা জনমেজয়ের সর্পমেধ যজ্ঞের পর এমন ব্যাপকভাবে সর্প-মৃত্যুর কথা আর শোনা যায়নি।

ক্যান্সার রোগ নিরাময় ব্যবস্থা

প্রথম হতে ধরা পড়লে অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য উপায়ে শতকরা ৭৫টি ক্যান্সাররোগীকেই নিরাময় করা যায় বলে চিকিৎসকগণ মনে করেন। আমেরিকায় কতিপয় চিকিৎসাবিদ্ প্রথম সূত্রপাত হতেই রক্তপরীক্ষা দ্বারা ক্যান্সার রোগের অস্তিত্ব নির্ধারণের একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। উক্ত উপায়ে শরীরের কোন্ স্থান রোগাক্রান্ত হয়েছে বা কি ধরণের ক্যান্সার রোগ হয়েছে তা জানা যায় না বটে, তবে এর সাহায্যে রোগী পূর্ব হতেই সাবধান হতে পারে এবং অন্য উপায়ে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সুস্থ লোকের রক্ত জমাট বাঁধতে যত সময় লাগে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত জমাট বাঁধতে তার চেয়ে বেশী সময় লাগে বলে গবেষণার ফলে জানা গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, শরীরের কোন স্থানে ক্যান্সার রোগ থাকলে রক্তের রাসায়নিক উপাদানের বিপর্যয় ঘটে থাকে। ক্যান্সার রোগ কেন হয় এ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা চালাচ্ছেন এই উদ্ভাবনের ফলে তাঁদের সহায়তা হতে পারে।

আলোচ্য উপায়টির উদ্ভাবন করেন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যান্সার রিসার্চের সভাপতি ডাঃ চার্লস বি, হিগিনস্ এবং ডাঃ জেরাল্ড এম মিলার ও ডাঃ এলউড ভি জনসন নামে তার দু-জন সহকর্মী। গবেষণার ফলাফল আমেরিকার সমুদয় ক্যান্সার চিকিৎসাকেন্দ্রকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ক্যান্সারের চিকিৎসা

বোম্বাই ১১ই জুন—বোম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ক্যান্সার ও তজ্জাতীয় অন্যান্য রোগের গবেষণা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি কার্য্যক্রম রচনা করছেন। ভারতে ইহাই ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট

হাসপাতাল। ক্যান্সার রোগে অস্ত্রোপচার, রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা ও রেডিয়াম চিকিৎসার এত সুবিধা দেশে আর কোথায়ও নেই।

হাসপাতাল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ ভি, আর খানোলকার বলেছেন যে, ভারতে ৪৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক একলক্ষ লোকের মধ্যে ২৫০ জনেরও বেশী ক্যান্সার রোগে মারা যায়। তবে সঠিক সংখ্যা জানা সহজ নয়। মাদ্রাজ, পাটনা ও অন্যান্য স্থানে ক্যান্সার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ক্যান্সার চিকিৎসা-শাখার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ডিপথেরিয়া দমনে সাফল্য

লণ্ডন ১২ই মে—বৃটেনে ডিপথেরিয়া ব্যারামে মৃত্যুর হার আশাতীতভাবে হ্রাস পেয়েছে। গত বৎসর এই ব্যাধিতে ১৫০ জনের মৃত্যু হয়; কিন্তু ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২,৬৪১ জন।

১৯৪১ সালে গভর্ণমেণ্ট শিশুদের রক্ষার জন্যে ব্যাপকভাবে আন্দোলন সুরু করে। তদবধি এই রোগে মৃত্যুর হার ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৪১ সালে ৫১,০০০ ডিপথেরিয়া রোগীর নাম রেজেষ্টী করা হয়। গত বছর এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮,০৩৪ জন।

স্বাস্থ্য-মন্ত্রী স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের বর্তমান বৎসরেও আন্দোলন চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। বৃটেনের তিন-চতুর্থাংশ শিশুদের এক বছর বয়স হবার পূর্বেই প্রতিষেধক ব্যবস্থাধীনে আনা হবে।

মানুষের রক্তে নতুন পদার্থ

সেণ্টলুইস্থিত ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের ডাঃ হেনরী এ শ্রোডার মানুষের রক্ত থেকে একটি নতুন পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। যাঁরা রক্তচাপাধিক্যে ভুগে থাকেন, সেই সকল ব্যক্তির রক্তেই কেবল এর সন্ধান পাওয়া গেছে। হয়ত উক্ত পদার্থই রক্তচাপাধিক্য সৃষ্টি করে থাকে।

ডাঃ শ্রোডার বলেন, প্রতি বৎসর তিন লক্ষেরও অধিক লোক রক্তচাপাধিক্যের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এযাবৎ এ রোগের যে চিকিৎসাবিধি অনুসৃত হয়ে আসছে তাতে প্রধানত রোগ উপশমই হয়, রোগ নিরাময় হয় না। যখন নবাবিষ্কৃত পদার্থটির সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানতে পারা যাবে এবং কিভাবে রক্তচাপাধিক্যের সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আরও জ্ঞানলাভ করা যাবে, তখন রোগ চিকিৎসার জন্যে অধিকতর সন্তোষজনক উপায় অবলম্বিত হবে।

এক্ষণে নতুন পদার্থটির রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ণয়ের চেষ্টা হচ্ছে।

পৃথিবীতে চাউলের অভাব

জেনেভা ৮ই জুন:—আজ আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের ৩২তম অধিবেশনে যে বার্ষিক বিবরণী পেশ করা হয়েছে, তাতে পৃথিবীতে চাউলের চাহিদা মিটানোর অসুবিধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অন্নভোজী লোকের সংখ্যা বছরে এক কোটি হিসাবে বাড়ছে। তাদের আহার যোগানোর জন্যে বছরে অন্ততঃ ২৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া দরকার।

এমনকি, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েও চাউল উৎপাদন অপর্যাপ্ত ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় ওই সময়ের মধ্যে চাউলের উৎপাদন শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি পায়, অপরপক্ষে জনসংখ্যা শতকরা দশভাগেরও বেশী বাড়ে।

ভারত ও পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালে বাস্তুহীনদের সংখ্যা এক কোটিতে দাঁড়ায়; তবে প্রাণপণ চেষ্টার ফলে বহুসংখ্যক লোকের পুনর্বসতি সম্ভব হয়েছে।

চীনে বর্তমানে বাস্তুহারাদের সংখ্যা ৫॥ কোটি বলে হিসাব করা হয়েছে।

সস্তায় পত্রিকার কাগজ উৎপাদন ব্যবস্থা

সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে ঘাস এবং

খড় হতে অল্পব্যয়ে নিউজপ্রিণ্ট প্রস্তুতের একটি ফরমূলা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফরমূলাটি উদ্ভাবন করেছেন ওহিও স্টেটের ক্লীভল্যাণ্ড সহরের কিন্‌স্‌লে কেমিক্যাল কোম্পানী। এই কোম্পানীর উদ্যোগে কিউবা, পোর্টোরিকো, উরুগোয়ে, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, তুর্কী এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাগজের কারখানাসমূহে এই ফরমূলা অনুসারে নিউজপ্রিণ্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পূর্বে যে প্রণালীতে খড় হতে কাগজ তৈরী হতো তাতে খরচ বেশীই লাগতো। কাঠের শাঁস হতে তদপেক্ষা কম খরচে কাগজ পাওয়া যেত। কিন্‌স্‌লে কোম্পানীর মতে এই নূতন ফরমূলার দ্বারা মাত্র ৭৫ ডলারে এক টন পরিমাণ নিউজপ্রিণ্ট প্রস্তুত করা সম্ভব। কাঠের শাঁস হতে কাগজ প্রস্তুত করতে প্রতি টনে এক শত ডলারের চেয়েও বেশী খরচ পড়ে যায়।

এই নতুন প্রণালী অনুসারে কাগজ প্রস্তুত করবার জন্যে একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন উক্ত কোম্পানীর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর এডওয়ার্ড আর টিমলাউস্‌কি। এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রয়োগ করলে খড়ের তন্তুগুলি আপনা হতেই পৃথক হয়ে যায় অথচ এর দৈর্ঘ্য একটুও কমে না।

এই নতুন প্রণালী অনুসারে গমের খড়, আখের ছিবড়া, ধান এবং তুলার গাছ ইত্যাদি থেকেও কাগজ উৎপন্ন হবে। এই নতুন ফরমূলাটি নিয়ে এখন আরও পরীক্ষা চালান হবে। তবে ইতিমধ্যেই যতটা অগ্রসর হয়েছে তাতে এখনই এর সাহায্যে ব্যাপকভাবে কাগজ প্রস্তুত করা চলতে পারে।

ভারতের বৈজ্ঞানিক লোকবল

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, নয়াদিল্লীতে বৈজ্ঞানিক জনবল কমিটির এক বৈঠকের ব্যবস্থা হচ্ছে। আগামী ৫—১০ বছরের মধ্যে এদেশে কত সংখ্যক বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে, গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজন, কৃষি, যানচলাচল, গবেষণা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ, সম্পদের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সে সম্বন্ধে প্রয়োজন মিটাবার জন্যে আবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক জনবল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিবরণী দাখিল করবার জন্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঐ বৈঠকে গ্রহণ করা হবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষাদানের জন্যে কি কি উন্নত ও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, কিভাবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগকে বিদেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার উন্নতি সাধন করা যায়—এসব বিষয় কমিটি বিবেচনা করে দেখবেন।

ভারতের বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ ও সঙ্কলনের বিষয়ও এই বৈঠকে বিবেচনা করে দেখা হবে। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কাজ আরম্ভ করছেন এবং তাঁরা প্রায় ত্রিশ হাজার বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার, কারিগর, ডাক্তার প্রভৃতির নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | জুলাই—১৯৪৯ | সপ্তম সংখ্যা

বিহেভিয়রিজম্ বা চেষ্টিতবাদের ইতিহাস

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য

বিহেভিয়রিজম্ বা চেষ্টিতবাদ মনোবিদ্যার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মনোবিদ্যার প্রত্যেক প্রান্তকে স্পর্শ করিয়া ইহাকে প্রকৃত বিজ্ঞানের আসনে স্থাপিত করিবার প্রয়াসে চেষ্টিতবাদ অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। চেষ্টিতবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি এই—প্রথমতঃ, 'মন' বলিয়া কোন পদার্থ অথবা 'মানস-সত্তা' নাই। এই তথাকথিত মানস-সত্তার অনুসন্ধান মনোবিদ্যার সকল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছে। কারণ এই মানস-সত্তা কোন পরীক্ষালব্ধ ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। এই পদার্থটি দর্শনপ্রভাবপুষ্ট মনোবিৎ সম্প্রদায়ের একটি অলীক কল্পনা মাত্র। ভিত্তিহীন কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, শুধু নিরর্থক মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব একটি কল্পিত মানস-সত্তার পশ্চাতে না ছুটিয়া পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ মনের চেষ্টিত, আচরণ অথবা ব্যবহারকেই মনোবিদ্যার একমাত্র উপজীব্য বিষয়বস্তুরূপে বরণ করা উচিত। পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়নজাতীয় বিদ্যার মত মনোবিদ্যার বিষয়টিকেও একই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতিদ্বারা অনুসন্ধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যার চিরাচরিত অন্তর্দর্শন বা ইন্‌ট্রোস্পেক্‌শন পদ্ধতি বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। অন্তর্দর্শনলব্ধ ফলগুলির কোন স্থায়িত্ব নাই। বিভিন্ন মনোবিদের অন্তর্দর্শনগুলি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্দর্শনের বিশ্বাসযোগ্যতা নাই এবং ইহা সর্বথা বর্জনীয়। তৎপরিবর্তে গ্রহণ করিতে হইবে 'বাচিক বিবরণ' বা "ভারব্যাল রিপোর্ট" পদ্ধতিকে। ইহাতে মানস-সত্তা অথবা অন্তর্দর্শনের কোন সংস্পর্শ নাই। তৃতীয়তঃ, মনোবিৎ এযাবৎকাল যে সকল ক্রিয়া বা বৃত্তিগুলিকে মনের মৌলিক উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাদের সবগুলিই সমানভাবে মৌলিক নয়। আবার যাঁহারা জ্ঞান, ইচ্ছা এবং অনুভূতিমূলক তিনপ্রকারের মৌলিক মানসবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে, সংবেদন অথবা সেন্‌সেশনই একমাত্র মৌলিক বৃত্তি। অনুভূতি বা ফিলিং, ইচ্ছা বা ভলিশন এবং চিন্তা বা থিংকিং প্রভৃতি তথাকথিত মৌলিক মানসবৃত্তিগুলি সংবেদনাত্মক মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন যৌগিক

ফল। যেমন জড়বস্তুর একক উপাদান পরমাণু এবং পরমাণুর বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকারগত সংমিশ্রণে বস্তুপুঞ্জের উৎপত্তি হয়, তেমন সকল মনুষ্য-চেষ্টিতের মূল উপাদান অথবা একক কোন না কোন প্রতিবর্ত্ত সংবেদন বা রিফ্লেক্স সেন্‌সেশন এবং সকল মানস-বৃত্তিই এই মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন প্রকার ও মাত্রার সংযোগের ফল। যে সংবেদন কোন উত্তেজক বা ষ্টিমুলাস উপস্থাপিত হইবামাত্র কোন সচেতন ক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন করে, তাহাকে প্রতিবর্ত্ত সংবেদন বলে। এই সংবেদনে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী আর কোন চেতন-ক্রিয়া নাই। পায়ে সুড়সুড়ি দেওয়া মাত্র পা সরাইয়া লওয়া, অথবা আগুনে হাত লাগানো মাত্র হাত সরাইয়া লওয়া প্রভৃতি,—এক কথায়, যে সকল ক্ষেত্রে কোন ইন্দ্রিয়কে কোন উদ্দীপক উত্তেজিত করা মাত্র প্রতিবেদন অথবা প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় —প্রতিবর্ত্ত সংবেদনের উদাহরণ। চেষ্টিতবাদ সকল মানব-চেষ্টিতকে, সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া দার্শনিকের মনন, কবি অথবা সৌন্দর্য-পিপাসুর কল্পনা, ভক্তের অনুভূতি বা ভাববিলাস এবং বিজ্ঞানীর অভ্রান্ত গবেষণাকে একই প্রতিবর্ত্ত সংবেদনের সংযোগ বা যৌগিক ফলরূপে ব্যাখ্যা করেন।

চেষ্টিতবাদের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ফি বলিয়াছেন যে, ইহার মূল ধারাটি তিনটি উৎস হইতে প্রবাহিত। প্রথমটি হইল জার্ম্মাণ প্রাণিমনোবিদ্‌গণের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই সম্প্রদায়টির দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক বা মেটিরিয়ালিষ্টিক্। ইঁহারা প্রাণ অথবা প্রাণীকে জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিদ্বারা অনুসন্ধান করিয়াছেন। হাঁস্ ড্রিস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যেমন প্রাণকে একটি জড়বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সত্তা অথবা পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ইঁহারা তাহা করেন নাই। প্রাণ জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র একটি রহস্যাবৃত সত্তা, এইরূপ মত পোষণ করিলে প্রাণিমনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, এই আশঙ্কা করিয়া জার্ম্মাণ বস্তু-তান্ত্রিক প্রাণিমনোবিদ্‌গণ তাঁহাদিগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন অথবা অন্যান্য প্রাকৃত বিজ্ঞানের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শে প্রাণিমনোবিদ্যাকে রূপায়িত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্বাধীন ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী চেষ্টিতবাদীকে নূতন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। চেষ্টিত-বাদের দ্বিতীয় উৎস—রাশিয়ার মৌলিক গবেষণা। রাশিয়ান মেটিরিয়ালিষ্ট, অথবা রুশ বস্তুতন্ত্রবাদী প্রসিদ্ধ শারীরবৃত্তবিদ্ প্যাভ্‌লো এবং রাশিয়ান নিওরলজিষ্ট বা নার্ভরোগবিদ্ বিছ্‌টিরো তাঁহাদের যুগান্তকারী গবেষণায় বিজ্ঞানে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছিলেন। চেষ্টিতবাদ এই গবেষণার সূত্র অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশের পথ আবিষ্কার করিল। এই দুইটি উৎসই চেষ্টিতবাদকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। চেষ্টিতবাদের আরও একটি তৃতীয় উৎস রহিয়াছে। চেষ্টিতবাদী দেখিলেন যে, অন্তর্দর্শনবাদী মনোবিদ্‌গণ কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। তদুপরি তাঁহারা এই অক্ষমতার জন্য দৈন্য অনুভব করিবার পরিবর্তে, বিষয়গত পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি অতি হীন ভাষায় কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে সহস্রমুখ হইয়াছেন। এইপ্রকার পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া চেষ্টিতবাদী কৃতসঙ্কল্প হইলেন যে, তাঁহারা মনোবিদ্যাকে অন্তর্দর্শনমুক্ত করিবেন, কারণ, তাহা না করিতে পারিলে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হইবে।

জার্ম্মান বস্তুতন্ত্রবাদী প্রাণিমনোবিদ্‌গণ দেখা-ইলেন যে, কোনপ্রকার মানসক্রিয়ার অথবা অন্তর্দর্শনের সাহায্য না পাইয়া, কেবল মাত্র বিষয়গত পদ্ধতি দ্বারা প্রাণিচেষ্টিতের পর্যবেক্ষণ এবং

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরবর্তী ধাপগুলি অতিক্রম করিতে পারিলেই সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। জার্মান প্রাণিমনোবিদ্‌গণ যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা অধিকতর দৃঢ় হইল প্যাভ্‌লো এবং বিছ্‌টিরোর সার্থক চেষ্টার দ্বারা। প্যাভ্‌লো তাঁহার প্রয়োগশালায় কুকুরকে পাত্ররূপে ব্যবহার করিয়া যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ অর্থাৎ কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স আবিষ্কার করিলেন তাহাও মন এবং অন্তর্দর্শনমুক্ত। প্যাভ্‌লো দেখাইলেন যে, নিরপেক্ষ অথবা স্বাভাবিক প্রতিবর্ত সংবেদনকে সাপেক্ষরূপে পরিণত করা যায়। তিনি প্রয়োগশালায় তাঁহার একটি অনুগত কুকুরের স্বাভাবিক অথবা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, মাংস অথবা অনুরূপ কোন খাদ্য উহার লালানিঃসরণরূপ স্বাভাবিক প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে। তাঁহার অনুসন্ধান অথবা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল এই যে, অন্য কোন উদ্দীপক যাহা স্বভাবতঃ অথবা নিরপেক্ষভাবে লালানিঃসরণরূপ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করেনা, ঐরূপ কোন অস্বাভাবিক উদ্দীপক সাহায্যে ঐ প্রতিবর্তটি উৎপন্ন করা যায় কিনা। যদি করা যায়, তবে প্রমাণিত হইবে যে, লালানিঃসরণরূপ প্রতিবর্তটি ঐ প্রকার অস্বাভাবিক উদ্দীপকের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া না হইলেও একটি সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া। প্যাভ্‌লো স্থির করিলেন যে, কুকুরটিকে খাদ্য দিবার অব্যবহিত পূর্বে একটি ঘণ্টা বাজাইবেন এবং ঐ ঘণ্টা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উপস্থিত করিবেন। প্রথম কয়েকবার দেখা গেল যে, ঘণ্টাবাদনরূপ উদ্দীপকটি, (যাহা স্বভাবতঃ, অথবা অন্য স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত সম্পর্কিত না হইয়া লালানিঃসরণরূপ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করেনা) লালানিঃসরণ উৎপন্ন করিল না। কিন্তু তাহার পরেই প্যাভ্‌লো আবিষ্কার করিলেন যে, যতবার ঘণ্টা বাজানো হইল ততবারই খাদ্য দিবার পূর্বেই কুকুরটির লালাস্রাবী গ্রন্থি লালানিঃসরণ করিতে লাগিল। অবশ্য ইহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, খাদ্যের সংস্পর্শে যে পরিমাণ লালা নিঃসৃত হয়, ঘণ্টাবাদনের ফলে সেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয় না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত হইয়া গেল যে, একটি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপক সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তে পরিণত করা যায়। প্যাভ্‌লোর এই যুগান্তকারী গবেষণা অতীব বিস্তৃত এবং জটিল। এই প্রবন্ধে মূল কথাটি বলা হইল মাত্র। প্যাভ্‌লোর এই আবিষ্কার হইতে চেষ্টিতবাদীরা তাঁহাদের লক্ষ্যবস্তুকে আরও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং সরল প্রতিবর্ত বা সিম্প্‌ল্‌ রিফ্লেক্স সূত্রকে একক ধরিয়া সূক্ষ্ম অথবা জটিল প্রাণিচেষ্টিতকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইঙ্গিত পাইলেন। বিছ্‌টিরো সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কিছু ইতরবিশেষভাবে তাঁহার অনুসঙ্গ প্রতিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

চেষ্টিতবাদীর মতানুসারে প্রাণিমনোবিদ্যা এবং মনোবিদ্যার গবেষণা পদ্ধতিতে মোটেই প্রভেদ নাই। প্রাণিমনোবিদ্যার সাফল্য দেখিয়া চেষ্টিতবাদী এতই আকৃষ্ট হইলেন যে, মনুষ্য-মনোবিদ্যাকেও ঐ আদর্শে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এই দুইটিকে এইভাবে একীভূত করিবার ফলে মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মনুষ্যের মধ্যে কোন প্রকারগত অর্থাৎ কোয়ালিটেটিভ্‌ পার্থক্য রহিল না; কিন্তু তাহারা নিছক পরিমাণগত অথবা কোয়ান্টিটেটিভ্‌, অর্থাৎ সহজ বা সরল অপেক্ষা জটিলের পার্থক্যে পর্যবসিত হইল। চেষ্টিতবাদী এই প্রকার কোন চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া প্রাণিমনোবিদ্যার বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীকে অধ্যাত্মবাদিগণের অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু বিপক্ষ সম্প্রদায়ের উগ্র বিরোধিতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই পক্ষের দোষগুলির সঙ্গে সঙ্গে গুণগুলিকেও উপেক্ষা করিলেন।

পিল্‌স্‌বুরি বলেন যে, ম্যাক্স্‌ মেয়ারই সর্বাগ্রে মানবক্রিয়ার চেষ্টিতবাদসঙ্গত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

"দি ফাণ্ডামেণ্ট্যাল লজ্ অব্ হিউম্যান বিহেভিয়র" গ্রন্থে ম্যাক্স্ মেয়ার সমগ্র মনোবিদ্যাকে ক্রিয়ার আলোচনায় সীমাবদ্ধ এবং সমস্ত ক্রিয়াকে প্রধানতঃ রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রতিবর্ত যে সর্বদা অভ্রান্তভাবে ঘটিয়া থাকে এমন কথা তিনি বলেন নাই। উপরন্তু শারীরবৃত্ত উপযোজনের (ফিজিওলজিক্যাল অ্যাড-জাষ্টমেণ্টের) প্রমাদজনিত আপতিক প্রকারণ বা ভেদ (অ্যাক্সিডেণ্ট্যাল্ ভেরিয়েশন) তিনি স্বীকার করিয়াছেন। মেয়ার মানসবৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন যে, উহারা মুভমেণ্ট বা বিচলন-ক্রিয়ারই রূপান্তর। তিনি অসাধারণ সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসক্রিয়াগুলিকে বিচলন-ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একটি শব্দ শ্রবণ করিলাম অথবা একটি রং দেখিলাম। শ্রবণ অথবা দর্শন প্রভৃতি সংবেদনগুলি যে একাধিক বিচলন ক্রিয়ার সমষ্টি ইহা প্রদর্শন করা কঠিন নয়। কিন্তু একটি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা, সৌন্দর্যানুভূতি, ঈশ্বরস্পৃহা বা চরিত্রগঠনের সাধনা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে বিচলনে রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য নয়। এক একটি মনুষ্যের মূর্তি অথবা রূপ আছে। তাহাদের সকল বৈশিষ্ট্য বা মূর্ত গুণ হইতে 'মনুষ্যত্ব' রূপ সূক্ষ্ম অথবা অমূর্ত জ্ঞানটির মধ্যে অগণিত মনুষ্যের বৈশিষ্ট্য অথবা মূর্তি নাই। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই শেষোক্ত জ্ঞানটি পাওয়া যায় তাহাকে অ্যাবষ্ট্রাক্শন অথবা বিমূর্তন বলে। আবার দুই চারিটি মনুষ্যের মৃত্যু দেখিয়া যে প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা "সকল মানুষই মরণশীল," এই প্রকার একটি সাধারণ জ্ঞানে উপনীত হই তাহাকে বলে জেনার‍্যালইজেশন বা সামান্যীকরণ। ম্যাক্স মেয়ার এই বিমূর্তন ও সামান্যীকরণরূপ দুইটি সূত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির অন্তর্ভূত নিম্নস্তরের মানস বৃত্তিগুলি যে বিচলন-ক্রিয়া সমুদয়ের সমষ্টি, উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলি ঐ ক্রিয়াসমুদয়েরই বিমূর্তন অথবা সামান্যীকরণ হইতে উৎপন্ন। মেয়ার দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ অন্তর্দর্শনলব্ধ সকল ক্রিয়াগুলিই বিচলন এবং নার্ভক্রিয়া অর্থাৎ নার্ভাস্ প্রোসেস্ হিসাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। তিনি অন্তর্দর্শনকে একেবারেই আমল দেন নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "সাইকোলজি অব্ দি আদার ওয়ান্" শীর্ষক গ্রন্থে তিনি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। তাঁহার মতানুসারে মনোবিদ্যার প্রকৃত বিষয়বস্তু 'দ্রষ্টা' স্বয়ং নহে। কিন্তু "অপর কেহ" অর্থাৎ "আদার ওয়ান্"। এই বিষয়বস্তুর পক্ষে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি একেবারেই অনুপযোগী। বিষয়গত পদ্ধতি বা অবজেক্‌টিভ্ মেথড্ই মনোবিদ্যার একমাত্র অবলম্বন।

ম্যাক্স্ মেয়ার চেষ্টিতবাদের গোড়াপত্তন করিলেও এই মতবাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক হিসাবে জে, বি, ওয়াট্‌সনের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাণিমনোবিৎ এবং শিশুমনোবিৎ হিসাবেই ওয়াট্‌সন প্রথমে মনোবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি চেষ্টিতবাদে প্রবর্তিত হন। উড্ওয়ার্থ ওয়াট্‌সনের চেষ্টিতবাদে প্রবর্তিত হওয়ার প্রতি মনোরোগবাদী অথবা সাইকোয়্যাষ্ট্রিষ্ট্সদের সংজ্ঞা অনুসারে দুইটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমটি প্রবণতাজনক কারণ বা প্রিডিস্পোজিং কজ্ এবং দ্বিতীয়টি উদ্দীপক কারণ বা এক্সসাইটিং কজ্। জার্মান এবং রুশ বস্তুতন্ত্রবাদিগণের প্রভাব ইহার প্রবণতাজনক কারণ এবং অন্তর্দর্শনবাদী বা সাব্জেক্‌টিভিস্ট-গণের প্রাণিমনোবিদ্যার প্রতি অনমনীয় প্রতিকূলতা ইহার প্রধান উদ্দীপক কারণ। প্রাণিমনোবিদ্‌গণের নিত্য নব উদ্ভাবিত বিষয়-পদ্ধতির প্রয়োগগুলি বিজ্ঞানীমহলে সমাদর লাভ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের মতগুলি সকলেই

স্বীকার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সকলেই প্রতিপাদ্য বস্তু এবং ইহার সমাধান বিষয়ে একমত হইলেন। পক্ষান্তরে অন্তর্দর্শনবাদিগণের মতগুলি অনুরূপ সমাদর লাভ করিতে পারিল না। টিস্‌নার, এঞ্জেল্‌, উড্‌ওয়ার্থ প্রমুখ অন্তর্দর্শনবাদী মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সমাধানে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া 'অপ্রতিরূপ চিন্তা' বা 'ইমেজ্‌লেস্‌ থট্‌' সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবৈষম্য প্রকট হইয়া উঠিল। এই সমস্যার কোন নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছাইতে তাঁহারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইলেন। একদল বলিলেন যে, কোনপ্রকার প্রতিরূপ ছাড়াই চিন্তা সম্ভব এবং আর একদল বলিলেন যে, প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়া চিন্তা অসম্ভব। এই শোচনীয় ব্যর্থতায় ওয়াট্‌সন অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। প্রচলিত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা অনুসারে বিষয়গত মনোবিদ্যার অনিশ্চিত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ওয়াট্‌সন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। প্রচলিত মনোবিদ্যায় 'মন' অথবা 'চৈতন্য'কে তাহার বিষয়বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে। অথচ, বিষয়গত পদ্ধতি দ্বারা মন অথবা চৈতন্যের কোনই সন্ধান পাওয়া যায়না। সুতরাং ওয়াট্‌সন মনোবিদ্যার সংজ্ঞা এবং লক্ষণের আমূল পরিবর্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অধিকন্তু অন্তর্দর্শনবাদী মনোবিদ্‌গণ বিষয়গত মনোবিদ্যারপ্রতি অবিশ্রান্ত কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ ইহাকে 'পেশী সঞ্চালন মনোবিদ্যা' অথবা "মাস্‌ল টুইস্‌ সাইকোলজি" এবং টিস্‌নার ইহাকে 'ইট-চূণ-মনোবিদ্যা' অর্থাৎ 'ব্রিক্‌ অ্যাণ্ড মর্টার সাইকোলজি" ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ এমন কথাও বলিতে লাগিলেন যে, চেষ্টিতবাদকে মনোবিদ্যার মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ ইহা শারীরবৃত্ত অথবা ফিজিওলজির নামান্তর মাত্র। আবার কেহ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন যে—মনোবিহীন মনোবিদ্যা হ্যাম্‌লেট্‌বিহীন হ্যাম্‌লেট্‌ অভিনয়ের ন্যায় হাস্যকর। এই অবজ্ঞা, বিদ্রূপ এবং কটূক্তিতে প্রাণিমনোবিদ্‌গণ, পরীক্ষারত মনোবিদ্‌গণ (টেষ্ট্‌ সাইকোলজিষ্ট্‌স্‌) অথবা প্রয়োগশালায় নিযুক্ত মনোবিদ্‌গণ (ল্যাবরেটরি সাইকোলজিষ্ট্‌স্‌) যাঁহারা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কৃতির (পারফর্ম্যান্স্‌) প্রতি অধিক আকৃষ্ট তাঁহারা পদে পদে উপহসিত এবং অপমানিত হইতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহাদের কার্যে তাঁহারা অবাধভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেন না।

ওয়াট্‌সন স্থির করিলেন, হয় তিনি মনোবিদ্যার চর্চা ছাড়িয়া দিবেন, নতুবা মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (ন্যাচারেল সায়েন্স) পরিণত করিবেন,—মনোবিদ্যায় চৈতন্যের উল্লেখমাত্র করিবেন না এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে মনোবিদ্যা হইতে নির্বাসিত করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তিনি মনোবিদ্যাকে 'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া' (ষ্টিমুলাস-রেস্‌পন্স) 'অভ্যাস গঠন' (হ্যাবিট্‌ ফর্মেশন) এবং 'অভ্যাস সম্পূরণ' (হ্যাবিট্‌ ইন্টিগ্রেশন) ইত্যাদির মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করিবেন। ওয়াট্‌সন আরও ভাবিয়া দেখিলেন, মনোবিদ্যার যে শাখাগুলি অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপর যে পরিমাণে কম নির্ভর করিয়াছে তাহারা সে পরিমাণে প্রগতিশীল ও উন্নত হইয়াছে।

অন্তর্দর্শন ও চৈতন্যের প্রতি ওয়াট্‌সনের বিরুদ্ধভাব ও তাহার কারণ প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ওয়াট্‌সনের ন্যায় একজন মনীষীর পক্ষে প্রতিপক্ষের বৈরিতাকে আরও উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করা উচিত ছিল। বস্তুতঃপক্ষে, অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হইলেও উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ না-ও থাকিতে পারে। সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোবৃত্তিটি দেখা যায় ক্যাটেল, ম্যাকডুগ্যাল, পিল্‌সবুরি এবং থর্নডাইক্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের দৃষ্টিভঙ্গীতে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, সেণ্টলুই বিশ্বসম্মেলনে, মনোবিদ্যার সংজ্ঞানির্দেশ প্রসঙ্গে ক্যাটেল বলিয়াছিলেন যে, অন্তর্দর্শনের বিশ্লেষণ বা বিষয়গত পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। উহাদের মিলন যে শুধু বাঞ্ছনীয় তাহা নয়, উহাদের মিলন ঘটিয়াই আছে। "ইন্ট্রোডাক্সন টু সোশ্যাল সাইকোলজি" গ্রন্থে ম্যাগডুগ্যাল অন্তর্দর্শনকে নির্বাসিত করেন নাই, অথচ তিনি মনোবিদ্যাকে "চেষ্টিতের সমর্থক বিজ্ঞান" (পজিটিভ সায়েন্স অব্ বিহেভিয়র) বলিয়া মত-প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "এসেন্শিয়্যাল্স্ অব্ সাইকোলজি" পুস্তকে পিল্স্বুরিও চেতনা অথবা অন্তর্দৃষ্টিকে বাদ দেন নাই, অথচ বলিয়াছেন যে, "মানবচেষ্টিতের বিজ্ঞান," ইহাই হইল মনোবিদ্যার সুন্দর লক্ষণ। থর্ণডাইক তাঁহার "দি ষ্টাডি অব্ কন্সাচ্নেস্ এ্যাণ্ড দি ষ্টাডি অব্ বিহেভিয়র" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মনোবিদ্যা পদার্থবিদ্যার অনুরূপ অন্তর্দর্শন পদ্ধতি হইতে অন্ততঃ—আংশিকভাবে স্বতন্ত্র। চেষ্টিত বলিলে চেতনা এবং ক্রিয়া, মানসিক বৃত্তিনিচয় এবং তাহাদের সম্বন্ধও বুঝা যায়।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, থর্ণডাইক মনোবিদ্যার মধ্যে চেতনা এবং মানসবৃত্তিকে স্থান দিয়াছেন এবং অন্তর্দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করেন নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ওয়াট্সন চেতনা অথবা অন্তর্দর্শনকে নির্বাসিত না করিয়াও চেষ্টিতবাদসম্মতভাবে মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিতেন। তৎসত্ত্বেও যখন তিনি চেতনা এবং অন্তর্দর্শনের উপর খড়্গহস্ত, তখন অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, ওয়াটসনের মনে অন্তর্দর্শনবিরোধী একটি "কম্প্লেক্স"অথবা "গূঢ়ৈষা" আছে। তাঁহার একটি বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, অন্তর্দর্শন পদ্ধতিটি আত্মারই নামান্তর, অথবা চৈতন্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ক্যাটেল এবং থর্ণডাইকের দৃষ্টিভঙ্গী চেষ্টিতবাদী না হইলেও চেষ্টিতবাদের সহিত বিরোধবর্জিত। সুতরাং অন্তর্দর্শনের সহিত আত্মাকে পদার্থ অথবা স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিবার কোন অপরিহার্য সম্বন্ধ নাই। ওয়াট্সন স্বয়ং অন্তর্দর্শনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিহার করিলেও ইহা তাঁহার চেষ্টিতবাদে পরোক্ষভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ তাঁহার গৃহীত 'বাচিক বিবরণ' অথবা "ভারব্যাল রিপোর্ট" প্রণালী প্রকারান্তরে অন্তর্দর্শনকে মানিয়া লইয়াছে, কেননা বাচিক বিবরণ "পাত্র" অথবা সাবজেক্টের অন্তর্দর্শনসাপেক্ষ। পাত্র একটি গ্রামোফোন অথবা কথা বলিবার যন্ত্র মাত্র নয়, কিন্তু একটি সচেতন এবং অন্তর্দর্শনকারী মনবিশিষ্ট ব্যক্তি। অতএব 'বাচিক বিবরণ' অন্তর্দর্শন ব্যতিরেকে দুর্বোধ্য।

পুনশ্চ, ওয়াটসন্ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে মনোবিদ্যার সার্বভৌম তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রবর্তক প্যাভ্লো তাঁহার গবেষণার মধ্যে কোথায়ও মনোবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। পক্ষান্তরে, তিনি মনোবিদ্যার সংস্রবমাত্র পরিহার করিয়া শারীরবৃত্তে সীমাবদ্ধ রহিয়াছেন। প্যাভ্লো উদ্ভাবিত এই সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে ওয়াটসন্ সানন্দে বরণ করিয়া লইলেন এবং সমগ্র মনোবিদ্যাকে এই আদর্শে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার মতবাদের 'পেশী সঞ্চালন মনোবিদ্যা' ইত্যাদি অপবাদগুলি খণ্ডন করিয়া বিপক্ষের গুরুতর দোষ প্রদর্শনে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

মনোবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই বিজ্ঞানটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অদ্যাপি কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠিত হয় নাই। 'সাইকোলজি' এই নামটির উদ্ভাবয়িতা গ্লোকেনিয়স। 'সাইকি' অথবা 'আত্মা' সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হিসাবেই মনোবিদ্যা প্রথমে পরিচিত হয়। 'আত্মা'

অ্যারিস্টটোলীয় যুগে অবয়বীর (অর্‌গ্যানিজম্‌) সারভূত নিয়ামক পদার্থ হইতে মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া দে-কার্তের দর্শনে চৈতন্যস্বরূপ পদার্থে পরিণত হইল। লাইবনিজ অবচেতন স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আত্মার পরিধি প্রসারিত করিলেন। হিউম আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ হইতে চেতনক্রিয়ায় রূপান্তরিত করিলেন। হিউম প্রবর্তিত ধারা প্রবাহিত হইয়া চেষ্টিতবাদে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সে যাহা হউক, আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ অভিহিত করিলে অন্তর্দর্শনই মনোবিদ্যার একমাত্র উপজীব্য প্রণালী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ওয়াটসন্‌ মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শনের অপরিহার্যতা অস্বীকার করেন। তাহার অস্বীকারের কারণগুলি এই:—(১) আত্মাই আত্মাকে দর্শন করিতে গিয়া দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং কর্ম-কর্তৃ বিরোধ ঘটায়; (২) মানসক্রিয়াগুলি অন্তর্দর্শনপ্রচেষ্টায় বিকারপ্রাপ্ত হয়; (৩) প্রত্যেক মানসক্রিয়া মাত্র একক্ষণস্থায়ী এবং দর্শনকালে উহা বিলীন হইয়া যায়; (৪) অতএব যে মানসক্রিয়াটি দৃষ্ট হয়, তাহা ঠিক দৃষ্ট হয়না, কিন্তু স্মৃত হয়—কাজে কাজেই জীবন্ত মানসবৃত্তিটির স্থানে আমরা ইহার মৃতাবশেষ পাই মাত্র; (৫) বহু মানসক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া যাওয়ায় অন্তর্দর্শনযোগ্য হয়না; (৬) অবচেতন ক্রিয়াগুলি অন্তর্দর্শনলভ্য নয়; (৭) অন্তর্দর্শনকে বিজ্ঞানের আদর্শানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, এবং (৮) অন্তর্দর্শনের ফলগুলি সর্বজনস্বীকৃত নয়, উপরন্তু দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

এই প্রবন্ধে চেষ্টিতবাদের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই মতবাদটি আংশিকভাবে বিন্যস্ত হইল মাত্র। চেষ্টিতবাদ কিরূপে সমস্ত মানসবৃত্তিগুলিকে ইহার মতানুসারে আলোচনা ও প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নয়; এই কারণে এবং স্থানসঙ্কোচের জন্য, তাহা প্রদর্শিত হইল না।

"রমফোর্ডের ঐকান্তিক যত্নে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও প্রতিভার যশোভাগী ডেভী। তিনি দরিদ্রের সন্তান, বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে। এক ডাক্তারখানায় তিনি এপ্রেন্টিস্‌ নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময়কার ডাক্তারখানা, আর এখনকার ঔষধালয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসময়ে তিনি একটিও রাসায়নিক পরীক্ষা (Experiment) দেন নাই, এমন কি, রাসায়নিক যন্ত্র সকলের আকৃতি কিরূপ তাহাও জানিতেন না। তাঁহার যন্ত্রের মধ্যে ছিল শিশি, মদের গেলাস, চায়ের পেয়ালা, তামাকের নল এবং কখন কখন ধাতু গলাইবার মাটির মুচি। আমাদের দেশে যুবকগণ অনেক সময় কেবল গভর্ণমেন্টের উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত হন, আর বলেন—রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে হইতে বড় বড় বিজ্ঞানাগার চাই, অজস্র টাকা চাই। আমি ইহার উত্তরে ক্রমান্বয়ে ডেভী, ফ্যারাডে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের চরিত্র বর্ণনা করিব। তাহা হইতে দেখ—যে ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়—"Where there is a will, there is a way."

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

আদিবাসী

পূর্বের এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মধ্যভারত এলাকায় কতকগুলি শাখাকে এই অঞ্চলে দেখা যায়।

মধ্যভারত এলাকায় ও সমগ্র পশ্চিম ভারতে ভীলগোষ্ঠী প্রধান আদিবাসী উপজাতি। আজমীর মাড়বার, পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বোম্বাই, বরোদা ও হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ২৫ হাজার ভীলগোষ্ঠীয় উপজাতি ছড়াইয়া আছে। মধ্যভারতে ভীলিভাষা ব্যবহার করে প্রায় ৬ লক্ষ লোক, রাজপুতানা প্রায় ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার। রাজপুতানায় দুদ্দারপুর, কোটা, কুশলগড় ও মেবার ভীলদিগের প্রধান আড্ডা। বরোদায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫৪ হাজার। মধ্যভারত দেশীয় রাজ্যের এলাকার দক্ষিণ অংশে প্রায় ২ লক্ষ ভীলালা উপজাতির বাস। মধ্যপ্রদেশে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। বরোদা রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার তদবী ও বাসওয়া বাস করে। ইহারা ভীলগোষ্ঠীর শাখা। সিরোহী, মেবার ও মাড়বারের প্রায় ৩০ হাজার গ্রাসিয়া বা গিরসিয়াকে ভীলগোষ্ঠীর শাখা বলা হয়। ভীলগোষ্ঠীর ভাষার অন্যান্য শাখার মধ্যে ওয়াগদী বা বাগদী প্রায় আড়াই লক্ষ ও ভিলোদী প্রায় ৬০ হাজার লোক ব্যবহার করে। মীনা ও মিওদিগকে ভীলগোষ্ঠীয় বলা হয়। মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য, আজমীঢ়, মাড়বার ও রাজপুতানায় মীনাদিগকে দেখা যায়। রাজপুতানায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ, গোয়ালিয়রে প্রায় ৬৭ হাজার। রাজপুতানার জয়পুর, মেবার, কোটা, টঙ্ক ও আলোয়ারে ইহাদিগকে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। মিওদিগের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার। আলোয়ার ও ভরতপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। ইহারা ছাড়া ববেলা, ধাঙ্কা মাঙ্কর, সবটী, পথিয়া, বার্থয়া প্রভৃতি উপজাতিকে ভীলগোষ্ঠীর মধ্যে গণনা করা হয়। সকল শাখা লইয়া ভীলগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ধরা হয়। ধাঙ্কাদিগকে বরোদা ও রাজপুতনায় দেখা যায়। সবটী, তদভী প্রভৃতিকে প্রধানতঃ বরোদা রাজ্যের এলাকায় দেখা যায়। রাজপুতানা ও আজমীঢ়-মাড়বারের মেড় ও মেরাটদিগকে ভীল গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা চলে কি না সন্দেহের বিষয়। ইহারা সম্ভবতঃ মেড় জাতির শাখা এবং ঐতিহাসিক যুগে, খুব সম্ভব ৩য় হইতে ৫ম খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। রাজপুতানা ও আজমীঢ়-মাড়বারের অধিকাংশ মেড় মুসলমান। রাজপুতানার বাহিরে পাঞ্জাবের গুরুগাঁও জেলা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ মিওদিগের একটি প্রধান অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম মেওয়াট। মেওয়াটের প্রাচীন যদুবংশীয় রাজপুত রাজবংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এবং খানজাদা নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে মিওগণ এই অঞ্চলের লোক সংখ্যার ⅙ অংশ। আরাবল্লী পর্বতমালার মীনা উপজাতির সহিত ইহারা সম্পর্কিত। মিওগণ মুসলমান।

ভীলগোষ্ঠীর এই সকল উপজাতি ব্যতীত আর যে সকল উপজাতিকে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় তাহারা ধর্মে ও ভাষায় হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। চোধ্র, ধোদিয়া দুব্রা, গামিত, কোকনা, বলন্দ প্রভৃতি কোন প্রধান

আদিবাসী উপজাতির সহিত সম্পর্কিত কিনা তাহা বলা কঠিন। সাঁওতাল ও ছোটনাগপুর এলাকার তুরীদিগকে অল্প সংখ্যায় পশ্চিমভারতে দেখা যায়। মুণ্ডাগোষ্ঠীর নাইয়া সম্ভবতঃ নাই নামে মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও রাজপুতানা অঞ্চলে দেখা যায়। মধ্যভারত ও আজমীঢ়-মাড়বারের লোধা সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশ এলাকার লোধির সহিত সম্পর্কিত। পশ্চিমঃ ভারতের বৃহৎ কোন গোষ্ঠীকে কেহ কেহ মুণ্ডা-গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন। আজমীঢ়-মাড়বার, রাজপুতানা, বোম্বাই, বরোদা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে কোলি গোষ্ঠীর প্রায় ৩৩ লক্ষ লোক বাস করে। Hamilton ও Todd-এর মতে কোন আদিবাসী উপজাতি, কিন্তু Cunningham ও Elliot প্রভৃতির মতে কোলি ও মেড় এক গোষ্ঠীয় এবং শ্বেত হুনদিগের দলে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উত্তর গুজরাট ও কাথিবাড় ইহাদের প্রধান বাসভূমি।

Risley ভীলদিগকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ভীল গোষ্ঠীকে মধ্য ও পূর্বভারত ও দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলির একগোষ্ঠীয় অর্থাৎ নিষাদ গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন। পূর্বের এক প্রবন্ধে একথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ভীল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অরণ্য এবং পর্বতনিবাসী উপজাতিকে পুনঃ পুনঃ একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। সাতপুরা পর্বতমালার ভীলদিগের কোন কোন অংশ ব্যতীত ভীলগণ সর্বত্র হিন্দুদিগের ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে—দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব এবং পশ্চিমভারতের আদিবাসী উপজাতি-গুলি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে এক গোষ্ঠীয়। এখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিগুলির এই নিষাদগোষ্ঠীর সহিত কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা তাহা দেখা যাইতে পারে।

আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আসাম হইতে উত্তর ও পূর্বদিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, অধিবাসীদিগের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ ততই পরিস্ফুট দেখা যাইবে। আসাম সীমান্তের এই লম্বা মুণ্ড, মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিগুলিকে উত্তর পশ্চি-মের লাডাক ও পূর্ব হিমালয়ের ভূটান, সিকিম, দার্জিলিং ও নেপালের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপ-জাতিগুলি হইতে একটি পৃথক গোষ্ঠীর বলিয়া মনে করা হয়। ডাঃ গুহের ব্যাখ্যা এই যে—লাডাকী, লালুলী, লিম্বু, লেপচা, রঙ্গপা, ভোট ও নেপালের উপজাতিগুলির মধ্যে অন্য একটি টাইপের সঙ্গে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বা তিব্বতী টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির মধ্যে যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায় উহা দক্ষিণ পশ্চিম চীন হইতে আগত ইন্দোচাইনীজ গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই গোষ্ঠী ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়ান আইল্যা-গুস্ বা দ্বীপময় ভারতে প্রস্থান করে। এই জাতির কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া আসামে রহিয়া যায়। মিরি, বোদো, নাগা এই গোষ্ঠীভুক্ত। ডাঃ গুহের ব্যাখ্যাত অন্য একটি যে টাইপের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—প্রাচ্য বা ওরিয়্যাণ্টাল টাইপ। ইহার কথা পরে বলা হইবে। লুসাই পর্বতমালার পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীর পৃথক একটি শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাখার লোক গোলমুণ্ড, অপেক্ষাকৃত ময়লা রঙের এবং আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলি অপেক্ষা মালয়ের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের সম্পর্ক অধিক বলিয়া মনে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালার মগ এই শাখাভুক্ত। সে যাহাহউক, শানগোষ্ঠীয় উপজাতিদিগের আসাম অধিকার ও বর্মী ও আরাকানীদের যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক আমলের ব্যাপার। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে,

মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিসমূহ অতি প্রাচীন কাল হইতে আসামের সীমান্ত অঞ্চলে বাস করিতেছে। ইহারা ছাড়া আসামের কোন আদিবাসী উপজাতি ছিল কিনা এই প্রশ্ন উঠিবে।

Dr. Haddon আসামের অধিবাসীদিগের মধ্যে ১। লম্বামুণ্ড, চেপ্টা নাক, ২। লম্বামুণ্ড মধ্যমাকৃতি নাক ৩। মধ্যমাকৃতি মুণ্ড, চেপ্টা নাক ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক দেখিতে পান। প্রথম গোষ্ঠীকে তিনি নিষাদগোষ্ঠীর (Pre-Dravidian বা Proto-Australoid) সহিত সম্পর্কিত মনে করেন। খাশী, কুকী, মণিপুরী ও কাছারী তাঁহার মতে এই গোষ্ঠীভুক্ত। দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে তিনি নেসিয়ট নাম দিয়াছেন। নেসিয়ট নাম দিবার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার মতে এই গোষ্ঠীর লোক দ্বীপাঞ্চল হইতে আসিয়াছে বা দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক আছে। দ্বীপাঞ্চল বলিতে এখানে দ্বীপময় ভারত বুঝায়। তাঁহার মতে নাগা ও অন্যান্য উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে যে, নাগাদিগের মধ্যে তাঁহার মতে দুই প্রকারের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তৃতীয় গোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত লোক তিনি খাশীদিগের মধ্যে পাইয়াছেন এবং তাঁহার মতে বর্মী, পালাউং, দক্ষিণ চিন ও কাচিনদিগের মধ্যে ও ছোটনাগপুর এলাকায় এই টাইপ প্রবল। চতুর্থ গোষ্ঠীর লক্ষণ তিনি লেপ্‌চা সুর্মী, বঙ্গদেশের কতকগুলি জাতি (নাম দেওয়া নাই) ও বিহারের দোসাদ, কুর্মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে পাইয়াছেন। পঞ্চম গোষ্ঠীর লক্ষণ তিনি ব্রহ্ম হইতে আগত উপজাতির মধ্যে পাইয়াছেন। এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে Pareoean, অর্থাৎ দক্ষিণ মোঙ্গলগোষ্ঠী। পীতকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে ইহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। Haddon-এর অভিমতের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতেছি, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় আদিবাসীদিগের দুইটি দৈহিক লক্ষণ—লম্বা মুণ্ড ও চেপ্টা নাক তিনি খাশী, কুকী, মণিপুরী ও কাছারী উপজাতিগুলির মধ্যে পাইতেছেন। নাগাদিগের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ান টাইপের লক্ষণ পাইতেছেন। মধ্যমাকৃতি মুণ্ড ও চেপ্টা নাক তিনি খাশীদিগের ও ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসীদিগের মধ্যে পাইতেছেন। ইহার অর্থ—খাশীদিগের (এবং নাগাদিগের মধ্যে) ও ছোটনাগপুরে এলাকার আদিবাসীদিগের মধ্যে তিনি দুইপ্রকার টাইপ দেখিতে পান। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে, মাত্র দুইটি লক্ষণ—মস্তক ও নাসিকার আকৃতি হইতে Haddon খাশী, কুকী, মণিপুরী, কাছারী, ব্রহ্মের কাচিন, চিন, পালাউং প্রভৃতির সহিত ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসীরা সম্পর্কিত—এইরূপ মনে করেন। Dr. Hutton-এর মত এই যে, আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যের পার্বত্য অঞ্চলে মেলানেশিয়ান টাইপ বিশেষ প্রবল দেখা যায়। মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, উহা মিশ্রিত নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্ট্র্যালয়েড সংমিশ্রণের ফল। ("The Melanesian represents a stabilised type derived from mixed Negrito and Proto-Australoid elements".) এখানে নেগ্রিটো কথাটির আগে mixed বিশেষণ ব্যবহার করিয়া Hutton তাহার বক্তব্যকে অস্পষ্ট রাখিতে চাহিয়াছেন কিনা —বুঝা যায় না। হয় আমাদের মানিয়া লইতে হইবে যে, মেলানেশিয়ান টাইপ নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্ট্র্যালয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন, অথবা তাঁহার বক্তব্য এই হইতে পারে যে, আসাম সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে যে মেলানেশিয়ান টাইপ (তাঁহার মতে) দেখা যায় তাহা নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্ট্র্যালয়েড সংমিশ্রণের ফল। মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, মেলানেশিয়া নামে পরিচিত নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের কৃষ্ণকায়, পশমের মত চুল, চেপ্টা নাক পাপুয়ান গোষ্ঠীর সহিত অপেক্ষাকৃত ফরসা রং, লম্বামুণ্ড, মধ্যমাকৃতির নাসিকা ও সরল বা ঢেউ-খেলান চুলের ইন্দো-

নেশিয়ান গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এই টাইপের উৎপত্তি। Haddon-এর মতে ইন্দোনেশিয়ান টাইপের সহিত নেগ্রিটো গোষ্ঠীর পাপুয়ানের সংমিশ্রণের ফলে মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি। Hutton-এর মতে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েডের সহিত নেগ্রিটোর সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। আমরা দেখিতে পাই যে, এই টাইপের উৎপত্তির কারণ যেরূপ অনির্দিষ্ট, ইহার দৈহিক লক্ষণও সেইরূপ অনির্দিষ্ট। চুল উলোট্রিকাস বা কিমোট্রিকাস, দেহের দৈর্ঘ্য অনির্দিষ্ট, গাত্রবর্ণ কাল, তামাটে বা চকোলেট, মস্তকের গঠন লম্বা অথবা গোল, নাক চেপ্টা, কিন্তু কখনও কখনও খাড়া ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণকায় মানুষমাত্রকেই ইচ্ছামত মেলানেশিয়ান টাইপের বলিয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, যদি এই টাইপের নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন না থাকে।

নেগ্রিটোবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, অঙ্গমী নাগাদিগকে (ইহাদের গাত্রবর্ণ কালো) Hutton একবার নেগ্রিটো ও একবার মেলানেশিয়ান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের কাদার, পানিয়ান প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো, মেলানেশিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর সহিত সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। Haddon নাগা, কুকী, মনিপুরী, খাশী, কাছারীকে নিষাদ-গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত মনে করেন। Hutton মেলা-নেশিয়ান টাইপ আঁকড়াইয়া থাকিলেও এই টাইপের যে নূতন সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছেন তাহাতে নিষাদগোষ্ঠীকে এড়ান যাইতেছে না। সে যাহাহউক, আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে। Hutton বলিতেছেন যে, এই অঞ্চলে ও নিকোবরীদিগের মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ প্রবল এবং এই উভয় অঞ্চলে মেলানেশিয়ানের সহিত মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ আছে। আমরা স্মরণ করিতে পারি যে, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের নিষাদ গোষ্ঠীর মধ্যেও অস্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। Hutton আরও কিছু অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মদেশের মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ দেখিতে পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, মেলানেশিয়ান বা Pacific Negro-দিগের মিশ্র টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা সঙ্গত যে, ইন্দোনেশিয়া হইতে পূর্বমুখে মেলানেশিয়া নামে পরিচিত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে অভিযান অগ্রসর হইয়াছিল। মেলানেশিয়া হইতে পশ্চিমমুখে ভারতের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত কোন অভিযান হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না। মধ্যস্থলে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া পার হইয়া পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মেলানেশিয়ান টাইপের পক্ষে কিভাবে আসাম ও ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

যাহাহউক, দেখা যাইতেছে যে, মোঙ্গলীয় লক্ষণ-যুক্ত আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিগকে কেহ কেহ নিষাদগোষ্ঠীর সহিত দূরসম্পর্কিত মনে করেন। এই অভিমত মানিয়া লইলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গোড়ায় নিষাদ গোষ্ঠীর কতকগুলি উপজাতি এই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সহিত মোঙ্গলীয় লক্ষণ-যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ববিদের অভিমত এই অনুমান সমর্থন করে কিনা দেখা যাউক। অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মুণ্ডা, খাশী এবং ব্রহ্মের পালাউং, ওয়া, রিয়াং উপজাতিদের ভাষা ও মন-খেন্মার ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া কথিত হয়। Grierson ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, মুণ্ডা ও মন-খেন্মার ভাষার ভিত্তি এক। শানরাজ্যগুলির পশ্চিম অঞ্চলের ওয়া, রিয়াং ও পালাউংদিগের ভাষাকে মন-খেন্মার এবং ইহাদিগকে মন-খেন্মার জাতি

বলা হয়। ইহার অর্থ—ইহাদের মধ্যে পেগুর Tailaing বা মন এবং ক্যাম্বোডিয়ার খেন্ধারদিগের সংমিশ্রণ আছে। কেহ কেহ বলেন মন-খেন্ধার জাতি কল্পনার বস্তু, কারণ খেন্ধারজাতি কুই, হিন্দু প্রভৃতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। যাহাহউক, আমরা দেখিয়াছি যে, Haddon-এর মতে খাশী, কুকী, মণিপুরী, কাছারী নিষাদগোষ্ঠীর সমলক্ষণ যুক্ত (Haddon মাত্র দুইটি দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে বিচার করিয়াছেন) এবং খাশী, পালাউং ও ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসী সমলক্ষণযুক্ত। (কোন আদিবাসী উপজাতির নাম করা হয় নাই)। এই অভিমত মানিয়া লইলে দাঁড়ায় যে, আসাম সীমান্তের প্রধান উপজাতিগুলি মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত। সুতরাং ভাষার দিক দিয়াও মুণ্ডা ভাষাভাষীদের সহিত মন-খেন্ধার ভাষাভাষী খাশী ও শান সীমান্তের পালাউং, রিয়াং প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইতেছে। Sten Konow-এর মুণ্ডা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিলে সমগ্র পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উপজাতিদিগের সহিত মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করা হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আলোচ্যবিষয়ের সকল অঙ্গ ও বহু প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অভিমতের উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার একটি কারণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের সকল প্রকার অভিমতের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হইতে আদিবাসীদিগের বাসভুমি ও সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য হইতে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী অভিমত ও নূতন নূতন নামকরণের ফলে যে কুজ্ঝটিকা-জাল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমাদের আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে যে, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্বভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলিকে দৈহিক লক্ষণ বিচার করিয়া নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়—এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি, ইহার ভারতে প্রবেশ পথ, ইহার মধ্যে অন্যান্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত ইহার সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নে। এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় মত বিরোধ ও ব্যক্তিগত অনুমানকে প্রাধান্য দিবার প্রয়াসের প্রভূত অবকাশ রহিয়াছে। এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায়, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভাষাতত্ত্ববিদেরাও ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলির ভাষাগত এক গোষ্ঠীত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ভাষাগত ঐক্যের একটা অতি বৃহৎ পরিধি রচনা করিয়া উহার ভিত্তিতে একটি বহু বিস্তৃত মনুষ্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এই মতবাদ অপ্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর সহিত উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিগুলির সম্পর্কের আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ উভয়েই সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই অঞ্চলের আদিবাসী উপজাতি বাহিরে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। সংক্ষেপে সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলি এক গোষ্ঠীভুক্ত—এই তথ্য আমরা পাইতেছি। এই ঐক্য ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে খণ্ডিত হইয়াছে ব্রহ্ম, শানদেশ ও আরাকানের পথে আগত বিভিন্নগোষ্ঠীয় উপজাতিসমূহের সহিত

সম্ভবতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় আদিবাসীদিগের সংমিশ্রণের ফলে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তের উপকূল অঞ্চলে সম্ভবতঃ অল্প পরিমাণে বহির্ভারতীয় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ এই গোষ্ঠীকে ওশেনিক টাইপ বলেন, কেহ মেলানেশিয়ান বলেন, আবার কাহারও মতে উহা ইন্দোনেশিয়ান।

ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠীর সহিত দক্ষিণ মালয়ের শকাই, সিংহলের বেদ্দা, সুমাত্রার উপকুলভাগের অধিবাসী, সেলিবিসের তোয়ালা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। এই সাদৃশ্যের প্রকৃত পরিমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা একমত নহেন। ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠীর সংখ্যা, বিস্তার, ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্নযুগে তাহাদের কোন কোন গোষ্ঠী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার সহিত মালয়, সুমাত্রা, সেলিবিসের যে সকল উপজাতিকে তাহাদের গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয় তাহাদের বর্তমান সংখ্যা, অবস্থা এবং বেদ্দাদিগের অবস্থা ও সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া এরূপ অভিমত গ্রহণ করা যায় না যে, ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠী বহির্ভারতের এই সকল অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। বরং ইহাই সম্ভবপর—যদি দৈহিক লক্ষণের ঐক্য স্বীকার করা যায় তবে এই গোষ্ঠীর কোন কোন দল বহির্ভারতের এই সকল অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছিল। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। ইস্টার দ্বীপ হইতে পশ্চিমে মাডাগাস্কার পর্যন্ত কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে একটা পৃথক অঞ্চল বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন কোন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয়। ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ বা অনুমানের সাহায্যে জাতি-সংমিশ্রণের প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনুমানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে Gueffride Ruggeri মত সমীচীন বলিয়া মনে করা যায়। Schmidt-এর মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে (মন-খেমার জাতির সম্বন্ধে) মুণ্ডা, রিয়াং, ওয়া, শকাই, সেমাং প্রভৃতির মধ্যে ভাষার ঐক্যের কথা তুলিয়া তিনি বলিতেছেন, "I am forced to conclude that these Protomorphic Asiatics had a linguistic unity which was wider than their somatic unity, but which must have been acquired secondarily, the Pre-Dravidian by their greater expansion having encroached upon Negritoid nucleus. The Mon-Khmer affinities extend themselves to Indonesia but here also we pass into another somatic unity.."

অর্থাৎ তাঁহার মতে ভাষার ঐক্যের (উহার কারণ যাহাই হউক) সঙ্গে দৈহিক লক্ষণের ঐক্যের কোন সম্পর্ক নাই। কৃষ্টিগত সাদৃশ্যের যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় (পূর্বের এক প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে) জাতি-সংমিশ্রণের প্রমাণ হিসাবে তাহা অবান্তর।

ভারতবর্ষের সকল আদিবাসীকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে—এই তথ্য পাইবার পরে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদের ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কের আলোচনা করা যাইতে পারে। এই গোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও বহু সহস্র বৎসরের অসংখ্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম বিপ্লব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আপনাদিগের পৃথক অস্তিত্ব ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়াছে। কোন শক্তির বলে ও ঘটনা পরম্পরায় ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা উৎসাহী গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয়।

অভিব্যক্তিবাদ

শ্রীদিলীপকুমার দাস

মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিস্মিত হয়ে যই—ভাঙ্গা ও গড়ার পুনরাবৃত্তিতে, বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকি প্রস্তর যুগের সভ্যতা থেকে যান্ত্রিক যুগের যে সভ্যতায় আমরা পৌচেছি—তার দিকে। সভ্যতার এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা বহু জিনিস ফেলে দিয়ে এসেছি, বহু জিনিস গ্রহণ করেছি—এর প্রমাণ রয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় পাতায়। মানব সভ্যতার চমক লাগানো এই ইতিহাস ছাড়াও পৃথিবীর আর একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসেও রয়েছে ভাঙ্গা ও গড়ার পুনরাবৃত্তি, রয়েছে গ্রহণ করা ও ফেলে আসার পালা। এই ইতিহাস বহু পুরনো। এই ইতিহাসে পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণী ও উদ্ভিদ অংশ গ্রহণ করেছে। বর্তমান ও অতীতের প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাক্ষর রয়েছে এই ইতিহাসে। ধরিত্রীর প্রতিটি স্তর এই ইতিহাসের এক একটি পাতা। পৃথিবীর এই ইতিহাসে সত্যানুসন্ধী বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অতীতের প্রাণী ও উদ্ভিদের সংগে বর্তমানের প্রাণী ও উদ্ভিদের একটা সম্বন্ধ। অতীত হতে বর্তমানের সৃষ্টি, বর্তমান আবার লুপ্ত হয়ে যায় অতীতের অন্ধকারে। তবুও উভয়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিজ্ঞানীরা তেমন একটা সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন—বর্তমান ও অতীতের জীবজগতের মাঝে। এই সম্বন্ধ থেকেই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, জীবজগতের ক্রমবিবর্তন বা অভিব্যক্তির ধারা।

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ এবং তা থেকে জীব-জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর বেশীর ভাগই যে নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তবের সংগে সম্পর্কবিহীন সেকথা বলা বাহুল্য। প্রাণতত্ত্ববিদ্‌দের মতে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে। ভীষণ উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ তাপ হারিয়ে পৃথিবী যখন একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল তখনকার কোন একসময়ে, প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, তাতে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। প্রাণের জন্যে যে তিনটি জিনিস বিশেষ প্রয়োজনীয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপ, বায়ুমণ্ডল ও জল, সেই তিনটিই প্রয়োজনমাফিক পাওয়া গেলেও প্রাণ বোধ হয় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। হয়ত কতকগুলো নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ উপযুক্ত তাপ, বায়ুমণ্ডল ও জলের প্রভাবে প্রাণবন্ত এককোষী জীবে পরিবর্তিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছিল ঐ নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলোর প্রাণবন্ত বস্তুতে পরিবর্তিত হবার মধ্যবর্তী সময়ে। এরূপ মনে করবার কারণ এই যে, ভাইরাসের মধ্যে যেমন প্রাণের আভাস পাওয়া যায় তেমনি আবার নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ বলেও মনে হয়। প্রাণের উৎপত্তির পর যে এককোষী জীবগুলোকে পৃথিবীর বুকে দেখা গিয়েছিল তারাই কয়েক কোটি বৎসর ধরে বিবর্তিত হতে হতে আজকের মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের একপ্রান্তে হলো অ্যামিবা জাতীয় জীব, আর অপর প্রান্তে হলো আধুনিক যুগের মানুষ।

ক্রমবিবর্তনের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস, যার উপর

ভিত্তি করে অভিব্যক্তিবাদের উৎপত্তি হয়েছে, সেই তত্ত্ব যে কেবল আধুনিক বিজ্ঞানীদের দান তা নয়। এবিষয়ে অতীতের কয়েকজন মণীষীর দানের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লিনিয়াস (১৭০৭—১৭৭৮) প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে অতি সূক্ষ্মভাবে ভাগ করেছিলেন এবং সেই সংগে তাঁর জানা প্রত্যেকটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ল্যাটিন নামকরণও করেছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ প্রথা প্রবর্তনের জন্যে তিনি বিজ্ঞান-জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জীব-জগৎ সম্বন্ধে লিনিয়াসের মতবাদ ছিল এই যে, পৃথিবীতে সব রকমের জীবই একজোড়া করে ছিল এবং তাদেরই বংশবৃদ্ধি হয়ে এই জীব-জগতের সৃষ্টি হয়েছে। লিনিয়াসের এই মতবাদে কোথাও ক্রমবিবর্তনের কথা নেই। তাছাড়া এই মতবাদে আরও একটা আপত্তি রয়ে গেছে এই যে, সকল জীবই যখন কেবল একজোড়া করে ছিল তখন নিশ্চয়ই শক্তিমানেরা দুর্বলদের উদরসাৎ করতো।

আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে লিনিয়াসের এই মতবাদ আজগুবি বলে মনে হবে এবং তাঁরা নিশ্চয়ই এককথায় এই মতবাদ নাকচ করে দেবেন। লিনিয়াসের সমসাময়িক বুফোঁ (১৭০৭-১৭৮৮) আবার যে মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন সেটা পড়লে বিস্মিতই হতে হয়। তিনিই সর্বপ্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কংকালের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে মানুষের বাহু ও ঘোড়ার সামনের পায়ের তুলনা করেন। উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উভয় মহাদেশ একসময় স্থলভাগ দ্বারা যুক্ত ছিল। ফলে, এক মহাদেশের প্রাণী অন্য মহাদেশে যাতায়াত করতে পারতো। এভাবে বুফোঁ জীব-জগতের ক্রমবিবর্তনের তথ্য প্রকাশ করেন। এই মত পোষণ করলেও তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতেন—যেকোনও শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণী হোক না কেন তারা কোনরূপেই পরিবর্তিত হতে পারে না। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে স্বীকার করেন—যে কোনও প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ বিবর্তিত হতে পারে। তিনি সকল শ্রেণীর প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের বাহ্যিক সকল প্রকার অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণীর প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের সংগে অপর একশ্রেণীর প্রাণী অথবা উদ্ভিদের একটা সম্বন্ধ আছে একথা বিশ্বাস করতেন।

জীবাশ্ম সম্বন্ধে পূর্বে এই ধারণা ছিল যে, সেগুলো প্রকৃতির খেলা। সেগুলোকে প্রাণবিহীন জীবদেহের মডেল হিসেবে গণ্য করা হতো, কিন্তু কুভেয়ার (১৭৬৯—১৮৩২) এই মত সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বলেন যে, পৃথিবীতে অতীতে যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ বাস করতো জীবাশ্মগুলো হলো তাদেরই প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ। অতীতের যেসব প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায় সেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংগে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীদের যে কোন রকম সম্বন্ধ থাকতে পারে, একথা তিনি মানতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এক এক যুগে এক একপ্রকার প্রাণী এবং উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছিল। সেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস হয়ে পরবর্তী যুগে আবার পরিবর্তিত আকারে নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছে।

এ ভাবে এতদিন পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা যেভাবে ক্রমবিবর্তনের কথা বলে আসছিলেন তাতে তাঁরা নিজেদের মতবাদকে একটা সুষ্ঠু রূপ দিতে পারেননি। এই সময় ফ্রান্সে আবির্ভূত হন ল্যামার্ক (১৭৪৪—১৮২৯)। তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণসহ উপস্থিত করেন—ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। তাঁর মতবাদে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার

করেন ক্রমবিবর্তনের কথা এবং বিশ্বাস করেন—যে কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে বিবর্তিত হতে পারে। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল এমন এক শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ যাদের দৈহিক গঠন-বিন্যাসে ছিল না কোনও জটিলতা, কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে এরাও বিবর্তিত হয়ে এসেছে এবং দেখা দিয়েছে নতুন নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদ। ল্যামার্ক মনে করতেন, পারিপার্শ্বিক কারণে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিশেষ কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা বাড়ানো প্রয়োজন হতে পারে, তেমনি আবার কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা কমেও আসতে পারে। এভাবে বারংবার ব্যাবহারের ফলে কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, আবার অব্যবহারের ফলে কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লোপ পেয়ে যায়। স্বোপার্জিত গুণসমূহ বংশানুক্রমে পরিচালিত হয় বলে ল্যামার্ক মনে করতেন; অর্থাৎ তাঁর মতে পারিপার্শ্বিক কোনও কারণে যদি কোনও একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহে কোনও পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেটা বংশানুক্রমে দেখা দেবে। জিরাফের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গাছের উঁচু ডালের পাতা খাবার ক্রমাগত প্রচেষ্টাতেই জিরাফের লম্বা গলার উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। ল্যামার্কের মতবাদের সমর্থন হিসেবে অন্ধকার গুহাবাসী প্রাণীদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। অন্ধকার গুহাবাসী প্রাণীদের বেশীর ভাগই দৃষ্টিশক্তিহীন। কারণ, আলোর অভাবে চোখে দেখা সম্ভব নয় বলেই চোখের কার্যকারিতা কমে গিয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেছে।

ল্যামার্কের জীবদ্দশাতেই কুভেয়ার এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ল্যামার্কের পক্ষ মতবাদের তীব্র সমর্থন করে দাঁড়ান তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু সেণ্ট হিয়েলার (১৭৭২—১৮৪০)। কুভেয়ারের প্রতিবাদ অবশ্য খুব যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কারণ, জীবজগৎ অপরিবর্তনীয় এই মতের উপর ভিত্তি করেই তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, পারিপার্শ্বিক কারণেই যদি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে হাজার বছর পূর্বেকার যেসব মমি পাওয়া গেছে তাদের সংগে বর্তমান মানুষের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য সম্ভব হয় কি করে? এই ধরণের প্রশ্নে কুভেয়ার সেণ্ট হিয়েলারকে বিব্রত করে তুলেছিলেন।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রকাশিত হবার পর আধুনিক বিজ্ঞানীরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ল্যামার্কের মতবাদের। বিশেষ করে স্বোপার্জিত গুণসমূহ বংশানুক্রমে পরিচালিত হয়ে থাকে—ল্যামার্কের এই উক্তি যে সত্য নয় নানা-পরীক্ষার ফলে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। কয়েক-পুরুষ ধরে ড্রসোফিলা শ্রেণীর মাছিদের ডানা কেটে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তা সত্বেও তাদের পরবর্তী বংশধরেরা জন্মেছিল সম্পূর্ণ ডানা নিয়েই। এর আগে ল্যামার্কের সমর্থনকারীরা আরও একটি প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলেন, যখন জার্মানীতে হ্বাইসম্যান (১৮৩৪-১৯১৪) জীবকোষের ভিতরে অবস্থিত ক্রোমোসোমের কথা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ক্রোমোসোমই কুলসঞ্চারী গুণসমূহকে বংশপরম্পরায় বহন করে নেয়; কিন্তু স্বোপার্জিত গুণের কোনও প্রভাব ক্রোমোসোমের উপর নেই। এত বিরোধিতা সত্বেও অনেকেই ল্যামার্কের মতবাদ সমর্থন করেছিলেন। তারপরেই অভিব্যক্তিবাদকে ডারউইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

মশার স্বভাব-শত্রু

মশার উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই মশারির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোন্ অতীতে, কার বুদ্ধিতে এই অপূর্ব বস্তুটি উদ্ভাবিত হয়েছিল সেবিষয়ে আমরা মাথা না ঘামালেও এটা যে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার এতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ, আজও মশার উৎপাত প্রতিরোধের জন্যে মশারির চেয়ে কোন সহজসাধ্য ব্যবস্থা কেউ উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়নি। শোনা যায়—অতি প্রাচীন-কালে নাকি মশক-দমনে ধূম প্রয়োগের ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। ধূম প্রয়োগের ফল ঠিক আশানুরূপ না হওয়াতেই বোধ হয় অবশেষে মশারির উদ্ভব ঘটে। যাহোক, মশারির সাহায্যে মশার আক্রমণ ব্যর্থ করে' মানুষ অনেকটা নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে আসছিল। সেই প্রাচীনযুগে ম্যালেরিয়া ছিল কিনা জানা নেই; কিন্তু তার অনেককাল পরে শোনা যায়—ম্যালেরিয়ার কথা। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উচ্ছন্ন হয়ে যাবার যোগাড়। আমেরিকার রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌রা রোগীকে কিনা-কিনা ছালের গুঁড়ো খাইয়ে ম্যালেরিয়া আরাম করতো। আকস্মিক একটা ঘটনায় সেই কিনা-কিনা গাছের ছাল ম্যালেরিয়ার ওষুধরূপে ইউ-রোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ এই কিনা-কিনা বা সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকেই ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ওষুধ কুইনিন নিষ্কাশিত হয়। এ তো হলো শুধু রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা। রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগোৎপত্তি বন্ধ করবার ব্যবস্থাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। কিন্তু যেখানে রোগোৎপত্তির কারণই জানা নেই সেখানে রোগের আক্রমণ বন্ধ করবার সম্ভাবনা কোথায়? ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ না জানা পর্যন্ত মশাকে কিন্তু কেবল দংশনকারী শত্রু হিসাবেই গণ্য করা হতো। ম্যালেরিয়ার সংগে মশার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে, ভুলেও তখন এরূপ কোন সন্দেহ মানুষের মনে জাগেনি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই মাত্র বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মানুষ জানতে পারলো—ম্যালেরিয়ার সংগে মশার কি সম্বন্ধ। মশা এই ম্যালেরিয়া বীজাণুর বাহক; দংশন করবার সময় মানুষের শরীরে বীজাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়। মানুষ তখন মশারি খাটিয়ে কেবল বিশ্রাম-সুখ উপভোগেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারলো না, মশক-দংশনে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। কারণ, কোন গতিকে, এক আধটা

মশকভুক তেচোকা মাছ

মশার দংশনে বিশ্রাম-সুখ ব্যাহত না হতে পারে; কিন্তু ম্যালেরিয়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। কাজেই মশক-কুল নির্মূল করবার জন্যে মানুষ যেন মরিয়া হয়ে উঠলো। ঝোপ-ঝাড়, জঞ্জাল পরিষ্কার করে', নালা-ডোবা বুজিয়ে, কেরোসিন ছিটিয়ে, মানুষ অনেক দেশ থেকে ম্যালেরিয়া তাড়াতে সমর্থ হলো বটে; কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুকে এভাবে সম্পূর্ণ-রূপে নির্মূল করা সম্ভব নয়। একস্থানে নির্মূল হলে কি হবে, অন্যস্থানে আবার অবাধ বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। ফ্লিট অথবা অধুনা আবিষ্কৃত কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের অব্যর্থ ওষুধ, ডি, ডি, টি প্রয়োগে মশা মরে বটে; কিন্তু প্রয়োগ-বিধির অসুবিধায় বাচ্চাগুলো রেহাই পেয়ে যায়। মশার বাচ্চা থাকে জলের নীচে। উপরে ডি, ডি, টি ছড়ালে তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না। ইতিপূর্বেই বিজ্ঞানীরা আবার মশার কতকগুলো স্বাভাবিক শত্রুর সন্ধান পেয়েছেন। কয়েক জাতের মাছ মশার বাচ্চা খেয়ে উদরপূর্তি করে। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করতে হলে মশক-দমন যখন অপরিহার্য তখন এই ক্ষুদ্র শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের স্বভাব-শত্রু লেলিয়ে দিতে পারলে উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। জীব-জগতে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে প্রকৃতিদেবীও ঠিক এই পন্থাই অনুসরণ করে থাকেন। কাজেই, এ-প্রসঙ্গে মশার স্বভাব-শত্রু সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কয়েকটি কথা বলছি।

কয়েক বছর আগের কথা। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ-কল্পে মাছ সংক্রান্ত গবেষণাকারী বিজ্ঞানীমহলে তেচোকা বা প্যান্‌চাক্স প্যান্‌চাক্স মাছের তখন খুব নাম। এরা নাকি মশার বাচ্চা খেতে খুবই ওস্তাদ। পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে কতকগুলো তেচোকা মাছ সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীর বড় একটা কাচের চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলাম। কোলকাতার আশেপাশে খাল, বিল, পুকুরে দু'জাতের তেচোকা মাছ পাওয়া যায়। এক জাতের মাছ প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা হয়, আর এক জাতের মাছ অনেকটা ছোট, লম্বায় প্রায় ½ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। দু'জাতের মাছেরই মাথার উপরে রূপালীরঙের একটা জলজলে ফোঁটা দেখা যায়। এরা দলবেঁধে জলের উপরিভাগে ভেসে বেড়ায় এবং জলাশয়ের ধারে ধারেই ঘোরাফেরা করে, গভীর জলে যায় না। যাহোক, মাছগুলোকে চৌবাচ্চার জলে ছাড়বার পর, দিন দুই পর্যন্ত কিছুই খেতে দিইনি। তারপর ট্যাংরার চামড়ার কারখানা থেকে প্রচুর মশার বাচ্চা ধরে এনে তার কিছু কিছু চৌবাচ্চার জলে ছেড়ে দিলাম। মশার বাচ্চাগুলো জলের নীচেই থাকে। সেখানে মৃত উদ্ভিজ্জ বা জৈব-পদার্থ কুরেকুরে খায়। খাওয়াই হচ্ছে এদের প্রধান কাজ। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে পরেই কিলবিল করে বাতাস নেবার জন্যে জলের উপরে উঠে আসে। লেজটা উপরের দিকে তুলে কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করবার পর খানিকটা বাতাস সংগ্রহ করে' আবার নীচে নেমে যায়। মশার বাচ্চাগুলোকে জলে ছাড়বার সংগে সংগেই ক্ষুধার্ত মাছগুলোর মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। কিলবিল করে এক একটা বাচ্চা যখন জলের উপরে উঠতে বা নীচে নামতে থাকে, মাছগুলো তখনই সেগুলোকে ছো-মেরে ধরবার চেষ্টা করে। কয়েকটা বাচ্চাকে তারা গলাধঃকরণ করলো বটে, কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে নয়টা মাছ প্রায় দশটা বারোটার বেশী মশার বাচ্চা শিকার করতে পারেনি। মোটের উপর, অনেক দিন ধরে অনেক রকম পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—তেচোকা মাছ মশার বাচ্চা খেতে ভালবাসে বটে, কিন্তু জলের উপরে ভেসে বেড়ায় বলে' তাদের পক্ষে এ-ধরণের শিকার ধরা অনেক সময়েই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

এর পরে চাঁদা-মাছ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করি। চাঁদা-মাছেরা জলের অনেক নীচে দল বেঁধে ঘোরাফেরা করে। মাঝারি গোছের এক একটা

চাঁদা, পুঁটি ও খল্‌সে মাছের বাচ্চা। এরা প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা উদরস্থ করে।

কাচের ট্যাঙ্কের মধ্যে তিন চারটে করে' চাঁদা-মাছ রেখে মশার বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। শিকার নজরে পড়লে, শান্তশিষ্ট বিড়ালেরও অকস্মাৎ যেমন চোখ-মুখের ভাব বদলে যায়, আচরণের অদ্ভুত বৈলক্ষণ্য ঘটে—মশার বাচ্চা নজরে পড়বামাত্র এই চাঁদা মাছ-গুলোরও তেমনি একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পেট ও পিঠের কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, শরীর থেকে লালা নিঃস্রব হতে থাকে এবং উত্তে-জনায় সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। এ অবস্থায় একটা মাছকে জল থেকে তুলে ধরলেও তার উত্তেজনার অবসান ঘটে না। তার যেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই! শরীরের কাঁপুনিতে যেন ঝিন্‌ঝিন্ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। জলের নীচে এসময়ে কী তাদের উল্লাস, কী তাদের কর্মব্যস্ততা! মশার বাচ্চাগুলোকে দেখামাত্রই ছোমেরে টপাটপ গিলে ফেলছে। প্রথমবারে এক একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রায় ১৫।২০টা করে মশার বাচ্চা ছেড়েছিলাম। প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই তিন চারটা মাছ সেগুলোকে নিঃশেষ করে ফেললো। তারপর আরও বাচ্চা ছেড়ে দিলাম। প্রায় কুড়ি, পঁচিশ মিনিটের মধ্যে সেগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! এর পরে কই, খল্‌সে, শাল, শোল, ল্যাটা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের মাছ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—কই, শাল, শোল, ল্যাটা প্রভৃতি বড় মাছগুলো মশার বাচ্চা ধ্বংস করতে কোন সাহায্য করে না বললেই হয়। তারা কদাচিৎ দু'একটা মশার বাচ্চা উদরসাৎ করে বটে; কিন্তু সে যেন নেহাৎ দায়ে পড়েই আশেপাশে মশার বাচ্চা কিলবিল করলেও তারা যেন ভ্রূক্ষেপই করে না। মনে হয়, অত বড় মাছের পক্ষে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর খাদ্য বলেই বাচ্চাগুলো রেহাই পেয়ে যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো মশার

বাচ্চার প্রবল শত্রু। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ছোট-বেলায় এরা বেশীর ভাগই মশার বাচ্চা খেয়ে উদর পূরণ করে থাকে। কেবল খাল-বিল, নালা-ডোবায়ই নয়, দু'চার দিন কোন জায়গায় একটু জল জমলেই সেখানে মশার বাচ্ছা জন্মায়। খাল-বিল বা অন্যান্য জলাশয়ে যথেষ্ট মাছও থাকে; তারা না হয় মশার বাচ্চা খেয়ে উজার করে, কিন্তু কোন জায়গায় কয়েক দিনের জন্য জল জমে থাকলে তাতে তো আর মাছ জন্মায় না! এসব ক্ষেত্রে মশার বাচ্চা ধ্বংস করবার কোন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে কি? বোধহয় নেই—এই ছিল আমার ধারণা। তারপর হঠাৎ একটা ঘটনা নজরে পড়ায় এই ধারণা বদলে গেল।

কোলকাতার সন্নিহিত মস্ত বড় একটা মাঠ। মাঠটা সমতল নয়, মাঝে মাঝে বেশ উঁচু-নীচু। নীচু জায়গাগুলোতে বর্ষার জল জমে ছোট-খাট ডোবার মত হয়েছে। তখন শরৎকাল। ডোবার জল শুকিয়ে আসছে। এরকমেরই একটা ডোবার ধারে বসে ফড়িঙের বাচ্চা ও অন্যান্য জল-পোকার গতি-বিধি লক্ষ্য করছি। মশার বাচ্চাও দু'একটা নজরে পড়ছিল। আমার কাছ থেকে প্রায় হাত দেড়েক তফাতে জলের গভীরতা প্রায় এক ফুট। একটা মশার বাচ্চা সেখানে কিলবিল করে উপরে উঠে আসছিল। জলের উপরে উঠতে না উঠতেই ইঞ্চি খানেক লম্বা মাছের মত একটা প্রাণী কোত্থেকে হঠাৎ ছুটে এসে তাকে ছো-মেরে ধরে নিয়ে গেল। বাচ্চাটাকে ধরবার সংগে সংগেই উদরসাৎ করে প্রাণীটা জলের তলায় গিয়ে চুপটি করে বসে রইলো। তার গায়ের রং আর জলের তলায় আশেপাশের মাটির রং হুবহু এক রকমের। কাজেই প্রাণীটা যদি শিকার ধরবার জন্যে উঠে না আসতো তবে তার প্রতি নজর পড়বার কোন কারণই ঘটতো না। চেহারাটা দেখে হঠাৎ মনে হয় যেন একটা বেলে-মাছের বাচ্চা। নেটের জাল দিয়ে প্রাণী-টাকে ধরে ফেল্লাম। জল থেকে তুলে দেখি—মস্ত বড় একটা ব্যাঙাচি। সাধারণতঃ আমরা নালা-ডোবার মধ্যে যেসব ব্যাঙাচি দেখতে পাই সেগুলো অনেক ছোট এবং কুচকুচে কালো। আর এই ব্যাঙাচিগুলোর গায়ের রং ধূসর এবং

মশকভুক ব্যাঙাচি

আকারে এরা প্রায় এক ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়ে থাকে। এরা হলো কোলা-ব্যাঙের বাচ্চা। কালো-ব্যাঙাচির মত এরা একস্থানে দলবদ্ধভাবে থাকে না, একাকী বিচরণ করে। যাহোক, এই জাতের ব্যাঙাচি ধরে এনে তাদের মধ্যে মশার বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে দেখলাম—এরা প্রধানতঃ বিভিন্ন জাতের মশার বাচ্চা খেয়েই জীবনধারণ করে। কোলকাতায় প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ছাতের উপর জলের ট্যাঙ্ক থাকে। সেখানে অজস্র মশার বাচ্চা জন্মায়। এই ট্যাঙ্কের জলে বিভিন্ন জাতের ছোট ছোট মশক-ভূক মাছ ছেড়ে দেখেছি, তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। মোটের উপর, অনেক ক্ষেত্রেই মাছগুলোকে ট্যাঙ্কের জলে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই ব্যাঙাচিগুলো ট্যাঙ্কের জলে মশার বাচ্চা খেয়ে দিব্যি আরামেই বেড়ে ওঠে। এই সব পরীক্ষার পর প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেল। এই সময়ে হঠাৎ একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়লো।

জলজ শ্যাওলার গায়ে ক্লেমিডোমোনাস্ নামে এক রকমের আণুবীক্ষণিক প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ কোন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই অদৃশ্য প্রাণীর উৎপাদন করা দরকার হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে ল্যাবরেটরীর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির গামলায় বিভিন্ন রকমের জলজ শ্যাওলা জন্মানো হয়েছিল। সাতটা গামলার মধ্যে দুটো গামলা ছিল ক্ষুদে পানায় ঢাকা। জলভর্তি একটা গামলা খালিই পড়েছিল। অদৃশ্য প্রাণীগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে হঠাৎ একদিন নজর পড়লো—খালি গামলাটার উপর। দেখলাম—গামলার জলে অজস্র মশার বাচ্চা কিলবিল করছে। মনে হলো—তবে তো সবগুলো গামলার জলই বোধহয় মশার বাচ্চায় ভর্তি হয়ে গেছে! একে একে সবগুলো গামলাই অনুসন্ধান করে দেখলাম। আশ্চর্যের বিষয়, কেবল ওই খালি গামলাটা ছাড়া আর কোন গামলার জলেই মশার বাচ্চার চিহ্নও পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি? একই জায়গায় রাখা গামলার জলে এই পার্থক্যের কারণ কি হতে পারে? বিবিধ রকমের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চলতে লাগল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—কয়েক জাতের জলজ উদ্ভিদের সংস্পর্শে মশার বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে না। যেসকল জলাশয়ে জলজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মে সেখানে মশার বাচ্চা কদাচিৎ দেখা
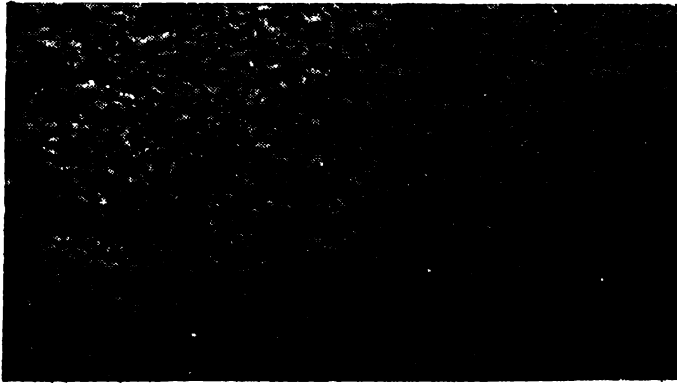
জলের উপরিভাগ ক্ষুদে পানায় ঢেকে গেছে। এরূপ পানায় ঢাকা জলাশয়ে মশার পক্ষে ডিম পাড়া সম্ভব নয়।

যায়। এর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি বটে, তবে হ্রদে পানায় ঢাকা পুকুরের জলে মশার বাচ্চা না হওয়ার কারণ খুবই পরিষ্কার। মশা পরিষ্কার জলের উপর বসে ডিম পাড়ে। পানায় ঢাকা পুকুরের জলে সে ডিম পাড়বার মোটেই সুবিধা পায় না। তাছাড়া জলের উপর পাতলা সরের মত শ্যাওলা জমে থাকলেও মশা সেখানে ডিম পাড়তে পারে না। কোন ফাঁকে ডিম পাড়লেও বাচ্চাগুলো ওই সরের আবরণ ভেদ করে বাইরের বাতাস নিতে না পারায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

—গ—

কৃত্রিম সূর্যরশ্মি ও বৃষ্টির সৃষ্টি

মানুষ যতদিন পর্যন্ত আবহাওয়াকে আয়ত্তাধীনে আনিতে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্যন্ত চাষবাসের কাজ কতকটা জুয়াখেলার মতই চলিতে থাকিবে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া চাষবাসের সুবিধা করার জন্য সম্প্রতি চেষ্টা চলিতেছে তবে এই "খোদার উপর খোদকারী" পরিকল্পনাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলিয়াই মনে য়য়। লোকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

সূর্যের রশ্মিকে বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় প্রয়োজনমত কাজে খাটানো এবং প্রয়োজনাভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখার এবং বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

অতি উর্ধে বিচরণোপযোগী বিমানের সাহায্যে মেঘপুঞ্জের মধ্যে জমাট কার্বন—ডাইঅক্সাইড প্রক্ষেপ করিয়া খানিকটা সুফল লক্ষ্য করা গিয়াছে।

তবে একথা অকপটেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আবহাওয়া মানুষের আয়ত্তাধীনে আনার প্রশ্ন এখনও বহু দূরের কথা। তবে চাষীদের সুবিধার জন্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়া যতটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

উন্মুক্ত প্রান্তরে খড় শুষ্ক করিবার একপ্রকার চলমান যন্ত্র বৃটেনে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই উদ্ভাবনের ফলে চাষীদের সূর্যের তাপের আশায় বসিয়া থাকিতে হয় না এবং ক্রমাগত কয়েকদিন বর্ষা নামিলেও তাহারা আর চিন্তিত হইয়া পড়ে না। এতদ্ব্যতীত অল্প জমির মালিকদের পূর্বে ভিজা খড় মাঠ হইতে আনিতে হইত; কিন্তু এখন তাহারা মাঠে উহা শুষ্ক করিয়া বাড়ীতে আনিতে পারে। ভিজা খড় শুষ্ক করা হইলে শতকরা ৭৫ ভাগ ওজন হ্রাস পায়; ফলে চাষীদের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয় যথেষ্ট।

বর্তমানে যে যন্ত্র বৃটেনে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে দৈনিক এক টন খড় শুষ্ক হইতে পারে। আর এক প্রকার যন্ত্র আছে যাহার সাহায্যে ঘণ্টায় তিন হইতে চার হন্দর খড় শুষ্ক হইতে পারে। যন্ত্রটিকে যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া চলে এবং অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে উহাকে কার্যোপযোগী করিয়া তোলা যায়।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বের অনন্ত রহস্য কবি ও জ্যোতির্বিদকে সমভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছে। যতবারই মানুষ অসীমকে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই সে নূতন আবিষ্কার দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে।

আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রাদির তথ্য জানিবার উদ্দেশ্যে চলুন আমরা একটি কাল্পনিক পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তীব্র বেগে অনন্ত শূন্যে যাত্রা করি। যাত্রাপথে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী চন্দ্রকে প্রথম দেখিতে পাইব। ইহার দূরত্ব ২৪০,০০০ মাইল। যদি আমাদের পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত রেল লাইনের ব্যবস্থা হয় এবং গাড়ী যদি অনবরত ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চলে তবে ২০০ দিনে আমরা চন্দ্রলোকে পৌছিতে পারিব। অথবা এরোপ্লেনে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে চলিলে ২০ দিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারিব। অবশ্য আরও দূরের তারকাপুঞ্জে পৌছিবার পক্ষে এই বেগ নিতান্তই নগণ্য। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। আলোর গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে কোন রকেট চালাইতে পারিলে অনন্ত নীলিমার রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক সুবিধা হইত। ধরুন, আমাদের কল্পনার পুষ্পকরথ আলোর গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

চন্দ্র

আলোকের গতিতে চলিলে আমরা ১¼ সেকেণ্ডে চন্দ্রে পৌছিব। প্রাণী, উদ্ভিদ, বায়ু—এসব চন্দ্রে নাই। চন্দ্রের বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষ উহার সম্বন্ধে কত অলীক কল্পনা করিয়াছে! প্রায় ১১০ বৎসর পূর্বে নিউইয়র্ক সহরের নিকট একটি অল্প পরিচিত পত্রিকার সম্পাদক ঐ পত্রিকার বিক্রয় বাড়াইবার জন্য চন্দ্রের সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক বর্ণনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি লেখেন যে, আফ্রিকার জঙ্গলে একটি অতি বৃহৎ নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্ট চন্দ্রের পৃষ্ঠে বিশালকায় বৃক্ষ এবং অদ্ভুত আকারের অতি বৃহৎ জন্তুর বিবরণ দেওয়ার ফলে এই পত্রিকাটির প্রচার এত বৃদ্ধি পাইল যে, উহার পাঠকসংখ্যা শীঘ্রই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল। চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশের গুরুত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের গুরুত্বের ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ। কেহ যদি পৃথিবীতে ৫ ফিট উঁচুতে লাফাইতে পারেন তবে চন্দ্রলোকে তিনি ৩০ ফিট উঁচুতে লাফাইতে পারিবেন। পৃথিবীতে দীর্ঘ উল্লম্ফনে যদি তিনি ২০ ফিট অতিক্রম করিতে পারেন তবে চন্দ্রে গিয়া সেই তুলনায় ১২০ ফিট অতিক্রম করিতে পারিবেন।

চন্দ্রের পৃষ্ঠে আমরা দেখিতে পাইব বিস্তীর্ণ মরুভূমি, উচ্চপর্বতশৃঙ্গ ও সুদূর প্রসারিত পর্বতমালা এবং নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির বিশাল গহ্বর। এই পরিবেষ্টনীতে কোন জীবনের আভাস নাই এবং থাকিতেও পারে না।

সূর্য

চলুন আমরা চন্দ্র ছাড়িয়া সূর্যের দিকে অগ্রসর হই। আলোকের বেগে ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ৮ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে সূর্যলোকে পৌছিব। সূর্য-পৃষ্ঠের উত্তাপের পরিমাণ ৬০০০° সেন্টিগ্রেড এবং কেন্দ্রের

উত্তাপ প্রায় ২ কোটি সেন্টিগ্রেড। তথায় চাপের পরিমাণ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ হইতে কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ছাড়া আমাদের পৃথিবীর পরীক্ষাগারে সূর্যের পৃষ্ঠদেশের সমপরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। স্পিরিট ষ্টোভের নীল শিখার উত্তাপ ৫০০° সেন্টিগ্রেড, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের সাদা তারের উত্তাপ ২০০০° সেন্টিগ্রেড এবং লোহা গলাইবার চুল্লীর উত্তাপ প্রায় ১৮০০° সেন্টিগ্রেড।

অঙ্গার প্রভৃতি উপদানে গঠিত প্রাণী সূর্যে পৌছিতে পৌছিতেই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। যদি সিলিকন প্রভৃতি উপাদানে গঠিত প্রাণী সম্ভবপর হয়, তবে সে-ও সূর্যে পৌছিয়া একই দশায় পড়িবে। কোনক্রমে যদি আপনি সূর্যের কেন্দ্রে পৌছিতে পারেন তাহা হইলে আপনার শরীরই যে কেবলমাত্র ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে তাহা নহে, আপনার শরীরের প্রত্যেকটি অণু বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হইবে। সূর্যের কেন্দ্রের উত্তাপ ও চাপে সমস্ত অণু-পরমাণু চূর্ণ হইয়া ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন মুক্ত হইয়া সূর্যের ভিতরে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিবে

সূর্যের উপরিতলে বিরাট অগ্নিশিখা মিনিটে কয়েক সহস্র মাইল বেগে বিনির্গত হইতে দেখা যায়।

সূর্য-কলঙ্ক

সূর্যের পৃষ্ঠদেশে অনেকগুলি কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। এই কলঙ্কগুলির তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক অংশগুলির তাপমাত্রা হইতে অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই নিষ্প্রভ দেখায়। এই সব স্থান হইতে ক্রমাগত বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইতেছে বলিয়া ঐ স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায়। পূর্বে বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সূর্য-কলঙ্কগুলি বায়বীয় পদার্থের আবর্ত। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের বিভিন্ন স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন কৌণিক গতিতে ঘুরিয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের কাছের গতি মেরু প্রদেশের গতি অপেক্ষা কিছু তীব্রতর। ঘূর্ণনবেগের অসমতার জন্য সূর্যের পৃষ্ঠদেশে আবর্তের সৃষ্টি হয়; যেমন নদীর জলের গতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ হইলে জলে আবর্তের সৃষ্টি করে।

কিন্তু সূর্য-কলঙ্কগুলির সঙ্গে সঙ্গে কেন তীব্র চুম্বক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহা উপরোক্ত অনুমান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলিয়া এই মতবাদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইদানীং সুইডেনের জ্যোতির্বিদ আলফেন অনুমান করেন যে, সূর্যের কেন্দ্রের সন্নিকটে আবর্তের সৃষ্টি হয় এবং ঐ আবর্তগুলির সূর্যের চুম্বক-শক্তির দিকে চুম্বক-শক্তিবিশিষ্ট ঢেউয়ের আকারে অগ্রসর হইয়া উপরিভাগে আসে। তাঁহার মতে এই অনুমান দ্বারা সূর্য-কলঙ্কগুলির তীব্র চুম্বক-শক্তির কারণ নির্ণয় করা যায়।

সূর্যের শক্তি

৬০০০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে পদার্থ কেবলমাত্র বায়বীয় আকারেই অবস্থান করিতে পারে এবং এই উত্তাপে জটিল পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায়। সেই কারণে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে সমস্ত পদার্থ বায়বীয় আকারে মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। বিকিরণের ফলে সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ৩.৮×১০^{৩৩} আর্গ পরিমাণ শক্তি হারাইতেছে। হয়ত মনে করা যাইতে পারে যে, ইহার ফলে সূর্য ক্রমাগত শীতল হইতেছে। কিন্তু তাহা না হইয়া সূর্য অতি ধীরে ধীরে আরও উত্তপ্ত হইতেছে। এক বিলিয়ন ($১০^{৯}$) বৎসরেরও উপর সূর্য তাহার উত্তাপ দান করিয়া আসিতেছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কিরূপে সূর্য এই বিকিরণজনিত ক্ষতিপূরণ করিয়া আরও কিছু উত্তাপ সঞ্চয় করিয়াছে? জার্মান বিজ্ঞানী হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ

মনে করিতেন যে, সূর্য আদিকালে শীতল গ্যাসের বিরাট একটি গোলক ছিল এবং নিজের ভারের চাপে ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতেছে। ক্রমাগত এই সঙ্কোচনের ফলে সূর্য উত্তাপ লাভ করিয়া বিকিরণজনিত ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু গণিতের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, এরূপভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া সূর্যের পক্ষে সমতা রক্ষা সম্ভবপর নয়। সূর্যের প্রথম অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে মাত্র ২×১০^{৪৭} শক্তিমাত্রা পরিমাণ শক্তি সূর্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সূর্য বিকিরণ করিয়াছে ২.৪×১০^{৫০} শক্তিমাত্রা, অর্থাৎ ১০০০ গুণ অধিক শক্তির অপচয় হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে —এই সঙ্কোচনে নহে, বরং অন্য কোনও আণবিক প্রক্রিয়া দ্বারা শক্তির সমতা রক্ষা হইতেছে। সূর্যের ভিতর অনবরত আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিতেছে। একটি উপাদান অন্য উপাদানে রূপান্তরিত হইয়া প্রচুর শক্তি মুক্ত করিতেছে। আমেরিকান পদার্থবিদ্ ডাঃ হেন্‌স্ বেথি ১৯৩৮ সালে ওয়াশিংটনের থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স কন্‌ফারেন্সে গিয়া উপলব্ধি করিলেন যে, সূর্যের শক্তির সংরক্ষণ আণবিক প্রক্রিয়া দ্বারাই হইতেছে। সমিতির কার্য শেষ হওয়ার পর তিনি যখন ট্রেনে কর্নেল সহরে তাঁহার বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন, তখন তিনি মনস্থ করিলেন, সান্ধ্যভোজনের পূর্বেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ট্রেনের কক্ষে তিনি একখানি কাগজে নানাবিধ সংখ্যা ও সংকেত লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহযাত্রীরা ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সন্ধ্যা আগমনে সান্ধ্য ভোজনের ঘণ্টা পড়িল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাধান করিতে সমর্থ হইলেন। বেথি আবিষ্কার করিলেন যে, কোটি ডিগ্রী উত্তাপে এবং অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের সহায়ক প্রক্রিয়ায় (Catalytic action) সূর্যের হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি মুক্ত হয়, তাহার দ্বারা সূর্যের বিকিরণজনিত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে পূরণ হইতেছে। কার্বন ও নাইট্রোজেনের কেন্দ্রিক এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বকীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আইনষ্টাইনের নীতি অনুসারে এই প্রক্রিয়ায় ঈষৎ পরিমাণ জড়মান শক্তিতে পরিণত হয়। এই আণবিক প্রক্রিয়ার চক্র পূর্ণ হইতে ৫০ লক্ষ বৎসর লাগে এবং এই চক্র-প্রক্রিয়া সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

সূর্যের ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক জর্জ গ্যামো দেখাইয়াছেন যে, হাইড্রোজেন অপেক্ষা হিলিয়াম সূর্যের তেজ বিকিরণে অধিক বাধা দেয়। সুতরাং সূর্যের অভ্যন্তরে যতবেশী হিলিয়াম উৎপন্ন হইতেছে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে ততই তাপ বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। ইহাতে তেজের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে। সূর্যের তাপ বিকিরণের মাত্রা সেইজন্য ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং $১০^{১০}$ বৎসর পরে যখন সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে তখন সূর্যের তাপ বিকিরণ আরও ২০০ গুণ অধিক হইবে। তখন আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ ফুটন্ত জলের উত্তাপ অপেক্ষা অধিক হইবে; সমুদ্র এবং উপসমুদ্রের জলরাশি বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে এবং বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমাদের এবিষয়ে চিন্তা করিয়া এক্ষণেই নিদ্রার ব্যাঘাত করা উচিত নহে, কারণ এই ভীষণ অবস্থায় পৌঁছিতে পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে। হয়ত উহার পূর্বেই মানুষ উত্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভূগর্ভে আবাসস্থল নির্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিবে, অথবা অন্য কোন বাসোপযোগী গ্রহে পলায়ন

করিয়া জীবন রক্ষা করিবে। যখন সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তখন সূর্য ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিবে এবং দ্রুতহারে তাহার সঙ্কোচন আরম্ভ হইবে। প্রায় ১০,০০৫,০০০,০০০ খৃষ্টাব্দের পরে সূর্যের আলোক ও উত্তাপ বিকিরণের ক্ষমতা বর্তমান অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। কালক্রমে সূর্য আকারে বহু পরিমাণে খর্ব হইয়া অবশেষে ক্ষুদ্রকায় শ্বেত-বামন তারকায় পরিণত হইবে। এই ক্ষুদ্রকায় তারকার ব্যাস আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় সমান হইবে। সেই অবস্থায় সূর্যের গুরুত্ব এত অধিক হইবে যে, ইহার অন্তর্ভুক্ত এক কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমাণ পদার্থের ভার প্রায় ৩০ টন হইবে।

বুধ ও শুক্রগ্রহ

চলুন এবার আমরা সূর্য হইতে ক্রমশ সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বুধ গ্রহে যাত্রা করি। বুধের পৃষ্ঠদেশের একটা অংশ সর্বদাই সূর্যের দিকে ফিরিয়া থাকে। এইজন্য সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই গ্রহটি স্বীয় কক্ষ পরিক্রম করিতে যতটা সময় নেয় ঠিক ততটা সময়েই ইহা নিজের অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে একবার আবর্তন করে। সূর্যের দিকে যে অংশটি দেখা যায় উহার তাপের পরিমাণ ৪১০° সেন্টিগ্রেড। অন্ধকার অংশটির তাপমাত্রা -২১০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এইজন্য বুধগ্রহটির অবস্থা দ্বৈতগুণ বিশিষ্ট। একটি অংশ সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত এবং অন্যটি সর্বাপেক্ষা শীতল। বিজ্ঞানজগতে বুধগ্রহের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান এই যে, উহার কক্ষের নিকটতম বিন্দুর গতির দ্বারা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক মতবাদের তিনটি প্রমাণের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়।

বুধ হইতে আমরা শুক্রগ্রহে যাই। শুক্রগ্রহকে সান্ধ্য তারকা ও প্রভাতী তারকা বলা হয়। সূর্য এবং চন্দ্র ব্যতীত ইহা আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বুধের বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ঘন আচ্ছাদনে পরিবেষ্টিত কিন্তু সেইখানে জলীয় বাষ্প বা অম্লজান নাই।

মঙ্গলগ্রহ

বুধ হইতে চলুন আমরা মঙ্গলগ্রহে যাই। গত শতাব্দীর শেষদিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে মঙ্গল সম্পর্কে জ্যোতিবিদদের মধ্যে বাক্ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। ইটালীয় জ্যোতির্বিদ্ সিয়াপেরিলি এবং আমেরিকান জ্যোতির্বিদ লাউয়েল ঘোষণা করিলেন যে, মঙ্গলের জলস্রোত বা খালগুলি মঙ্গলের বুদ্ধিমান অধিবাসীগণই নির্মাণ করিয়াছে। প্রতিপক্ষদলের মতে তথাকথিত খালগুলি প্রকৃত খাল নয়। সেইগুলি নিরবচ্ছিন্ন সরল রেখাও নয়, বহুসংখ্যক অসংবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা গঠিত মাত্র।

যখন স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসে তখন ইহার দূরত্ব হয় ৩৫,৬০০,০০০মাইল। সেই সময় উহাকে পরীক্ষা করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ। এই গ্রহের পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ লাল অথবা কমলা রঙের এবং আটভাগের তিন ভাগ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ সবুজ বর্ণ।

ইহার উভয় মেরুপ্রদেশ শুভ্রবর্ণের আবরণে আচ্ছাদিত। এই আবরণগুলিকে 'পোলার ক্যাপ' বা মেরুর শিরস্ত্রাণ বলা হয়। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে ঈষৎলাল অংশের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু মেরুর শিরস্ত্রাণের আয়তন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। শীতঋতুর মধ্যভাগে শিরস্ত্রাণের আয়তন সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, আবার গ্রীষ্মের মধ্যভাগে উহার আকার ক্ষুদ্রতম হয়। খুব সম্ভব এই দুটি অংশ বরফে গঠিত এবং গ্রীষ্মের উত্তাপে উহার অনেকটা তরল হইয়া যায়।

সিয়াপেরিলি এবং লাউয়েল উভয়েই প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা মঙ্গলগ্রহে ৪০০টি খাল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় ৫০টি খাল যুগ্ম। তাঁহারা ২০০টি কৃষ্ণাভ স্থান অথবা

মরুস্থান দেখিতে পান। লাউয়েল আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, মঙ্গলের বুদ্ধিমান প্রাণীরা ঐসব খাল নির্মাণ করিয়া মেরুপ্রদেশের হইতে অপেক্ষাকৃত শুষ্কপ্রদেশে জল লইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। লাউয়েল অনুমান করিয়াছিলেন যে, মেরুর শিরস্ত্রাণ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই খালগুলি ক্রমশ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠে। হয়ত জল চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে জলস্রোতের উভয় পার্শ্বে উদ্ভিদ জন্মায়। মঙ্গলগ্রহে যদি বুদ্ধিমান জীব থাকিয়া থাকে তবে তাহারাও আমাদের সাহারা মরুভূমির ভিতর দিয়া প্রবাহিত নীল নদকে একটি কৃষ্ণাভ রেখার মত দেখিতে পাইবে।

অপরপক্ষে আমেরিকার বার্ণার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে কোন জ্যামিতিক সরল রেখা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা দেখিয়াছেন কতকগুলি ক্ষুদ্র অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ রেখা। ফরাসী জ্যোতির্বিদ অ্যাণ্টোক্সিয়াডি, ম্যাণ্ডোরা অবজার-ভেটরি হইতে সবিশেষ পর্যবেক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল প্রণালীগুলি সরল অথবা অভিন্ন নয়, বরং এইগুলিকে আরও সূক্ষ্ম রেখায় বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। এই প্রণালীগুলি যে জলনিকাশের অবক্র কৃত্রিম পথ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না এবং একথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে, এইগুলি অসংবদ্ধ অস্পষ্ট রেখামাত্র।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে কিনা তাহার কোনও সঠিক প্রমাণ নাই। দ্বিপ্রহরে বিষুবরেখার কাছাকাছি উত্তাপ ১০° সেণ্টিগ্রেডের উপরে উঠে এবং মেরু প্রদেশের উত্তাপ প্রায় -৭০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত কমিয়া যায়। মঙ্গলের তাপমাত্রা জীবের প্রাণ ধারণের পক্ষে প্রতিকূল নয়।

মঙ্গলের আলোকের বর্ণালী পরীক্ষা করিয়া এই গ্রহে জীবের অস্তিত্ব বিষয়ক সমস্যাটি সম্প্রতি সমাধান হইয়াছে। ইহার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা অনেক লঘু। বর্ণালী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে খুব অল্পই অম্লজান আছে। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণ এই গ্যাসের অভাবে উন্নত স্তরের জীব মঙ্গলগ্রহে জীবন ধারণ করিতে পারে না। জ্যোতির্বিদেরা মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের ঋতু পরিবর্তন বিষয়ে লাউয়েলের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব মঙ্গলের মলিনাংশে কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। গ্রীষ্মকালে মেরু-শিরস্ত্রাণের আকার হ্রাস পায় এবং বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্পকণা সঞ্চয় করিয়া মলিনাংশগুলি সতেজ হয় এবং শ্যামল বর্ণ ধারণ করে। পরে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বাষ্পের অভাবে উদ্ভিদ শুষ্ক হইয়া ধূসরবর্ণ ধারণ করে।

একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুদূর অতীতে যখন মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অম্লজান ও বাষ্পকণা ছিল এবং তাপমাত্রা অনুকূল ছিল তখন হয়ত এই গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব ছিল। হয়ত কোন কোন খাল শুষ্ক নদীর গর্ভ অথবা জলনিকাশের কৃত্রিম প্রণালী। কিন্তু এসব কেবল কল্পনামাত্র, সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি

এখন আমরা মঙ্গল গ্রহ পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতির দিকে অগ্রসর হই। এই যাত্রাপথে আমরা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সম্মুখীন হইব। এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলির মধ্যে কোনটিরও ব্যাসের পরিমাণ ৪৮০ মাইলের বেশী নয়। সূর্য হইতে বৃহস্পতিতে পৌঁছাইতে আমাদের ৪৩ মিনিট লাগিবে। বৃহস্পতি সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ। উহার ব্যাসের পরিমাণ ৮৬,৭২০ মাইল এবং ইহা পৃথিবী হইতে ৩১৭ গুণ অধিক ভারী। ইহার বায়ুমণ্ডল অতীব ঘন। লেখক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১৯ কিলোমিটার। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন পাওয়া যায়।

এপর্যন্ত বৃহস্পতির ১১টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত

হইয়াছে। বৃহস্পতি সৌরজগতের গ্রহরাজ এবং অন্য এক কারণে ইদানীং ইহার গুরত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি অণু সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। ইহার মধ্যে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। কেন্দ্রিক, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। জমাট বা তরল পদার্থের অণুগুলি পাশাপাশি সংবদ্ধ বলিয়াই এই অবস্থায় জমাট ও তরল পদার্থের সঙ্কোচন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের অন্ততঃ ১৫ কোটি গুণ চাপ দ্বারা জমাট ও তরল পদার্থের অণুগুলি চূর্ণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রিকের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিবে। চাপ যতই বাড়িতে থাকিবে আণবিক কেন্দ্রিকগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব এবং ইলেকট্রন ও কেন্দ্রিকের মধ্যের দূরত্বও তত কমিতে থাকিবে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের দুইকোটি গুণ মাত্র। সেইজন্য পৃথিবীর পরীক্ষাগারে ১৫ কোটি গুণ চাপের বল উৎপন্ন করা অসম্ভব। এই কারণে আমরা বলিয়া থাকি যে, জমাট ও তরল পদার্থের সঙ্কোচন অসম্ভব। বৃহস্পতির কেন্দ্রস্থলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় ১৫ কোটি গুণ। ঐ চাপের পরিমাণ সংকট-সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, কিন্তু তাহা অতিক্রম করে নাই। বৃহস্পতি সেইজন্য অসঙ্কুচিত অবস্থায় আছে। বৃহস্পতির অপেক্ষা জড়মান বেশী এইরূপ জ্যোতিষ্ক যদি জমাট ও শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ১৫ কোটি গুণের চাপের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং ইহার অণুগুলি চূর্ণ হইতে আরম্ভ করিবে এবং ইহার আয়তন কমিতে থাকিবে। জড়মান যত বেশী হইবে চাপও তত অধিক হইবে এবং আয়তন আরও কমিয়া যাইবে। সেইজন্য বৃহস্পতির অপেক্ষা বড় আয়তনের শীতল, জমাট জ্যোতিষ্ক এই মহান বিশ্বে সম্ভব নয়। সূর্য যখন শীতল ও জমাট হইয়া যাইবে তখন ইহার আয়তনের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় সমান হইবে। বৃহস্পতির জড়মান অপেক্ষা যে-জ্যোতিষ্কের জড়মান যত অধিক হইবে তাহার আয়তন ততই কম হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই সংক্রান্ত একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুভার জ্যোতিষ্কের সংকোচনের ফলে তাহার কৌণিকগতি অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। অবশেষে ইহা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে কিংবা বিস্ফোরণের ফলে উহা নোভা অথবা সুপার-নোভাতে রূপান্তরিত হইবে।

অবশ্য বৃহস্পতির জড়মান অপেক্ষা কম যে-জ্যোতিষ্কগুলির জড়মান তাহারা যখন শীতল ও জমাট হইবে তখন যে জ্যোতিষ্কগুলির জড়মান অপেক্ষাকৃত বেশী সেইগুলির আয়তনও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইবে।

বলয়ধারী শনি

বৃহস্পতি ছাড়িয়া এক্ষণে আমরা শনিগ্রহে যাই। আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক আমাদের নয়নগোচর হয় তাহাদের মধ্যে বলয়ধারী শনি দেখিতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। বিখ্যাত জ্যোতিবিদ রচি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি কোনও গ্রহ, উপগ্রহের কেন্দ্র হইতে গ্রহটির ২·৪৪ গুণ ব্যাসার্ধ পরিমিত দূরত্বের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে উপগ্রহটি অসংখ্য ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত হইয়া বলয়াকারে পরিণত হইয়া গ্রহটিকে বেষ্টন করে। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, চন্দ্র এক্ষণে পৃথিবী হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে।

এক নাক্ষত্রদিবসে আমাদের পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর কৌণিক গতি এক্ষণে হ্রাস পাইতেছে এবং সেইজন্য নাক্ষত্রদিবস দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হই-

তেছে। যতদিন এই নাক্ষত্রদিবস দীর্ঘ হইতে থাকিবে ততদিন চন্দ্র পৃথিবী হইতে আরও দূরে অপসরণ করিতে থাকিবে। অতঃপর যখন নাক্ষত্রদিবস চান্দ্র মাসের সমান হইবে তখন পৃথিবীর কৌণিক গতি পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে এবং চন্দ্র পুনরায় পৃথিবীর নিকট আসিতে আরম্ভ করিবে। যখন পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে চন্দ্র ১০ হাজার মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে তখন ইহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বলয়াকার ধারণ করিবে।

ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো

চলুন এইবার আমরা শনি পরিত্যাগ করিয়া ইউরেনাস (বারুণী), নেপচুন (বরুণ) ও প্লুটো (যম) পরিভ্রমণ করিতে যাই। ইউরেনাস ও নেপচুনের জড়মান, ঘনত্ব, আয়তন ও প্রাকৃতিক গঠন প্রায় একই রকম। হার্সেল ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন।

ইংরেজ জ্যোতির্বিদ অ্যাডাম্‌স্‌ ও ফরাসী বিজ্ঞানী লেভেরিয়ার প্রায় একই সময়ে গাণিতিক গবেষণায় নেপচুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। জার্মান জ্যোতির্বিদ যোহান গল ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই গ্রহটি আবিষ্কার করেন। নেপচুনের পৃষ্ঠদেশে সূর্যরশ্মির প্রগাঢ়তা পৃথিবীর উপর পূর্ণিমার চন্দ্ররশ্মির প্রগাঢ়তা হইতে ৫০০ গুণ অধিক। এবার আমরা নেপচুন হইতে প্লুটো গ্রহে গমন করি। প্লুটোতে পৌঁছিতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগিবে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়। এইবার আমরা সৌরমণ্ডলের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইব। এক্ষণে আসুন আমরা আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসি। আশা করি, আমরা সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

"পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর-দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

মরক্কো লেদার

শ্রীসুশীলরঞ্জন সরকার

মুসলমান বাদশাগণের শিল্পপ্রীতির কথা আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পারি। তাদের কয়েকজনের আমলে শিল্পকলা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। মোগল সম্রাট শাহজাহানের কীর্তিবিমণ্ডিত তাজমহল আজিও জগতের বিস্ময়! স্পেনদেশে সিয়েরা নেভেডা গিরিশ্রেণীর পাদমূলে ভেগা প্রান্তরের উপকূলে মুরযুগের কীর্তিমুকুট বিশাল মর্মর প্রাসাদ 'আল্‌হামরা' নির্মিত হয়েছিল। এই অপূর্ব শিল্প চাতুর্যের নিদর্শনটির ধ্বংসাবশেষ আজিও মুরসম্রাটগণের শিল্প-প্রীতির কথা সগর্বে ঘোষণা করছে। সম্রাটগণের এই শিল্পানুরাগ দেশের শিল্পীজনকে নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে প্রেরণা জোগাতো—আর তাতেই দেশ শিল্পসমৃদ্ধিতে ভরে উঠতো।

একসময়ে রোমানগণও উন্নতির গৌরবময় শীর্ষে আরোহণ করেছিল। শিল্পের বিভিন্নদিকে তাহার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। চর্মশিল্পে বিশেষতঃ রংগীন চামড়া প্রস্তুত কার্যে তারা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। এই শিল্প রোমসম্রাটগণের সমাদর লাভ করেছিল, আর জনসাধারণের কাছ থেকে পেয়েছিল অজস্র প্রশংসা। রোমান রমণীগণের পদযুগল কত সুদৃশ্য সৌখীন চর্মপাদুকায় আবৃত থাকতো! কিন্তু রোম সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হবার সংগে সংগে এই শিল্প য়ুরোপ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল—তবে জেগে উঠেছিল ভূমধ্য সাগরের অপরতীরে মরক্কো দেশে, মুর-সুলতান গণের রাজত্বে। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আজিও দাঁড়িয়ে আছে এই ছোট্ট দেশটি। সেকালে এই দেশে রংগীন, সৌখীন চর্ম-শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল, অধিবাসীরা হয়ে উঠেছিল সুদক্ষ। সেই সময়ে মরক্কোবাসীগণ স্পেনদেশ আক্রমণ করে' অধিকার করে নেয়। দলে দলে মরক্কোর অধিবাসীগণ স্পেনে এসে বসবাস সুরু করে। তাদের শিল্প সংস্কৃতির সংস্পর্শে এস স্পেনবাসীগণ শিখে নিয়েছিল কি করে ঐ সুদৃশ্য চামড়া তৈরী করা যায়। ধীরে ধীরে এই শিল্পে তারা সুনিপুণ হয়ে উঠলো, দেশবিদেশে সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। য়ুরোপ ফিরে পেলো তার হারাণো শিল্প; তবে তাতে মরক্কোবাসীদের নাম অক্ষয় অমর হয়ে রইলো। মরক্কো লেদার তখন থেকেই পরিচিত হলো জগতে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চল থেকেই এই মূল্যবান মরক্কো চামড়া আমদানী করতো য়ুরোপের অন্যান্য দেশ। কি রকম ভাবে এই চামড়া তৈরী হতো তা' প্রথম জানা যায় ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে। তার কয়েক বছর পরে ফরাসীদেশের প্যারী নগরীতে সর্বপ্রথম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করবার জন্যে মরক্কো লেদার তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলো। তারপর একে একে অনেক ট্যানারী গড়ে উঠলো এই শিল্পকে অবলম্বন করে য়ুরোপ, আমেরিকার বিভিন্নস্থানে। শতাধিক বৎসর পূর্বে এই শিল্পের কিরকম অবস্থা ছিল তা' একজন রসায়নবিদের বিবরণ পড়ে জানতে পারি। এখানে যে চিত্রটি সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে সে যুগের মরক্কো চামড়া কি করে ট্যান করতো তার একটি নিখুঁৎ রূপ ফুটে উঠেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব থাকলেও পন্থা তাদের অভিনব ছিল স্বীকার করতে হবে। শোনা যায় স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি জায়গা থেকে কাঁচামাল আমদানী হতো।

একশ' বছর আগে মরক্কো লেদার এই রকমভাবে ট্যান করা হতো। স্যুমাক পাতার রস মাটির ফঁদেলের সাহায্যে ব্যাগের মধ্যে ভরা হচ্ছে। কতকগুলো ব্যাগ চৌবাচ্চায় ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

এই কাঁচামাল হলো ছাগলের চামড়া—এথেকেই আসল মরক্কো লেদার তৈরী হয়। ভেড়ার চামড়া ব্যবহার করলে নকল মরক্কো ছাপ পাবে। কাঁচা চামড়া জলে ভিজিয়ে বেশ নরম হয়ে গেলে অতিরিক্ত মাংস চেঁচে ফেলতো—তার সংগে চর্বিও খানিকটা চলে যেতো। তারপর ক্রমবর্ধমান শক্তিসম্পন্ন চুণের জলে ডুবিয়ে রাখতো কয়েকদিন ঠিক এখনকার মতই। লোমের গোড়া আল্‌গা হয়ে গেলে চুণের জল থেকে চামড়া তুলে নিয়ে লোমশূন্য করে ফেলতো। এরপর চামড়া থেকে সমস্তটা চুণ তাড়িয়ে দিত। কারণ একটু চুণ অবশিষ্ট থাকলেও রং করবার সময় চামড়ায় দাগ ধরে যাবে। এই কাজ সমাধা হতো একটি পিপের মত কাঠের পাত্রে, যাকে নিজ অক্ষের চারদিকে ঘোরানো যেতো এবং যার উন্নত সংস্করণ হলো আধুনিক বিদ্যুৎচালিত ড্রাম। ওই পিপের মধ্যে কতকগুলো কাঠের কীলক লাগানো থাকতো যা চামড়া থেকে চুণ তাড়াতে সাহায্য করতো। এবার চামড়া নরম করবার জন্যে উৎসেক ক্রিয়া করা হতো। তখনকার দিনে একাজে যে বেট্ ব্যবহার করা হতো তা একেবারে প্রাকৃতিক। কুকুর বা পাখীর বিষ্ঠাই হলো আদিম বেট্। অনেকে অবশ্য মধু বা ডুমুর ফলের কাথ একটু লবণ সহযোগে ব্যবহার করতো। বেট্ করা হয়ে গেলে চামড়াগুলোর ভালমন্দ বাছাই করা হতো। যেগুলো সবচেয়ে ভাল সেগুলোতে লাল মরক্কো তৈয়ারী হতো আর বাকীসব অন্যান্য রঙের করতো।

লাল মরক্কোর আদর বেশী। প্রস্তুতে সামান্য তফাৎ আছে, আগে রং করে পরে ট্যান বা পাকা করা হতো। প্রথমেই দু-দুটো করে বেট্-করা চামড়া নিয়ে দানাপিঠ বাইরে রেখে সেলাই করে ফেলতো বেশ ঘন করে যাতে হাওয়া ভর্তি করলে ফুলে একটা ব্যাগ বা থলে তৈরী হয়। রং করবার আগে একটা দ্রবণে চামড়াগুলো ডুবিয়ে নিতো যার গুণে চামড়ায় রংটা ভালভাবে ধরতো। এই প্রক্রিয়াকে বলে মর্‌ড্যান্টিং। ফটকিরি বা টিনক্লোরাইড প্রচুর পরিমাণ অল্প গরমজলে গুলে তাতে ঐ ব্যাগগুলো ভিজিয়ে নেওয়া

হতো। তারপর সেলাই কেটে পরপর সাজিয়ে একটা অধ নলাকৃতি ফাঁপা বীমের ওপর রেখে বিশেষ ধরণের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভোঁতা ছুরি দিয়ে পিষে চামড়া থেকে অতিরিক্ত মরৃভ্যানৃট্‌ বের করে ফেলতো। এরপর আবার সেলাই করে হাওয়া ভর্তি করে রঙের চৌবাচ্চায় ফেলে দিত। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ওই রকম একটি রং-ভর্তি চৌবাচ্চায় ব্যাগগুলো ভাসিয়ে দিত। কোচীন দেশীয় রং-ই ব্যবহার হতো বেশী, কারণ রংটা তাতে উজ্জ্বল হতো। প্রতিডজন চামড়ায় আকার অনুযায়ী ১২ থেকে ১৬ আউন্স রং দেওয়া হতো। দানা দানা রং ভাল করে গুঁড়ো করে নিয়ে জলে গুলে খানিকটা ক্রিম অফ্‌ টার্‌টার্‌ মিশিয়ে একটি পাত্রে গরম করে ফুটিয়ে নিতো, পরে ছেঁকে নিয়ে অর্ধেকটা প্রথমে যোগ করতো। যখন দেখা যেতো সমস্ত রংটা নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন বাকীটা যোগ করা হতো। রঙের জলে চামড়াগুলো ভাসিয়ে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করতো যতক্ষণ না সমস্ত রংটা শোষণ করে নিচ্ছে। তারপর থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা হতো। এবার হবে ট্যানিং; এতে গাছ করবে সাহায্য। যেমন এখন ক্রোম চামড়া তৈরী করতে হলে করা হয় ক্রোমট্যানিং, স্যাময লেদার করতে অফেনট্যানিং, তেমনি এর বেলায় করা হতো ভেজিটেবল ট্যানিং। স্যুমাক পাতাই মরক্কো চামড়া তৈরী করতে সবচেয়ে উপযোগী, তাই স্যুমাক পাতার গুঁড়ো খানিকটা ব্যাগের মধ্যে পুরে দিত, সংগে খানিকটা স্যুমাক পাতার ক্বাথও দিত। তারপর ব্যাগ হাওয়া ভর্তি করে ছবিতে যেমন আঁকা আছে ওই রকম একটি চৌবাচ্চায় স্যুমাক পাতার রসে ভাসিয়ে দিত। যখন মনে হতো ব্যাগের ভিতরের দ্রব্য সব ফুরিয়ে গেছে, তখন তুলে নিয়ে মুখ খুলে খানিকটা ঘন স্যুমাক পাতার রস ঢেলে মুখ বন্ধ করে আবার ভাসিয়ে দিতো। যতক্ষণ না সমস্তটা ট্যানিন চামড়ার সংগে সংযুক্ত হয়ে পাকা করে শোষিত হচ্ছে, ততক্ষণ ব্যাগগুলো চালু রাখা হতো। ট্যান হয়ে গেলে ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে সমস্তটা রস ঝরে গেলে সেলাই কেটে ঠাণ্ডা জলে বেশ ভাল করে ধুয়ে নিতো যাতে ধুলোবালি সব চলে যায়। তারপর আবার বীমের ওপর রেখে ভোঁতা ছুরি দিয়ে দলাই করা হতো যাতে চামড়া সমতল এবং দানাস্তর ক্লেদ-মুক্ত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। এরপর চামড়া শুকিয়ে নিতো, তার ফলে অনেক সময় চামড়া আবার কুঁচকে যেতো; এ বিষয়ে এখন থেকে সাবধান না হলে তৈয়ারী চামড়া কাজে লাগা-বার পর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বিকৃত হয়ে পড়তে পারে তাই আরো কয়েকবার বিশেষভাবে দলাই করা হতো, যার ফলে চামড়ার ছোট ছোট তন্তুগুলো ভেঙ্গে যেতো। এবার শুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ডিজাই-নের দানা তোলা হতো হাতে বা মেসিনে। আরও কতকগুলো ছোটখাট কায়দা আছে যাতে চামড়া উৎকৃষ্টতর হতো। অন্যান্য রঙের মরক্কো করতে প্রথমে ট্যান করে পরে রং করা হতো। এমন প্রক্রিয়া জানা ছিল যাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্যান করে দিতে পারতো।

আধুনিক যুগে এই সব প্রণালীর আরও উন্নতি হয়েছে। চর্ম-রসায়নের উন্নততর গবেষণার ফলে অনেক অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষেও কিছু কিছু মরক্কো চামড়া তৈরী হচ্ছে, তবে খুব উৎকৃষ্ট নয়, কারণ প্রয়োজনীয় স্যুমাক পাতা এখানে জন্মায় না। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে কাজ হাঁসিল হচ্ছে। এখন চুণের সংগে লোম তুলে ফেলতে সাহায্য করে সোডি-য়াম সালফাইড। আর চামড়া বেট্‌ করা হয়

কৃত্রিম বেট্ দিয়ে; গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে প্রস্তুত 'প্যাংক্রিওল, 'অরোপোন' বেট্ বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে স্যুমাক পাতার অভাবে বাবুল, সোনালী বা আভারাম গাছের ছালের রস দিয়ে ট্যান করা হয়। ছালের রস ভর্তি চৌবাচ্চায় চামড়াগুলো ঝুলিয়ে বা ডুবিয়ে রাখা হয়। ট্যান হয়ে গেলে রং ও চেহারার খানিকটা উন্নতির জন্যে হরিতকী চূর্ণের রসে তিল তেল মাখিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর রং করে নেওয়া হয়। বিদ্যুৎ চালিত ড্রামে এই কাজ সারা হয়। ১৫ মিঃ অন্তর ডুবাবে সমস্তটা রং যোগ করা হয় ড্রামে; ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপযুক্ত জলে রং করা হয়। রং করা হয়ে গেলে ঠাণ্ডা জলে কয়েকবার ধুয়ে পালিশ লাগিয়ে গ্লেজ্ করে নেওয়া হয়। এখন ভিজে কাপড় দিয়ে চামড়ার ওপর ঘষলে রং উঠে যাবে, তাই শেলাক অথবা নাইট্রোসেলুলোজ বার্নিশ স্প্রে করে দেওয়া হয় চামড়ার ওপর। এর পর ঘষলে আর রং ওঠে না। এই বার্নিশ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এর পর দানা তোলা হয়। মরক্কোর দাম অনেকটা এই দানা তোলার সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। তবে আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেসিনেই একাজ সমাধা হয়। আগামী দিনে ভারতে এই শিল্প খুব বেশী সাফল্য লাভ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ, স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্রনির্ম্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

ইউরেনিয়াম ও পরমাণু শক্তির ব্যবহার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিগত যুদ্ধের অবসান হইতেই একথা প্রচারিত হইয়াছে যে, পরমাণু বোমা নির্মাণের যথার্থ উপযোগী উপকরণ নৈসর্গিক ইউরেনিয়াম (U২৩৮) নহে, উহার লঘু সমপদ অ্যাকটিনো ইউরেনিয়াম (U২৩৫)। এই সমপদ মৌলের পৃথক সত্তা নিসর্গে দেখা যায় না। ভারী সমপদের (U২৩৮) সহিত উহা অতি সামান্য মাত্রায় মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু U২৩৫ এ নিউট্রন প্রবেশানন্তর যে বিখণ্ডন ও স্বতঃ নিউট্রন প্রজনন আরম্ভ হয়, তাহা কখনই U২৩৮ হইতে আশা করা যায় না। কারণ বিখণ্ডনক্ষম নিউট্রনের অধিকাংশই ভারী U২৩৮ পরমাণু নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ হইয়া গামা-রশ্মি বিকিরণেই সাহায্য করিবে মাত্র; নিজ নিজ কার্যকারিতা পূর্ণরূপে প্রদর্শনের কোন সুযোগই তাহারা পাইবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ সমপদ U২৩৫কে নিউট্রন সহজেই বিখণ্ডনে সমর্থ হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিপ্রাপ্ত নিউট্রনগুলি রক্ত-বীজের বংশের ন্যায় জনকের কাজের সহায়ক হয়। সুতরাং একটি মাত্র নিউট্রন U২৩৫ পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইলেই এক আকস্মিক বিস্ফোরণ সংঘটিত হইবে।

আর তাহা হইলে একথাও মানিতে হয় যে, কোন কালেই বিশুদ্ধ U২৩৫ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবেনা। কারণ ব্যোমরশ্মি, নৈসর্গিক তেজস্ক্রিয়া ও আরও অনেক প্রকারে উৎপন্ন হইয়া যে-সকল নিউট্রন আকাশে-বাতাসে বিচরণ করে তাহাদেরই কোন একটি, সংগৃহীত বিশোধিত U২৩৫ পরমাণুর আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া দিবে। সুতরাং ব্যাপার এই দাঁড়াইতেছে যে, স্বতঃ নিউট্রন-প্রজননক্রিয়া প্রবর্তিত করিতে হইলে, বিখণ্ডনের ফলে সমুৎপন্ন নিউট্রনগুলি সামান্য গামারশ্মি বিকিরণের হেতু স্বরূপেই নিজ নিজ জীবনধারার অবসান ঘটাইবে না কিংবা নিউক্লিয়াসের বিখণ্ডন সাধন না করিয়া পদার্থের অভ্যন্তর হইতে বাহিরেও চলিয়া আসিবে না। নিউট্রনের পক্ষে কার্যকর না হইয়া পদার্থের বাহিরে চলিয়া আসার সম্ভাবনা দূর করিতে হইলে বিখণ্ডনে ব্যবহৃত পদার্থখণ্ডের এক ন্যূনতম আয়তন লইতে হইবে যাহাতে ঐ আয়তনের ভিতরে স্বতঃ-প্রজননক্রিয়ার শৃংখল প্রসারিত হইতে পারে। প্রজনন মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কোন নিউক্লিয়াসে প্রহৃত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত চলার পথকে যদি নিউট্রনের অবাধ-গতি-পথ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ পথ বিখণ্ডনে প্রযুক্ত বস্তুখণ্ডের আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হওয়া প্রয়োজন। নতুবা নিউট্রন কোন নিউক্লিয়াসের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করার পূর্বেই বাহিরে চলিয়া আসিবে। সুতরাং বৃহদায়তন বস্তুতেই স্বতঃ-প্রজননক্রিয়া প্রবর্তিত হইয়া অবাধ বিখণ্ডন চালু হইতে পারে। হিসাবে পাওয়া যায়, ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম খণ্ডের দৈর্ঘ্য ১০ সেন্টিমিটার হইলেই উহা কার্যোপযোগী হইতে পারে। তবে এজন্য প্রয়োজন ১০।২০ হাজার গ্র্যাম্ ইউরেনিয়াম (U২৩৫)। এই দুষ্প্রাপ্য পদার্থ এত অধিক পরিমাণে সংগৃহীত করিতে না পারিলেও আর এক উপায়ে নিউট্রনের বহিরাগমনের সম্ভাবনা হ্রাস করা যাইতে পারে। এজন্য মূল পদার্থকে অন্য এক অকর্মণ্য পদার্থ দ্বারা সম্পুটিত করিতে হইবে। শেষোক্ত পদার্থকে অকর্মণ্য বলিতেছি এই জন্য যে, তাহা বিখণ্ডনপ্রবণ নহে; কিন্তু উহার গাত্রে প্রহৃত হইলে পলায়নপর নিউট্রন

প্রতিফলিত ও ভিতরের মূল পদার্থে প্রত্যাগমন করিতে পারে। ঐ প্রকারে ব্যবহৃত প্রতি-ফলক পদার্থপুটকে ব্যবহারিক ভাষায় রিফ্লেক্টর বা ট্যাম্পার বলা হয়।

অনাহূত আগন্তুক নিউট্রনের আক্রমণ হইতে বিখণ্ডনোপযোগী পদার্থকে রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ ক্যাড্‌মিয়াম নির্মিত আধার ব্যবহৃত হয়। আধারগুলি আবার জলে নিমজ্জমান রাখা হয়। কারণ জলের ভিতর দিয়া গমনশীল নিউট্রন অতিশয় মন্দগতি ও কাজের অনুপযুক্ত হওয়ায় সহজেই ক্যাডমিয়ামে শোষিত হইয়া যায়।

নৈসর্গিক ইউরেনিয়াম হইতে U২৩৫ পৃথক করা অতিশয় কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সেজন্য মিশ্রণে বিদ্যমান থাকিলে U২৩৮ যাহাতে নিউট্রন-প্রজনন-শৃংখল গঠনে বিশেষ বাধা না জন্মাইতে পারে তাহারও উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে ইউরেনিয়ামের এই দুই সমপদের উপর নিউট্রনের ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এই দুই পদার্থের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, U২৩৫ এর নিউক্লিয়াস মন্দগতি নিউট্রন আবদ্ধ করিতে গিয়া সহজেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়; পক্ষান্তরে U২৩৮ নিউক্লিয়াস ঐ প্রকার নিউট্রনের ক্রিয়ায় গুরুতর সমপদ U২৩৯ এ পরিণত হয় মাত্র। এ কথাও জানা আছে যে, নিউট্রনধরা বিদ্যায় U২৩৫ই সমধিক পারদর্শী। দুই সমপদের নৈসর্গিক মিশ্রণের অভ্যন্তরে নিউট্রন প্রচলিত করিলে পরিমাণে স্বল্পতর হইলেও U২৩৫ নিউক্লিয়াসই অধিক সংখ্যক নিউট্রন ধরিয়া বসে। সুতরাং মৃদুগতি নিউট্রন ব্যবহার করিলে U২৩৮ এর সান্নিধ্যে থাকিলেও U২৩৫ নিউক্লিয়াস বিখণ্ডনের ব্যত্যয় হয় না।

কিন্তু অসুবিধা আসে তখনই, যখন আমরা বিখণ্ডনজনিত নিউট্রনের কথা চিন্তা করি। ইহারা ত্বরিদ্গতি ও সেইজন্য গুরু সমপদ U২৩৮ উহাদিগকে সহজে ধরে। সাধারণতঃ যে সকল নিউট্রনের গতিজনিত শক্তির পরিমাণ ২৫ $\times$ ১০$^{-৬}$ Mev. তাহারাই U২৩৮ নিউক্লিয়াসের অতি প্রিয়। এতদপেক্ষা দ্রুত বা মৃদুগতি নিউট্রন উহার পাশ দিয়া প্রায় অবাধে চলিয়া যায়; কিন্তু নিউট্রনের শক্তি (২৪ হইতে ২৬) $\times$ ১০$^{-৬}$ Mev. এর মধ্যে হইলেই U২৩৮ নিউক্লিয়াস তাহাকে গ্রাস করে। আবার একথাও ভাবিতে হইবে যে, কোন একটি নিউক্লিয়াস বিখণ্ডন-জনিত নিউট্রনের গতিবেগ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া শক্তির পরিমাণ •'০৪ $\times$ ১০$^{-৬}$ Mev. দাঁড়াইলেই উহা অন্য এক নিউক্লিয়াস বিখণ্ডনে সক্ষম হইতে পারে ও এই গতিমান্দ্য সাধন প্রক্রিয়ায় কোন এক সময়ে নিউট্রনটির শক্তি উপরে বর্ণিত বিশিষ্ট শক্তির সমতুল্য হইলেই উহার U২৩৮ নিউক্লিয়াসের কবলে পতিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। এই কারণেই নৈসর্গিক ইউ-রেনিয়ামে নিউট্রনের স্বতঃপ্রজনন-শৃংখল প্রব-র্তিত হইতে পারে না। তবে যদি অন্য কোন উপায়ে নিউট্রনের গতিমান্দ্য সাধনে উক্ত বিশিষ্ট গতিবেগকে এড়ান যায়, তাহা হইলেই প্রার্থিত ফল লাভ ঘটিতে পারে। ইহার এক উপায়, অতি দ্রুত গতিমান্দ্য সাধন। তাহা হইলে পরিবর্তনধারায় উক্ত বিশিষ্ট শক্তি ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় নিউট্রনের U২৩৮-এর গ্রাসে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে দাঁড়াইবে।

নিউট্রনের গতিমান্দ্য বিধানের এক উপায় পূর্বে কথিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পরমাণুঅংক বিশিষ্ট কোন বস্তুর ভিতরে পরিচালিত করিলে, বারবার স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের পরিণামে নিউ-ট্রনের গতিবেগ হ্রাস পাইতে থাকে। এই কার্যের যথার্থ উপযোগী বস্তু হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বস্তুর সাধারণ নাম মডারেটার। কিন্তু উল্লিখিত দুই মডা-

রেটারই গ্যাসীয় বিধায় সাধারণ জল বা ভারী জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহাতে অসুবিধা ঘটে, অপর অপ্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেনকে লইয়া।

ফের্মির মতে কার্বন ও সেই বংশজ গ্র্যাফাইট মডারেটার হিসাবে উভয় প্রকার জল অপেক্ষা যোগ্যতর। কার্বনের ভিতরে ৪০ সেন্টিমিটার চলিলেই নিউট্রনের যথোপযুক্ত গতিমান্দ্য ঘটিয়া থাকে। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে রুশীয় বিজ্ঞানী জেল্‌ডোভিচ্ এবং লিউস্কা খারিটোন সর্বপ্রথমে হিসাব করিয়া দেখান যে, জলে মিশ্রিত নৈসর্গিক ইউরেনিয়ামে নিউট্রন-প্রজননক্রিয়া মাত্র ০'৭ অংশ বর্ধিত হয়, অর্থাৎ প্রতি দফা জল নিউট্রন জনকের সন্তানের মধ্যে ৭টি পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ঠিক আশানুরূপ ফল বলা যায় না। আরও ভাল ফলের আশায় গবেষণা চলিতে থাকে ও শীঘ্রই ফের্মি ও জিলার্ড প্রস্তাব করিলেন যে, ইউরেনিয়ামের সঙ্গে মডারেটারের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ (যেমন জলের সঙ্গে হয়) অপেক্ষা অধিক পরিমিত মডারেটারের ভিতর স্থানে স্থানে ইউরেনিয়াম কণা জাফরির ন্যায় সজ্জিত করিয়া লইলে ব্যবস্থাটি অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এই প্রকার সজ্জার নাম মডারেটার ল্যাটিস্। এই ল্যাটিস সাহায্যে ইউরেনিয়ামে স্বতঃ নিউট্রন প্রজনন-শৃংখল সংগঠন সুসাধ্য হয়।

১৯৪২ খৃঃ অব্দে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সংগোপনে ফের্মি মডারেটার ল্যাটিস লইয়া প্রথম পরীক্ষা করেন। গ্র্যাফাইট নির্মিত ইট স্তরে স্তরে সাজাইয়া ও তাহাদের ফাঁকে যথাবিহিত স্থানে ইউরেনিয়াম কণা সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি একটি সুবৃহৎ চেপ্টা গোলক বা স্তূপ প্রস্তুত করেন। ইহার অভ্যন্তর হইতে কোন নিউট্রনের বাহিরে চলিয়া আসার সম্ভাবনা ছিল না। পরীক্ষার ফলে সাব্যস্ত হয় যে, স্তূপের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন নিউট্রনের কার্য-কুশলতা ও পরমাণু হইতে প্রকট শক্তি সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। তখনই প্রশ্ন আসে, স্তূপের সেই আয়তন নির্ধারণের, যাহাতে প্রকট শক্তি আয়ত্তে রাখা যায়। কারণ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে শক্তির আকস্মিক বিকাশে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। এ জন্য ফের্মি রেগুলেটার হিসাবে ক্যাডমিয়াম বা বোরন দণ্ড পূর্বোক্ত ইষ্টকস্তূপে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহারা অনেক নিউট্রন শোষণ করিয়া সমগ্র ক্রিয়াটি আয়ত্তে রাখিতে সাহায্য করে। ফের্মি এই প্রকার স্তূপ সাহায্যে কোন দুর্ঘটনা না ঘটাইয়া সেকেণ্ডে প্রায় ২০০ ওয়াট শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হন।

যাহা হউক এইরূপ স্তূপের সাহায্যে U২৩৫ এর সুপ্ত শক্তির অধিকাংশই জাগাইয়া তোলা সম্ভবপর হইলেও তা থেকে সকল কাজে সর্বদা শক্তি-ভাণ্ডার রূপে ব্যবহার করা চলেনা। ফের্মির স্তূপ নির্মাণে প্রয়োজন বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট শত শত টন, ইউরেনিয়ামও ৬০।৭০ টন। সেই বিবেচনায় স্তূপ একটি ঘনীভূত শক্তির উৎস। ইহাতে উৎপন্ন তাপই যথাসম্ভব কাজে লাগান যায় না। কারণ, স্তূপের উষ্ণতা কয়েক শত ডিগ্রীর অধিক বাড়িতে দেওয়া নিরাপদ নহে বলিয়াই ইহার তাপকে কোন যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা লাভজনক হয় না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সামান্য পরমাণুর অন্তর্নিহিত অচিন্ত্য শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও যথোচিত ব্যবহারই আমাদের কাম্য। অল্প পরিমিত বস্তুর সবটুকু শক্তি ব্যবহারে লাগাইতে পারার চেষ্টাই কর্তব্য।

সুতরাং ফের্মির স্তূপ বিজ্ঞানীর অধ্যবসায়ের নিদর্শন স্বরূপ হইলেও ইহা কোন বিশেষ কাজের উপযোগী নহে। তবে অন্য এক অভাবনীয় প্রকারে ইহার উপযোগীতা উপেক্ষনীয় নহে। এই স্তূপে সকল নিউট্রনই U২৩৫ নিউক্লিয়াস বিশ্লেষণে প্রযুক্ত হইবে, তাহা নহে। কিছু কিছু বাহিরে চলিয়া আসিবে ও কিছু মডারেটার বা

U২৩৮ নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। মডারেটারের কার্বন নিউক্লিয়াস নিউট্রন গ্রহণের ফলে তাহারই এক গুরুতর সমপদে (পরমাণু ভার-১৩) পরিণত হইবে। একই প্রকার ক্রিয়ার ফলে U২৩৮ একটি গুরুতর সমপদের U২৩৯ জন্মদান করিবে। এই নিউক্লিয়াস অতিশয় অস্থিরবস্থ। কারণ উহার প্রোটন সংখ্যার তুলনায় নিউট্রন সংখ্যা অত্যধিক। সেই কারণেই সাম্য স্থাপন উদ্দেশ্যে দুইটি নিউট্রন একে একে ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে পরিণত হয়। প্রথম ইলেকট্রনটি বাহির হয় প্রায় ২৩ মিনিট পর ও দ্বিতীয়টি ৫৪ ঘণ্টা পর। ইহার ফলে নিউক্লিয়াসের পরিচয় জ্ঞাপক পরমাণুঅংক ৯২ হইতে প্রথমে ৯৩ ও পরে ৯৪ হইবে। ইউরেনিয়াম অতীত এই দুই মৌল নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম নামে খ্যাতি লাভ করিলেও, নিসর্গে উহাদের স্থান নাই। তবে উহাদের উক্তরূপে জন্ম ১৯০৫ খৃঃ অব্দে ফের্মি অনুমান করিয়াছিলেন। তেজস্ক্রিয়ার বিচারে প্লুটোনিয়াম, ইউরেনিয়াম কিংবা থোরিয়ামের সমতুল্য। ইহা লুপ্ত হইতে হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবে ও আলফা কণা ত্যাগ করিয়া ইহার প্রত্যেক নিউক্লিয়াস U২৩৫ নিউক্লিয়াসে পরিণত হইবে। এই বিবেচনায় ফের্মি-স্তূপের দান সামান্য নহে। কারণ U২৩৯ এর বিখণ্ডনপ্রবণতা U২৩৫ হইতেও সমধিক মনে হয়। সুতরাং স্তূপের আবিষ্ক্রিয়ার পর নৈসর্গিক U২৩৮ হইতে U২৩৫ পৃথকীকরণের প্রয়োজন রহিল না। ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে আরও উন্নত ধরণে ক্লিণ্টন স্তূপ নির্মিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ঘনীভূত প্রচণ্ড শক্তির ব্যবহার কি প্রকারে হইবে? ইহার দুই প্রকার ব্যবহার চলিতে পারে। আকস্মিক বিস্ফোরণে এই পরমাণু শক্তির সাহায্যে চতুষ্পার্শ্বের মাইলের পর মাইল ভস্মীভূত করা যাইতে পারে। আবার, ধীরে ধীরে এই শক্তি প্রকট করিতে পারিলে, নানা প্রকার কল-কব্জা পরিচালনায়ও উহার ব্যবহার হইতে পারে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় U২৩৫ বিখণ্ডন আবিষ্কৃত হওয়ায়, সহজেই এই শক্তি পরমাণু বোমারূপে রূপায়িত হইয়াছে। U২৩৫ বা U২৩৯ এর বিখণ্ডনপ্রবণতার কথা যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহাদের সাহায্যে আকস্মিক বিস্ফোরণ সংঘটন মোটেই বিস্ময়কর নহে। তবে কি ভাবে বিস্ফোরক উপাদানের পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইবে ও কিভাবে বিভিন্ন অংশগুলি সজ্জিত করিতে হইবে তাহাই হিসাবের বিষয়। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক কারণে পরমাণু বোমা-তত্ত্ব এক অতি গুহ্য তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং কিভাবে এই শক্তি লোকহিতে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহারই সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।

শক্তি হিসাবে পরমাণু-শক্তি এক বহুমূল্য বস্তু। প্রথম কারণ, ইউরেনিয়াম অতি দুষ্প্রাপ্য মৌল। দ্বিতীয়তঃ U২৩৫ পৃথকীকরণ কিংবা প্লুটোনিয়াম U২৩৯ উৎপাদন চেষ্টাও ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ব্যবসায় হিসাবে এই শক্তি উৎপাদন কতদূর লাভজনক হইবে তাহা বর্তমান সময়ে বলা কঠিন। কয়লা-দহনজাত শক্তি অপেক্ষা পরমাণু-শক্তি ব্যয়বহুল হইলে উহার প্রয়োগ কখনও চালু হইতে পারে না। তবে এই শক্তির উৎস বিবেচনায় কেবল আর্থিক লাভ ক্ষতির চিন্তা করিলেও চলিবে না। সামান্য পরিমাণ বস্তু হইতে কিরূপ প্রভূত শক্তি উৎসারিত হইবে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কারণ বহুদূর ধাবনক্ষম ত্বেট প্রধাবিত এরোপ্লেন বা রকেট-প্লেন নির্মাণে এইরূপ স্বল্পস্থানে পুঞ্জীকৃত শক্তির প্রয়োজনীয়তা মনে রাখিয়াই শক্তির প্রয়োগবিধি বিচার করিতে হইবে।

এই সকল কার্যে সরাসরি ব্যবস্থা এই হইবে যে, কোন বিখণ্ডনপ্রবণ বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে লইতে হইবে যাহাতে আকস্মিক বিস্ফোরণ রূপ দুর্ঘটনার

সম্ভাবনা না থাকে। তাহারই অভ্যন্তরে নিউট্রন প্রক্ষেপন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফের্মি-স্তূপের ন্যায় একই পদ্ধতি এক্ষেত্রেও চলিবে। উৎপন্ন তাপের যান্ত্রিক ব্যবহার চলিতে পারে। যেমন ষ্টীম এঞ্জিন চালান, জল ফুটান প্রভৃতি। এই তাপের সাহায্যেই প্রভূত চাপে আবদ্ধ বায়ু উত্তপ্ত ও অপসৃত করিয়া জেট প্রধাবিত এরোপ্লেন কিংবা রকেট চালান যাইতে পারে। বিশগুন প্রবণ বস্তুকে এঞ্জিনের ভিতর রাখা মোটেই নিরাপদ হইবে না। কারণ, প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিমাণ দাঁড়াইবে বহু কিলোগ্র্যাম ও তাহার সঙ্গেই আকস্মিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে। আবার এই উপায়ে মোটর চলিবার সময় যে গামারশ্মি ও নিউট্রন বিকীর্ণ হইবে, তাহা আরোহীগণের পক্ষে অনিষ্টকর। তবে তড়িৎ-ভাণ্ডারের ন্যায় পরমাণু-শক্তির ছোট ছোট ব্যাটারী বা ইউনিট প্রস্তুত করিতে পারিলে শক্তির ব্যবহারযোগ্যতা অনেক বর্ধিত হইবে।

সাধারণ স্থিরবস্থ মৌলকে ইউরেনিয়াম স্তূপের সংশ্রবে রাখিলে যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া উৎপন্ন হইবে তাহারও ব্যবহার চলিতে পারে। এই প্রকার মৌল হইবে তাপ-শক্তির উৎস। এই তাপের যান্ত্রিক ব্যবহার চলিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে পরমাণু-শক্তির ইউনিট বা ভাণ্ডারের অসুবিধা এই যে, উহা হইতে অনবরত শক্তি বিকিরণ চলিতে থাকিবে। ইচ্ছামত উহার কায চালু বা বন্ধ করিবার কোন উপায় হয় না।

মনে হয়, ভবিষ্যতে রকেট-প্লেন পরিচালনাই হইবে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের যথার্থ ক্ষেত্র। এই সকল প্লেনে চড়িয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রভাব অতিক্রম ও সহজেই নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ সম্ভবপর হইবে।

শ্বেতবামন ও অন্তিমসূর্য

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

সৌরদেহে হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাবার পরেও মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে সূর্য কিছুকাল উজ্জ্বল থাকবে। এই সংকোচন চরম পর্যায়ে পৌছবার পর সূর্য শীতল বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে। গ্রহগুলো শীতলতা প্রাপ্ত হয়ে তার চারদিকে এখনকার মতই আবর্তন করতে থাকবে। সেই অন্তিম অবস্থায় সূর্য যে আমাদের পৃথিবীর মত মাটি বা অন্যান্য যৌগিক পদার্থে সুগঠিত হবে এরূপ ধারণা করা ভুল। সূর্যের দেহপিণ্ডের বিশালতা হেতু তার ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নক্ষত্রদেহের বিশাল আকার ও অত্যধিক ভরের জন্যে তার শীতল ও কঠিন অবস্থায় বাইরের স্তরগুলো দেহ-কেন্দ্রের ওপর বিরাট চাপের সৃষ্টি করবে। এই চাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে গেলে বস্তুর প্রতিঘাত শক্তি লোপ পাবে। এই নির্দিষ্ট চাপ মাত্রায় কোনও শীতল নক্ষত্রদেহ একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আয়তন লাভ করবে; কিন্তু এই মাত্রা অতিক্রান্ত হলে নক্ষত্রদেহের পরমাণুগুলো চূর্ণিত হয়ে তার দেহপিণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। অধ্যাপক গ্যামো নক্ষত্রদেহের এই অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন—একটা বড় বাড়ীর

দেয়ালের কথা ধরা যাক। একজন খামখেয়ালী মিস্ত্রী দেয়ালটি ইট দিয়ে গাঁথছে। বাড়ীটি কত তলা হবে তার কোনও ধারণা না রেখেই মিস্ত্রী যদি দুর্বল ভিতের ওপর ইটের পর ইট গেঁথে যায় ও অনেকগুলো ছাদ তৈরী করতে চায় তবে উপরের তলাগুলির অত্যধিক চাপ সহ্য করতে না পেরে নীচের দেয়াল ধ্বসে পড়ে সমস্ত বাড়ীটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু শীতল নক্ষত্র দেহের বাইরের স্তরের প্রচণ্ড চাপে তার কেন্দ্র-স্থল ভেঙ্গে পড়া একটু ভিন্ন ধরণের ব্যাপার। পরমাণুগুলো কঠিন পদার্থের ভিতর খুব ঠাসাঠাসি ভাবে থাকে। তাদের ভিতরকার ফাঁক খুব অল্প বলেই বাইরের সাধারণ চাপে কঠিন পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে না, পরন্তু পরমাণুর বিভিন্ন অংশ সাধারণ চাপ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রয়েছে। যখন এই চাপ সেই নির্দিষ্টমান অতিক্রম করে, তখন এক পরমাণু অন্য পরমাণুর ভিতর ঢুকে যায়। পরমাণু কেন্দ্রিনের বাইরের ইলেকট্রন খোলসগুলো মুক্ত হয়ে যায় এবং পরমাণুগুলো ভেঙ্গে পড়ে। অবশ্য বিভিন্ন পরমাণুর এই অবস্থায় আসতে বিভিন্ন চাপের প্রয়োজন হয়। এখন এই ভেঙ্গে-পড়া পরমাণু-গুলোর কেন্দ্রিন ও অতিরিক্ত চাপে মুক্ত ইলেকট্রন-গুলো শীতল নক্ষত্রদেহে বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়ায়। ফলে পরমাণুর ইলেকট্রন খোলসগুলোর অভেদ্যতা হেতু কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা অন্তর্হিত হয় এবং নক্ষত্রদেহের ঘনত্ব বেড়ে যায়। মোটের উপর অত্যধিক চাপের ফলে কঠিন পদার্থ তার নিজস্ব ধর্মের বিপরীত আচরণ করে ও সংকোচনে শীর্ণ হয়ে পড়ে।

চাপের ফলে সংকোচন ও চাপের অনুপস্থিতিতে বিস্তার—সাধারণ বায়বীয় পদার্থের একটা বিশেষ ধর্ম। বিশাল নক্ষত্রদেহ শীতল অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের ধর্ম আচরণ করে। তফাৎ এই যে, এই অবস্থায় কঠিন পদার্থ সাধারণ বায়বের আকার ধারণ করেনা বরং গলিত ভারী ধাতুর মত দেখায়। সাধারণ বায়ব যেমন পরমাণু বা অণুর মিশ্রণ এই অভিনব বায়বে তেমনি দ্রুত সঞ্চরণশীল পরমাণুর অন্তর্নিহিত বস্তুকণার সমষ্টি মিশ্রিত-অবস্থায় থাকে। এই নবাবিষ্কৃত বায়বকে ফার্মির নামানুসারে ফার্মি-বায়ব নামে অভিহিত করা হয়। একে ইলেকট্রনিক-বায়বও বলা হয়। কারণ কেন্দ্রিন-মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর ওপরই এই রকম বায়ব স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম প্রাপ্ত হয়, ফলে এই ইলেকট্রনিক-বায়ব সর্বনিম্ন তাপমাত্রাতেও চাপ সৃষ্টি করে। ফার্মির মতে ইলেকট্রনিক-বায়ব, তথা শীতল নক্ষত্রদেহের অন্তর্নিহিত চাপ তার ঘনত্বের সঙ্গে বেড়ে চলে এবং উহার ঘনমানের সহিত বিপরীতহারে সমানুপাতিক হয়।

বাইরের স্তরের অত্যধিক চাপের ফলে যে নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলের পরমাণুগুলো চূর্ণিত হয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সেই নক্ষত্রদেহ তখন আর প্রস্তরীভূত কঠিন পদার্থের অবস্থায় থাকেনা। সেই নক্ষত্রদেহ বায়বীয় পদার্থের ধর্ম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিচূর্ণিত নক্ষত্রদেহের জ্যামিতিক আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের বলে সংকোচন ও অন্যদিকে তার দেহাভ্যন্তরস্থ ফার্মির ইলেকট্রন-বায়বের বহি-র্মুখী চাপ এই দুয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থার কথা বিশদভাবে জানা দরকার। এই অবস্থায় নক্ষত্র দেহের পরমাণুর ভরবিশিষ্ট প্রোটনগুলো নিউটনীয় শক্তির নিয়ম মেনে চলে—এদিকে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন-গুলো বায়বাকারে আভ্যন্তরীন চাপের সৃষ্টি করে। এইরূপ কোনও নক্ষত্রে উভয় প্রকার চাপ যখন সাম্যবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ না কমিয়ে ভর দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে কি হয় দেখা যাক। নক্ষত্রদেহের বিভিন্ন অংশের পরস্পর আকর্ষণরূপ মহাকর্ষ-শক্তির বলেই নক্ষত্রদেহ

সংকুচিত হয়। কোনও নক্ষত্রদেহের একক ঘন মানের ভর যদি দ্বিগুণিত হয় তা হলে এই দুই অংশের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ নিউটনীয় নিয়মানুযায়ী চতুর্গুণ বেড়ে যাবে। নিয়মানুযায়ী ইলেকট্রন-বায়বের চাপ বাড়বে মাত্র ২$\frac{5}{3}$=৩·১৭ গুণ অর্থাৎ চার গুণের কম। ফলে নক্ষত্রদেহে মহাকর্ষীয় শক্তিই কার্যকরী হবে এবং এই বাড়তি শক্তির বলে সাম্যাবস্থা না আসা পর্যন্ত দেহপিণ্ড সংকুচিত হয়ে আরও ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত হবে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, শীতল নক্ষত্রদেহ যতই ভারী হবে ততই তার আয়তন কমে যাবে। চাপের দ্বারা বস্তু পরমাণু চূর্ণিত হলেই বস্তুপিণ্ডের এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানী কোঠারী গণনায় দেখিয়েছেন যে, প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড চাপের দ্বারা বস্তুপিণ্ডের পরমাণু চূর্ণিত হতে পারে। এই হিসেবে আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রের প্রতিবর্গ ইঞ্চির উপর মাত্র ২২ মিলিয়ন পাউণ্ড চাপ পড়ছে—অতএব তার পরমাণু চূর্ণিত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে ৩১৭ গুণ ভারী বৃহস্পতির কেন্দ্রের উপর বর্তমানে যে চাপ পড়ে তাতে তার পরমাণুগুলো প্রায় চূর্ণিত হতে পারে। চাপের বলে এই দেহপিণ্ডে পরমাণু চূর্ণীকরণ আরম্ভ হলেই তার আয়তন কমে যাবে। আর বৃহস্পতির চাইতে আরও ভারী যে কোনও দেহপিণ্ডের কেন্দ্রস্থলের পরমাণু তার বহিরাবরণের চাপে নিশ্চিতই চূর্ণিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। তখন তাদেরও আয়তন হবে অপেক্ষাকৃত কম। তাই বৃহস্পতি গ্রহকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শীতল বস্তুপিণ্ড বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এমনকি আমাদের সূর্যও তার শীতল অবস্থায় বৃহস্পতির চাইতে ক্ষুদ্রতর ও পৃথিবীর প্রায় সমান আকার ধারণ করবে।

শীতল নক্ষত্রদেহের ব্যাসার্ধ তার ভরের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভর-ব্যাসার্ধ সম্বন্ধের যে লেখাচিত্র এঁকেছেন তা থেকে বিভিন্ন নক্ষত্রদেহের ভর ও আয়তনের ধারণা পাওয়া যায়। এই চিত্রে দেখা যায় বৃহস্পতির চেয়ে হাল্কা বস্তুপিণ্ডের ঘনমান ভরের সঙ্গে বেড়ে চলে। স্বাভাবিক বস্তুপিণ্ডে এই ধর্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু বৃহস্পতির চেয়ে ভারী বস্তু-পিণ্ডে পরমাণুগুলো চাপের ফলে চূর্ণিত হয়ে পড়ে বলেই ভর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহপিণ্ডের ঘনমান কমতে থাকে। এই চিত্র হতে বোঝা যায়, আমাদের সূর্য শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হলে তার ব্যাসার্ধ বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে দশগুণ কম আর পৃথিবীর প্রায় সমান হবে। এই অবস্থায় সৌর-দেহের গড় ঘনত্ব হবে জলের চেয়ে ৩০ লক্ষ গুণ বেশী। আবার কেন্দ্রের ঘনত্ব হবে আরও বেশী অর্থাৎ সৌর-কেন্দ্রের প্রতি ঘন সেন্টিমিটার বস্তুর ওজন হবে প্রায় ৩০ টন। সৌর-কেন্দ্রের হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে তার এই পরিণতি কত দিনে ঘটবে তা' বিজ্ঞানীদের কল্পনার বিষয়। সূর্যের এই অবস্থা কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আবার যে সমস্ত নক্ষত্র এইরূপ মৃত ও শীতল অবস্থায় মহাকাশে অবস্থান করছে তাদের নিজস্ব কোনও আলো নেই বলে তাদের দেখা যায় না বা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানাও সম্ভব নয়। কিন্তু সে সমস্ত নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সম্পদ সবেমাত্র একেবারে নিঃশেষিত হয়েছে, অথচ মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে এখনও শেষ অবস্থায় এসে পৌছায় নি। সেই সমস্ত মরণোন্মুখ নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করলে নক্ষত্র, তথা সৌর-জীবনের অন্তিম অবস্থার কথা জানা যাবে। এই সব মরণোন্মুখ নক্ষত্রগুলোর আকার ছোট। এদের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা অত্যন্ত অধিক, অথচ উজ্জ্বলতা অল্প বলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে—শ্বেতবামন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ক্লার্ক সিরিয়াস-এ নক্ষত্রের সহচর সিরিয়াস-বি নামক জুড়ি শ্বেতবামন আবিষ্কার

করেন। সিরিয়াস-বি নক্ষত্রের বিভিন্ন ধর্ম পর্যবেক্ষণ করে আমরা শীতল মৃত নক্ষত্রগুলোর অবস্থা জানতে পারি। সিরিয়াস-বি-এর পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা ১০০০০ ডিগ্রী, অথচ উজ্জ্বলতা অল্প বলে এর জ্যামিতিক আয়তন সাধারণ নক্ষত্রের চেয়ে কম হওয়াই সম্ভব। গণনায় দেখা যায় যে, সিরিয়াস-বি-এর পৃষ্ঠ-আয়তন ও ব্যাসার্ধ সূর্যের চেয়ে যথাক্রমে ২৫০০ ও ৫০ গুণ কম। আবার সিরিয়াস-এর চারদিকে এই নক্ষত্রের আবর্তন পর্যায়ের গণনায় যে ভর হিসেব করা যায় তা' প্রায় সূর্যের ভরের সঙ্গে সমান। তাই এর গড় ঘনত্ব হবে জলের চেয়ে প্রায় ২লক্ষ গুণ বেশী। চন্দ্রশেখরের লেখচিত্রে সিরিয়াস-বি নক্ষত্রের ভর ও ব্যাসার্ধ তুলনা করলে দেখা যায় যে, এর শীতলতম অবস্থায় ব্যাসার্ধ এখনকার চেয়ে ২½ গুণ কমে যাবে। এথেকে জানা যায় যে, সিরিয়াস-বি এখনও তার শেষ অবস্থায় পৌঁছায় নি। যাহোক সিরিয়াস-বি ও অন্যান্য শ্বেতবামনদের পর্যবেক্ষণ করে আমরা নক্ষত্রদের অন্তিম অবস্থার অনেক কিছু কথা জানতে পেরেছি। কয়েকশত কোটি বছর পরে সূর্যও একদিন শ্বেতবামন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সিরিয়াস-বি-এর মত দেখাবে। তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে তার কৌণিক ব্যাস দাঁড়াবে বৃহস্পতির সমান। সূর্যের তাপ এইরূপ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র আলোহীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হিমাংকের চেয়ে ২০০ ডিগ্রী নীচে নেমে যাবে। তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে জীবনের কোনও চিহ্ন থাকবে না। অধ্যাপক গ্যামোর মতে অবশ্য হাইড্রোজেন একেবারে নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই সৌরতেজের আধিক্য হেতু পৃথিবীর জীবজগৎ লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের পক্ষে সূর্যের শ্বেতবামন বা মৃত অবস্থা দেখবার মত সুযোগ কোন দিনই হবে না। বিজ্ঞানীর কল্পনায় সূর্য সেদিনের সেই হীন ও ক্ষুদ্র শ্বেতবামন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। তারপর মহাকাশের অতল গর্ভে লক্ষ লক্ষ মৃত নক্ষত্রের দলে তার দীপ্তিহীন মৃতদেহ কোথায় অন্তর্হিত হবে কেউ তার সন্ধান পাবেনা।

এক্স্-রে অণুবীক্ষণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন অদৃশ্য বস্তুকে দেখতে হলে পদার্থটিকে বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ সূর্যালোক বা বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে আলোকিত করে থাকেন। তার কারণ সাত রঙে গঠিত সাদা আলো ছাড়া আমাদের চোখ সাড়া দেয় না। কিন্তু দেখা যায় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ শক্তি অসীম নয়—তাকে সীমাবদ্ধ করে আলোক তরঙ্গ নিজেই। বিশ্লেষণ শক্তি অর্থে আমরা বুঝি—পৃথক করবার ক্ষমতা। দুটি পদার্থ পাশাপাশি থাকলে তাদের পৃথক বলে চেনার ক্ষমতাই হচ্ছে বিশ্লেষণ শক্তি। এই হিসেবে শুধু চোখের বিশ্লেষণ ক্ষমতা হচ্ছে এক ইঞ্চির আড়াইশ ভাগের এক ভাগ। এর চেয়েও কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পদার্থকে আলাদা বলে চিনতে হলে আমাদের চোখের সাহায্যের জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সীমা নির্দেশ করে আলোক-তরঙ্গ স্বয়ং। হিসেব করে দেখা গেছে—সাধারণ সূর্যালোক ব্যবহার করলে সর্বাধিক শক্তিশালী আধুনিক যন্ত্রের

বিশ্লেষণ শক্তি দাঁড়ায়—এক ইঞ্চির সওয়া লক্ষ ভাগের এক ভাগ। জলের ঢেউয়ের একটি চূড়া থেকে অপর চূড়া পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। ইথার সমুদ্রে আলোর প্রবাহ ঢেউ তুলে চলে ধরে নিলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা সম্ভব। বিভিন্ন রং বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিচয় দেয়। সুতরাং যেহেতু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান বিশ্লেষণ শক্তিকে খর্ব করে রেখেছে যন্ত্রে ব্যবহৃত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, সেহেতু যত ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গ ব্যবহার করা যাবে, বিশ্লেষণ শক্তির সীমা তত প্রসারিত হবে। চোখে দেখা আলোর মধ্যে নীল আলোই সব চেয়ে ছোট, তার চেয়েও ছোট হচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট আলো। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করলে অসুবিধা আছে, কারণ দ্রষ্টব্য বস্তুকে চোখে দেখা যাবে না। তার ফটো তুলতে হবে এবং যন্ত্রের লেন্সগুলোও কাঁচের হলে চলবে না। তা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ শক্তি বাড়বে প্রায় চার পাঁচ গুণ। আরো বাড়াতে চাইলেই মুশকিল। কারণ তখন আমরা পৌঁছে যাই একস্-রে'র রাজ্যে। কিন্তু একস্-রশ্মির ভেদ-শক্তিকে সামলে তার গতিপথকে বিচলিত করবার মত কোন লেন্সই বিজ্ঞানীদের জানা নেই। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একস্ রে ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্যে বিশ্লেষণ শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত হলো ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ এবং তারও বিশ্লেষণ শক্তির সীমা লঙ্ঘন করবার জন্যে প্রোটন মাইক্রস্কোপের কথা ফরাসীমুলুক থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এই বৎসরের মে সংখ্যাতে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিস্তারিত আলোচনা এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের অসুবিধা হচ্ছে প্রধানতঃ এই যে, যন্ত্রটির দাম অত্যন্ত বেশী এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়াও সাধারণ অণুবীক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ-সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ শক্তি আলোক অণুবীক্ষণের চেয়ে প্রায় একশো গুণ উন্নত বলে ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপের চাহিদা ও ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠছে। কিন্তু ইলেকট্রনের ভেদশক্তি অত্যন্ত পরিমিত হওয়ায় ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে দ্রষ্টব্য পদার্থের সাইজ হওয়া চাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম—আলোক অণুবীক্ষণের নমুনার চেয়ে বহুগুণে সংকীর্ণ। এত পাতলা নমুনা তৈরী করতে হলে নতুন উপায়, নতুন যন্ত্রের প্রয়োজন। এইরকম একটা যন্ত্রের বর্ণনা গত সংখ্যার 'বিজ্ঞানের খবরে'র মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু অতশত ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজন হয় না যদি একস্-রেকেই অণুবীক্ষণের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। সাধারণ আলোক-তরঙ্গের চেয়ে একস্ রে'র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একশো থেকে দশ হাজার গুণ ছোট এবং তার ভেদশক্তিও অসাধারণ। সুতরাং একস্ রে অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ শক্তি ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সমকক্ষ হতে পারে, অথচ হাঙ্গামাও অনেক কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুশকিল এই যে, একস্-রে'কে ফোকাস করার মত কোন লেন্স বিজ্ঞানীদের জানা নেই। রয়েন্টগেন যখন একস্ রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই সময় তিনি কাঁচের এবং রবারের লেন্সের সাহায্যে এই রশ্মিকে ফোকাস্ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। "একস্-রশ্মিকে ফোকাস করা সম্ভব নয় দেখা যাচ্ছে," এই বলে এই সমস্ত পরীক্ষা নিয়ে আর তিনি অগ্রসর হন নি। তারপর বহুদিন কেটে গেছে —একস্-রশ্মি সম্বন্ধে নিত্য নূতন তথ্য পরীক্ষায় বেরোতে থাকলেও একস্ রশ্মির জন্যে লেন্স তৈরী করার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে কেউ আর এই দিকে গবেষণা করতে ইচ্ছুক হন নি।

কেন একস্-রশ্মির লেন্স তৈরী করা সম্ভব নয় এই ধাঁধার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে গত পঁচিশ বছর থেকে। একথা প্রায় সকলেই

জানেন যে, আলোক-রশ্মিকে ফোকাস করতে গতিপথের পরিবর্তন প্রয়োজন। আলোর প্রতি-হলে লেন্সের মধ্যে আলোকের প্রতিসরণ বা সরণ কেন হয় সে কথা বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করেন
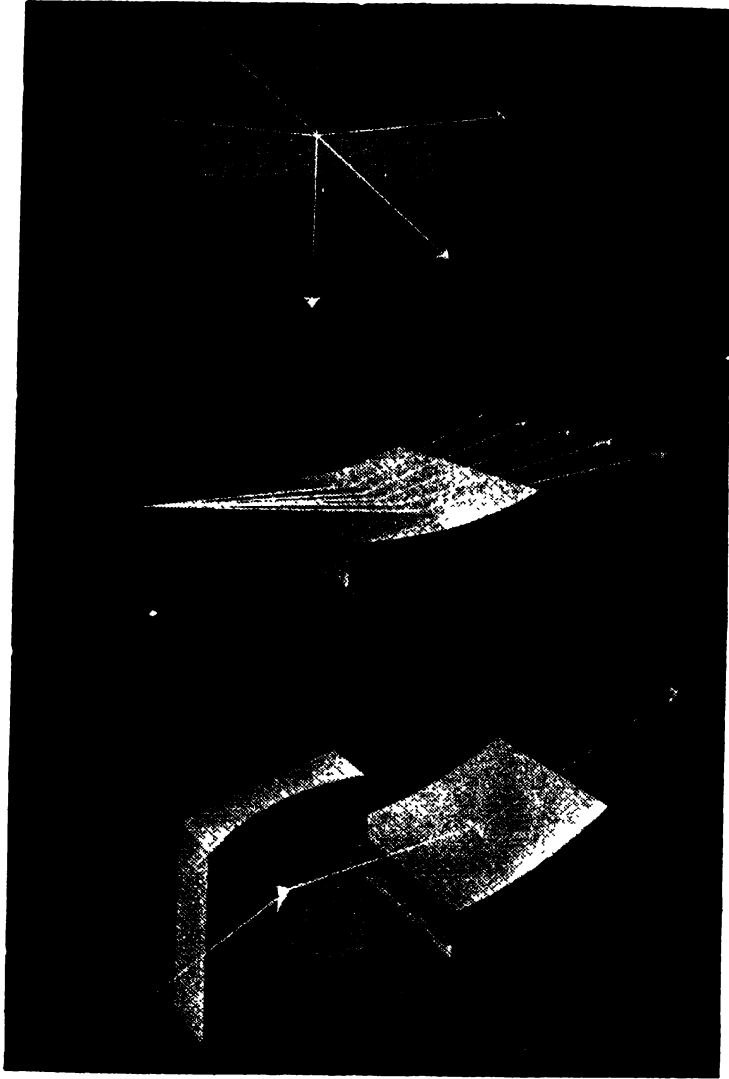
এক্স্-রে অণুবীক্ষণের মূল-রহস্য।

এক্স্-রে মাইক্রস্কোপিতে দর্পণ থেকে অতি সূক্ষ্মকোণে রশ্মি প্রতিফলিত হবে (উপরের চিত্র)। সূক্ষ্মছিদ্র পথে আগত রশ্মিকে স্ফেরিক্যাল দর্পণের সাহায্যে ফোকাস্ করা হবে। কিন্তু প্রতিবিম্বটি হবে অ্যাষ্টিগ্ম্যাটিক (মধ্যম চিত্র)। দুটি স্ফেরিক্যাল দর্পণের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আগত রশ্মি থেকে বিন্দু পরিমিত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যেতে পারে (নীচের চিত্র)।

এই ভাবে যে, লেন্স মাধ্যমের অন্তর্বর্তী অণুদের ইলেকট্রনগুলো আলোক-তরঙ্গের প্রভাবে বিচলিত হতে থাকে। বিজ্ঞানীর মতে জড়পদার্থের অণুগুলো সর্বদাই স্পন্দনশীল এবং আলোক-তরঙ্গের শক্তিচ্ছটায় ইলেকট্রনগুলো তরঙ্গের কম্পনের সঙ্গে তাল রেখে কাঁপতে থাকে। তার ফলে তারা আলোক বিকিরণ করে ভিন্ন দিকে—অর্থাৎ আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ ঘটে। এক্স্-রশ্মির বেলা সেরকম কোন কাণ্ড হয় না; তার কারণ হচ্ছে, এক্স্-রশ্মির স্পন্দন-সংখ্যা এত বেশী যে, তার সঙ্গে তাল রেখে ইলেকট্রনগুলো কাঁপবার অবসর পায় না। তার ফলে তারা অবিচলিতই থেকে যায়। যেমন শব্দের তীব্রতা বা কম্পন-সংখ্যা উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকলে অবশেষে এত দ্রুত হয়ে দাঁড়ায় যে, আমাদের কানের পর্দা আর কাঁপেই না এবং শব্দ থেকে যায় অশ্রুত। এক্স্-রশ্মি এই কারণে যে কোন পদার্থের লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় পায় অবাধ গতি।

সুতরাং এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একরকম স্থির নিশ্চিত যে, অদূর ভবিষ্যতে এক্স্-রে লেন্স উদ্ভাবন করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু আলোক-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির, যথা টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ, সিনেমা প্রজেক্টর প্রভৃতির মধ্যে শুধু যে লেন্স ব্যবহার করা হয় তা নয়—আলোকের গতি নিয়ন্ত্রণে আর এক পদ্ধতির ব্যবহারও সুপ্রচলিত। বিভিন্ন মাধ্যমে আলোক-তরঙ্গ যে কেবলমাত্র প্রতিসরিত হয়, তা নয়—অস্বচ্ছ ও মসৃণ পদার্থ, যেমন আয়না, থেকে আলোকের প্রতিফলনও সর্বদাই ঘটে থাকে। আলোর প্রতিফলন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুপরিচিত। চকচকে আয়না বা ধাতুর পাতে যেখানেই আলো পড়ুক না কেন তার প্রতিফলন হবেই। নিশ্চল জলের গা থেকেও প্রতিফলিত আলো সকলেই দেখেছেন। এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তখনই যখন আলোক-রশ্মি বাতাসের মধ্যে দিয়ে এসে পড়ে জলের গায়ে, অর্থাৎ কম ঘন মাধ্যম থেকে বেশী ঘন মাধ্যমের সীমারেখায়। আলোক-রশ্মির এখানে অবশ্য পূর্ণ প্রতিফলন হয় না, খানিকটা অংশ প্রতিসরিত হয়ে যায় জলের মধ্যে। এখন, জলের মধ্য থেকে আলো যদি বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, তবে দেখা যাবে জল ও বাতাসের সীমারেখা থেকে আলোক প্রতিসরিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিসরণ নির্ভর করবে—কি কোণের মধ্যে আলোক-রশ্মি আসছে। আলোক-রশ্মি যদি তির্যক থেকে অধিকতর তির্যক হয়ে পড়তে থাকে তবে এমন এক সময় আসবে যখন আর প্রতিসরণ দেখা যাবে না; আলোক জল ও বাতাসের সীমারেখা থেকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে যাবে জল থেকে পুনর্বার জলের মধ্যে। আলোকের এই প্রতিসরণহীন প্রতিফলনকে বলা হয় পূর্ণ প্রতিফলন। হীরকের চোখ ঝলসানো ঔজ্জ্বল্য অথবা মরীচিকায় পুকুরের মধ্যে গাছের প্রতিবিম্ব সবই আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের ফল—ঘন মাধ্যম থেকে স্বল্প ঘন মাধ্যমে যাবার সময় বিশেষ তির্যক কোণ করে নিপতিত আলোক-রশ্মির এক বা একাধিক প্রতিফলন।

এক্স্-রশ্মির বেলায় এই পূর্ণ প্রতিফলনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ১৯২২ সালে কম্পটন প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, অত্যুজ্জ্বল দর্পণের সাহায্যে তার একেবারে গা ঘেঁষে এক্স্-রশ্মি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। সোজাসুজি প্রতিফলন এক্স্-রশ্মির বেলায় দেখা যায় না। তার বদলে দর্পণগাত্র থেকে চতুর্দিকে তার বিচ্ছুরণ ঘটে। জলের মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলন হয় যখন আলো জলের মধ্যে দিয়ে আসে। এক্স্-রশ্মির বেলায় তা' হয় যখন এক্স্-রশ্মি বাইরে থেকে এসে পড়ে।

যে তির্যক কোণ করে পড়লে আলোর পূর্ণ প্রতিফলন সম্ভব, তার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডী আছে।

এক্স্ রে'র বেলায়ও তাই ; কিন্তু সে গণ্ডী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল—যাকে আমরা এক্স্-রে বলে এক কথায় বলছি, তা শুধুমাত্র একটি তরঙ্গের কথা নয়—বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটা সম্মিলনীকেই আমরা সাধারণভাবে এক্স্ রে নামে অভিহিত করছি। এক্স্ রে'র পূর্ণ প্রতিফলনের জন্যে তার সংকীর্ণ আপতন কোণ নির্ভর করে রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং দর্পণের উপাদানের ওপর। সুসমতল কাঁচের ওপরে মিহি, উজ্জ্বল রৌপ্য প্রলেপ দিয়ে তৈরী অত্যুৎকৃষ্ট আরশির বেলা দীর্ঘ এক্স্-রশ্মি ব্যবহার করলেও এই আপতন কোণ মাত্র এক ডিগ্রীর বেশী কিছুতেই হয়না। এতখানি কান-ঘেঁষে এক্স্-রে ফেলাটা যে মোটেই সুবিধাজনক নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এক্স্ রে'র সাহায্যে তোলা পিন-হোল প্রতিচ্ছবি।

যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ পল কির্কপ্যাট্রিক সম্প্রতি এভাবে এক্স্ রশ্মি ব্যবহার করে দর্পণের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক্স্-রে মাইক্রস্কোপ সৃষ্টির সূচনা তিনি ও তাঁর সহযোগীরা করেছেন, ন্যুব্জপৃষ্ঠ দর্পণের সহায়তায় এক্স্-রে'কে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করিয়ে। আমরা সাধারণতঃ সমতল দর্পণের সঙ্গে পরিচিত। মাঝে মাঝে পিঠ-বাঁকা আয়নার সন্ধান মেলে মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের ডানদিকের জানালার কোণে অথবা দাড়ি কামাবার কোন কোন দর্পণে। কংকেভ আয়না, অর্থাৎ যে আয়না ভিতর দিকে বেঁকে গেছে, আবার আলোক-রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম। কিন্তু একটি বিন্দু থেকে আলো এসে যখন কংকেভ

দর্পণের গা ঘেঁষে পূর্ণপ্রতিফলিত হয় তখন বিন্দুটির প্রতিচ্ছবি আর বিন্দু থাকে না—রূপান্তরিত হয়ে যায় একটি রেখায়। এই রূপান্তর-দোষকে বলা হয়—অ্যাস্টিগ্‌ম্যাটিজম। সুতরাং এইরূপে কোন পদার্থের হুবহু প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের চোখের অ্যাস্টিগ্‌ম্যাটিজম বা বিষম-দৃষ্টি যেমন আর একটি অনুরূপ দোষবহুল লেন্সের সাহায্যে শোধরানো হয় সেই রকমভাবে দুটি কংকেভ আয়নার সাহায্যে বিন্দুর রেখায় পরিণতিও বন্ধ করা যেতে পারে। একস্-রে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের এইটাই হলো মূল তথ্য।

অ্যাসটিগ্‌ম্যাটিজম ছাড়া কংকেভ দর্পণের আর একটা দোষ দেখা যায়, তাকে ইংরাজীতে বলে—স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন। দর্পণটি যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে, এই দোষের জন্যে সেটি পরিপূর্ণভাবে ফোকাস হয় না, প্রতিবিম্বের চারপাশের কিনারা থেকে যায় অল্পবিস্তর অস্পষ্ট। দর্পণটি একটি স্ফিয়ার বা গোলকের অংশবিশেষ হওয়ার জন্যেই এই বিপত্তির উৎপত্তি। সাধারণতঃ এই দোষ দূর করা হয় আলোক-রশ্মিকে অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রের সাহায্যে সীমাবদ্ধ করে'। একস্ রশ্মির বেলায় প্রফেসর কির্কপ্যাট্রিক জানাচ্ছেন যে, তাঁদের অত্যন্ত সংকীর্ণ রন্ধ্রপথের ব্যবহার করতে হয়েছে—ক্যামেরায় যে ডায়াফ্রাম ব্যবহার করা হয় তার সংকীর্ণতার চেয়ে বহুগুণে সূক্ষ্ম। কিন্তু এত সূক্ষ্ম সূচীপথের অসুবিধা এই যে; প্রতিবিম্বের ফটো তুলতে হলে একস্‌পোজার দিতে হবে বেশী এবং বিশ্লেষণ শক্তি খর্ব হবার আশঙ্কাও আছে। স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন দূর করার জন্যে তাঁরা গোলক ছেড়ে ইলিপ্সের অংশের আকারে দর্পণ তৈরী করার এক অভিনব পদ্ধতি বের করেছেন। এর জন্যে কংকেভ কাঁচকে তাঁরা ইলিপ্সের অংশের চেহারা দেবার চেষ্টা করেন নি—তার বদলে কংকেভ কাঁচের ওপর এমনভাবে পালিশ দিয়েছেন যাতে দর্পণটি উপবৃত্তাকার আয়নার মত কাজ করে। দর্পণটিতে রূপার আস্তর দেবার জন্যে তাঁরা বায়ুশূন্য স্থানে কাঁচটিকে রেখে সেই স্থানেই একটি ছোট ক্রুসিবল থেকে রূপাকে বাষ্পে পরিণত করেছেন। রৌপ্যবাষ্প এসে জমাট বেঁধেছে কাঁচের গায়ে—তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছে পিতলের একটি গতিরোধকারী যন্ত্র। এরই সাহায্যে কাঁচের ইতস্ততঃ হিসেব করা স্থানে রূপার ক্ষীণ পালিশ পড়েছে—এবং তারপরে প্রতিফলন কোণ বৃহত্তম করবার জন্যে একটা স্তর প্ল্যাটিনাম ধাতু বিস্তৃত করা হয়েছে।

একস্-রে মাইক্রস্‌কোপ সম্বন্ধে গবেষণা আজ এই পর্যন্ত এসে পৌচেছে। পূর্ণাঙ্গ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আজও তৈরী হয় নি। মাইক্রস্‌কোপ নির্মাণের পথে মূল বাধাগুলো দূরীভূত হলেই কার্যক্ষেত্রে তার আবির্ভাব হবে। বোধ হয় সেদিনের আর বেশী বিলম্ব নেই।

এখন কথা হচ্ছে, একস্-রে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সার্থকতা কোথায়। হিসেব করে দেখা গেছে, একস্-রশ্মির এই দর্পণ-পদ্ধতি ব্যবহার করলে তার বিশ্লেষণ-শক্তি হবে আলোক অণুবীক্ষণের প্রায় পঁচিশ গুণ। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই বিশ্লেষণ-শক্তি একস্ রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর মোটেই নির্ভর করছে না। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাসের সঙ্গে বিশ্লেষণ-শক্তির উন্নতি ঘটে—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। তার কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। একস্-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ্রাসের সঙ্গে বিশ্লেষণ-শক্তি যতখানি বাড়বে, তার পূর্ণ প্রতিফলন-কোণের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের জন্যে সে বৃদ্ধি প্রকটিত হবে না।

ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপের চেয়ে বিশ্লেষণ-শক্তিতে খাটো হলেও এই ধরণের একস্ রে মাইক্রস্‌কোপের একটা মস্ত সুবিধা হবে এই যে, এতে বায়ুশূন্যস্থানের প্রয়োজন হবে না, অথচ খরচ পড়বে কম এবং ব্যবহারে জটিলতাও থাকবে না বেশী। যে সমস্ত পদার্থ বায়ুশূন্য পারিপার্শ্বিকে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই কারণে ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপে যারা অচল, তাদের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহই হবে সম্ভবতঃ একস্-রে অণুবীক্ষণের প্রধান কাজ। আবার যে সমস্ত পদার্থ (যেমন ধাতু ও খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি) এত পুরু যে, অতি শক্তিশালী ইলেকট্রনও তাদের ভেদ করতে অসমর্থ সেই সকল নমুনায় প্রসারিত হবে একস্-রে মাইক্রস্‌কোপের মর্মভেদী দৃষ্টি—বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে নূতন রাজ্যের সন্ধান মেলার আশা অমূলক হয়ত হবে না।

মাদুলি

শ্রীরাজগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রবিবারের বিকাল দাদা বললেন, "চল হে রোগী দেখে আসি।"

কোথায়?

চলই না!

জানি, দাদার এ বাতিক নতুন নয়। অতএব নিঃশব্দে সঙ্গী হলাম। বাসে তিলধারণের স্থান নেই। ভীড় ঠেলে অগ্রসর হতে পারি নে। তার ওপর পরিচালকের চীৎকার—খালিগাড়ি, বৌবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার। নাকালের একশেষ! যাই হোক, জায়গা হোল, লেডিজ সীটে এবং পরক্ষণেই উঠতে হলো। এসে বসলেন একটি মহিলা, আধ ময়লা কাপড় পরা, কাঁখে শ্রান্তভাবে এলিয়ে পড়া ছেলে, নির্জীব। দাদা বললেন, দেখেছ ওর চোখদুটি!

কার?

কার আবার, ঐ ছেলেটির!

বাসের ঝাঁকুনিতে ছেলেটি চোখ খুলছে, বুজছে। বুড়ো আঙুল চুষছে। দেখি তার একটি চোখের তারা ঘোলাটে হয়ে এসেছে, কে যেন একটি সিদ্ধ করা সাগুদানা বসিয়ে দিয়েছে চোখের মণিতে। তাই ত!

দাদা বললেন, বুঝেছ?

কি?

ভিটামিন-এ'র কমতি।

ঐ টুকু ছেলের?

হ্যাঁ হে, দেখছো না চোখের ভাব। ভিটামিন-এ ঘটিত খাদ্য পাচ্ছে কোথায়? হ্যালিবাটের তেল বা কডমাছের তেলই বল, সে ত আর আমাদের দেশে সাধারণের ভাগ্যে জোটে না! আর দুধ, সে ত অশ্বত্থমার অবস্থা হে, পিটুলি গোলা খেয়েই খুশী হতে হয়। সবই ত আজকাল সংশ্লেষিত! এক পাটার মেটে খেতে পার।

কেন সবজীতে?

ওরে বাবা, গাজর, টোমাটো খায় কংগ্রেসীরা আর কালো বাজারীরা, তোমার আমার ভাগ্যে জোটে! বলি, কলকাতার রাজপথে চলাফেরা কর? চোখ খুলে চল কি? দুপুরে মুটে-মজুর, রিকসাওয়ালারা খায় কি? কেবল কতকগুলি ছাতু, জলে গুলে কাঁচালঙ্কা আর তেঁতুলের আচারের টাকনা দিয়ে! ওদের সব কজনাই রাতকানা ধরে নিতে পার। সব ভিটামিন-এ বুভুক্ষিত!

ছেলেটির বয়স হয়েছে বলে মনে হয়। তা দু বছর হবে। অথচ কত ছোট্ট দেখেছ? পা দুটিও বাঁকা।

আমি ঘাড় নাড়লাম। কি? রিকেট?

দাদা বললেন, হুঁ।

তা এদেশে এত রোদ। অতিবেগুনী আলো ত চামড়ায় লাগছে।

দাদা হেসে বললেন, কেবল মর্দন ও মাজনে কি হবে, আহার কই? ভিটামিন-ডি, চাই ত! তারও যে অভাব! ভিটামিন-ডি ও তো আছে সেই দুধে, আর মাছের তেলে যা আমাদের পাতে পড়ে না। কিছু আছে ডিমের হলদে অংশে। বর্ষায় মাছের তেল বলতে খাই আমরা ইলিশ মাছের তেল। সে তেলে আবার তেমন ভিটামিন নেই। যা আছে তা আছে রুই মাছের তেলে। সে মাছের তো সাড়ে তিন-টাকা সের।

দাদা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, দেখেছ, কতগুলি মাদুলি পরিয়েছে! আহা, মায়ের প্রাণ!

এতক্ষণে আমরা এসে পড়েছি ধর্মতলায়। ভাগ্যবশে বসবার জায়গা মিলে গেল। দাদা বসতে বসতে বললেন, তুমি কি সেদিন কলেজে ছিলে?

কোনদিন ?

গত শনিবার ?

না।

সে একটি ছাত্র, এবার শেষপরীক্ষা দিল। হাত সরু সরু, পেশীগুলি যেন হাড়েতে লেপটে গেছে। খুব শ্রান্ত চেহারা, ধুঁকছে। আমি দেখেই বললাম, তোমার ত ভিটামিন-বি'র অভাব মনে হচ্ছে। ছেলেটি হেসে ফেললে—হ্যাঁ, স্যার, আমি একটা কোর্স থাইয়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড নিচ্ছি। আমি বললাম, দেখলে তো, ঠিক দেখা যাচ্ছে। বেরিবেরি হয়নি তো? সে বললে, পাগুলি একটু ফুলেছিল বটে, কমে গেছে। দেখ বাপু সাবধান হয়ো। তার আবার একটা সোনার কবচ। বললাম, ওহে এ যে তোমার ক্ষয় কবচ! রোগা হয়ে যাচ্ছ। সে লজ্জিত হেসে বললে, কি করব, মার ঝোঁক! গ্রহশান্তি করা হয়েছে!

আমি চুপ করে রইলাম।

দাদার কণ্ঠ মন্থর হয়ে চলল, তরুণ বয়সী ছেলে! আহার কোথায় বল! বাজে চা'ল, তাও পালিশ করে দিচ্ছে! কি পুষ্টি হবে? ভিটামিন বি'র অভাবে কর্মে নিরুৎসাহ, বুক-ধড়ফড়ানি, হাত-পায়ের কব্জা লগবগে হয়ে পড়ছে। যোয়ান বয়স সব! দৃপ্তভাবে চলবে ফিরবে, তা নয়—এদেরই বা দোষ দেব কি! সুজি, আটা, মটর, ডিমের হলদে অংশবিশেষ—এসব কজনা, চোখে দেখতে পাচ্ছে, বল? ভিটামিন-বি'র অভাবে আর এক রোগ খুব হচ্ছে। গায়ের চামড়া খসখসে, ফাটা ফাটা যেন গোসাপের গা। বার-মেসে পেটের অসুখ। নিকোটিন-এমাইড খেলে সারে। মেটের ঝোল খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। মুসুরদালও ভাল। আটাও চলবে, তবে ময়দা নয়। ভিটামিন-বি'র অভাবে পরিপাক শক্তি কমে গেলে দেহের রক্তাল্পতা চোখে পড়ে। তখন মেটে থেকে পাওয়া ফোলিক অ্যাসিড অমোঘ ঔষুধ। মেটের বা লিভার-নির্যাস ইঞ্জেকশনও ফলপ্রদ।

দাদা খানিক চুপ করে থেকে বললেন, এ বছর দারজিলিং যাচ্ছ নাকি?

দেখি পুজোতে।

লেবু খাও তো? শাতি, কাগজি, কমলা—যা খুসী।

আমি বললাম, ঐ মুসুম্বিটা এখন চলে। কমলা লেবু ত এখন দুষ্প্রাপ্য। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়লেই বুঝবে, ভিটামিন-সি'র অভাব। ঐটেই ওর আভাস। তখন লেবু খাওয়াই ভাল। ইউরোপে ভিটামিন-সি'র অভাব বেশি হয়, কেন না লেবু জাতীয় ফল সে দেশে কম। এদেশে লেবু খেলেই চলে। ওদেশে ভিটামিন-সি'র জন্যে বাঁধাকপিই ভরসা। ওদেশে যখন ছিলাম, দেখি ভারতীয় ছেলেদের দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে সুরু হয়েছে। অমনি বললাম, ভিটামিন-সি'র বড়ি খেতে আরম্ভ কর, নইলে স্কার্ভি হতে পারে শেষ পর্যন্ত। আর যা ঠাণ্ডা দেশ, আর জোলো! ভিটামিন-সি'র অভাবে শেষ পর্যন্ত ব্রঙ্কাইটিস হয়ে যেতে পারে।

আমাদের ত পাকা ফলের দেশ। এখানে ভিটামিন-সি'র অভাব হবে কেন?

আর কেন? কত ফল খাও বল? টাকায় তিনটা সময়ের ল্যাংড়া, বার আনায় একটা কিলিয়ে পাকানো পেপে, ছ' পয়সা জোড়া শুটকো কলা, যাকে বলে বাঁদর-বিড়ম্বিত কলা! যাই হোক, তবু সব্জীতেও আছে; বাঁধাকপি, ফুলকপি, নতুন আলুতে। এদিকে কুল চালতা, কামরাঙা।

ভিটামিন-কে'র নাম শুনেছ?

আমি জিজ্ঞাসুভাবে চাইলাম।

দাদা পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বের করলেন। বললেন এটি দিতে যাচ্ছি হাসপাতালে। প্রসবের পূর্বাবস্থায় সেবন করালে ভাল। সদ্যোজাত শিশুকেও।

আমার চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল।

দাদা থমথমে হয়ে বললেন, এ একজন অনাথা বাস্তহারা।

আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হলো না।

দাদা বুঝলেন, বললেন, তুমি কোন খবর রাখ না।

কেমন করে হলো, ধীরে ধীরে শুধোলাম।

যারা আহার আর আশ্রয় দিয়েছে বলছে, তারাই—।

কথার মোড় ফেরাবার জন্যে বললাম, 'গ্রো মোর ফুডে'র বিজ্ঞাপন দেখেছেন?

দাদা হেসে বললেন, তা জানো না বুঝি? এবার যে নেচে 'ফুড গ্রো' করানো হবে। চোখ মটকে বললেন, "অশোক বৃক্ষ উঠবে ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে—।"
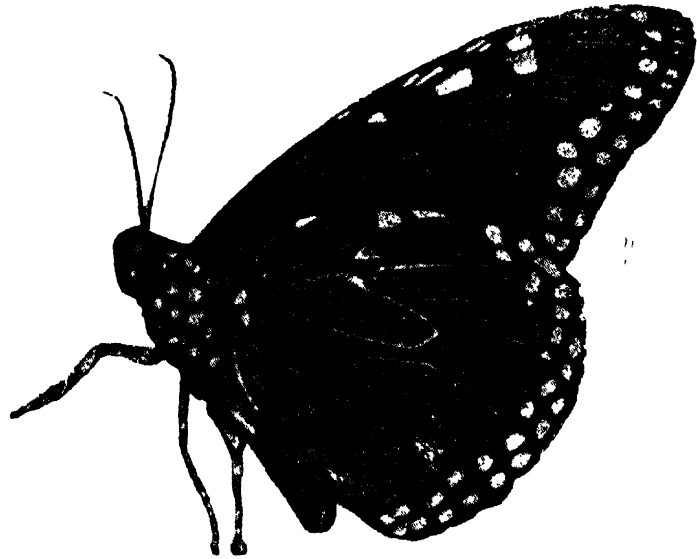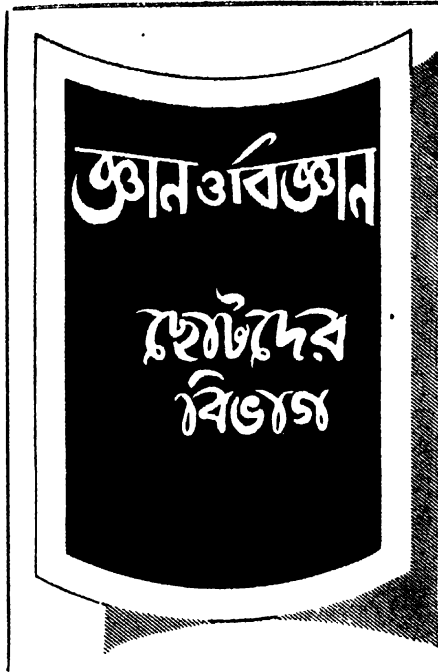
প্রজাপতি যেমন ফুলে ফুলে বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করে তোমরাও সেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ আহরণ কর।

প্রকৃতির খেয়াল
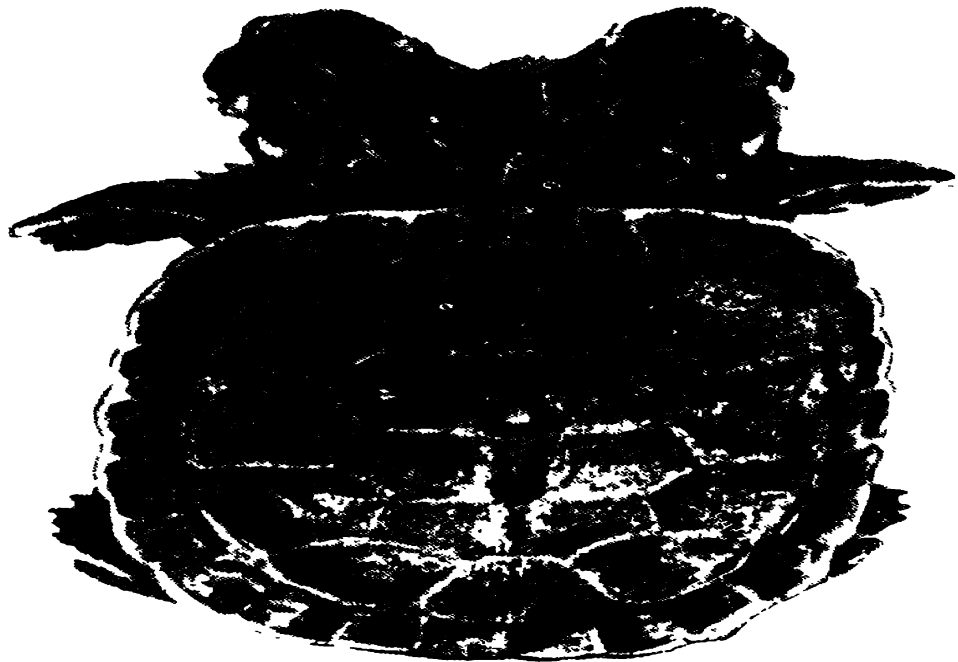
দু'মুখো কচ্ছপ
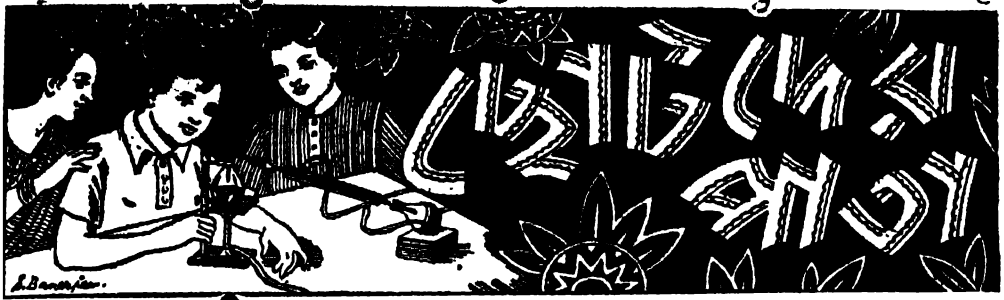
করে দেখ

ইলেকট্রোপ্লেটিং

সচরাচর আমরা রূপার মত ঝকঝকে চায়ের চামচ ও অন্যান্য যেসব জিনিস ব্যবহার করে থাকি সেগুলো যে রূপার তৈরী নয়, একথা বোধহয় তোমাদের কারুরই অজানা নয়। কিছুকাল ব্যবহারের পরেই দেখা যায়—ওসব জিনিসের রূপার মত ঝকঝকে আবরণটা উঠে গিয়ে পিতলের রং বেরিয়ে পড়েছে। পিতলের তৈরী জিনিসের উপর নিকেলের পাত্‌লা একটা আস্তরণ দেওয়া থাকে বলে রূপার মত চকচকে দেখায়। ইলেকট্রোপ্লেটিং নামে একরকম সহজ প্রক্রিয়ায় এই আস্তরণ দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটা এত সহজ যে, ইচ্ছাকরলে তোমরাও অনায়াসে করে দেখতে পার। কেমন করে ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে হয়, সেকথা বলছি।

সোনা বা রূপার গিল্‌টি-করা* নানারকমের জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামা, পিতলের তৈরী জিনিসপত্রের উপর গিল্‌টি করার রেওয়াজ অনেককাল থেকেই প্রচলিত। পূর্বে আরও সহজ উপায়ে গিল্‌টি করা হতো। পারার সঙ্গে সোনা মিশিয়ে সে জিনিসটাকে তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্মিত জিনিসের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হতো। তারপর সেই জিনিসটাকে চুল্লীতে উত্তপ্ত করলেই পারা উবে গিয়ে সোনার সূক্ষ্ম আস্তরণ তার গায়ে লেগে থাকতো। রূপার আস্তরণ দেবার জন্যেও এই প্রক্রিয়ারই প্রচলন ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থাটা যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনই অস্বাস্থ্যকর। কাজেই ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ার পর এ-প্রক্রিয়ার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রুগ্নেটেলি নামে ভল্টার জনৈক ছাত্র ১৮০৩ সালে পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, সোনার ক্ষারধর্মী দ্রাবণের ভিতর দিয়ে ব্যাটারী থেকে তড়িৎ-স্রোত পরিচালন করে ধাতব

*গিল্‌টি করা কথাটা যদিও সোনার গিল্‌টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তবু এস্থলে সব রকম ধাতুর আস্তরণ দেওয়ার অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

পদার্থকে গিল্টি করা যেতে পারে। ডি লা রাইভ-ই প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগান। তারপর ক্রমে ক্রমে এলকিংটন, রুয়োলজ এবং অন্যান্য আরও অনেকের প্রচেষ্টায় ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া বর্তমান সহজসাধ্য কার্যকরী ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

ধর, তুমি একটা পিতলের আংটিকে সোনার গিল্টি করতে চাও। তোমাকে কি কি করতে হবে বলছি। প্রথমে তোমাকে একটা গ্লেজকরা চিনামাটির বাটি বা ওই রকমের একটা কাচের পাত্র, গোটা তিনেক ব্যাটারী, খানিকটা পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং গোল্ড ক্লোরাইড যোগাড় করতে হবে। এ-জিনিসগুলো কেমিষ্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরী করে তাতে চীনামাটি বা কাচের পাত্রটাকে প্রায় ভর্তি করে দিতে হবে। ১ ভাগ গোল্ড ক্লোরাইড, ১০ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ২০০ ভাগ জল—এই অনুপাতে মিশ্রণটি তৈরী করবে। কিন্তু সাবধান—পটাসিয়াম সায়েনাইড ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ—অসর্তকতার ফলে কোন রকমে মুখে বা জিভে লেগে গেলে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে।

এবার পাত্রটার উপর পরিষ্কার করা ছুটা সরু তামার রড্ বসিয়ে দাও। ১ নম্বরের ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে।

কাচের পাত্রে মিশ্রণটা রয়েছে। পাত্রটার কাণার উপরে ক ও খ চিহ্নিত ছুটা তামার রড্ বসানো হয়েছে। ব চিহ্নিত ব্যাটারী থেকে + চিহ্নিত পজিটিভ এবং − চিহ্নিত নেগেটিভ তার ছুটাকে তামার রড্ ছুটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে 'বাথ' তৈরী এবং ব্যাটারীর ব্যবস্থা করে নিয়ে আংটিটাকে খুব ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমে আংটিটাকে গরম কর। গরম থাকতে থাকতে সেটাকে জল-মিশ্রিত হাল্কা নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ অ্যাসিডে থাকবার পর কড়া ব্রাস দিয়ে ঘষে পরিস্রুত জলে (ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার) ধুইয়ে আগুনের আঁচে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নেবে। এরপর আবার সাধারণ নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়েই চট্ করে তুলে নেবে এবং নুণ, ভুষাকালি ও নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত পদার্থে ডুবিয়ে দিবে। এখান থেকে তুলে আংটিটাকে বেশ করে পরিস্রুত জলে ধুইয়ে অল্প আঁচে ধীরে ধীরে শুকিয়ে নেবে।
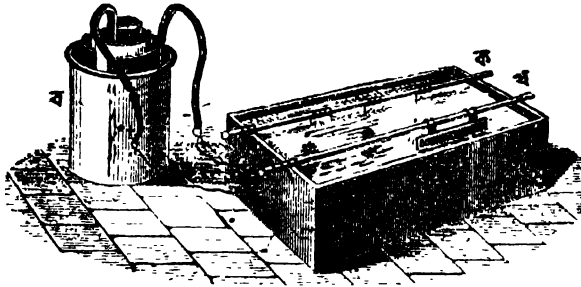
১নং চিত্র

এবার আংটিটাকে 'বাথে'র উপরে ব্যাটারীর নেগেটিভ তার সংলগ্ন রডের সঙ্গে

সরু তারে ঝুলিয়ে মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। পজিটিভ তার সংলগ্ন রড্ থেকেও সরু তারে ঝুলিয়ে একটুকরা সোনা মিশ্রণে ডুবিয়ে দিতে হবে। সোনার যে কোন একটা জিনিস ঝুলিয়ে দিলেই চলবে। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রণ থেকে তুললেই দেখবে আংটিটাকে আর পিতলের বলে চেনা যায় না। তার উপরে সোনার একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে গেছে। এই আস্তরণটাকে আরও পুরু করতে হলে আরও কিছু বেশী সময় মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর পরিষ্কার জলে খুব ভাল করে ধুইয়ে নিলেই হলো।

যেভাবে সোনার গিল্টি করা হয় ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই রূপা, তামা, নিকেল প্রভৃতির আস্তরণ দেওয়া হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। আংটিটাতে যদি রূপার আস্তরণ দিতে চাও তবে মিশ্রণটা হবে এরূপ :—২ ভাগ সিলভার সায়েনাইড, ১ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ১৫০ ভাল জল। আংটিটাকে ঝুলাতে হবে নেগেটিভ রড্‌টাতে, আর পজিটিভ রড্ থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে একখণ্ড রূপা। নিকেলের আস্তরণ দিতে হলে নিকেল অ্যামোনিয়াম সালফেটের 'বাথ' ব্যবহার করতে হবে। আর পজিটিভ রড্ থেকে মিশ্রণের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে একখণ্ড নিকেল।
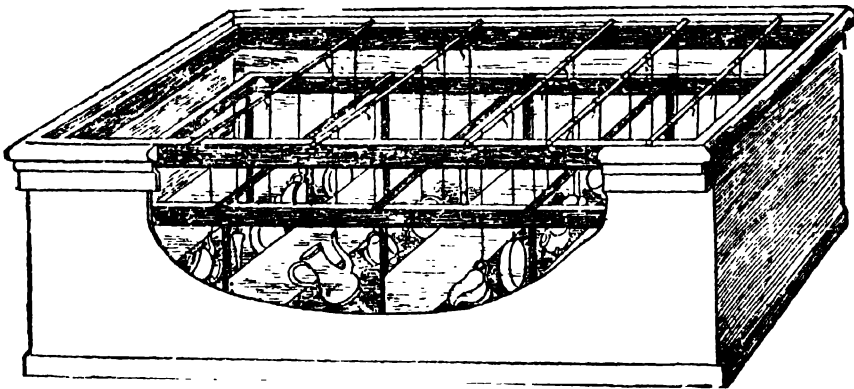
২নং চিত্র

যদি একসঙ্গে অনেকগুলো জিনিসকে গিল্টি করতে হয় তবে সেগুলোকে আলাদা ভাবে পজিটিভ তার সংলগ্ন রড্ থেকে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ২ নম্বরের চিত্র দেখলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে। প্রয়োজনমত ব্যাটারির সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে হবে। ইস্পাত, লোহা, দস্তা, সীসা, টিন প্রভৃতির জিনিস গিল্টি করা অনেকটা শক্ত। এসব জিনিস গিল্টি করতে হলে প্রথমে এদের উপর তামার আস্তরণ ধরিয়ে নিতে হয়। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াতেই তামা ধরাতে হয় তবে 'বাথে'র মিশ্রণটা হবে কপার-সালফেটের আমরা যাকে তুঁতে বলি।

গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

ঘড়ির কথা

সময়ের হিসেব রাখবার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পদে পদে অনুভব করে আসছে। তার ফলে, প্রাচীন যুগেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে সময় নির্ধারণের বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল। জল ঘড়ি, বালি ঘড়ি, সূর্য ঘড়ি, দাগকাটা বাতি এবং আরও কত রকমের সময়-নির্দেশক ব্যবস্থা যে প্রচলিত হয়েছিল সে-সব কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসের কথা তোমরা আর একদিন শুনবে। আমাদের নিত্যপরিচিত ঘড়ির যান্ত্রিক-কৌশলের বিষয়ে তোমাদিগকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলছি।

আজকাল রকমারি দেয়াল ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, হাত ঘড়ির ব্যবহার দেখা যায়। খুঁটিনাটি কল-কৌশলের বৈচিত্র্য ছাড়া প্রায় সব রকমের ঘড়ির যান্ত্রিক-কৌশলই মূলতঃ পেণ্ডুলামের দোলন-রীতি অনুসারে গঠিত। আজ থেকে প্রায় ৩৬৯ বছর পূর্বে পিসা নগরীর এক গীর্জায় বাতির ঝাড়ের দোলন দেখে গ্যালিলিও পেণ্ডুলামের দোলন-নিয়ম আবিষ্কার করেন। সেই পেণ্ডুলাম থেকেই দোলক ঘড়ির উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এই পেণ্ডুলাম ঘড়িও কার্যতঃ ব্যবহারোপযোগী হয়েছিল তার প্রায় ৯৩ বছর পরে—হয়ঘেনস্-এর চেষ্টায়। কিন্তু আরও প্রায় একশত বছর পরে জর্জ গ্র্যাহাম ঘড়ির এস্কেপ্মেণ্টের অধুনা প্রচলিত উন্নততর ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। পেণ্ডুলাম ঘড়ি এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে ঠিকমত চলতে পারে, অন্যথায় অচল। কিন্তু ব্যালান্স হুইল, এস্কেপ্মেণ্টের কৌশলে নির্মিত ঘড়ির কোন অবস্থাতেই চলার ব্যাঘাত ঘটেনা।
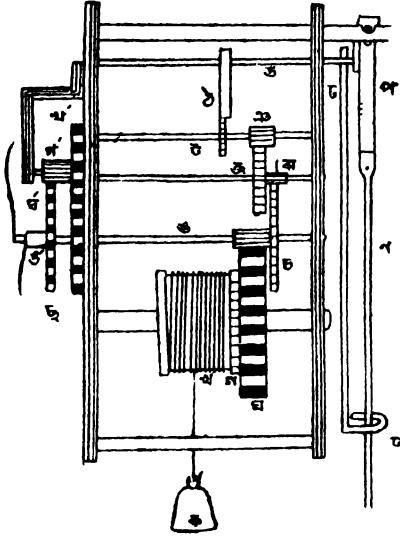
১নং ছবি

ঘড়ি কেমন করে চলে এখন সে কথাই বলছি। যদিও কেবল বর্ণনার সাহায্যে যান্ত্রিক-কৌশলের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝানো সহজ নয় তবুও ছবির সাহায্যে হয়তো মোটামুটি ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে। ১ নম্বরের ছবিটা দেখ। এতে পেণ্ডুলাম ঘড়ির কৌশলটা দেখানো হয়েছে। ছবির নীচের দিকে ঘ চিহ্নিত একটি বড় চাকা। তার গায়ে গ চিহ্নিত একটি ছোট চাকা। ২ নম্বর ছবিতে গ চিহ্নিত চাকাটিকে

পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। গ চিহ্নিত চাকার পরেই খ চিহ্নিত একটা খাঁজ কাটা ড্রাম। খ চিহ্নিত ড্রাম সমেত বড় চাকাটা নীচের দিকে ঘোরে। যদি ড্রামটার গায়ে একটা সরু তার জড়িয়ে প্রান্তভাগে ক চিহ্নিত ভারের মত কোন একটা ভার ঝুলানো যায় তবে কি হবে? ভারের টানে ড্রামটা ঘুরতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘ চাকাটাও ঘুরবে। ঘ চাকাটার সঙ্গে চ, জ, ট চিহ্নিত চাকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে দাঁতে দাঁতে সংলগ্ন। কাজেই ঘ চাকাটা ঘুরলে অন্য চাকাগুলোও ঘুরবে। তবে ঘ চাকা ঘুরবে খুব ধীরে, চ একটু বেশী, জ আরও বেশী এবং ঞ বা ট সব চেয়ে বেশী দ্রুতগতিতে ঘুরবে। কিন্তু কথা হচ্ছে—ড্রামে জড়ানো তারের সবগুলো পাক খুলে গেলে আবার কেমন করে তাকে সহজে জড়ানো সম্ভব হবে? ঘড়িতে চাবি দেওয়ার ব্যাপারটাই হলো এই খানে। ঘ চাকার রডের অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের বাইরের দিকটা চৌকো। ওতে চাবি পড়িয়ে ঘোরালেই ড্রামসহ রড্‌টা উল্টোদিকে ঘুরতে পারে। কিন্তু ঘ চাকাটা যেমন আছে তেমনই থাকবে, উল্টোমুখে ঘুরবে না। কেমন করে এব্যবস্থা করা হয়েছে ১ নম্বরের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। ২ নম্বরের ছবিতে খ চিহ্নিত জিনিসটা একটা ক্লিক—ক চিহ্নিত স্প্রিং দিয়ে চাকার বাঁকানো দাঁতের মধ্যে চেপে ধরা আছে।

২নং ছবি
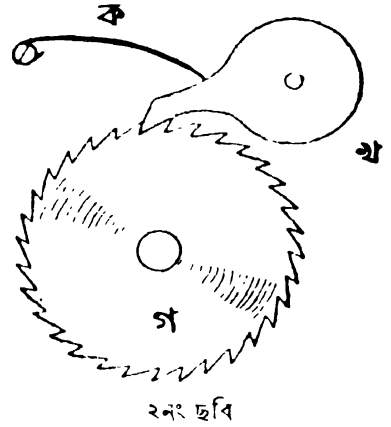
২ নম্বর চিত্রের খ চিহ্নিত ক্লিকটা কিন্তু আল্‌তোভাবে আটকানো আছে ঘ-চাকার গায়ে। কাজেই চাবি দিয়ে রড্‌টাকে বাঁ-দিকে ঘোরালেই ভার-বাঁধা তারটা আবার ড্রামের গায়ে জড়িয়ে যাবে। এখনকার ঘড়িতে তারে ঝুলানো ভারের পরিবর্তে ড্রাম বা ব্যারেলের মধ্যে স্প্রিং জড়ানো থাকে। স্প্রিংটাকে চাবি দিয়ে জড়িয়ে দিলে ঠিক ঝুলানো ভারের মতই কাজ করবে; অর্থাৎ জড়ানো স্প্রিংটা খোলবার ফলে সমস্ত চাকাগুলোই ঘুরতে থাকবে।

পূর্বেই বলেছি—ট চিহ্নিত চাকাটা খুব দ্রুতগতিতে ঘোরে; কিন্তু ঠ চিহ্নিত জিনিসটা তাকে ঠেকিয়ে রাখে। ঠ চিহ্নিত জিনিসটাকে বলাহয় প্যালেট্‌স্। ৩নং ছবিতে এই প্যালেট্‌স্ এবং ট-চাকার আকৃতি পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। প্যালেট্‌স্-এর দুটা বাহু ঢেঁকিকলের মত এদিক ওদিক ওঠা-নামা করতে পারে। ৩নং চিত্রে ১ নম্বর চিত্রের ট চিহ্নিত চাকার দাঁতগুলো দেখ্‌ছো তো—একদিকে হেলানো। এই চাকাটাকে বলা হয় স্কেপ-হুইল। স্কেপ-হুইল দ্রুতবেগে ঘুরে যেতে চায়। কিন্তু আটকা পড়ে ওই প্যালেট্‌স্-এর সূক্ষ্মাগ্র কাঁটায়। প্যালেট্‌স্ আটকানো থাকে ১নং চিত্রের ড চিহ্নিত রডের

গায়ে। এই রডের ডানপ্রান্তে সরু একটা লম্বা তার এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই তারটার সামনেই ফ্রেমে আটকানো প চিহ্নিত একটা পাতলা স্প্রিং-এর সঙ্গে ণ চিহ্নিত লম্বা তার জুড়ে তার নীচের প্রান্তে পেণ্ডুলামটি ঝুলিয়ে দেওয়া থাকে। চাকাগুলো যাতে তাড়াতাড়ি ঘুরে যেতে না পারে তার জন্যেই পেণ্ডুলামের প্রয়োজন। পেণ্ডুলাম হচ্ছে গতি নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। পেণ্ডুলামের তারটা গলে যাওয়া চাই ঢ চিহ্নিত তারের প্রান্তের গেরোর মধ্য দিয়ে। ৪নং চিত্রে পেণ্ডুলাম, স্কেপ-হুইল ও প্যালেটের ব্যবস্থা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।
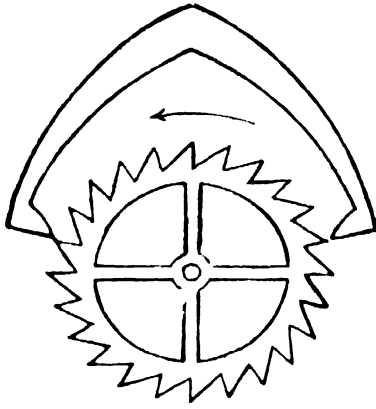
৩নং ছবি

এখন পেণ্ডুলামটাকে যদি দুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে? পেণ্ডুলামটা দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ নম্বরের তারটাও দোল খাবে। (এখানে ১ নম্বর চিত্রের সঙ্গে ৪নং চিত্র মিলিয়ে দেখ। ১ নম্বর চিত্রের ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, প ইত্যাদি অংশগুলোকেই ৪নং চিত্রে ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে।) আচ্ছা, এবার কৌশলটাকে বোঝবার চেষ্টা কর। ১নং রডের সঙ্গে ২নং তার এবং ৩নং প্যালেটটা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। কাজেই পেণ্ডুলামের দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ৩নং প্যালেটটাও এদিক-ওদিক ওঠা-নামা করতে থাকে। পূর্বেই বলেছি প্যালেটের সূক্ষ্মাগ্র ৪নং চাকাটাকে আটকে রাখে। নচেৎ চাকাটা দ্রুতবেগে ঘুরে যেত। প্যালেটটা ওঠা-নামা করবার মুখে চাকাটা এক এক দাঁত করে থেমে থেমে ঘুরতে থাকে। স্কেপ-হুইলের দাঁতগুলোর গঠন দেখছো তো?—টেরছা করে কাটা—সাধারণ চাকার দাঁতের মত সোজা নয়। এই জন্যে প্যালেটের সূক্ষ্মাগ্র, চাকার দাঁতের ফাঁক থেকে পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করবার সময় পেণ্ডুলামের দোলনের তালে তালে তাতে এক একটা করে ঝাঁকুনি লাগে। এর ফলে পেণ্ডুলামের দোলনও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। পেণ্ডুলাম, প্যালেট ও স্কেপ-হুইলের কৌশলে চাকাগুলোকে অতি মন্থরগতিতে একটু একটু করে ঘুরতে হয় বলে একবার দম দিলে ঘড়ি ৭।৮ দিন কি তারও বেশী সময় ধরে চলতে পারে।
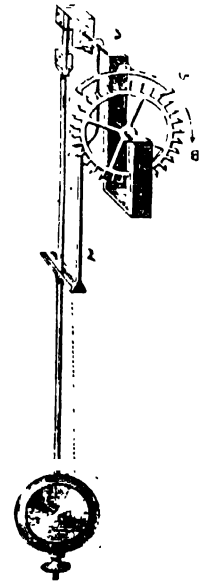
৪নং ছবি

ঘড়ির কাঁটা কিভাবে ঘোরে—এবার সেটা দেখা যাক। এবার ১ নম্বর চিত্রের বাঁ-দিকের অংশটা লক্ষ্য কর। চ-চাকার ঙ চিহ্নিত রডটা বাঁ-দিকে অনেকটা বেরিয়ে আছে। রডের এই বাইরের অংশটুকুর

গোড়ার দিকে আটকানো আছে ছোট্ট একটা চাকা। এই চাকাটা আবার র্খ চিহ্নিত বড় চাকাটার সঙ্গে দাঁতে দাঁতে সংলগ্ন। ছ চিহ্নিত চাকাটা রডের গায়ে আলতোভাবে বসানো আছে। র্গ দাঁতের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার ফলে ছ চাকাটা অতি ধীরে ধীরে ঘোরে। এই চাকাটার সঙ্গেই ঘড়ির ডায়েলের উপরে ঘণ্টার কাঁটা বসানো থাকে। মিনিটের কাঁটা আটকানো থাকে ড চিহ্নিত রডের প্রান্তভাগে।

পেণ্ডুলাম ঘড়ির প্রধান অসুবিধা হলো—একে নির্দিষ্টভাবে কোন স্থানে বসিয়ে রাখলে ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে; কিন্তু কোন রকমে স্থানচ্যুতি ঘটলে—হয় সময়ের ব্যতিক্রম ঘটবে, নয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পেণ্ডুলামের স্থলে ব্যালান্স হুইলের প্রবর্তন হয়। সূক্ষ্ম আলের উপর একটা ভারী চাকা বসানো। কুণ্ডলী করা খুব পাতলা একটা সরু স্প্রিং-এর ভিতরের প্রান্তভাগ আটকানো থাকে চাকার রডের সঙ্গে। স্প্রিং-কুণ্ডলীর বাইরের প্রান্তভাগ আবদ্ধ থাকে ঘড়ির ফ্রেমের সঙ্গে। এ-অবস্থায় চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিলে পেণ্ডুলামের এদিক-ওদিক দোলনের মত পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে, আবার ওদিকে পাক খেতে থাকবে। চাকাটার এই এদিক-ওদিক পাক খাওয়া যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—ঢেঁকিকলের মত শয়ানভাবে স্থাপিত
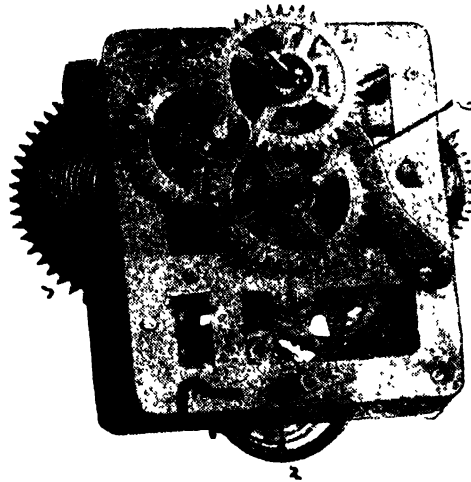
৫নং ছবি

একটা লম্বা রড্ বা লিভারের। ব্যালান্স হুইলের একপাশ থেকে ছোট্ট একটা কাঁটা বেরিয়ে থাকে। এই কাঁটাটা, চাকার পাক-খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক করবার সময় ঢেঁকিকলের মত লিভারটাকেও পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে আবার ওদিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এর ফলে স্কেপ-হুইল একটু একটু করে ঘুরতে থাকে। মোটের উপর পেণ্ডুলাম ঘড়ির যে যান্ত্রিক-কৌশলের কথা বলেছি এতেও সেই একই ব্যবস্থা। ব্যতিক্রমের মধ্যে

কেবল হেয়ার-স্প্রিং ও ব্যালান্স হুইল। ৫নং ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এখানে ১ নম্বরে বড় চাকার উপর মেইন স্প্রিং বাঁধা আছে। ২ নম্বরে ব্যালান্স হুইল ও হেয়ার-স্প্রিং দেখা যাচ্ছে। ৩ নম্বরে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা ঘোরবার চাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

পকেট ঘড়ি এবং হাত ঘড়ির যান্ত্রিক-ব্যবস্থাও ঠিক এই রকমের। তবে খুঁটিনাটি কতকগুলো যান্ত্রিক-কৌশলের পার্থক্য আছে। ৬নং ছবিতে একটা পকেট ঘড়ির ভিতরের অবস্থাটা দেখানো হয়েছে। ১নং—ঘড়ির চাবি। চাবিটাকে ডানদিকে ঘোরালে ২নং চাকাটি ঘোরে। ২নং চাকার সঙ্গে ৩নং চাকা দাঁতে দাঁতে সংলগ্ন; কাজেই সেটাও ঘুরবে।
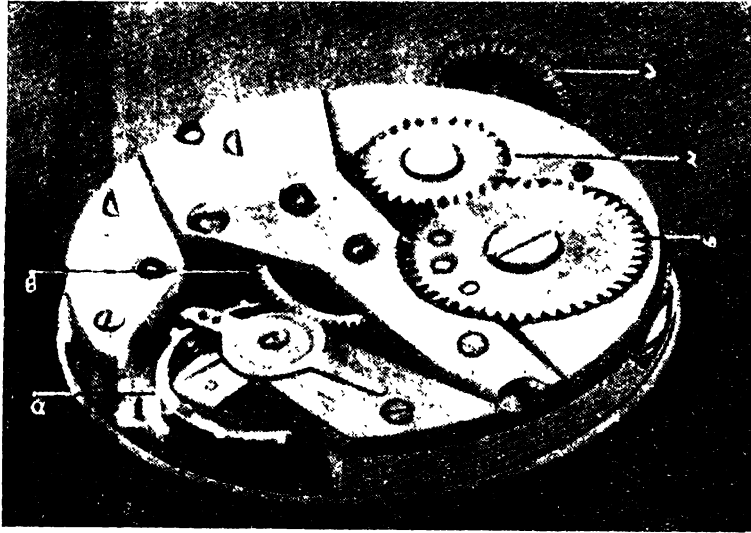
৬নং ছবি

৩নং চাকার নীচে একটা ব্যারেলের মধ্যে মেইন স্প্রিং জড়ানো। ৪ নম্বরের চাকাটা আছে ঠিক মধ্যস্থলে। এই চাকার রডের সঙ্গেই ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা বসানো থাকে। ৫ নম্বরে দেখা যাচ্ছে—হেয়ার-স্প্রিং আটকানো ব্যালান্স হুইল। এস্‌কেপ্‌মেণ্টের ব্যবস্থা—অর্থাৎ স্কেপ-হুইল ও প্যালেট্‌স্‌ রয়েছে ব্যালান্স হুইলের তলায়। ঘড়ি চলার কৌশলটা যদি বুঝে থাক তবে এ-ছবি থেকে পকেট ঘড়ি বা হাত ঘড়ির কৌশলটাও অনুমান করতে পারবে।

গ. চ. ভ.

বিজ্ঞানের বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞানের আদিযুগে

সভ্যতার আদিযুগে মানুষ সভয়ে পূজো করত জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যদেবকে। তারপর এলো সূর্যালোকের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের আলো। বিজ্ঞানের আদিযুগে সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগাবার প্রয়াস করেছিলেন তিনজন—প্রথমে আর্কিমিডিস, তার দুহাজার বছর পরে ফ্রান্সে মুশো এবং ল্যাভয়সিয়ের।

খৃষ্টপূর্ব ২২৫ সালে আর্কিমিডিস দর্পণের সাহায্যে সূর্যালোককে কেন্দ্রীভূত করে তার জ্বলন্ত তেজে আক্রমণকারী নৌবাহিনীকে জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় কাষ্ঠনির্মিত অর্ণবপোতের প্রচলন ছিল।

মুশোর সৌর-এঞ্জিনে প্যারাবোলিক দর্পণের দ্বারা কেন্দ্রীভূত সূর্যালোকে ছাপাখানার বয়লার গরম করা হতো। ল্যাভয়সিয়ের সূর্যালোক ফোকাস করে প্ল্যাটিনাম ধাতু গলিয়ে ফেলেছিলেন। প্ল্যাটিনামের গলনাঙ্ক হচ্ছে ৩১৮২ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

মহাযুদ্ধ ও আণবিক বোমা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে জাপানে পর পর দুটি আণবিক বোমার নিক্ষেপ ও তার মারাত্মক ফলাফল দেখে আজ পৃথিবীর প্রায় সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আণবিক বোমাই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করবে। আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লুকোচুরি ও দ্বন্দ্ব অনেকটা এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। কিন্তু সাধারণের এই বিশ্বাস কতখানি নির্ভরযোগ্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী পি, এম, এস, ব্ল্যাকেট। তাঁর লেখা "Fear, War and the Bomb" নামে একটি বই সম্প্রতি বেরিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক মহলে তার মতামত নিয়ে প্রবল বিতর্ক আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্ল্যাকেটের মতে—ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আণবিক বোমা কখনই চরম অস্ত্র হতে পারেনা—বিমান-বাহিনীর শ্রেষ্ঠতাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জয় পরাজয়। ভবিষ্যতে মহাসমর হতে পারে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে এবং রাশিয়া আণবিক বোমা নিয়ে প্রস্তুত হতে না পারা পর্যন্ত সংগ্রাম শুরু হতে পারে না। মোটামুটিভাবে দশ বছর বাদে আমরা দুই পক্ষকেই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাবো। তাহলে আণবিক বোমা নিয়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করতে হলে চাই দূর পাল্লার বিমান-আক্রমণ। ব্লকেটের দ্বারা আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে আক্রমণ চালানো সম্ভব নয় এবং রেডার যন্ত্র, উন্নতধরণের বিমানধ্বংসী কামান এবং ফাইটার প্লেনে সুরক্ষিত লক্ষ্যবস্তু ভেদ করা বিমান বাহিনীর পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য হবে না। কিন্তু আণবিক বোমার বিষয়ে একটা কথা বলবার আছে। অনেকের বিশ্বাস যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় সহরে কয়েকটি আণবিক বোমা ফেললে ধ্বংসের প্রাথর্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যাবে। ব্ল্যাকেট একথা মানতে চান না। তিনি বলেন, সুরক্ষিত সহরের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করতে হলে চাই—বড়দরের বিমান-বাহিনী—একটা আণবিক বোমাবাহী বিমানের রক্ষক হিসাবে তার চতুর্দিকে আরো বহুসংখ্যক বিমান। তারপরে, ধ্বংসকার্য এত দ্রুত শেষ হয়ে গেলে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হবার সময় পাবে; কিন্তু বোমাবর্ষণ এত সংক্ষেপ না হয়ে যদি কয়েকমাস ব্যাপী হয় তবেই রক্ষণ-বিভাগ ক্রমশ ক্লান্ত ও বিহ্বল হয়ে অকেজো হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া জনসাধারণের মানসিক শক্তির

ওপর ঘা দেওয়ার পন্থা এই রকমে সফল হবে না। মানুষের মন সবরকম অবস্থার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে এবং এই মনের জোরই আক্রান্ত জনসাধারণকে আণবিক বোমার আক্রমণের ভয়াবহতাকে নির্ভীকভাবে বহন করবার শক্তি দেবে।

নানাদিক বিচার করে ব্ল্যাকেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভবিষ্যৎ মহাসমরের ফলাফল শুধুমাত্র আণবিক বোমার দ্বারা হঠাৎ বোমাবর্ষণে নিষ্পত্তি হতে পারে না। আনবিক বোমা মারণাস্ত্র হিসেবে অভিনব ও চমকপ্রদ হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চাই শক্তিশালী সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং আধুনিক সমর সম্ভারের প্রাচুর্যের সমাবেশ এবং সর্বোপরি Strategic bombing। সেদিক দিয়ে রাশিয়ার আমেরিকার চেয়ে প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

ব্ল্যাকেটের বিপক্ষীয়রা তাঁর উপরোক্ত মতামতকে রাশিয়ার প্রোপাগ্যাণ্ডা ও রাশিয়ার নীতির পরিপোষক বলে ঘোষণা করেছেন। এইনিয়ে তর্কযুদ্ধের অবসান এখনো হয়নি।

মানুষের তৈরী মেসন

মহাকাশ থেকে কস্মিক রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে চলে বহুবিধ রূপান্তর। এই আণবিক ধ্বংসাবশেষ থেকে বিজ্ঞানীরা মেসন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রায় দশ বছর আগে। মেসন কণার সন্ধান বীক্ষণাগারে কোন যন্ত্রের সাহায্যে অনেক খোঁজাখুঁজিতেও পাওয়া যায়নি এতদিন। কিন্তু গত বছর চারশ' মিলিয়ন ভোল্ট আল্‌ফা কণার সাহায্যে মেসন কণার অস্তিত্ব ল্যাবরেটরীতে ধরা পড়েছে। এ বছর এক্‌স্‌-রশ্মি এবং প্রোটন কণার সংঘাতে অণুকেন্দ্র থেকে মেসন কণা পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Radiation Laboratory-র খবরে প্রকাশ যে, নবস্থাপিত সিন্‌ক্রটন যন্ত্র থেকে তিনশ' মিলিয়ন ভোল্ট এক্‌স্‌-রশ্মি এবং ১৮৪ ইঞ্চি সাইক্লট্রন যন্ত্র থেকে নির্গত সাড়ে তিনশ' মিলিয়ন ভোল্ট প্রোটন কণার সাহায্যে মেসন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

এ বৎসরের ১৭ই জানুয়ারী সিনক্রটন যন্ত্রটি চালু করা হয়েছে। ম্যাকমিলান নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী এবং ভেক্‌স্‌লার নামে এক রাশিয়ান পরস্পর স্বাধীনভাবে এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। ক্যালিফোর্নিয়ার যন্ত্রটি ইলেকট্রন কণাকে প্রচণ্ড গতিবেগ দেবার জন্যে তৈরী। সাধারণ সাইক্লট্রনে অল্পক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবেগ এত বেড়ে যায় যে, তখন গতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভর (Mass) দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে যন্ত্রের মধ্যে চৌম্বকক্ষেত্রের ঘূর্ণিপাকে তারা ক্রমশ বেটাল হয়ে পিছিয়ে পড়ে ও ইলেকট্রন-রশ্মি সৃষ্টি করার আশা ব্যর্থ হয়ে যায়। সিনক্রটন যন্ত্র এই অসুবিধা দূর করবার প্রয়াস মাত্র। ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষ অণুকেন্দ্রের পক্ষে মোটেই মারাত্মক নয় বলে যন্ত্রলব্ধ দ্রুত ইলেকট্রনের শক্তিকে অত্যুগ্র এক্‌স্‌-রশ্মিতে পরিণত করা হয়। এত প্রখর রশ্মি আর কোন উপায়েই পাওয়া যায় না।

১৮৪ ইঞ্চি সাইক্লট্রনটি এতকাল শুধু আলফা কণা ও ডয়টেরিয়াম কণার ত্বরণের জন্যে ব্যবহৃত হতো। প্রোটন কণাকে ত্বরণের জন্যে এর অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। ত্বরিত প্রোটনের সাহায্যে সাড়ে তিনশ' মিলিয়ন ভোল্ট নিউট্রনও পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ।

কারখানা থেকে পাইরেথ্রাম

কীটধ্বংসী পদার্থ হিসেবে পাইরেথ্রিয়ামের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। জাপান ও আফ্রিকা থেকেই এর চালান আসত এতকাল—পাওয়া যেত একরকম ফুল থেকে। যুদ্ধের পরে জাপানে পাইরেথ্রাম ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের কোন উন্নতিই করেনি। তার ফলে প্রাকৃতিক পাইরেথ্রাম আজ দুর্মূল্য। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিবিভাগের দুজন বিজ্ঞানী সম্প্রতি সাধারণ রাসায়নিক পদার্থ (কারখানায় যা সহজে উৎপন্ন হয়) থেকে পাইরেথ্রাম জাতীয় একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। দ্রুত কীটনাশ এবং যেখানে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হবার ভয় থাকায় ডি, ডি, টি ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেইসমস্ত অবস্থাতেই পাইরেথ্রাম ব্যবহার্য। ডি, ডি, টির মত দীর্ঘকালস্থায়ী ধ্বংস-ক্ষমতা কিন্তু পাইরেথ্রামের নেই।

সঞ্জয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | আগষ্ট—১৯৪৯ | অষ্টম সংখ্যা

আলোক-চিত্রে লেন্স্

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত।

চিত্রশিল্পী অতি সুন্দরভাবেই প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি ও প্রতিকৃতি আঁকিতে পারেন। দক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় বিষয়বস্তুর চিত্র নিখুঁতভাবেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ছবি আঁকা বহু আয়াস ও সময়-সাপেক্ষ।

যন্ত্রযুগে মানুষের শ্রম-লাঘব ও সময়-সংক্ষেপের জন্য যন্ত্রের প্রবর্তন হয়। যুগধর্মের প্রভাবে ও মানুষের শাশ্বত কৌতূহলের বশেই চিত্রশিল্পীর কাজ সহজ ও শ্রমলঘু করিবার জন্য সৃষ্টি হইল —ক্যামেরার।

আলোকই চিত্রের প্রাণ। কিন্তু উহার অনুভূতির জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তির। চিত্রশিল্পীর অন্য অনেক ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে দৃষ্টিহীন হইলে চলিবে না। আলোক-চিত্রযন্ত্র ক্যামেরারও তাই প্রয়োজন একটি উত্তম চক্ষুর—উহাই তাহার লেন্স্।

একটি বন্ধ বাক্সের একদিকে পিন বা ছুঁচ দিয়া ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রের ঠিক বিপরীত দিকে একখানি ঘষা-কাচ বসাইলে আমরা ঐ ঘষা কাচটির উপর স্পষ্ট একটি প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। ঐ ঘষা-কাচটির পরিবর্তে প্লেট বা ফিল্ম রাখিয়া ছবি তোলা যায়।

এইরূপ সূচ্যগ্র ছিদ্রের সহায়তায় ছবি তোলা যায় সত্য, কিন্তু উহার মধ্য দিয়া যে পরিমাণ আলোক পাওয়া যায় তাহা ছবির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ওইরূপ নিয়মে ছবি তুলিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন ও বহু পরিশ্রম করিতে হয়।

আবার আলোক বেশী পাইবার জন্য সূচ্যগ্র ছিদ্রটি বড় করিলে আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। কেননা তাহা হইলে ঐ বড় ছিদ্রপথ দিয়া একই বিষয়বস্তুর একই সময়ে অনেকগুলি প্রতিচ্ছবি আসিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হইয়া প্রতিচ্ছবিটিকে অবোধ্য করিয়া ফেলে। কিন্তু আলোক বেশী পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া আলোকরশ্মি এই ছিদ্রপথে প্রবাহিত হয়। ওই রশ্মি নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া যাহাতে একটি মাত্র প্রতিকৃতি গঠন করিতে পারে তাহাই আলোক-চিত্র গ্রহণের লক্ষ্য। ইহার মীমাংসা হইয়াছে একমাত্র লেন্সের দ্বারা।

লেন্স্ একপ্রকার কাচ। সাধারণ কাচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক প্রণালীতে কয়েক প্রকার রাসায়নিক মিশ্রণ দ্বারা বিশেষ এক প্রকার কাচ তৈয়ারী

হয়। ইহা দৃষ্টির কাজের পরিপূরক ও সহায়ক। এই কাচ হইতেই লেন্স্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার কাচকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ—ক্রাউন কাচ ও ফ্লিন্ট কাচ। ফ্লিন্ট কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আলোকরশ্মি প্রতি-সরণের ক্ষমতা ক্রাউন কাচ হইতে অধিক। আবার এই দুই শ্রেণীর কাচকে প্রায় একশত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সকল শ্রেণীর দৃষ্টি-কাচ দিয়াই আলোক-চিত্রের লেন্স্ প্রস্তুত করা যায় সত্য, কিন্তু নিখুঁত কাজের জন্য উহাদের

১নং চিত্র

মধ্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাচ বাছিয়া লওয়া হয়। কোন কোন দৃষ্টিকাচ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিতে বিশুদ্ধ রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান হইয়া পড়ে। এক বা একাধিক এইরূপ মনোনীত কাচের বিন্যাসে আলোক-চিত্রের লেন্স্ প্রস্তুত হয়। ক্রিয়া তারতম্য অনুসারে এই সকল লেন্স্ বিভিন্ন নামে পরিচিত।

মেনিস্কাস্ একটিমাত্র কাচ দিয়া প্রস্তুত লেন্স্। ইহা ফিক্স্‌ড্ ফোকাস অর্থাৎ নির্দিষ্ট আলোক-সমাহার-কেন্দ্রযুক্ত ক্যামেরাতেই ব্যবহৃত হয়। ইহার আলোক গ্রহণ শক্তি অত্যন্ত কম (এফ্. ১৪) এবং ইহার ব্যবহারে বিষয়বস্তুর চিত্রটি ঈষৎ বাঁকিয়া যায়। আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রটি (অ্যাপারচার) এই লেন্সের সামনের দিকে থাকিলে চিত্র বাহিরের দিকে বাঁকিয়া যায় (১নং চিত্র) এবং উহা পিছনে থাকিলে ভিতরের দিকে বাঁকিয়া যায়। (২নং চিত্র)

আলোক নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের সামনে ও পিছনে একটি করিয়া মেনিস্কাস্ লেন্স্ বসাইয়া এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়। (৩নং চিত্র)। ইহা

৩নং চিত্র

পেরিস্কোপিক লেন্স্ নামে পরিচিত। ইহার আলোক গ্রহণ ক্ষমতা কম (এফ্. ১১)।

চোখের পর্দায় আলোকরশ্মিকে আমরা সাদাই দেখিয়া থাকি, আসলে কিন্তু উহা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-জ্যোতির সমষ্টি। লেন্সের মধ্য দিয়া ঐ সকল বিভিন্ন রঙের রশ্মি নিজ নিজ নির্দিষ্ট দূরত্বে যাইয়াই বিবর্ণ- সমাহার-কেন্দ্র গঠন করে (৪ নং চিত্র)।

৪নং চিত্র

বিভিন্ন বর্ণ-রশ্মিগুলি একটিমাত্র কেন্দ্রে মিলিত না হইলে চিত্র ঝাপ্‌সা হইয়া যায়। মেনিস্কাস্

ও পেরিস্কোপিক লেন্সের কিরণ-সমাহার-কেন্দ্র নির্দিষ্ট থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট দূরত্বেই চিত্র স্পষ্ট হয়। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লেন্স্ সকল প্রকার নিখুঁত আলোক-চিত্র তুলিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। এইরূপ আলোকরশ্মির বর্ণ সম্বন্ধীয় ত্রুটি সংশোধন করিয়া ও আলোক গ্রহণ শক্তি বাড়াইয়া আর একটি উন্নত লেন্সের প্রচলন হয়—ইহাকে র‍্যাপিড্ রেক্টিলিনিয়র বা অ্যাল্ফাণ্ট অথবা সিমেট্রিক্যাল লেন্স্ বলা হয়। ইহাতে আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের সামনে ও পিছনে গ্রন্থিবদ্ধ ক্রাউন ও ফ্লিণ্ট কাচের বিন্যাস থাকে। এই শ্রেণীর লেন্স্ ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া চিত্রের আয়তন ও স্পষ্টতা আয়ত্ত করা যায়। যদিও ইহা পূর্বোক্ত দুই প্রকার লেন্স্ হইতে উন্নত তবুও ইহার আলোক গ্রহণ ক্ষমতা (এফ্ ৮) সর্বক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। ইহার আলোক গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াইয়া দিলে লেন্সের পরিধির প্রান্তসীমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত আলোক-প্রভা বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিফলিত হয়; ফলে ছবিতে ঐ সকল অংশ ঝাপ্সা হয়। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য রেক্টিলিনিয়র লেন্সের মৌলিক উপাদানের কিছু পরিবর্তন করিয়া অ্যানাস্টিগ্মেট লেন্সের প্রচলন হয়। ইহা গ্রন্থিবদ্ধ ছয়খানি বা ছয়খানিরও অধিক সংখ্যক লেন্সের বিন্যাসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আলোক গ্রহণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী (এফ্ ১·৫) এবং যে কোন প্রকার সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত নিখুঁত চিত্র তোলা যায়।

আলোকচিত্রের আধুনিক লেন্স্ নিখুঁত কাজ করিয়া থাকে, ইহাই আমরা জানি; আসলে কিন্তু তাহা নহে। গবেষণা দ্বারা ইহার ক্রমোন্নতি করিয়া বর্তমান স্তরে আনা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম বিচারে এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিখুঁত লেন্স্ প্রস্তুত হয় নাই। এই ত্রুটি এত সূক্ষ্ম যে, ইহা অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া নিখুঁত বলিয়াই চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে এই অতি সূক্ষ্ম ত্রুটিও একদিন সংশোধিত হইবে, আশা করা যায়।

আলোকরশ্মি সোজা পথে যায়, কিন্তু কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ঐ পদার্থের প্রকার ও গঠনভেদে উহার গতির দিক্ পরিবর্তন হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লেন্সের গঠন এরূপ করা হইয়াছে যাহাতে বিষয়বস্তু হইতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া লেন্সের মধ্য দিয়া প্রতিসরিত হইয়া আবার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়।

আরও এক প্রকার লেন্স্ আছে যাহার মধ্য দিয়া ঐ আলোকরশ্মি প্রবাহিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই লেন্স্টিকে পূর্বোক্ত লেন্স্টির পূরক হিসাবেই কাজে লাগান হয়; অথচ ইহা লেন্সের যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রবাহিত আলোকরশ্মির মিলন, তাহাতে বাধা দেয় না।

লেন্সের আলোকরশ্মি প্রতিসরণ ক্ষমতার তারতম্য নির্ভর করে উহার গঠনের উপর। উহার গঠনের বক্রতা যত বেশী হইবে লেন্সের শক্তি প্রতিপাও তত বেশী হইবে। এইরূপ লেন্সের শক্তি
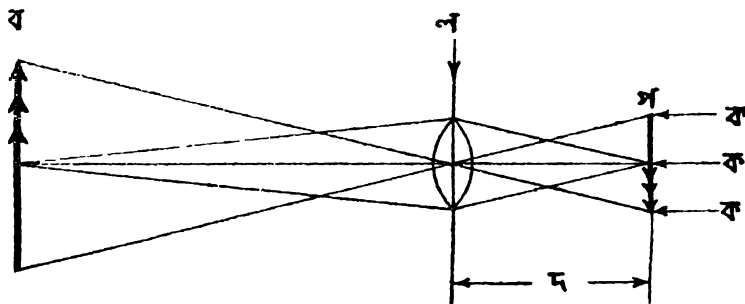
৫নং চিত্র

যত বেশী হইবে কিরণ-সমাহার-কেন্দ্র তত ছোট হইবে।

আলোকরশ্মির এই মিলন বিন্দুটিকে লেন্‌সের কিরণ-সমাহার কেন্দ্র বা ফোকাস বলা হয় (৫ নং চিত্র)। লেন্‌সের কেন্দ্র হইতে এই মিলিত বিন্দুটির দূরত্বকে লেন্‌সের কিরণ-সমাহার-দৈর্ঘ্য বা ফোকাল-লেংথ্ বলা হয়।

ক্যামেরা-লেন্‌সের ফোকাল-লেংথ্ সচরাচর প্লেট বা ফিল্মের লম্বাদিকের মাপ হইতে সামান্য বড় অথবা উহার কোণাকুণী মাপের সমান হওয়া লেন্‌সে দৃশ্যবস্তুর বিস্তার কম পাওয়া যায়; কিন্তু বস্তুর আকৃতি হয় বড় (৭ নং ছবি)। অতি নিকট হইতে দৃশ্যবস্তুর বিস্তার বেশী পাওয়া যায় বলিয়াই অধিকাংশ লোকেরই ছোট ফোকাল-লেংথের লেন্‌স্ ব্যবহার করিতে ঔৎসুক্য দেখা যায়।

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ১০" ইঞ্চি হইতে ১২" ইঞ্চি ফোকাল-লেংথের লেন্‌স্ দ্বারা ৮½"×৬½" ইঞ্চি মাপের ছবি তোলা হইয়া থাকে। অপরিসর স্থানে, যেখানে ক্যামেরা পিছু হটাইবার
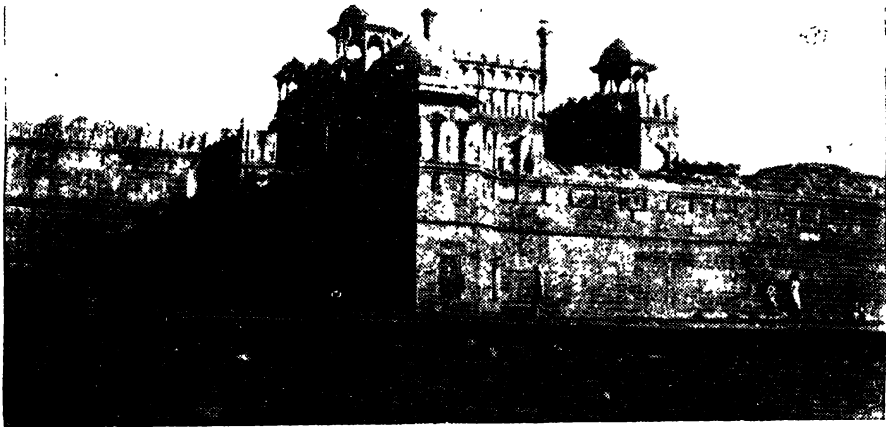
৬নং ছবি

উচিত। ফোকাল-লেংথের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ক্যামেরা-লেন্‌স্‌কে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ফেলা হয়:—হ্রস্ব বা সর্ট এবং দীর্ঘ বা লং ফোকাল লেন্‌স্।

যদি একই দূরত্ব হইতে একই মাপের ছবি ওই দুই রকমের লেন্‌স্ দিয়া তোলা হয় তবে ছোট ফোকাল লেন্‌সের প্রতিচ্ছবিতে দৃশ্যবস্তুর বিস্তার বেশী পাওয়া যায়; কিন্তু বস্তুর আকৃতি ছোট হয় (৬ নং ছবি); অপরপক্ষে বড় ফোকাল উপায় নাই এবং উপরোক্ত ফোকাল-লেংথের লেন্‌স্ দ্বারা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় অংশ পাওয়া যায় না, সে সকল ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫¼" ইঞ্চি ফোকাল-লেংথের লেন্‌স্ বাধ্যতামূলক ব্যবহার করাও চলিতে পারে। এইরূপ ছোট লেন্‌স্ ব্যবহার করিতে হইলে উহার ফোকাল-লেংথের অনুপাতে আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রটি ছোট করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় ১০০° ডিগ্রির এফ্ ৬·৫ শক্তির ৫¼" ইঞ্চি ফোকাল-
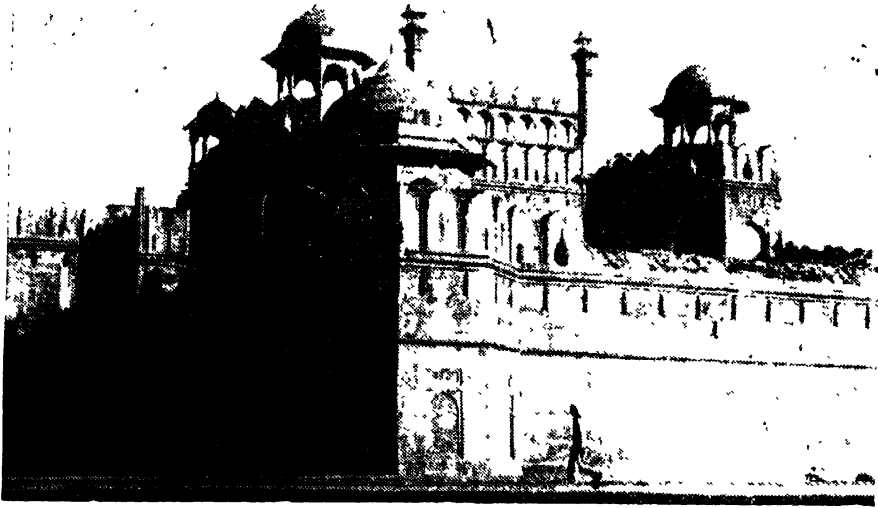
৭নং ছবি

লেংথের লেন্‌সে ৮½"×৬½" ইঞ্চি ছবি তুলিতে আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের ব্যাস কমপক্ষে এফ ১৬ করিতে হইবে।

চক্ষুর দৃষ্টিকোণে সম্মুখের বস্তু অপেক্ষা দূরের বস্তু দূরত্ব অনুযায়ী ক্রমশ ছোট দেখায়; কিন্তু উহাদের এইরূপ আনুপাতিক ছোট দেখা আমাদের চোখে তেমন অসমঞ্জস বোধ হয় না। ক্যামেরা-লেন্‌সও ঠিক একই রকমের কাজ করিয়া থাকে; কিন্তু লেন্‌সের মধ্য দিয়া যে নিদর্শন পাওয়া যায় উহা আসল দৃশ্যের আয়তন অপেক্ষা বহুগুণ ছোট হয়। এজন্য ছবিতে বড় ছোটর অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকটু হয়। উপযুক্ত লেন্‌সের বাছাই অথবা বিষয়বস্তুর শ্রেণী বিচার করিয়া নির্দিষ্ট দূরত্ব হইতে ছবি তুলিলে এই চক্ষু-পীড়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। লেন্‌সের আলোক-গ্রহণ-কোণ যত বিস্তৃত হয় (ওয়াইড অ্যাঙ্গ্‌ল্‌) এবং দৃশ্যবস্তুর খুব নিকটে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তুলিলে, এই বিসদৃশ ভাব ততই দৃষ্টিকটু হয়। লেন্‌সের নিকটতম অংশ দূরের অংশের তুলনায় অস্বাভাবিক দেখায়। এই জন্য এই শ্রেণীর লেন্‌স্‌ যতদূর সম্ভব বিষয়-বস্তু হইতে দূরে ব্যবহার করা উচিত।

বিষয়বস্তুর শ্রেণী ও পরিস্থিতি বিচার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফোকাল-লেংথের লেন্‌স্‌ ব্যবহার করা উচিত। আবশ্যকমত প্রত্যেক ক্যামেরা লেন্‌স্‌কেই পূরক লেন্‌সের সাহায্যে উহার ফোকাল-লেংথ পরিবর্তন করিবার উপায় আছে। সাধারণ কাজের জন্য ৫৫° ডিগ্রির লেন্‌স্‌ই উপযুক্ত। এই লেন্‌স্‌ দ্বারা নির্দিষ্ট দূরত্ব হইতে—যেমন মানুষের গোটা-শরীরের ও বুক পর্যন্ত ছবি তুলিতে যথাক্রমে ১০' ফিট ও ৫' ফিটের কম না হয়—এরূপ দূরত্ব হইতে ছবি তুলিলে ছবিতে অসামঞ্জস্যের ভাব প্রকট হয় না।

৩" ইঞ্চি ও উহার বড় আয়তনের ছবি তুলিতে ৫৫° ডিগ্রির এফ্‌ ৪.৫ লেন্‌স্‌ এবং উহার ছোট আয়তনের জন্য ৬০° ডিগ্রির এফ্‌ ২.৮ অথবা ৪০° এফ্‌ ১.৫ লেন্‌স্‌ই উপযুক্ত। অল্প পরিসর স্থানে ছোট ফোকাল-লেংথ (ওয়াইড অ্যাঙ্গ্‌ল্‌), প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির জন্য মাঝারি ফোকাল-লেংথ (মিডিয়াম অ্যাঙ্গ্‌ল্‌), মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর একক বা মিলিত

ছবির জন্য বড় ফোকাল-লেংথ (নেরো অ্যাঙ্গল্) এবং বহু দূরের বিষয়ের জন্য অত্যধিক ফোকাল-লেংথ (টেলিফটো) লেন্স্ ব্যবহার করিলে বিষয়বস্তুর আনুপাতিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

প্রত্যেক লেন্সের কাঠামোতে উহার ফোকাল-লেংথের উল্লেখ থাকে। লেন্সের মুখে উপযুক্ত পূরক লেন্স্ বসাইয়া প্রত্যেক ক্যামেরা-লেন্সের ফোকাল-লেংথ্ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থাও আছে।

আলোকের শক্তি বা উজ্জ্বলতা যেখানে উগ্র, সেখানে আমাদের চোখের পাতা ক্রমশ বন্ধ করিয়া আলোকের তেজ আয়ত্ত করিয়া থাকি, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যবস্তুও চোখের পর্দায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপ আলোক-প্রভা যাহাতে ইচ্ছামত লওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক লেন্সের মধ্যে আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের (অ্যাপারচার বা ডায়াফ্রাম অথবা ষ্টপ) ব্যবস্থা থাকে।

লেন্সের ফোকাল-লেংথ্ ও উহার ব্যাসের অনুপাতে $\left(\frac{\text{ফোকাল-লেংথ্}}{\text{ব্যাস}}\right)$ আলোক-নিয়ন্ত্রণ ফুকর বা ছিদ্রটির ব্যাস স্থির করা হয়। ৪" ইঞ্চি ফোকাল-লেংথের লেনসের ব্যাস যদি ১" ইঞ্চি হয় তবে ঐ লেন্সের আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের ব্যাস (৪"÷১"=৪") ৪" ইঞ্চি হইবে। আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের পূর্ণ ব্যাসই হইল ঐ লেনসের পূর্ণ শক্তি। প্রত্যেক লেনসের কাঠামোতে এই ছিদ্রটির ব্যাস আনুপাতিক অঙ্কের দ্বারা দাগ দেওয়া থাকে। এই আনুপাতিক পরিমাণ ইংরেজী বর্ণমালার ছোট এফ (f) দ্বারা নির্দেশ করা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে (f.2; 2·8; 4; 5·6; 8; 11; 16; 22; 32 প্রভৃতি); যদিও পূর্বে ইউ, এস্ (ইউনিফরম সিসটেম) দ্বারাও নির্দেশ থাকিত (U. S. 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 প্রভৃতি)। এই নির্দেশ সংখ্যার রচনা এমনভাবে স্থির করা থাকে যে, আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রটির ব্যাস এক একটি ধাপ কমাইলে উহার পূর্ববর্তী ধাপ হইতে আলোকের ঔজ্জ্বল্য অর্ধেক হ্রাস পাইবে; অর্থাৎ এফ্ ৪-এ যে আলোক-প্রভা পাওয়া যায়, এফ ৫·৬-এ ঐ আলোক-প্রভাই অর্ধেক নিস্তেজ হইয়া ক্যামেরার ভিতরে প্লেট বা ফিল্মের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। এক্সপোজারও ঐ অনুপাতে বাড়াইতে হইবে। অর্থাৎ এফ ৪-এ যে এক্সপোজার লইতে হয়, এফ ৫'৬-এ উহার দ্বিগুণ লইতে হইবে।
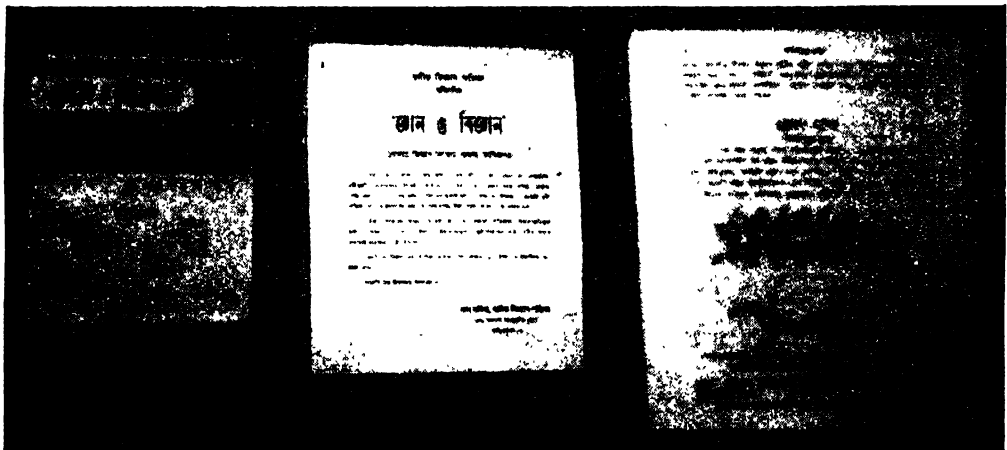
৮নং ছবি

মুখ্য বিষয়বস্তু যদি একের অধিক হয় এবং পরস্পর হইতে দূর দূর পংক্তিতে থাকে তবে অধিক শক্তির লেন্‌সে সকল পংক্তির স্পষ্টতা পাওয়া যায় না। উহার যে কোন এক পংক্তিকে স্পষ্ট ফোকাসের মধ্যে আনিলে অন্য পংক্তিগুলি অস্পষ্ট হইয়া যায় (৮ নং ছবি); যাহাকে আলোক-চিত্রের ভাষায় "আউট অব ফোকাস" বলা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে যতগুলি পংক্তিই হউক না কেন, উহাদের মধ্যস্থলের যে দূরত্ব তাহাই স্পষ্ট ফোকাস করিয়া আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের ব্যাস আনুপাতিক কমাইয়া দিলেই সকল পংক্তির বস্তুই স্পষ্ট ফোকাসের মধ্যে আসিয়া যাইবে (৯ নং ছবি)। ইহাকে "ডেপ্‌থ্‌ অব ফোকাস্‌" বলে।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রটি যত ছোট করা যায়, স্পষ্টতা তত বেশী করিয়া পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু ছবির কোমলতা ক্রমশ দূর হইয়া কর্কশ হইয়া উঠিবে। আবার অধিক শক্তির লেন্‌স্‌ যেমন কোমলতা ফুটাইয়া তোলে সঙ্গে সঙ্গে উহার আনুপাতিক স্পষ্টতাও হ্রাস পায়। উদ্দেশ্য অনুযায়ী অতিকোমল হইতে অতিকর্কশ সকল প্রকার ছবিরই প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অধিক শক্তির লেন্‌স্‌ আয়ত্তে রাখিলে উহাকে ইচ্ছামত কম শক্তি করিয়া সব রকম কাজে লাগান যায়। ইহা ছাড়া চঞ্চল বালক-বালিকা, শোভাযাত্রা, যানবাহন, জীবজন্তু প্রভৃতি সচল বিষয়বস্তুর ছবি তুলিতে যে ক্ষেত্রে অতি কম এক্সপোজারের প্রয়োজন সেই সব ক্ষেত্রে ইহা নির্ভুল কাজ করিয়া থাকে।
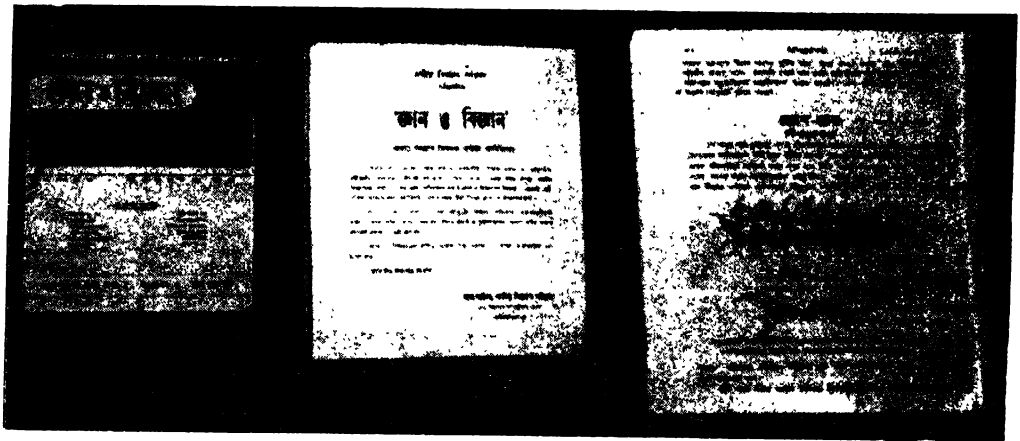
৯নং ছবি

আবর্জনাও কাজে লাগে

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজে আবর্জনা জঞ্জাল ভেবে ছেঁড়া আসবাব-পত্র, জামাকাপড়, কাগজ, লোহালক্কড় প্রভৃতি কত জিনিস না আমরা রোজকে রোজ রাস্তাঘাটে ডাস্টবিনে ফেলে দিই। কিন্তু কবির সেই কথা যদি আমরা স্মরণ করি—

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
থাকিলে থাকিতে পারে অমূল্য রতন।

সত্যিই হিসেব করলে দেখা যাবে, বাজে অকেজো জিনিস ভেবে যা আমরা ফেলে দিতে দ্বিধা বোধ করি না সে সব মূল্যহীন আবর্জনা থেকেও কত সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহাম শহরে একবার নয় মাস ধরে সংগৃহীত আবর্জনা-স্তূপ থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল—৩ আউন্স সোনা, ১৭০ আউন্স রূপো, ১২ টন তামা, ১ টন সীসে, ২ টন অ্যালুমিনিয়াম ও আরো অনেক কিছু। এসব জিনিসের মূল্য মোটামুটি হবে ২০০০ পাউণ্ড।

অধিকাংশ শহরেই স্তূপীকৃত আবর্জনা দিয়ে গর্ত, ডোবা প্রভৃতি ভরাট করা হয়। ইংল্যাণ্ডে বার্মিংহামেই সর্বপ্রথম আবর্জনাকে লাভজনক সদ্ব্যবহারে লাগানোর প্রচেষ্টা হয়। এখন অনেক বড় শহরে আবর্জনা কাজে লাগানো হচ্ছে। গাড়ি-ভর্তি আবর্জনা সংগৃহীত হবার পর তা থেকে প্রথমে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা ধূলোবালি পৃথক করা হয়। সংগৃহীত ধূলোবালি বড় বড় নল দিয়ে বাহিত হয়ে অন্যত্র জমা হয়। পরে এই ধূলোবালি রাস্তাঘাট তৈরী প্রভৃতি কাজে লাগে। ধূলোবালি পৃথক করার পর আবর্জনারাশিকে বৈদ্যুতিক চুম্বকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতব জিনিসগুলো চুম্বকের আকর্ষণে পৃথক হয়ে যায়। ক্ষুরের ব্লেড, পেরেক, গ্রামোফোন পিন, সাইকেলের অংশ প্রভৃতি বহু জিনিস এর মধ্যে পাওয়া যায়। এরপর আবর্জনা থেকে যথাক্রমে ন্যাকড়া, কাগজ ও অন্যান্য জিনিস পৃথক পৃথক করে বেছে নেওয়া হয়। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা জ্বালানী কাজে ব্যবহার করা চলে। বার্মিংহাম শহরে আবর্জনা পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহকারী মোটরগাড়ির ব্যাটারী চালাবার ব্যবস্থা আছে। পোড়াবার পরে সে ভস্মাবশেষ জমিয়ে নকল প্রস্তর খণ্ড তৈরী করা যায় এবং তা রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা চলে।

এইভাবে বিভিন্ন জিনিস পৃথক করে নিয়ে যথাযথ কাজে লাগানো হয়। ছেঁড়া কাগজ থেকে আবার নতুন কাগজ তৈরী হয়। কাগজ সাধারণতঃ তৈরী হয় কাঠের কুচি, খড় আর কয়েক জাতের ঘাস থেকে। ওসবের মধ্যে সেলুলোজ বলে এক রকম জৈব-পদার্থ থাকে। এই সেলুলোজ বের করে তাই দিয়ে কাগজের মণ্ড তৈরী হয়। ছেঁড়া, ময়লা কাগজগুলোর মধ্যেও প্রায় সবটাই এই সেলুলোজ। কাজেই পুরনো কাগজকেও আবার মণ্ড করা যায়। কিন্তু পুরনো কাগজ থেকে আবার ভাল কাগজ তৈরী করা সম্ভব নয়। কারণ, ছাপা কাগজের কালির রং তোলা যায় না, এইটেই হল সবচেয়ে বড় অসুবিধা। পুরনো কাগজ দিয়ে তাই মোটা ও রঙিন কাগজ ও পেস্টবোর্ড তৈরী হয়ে থাকে।

ছেঁড়া কাপড় ও ন্যাকড়া থেকে আবার নতুন কাপড় তৈরী হয় শুনলে অনেকের হয়তো আশ্চর্য

লাগবে। কিন্তু আশ্চর্য মনে হলেও এটা একেবারে অসম্ভব নয়। আবর্জনা থেকে সংগৃহীত ন্যাকড়াগুলো প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হয়। কারণ, তুলোর কাপড়, সিল্কের কাপড়, পশমী কাপড় সবগুলো একই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় না। বাছাই করার পর এগুলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কৃত ও রোগ-বীজাণু মুক্ত করে নেওয়া হয়। পশমী কাপড়ের ন্যাকড়াগুলো যন্ত্রের সাহায্যে ধুনে নেওয়ার পর এগুলো আবার সুতো তৈরীর কাজে লাগে। এই রকম সুতোয় তৈরী কাপড় নতুন কাপড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। ইউরোপের নানা জায়গায় এই রকম পুরনো পশমের কারবার ও সেই সম্পর্কিত বিশাল ব্যবসায় গড়ে উঠেছে। এই রকম পশমী কাপড়ের নাম 'শডি'। তুলোর কাপড়ের ন্যাকড়া থেকে ভাল কাগজ তৈরী করা যায়। ব্যাংক বা কারেন্সী নোটে যে কাগজ ব্যবহার করা হয়, তা অনেক জায়গায় এই রকম ন্যাকড়া থেকে তৈরী হয়। এই ন্যাকড়া থেকে কৃত্রিম রেশম তৈরী করার ব্যবস্থাও আছে। আবার রেশমী ন্যাকড়া থেকে ভেলভেট বা মখমল তৈরী হয়।

পুরনো, ভাঙা, মরচে-ধরা লোহালক্কড় আমরা কতই না ফেলে দিয়ে নষ্ট করি! বিলাত, আমেরিকার লোকেরা কিন্তু এগুলোকে এরকম অকেজো বাজে ভেবে ফেলে দেয় না। জার্মেনী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক শহরে প্রত্যেক বাড়িতে আবর্জনা রাখবার জন্যে পাত্র বসানো থাকে। এই সমস্ত আবর্জনা রোজ এক-একটা জায়গায় জড়ো করা হয়। মজুরেরা সেগুলো থেকে নানা ধরণের জিনিস বেছে বেছে আলাদা করে। তার মধ্যে যেগুলো একটু ভাল অবস্থায় থাকে, সেগুলো একটু আধটু মেরামত করে আবার ব্যবহার করা হয়। যেসব লোহালক্কড় মেরামত করা চলে না সেগুলো আবার নতুন করে গলিয়ে নতুন লোহা, নতুন ইস্পাত তৈরী হয়। আমেরিকার বিখ্যাত ফোর্ড মোটরের কারখানায় এ-ধরণের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে এই আবর্জনা বাছাই করার জন্যেই রোজ ৮০০ লোক খাটে।

মৃত জীবজন্তুর হাড় এক রকম আবর্জনা। কিন্তু বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ তাকেও কাজে লাগিয়েছে। হাড় পরিষ্কার করে জলে সিদ্ধ করলে জিলাটিন নামে এক অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়। জিলাটিন ফটোগ্রাফীর কাজে অপরিহার্য ও চকোলেট প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যাদি তৈরী করতে লাগে। হাড় পুড়িয়ে এক রকম কয়লা পাওয়া যায়, তাকে বলে বোন চারকোল। ময়লা চিনি, নুন প্রভৃতি পরিষ্কার করতে এই হাড়-কয়লা না হলে চলে না। আবার হাড় গুঁড়ো করে জমির সার তৈরী হয়। হাড়ের উপাদান ফসফরাস উদ্ভিদের অন্যতম খাদ্য।

শহরের নদমা দিয়ে নোংরা জলের সংগে কত পংকিল পদার্থ নিত্য বয়ে যায়। এই নোংরা আবর্জনারও কার্যকারিতা উদ্ভাবিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের অনেক জায়গায় জমির সার এ-থেকে তৈরী করা হয়। আমেরিকায় এই সব পংকিল কর্দমাক্ত ক্লেদ থেকে উৎপন্ন গ্যাস, পেট্রোল বা কেরোসিন তেলে চালিত ইঞ্জিন চালাবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গ্যাসে শতকরা ৭০ ভাগ মিথেন বা মার্স গ্যাস থাকে—যা হলো দাহ্য পদার্থ। আজকাল পেট্রোলের অভাবে কাঠ কয়লায় উৎপন্ন গ্যাস দিয়ে যেভাবে মোটর চালানো হচ্ছে, এই গ্যাস দিয়েও সেই কাজ করা চলে। কয়লা চালিত বাষ্পকলেও এই গ্যাসকে কয়লার পরিবর্তে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা যায়।

কয়লা থেকে পাইন প্রণালীতে কয়লা-গ্যাস পাবার প্রক্রিয়ায় যে আলকাতরা পাওয়া যায় তাও এক কালে অকেজো নোংরা আবর্জনা বলে ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আলকাতরা থেকে আজ কতই না জিনিস তৈরী হচ্ছে! এখন শত শত মূল্যবান রং, ওষুধ, এসেন্স,

তৈল জাতীয় পদার্থ আলকাতরা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আবর্জনাও যে কত কাজে লাগে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো এই আলকাতরা।

করাত দিয়ে কাটার পর কাঠের যে গুঁড়ো পাওয়া যায়, তা সাধারণতঃ পোড়ানো ও প্যাকিংএর কাজে লাগে। কিন্তু রাশিয়ায় এখন কাঠের গুঁড়ো থেকে চিনি ও সুরা তৈরী হচ্ছে। কাঠের গুঁড়ো থেকে বিদ্যুৎ-অপরিচালক পেস্টবোর্ড তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আখ মেড়ে চিনি তৈরী করার পর যে আখের ছোবড়া ও ঝোলা বা চিটে গুড় থাকে তা এতকাল আবর্জনাই ছিল। ছোবড়া দিয়ে বিদ্যুৎ-অপরিচালক পেস্টবোর্ড তৈরী করা যায়। আমেরিকায় আজকাল সেলোটেক্স্ নামে এক রকম উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ-অপরিচালক বোর্ড এই ছোবড়া থেকে তৈরী হচ্ছে। ঝোলা গুড় থেকে সুরা ও কৃত্রিম রেশম তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় অ্যাসিটোন নামে রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট পেট্রোল তৈরী করাও সম্ভব। খড়, গরু-মোষের খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। বহু খড় প্রতি বছর মাঠে মাঠে অযথা নষ্টও হয়। এখন খড় থেকে রং, কাপড় ও পেস্টবোর্ড তৈরী হচ্ছে এবং পুষ্টিকর আহার্য উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

বাজে জঞ্জাল ভেবে যা আমরা ফেলে দিই, এমনি জিনিসও কত না কাজে আসে! কমলা লেবুর খোসা থেকে এক রকম তেল উৎপন্ন হয়। আপেলের খোসা থেকে পেকটিন নামে রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। জেলী ও জ্যাম তৈরী করতে এই পেকটিন খুব দরকারী। চা তৈরীর পর চায়ের পাতা আমরা ফেলে দিই। কিন্তু চায়ের পাতায় ট্যানিন নামে রাসায়নিক পদার্থ আছে, যার চাহিদা ও দাম কোনটাই তুচ্ছ নয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে পুকুরে পুকুরে কচুরীপানা ভর্তি। কচুরীপানাকে জঞ্জাল ও আপদ বলেই লোকে জানে সাধারণতঃ। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত আবর্জনা থেকেই কাগজ তৈরীর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের দেশে।

বিজ্ঞানীর কাছে পদার্থমাত্রেই অবিনশ্বর; কাজেই কোন জিনিসই আবর্জনা নয়। ব্যবহারের যথাযথ পদ্ধতি জানা থাকলে অকিঞ্চিৎকর আবর্জনাকেই বহুমূল্য সম্পদে পরিণত করা যেতে পারে। ইউরোপ আমেরিকায় আবর্জনা ব্যবহারের বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বহু লোক সেখানে আবর্জনা স্তূপ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কুড়িয়ে জীবিকার্জন করে। আমাদের দেশে আবর্জনা ব্যবহারের এ-রকম কোন ব্যাপক ব্যবস্থা আছে বলে তো জানি না। কলকাতা শহরে প্রতিদিন যে পরিমাণ আবর্জনা জমে, তাতেও হাজার হাজার টাকা অপচয় হচ্ছে। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে, লণ্ডন শহরে প্রতি বছর ২০ লক্ষ টন আবর্জনা ফেলে দেওয়া হয়, যার আনুমানিক মূল্য অন্ততঃ ২½ লক্ষ পাউণ্ড। কলকাতার আবর্জনার মূল্য বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। সুখের বিষয়, সম্প্রতি আমাদের জাতীয় সরকার কলকাতা ও শহরতলীর আবর্জনা থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা ও পয়ঃপ্রণালী বাহিত ময়লা জল সেচকাজে ব্যবহার সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্যে আলাপ আলোচনা চলেছে।

বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু

শ্রীহৃষীকেশ রায়

দিনরাত্রি ও ঋতুভেদে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান অনুসারেও সারা বৎসরই বায়ু এক নির্দিষ্ট গতিপথে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রথমোক্তরূপ বায়ুপ্রবাহকে সাময়িক-বায়ু ও শেষোক্তকে নিয়ত-বায়ু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাময়িক-বায়ু-প্রবাহের ফলে নিয়ত-বায়ুপ্রবাহ ব্যাহত হইতে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত নামীয় দুইটি অনিয়মিত বায়ুপ্রবাহও ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। পর্বত বা মরুভূমির বিশেষ অবস্থানের ফলে কোন কোন দেশে নানাকারণে আরও একপ্রকারের স্থানীয় আকস্মিক বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়।

দৈনিক সংবাদপত্রগুলি আমাদিগকে দেশের কোন অংশে কখন বৃষ্টিপাত হইবে, দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রভৃতির বিবরণ সহ দৈনন্দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়। কোন ঘূর্ণবাতের আশঙ্কা থাকিলে বায়ুচাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভ নামিয়া আসে। উষ্ণ বায়ুর চাপ লঘু, শীতল বায়ুর চাপ উচ্চ। এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে শীতল ও উষ্ণ বায়ুর মিলনস্থলে কেন্দ্রে লঘু চাপের সৃষ্টি হইয়া ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি হয়। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু, উত্তর বা উত্তর-পূর্ব শীতল মেরু বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে সাধারণতঃ এই অবস্থা দেখা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলেও অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এইরূপে হঠাৎ কোন কারণে কোন স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উর্ধ্বগামী হইলে সেখানে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং চতুস্পার্শ্ববর্তী উচ্চ চাপযুক্ত বায়ু কুণ্ডলাকারে বাইস-ব্যালটের* নিয়মানুসারে উত্তর গোলার্ধে বামাবর্তে এবং দক্ষিণ-গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। এই উর্ধ্বগামী ও কেন্দ্রমুখী বায়ুই ঘূর্ণবাত। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রকে "চক্ষু" বলে।

কোনও স্থানের বায়ুচাপ কম বলিলে ইহাই বুঝায় যে, সেই স্থানের বায়ুর পরিমাণ কম; কারণ বায়ুর ওজনই বায়ুর চাপ। কোন দেশের বিভিন্ন আবহমন্দিরের বায়ু চাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভের উচ্চতা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সকল স্থানের বায়ুচাপ অভিন্ন নয়। কি কারণে বায়ু লঘু হইয়া ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি করে, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। অতীতে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, শীতল বায়ু বেষ্টিত উষ্ণ বায়ু কেন্দ্রে থাকিয়া নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। বায়ু অচঞ্চল হইলে হয়ত ইহা সম্ভব হইত। কিন্তু সতত চঞ্চল বায়ুর পক্ষে এই অনুমান অসিদ্ধ। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক বিগেলো সেজন্য এই যুক্তি অসার প্রতিপন্ন করিয়া স্থির করেন যে, শীতল ও উষ্ণ বায়ুস্রোতের সীমান্তে এইরূপ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। হেলমহোলৎজ্ ও নরওয়েজীয় আবহতত্ত্ববিদ্‌গণের অক্লান্ত চেষ্টায় কিভাবে উষ্ণ ও ও শীতল বায়ুস্রোতের সীমান্তে ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি হয় তাহা নির্ধারিত হইয়াছে। তাহাদের মতে উষ্ণ বায়ুস্রোত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শীতল

* বাইস্‌-ব্যালটের সূত্র—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাচ্ আবহতত্ত্ববিদ্ বাইস্‌-ব্যালট এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন। কোন ব্যক্তি যদি বাতাসের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে তাঁহার দক্ষিণ দিক অপেক্ষা বামদিকে বায়ুর চাপ কম হইবে, দক্ষিণ গোলার্ধে এই নিয়ম বিপরীতভাবে প্রযোজ্য।

বায়ুস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে, শীতল বায়ুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে এবং উষ্ণ বায়ু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়; অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের উষ্ণ প্রত্যায়ন-বায়ুর সহিত শীতল মেরু-বায়ুর সংঘর্ষে কেন্দ্রে বায়ুর নিম্নচাপ হয়। এইরূপে ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হইয়া তাহা ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘূর্ণবাত কিন্তু স্থানীয় তাপাধিক্যের ফলেই হয় বলিয়া অনুমিত। কারণ এই অঞ্চলের দ্বীপগুলি প্রখর সূর্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া বায়ুতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। দেখা গেল, ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে বায়ুর নিম্নচাপ ও কেন্দ্রের বাহিরে উচ্চচাপ হওয়া আবশ্যক। অবশ্য ঘূর্ণবাতের সঠিক কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই

পূর্বে দেখিয়াছি যে ঘূর্ণবাতে কেন্দ্রের বাহিরে উচ্চ চাপযুক্ত বায়ু উত্তর গোলার্ধে বামাবর্তে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র কোনও একস্থানে স্থির নয়; ইহা ঘুরিতে ঘুরিতে সাধারণতঃ উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্বদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে স্থানীয় অন্যান্য কারণে এই গতিপথের পরিবর্তন হইতে দেখা যায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাত দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর ব্যতীত প্রায় সকল মহাসাগরের উত্তপ্ত অংশে, বিশেষতঃ আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশে, মেক্সিকো উপসাগরে, বঙ্গোপসাগরে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীন সমুদ্রে সংঘটিত হয়। নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে ঘূর্ণবাত দেখা যায় না; কিন্তু ১০° হইতে ২০° অক্ষাংশের মধ্যে গ্রীষ্মকালে ইহার প্রভাব বেশী। গ্রীষ্মের ও শীতের মৌসুমী বায়ুর প্রারম্ভে ভারত-মহাসাগরে যে ঘূর্ণবাত হয় তাহাকে আমরা যথাক্রমে কালবৈশাখী ও আশ্বিনে ঝড় বলি। চীন সমুদ্রেও ঐ সময়ে যে সকল ঘূর্ণবাত হয় তাহাকে টাইফুন বলে এবং ইহাই পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে টাইফুন নামে অভিহিত। ঘূর্ণবাতের ইংরাজী প্রতিশব্দ সাইক্লোন কথাটি মিঃ এইচ., পিডিংটন বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণবাতের নাম করণের সময় সৃষ্টি করেন।

উৎপত্তিস্থলে যদিও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের ব্যাস মাত্র ৫০ মাইল, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে এই ব্যাস ১৫০ হইতে কয়েক শত মাইল বিস্তৃত হয় এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরও কয়েক শত মাইলব্যাপী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। কেন্দ্রে বায়ু লঘু, আকাশ স্থানে স্থানে গভীর মেঘাচ্ছন্ন, অবশিষ্টাংশ নির্মেঘ। কেন্দ্রের বহির্ভাগে বায়ুর গতিবেগ সময়ে সময়ে ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল হইয়া ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে। ঘূর্ণবাত অগ্রসর হইবার সময় বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও চীন সাগরের উপর দিয়া দৈনিক গড়ে প্রায় ২০০ মাইল যায়। ভারত মহাসাগরেও এই গতিবেগ দৈনিক ৫০ হইতে ২০০ মাইল; পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে এই গতিবেগ সর্বোচ্চ—দৈনিক গড়ে প্রায় ২৫০ হইতে ৪০০ মাইল। ঘূর্ণবাতের গমনকালে কেন্দ্রে গ্রীষ্মকালে ঝড়বৃষ্টি এবং শীতকালে তুষারপাত হইতে দেখা যায়। এইরূপে ইহা কোন দেশ অতিক্রম করিয়া গেলে আকাশ নির্মেঘ হইয়া শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে।

ঘূর্ণবাত সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় উহার কেন্দ্র আংশিকভাবে বায়ুশূন্য হওয়ায় সমুদ্রের জল ঊর্ধ্বগামী হইয়া জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে। এই জলস্তম্ভ বাইস্-ব্যালটের সূত্র অনুসারে সমুদ্র-পথে অগ্রসর হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল, চীন ও জাপানের উপকূল এবং মেক্সিকো উপসাগরে জলস্তম্ভ বেশী দেখা যায়। কোন কারণে মরুভূমির উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলের উক্ত অবস্থা হইলে বালুকা স্তম্ভাকারে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বালুস্তম্ভের সৃষ্টি করে।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ঘূর্ণবাতগুলি আয়তনে সাধারণতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাত অপেক্ষা বৃহত্তর। উত্তর আমেরিকায় ইহার ব্যাস সার্ধ সহস্র মাইল; উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ও অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ ঘূর্ণবাত দেখা যায়। ইহা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইলেও স্থলভাগে কিছু দক্ষিণে ও জলভাগের উপর দিয়া যাইবার সময় কিছু উত্তরে বাঁকিয়া যায়। এই মণ্ডলেও গ্রীষ্ম ও শীতের প্রারম্ভে ঘূর্ণবাত দেখা যায়, তবে গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতেই বেশী। জাপান ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, বেরিং সাগর, আলাস্কা উপসাগর, উত্তর আমেরিকার উত্তরের বৃহৎ হ্রদগুলি ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ঘূর্ণবাতের একটি পথরেখা অঙ্কিত করে। অপর একটি পথ ফ্লোরিডা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া নরওয়ের উপকূল, রাশিয়ার উত্তরাংশ দিয়া মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে। ইহা ব্যতীত ভূমধ্যসাগরের উত্তরাংশ হইয়া মধ্য এশিয়া পর্যন্ত একটি পথ বিস্তৃত আছে। দক্ষিণ গোলার্ধে ৬০° অক্ষাংশের সমান্তরালভাবে এইরূপ আরও একটি ঘূর্ণবাতের পথ রহিয়াছে। দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানই ঘূর্ণবাতের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত নয়। এই ঘূর্ণবাতের গতিবেগের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই—গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতে ইহার গতিবেগ অধিক, আবার ইউরোপ অপেক্ষা আমেরিকার ঘূর্ণবাতগুলি প্রবল।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বেশ স্পষ্ট—(১) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের সমপ্রেষরেখাগুলি নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের সমপ্রেষরেখা অপেক্ষা সুসংবদ্ধ ও প্রায় গোলাকৃতি, (২) প্রথমোক্ত ঘূর্ণবাতের চতুর্দিকে উত্তাপের সমতা থাকিলেও দ্বিতীয় প্রকার ঘূর্ণবাতে এই উত্তাপের পার্থক্য লক্ষিত হয়, (৩) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতে যেরূপ প্রবল বৃষ্টিপাত হয় নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ঘূর্ণবাতে সেরূপ হয় না, (৪) গ্রীষ্ম ও শরতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের প্রভাব বেশী; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের প্রভাব বেশী শীতে; (৫) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাত নিজ সীমা অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডল অতিক্রম করিয়া নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে প্রবেশ করিলেও, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ঘূর্ণবাত কখনও গ্রীষ্মমণ্ডলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় না। (৬) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের ন্যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাতের সহযোগী কোন প্রতীপ ঘূর্ণবাত নাই, যদিও ইহা স্বাভাবিক যে, দুইটি ঘূর্ণবাতের মধ্যে প্রতীপ ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়।

ঘূর্ণবাতের কারণগুলি বিপরীতক্রমে সংঘটিত হইলে অর্থাৎ কেন্দ্রে উচ্চচাপযুক্ত বায়ু এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে নিম্নচাপযুক্ত বায়ু থাকিলে প্রতীপ ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দুইটি অগ্রগামী ঘূর্ণবাতের মধ্যবর্তী প্রদেশেও প্রতীপ ঘূর্ণবাত দেখা যায়। প্রতীপ ঘূর্ণবাতে কেন্দ্রের উচ্চ চাপযুক্ত বায়ু নিম্নচাপের বায়ুর দিকে অগ্রসর হইবার সময়, উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে এবং দক্ষিণ-গোলার্ধে বামাবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হইলেও, প্রতীপ ঘূর্ণবাতে কেন্দ্রে নিম্নগামী বায়ুর দ্বারাই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়। এই নিম্নগামী বায়ুর গতি দৈনিক মাত্র কয়েক শত ফিট। প্রতীপ ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র গতিশীল অবস্থায় শীতল, কিন্তু গতি স্থির হইলেই ইহা উত্তপ্ত হইতে থাকে। যদিও প্রতীপ ঘূর্ণবাতের সময় নির্মেঘ আকাশ আশা করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-সময় অবস্থা বিশেষে কুয়াশা, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি হয়। ঘূর্ণবাতের তুলনায় ইহার গতি অতি দুর্বল ও ধীর, কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।

গ্রীনল্যাণ্ড ও অ্যান্টারটিকার উচ্চ চাপ বলয়ে প্রতীপ ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার পশ্চিমে ও চিলির নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরে, আটলান্টিক মহাসাগরের অ্যাজোরস্ দ্বীপপুঞ্জের

নিকট ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রে এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে বায়ুমণ্ডলে এইরূপ উচ্চ চাপের সৃষ্টি হওয়ায় এই সকল অঞ্চলে প্রতীপ ঘূর্ণবাত দেখা যায়। ঘূর্ণবাতের ন্যায় প্রতীপ ঘূর্ণবাতের কারণগুলি এখনও বহুলাংশে রহস্যাবৃত; প্রকৃতির এ রহস্যভেদ করিতে এখনও আমরা সক্ষম হই নাই।

ঘূর্ণবাতের ধ্বংসলীলা অতি ভয়াবহ। বাংলার উপকূলবর্তী প্রদেশে বর্ষাকালে প্রায়ই ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। ইহার ভয়াবহতা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখের ঘূর্ণবাতে কয়েক সহস্র লোকের প্রাণহানি ও বহু আর্থিক ক্ষতি হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকের সাগরে ২২ মে এই ঘূর্ণবাত উৎপন্ন হইয়া ঘণ্টায় ৬ হইতে ৮ মাইল বেগে ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইহা ২৫ মে বাখরগঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় ও উক্ত স্থানের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ইহা অপেক্ষা বহুগুণে ভয়াবহ ঘূর্ণবাত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বাখরগঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সকল ঘূর্ণবাতের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ইহাদের প্রখরতা খুবই বৃদ্ধি পায়।

যে সকল ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রের ব্যাস খুব ছোট, মাত্র ১০০ হইতে ৪০০ গজ, এমনকি সময়ে সময়ে ৫০ গজেরও কম হয় তাহাকে টর্নেডো বলে। ঘূর্ণবাত অপেক্ষা আয়তনে ছোট হইলেও ইহার তীব্রতা অত্যন্ত অধিক; সেজন্য ইহা কেন্দ্র হইতে ৩০ মাইল স্থানেরও ক্ষতি সাধন করিতে পারে। বায়ু-প্রবাহ যতই কুণ্ডলাকারে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, বায়ুর গতিবেগ ততই বর্ধিত হইয়া কখনও কখনও ঘণ্টায় ৩০০ মাইলও হয়; কিন্তু ইহার অগ্রগতির বেগ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ২০ হইতে ৮০ মাইল। যদিও ইহার স্থায়িত্বকাল অতি অল্প, ইহার গতিপথে বৃহৎ অট্টালিকা, বৃক্ষাদি যাহা কিছু পড়ে তাহাই উন্মূলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়; বায়ুচাপ এত কমিয়া যায় যে, নিকটবর্তী আবহ-মন্দিরের সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি অকর্মণ্য হয়; এমন কি পাখীর পালক পাখীর ডানা হইতে খসিয়া পড়ে। টর্নেডো প্রবাহিত হইবার সময় প্রবল বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপতন প্রভৃতি হইতে দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও মধ্যভাগে ইহার প্রাবল্য (বৎসরে প্রায় ৫০টি লক্ষিত হইলেও, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে ইহা একেবারে বিরল নয়। এত যে প্রবল প্রতাপ টর্নেডোর, তাহা মাত্র ৩০ মাইল অগ্রসর হইবার পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুর নিম্নস্তরেও টর্নেডোর উৎপত্তি হয়, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে তাহার কোন ক্রিয়া নাই।

পর্বত, উপত্যকা, মরুভূমি প্রভৃতির বিশেষ অবস্থানের ফলে এবং স্থানীয় আরও অনেক কারণে বায়ুতে উচ্চ বা নিম্ন চাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়া মাঝে মাঝে যে বায়ু প্রবাহ হয়, তাহাকে স্থানীয় বায়ু বলে। সাধারণতঃ ইহা ৩৫° হইতে ৫০° অক্ষাংশের মধ্যে ঘটিতে দেখা যায়। ইহাদের প্রকৃতি অনুসারে নামকরণ হইলেও, বিভিন্ন দেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বসন্তকালে নিম্ন বায়ু-চাপের জন্য ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত সাহারা ও আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত, শুষ্ক ও বালুকাপূর্ণ বায়ু ঐ অঞ্চলের সিসিলি দ্বীপে ও ইতালীতে "সিরক্কো" নামে পরিচিত হইলেও, মিশরে ইহাকে "খামসিন" এবং আরবে "সাইমুম্" বলে। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিবার সময় এই বায়ু যথেষ্ট জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া উত্তর উপকূলের পর্বতে বাধা পাইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। উত্তর আমেরিকার সিয়েরা নিভেদা পর্বতের পূর্বপ্রান্ত হইতে এইরূপ উত্তপ্ত বায়ু ক্যালিফোর্ণিয়ার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়।

আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে সুইজারল্যাণ্ডের

উপত্যকায় শীতকালে যে শুষ্ক, উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের আবির্ভাব প্রায়ই হয়, তাহা "ফন" নামে পরিচিত। এই বায়ুপ্রবাহের পূর্বে কয়েকদিন বরফাবৃত উপত্যকাগুলি শীতল ও শান্ত থাকে; পরে "ফন"-এর প্রবাহ আরম্ভ হয় এবং তাপ মাত্রাও ৪০° বর্ধিত হইয়া বরফ গলাইয়া বন্যার সৃষ্টি করে এবং চারণ-ভূমিগুলিও বরফমুক্ত হয়। বায়ু এত শুষ্ক যে, সামান্য অগ্নি-সংযোগেই কাষ্ঠনির্মিত গৃহাদি ভস্মীভূত হয়। "ফন" বায়ু-প্রবাহ একবারে তিন চারি দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। ঐ সকল স্থানে বৎসরে প্রায় ৩০।৪০ দিন "ফন" প্রবাহিত হওয়ায় শরতের ফল শীঘ্র পাকিয়া উঠে, কিন্তু "ফন"-এর তাপ সেখানকার অধিবাসীর অসহ্য হয়। "ফন"-এর সহিত "সিরক্কো"-র বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনেকে ইহাদিগকে একই শ্রেণীভুক্ত করেন। "সিরক্কো"-বায়ু স্বভাবতঃই উষ্ণ; কিন্তু ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশের বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ায়, দক্ষিণ বায়ু তাহার প্রবাহপথে সুইজারল্যাণ্ডের উপত্যকায় প্রবল বেগে নামিয়া আসে ও সংকুচিত হইয়া উত্তপ্ত হয়। "ফন" বায়ুর প্রভাবে সুইজারল্যাণ্ডে নির্মেঘ আকাশ ও শুষ্ক জলবায়ু দেখা গেলেও ইতালীর উত্তর প্রান্তবর্তী আল্পসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

"ফন"-এর ন্যায় আরও একপ্রকারের বায়ু-প্রবাহ গ্রীনল্যাণ্ডের বরফাবৃত মালভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া পশ্চিম উপকূলের ফিয়র্ডগুলিকে বরফমুক্ত করে। অবতরণকালে সংকোচনের ফলে এই বায়ু এত উত্তপ্ত হয় যে, গ্রীনল্যাণ্ডবাসীদের পক্ষে ইহা আদৌ আরামপ্রদ নহে।

উত্তর আমেরিকার কানাডা ও উত্তর পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের উপর দিয়া উষ্ণ ও শুষ্ক "চিনুক" বায়ু প্রবাহিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের হইতে প্রবাহিত হইয়া এই বায়ু রকি পর্বত অতিক্রম করিয়া সংকোচনের ফলে উত্তপ্ত হয় ও প্রেয়ারী অঞ্চলের বরফ গলাইয়া গম চাষের সুবিধা করিয়া দেয়। "চিনুক" বায়ু-প্রবাহের ফলে দেশের স্বাভাবিক তাপ ১৪° ফারেনহাইট হইতে ৬৮° ফারেনহাইটে উঠে।

পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত সমুদ্র ও স্থল বায়ুর ন্যায় পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে দিবা ও রাত্রিকালে তাপের বৈষম্য হেতু এক প্রকার বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আল্পস্ ও হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকায় এই বায়ুর প্রভাব দেখা যায়। নির্মল আবহাওয়ায় দিবাভাগে পর্বতগাত্র উত্তপ্ত হইলে সেখানকার বায়ু পার্শ্ববর্তী ও উপত্যকার বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ হয়। ফলে সেখানে বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ায় নিম্নের উপত্যকার বায়ু সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পর্বতগাত্র বাহিয়া উর্ধ্বগামী হয়। মেঘমুক্ত আকাশ ও তাপ বিকিরণের অন্য কোন বাধা না থাকিলে, পর্বতগাত্র ও উপত্যকার বায়ু শীতল হইয়া উপত্যকার উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা শীতল ও ভারী হয় এবং সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়। আল্পসের পাদদেশে ইতালীর হ্রদ অঞ্চলে উর্ধ্বগামী উপত্যকার বায়ুকে "ব্রিভা" ও নিম্নগামী পার্বত্যবায়ুকে "টিভানো" বলে।

দক্ষিণ ফ্রান্সে রোন নদীর উপত্যকা বাহিয়া "মিষ্ট্রাল" নামক একপ্রকার শীতল স্থানীয় বায়ু-প্রবাহ বহিয়া যায়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মেঘমুক্ত বসন্তের প্রারম্ভে সূর্যোত্তাপে বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হইলে ইউরোপের উত্তরের শীতল বায়ু-প্রবাহ দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় উপকূলস্থ উপত্যকায় প্রবলবেগে বহিতে থাকে। রাত্রিকালে "মিষ্ট্রাল" বায়ুর প্রভাব হ্রাস পায়। যদিও উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইবার সময় ইহা সংকোচনের ফলে উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রোন উপত্যকায় ইহা খুব শীতল। আড্রিয়াটিক সাগরের দেশে এই বায়ুর নাম "বোরা"।

দক্ষিণ গোলার্ধে আয়তনে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের দ্বিগুণ অ্যান্টার্টিকা মহাদেশ। এই মহা-

দেশ সমুদ্র হইতে ৮০০০ হাজার ফিট উচ্চ চির-তুষার আবৃত একটি মালভূমি। এখানে শীতল বায়ু বৎসরের সকল সময় বহে বলিয়া এই দেশকে "ব্লিজার্ড"-এর দেশ বলে। এই বায়ু-প্রবাহের সহিত জমাট শুষ্ক তুষারকণা বাহিত হইয়া দৃষ্টিশক্তিকে অচল করিয়া পথিককে পথভ্রান্ত করে। অনেক আবিষ্কারক এই "ব্লিজার্ড" বায়ুর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। "ব্লিজার্ড" বায়ু বহিবার সময় তাপ ০°-র নীচে নামিয়া আসে। এইরূপ তুষার-বাত্যাকে কানাডা ও মেরুপ্রদেশে "ব্লিজার্ড," রাশিয়া ও সাইবেরিয়াতে "বুরান" এবং তুন্দ্রা অঞ্চলে "পুরগা" বলে।

কথাটা সত্যি

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর ব্লেক্‌স্‌লিকে চেনেন? ইনি একজন উদ্ভিদ-তত্ত্বের নাম করা লোক। জাতিতে আমেরিকান, পেশায় ডিরেক্টর, স্মিথ কলেজ জেনেটিক্‌স্ এক্‌সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনের। সম্মানে অধ্যাপক, অধ্যাপনা করেছেন হার্ভাডে, র‍্যাডক্লিফে ও কনেকটিকাটে। ব্লেক্‌স্‌লি এসেছিলেন আমাদের দেশে, দিল্লীতে, ১৯৪৭ সালের সায়ান্স কংগ্রেসে সদস্য হিসেবে। তিনি গত বছরের আমেরিকায় প্রকাশিত 'সায়ান্টিফিক মন্থলি'তে তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং ভুলে যাওয়া দিনের আর এক বিদেশীর মতই বলেছেন, "সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ।"

বলেছেন—ভারতবর্ষে অপূর্ব বৈপরীত্যের বিচিত্র সমাবেশ। কথাটা বেশ ভাল লাগছে শুনতে, কেমন ত? 'আমরা দেখলাম মানুষ শুয়ে রয়েছে পথে, দেখলাম দিল্লীর মসজিদের সোপান 'পরে। কেন না, তাদের থাকবার জায়গা নেই যে! তারপরই আমরা ঢোকলাম বড়লাটের বিরাট প্রাসাদে, যেখানে হলো বড় ভোজ; সুরা স্যাম্পেনের ছড়াছড়ি!'

ব্লেক্‌স্‌লির দল সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন সায়ান্স কংগ্রেসের বৈঠকে এসে—সব সভার সব কাজকর্ম ইংরেজি ভাষায় হচ্ছে দেখে। বিশেষ করে, যে দেশে ভাষা আর উপভাষার সংখ্যা একশো-কেও ছাড়িয়ে গেছে! যাক সে কথা।

এইবার একটা মজার কথা শুনুন। অন্যদেশকে আমরা কত বাড়িয়ে তুলি। একজন মহিলা উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক নাকি শেওলার অর্থনৈতিক ব্যবহারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলে বসেছিলেন—আমাদের দেশে আমেরিকায় যা করে তা-ই করা উচিত। আমেরিকায় প্রত্যেক জেলের একটা মাছ ভর্তি পুকুর থাকে। তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক দিয়ে শেওলা বাঁচানো এবং বাড়ানো হয়। মাছগুলো সেই শেওলা খেয়ে বাড়তে থাকে, আর যখন খুসি জেলে মাছ ধরে নিয়ে আসে। ব্লেক্‌স্‌লি বলছেন, তাঁরা এ রকম পরিকল্পনার কথা এই শুনলেন। এমন মাছ জীয়ানো পুকুর কখনও দেখেন নি।

এদেশের লোকের ধারণা, আমেরিকার সবই কলে হয়। যখন তিনি বললেন যে, তাঁদের দেশে এত ঝি-চাকর মেলে না, তখন চোখ-বড়-করা উত্তর পেয়েছেন—তা, আপনাদের দেশে আর কি, বিজলীর বোতাম টিপলেই সব মেলে!

ভারতের সভ্যতা অনেককালের পুরনো, আজ

থেকে চার হাজার বছর আগেকার। ব্লেকস্‌লির মতে ভারতবাসী অন্য জাতির তুলনায় বুদ্ধিতে খাটো নয়। গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ভারতবাসীরা বেশ কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। অবশ্য অধ্যাপক রামনের কথা আলাদা; তিনি পরীক্ষা-বিজ্ঞানেও হাত দেখিয়েছেন। এদেশে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের ছাত্রদের হাতে কলমে কাজ করতে অনিচ্ছা ব্লেকস্‌লির চোখে পড়েছে। তাঁর মতে, সেই কারণেই ব্যবহারিক বিজ্ঞান এদেশে প্রসার লাভ করে নি। ভারতবাসীর সঙ্গে একজন আমেরিকানের এইখানেই পার্থক্য—একজন আমেরিকান যখন পি-এইচ.ডি পেলো তখন থেকে তার বিজ্ঞানবহুল কর্মজীবনের সূচনা হলো; আর একজন ভারতবাসী পি-এইচ.ডি পেলে, ব্যস্—তার বিজ্ঞান গবেষণার সেখানেই যবনিকা পতন! কথাটা আমাদের কাছে নতুন নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুবারই এই কথা বলেছেন, "আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করি ইত্যাদি।" পুরনো হলেও, বিদেশীর মুখে একটু নতুন শোনায় বৈকি! এরপর আর একটি কথা বলেছেন, যেটা কাগজের বুকে আর কোন দিন চোখে পড়ে নি—যদিও আমাদের অজানা নয়। তাঁর মনে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের গদিতে বসলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি ভারতবাসীর শ্লথ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, আর একটু বেশি মাত্রা আছে,—বৈজ্ঞানিক গবেষণার চাইতে গদির দাম এখানে বেশি। দুই একজন ভারতবাসী, যারা ব্লেকস্‌লির লাইনে বা ঐ জাতীয় মৌলিক গবেষণায় রত আছেন, তাঁরা ব্লেকস্‌লির সঙ্গে ওসব বিষয়ে কথা পর্যন্ত কইতে পান নি। ব্লেকস্‌লির মনে হয়েছিল, তাঁদের যেন আড়াল করে রাখা হয়েছে।

আমরা যে বিদেশীর অভিমতে ও অনুমোদনে হুমড়ি খেয়ে পড়ি, তাও ব্লেকস্‌লির নজর এড়ায় নি। অর্থাৎ তাঁকে এসব বিষয়ে ভারতবাসীই ওয়াকেফ-হাল করে তুলেছেন। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ করেছেন যেন তিনি তাঁর বক্তৃতায় তাঁদের (ভারতীয়দের) গবেষণার উল্লেখ করেন; তাহলেই তাঁদের কথা কর্তৃপক্ষের কানে আসবে। দেশ না হয় গরীবের, তা'বলে কি কাঙালেরও! চাকুরী-শিকারের বাজারে বিদেশী অধ্যাপকের প্রশংসাপত্রের বেশি মূল্য দেওয়া হয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ঠাঁট বজায় রাখার জন্যে উমেদারদের "কনে-দেখা" হয়; কিন্তু চাকরী দেওয়া হয়, আগে থেকে নির্বাচন করে রাখা সেই ভারতপুঙ্গবকে যিনি ইউরোপের কোন গৃহকোণে অধ্যাপকের আওতায় সদ্য গবেষণা-রত। তার জন্যে আবার বিশেষ ব্যবস্থা। চাকরী তার জন্যে তোলা থাকে, বৎসরান্তে তিনি শিকা থেকে কাজটিকে পেড়ে নেন। ব্লেকস্‌লি বলেছেন, ভারতে সুপারিশে সরেশ কাজ হয়। যোগ্যতায়? কে জানে! তাঁকে একটি ভারতীয় ছাত্র সুপারিশের জন্যে এই কথা স্পষ্ট বলে আবেদন করেছিল। যাইহোক, ব্লেকস্‌লি সাহেব ব্যাপারটিকে বড় করে ধরেন নি। আইনের ভাষায় 'বেনিফিট অফ ডাউট' দিয়েছিলেন। ব্লেকস্‌লি বলছেন—তিনি মহারাজা হতে চান। অর্থ, পত্নী আর উপ-স্ত্রীর জন্যে নয়, বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারে দেশের উন্নতি সাধনের জন্যে। তিনি বলছেন—দু' চারটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন বসু বিজ্ঞান মন্দির, টাটা হস্‌পিটাল ইত্যাদি। কিন্তু এই বিরাট দেশের তুলনায় সে তো মুষ্টিমেয়! এমন আরও চাই।

ব্লেকস্‌লি তবু তো ১৯৪৪ সালে আসেন নি! হয়তো বাংলাদেশে আসেন নি! নইলে আরও কত কি দেখতেন! আমাদের দুর্ভাগ্য যে বিদেশীও জানতে পেরে গেছে এসব গ্লানির কথা, বোধকরি ডাষ্টবিন উপচে পড়ছে বলেই। "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!"

কদলী-ভক্ষণ

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত।

"কলা খাইটে অটি উট্টম"—শুধু উত্তমই নয়, এই খাদ্যাল্পতার যুগে পরিপূরক খাদ্য হিসেবে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় এর স্থান হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আমাদের কলা ও মিষ্টি আলু খেতে উপদেশ দিয়েছেন, চা'ল ও আটার অভাব পুরণ করতে এরা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ভারতে কদলীবৃক্ষের ইতিহাস অতি প্রাচীন। ৩২৭ খৃঃ পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ কালে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এই গাছ প্রথম দেখতে পান। সম্ভবতঃ আরববাসীরা ভারতবর্ষ থেকে এই গাছ প্যালেষ্টাইন ও মিশরে আমদানী করে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যেও কলার উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে নারীর উরুদেশের সঙ্গে কলার তুলনা করেছেন :—

নাগেন্দ্র হস্তাস্তচি কর্কশত্বাৎ
একান্ত শৈত্যাৎ কদলী বিশেষাঃ।
লব্ধাপি লোকে পরি নাহি রূপং
জাতাস্তু দূর্বোরুপমানবাহ্যাঃ।

(কুমার সম্ভব ১।৩৬)

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কলা মিউসাসি পরিবারভুক্ত। বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম। বাংলা ও সংস্কৃতে কদলী, রম্ভা, বারণ বুষা, অংশুমৎ-ফলা, কষ্টিলা, বালকপ্রিয়া, যকৃৎফলা ইত্যাদি; হিন্দুস্থানীতে কেরা বা কেলা, গুজরাটিতে কেল্য, সিংহলীতে কেহেল, তামিল ভাষায় বাঠ্ঠ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় মিউসা প্যারাডেসিকা লিন। কলাগাছ সাধারণতঃ দশ থেকে কুড়ি ফুট উচু হয়ে থাকে। কলার ফুল বা মোচার ডাঁটাতে অসংখ্য পুষ্পগুচ্ছ সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। প্রত্যেকটি ফুলের আবার একটি করে ঢাকনা আছে। স্ত্রী-পুষ্প, ডাঁটার উপরের দিকে এবং পুং-পুষ্প, শেষপ্রান্তে অবস্থিত থাকে। এই স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে নপুংসক বা ক্লীব পুষ্পের সার। স্ত্রী-পুষ্পের সংখ্যা পরিমিত। কিন্তু পুং-পুষ্প সংখ্যায় অজস্র, এক একটা মোচায় দেড়হাজারেরও বেশী পুং-পুষ্প থাকতে পারে। কলা সাধারণতঃ ৪ ইঞ্চি থেকে ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। কয়েক শ্রেণীর কলা ১ ফুট লম্বাও হতে পারে। পূর্ব আফ্রিকাতে একরকম কলা হয়—এরা লম্বায় ২ ফুট এবং মানুষের বাহুর মত মোটা। কোচিন চীন ও মালয়ে এম, করনি কুলাটা—শ্রেণীভুক্ত একরকম গাছে মাত্র একটি কলা হয় এবং সেটা এত বড় ও মোটা হয় যে, সেই একটি ফলেই তিনজন লোকের একবেলার আহার হতে পারে।

ভারতে প্রায় ৬০০ রকমারি কলার চাষ হয়ে থাকে। আমের চাষের পরই কলার স্থান। কলার চাষ মাদ্রাজ প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী; প্রায় ১২৮০০০ একর জমিতে কলা উৎপাদন করা হয়। আর বাংলা-দেশে মাত্র ৪৪০০০ একর জমিতে কলার চাষ হয়ে থাকে। আর্দ্র জলবায়ু ও জলা জমি কলার চাষের উপযোগী। পুকুরের ধারে কলাগাছ রোপণ করা উচিত। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের জলবায়ু শুষ্ক হওয়ায় সেই সমস্ত প্রদেশে কলা-বিশেষ হয় না। কিন্তু সেই প্রদেশগুলির কয়েকটি অঞ্চলে ভাল কলার চাষ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতে কলা-চাষের মোট জমির শতকরা ৫৪ ভাগেই মাদ্রাজে পুভান্ নামক কলা উৎপন্ন হয়ে থাকে; তারপর মালাবারের কলা নিউদ্রাণের

স্থান। বাংলাদেশে সবরি, চাঁপা, রামরম্ভা, অমৃতসর, মর্তমান, অগ্নিশ্বর ইত্যাদি বহু প্রকার কলা উৎপন্ন হয়। আসামে পনেরো প্রকারের কলা হয়ে থাকে। বোম্বাইয়ের সফেদ ভেলচি, লাল ভেলচি কলা বিখ্যাত।

একটি কলাগাছ একবার মাত্র ফল প্রদান করে তারপরেই শুকিয়ে মরে যায়ঃ—

তালী তরোবল্পপকারি ফলং ফলিত্বা
লজ্জাবশাদুচিত এব বিনাশ যোগং
এতত্তু চিত্রমুপকৃত্য ফলৈ পরেভ্যঃ
প্রাণান্নিজান্ধগিতি যং কদলী জহাতি॥

(শাঙ্গ'ধর পদ্ধতি ৫৬)

অর্থাৎ অল্পপকারী ফল প্রসব করে তাল গাছের লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কদলী যে ফল দ্বারা পরের উপকার করে তৎক্ষণাৎ নিজের প্রাণত্যাগ করে—এটাই আশ্চর্য।

কলা অত্যন্ত উপকারী খাদ্য। শুধু সুস্বাদুই নয়—কলার মধ্যে যে শ্বেতসার রয়েছে, তাতে শর্করার ভাগ বেশী। কলা খাওয়ার পর জৈব অম্ল সেই খাদ্য সহজেই পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে পৌছে দিতে সাহায্য করে। দেহগঠন, পুষ্টিবিধান ও রক্ষণের জন্যে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবে শ্বেতসার, প্রোটিন, ফ্যাট বা তৈল জাতীয় খাদ্য বিভিন্নপ্রকার খনিজ লবণ এবং ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজন। কলার মধ্যে এই সমস্ত রকমের খাদ্যই কমবেশী বিদ্যমান রয়েছে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যহ প্রায় ৪ আউন্স প্রোটিন, ৩ আউন্স ফ্যাট এবং প্রায় ১৬ আউন্স শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। একটা মাঝারি আকারের (প্রায় ৫॥০ আউন্সের ওজনের) কলাতে প্রায় ৩·৭ আউন্স জল, ·০৫ আউন্স খনিজ লবণ, ·০৬ আউন্স প্রোটিন, ·০০৫ আঃ ফ্যাট এবং ১·৩১ আউন্স শ্বেতসার আছে। অন্যান্য খাদ্যবস্তুর তুলনায় কলাতে এই সমস্ত উপাদানের পরিমাণ যে নিতান্ত নগণ্য নয়, তা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি হবে

খাদ্য	ওজন	প্রোটিন	ফ্যাট	শ্বেতসার	মোট তাপমূল্য বা ক্যালোরি
কলা	১ গ্রাম	·০১৩	·০০৬	·২২০	·৯৯
মাখন	১ „	·০১০	·৮৫০	—	৭·৬৯
ডিমের হল্‌দে অংশ	„	·১৫৭	·৩৩৩	—	৬·৩৬
দুগ্ধ	„	·০৩৩	·০৪০	·০৫০	·৬৯

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন খাদ্যের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। ভিটামিনের বহু শ্রেণীবিভাগ আছে। ভিটামিন-এ দেহগঠন ও পুষ্টিসাধন করে। এর অভাবে দুর্বলতা, পুষ্টিহীনতা ও চক্ষুরোগ হয়ে থাকে। ভিটামিন-বি-এর অভাবে ক্ষুধামান্দ্য, দেহের মাংসপেশীর গঠন-বিকৃতি, বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়। স্কার্ভিরোগ, দন্তরোগ ও অস্থি-র বিকৃতি ইত্যাদির আবির্ভাব, দেহে ভিটামিন-সি অভাবের লক্ষণ। ভিটামিন-জি-এর অল্পতায় দেহ শীর্ণ, স্ফূর্তিহীন, পরিপাক শক্তির হ্রাস এবং শরীরের ওজন কমে যায়। কলার মধ্যে এই সব ভিটামিনই কমবেশী বর্তমান আছে।

খাদ্য	ওজন	ভিটামিন-এ	ভিটা-বি	ভিটা-সি	ভিটা-জি
কলা	১০০ গ্রাম	২৮৫ একক	১১ একক	২০ একক	৩৫ একক
দুগ্ধ	„	২২২ „	২০ „	৫ „	৪০-৭৫ „
ডিম	„	১৯২০ „	৩০ „	সামান্য	১৩৫-১৫০ „

দেহ গঠন রক্ষণের জন্যে বহুবিধ খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেহ অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, গন্ধক, আয়োডিন, ক্লোরিন, সিলিকন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। শ্বেতসার, শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদিতে ধাতব পদার্থ ব্যতীত আর সবগুলোই প্রায় বিদ্যমান। যে সকল খাদ্যে উপরোক্ত ধাতব পদার্থের লবণ বর্তমান রয়েছে, আমাদের সে জাতীয় খাদ্যই নির্বাচন করা উচিত। কলার মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তাম্র এবং ম্যাঙ্গানিজ খুব অল্প পরিমাণে আছে। ৪৫০ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত ছটাক কলাতে '০৩৭ গ্রাম ক্যালসিয়াম, '১৩৬ গ্রাম ফসফরাস এবং '০০০৭ গ্রাম লৌহ বর্তমান। এ-ছাড়া কলাতে অ্যামাইল অ্যাসিটেট্ নামক একটি সুগন্ধি পদার্থও রয়েছে, যার জন্যে কলার এই সুমধুর ঘ্রাণ এই জিনিসটি কলা থেকে নিষ্কাশন করা যায়। সরবতে এই সুগন্ধি এসেন্স ব্যবহার করা হয়।

মানবদেহ প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই ক্ষয় তাপ, শক্তি বা 'এনার্জি'রূপে দেহ হতে বের হয়ে যায়। মানুষ যখন পরিশ্রম করে না, এবং যখন তার পেট ভরা নয়, অর্থাৎ নিদ্রামগ্ন অবস্থায়, পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির (ওজন ৭০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ প্রায় ১ মণ ৩০ সের) দেহ থেকে প্রতি ঘণ্টায় দেহের প্রতি-কিলোগ্রাম ওজনের জন্যে যে তাপ বহির্গত হয় তার পরিমাণ ১ ক্যালোরি খাদ্য এই ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে; কাজেই দেহ হতে যে তাপ নির্গত হয়, খাদ্য হতে সেই পরিমাণ তাপ দেহের পক্ষে প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের জন্যে ২৭০০ ক্যালোরি, অল্প পরিশ্রমকারীর পক্ষে ৩০০০ এবং কঠোর কায়িক পরিশ্রমকারী ব্যক্তির জন্যে ৪০০০ ক্যালোরি তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন। একটা মাঝারি আকারের (ওজন ৫॥০ আউন্স) কলা থেকে আমরা প্রায় ১০০ ক্যালোরি তাপ পেয়ে থাকি। এর মধ্যে কলার প্রোটিন ৫, ফ্যাট ৬ এবং শ্বেতসার ৮৯ ক্যালোরি সরবরাহ করে থাকে। প্রতি একর জমিতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাদের মোট তাপমূল্যের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

কলা—৫০,০০,০০০ ক্যালোরি,
গম—১২,৬০,০০০ „
মিষ্টিআলু—৩৯,৮০,৯০০ ক্যালোরি,
চাউল—১২,৮০,০০০ „

কলাতে যে প্রোটিন এবং শ্বেতসার আছে, তা গম কিংবা চা'লের প্রোটিন ও শ্বেতসারের চেয়ে উৎকৃষ্ট। দুধের সংগে প্রত্যহ কয়েকটি কলা আমাদের খাদ্যের সমতা বিধান অর্থাৎ 'ব্যালেন্স্‌ড্ ডায়েট' তৈরী করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের লোকেরাই সবচেয়ে বেশী কলা খায়। বৎসরে মাথাপিছু কদলী ভক্ষণের গড়পড়তা হার,—৪৪ সের, মাদ্রাজ ২৭ সের, যুক্তপ্রদেশ ১ পোয়া পাঞ্জাবও তথৈবচ।

ছোট ছেলেদের পক্ষে পাকা কলা সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। শিশুদের সেলিয়াক অর্থাৎ নিম্নউদর সংক্রান্ত রোগে কলা একটি অপরিহার্য পথ্য। এই রোগে নিতম্বের স্ফীতি, অত্যধিক মলত্যাগ, ক্ষুধাহীনতা, বমন এবং রক্তহীনতা দেখা দেয়। একমাত্র পথ্যের সুনির্বাচনেই এই রোগ আরোগ্য করা যায়। চিকিৎসার প্রথম অবস্থায় শুধু ছানার জল, দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিবারে পাকা কলা ৩½ আউন্স, দুধ (প্রোটিন যুক্ত) ৮ আঃ এবং দই ১½ আঃ। চিকিৎসার তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ রোগী আরোগ্যলাভ করতে থাকলে ভাত, ডাল ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দেওয়া যেতে পারে। অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতায় কলা অতি উপকারী। পরিপক্ব কলা সহজেই হজম হয়। কলা আগুনে সেঁকেও খাওয়া যায়। কলা টুকরো টুকরো করে কেটে চিনি ও একটু লেবুর রস মিশিয়ে কড়াইয়ে ছেড়ে দেবার পর নরম হলে উঠিয়ে নিতে হয়। এইরূপে তৈরী কলা সহজেই হজম হয়। কাঁচাকলা যন্ত্রের সাহায্যে

অর্থাৎ শুকিয়ে তাকে গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। কলা সংরক্ষণ করা কঠিন নয়। ঠাণ্ডা-সংরক্ষণ ব্যবস্থা-দ্বারা কলা সংরক্ষিত করে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জ্যামেকা প্রভৃতি স্থান থেকে একরকম বিশেষ ধরণের নৌকায় আমেরিকা, ইয়োরোপ ও কানাডায় চালান করা হয়। আমাদের দেশেও কিরকিতে কলা সংরক্ষণ সম্বন্ধে পরীক্ষা চালান হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাদ্রাজের সিরুমালাই এবং কর্পূর-চক্রকেলী কলা ৫৬° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে পরিপক্ক হয় এবং এদের ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত অবিকৃত রাখা যায়। ভাল সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রেখে কলা বাংলা ও মাদ্রাজ থেকে অন্যান্য দেশে চালান দেওয়া যেতে পারে।

কলা এবং কলাগাছকে রোগমুক্ত রাখার ব্যাপক প্রচেষ্টা তেমন হয়নি। পানামা রোগের নাম শোনা গেছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও আমেরিকার কদলী ক্ষেত্রে এই রোগ সংক্রামক আকারে দেখা দেয়—ফিউসারিয়াম কিউবেন্‌সি নামক ব্যাক-টেরিয়ার আক্রমণের ফলে। পাঞ্জাবে (যদিও সেখানে কলাগাছ বেশী নেই) গ্লিওস্‌পোরিয়াম, হেলমিন-থোস্‌পোরিয়াম ইত্যাদি ছত্রাকের আক্রমণে কলা-গাছের এক প্রকার রোগ হয়ে থাকে। এই রোগে পাতার মধ্যদণ্ড আক্রান্ত হয় ও ভেঙ্গে পড়ে, পাতার ওপরে চক্রাকার দাগ দেখা যায়, ফলে ক্রমশ গাছ শুকিয়ে যায়। গাছের মূলদেশে যে ছোট ছোট চারা গাছ হয়ে থাকে, যেগুলি তুলে নিয়ে তুঁতের জলে (২%) কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রেখে, তারপর অনেক-দূরে দূরে রোপণ করলে তাতে যে কলা গাছ হয়, সেগুলো প্রায়ই রোগমুক্ত হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে কলাগাছের প্রতি মোটেই যত্ন নেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগর, শেওড়াফুলী, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে, পূর্ববঙ্গের মুন্সিগঞ্জ, মীরকাদিম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর কলা জন্মে থাকে। একটু যত্ন নিলে উৎপাদনের পরি-মাণ অনেক বাড়ান যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের ফলে অনেক দেশে এর উৎপাদন বৎসরে প্রতি একরে প্রায় ৮০০ মণ পর্যন্ত বাড়ান সম্ভব হয়েছে। শুধু খাদ্য হিসেবে নয়, কলাগাছের বিভিন্ন অংশ থেকে বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরী হয়। মাদ্রাজ ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের কুটির-শিল্পে এর অবদান কম নয়। এই খাদ্যাল্পতার দিনে অন্য খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় অল্পায়াসে উৎপাদিত এই সস্তা ফলের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। এই কদলী দ্বারা অন্নসমস্যাকে কি কিঞ্চিন্মাত্রও কদলী প্রদর্শন করা যাবে না? খনার বচন মিথ্যা নয়:—

কলা রুয়ে না কাট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

নৃ-তত্ত্বের অনুধ্যান

শ্রীকান্তি পাকড়াশী

প্রাণী-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জনের অন্যতম শাস্ত্র হিসাবে নৃ-তত্ত্ব শিক্ষার্থী মহলে পরিচিত। নৃ-তত্ত্বের উপযুক্ত বিকাশ কিন্তু মানব-জীবনের বিভিন্ন সংস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত চর্চায় উৎকর্ষলাভ করেছে। এই শাস্ত্রে মানুষের উৎপত্তি এবং প্রকৃতির রাজ্যে তার অবস্থান—এই দুই বিষয়ের অনুধ্যান মূলতঃ প্রধান। প্রাণী-জগতে মানুষের নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ করতে শারীরিক লক্ষণগুলির যে তুলনামূলক অনুধ্যান এই শাস্ত্রে করতে হয়, সে অনুধ্যান জীব-তত্ত্বেরই সাধারণ অধ্যয়নের এক অংশ।

নৃ-তত্ত্বের অধ্যয়ন প্রধানতঃ দুটি দৃষ্টিভংগী নিয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে। দৃষ্টিভংগীদ্বয়ের একটি শারীরিক নৃ-তত্ত্ব এবং অপরটি সমাজ-সম্বন্ধীয় নৃ-তত্ত্ব। বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং সে সংগে মানবজন্মের আদিক্ষণে তৎকালীন পৃথিবীর অবস্থা ও অন্যান্য মনুষ্যতর জীবের দেহাবশেষ সম্পর্কে গবেষণা এবং আধুনিক মানুষের সংগে অতীতের মানুষের শারীরিক লক্ষণের মিল ও অমিলের বিচার বিশ্লেষণ, সমস্তই শারীরিক নৃ-তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান জাতির আপন আপন বিশেষ শারীরিক লক্ষণগুলো বিচার করে সমগ্র মানবজাতিকে কতকগুলো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে শ্রেণীবিন্যাস ও বণ্টন করার এবং মানব-শরীরের ওপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব নিরূপণ করার গুরুত্বপূর্ণ অনুধ্যানও শারীরিক নৃ-তত্ত্বের বিশেষ অংগ। এখানে একথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উপযুক্ত অবদান ছাড়া কিন্তু শারীরিক নৃ তত্ত্বের গবেষণা সম্পূর্ণ হতেই পারে না। ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, প্রজননবিদ্যা, জৈব-রসায়নবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সংখ্যাবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অবদানের বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য ছাড়া শারীরিক নৃ-তত্ত্বের সুষ্ঠু প্রসার অসম্ভব।

কৃষ্টি, সংস্কৃতিমূলক নৃ তত্ত্বের গবেষণা প্রধানতঃ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থিতিতে উৎকর্ষ লাভ করে। সংস্থিতিদ্বয়ের একটিতে মেটেরিয়াল কাল্‌চার বা বস্তুসম্পর্কীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ মানুষের শিল্পবৃত্তির অনুধ্যান এবং অপরটিতে সামাজিক ঘটনাবলীর অর্থাৎ প্রকৃতির ও প্রতিবেশীর সংগে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মীমাংসার পন্থা নিরূপণ করা হয়। এই দুই অনুধ্যানের মিলিত প্রচেষ্টাতেই মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহারের স্বরূপটা সহজে বুঝতে পারা যায়। আবার বস্তুসম্পর্কীয় সংস্কৃতির অপর এক অনুধ্যানে মানুষের আদিম শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলোর ওপর ভিত্তি করে মানুষের আদিম ইতিহাস বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টাও বর্তমান। এই বিশেষ অনুধ্যানই প্রত্নতত্ত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশেষত্ব এবং তাদের অনুক্রম ও স্থায়িত্ব নিরূপণের বিশেষ পদ্ধতি এবং বস্তুসম্পর্কীয় সংস্কৃতির আদিম অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনধারা সমস্তই প্রত্নতত্ত্বের মৌলিক গবেষণার উপাদান। পৃথিবীর বুকে খনন কার্যগুলোই অতীতদিনের সাক্ষ্য উদ্‌ঘাটন করে আমাদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথ সহজ করে তুলেছে। বস্তুসম্পর্কীয় সংস্কৃতির অনুধ্যানে এই খননকার্যগুলোই গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, এই খননকার্য ছাড়া আধুনিক শিল্পকর্মের উন্নতির কোন সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পাওয়া শ্রমসাধ্য হতো। প্রধান প্রধান শিল্পকর্মের

ও তাদের প্রয়োগপদ্ধতির ঐতিহাসিক উন্নতির ধারা ও ভৌগলিক বণ্টন সমস্ত কিছুর তুলনামূলক অনুধ্যান আবার টেক্‌নোলজি বা শিল্পবিজ্ঞান হিসেবে পূর্ণতা লাভ করেছে। অতীত ও আধুনিক মানবগোষ্ঠীর বস্তুসম্পর্কিত সংস্কৃতির ভৌগলিক বণ্টন, নিকট সম্বন্ধ ও সংযোগের অনুধ্যান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষের প্রতিক্রিয়ার অনুসন্ধান, প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পবিজ্ঞানের মানবজাতিতত্ত্ববিষয়ক সংস্থিতিটা পরিষ্কার করে বুঝতে সাহায্য করে।

কৃষ্টি, সংস্কৃতিমূলক নৃ-তত্ত্বের যে অংশে সামাজিক বিষয়ীভূত বস্তু বিবেচনা করা হয়, সে অনুধ্যান সমাজসম্বন্ধীয় নৃ-তত্ত্বেরই এক অন্যতম বিষয়। সমাজতত্ত্বের অনুধ্যানে সামাজিক বিষয়ীভূত বস্তুগুলোর তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং সে বিষয়ীভূত বস্তুগুলোর ভৌগলিক বণ্টন ও ঐতিহাসিক উন্নতির ধারা নির্দেশ করার দায়িত্বই প্রধান। বিবাহ রীতিনীতি, অর্থনীতি, আইন শাসন, নৈতিক আচারবিধি, লোকোপাখ্যান, ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় কাজকর্ম সমাজ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোই সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার প্রয়োজনীয় ভিত্তি। এই সংগে মনস্তত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের অনুধ্যান এবং মানসিক চিন্তাধারার সংগে ভাষার নিকট সম্পর্ক নির্ণয় করার দায়িত্বপূর্ণ গবেষণাও অত্যাবশ্যক। এখন ভাষার অবস্থা, ধর্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক নিয়মপ্রণালী ও ভাব-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক অনুধ্যান ও শ্রেণীকরণ করার কাজ জাতিতত্ত্ব বিষয়ক সংস্থিতিতে এক বিশেষ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজতত্ত্বের অনুধ্যানে একথাটা সব সময় মনে রাখা দরকার যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি এই দুইয়ের মধ্যে সর্বদা একটা পারস্পরিক প্রভাব বর্তমান।

শারীরিক ও কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্ব কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে সব সময়। নৃ-তত্ত্ববিদ্‌দের সেজন্যে সব নিয়ম ভালভাবে জানতেই হয়, নইলে মানুষ ও তার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ধারাটি কোন মতেই পরিষ্কার করে বোঝা সম্ভব হয় না। যে কোন একটা নিয়মের প্রতি আসক্ত হলেও মোটামুটিভাবে সব নিয়মই অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, তা না হলে কখন, কি অবস্থায় ও কোন্ কারণে একটা ঘটনা সংঘটিত হলো সেটা ধরতে পারা যাবে না সময়মত। মানববিজ্ঞান এই রকমেরই এমন কতকগুলো সিন্‌থেটিক্ বা সংযোজিত নিয়মের ভাব প্রকাশ করে যাতে মানুষ ও তার সৃষ্টকর্মের সমগ্র রূপটা সহজে বুঝতে পারা যায়। এই সংযোজিত অনুধ্যানই নৃ-তত্ত্ব হিসেবে খ্যাত।

এই প্রসংগে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। অনেক লেখক শারীরিক নৃ-তত্ত্বকে শুধু নৃ তত্ত্ব এবং কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বকে মানবজাতিতত্ত্ব হিসেবে গণ্য করতে পছন্দ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে নৃ-তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে এই ধরণের নাম পরিবর্তনের কোন সমর্থন নেই। আন্তর্জাতিক শিক্ষায়তনে কিন্তু নৃ-তত্ত্ব বলতে আমরা এতক্ষণ যা জানলাম তা মেনে নেওয়া হয়েছে। নৃ-তত্ত্ব সাধারণভাবে মানব-বিজ্ঞান হিসেবেই পরিচিত। জাতিতত্ত্ববিদ্যা নৃ-তত্ত্বেরই এক প্রয়োজনীয় অংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির শারীরিক লক্ষণগুলো এবং প্রাকৃতিক সামাজিক সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়ন বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করার কাজই এই তত্ত্ব অনুধ্যানের প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন শারীরিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানুগত বিভিন্ন এথ্‌নিক্ বা জাতীয় প্রকারের অথবা জনগোষ্ঠীর গঠন অনুধ্যানই এই জাতিতত্ত্ববিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা। এথ্‌নোগ্রাফি বা পৃথিবীর বিভিন্নজাতির বিবরণ সম্পর্কিত বিদ্যায় কোন এক জনগোষ্ঠীর অথবা কোন এক জায়গার গভীর অনুধ্যান ও বিবরণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করাই প্রধান কাজ। এই বিদ্যায় যে জ্ঞান অর্জন

হয় সে জ্ঞান নৃ-তত্ত্বের বিস্তৃত অধ্যয়নে অত্যাবশ্যক। জাতিতত্ত্ববিদ্যা ও বিবরণ-বিদ্যা দুই-ই নৃতত্ত্বের প্রয়োজনীয় শাখা।

নৃ-তত্ত্ব বিশেষ করে আদিম মানুষ নিয়ে অনুধ্যান করে কেন—তা বোঝা দরকার। প্রথমতঃ, এটা সাধারণভাবেই সত্য যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণা ও অনুধ্যান সভ্য মানুষের নিয়ম-প্রণালী নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন কখনই কোন এক বিশেষ বিজ্ঞানশাস্ত্র দিয়ে সম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন শাস্ত্রের মিলিত অবদানেই মানবসম্বন্ধীয় অধ্যয়ন সুসম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ নিয়ে যখন আমরা বিবেচনা করি তখন এমন এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন, যেখানে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অবদান সংযোজিত হবে এবং পরে সে সংযোজিত জ্ঞান মানবসম্বন্ধীয় অনুধ্যানে জাতিগত ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিগতভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে মানুষের নিকট সম্পর্ক নির্ধারণে প্রয়োগ করতে পারা যাবে। বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র কোনদিনই সমগ্র মানবসম্বন্ধীয় অধ্যয়ন আয়ত্তাধীনে আনতে পারবে না। নৃ-তত্ত্ব সেখানে তাদের সকলের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করবে।

দ্বিতীয়তঃ, নৃ-তত্ত্ব স্বয়ংপূর্ণ এক বিজ্ঞানশাস্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠার পর যে-সব ট্রাইবস বা মানবগোষ্ঠী নিয়ে তার বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আরম্ভ করলো, যাদের লিখিত ইতিহাস এর আগে কোনদিনই ছিল না। নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা সভ্য মানুষের সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত জনগোষ্ঠী নিয়ে তাদের গবেষণা সুরু করলেন। এসব জনগোষ্ঠীর বিবিধ কার্যকলাপ, যা সভ্য মানুষকেও প্রভাবান্বিত করেছিল নানাভাবে, অতীতে তার কোন অনুসন্ধানই এর আগে কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রচেষ্টায় চালু হয় নি। নৃ-তত্ত্ববিদেরা তাই সমাজের নীচুস্তরের আদিম মানুষ নিয়ে তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যানে ব্রতী হলেন।

নৃ-তত্ত্ব খুব বেশী দিন প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। নৃ-তত্ত্বের প্রসার অল্প-সময়ের ব্যবধানে বেশ দ্রুতগতিতেই হয়েছে। যে সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র আগে মানুষের জন্ম ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতো তাদের প্রসার গত শত-বছরের মধ্যেই সুরু হয়েছিল এবং যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র মানুষকে সমগ্রভাবে অনুধ্যান করার প্রয়াসী সে বিজ্ঞান যতদিন পর্যন্ত যথাযথভাবে সংগঠিত না হচ্ছে ততদিন তার বিপুল প্রসার অসম্ভব। নৃ-তত্ত্বের প্রসার এই কারণেই আশানুরূপ হয়নি প্রথম প্রথম। অন্যদিকে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে এখন ন্যায়সংগত সংযোগগুলো খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এই সংযোগ খুঁজে পেলে শারীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান এই তিন শাস্ত্রের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের সংগে নৃ-তত্ত্বের সম্পর্কটাও সহজ পথে বুঝতে পারা সম্ভব হবে। কিন্তু যতদিন না সেই অতিপ্রয়োজনীয় সংযোগগুলো ঠিক করে নির্ধারিত হচ্ছে ততদিন বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলোর অন্তর্সম্পর্কটাও অস্পষ্ট হয়ে থাকবে।

নৃ-তত্ত্বের প্রসার তার ইতিহাস থেকেই ভাল করে বোঝা যাবে বলে সে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। নৃ তত্ত্বের ইতিহাস মোটামুটি চারটে পিরিয়ড বা পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(ক) ফরমুলারি বা আনুষ্ঠানিক পর্যায় (খ) কনভারজেন্ট্ বা এককেন্দ্রিকতার পর্যায় (গ) ক্রিটিক্যাল্ বা সমালোচনার পর্যায় (ঘ) কন্স্ট্রাকটিভ্ বা গঠনমূলক পর্যায়। নৃ-তত্ত্বের ইতিহাসের প্রধান অংশই গত একশ বছর অধিকার করে আছে এবং সে ইতিহাস যথাযথভাবে আরম্ভ হয়েছে সে সময়ে যা এককেন্দ্রিকতার পর্যায় হিসেবে খ্যাত। এই সময়কাল ইংরেজি ১৮৩৫—১৮৫৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই ১৮৫৯ সালেই ডারউইনের বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক 'জীবের উৎপত্তি' প্রকাশিত

হয় এবং সেই সংগে প্রস্তরযুগের মানুষের অতি-প্রাচীনতাও স্বীকৃত হয় বিদ্বজ্জন সমাজে।

এই কয়েক বছরের মধ্যে সমাজতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং বস্তুসম্পর্কীয় সংস্কৃতির শিক্ষার্থী, জাতিতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ সকলেই পরস্পরের মধ্যে একটা ন্যায়সংগত সম্পর্ক খুঁজে পেলেন এবং তাদের আপন আপন বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও অবদানগুলো পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে দেখারও সুযোগ পেলেন। সকলেই কিন্তু মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে মৌলিক তথ্যাদি নিরূপণে সচেষ্ট ছিলেন গোড়া থেকেই। ডারউইন তাঁর প্রসিদ্ধ বিবর্তনবাদের সাহায্যে সেই মৌলিক তথ্যের স্বরূপ প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানের দরবারে এবং এই সংগেই এই বিষয়ে সমস্ত অনুধ্যান একত্রীভূত করলেন একটা ন্যায়সংগত ভিত্তির ওপর। এর পরেই মানববিজ্ঞান এক সুগঠিত শাস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠলো। এই সময়ে ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণও স্বীকার করলেন যে, মানুষের শারীরিক অবস্থা বিবর্তনে বেশ কয়েক সহস্র যুগ সময় লেগেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের বিবর্তনবাদের সংগে সংগেই নৃ-তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আরম্ভ হলো। ডারউইনের থিওরি প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যে জীব-বিজ্ঞানের নানারকমের অসংগতি সংশোধিত হয়ে উঠলো সুস্থ চিন্তাধারার পথে এবং এই সংগে মানবসম্বন্ধীয় নিয়মপ্রণালী ও ভাব-বিশ্বাসের জন্ম ও উন্নতির অনুধ্যানের এক যুক্তি-সংগত পদ্ধতিও স্থির হয়েছিল। এখন সমস্ত ব্যতিক্রম ও বৃদ্ধি এক কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব হলো এই থিওরির প্রসারে। আবার অন্যদিকে সমাজকে একটা অরগ্যানিজম্ বা জীবন্ত বস্তু হিসেবে অধ্যয়ন করার সুযোগও পাওয়া গেল সময় মত। সমাজ যে সমস্ত উপাদান দিয়ে গঠিত সে উপাদানগুলোর অস্তিত্বের যে সংগ্রাম তার মধ্যেই স্বাভাবিক ও সামাজিক নির্বাচন কার্যকরী হয় এবং সে নির্বাচনের ভিত্তিতেই সমাজের বৃদ্ধি বা ডেভেলপ্‌মেণ্ট্ অনুধ্যান করা সহজ। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নৃ-তত্ত্বের অনুধ্যানের সকল সংস্থিতিতে বড় বড় পণ্ডিতেরা ডারউইনের নীতি মেনে চল্লেন এবং বহু প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পর মানববিজ্ঞান উপযুক্তভাবে গড়ে তুল্লেন বিজ্ঞানসম্মত পথে। এই সময়টাই আমরা গঠনমূলক পর্যায় বলে জানি।

১৯০০ সালকে নৃ-তত্ত্বের ইতিহাসে এক নব-পর্যায়ের আরম্ভ হিসেবে ধরা হয়। কারণ এই সময়ে মেণ্ডেলের বিখ্যাত আবিষ্কার সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় এবং এই সময়ে সমালোচনার একটা ঝোঁক বড় হয়ে দেখা দেয় বিজ্ঞানীমহলে। এই জন্যেই এই সময়টা সমালোচনার পর্যায় হিসেবে খ্যাত। ভ্যারি-য়েশন্ বা ব্যতিক্রমের কারণগুলো ও লজ অব হেরেডিটি বা বংশপরম্পরাগত গুণাধিকারসম্বন্ধীয় সূত্রগুলো আরো নিখুঁৎভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা জীবতত্ত্ববিদ ও নৃ-তত্ত্ববিদ্‌দের উৎসাহিত করে তুললো আপন আপন গবেষণার ক্ষেত্রে। এই সমস্ত বিজ্ঞানবিদ্ আরও ধীরগতিতে অগ্রসর হলেন তাদের গবেষণার চর্চায় এবং যে সমস্ত বিষয় ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সে বিষয়গুলো আবার গভীরভাবে পরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন। এই সময়টা নৃ-তত্ত্বের পক্ষেও সঙ্কটময়, কারণ এখনও অনেক বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এবার সেগুলো সংশোধিত হলো এবং নৃ-তত্ত্ব দুটি প্রধান অংশে পরিষ্কারভাবে ভাগ হয়ে গেল। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ ও তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অবস্থার অনুধ্যানও প্রসার লাভ করলো এই সময়। নৃ-তত্ত্বের জীব ও মনস্তাত্ত্বিক সংস্থিতিতে উন্নতি দেখা গেল এবং প্রজনন-বিদ্যা ও বাইও-মেট্রি বা জীবসংখ্যাবিদ্যা এই দুই সংস্থিতির উন্নতির প্রচুর সুযোগ রয়েছে এখনও। এখন শারীর-বিজ্ঞান ও মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের গবেষণা যত বেশী কার্যকরী হবে ততই আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জাতিগত ও

ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে তার স্বরূপ সহজে বুঝতে পারবো। এই প্রসংগে অস্‌টিওলজি বা অস্থিবিজ্ঞানের অনুধ্যানও উল্লেখ-যোগ্য। কারণ এই অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা নৃ-তত্ত্বের সাধারণ অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বে কিন্তু ইউনিলিনিয়ার বা সরল বিবর্তনের বিশ্বাস একেবারেই অচল। নৃ-তত্ত্বের এই সংস্থিতির প্রসারে বহু পণ্ডিতের মতামত বিভিন্ন স্কুল বা গোষ্ঠী মারফৎ প্রচারিত হতে আরম্ভ হলো। প্রসঙ্গক্রমে গোষ্ঠীগুলোর কিছু ইংগিত এখানে দিয়ে রাখছি। সবচেয়ে পুরাতন স্কুল হচ্ছে ইভলিউসনার বা বিবর্তনবাদী গোষ্ঠী, যারা ডারউইনের বিবর্তন-বাদের সূত্রানুযায়ী সাংস্কৃতিক জগতের সমস্ত কিছুর বিবর্তন ধারা স্থির করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা অল্পসময়ের মধ্যে তেমন কার্যকরী আর হলো না সব জায়গায়। ক্রমে ক্রমে আর এক স্কুল নূতন করে কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার করতে সুরু করলেন। এই ঐতিহাসিক গোষ্টির পণ্ডিতেরা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না যে, পৃথিবী-ব্যাপী মানুষ গোড়া থেকেই এক রকমের। তাঁরা মিলের চেয়ে অমিলের প্রতি দৃষ্টি দিলেন বেশী। বর্তমানে আর এক নূতন ফাঙ্‌সনাল্ বা কার্যানু-সন্ধানী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীর পণ্ডিতেরা বিশেষ এক সমাজ, যে যে কার্য-কারণের সংঘাতে বর্তমান অবস্থায় রয়েছে সে কার্যকারণগুলো অনুধাবন করতে আরম্ভ করলেন। এঁরা বিবর্তনবাদী ও ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর অনুধ্যান-রীতি একেবারেই বর্জন করলেন নৃ-তত্ত্বের বিভিন্ন অধ্যয়নে। তবে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, এই তিন গোষ্ঠীর কার্যকলাপ পরিপূরক হিসেবেই সম্পূর্ণ এবং একজন অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ্‌কে তার মানবীয় অনুধ্যানে গোষ্ঠীত্রয়ের প্রয়োগপদ্ধতি ভাল করে জানতেই হবে প্রথমে এবং পরে যে কোন একটা পথ অনুসরণ করলেই গবেষণার পথ সহজ হবে।

নৃ-তত্ত্বের ইতিহাস মোটামুটিভাবে লেখা হলো। নৃ-তত্ত্বের গবেষণা ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে চালু করা অত্যাবশ্যক। মানুষ সম্বন্ধে যে শাস্ত্র তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে শ খানেক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে শাস্ত্র কেন আমাদের দেশে অনাদৃত হয়ে আছে সেটা ভাবলে সত্যই চমৎকৃত হতে হয়। নৃ-তত্ত্বের শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকটি বিদ্যায়তনে বাধ্যতামূলক না করা হলে ভবিষ্যতে মানবীয় সমস্যা নানা পথে এত প্রকট হয়ে দেখা দেবে যে, তখন সমাধানের পথ আর সহজে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেশলাইয়ের জন্মকথা

(ইন্দ্রনাথ)

মাত্র দেড়শ' বছর আগের কথা। সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে পৃথিবীর বুকে। গৃহস্থের ঘরে ঘরে মহা ব্যস্ততা—অন্ধকারে আলো চাই, রান্নার জন্য চাই আগুন। মা বলছেন 'খুকি, প্রদীপটা জ্বাল মা।' মেয়ে বলছে, 'না বাপু, আমি আর পারিনে; চকমকি পাথর ঠুকে ঠুকে হাতে ব্যথা ধরে গেল।' মা উপদেশ দিচ্ছেন 'চেষ্টা করে শেখ মা। চকমকি জ্বালতে না জানলে সংসার করবি কি করে!' এই প্রাচীনা জননী সেদিন কল্পনাও করেন নি, চকমকি ঠুকতে না শিখলেও তার ভবিষ্যৎ সন্ততিরা স্বচ্ছন্দে সংসার করতে পারবে। মুহূর্তে বিনা আয়াসে আলো জ্বলবে একটি দেশলাইয়ের কাঠির এক খোঁচায়। আলো ও তাপের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কথা না হয় না-ই তোলা গেল। এই হলো বিজ্ঞানের দান—মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ!

পৃথিবীতে মানুষ প্রথম আগুন ও আলো দেখেছিল সম্ভবতঃ মেঘের বিদ্যুৎস্ফুরণে, বনানীর দাবানলে। তারপর আদিম মানব দৈবাৎ পাথরে পাথরে আঘাতের ফলে আগুনের সৃষ্টি দেখল। এই দেখে ক্রমে পাথরে পাথরে ঠুকে, কাঠে কাঠে ঘসে অতি কষ্টে সে আগুন জ্বালতে শিখল। অগ্নি উৎপাদনের মোটামুটি এই ব্যবস্থাই চলে এসেছে সহস্র সহস্র বছর, এই সেদিন পর্যন্ত। আলো ও আগুনের প্রয়োজনীয়তা ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে অগ্নি হয়ে উঠলো দেবতা। অগ্নিদেবতা মানুষের দুষ্কর আরাধনায় নেমে আসেন স্বর্গ থেকে। অগ্নিতে সব শুদ্ধি, সব পবিত্রতা! আদিম মানব হলেন অগ্নির উপাসক—'অগ্নয়ে স্বাহা' 'অগ্নিদেবায় নমঃ'—চললো যাগযজ্ঞ। আজ আমরা জানি, আলো ও আগুন একটা সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা দহনের ফল মাত্র। অগ্নির দেবত্ব ঘুচেছে। মানব সভ্যতার বিকাশে অগ্নির এই দেবত্ব ঘুচলেও কিন্তু এর প্রয়োজন-বহুল শ্রেষ্ঠত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকবে। আধুনিক সভ্যতার বহু বিস্ময়কর দানের মূলসূত্রই অগ্নি বা দহন—অগ্নির প্রভাবেই শক্তির উদ্ভব। বিভিন্ন শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রেল, স্টীমার, এরোপ্লেন—বোমা, বন্দুক, টর্পেডো—এক কথায় মানব সভ্যতার আজ বিকাশ ও বিনাশের অধিকাংশ আয়োজনের মূলেই রয়েছে অগ্নির ক্রিয়া। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অগ্নিই আজ বিবিধ বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের শক্তি জোগাচ্ছে।

অগ্নির বৈজ্ঞানিক স্বরূপ ও তথ্য নিরূপণে বিজ্ঞানী-মহলে কত সময়ে কত পরীক্ষা হয়ে গেছে, কত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে! যুক্তি ও মতবাদের সে সব ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক; আমরা কিন্তু তা আজ আলোচনা করবো না। এই প্রবন্ধে অগ্নিদেবতা কি উপায়ে মানুষের করায়ত্তও একান্ত ভৃত্য হয়ে উঠলেন, তারই কিঞ্চিৎ আভাস দেবো।

অগ্নি উৎপাদনের জন্যে দাহ্য পদার্থটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উন্নীত করতে হয়। যে কোন উপায়ে এই নির্দিষ্ট তাপ সৃষ্টি করতে পারলেই বায়ুর সংস্পর্শে পদার্থটি জ্বলে উঠে। বিজ্ঞানের কথায় বায়ুর অক্সিজেন অংশের সঙ্গে পদার্থটির মিলন ঘটে; আর তারই ফলে আগুনের উৎপত্তি ও বিশেষ অবস্থায় আলোকের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আজকাল প্রজ্বলনের তাপমাত্রা উৎপাদনে কোন অসুবিধাই নেই। রসায়ন বিজ্ঞানের আধুনিক উৎকর্ষের কাছে এটা আজ অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

এখন সামান্য চেষ্টায় ইচ্ছামাত্রেই মুহূর্তে আমরা অগ্নি উৎপাদন করতে পারি। আদিম মানব কত না পরিশ্রমে শুক্‌নো কাঠে কাঠে ঘষে, পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বালত। এটা ছিল যেন অজ্ঞানতার কঠিন দণ্ডভোগ! আর আজ আমরা দেশলাই জ্বালাচ্ছি—একরকম বিনা ব্যয়ে, বিনা পরিশ্রমে ইচ্ছামাত্রেই অগ্নিদেবতাকে ধরায় নিয়ে আসছি মুহূর্তে। আধুনিক মানব-সভ্যতার এই উৎকর্ষ ও অগ্রগতির তুলনা নেই।

পদার্থের দহন বা প্রজ্জলন একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র; এতে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য-পদার্থটির রাসায়নিক মিলন ঘটে, একথা পূর্বেই বলেছি। আর এই রাসায়নিক সংযোগের ফলেই আলোক ও অগ্নিরূপী শক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়। অগ্নি উৎপাদনের এই মূলসূত্র জেনেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এর কোন বাস্তব সহজ কৌশল মানুষ প্রয়োগ করতে পারেনি। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে চ্যান্‌সেল নামে একজন ফরাসী দেশীয় ভদ্রলোক এর একটা কৌশল বের করেন। এই-ই পৃথিবীর ইতিহাসে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অগ্নি উৎপাদনের সর্বপ্রথম উদ্যম। চ্যান্‌সেল সরু সরু কাঠের ফালির মাথায় এক প্রকার জিনিস লাগালেন—এ জিনিসটা হলো পটাসিয়াম ক্লোরেট ও চিনি; একটা কোন আঁঠালো পদার্থে মিশিয়ে তৈরী। কাঠের ফালির মাথায় এই মিশ্রণটি শুকিয়ে নিয়ে তিনি তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে অগ্নি উৎপাদন করলেন। কার্বনবহুল চিনি তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে জ্বলে উঠলো; আর পটাসিয়াম ক্লোরেট বিশ্লিষ্ট হয়ে এই প্রজ্জলনের উপযোগী অক্সিজেনের সরবরাহ হলো। এইরূপে উৎপন্ন আগুনে শেষে কাঠিটা জ্বলে উঠলো এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন পদার্থ জ্বালানো সম্ভব হলো। এই সর্বপ্রাচীন দেশলাই মানুষ ব্যবহার করেছে বহুদিন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এরূপ দেশলাই বিক্রয় হয়েছে। এতে অসুবিধা ছিল প্রচুর—তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিড মহা বিপজ্জনক পদার্থ। সঙ্গে করে যত্রতত্র ইচ্ছামত নিয়ে যাওয়া তো সম্ভবই ছিল না।

তারপর, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জন ওয়াকার নামে একজন ইংরাজ ঔষধ-বিক্রেতা একপ্রকার দেশলাই আবিষ্কার করেন। তিনি কাঠের ফালির অগ্রভাগে পটাসিয়াম ক্লোরেট ও অ্যান্টিমনি সালফাইড নামক রাসায়নিক পদার্থ দুটির মিশ্রণ লাগিয়ে শুকিয়ে নিলেন। তারপর মোটা কাগজের উপর সূক্ষ্ম কাচের গুঁড়ো আঁঠা দিয়ে সমানভাবে লাগিয়ে শুকিয়ে নিলেন। ঐ দেশলাইয়ের কাঠি এই কাগজের উপর ঘষতেই আগুন জ্বলে উঠল। ঘর্ষণে উত্তাপ বাড়ে; এই উত্তাপে অ্যান্টিমনি সালফাইডের সালফার বা গন্ধক বিশ্লিষ্ট হয়ে জ্বলে ওঠে, আর পটাসিয়াম ক্লোরেট বিশ্লিষ্ট হয়ে এই জ্বলনের উপযোগী অক্সিজেন সরবরাহ করে। ওয়াকারের এই আবিষ্কারই আধুনিক ঘর্ষণ-দেশলাইয়ের প্রথম সূত্রপাত। এই দেশলাইয়ের নাম ছিল 'লুসিফার'। অগ্নি উৎপাদনের এই কৌশলটা অধিকতর সহজ ও সুবিধাজনক বলে চলছিল অনেকদিন।

অগ্নি উৎপাদনের এসব কৌশল উদ্ভাবনের বহুপূর্বে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ফস্‌ফরাস নামক পদার্থটি আবিষ্কৃত হয়। ফস্‌ফরাস অত্যন্ত সহজদাহ্য, সামান্য উত্তাপে এমন কি বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক তাপেই জ্বলে ওঠে। এর এই দাহ্যগুণের জন্যে দেশলাই তৈরীর কাজে ফস্‌ফরাসের ব্যবহার স্বভাবতঃই আরম্ভ হলো। অগ্নি উৎপাদনের কৌশল হিসেবে এর প্রথম ব্যবহার আমরা দেখতে পাই ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে। ইটালী দেশের এক ভদ্রলোক ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ভ্রমণকালে ফস্‌ফরাসের এক-রকম দেশলাই নিয়ে যান। তাঁর কৌশলটা ছিল ভাল; একটা বোতলের ভিতরের দিকের গায়ে ফসফরাস মাখানো ছিল, আর কাঠির মাথায় ছিল গন্ধক লাগানো। গন্ধক লাগান কাঠিটা

বোতলের ভিতর দিকে ঘষে বার করে আনা হতো। ঘষার ফলে সামান্য কিছু ফস্‌ফরাস গন্ধকের সঙ্গে লেগে যেত, তারপর বাইরে আনতেই ফস্‌ফরাস জ্বলে উঠে গন্ধককে আগুন ধরে যেত। এরকম দেশলাই ১৮২৭ খৃষ্টাব্দেও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ফ্যারাডে পর্যন্ত ব্যবহার করে গেছেন।

আজকাল বিভিন্ন দেশের কারখানায় ফস্‌ফরাস তৈরী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, বালি ও কয়লা একসঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অত্যধিক তাপে উত্তপ্ত করে এখন সহজেই বিশুদ্ধ শ্বেত ফস্‌ফরাস প্রস্তুত হয়। যাই হোক, ফস্‌ফরাসের দেশলাই, যাকে তৎকালের লোকে 'কন্‌গ্রিভ্‌স্‌' বলত, তা পাশ্চাত্যের সকল দেশেই ব্যবহৃত হতো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অবধি। এই দেশলাইয়ের কাঠির অগ্রভাগে লাগান হতো ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়াম ক্লোরেট বা লেড্‌ অক্সাইড-এর একটা মিশ্রণ। এতে বিভিন্ন রং মিশিয়ে রঙিন করা হতো, আর কোন একটা আঠালো পদার্থের সাহায্যে কাঠির মাথায় লাগান হতো। ফস্‌ফরাসের দহনের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জোগান দেবার উদ্দেশ্যেই অক্সিজেনবহুল পদার্থ পটাসিয়াম ক্লোরেট বা রেড লেড্‌ ব্যবহৃত হতো। এই দেশলাইয়ের কাঠি যে-কোন স্থানে ঘষলেই জ্বলে উঠতো। অনায়াসে অগ্নি উৎপাদনের কৌশল হিসেবে এরূপ ফস্‌ফরাস দেশলাই মানবসভ্যতায় যথেষ্ট উন্নতি আনল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রতি পদক্ষেপেই মানুষ কঠিন দণ্ডভোগ করেছে। এক্ষেত্রে দণ্ডটা গুরুতর রকমের হয়ে উঠলো।

সহজদাহ্য বলে সামান্য অসাবধানেই ফস্‌ফরাসের দেশলাই আপনা থেকে জ্বলে উঠে বহুস্থানে বহু অগ্নিকাণ্ড ঘটলো। এরূপ অতর্কিত লঙ্কাকাণ্ডে ও আরও নানাভাবে বহু লোক এতে প্রাণ হারায়। সবচেয়ে মারাত্মক হলো ফস্‌ফরাসের বিষক্রিয়া। এরূপ দেশলাই প্রস্তুতের কারখানায় শ্রমিকদের একরকম ভয়ঙ্কর ব্যাধি আরম্ভ হলো; লোকের দাঁতের মাড়ি ফুলে দাঁতগুলো পড়ে যেত—চোয়ালের হাড়ে পচন ধরত। এতে ফস্‌ফরাস দেশলাই ব্যবহারে একটা গুরুতর বিভীষিকার সৃষ্টি হলো। অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াল যে, সব সভ্য দেশেই ফস্‌ফরাসের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ফস্‌ফরাসের এসব অসুবিধা দূর করার জন্যে বিজ্ঞানীরা উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেলেন। উপায়ও সহজেই পাওয়া গেল। সাদা ফস্‌ফরাসকে কোন বদ্ধমুখ পাত্রে ২৪০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত করলে তার রং হয়ে যায় লাল। পরীক্ষায় দেখা গেল, এই লাল ফস্‌ফরাস ও সাদা ফস্‌ফরাসে মূলতঃ কোন বস্তুগত তফাৎ নেই—বিভিন্নতা কেবল বাহ্যিক গঠনে ও গুণে। সাদা ফস্‌ফরাসই অতিশয় সহজদাহ্য এবং বিষাক্ত; কিন্তু লাল ফস্‌ফরাস তেমন সহজে জ্বলে না, বা তার কোন বিষক্রিয়াও নেই। যাই হোক লাল ফস্‌ফরাস দিয়ে দেশলাই প্রস্তুত করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধা দেখা দিল। শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে একজন জার্মান রাসায়নিক নানারূপ পরীক্ষার পর এসব অসুবিধা দূর করলেন। তাঁর এই উদ্ভাবিত উপায় সর্বপ্রথম সুইডেন দেশের এক কারখানায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হলো। এভাবে সুইডেনেই আধুনিক দেশলাই প্রথম প্রস্তুত হয়। এজন্য আজকালকার বিপদ-আশঙ্কাহীন দেশলাই ক্রমে সুইডিস্‌ দেশলাই নামেই পরিচয় লাভ করে।

সাদা ফস্‌ফরাসের ব্যবহার আইনে নিষিদ্ধ হলে বিজ্ঞানীরা অবশ্য আর একরকম নিরাপদ দেশলাই উদ্ভাবন করেছিলেন; কিন্তু তার ব্যবহার জনপ্রিয় হয়নি। এটা যে-কোন অমসৃণ স্থানে ঘষলেই জ্বলে উঠতো। এর কাঠির মাথায় ফস্‌ফরাস সালফাইড ও পটাসিয়াম ক্লোরেট কোন আঠালো পদার্থে মাখিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হতো।

কখন কখন এই মিশ্রণে কাচের গুঁড়োও মেশান হতো যাতে অল্প ঘর্ষণেই জ্বলে ওঠে।

যাই হোক আধুনিক দেশলাই বা সুইডিস্ দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর মাথায় অ্যান্টিমনি সাল-ফাইডের সঙ্গে পটাসিয়াম বাইক্রোমেট, পটাসিয়াম ক্লোরেট বা লেড অক্সাইড্ এসব অক্সিজেনবহুল পদার্থের যে কোন একটি মিশিয়ে লাগান হয়। কখন কখন গন্ধক ও কয়লার গুঁড়োও মেশান হয়ে থাকে। কাঠির মাথায় লাল ফস্ফরাস একেবারেই দেওয়া হয় না। অ্যান্টিমনি সালফাইড ও সূক্ষ্ম কাচ চূর্ণের সঙ্গে লাল ফস্ফরাসের একটা মিশ্রণ লাগিয়ে দেওয়া হয় দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে। এই দেশলাইয়ের কাঠি বাক্সের গায়ে ঘষলেই জ্বলে উঠে। আকস্মিকভাবে যাতে কোন অগ্নিকাণ্ড না ঘটে সে জন্য এই দেশলাইয়ের কাঠিগুলো ফিট্‌কিরি, সোডিয়াম ফসফেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট প্রভৃতির দ্রবণে ভিজিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এতে কাঠিগুলো অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়, আর কাঠির আগুন বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। আবার দেশলাইয়ের অগ্রভাগের রাসায়নিক মিশ্রণটি জ্বলে উঠলেই সেই আগুন যাতে সহজেই কাঠিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এজন্যে কাঠিগুলোকে সহজদাহ্য করা হয়। কাঠি-গুলোর উপরের দিকটা এজন্যে গলান মোম বা গন্ধকের মধ্যে ডুবিয়ে একটা পাতলা আস্তরণ করে দেওয়া হয়। এতে দেশলাইয়ের বারুদ জ্বলে উঠলে সেই আগুনে কাঠিও সহজে ধরে যায়। এভাবে প্রজ্বলন কিছুক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় কাজের অনেক সুবিধা ঘটে।

বিজ্ঞানীদের সাধনার ফলে সহজে অগ্নি উৎপাদনের জন্যে কত না উপায় উদ্ভাবিত হলো। ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে এগিয়ে আজ দেশলাই শিল্প চরম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। দেশলাই তৈরীর কাজ সেদিন ছিল বিপজ্জনক—তৈরী হতো হাতে। আর আজ সুবিশাল কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেশলাই তৈরী হচ্ছে। একটি মাত্র যন্ত্রে আজকাল দৈনিক প্রায় একলক্ষ ষাট-কাঠির দেশলাই তৈরী হতে পারে। যন্ত্র কৌশলে কাঠ চেরাই হয়ে কাঠি তৈরী হচ্ছে—সাইজ মত কাটা হচ্ছে, তারপর সেগুলোর মাথায় দাহ্যপদার্থের মিশ্রণটি লাগান, বাক্স তৈরী, বাক্সে কাঠি-ভর্তি করা, এমন কি তার গায়ে লেবেল পর্যন্ত যন্ত্রেই আঁটা হচ্ছে। একেবারে পুরো তৈরী দেয়াশলাই যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে সারা পৃথিবীর কারখানাগুলোতে আজকাল দৈনিক যে পরিমাণ দেশলাই তৈরী হচ্ছে তার হিসেব দেখলে একটা অবিশ্বাস্য সংখ্যা বলে অনুমিত হবে।

আমাদের পুরাণে আছে, সে কালের ভগীরথ সাধনার বলে মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন। একালের বিজ্ঞানী ভগীরথেরা অতীতের অগ্নিদেবকে ধরায় নাবিয়ে এনেছেন নিছক কৌশলে। অগ্নিদেবতার মর্তে আগমনের ইতিহাস আজও শেষ হয়নি। সহজে আলোক ও অগ্নি উৎপাদনের পক্ষে আধুনিক দেশলাই সর্বাংশে সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কত সহজতর কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, হয়ত আরও কত হবে।

অগ্নি উৎপাদনের আধুনিকতম একটি কৌশলের কথা বলে এ অধ্যায় শেষ করবো। আজকাল 'পেট্রল-লাইটার' অনেকেই ব্যবহার করেন—একে এক রকম দেশলাই-ই বলা যেতে পারে। এতে ইস্পাতের তৈরী একটা ছোট চাকা আঙ্গুলের চাপে সহজেই ঘোরান যায়। চাকাটা ঘুরলে লোহা ও সিরিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী একটা ক্ষুদ্র পদার্থে ঘষা লাগে, আর তার ফলে দ্রুত আগুনের ফুলকি বেরোয়। ইস্পাতের ঘর্ষণে সিরিয়াম ধাতুর সূক্ষ্ম কণাগুলো ছুটে বেরিয়ে বাতাসে জ্বলে ওঠে এবং তাতেই ঐ ফুলকিগুলোর সৃষ্টি হয়। লাইটারের ভিতরে থাকে 'পেট্রল' তেল—তা থেকে পল্‌তে বেরিয়ে থাকে বাইরে, ঐ ইস্পাতের চাকাটার কাছে। এই পেট্রল হলো একটা অতিশয় সহজ দাহ্য ও উদ্বায়ী তেল। লাইটারের ঢাক্‌না খুললেই উদ্বায়ী পেট্রল পল্‌তে বেয়ে উপরে উঠে বাতাসে মিশে যায়। চাকাটা ঘোরালে যে আগুনের ফুলকি বেরোয় তাতে পেট্রলের পলতে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। আবার লাইটারের ঢাক্‌নাটি বসিয়ে দিলে বাতাসের অভাবে পেট্রল আর জ্বলতে পারে না—আগুন নিবে যায়।

পাখীদের দেশান্তর অভিযান

শ্রীরণেন্দ্রনাথ সিংহ

প্রাণীজগতে গৃহ পরিবর্তনের অভিযান প্রথা সুপ্রাচীন। এই অভিযানের গন্তব্যস্থল দুইটি; একটি বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয়ের স্থান, অন্যটি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বৃদ্ধির স্থান। দুই প্রান্তের দুইটি বাসগৃহকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণীর অবাধ অভিযান অনুসন্ধিৎসু মানুষের নিকট চিরকালের রহস্য। যেদিন হইতে মানুষ তাহার প্রতিবেশী প্রাণী সম্বন্ধে প্রথম কৌতূহলী হইয়াছে সেদিন হইতেই এই অবধি অভিযান প্রথা তাহার মনে কতকগুলি দুর্বোধ্য প্রশ্ন তুলিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত সে ভাবিয়াছে, কিসের আশায় জীবনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই দুর্বার অভিযান? কেমন করিয়াই বা দূরদূরান্তের দুর্গম পথকে অতিক্রম করিয়া অভিযান পূর্ণতা লাভ করে? কিসের আহ্বানে কার অনুপ্রেরণায় ক্ষুদ্র জীবদেহে দুরতিক্রম্য পর্বত, সীমাহীন প্রান্তর কিংবা সমুদ্রের বিপুল জলধারা ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার মত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চিত হয়? যুগে যুগে মানুষ এই সকল প্রশ্ন লইয়া ভাবিয়াছে এবং বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই। একথা সত্য যে, শতাব্দীর বিজ্ঞান-সাধনা সময়ে সময়ে প্রশ্নগুলির আংশিক উত্তর দিয়াছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আজও মূক, যেমন সে ছিল সৃষ্টির প্রথম যুগে। প্রাণীজগতে অভিযান প্রথার সেইসব অমীমাংসিত প্রশ্ন আজও প্রকৃতির এক বিচিত্র রহস্য।

অভিযানকারী প্রাণীদের মধ্যে খেচর পাখীর স্থান সর্বাগ্রে। ইহারা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে দল বাঁধিয়া দেশদেশান্তরে অভিযান করে। পাখীর মধ্যে এই প্রথা সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত হইলেও প্রাণীজগতের সকল শ্রেণীতেই ইহা দেখা যায়। যেমন মাছে—স্যামন, ইল ইত্যাদি, সরীসৃপে সামুদ্রিক কচ্ছপ, স্তন্যপায়ীতে বল্গা হরিণ ইত্যাদি। দলবদ্ধভাবে দেশান্তর ভ্রমণ, অথবা অন্যদেশে স্থায়ীভাবে গৃহ স্থাপন সর্বক্ষেত্রে অভ্যাসগত প্রাবাসিক গৃহ পরিবর্তন নয়। যেমন দ্রুত সংখ্যাধিক্যের জন্য নরওয়ের লেমিং নামক ইঁদুর ঝাঁকে ঝাঁকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঝাঁপাইয়া পড়ে অথবা খাদ্যের সন্ধানে হেরিং মাছের মত প্রাণীরা এক সাগর হইতে অন্য সাগরে চলিয়া যায়; কিংবা কোন প্রাণী যেমন জলস্রোত বা হাওয়ায় ভাসিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। আবার যখন বিশেষ কোন কারণে প্রাণীরা স্থায়ীভাবে পুরাতন গৃহ ছাড়িয়া দিয়া নূতন গৃহে বসবাস স্থাপন করে তখনও তাহাকে প্রকৃত অভ্যাসগত গৃহ-পরিবর্তন বলে না।

পাখীদের দেশান্তরে গৃহ-স্থাপনের প্রথা তাহাদের প্রবৃত্তিগত সংস্কার। ইহা একটি সহজাত-বৃত্তি। শীতের প্রারম্ভে শীতপ্রধান বাসভূমি ত্যাগ করিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চলিয়া যাইবার জন্য তাহাদের কোন শিক্ষা দিতে হয় না। অভিযান কালে শত সহস্র মাইল আকাশপথে উড়িয়া পার হইবার শিক্ষাও ইহাদের বংশানুক্রমিক। মৌমাছি যেমন নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায় মৌচাক বাঁধে, মাকড়সা জাল বোনে, পাখীও তেমনি নূতন গৃহের সন্ধানে অভিযান চালায়। অভিযানের অফুরন্ত শক্তি ইহাদের গঠনপ্রণালীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ইহা এক প্রকার রহস্যময় ক্ষমতা, যাহা দ্বারা পাখী তাহার অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণায় সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়া থাকে। এইজন্যই দেখা যায় সীমাহীন আকাশে একটি পাখী দলছাড়া হইয়া পড়িয়াও সম্পূর্ণ অপরিচিত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে

পারে। আবার অভিযানের প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির বিভিন্নতায় প্রাণীজগতে একেবারে নীচু হইতে উঁচু পর্যন্ত নানাস্তরের দেখা যায়; যেমন স্তন্যপায়ী শীল সরীসৃপ, সামুদ্রিক সাপ, ফ্লাণ্ডার মাছ এবং স্থলচর কাঁকড়া। অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় অভিযানের সহায়তা করে। এই সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ইউরোপ, আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের দেশগুলিতে ঋতুভেদে অভিযান অনুসারে পাখীদের প্রধানতঃ পাঁচভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর পাখী হইল, সোয়ালো, সুইফ্‌ট—কোকিল এবং নাইটিঙ্গেল। এই সকল পাখী বসন্তের প্রাক্কালে গ্রেটবৃটেন ও ইউরোপের নানা জায়গায় বাসা বাঁধে এবং গ্রীষ্মের শেষে অথবা শরৎকালে তাহারা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল সমূহে নামিয়া আসে। উত্তরের প্রচণ্ড শীতকে এড়াইয়া সারা শীতকাল সেখানে কাটায়। ২য় শ্রেণীর পাখীর দলে পড়ে—ফিল্ডফেয়ার, রেড উইং, স্নোব্রান্টিং এবং গ্রেট নর্দার্ন ডাইভার। ইহাদের বাস সুদূর উত্তরে মেরুপ্রদেশের সমীপবর্তী স্থানে। মেরুপ্রদেশে যখন অসহ্য শীতে সমস্ত জমিয়া যয় তখন এই সকল পাখী দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে (গ্রেটবৃটেন, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে) আসিয়া বাস করে। শীতের শেষে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে ইহারা দেশে ফিরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পাখী বিশেষতঃ স্নোব্রান্টিংকে সময়ে সময়ে নিম্নাঞ্চলে বাসা বাঁধিতে দেখা যায়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে—স্যাণ্ডপাইপার, গ্রেটস্নাইপ, লিট্‌ল্‌ ষ্টিন্ট্‌ প্রভৃতি। ইহারা সুদূর যাত্রাপথের মাঝখানে ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপে সামান্য সময়ের জন্য আস্তানা জমায়। এই স্বল্পস্থায়ী বিশ্রাম ও বাস উত্তর অথবা দক্ষিণ উভয় দিকেই গন্তব্যস্থলে যাইবার সময় হইতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর পাখীকে আংশিক অভিযানকারী বলা যাইতে পারে। ইহারা ঋতুভেদে কখনও স্থায়ী বাসস্থান হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া চলিয়া যায় না, অথচ ইহাদের জীবনেও অন্যান্য অভিযানকারী পাখীদের মত শীত ও গ্রীষ্মাভিযানে জীবনচক্র পূর্ণ হয়। ল্যাপউইং পাখীকে স্কটল্যাণ্ডে বৎসরের সারা সময়ে দেখা যায়, কিন্তু ল্যাপউইং শরৎকালে ঠিক আয়ারল্যাণ্ডে গিয়া কাটাইয়া আসে। পঞ্চমতঃ রেড্‌গুজ ও হর্স প্যারো প্রভৃতি যদিও পুরাপুরি গ্রেট্‌বৃটেনের স্থায়ী বাসিন্দা তথাপি ইহারা ছোট ছোট অভিযানে বাহির হয়। কখনও বা ইহারা ইউরোপে, কখনও বা দেশের মধ্যেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে অভিযান করে। ঠিক এই ধরণের স্কাইলার্ক, রুক্‌, সংর্থাস্‌ প্রভৃতি আরও অনেক পাখী আছে

পাখী একাদিক্রমে অভিযানে কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে তাহা সঠিক বলা অত্যন্ত কঠিন। সোয়ালো ও ষ্টর্কপাখী হাজার মাইলেরও বেশী পথ এক অভিযানে অতিক্রম করে। দূরত্বের দিক দিয়া প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লোভারেরও কৃতিত্ব আছে। ইহারা আলাস্কাতে ডিম পাড়িয়া অজানা অচেনা সমুদ্রের উপর দিয়া হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া হাওয়াই দ্বীপে গিয়া শীতকালীন আস্তানা স্থাপন করে। প্রাণীজগতে সুদূর অভিযানে চ্যাম্পিয়ান সম্ভবতঃ মেরুদেশীয় সামুদ্রিক সোয়ালো পাখী। ইহাদের দেহাকৃতি অতিশয় ক্ষুদ্র ও শীর্ণ অনেকটা গাঙ্গের মত। ইহাদের শীতাভিযান আরম্ভ হয় আমেরিকার মেরু অঞ্চল হইতে। সেখান হইতে উত্তর আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া ইউরোপে ও ইউরোপের উপকূল ধরিয়া আফ্রিকা ও আফ্রিকা হইতে আমরু অঞ্চলের মহাসাগরে ইহারা অভিযানের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করে। পরবর্তী বসন্তকালে এইখান হইতে আবার প্রত্যাভিযান সুরু হয় —ঠিক পূর্বের পথেই প্রায় ২৪০০০ হাজার মাইলের ভ্রমণচক্র পূর্ণ করিয়া সোয়ালো দেশে উপস্থিত হয়।

অভিযানকারী পাখীর অভিযানের দূরত্ব অপেক্ষা গতি নির্ণয় করা আরও কঠিন। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন—সাধারণ পাখী অভিযানের সময়

ঘণ্টায় কম বেশী ৫০ মাইল বেগে উড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহা নাকি ২৫০ মাইল পর্যন্তও হইতে দেখা যায়। অভিযানকারী কাক সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৩০ হইতে ৪৫ মাইল, ফ্যালকন্ ৪০ হইতে ৪৮ মাইল, হাঁস ৪২ হইতে ৫৫ মাইল, পাতিহাঁস ৪৪ হইতে ৫৯ মাইল উড়তে পারে। স্টর্ক উত্তর ইউরোপ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় শরৎকালীন অভিযানের সময় ২০০ মাইল একভাবে উড়িয়া বিশ্রাম নেয়। ইহারা দিনে আট ঘণ্টার বেশী উড়ে না।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্ গাৎকের মতে পাখী ২০০০ ফিট পর্যন্ত উঁচু দিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। অবশ্য স্টার্লিং, স্কাইলার্ক প্রভৃতি পাখী আরও নীচু দিয়া যায়। গাৎকের এই উচ্চতার হিসাব অঙ্ক কষিয়া বাহির করা। প্রকৃতপক্ষে বিমানচালকেরা কোন কোন পাখীকে ৩০০০ ফিট উঁচু দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছেন। লুকানাসের মতে অধিকাংশ পাখীই ১০০০ ফিটের নীচু দিয়া উড়িয়া যায় এবং কদাচিৎ কোন পাখীকে ৩২০০ ফিট পর্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। মিনার্ট জহাগেন বলেন, কোন কোন পাখীকে ৫০০০ হাজার ফিট উপরে উঠিতে দেখা যায় এবং তাহারাই অসাধারণের শ্রেণীতে পড়ে। আর সকল সাধারণ পাখী ৩০০০ ফিটের নীচু দিয়া যায়—দিনে অথবা রাত্রিতে। কিন্তু এই ৫০০০ ফিটকেই পাখীর অভিযানে সর্বোচ্চ আরোহণ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সোয়ালো যখন আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া যায় তখন সে অন্ততপক্ষে ১০০০০ ফিট উঁচু দিয়া যায়। আবার এমন অনেক পাখী আছে যাহারা অবলীলাক্রমে হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে নামিয়া আসে। তাহারা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কমপক্ষে ১৮০০০ হাজার ফিট উঁচুতে উড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আদিম প্রবৃত্তি যখন প্রাণীকে চালনা করে তখন তাহারা পথের সকল প্রকার বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিবার মত অসাধারণ শক্তিলাভ করে।

শীতের দেশে যে সকল পাখী গরমকালে আসে, তাহারা সে দেশে শরৎকালেই ঠাণ্ডা হাওয়া, ঝড় ও ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে প্রচণ্ড শীতের পূর্বাভাস বুঝিতে পারে। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের-শেষে, বসন্তকালেই পাখী আবহাওয়ার ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা অনুভব করে ও ভবিষ্যৎ গ্রীষ্মের ইংগিত পায়। এই অভিযান অধিকাংশ সময়েই একটি গোষ্ঠীবদ্ধ কাজ। একে অন্যেকে অভিযানে প্ররোচিত করে। এই অভিযানপ্রথার পিছনে একটি বিবর্তনের ইতিহাস রহিয়াছে। এই ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা দেশের সমসাময়িক জলবায়ুর পরিবর্তন ও আবহাওয়ার বিবর্তনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতীতে এমন এক সময় ছিল, যখন ইউরোপ কিংবা উত্তরের শীতপ্রধান অঞ্চলসমূহে আজিকার অপেক্ষা উষ্ণতর আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল। সেইসময় যে সকল পাখী সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিত পরবর্তীকালে ক্রমশ ঋতুভেদে শীতের আধিক্য হেতু তাহারা তখন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একদল সে দেশের শীতকালের দুরন্ত শীতের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিল এবং পূর্বের মতই সারা বৎসরের জন্য সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। অবশ্য শীত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত তাহাদের দেহের আংশিক পরিবর্তন হইল। ২য় দল—যাহাদের অনুভূতি শক্তি নাই অথবা থাকিলেও খুব কম, তাহারা আবহাওয়ার দ্রুত-পরিবর্তন ধরিতে পারিল না এবং নিজেদেরও সেই তীব্র শীতের আবহাওয়ার সহিত মিলাইয়া লইতে পারিল না। ফলে, একে একে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ৩য় দল—যাহারা তাহাদের প্রখর অনুভূতিশীলতার দরুণ অসহ্য শীতের আভাস পাইয়া শীত পড়িবার পূর্বাহ্নেই দক্ষিণের উষ্ণতর অঞ্চলে গিয়া সাময়িকভাবে আস্তানা করিল। শেষোক্ত দলের ডানায় জোর ছিল বেশী—দৃষ্টিশক্তি ছিল

প্রখর। এইদলই সর্বপ্রথম ঋতুভেদে বিদেশে অভিযানের সূচনা করিল। উত্তরে শীত যখন শেষ হইয়া যাইত তখন বসন্তকালে ইহারা দেশে ফিরিয়া আসিত। সেই সময়ে অজস্র ফলে, ফুলে দেশ ভরিয়া যাইত; জলেরও কোন অভাব থাকিত না। পাখী শান্তিতে গৃহনির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিত।

এইভাবে উত্তরাঞ্চলে শীত বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের শারদীয় অভিযানের দূরত্বও ক্রমশ বাড়িতে থাকে। কালে ইউরোপের পাখী শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এশিয়া ও আফ্রিকা অভিমুখে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিতে লাগিল। আর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়া এই দলবদ্ধ অভিযান কালে বংশানুক্রমিক প্রথায় পরিণত হইল। অবশ্য শীতের সমস্যা উত্তরের প্রাণীসমাজে চিরন্তন। তাই দেখিতে পাই, শীতের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আত্মরক্ষার নানাপ্রকার সরঞ্জাম। শীতের জন্য কেহ খাদ্যসঞ্চয় করে, কেহ দেহে চর্বি সঞ্চয় করে, কেহ বা শীতকালে দেহ লোমে ভরাইয়া দেয়। আবার কেহ সারা শীতকাল ঘুমাইয়াই কাটায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সহজ সমাধান পলায়ন।

পাখী কিরূপে তাহার যাত্রাপথ খুঁজিয়া বাহির করে, ইহা একটি গভীর রহস্য। সুদূর যাত্রাপথে পাখীর ঝাঁককে অনেক রকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার কালে পাখী অনেক সময় অন্ধকার কুয়াশায় বিভ্রান্ত হয়; খাদ্যাভাবে অথবা আলোক স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা খাইয়া মারা পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত বাধা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের অভিযান সফল হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া ইহারা সমুদ্র-পৃষ্ঠে দিকনির্ণয় করিয়া ঠিক পথে চলে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিদ্বারা দ্বীপপুঞ্জের সারি, পর্বতশৃঙ্গ, নদী বা উপত্যকাকে চিহ্নিত করিয়া রাখে এবং ফিরিবার পথে কাজে লাগায়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তিই দিক্ নির্ণয়ের মূল উপাদান নহে। কারণ, অসংখ্য পাখী রাত্রির অন্ধকারে কোন চিহ্ন ছাড়াই বিরাট সমুদ্র পাড়ি দেয়। একবার একদল বন্যপাখীকে খাঁচায় বদ্ধ করা হয় এবং জাহাজে করিয়া সমুদ্রের মাঝখানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হাজার মাইল দূর হইতে তাহারা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিয়াছে। এ ঘটনা পাখীদের পথের নিশানা ও দিকনির্ণয়ের রহস্যকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে দিকনির্ণয়ের ক্ষমতা ইহাদের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার সম্মিলিত ফল। কে জানে, সুউচ্চ পর্বত বা সুদীর্ঘ সাগরের উপর দিয়া একাদিক্রমে অভিযান চালাইয়া ইহারা কিভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সে অভিজ্ঞতাই বা কিভাবে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়!

যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, দূরদেশে অভিযানের অনুপ্রেরণা পাখীর রক্তের মধ্যেই থাকে এবং বংশপরম্পরায় তাহা সঞ্চারিত হয়, তথাপি কেমন করিয়া ইহা এক গোষ্ঠীর মধ্যে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে? তবে কি খাদ্যাভাব, উত্তাপ বা বায়ুচাপের তারতম্যই ইহার জন্য দায়ী? কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই তিনের পরিবর্তন হয়, তাহার বহু পূর্ব হইতেই পাখীর অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। উইলিয়ম রোয়েন বলেন যে, দিনের আলোর স্থায়িত্বের সহিত অভিযানে সাড়া দিবার এক নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। তাঁহার মতে দিনের আলোর পরিবর্তন পাখীর দেহেও কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন আনে। এই দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের প্রবৃত্তিও জাগরিত হয়। শরৎ-কালে দিনের আলো কমিয়া আসিতে থাকে এবং বসন্তকালে বাড়িতে থাকে। পাখীও সেই অনুসারে

অভিযানের সংকেত পায় ও উত্তর হইতে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ হইতে উত্তর গোলার্ধের দিকে যাত্রা করে। বাউএন এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি একবার আলবার্টায় দক্ষিণের যাত্রী একপাল জুন্‌কো পাখী ধরিয়া দুইটি ঘরে বন্ধ করিয়াছিলেন। ঘর দুইটির একটির মধ্যে ৫০ ওয়াট পাওয়ারের কৃত্রিম আলো জ্বালান ছিল, অন্যটি দিনের আলোকেই আলোকিত হইত। উভয় খাঁচাতেই পাখীগুলিকে খাদ্য দেওয়া হইত এবং উভয় খাঁচাতেই তাহারা প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে শীতের মাঝামাঝি সময়ে যখন উভয় খাঁচার পাখীগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল, কৃত্রিম আলোকে আলোকিত খাঁচার পাখীগুলি নির্দিষ্ট যাত্রাপথে উড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু স্বাভাবিক আলোকে আলোকিত খাঁচার পাখীগুলি ছাড়িয়া দিবার পরও আশেপাশেই রহিয়া গেল এবং সহজেই আবার ধরা পড়িল। কিন্তু উভয় খাঁচার পাখীকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, প্রথমোক্ত খাঁচার পাখীগুলির প্রজনন যন্ত্রে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। প্রজনন-যন্ত্রগুলি, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই ঠিক বসন্তকালের মত পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ২য় (স্বাভাবিক খাঁচার) পাখীগুলির প্রজনন-যন্ত্র, ঠিক শীতকালে যাহা স্বাভাবিক সেই রকম অকর্মণ্যই রহিয়াছে। ইহার ফলে ইহারা অভিযানের অনুপ্রেরণা ও গতিশীলতাকে হারাইয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, অভিযানের স্পৃহা প্রতিকূল ঋতুতে বা আবহাওয়ায় কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে স্বাভাবিক দেহেরও কাজ চালু থাকার দরুণ পূর্বের মতই রহিয়াছে।

অভিযানকারী ভারতীয় পাখী সম্বন্ধে আজপর্যন্ত কোন ব্যাপক গবেষণা হয় নাই। অথচ ভারতবর্ষে অভিযানকারী পাখীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। শীতকালে সকলেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল উত্তর দিক হইতে উড়িয়া আসিতেছে এবং ছোট বড় জলাশয়ে চড়িয়া বেড়াইতেছে। নানাজাতের প্রায় ২৮৷২৯ রকমের হাঁস ভারতে আসে। অভিযান ও প্রত্যভিযানকারী যে সকল পাখী বিদেশ হইতে কিংবা হিমালয় হইতে ভারতবর্ষে আসে এবং শীতকাল সেখানেই কাটাইয়া যায় তাহাদের কতকগুলির নাম দেওয়া হইল। যথা—স্নাইপ, টার্ণ বা গাংচিল, রেডষ্টার্ট, কমন্‌গ্রেকোয়েল, পিনিয়ন কুইল, রেনকোয়েল, নাকিহাঁস, লালশর, রাঙামুড়ি, উইজিন, ইয়েলোডাগটেল, (খঞ্জন), গ্রেহেডেড্‌ মৌউয়া (পাওয়াই) কমন সোয়ালো, পীনটেল, ব্রাহ্‌মিনি-ডাক্‌স (চখা), গ্রে গুজ, কটন টিল, কুয়েইল, পিনিয়ন কুয়েল, জাপামিজ কুয়েইল, বাস্টার্ড কুয়েইল, লেসার কুইসলিংটিল, শেরাল হাঁস, ডাবটিক (পানডুবি) রুফাস টারটল্‌, স্টারলিং ইত্যাদি। এই সকল পাখী উত্তরের প্রচণ্ড শীত সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও ভারতের নিকটবর্তী স্থানসমূহে চলিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে একটি বড় অংশ আসে হিমালয় হইতে। শীতের অবসানে ২৷১টি ছাড়া প্রায় সব রকমের পাখী ফিরিয়া যায়।

ঋতুভেদে অভিযান ও প্রত্যভিযানে ভারতবর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পাখীকে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌ ডাঃ এস, সি লাহা তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

(১) প্রকৃত অভিযানকারী যে সকল পাখী সাধারণতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া ডিম পাড়ে। যেমন—স্নাইপ বাস করে ও ডিম পাড়ে ইউরোপে, আফ্রিকায়, কাশ্মীরে ও সাইবেরিয়ায়, কিন্তু শীতকালে আসিয়া শক্তি সঞ্চয় করে ভারতবর্ষে। খঞ্জন বা ইয়েলোডাগটেল্‌—সাধারণতঃ আসে রাশিয়া হইতে, তবে গ্রীষ্মকালে ইহারা ইউরাল পর্বত হইতে কামাস্কাট্‌কা পর্যন্ত নানা জায়গায় ছড়ান থাকে। রুকাস, টারটল, ষ্টারলিং, শ্রাইক প্রভৃতি আরও অনেক পাখী এই দলে পড়ে।

(২) কতকগুলি পাখী হিমালয়ে গিয়া ডিম

পাড়ে। রেড্‌ষ্টার্ট ব্ল্যাক ক্যাপ্‌ড ও হোয়াইট ক্যাপড্‌, কুইস্‌লিংটিল বা মংগলহাঁস, রাজহাঁস, নাকিহাঁস প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে।

(৩) আংশিক অভিযানকারী—যে সকল পাখী ভারতবর্ষের মধ্যেই বাস করে—কিন্তু বাসস্থান ব্যতীত অন্য এক স্থানে গিয়া ডিম পাড়িয়া আসে। এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে আমাদের সুপরিচিত বৌ কথা কও, কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখী। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম ব্যতীত, রাজপুতনা হইতে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত পাপিয়া ভারতবর্ষের সকল অংশেই দেখা যায়। নভেম্বর মাসে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে লঙ্কা দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হয় এবং গ্রীষ্মের প্রথমেই আবার স্ব স্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা প্রভৃতি শুষ্কস্থান ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষেই কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা·স্থানীয় অভিযানকারী পাখী। কেবল যে সকল স্থানে পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল নাই সেই সকল স্থানে গিয়া ইহারা ডিম পাড়িয়া আসে। শীতকালে কোকিল লঙ্কায় যায়। ওট্‌স্‌-এর মতে ইহারা গ্রীষ্মকালে চীন, জাপান ও পূর্ব সাইবেরিয়ায় অভিযান করে। কিন্তু এপ্রিল ও মে মাসে ইহাদিগকে ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়ে পর্বতে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। সাহ্‌-বুল্‌বুল্‌কেও সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া দেখা যায়। বর্ষাকালে ইহারা বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতবর্ষে চলিয়া আসে। তবে দাক্ষিণাত্যেও ইহাদের বর্ষাকালে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাখীদের দেশান্তর গমনাগমন সম্বন্ধে কলিকাতা যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :—

ঊর্ধ্বদেশে গমনাগমন

১। হিমালয় পর্বতের সাদা ঝুঁটিযুক্ত রেডষ্টার্ট পাখী গ্রীষ্মকালে প্রায় ৮০০০ হাজার হইতে ১৪০০০ ফুট উচ্চস্থানে ডিম পাড়ে এবং শীতকালে প্রায় ২০০০ হইতে ৮০০০ ফুট নিম্নস্থানে আসিয়া বাস করে।

২। রুফাস্‌ টার্‌টল্‌ নামক এক প্রকার ঘুঘু মধ্য সাইবেরিয়া, মাঞ্চুকো জাপান ও চীন দেশের কোন কোন স্থানে এবং হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল, সিকিম ও উত্তর আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। শীতকালে ইহারা পূর্বভারত ও দাক্ষিণাত্যেও গিয়া উপস্থিত হয়। যেখানে ইহারা শীত কাটায় ও অনতিদূরেই ডিম পাড়িয়া থাকে।

৩। মধ্য এশিয়ার ষ্টার্‌লিং পাখী তুর্কীস্থানের ফেরঘনা ও ইয়ারখন্দ হইতে তিয়েনশান পর্বতমালার মধ্যস্থিত প্রদেশে ডিম পাড়ে। ইহারা আফগানিস্থান, উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থানে গিয়া শীতের সময় বাস করে।

৪। বাদামী রঙের শ্রাইক পাখী সাইবেরিয়ায় ডিম পাড়ে এবং ভারতবর্ষ ও সিংহলে গিয়া শীতকালে বাস করে। ইহারা যে স্থানে ডিম পাড়ে, তথা হইতে বহুদূরে গিয়া শীতকালে বসবাস করে।

৫। দূরদেশে গমনাগমন—হাঁসেরা বাসাবদল করিবার সময় সাধারণতঃ শ্রেণীবদ্ধভাবেই উড়িয়া যায়। ইহারা ৩০০০ ফুট উঁচু অথবা নিম্ন স্থানের উপর দিয়া যাতায়াত করে।

৭। প্রতি বৎসর কয়েক প্রকার হাঁস ভারতবর্ষ হইতে সাইবেরিয়া পর্যন্ত -- দুই হাজার মাইলের অধিক যাতায়াত করে। তাহারা গ্রীষ্মকালে সাইবেরিয়ায় ডিম পাড়ে এবং শীতকালে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে। গতিবিধি নির্ণয়ের জন্য কয়েকটি পাখীর পায়ে আংটা পরাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে ইহাদিগকে সাইবেরিয়া ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়।

আইসোটোপ্‌স্‌ ও ভরলিপি যন্ত্র

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

অনেকদিন থেকে বিজ্ঞানীরা এটাই বিশ্বাস করতেন যে, যে কোন বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ—যেমন, পারদ অথবা ক্লোরিন একই রকম পরমাণুদ্বারা গঠিত যাদের শুধু পারমাণবিক সংখ্যা নয়, পারমাণবিক ওজনও সমান। যেমন পারদের পারমাণবিক সংখ্যা ৮০ এবং পারমাণবিক ওজন ২০০.৬। কাজেই পারদের সব পরমাণুর সংখ্যা ও ওজন হবে যথাক্রমে ৮০ এবং ২০০.৬। কিন্তু পরে স্যার জে, জে, টমসনের 'পজিটিভ রশ্মি' পরীক্ষার সময় এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। স্যার জে, জে, টমসন যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন তার বিশেষত্ব ছিল এই যে, তা দিয়ে সরাসরি কোন বিশেষ পরমাণুর ভর মাপা যায়। যে সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া জানা ছিল তা দিয়ে যে কোন পদার্থের সব পরমাণুর গড়পরতা ভর মাপা যেত; কোন বিশেষ পরমাণুর ভর পাওয়া যেত না। অবশ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বেলাতে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, পদার্থটির সব পরমাণুই একরকম। কাজেই গড়পরতা ভর পেলে এবং পরমাণুর সংখ্যা জানলে তা থেকে একটি পরমাণুর ভর নির্ণয় করা যেতে পারতো। সুতরাং এ প্রণালী থেকে সব পরমাণুর এক ওজন হবে—একথা বলাই বাহুল্য। টমসন 'পজিটিভ রশ্মি' পরীক্ষা যন্ত্রে নিওন নামক গ্যাস দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, ফটোগ্রাফির প্লেটে নিওন লাইনের পাশে আর একটি অস্পষ্ট লাইন আছে। নিওনের পারমাণবিক ওজন ২০ এবং এই অস্পষ্ট লাইনটি ২২ পারমাণবিক ওজনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনরকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই ২২ পারমাণবিক ওজন সম্পন্ন জিনিসটি নিওন থেকে পৃথক করা গেল না। একই রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অথচ বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের অধিকারী বিভিন্ন জিনিসের অস্তিত্ব থাকতে পারে এরকম একটা ধারণা আগে থেকেই করা হয়েছিল তেজস্ক্রিয়তা প্রতিপাদ্যের দ্বারা। কিন্তু এই প্রতিপাদ্যে এই ঘটনাকে শুধু তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভিতর আবদ্ধ করা ছিল। এখন টমসন তাঁর পরীক্ষাদ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন যে, শুধু তেজস্ক্রিয় পদার্থ নয়, সাধারণ পদার্থেও এই ব্যাপার দেখা যায়, যেমন দেখা গেল নিওন গ্যাসে। এই যে বিভিন্ন জিনিস, যাদের রাসায়নিক গুণসমূহ অবিকল একরকম অথচ তাদের পারমাণবিক আকার ও ওজন বিভিন্ন এদের বলা হয়—আইসোটোপ্‌স্‌। আগেই বলা হয়েছে যে, আসল ধাতু থেকে আইসোটোপ্‌কে বিচ্ছিন্ন করা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সম্ভব হয়নি। বিশেষতঃ উচ্চ পারমাণবিক ওজন সম্পন্ন মৌলিক পদার্থের বেলায় এই সমস্যা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। কাজেই এই বিষয় বিজ্ঞানীরা তখন বড়ই বিব্রত বোধ করেছিলেন। টমসনের পরীক্ষা দ্বারা আরো অনেক পদার্থের আইসোটোপ্‌সের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল; কিন্তু পৃথকীকরণ সমস্যার সমাধান আর হলো না। টমসনের পরীক্ষার ফলদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অ্যাস্টন এই বিষয় গবেষণা আরম্ভ করলেন এবং অবশেষে সাফল্য লাভ করে যে যন্ত্র আবিষ্কার করলেন তা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হলো। এই যন্ত্রের নাম 'ভর-লিপি যন্ত্র' বা 'মাস্‌-স্পেক্ট্রোগ্রাফ'। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৯২২ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। অ্যাস্টনের এই

ভরলিপিযন্ত্র পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে অনেকদূর প্রসারিত করেছে। অ্যাস্টনের যন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :—

বিজ্ঞানীমহলে একথা আগেই জানা ছিল যে, তড়িৎসম্পন্ন কোন কণার গতিপথ চৌম্বক-ক্ষেত্র বা বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্র দ্বারা ভিন্নমুখী করা যায় এবং টমসনও 'পজিটিভ রশ্মি' পরীক্ষায় এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন। অ্যাস্টনও টমসনের প্রণালী অবলম্বন করে তাঁর ভরলিপি যন্ত্রের যে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে, একই তড়িৎ পরিমাণ ও ভরের অনুপাতবিশিষ্ট সব আয়নকে একই বিন্দুতে আনতে পেরেছিলেন। এই প্রণালীর দ্বারা যন্ত্রের সূক্ষ্মতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অ্যাস্টন তাঁর যন্ত্রে যে প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন তার একটি ছবি দেওয়া হলো। একটি বিদ্যুৎ-মোক্ষণ কাঁচনলের ভিতর বহুরকম গতিবেগসম্পন্ন কণা বর্তমান, সেহেতু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় স্রোতটি ক্রমশ মোটা হয়ে যাবে এবং একটি মোটা ছিদ্রের (ঘ) ভিতর দিয়ে এই স্রোতকে অগ্রসর হবার সময় সব চাইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন কণাগুলো ছিদ্রের (চ) পাশ ঘেঁসে যাবে এবং কম গতি সম্পন্ন কণাগুলো (ছ) পাশ ঘেঁসে যাবে। (ঘ) ছিদ্র থেকে বেরিয়ে এই মোটা কণাস্রোতটি কাগজের সমতলের সঙ্গে সমকোণ করা একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ করে। একটি তড়িৎ-চুম্বকের গোলাকার মেরু (ম) দ্বারা এই চৌম্বক ক্ষেত্রটি সৃষ্টি করা হয়। এই চৌম্বক-ক্ষেত্র স্রোতটিকে এমনভাবে ভিন্নমুখী করে দেয় যাতে অল্প বেগবান আয়নগুলো বেশী ঘুরে যায় এবং সেগুলোকে অতি বেগবান করে। এই চৌম্বক-ক্ষেত্রটির কাজ আগের বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্রের কাজের ঠিক বিপরীত। এর
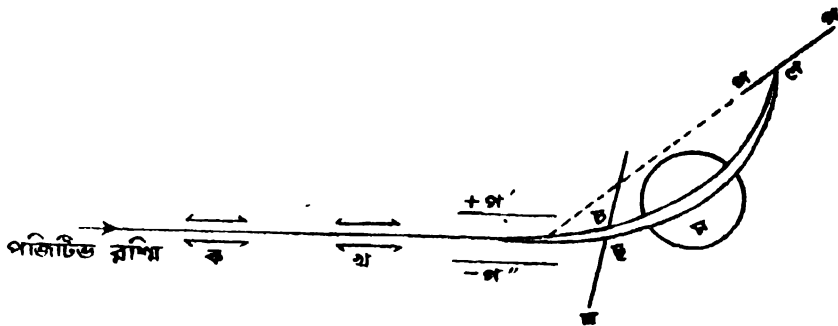
ভরলিপি যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

(ছবিতে দেখান হয়নি) ভিতর থেকে আগত পজিটিভ রশ্মিকে ক্যাথোডের একটি ছোট ছিদ্রের (ক) ভিতর দিয়ে পাঠান হতো। রশ্মি এই ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আর একটি ছোট ছিদ্রের (খ) ভিতর দিয়ে যে স্থানে উপস্থিত হতো সে জায়গায় একটি বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্র রচনা করা আছে দুটি বিদ্যুৎবাহী প্লেটের (গ', গ'') সাহায্যে। এই বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্র কণাস্রোতকে গ প্লেটের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যে কণার যত বেশী গতিবেগ, সেই কণা তত বেশী ঘুরে যায়। যেহেতু 'পজিটিভ রশ্মি' স্রোতের ফলে চৌম্বক-ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আয়নগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে ধাবিত হয় এবং একটি বিন্দুতে (ন) গিয়ে হাজির হয়। যন্ত্রটি সুবিধা মত তৈরী করে নিলে তড়িৎ-পরিমাণ ও ভরের বিভিন্ন অনুপাত-বিশিষ্ট বিভিন্ন আয়নের বিন্দুপথটি একটি সরল রেখায় পরিণত করা যায়। কাজেই একটি ফটোগ্রাফীর প্লেটকে (প) এই জায়গায় রাখলে কতকগুলো লাইনের ছবি পাওয়া যাবে। যার প্রত্যেকটি লাইন একটি বিশিষ্ট তড়িৎ-পরিমাণ ও ভরের অনুপাতের জ্ঞাপক। অ্যাস্টনের এই যন্ত্রে ফটো-

গ্রাফীর প্লেটের পরিবর্তে যদি সুবিধামত 'প্লিটের' বন্দোবস্ত করা যায় তাহলে এক একখোপে এক এক রকমের ওজনের পরমাণু সংগ্রহ করা সম্ভব।

এই যন্ত্রের সাহায্যে দু'রকম ভরসম্পন্ন নিওন পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অ্যাস্টন নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছিলেন। অক্সিজেন পরমাণুর ভরকে (১৬) একক হিসাবে ধরে নিওনের এই দুটি পরমাণুর ওজন যথাক্রমে ২০ এবং ২২ খুব কাছাকাছি পাওয়া গেল। ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন ৩৫'৪৬। কিন্তু যখন এই ভরলিপি যন্ত্রে ক্লোরিনকে নিয়ে পরীক্ষা করা হলো তখন ৩৫'৪৬ অনুযায়ী কোন লাইন পাওয়া গেল না—তার বদলে দুটি লাইন পাওয়া গেল, যাদের ভর যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৭। কাজেই এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হলো যে, দুরকম ক্লোরিন পরমাণু আছে, যাদের পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন; কিন্তু রাসায়নিক ও অন্যান্য গুণাবলীর ব্যাপারে হুবহু একরকম। কাজেই এদের বলা হয় ক্লোরিন আইসোটোপ। সাধারণ ক্লোরিনে এই দু'রকম পরমাণু এমন পরিমাণে মিশ্রিত আছে যাতে সাধারণ ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন হয়েছে ৩৫'৪৬। এভাবে অ্যাসটনের ভরলিপি যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষার ফলে প্রায় সব মৌলিক পদার্থে আইসোটোপ্‌সের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সম্প্রতি সব চাইতে সহজ ও সরল যে মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন—তাতেও আইসোটোপ্‌সের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। তিন রকম পারমাণবিক ওজন সম্পন্ন (১, ২, ৩) পরমাণু দ্বারা হাইড্রোজেন গঠিত।

পরমাণু ভর ঠিক ঠিক পূর্ণসংখ্যা কি-না পরীক্ষা করবার জন্যে অ্যাস্টন তাঁর যন্ত্রের সূক্ষ্মতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করলেন এবং তা দিয়ে এই পূর্ণসংখ্যা নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন। যদিও এই ব্যতিক্রম অতি সামান্য তবুও তাৎপর্যপূর্ণ। অক্সিজেনের ভর একক হিসাবে ধরলে অন্যান্য পরমাণুর ভর পূর্ণসংখ্যার অতি নিকটবর্তী হয়, যদিও ঠিক ঠিক সমান হয় না। যেমন, অ্যাস্টন তাঁর প্রথম ভরলিপি যন্ত্র দ্বারা ক্লোরিনের যেদুটি আইসোটোপ্‌স্ পেয়েছিলেন, তাদের ভর ছিল ৩৫ ও ৩৭; কিন্তু সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেল, তাদের যথার্থ ভর ৩৪'৯৮৩ ও ৩৬'৯৮০।

অ্যাস্টনের ভরলিপি যন্ত্র দ্বারা আইসোটোপ্‌স্ পৃথকীকরণ সমস্যার সমাধান হলো এবং তাঁর এই সাফল্য পরবর্তীকালে আণবিক শক্তি আহরণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করলো। বিজ্ঞানীমহলে এটা জানা ছিল যে, ইউরেনিয়াম্ ২৩৮-এর একটি আইসোটোপ্ ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর ভাঙ্গন খুব সহজে নিষ্পন্ন করা যায়; কিন্তু মুস্কিল ছিল—আসল ধাতু থেকে আইসোটোপ্‌কে বিচ্ছিন্ন করা। অ্যাস্টনের ভরলিপি যন্ত্র এই মুস্কিলের আসান করলো। আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে ভরলিপি যন্ত্রের প্রণালী হয়তো ব্যবহৃত হয়নি—তাহলেও অ্যাস্টনের এই যন্ত্র বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ করে রাসায়নিক-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে সন্দেহ নেই।

কালো আলো

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

মানুষ তার আদি সৃষ্টি মূহূর্ত থেকে আলোর সঙ্গে পরিচিত। তারপর তার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নানা গবেষণা চালিয়ে কৃত্রিম উপায়ে নানা প্রকার আলোকরশ্মি আবিষ্কার করেছে। আকাশের গায়ে রামধনুর বিচিত্র বর্ণসমাবেশ দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছে আর করেছে গবেষণা—কেমন করে বিচিত্রবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকেই মানুষ আবিষ্কার করেছে—রঙের পার্থক্য কেমন করে হয়। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্যে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি। বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪/১০০,০০০ সেন্টিমিটার আর লাল আলোর ৭/১০০,০০০, সেন্টিমিটার। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাঝে হল্‌দে, সবুজ এবং নীল আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্তমান। লাল আলোর চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত একপ্রকার অদৃশ্য আলোর নাম—ইনফ্রারেড বা লালউজানি আলো। ঠিক ঐভাবে বেগুনী আলোর চেয়ে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত একরকম আলোকে বলা হয় আলট্রাভায়োলেট-রে বা বেগ্‌নী পারের আলো। এই বেগ্‌নী পারের আলো থেকেই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু 'কালো আলোর' জন্ম হয়েছে।

বেগ্‌নী পারের আলো বা আলট্রাভায়লেট-রশ্মির সামনে যদি নিকেল অক্সাইড মাখানো একটি কাচখণ্ড ধরা যায়, তাহলে বেগ্‌নী পারের আলোর রূপ যায় বদ্‌লে—আলোর রং তখন কালো মত দেখায়। সেই জন্যে বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন কালো আলো বা 'ব্ল্যাকলাইট'।

'কালো আলো' অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আলো-কে পরাভূত করেছে। সাধারণ আলোর সাহায্যে যেসব বস্তু আমাদের চোখে পড়ে না—'কালো আলো' তা দেখ্‌তে সাহায্য করে। এমন বহু ব্যাধি আছে যাদের বীজাণু এবং লক্ষণ সাধারণ আলোয় চোখে দেখা না গেলেও কালো আলোর সংস্পর্শে এলে তা দেখ্‌তে এবং বুঝতে পারা যায়।

এই কালো আলো-কে সর্বপ্রথম রোগ নির্ণয়ের কাজে প্রয়োগ করেন জার্মেনীর অন্তর্গত কলোনের ডাঃ কার্ল হেগেম্যান্। ভাইরাস, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে না, তাদের উপর কালো আলো ফেল্‌লে সেগুলো অদ্ভূত প্রতিপ্রভ বা 'ফ্লুওরেস্‌সেণ্ট' হয়ে ওঠে এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। এই ভাইরাস থেকে প্যারট্-ফিভার, হাম, বাতজ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মায়।

বার্লিনের একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ অটো-রিক্ একবার এই কালো আলো দিয়ে অদ্ভুত একটি পরীক্ষা করেন। মানুষের রক্ত একটি টেষ্টটিউবে ভরে কিছুক্ষণ রেখে দিলেন—এতে রক্তকণিকাগুলো তলিয়ে গেল; উপরে রইল রক্তের জলীয় অংশ বা সিরাম। রক্তের এই জলীয় অংশের উপর ডাঃ অটো কালো আলো ফেললেন। এই পরীক্ষায় তিনি দেখতে পেলেন বিভিন্ন রক্তের জলীয় অংশের রংও বিভিন্ন—তা ছাড়া কতকগুলো রক্তের জলীয় অংশ দেখা গেল, কালো আলোর সংস্পর্শে একেবারে স্বচ্ছ আবার কতকগুলো দুধের মত ঘন। এই ভাবে নানা পরীক্ষা চালিয়ে ডাঃ অটো দেখলেন—সুস্থ, সবল মানুষের রক্তের সিরাম ফিকে অথবা গাঢ় জলপাই-সবুজ রঙের হয় আর অসুস্থ লোকের সিরামে নানা রকম রং দেখা যায়। এই পরীক্ষার দ্বারা রঙের তারতম্য অনুযায়ী রোগ নির্ণয় এবং তার অবস্থাও বলা যায়।

ডেট্রয়েটের ডাঃ জে, এল, নেলার এবং ই, আর স্মিথ, ইনজেকসনের সূচ দিয়ে লোকের পায়ের

উপর, উপর থেকে নীচের দিকে আঁচড় টেনে তার উপর কালো আলো ফেলে হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এই পরীক্ষায় রোগীর পা এবং পায়ের পাতা বেশ ভাল করে অ্যাল্‌কোহল দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর দু ইঞ্চি অন্তর পায়ে ক্রমাগত নীচের দিকে ইন্‌জেকসনের সূচ দিয়ে আঁচড় টানা হয়। শেষ আঁচড়টি বুড়ো আঙুলের নীচে গিয়ে পড়ে। আঁচড় টানা শেষ হলেই শতকরা কুড়ি ভাগ সোডিয়াম ফ্লুয়োরেসিন দ্রাবক প্রায় পাঁচ কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমাণ রোগীর রক্তস্রোতে ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, ঘরটি অন্ধকার থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁচড় টানা জায়গাটির উপর কালো আলো ফেলা হয়। এই আলোক-সম্পাতে দেখা যায় যে, আঁচড়গুলো দু-এক মিনিটের জন্যে প্রতিপ্রভ বা ফ্লুয়োরেসেন্ট্ হয়ে উঠেছে। এই প্রতিপ্রভার দ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালনের নানা তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন।

কালো আলো আরও একটি বিশেষ উপকার সাধন করেছে। সুইস্ চিকিৎসক এবং ক্যান্‌সার সম্বন্ধে গবেষক ডাঃ এ, এচ, রফো আবিষ্কার করেছেন—কেমন করে কালো আলো দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়। কোলেষ্টেরল এক প্রকার অ্যাল্‌কোহল জাতীয় পদার্থ যা মানুষের দেহে পাওয়া যায়। ডাঃ রফো দেখলেন কোলেষ্টেরল প্রতিপ্রভ গুণসম্পন্ন। কতকগুলো চর্মরোগ আছে যা হলে চামড়ার তন্তুগুলোর মধ্যে কোলেষ্টেরল জন্মায় এবং এই কোলেষ্টেরল যদি খুব বেশী পরিমাণে জন্মায় তাহলে রোগীর ক্যানসারও হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ডাঃ রফোর এই গবেষণার দ্বারা কোন চর্মরোগ ভবিষ্যতে ক্যানসারে পরিণত হবে কিনা তা আগেই জানা যায়।

দাঁতের চিকিৎসাতেও কালো আলো অদ্ভুত উপকার করেছে। সুস্থ সবল মানুষের দাঁতের প্রতিপ্রভা, তরুণ বয়সে সাদা এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে লালচে হয়। দাঁতের প্রতিপ্রভা যদি ফিকে সবুজ রঙের দেখায় তাহলে বুঝতে হবে শরীরে পুষ্টির অভাব ঘটেছে।

অনেক রোগে রেডিয়াম চিকিৎসা হয়। কিন্তু রেডিয়াম চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখা গেল, রোগীর দেহে ঘা হয়ে গিয়েছে। এই ঘা রেডিয়ামের জন্যে হয়েছে না আপনিই হয়েছে তাও এই কালো আলো দ্বারা জানা সম্ভব হয়েছে। কালো আলো পড়লে রেডিয়ামের প্রয়োগের জন্যে রোগীর দেহের চামড়ায় বিশেষ ধরণের প্রতিপ্রভা দেখা যায়।

এছাড়া সুবেশা তরুণীর গায়ে কালো আলো ফেলে তাঁর ঠোঁটের এবং নখের সিঁদুর দেখে, কতক্ষণ আগে তিনি সাজগোজ করেছেন তাও নাকি বলে দেওয়া যায়।

মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, ঠিক কখন সত্যিকারের মৃত্যু হলো তা নিয়ে অনেক গবেষণা চলেছে এবং এই গবেষণা সাফল্য লাভ করেনি। কালো আলোর প্রসাদে আজকাল চিকিৎসকরা ঠিক মৃত্যু-মুহূর্ত বলে দিতে পারেন। ডাক্তারবাবু রোগীর মৃত্যু ঘোষণা করলেন, কিন্তু বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ হলো—ডাক্তার বাবুর কথা কি ঠিক? যে মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে কি মৃত্যু হয়েছে? গবেষণা চললো; কিন্তু তার সাফল্য লাভ হলো কালো আলোর দ্বারা। কালো আলো আবিষ্কার হবার আগে এই মৃত্যু-মুহূর্ত নির্ণয় সম্বন্ধে যে সব গবেষণা করা হয় তার ফলাফল নির্ভরযোগ্য ছিল না। কালো আলোর পরীক্ষায় ইউর্যানিন বা সোডিয়াম ফ্লুওরেস্‌সিনাইট রোগীর রক্তস্রোতে ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হয় এবং রোগীর ঠোঁট, চোখ এবং ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া স্থানটির উপর কালো আলো ফেলে পরীক্ষা করা হয়। যদি মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে তবে ঠোঁট, চোখ এবং ইন্‌জেক্‌সনের স্থানটির প্রতিপ্রভার বদল দেখা যায় না। যখন মৃত্যু খুব নিকটবর্তী তখন ঠোঁটের প্রতিপ্রভা উজ্জ্বল হয় এবং ইন্‌জেক্‌সনের স্থানটিতে কম দেখা যায়।

আরও অনেক ছোটখাটো গবেষণা সাফল্যজনক ভাবে চালানো হয়েছে। কালো আলোর দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে আরও উন্নততর হবে তার আশা করা বোধহয় ভুল হবে না।

বিলাতীমাটি বা সিমেণ্ট

শ্রীনিতাইচরণ মৈত্র

যুদ্ধোত্তর ভারতে জীবনধারণ করাটা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ সকল বিষয়েই সমস্যা। সারা ভারত জুড়ে আজ গৃহ-হারাদের আর্তনাদ। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ গৃহনির্মাণ সমস্যায় বিপন্ন ও বিব্রত।

বর্তমান যুগে ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্যে বিভিন্ন অত্যাবশ্যক জিনিসগুলোর মধ্যে বিলাতীমাটি বা সিমেণ্ট একটি প্রধান উপকরণ। বর্তমান প্রবন্ধে এই সিমেণ্ট বা বিলাতীমাটি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

সিমেণ্ট কথাটির সাধারণ অর্থ, যা অপর পদার্থ সকলকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। এই হিসেবে সাধারণ আঠা, লোহা, কাচ, কাঠ মোড়বার আঠা বা গ্লু, দাঁত জোড়বার মসলা সবই—সিমেণ্ট। বিলাতীমাটিও সেই হিসেবে সিমেণ্ট। বিলাত হতেই পূর্বে এই মাটি আসত বলে আমাদের দেশে সচরাচর ইহা বিলাতীমাটি বলেই পরিচিত।

শতাধিক বছর পূর্বে বিলাতের জনৈক গৃহ-নির্মাতা সেকালে প্রচলিত বিবিধ বন্ধনী উপাদানগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু তৈরী করার চেষ্টায় মৃত্তিকা সংযোগে পোর্টল্যাণ্ড অঞ্চলের চুনাপাথর পুড়িয়ে প্রথমে ইহার প্রস্তুতপন্থা আবিষ্কার করেন। পোর্টল্যাণ্ড প্রদেশের পাথর হতে প্রথম প্রস্তুত হয়েছিল বলে ইহা আজও পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট বলে চলে আসছে। অবশ্য তখনকার বিলাতীমাটি আজকালকার যে কোনও বিলাতীমাটি অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্ট ছিল। নানা দেশবাসী বহু বিজ্ঞানীর বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই সিমেণ্ট আজ উৎকৃষ্ট পদার্থে পরিণত হয়েছে। আজ কতদিকে কতভাবে যে এই বিলাতীমাটি ব্যবহার করা হয় তা হিসেব করে উঠাই দুষ্কর। আজ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে যে সিমেণ্ট তৈরী হয়ে থাকে তার মোট পরিমাণ দশকোটি পঞ্চাশলক্ষ টনেরও বেশী। ভারতে মাত্র ১৯০৭ সাল থেকে সিমেণ্ট তৈরীর জন্যে কারখানা স্থাপিত হয়। এগুলো আবার পুরোপুরিভাবে চালু হতে আরও প্রায় বিশবছর কেটে যায়। ভারতে মাদ্রাজ প্রদেশেই সর্বপ্রথম সিমেণ্ট কারখানা খোলা হয়েছিল। ১৯১৪-১৯১৬ সাল পর্যন্ত বছরে মাত্র পঁচাশী হাজার টন সিমেণ্ট ভারতে প্রস্তুত হতো। ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে এই উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল বছরে চৌদ্দ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩-৪৪ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল একুশ লক্ষ বার হাজার টন। পরের বছর কিঞ্চিৎ কম হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে পার্টিসনের পর ভারতীয় ইউনিয়নে পনের লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টন সিমেণ্ট তৈরী হয়। ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দশলক্ষ উনত্রিশ হাজার টনের মত সিমেণ্ট তৈরী করা হয়।

বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন সিমেণ্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সারা জগতের উৎপাদিত সিমেণ্টের তুলনায় ভারতের উৎপাদন পরিমাণ একশোভাগের দু'ভাগেরও কম। অথচ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে সিমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। ভাল রাস্তাঘাট তৈরী করতে, বাঁধ বাঁধতে, কারখানা গড়তে, বিমান ঘাঁটি তৈরী করতে, গৃহ প্রস্তুত করতে—প্রত্যেকটি ব্যাপারেই চাই সিমেণ্ট। অথচ দেশের সাধারণ চাহিদা

মেটাবার মত ব্যবস্থাই নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ভারতের চাহিদা ও উৎপাদন পরিমাণের হিসেব নিয়ে দেখেছেন যে, উৎপাদন অন্ততঃ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। দামোদর, কোশী ও ময়ুরাক্ষী নদীর বাঁধ এবং বহুল পরিমাণ বিমানঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে বরং আরও অনেক বেশী বিলাতীমাটির প্রয়োজন।

এইজন্যেই তাঁরা চলতি কারখানাগুলোর উৎপাদনবৃদ্ধি এবং নূতন নূতন কারখানা স্থাপনের জন্যে ব্যবসায়ীদের আহ্বান করেছেন। ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও কিছু কিছু হয়েছে।

সিমেণ্ট প্রস্তুতের যন্ত্রাদি বর্তমানে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা থেকেই আমদানি করতে হবে। ভবিষ্যতে এ-দেশেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা যায় কি না সে-বিষয়ে অবশ্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এমন কি, ইতিমধ্যেই কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান এদিকে অনেকটা সফল হয়েছেন। ভারতে প্রস্তুত যন্ত্রাদি নিয়ে কারখানা স্থাপনের প্রধান অন্তরায়, শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রাদির অভাব। সুবিধামত প্রয়োজনীয় শক্তি-উৎপাদনকারী যন্ত্রাদি প্রস্তুত করতে না পারলে এ-ধরণের যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকরী করে তোলা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের বাঁধ ও আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকরী হলে এ-অভাব অনেকটা মিটবে।

সাধারণতঃ বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা নিকটবর্তী দেশীয় রাজ্যগুলোতেই বেশীরভাগ সিমেণ্ট তৈরী হয়। কারণ, সিমেণ্ট প্রস্তুতের প্রধান উপাদান চুনাপাথর এসব অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রদেশেও হয় বটে তবে এত পরিমাণে নয়।

বাঙ্গলা, পাকিস্তান ভাগের পর এবিষয়ে একেবারে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। ভারত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বছরে মাত্র একলক্ষ বিশ হাজার টন সিমেণ্ট তৈরীর হিসেবে বাঙ্গলার ভাগে পড়েছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার পক্ষে এখন পর্যন্ত এর ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় নি। কারণ বাঙ্গলায় চুনাপাথর নেই বললেই চলে— কিন্তু তা বলে কি আমরা বসে থাকব? পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তো এই সমস্যা কোনও না কোনও সময়ে দেখা দিয়েছে এবং সেখানকার বিজ্ঞানীরা সমবেত অক্লান্ত চেষ্টায় তার সমাধানও করেছেন—তবে?

বাঙ্গলায় প্রচুর চুনাপাথর না থাকলেও প্রচুর পরিমাণে ঘুটিং বা কঙ্কর রয়েছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বিবরণীতে দেখি— কঙ্কর বা ঘুটিং বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যেতে পারে। বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় বিহারে ইতিমধ্যেই এমন একটি ছোট কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা সকল বাধাবিঘ্ন পার হয়ে দেখাতে পেরেছেন যে, এই অনাদৃত কাঁকর বা ঘুটিং দিয়ে চমৎকার সিমেণ্ট করা যায়। বাঙ্গলা সরকার উপযুক্ত সাহায্য করলে বাঙ্গলাদেশের নিজস্ব সিমেণ্ট কারখানাও বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার এই অনাদৃত কাঁকর বা ঘুটিং থেকেই চলতে পারে। অপরপক্ষে বাঙ্গলার সিমেণ্ট কারখানা চালু করার বিষয়ে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ সুবিধাও আছে। সহজলভ্য কয়লা, দামোদর বাঁধের পরিকল্পনার ফলে সহজ ও সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি, কলকাতার ন্যায় বিরাট বন্দরের ও বিভিন্ন রেলপথের সান্নিধ্য ইত্যাদি সকল সুবিধাগুলোর কথাই ভেবে দেখুন। সুতরাং সিমেণ্টের ন্যায় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে পরের মুখ চেয়ে বসে না থেকে আমাদের উদ্যোগী হওয়ারই কথা।

সিমেণ্টের মূল্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রথমদিকে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় টন প্রতি মূল্য ছিল ৪২ হতে ৫৫ টাকার মধ্যে। এর পর সরকারী তত্ত্বাবধান উঠে যাওয়াতে দর দাঁড়ায় ১২৫ হতে ২২৫ টাকা টন। কারণ, সহজেই বোঝা যায়। সরকারী বাঁধাদর না থাকায় যে যেমন পেরেছে আদায় করেছে। বিদেশী

আমদানীর ফলে ১৯২২ হতে ১৯২৫ সালের মধ্যে দর টন প্রতি ৬০ টাকারও নীচে চলে যায়। ভারতীয় কারখানাগুলো বাধ্য হয়ে দর কমাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বনিম্ন দর দাঁড়ায় টন প্রতি ২৫ টাকা। এরপর সমবেত প্রচেষ্টায় অ্যাসোশিয়েশনের সুরু হয় এবং ১৯২৯ হতে ১৯৩৭ পর্যন্ত দর টন পিছু ৫৪।।০-৪৪।।০ টাকার মধ্যে থাকে।

এ সময়ে আবার একটি নূতন প্রতিষ্ঠান কতকগুলো বড় বড় কারখানা খুলে দর কমিয়ে ফেলেন। বাজারে প্রচুর পরিমাণ সস্তায় জাপানী সিমেন্ট আমদানী হতে থাকে। দর আবার ২৫ টাকা টনে নেমে আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতেই সিমেন্ট কারখানাগুলোর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। এবার শুধু যুদ্ধের ব্যাপারেই নয় সর্বসাধারণের প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারেও এই নিয়ন্ত্রণ জারী হয়। দর ক্রমশ চড়ে গিয়ে টন প্রতি ৭৫ টাকায় দাঁড়ায়। সরকারী অনুমোদন ছাড়া সিমেন্ট ক্রয়-বিক্রয় ও স্থানান্তরিত করা নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণকে প্রয়োজনের জন্যে সরকারী অবৈতনিক উপদেষ্টার কাছে আবেদন করতে হতো। যুদ্ধ বিরতির পর ব্যবস্থা অনেক সহজ ও সুন্দর হওয়া হবে।

সত্ত্বেও সাধারণকে এক বস্তা সিমেন্টের জন্যে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয় নচেৎ কালোবাজারের চড়া দর দিয়ে জোগাড় করতে হয়। এ বিষয়ে বিশেষ বলার প্রয়োজন নেই, কারণ সকলেই ভুক্তভোগী। বর্তমানে দর ক্রমশই বাড়ছে। কিছু পরিমাণ বিদেশী সিমেন্ট আসছে বটে, কিন্তু দেশী ও বিদেশী মিলিয়ে ও চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ এখনও এক পঞ্চমাংশেরও কম রয়েছে। মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনেক। যেমন, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, কয়লার মূল্য, যন্ত্রাদির মেরামতি খরচা প্রভৃতি।

আজকাল লাভজনক একটি কারখানা স্থাপন করতে প্রায় এক কোটি টাকার মত মূলধন লাগে। বিদেশী যন্ত্রাদির অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ। অন্য সকল কারণ অবহেলা করলেও মাত্র এই কারণের জন্যেই ভারতে সিমেন্ট প্রস্তুতের কলকজা যাতে ভারতেই নির্মাণ করা সম্ভব হয় সেজন্যে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় সিমেন্ট প্রস্তুতের ন্যায় একটি বিরাট ব্যবসায়ের জন্যে ভারতকে শুধু পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হবে না বরং প্রতিটি কারখানা স্থাপনের কাজে বহুগুণ অর্থ অনর্থক নষ্ট করতে
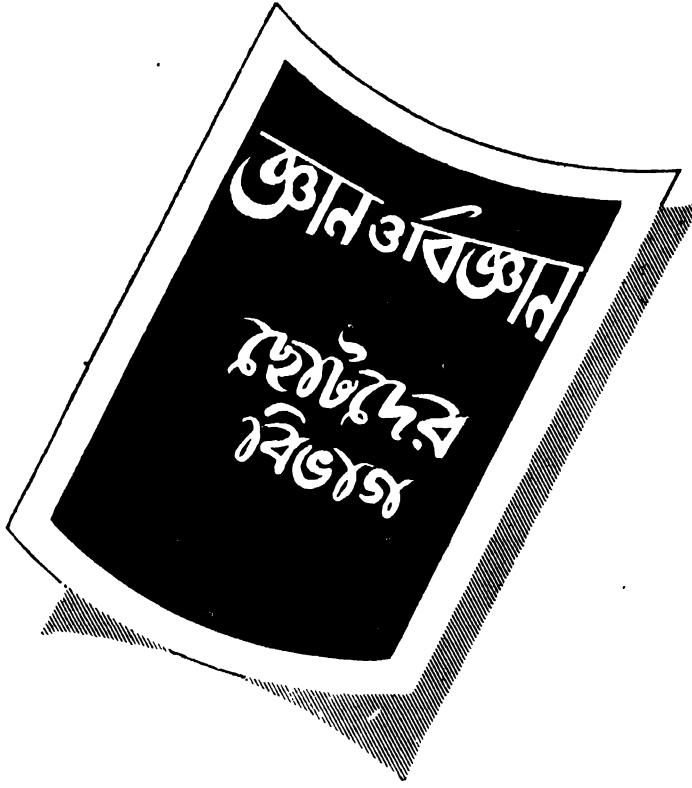
তোমাদের লেখার সুযোগ দেবার জন্যে এবার থেকে ছোটদের বিভাগের মুখপত্রে একখানা করে ছবি দেওয়া হবে। ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া থাকবে। তোমরা এসম্বন্ধে যা জান—নিজেদের জানা কথা বা অভিজ্ঞতার কথা—লিখে পাঠাতে পার—লেখা যেন ছাপার ১০ লাইনের বেশী না হয়। সর্বোৎকৃষ্ট লেখাটি ছোটদের বিভাগে প্রকাশিত হবে।

এই ছবিটা হচ্ছে একটা শোঁয়াপোকার। করবী, আকন্দ প্রভৃতি গাছের পাতার মধ্যে এ-ধরনের শোঁয়াপোকা অনেক দেখা যায়। এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং পরিণত অবস্থা সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর।

অপূর্ব সৌহার্দ্য

শ্রীমান ধ্রুব চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত ফটো।

করে দেখ

চুম্বকের খেলা

(এক)

চুম্বক-লোহা তোমাদের অপরিচিত নয়। চুম্বক-লোহা দিয়ে তোমরা অনেকেই হয়তো অনেক রকমের মজার খেলা করে দেখেছ। আজকে তোমাদিগকে ওইরকমের আরও দু'একটা খেলার কথা বলবো। খেলাগুলো খুবই সহজ; কিন্তু একটু বুদ্ধিকরে করতে পারলে বেশ কৌতুকজনক হবে।

প্রথমে কয়েকটা সেলাই করবার স্চ, কয়েকটা কর্ক এবং ছোট্ট একটা বার-ম্যাগনেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক-লোহা যোগাড় করতে হবে। বাজারে সাধারণতঃ দু'রকমের চুম্বক-লোহা কিনতে পাওয়া যায়। একরকমের চুম্বক-লোহা ঘোড়ার নালের মত বাঁকানো, আর একরকম চেপ্টা অথচ লম্বা। দু'ইঞ্চি কি আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা চুম্বক-লোহা হলেই কাজ চলবে। প্রথমে স্চগুলোকে চুম্বক-স্চে পরিণত করতে হবে। কেমন করে করবে—জান তো? স্চের চোখের দিকটায় ধরে বার-ম্যাগনেট খানার যেকোন একটা প্রান্তের উপর দিয়ে সামনে থেকে পিছনের দিকে বারকয়েক আলতোভাবে ঘষ্ড়ে টেনে নাও। দেখবে—স্চটা চুম্বকের গুণ পেয়ে গেছে।
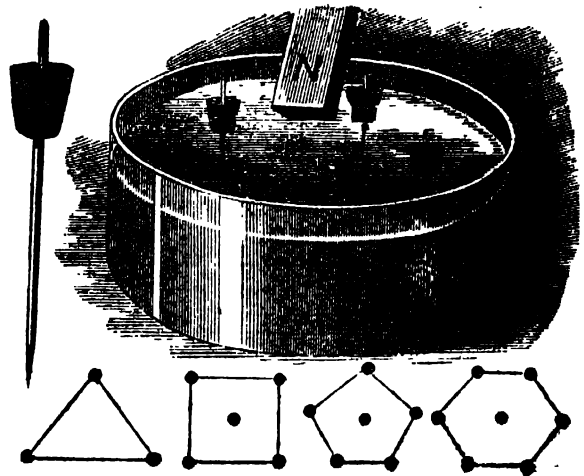
সূচগুলোকে যেকোন দিকে ধরে চুম্বক- লোহার যেকোন প্রান্তে ঘষ্‌ড়ালেই চুম্বকের গুণ পাবে। তবে এ-পরীক্ষাটার জন্যে সবগুলো সূচকে একই রকমে চুম্বকশক্তিসম্পন্ন করতে হবে। এবার ছবির মত করে এক একটা কর্কের মধ্যে চুম্বক-সূচ এমনভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও যেন সূচের সরু মুখটা নীচের দিকে থাকে। একটা বড় পাত্রে জল ভর্তি করে কর্ক-আঁটা সূচগুলোকে জলে ভাসিয়ে দাও। দেখবে—একই রকম চুম্বক-মেরুর পরস্পর বিকর্ষণের ফলে সূচগুলো দূরে দূরে সরে গিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্যামিতিক নক্সা রচনা করেছে। সূচের সংখ্যা যত বাড়াবে ততই বিভিন্ন রকমের জ্যামিতিক নক্সা গড়ে উঠবে। বার-ম্যাগনেটের যেকোন এক প্রান্ত এই ভাসমান সূচ-গুলোর মধ্যস্থলে ধরলে উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অনুযায়ী জ্যামিতিক নক্সা বজায় রেখেই সূচগুলো দূরে সরে যাবে অথবা কাছে উপস্থিত হবে। কতটা সূচ ভাসালে কোন্ রকমের জ্যামিতিক নক্সা তৈরী হবে, পাত্রের নীচের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। পাতলা কাগজ কেটে সৈন্য-সামন্ত বা জীবজন্তুর ছবি কর্কের উপর বসিয়ে দিলে খেলাটা আরও চিত্তাকর্ষক করতে পার।

(দুই)

রামায়ণে তোমরা রাম, সীতা ও রাবণের কাহিনী পড়েছ। সীতা হিন্দু রমণীর আদর্শ। রামের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ এবং রাবণের প্রতি অপরিমেয় ঘৃণা সীতার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চুম্বকের খেলার মধ্য দিয়ে সীতার এই বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে দেখানো যেতে পারে। নীচের ছবি দুটা দেখলেই খেলার ব্যাপারটা অনায়াসে বুঝতে পারবে।

এক নম্বরের ক চিহ্নিত চিত্রে সূক্ষ্ম আলের উপর স্থাপিত মোটা কাগজের একখানা
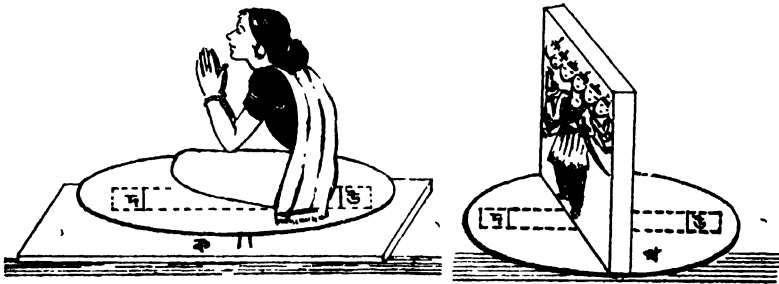
এক নম্বর চিত্র

গোল চাকতি। চাকতিটার উপরে হাত যোড়করা সীতার মূর্তি বসানো আছে। চাকতিখানার তলায় ছোট্ট একটা বার-ম্যাগনেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক ঠিক মাঝখানে আড়াআড়িভাবে বসানো। চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মূর্তির সামনে এবং উত্তর মেরু পিছনের

দিকে আছে। মূর্তি ও চুম্বক সহ চাকতিখানা অনায়াসেই আলের উপর ঘুরতে পারে। খ চিহ্নিত আর একখানা চাক্‌তির উপরেই হোক, কি কাঠের উপরেই হোক আর একটা বার-ম্যাগনেট বসিয়ে তার উপরে ছবির মত করে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বা ওই ধরণের আর একটা কিছু এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। দেশলাইয়ের বাক্সটার যেদিকটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিকে আছে সেদিকটায় রাবণের মূর্তি এঁকে দাও। যেদিকটা উত্তর মেরুর দিকে সেদিকটায় রামের মূর্তি আঁক। চুম্বক চুটাকে সুবিধামত কাগজ বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তাহলেই খেলাটা আরও বেশী চিত্তাকর্ষক হবে। এবার রাবণের ছবিটা সীতার কাছে এনে বসিয়ে দাও। দেখবে—সীতা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরেই বসে থাকবে। কিন্তু রামের ছবিটাকে তার দিকে বসিয়ে দেবামাত্রই সীতা রামের দিকে যোড়হাতে ঘুরে বসবে।

আলের উপর ঠিকভাবে 'ব্যালান্স' করে বসানোর অসুবিধা হলে তলায় আড়া-আড়িভাবে স্থাপিত চুম্বকটা সমেত সীতার মূর্তিটাকে একগাছা সরু সূতার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে পার। এতেও ঠিক পূর্বের মত অবস্থাই হবে। ৩'নম্বরের গ ও ঘ চিহ্নিত চিত্রে ব্যবস্থাটা দেখানো হয়েছে। কেবল সীতার মূর্তি দেখা যায় এরূপ ব্যবস্থা রেখে
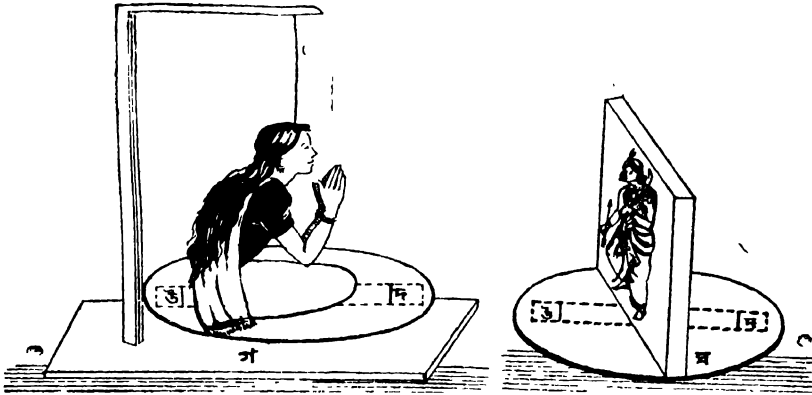
৩'নম্বর চিত্র

বাকী সবটাকে ঢেকে দিবে। এখানেও রামের মূর্তি কাছে আনা মাত্রই সীতা যোড়-হাতে তার দিকে ঘুরে বসবে; কিন্তু রাবণের মূর্তিটাকে তার দিকে আনবামাত্রই মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যাবে। কেন এমন হয়—সেকথাটা বোধহয় তোমাদের আর বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। দু'টা চুম্বক কাছাকাছি আনলে সম-মেরু পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়; কিন্তু অসম-মেরু পরস্পরকে কাছে টেনে নেয়। অর্থাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। আবার উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু দক্ষিণ মেরুকে দূরে ঠেলে দেয়।

গ, চ, ভ,

জেনে রাখ

কাঁচপোকার কথা

আমাদের দেশে একটা কথা আছে—কাঁচপোকায় ধরলে তেলাপোকা নাকি কাঁচপোকা হয়ে যায়। কেমন করে হয়—সে কথার জবাব কারুর কাছে পাইনি। এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এমন কোন লোকের সন্ধানও মেলেনি। ব্যাপারটা কি—জানবার জন্যে একটা অদম্য কৌতূহল্ ছিল। কিন্তু তখন কৌতূহল নিবৃত্তির কোন উপায়ই ছিল না; কারণ কাঁচপোকারা কোথায় থাকে, কি করে—কিছুই জানা নেই। তাছাড়া, জানা থাকলেও এরকমের একটা অদ্ভুত ঘটনা চোখের সামনে ঘটবার সম্ভাবনাই বা কতটুকু!

যাই হোক, পোকা-মাকড়ের সন্ধানে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় সর্বদাই মনের কোণে আকাঙ্ক্ষা জাগতো—যদি বা দৈবাৎ এরকমের একটা অদ্ভুত ঘটনা নজরে পড়ে যায়! কিন্তু অনেক দিন কেটে গেল, কোন কিছুই নজরে পড়লো না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতের অনেক কাঁচপোকা নজরে পড়েছে; কেউ মাকড়সা, কেউ উইচ্চিংড়ি, কেউ বা শোঁয়াপোকা শিকার করে বেড়ায়। কিন্তু কাউকে তো তেলা-পোকা শিকার করতে দেখলাম না!

একদিন শিবপুরের পল্লী অঞ্চলের একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার পাশেই হাত চারেক চওড়া সরু এক ফালি খালি জায়গা। তার পরেই একখানা দোতলা বাড়ি। বাড়িটার প্রায় গা ঘেঁসে জমিটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—অর্ধমৃত তে-ডালা একটা পুরনো গাছ। বোধ হয় জামরুল গাছ হবে। এতদিন ধরে যা দেখবার কৌতূহল পোষণ করে আসছিলাম, একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গাছের মোটা গুঁড়িটার ওপর সেই জিনিসই নজরে পড়লো। একটা কাঁচপোকা মাঝারি গোছের একটা তেলা-পোকাকে শুঁড়ে ধরে হিড় হিড় করে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভাল করে দেখবার জন্যে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোমরা হয়তো ভাবছ—কাঁচপোকা তেলাপোকার মৃত দেহটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তা নয়—তেলাপোকাটা জ্যান্ত। শুঁড় ধরে টানবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দিব্যি তরতর করে হেঁটে যাচ্ছিল। কাঁচপোকাটা হাঁটছে পিছনের দিকে আর তেলাপোকাটা যাচ্ছে সামনের দিকে। কিছুদূর গিয়ে তেলাপোকাটাকে ছেড়ে কাঁচপোকাটা লাফিয়ে লাফিয়ে উত্তেজিতভাবে গাছটার অনেক উপর দিকে উঠে গেল। আশ্চর্যের বিষয়—তেলাপোকাটা কিন্তু সেই জায়গাটাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। যেন একটা মোহগ্রস্ত ভাব। কাঠি দিয়ে কয়েকবার খানিকটা দূরে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই ফিরে এসে ঠিক জায়গাটাতে

বসে থাকে। প্রায় মিনিটদশেক পরে কাঁচপোকাটা ফিরে এসে আবার সেটাকে শুঁড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। খানিক দূর গিয়ে তেলাপোকাটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার যেন কোথায় চলে গেল। বোধ হয় উপরের দিকে কোন শুকনো ডালে গর্ত খুঁড়ে বাসা বেঁধেছে। তেলাপোকাটাকে শেষপর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায়, কি করে—দেখবার জন্যে আগ্রহভরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ তরকারীর খোসা, ধূলো-বালি-জঞ্জাল-ভর্তি একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি উপর থেকে এসে ধপাস্ করে ঘাড়ের উপর পড়লো। অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করবার পূর্বেই জন দুই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে—এতক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিলাম—বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সে কথা জানতে চাইলেন। যথাযথ উত্তর দেওয়ার ফলে তাদের সন্দেহ যেন আরও বেড়ে গেল। একজন বল্লেন—চল, থানায় গিয়ে তোমার কেচ্ছা বলবে। আর একজন কিন্তু থানায় যাবার পূর্বে জলযোগের ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেন। গোলমাল শুনে ইতিমধ্যে আরও ৫।৭ জন লোকের ভীড় জমে গেছে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের
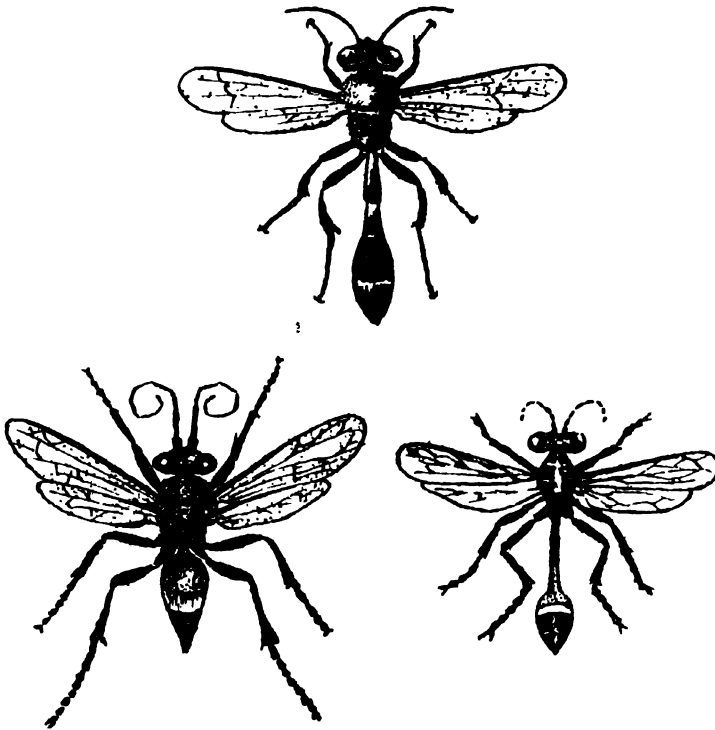
মাকড়সা, উইচিংড়ি, ক্যাটারপিলার শিকারী বিভিন্ন জাতের কুমোরেপোকা বা কাঁচপোকা।

তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণন করে বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য প্রকাশ করলেন। চরম

পরিণতির জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। অবশেষে এক ভদ্রলোক, বোধ হয় দয়াপরবশ হয়েই কতকগুলো নীতিবাক্য শুনিয়ে আমাকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। মুক্তি পেলাম বটে, কিন্তু যার জন্যে এই লাঞ্ছনাটা ভোগ করতে হলো সে-ব্যাপারটার শেষ অবধি দেখা সম্ভব হলো না বলে মুক্তির আনন্দটাও তেমন উপভোগ করা গেল না।

যাহোক, এতে লাভটাও একেবারে কম হয়নি। তেলাপোকা-শিকারী কাঁচপোকা-গুলো কি ধরণের হবে তার একটা আন্দাজ পেলাম। কিছুকাল পরে সোনারপুরের একটা পোড়ো জায়গায় ওই ধরণের কাঁচপোকার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তেলাপোকা কাঁচপোকায় রূপান্তরিত হয় কিনা—সে রহস্য উদ্ভেদ করা যায় কেমন করে? একটা জায়গায় দেখা গেল—কাঁচপোকার গোটা দুই গর্ত রয়েছে; কিন্তু কাঁচপাকা সেখানে নেই। কিন্তু গর্ত যখন রয়েছে কাঁচপোকা সেখানে আসবেই! মাঝারি গোছের কয়েকটা তেলাপোকা ধরে ক্লোরোফর্ম দিয়ে সেগুলোকে নিস্পন্দ করে ফেললাম। গর্ত দুটার প্রায় ৩।৪ ফুট তফাতে সেই নিস্পন্দ তেলাপোকাগুলোকে, স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন থাকে ঠিক তেমনি করে বসিয়ে রেখে, অপেক্ষা করে রইলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল —কাঁচপোকার দেখা নেই। গর্তের মাটি সদ্য তোলা—না আসবার তো কথা নয়! প্রায় ঘন্টাদেড়েক বাদে উজ্জ্বল সবুজ রঙের বেশ বড় একটা কাঁচপোকা উড়ে এসে গর্তের পাশে বসলো। গর্তের চার পাশে কয়েকবার ঘোরাফেরা করে গর্তটার ভিতরে ঢুকে গেল। প্রায় মিনিট দুয়েক পরে বেরিয়ে এসে খুব উত্তেজিতভাবে এদিক-ওদিক কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। ইতিমধ্যে তেলাপোকাগুলোর ক্লোরোফর্মের নেশা অনেকটা কেটে গেছে। দু-একটা ধীরে ধীরে হাটবার চেষ্টা কচ্ছিল। একটা একটু বেশী চাঙ্গা হয়ে উঠে ছুটে পালাবার মুখে কাঁচপোকাটার নজরে পড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে সে যেন লাফিয়ে গিয়ে তেলাপোকাটার ঘাড়ের উপর পড়লো। উভয়ের মধ্যে সুরু হলো একটা প্রবল ধস্তাধস্তি। একটা অদ্ভুত কায়দায় তেলাপোকার পিঠের উপর চেপে বসে কাঁচপোকা তাকে হুল ফুটিয়ে দিল। তারপরেই সব চুপচাপ। তেলাপোকাটার আর যেন নড়বার শক্তি নেই! চুপ করে বসে আছে। কাঁচপোকা, শিকার আয়ত্ত করে চারদিকে কয়েকবার ঘুরে দেখলো, তারপর গর্তের ভিতরে ঢুকে তৎক্ষণাৎই আবার বেরিয়ে এসে তেলাপোকাটার শুঁড় কামড়ে ধরে গর্তের দিকে টেনে নিয়ে চললো। দড়ি-বাঁধা ছাগলের মতই তেলাপোকাটা শুঁড়ের টানে হেটে হেটে যাচ্ছিল। গর্তের মধ্যে ঢোকানো হলো মুশ্কিল। তাকে গর্তের পাশে বসিয়ে রেখে কাঁচপোকা গর্তের মুখ বড় করতে লেগে গেল। প্রায় আধ ঘন্টার উপর নানারকম কসরৎ করে তেলাপোকাটাকে গর্তের ভিতরে ঢোকানো সম্ভব হয়েছিল। প্রায় ঘন্টাখানেক পর কাঁচপোকাটা গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আল্গা মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে একদিকে উড়ে চলে গেল।
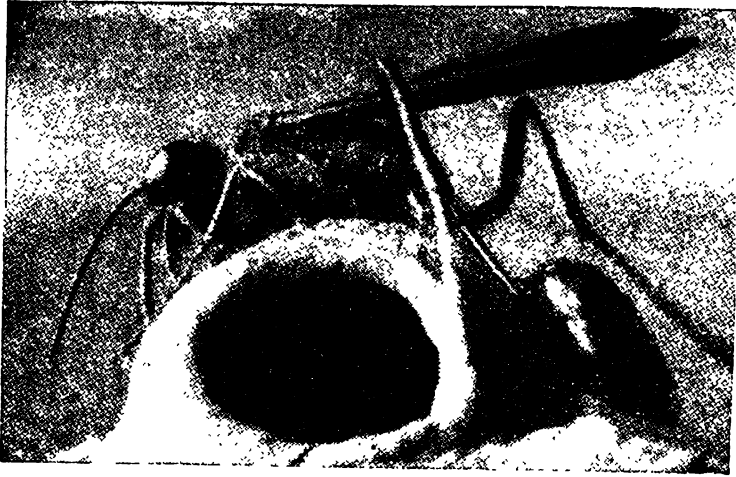
কুমোরেপোকা মাটির ডেলা দিয়ে সুরঙ্গ তৈরী করছে।

কাচপোকাটা চলে যাবার পর অনেক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম—সে আর ফিরে এল না। তখন একটা কাচের গ্লাস উল্টো করে গর্তের উপর চেপে বসিয়ে দিলাম এবং চারদিক আড়াল করে একটা নিশানা রেখে চলে আসলাম। দিন কয়েক পরে ফিরে গিয়ে দেখলাম— সবই ঠিক আছে। গ্লাসের মধ্যে কিছু একটা দেখতে পাব আশা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই নেই। গ্লাসটা সরিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেললাম। প্রায় ফুটখানেক নীচে গিয়ে গর্ত শেষ হয়েছে। গর্তের মধ্যে তেলাপোকার কয়েকটা ডানা ছাড়া শরীরের চিহ্নমাত্রও নেই। আর রয়েছে কুলের আঠির মত খয়েরী রঙের বেশ বড় একটা গুটি। গুটিটাকে নিয়ে এসে একটা কাচের পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। দু-দিন পরেই গুটি থেকে উজ্জ্বল সবুজ রঙের কাঁচপোকা বেরিয়ে এল। এ-ই হলো তেলাপোকার কাঁচপোকায় রূপান্তরিত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কাঁচপোকা তোমরা দেখেছ কি? দেখছ নিশ্চয়, হয়তো চিনতে পারোনি। এবার চিনতে পারবে বোধ হয় এবং এদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। আমাদের দেশে সর্বত্র বিভিন্ন জাতের অনেক রকমারি কাঁচপোকা দেখা যায়। তবে বেলওয়ারী কাচের মত উজ্জ্বল নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের বড় বড় পোকাগুলোকেই সাধারণতঃ কাঁচপোকা বলা হয়। বাকী অন্যগুলোকে বলা হয় কুমোরেপোকা। কারণ এদের অনেকেই মাটিতে গর্ত খুঁড়ে অথবা মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করে। তবে সন্তানপালনের ব্যবস্থার দিক দিয়ে বিচার করলে এদের চারটে শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলো কুমোরেপোকা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে অথবা মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করে, কতকগুলো মোটেই বাসা তৈরী করে না—সন্তানপালনের জন্যে জীবন্ত
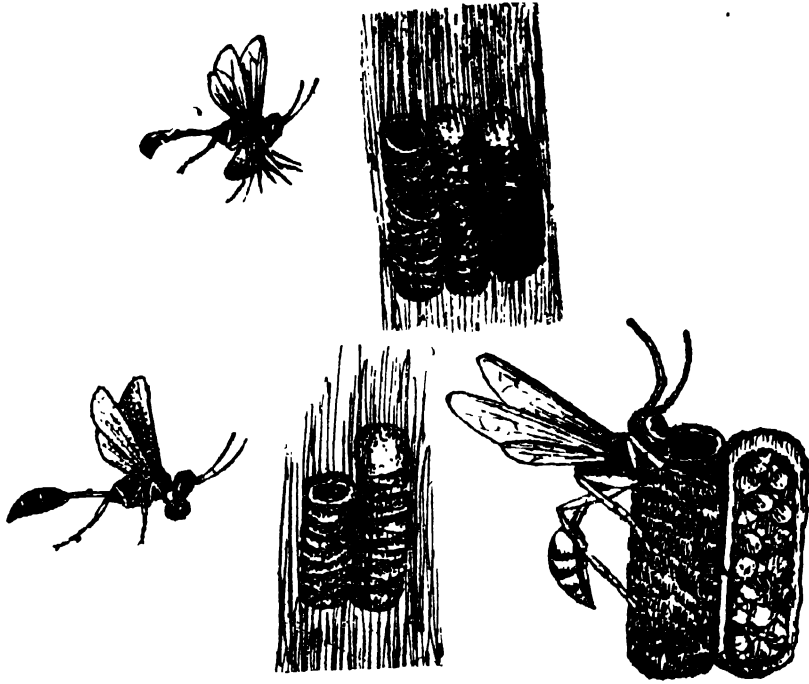
এই জাতের কুমোরেপোকাদের ঘরের দেয়ালে, বেড়ার গায়ে প্রায়ই মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করতে দেখা যায়। উপরে—বাসায় রাখবার জন্যে কুমোরেপোকা মাকড়সা শিকার করে নিয়ে আসছে। বাঁয়ে—বাসা তৈরী করবার জন্যে মাটির ঢেলা নিয়ে আনছে। ডানে—মাটি দিয়ে কুমোরেপোকা বাসা তৈরী করছে।

শিকারের গায়ে ডিম পেড়ে যায়। কতকগুলো, পুরনো গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করে বা কোন কিছুর ফাটলে বাসা তৈরী করে' ডিম পাড়ে। কতকগুলো আবার গাছের কচি ডগা, পাতা, ফুলের কুঁড়ি অথবা ফলের গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে। এক কলকাতা সহরের মধ্যে অনুসন্ধান করলেই বিভিন্ন জাতের প্রায় সবরকম কাঁচপোকা বা কুমোরেপোকার সন্ধান পাওয়া যাবে। কলকাতা সহরেরই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দু-শ'য়ের বেশী বিভিন্ন জাতের রকমারি কুমোরেপোকা সংগ্রহ করেছি। চেষ্টা করলে তোমরাও হয়তো অনেক নতুন ধরণের পোকার সন্ধান পাবে। কতকগুলো কুমোরে-পোকা দেখতে অনেকটা ভীমরুলের মত, কতকগুলো বোল্‌তার মত, আবার কতক-গুলো মৌমাছির মত। ভীমরুল, বোলতা বা মৌমাছি যেমন চাক বা বাসা তৈরী করে' দলবদ্ধভাবে বাস করে এরা কিন্তু সে রকমের সামাজিক জীব নয়। সর্বদাই এরা একাকী বিচরণ করে থাকে। উইচ্চিংড়ি, মাকড়সা, শুঁয়োপোকা, তেলাপোকা বা আরশোলার এরা পরম শত্রু।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে—বাড়ীর আনাচে-কানাচে বেড়ার গায়ে এক একটা শুকনো মাটির ডেলা লেগে আছে। ওগুলো আর কিছুই নয়—কুমোরেপোকার বাসা। এরা বাসা বাঁধে কেবল বাচ্চাদের জন্যে—নিজেদের বাস করবার জন্যে নয়। কলকাতার প্রায় সর্বত্র লিকলিকে ধরণের কালোরঙের বোলতার মত এক রকমের কুমোরেপোকা খুব বেশী দেখা যায়। ডিম পাড়বার সময় হলেই এরা খুব নরম কাদামাটির খোঁজে বেরোয়। সেখান থেকে ছোট্ট বড়ির মত মাটির ডেলা মুখে করে নিয়ে এসে দেয়ালের কোন সুবিধামত জায়গায় বাসার পত্তন করে। বার বার একটু একটু করে মাটির ডেলা এনে দু-তিন দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুড়ঙ্গের মত বাসা গেঁথে তোলে। একটা সুরঙ্গ তৈরী হয়ে গেলেই শিকারেরর সন্ধানে চলে যায়। এদের শিকার হলো মাকড়সা। কুমোরেপোকার মাকড়সা শিকার একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যদি কখনও দেখবার সুযোগ পাও তবেই বুঝতে পারবে। ঘরের আনাচে-কানাচে লম্বা ঠ্যাংওয়ালা একরকমের ছোট ছোট মাকড়সা জাল পেতে বসে থাকে। একটু স্পর্শ করলেই জালসমেত মাকড়সাটা কাঁপুনি সুরু করে দেয়। এজন্যে এদের আর এক নাম—কাঁপুনে-পোকা। কুমোরে-পোকার উপস্থিতি টের পেলেই প্রথমতঃ এরা জালসমেত ভয়ানক ভাবে দুলতে থাকে; তারপর চলে লুকোচুরি। কিন্তু লুকোচুরিতে কুমোরেপোকার নজর এড়ানো সম্ভব নয়। অবশেষে ধরা পড়বার মুখেই দু-একটা ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এই মাকড়সার ঠ্যাংগুলোও অদ্ভুত। ছেঁড়া ঠ্যাং মাটিতে পড়েই অনেকক্ষণ ধরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ছটফট করতে থাকে। মনে হয় যেন একটা জীবন্ত প্রাণী। কুমোরেপোকা অনেক সময় ছেঁড়া ঠ্যাংটাকেই মাকড়সা বলে ভুল করে' তার দিকে আকৃষ্ট হয়। এই সুযোগে ঠ্যাং-এর মালিক সময় সময় আত্মগোপনে সক্ষম হয়।

বাঁয়ে—কুমোরেপোকার শীত-ঘুম। ডানে—এক জাতের কাঁচপোকা তেলাপোকাকে শুঁড়ে ধরে টেনে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে।

কুমোরেপোকা মাকড়সার শরীরে হুল ফুটিয়ে তাকে নিস্পন্দ করে বাসায় নিয়ে যায়। এভাবে দশ-বারোটা মাকড়সায় সুরঙ্গ ভর্তি করে যে কোন একটার গায়ে একটা মাত্র ডিম পাড়ে। তারপর মাটির প্রলেপ দিয়ে সুরঙ্গের মুখ বন্ধ করে দেয়। এরপর

আগের সুরঙ্গটার গায়ে নতুন আর একটা সুরঙ্গ গড়ে তোলে। এভাবে গায়ে গায়ে লাগানো চার-পাঁচটা সুরঙ্গ তৈরী করে তাতে মাকড়সা ভর্তি করে ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করে দিয়ে যায়। ডিম ফুটে সরু চ'লের মত বাচ্চা বেরিয়ে আসে এবং সুরঙ্গে সঞ্চিত মাকড়সাগুলোকে একটা একটা করে খেতে সুরু করে। সব মাকড়সা নিঃশেষে উদরস্থ হবার পর বাচ্চাটা মুখ থেকে অতি সূক্ষ্ম সূতা বের করে শরীরের চারদিকে পাতলা পর্দার মত একটা আবরণী তৈরী করে' তার মধ্যে নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে। প্রায় দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই বাচ্চাটার চোখ, মুখ, শুঁড়, ডানা, পা প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারপরে শরীরে রং ধরে। আরও দু-এক দিনের মধ্যেই শরীরটা একটু শক্ত হলেই পরিণত কুমোরে-পোকা রূপে সুরঙ্গের ঢাকনা কেটে বেরিয়ে আসে। এদের থাকবার নির্দিষ্ট কোন

একজাতের কুমোরপোকা কপি পাতার ক্যাটারপিলারকে
আক্রমণ করেছে।

স্থান নেই—যেখানে সেখানেই অবসর যাপন করে; কিন্তু সারা শীতকালটা শরীরটাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে শক্ত করে ঘাস পাতা আঁকড়ে ধরে শীত-ঘুমে কাটিয়ে দেয়।

বিভিন্ন জাতের যেসব কুমোরেপোকা মাটিতে গর্ত করে বাসা তৈরী করে তারা প্রধানতঃ উইচ্চিংড়ি, ঘুঘরাপোকা, বড় মাকড়সা, বড় বড় ক্যাটারপিলার, শোঁয়াপোকা ও আরশোলা প্রভৃতি শিকার করে থাকে। কতকটা মৌমাছির মত দেখতে—লালচে, ধূসর ও খয়েরী রঙের কুমোরেপোকারা বড় বড় মাকড়সার গায়েই ডিম পেড়ে আসে। নির্দিষ্ট জাতের মাকড়সার কোন রকমে সন্ধান পেলেই হলো—কুমোরেপোকার হাত থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই! লুকোচুরি,

ছুটোছুটি অনেক কিছুই করে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুমোরেপোকা তার গায়ে একটি মাত্র ডিম পেড়ে যাবেই। অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে মাকড়সার রস-রক্ত চুষে খেতে থাকে। মাকড়সাটা যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে; কিন্তু কতক্ষণ আর পারবে! চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই বাচ্চাটা তাকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলে এবং খুব বড় হয়ে ওঠে। তারপরে বাচ্চাটা গুটি বেঁধে দিন দশ-পনেরো অবস্থান করবার পর পূর্ণাঙ্গ কুমোরেপোকার রূপ ধরে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে।

আমাদের ল্যাবরেটরী-সংলগ্ন মাঠে উদ্ভিদসংক্রান্ত একটা পরীক্ষা চলছিল। হঠাৎ নজরে পড়লো, ঘাসের বেড়ার উপব দিয়ে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা শোঁয়া পোকা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। পোকাটার প্রতি নজর রাখলাম। এলোমেলোভাবে ছুটতে ছুটতে সেটা ঘাস পেরিয়ে কাঁকড় বিছানো পথের উপর এসে পড়লো। তবুও ছুটছে; কিন্তু গতি যেন ক্রমশই মন্দী-

ক্যাটারপিলারের গায়ে একজাতের ক্ষুদ্রকায় কুমোরেপোকার অসংখ্য গুটি দেখা যাচ্ছে।

ভূত হয়ে আসছিল। আরও খানিকটা এগিয়ে দেয়াল বেয়ে খানিকটা উপরে উঠেই চুপ করে রইল। ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারি নি। ৫।৭ মিনিট পরেই দেখলাম—পোকাটার গা থেকে যেন সাদা সাদা কি বেরিয়ে আসছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম—অতি সূক্ষ্ম সূতার মত এক রকমের পোকা। দেখতে দেখতেই প্রায় ৩০।৪০টা পোকা বেরিয়ে শোঁয়াপোকার গা-টা ছেয়ে ফেললো। কেবল

এই নয়—সূতার মত সূক্ষ্ম পোকাগুলো অনবরত তাদের মাথার দিকটা নড়াচ্ছিল। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম—ছোট ছোট সাদা ডিমের মত গুটিতে শোঁয়াপোকাটার গা ঢেকে গেছে। দিন দশ-বারো পরে এই গুটি থেকে পিঁপড়ের মত ছোট ছোট কালো রঙের অনেকগুলো কুমোরেপোকা বেরিয়ে এলো। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল—এই পিঁপড়ের মত ছোট ছোট কুমোরেপোকারা নির্দিষ্ট একজাতের শোঁয়াপোকার গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে দেয়।

আরও কয়েক রকমের কুমোরেপোকা দেখা যায় যারা কেবল ফল, মূল, লতা-পাতার গায়েই হুল ফুটিয়ে ডিম পাড়ে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এদের কুমোরেপোকা বলা চলে না; তবে অনেকগুলো বিষয়ে কুমোরেপোকার শ্রেণীতেই পড়ে। আমাদের দেশে এরা নেউলে-পোকা, ধুবী-পোকা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। একটু চেষ্টা করলেই এদের সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে, কারণ এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়।

গ. চ. ভ.

বিজ্ঞানের সংবাদ

সঞ্জয়

ভবিষ্যতের খাদ্য :—

গল্পলেখক এবং ঔপন্যাসিকেরা কল্পনার সাহায্যে প্রায়ই দেখে থাকেন যে, দূর ভবিষ্যতে আমাদের খাদ্যসম্ভার পর্যবসিত হবে কেবলমাত্র আহার্য-বটিকায়। ছোট একটা বড়ি খেলেই একদিনের আহারের উপদ্রব মিটে যাবে, এই রকমই অনেকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক মূল্য কতখানি, তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। সাধারণ সুস্থ মানুষের দৈনিক ২৫০০ থেকে ৩০০০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। খাঁটি চর্বি বা স্নেহদ্রব্য থেকে প্রতি পাউণ্ডে ৪২০০ ক্যালরি পাওয়া যায়,। চর্বিই হচ্ছে একমাত্র পদার্থ যাকে সর্বাপেক্ষা বেশী গাঢ় করে ফেলা সম্ভব। সুতরাং একজন লোক শুধু যদি চর্বি খেয়েই জীবনধারণ করে, তবে সুস্থ থাকতে হলে তার দৈনিক প্রয়োজন হবে প্রায় ছয় ছটাক পরিমাণ বটিকার।

কিন্তু শুধু চর্বি খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। গা কেমন করার কথা বাদ দিলেও, আমাদের শরীর স্নেহদ্রব্যকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না, যদি না খাদ্যের সঙ্গে থাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট। অসম্পূর্ণ গৃহীত চর্বি শরীরের পক্ষে বিষক্রিয়া করে এবং সেজন্যে শুধু স্নেহদ্রব্য জীবনধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত। এছাড়া দেহের পুষ্টির জন্যে চাই প্রোটিন ও খনিজ লবণ, যা খাঁটি চর্বিতে নেই। প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট প্রতি পাউণ্ডে ১৮৬০ ক্যালরি শক্তির ইন্ধন জোগায়। সুতরাং এ সমস্ত জড়িয়ে একটা সংক্ষিপ্ত খাদ্য-বটিকা করতে গেলে চাই মোটামুটি দেড় পাউণ্ড বা এক সেরের কাছাকাছি ওজনের খাদ্যবস্তু। রোজ দেড় পাউণ্ড বড়ি গেলা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে খুবই রুচিকর হবে বলে মনে হয় না এবং সেই কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য-ট্যাবলেটের

অনভ্যুদয় সম্বন্ধে আমরা একরকম নিশ্চিন্তই থাকতে পারি।

মানুষের কল্যাণে আণবিক শক্তি :—

শুধুমাত্র অ্যাটম বোমার সৃষ্টি নয়, আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার একটা মানবতার দিকও আছে। তার মধ্যে প্রধান হলো, দুরপনেয় ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আণবিক শক্তির প্রথম ব্যবহার হয়েছে টক্‌সিক গয়টার রোগের চিকিৎসায়—তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সাহায্যে। আমাদের শরীরে কণ্ঠার ঠিক নীচে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অবস্থিতি। এই গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়ায় থাইরক্‌সিন নামে একটি হরমোনের সৃষ্টি হয় এবং তার সাহায্যে নির্ধারিত হয় শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াসমূহের দ্রুত বা মন্থর গতি। টক্‌সিক গয়টার রোগে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড অজানা কারণে সহসা অত্যধিক কার্যকরী হয়ে ওঠে এবং রক্ত-স্রোতে নিঃসৃত থাইরক্‌সিনের পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তার ফলে হাইপার থাইরয়েডগ্রস্ত লোকের মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, দুর্বলতা ও জ্বরের সৃষ্টি হয় এবং চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে। এ-ছাড়া তারা সহজে ঘামে, তাদের ওজন কমে যেতে থাকে এবং উগ্র ক্ষুধার উৎপত্তি হয়। গলার নীচে স্বল্প পরিমাণ স্ফীতিও দেখা যায়। খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে আর একরকম গয়টার রোগও দেখা যায়। সে রোগেও গলা ফুলে ওঠে, কিন্তু টক্‌সিক গয়টারের সঙ্গে তার প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

টক্‌সিক গয়টারের চিকিৎসায় ডাক্তারেরা প্রথমে স্বল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আয়োডিন "ট্রেসার" বা সন্ধানী হিসেবে রোগীকে খেতে দেন। রক্ত-স্রোত থেকে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আয়োডিন কেড়ে নিচ্ছে কিনা তা দেখাই এর উদ্দেশ্য। সক্রিয় থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থাইরক্‌সিন প্রস্তুত করবার জন্যে আয়োডিন পরমাণুদের মুষ্টিগত করবে প্রচুর পরিমাণে। তাই যদি হয়, তা জানা যাবে রোগীর গলার কাছে একটা গাইগার কাউন্টার ধরলে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থেকে নিক্ষিপ্ত হয় ইলেকট্রন কণা। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে বন্দী তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যাবে এই গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্রটির সাহায্যে, গলা থেকে ইলেকট্রনের অভ্যুদয় প্রমাণ করে। যদি তা না হয়, তাহলে ডাক্তারেরা বুঝতে পারবেন যে, রোগের উপসর্গগুলো টক্‌সিক গয়টারের জন্যে নয়—মানসিক ব্যাধির লক্ষণ মাত্র।

টক্‌সিক গয়টার ধরা পড়লে তার চিকিৎসা হয় তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সাহায্যেই। এক গ্লাস কমলালেবুর রসে প্রয়োজনমত তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ডোজ মিশিয়ে রোগীকে খেতে দেওয়া হয়। তারপর তিন দিন হাসপাতালে তার পূর্ণবিশ্রাম। শুধু মাঝে মাঝে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে আয়োডিন পরমাণুগুলোর ক্রিয়ার উপর নজর রাখা হয়। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পরমাণুগুলো চালায় ধ্বংসাত্মক কার্য। উদ্ভূত ইলেকট্রনের সাহায্যে তারা ধ্বংস করে বহু তন্তুকোষকে এবং তার ফলে থাইরয়েড কারখানার কর্মী কমে গিয়ে রক্তের মধ্যে থাইরক্‌সিনের নিঃসরণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কাটাকুটি নেই, যন্ত্রণা নেই অথচ রোগ উপশম এই চিকিৎসায় অনিবার্য।

টক্‌সিক গয়টারের আগেকার চিকিৎসা ছিল একমাত্র অস্ত্র প্রয়োগ। তাতে প্রয়োজন নিপুণ সার্জেনের এবং প্রচুর অর্থের। বর্তমান চিকিৎসাতেও কুশলী চিকিৎসকের প্রয়োজন, কারণ প্রয়োজনাধিক তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ডোজ দিয়ে ফেললে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের সক্রিয়তা সাধারণের চেয়েও কমে যেতে পারে। এজন্যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি কমিশন যে কোন হাসপাতালকে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন সরবরাহ করে না—যাদের ভাল গবেষণাগার এবং

নিপুণ কর্মী আছে তারাই কেবল পায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের অধিকার।

এই চিকিৎসায় খরচ সাধারণের দশভাগের এক ভাগ কমে যায়। সময়ও বেশী লাগে না। কিন্তু তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের তেজস্ক্রিয়া বেশীদিন থাকে না বলে একসঙ্গে অনেক রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

ইঁদুর তাড়াবার অভিনব উপায়:—

কল পেতেও যেখানে ইঁদুরের উৎপাত দূর করা যায় না সেখানে একটা নতুন উপায়ের উদ্ভাবনা করেছে আমেরিকানরা। ক্যান ডাব ভ্যানকুবার সহরে জন অ্যাণ্ডারসন নামে এক ব্যক্তি তার পুত্রের সহযোগিতায় পঞ্চাশটা ইঁদুরকে বন্দী করে। তারপর তাদের লেজে মোচড় দিয়ে তাদের সম্মিলিত ভয়ার্ত আর্তনাদ গ্রামোফোনের রেকর্ডে তুলে নেওয়া হয়। এই রেকর্ডটি একটি গুদোম-ঘরের মধ্যে উঁচু ভালুমে বাজে বাজানো হয়। তার পর দিন দেখা গেল, গুদোমঘরে আর ইঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই, রেকর্ডে ইঁদুরের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে নার্ভাস হয়ে অন্যান্য সব ইঁদুরই অন্তর্হিত হয়েছে। এরপরে ইঁদুরদের গর্তগুলো বুজিয়ে দেওয়া হয়।

শিশুরা আধো আধো কথা বলে কেন?

শিশু মনোবিদ্‌রা বহু পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অর্দ্ধস্ফুট বাক্য শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক মোটেই নয়। আধো আধো কথা তারা শেখে তাদের মাতাপিতার কাছ থেকেই। তাঁদের মতে বড়োরাই শিশুদের অস্ফুট বাক্যের জন্যে দায়ী। এরপর তাঁরা তাদের এই অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যালেন ওয়াকার ঐ অভিভাবকদের এই অভ্যাসের নিন্দা করেছেন, বলেছেন ইংরাজী ভাষার নিখুঁত উচ্চারণ করা শিশুদের পক্ষে এমনিতেই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, তাতে আধো আধো ভাষার বিড়ম্বনা তাদের ওপর চাপানো মোটেই উচিত নয়। তিনি বলেন, শিশুদের কাছে অভিভাবকরা প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ও জড়তাহীনভাবে বলবার প্রয়াস করবেন। এই অভ্যাসে ছয় বছরের একটি ছেলে সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হবে।

পুস্তক-পরিচয়

India on Planning, by A. K. Saha ৯৲ টাকা। প্রকাশক: দি গ্লোব লাইব্রেরী; ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২; পৃঃ ২২৮।

মাত্র বিশ বছরে একটা দেশ কোথা থেকে কোথায় উঠতে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত সোভিয়েট রাশিয়া! যে শক্তি দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীকে পরাভূত করেছে তার সাফল্যের মূলে রয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা ভিন্ন হলেও এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে যদি আমরা সত্যই দেশের জনসাধারণের উন্নতি চাই। এই আশায়ই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্রীয় শাসন হাতে পেয়েও তিনি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারছেন না।

রাশিয়ার দেখাদেখি পরিকল্পনার হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে সর্বত্রই; কিন্তু কোনটাই দেশের মঙ্গল বিধানে কার্যকরী হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ, বিদেশী সরকার তার চিরাচরিত প্রথায় শুধু ঢক্কা নিনাদেই ব্যস্ত ছিলেন এবং পরিকল্পনাগুলোকে কেবল ফাইলেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের লোকপ্রিয় জাতীয় সরকারের বেশীরভাগ পরিকল্পনাই এই বিদেশী শাসকবৃন্দের মানসেই গড়ে উঠেছে এবং স্বভাবতঃই পরিকল্পনাগুলো দপ্তরের ফাইলেই সীমাবদ্ধ আছে। অথচ তার জন্যে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ বেড়েই চলেছে,

অফিসারদের ভাতা ও মাহিনা জোগাবার জন্যে। এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ—'Grow more food Campaign'।

লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা সৌভাগ্যবশতঃ রাশিয়ার পরিকল্পনায় সাক্ষাৎভাবে যোগদান করতে পেরেছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় পরিকল্পনারও একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরিকল্পনাকে কি ভাবে বাস্তবরূপ দান করা যেতে পারে, কি ভাবে এদেশে সেগুলো কার্যকরী করা যেতে পারে তার সুষ্ঠু বর্ণনা এই বইখানাতে পাওয়া যায়।

প্রাক্‌বিপ্লবী রাশিয়ার সংগে যে ভারতের অনেক সাদৃশ্য আছে তা শ্রীযুক্ত সাহার লিখিত সুখপাঠ্য পরিচ্ছেদগুলোতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

দেশের কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনেতাদের ও সরকারী দপ্তরের অফিসারদের এই বইখানা পড়ে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। এতে অনেক কিছু ভাববার আছে।

বইখানার দাম একটু বেশী হয়েছে—সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরে হবে বলে মনে হয়। বইখানার বহুল প্রচার কামনা করি। স্ব. বা.

What Time is it? By Mikhail Ilier, Publishers—Eagle Publishers, মূল্য ১৮০; ১২২ পৃঃ।

সময় গণনার জন্য কত রকমের যে ঘড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিবিধ কালে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত, তাহার ইতিবৃত্ত পুস্তিকাটিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাষা সহজ সরল আড়ম্বরবিহীন; ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লেখা। এইরূপ পুস্তিকা বাঙলাভাষায় প্রকাশ হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাধির পরাজয়—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ—৫১; ২৩খানা হাফটোন ছবি; মূল্য দেড় টাকা।

ভাষার সরসতা ও সাবলীলতায় দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুও সুখবোধ্য হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তু অবিকৃত রেখে সহজবোধ্য সরস ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে চারুবাবু সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য বইখানিতেও তাঁর এ-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। বইখানিতে তিনি বিভিন্ন রকমের রোগোৎপাদক জীবাণুর আবিষ্কার এবং সেসব জীবাণুঘটিত ব্যাধি প্রতিকারের উপায় নির্ধারণে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও এতে বিষয়বস্তুর দৈন্য নেই। সরস, অনাড়ম্বর ভাষার গুণে বইখানা জনসাধারণের নিকট আদৃত হবে বলেই মনে হয়। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"* * * সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব জ্ঞানের সেই পরিবেশন কার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ।* * *" বইখানিতে এই আদর্শই যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ ধরণের বই-এর সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলেই বিশ্বাস।

গ. চ. ভ.

জানোয়ার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রকাশনী, ৫০, হরিশ চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৩২ পৃষ্ঠা, ১০ খানা ছবি; মূল্য দেড় টাকা।

বড় হরপে ছাপা ছোটদের বই। শিশুমনের খোরাক যোগাবার জন্য গল্প, উপকথার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু ছাড়া, গল্পে কেবল আজগুবি কাহিনী না শুনিয়ে ছোটদের সত্যিকারের জন্তু-জানোয়ারদের কথাও শোনানো দরকার। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অদ্ভুত রকমের জন্তু-জানোয়ারদের আকৃতি প্রকৃতি, চাল-চলনের বিচিত্র কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে গল্প-উপকথার চাইতেও বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। বইখানিতে লেখক ছোটদের জন্যে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি অদ্ভুত রকমের জন্তু জানোয়ারের কথা পরিবেশন করেছেন। মনে হয়, বইখানি পড়ে ছেলেমেয়েরা খুব খুশীই হবে এবং তাদের কৌতূহলও বাড়বে। বইখানিতে কিছু বানান ভুল এবং কোন কোন জায়গায় অপ্রচলিত কথাকেও চলতি কথার মত ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন—'পালা-পালি করে'; 'রাত্তিরে ভিত্তিরে' ইত্যাদি।

গ. চ. ভ.

বিবিধ

'চিত্তরঞ্জন' এঞ্জিন তৈরীর কারখানা

আসানসোল থেকে বিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণায় ভাবী ভারতের চাহিদা পূরণের জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত এঞ্জিন তৈরীর কারখানা নির্মিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে যে নতুন সহরের পত্তন আরম্ভ হয়েছে তার নাম হবে—চিত্তরঞ্জন। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকেই চিত্তরঞ্জন কারখানা থেকে ভারতের রেলপথের জন্যে নতুন এঞ্জিন আমদানী হবে। মাইথন বাঁধ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি সাহায্যে এই সমগ্র অঞ্চল আলোকিত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কারখানা তৈরী করতে প্রায় চৌদ্দ কোটি টাকা খরচ হবে।

কারখানা তৈরী হয়ে গেলে এখান থেকে বছরে ১২০টি এঞ্জিন ও ৫০টি বয়লার নির্মিত হবে বলে আশা করা যায়। এজন্যে বাইরে থেকে যে সব সাজসরঞ্জাম আমদানী করতে হবে তার মূল্য হবে প্রায় তিন কোটি টাকা। এ ছাড়া আরও প্রায় এক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ভারত থেকেই জোগাড় করা সম্ভব হবে।

এঞ্জিন তৈরীর কাজটি খুবই জটিল। অনেকগুলো ছোট ছোট কাজ, যেমন—প্যাটার্ন তৈরী, জোড়া দেওয়া, ঝালাই ও ঢালাইয়ের কাজ; কামারের কাজ, ছোট ছোট যন্ত্র তৈরী, বয়লারের পাত তৈরী ও ফিটিং প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এটা সম্পন্ন হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে যারা এই কাজে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী, বেছে বেছে তাদেরই এসব কাজে নিযুক্ত করা হবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের আরও উন্নত শিক্ষার জন্যে এখানে অথবা বাইরে পাঠানো হবে। কারখানার কাজের পরিকল্পনা যে কি বিরাট এবং এর নির্মাণ শেষ করতে যে কি পরিমাণ কাজের প্রয়োজন নীচের হিসাব থেকে তা মোটামুটি বুঝা যাবে।

কারখানার বাড়ীগুলো তৈরী করতেই অন্ততঃ ১০,০০০ টন ইস্পাত লাগবে। এই কারখানাগুলোতে অন্ততঃ ১০০০টি বিভিন্ন যন্ত্র বসবে। যন্ত্রগুলোতে এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ তৈরী হবে।

কারখানার কর্মচারীদের জন্যে ৬০০০ বাসগৃহ তৈরী হবে। প্রায় ১০০ মাইল লম্বা পাইপের সাহায্যে এখানে জল আনার ব্যবস্থা হবে। সেচের কাজও অনুরূপ পাইপের দ্বারাই সম্পন্ন হবে। কারখানা ও উপনিবেশের যোগসূত্র হিসেবে যে রাস্তা তৈরী হবে তার দৈর্ঘ্য হবে ৬০ মাইল। কারখানার জন্যে সরঞ্জাম হিসেবে বহু জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে এবং সেগুলো সরবরাহের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। যত কম করেই ধরা যাক না কেন, কর্মচারীদের বাসভবনের জন্যে অন্ততঃ ৭০০০ টন ইস্পাত, ২৫ কোটি ইট, ৩০,০০০ টন সিমেন্ট, ৫০ লক্ষ ঘন ফুট বালি, ৫০ লক্ষ ঘন ফুট পাথর কুচি, এক লক্ষ ঘন ফুট কাঠ এবং ২০,০০০ গ্যালন রং লাগবে। কারখানার জন্যে যে ১০,০০০ টন ইস্পাত লাগবে তা এ হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি। এদের মধ্যে পাথরকুচির অধিকাংশ ও বালি ছাড়া আর সমস্তই ১০০ থেকে ২০০ মাইল কিংবা আরও দূরবর্তী স্থান থেকে রেলওয়ে মারফৎ বইয়ে আনতে হবে। কারখানার কাজে প্রায় ২০,০০০ গ্রোস স্ক্রু, ৪০০০ ডজন বল্টু এবং ৬০০০ ডজন কব্জার প্রয়োজন হবে। এ সকল জিনিসগুলো এত বেশী পরিমাণে প্রয়োজন যে, সেগুলো সরবরাহ করা এক সমস্যার ব্যাপার। যথাসময়ে প্রয়োজনানুরূপে এগুলো চালানোর জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

কারখানা ও তার আনুসঙ্গিক যাবতীয় কাজের জন্যে ব্যয় হবে প্রায় ১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সাড়ে আট কোটি টাকা কেবলমাত্র কারখানা ও তৎসংলগ্ন কাজ ও বাকী সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা

কর্মচারীদের উপনিবেশ ও তাদের অন্যান্য হিতকর কার্যে ব্যয় করা হবে।

প্রথমোক্ত সাড়ে আট কোটি টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে, দু' কোটি টাকা কারখানা তৈরীর কাজে এবং এক কোটি টাকা কারখানা সংক্রান্ত অন্যান্য নির্মাণকার্যে ব্যয় হবে। বাকী টাকা রাস্তা-ঘাট, জলসরবরাহ ও সেচের কাজে ব্যয় হবে। বাড়ী তৈরীর কাজে যে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হবে তার মধ্যে তিন কোটি টাকায় কোয়ার্টার তৈরী হবে এবং এক কোটি টাকায় ওই সব কোয়ার্টারের জন্যে জল সরবরাহ, সেচ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। জমি-জায়গার উন্নতি সাধন ও অন্যান্য খাতে ৫০ লক্ষ করে টাকা ব্যয় হবে।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কারখানার কাজ সুরু হবে। ক্রমশ যন্ত্রপাতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫১ সালের প্রথমে এঞ্জিন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে এবং ওই বছরের শেষাশেষি প্রথম ভারতীয় এঞ্জিন কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবে। আজও ভারতের রেলপথের চাহিদা মেটাবার জন্যে বহু কোটি টাকার মালপত্র বাইরে থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। এই সেদিনও বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভারতবর্ষ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রেলপথের উন্নতির বিধানের জন্যে ঋণ গ্রহণ করেছে। চার বছর পর বিদেশ থেকে মাল আমদানীর জন্যে বিদেশ থেকেই সুদসহ টাকা ধার করবার এবং মালের জন্যে বিদেশেরই শিল্পপতিদের মুনাফা দেবার দুর্ভাগ্য আর হবে না—এই আশাতেই মিহিজামের নিকট বহু অর্থ ব্যয়ে চিত্তরঞ্জন সহর ও কারখানা তৈরী হচ্ছে। বহু সমস্যায় জর্জরিত খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখানে প্রধানতঃ বেকার বাঙালী তরুণদের জীবিকার্জনের পথ সুগম হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে বৈজ্ঞানিক কর্মীর চাহিদা

ভারতের শিল্পকার্যাদিতে কতজন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন—সে তথ্য নির্ণয়ের জন্যে ভারত সরকার যে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন তার রিপোর্টে প্রকাশ যে, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে এ-ধরণের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের প্রয়োজন হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দেশের প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শতকরা ৪০ থেকে ৯০ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কারিগরী বিদ্যানিপুণ লোকের ঘাটতি ধরা হয়েছে। কৃষিকার্যে ছয় হাজারেও বেশী লোক উদ্বৃত্ত আছে বলে কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু একে প্রকৃত উদ্বৃত্ত বলে মনে করা হচ্ছে না। কারণ সরকারের কৃষি-বিভাগের উপদেষ্টা ও গবেষণাকার্যের জন্যে প্রয়োজনীয় লোকের সংখ্যাই কমিটি বিবেচনা করেছেন। যে ৫০ হাজার লোকের প্রয়োজন বলে ধরা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে চিকিৎসা ও শিক্ষাকার্যের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ও সর্বপ্রকার জুনিয়ার গ্রেডের কর্মচারীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের জন্যে প্রায় ২০ হাজার ডাক্তার ও দন্তচিকিৎসক, ৩২৫০০ নার্স প্রভৃতি চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, প্রায় ২০ হাজার বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক এবং ৩৫ হাজারেরও বেশী সর্বশ্রেণীর জুনিয়ার গ্রেডের কর্মচারীর প্রয়োজন।

বিজ্ঞান কলেজের প্রসার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপার সারকুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজ প্রসারিত করবার জন্যে শীঘ্রই কলেজ সন্নিহিত দশ থেকে চৌদ্দ বিঘা জমি দখল করবেন। এই জমি সরকারী জমি দখল অফিসারের মারফৎ লওয়া হবে। এই প্রসার কার্যের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে পঁচিশ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকারের মধ্যে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। ভারত সরকার এই ঋণের জন্যে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে

সুদ ধার্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সুদের হার হ্রাস এবং ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধির জন্যে আবেদন করেছেন।

নতুন ভেষজের সন্ধান

নিউইয়র্কের বটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্‌ এর অধ্যক্ষ ডাঃ উইলিয়াম জে, রবিন্‌স্‌ বিখ্যাত মার্কিন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী কিংডন ওয়ার্ডকে ভারত-বর্মা সীমান্তে কর্টিসোন (cortisone) নামক ওষুধ সমন্বিত উদ্ভিদ খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে— গেঁটে বাত ও বাতজ্বর প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় কর্টিসোন বিশেষ ফলপ্রদ।

মিঃ ওয়ার্ড এখন আসাম এবং বর্মার সীমান্তে অবস্থান করছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার জন্যে তাঁকে উক্ত উদ্ভিদ এবং তার বীজ সংগ্রহ করে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। রাওলপিণ্ডির গর্ডন কলেজের ডাঃ র‍্যাল্‌ফ্‌ স্টুয়ার্টের নিকটও অনুরূপ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কর্টিসোনকে অনেকসময় মোহিনীশক্তিসম্পন্ন ওষুধ বলা হয়। কারণ বাতের রোগীদের উপর এই ওষুধ প্রয়োগে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। Strophanthus জাতীয় প্রায় পঞ্চাশ রকমের উদ্ভিদে এই ওষুধের অস্তিত্ব দেখা গেছে। ১৯৩৫ সালে কিউবা থেকে এই জাতের একটি উদ্ভিদের বীজ এনে নিউইয়র্কের বটানিক্যাল গার্ডেনে সে রোপন করা হয়েছিল। এখন সেখানে ১৫ ফুট উঁচু একটি মাত্র উদ্ভিদ আছে।

ভারতের খনিজ সম্পদ

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ১৯৪৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, মধ্যপ্রদেশের ধলঘাট জেলার তিরোদির নিকটবর্তী পৌনিয়া এলাকায় ম্যাঙ্গানিজ আকরের প্রায় বারোটি নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার জ্বালামুখী অঞ্চলে, তালচের এলাকায় ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের লখিমপুরে এবং আসামের শিবসাগর জেলায় তেলের সন্ধান করা হচ্ছে। ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগ বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলায় এবং মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টমের নিকট তেল বিশুদ্ধীকরণের স্থান পরীক্ষা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তামা, জিপসাম, মৃৎশিল্পের কাঁচামাল এবং ফুলার্স আর্থের খনি আবিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

আগামী ২রা থেকে ৮ই জানুয়ারি পুণায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে তাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বৈজ্ঞানিক দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করবেন। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেস বিদেশী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-গুলোকে প্রতিনিধিদের নাম মনোনয়ন করে পাঠানোর জন্যে চিঠি দিয়েছেন। এই প্রথম পুণা ও পুণা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুণা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য

মস্কো যাত্রার পূর্বে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সাংবাদিকদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন— ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম অভিযোগ এই যে, ভারতের জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বপ্রকার সম্পর্ক রহিত।

আমাদের দেশের লেখকদের অনাদর করে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সেক্সপিয়ার, মিলটনের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন। ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেককাল থেকেই অ-ভারতীয় আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে অতি মর্যাদা দানই শিক্ষায় অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ বলে স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, সরকারী চাকুরী লাভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে না।

শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থা যে, দেশের প্রতি অভিশাপে পরিণত হয়েছে তা আমরা অনুভব করেছি। পরীক্ষা-নীতির মূলে বিরাট গলদ রয়েছে। এই নীতি সম্পূর্ণ অকেজো, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

এই ব্যবস্থা ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির যথার্থ নিরিখ নয়। ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং আসক্তি নির্ভুলভাবে নির্ধারণের জন্যে পরীক্ষা-নীতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বাস্তব বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরীক্ষা-নীতির আমূল পরিবর্তনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সুপারিশ করেছেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা

সম্প্রতি দিল্লী সম্মিলনে স্থির হয়েছে যে, সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের মাধ্যমিক পর্যায়েও মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে প্রাদেশিক ভাষা পাঠ করতে হবে। প্রাদেশিক ভাষা অথবা রাষ্ট্রভাষা তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে পড়ানো আরম্ভ করা হবে। যেসব বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রের একতৃতীয়াংশ অথবা ততোধিক সংখ্যালঘু ভাষাভাষী ছাত্র থাকবে সেসব বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘুদের সকল পর্যায়েই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং যেসব বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী ছাত্রের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম সেসব স্থানে তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সুতরাং মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের প্রাদেশিক অথবা রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার জন্যে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে প্রাদেশিক অথবা রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়েছে।

বিজ্ঞান পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলো সহজ বাংলায় সাধারণের নিকট পরিবেশনের জন্যে পরিষদ 'লোক বিজ্ঞান গ্রন্থমালা' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। এই গ্রন্থমালার তিনখানা পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে; চতুর্থ খানার মুদ্রণ কার্যও প্রায় শেষ হয়েছে। বিভিন্ন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের লিখিত জনসাধারণের উপযোগী এরূপ পুস্তক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া বিজ্ঞানের মূল বিষয়ের সাধারণ তথ্য ও সত্যগুলো সহজভাবে বোঝাবার জন্যে পরিষদ 'বিজ্ঞান প্রবেশ' নামে আর একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এতে রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক সহজ তথ্যাদি এমনভাবে সন্নিবেশিত হবে যাতে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সহজেই বিজ্ঞানের সংগে পরিচয় লাভে সক্ষম হবেন। বিশেষ কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই যেসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্ভব সেসব পরীক্ষাই এই সব পুস্তকে স্থান পাবে। বিজ্ঞানের সকল জটিলতা ও বাহুল্যবর্জিতভাবে এই সকল পুস্তক সাধারণের পক্ষে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবেশ লাভের সহায় হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পরিষদের সাধারণ অধিবেশন (২০-৮-৪৯)

বিবরণী ও বিজ্ঞপ্তি

গত ২০শে আগষ্ট '৪৯, শনিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের বক্তৃতাগৃহে পরিষদের একটি সাধারণ অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় একশত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কর্মসচিব, শ্রীসুবোধনাথ বাগচী পরিষদের ষান্মাসিক বিবরণী ও আর্থিক হিসাবাদি উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

তারপর শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা ভাষায় গণিতের রাশি ও পরিমাপের মান সম্বন্ধীয় উপসমিতির প্রস্তাবাবলী সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উপসমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রথম দুইটি প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

১। বাংলা ভাষার সংখ্যা-সূচক প্রতীক চিহ্নগুলি 0, 1, 2, 3..... 9 এইরূপ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়; বাংলায় এগুলিকে এক, দুই, তিন ইত্যাদি করিয়াই প্রকাশ করা হইবে। আন্তর্জাতিক বিধি অনুসরণ করিয়াই আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি। সংখ্যা-সূচক চিহ্ন বা হরফগুলির এইরূপ প্রকাশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। সংক্ষেপে আমাদের প্রস্তাব এই যে, বাংলা সংখ্যাগুলি এইরূপ প্রচলিত হউক—1 এক, 2 দুই, 3 তিন ইত্যাদি।

২। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রকাশ না করিয়া সর্বদা রোমান হরফ ব্যবহারের প্রস্তাব করা যাইতেছে। বাংলায় বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার সময়ে বৈজ্ঞানিক সূত্র ও সমীকরণগুলি সর্বদা রোমান হরফে প্রকাশিত হইলে অনেক অসুবিধা দূর হইবে।

উপরোক্ত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হওয়ার পরে উপসমিতির অবশিষ্ট চারটি প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় স্থির হয় যে, এই প্রস্তাবগুলি সদস্যগণের বিবেচনার জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও যথাসময়ে একটি সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া যথাকর্তব্য স্থির করা যাইবে।

সদস্যগণের বিবেচনার জন্য উক্ত প্রস্তাব ৪টি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

৩। বাংলায় ওজন, কাল ও দূরত্ব প্রকাশের মান মেট্রিক পদ্ধতি অনুসারেই প্রচলিত হওয়া আবশ্যক—সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ড, এই আন্তর্জাতিক মানগুলিই বাংলায় প্রচলন করিতে হইবে, তবে কোথাও বিশেষ অসুবিধা ঘটিলে মাইল, ফুট, পাউণ্ড, সের প্রভৃতিরও ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গে করা যাইতে পারে।

৪। অনাবশ্যক জটিলতা দূর করিবার জন্য সর্বপ্রকার ইলেক, চোক, কড়া, গণ্ডার প্রচলন একেবারেই তুলিয়া দিতে হইবে—যেমন ১৸৵১৫ এক টাকা তের আনা তিন পয়সা লিখিতে হইবে 1-13-3 পয়সা, এইরূপ। মণ ৩৷১৫॥৵ এর বদলে লিখিতে হইবে মণ 3-15-10

৫। এই উপসমিতির সর্বসম্মত অভিমত এই যে, মাপ ও মুদ্রা প্রভৃতির প্রকাশ সর্বদা দশমিক প্রথা অনুসারে করাই বাঞ্ছনীয়।

৬। শিল্প ও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় সংখ্যা ও মাপ বিষয়ে যে মান প্রচলিত আছে তাহাই বিকল্পে চলিতে পারে বলিয়া এই উপসমিতি মনে করেন।

শেষোক্ত এই চারিটি প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্যগণের মতামত আহ্বান করা যাইতেছে।

['জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের লিখিত 'দশমীকরণের আন্দোলন' নামক প্রবন্ধটি সদস্যবর্গকে পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। কর্মসচিব]

দ্রষ্টব্য—বিশেষ অসুবিধার জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' আপাততঃ উপরোক্ত ১নং প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হলো না। নববর্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। গ.

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | সেপ্টেম্বর—১৯৪৯ | নবম সংখ্যা

সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কৃত্রিম হরমোন

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

মুখের সৌন্দর্য ও লাবণ্যবৃদ্ধির জন্যে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। যৌবনকে দীর্ঘকাল আটকে রাখার প্রচেষ্টায় সৃষ্ট হয়েছে প্রসাধন-শিল্প—স্নো, ক্রীম, পাউডার। আধুনিকা নারীর রূপচর্চায় এগুলো অপরিহার্য; যদিও শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতায় নারীদের উদ্দেশ করে বলেছেন: "Faces cannot be made beautiful by the application of lip-sticks and cosmetics." প্রসাধন একটা দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির উৎসাহে প্রসাধন দ্রব্যাদির অত্যধিক ব্যবহারে নারীর স্বাভাবিক রূপ ও লাবণ্য ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসে, প্রসাধনহীন মুখে দেখা দেয় যৌবন-শেষের কুঞ্চন রেখা। কুরূপাকে সুরূপা করে তুলতে, সুরূপার রূপকে আরও বাড়িয়ে তুলতে প্রসাধন সামগ্রীর কার্য নিতান্তই সাময়িক। বাজারে চলতি এই সমস্ত দ্রব্যাদি ব্যবহারে মুখের নরম চামড়ার মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়। তার কমনীয়তাও ধীরে ধীরে কমে আসে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির আসল জিনিস এতে নেই। আমরা ভুলে যাই যে, নারীর স্বাস্থ্য ও নারীদেহের আভ্যন্তরীণ গঠনই তার বাইরের সৌন্দর্যের কারণ। সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়তাকারী সেই আভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীকে সচল করে রাখতে পারলেই যৌবনের স্থায়িত্বকাল হয়তো দীর্ঘতর করতে পারা যায়। প্রসাধন সামগ্রীর ভিতর দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ করতে বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন।

মানবদেহের অভ্যন্তরে একজাতীয় গ্রন্থি আছে। সেগুলোকে বলা হয় এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড অর্থাৎ নালীবিহীন গ্রন্থি। সুস্থদেহে এই সমস্ত গ্রন্থিতে এক প্রকার অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। অনুভূতিশীল স্নায়ুমণ্ডলীর আয়ত্তাধীনেই এর উৎপত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের জীবনী-শক্তির মূল-আধার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির সহায়ক এই রাসায়নিক পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে হরমোন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বেলিস ও স্টারলিং নামক বিজ্ঞানীদ্বয় দেহে সর্বপ্রথম যে হরমোন, আবিষ্কার করেন তার নাম সিক্রেটিন। অন্তঃ-নিঃসরণকারী গ্রন্থিকোষ হতে নির্গত হরমোন, নালীর সাহায্য ছাড়াই সোজাসুজি রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিশে যায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই অন্তর্মুখী নিঃসরণ শরীরের পক্ষে

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, শরীর-যন্ত্রের বিচিত্র ক্রিয়ানির্বাহের এরাই কর্মীস্বরূপ। এই রস নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সমস্ত এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ডের কার্যকরী সমতা বিনষ্ট হয় এবং দেহে নানারকমের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অন্তঃনিঃসরণকারী গ্রন্থির মধ্যে গল-গ্রন্থি বা থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস, অ্যাড্রিনেল, পোষনিকা বা পিটিউটারী-গ্রন্থি, অন্ত্রের উপরিস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং যৌন-গ্রন্থি বা সেক্স গ্ল্যাণ্ডই প্রধান। প্রত্যেকটি গ্রন্থি হতে বিভিন্ন উত্তেজনায় বিভিন্ন প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়ে থাকে।

কিড্‌নী বা বৃক্কের গ্রন্থি হতে যে হরমোন নির্গত হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাড্রিনালিন। এই অ্যাড্রিনালিন, শিরা-উপশিরার সঙ্কোচন দ্বারা রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়। যখন কারও কপোল বা গণ্ডদেশ লজ্জায় বা আবেগে রক্তিম হয়ে ওঠে তখন বুঝতে হবে অ্যাড্রিনালিন হরমোনের নিঃসরণ দ্বারাই এরকম হয়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে এই হরমোন নির্গমনের ফলে রক্তনির্যাস বা সিরামে পটাশিয়াম ধাতুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত ঘর্ম, ভয় বা বিস্ময়ের আতিশয্যে হৃৎস্পন্দনের গতিবৃদ্ধি প্রভৃতি আবেগ-সংক্রান্ত ক্রিয়ায় ইনসুলিন নামক হরমোন নিঃসৃত হতে পারে। স্তন সম্পর্কীয় গ্রন্থি বা ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডের উত্তেজনায় ল্যাক্টোজেনিক হরমোনের স্বতঃনিঃসরণ হতে দেখা যায়। জেনেট নামক একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যে, পরীক্ষা আরম্ভ হবার অনতিপূর্বে পরীক্ষার্থীরা ঘন ঘন প্রস্রাব করে থাকে। এটাও উত্তেজনাপ্রসূত হরমোনেরই ক্রিয়া। কোন কোন শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী, যেমন ভেক ইত্যাদি দেহ-ত্বকের রং পরিবর্তন করে থাকে। পোষনিকা গ্রন্থির হরমোন নিঃসৃতির ফলেই নাকি এরকম হয়। বিজ্ঞানীরা এই সকল দেহ-নিঃসৃত হরমোন রক্ত, মূত্র প্রভৃতি হতে পৃথক করে নিয়ে তাদের গুণাগুণ ও গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই সমস্ত জটিল রাসায়নিক পদার্থ গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে।

দেহের যৌন-লক্ষণ বিকাশের সঙ্গে সেক্স-হরমোনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নারীর দৈহিক লাবণ্যও নাকি নির্ভর করে বিশেষ এক রকম হরমোনের ওপর। এর নাম এসট্রোজেন। দেহে এই হরমোনের অভাব হলেই নাকি নারীদের দৈহিক লাবণ্যে ভাটা পড়ে। কাজেই কৃত্রিম উপায়ে প্রসাধন-ক্রিমের সঙ্গে এই হরমোন দেহে প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীমহলে সুরু হয়েছে। আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনা স্কুল অফ্ মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ এডওয়ার্ড প্রিন্স, মিশ্রিত এসট্রোজেন দেহত্বকে কিভাবে শোষণ করানো যায় এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেছেন।

এসট্রোজেন-ক্রিম মাখানোর ফলে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এতে দেহের রক্তনালী-বিন্যাসের সূক্ষ্ম কৈশিক নালীগুলোর আয়তন বাড়িয়ে দেয় এবং ত্বকের নীচের কতকগুলো সূত্রের জল শোষণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। এইরূপ মতও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন যে, ত্বকের এই সূত্রগুলোর জলশোষণ জনিত স্ফীতির দরুণ ত্বকের উপরিভাগ প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং সেই জন্যেই চামড়ার ওপরের কুঞ্চিত রেখাগুলো দূর হয়ে যায় এবং ত্বক মসৃণ হয়ে ওঠে। এই এসট্রোজেন রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক নালীগুলোর আয়তন বাড়িয়ে দেয়। ফলে অক্সিজেনও অধিক পরিমাণে এখানে গৃহীত হয়ে থাকে। ত্বকও হয়তো এই কারণেই সজীব হয়ে ওঠে।

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছিল যে, বিক্রয়ের জন্যে মজুত এসট্রোজেন মিশ্রিত ক্রিমের প্রতি দু-আউন্স শিশিতে দশ থেকে চল্লিশ হাজার ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট পর্যন্ত এসট্রোজেন রয়েছে। যদি এক শিশি ক্রিমে দু-মাসের কিছু বেশী চলে

তাহলে প্রতিদিনের হিসেবে ৩৩০থেকে ১৩০০ ইউনিট পর্যন্ত পড়ে। দেখা গেছে যে, এই এস-ট্রোজেনের মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১৫৫ ইউনিট বাস্তবিকপক্ষে দেহ-ত্বকে শোষিত হয়ে থাকে। গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সাড়া জাগাতে অতি সামান্য পরিমাণ এসট্রোজেন-ক্রিমের প্রয়োজন। ২০টি ইঁদুরকে বেশী এসট্রোজেন-ঘটিত ক্রিম মাখানো হয় এবং আরো ২০টি ইঁদুরকে মাখানো হয়েছিল কম এসট্রোজেনযুক্ত ক্রিম। এই হরমোনের ফলাফল দেখবার জন্যে বাকী কয়েকটি ইঁদুরকে এসট্রোজেন বিহীন ক্রিম মাখানো হয়েছিল। ইঁদুরগুলোর দেহে দেড় মিনিট ধরে দিনে একবার এই ক্রিম মালিশ করা হয় সপ্তাহে ছয়দিন। ইঁদুরের শরীরের বাঁ-দিকের লোমগুলি কাঁচি দিয়ে ছোট করে ছেটে ফেলে সেখানটায় এই ক্রিম মাখানো হয়। ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ফেললে হয়তো চামড়া কেটে যেতে পারে, তাতে জ্বালা হতে পারে, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। জন্তুর ওপর এরকম পরীক্ষায় কিছু খারাপ ফল দেখা গেল। কতকগুলো ইঁদুরের লোম উঠে গেল, কতকগুলোর গায়ের চামড়া স্থানে স্থানে পুরু বা পাতলা হয়ে গেল, জনন-ইন্দ্রিয়ও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে দেখা গেল এবং আরো লক্ষ্য করা গেল যে, রক্তবহা কৈশিক নালীগুলোর আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেহে রক্তসঞ্চালনেরও আধিক্য ঘটেছে।

ডাঃ প্রিস্ক বলেন যে, এসট্রোজেন দেহ-ত্বক ভেদ করে যায় এবং চামড়ার কুঞ্চন নষ্ট করে বলে প্রসাধন-ক্রিমের ব্যবহার হতে পারে। সূচী প্রয়োগ দ্বারাও ইহা দেহে প্রবেশ করানো যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া মোটেই আরামপ্রদ নয়। কাজেই অবাঞ্ছিত ঘরে বসে আরাম করে এই ক্রিম মুখে বা হাতে মাখান যায়; এতে রয়েছে ক্লান্তি-হরা আনন্দ, রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। কিন্তু ডাঃ প্রিস্ক সাবধান করে দিয়েছেন যে, এসট্রোজেন-ঘটিত ক্রিমের মাত্রাধিক্য দেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে প্রজনন শক্তির ক্ষিপ্রতা বিধান করে ও নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়। দেহের রক্তস্রোতে এসট্রোজেন প্রবেশ করানোর ফলে স্ত্রীজাতির রজঃ-নিবৃত্তিকাল বিলম্বিত হয় কিনা—এটা এখনও পরীক্ষাধীন। কিন্তু একথা জানা গিয়েছে যে, নারীদেহের উর্ধ্বাংশ গঠনে এসট্রোজেন বিশেষ সহায়তা করে। নারীদেহকে সমুন্নত, লাবণ্যময় ও সৌষ্ঠবশালী করে গড়ে তুলতে এসট্রোজেন অদ্বিতীয়।

এসট্রোজেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হরমোন। এই হরমোনের অভাবে স্ত্রী-দেহ যেমন লাবণ্যহীন ও কৃশ হয়ে পড়ে, এর আধিক্যেও তেমনি দেহে নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়। দেহ-ত্বকে অত্যধিক পরিমাণে এসট্রোজেন শোষিত হওয়ার ফলে ক্যানসার বা কর্কট রোগের সূত্রপাত হতে পারে। কারণ কতকগুলো এসট্রোজেন ক্যানসার রোগ সৃষ্টিকারী পদার্থের সমধর্মী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অনেকে এই হরমোন ব্যবহারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই হরমোন-ঘটিত ক্রিমের প্রসাধনে দেহলতা সুচারুরূপে বর্ধিত হয়,লাবণ্য ও কমনীয়তাও বেড়ে যায়। সৌন্দর্য-লিপ্সু নারীর পক্ষে ইহা লোভনীয় জিনিস সন্দেহ নেই; কিন্তু এই হরমোনের আধিক্য জীবনীশক্তিকে যেরূপ অস্বাভাবিকভাবে উদ্দীপিত করে, দেহ-গঠন ও বৃদ্ধির যেরূপ দ্রুত সহায়তা করে তাতে ক্যানসার ব্যাধির আক্রমণের সূচনা দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই এই হরমোনের সম্পূর্ণ কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগম্য না হওয়া পর্যন্ত সৌন্দর্যকামী রূপসজ্জা-বিলাসিনীদের অপেক্ষা করে থাকা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ-সরবরাহ উন্নয়নে আইনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহে শক্তির উৎসগুলিকে জাতির সম্পদরূপে গণ্য করা হয় এবং তাহাদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সুপরিচালনার নিমিত্ত নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। জনসাধারণ যাহাতে সস্তা দরে নিশ্চিতরূপে প্রচুর পরিমাণ শক্তি পায় এবং কোন পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নিকট সাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময় সময় অনুকূল বিধি রচিত এবং সংশোধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিদ্যুৎ-সরবরাহ শিল্পে আইনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভারত সরকার ১৯১০ সালে বিদ্যুৎ-সরবরাহ শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ-আইন সংকলন করেন। এই আইনের বলে প্রাদেশিক সরকার বেসরকারী যৌথ অথবা স্বতন্ত্র যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সার্বজনীন বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন ও সরবরাহ করিবার ক্ষমতা দিয়া লাইসেন্স দিবার অধিকার লাভ করেন। এইভাবে বিদ্যুৎ-শিল্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বা জেলা কর্তৃপক্ষের আওতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

কতকগুলি অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৭টি সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহারা রেসিপ্রোকেটিং ষ্টিমএঞ্জিন অথবা ডিজেল সেট-এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বৃহত্তর পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এরূপ এঞ্জিনের ব্যবহার বহুকাল পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে অধিকতর উপযোগী টারবাইন প্রবর্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে মাত্র কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ সমিতি ও অপর দুইটি প্রতিষ্ঠান শেষোক্ত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া থাকে। কলিকাতা সহর ও সহরতলীর বাহিরে যে পরিমাণ বিদ্যুতের ব্যবহার হয় তাহা নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ৯৭০০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ অর্থাৎ ৮২২০ লক্ষ ইউনিট শুধু কলিকাতা অঞ্চলের শক্তিকেন্দ্র হইতেই উৎপাদিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের শক্তিকেন্দ্রগুলির কার্যক্ষম যন্ত্রের সম্ভাব্য ক্ষমতা হইল মোট ৩৪২,৩২৯ কিলোওয়াট; কিন্তু শুধু কলিকাতায় স্থাপিত যন্ত্রগুলির সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা ২৯৪,৭৫০ কিলোওয়াট অর্থাৎ শতকরা ৮৪.৪ ভাগ।

গ্রেট ব্রিটেনে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আইন

ভারতীয় বিদ্যুৎ-আইন মূলতঃ গ্রেট ব্রিটেনের প্রাথমিক বিদ্যুৎ-আলোকন বিধি অনুসারে রচিত। আজও প্রধান প্রধান বিষয়ে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পক্ষান্তরে গ্রেট ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তাহার সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক শক্তিকেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে প্রবর্তিত বিদ্যুৎ-আলোকন বিধি বিদ্যুৎ-সরবরাহ শিল্পে সর্বপ্রথম আইন। ইহার বলে বোর্ড অফ ট্রেড যেকোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সম্প্রদায়কে অনুমোদন পত্র দিবার ক্ষমতা লাভ করেন। এই বিধি অনুসারে সম্প্রদায়গুলি মাত্র ২১ বৎসরের জন্য সরবরাহ সত্ত্ব লাভ করে। ১৮৮৮ সালে যে আইন রচিত হয় তাহার ফলে এই সরবরাহ কাল ৪২ বৎসরে পরিবর্ধিত হয়।

সুদূর অঞ্চলে সরবরাহের সুবিধা উপলব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরবর্তী পর্যায় গোচরীভূত হয়, দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর প্রসারিত হয়, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্প্রদায়ের সংগঠন অনুমোদন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আইন রচিত হইতে থাকে। পূর্বের সরবরাহ সমিতিগুলির সহিত এই প্রতিষ্ঠানগুলির পার্থক্য এই যে, ইহাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন অনুমোদন ও সরবরাহের অধিকার দেওয়া হয়।

আইনের দ্বারা প্রধানতঃ দুইটি ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সরবরাহ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়, যথা—অনুমোদিত আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ককে অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং জনসাধারণের প্রয়োজনস্থলে বিদ্যুৎ জোগানো। আইন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও অনুমোদিত সরবরাহকারীর সীমানায় তাহার বিনা অনুমতিতে প্রয়োজনস্থলেও বিদ্যুৎ বিতরণ করিতে পারে না।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাধারণ আইন সংকলিত হয়। ইহার ফলে প্রতিবেশী সরবরাহকারী-দের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য প্রেরণ-পথ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উক্ত আইন অনুসারে বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ফলে এবং এই সকল কেন্দ্র হইতে দূরবর্তী বণ্টন-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হওয়ায় বিদ্যুৎ শিল্পে উন্নতি লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের আদান-প্রদানের জন্য বণ্টন-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আইনে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা হয় নাই। এইজন্য ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত শক্তি উৎপাদক সমিতিগুলি তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র উৎপন্ন কেন্দ্র হইতেই সরবরাহ করার ব্যগ্রতার জন্য প্রধানতঃ কতিপয় স্বতন্ত্র সংস্থিতির মধ্যেই উন্নতি সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হয় তখন বিদ্যুৎ-সরবরাহ উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায় লক্ষিত হয়। সার্বজনীন সরবরাহে সহযোগীতা না থাকায় শ্রমশিল্পে বিদ্যুৎশক্তি নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। মূলধনের আধিক্য ও ইন্ধনের অপ্রাচুর্য হেতু বিদ্যুতের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। সরবরাহ অঞ্চলগুলি বৃহত্তর হইলে এবং উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি কখনই ঘটিত না।

বোর্ড অফ ট্রেড কর্তৃক নিয়োজিত ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সাপ্লাই কমিটির (উইলিয়ামসন) পরামর্শ অনুমোদনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে পার্লিয়ামেণ্টে একটি বিল উপস্থাপিত করা হয়। পার্লিয়ামেণ্ট এই বিল গ্রহণ করিয়া বৈদ্যুতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে উন্নয়নের পুনর্ব্যবস্থা অনুমোদন করে এবং উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রধান প্রেরণ-পথ ক্রয় করিতে পারে এইরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন যৌথপ্রতিষ্ঠান সংগঠনকে আইনসঙ্গত করিয়া দেয়। এই আইনের বলে পরিদর্শন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রিসিটি কমিশন গঠিত হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ চলাচল বিষয়ক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত হয়।

১৯১৯ সালের এই আইনের ফলে পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপুল উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অধিকাংশ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান আপন আপন স্বতন্ত্র অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার আকাঙ্খা পোষণ করিত। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ সমবায়ের নিকট কেন্দ্রগুলিকে হস্তান্তরিত করিতে তাহাদের প্রবল অনিচ্ছা ছিল। পূর্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি-সাধন করার অবাধ ক্ষমতা লাভ করিবার আকাঙ্খা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছিল। এই সব কারণে কার্যকরী পুনর্বন্দোবস্ত সম্ভব হয় নাই।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-সভা

১৯২৫ সালে অধিকতর শক্তিশালী আইনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইলে লর্ড উইয়ারের নেতৃত্বে এই পরিস্থিতি বিবেচনা করিবার জন্য আরও একটি সরকারী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির অনুমোদনের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের উৎপাদন ও প্রেরণ পদ্ধতির পুনর্গঠন করা হইয়াছে। ১৯২৭ সালে 'কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎসভা' নামক একটি নবগঠিত সাধারণী-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদন ও প্রেরণের সংযোজনকে বাধ্যতামূলক করিয়া আইন সংকলিত হয়।

কোন অর্থেই উক্ত সভাকে সরকারী বিভাগ বলা চলে না। ইহা রাজনৈতিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, নিজের পদ্ধতি ও পরিচালনার ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন একটি বাণিজ্য সমবায়। কোনরূপ লাভের আশা না করিয়া ইহাকে আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করিতে হয়। বিদ্যুৎ-সরবরাহ আইনের দ্বারা অনুমোদিত অপর যে কোন প্রতিষ্ঠানের মত ইহাও চলাচল-মন্ত্রী ও ইলেকট্রিসিটি কমিশনারের শাসনাধীন এবং একই আইনের অধীন ছিল।

গ্রীড-পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য হ্রাস

জনসাধারণের মধ্যে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীত কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট কারখানাগুলি যাহাতে তাহাদের যোগ্যতানুরূপ কাজ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মধ্যে গ্রীড-পদ্ধতি নামক প্রেরক জালিকার দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা হয়। গ্রীড-পদ্ধতিতে নিম্নরূপ পরিবর্তন দেখা দেয় :—

প্রধান ক্রেতাদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার অধিকার প্রত্যেকটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অক্ষুন্ন থাকে ; কিন্তু যথাযথভাবে চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব ইহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া হয় এবং গ্রীড-পদ্ধতিতে অর্থাৎ সাধারণ কেন্দ্র হইতেই সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রীড-পদ্ধতি প্রণয়ন ও পরিচালনার ভার আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সভার উপর বর্তায়। সভার নির্দেশমত অথচ স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত মনোনীত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপন্ন বিদ্যুৎ ক্রয়ের ও পরিচালনার ভার আইনের বলে এই সভার উপর বিন্যস্ত হয়। এই সভা আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কর্তৃপক্ষকে এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বরাবর বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। ১৯২৬ সালের বিধি অনুসারে বিদ্যুৎ বিতরণ ও বাণিজ্যিক উন্নতির সমূহ দায়িত্ব অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান অথবা আঞ্চলিক সরবরাহকারীদের উপর অর্পিত হয়।

বোর্ডের কার্যের সুবিধার জন্য উত্তর স্কটল্যাণ্ডের বসতিবিরল প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে পরিকল্পনানুযায়ী কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। উঃ দঃ হাইড্রো-বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২০,৫০০ বর্গ-মাইল জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত জাতীয় জনসংখ্যার শতকরা দুই ভাগেরও কম অধিবাসী অধ্যুষিত এই প্রদেশের জন্য একটি নূতন পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। পরিকল্পনার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলির নাম :— (১) মধ্য স্কটল্যাণ্ড (২) উত্তরপশ্চিম ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ (৩) উঃ পূঃ ইংল্যাণ্ড (৪) মধ্যপূর্ব ইংল্যাণ্ড (৫) মধ্য ইংল্যাণ্ড (৬) দঃ পূঃ ইংল্যাণ্ড (৭) পঃ ইংল্যাণ্ড ও দঃ ওয়েলস্।

উৎস হইতে প্রধান প্রধান চাহিদার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণের নিমিত্ত বহুকাল হইতে উচ্চ-ভোল্টেজে প্রেরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। গ্রেট ব্রিটেনের শক্তি-উৎসগুলি পরস্পর অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত বলিয়া এবং উৎপাদনকেন্দ্র প্রধানতঃ চাহিদার অঞ্চলের নিকটবর্তী থাকায় কেবল মাত্র বিপুল শক্তি প্রেরণের

জন্যই উচ্চ ভোল্টেজ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। পক্ষান্তরে কারখানার সম্পূর্ণ সংযোজনের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা : (ক) প্রত্যেক স্বতন্ত্র কেন্দ্রে মজুত যন্ত্রাদির পরিমাণ হ্রাস করিয়া এই পদ্ধতির যন্ত্রাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে এবং (খ) সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যক্ষম যন্ত্রে উচ্চতম সম্ভাব্য 'লোড' ব্যবহার সহজসাধ্য করিয়া থাকে।

গ্রীড-পদ্ধতির সুবিধা নানাবিধ। এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রচলন হইবার পূর্বে বাড়তি যন্ত্রপাতির বিশেষ একটি অংশ ব্যবসায় শিল্পে ব্যবহৃত হইত। পরস্পর সংযুক্ত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির প্রতিষ্ঠায় কোন একটি কেন্দ্রে অচল অবস্থার উদ্ভব হইলে গ্রীড-পদ্ধতিতে এই ক্ষতির পূরণ হইয়া থাকে। সুতরাং একটি রিজার্ভ সমগ্র অঞ্চলের জন্য যথেষ্ট। সমগ্র দেশের উর্ধতম চাহিদা গড়ে দশ লক্ষ কিলোওয়াট। গ্রীড পদ্ধতিতে বাড়তি যন্ত্রাদির পরিমাণকে আজ পর্যন্ত গড়ে ৬৫% হইতে প্রায় ১৫% পর্যন্ত নামাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা মোটামুটি পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন যন্ত্রের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছে। ইহার অর্থ প্রতি কিলোওয়াট ৩০ পর্যন্ত হারে গ্রীড-পদ্ধতি দেশকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে।

কোনও অঞ্চলের সকল প্রয়োজনীয় মাল সেই অঞ্চলেই উৎপন্ন করিবার আর দরকার হয় না। দিবারাত্র পূর্ণোদ্যমে কর্মরত উৎকৃষ্ট কেন্দ্রগুলিতে দেশের প্রয়োজনমত শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

'দ্বি-পর্যায়যুক্ত কেন্দ্র' নামক অপর কতকগুলি কেন্দ্র নিশাভাগে ও সপ্তাহ অন্তে বন্ধ থাকে। পক্ষান্তরে উচ্চতম চাহিদার সময় দেশের সকল কেন্দ্রই (পুরাতন নিকৃষ্ট কেন্দ্রগুলিও) ব্যবহৃত হইতে পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এই কেন্দ্রগুলি ব্যবহার করায় যে পরিমাণ কয়লা ব্যয় হয় তাহার গুরুত্ব অল্প। কারণ ইহাদের সাহায্য গ্রহণের ফলে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর খরচ বাঁচিয়া যায়।

১৯৪২ সাল পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আইনগত ক্ষমতাসম্পন্ন ৫৭৬টি ভিন্ন ভিন্ন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশ মতে চালিত মাত্র ১৪২টি বিশিষ্ট কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও ৫১টি সাধারণ কেন্দ্র ছিল। ইহারাও বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হইত। সুতরাং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত বোর্ডের মাত্র ১৯৩টি উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। ইহাদের মালিকীর পরিবর্তন হইত না। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশে ইহারা পরিচালিত হইত এবং প্রকৃত উৎপাদন মূল্যে বোর্ডের নিকট ইহাদের সমগ্র উৎপাদনই বিক্রীত হইত।

মো-গোয়ান কমিটির রিপোর্ট

এইভাবে দেখা যায় ১৯২৬ সালের আইনের দ্বারা বিদ্যুৎশিল্প একটি সুদৃঢ় উন্নতিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক অঞ্চলে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান থাকায় ইহাদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত করিতে পারিলে বিদ্যুৎ বিতরণের সুবিধা হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে আইন পরিবর্ধিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

১৯৩৬ সালে বিদ্যুৎ বিতরণ সম্পর্কে মো-গোয়ান কমিটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তির লক্ষ্য হইল বিদ্যুৎ বিতরণের পুনর্গঠন ব্যবস্থায় ব্যয়সাম্য করিয়া বিদ্যুতের চাহিদাবৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস সম্ভব করা।

মো-গোয়ান কমিটি অনুমোদন করেন যে, সন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনবোধে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরবরাহকারী সমিতিগুলির নিকট হস্তান্তর করা। এই ভিত্তিতে ৫০ বৎসরের অনূর্ধ্ব নির্দিষ্ট সময় অন্তে সমিতিগুলির যে কোনও জনপ্রতিষ্ঠান ক্রয় করিতে পারা।

দৃশ্যতঃ সমিতিগুলির কোনও সুনিশ্চিত স্থিতিকাল থাকিতে পারে না। মো-গোয়ান কমিটি সুদীর্ঘ অঞ্চলব্যাপী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ উপকারিতা সম্বন্ধে সুপারিশ করেন। বিদ্যুৎ-শিল্পের পুনর্গঠনে বর্তমান কাঠামোর সম্পূর্ণ ওলটপালট না করিয়া এবং ইহার প্রবর্তকগণের দাবীদাওয়া যথাযথভাবে মানিয়া লইয়াও কিরূপে বিস্তৃতভাবে উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধন করা যাইতে পারে এই কমিটি সে সম্বন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সমিতি প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ-সরবরাহ সম্পর্কে মো-গোয়ান কমিটির সুপারিশ সাধারণভাবে মানিয়া লইলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান-গুলি মনে করেন যে, এইরূপ পরিকল্পনার চরম সুবিধা কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিচালিত একটি মাত্র বিতরণ-প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রেতাগণের উপভোগ্য হইতে পারে।

বিদ্যুৎ জাতীয়করণ

বিগত বিরোধীতার অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নূতন শ্রমিক সরকার বিদ্যুৎ-সরবরাহ শিল্পকে জাতীয় শিল্পে পরিণত করার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট ভোগসত্বসম্পন্ন সমিতি ও অনির্দিষ্ট ভোগসত্ব-প্রাপ্ত সমিতি এবং মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যুৎ-শিল্প যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল জাতীয়করণের ফলে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং গত দশ মাস ধরিয়া তাহারা জাতীয় শিল্পরূপে কাজ করিতেছে। সমগ্রদেশ বর্তমানে কতকগুলি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত।

গ্রীডপদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্রিটিশ ইলেকট্রিসিটি অথরিটির দ্বারা এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ শিল্পক্ষেত্রে এই বিপুল পরিবর্তন বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব করিতে পারে যাহার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উন্নত আমেরিকা বিদ্যুৎ-শিল্পের জাতীয়করণ সমর্থন করে না। পল্লী অঞ্চলে লাইন লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে ঋণ দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ভারতীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ-শিল্পের উন্নয়ন প্রধানতঃ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ অতি অল্প এবং বণ্টন ও সরবরাহ পরিমিত। এই সকল ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য উল্লিখিত আইন সংকলিত হয়। এই আইন একটি প্রাদেশিক বিদ্যুৎ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু ইহা কোনও সরকারী বিভাগ হইবে না। সরকারী পর্যবেক্ষণের অধীন হইলেও ইহা সরকারী প্রভাব হইতে মুক্ত একটি সুসংবদ্ধ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

প্রাদেশিক বিদ্যুৎ-বোর্ড দুইভাগে কাজ করিবে। প্রথমতঃ, ইহাকে সুষ্ঠুভাবে ও লাভজনক উপায়ে বিদ্যুৎ-শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, সরবরাহ শিল্পের যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত বোর্ড নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অথবা বর্তমান কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া তাহাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরণপথ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। তত্ত্বাবধানাধীন কেন্দ্রগুলির মালিকদের নিকট হইতে বোর্ড বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে অথবা সকল কেন্দ্রে মালিক এবং অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পরিমাণমত বিদ্যুৎ বিক্রয় করিতে পারিবেন। সর্বাপেক্ষা উপযোগী কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব করিয়া এবং সরবরাহকে নিজের নির্দেশাধীন করিয়া প্রাদেশিক বোর্ড কেবলমাত্র নূতন অঞ্চলেই গ্রীড-পদ্ধতির প্রচলন সীমাবদ্ধ রাখিবেন না, পক্ষান্তরে পুরাতন

অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করিয়া তাহাদের অন্তর্গত অঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে পারিবেন। কোন প্রতিষ্ঠান আপন কর্তব্য সন্তোষজনকভাবে পালন করিলে কোনও বোর্ড তাহার আইনসঙ্গত অধিকার ও দায়িত্ব অপসারণ করিতে পারেন না।

যাহাতে বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ যুক্তিসঙ্গত লাভ এবং ক্রেতাগণ সুবিধা দরে বিদ্যুৎ পাইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে বোর্ড বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কিছু পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন মাত্র।

উপরোক্ত আইন বিদ্যুৎ-শিল্পকে জাতীয়শিল্পে পরিণত করিবার প্রয়াস না পাইয়া কেবলমাত্র পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

বোর্ড সরকারের নিকট প্রথম প্রথম আর্থিক সাহায্য পাইবেন। কিন্তু এই সাহায্য ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইবে এবং বোর্ড নির্দিষ্ট সময়ে সুদ সহ এই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

বোর্ডের যে লাভ হইবে তাহার কিয়দংশ প্রাদেশিক বিদ্যুৎ-শিল্প উন্নয়নের নিমিত্ত সঞ্চিত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ সুদ ও রাজস্বের খাতে ব্যয়িত হইবে। আইনে প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী কি পরিমাণ লভ্যাংশ সঞ্চিত হইবে ও কি পরিমাণ ব্যয়িত হইবে তাহা নির্ধারণ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

যদিও সরকারের বিদ্যুৎ-উন্নয়ন পরিচালক সমিতি পরিকল্পনা রচনায় এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন তথাপি একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক বিদ্যুৎসভা গঠনের আবশ্যকতা সরকারের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে উপরোক্ত বিদ্যুৎ-উন্নয়ন পরিচালক সমিতি ব্যারাকপুর বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গৌরীপুর, কৃষ্ণনগর ও বর্ধমানের দ্বারা পরিবেষ্টিত ত্রিভূজাকৃতি গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে "উত্তর কলিকাতা পল্লী-বিদ্যুতালোকন পরিকল্পনা" নামক একটি পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার জন্য কার্য আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা এবং খড়্গপুর-মেদিনীপুর প্রভৃতি অন্যান্য উন্নতিমূলক পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

নাইলন এতকাল বাজার দখল করেছিল। সম্প্রতি নাইলনের চেয়ে আরও বিভিন্ন ধরণের কাজের উপযোগী অরলোন নামে এক প্রকার অভিনব সিন্থেটিক ফাইবার উদ্ভাবিত হয়েছে। Buna N নামে কৃত্রিম রবারের উপাদান acrylonitrile নামক পদার্থ থেকে অরলোন তৈরী হচ্ছে।

সময়ের হিসাব

শ্রীঅবন্তিকা সাহা

সূর্য প্রত্যহ প্রভাতে পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। আকাশ-মার্গে সূর্যের এই গতি লক্ষ্য করিয়া কি প্রকারে নির্ভুলভাবে সময়ের হিসাব করা হয়, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আপাতদৃষ্টিতে সূর্য পৃথিবীকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিতেছে মনে হইলেও, প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীই আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে আবর্তন করিতেছে। ইহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির ফলে স্থির তারকাগুলি নভোগোলকে প্রতিদিন কতক-গুলি লঘুবৃত্তাকার* পথের সৃষ্টি করে। এই সকল লঘুবৃত্তের বিভিন্ন সমতলগুলি পরস্পর সমান্তরাল। নভোগোলকের যে ব্যাস এই সকল সমান্তরাল সমতলের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত তাহা নভো-গোলককে যে দুই বিন্দুতে ছেদ করে, তাহা তাহাদের নভঃস্থ মেরুবিন্দু। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে দিনে একবার আবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও বৎসরে একবার সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। ইহাই পৃথিবীর বার্ষিক গতি। পৃথিবীর এই দুইপ্রকার গতি থাকার ফলে নভো-গোলকে সূর্যের আপাতগতিও দুইপ্রকার। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে, সূর্য স্থির-তারকা-গুলির ন্যায় প্রত্যহ পূর্ব হইতে পশ্চিমে একবার ঘুরিয়া আসে এবং পৃথিবীর বার্ষিক-গতির ফলে স্থির তারকাসমূহের মধ্য দিয়া প্রত্যহ পশ্চিম হইতে পূর্বে কিছু কিছু সরিয়া যায় এবং এক বৎসর পরে আবার পূর্বেকার অবস্থানে ফিরিয়া আসে। স্থির তারকাসমূহের মধ্যে সূর্যের এই আপাত বার্ষিক পথের নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা ইলিপ্‌টিক্। ক্রান্তিবৃত্ত নভোগোলকস্থিত একটি গুরুবৃত্ত। নভোগোলকস্থিত যে গুরুবৃত্তের সমতল নভঃস্থ মেরুবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত তাহা নভঃস্থ-নিরক্ষবৃত্ত নামে অভিহিত। নভোগোলকস্থিত যে গুরুবৃত্ত নভঃস্থ মেরুবিন্দু ও কোন স্থানের দর্শকের ঠিক মস্তকোপরি নভঃস্থ বিন্দু ভেদ করিয়া যায় তাহাকে সেই স্থানের মাধ্যন্দিন রেখা বলা হয়।

পৃথিবী যে পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা একটি প্রায়বৃত্ত বা ইলিপস্। পৃথিবী এই প্রায়-বৃত্তাকার কক্ষের একটি কিরণ-কেন্দ্রে অবস্থান করে। কিরণ-কেন্দ্র হইতে প্রায়বৃত্তের বিন্দুগুলি সমান দূরে অবস্থিত নহে। সেইজন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী সূর্য হইতে বিভিন্ন দূরে অবস্থিত থাকে। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যখন যত বেশী হয় পৃথিবীর বার্ষিক গতিবেগ অর্থাৎ সূর্যের আপাত বার্ষিক গতিবেগ তখন তত কম হয়। সুতরাং ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া সূর্যের বার্ষিক গতিবেগ সর্বদা সমান থাকে না।

আপাত সৌরসময়

সূর্যের আপাত আহ্নিক গতির দ্বারাই দিবা ও রাত্রি নিরূপিত হয়। সেইজন্য মনে হয়, সূর্যের আপাত আহ্নিক গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সময় বা আপাত সৌরসময়ই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার

* কোন গোলকস্থিত যে বৃত্তের সমতল ঐ গোলকের কেন্দ্রবিন্দু দিয়া অতিক্রম করে না, তাহাকে ঐ গোলকের বৃত্ত বলা হয় এবং কোন গোলকের কেন্দ্রবিন্দু দিয়া অতিক্রান্ত কোন সমতল ঐ গোলককে যে বৃত্তে ছেদ করে তাহাকে ঐ গোলকের গুরুবৃত্ত বলা হয়।

করা সবচেয়ে সুবিধাজনক হইবে। কিন্তু সূর্যের আপাত সৌরসময় বা সূর্য-ঘড়ির সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নহে।

মধ্যক সৌরসময়

কাজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক কাল্পনিক সূর্যের অবতারণা করিয়া আপাত সৌরসময় হইতে বিশেষ পৃথক নহে এইরূপ এক বিজ্ঞানসম্মত সময়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে করা হইয়াছে যে, এই কাল্পনিক সূর্য নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া সর্বদা সমান বেগে সরিয়া এক বৎসর পরে আবার পূর্বেকার অবস্থানে ফিরিয়া আসে। ফলে কাল্পনিক সূর্যের আহ্নিক গতিবেগও সর্বদা সমান। ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া সূর্যের সারা বৎসরের অসম গতিবেগের গড়কেই কাল্পনিক সূর্যের বার্ষিক গতিবেগ মনে করা হইয়াছে। বর্তমানে যান্ত্রিক ঘড়িতে আমরা যে সময়ের নির্দেশ পাই তাহা এই কাল্পনিক সূর্যের আহ্নিক গতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই কাল্পনিক সূর্যকে মধ্যক সূর্য এবং কাল্পনিক মধ্যক সৌরসময় বলেন।

বৎসরের যে কোন সময়ে মধ্যক সৌরসময় ও আপাত সৌরসময়ের অন্তরকে সময়ের সমীকরণ বলা হয়।

আপাত সৌরসময় ও মধ্যক সৌরসময়ের পার্থক্য

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে কখন কতটা আগাইয়া বা পিছাইয়া থাকে, এখন সেই সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

আপাত সৌরসময় হইতে মধ্যক সৌরসময়ের পার্থক্য হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া আপাত বা প্রকৃত সূর্য সর্বদা সমান বেগে চলে না। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তিবৃত্ত নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের সহিত ২৩°২৮′ কোণে নত।

উপরোক্ত কারণ দুইটির ফলেই প্রকৃত সূর্যের আপাত আহ্নিক গতিবেগ সর্বদা সমান থাকে না।

কেবলমাত্র প্রথম কারণটি বর্তমান থাকিলে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে কখন কতটা পৃথক হয়, তাহাই আমরা প্রথমে নির্ণয় করিব।

৩১শে ডিসেম্বর পৃথিবী প্রকৃত সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে। সেইজন্য ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া প্রকৃত সূর্যের গতিবেগ এই সময় সবচেয়ে বেশী হয়। সুতরাং এই সময়ে ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া প্রকৃত সূর্য যে বেগে পশ্চিম হইতে পূর্বে ধাবিত হয় তাহা মধ্যক সূর্যের বার্ষিক গতিবেগ অপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর আহ্নিক গতিও পশ্চিম হইতে পূর্বে। সুতরাং কেবলমাত্র প্রথম কারণটি বর্তমান থাকিলে এই সময় মধ্যক সূর্য্য প্রতিদিন প্রকৃত সূর্যের পূর্বেই মাধ্যন্দিন রেখা অতিক্রম করিবে। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যদি আপাত সৌরসময় ও মধ্যক সৌরসময় উভয়কে যথাক্রমে সূর্য-ঘড়ি ও যান্ত্রিক ঘড়ির সাহায্যে পরিমাপ করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সূর্য ঘড়ি যান্ত্রিক ঘড়ি অপেক্ষা মন্থরগতিতে চলিতেছে এবং পরদিন সূর্য-ঘড়িতে ১২টা বাজিবার পূর্বেই যান্ত্রিক ঘড়িতে ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। তিন মাস পরে মার্চ মাসের শেষে প্রকৃত সূর্যের গতিবেগ উহার গড় গতিবেগের সমান না হওয়া পর্যন্ত মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে ক্রমেই বেশী আগাইয়া যাইতে থাকিবে। মার্চ মাসের শেষে যান্ত্রিক ঘড়ির সময়, সূর্য-ঘড়ির সময় হইতে প্রায় ৭ মিনিট আগাইয়া থাকিবে। মার্চ মাসের পর হইতে প্রকৃত সূর্যের গতিবেগ উহার গড় গতিবেগ হইতে ক্রমেই অল্পতর হইতে থাকে। সুতরাং এখন আপাত বা প্রকৃত সৌরদিবস (কোন স্থানের মাধ্যন্দিন রেখার উপর দিয়া প্রকৃত সূর্যের পর পর দুইবার অতিক্রমের মধ্যবর্তী সময়) মধ্যক সৌরদিবস (কোন স্থানের মাধ্যন্দিন রেখার উপর দিয়া মধ্যক সূর্যের পর পর দুইবার অতিক্রমের মধ্যবর্তী সময়) হইতে ক্রমেই হ্রস্বতর হইতে থাকিবে।

ফলে আপাত সৌরসময় ও মধ্যক সৌরসময়ের পার্থক্য ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং তিনমাস পরে ১লা জুলাই এই পার্থক্য একেবারেই থাকিবে না। ১লা জুলাই পৃথিবী প্রকৃত সূর্য হইতে সবচেয়ে দূরে থাকে। সুতরাং এই সময়ে ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া প্রকৃত সূর্যের গতিবেগ সবচেয়ে কম। ১লা জুলাইএর পরে, প্রকৃত সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যতই হ্রাস পাইতে থাকে, প্রকৃত সূর্য্যের গতিবেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে ফলেই মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে কিছু পৃথক হইত। এই পার্থক্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কখন কিরূপ হইত তাহাই এখন স্থির করা যাউক।

প্রথম চিত্রে, গ এবং ল, নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয় প্রকৃত সূর্য ২১শে মার্চ গ বিন্দুতে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর ল বিন্দুতে অবস্থান করে। এখন মনে করা যাউক, প্রকৃত সূর্য ক এবং মধ্যক সূর্য খ একসঙ্গে গ বিন্দু হইতে
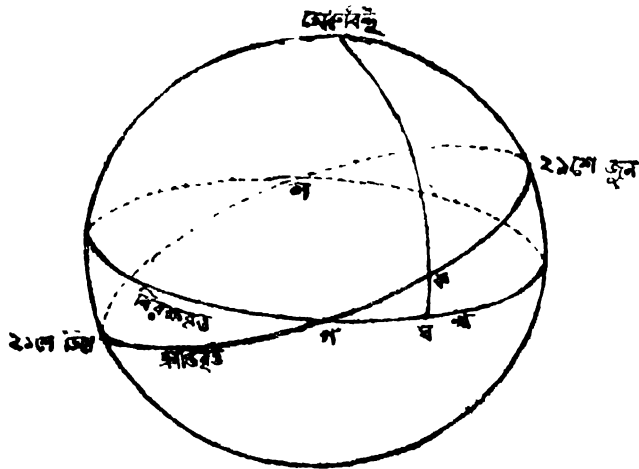
প্রথম চিত্র

যান্ত্রিক ঘড়ির সময় আপাত সৌরসময় হইতে প্রায় ৭ মিনিট পিছনে থাকিবে। ইহার পর এই পার্থক্য আবার হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যক সৌরসময় পুনর্বার আপাত সৌরসময়ের সমান হইবে।

নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া মধ্যক সূর্য্য যেমন সর্বদা সমান বেগে চলে, ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া প্রকৃত সূর্যের গতিবেগও যদি তেমনি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকিত ও মধ্যক সূর্যের গতিবেগের সমান হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র ক্রান্তিবৃত্ত নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের সহিত ২৩°২৮′ কোণে নত থাকার পূর্বদিকে যাত্রা করিল। প্রকৃত সূর্য ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া এবং মধ্যক নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। উভয়ের গতিবেগ সমান, সুতরাং উহারা আবার ল বিন্দুতে মিলিত হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র দ্বিতীয় কারণটি বর্তমান থাকিলে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে কিছুমাত্র পৃথক হইবে না।

প্রকৃত সূর্য ২১শে জুন উত্তর অয়নান্ত বিন্দুতে এবং ২১শে ডিসেম্বর দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দুতে অবস্থান করে। উভয়দিনই নভঃস্থ মেরুবিন্দু ও

প্রকৃত সূর্যের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অঙ্কিত গুরুবৃত্ত-চাপ মধ্যক সূর্যের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়। সুতরাং উভয় দিনেই প্রকৃত সূর্য ও মধ্যক সূর্য একসঙ্গে মাধ্যন্দিন রেখা অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ ২১শে জুন ও ২১শে ডিসেম্বর মধ্যক সৌরসময় ও আপাত সৌরসময়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিবে না।

এখন মনে করা যাউক, প্রকৃত সূর্য যখন ক বিন্দুতে থাকে, মধ্যক সূর্য তখন খ বিন্দুতে থাকে। (প্রথম চিত্র) গক=গখ। নভঃস্থ মেরু-বিন্দু ও ক বিন্দুর মধ্য দিয়া অঙ্কিত গুরুবৃত্তচাপ নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের সহিত ঘ বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এখন গকঘ একটি গোলকীয় সমকোণী ত্রিভুজ এবং গক উহার অতিভুজ। অতএব গঘ, গক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কাজেই গঘ, গখ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। অতএব ঘ বিন্দু খ বিন্দুর পশ্চিমে অবস্থিত। অর্থাৎ ২১শে মার্চের পরে কিছুদিন প্রকৃত সূর্য মধ্যক সূর্যের পশ্চিমে থাকিবে। সুতরাং ২১শে মার্চের পর হইতে প্রকৃত সূর্য পূর্বেই মাধ্যন্দিন রেখা অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ সূর্য-ঘড়ি যান্ত্রিক ঘড়ি হইতে দ্রুত চলিবে। ২১শে জুন মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকিবে। মে মাসের প্রথম ভাগে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে সবচেয়ে বেশী পিছনে থাকিবে। তখন এই দুই সময়ের পার্থক্যের মান প্রায় ১০ মিনিট হইবে। অনুরূপভাবে, ২১শে জুন ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে আগাইয়া থাকিবে এবং আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে এই পার্থক্য ইহার চরম মান ১০ মিনিট প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র দ্বিতীয় কারণটি বর্তমান থাকিলে, ২১শে মার্চ, ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর বৎসরে এই চারিদিন মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান হইবে এবং ফেব্রুয়ারি, মে, আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে যথাক্রমে ১০ মিঃ বেশী, ১০মিঃ কম, ১০মিঃ বেশী ও ১০মিঃ কম থাকিবে।

প্রথম কারণের ফলে ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জুলাই মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান হয় এবং মার্চ ও সেপ্টেম্বরের শেষে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌর সময় হইতে যথাক্রমে ৭ মিঃ বেশী ও ৭মিঃ কম থাকে।

সুতরাং দুইটি কারণই একত্রে বর্তমান থাকিলে, ১৬ই এপ্রিল, ১৫ই জুন, ১লা সেপ্টেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় ও আপাত সৌরসময়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিবে না। ১১ই ফেব্রুয়ারি এই পার্থক্যের মান ১৪মিঃ ২৮সেঃ এবং ৩রা নভেম্বর ১৬মিঃ ২১সেঃ হইবে। কেবলমাত্র প্রথম কারণটি অথবা কেবলমাত্র দ্বিতীয় কারণটি বর্তমান থাকিবে। বৎসরের বিভিন্ন দিনে মধ্যক সৌরসময়ে আপাত সৌরসময় হইতে কখন কতটা বেশী বা কম থাকে এবং কোন্ কোন্
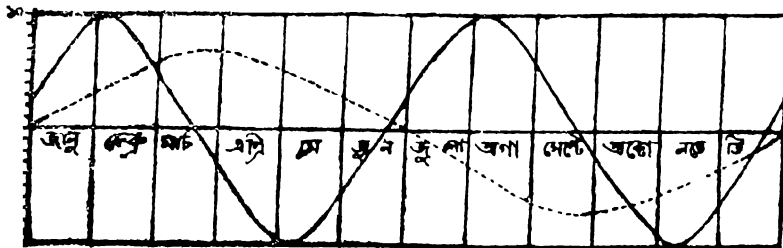
দ্বিতীয় চিত্র

দিনে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান হয় তাহা দ্বিতীয় চিত্রে অঙ্কিত লেখ দুইটি হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ চিত্রে বিচ্ছিন্ন দাগের অঙ্কিত বক্ররেখাটি ও অবিচ্ছিন্ন বক্র-রেখাটি প্রথম ও দ্বিতীয় কারণের ফলাফলের লেখ।

দুইটি কারণই একত্রে বর্তমান থাকিলে, বৎসরের বিভিন্ন দিবসে মধ্যক সৌরসময় আপাত

তৃতীয় চিত্র

সৌরসময় হইতে কখন কতটা পৃথক হয়, তাহা তৃতীয় চিত্রে লেখ অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। লেখটির শূন্য-লাইনের উপরে অবস্থিত অংশগুলি আপাত সৌরসময় হইতে মধ্যক সৌরসময় কতটা বেশী তাহা বুঝাইতেছে এবং লেখটির যে সকল অংশ শূন্য-লাইনের নীচে অবস্থিত, সেগুলির দ্বারা আপাত সৌরসময় হইতে মধ্যক সৌরসময় কতটা কম তাহা সূচিত হইতেছে। যে চারিদিন লেখটি শূন্য-লাইনকে ছেদ করিয়াছে, সেই চারিদিন মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান।

মানমন্দিরে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে কোন মুহূর্তে সূর্য আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে সেই মুহূর্তে আপাত সৌরসময় নির্ধারণ করা যায়। ১৬ই এপ্রিল, ১৫ই জুন, ১লা সেপ্টেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর—এই চারদিন ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য দিনে যে কোন মুহূর্তে মধ্যক সৌরসময় কত তাহা হিসাব করিতে হইলে সেই মুহূর্তের আপাত সৌরসময়ের সহিত সেই মুহূর্তের সময়ের সমীকরণের মান যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে।

বলুন তো!

পৃথিবী ছাড়িয়ে গ্রহ, উপগ্রহে বসতি স্থাপন করার কল্পনা হয়তো বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলেছে। আণবিক শক্তি, রকেট, রেডার যন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবনা এবং নিয়ন্ত্রণের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী ছাড়িয়েও মানুষের আনাগোনা সম্ভব হয়তো হবে।

ধরুন, আপনি এইরকম মহাকাশগামী কোন একটি বিমানের যাত্রী। নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হলো, সেইরকম অবস্থায় পড়লে কোথায় আছেন আপনি তা আন্দাজ করে নিতে পারবেন তো? চেষ্টা করে দেখুন না—সম্পূর্ণ উত্তর করতে পারলে অন্ততঃ গোলকধাঁধার মধ্যে নিজের পথ খুঁজে নেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন। বলুন তো আপনি কোথায়?

(১) এইমাত্র আপনি গ্রহটির যে অংশে পদার্পণ করলেন সেই দিকটিই ঠাণ্ডা। গ্রহের অন্যদিকটি প্রচণ্ড গরম, কারণ সেদিকটা সর্বদাই সূর্যের দিকে মুখ করে আছে এবং সূর্য রয়েছে খুবই কাছে।

(২) ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে আপনি শূন্যপথে ছুটে এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী ছাড়ার পর এখনও দশঘণ্টা পূর্ণ হয়নি। আপনি এসে অবতরণ করেছেন বায়ুহীন পার্বত্যদেশের মাঝখানে।

(৩) সূর্য ও মঙ্গলগ্রহ থেকে আপনি ক্রমশ ধীর গতিতে দূরে চলে যাচ্ছেন। সেই সময় আপনার পথপার্শ্বে পড়েছে একটি শিলাময় খণ্ড, তার প্রস্থ হবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

(৪) ন'টি চন্দ্রের মধ্যে চারটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং আকাশের বুকে নীহারিকার মত দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ বলয়।

(৫) চারদিকের আকাশ ঘোর কালো। পাতলা বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল তারকাদ্যুতি দেখা যাচ্ছে। বিমান থেকে আপনি অক্সিজেনবাহী গুরুভার পোষাক পরে যখন নামলেন, তখন কিন্তু ভার লাগছে না মোটেই; স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছেন আপনি। ঠিক মাথার ওপর রয়েছে ছোট্ট একটি চাঁদ এবং পশ্চিমাকাশে উদিত হচ্ছে আর একটি চন্দ্র।

(৬) রেডার যন্ত্রের সহায়তায় সাবধানে দিক-নির্ণয় করে আপনি নাবছেন উষ্ণ, শুষ্ক ধূলিময় বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে। মহাকর্ষের টান এখানে পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে একটু কম।

(৭) আপনি চলে এসেছেন সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী গ্রহে। সূর্যকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু মাত্র অত্যুজ্জ্বল তারকার মত।

(৮) শূন্যপথে ভ্রমণ আজকাল অত্যন্ত সহজ। কিন্তু আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই গ্রহের মেঘাবৃত অন্তরে অভিযান করতে দুঃসাহসী হলেন। মহাকর্ষের টান এখানে এত প্রবল যে, কোন বিমানই যে এর আকর্ষণ ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়বার মত শক্তি রাখে তা মনে হয় না।

(৯) চন্দ্রমণ্ডলীর চারটির মধ্যে একটিতে আপনি পদার্পণ করেছেন।

(১০) আপনার বিমান এসে ধ্বসে পড়েছে এই জায়গায়। চতুর্দিকে ধূধূ করছে তপ্ত বালুকা-রাশি—কোথাও চিহ্ন নেই এক ফোঁটা জলের। ওপরে আকাশ নির্মেঘ, জ্বলন্ত সূর্যের অগ্নিকিরণে চারিদিক যেন পুড়ে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় আপনার বুক ফেটে যাবার জোগাড়। চারিদিকে তপ্ত হাওয়ায় ঝড় উঠেছে।

('বলুনতো' শীর্ষক প্রশ্নমালার উত্তর)

(১) বুধগ্রহ : সূর্যের সবচেয়ে নিকটে এই গ্রহের অবস্থান। এর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি সমান হওয়ায় একটা দিকই সর্বদা সূর্যের সামনে থেকে যায়, ঠিক আমাদের চাঁদের মত

২) আমাদের চাঁদ ; প্রায় ২৪০,০০০ মাইল দূরে।

(৩) আপনি একটি গ্রহাণু বা অ্যাস্টারয়েডের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে এইরকম বহু গ্রহাণু কক্ষপথে ভ্রমণ করে থাকে।

(৪) শনি গ্রহের বলয় ছাড়া ন'টি চাঁদ আছে।

(৫) মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল ক্ষীণ, মহাকর্ষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এর দুটি চাঁদ আছে—নিকটের চন্দ্রটি গ্রহের চারিদিকে সাড়ে সাত ঘণ্টায় ঘুরে আসে। মঙ্গল গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশেরও কম এই সময়। সেই জন্যে এই চাঁদটি পশ্চিমে উদিত হয়।

(৬) জ্যোতির্বিদেরা স্থির করেছেন যে, এই গ্রহে অক্সিজেন বা জল কিছুই নেই। পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের সমীপবর্তী হওয়ায় শুক্রের উষ্ণতা বেশী। আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান।

(৭) প্লুটো। পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গুণ এর দূরত্ব।

(৮) বৃহস্পতি—গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে বৃহত্তম।

(৯) ইউরেনাস গ্রহে চন্দ্রের সংখ্যা চার। আপনি এর একটিতে এসে নেবেছেন।

(১০) সাহারা বা পৃথিবীর অন্য কোনো মরুভূমি। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণোপযোগী বায়ুমণ্ডল আছে বলে জানা নেই।

হেনরী পয়েঁকার

শ্রীআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে গণিত এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছু দ্রুত। বিশেষ করে গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এর আবিষ্কৃত তত্ত্বের পরিমাণ বিপুল আকার ধারণ করল। গণিতজ্ঞ মহলে ধারণা জন্মাল যে, কোন এক-জনের পক্ষে অঙ্কশাস্ত্রের সকল দিক আয়ত্ত করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তাঁদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করতে এমনি সময় জন্ম নিলেন হেনরী পয়েঁকার। তিনি যে কেবল সকল দিক আয়ত্ত করলেন তাই নয়, গণিতের সর্ব ক্ষেত্রেই দিয়ে গেলেন তাঁর অপূর্ব মেধার চমকপ্রদ আবিষ্কার। সাধে কি এ-যুগের গণিতজ্ঞ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল পয়েঁকারের নামে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন!

হেনরী পয়েঁকারের জন্ম হয় ফ্রান্সের নান্সি নামে এক জায়গায়, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। মায়ের চেষ্টায় এবং যত্নে পয়েঁকারের শিশুমনের গঠন হয়ে ওঠে অতি চমৎকার; আর তার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও উৎকর্ষ লাভ করে যথেষ্ট। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই পয়েঁকারের শরীর ছিল বড় রোগা। পাঁচ বছর বয়সে তিনি একবার সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং নয় মাস শয্যাশায়ী থাকেন। এর ফলে তাঁর স্বভাবটি হয়ে দাঁড়াল একটু ভীতু আর লাজুক। বেশী দৌড়ঝাঁপের খেলাতে বালক পয়েঁকার তাঁর রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে যোগদান করতে পারতেন না।

তাই তাঁর সমস্ত শক্তি স্বাভাবিকভাবেই নিয়োজিত হলো মস্তিষ্কের কাজে।

ছোটবেলায় তাঁর প্রধান স্পৃহার বস্তু হয়ে দাঁড়াল বই-পড়া। একটি বই হাতে এলে তিনি ঝড়ের গতিতে শেষ করে ফেলতেন এবং এমনিভাবে আয়ত্ত করতেন যে, যখন তখন কোন একটি বিষয় সে বইয়ের কোন্ পাতায় কোন্ লাইনে আছে তা বলে দিতে পারতেন। এদিকে আবার বিনয়ের কমতি ছিল না। বড় হয়েও যখনই স্মৃতিশক্তির কথা উঠত, তিনি একটুও ইতস্ততঃ না করে বলতেন তাঁর স্মৃতিশক্তিটা নিতান্তই খারাপ। আর একটা ব্যাপার—ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই তিনি অধ্যাপকদের কাছ থেকে গণিত শিক্ষা করতেন, বোর্ডে দেখে দেখে নয়—কানে শুনে শুনে। তার কারণও ছিল—ল্যাবরেটরীর কাজে তিনি মোটেই দক্ষ ছিলেন না। অনেকে বলেন, যদি গবেষণার কাজে তাঁর হাত কিছু পাকা হতো তাহলে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত গাণিতিক তত্ত্বগুলো পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রমাণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নিখুঁৎ করে যেতে পারতেন।

স্কুলে তাঁর অঙ্ক যে খুব প্রিয় ছিল তা নয়, ইতিহাসের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যেত। আর ছিল তাঁর বার্ণার্ড শ'য়ের মত বিশ্বের যত জীবজন্তুর ওপর অদ্ভুত ভালবাসা। একবার বন্দুক ছোঁড়া শিখতে গিয়ে তাঁর হাতে একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হয়, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত-ভাবেই। এ দুর্ঘটনায় তিনি এত অভিভূত হন যে, এর পরে কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সময় ছাড়া তিনি আর আগ্নেয়াস্ত্র স্পর্শও করেন নি। স্কুলের দৈনন্দিন পড়া তিনি অতি দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলতেন। তাই উদ্বৃত্ত প্রচুর সময় তিনি নিজের খেয়ালখুশীমত কাটাতেন কিংবা মাকে গৃহকার্যে সাহায্য করতেন। বালক পয়েঁকার তাঁর চিন্তার আনন্দে এমনই বিভোর থাকতেন যে, খাওয়াদাওয়ার কথাও ভুল হয়ে যেত এবং তাঁর প্রায় কোন দিনই মনে থাকত না যে, সকাল বিকালের জলখাবারটা খাওয়া হয়েছে কি না।

পনেরো বছর বয়স থেকেই পয়েঁকারের অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি আসে দুর্বার আকর্ষণ। তখন থেকে চলেফিরে বেড়াবার সময়েই তিনি অঙ্কের সমাধান করতেন এবং এভাবে সমস্ত সমাধান হয়ে গেলে কাগজে লিখে রাখতেন। এরকম চলে বেড়াতে বেড়াতে অঙ্ক কষে ফেলার অভ্যাস তাঁর বড় হয়েও ছিল।

তাঁর বয়স যখন ষোল তখন (১৮৭০ খ্রীঃ) লাগল ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ। তাদের গ্রামের ওপর দিয়েও জার্মান আক্রমণের প্রবাহ বয়ে গেল। পয়েঁকার তাঁর ডাক্তার পিতার সঙ্গে রোগীর পরিচর্যা করে ফিরতে লাগলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মনে কি ছাপ ফেলেছিল তা কে জানে? যাহোক, এ ফাঁকে পয়েঁকার জার্মান ভাষাটা ভাল করে শিখে ফেল্লেন। এতে সুবিধাই হলো। দেখলেন জার্মান সৈন্যরা নিষ্ঠুর বটে; কিন্তু ওদেশের অঙ্কবিদরা তো ওরকম নয়! বাস্তবিক তাঁদের আবিষ্কারের জন্যে তাঁদের শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

পয়েঁকারের প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হয়। অঙ্কে তিনি কোনরকমে পাশ করেন। এতে কর্তৃপক্ষ অবাক হয়ে যান। অবশ্য এর পরের পরীক্ষায় তিনি অনায়াসে প্রথম হলেন। অন্য ছেলেরা অবাক হয়ে যায় এই ভেবে যে, তিনি কি করে ক্লাসে একদিনের জন্যেও নোট না নিয়ে প্রথম হন। তাকে ঠকাবার জন্যে ওরা ভেবেচিন্তে অনেক সমস্যা খাড়া করত। কিন্তু তাদের মুখের ওপর পয়েঁকারের চোখা চোখা উত্তর আসতে একটুও দেরী হতো না।

এরপর তিনি ঢুকলেন ইকোল পলিটেকনিকে। এখানেও দেখা গেল তিনি গণিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু খেলাধুলা, ব্যায়াম বা কুচকাওয়াজে তিনি ছিলেন একেবারেই আনাড়ী। কিন্তু তবু তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য ক্লাসের সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। অঙ্কনের কাজে তাঁর হাত ছিল না। একটি জিনিস আঁকতে গিয়ে তিনি সেটাকে কি যে দাঁড় করাতেন তা বোঝাই দুর্ঘট হয়ে পড়ত। এ নিয়ে ক্লাসে ছেলেরা খুব হাসাহাসি করত। এই অক্ষমতার জন্যে জ্যামিতিতে মাঝে মাঝে মুস্কিলে পড়তে হতো

একুশ বছর বয়সে তিনি পলিটেকনিক ছেড়ে ঢুকলেন খনির কাজ শিখতে। এ কাজ শিখতে শিখতে তিনি যথেষ্ট অবসর পেতেন অঙ্ক কষবার। এবার তাঁর প্রতিভা নিজের পথে অগ্রসর হলো। তিনি ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশনের এক সাধারণ সমস্যার সমাধানে লেগে গেলেন এবং তিন বছর পরে প্যারিসের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের কাগজপত্র। যদিও খনিবিদ্যায় এঞ্জিনিয়ারী করবার তাঁর খুব উৎসাহ ছিল না তবুও কাজে যে তাঁর সাহস আছে তা বোঝা গিয়েছিল। কারণ একবার খনিতে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হওয়ায় ১৬ জন লোক মারা যায়। পয়েঁকার তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধারকার্যে যোগ দিয়েছিলেন।

তাঁর আবিষ্কারের কাগজপত্র দেখে পরীক্ষকের মনে জাগল বিস্ময়। কি সুন্দর অভিনব যুক্তিবত্তা! ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের কি চমৎকার সম্ভাবনা দেখা যায় তাঁর ঐ দুরূহ সমাধান থেকে; কিন্তু ভিতরের অল্পস্বল্প ভুলচুক যদি একটু শুধরে দেন পয়েঁকার! কিন্তু পয়েঁকারের প্রকৃতিই আলাদা; একবার তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে সে নিয়ে মাথা ঘামানো আর তিনি প্রয়োজন বোধ করতেন না। কেননা ততক্ষণে নতুন চিন্তা এসে তাঁর মন অধিকার করত। এভাবে তিনি তখন থেকেই রাশি রাশি চিন্তার জালে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন।

খনির কাজ তিনি ছেড়ে দিলেন এবং ১৮৭৯ খ্রীঃঅব্দে কায়েঁতে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। কেন না এপর্যন্ত তাঁর গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ থেকেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি ওই পদের উপযুক্ত। দু'বছর পরে তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন থেকেই পয়েঁকারের অসামান্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল। ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশনের ওপর তাঁর প্রাথমিক অনুসন্ধান দেখে মনে হয়, পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ গণিতের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল কারণ নিউটনের আমল থেকে দেখা গেছে, পদার্থ-বিজ্ঞানে ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশনের প্রয়োগ খুবই সুবিধাজনক। ওই অনুসন্ধানের ফলে তিনি বুঝতে পারলেন ইলিপ্টিক ফাংশানগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য আনা খুবই সম্ভব। তাই তিনি গড়ে তুললেন অটোমর্ফিক ফাংশান্স্ নামে এমন এক নতুন তত্ত্ব যার মধ্যে সব রকম ইলিপ্টিক ফাংশানেরই স্থান হতে পারে। পর পর কয়েকটি পেপারে তিনি এদের গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সৃষ্ট এই অটোমর্ফিক ফাংশান বিশুদ্ধ গণিতে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়।

শুধু যে গাণিতিক বিশ্লেষণ নিয়েই তিনি সময় কাটাচ্ছিলেন তা নয়। বীজগণিত, রাশিতত্ত্ব, গাণিতিক জ্যোতিবিদ্যাতেও তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। গশের বাইনারী কোয়াড্রাটিক ফর্মের তত্ত্বকে তিনি এক বিশেষ জ্যামিতিক রূপ দান করেন। এ-বিষয়ে তিনি যুক্তির চেয়ে সংজ্ঞাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশী। তাই যাঁরা সংজ্ঞার ভক্ত তারা তাঁর দেওয়া ঐ জ্যামিতিক রূপটি বিশেষ পছন্দ করেন। এসব কাজের জন্যে পয়েঁকারের খ্যাতি খুব বেড়ে গেল এবং তিনি অ্যাকাডেমিতে নির্বাচিত হলেন।

এরপর তিনি হানা দিলেন জ্যোতির্বিদ্যার রাজ্যে। নিউটনের পর অয়লার, লাগ্রাঞ্জ, লাপ্লাস সকলেই জ্যোতির্বিদ্যার জন্যে কাজ চালানো গোছের

গণিত খাড়া করেছিলেন। কিন্তু সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে না ছিল কোন সংহতি, না ছিল কোন সমন্বয়। এই অব্যবহৃত গণিতের বিপুল স্তূপ মন্থন করতে সুরু করলেন পয়েঁকার। তার মধ্য থেকে বেছে বার করলেন নিতান্ত মূল্যবান অস্ত্রগুলো। নিজের প্রতিভায় শানিয়ে সেগুলোকে করে তুললেন কার্যকরী। তারপর বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যাকে আক্রমণ করলেন চমৎকার অভিনব কৌশলে। এ কাজটি সম্ভব হয়নি পয়েঁকার ছাড়া অন্য কারুর দ্বারা।

তখনকার দিনে (১৮৮৯ খ্রীঃ) যে কোন সংখ্যক বস্তুর সমস্যা (problem of n-bodies) ছিল ভীষণ সমস্যা। নিউটন দুই বস্তুর সমস্যাটি সমাধান করেছিলেন—যা হচ্ছে বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম। এ নিয়মে জানা যায়, পৃথিবীর যে কোন দুই বস্তু পারস্পরিক টানাটানির মধ্যে কোন্ সময়ে কোথায় থাকবে।

কিন্তু যদি বস্তুর সংখ্যা দুই না হয়ে যে কোন সংখ্যক হয় তবে তারা পরস্পর টানাটানি করেও ঠিক কোন্ সময় কোথায় থাকবে তার নিয়মটা বার করা যায় কি করে? আর যদি সেটুকু বের করা যায় তবে সেই নিয়ম দ্বারা এই বিশ্বের নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি বস্তুগুলো পারস্পরিক টানাটানির ফলে ঠিক কোন সময় কোথায় থাকবে তা জানা যাবে। সমস্যাটি খুবই জটিল; কেননা নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতির বস্তু পরিমাণ তো আর সব সময়ে সমান থাকবে না! তেজ, তাপ ইত্যাদি ক্ষয় করতে করতে এদের বস্তুও কমে যাবে। যাহোক পয়েঁকার যে কোন সংখ্যক না করে তিন সংখ্যক বস্তুর একটি সমাধান খাড়া করেছিলেন। এ কাজটিও যথেষ্ট মূল্যবান। কারণ, এথেকে সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী এই তিনটি বস্তুর বিষয় সমাধানে অর্থাৎ এখন থেকে হাজার কি লক্ষ বছর পরে এরা কে কোথায় থাকবে তার উত্তর জানা গেছে। এই কাজের জন্যে সুইডেনের রাজা তাঁকে ২৫০০ ক্রাউন এবং একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট উপাধি দিলেন নাইট্। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদানের বিপুলত্ব এত বেশী যে, সব কথা বলা সম্ভব নয়।

আধুনিক গাণিতিক পদার্থ-বিদ্যায় তিনি বেশী কাজ করে যেতে পারেন নি। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত আবিষ্কার নিয়েই তিনি মেতে ছিলেন এবং তাঁর প্রায় জীবনসায়াহ্নে সূত্রপাত হলো—প্ল্যাঙ্ক এবং আইনষ্টাইনীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে যখনই যে বড় আবিষ্কার হয়েছে তিনি তার বিশুদ্ধ গণিত পরীক্ষা করেছেন। বেতারের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গণিত পরীক্ষা সমূহ আয়ত্ত করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই যখন আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাতত্ত্ব প্রকাশিত হলো তখন সকলেই একে উপহাস করেছিল। একমাত্র তিনিই তখন জগতকে শুনিয়েছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানে কি আশ্চর্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম মতবাদকেও তিনি সমান সম্মান দেখিয়েছিলেন।

পরিশেষে পয়েঁকারের দার্শনিক চিন্তাধারার কথাও একটু বলতে হয়। কেননা এ বিষয়ে তিনি শেষ বয়সে অনেক কথা লিখে গেছেন। তাঁর মতে গাণিতিক আবিষ্কারের জন্যে যুক্তিটাই যে খুব বড় তা নয়। প্রথম মনের চেতন স্তরে কাজ আরম্ভ হয়, তারপর অবচেতন স্তরে সেই কাজ অতি তীব্রভাবে চলতে থাকে। যে কোন সমস্যা নিয়ে ঐ অবচেতন স্তরে যখন কাজের তীব্রতা খুব বৃদ্ধি পায় তখনই সহসা সে বিষয়ে আলোকপাত হয় এবং প্রকৃত সমাধান হয় তখনই। যুক্তিতর্ক করে প্রকৃত গাণিতিক রূপ দেওয়া হয় ওই আলোকপাতের পর। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখে গেছেন।

যাহোক, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই

পয়েঁকারের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল এবং ফ্রান্সে সকলে তাঁকে ভাবতো যেন গণিতের ডিক্সনারি। তাঁর জীবনের শেষ চার বছর ছাড়া বাকীটা বেশ সুখে-শান্তিতে কেটেছিল। বিশ্বের বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে খুব সম্মান দেখানো হয় এবং বাহান্ন বছর বয়সে তিনি ফরাসী অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এত সম্মান পেয়েও তিনি কখনও অহঙ্কারী হন নি। তিনি চিরজীবনই ছিলেন বিনয়ী। তাঁর যুগে ছিলেন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এটা যদিও তিনি জানতেন তবু সব সময় স্বীকার করতেন—জানার তাঁর তখনও অনেক বাকী। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুব সুখের এবং তাঁর তিন কন্যা ও এক পুত্র ছিল। সিম্ফনিক সঙ্গীতে তাঁর ছিল দারুণ অনুরাগ।

১৯০৮ খ্রীঃ অসুস্থতার জন্যেই তিনি আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন নি। ১৯১২ খ্রীঃ ১৭ই জুলাই তিনি হঠাৎ মারা যান। গণিত চর্চাই ছিল তাঁর জীবনের প্রিয় জিনিস। সর্বপ্রকার গণিতের তাঁর পাঁচ-শ'টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আছে। মাত্র উনষাট বছরের জীবনে এ অভূতপূর্ব। এছাড়াও আছে তাঁর দার্শনিক লেখা। তিনি বলেছিলেন, শিল্পীর যেমন সৃষ্টি করাতেই আনন্দ বিজ্ঞানীরও ঠিক তেমনি আনন্দ হয় তাঁর নিজের কাজে এবং এ দুই আনন্দ যে একই প্রকারের তা তিনি নিজে অক্ষরে অক্ষরে বুঝেছিলেন।

দেশ-বিদেশের মৌমাছি

বিমল রাহা

সফলতার সহিত ও সুচারুরূপে মৌমাছি পালন করিতে হইলে দেশ ও বিদেশের মৌমাছির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, কোন্ বিশেষ মৌমাছি আধুনিক চাকবাসে পালনের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী বা কোন্ মৌমাছির দ্বারা চাকমধু উৎকৃষ্টতম হয় বা কোন্ মৌমাছি মধুর চাক সুদৃশ্য, শ্বেত আবরণী দ্বারা আবৃত করে ও কোন্ মৌমাছি পালনের দ্বারা বেশী মধু পাওয়া যাইতে পারে ইত্যাদি তথ্য মৌমাছি পালনের পক্ষে অপরিহার্য।

আমদের দেশেও বিভিন্ন রকমের মৌমাছি দেখা যায়। স্থানভেদে রং ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য তো আছেই, উপরন্তু আকৃতিগত বিভিন্নতাও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্তও এবিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। অথচ আমাদের দেশে মৌমাছি-পালনে দেশী অথবা বিদেশী মৌমাছির মধ্যে কোন্ প্রকার মৌমাছি ব্যবহার করিলে সর্বাধিক ফললাভ করিতে পারা যায় ও সর্বসাধারণের পক্ষে মৌমাছি-পালন সহজ ও সুলভ হয় তাহা বহুলাংশে ইহারই উপর নির্ভর করে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশের মৌমাছির মধ্যে পার্বত্য ও সমতলীয় এই দুইটি বিভাগ সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু রং, আচরণ ও আকারগত পার্থক্য এই দুইয়ের মধ্যেও কম নহে। পার্বত্য মৌমাছির চাকে কর্মী-কক্ষের সংখ্যা প্রতি রৈখিক ইঞ্চিতে ৫½ হইতে ৫¾ পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। কাজেই চাকপত্র ভিত্তির মান সমান রাখিলে চাকবাসে পুং-মৌমাছি নিয়ন্ত্রণ সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ চাকপত্র ভিত্তি ব্যবহারের অন্যতম কারণ

ইহারই নিয়ন্ত্রণ। পার্বত্য মৌমাছিই চাকবাসে অধিক মধু সঞ্চয় করিতে পারে এবং একমাত্র ইহারাই ল্যাংস্ট্রথ চাকবাসে রাখিবার উপযুক্ত। প্রতি রৈখিক ইঞ্চিতে সমতলীয় মৌমাছির কর্মী-কক্ষের সংখ্যা ছয়টি। যদিও এই মানের ব্যতিক্রম এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহাদের রাণীর প্রজনন ক্ষমতার স্বল্পতোহেতু ইহারা ল্যাংস্ট্রথের মত বৃহৎ চাকবাসে পালন করিবার জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয় এবং পার্বত্য মৌমাছির ন্যায় অধিক মধু সঞ্চয়েও অক্ষম। অধিকন্তু ইহাদের উভয় প্রকারের মধ্যেই এক চাকবাসের মৌমাছি হইতে অন্য চাকবাসের মৌমাছির আচরণ এত পৃথক যে, ইহাদের একটি চাকবাস দেখিয়া অন্যসকল চাকবাসের মৌমাছি নিয়ন্ত্রণ একেবারে অসম্ভব বলিলেই হয়। তারপর এই উভয় প্রকার মৌমাছিই চাকবাস খুলিয়া পরীক্ষাকালে বেশী চঞ্চল হইয়া পড়ে বলিয়া পরীক্ষাকার্য কষ্টকর হয়। ইহারা মাঝে মাঝে উড়িয়া গিয়া প্রায়শ উপনিবেশকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য মধু আহরণ করিতে পারে না। ইহারা মোমী-কীড়ার আক্রমণ রোধ করিতে পারে না এবং শীঘ্র প্রয়োজনীয় বংশবৃদ্ধি করিতেও অক্ষম।

মৌমাছি পালনের জন্য মৌমাছি নিবাচন কালে দেখিতে হইবে, ঐ মৌমাছি শান্ত কিনা। চাকপত্র পরীক্ষাকালে উহার উপর স্থির হইয়া থাকে কিনা। রাণী উপযুক্ত পরিমাণ ডিম্ব প্রদান করিতে পারে কিনা। পরিশ্রমী কিনা ও খুব প্রত্যূষেই মধু ও পুষ্পরেণু আহরণের জন্য চাকবাস ত্যাগ করিয়া অন্ধকার হইবার পূর্ব পযন্ত কাযে ব্যস্ত থাকে কিনা। সাদা মোম দ্বারা সুদৃশ্য করিয়া মধুকক্ষ সকল আবৃত করে কিনা। শত্রু হইতে চাকবাস রক্ষা করিতে পারে কিনা।

কয়েক প্রকার ইউরোপীয় মৌমাছিতেই এই সকল গুণ বর্তমান।

সামাজিক মৌমাছি সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। হুলশূন্য মৌমাছি (Melipona) ; ভোমরা, (Bombus) ও মৌমাছি (Apis) এবং জেনাস্ এপিসের মধ্যে এপিস্ ডরসাটা (Apis dorsata), এপিস্ ইণ্ডিকা (Apis indica), এপিস্ ফ্লোরিয়া (Apis florea) ও এপিস্ মেলিফিকা (Apis melifica) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। মৌমাছি পালনে ইউরোপে এপিস মেলিফিকা ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের এপিস ইণ্ডিকা, এপিস মেলিফিকার সমগোত্রীয়।

এপিস মেলিফিকার মধ্যেও দুইটি বিভাগ আছে। ইহারা (১) কালো বা ধূসর ও (২) হরিদ্রা। কালো বা ধূসর রঙের মৌমাছি মধ্য ইউরোপ, গ্রেট বৃটেন, উত্তর আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারে পাওয়া যায়। আমেরিকায়ও ইহারা বহুপুর্বেই নীত হইয়াছে।

হরিদ্রাবর্ণের মৌমাছির মধ্যে ইটালীয় মৌমাছিই প্রধান। ইহা উত্তর মধ্য ইটালীতে পাওয়া যায়। ইহারা আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মৌমাছি পালকের দ্বারা আমদানীকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন সাইপ্রাসের মৌমাছিই এই গোষ্ঠীর আদি। ইহাদিগকে সাইপ্রাস, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইজিপ্ট, ও সাহারার মরুদ্যানে পাওয়া যায়।

কালো বা ধূসর মৌমাছি দুই প্রকার। ডাচ্ বা হিদার (Heather) মৌমাছির আদি বাসস্থান হল্যাণ্ড। ইউরোপীয়েরা আমেরিকা যাইবার কালে এই মৌমাছিই লইয়া গিয়াছিলেন। ফলে আমেরিকার কতকাংশে এই মৌমাছি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মসীবর্ণ হইতে ধূসর বর্ণের মধ্যে পরিবর্তিত হইতে থাকিলেও ইহাদের আকার ও চরিত্রের সাধারণ সাদৃশ্য আছে। বিশুদ্ধ ইতালীয় মৌমাছি অপেক্ষা ইহারা অধিক লুণ্ঠনবৃত্তি পরায়ণ এবং অধিক পুষ্পরস নিঃসরণ না হলে বা গাঢ় রংয়ের মধুর উৎস ব্যতিরেকে ইহারা মধু সংগ্রহে বিশেষ

উৎসাহী নহে। পরীক্ষার জন্য চাকবাস খুলিলেই ইহারা পাগলের মত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে ও চাকবাস ছাড়িয়া চতুর্দিকে উড়িতে আরম্ভ করে। চোখের সামনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে উড়িতে থাকা ইহাদের এক বিরক্তিকর স্বভাব।

ইহাদের কয়েকটি গুণও আছে। মধু নিষ্কাশণের জন্য চাকপত্র লইবার কালে ইহাদিগকে সহজেই চাকপত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায় এবং সহজেই অল্প দূরে স্থানান্তরিত করা যায়।

জার্মান বা বৃটিশ মৌমাছির সহিত ডাচ্ মৌমাছির আকৃতিগত সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু ইহারা হল্যাণ্ডীয় মৌমাছির ন্যায় কালো হয় না। ইহাদিগকে মধ্য ও উত্তর পশ্চিম রাশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নেদারল্যাণ্ডস্, জার্মেনী, অষ্ট্রীয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালে পাওয়া যায়। ইহারা দক্ষিণ ফ্রান্সেই অধিক পালিত হইয়া থাকে। ধূম দ্বারা ইহাদিগকে সহজেই বশীভূত করা যায়। ইহারা ডাচ মৌমাছির ন্যায় চঞ্চল নহে। ইহারা প্রায় সর্ববিষয়ে ইতালীয় মৌমাছির সমকক্ষ।

কালো বা ধূসর মৌমাছির মধ্যে অন্যান্য ভাল জাতেরও কয়েকপ্রকার মৌমাছি আছে। ইহারা ইতালীয় ও অন্য কালো বা ধূসর মৌমাছি হইতে শান্ত এবং মধু উৎপাদন ও অন্যান্য বিষয়ে ইতালীয় মৌমাছির সমান।

কারনিওলান (Carniolans) :—বৃহদাকৃতি ও ধূসর-রূপালী রঙের। এই মৌমাছি আল্পস পর্বতের উত্তর পূর্ব প্রান্ত হইতে ডানিয়ুবের তীর পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র কারনিওলানই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহারা অধিকাংশ ইতালীয় মৌমাছির ন্যায়ই শান্ত কিন্তু অন্যান্য কালো বা ধূসর মৌমাছি অপেক্ষা অনেক বেশী শান্ত। ইহাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা খুবই বেশী। কিন্তু একমাত্র দোষ এই যে, ইহারা অতিরিক্ত ঝাঁক নিক্ষেপক। এজন্যই মক্ষি-পালকের বাসস্থান হইতে অধিক দূরবর্তী মক্ষি-পালন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত নহে। ইহাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা চাকে মোটেই প্রোপলিস জমায় না ও চাক সর্বদা পরিষ্কার রাখে এবং শুভ্রবর্ণের চাক প্রস্তুত করে। ইহাদের ঝাঁক নিক্ষেপের অতিপ্রবণতা না থাকিলে চাকমধু প্রস্তুত করিতে ইহারাই হইত সর্বশ্রেষ্ঠ।

ককেশিয়ান :—কারনিওলান মৌমাছির সহিত ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। ইহারা উভয়েই ডাচ্ বা সাধারণ কালো মৌমাছি হইতে অনেকাংশে পৃথক। চাকবাস খুলিয়া পরীক্ষা করিবার কালে ইহারা মোটেই অস্থির হয় না বা ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না।

ককেশিয়ার পার্বত্য প্রদেশে পালিত ককেশিয়ান মৌমাছিই যাহারা মরুভূমির উত্তরে অবস্থিত মরুদ্যানের মৌমাছি ব্যতীত সকল মৌমাছি অপেক্ষা শান্ত। সমতল প্রদেশসমূহে পালিত ককেশিয়ান মৌমাছি পার্বত্য প্রদেশে পালিত মৌমাছির ন্যায় শান্ত নহে। ইহারা উভয়েই চাকে অতিরিক্ত প্রপোলিস ব্যবহার করে। এই কারণেই চাকমধু প্রস্তুত করিতে ইহারা উপযুক্ত নহে।

তবে পার্বত্য প্রদেশে পালিত ককেশিয় মৌমাছি বিদেশে যেরূপ দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে তাহাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে ইহারা এবিষয় ইতালীয় মৌমাছিকে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

বিদেশে যাহারা ককেশিয় মৌমাছি পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহারা বলেন—ইহাদের চাকবাস ভাল ও মন্দ আবহাওয়ায় বিনা ধূমদানে বারংবার খোলা সত্ত্বেও ইহারা হুল ব্যবহার করে নাই। যদিও অনেক সময় মনে হয় ইহারা হুল ফুটাবার জন্যই উড়িয়া আসিতেছে।

ককেশিয়ান মৌমাছি শান্ত স্বভাবের জন্য লোকালয়ে পালনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

ইতালীয় মৌমাছি অপেক্ষা ককেশিয় মৌমাছির

জিহ্বা কিছু দীর্ঘতর। শান্ত স্বভাবের ককেশিয়ান মৌমাছি পরিশ্রমী, উৎসাহী অথচ অতিরিক্ত ঝাঁক নিক্ষেপকারী নহে।

বানাট্ মৌমাছি :—হাঙ্গারীর একটা জেলার নামে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। ইহারা বহুলাংশে ককেশিয়ান মৌমাছির ন্যায়। অনেকে মনে করেন—ইহারা কারনিওলান মৌমাছির একটি শাখা। কিন্তু ইহাদিগকে ইউরোপীয় কালো বা ধূসর মৌমাছি হইতে পৃথক করাই দুরূহ।

উত্তর আফ্রিকায় কালো মৌমাছি :—যদিও ইহারা টিউনিশিয়ান বা টিউনিক বলিয়া পরিচিত তথাপিও সমগ্র উত্তর আফ্রিকাতেই এই মৌমাছি পাওয়া যায়। একারণে বালডেন স্পারজার ইহাদিগকে টেলুরিয়ান বা টেলিয়ানা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদিগকে যুক্তরাজ্যে (আমেরিকা) পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহারা সহজেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে ও চাকের সর্বত্র লালগঁদের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ লেপন করিয়া রাখে বলিয়া চাকমধু প্রস্তুত করিতে মোটেই উপযোগী নহে। আধুনিক মৌমাছি পালনে ইহাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগীতা হেতু ইহাদের অন্য কোনও দেশে আমদানী করা উচিত নয়।

মাডাগাস্কার মৌমাছি :—ইহাদিগকে মাডাগাস্কার ও উহার সন্নিহিত দেশসমূহে পাওয়া যায় এবং তথা হইতেই ইহারা আফ্রিকায় নীত হইয়াছে। মাডাগাস্কার দ্বীপে ইহারা সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্ব হইতে পালিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের রং কালো মৌমাছির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কালো।

পশ্চিম আফ্রিকার মৌমাছি :—ইহাদের স্বভাব মাডাগাস্কার মৌমাছির ন্যায়। ইহারা কোথাও বিশেষ আদরণীয় হয় নাই।

পীতজাতীয় মৌমাছি :—পীতজাতীয় মৌমাছির মধ্যে ইতালীয় মৌমাছিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যদিও ইহারা পীতজাতীয় মৌমাছির আদিজনক নহে। ইতালীয়, সাইপ্রাসীয়, ফিলিস্তানীয় বা হোলিল্যাণ্ড মৌমাছি, ইজিপ্তিয় এবং সাহারীয় বা উত্তর মধ্য আফ্রিকায় সাহারা মরুর মৌমাছি সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ইতালীয় মৌমাছির আদি :—বালডেন স্পারজার বলেন, সুস্পষ্টভাবে ইহাদের বৃত্তান্ত জানা না গেলেও অনুমানের দ্বারা কিঞ্চিৎ বোঝা যায়। এরিস্টোটল এবং ভাজিল উভয়েই কালো ও উজ্জল বর্ণের মৌমাছির কথা জানিতেন। খৃঃ পূঃ ৭৫০ বৎসর আগেও গ্রীসিয়রা মৌমাছি পালন জানিত ও তাহাদের চাকবাসে মৌমাছির অতিবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকখণ্ড কাষ্ঠফলকে চাক নির্মাণ করাইত। আদিম নাবিকেরা তাহাদের সহিত মৌমাছি লইয়াই সর্বত্র যাতায়াত করিত এবং যেস্থানে বৎসরাধিককাল যাপন করিতে হইত সেইখানেই মৌমাছিশালা প্রতিষ্ঠিত হইত। সাইপ্রাস হইতে গ্রীকরাই বোধহয় সর্বপ্রথম ইতালীতে পীত মৌমাছি লইয়া আসেন। ইহারাই কালক্রমে স্থানীয় কালো বা ধূসর মৌমাছির সহিত মিলিত হইবার ফলে বর্তমান ইতালীয় মৌমাছির জন্ম হইয়াছে। রোমক সভ্যতার উত্তরমুখী অভিযানের সহিত এই নবপ্রতিষ্ঠিত পীত মৌমাছি স্থানীয় কালো বা ধূসর মৌমাছিকে উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র ইতালীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখনও ইহাদের রং-এর সমতা সাধিত হয় নাই। ইহাদের বর্ণ কোথাও বেশী গাঢ় কোথাও বা ফিকা। ইহাদের পুং-মৌমাছি কোথাও সম্পূর্ণ পীত কোথাও বা সমগ্র শরীরে একটি ক্ষীণ পীত বন্ধনী দৃষ্ট হয়।

১৮৪৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডে একজন মৌমাছিপালক প্রথম ইতালী হইতে কয়েকটি মৌমাছির উপনিবেশ তাহার দেশে লইয়া আসেন। ১৮৫৩ সালে জিয়ারজন জার্মানীর সাইলেশীয়ায় ইতালীয় মৌমাছির মধ্যে অ-পুং-জনন (parthenogenesis) প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ সালে হ্যামেটের দ্বারা ইতালীয় মৌমাছি ফরাসী দেশে নীত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাদের তেমন প্রসার হয়

নাই। জিয়ারজনের মধ্যস্থতায় ১৮৮৫ সালে এই মৌমাছি প্রথম আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এম, বি পারসন্স্ ১৮৬০ সালে নিজেই ইতালীয় মৌমাছি আমেরিকায় আমদানী করেন। ১৮৬৩ সালে ল্যাংষ্ট্রথ জার্মেনী হইতে ইতালীয় মৌমাছি আমদানী করিয়াছিলেন।

ইতালীয় মৌমাছির সর্বাধিক চাহিদার হেতু আমেরিকায় ইতালীয় মৌমাছি ব্যাপকভাবে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের দিক হইতে ইহারাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মৌমাছি। ইহারা শান্ত, পরিশ্রমী, ভাল কর্মী এবং চাকপত্রে স্থির হইয়া থাকে। দেখিতে সুন্দর ও ঝাঁকনিক্ষেপ-প্রবণ নয়। আমেরিকায় প্রায় সকল ইতালীয় মৌমাছির উদর বেষ্টনীতে কালো ধার সমন্বিত তিনটি পীত বৃত্তাংশ আছে। ঝাঁক নিক্ষেপ রোধ করা মৌমাছি পালনের কঠিনতম সমস্যা। অন্য সকল বিষয় সমান হইয়াও যে মৌমাছি কম ঝাঁক নিক্ষেপপ্রবণ, তাহারাই অধিক কাম্য। এ বিষয়ে ইতালীয় মৌমাছি সর্বাগ্রগণ্য। ইহারা ঝাঁক নিক্ষেপ রোধের সকল প্রচেষ্টাতেই যথোচিৎ সাড়া দেয়, কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়। আমেরিকায় কৃষ্ণ মৌমাছি, কারনিওলান ও কতিপয় ককেশিয় মৌমাছি সময় অসময় সকল নিয়ম ও বাঁধা লঙ্ঘন করিয়া এরূপ ঝাঁক নিক্ষেপ করে যে, সাধারণ মৌমাছি পালকের পক্ষে তাহা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ঝাঁক নির্গম রোধ করিতে না পারিলে মধু প্রাপ্তির পরিমাণও কমিয়া যায়। কিন্তু ইতালীয় মৌমাছির এই প্রবণতা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বার বার পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ইতালীয় মৌমাছিই মথ-পলু হইতে নিজেদের চাক রক্ষা করিতে পারে সবচেয়ে বেশী। কৃষ্ণ বা ডাচ্ মৌমাছির উপনিবেশে উপযুক্ত সংখ্যাধিক্য না থাকিলে তাহারা মথ-পলুর আক্রমণে শীঘ্রই পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে। ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইতালীয় মৌমাছি ময়লা পীত রংয়ের ও সাইপ্রাসীয় মৌমাছি গাঢ় কমলা রঙের। প্রায়ই ইহাদের কমলা রঙের তিনটি বন্ধনী থাকে; কখন কখন চতুর্থ উদর-বন্ধনীও কমলা রঙের হইতে দেখা যায়। ইহাদের ছয়টি বন্ধনীরই শেষাংশ কালো এবং বক্ষাংশের চন্দ্র-লাঞ্ছন দ্বারা অন্য মৌমাছি হইতে পৃথক করা যায়।

মনে হয় যে, এই সাইপ্রাসীয় মৌমাছিই কেবলমাত্র সিরিয় ও ফিলিস্তানীয়ই নয়, ইতালীয় মৌমাছিরও আদি। অন্য সকল মৌমাছি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সাইপ্রাস দ্বীপে ইহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় পালিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের পরিশ্রমী স্বভাব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াই হয়তো ইহারা নানাদেশের লোকের দ্বারা ইউরোপ, সিরিয়া ও ফিলিস্তানে নীত হইয়াছিল এবং স্থানীয় মৌমাছির সহিত ক্রমমিলনের ফলে বহু বিভিন্ন জাতের মৌমাছির উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতের পাহাড়ীয় মৌমাছি ও ইজিপ্তিয় মৌমাছি বাদে ইহারাই সর্বাপেক্ষা কোপন স্বভাবের মৌমাছি। নচেৎ ইহারা সৌন্দর্য ও পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিত। কেবল ইহাদের কোপন স্বভাবের জন্য ইহারা মৌমাছি পালকদের নিকট আদৃত হয় নাই।

সিরিয় মৌমাছি:—ইহাদের সিরিয়ার লেবানন প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে ইতালীয় ও সাইপ্রাসীয় মৌমাছির মধ্যবর্তী। ইহারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে পারে ও ভাল কর্মী। তারাস পর্বতমালার দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় ইহাদের বিশুদ্ধতা ক্ষুন্ন হইতে পারে নাই। সাইপ্রাসীয় মৌমাছির ন্যায় ইহারা চঞ্চল; কিন্তু তাহাদের ন্যায় হিংস্র নহে। ইহাদের চাকবাস খুলিবার কালে যথেষ্ট ধূম প্রদানের প্রয়োজন হয়।

ফিলিস্তানীয়:—ফিলিস্তানীয় বা হোলীল্যাণ্ড মৌমাছি সিরিয় মৌমাছি হইতে আকৃতিতে সামান্য

কি

পৃথক হইলেও স্বভাব তাহাদেরই মত। ইহারা সাইপ্রাসীয় মৌমাছির ন্যায় চঞ্চল ও হিংস্র। ইহাদের প্রথম তিনটি উদর-বন্ধনী কৃষ্ণবর্ণ প্রান্তযুক্ত লেবুবর্ণের। ফিলিস্তানীয় মৌমাছিগুলিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকৃতি বলিয়া মনে হয়। ইহাদের রাণী দীর্ঘাকৃতি ও শীর্ণ এবং প্রচুর অণ্ড-প্রসবী।

পূর্বদেশীয় মৌমাছি, বিশেষতঃ ফিলিস্তানীয় মৌমাছি প্রতিপালনের পক্ষে অন্য সকল প্রকার মৌমাছি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের চাকবাসে পালিত রাণী মৌমাছি খুব সবল ও বৃহৎ হয়। এই একমাত্র কারণে, যাহারা যথেষ্ট সংখ্যক রাণী উৎপাদন করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পূর্বদেশীয় মৌমাছির একটি মহৎ দোষ এই যে, ইহারা কিছুদিন রাণী শূন্য অবস্থায় থাকিলেই অণ্ড-প্রসবী কর্মীর সৃষ্ট হয়, ফিলিস্তানীয় মৌমাছিরও এই দোষ বর্তমান।

পূর্বদেশীয় মৌমাছি ইউরোপ বা আমেরিকায় আদৃত হয় নাই। তাহার কারণ ইহাদের হিংস্র স্বভাব ও ঝাঁক নির্গমের অনিয়মিতা। এই সকল কারণেই ইহারা মধু উৎপাদন ব্যবসায়ে উপযুক্ত নহে।

শ্বেতী বা পঞ্চ-পীতবন্ধনীযুক্ত ইতালীয় মৌমাছি:—ইহারা খাকি রঙের মৌমাছি। ইহারা পূর্বদেশীয় মৌমাছিরই এক প্রশাখা। ইহারা দেখিতে পূর্বদেশীয় মৌমাছির ন্যায় ও হিংস্র স্বভাবসম্পন্ন। ব্যবসায় হিসাবে মধু উৎপাদনে ইহাদের বিশেষ উপযোগীতা নাই।

ইজিপ্তিয় মৌমাছি:—পৃথিবীতে এই মৌমাছিই সর্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। অন্য জাতের মৌমাছির সহযোগিতায় ইজিপ্তিয় মৌমাছি হইতে সুন্দর ও প্রচুর মধু উৎপাদনে সক্ষম একটি নূতন জাতি সৃষ্টি চেষ্টারই ফল—কারনিওলান ও ইজিপ্তিয় মৌমাছি (বিশুদ্ধ কারনিওলান কুমারী রাণী ও ইজিপ্তিয় ড্রোন)। ইহারাই সৌন্দর্য্যে, মধু উৎপাদনে, আকৃতিতে ও স্বভাবে অন্য সকল মৌমাছি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহারা বিশুদ্ধ কারনিওলান বা ককেশিয় মৌমাছির ন্যায় শান্ত নহে।

ইহাদের রাণী বহু অণ্ড-প্রসবী। এইজন্য মৌমাছি-প্রজননকারীরা প্রথম চাকবাস সংগঠনে ইহাদের উপযোগীতা উপলব্ধি করেন। সাইপ্রাসীয় মৌমাছিরও এই গুণ বর্তমান।

ডঃ মিলারের মতে ইহারা রাণী প্রতিপালন কার্যে সহজেই সাড়া দেয় এবং সহজেই শত শত রাণী উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইহারা নিষ্কাশিত মধু উৎপাদনে সমধিক উপযোগী; কিন্তু ইহাদের দ্বারা চাকমধু উৎপাদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সকল পীত মৌমাছির ন্যায় ইহারা দূরে অবস্থিত মৌমাছিশালার উপযোগী নহে। বর্তমান উন্নত চাকবাসে পালন করিয়া ইহাদের দ্বারা সুবৃহৎ উপনিবেশ সৃষ্টি সম্ভব; কিন্তু ইহাদের আদি বাসভূমির অল্প পরিসর মৃত্তিকা আধারে ইহাদের নিকট তাহা আশা করা সম্ভব নয়।

সাহারা মৌমাছি:—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আধুনিক চাকবাসে পালিত হইলে সাহারা-মরু মৌমাছি মধু ব্যবসায়ীর পক্ষে মধু উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ মৌমাছি হইতে পারে। ইহাদিগকে সাহারা মরুভূমির মরুদ্যানে ও উত্তর পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে অনেকটা সাইপ্রাসীয় মৌমাছির ন্যায়; কিন্তু তাহাদের মত হিংস্র নহে। ইহারাই পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত মৌমাছি। কারণ ইহারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে সব স্থানে বাস করে সেস্থানে মৌমাছির শত্রু সংখ্যা খুবই অল্প। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা পুষ্প-রসের অন্বেষণে ৪।৫ মাইল পর্যন্ত যায়; কিন্তু অন্য জাতের মৌমাছি ২।৩ মাইলের বেশী যায় না।

হিংস্র বেদুইন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে ইহাদের সন্ধান করিয়া লইয়া আসা দুষ্কর। বেদুইনদের ভাষাজ্ঞান ও তাহাদের স্বভাবের সহিত সম্যক পরিচয় না থাকিলে তথায় যাওয়া বিপদজ্জনক।

পার্চমেণ্ট

শ্রীসুশীলরঞ্জন সরকার

সভ্যতার পথে আমরা যে আজ এতদূর এগোতে পেরেছি তার জন্যে কাগজ অনেকটা দায়ী। দু-হাজার বছর আগে চীনদেশে কাগজের আবিষ্কার হয়। সেই হতে কাগজ পৃথিবী থেকে অশিক্ষ, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবার জন্যে হাল্কা হাতিয়ার সরবরাহ করে এসেছে। আদিম যুগে গাছের গুঁড়ি, শিলাখণ্ড, গাছের পাতার সাহায্যে কাজ চালানো হতো। অশোকের সময়ে পর্বতগাত্র, প্রস্তর বা ধাতু ফলক, লৌহ বা প্রস্তর স্তম্ভে অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ করা হতো। জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে, যা তাল পাতার ওপর সযত্নে লেখা; তাহলেও তা সাধারণের ব্যবহার উপযোগী ছিল না। তাই কাগজের মত একটি লিপিবদ্ধ করে রাখবার উপকরণের অভাব ছিল অনেক দিন ধরে। অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও চীন, ভারত, মিশর প্রাচীন সভ্যতার দেশ। জ্ঞানের আলোক এই সব দেশ থেকে প্রাচীনকালে ছড়িয়ে পড়তো অন্য দেশে। কাগজ আবিষ্কারের প্রায় দু-হাজার বছর আগে চীনদেশে সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, সুপ্রাচীন কালেও কাগজের মত একটা সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যিশুখ্রীষ্ট জন্মাবার কয়েকশ' বছর আগে মিশর দেশে একরকম কাগজ প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায়। তাকে বলা হতো প্যাপিরাস। মিশর ও তার সন্নিহিত দেশসমূহে প্যাপিরাসের ছিল অবাধ রাজত্ব। কিন্তু এগুলো কাজের খুব উপযুক্ত ছিল না, সহজে ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যেতো। এই সময়ে এসিয়া মহাদেশে, তুরস্কে, পারগ্যামোস নামে একটি শিল্প-সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এর বর্তমান নাম বারগ্যামোস, ইজমিরের ৪২ মাইল উত্তরে একটি নদীর ধারে এই স্থানটি আজিও রয়েছে। খ্রীষ্টজন্মের দু-শ' বছর আগে যুমেনস্ নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। রাজকার্যে তিনি প্যাপিরাস ব্যবহার করতেন। কিন্তু মূল্যবান দলিলাদি প্রস্তুতকায এরকম নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে চলতো না। তাই তিনি নূতন কিছু আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন। একদিন তার এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো। তিনি ছাগলের চামড়া থেকে একরকম সুদৃঢ়, মসৃণ কাগজ প্রস্তুত করলেন। এই কাগজই আপনাদের কাছে পার্চমেণ্ট নামে পরিচিত। কাজের উপযোগী হওয়াতে এর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। অ শ্য কিছুকাল পরে কাগজের আবিষ্কার হওয়াতে পার্চমেণ্টের ব্যবহার কমে এলো। তবুও এর বিশেষ গুণ থাকায় প্যাপিরাসের মত জগত থেকে বিদায় নেয় নি। মূল্যবান দলিলাদি তৈরী করতে আজও পার্চ-মেণ্টের ডাক পড়ে। আধুনিক যুগেও পাচ ও দশ টাকার নোট ছাপাতে পার্চমেণ্ট কাগজ কাজে লাগানো হয় বলে শোনা যায়। পরে অবশ্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডবলু, ই, গেনি কাঠের মণ্ড থেকে উদ্ভিজ্জাত পার্চমেণ্ট তৈরী করেন। তার ফলে চামড়া থেকে তৈরী পার্চমেণ্টের ব্যবহার আরো কমে যায়।

শুধু মূল্যবান দলিল তৈরী করার জন্যেই পার্চমেণ্ট ব্যবহৃত হয় তা নয়, অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রে এর সাক্ষাত পাবেন। ঢাক, ঢোল থেকে আরম্ভ করে ইংরাজী বাজনার অন্তর্ভুক্ত বাঁগ ড্রাম, কেট্‌লড্রামে যে সাদা চামড়া টান

করে লাগান রয়েছে তা পার্চমেণ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। গানের আসরে তবলা, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ আপনাদের যে আনন্দ পরিবেশন করে তাও এই পার্চমেণ্টের গুণে।

চামড়া থেকে পার্চমেণ্ট তৈরী করা খুব শক্ত নয়, খুব বেশী হাংগামা নেই। মসৃণ ও পাৎলা পার্চমেণ্ট কাগজ তৈরী করতে হলে ছাগলের বাচ্চা, ছোট্ট বাছুর, সদ্যোজাত মেষশাবকের চামড়া হলেই ভাল হয়। বাদ্যযন্ত্রে লাগাবার জন্যে একটু মোটা ও খস্‌খসে হলে চলে, তাই বড় বাছুর, গাধা, নেকড়ে বা ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী করা চলবে।

এ কাজের জন্যে প্রথমেই দুটি মাটির বড় গামলা যোগাড় করুন। বাজার থেকে কাঁচা চামড়া কিনে এনে এক গামলা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন ঘণ্টা দুয়েক। আর একটা মাটির গামলায় কিছু পরিমাণ চূণ জলে গুলে রেখে দিন। নির্দিষ্ট সময়ের পরে চামড়াটা পরীক্ষা করে দেখুন বেশ নরম হয়ে গেছে কিনা। এখন লোম সব তুলে ফেলতে হবে। সহজেই এ কাজ সমাধা হবে। একটি বন্ধঘরে ওই চামড়াটি সামান্য লবণ মাখিয়ে মেঝের ওপর বিছিয়ে রাখুন। এর ফলে চামড়াতে কিছু জীবাণুর সৃষ্টি হবে—তারাই লোমের গোড়া আলগা করে দেবে। মাঝে মাঝে পরীক্ষা করবেন, যেই দেখবেন লোম টানলে উঠে আসছে, তখনই তুলে নিয়ে সমস্ত লোম উপড়ে ফেলবেন। তারপর ভাল করে ধুয়ে চূণের জলে ডুবিয়ে রাখুন। লোমশূন্য করা অবশ্য চূণ ও সোডিয়াম-সালফাইড দিয়ে চলতো; কিন্তু তাতে চামড়ায় নীলাভ দাগ ধরে যায়, খুব শুভ্র হয় না, তাই এই ব্যবস্থা। সাতদিন পরে চামড়া চূণের জল থেকে তুলে নিন। তারপর একটি চটের থলে চূণের জলে ভিজিয়ে ঢেকে দিন মেঝের ওপর চামড়া বিছিয়ে। আট ঘণ্টা বাদে আবার নতুন করে চূণের জল তৈরী করে তাতে চামড়া ডুবিয়ে রাখুন ২৪ ঘণ্টা। এরপর আবার খানিকক্ষণ তুলে রাখুন, আবার ডুবিয়ে দেবেন। সাতদিন এই রকম চলবে। এবার অতিরিক্ত মাংস ও চর্বি, যা চামড়াতে লেগে আছে তা চেঁচে ফেলে দিতে হবে। ধারাল ছুরির সাহায্যে মেঝের ওপর চামড়া বিছিয়ে নিপুণতার সংগে এই কাজ করতে হবে, যাতে চামড়াতে ছুরির দাগ বসে না যায়। মসৃণ পাতলা পার্চমেণ্ট কাগজ তৈরী করতে দক্ষ লোকের প্রয়োজন। বিলেতে স্প্লিটিং মেসিনে চেরাই করে মাংস ও চর্বির স্তর তুলে ফেলা হয়। এর পর ভাল করে ধুয়ে নিয়ে গামলাতে ঈষদুষ্ণ (১০০°F) জল নিয়ে ডুবিয়ে রাখুন। দেড় ঘণ্টা বাদে শুকোবার জন্যে চামড়া তুলে নিন। একটি চারকোণা কাঠের ফ্রেম যোগাড় করতে হবে; তাতে স্ক্রু বা দড়ির ব্যবস্থা থাকবে যাতে খুব টান করে চামড়া মেলে দেওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি না শুকিয়ে ধীরে ধীরে ও সমানভাবে শুকোতে হবে। তা না হলে কমবেশী শুকোনোর ফলে চামড়া কুঁচকে বা ফেটেও যেতে পারে। অতএব সাবধানে একাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। শুকোবার সময়ে যদি চর্বি কিছু চামড়ার ওপর বেড়িয়ে আসে তাহলে এক কাজ করবেন। খানিকটা জলে সামান্য সোহাগা (৫%) গুলে নিন; তারপর একটি শক্ত বুরুশ দিয়ে চামড়ার ওপর মাখিয়ে দিন। এবার একটি পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভাল করে চামড়া মুছে ফেলুন। তারপর ছায়াতে ভাল করে শুকিয়ে নিন। এক রকম ছুরি পাওয়া যায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি। অর্ধেকটা ধারাল অর্ধেকটা ভোঁতা। সেই রকম ছুরির ধারাল দিকটা দিয়ে চামড়ার মাংসের পিঠটা চেঁচে ফেলুন ভাল করে। চেঁচে একেবারে সুসমতল করে দেবেন, যাতে খস্‌খসে না থাকে। ফ্রেমটা ঘুরিয়ে নিন। দানাপিঠটা ছুরির ভোঁতা দিকটা দিয়ে ঘষতে থাকুন। তার ফলে চামড়া অনেকটা মসৃণ ও মোলায়েম হবে। আর ক্লেদ যা কিছু থাকবে তাও উঠে গিয়ে বেশ উজ্জ্বল হবে।

এরপর এক টুক্‌রো পিউমিস্ পাথর বেশ ঘষে মসৃণ করে নিন। এবার ঐ পাথর দিয়ে ভাল করে চামড়ার দানাপিঠ ঘষুন। খানিকটা গোলাচূণ আবার মাখিয়ে দিন আর ফ্রেমটি আরও শক্ত করে এঁটে দিন যাতে চামড়া ঢিলে না থাকে। পরিষ্কার পশমী কাপড় দিয়ে অতিরিক্ত চূণ ঝেড়ে ফেলে দিন। শেষে আবার পিউমিস্ পাথর দিয়ে ভাল করে ঘষে নিন।

পার্চমেণ্ট তৈরী হয়ে গেছে। অসাবধানতার জন্যে যদি কোন জায়গা কেটে গিয়ে থাকে তো ধার থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে ছেঁড়া অংশটা সমান করে ছেঁটে গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে দিন। ধার সমান সুদৃশ্য করে ছেঁটেও সাইজ করে নিতে পারেন। যদি সবুজ রং করতে চান তাহলে চামড়া সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে রং লাগাতে হবে। কপার অ্যাসিটেট্ ক্রিষ্টাল ৩০ ভাগ, পটাশিয়াম বাইটারটারেট ৮ ভাগ, ৫০০ ভাগ বিশুদ্ধ জলে (বৃষ্টির জল হলে চলবে) মিশিয়ে ঠাণ্ডা করে তাতে ৪ ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করে যে দ্রবণ তৈরী হবে, তা লাগালে সবুজ রং হবে। ডিমের অ্যালবুমেন বা গাম্ এরাবিকের দ্রবণ মাখিয়ে ঘষলে বেশ জ্যোতিঃ বেরোবে।

পাচমেণ্টের অপর নাম ভেলাম। যদিও চামড়া থেকে তৈরী তাহলেও এ পাকা চামড়া বা লেদার নয়।

সিমেণ্ট তৈরীর ব্যবস্থা

শ্রীনিতাইচরণ মৈত্র

কারখানায় সাধারণতঃ সিমেণ্ট কিরূপে প্রস্তুত হয় এ প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

চুনাপাথরের পাহাড় থেকে পাথরগুলো সংগ্রহ ও বাছাই করে সুবিধামত কারখানায় এনে ফেলা হয়। সাধারণতঃ সিমেণ্ট কারখানাগুলো সুবিধার জন্যে পাহাড়ের ঠিক নীচে বা কাছাকাছি কোথাও বসান হয়। কারণ তাতে কাঁচামাল সরবরাহের গোলযোগ ঘটে না। বড় বড় পাথরগুলো প্রথমে, হয় জ-ক্রাসার নয়তো বড় হ্যামার-মিলে ফেলে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। একদিকে যেমন পাথর গুঁড়ো হতে থাকে অপরদিকে আবার উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট মাটি নিকটবর্তী মাঠ থেকে সংগ্রহ করে একটি চৌবাচ্চায় জল মিশিয়ে কাদায় পরিণত করা হয়। বলে রাখা ভাল যে, কোনও সিমেণ্ট কারখানায় প্রতিটি বিভিন্ন অংশে যে সকল বিভিন্ন কাজ হতে থাকে তারা পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে বিশিষ্টভাবে বাঁধা। একটিতে ভুল হলে সকলগুলোরই অচল অবস্থা দেখা দেয়। সমস্ত কারখানাটি একযোগে ধারাবাহিকভাবে চলে, কোথাও বিরতি বা বিচ্যুতির অবসর থাকে না। কাদার চৌবাচ্চা থেকে কাদাকে ক্রমান্বয় আরও কয়েকটি চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত করতে করতে আবর্জনামুক্ত করে ফেলা হয়। গুঁড়ো পাথর ও পরিষ্কার কাদা এবং সামান্য পরিমাণ লৌহ-প্রস্তর বা ল্যাটেরাইট এবার প্রচুর জলের স্রোতে বিরাট ইউনিভারস্যাল মিলের ভিতরে গিয়ে পড়ে। গুঁড়ো পাথর, কাদা বা ল্যাটেরাইটের পরিমাণ সিমেণ্ট বিশেষজ্ঞরা পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দিয়ে থাকেন এবং কারখানার কেমিষ্ট প্রভৃতি এই পরিমাণ যাতে ঠিক থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ইউনিভারস্যাল মিল একটি বিরাট

চোঙ্গা। ভিতরের গা-টি আগাগোড়া বিশেষভাবে প্রস্তুত লোহার চাদরে মোড়া।

ভিতরটি তিন ভাগে ভাগ করা। প্রত্যেক ভাগ লোহার ছোট বড় নুড়িতে অর্ধেকটা ভর্তি। চোঙ্গাটি ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। পাথর, কাদা, ল্যাটেরাইট এক মুখ দিয়ে জলের স্রোতে ঢুকে পড়ে এবং ঐ নুড়িগুলোর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে পিষে গিয়ে একেবারে মিহি কাদায় পরিণত হয়ে অপর মুখে বেরিয়ে যায়। এই মিহি এবং বিশেষ করে মিশান কাদাকে এবার থেকে আমরা কর্দমই বলব।

এবার বিরাট পাম্পের সাহায্যে কর্দমকে নির্দিষ্ট পাত্রে নিয়ে রাখা হয়। এখান থেকে কর্দম-স্থিরীকরণ আধারে নিয়ে ফেলা হয়। এখানে কেমিষ্টরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে কর্দমের মধ্যে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থগুলোর অনুপাত এমনভাবে ঠিক করে দেন যাতে সে গুলোকে উচ্চতাপে পোড়ালেই সিমেণ্ট তৈরীর ব্যবস্থা হয়। কর্দম-স্থিরীকরণ আধারের কাজ শেষ হলে উহাকে উপরে কর্দম ভুক্তি আধারে নিয়ে রাখা হয়। কর্দম প্রস্তুতের পর হতে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ চুল্লীতে খাওয়ানোর পুর্ব পর্যন্ত উহাকে চাপযুক্ত বাতাসের সাহায্যে সর্বদা আলোড়িত অবস্থায় রাখা হয় যাতে থিতিয়ে পৃথক হয়ে না পড়ে।

এক একটি কর্দম-স্থিরীকরণ আধার হতে কর্দম-ভুক্তি আধারটিকে প্রায় সাত দিন পর্যন্ত পূর্ণ রাখা যায়। কর্দম-ভুক্তি আধার হতে এবার কর্দম গড়িয়ে কেন্দ্রীয় আকর্ষণের টানে চুল্লীতে ঢোকে।

কর্দমে শতকরা ৪০ ভাগ জল থাকে। বেশী জল থাকা হানিকর; তাতে বেশী দাহ্য পদার্থের অর্থাৎ কয়লার দরকার কম থাকাও হানিকর, কারণ তাতে কর্দম জমে গিয়ে কর্দমবাহী নালী ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে পারে।

এখন কর্দম পুড়িয়ে সিমেণ্ট করার কথা। কর্দম-ভুক্তি হতে কর্দম গড়িয়ে কেন্দ্রীয় আকর্ষণের টানে চুল্লীতে ঢোকে একথা বলেছি। এবার চুল্লী সম্বন্ধে একটু বিশেষ ব্যাখ্যার দরকার। আগের দিনে সাফট কিল্‌ন্ বা সুড়ঙ্গ চুল্লীতে সিমেণ্ট পোড়ান হতো; তখন কর্দমকে শুষ্ক করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হতো অথবা সমস্ত গুঁড়ানোর কাজটি ও মিশ্রণের কাজটিকে শুষ্ক অবস্থায় করতে হতো। এখনও যেখানে জলের একান্ত অভাব সেখানে এরূপ শুষ্কভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। সুড়ঙ্গ চুল্লী এখনও জার্মেনীতে প্রচুর ব্যবহার হয়। ভারতে প্রায় সব জায়গাতেই ঘূর্ণী চুল্লী বা রোটারী কিল্‌ন্ ব্যবহার হয় সুতরাং ওই বিষয়েই বিশদভাবে বলব। একটি বিরাট লোহার চোঙ্গা লম্বায় প্রায় ৩০০ ফুট; তার ভিতর দিয়ে একটি দীর্ঘকায় মানুষ সহজেই মাথা উঁচু করে হেঁটে বেড়াতে পারে। চোঙ্গাটি কতকগুলো রোলার বা চাকার উপর এমনভাবে বসানো যে, উপর হতে নীচের দিকে একটু ঢালু হয়ে ঘুরতে পারে। ভিতরটি সমস্ত তাপসহ ইট দিয়ে মোড়া যাতে প্রচণ্ড তাপেও লোহার চোঙ্গাটি নরম হতে না পারে। উপরের মুখটি বিরাট চিমনীর গায়ে গিয়ে ঢুকেছে। নীচের মুখটিকে ঢেকে রেখেছে একটি হুড বা বাক্স। নীচের মুখের মধ্যে একটি সরু নল ঢোকানো, এর ভিতর দিয়ে গুঁড়ো কয়লা উচ্চ চাপের বাতাসের সাহায্যে ভিতরে নিয়ে ফেলা হয়। উত্তপ্ত ও জলন্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে উহা সহজেই জলে উঠে এবং আরও উত্তাপের সৃষ্টি করে। হুডটির নীচের দিকে আর একটি চোঙ্গা ঢুকেছে। সেটা বড় চোঙ্গাটির চেয়ে ছোট হলেও বেশ বড়। এটা বড় চোঙ্গাটির ঢালের উল্টো ঢালে বসান, এটাও ঘুরতে থাকে। এই চোঙ্গাটিকে 'কুলার' বলা হয়। কোন কোন আধুনিক চুল্লীতে একটি বড় চোঙ্গার বদলে ঘূর্ণী চুল্লীর গায়েই কয়েকটি ছোট ছোট সরু সরু চোঙ্গা বসান থাকে, তারাও ঐ কাজ করে।

কর্দমভুক্তি আধার হতে কর্দম ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়তে থাকে ও উত্তপ্ত বাতাসে শুষ্ক হয়ে যায় এবং যতই নামতে থাকে ততই তার তাপ বাড়তে থাকে। এই সময়ে ওর ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। প্রথম দিকে কার্বনিক গ্যাস (CO_2) হয়ে যায়। তারপর কার্বনিক গ্যাস বিযুক্ত শুষ্ক কর্দম প্রচণ্ড তাপে আংশিকভাবে গলে আরও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে সহজেই তাল পাকিয়ে যায়। চুল্লীর ভিতর যেখানে কর্দম তাল পাকায় বা যেখানে ক্লিংকারিং হয় সেই স্থানকে 'ক্লিংকার জোন' বলা হয়। এখানে তাপের পরিমাণ কমবেশী ১৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই সকল এতই উত্তপ্ত যে, রঙীন কাঁচের সাহায্য ছাড়া শুধু চোখে দেখা যায় না, সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

তালগুলো কিন্তু বেশীক্ষণ 'ক্লিংকারিং জোনে' থাকতে পারে না, গড়িয়ে নীচে নামে ও হুডের নীচের চোঙ্গায় 'কুলারে' গিয়ে পড়ে। 'কুলারে' নীচের দিক হতে চিমনীর টানে প্রচুর বাতাস বইতে থাকে, তার ফলে তালগুলো শীগ্‌গীরই ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও গড়িয়ে নীচে পড়ে। এখানে একটি স্বয়ংক্রিয় ওজনযন্ত্র তালগুলোর ওজন জানিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা তালগুলো এবার তালঘরে নিয়ে রাখা হয়। চুল্লীর ঘূর্ণীবেগ, কর্দম প্রবাহ, চাপযুক্ত বায়ু প্রবাহ চালিত কয়লার গুঁড়োর পরিমাণ ইত্যাদি কমবেশী করে ইচ্ছামত সিমেণ্ট পোড়ান পরিচালনা করা হয়। ঠাণ্ডা তালগুলোকে তাল-ঘরে বহুদিন ধরে 'এজ্‌' করতে বা পাকতে দেওয়া হয়। এই 'এজিং' বা পাকানর একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। সিমেণ্টের উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি যে, এগুলো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ যুক্তযৌগিক কৃষ্টালের একপ্রকার কাঁচের সমষ্টি। এই প্রকার পদার্থকে হঠাৎ উচ্চ তাপ হতে ঠাণ্ডা করে ফেললে কতক-গুলো অস্থায়ী অবস্থায় সৃষ্টি হয়। ইহাদের স্থায়ী অবস্থায় ফিরতে বহু সময় লাগে। তাছাড়া কঠিন অবস্থায় বা চলিত অবস্থায় রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ হতে বিলম্ব হয়। এই দুই কারণেই 'এজিং' বা পাকতে দিবার প্রয়োজন। পরীক্ষা করলে দেখা যায় 'এজিং'-এর পূর্বে তালগুলোর মধ্যে যে পরিমাণ অবিকৃত চুন থাকে তা পরে অনেক কমে যায় এবং 'এজিং'-এর পর তালগুলো গুঁড়িয়ে সিমেণ্ট করলে উহা অনেক বেশী "সাউণ্ড" হয়।

পাকবার সময় সাধারণতঃ দু-তিন মাস ধরা যেতে পারে। পাকান তালগুলো এবার আবার গুঁড়োতে হবে। আবার একটি ইউনিভারস্থাল মিলের প্রয়োজন। এবার আর জলে মিশানো চলবে না। সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় গুঁড়ানো হবে। এ সঙ্গে সামান্য পরিমাণ জিপসাম দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য, সিমেণ্টকে কাযক্ষেত্রে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জমে শক্ত হতে না দেওয়া। তাড়াতাড়ি জমে গেলে কাজের অসুবিধা।

ইউনিভারস্থাল মিল হতে যে সিমেণ্টচূর্ণ বের হতে থাকে তাকে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে চালানো হয়। এতে অপেক্ষাকৃত বড় বড় কণাগুলো পৃথক হয়ে পড়ে। এখানে বলা দরকার যে, সূক্ষ্মতার উপর সিমেণ্টের শক্তি অনেকটা নির্ভর করে। একই সিমেণ্ট বেশী সূক্ষ্ম করে গুঁড়োলে উহার শক্তির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই বলে যেন মনে করবেন না যে, নিকৃষ্ট বাজে সিমেণ্টকে শুধু সূক্ষ্ম করে গুঁড়োলেই কাজ চলবে। এই বায়ু শোধিত সিমেণ্ট চূর্ণকে এবার বিরাট আধারে নিয়ে রাখা হয়। এগুলোকে সিমেণ্ট সাইলো বলা হয়। এগুলো বায়ু সংস্পর্শশূন্য, যাতে সাধারণ বাতাসে বিদ্যমান জলকণা ও কার্বনিক গ্যাসকণার সাহায্যে এই সিমেণ্ট-চূর্ণ জমে গিয়ে নষ্ট হতে না পারে সেজন্যেই এ ব্যবস্থা। এজন্যেই সিমেণ্টের বস্তাগুলোকেও একটু ভালভাবে শুষ্ক স্থানে রাখায়

দরকার। একটি সিমেণ্ট কারখানায় বিভিন্ন অবস্থায় পাথর গুঁড়োতে, চুল্লীকে ঘুরাতে, পুনরায় তালগুলো গুঁড়োতে ও বিভিন্ন সময় পাথর, কর্দম, তালসিমেণ্ট, কয়লা প্রভৃতিকে একস্থান হতে আর একস্থানে নিযে যেতে বিরাট শক্তির প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যেক সিমেণ্ট কারখানায় নিজস্ব শক্তিকেন্দ্র থাকে। দেখা যায় যে, গড়ে টন প্রতি প্রায় ১০ অশ্ব-শক্তি পরিমাণ শক্তি এই কাজে লাগে। একক মূল উপাদান চুনা-পাথর থেকে তৈরী এই সিমেণ্ট আমাদের চিরপরিচিত চুন হতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিমেণ্ট জল পেলে জমে শক্ত হয় আর সগু পোড়ান চুনের ডেলা জল পেলে ফুলে উঠে গুঁড়ো চুন বা স্লেইক্‌ড্ লাইমে পরিণত হয়। এই গুঁড়ো চুন গাঁথনীর কাজে যখন ব্যবহার করা হয় তখন ইহা ক্রমশ শুষ্ক হতে হতেই শক্ত হয়ে যায়। ওদিকে আবার সিমেণ্ট যখন গাঁথুনীর কাজে লাগান হয় তখন উহাকে বার বার ভিজিয়ে বেশ কিছুদিন আর্দ্র অবস্থায় না রাখলে উহা শক্ত হয় না। এই বিপরীত ফলের কারণ কি? আমরা দেখেছি সিমেণ্ট প্রস্তুতের জন্যে চুনা-পাথর গুঁড়িয়ে উহার সঙ্গে কাদা ও লৌহ-পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে তবে উহাকে পোড়ান হয়। এরূপ করার ফলে চুনা-পাথরের মূল উপাদান আর কাদা ও লৌহ-পাথরের মূল উপাদানগুলোর ভিতর এক গভীর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এখন এই পরিবর্তিত উপাদান স্বভাবতঃই ভিন্নধর্মী। তার জন্যেই এই বিপরীত ফল। সিমেণ্টে চুনা-পাথরের ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও কাদার সিলিকা, অ্যালুমিনা ও লৌহাম্ল প্রভৃতি তালে পরিণত হবার সময় ও পাকতে থাকার সময় মিলেমিশে সিমেণ্টধর্মী যে সকল যুক্তযৌগিক বা কম্‌প্লেক্স কম্পাউণ্ড সৃষ্টি করে তার মধ্যে ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, ডাই-ক্যালসিয়াম সিলিকেট, ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট, পেণ্টা ক্যালসিয়াম ট্রাই অ্যালুমিনেট ও টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনোফেরাইট প্রভৃতিই প্রধান। এ সকল ছাড়া একটি গ্লাসধর্মী পদার্থও থাকে। যুক্তযৌগিক উপাদানগুলো কৃষ্টাল আকারে গ্লাসধর্মী পদার্থটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অবশ্য অবস্থাটি যত সরল করে বলা হল তার চেয়ে বহুগুণ জটিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বিভিন্ন-দেশীয় বিজ্ঞানীরা এই সিমেণ্টের মূলরহস্যের সন্ধানে দৃষ্টি দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রথমদিকে ডিকাট্ৰ-লিশেটেলিয়র, টোরলেবম, মিকালিস প্রভৃতি এবং শেষের দিকে নাকেন, গুটম্যান, সাইল, লিকিউল, যোসে প্রভৃতির নাম বিশেষ করে জড়িত। আজও এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সাধনার চেষ্টার বিরাম নেই। এই অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটনের ফলেই বিভিন্ন নতুন নতুন উপাদান হতে সিমেণ্ট তৈরী ও বিভিন্ন ধর্মী সম্পূর্ণ নতুন নতুন সিমেণ্ট তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।

এখানে সাদা সিমেণ্ট, রঙীন সিমেণ্ট, আই-সেন পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট, জল নিবারক সিমেণ্ট প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

সিমেণ্ট জমে শক্ত হওয়া বা সিমেণ্ট হার্ডেনিং সম্বন্ধে হয়তো অনেকের জানবার আগ্রহ থাকতে পারে। এ বিষয়ে মোটামুটি কিছু বলা ছাড়া বিশদ করে বলা যাবে না। উপরে যে যুক্ত-যৌগিক উপাদানগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো জলের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে উঠলে যে অব-স্থায় দাঁড়ায় তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রথমতঃ, সুপার সেচুরেটেড সলিউশান থেকে নতুন কৃষ্টালগুলো জালীবদ্ধ অবস্থায় নিপতিত হয়ে সমষ্টিযুক্ত হয়। এই জালীবদ্ধ ভাব সিমেণ্টের শক্তির জন্য বহুলাংশে দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ, অর্ধকঠিন জেলীর মত পদার্থের আবির্ভাবে এই জেলী ধীরে ধীরে শুষ্ক হতে থাকে ও পরস্পরের ও চারিপাশের কণাগুলোকে একীভূত

করে। কারণ আমরা জানি যে, পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি কণা থেকে ন্যূনতম সংখ্যায় জলীয় কণা অপসারণ করলে নতুন যুক্তযৌগিক বন্ধনের সম্ভাবনা।

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুটি ক্রিয়ার ফলে নবসৃষ্ট যৌগিক পদার্থগুলোর মধ্যেও পরস্পরের ক্রিয়া ঘটে ও তার ফলে আবার প্রথম দুটি অবস্থায় অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

নানা কারণে অবস্থা ও ক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ হয় না। হয় না যে তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, একবার জমাট বাঁধা সিমেণ্ট পুনরায় উপযুক্তভাবে চূর্ণ করে আবার জমালে জমে ও তার পূর্বশক্তির একটা বড় অংশও তাতে পাওয়া যায়। কেন এরূপ হয় তার কারণও সহজে অনুমান করা যায়। জেলীর মত পদার্থে আবৃত হয়ে পড়লে অনেক কণাই জলের সংস্পর্শে আসতে পারে না ও অবিকৃত থেকে যায়। বিভিন্ন যুক্তযৌগিক পদার্থগুলোর পৃথক পৃথক অনুশীলন করে দেখা গিয়েছে, ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেটই সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই এটি যাতে বেশী পরিমাণে সিমেণ্টে থাকে সে চেষ্টা করা হয়। বিশেষজ্ঞেরা কাঁচা মালের বিভিন্ন সামান্যতম যৌগিক উপাদানগুলোর অনুপাত এমন ভাবে ঠিক করে বেঁধে দেন ও পোড়ানর সময়ে তাপের নির্দেশ এমন ঠিক করে দেন যে, এই ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেটের অংশ বিশেষ পরিমাণে তৈরী সিমেণ্টে থাকে।

সিমেণ্ট বাজারে ছাড়বার পূর্বে তার গুণাগুণ বিশেষভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে দেখা গিয়েছে যে, মোটামুটিভাবে সিমেণ্টের বিশেষ কয়েকটি যৌগিক-পদার্থের অনুপাত পরিমাণ ঠিক করে দিলে আমরা উহার প্রয়োজনীয় গুণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

এই গুণানুশীলন প্রায় সবই মোটামুটি ভাবে স্থির করা। নির্দেশ অনুযায়ী পন্থায় চলে যে ফল পাওয়া যাবে তা নির্দেশপ্রণালী বর্ণিত সামান্যতম যোগ্য ফলের অথবা নির্দিষ্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকা চাই, তা না হলে পরীক্ষণীয় সিমেণ্ট পরিত্যাগ করতে হবে। টেন্সাইল শক্তি কমপ্রেশিভ শক্তি সাউণ্ডনেস্ টেষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি পরীক্ষা। রাসায়নিক পরীক্ষা করে বিভিন্ন সামান্যতম অক্সাইড্ গুলোর পরিমাণও কয়েকটি বিশেষ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রাখতে হয়। এই বিশেষ পরীক্ষাগুলো দুটি পরীক্ষণীয় সিমেণ্টের মধ্যে ভালমন্দ বিচার করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম ও কার্যকরী। প্রত্যেক দেশেই তাই বিশেষভাবে এই স্পেসিফিকেশন বা নির্দেশপ্রণালী ধারাবাহিকভাবে সুসম্বদ্ধ করে আইনসঙ্গত ভাবে জারী করা হয়। উপযুক্ত কমিটির সাহায্যে কিছু দিন অন্তর অন্তর এগুলোর আবার একটু আধটু অদলবদলও করা হয় যাতে এই পরীক্ষাগুলো সব সময়েই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে। ক্রমশই এ পরীক্ষাগুলোকে এমনভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে যাতে পরীক্ষণীয় সিমেণ্টের গুণ দিন দিন উন্নতি লাভ করে। নিত্য নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে অনেক পুরানো নির্দেশকে আবার অবান্তর বলে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

টাইরোথ্রাইসিন

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি পঁচিশ আগে ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হস্‌পিটালের গবেষণাগারে ব্যাপৃত ছিলেন পূঁজ উৎপাদনকারী ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু নিয়ে। যে পাত্রগুলিতে তিনি এসব জীবাণুর চাষ করছিলেন তাদের মধ্যে কতকগুলো পাত্র একপাশে পড়েছিল দিন কয়েক। সেই বছরের গ্রীষ্মকালের কয়েকটা দিন ছিল স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা, ঠিক যেমন হয় আমাদের দেশে বর্ষাকালের দিনগুলো। এদেশে বর্ষাকালে যেমন ভিজে কাঠে, ভিজে জুতায় ছাতা পড়ে তেমনি এক ধরণের সবুজ ছাতা দেখা দিল একদিন ফ্লেমিং-এর পাত্রগুলোতে। এটা এমন কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যা ডাঃ ফ্লেমিংকে আশ্চর্য করে দেবে। কারণ, এই ধরণের ছাতা বা ছত্রাক ভিজে আবহাওয়ায় বাতাসে ভেসে যেখানে সেখানে জন্মাতে পারে। কিন্তু ফ্লেমিং অবাক হয়ে দেখলেন, একটা পাত্রের জীবাণু এক ধরণের সবুজ রঙের ছত্রাকের সান্নিধ্যে এসে নির্মূল হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে জীবাণু ধ্বংসকারী যে ছত্রাক তিনি আবিষ্কার করেন তার নাম পেনিসিলিয়াম নোটাটাম। তখন তিনি এর চাষ করে যে পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন, বিজ্ঞান জগতে তা একটা বিস্ময়। যে ছত্রাক সম্বন্ধে গবেষণা করে ফ্লেমিং জগতজোড়া নাম কিনলেন, সেই ধরণের ছত্রাক সম্বন্ধে আরও গবেষণা করে পাওয়া গেল—প্যাটুলিন, ক্ল্যাভিফর্মিন, ফ্লেভাসিডিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, ষ্ট্রেপটোথ্রাইসিন, পলিপোরিন প্রভৃতি শক্তিশালী ওষুধ। এ রকম একটা শক্তিশালী ওষুধ হচ্ছে টাইরোথ্রাইসিন। বিজ্ঞানী ডাঃ ডুবোস এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন। তিনি কি ভাবে গবেষণা করে এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

সুদূর আমেরিকার রকফেলার ইনষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চের গবেষণাগারে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন ডাঃ ডুবোস। এখানে গবেষণা করতে করতে এই চিন্তা তাঁর মনে জাগে যে, কোন লোককে, প্লেগ বা যক্ষ্মা রোগে মারা যাবার পর যদি মাটিতে কবর দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায়—যে জীবাণুর আক্রমণে ঐ লোকটি মারা গেছে সেই জীবাণুকে মাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলেছে। মাটির মধ্যে কি আছে যা এই সব রোগ জীবাণু ধ্বংস করে ফেলে?

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মনে এই প্রশ্ন জাগে; কিন্তু উপযুক্ত উত্তর কেউ দিতে পারেন নি। তাই আর পাঁচজন বিজ্ঞানীর মত তাঁরও মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল—সত্যিই তো এর কারণ কি?

আমরা যেমন জীবনধারণের জন্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ধরণের জৈব পদার্থের ওপর নির্ভর করি তেমনি এসব রোগজীবাণুও আমাদের শরীরের জৈব পদার্থের ওপর নির্ভর করে। আর এই জৈব পদার্থ খেয়েই তারা জীবনধারণ করে' আমাদের দেহে রোগ উৎপাদন করে। সুতরাং অনেকে অনেক রকম কল্পনা করলেন। ভাবলেন বিভিন্ন রোগজীবাণু যেমন আমাদের ক্ষতি করে' নিজেদের দেহ পুষ্টি করে তেমনি নিশ্চয়ই মাটির কোন উপকারী জীবাণু এইসব রোগ জীবাণু ধ্বংস করেই নিজেদের বৃদ্ধি সাধন করে। অর্থাৎ একটি জীবাণু আর একটি জীবাণু খেয়ে জীবনধারণ করে যা সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণী-জগতে প্রস্তর যুগ থেকে এই ধারণা চলে এসেছে,

কিন্তু কেউ কোন দিন সেই উপকারী জীবাণুর জন্যে মাথা ঘামায়নি। ছোট্ট একটা মটর দানার মত মাটিতে কম করে পাঁচ কোটি বিভিন্ন ধরণের জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর ভিতর থেকে উপকারী জীবাণুটি খুঁজে বের করা কি ভীষণ শক্ত ব্যাপার, সহজেই বুঝা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞানী ডুবোস মানুষের কল্যাণের জন্যে লেগে গেলেন সেই অসাধ্য সাধনে। তিনি যেভাবে গবেষণা করতে লাগলেন তা ভারি মজার। প্রথমে তিনি সস্তাদরের তিনটি বড় বড় পাত্র কিনে এনে মাটি দিয়ে ভর্তি করলেন। উপযুক্ত খাবার, আলো, বাতাস ইত্যাদি পেলে যেমন গাছপালা, জীবজন্তু বেড়ে ওঠে তেমনি উপযুক্ত খাদ্য, বাতাস, জল ও তাপ পেলে জীবাণুও সংখ্যায় বেড়ে যায়। তিনি তাই প্রত্যেক দিন বিভিন্ন জীবাণুপূর্ণ পাত্রগুলোতে জল ঢালতে সুরু করলেন, প্রায় মাসখানেক ধরে। তিনি পাত্রগুলোকে এমন তাপে রেখে দিলেন যাতে জীবাণু অনুকূল অবস্থার মধ্যে বাড়তে পারে। আমাদের শরীরে যেমন বাইরের কোন রোগ-জীবাণু ঢুকে পড়লে শরীররক্ষী জীবাণু সংখ্যায় বেড়ে যায় তেমনি এসব জীবাণু আসার ফলে মাটিতে যে উপকারী জীবাণু আছে তারা সংখ্যায় এত বেড়ে যাবে যা খালি চোখে না হলেও শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়বে। এই উদ্দেশ্যে ডুবোস প্রতিদিন রোগ-জীবাণুপূর্ণ ঐ তিনটি পাত্রে জল ঢালতেন। তারপর মাসখানেক পরে একটি পাত্র থেকে এক চিমটি মাটি তুলে নিয়ে নিউমোনিয়া জীবাণুপূর্ণ একটি টেষ্ট টিউবের মধ্যে ফেলে দিলেন। এখন মাটির মধ্যে যদি কোন অজানা উপকারী জীবাণু থাকে যা নিউমোনিয়া জীবাণু ধ্বংস করতে পারে, তাহলে এখানেও সেই অজানা জীবাণুর টেষ্ট টিউবের নিউমোনিয়া জীবাণুকে ধ্বংস করা উচিত।

গভীর আগ্রহে ডুবোস অপেক্ষা করতে লাগলেন টেষ্ট টিউবের দিকে চোখ রেখে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে দেখা গেল, টেষ্ট টিউবের নিউমোনিয়া জীবাণু কোন এক অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে মরে গিয়ে আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়েছে টেষ্ট টিউবের তলায়। আর? আর দেখা গেল—রডের মত লম্বা লম্বা জীবন্ত সম্পূর্ণ এক অজানা জীবাণু যা ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ফিরিয়ে আনবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে।

যে জীবাণু মানুষকে দিল নিউমোনিয়া থেকে উদ্ধারের আশা, দেখা গেল—তা আর কিছুই নয়, মাটির অত্যন্ত সাধারণ একটি জীবাণু, যার নাম Bacillus brevis. এই আবিষ্কারের পর ডুবোস লেগে গেলেন এই জীবাণুর চাষ করতে। এরপর এই জীবাণু নিয়ে আরও গভীরভাবে বিবিধ পরীক্ষা করে দেখা গেল—এই জীবাণুর দেহ থেকে যে নির্যাস নিঃসৃত হয় সেই নির্যাসেরও রোগজীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। তিনি এর নাম দেন টাইরোথ্রাইসিন।

তারপর চললো রোগ জীবাণুর ওপর টাইরোথ্রাইসিনের অগ্নি-পরীক্ষা। যদিও সোজাসুজি মুখ দিয়ে ব্যবহার করলে এর কোন উপকার হয় না তবু চর্মরোগ, ফোঁড়া, আলসার, কার্বাঙ্কল্ প্রভৃতি রোগ সারাতে এ খুব পটু। যে সব জায়গায় পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন ও সালফা-ঘটিত ওষুধে কোন কাজ হয় না সেখানে দেখা দেয় টাইরোথ্রাইসিন।

এই তো সেদিন বিদেশের কোন হাসপাতালে একটি রোগী আসে, পায়ে এক মারাত্মক ধরণের আলসার নিয়ে। চোদ্দ বছর ধরে নানারকম চিকিৎসা চালানো হয়েছে তাঁর ঐ ক্ষত সারাতে; কিন্তু কোন কিছুতেই সারেনি। টাইরোথ্রাইসিন আবিষ্কার হবার পর এই ওষুধ ক্ষতের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আশ্চর্যের বিষয়, একদিনের মধ্যে ক্ষতের সমস্ত জীবাণু ধ্বংস করে এই ওষুধ তাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে। এরপরই আসে আর একটি

রোগী, আঙ্গুলে এক অস্বাভাবিক ক্ষত নি.য়। নানারকম পরীক্ষা করার পর চিকিৎসকেরা মত দিলেন আঙ্গুল কাটতে। কিন্তু টাইরোথ্রাইসিনের সাহায্যে এই ভীষণ ক্ষত সারানো হয় মাত্র সাতদিনের মধ্যে। এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়।

এ ছাড়া টাইরোথ্রাইসিনের একটি মস্ত সুবিধা আছে। এই ওষুধ পেনিসিলিনের মত তৈরী করা শক্ত নয় বা সালফা-ঘটিত ওষুধের মত শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায় না। যদিও সব রোগজীবাণু ধ্বংস করতে ট্রাইরোথ্রাইসিন অক্ষম তবুও কয়েক রকম রোগজীবাণু ধ্বংসে এই ওষুধ অব্যর্থ।

ডারউইন

শ্রীহৃষীকেশ রায়

মানুষের চিন্তাধারাকে যে সকল মনীষী বিভিন্ন-যুগে নব নব রূপ দানে নূতন পথে পরিচালিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, চার্লস ডারউইন তাঁহাদের অন্যতম। জীব-জগতের বহু তত্ত্বের মধ্যে যে-সকল রহস্য গুপ্ত ছিল, তিনি উহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদিগকে নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক গ্যালিলিওর* ন্যায় ডারউইনও জীবজগৎ সম্বন্ধে তৎকালীন প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে নিজের আবিষ্কৃত অভিব্যক্তিবাদ সাহসের সহিত প্রচারিত করিয়া জীবজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের শ্রুসবেরী নগরে প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞ চিকিৎসক রবার্ট ওয়ারিং ডারউইনের দ্বিতীয় পুত্র চার্লস ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন। চার্লসের মাতা বিখ্যাত মৃৎশিল্পী জোসিয়া ওয়েজউডের* কন্যা। চার্লসের পিতামহ এরাসমাস ডারউইনও (জন্ম-১১ই ডিসেম্বর ১৭৩১ এবং মৃত্যু ১৮ই এপ্রিল ১৮০২) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, উদ্ভিদবিদ্যায় ছিল তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। এইরূপ একটি সুধী পরিবারে জন্ম চার্লসের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে অনেক সহায়তা করে। তাঁহার জন্ম-দিনটি আরও এক কারণে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ দিনই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের দাসত্বমোচনকারী মহানুভব আব্রাহাম লিঙ্কনের † জন্ম হয়।

যিনি কালে জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের

* **গ্যালিলিও**—দূরবীক্ষন যন্ত্রের আবিষ্কারক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইতালীর অন্তঃপাতী পিসা সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য, কোপার্নিকাসের এই মতবাদ সমর্থন করায় গ্যালিলিওকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া তিনি ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* **জোসিয়া ওয়েজউড**—১২ই জুলাই, ১৭৩০ জন্ম,—৩রা জানুয়ারি ১৭৯৫ মৃত্যু। বিশিষ্ট বর্ণের পোর্সেলিনের পেটেণ্ট গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভবিষ্যৎ জীবনে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

† **আব্রাহাম লিঙ্কন**—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল আততায়ীর গুলিতে আহত হইয়া পরদিবস দেহত্যাগ করেন

অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবেন, বাল্যে তাঁহার প্রতিভার কোন লক্ষণই প্রতিভাত হয় নাই। স্রুসবেরীর বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়াও তিনি বিশেষ কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি দুর্বল ছিল। শারীরিক শাস্তির ভয়ে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় কবিতা কোনক্রমে মুখস্থ করিয়াও দুই একদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে ডারউইন নির্বোধ ও অলস বলিয়া পরিচিত হইলেও রসায়নশাস্ত্র, কবিতা আবৃত্তি, সেক্সপীয়ারের নাটক প্রভৃতি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল; কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল তাঁহার নিকট নানাপ্রকারের জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি, এমন কি বিভিন্ন প্রকারের শিলা-ও। রসায়নশাস্ত্রের নানা পরীক্ষায় লিপ্ত থাকায় তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "গ্যাস"।

শিকারেও তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে ঘরে ও বাহিরে যথেষ্ট তিরস্কার সহ্য করিতে হইলেও ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আলোকপাত করে। কিন্তু ডারউইনের পিতা তাঁহার পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্রুসবেরীর বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ডারউইন এডিনবরায় আসিলেন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য। পিতা আশা করিয়াছিলেন, পুত্র ডারুইন চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া তাঁহার ব্যবসায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন; কিন্তু তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। প্রাক ক্লোরফর্ম যুগে শল্য-চিকিৎসা এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল। কোমল হৃদয় ডারউইন এ-দৃশ্য দেখিতে পারিতেন না। ফলে তাঁহার চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা করা হইল না; কিন্তু তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বেশ জ্ঞান লাভ করিলেন। একদিন কোন বালকের অস্ত্রোপচার কালীন ভীষণ চিৎকার ভাবপ্রবণ ডারউইনের চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার যবনিকাপাত করে। এডিনবরায় কয়েকজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়; তাঁহাদের মধ্যে একজন নিগ্রো ছিলেন। পক্ষি-দেহের আবরণ মোচন করিয়া কিরূপে উহাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করা যায়, ডারউইন সেই নিগ্রো বন্ধুর নিকট তাহা শিক্ষা করেন। এই সময় মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কোন সামুদ্রিক কীটের সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেন।

পুত্রের বিদ্যা অর্জনে কোনরূপ আগ্রহ না দেখিয়া পিতা হতাশ হইলেন। তখনও ডারউইন পূর্বের ন্যায় শিকার, খেলাধূলা, কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ প্রভৃতি নানা আমোদজনক কার্যে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে পাদ্রী হইবার জন্য আবশ্যকীয় শিক্ষালাভ করিতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ক্রাইষ্টস্ কলেজে ভর্তি হইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হইল না। তাঁহার অপরাপর সহপাঠীরা যখন নানাপ্রকার খেলায় মত্ত, ডারুইন তখন বিবিধ কীট-পতঙ্গ ধরিতে ব্যস্ত; ইহাই তাঁহার পক্ষে অধিক আকর্ষণীয়। একদিন তিনি নূতন ধরণের দুইটি গুবরে পোকা দুই মুষ্টিতে ধরিয়াছিলেন, এমন সময় অপর একটি অন্য প্রকারের দুর্লভ গুবরে পোকা দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি কি করেন, দুইটি মুষ্টিই আবদ্ধ, অথচ তৃতীয় গুবরে পোকাটিও চাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া একটিকে মুখে রাখিয়া অপরটি ধরিতে গেলেন। মুখের গুবরে পোকাটির শরীর হইতে এমন এক জ্বালাকর রস নিঃসৃত হইল যে, তিনি সেটি ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং ইতিমধ্যে অপর গুবরে পোকাটিও উড়িয়া গেল। এইরূপে তিনি তিনটি বৎসর পাঠ্যবিষয়ে অবহেলা করিয়া জীববিদ্যার চর্চায় অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তিনি উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হেন্স্লো ও ভূ-বিদ্যার অধ্যাপক সেজউইকের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সেজউইকই* তাঁহাকে পরীক্ষা

* আডাম্ সেজউইক—বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ ইয়র্কসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হইতে ১৮০৮

ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষা দেন। বিদ্যালয়ের সেই অলস ও বুদ্ধিহীন বালক ডারউইন ইঁহাদের নিকট তাঁহার মনোমত বিষয় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অনায়াসে দশম স্থান অধিকার করিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই ডারউইন বাহির হইলেন ভূ-তত্ত্বের অনুসন্ধানে, সঙ্গে অধ্যাপক সেজউইক। অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অধ্যাপক বন্ধু হেন্‌স্লোর* এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে, নৌ-বিভাগ কর্তৃক দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল জরীপের কার্যে নিযুক্ত কাপ্তেন ফিজরয়† একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ যুবককে তাঁহার সহযাত্রী করিতে ইচ্ছুক এবং অধ্যাপকের ইচ্ছা ডারউইন যেন এই অপূর্ব সুযোগ অবহেলা না করেন। এই অযাচিত আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মাতুল ওয়েজউডের চেষ্টায় পিতার সম্মতি পাইতেও তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না। অতঃপর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর ডারউইন 'বিগল' জাহাজে কাপ্তেন ফিজরয়ের সহযাত্রীরূপে ডিভনপোর্ট হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য ডারউইন 'বিগল' জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিয়া বিস্কে উপসাগর অতিক্রম করিবার সময় সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর হইয়া পড়িলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে এই যাত্রা শেষ হইলেও ডারউইন প্রায়ই সুস্থ থাকিতেন না; কিন্তু তাঁহার অদম্য উৎসাহী কৌতূহলী মন তাঁহাকে অক্লান্তভাবে অভীপ্সিত কার্যে নিযুক্ত রাখিত। যখনই কোন বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হইত, তিনি তাঁহার সংগৃহীত নানাপ্রকারের দুর্লভ কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদাদি, শিলাখণ্ড প্রভৃতি ডাকযোগে স্বদেশে প্রেরণ করিতেন; যেগুলি এইভাবে পাঠান সম্ভব হইত না, তাহাদের চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিতেন। একদিন জাহাজ আসিয়া কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জের সেণ্ট আয়াগো দ্বীপে নোঙ্গর করিল। এই দিনটি ডারুইনের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। এখানে আগ্নেয়গিরির লাভার দ্বারা আবৃত একটি কঠিন শ্বেত শিলাস্তর আবিষ্কার করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত শিলা যখন সমুদ্রগর্ভে ছিল সেই সময়ে প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের কঠিন দেহাবরণে উক্ত শ্বেত স্তরটি গঠিত হইয়া পরবর্তীকালে লাভার দ্বারা আবৃত হয় এবং কোন নৈসর্গিক কারণে ইহা উর্ধ্বে উত্থিত হয়।

সেণ্ট আয়াগো ত্যাগ করিয়া 'বিগল' আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিল। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে ব্রেজিলের বাহিয়ার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্য দেখিয়া ডারুইন মুগ্ধ হইলেন। রিও-ডি-জেনেরো (ব্রেজিলের রাজধানী; বাংলার বীর সন্তান কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিলের সামরিক বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই নগরে বাস করিতেন।) নগরে তাঁহারা তিন মাস নানা মনোরম দৃশ্য দেখিয়া অতিবাহিত করিলেন। আর্জেণ্টিনার পম্পাস তৃণ ভূমিতে

খৃষ্টাব্দে উপাধি লাভ করিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি ডারউইনের "জাতীর উৎপত্তি" নামক পুস্তকের বিষয়বস্তু সমর্থন করিতেন না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি ইঁহার মৃত্যু হয়।

* **জন ষ্টিভেন্স হেন্‌স্লো** (১৭৯৬-১৮৬১) একজন বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্। ইনি রচেষ্টার নগরে ও কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করেন।

† **রবার্ট ফিজরয়**—একজন বিখ্যাত নৌ-অধ্যক্ষ ও আবহতত্ত্ববিদ। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন সেণ্ট এডমণ্ডের অন্তঃপাতী বেরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাটাগোনিয়া ও টিয়েরা-ডেল-ফিগোর উপকূল জরীপ করেন। নিজ নামানুসারে ইনি একটি বায়ুচাপমান যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল আত্মহত্যা করিয়া দেহাবসান করেন।

নানাপ্রকারের পক্ষী ও জীবজন্তু এবং পাটাগোনিয়ায় অধুনালুপ্ত বৃহদাকার জীবের জীবাশ্ম দেখিলেন। তখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল কেন জীব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয়; লুপ্ত ও জীবিতের এবং সমশ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ?

তাঁহাদের জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল বাহিয়া আরও দক্ষিণে ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ও কুয়াশার রাজ্য টিয়েরা-ডেল-ফিগোতে উপস্থিত হইল। এখানকার হিমবাহের দৃশ্যে ডারউইন মুগ্ধ হইলেন।

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম অংশ হর্ণ অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া 'বিগল' ঐ মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের চিলি ও পেরুর উপকূল বাহিয়া অবশেষে গ্যালাপেগোজ দ্বীপপুঞ্জে নোঙ্গর করিল। এখানকার পক্ষিকুল তাঁহাদের উপস্থিতিতে কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইল না। ডারউইন লক্ষ্য করিলেন, বিভিন্ন দ্বীপের পাখীরা একই গোষ্ঠীর (Family) হইলেও তাহাদের জাতি (Species) পৃথক। এই যে পার্থক্য, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; কিন্তু তিনি তখন সেই কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হন। সেখান হইতে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার সময় ডারউইন দেখিলেন যে, বহুস্থানে প্রবাল শৈলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রবাল বলয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার কারণ তিনি অনুমান করিলেন যে, ঐ বলয়-গুলি নিমজ্জিত দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং ভূ-ত্বকের উর্ধ্ব ও অধোগতির ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ডারউইনের এই অনুমান অবশ্য অনেক পরে প্রমাণিত হয়। এইরূপে বহু দেশ, বহু দ্বীপ, আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর এবং পরে ভারত মহাসাগর দিয়া আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিক্রমণ করিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর 'বিগল' আসিয়া ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি স্পর্শ করিল। পাঁচ বৎসর পূর্বের স্বভাব-চঞ্চল ডারুইন এখন প্রকৃতির জ্ঞান ভাণ্ডারের অতুল রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সমুদ্র যাত্রার পথে তিনি যে-সকল জীবাশ্ম, খনিজপদার্থ, শিলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি পাঁচটি খণ্ডে একখানি পুস্তক সম্পাদন করিতে মনস্থ করিলেন। কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেও তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহার প্রচারিত মত-বাদের সত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইলেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ডারউইন তাঁহার মাতুল কন্যা এমা ওয়েজ-উডকে বিবাহ করেন। এমার পরিচর্যাগুণে ডারউইন অসুস্থ শরীরেও তাহার গবেষণা কার্যে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।

ক্রমবিবর্তন শব্দটির দ্বারা আমরা সাধারণতঃ এই বুঝি যে, আমাদের সৃষ্ট কোন যন্ত্রপাতির বা কল-কব্জার বিশেষ উন্নতি সাধন। ডারউইন দেখাইলেন বিবর্তনের ফলে বহু বৎসর ধরিয়া জীবজগতের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তন অতি ধীরে ধীরে হইলেও, ইহার জন্য কোন জীব এই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে আবার বহু নূতন জীবের সৃষ্টিও হইয়াছে। এখন আর দীর্ঘদন্ত ব্যাঘ্র বা ম্যামথ হস্তী দেখা যায় না; দীর্ঘকায় ডায়নোসোরাস লুপ্ত হইয়াছে; আবার বর্তমানের বলিষ্ঠ সুশ্রী অশ্ব এক কুৎসিৎ লোমশ চতুষ্পদের বংশধর এবং বন্য নেকড়ে বাঘই কালক্রমে আমাদের প্রভুভক্ত কুকুরে পরিণত হইয়াছে। এই যে একজাতীয় জীবের লোপ এবং নূতন নূতন জীবের উৎপত্তি কি অদৃশ্য কারণে সংঘটিত হয়, সে প্রশ্নের সমাধান করেন ডারউইন। তিনি বলেন জীবন-সংগ্রামই ইহার মুখ্য কারণ। দুর্বল জীব জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া লুপ্ত হইবে; সবল তাহার স্থান অধিকার করিবে। জীবনধারণের জন্য পরস্পরের মধ্যে ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে প্রতিযোগিতা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের সামর্থ্য বা অসামর্থ্য জীবের বংশ বৃদ্ধি বা লোপের সহায়ক। যাহারা এই যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহারাই

ধরাপৃষ্ঠে থাকিতে পায়, অন্যেরা লুপ্ত হয়। ইহাকেই যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন বলিয়া ডারুইন অভিহিত করিয়াছেন। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, বর্তমান যুগে জীবজগতে আমরা যে সকল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি তাহা কোন এক শুভ মুহূর্তে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ডেকার্টে, লিপনিজ, হিউম, ডারউইন প্রমুখ মনীষীরা আমাদের সেই ভুল ধারণার নিরসন করিয়াছেন। অবশ্য ডারউইনই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান এবং তাঁহার মতবাদের স্থানও সর্বোচ্চে।

অসামান্য সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়া তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Origin of Species, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে Variation of Plants and Animals under Domestication এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে Descent of man—এই তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া ক্রমবিবর্তনবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। Origin of Species পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইল, এরূপ আর কোনও পুস্তকের ক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া অভিহিত করিল; খৃষ্ট-ধর্মের শত্রু বলিয়া তিনি গণ্য হইলেন। এই সকল বিরুদ্ধবাদীগণের অপ্রিয় মন্তব্য তিনি নীরবে সহ্য করিলেন, কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে তর্কে অবতীর্ণ হইলেন, ডারুইন তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন।

যদিও ডারউইন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লিখিতে আরম্ভ করেন তথাপি ইহা সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার দীর্ঘ উনিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহার লেখা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সে সময়ে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মলাক্কাস দ্বীপে গবেষণারত তাঁহার প্রকৃতিতত্ত্ববিদ বন্ধু আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস স্ব-রচিত একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধন ও তাঁহার মতামত গ্রহণের জন্য ডারউইনকে পাঠান এবং ভূ-তত্ত্ববিদ্ লায়ালকে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ডারউইন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখেন, ওয়ালেসও তাঁহার ধারা অনুসরণ করিয়াই জীবের উদ্‌বর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উনিশ বৎসরের কঠিন শ্রম বিফলে যায় দেখিয়া ডারুইন হতাশ হইলেন; কিন্তু তিনি মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি অনায়াসে ওয়ালেসকে ফাঁকি দিয়া নিজের প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে লোকে যদি তাঁহাকে নীচমনা ভাবে এই-জন্য তিনি তাঁহার নিজের প্রবন্ধ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে বন্ধু লায়াল বাধা দিলেন। এই বন্ধুর ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ হুকারের চেষ্টায় লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই, ডারউইন ও ওয়ালেসের যুক্তনামে এক যুগান্তরকারী প্রবন্ধ পঠিত হয়। সে সময়ে ঐ প্রবন্ধ লায়াল, হুকার ও জীববিদ্যাবিশারদ হাক্সলী ব্যতীত আর কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ওয়ালেসও কম উদার ছিলেন না। তিনি প্রচার করিলেন, ডারউইনই এই প্রবন্ধনিহিত সত্যের আবিষ্কারক।

মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের অভিনব অভিমত বুঝিতে না পারিয়া, অনেকেই এই মতকে বাইবেল, তথা খৃষ্টধর্ম বিরোধী মনে করিয়া ডারুইনকে আক্রমণ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে বৃটিশ এসোসিয়েসনে তাঁহার মতবাদ খণ্ডনের জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। একদিকে দলবলসহ বিশপ উইবারফোর্স, অপর পক্ষে হাক্সলী, হেকেল প্রমুখ ডারউইন-পন্থীগণ। বিশপের দলের ধারণা ডারউইন বলিয়াছেন, মানুষ বানরের বংশধর; কিন্তু বাইবেল বলে, সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ডারউইন বলেন, মানুষ

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট বর্গের হোমো সেপিয়েন্স গোষ্ঠীর জীব; অপর গোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি হইয়াছে বানরের। মানুষ প্রথমে বৃক্ষচারী থাকিলেও পরিবেশের পরিবর্তনে ও খাদ্যের সন্ধানে স্থলচারী জীবে পরিবর্তিত হয়। বাইবেল মতানুযায়ী মানুষ হঠাৎ সৃষ্ট নয়, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান স্তরে উপনীত হইয়াছে। ডারউইন বিরুদ্ধবাদীগণের আক্রমণে কখনও বিচলিত হন নাই। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সত্য যাহা তাহা অবিনাশী। তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহাকে কেহ গালাগালি করিলে, ডারউইন সহাস্যে বলিতেন, উহারা আমার মতবাদ আলোচনা করিয়া তাহাকে আরও সুস্পষ্ট করিতেছে।

ডারউইনের শরীর ক্রমেই খারাপ হওয়ায় তিনি কেন্টের অন্তঃপাতী ডাউন নগরীতে চিকিৎসকের নির্দেশমত অবসর জীবনযাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার গবেষণার কার্য অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গী ছিল বাগানের বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ। ইহাদের সঙ্গসুখে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। সর্বক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারার গতি পরিবর্তিত করিয়া জীববিজ্ঞানে নূতন পথের সন্ধান দিয়া ডারউইন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল ৭৪ বৎসর বয়সে বিনা রোগভোগে হঠাৎ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের পার্শ্বে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ডারউইনের পূর্বে ল্যামার্ক এবং পরবর্তী যুগে জার্মান বৈজ্ঞানিক হ্বাইসম্যান, মেণ্ডেল প্রভৃতি বিজ্ঞানী জীববিজ্ঞানে নব নব তথ্যের সন্ধান দিয়াও ডারউইন আবিষ্কৃত মূলসূত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই; তাঁহার মতবাদ এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পুস্তক-পরিচয়

বিশ্বরহস্যে নিউটন ও আইনষ্টাইন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার এম্, এস-সি।

প্রকাশক—মোহাম্মদ আবদুল খালেক

দি মালিক লাইব্রেরী

৭৩ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। মূল্য—২৷০

বিজ্ঞান জগতে নিউটন এবং আইনষ্টাইনের অবদান সকলকেই বিস্ময়ে অভিভূত করে। নিউটনের যুগে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিবিদ্যা সম্বন্ধে মানুষের মনে সব অদ্ভুত ধারণা ছিল। সেগুলি অতিক্রম করে নিউটনের পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করা অদ্বিতীয় প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। অধুনিক যুগেও তেমনি বিজ্ঞানীদের 'স্থান ও কাল' সম্বন্ধে দৃঢ়মূল ধারণাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে বৃহত্তম বিপ্লব। এঁদের দুজনার আবিষ্কৃত তথ্যের আলোচনা করার চেষ্টা, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়, সত্যই অত্যন্ত দুরূহ। এদিক থেকে আবদুল জব্বার সাহেবের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে নিউটনের তথ্য যদিও বা উপলব্ধি করা সম্ভব, বিনা গণিতে আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্বের অনুধাবন একরূপ অসম্ভব। এজন্য পুস্তকের শেষের দিকে জব্বার সাহেবকে গণিতের সাহায্য লইতেও হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি সাধারণ পাঠক-মণ্ডলীর পক্ষে কতদূর বোধগম্য হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। লেখকের প্রকাশভঙ্গী বেশ সুন্দর, এজন্য পুস্তকখানি, জটিল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও, সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষার সাবলীলতা লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকে 'পানি' এবং 'খোদা' শব্দের ক্রমাগত ব্যবহার শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হয়। শিক্ষিত মনে কৌতূহল উদ্রেকের প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণায় ভারত*

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

একথা আমরা সকলেই জানি যে, ভারত পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশ অপেক্ষা আজও অনেক পিছিয়ে আছে। সুদীর্ঘ দুইশত বছরের পরাধীনতাই এর প্রধান কারণ। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং এই স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্রমোন্নতি আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান অবস্থা ও শিল্পোন্নতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে সেটা হচ্ছে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। আজকের এই আলোচনা শুনে যদি অনেকে বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয় তবেই আমাদের এই আলোচনা সার্থক হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিই একমাত্র ভারতীয় শিল্প ছিল। বিংশ শতাব্দীর পত্তন থেকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্প সম্প্রসারণের যুগারম্ভ বলেই মনে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বস্ত্র ও পাট শিল্পের কিছু কিছু প্রসারণ হয়েছিল। এই মহাযুদ্ধের সময়েই ভারতে নানাপ্রকার শিল্পজাত পদার্থের অভাব অনুভূত হয় এবং সেই অভাব মিটাবার উপায় নির্ধারণের জন্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি শিল্প কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের অধিনায়ক ছিলেন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ স্যার টমাস হল্যাণ্ড। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই কমিশন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মত একটি "অল ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল সার্ভিস" স্থাপনের সুপারিশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের কিছুই কার্যে পরিণত হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের জন্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (I. C. A. R) এবং ভারতীয় গবেষণা সমিতি (I. R. F.A) স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘর্ষই সর্বপ্রকার শিল্প সম্প্রসারণ সম্পর্কে পুনরায় ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এর প্রধান কারণ হয়েছিল এই যে, এদেশে তৈরী মালের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দ্বারাই যে শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপন সম্ভবপর, ভারত গভর্ণমেণ্ট তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪০ সালে "বোর্ড অফ সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ" নামে কলিকাতার আলিপুর টেষ্ট হাউসে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হয়। গভর্ণমেণ্টকে শিল্প বিষয়ে (বিশেষতঃ যে সমস্ত শিল্প যুদ্ধের জন্য আবশ্যক) উপদেশ দেওয়া ছাড়াও এই বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল যে, এ দেশে অন্য যে সমস্ত গবেষণাগার আছে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের সঙ্গে শিল্পোন্নতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা। কোন কোন বিষয়ের গবেষণা এই বোর্ড তাহার নিজস্ব গবেষণাগারে সুরু করে এবং অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্যের দ্বারা বিবিধ বিষয়ে গবেষণা চালু করে। গবেষণার দ্বারা যে সমস্ত আবিষ্কার হয় তার ব্যবহারিক প্রয়োগ অথবা তা কি ভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে একটি "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ইউটিলিজেসন" কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বোর্ডকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসে তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য স্যার রামস্বামী

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

মুদালিয়ার ভারতীয় "লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্ব্লিতে" ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের জন্যে বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন এই অর্থ দেশের সর্ববিধ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যের সহায়তার জন্যে ব্যয়িত হবে। মেধাবী ছাত্রদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়। এ-ছাড়া শিল্প বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান হতে পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ় ভিত্তিতে এই "কাউন্সিল অফ সয়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ," (সংক্ষেপে C. S. I. R) স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই "সি, এস, আই আর" এর সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই প্রতিষ্ঠানের সহঃ সভাপতি। ১৯৪১ সালের শেষ ভাগে এই C. S. I. R-এর গবেষণাগার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে ওখানেই উহা অবস্থিত।

বিগত ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্যন্ত "সি এস আই আর"-এর মারফত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে প্রায় ৭ কোটি ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। এই টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যবহারিক গবেষণার জন্যে, ১ কোটি ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা তাত্বিক গবেষণার জন্যে, ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার যুদ্ধ সম্পর্কিত গবেষণা এবং ৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা জরিপ এবং আবশ্যকীয় শিল্পসম্ভারের জন্যে ব্যয় হয়েছে। ব্যবহারিক গবেষণায় যে টাকা খরচ হয়েছে তার মধ্যে ২৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা "সি, এস, আই, আর" দ্বারা অর্থ সাহায্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণাগারে এবং ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা "সি, এস, আই, আর,"-এর দিল্লীস্থিত নিজস্ব গবেষণাগারে ব্যয়িত হয়েছে।

ব্যবহারিক ও তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রভেদে সাধারণতঃ লোকের ভ্রম হয়। ব্যবহারিক গবেষণার মূল ভিত্তি হলো তত্ত্বীয় বিজ্ঞান। যেমন প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এদেশে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রতম বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই তরঙ্গের ব্যবহার বিগত মহাযুদ্ধে রেডার নামক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। আণবিক বোমা আবিষ্কারের বহু পূর্বেই আণবিক শক্তি সংক্রান্ত নানা তত্ত্বীয় গবেষণা চলেছে এবং কেউ ধারণা করতে পারেন নি যে, এই শক্তি জগতের মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই প্রকারেই প্রয়োগ করা যেতে পারবে।

স্বাধীনতা লাভের প্রথম থেকেই ভারত গভর্ণমেণ্ট বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে, শিল্পোন্নতির দ্বারাই দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর এবং এই শিল্পোন্নতি নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর। এই কারণে বিজ্ঞান সম্পর্কীত বিষয় স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের ১লা জুন থেকে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপন করেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই দপ্তরেরও ভার নিয়েছেন।

যে সমস্ত বিষয়ে সি, এস, আই, আর, তার নিজস্ব গবেষণাগারে অথবা অন্যত্র গবেষণাকার্যে সহায়তা করছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। যেমন, ড্রাইসেল এবং কার্বন ইলেকট্রোড নির্মাণ, প্লাষ্টিক্স্, উপক্ষার, উদ্ভিদ-জাত রঞ্জক পদার্থ, কীটনাশক এবং অপরাপর উদ্ভিদ-জাত, জৈব এবং অজৈব রাসায়নিক দ্রব্যাদি। সস্তা রেডিও সেট এবং রেডিও ভাল্ভ্ প্রস্তুতকরণ, রাসায়নিক পোর্সেলিন উৎপাদন, ভারতীয় বনৌষধি, এমিটিন এবং enterovioform প্রস্তুতকরণ, ভারতীয় খনিজ পদার্থ এবং mineral spring এর রেডিয়ামের মাপ, আইওনোস্ফিয়ার সম্পর্কিত গবেষণা' ভ্যাকুয়াম পাম্প, Compressor এবং রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত, পৃথিবীর স্তরের বয়স নিরূপণ, কয়লার গন্ধক বিমুক্তকরণ ইত্যাদি। এই সমস্ত

গবেষণা কার্যের ব্যবস্থা করার জন্যে ২৪টি কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়েছে। এপর্যন্ত ২ শতাধিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যের জন্যে সাহায্য করা হয়েছে। কতকগুলোর ফল ভারতীয় পেটেণ্ট আইনের দ্বারা সংরক্ষিত। বি, এস, আই, আর-এর প্রতিষ্ঠানের প্রথম থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতির আবশ্যক তাহার কিছুই ভারতে উৎপন্ন হয় না। ভারতে উৎপন্ন কাঁচা মাল থেকে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা আবশ্যক। শিল্পের উন্নতি বজায় রাখতে হলে শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা অত্যাবশ্যক। ১৯৪৪ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি বৃহৎ জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন করেন এবং C. S. I. R.-এর বিভিন্ন উপসমিতির সুপারিশক্রমে ভারত গভর্ণমেণ্ট এ পর্যন্ত যে কয়টি গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে, যথা :—

১। ১৯৪৫—সেণ্ট্রাল গ্লাস ও সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ; কলকাতার নিকট যাদবপুরে। স্যার আর্দেশীর দালাল কর্তৃক ১৯৫৫ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ জে, ক্রাইডেল ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন।

২। ১৯৪৬ ন্যাশনাল ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ; ধানবাদের নিকট ডিক্যাদীতে। সি, এচ, ভাবা কর্তৃক ১৯৪৬ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ জে, ডব্লিউ, ভিট্রেকার ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন।

৩। ১৯৪৬—ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরেটরী ; জামসেদপুরে। মাননীয় শ্রী সি, রাজাগোপালচারী কর্তৃক ১৯৪৬ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ জি, স্যাক্‌স্‌ ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন।

৪। ১৯৪৭—ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী, নয়াদিল্লীতে ; পণ্ডিত ১৯৪৭ সালে জহরলাল নেহেরু কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। স্যার কে, এস কৃষ্ণন ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন।

৫। ১৯৪৭—ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী ; পুনাতে। মাননীয় বি, জি খের কর্তৃক ১৯৪৭ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ জে এম ম্যাকবেন ইহার অধ্যক্ষ পদে আগামী অক্টোবর মাসে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

৬। ১৯৪৮—সেণ্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, মাদ্রাজে। মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কর্তৃক ১৯৪৯ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

৭। ১৯৪৮—সেণ্ট্রাল ইলেকট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট মাদ্রাজের নিকট কারাইকুদী স্থানে। পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক ১৯৪৮ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। শেষোক্ত দুইটি গবেষণাগারের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি। ইহা ব্যতীত সি. এস. আই. আর. আরও ৪টি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন যথা—

৮। রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট—দিল্লী

৯। বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট—রুরকী

১০। সেণ্ট্রাল ফুড টেকনজিকাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট—মহীশূর

১১। সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট—লক্ষ্ণৌ।

শেষোক্ত দুইটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্যে মহীশূর গভর্ণমেণ্টের চেরালম্ব প্রাসাদ এবং লক্ষ্ণৌয়ের ছত্রমঞ্জিল সি. এস. আই. আর.-কে দান করা হয়েছে। এ ছাড়া এই সমস্ত গবেষণাগার নির্মাণকল্পে ডোরাবজী টাটা ও রতনটাটা ২০ লক্ষ টাকা দান করেছেন। ডক্টর আলাগাপ্পা চেটিয়ার ১৫ লক্ষ টাকা এবং ঝরিয়ার রাজা তিনশত একর জমি দিয়েছেন। সেণ্ট্রাল ফুড টেক্‌নোজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের কাজ সম্প্রতি সুরু হয়েছে এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থেকে সিন্থেটিক দুগ্ধ উৎপত্তির উপায় নির্ধারণের জন্যে গবেষণা চলছে। এই

প্রতিষ্ঠানটিকে সমস্ত এশিয়ার খাদ্য বিষয়ক গবেষণাগার করার জন্যে ইউনেস্কোর সাহায্যে এটিকে আন্তর্জাতিক গবেষণাগার করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এ ছাড়া ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি বেসরকারী গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। যথা:—

১। ১৯৪৫—টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ্চ, বোম্বাইতে স্যার জন কলভিন কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ এইচ, জে, ভাবা ইহার অধ্যক্ষ।

২। ১৯৪৮—ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। ১৯৪৮ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ইহার অধ্যক্ষ। এই গবেষণাগারে আণবিক শক্তি গবেষণার জন্যে একটি সাইক্লোট্রোন যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র এশিয়াতে এই একমাত্র সাইক্লোট্রোন। বিগত মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের সাইক্লোট্রনগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

৩। ১৯৪৯—ইনষ্টিটিউট অফ পেলিওবোটানী। গত ৩রা এপ্রিল পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ গবেষণাগার এই প্রথম এবং দুঃখের বিষয় এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক বীরবল সাহনী ভিত্তি স্থাপনের ৭ দিনের মধ্যে হঠাৎ মারা যান। যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন প্রায় অনুরূপ আদর্শেই অধ্যাপক সাহনী তাঁর সঞ্চিত অর্থ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই গবেষণাগারের জন্যে দান করেন।

৪। ১৯৪৯—ইনষ্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর গত এপ্রিল মাসে স্থাপিত হয়; অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ইহার অধ্যক্ষ।

ভারতের জাতীয় গবেষণার ইতিহাসে আরও দুইটি গবেষণাগার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন এবং বর্তমানে এই গবেষণাগারে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও জৈববিদ্যায় বহু উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলছে। ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু বর্তমানে ইহার অধ্যক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুপযুক্ত বলে তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেণ্ট কোনও প্রকার বিজ্ঞান চেষ্টার ব্যবস্থা করেন নি, সেই সময়ে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়ান্স" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই ভারতের অন্যতম বিজ্ঞানী ডাঃ স্যার বেঙ্কট রামন তাঁর বিখ্যাত "রামন এফেক্ট" সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা জগৎকে আশ্চর্যান্বিত করেন এবং ১৯৩১ সালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে অধ্যাপক রামনকে ন্যাশানাল রিসার্চ প্রফেসার পদে অধিষ্ঠিত করে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এই গবেষণাগারের নূতন বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর গত বৎসর যাদবপুরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক স্থাপিত হয়। বর্তমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এই গবেষণাগারের অবৈতনিক অধ্যক্ষ। এতদ্ব্যতীত ভারতের সমস্ত বিজ্ঞানীদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগে রাখার ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালে গঠিত হয়। বিলাতে রয়াল সোসাইটির অনুরূপ আদর্শেই ইহা গঠিত। বর্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় দু-শতাধিক ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইহার সভাপতি। ভারত গভর্ণমেণ্টের সায়ান্টিফিক রিসার্চ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী এবং সি. এস. আই. আর. এর অধ্যক্ষ যিনি প্রায় গত ১০ বৎসরে কয়েকটি জাতীয় গবেষণাগার সৃষ্টির মূলে, তাঁর নাম বলেই আজকের এই আলোচনা শেষ করব। ইনি হচ্ছেন স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী ও শিল্পীগণ ইঁহার কার্যকলাপের সমালোচনা সম্যকভাবে করতে সক্ষম হবেন।

দ্বীপময় জগৎ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

নির্মল আকাশের দিকে চাইলে যে শুভ্র ছায়াপথ পার্থিব বিষুবরেখার মত আকাশকে সমান দ্বিখণ্ডে ভাগ করেছে দেখতে পাই, আমাদের সূর্য তারই একটি নক্ষত্র। এরূপ আরও বহু কোটি নক্ষত্র আমাদের এই ছায়াপথে বর্তমান রয়েছে। মসুরীকার (lenticular) এই ছায়াপথের সমতলে নক্ষত্রের সংখ্যা খুব বেশী, আর তার লম্বাদিকের সমতলে নক্ষত্রের সংখ্যা অল্প। ছায়াপথের এই গঠনের তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন হার্সেল নামক একজন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ক্যাপ্‌টিন গণনার দ্বারা স্থির করেন যে, আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ কোটি। এতগুলো নক্ষত্র পরস্পরের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রেখে অবস্থান করছে। তাই আমাদের ছায়াপথের আয়তন যে কত বৃহৎ তা বলা বাহুল্য মাত্র। হিসেব করে দেখা হয়েছে যে, আমাদের এই ছায়াপথের ব্যাস প্রায় এক-লক্ষ আলোকবছর, আর তার বেধ হবে প্রায় দশ হাজার আলোকবছর। (আলোক বছর = ৫৯০০ মিলিয়ন মাইল)। আমাদের সূর্য ছায়া-পথের কেন্দ্রের ত্রিশ হাজার আলোকবছর দূরে অবস্থান করছে। স্যাগিটারিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলী ছায়াপথের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। নক্ষত্র সৃষ্টির পর কতকগুলো কৃষ্ণবর্ণ শীতলতর বায়ব পৃথিবী ও ছায়াপথের কেন্দ্রের মধ্যস্থলে এমন-ভাবে ভীড় করে আছে যে, আমাদের পক্ষে ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্রগুলোর গতিবিধি অনুধাবন করে দেখা গেছে যে, এরা মহাশূন্যে দ্রুতগতিতে বিচরণশীল। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, নক্ষত্র স্থির ও গ্রহগুলোই নক্ষত্রের চারিদিকে বিচরণ করে। কিন্তু সে ধারণা বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি, নক্ষত্রের বেগ গ্রহের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু নক্ষত্রগুলো বহুদূরে থাকায় এই বেগের দরুণ তাদের অবস্থানের সামান্য কৌণিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন সময়ে তোলা নক্ষত্রমণ্ডলীর ফটোগ্রাফ থেকে আমরা তাদের এই পরিবর্তন বেশ উপলব্ধি করতে পারি। ১নং চিত্রে গ্রেট্‌বিয়ার নক্ষত্রমণ্ডলী ২ লক্ষ বছরে তার নিজস্ব বেগের দ্বারা কিরূপ পরিবর্তিত হবে তা দেখান হয়েছে। চিত্রে দেখা যাবে যে, নক্ষত্রগুলো যদিও অনিয়মিত ও স্বাধীন গতিতে বিচরণ করছে তবু একটা বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলী একসঙ্গেই স্থান পরিবর্তন করে। গ্রেট্‌বিয়ার নক্ষত্রমণ্ডলীর পাঁচটি নক্ষত্রও একই দিকে বিচরণ করছে আর অবশিষ্ট দুটির পৃথক গতি থেকে মনে হয় যে, তারা এই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এই নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ করার সময় এই দুটি নক্ষত্রকে নিশ্চয়ই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত দেখতে পান নি। ২নং চিত্রে এক লক্ষ বৎসরে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলীর আনুমানিক ভবিষ্যৎ পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, নক্ষত্রদের রৈখিক গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় গড়ে ২০ কিলোমিটার। কোন কোন নক্ষত্র সেকেণ্ডে ১০০ কিলোমিটারও দেখা যায়। আমাদের সূর্য হারকিউলাস নক্ষত্রমণ্ডলীর কোনও বিন্দুর দিকে সেকেণ্ডে ১৯ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে। নক্ষত্রগুলো এত বেগবান হলেও দুটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ প্রায়ই সম্ভব হয় না; কারণ নক্ষত্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান

রয়েছে। গণনায় দেখা গেছে, গত ২ বিলিয়ন বছরে কয়েকটি মাত্র এরূপ সংঘর্ষ ঘটেছে।

নক্ষত্রদের এই গতিবেগ ছাড়া আমাদের ছায়াপথ ও তার কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুর্দিকে এক শতাব্দীতে প্রায় ৭ কৌণিক সেকেণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে। কৌণিকবেগ সামান্য হলেও ছায়াপথের উপরিতলের রৈখিকবেগ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে প্রায় কয়েকশত কিলোমিটার। সম্ভবতঃ এই আবর্তনের ফলেই ছায়াপথ চ্যাপ্টা মসুরাকৃতি ধারণ করেছে।

নক্ষত্র ছাড়া আমাদের ছায়াপথে রয়েছে অসংখ্য নীহারিকা। ঘনবাষ্প দিয়ে গড়া এই নীহারিকাগুলোর কোনটি দূরবীণ দ্বারা গ্রহের মত দেখায়। এদের বলা হয় গ্রহনীহারিকা (Planetary nebulae)। কোন কোনটি বা অনিয়মিত আকারের বৃহদায়তনরূপে প্রতিভাত হয়। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ছায়াপথ নীহারিকা। কিন্তু এই সব নীহারিকা ছাড়া আমাদের ছায়াপথের বাইরে এক শ্রেণীর নীহারিকা দেখা যায়। এগুলোকে বলা হয় বহির্ছায়াপথ নীহারিকা (Extragalactic nebulae)। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০" ইঞ্চি দূরবীণযোগে এই নীহারিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ৩নং চিত্রে বিজ্ঞানী হাবল প্রণীত বহির্ছায়াপথ নীহারিকাদের শ্রেণী বিভাগ ও গঠন দেখানো হয়েছে। এদের কোনটি কুণ্ডলিকৃত আর কোনটি বা উপবৃত্তাকার (Elliptic)। আমাদের ছায়াপথের বাইরে এই অসংখ্য নীহারিকা অতল সমুদ্ররূপ মহাকাশে এক একটি বৃহৎ দ্বীপের মত অবস্থান করছে। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে দ্বীপময় জগৎ।

এক নম্বর চিত্র

দূরবীণযোগে আমাদের ছায়াপথের নিকটস্থ নীহারিকাগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে বহু তারকা সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাছাড়া এই সব নীহারিকার বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের আলোক বৈশিষ্ট্য সূর্যের

আলোকের সঙ্গে সমান। তাই সূর্যের পৃষ্ঠতাপমাত্রার সঙ্গে এই নীহারিকাগুলোর পৃষ্ঠতাপমাত্রার বিশেষ পার্থক্য থাকতে পারে না। এই নীহারিকাগুলো যদি সূর্যের পৃষ্ঠতাপমাত্রা বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন বায়বপিণ্ড দিয়ে গড়া হতো তাহলে বিকীর্ণ সমগ্র আলো তাদের পৃষ্ঠআয়তনের সঙ্গে সমানুপাতী হওয়া উচিত ছিল। এই নীহারিকাগুলোর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বড়। তাহলে তাদের উজ্জ্বলতা আরও কোটি কোটি গুণ বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, আমাদের ছায়াপথের প্রতিবেশী এণ্ড্রোমেডা নীহারিকার ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে মাত্র ১.৭ লক্ষ কোটিগুণ বেশী। তাই আমরা বলতে পারি যে,
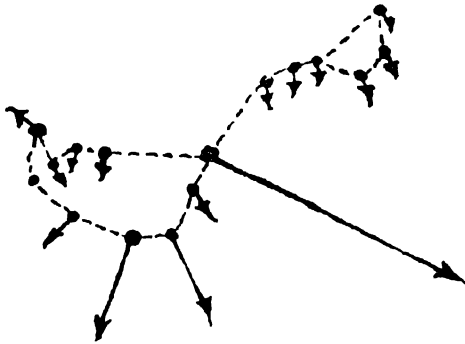
২নং চিত্র

নীহারিকার আলো তার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ থেকে আসে না, তার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু থেকে বিকীর্ণ হয়। এই আলোকবিন্দুগুলোর মোট আয়তন সমগ্র নীহারিকার আয়তন হতে নিশ্চয়ই কম। তাই এই ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুগুলোকে সাধারণ নক্ষত্র মনে করা স্বাভাবিক। আমাদের ছায়াপথের নীহারিকাগুলোর সংগে তুলনা করলে এগুলোকে আর নীহারিকা বলা যায় না। এরা আমাদের ছায়াপথের বাইরের ছায়াপথ যাতে আরও কোটি কোটি নক্ষত্র পুঞ্জিত হয়ে পৃথক নক্ষত্র জগৎ গড়ে তুলেছে।

বিজ্ঞানী হাবেল দেখিয়েছেন যে, আমাদের প্রতিবেশী এম্ ৩১ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকায় আমাদের ছায়াপথের মত সাধারণ নক্ষত্র, সেফেইড ভেরিয়েবল শ্রেণীর নক্ষত্র ও নবতারার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। এই নীহারিকা আমাদের ছায়াপথ থেকে প্রায় ৬৮০০০০ আলোকবছর দূরে অবস্থিত। আমাদের ছায়াপথের দূরতম বিন্দু নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্বের প্রায় চারগুণ দূরে এই নীহারিকা অবস্থিত। তাই এরা আমাদের ছায়াপথ থেকে বিচ্ছিন্ন বাইরের ছায়াপথ বললে ভুল হয় না।

আমাদের ছায়াপথের যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ম্যাগেলনিক মেঘ নামে দুটি উপগ্রহ নীহারিকা রয়েছে তেমনি এণ্ড্রোমিডা নীহারিকারও এম ৩২ ও এন্, জি, সি, ২০৫ নামক উপগ্রহ নীহারিকা রয়েছে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ম্যাগলেনিক মেঘের ব্যাস যথাক্রমে প্রায় ১২০০০ ও ৬০০০ আলোকবছর; এত ছোট বলেই এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছায়াপথ শ্রেণীতে পড়ে না। সেরূপ এম ৩২ ও এন জি, সি, ২০৫ নীহারিকার ব্যাস প্রায় ৮০০ ও ১৬০০ আলোক বছর মাত্র।

এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা ছাড়া আমাদের ছায়াপথ থেকে দূরে ও কাছে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা তাদের বিশাল বপুর মধ্যে কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে অনন্ত আকাশে বিরাজ করছে। সবচেয়ে দূরতম যে নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় ১০০০ মিলিয়ান আলোক বছর। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এই দূরত্ব কল্পনায় আনাও দুঃসাধ্য। অধ্যাপক গ্যামোর ভাষায় এই সব দূরতম নীহারিকার যে আলো পৃথিবীর মনুষ্য বাসের পূর্বে পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের শতকরা ৯৯.৯ ভাগ অতিক্রম করেছিল, সেই আলো অবশিষ্ট ০.১ ভাগ পথ অতিক্রম করে মনুষ্যসৃষ্টির পর হাজার হাজার পুরুষের ব্যবধানে দূরবীণযোগে মানুষের চোখে ধরা পড়েছিল। আজ এই সব নীহারিকার আলো তাদের যে চিত্র নিয়ে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা

আমাদের পৃথিবীতে যখন পৌঁছবে, তখন পৃথিবীর যে কি রূপান্তর হয়ে থাকবে বিজ্ঞানীরা তা কল্পনা করতে পারেন না।

আমাদের ছায়াপথ তার কক্ষপথে আবর্তন করছে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বহির্ছায়াপথ নীহারিকাগুলোও তাদের অক্ষপথে নিয়মিতভাবে আবর্তন করছে। এণ্ড্রোমিডার নীহারিকা কয়েকশত মিলিয়ন বৎসরে একবার সম্পূর্ণভাবে আবর্তিত হয় এবং তার কৌণিকবেগ আমাদের ছায়াপথের কৌণিকবেগের সমান। এই আবর্তনের ফলেই ছায়াপথগুলো উপবৃত্ত'কার ধারণ করেছে। বিজ্ঞানী জীন্সের মতে ছায়াপথের অতিদ্রুত আবর্তনশীল বিষুবরৈখিক সমতল থেকে বহির্গত বস্তুপিণ্ড দিয়ে তাদের কুণ্ডলিকৃত বায়ুর উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য ৩নং চিত্রে প্রদত্ত দুইশ্রেণীর কুণ্ডলিকৃত বায়ুর উদ্ভবের ব্যাখ্যা আজও সম্ভব হয় নাই।

যাহোক মানুষ আজ তার নিজস্ব বুদ্ধিবলে বিশ্বরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। অনন্ত জগতের অভিযানে তার সাধনার সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। পৃথিবী থেকে সৌরজগৎ, সৌরজগৎ থেকে আমাদের নক্ষত্রলোকে, আরও অন্যান্য নক্ষত্রজগতের অন্তঃস্তলে মানুষ তার দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করেছে। সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মর্মচিত্র প্রতিভাত হবে। মানুষ আজ সেই কঠোর সাধনার চরম সিদ্ধিলাভের বিপুল সম্ভাবনায় দুর্গম বিজ্ঞান পথের অভিযাত্রী। সে সাধনা সার্থক হোক।

উপবৃত্ত ছায়াপথ

৩নং চিত্র
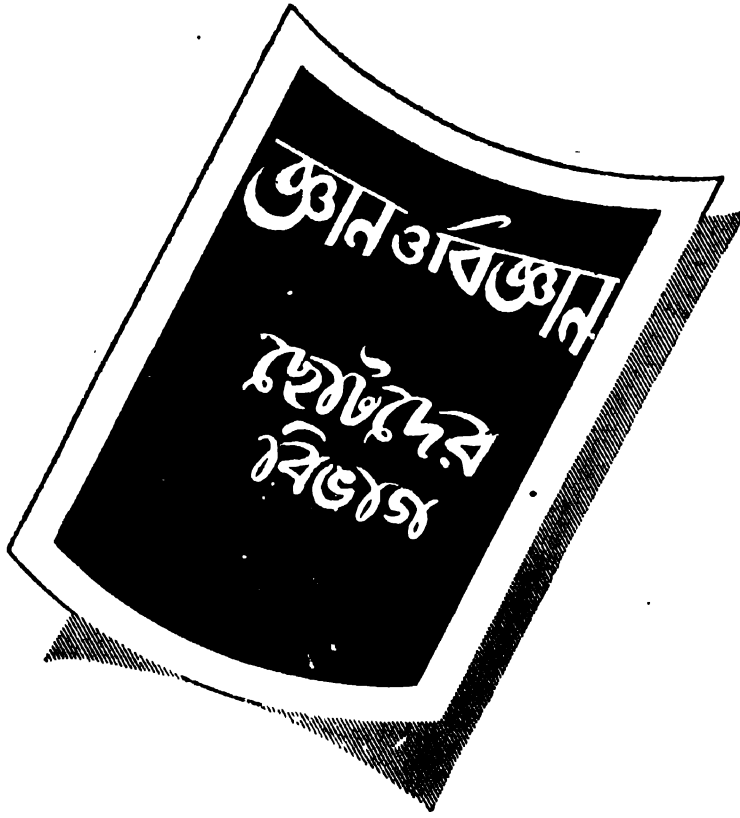
হাঁস যেমন জল থেকে দুধ পৃথক করে নেয়, তোমরা সেরূপ বিষয়বৈচিত্র্যের মিশ্রণ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ আহরণ কর।

গেল মাসের প্রকাশিত ছবির বিষয়ে লিখিত শোঁয়াপোকার কথা এবারে প্রকাশিত হলো। এবারে উদ্ভিদের আকর্ষণীর একটি ছবি দেওয়া হলো। এ সম্বন্ধে তোমরা যা জান, বিশেষ-করে নিজেরা যা চোখে দেখেছ—সেসব কথা সংক্ষেপে লিখে পাঠাবার চেষ্টা কর।

সাধারণতঃ কোন্ রকমের উদ্ভিদে আকর্ষণী থাকে?

উদ্ভিদের পক্ষে আকর্ষণী তন্তুর প্রয়োজন কি?

যত রকমের আকর্ষণী দেখেছ তাদের কার্যপ্রণালী বর্ণন কর।

আকর্ষণী স্প্রিং-এর মত জড়িয়ে যায় কেমন করে?

যে সব উদ্ভিদের আকর্ষণী নেই অথচ লতানো স্বভাব তারা বিস্তৃতি লাভ করে কিরূপে?

উদ্ভিদের আকর্ষণী তন্তু

উদ্ভিদের আকর্ষণী সম্বন্ধে যা জান 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ১০০ লাইনের বেশী না হয়—এরূপভাবে সংক্ষেপে লেখ। কাগজের একপৃষ্ঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখবে। সব চেয়ে ভাল লেখাটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হবে।
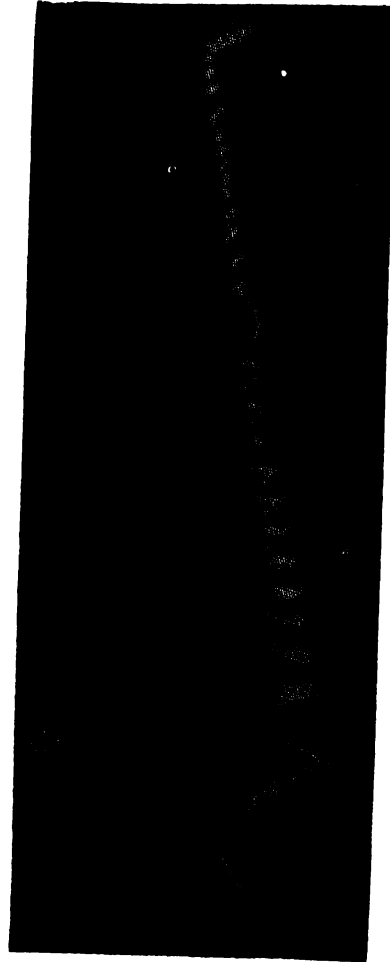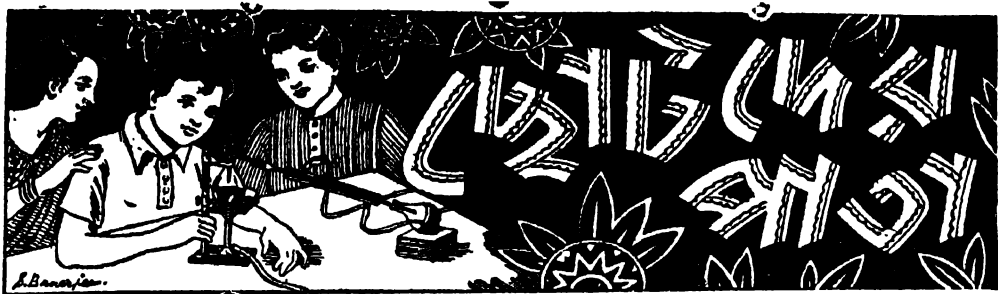
করে দেখ

বিদ্যুতের খেলা

তোমরা অনেকেই হয়তো বিদ্যুতের অনেকরকম খেলা দেখেছ। ইতিপূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'ও তোমাদের জন্যে কিছু কিছু বিদ্যুতের পরীক্ষার কথা লেখা হয়েছে। এবার তোমাদের জন্যে কয়েকটি অতি সাধারণ বিদ্যুতের খেলার কথা বলছি। এই খেলাগুলোর প্রত্যেকটিই তোমরা অনায়াসে নিজের হাতে করে দেখতে পারবে। কারণ এই পরীক্ষাগুলোতে যেসব জিনিসের দরকার হবে সেগুলো সংগ্রহ করতে তোমাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না।

(এক)

খুব পাত্‌লা অথচ শক্ত একখানা কাগজ থেকে ন' ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চি চওড়া একফালি কাগজ কেটে নাও। এই কাগজের ফালিটার দুই প্রান্ত আঠা দিয়ে জুড়ে সম্পূর্ণ গোলাকার একটা আংটির মত তৈরী কর। কাগজের আংটিটা এমন নিখুঁৎভাবে তৈরী করবে যেন জোড়ামুখ একটুও উঁচু নীচু না থাকে। মসৃণ টেবিলের উপর আংটিটাকে খাড়াভাবে রেখে ফুঁ দিয়ে দেখবে যেন বেশ গড়িয়ে যেতে পারে। এবার
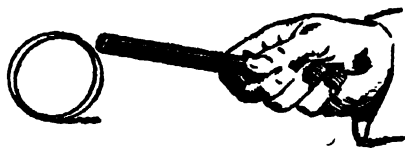
একটা গালার রড (সিল-মোহর করবার জন্যে যে গালার রড পাওয়া যায়) অথবা কাচের রড (ফ্লিন্ট গ্লাস অথবা লেড্ গ্লাসের রড ব্যবহার করা দরকার) যোগাড় কর।

একখণ্ড ফ্লানেল দিয়ে রডটাকে কিছুক্ষণ বেশ করে ঘষে নাও। ঘষবার পর রডটাকে ছোট ছোট সুতার ফেকরি, চুল বা কাগজের টুকরার কাছে নিয়ে এসো। দেখবে— রডটা যেন চুম্বকের মত ব্যবহার করছে। কাগজ, সুতা প্রভৃতির টুকরাগুলো লাফিয়ে উঠে রডটার গায়ে লাগবে। ফ্লানেল দিয়ে ঘষবার আগে কিন্তু রডটার এই গুণ দেখতে পাবে না। ঘষবার ফলে রডের মধ্যে তড়িতের উৎপত্তি হয়। এই তড়িতাবেশই সূতা, কাগজ প্রভৃতি হাল্কা পদার্থের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করবার কারণ। আচ্ছা, এবার কাগজের আংটির পরীক্ষটা করে দেখ। কাগজের আংটিটাকে টেবিলের উপর রেখে ফ্লানেল-ঘষা গালা বা কাচের রডটাকে একটু কাছে নিয়ে এস। দেখবে, কাগজের আংটিটা গড়িয়ে এসে রডের গায়ে লাগতে চাইবে। তুমি যদি সেটাকে রডের গায়ে লাগতে না দিয়ে ক্রমাগত সুরিয়ে নাও তবে কাগজের আংটিটাও চাকার মত গড়িয়ে গড়িয়ে টেবিলের সর্বত্র তাকে অনুসরণ করতে থাকবে। ছবি থেকেই ব্যাপারটার পরিষ্কাব ধারণা করতে পারবে।

(দুই)

পাতলা একখণ্ড সাধারণ লেখবার কাগজ একটু গরম করে নাও। কাগজ-খানাকে টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে খানিক্ষণ বেশ করে ঘষে দাও। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে, কাগজখানা যেন টেবিলের সঙ্গে লেগে গেছে; টেবিলটাকে কাৎ করলেও গড়িয়ে পড়ে না। এবার যদি হাত দিয়ে কাগজখানার একটা কোণ খানিকটা
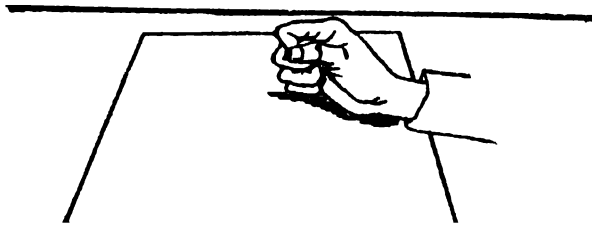
তুলে ধর—দেখবে, কাগজটা যেন লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে। কাগজখানা টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে তোমার হাত বা জামা কাপড়ে আটকে থাকতে চাইবে। এরকমের কাগজ মুখের কাছে ধরলে সুড়সুড়ির মত একটা অবস্থা অনুভব করবে। ঘর্ষণের ফলে কাগজখানা তড়িতাবিষ্ট হয় বলেই অন্য কোন নিস্তড়িৎ পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(তিন)

টেবিলের উপর পরস্পর থেকে কিছুটা তফাতে দু'খানা বই রাখ। বই দু'খানার উপর একখানা চওড়া কাচ বসিয়ে দাও। কাচ খানার তলায় টেবিলের উপর ছোট ছোট কতকগুলো কাগজের টুকরা রেখে দাও। এবার একটুকরা ফ্লানেল বা রেশমের কাপড় দিয়ে কাচখানাকে বেশ করে ঘষে দাও। কিছুক্ষণ ঘষবার পরেই দেখবে,

নীচের কাগজের টুকরাগুলো অদ্ভুত রকমে লাফাতে সুরু করছে। কাগজের টুকরা-গুলো যদি ব্যাং বা কয়ারফড়িং প্রভৃতির আকারে কাটা হয় তবে এ লাফানোর ব্যাপারটা বেশ কৌতুকপ্রদ হবে। কাচখানা তড়িতাবিষ্ট হওয়ার ফলেই এরূপ অবস্থা ঘটে। কি রকম করে কাচখানা রাখতে হবে ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

এসব পরীক্ষা করবার সময় জিনিসগুলোকে বেশ করে শুকিয়ে বা গরম করে নেওয়া দরকার। শীতকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় এজন্যে পরীক্ষাগুলো সহজে করা যায়; কিন্তু বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকলেই পরীক্ষার ব্যাপারে অনেকটা অসুবিধা হবে।

(চার)

তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে—রাবার বা ওই ধরণের কোন পদার্থের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ালে চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে ওঠে এবং অস্ফুট মট্‌মট্‌ আওয়াজ শোনা
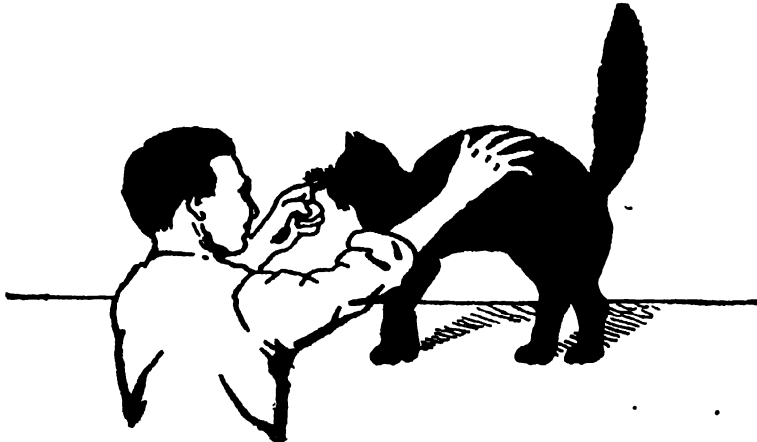
যায়। অবশ্য শুষ্ক আবহাওয়াতেই এরূপ ব্যাপার বেশী ঘটে। চুলের সঙ্গে চিরুণীর ঘর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তার ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। আর একটা সহজ পরীক্ষায় এ ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পার। অবশ্য শীতকালেই এই পরীক্ষাটা বেশী ভাল হয়। উনুনের পাশে বসে শরীরটাকে বেশ গরম করেছে এরকমের একটা বিড়ালের পিঠের উপর ক্ষিপ্রগতিতে সোজা বা উল্টোদিক থেকে হাত বুলোতে থাক। কিছুক্ষণ পরেই দেখবে - বিড়লটার লোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠেছে এবং অস্ফুট মট্‌মট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘর্ষণজনিত তড়িৎ উৎপত্তির ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। ঘর্ষণের পর যদি তোমার হাত মুঠো করে বিড়ালটার নাকের কাছে আন তবে একটা পরিষ্কার বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ তার নাকের ডগা থেকে তোমার হাতের মধ্য দিয়ে চলে যাবে। এতে বিড়ালটাও আৎকে উঠবে। অন্ধকার ঘর অথবা কালো বিড়ালের সাহায্য নিলে এ পরীক্ষায় বেশ সুন্দরভাবে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়।

(পাঁচ)

খুব পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়ামের পাত কেটে এরোপ্লেনের মত তৈরী কর। একটা এবনাইট রডকে ফ্লানেল দিয়ে বেশ করে ঘষে নাও। রডটাকে এরোপ্লেনটার কাছে আনবামাত্রই সেটা লাফিয়ে উঠে এসে তার গায়ে লেগে যাবে এবং রডের তড়িৎ
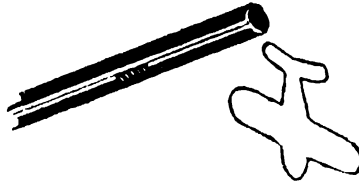
খানিকটা আহরণ করবে। উভয়েই তখন সমধর্মী তড়িতাবিষ্ট হওয়ায় এরোপ্লেনটা তৎক্ষণাৎ আবার রড থেকে লাফিয়ে সরে যাবে। এ অবস্থায় রডটিকে পিছু পিছু চালিয়ে নিলে যতক্ষণ খুশী যে কোন দিকে এরোপ্লেনটাকে উড়ন্ত অবস্থায় রাখা যেতে পারে।

গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

কীট-পতঙ্গের লুকোচুরি *

উদরপূরণের জন্যে একজাতের প্রাণী অন্য জাতের প্রাণীকে হত্যা করে—একথা তোমাদের অজানা নয়। প্রবল দুর্বলকে, দুর্বল আবার তার চেয়ে দুর্বলকে উদরস্থ করে' জীবিকানির্বাহ করে। প্রাণিজগতে পরস্পরের মধ্যে একটা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ রয়েছে বলে' সর্বত্রই এ-রকমের হানাহানি চলতে দেখা যায়। এই হানাহানির মধ্য দিয়েই প্রাণীকে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কেবল প্রবলের আক্রমণ থেকে জীবন বাঁচানোই নয়, শিকার সংগ্রহ করে' উদরপূরণের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই বিভিন্ন জাতের প্রাণী বিভিন্ন রকমের কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। প্রাণীদের লুকোচুরির ব্যাপারটা এই আত্মরক্ষারই একটা বিশিষ্ট কৌশলমাত্র। কীট-পতঙ্গের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ লুকোচুরির কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। যে দুর্বল লুকোচুরির আশ্রয়ে সে চায় শিকারীর নজর এড়িয়ে প্রাণ বাঁচাতে, আর শিকারী চায় লুকোচুরির আশ্রয়ে সহজে শিকারকে আয়ত্ত করতে। কয়েকটা দৃষ্টান্তের কথা বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

বহুরূপী নামে একজাতের প্রাণীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আলিপুরের বাগানেও অনেকে হয়তো এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখে থাকবে। বহুরূপী ইচ্ছামত তার গায়ের রং বদলাতে পারে। যখন যেখানে থাকে তার আশেপাশের রঙের মত বহুরূপী তার গায়ের রং পরিবর্তন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে বসে থাকে। লতাপাতার মধ্যে অবস্থানকালে গায়ের রং হয় পাতার মত সবুজ। হয়তো চোখের সামনেই বসে আছে—অথচ সহজে তোমার নজরে পড়বে না। বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার লক্ষণ নেই—ঠিক যেন মাটির গড়া একটা নির্জীব প্রাণী! চোখ দুটাকে কেবলমাত্র এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখা যায়। চোখ ঘোরাবার কায়দাও অদ্ভুত। হয়তো একটা চোখে তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—ইতিমধ্যে অপর চোখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আশেপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

বহুরূপীর লুকোচুরি
এরা গাছের ডালে পাতার সঙ্গে রং মিশিয়ে শিকার ধরবার আশায় বসে থাকে।

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে

করছে। এরা এমনভাবে বসে থাকে কেন—জান? শিকার ধরবার আশায়। পোকা-মাকড় শিকার করে' এদের জীবিকানির্বাহ করতে হয়। এদের নিশ্চল অবস্থা এবং গায়ের রঙে বিভ্রান্ত হয়ে পোকা-মাকড় নিঃশঙ্কচিত্তে কাছাকাছি কোথাও উপবেশন করবামাত্রই বহুরূপী চক্ষেরনিমেষে আঠা-কাঠির মত একটা লম্বা জিভ বের করে তার গায়ে ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে মুখের ভিতর টেনে নেয়। বহুরূপী যেমন আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করে' শিকার আয়ত্ত করে, বিভিন্ন জাতের কীট-পতঙ্গকেও সেরূপ লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়।

গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুলের পাপড়ির মধ্যে সাদা, হল্‌দে বা সবুজাভ একজাতের সুদৃশ্য মাকড়সা দেখা যায়। ফুলের রং অনুযায়ী এদের গায়ের রঙের পার্থক্য হয়ে থাকে। চলবার ধরণ ঠিক কাঁকড়ার মত। কাজেই এদের বলে কাঁকড়া-মাকড়সা। ছোট ছোট পাখী ও কুমোরে-পোকারা এদের পরম শত্রু। ফুলের রঙের সঙ্গে দেহের রং মিলিয়ে নিশ্চলভাবে একজায়গায় বসে থাকে বলে শত্রুরা সহজে এদের খুঁজে বের করতে পারে না। এই লুকোচুরির ব্যাপারটা এমনই নিখুঁত যে, বুঝতে না পেরে পোকা-মাকড়েরা নির্ভাবনায় মধুর লোভে ফুলের উপর উপবেশন করবামাত্রই তাদের খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারায়! এদের জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার সময় বহুবার দেখেছি—কাঁকড়া-মাকড়সা শিকারের প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই স্থানে নিশ্চলভাবে বসে রয়েছে। কোন একটা পোকা ফুলের উপর বসবার উপক্রম করামাত্রই চক্ষের নিমেষে তাকে ধরে ফেলবে। শিকার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলে ধরা পড়েও সময় সময় উড়ে পালায়। শিকার পালাবার সময় মাকড়সা হয়তো সামনের পা ত্বখানা উপরে উঠিয়েছিল—আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক সেভাবেই ঊর্দ্ধ্ব-পদ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে; একটু নড়াচড়া করে পা ত্বখানা পর্যন্ত যথাস্থানে গুটিয়ে রাখবে না!

খাল-বিল, নানা-ডোবার ধারে ছোট ছোট গাছপালার মধ্যে কাঠির মত এক রকমের মাকড়সা দেখা যায়। শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে শিকারকে ধোকা দেবার জন্যে এরা পা-গুলোকে একত্রিতভাবে উভয়দিকে প্রসারিত করে ঠিক একখণ্ড কাঠির মত সুতার গায়ে লেগে থাকে। জানা না থাকলে সেটা কাঠি, না মাকড়সা—কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই। শিকার জালে পড়বামাত্র হাত-পা ছড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে। শিকার আয়ত্ত করবার পর আবার ঠিক পূর্বের মত কাঠির আকার ধারণ করে' নিশ্চিন্তমনে ধীরে ধীরে তাকে উদরস্থ করতে থাকে।

শ্যাওলা ভর্তি জলাশয়ে হিপোলাইট নামে একজাতের কুচো-চিংড়ি দেখা যায়। চিংড়িগুলো ইঞ্চিখানেকের বেশী বড় হয় না। শরীরের রং বদলে লুকোচুরি করবার ক্ষমতা এদের অদ্ভুত। প্রায়ই এরা জলজ লতাপাতার মধ্যে অবস্থান করে এবং শরীরের রং ঘাস-পাতার রঙের মত বদল করে নেয়। সবুজ ঘাস-পাতার মধ্যে গায়ের রং থাকে

সবুজ; কিন্তু বাদামী রঙের ঘাস-পাতার মধ্যে ছেড়ে দিলে সবুজ রং পরিবর্তন করে বাদামী রং ধারণ করে। আরও আশ্চর্যের বিষয়—দিনের বেলায় যে রকমের রং দেখা যায় রাত্রি-বেলায় তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ঈষৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। বড় মাছ ও অন্যান্য শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে সহজে শিকার ধরবার জন্যেই এরা এরকমের লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

আমাদের দেশে গাছপালার মধ্যে বিভিন্ন জাতের কাঠি-পোকার অভাব নেই। এদের শরীরের গঠন এবং গায়ের রং দেখে একখণ্ড শুকনো কাঠি ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। ভয় পেলে উভয়দিকে লম্বালম্বিভাবে হাত-পা প্রসারিত করে এমনভাবে অবস্থান করে যে, ভালকরে লক্ষ্য করে দেখলেও—শুকনো কাঠি, না জীবিত প্রাণী সেটা ঠিক করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই কাঠি-পোকাদেরই আর এক গোষ্ঠী ক্রম-পরিণতির ফলে গাছের পাতার আকৃতি ধারণ করেছে। পাতার মধ্যে অবস্থানকালে কিছুতেই এদের খুঁজে বার করা যায় না। অনুকরণে এরূপ অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জনের ফলে দুদিক দিয়েই এদের সুবিধা হয়েছে। শত্রুরা সহজে এদের খোঁজ পায়না, অথচ আত্ম-গোপন করে খুব কাছে গিয়ে শিকার ধরতে পারে।
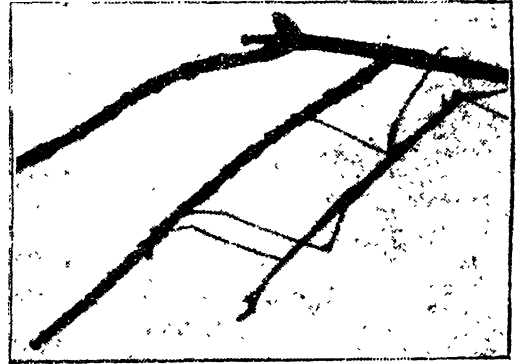
কাঠি-পোকার লুকোচুরি

চলাফেরার সময়েও এই পোকাগুলোকে শুকনো ডালপালার মত দেখায়। কিন্তু ভয় পেয়ে যখন হাত পা একত্র করে লম্বা হয়ে যায় তখন একখণ্ড শুকনো কাঠি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

খাল-বিল, নালা-ডোবায় কাঠির মত সরু দু-তিন ইঞ্চি লম্বা একরকমের প্রাণী দেখা যায়। এগুলোকে চল্তি কথায় জল-কাঠি বলে। জল-কাঠি উভচর প্রাণী, তবে বেশীরভাগ জলেই কাটায়। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে লেজের মত দুটি লম্বা শোঁয়া আছে। শোঁয়া দুটা জলের তলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। ছোট ছোট মাছ ও জলজ পোকা-মাকড় শিকার করে' এরা উদরপূরণ করে। শিকার ধরবার আশায় জলজ লতা-পাতার মধ্যে নীচুদিকে মুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তখন একটা কাঠি ছাড়া জীবন্ত প্রাণী বলে মোটেই মনে হয় না। ছোট ছোট মাছ কিংবা জলজ পোকা কাছে আসবামাত্রই সাঁড়াশীর মত দাড়ার সাহায্যে চেপে ধরে এবং ধীরে ধীরে রস চুষে খায়। জল-কাঠিরা যেখানে থাকে সেসব জায়গায় জল-বিছু নামে আর এক জাতের চ্যাপ্টা প্রাণীও দেখতে পাওয়া যায়। এরাও উভচর প্রাণী। জল-কাঠি আর জল-বিছুর মধ্যে পার্থক্য কেবল শারীরিক গঠনে। অন্যথায় উভয়ের স্বভাব প্রায় একই

রকমের। এরাও একটা পচা পাতার মত নিশ্চলভাবে শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকে। শিকার কাছে আসলেই সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে। প্রধানতঃ শিকার ধরবার উদ্দেশ্যেই এরা লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে থাকে।

লতাপাতা ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গঙ্গাফড়িং বোধ হয় তোমরা অনেকেই দেখেছ। সব জাতের গঙ্গাফড়িংই কমবেশী লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অনেকের গায়ের রং সবুজ পাতার মত, আবার কতকগুলোর গায়ের রং শুকনো পাতার মত। কতকগুলো গঙ্গাফড়িংকে অবিকল গাছের পাতা বলেই মনে হয়। গঙ্গাফড়িং পাখীদের উপাদেয় খাদ্য। কাজেই শত্রুর ভয়ে সর্বদা তাদের সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, অথচ জীবিকানির্বাহের জন্যে কীট-পতঙ্গ শিকার না করলেও চলে না। কিন্তু এমনই নিখুঁৎ তাদের অনুকরণ শক্তি যে, পাখী তো দূরের কথা, তেমন সন্ধানী চোখও তাদের খুঁজে বের করতে হয়রান হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে গঙ্গিলাস নামে গঙ্গাফড়িঙের আকৃতি আরও অদ্ভুত। দেখতে ঠিক এক একটা অর্কিড ফুলের মত। যেমন রং তেমনি গঠন। পাতার গায়ে পিছনের পা আট্‌কে মুখ নীচু করে ঝুলে থাকে। ফুল মনে করে কীট-পতঙ্গেরা কাছে এলেই ধরে উদরস্থ করে। পাখীরাও ফুল ভেবে এদের আক্রমণ করে না।

পাতা-পোকার লুকোচুরি
এরা গঙ্গা ফড়িঙের এক জাত। হুবহু গাছের পাতার মত দেখতে।

উঁচু মাচার উপর লতাপাতার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতার প্রান্তভাগে কাঠির মত কি যেন ঝুলছে। এই কাঠির মত পদার্থগুলো একরকম জীবন্ত পোকা, সূতলিপোকা নামে পচিচিত। এগুলো মথ জাতীয় ছোট্ট একরকম প্রজাপতির বাচ্চা। সূতলিপোকার সামনে ও পিছনে কয়েকজোড়া পা আছে। শরীরের মধ্যভাগ সম্পূর্ণ মসৃণ। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে জোঁকের মত হেটে যায়। গাছের সবুজ পাতা এদের খাদ্য। খাদ্য অন্বেষণে দূরে যেতে হলে অথবা কোনক্রমে শত্রুর নজরে পড়ে গেলে এরা মুখ থেকে সূতা ছেড়ে নীচে ঝুলে পড়ে। লুকোচুরিতে এরা খুবই ওস্তাদ। পিছনের পায়ের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়ে জোঁকের মত মুখ উঁচু করে হয়তো পাতা খাচ্ছে—ওই সময়ে অকস্মাৎ কোন ভয়ের কারণ ঘটলে তৎক্ষণাৎ শরীরটাকে খাড়া রেখেই নিশ্চল হয়ে যায়। দেখে মনে

হয় যেন পাতা খসে-পড়া লম্বা একটা বোঁটা গাছের গায়ে লেগে রয়েছে। সেটা যে একটা জীবন্ত প্রাণী তা' বোঝবার উপায় নেই। ছোট ছোট পাখীরা লতাপাতার মধ্যে সর্বদাই সূতলিপোকার সন্ধান করে বেড়ায়, কিন্তু লুকোচুরির কৌশলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রতারিত হয়ে থাকে।

শিবপুরের বাগানে একদিন দেখলাম—মাঝারি গোছের একটা গাছের উপরে ছোট ছোট সুদৃশ্য ফুল ফুটে রয়েছে। কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গাছটার গায়ে বড় বড় অসংখ্য কাঁটা।' কি করা যায় ভাবছি -হঠাৎ নজরে পড়লো—দু-একটা কাঁটা যেন ঈষৎ নড়ে উঠছে। অনুসন্ধানে বোঝা গেল—যেগুলোকে বিষাক্ত কাঁটা বলে ভেবেছিলাম সেগুলো কাঁটা নয় মোটেই, একজাতের অদ্ভুত পোকা। শত্রুর নজর এড়াবার জন্যে পোকাগুলো ঠিক কাঁটার আকার ধারণ করেছে। এ-ধরণের আরও কত রকমের পোকা যে আমাদের দেশে আছে তার ইয়ত্তা নেই। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই এরা লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এদের সাধারণ নাম হচ্ছে—ঝুড়িপোকা। পূর্বাঞ্চলে বনে-জঙ্গলে চূণের মত সাদা একরমের ছোট প্রজাপতি দেখা যায়। অধিকাংশ সময়ই এরা ছোট ছোট গাছের পাতার উপর ডানা ছড়িয়ে লেপ্টে বসে থাকে। দেখে মনে হয় যেন পাতার উপর চূণের দাগের মত পাখীর পরিত্যক্ত মল শুকিয়ে রয়েছে। ফিঙে পাখীরা এদের পরম শত্রু। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে যাবার সময়ই এরা পাখীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু পাতার উপরে বসে থাকবার সময় প্রত্যেকেই এগুলোকে পাখীর মল বলে ভুল করে।

একজাতের সূতলি পোকার লুকোচুরি। পোকাটা ডালের গায়ে এমনভাবে রয়েছে, যেন সরু ডাল বা পাতার বোঁটা বলে মনে হয়।

কলকাতার আশেপাশে বন-জঙ্গলে বাদামী রঙের মাঝারী গোছের কয়েক জাতের প্রজাপতি দেখা যায়। এদের ডানার নীচের দিকের রং শুকনো পাতার মত। শুকনো পাতার মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসে থাকলে মোটেই নজরে পড়ে না। এ ছাড়া আরও কয়েক রকমের প্রজাপতি দেখা যায় যারা লুকোচুরিতে খুবই পটু। এদের ডানার নীচের দিকের রং ফিকে বাদামী, তার উপর পাতার শিরা-উপশিরার মত কতকগুলো দাগ কাটা। ডানা গুটিয়ে বসলেই শুকনো পাতা বলে ভুল হবে। পাতা-প্রজাপতির লুঁকোচুরির কথা

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। একটু অনুসন্ধান করলে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এরকমের প্রজাপতির সন্ধান পাবে। দূর থেকে হয়তো তোমার নজরে পড়লো—প্রজাপতিটা উড়ে গিয়ে একটা গাছের উপর বসেছে; কিন্তু কাছে যাও—তার কোন সন্ধানই পাবে না। ডানা গুটিয়ে বসলে ঠিক গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

শরীরের পশ্চাদ্ভাগে শুঁড়ওয়ালা সবুজ রঙের একজাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা পাখীদের উপাদেয় খাদ্য। গাছের পাতা খেয়েই এরা জীবনধারণ করে। দিনের আলো বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এরা খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পাতাটা যতদূর খাওয়া হয়ে গেছে—সেখানেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে বসে থাকে। দেখে মনে হয় যেন বোঁটার গায়ে এক একটা নতুন কুঁড়ি গজিয়ে উঠেছে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার এটাই হলো তাদের প্রধান ফন্দী।
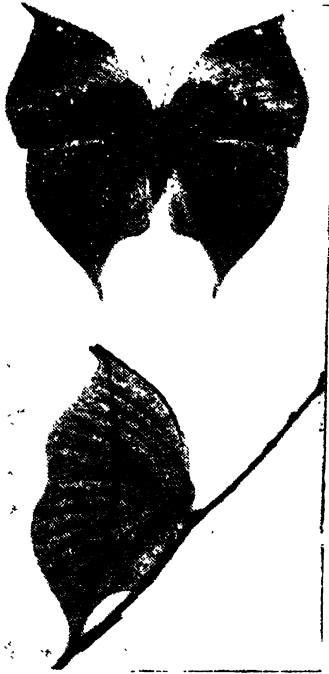
প্রজাপতির লুকোচুরি। উপরের প্রজাপতিরা নীচের ছবির মত ডানা মুড়ে পাতার আকার ধারণ করে।

কীট-পতঙ্গেরা সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস। তারা বাচ্চাদের আর কোন খোঁজখবরই লয় না। দুর্বল এবং অসহায় হলেও বাচ্চাগুলো নিজেরাই তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। আত্মরক্ষার জন্যে তারা যে কত রকম লুকোচুরির পরিচয় দিয়ে থাকে তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের রক্ততিলক প্রজাপতির বাচ্চারা পুত্তলী অবস্থায় নিরাপদে কাটাবার জন্যে এমন অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করে যে, দেখলেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগে—কাছে ঘেঁসতেই প্রবৃত্তি হয় না। কাঠ-পোকারা গাছের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফোটবার পর বাচ্চাগুলো গাছের গায়েই অবস্থান করে। গুটি বেঁধে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করবার সময় শত্রুর কবলে পড়বার ভয়ে সেই গাছের ফলের অনুকরণে গুটি তৈরী করে। এদের শত্রু তো দূরের কথা—মানুষেরাও সহজে বুঝতে পারে না যে, সেগুলো গাছের ফল, না পোকার গুটি। ফ্লাটা নামে এক জাতের পতঙ্গের বাচ্চা শত্রুর নজর এড়াবার জন্যে পত্র শূন্য সরু ডালের গায়ে পর পর গুটি তৈরী করে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। দেখে ডালের পাতা বা বোঁটায় ঝুলানো ফল বলেই মনে হয় পাখী এবং কীট-পতঙ্গভোজী প্রাণীরা ভুল করেই এদের স্পর্শ করে না। অথচ একটা গুটি ছিঁড়ে এনে পাখীর কাছে ফেলে দাও, তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে ফেলবে। বনে-জঙ্গলে অনুসন্ধান করলে এরকমের শত শত লুকোচুরির কৌশল তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শোঁয়াপোকার কথা

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
(দশম শ্রেণীর ছাত্র)

ডিম পাড়িবার সময় হইলে, স্ত্রী-প্রজাপতিরা করবী, আকন্দ, কুল, লেবু প্রভৃতি খাদ্যোপযোগী গাছের পাতার উপর অথবা সরু ডালের চারিদিকে একসঙ্গে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিমগুলি একপ্রকার আঠাল পদার্থের সাহায্যে পাতা কিংবা ডালের সঙ্গে লাগিয়া থাকে।

ডিম পাড়িবার পর ৫।৭ দিনের মধ্যেই ডিম হইতে শূককীট বা লার্ভা বাহির হয়। এই শূককীট শোঁয়াপোকা বা বিছা নামে আমাদের দেশে পরিচিত। মোটামুটিভাবে শোঁয়াপোকাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক জাতীয় শোঁয়াপোকার গায়ে চুলের মত অসংখ্য বিষাক্ত শোঁয়া থাকে। এই শোঁয়া দেহের কোন স্থানে লাগিলে অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং জায়গাটি ফুলিয়া যায়। আর এক জাতীয় শোঁয়াপোকার গায়ে কাঁটার মত কয়েক জোড়া পদার্থ থাকে। তাহাদের গায়ে শোঁয়া নাই। শোঁয়াযুক্ত শূককীট হইতে 'মথ' (নিশাচর প্রজাপতি) এবং শোঁয়াবিহীন শূককীট হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করে। প্রজাপতিরা দিনের বেলায় ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায় আর মথ জাতীয় প্রজাপতি নিশাচর।

ডিম হইতে শোঁয়াপোকা বাহির হইবার পর সাধারণতঃ তাহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। কখনও দল ত্যাগ করিতে চায় না। ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পর তাহারা গাছের পাতার সবুজ অংশ খাইতে আরম্ভ করে। এই সময় শোঁয়াপোকারা কয়েকবার খোলস বদলায় এবং ইঞ্চি দুই-এর মত বড় হয়। অতিরিক্ত ভোজনের পর মথ প্রজাপতির শোঁয়াপোকারা খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং নিজেদের চারিদিকে একটা শক্ত আবরণ তৈয়ারী করে। এই আবরণকেই গুটি বলে এবং গুটির ভিতর অবস্থিত শোঁয়াপোকাকে 'পিউপা' বলে। দিবাচর প্রজাপতির বাচ্চার গুটি হয় ভিন্ন রকমের। পরিণত বয়স্ক শোঁয়াপোকার পিঠ চিরিয়া সোনালী, রূপালী, সবুজ

প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বাদাম বা কুলের আঠির মত একটি পদার্থ বাহির হইয়া আসে। এই পদার্থটিকেই পুত্তলী বলা হয়। দশ পনেরো দিন পরে এই পুত্তলী হইতে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে।

'মথের' শুঁয়াপোকার গুটি হইতে রেশম, তসর, গরদ, মুগা, এণ্ডি, মটকা প্রভৃতি সূতা পাওয়া যায়। মথের শুঁয়াপোকাকে বলা হয় 'পলু'। মথের শুঁয়াপোকা তাহাদের মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া নিজের দেহের চারিদিকে ডিমের মত একটা আবরণ তৈরী করে। এগুলি মথের গুটি। এই গুটি হইতে বিভিন্ন রকমের সূতা সংগ্রহ করা হয়। প্রজাপতির পুত্তলী হইতে দশ পনেরো দিনের মধ্যেই প্রজাপতি বাহির হয়; কিন্তু মথ তার পুত্তলী অবস্থায় এক মাস অথবা দুই মাস বা আরও বেশী সময় অবস্থান করে। তারপর গুটি কাটিয়া মথ বাহির হইয়া যায়। মথ ও প্রজাপতির কতকগুলি পার্থক্য আছে। প্রজাপতির ডানা খুব পাতলা কিন্তু মথের ডানা ভারী এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ায় আবৃত। প্রজাপতির শুঁড় অনেকটা মুগুরের মত, কিন্তু মথের শুঁড় দেখিতে পাখীর পালকের মত। মথরা ডানা মেলিয়া বসে এবং প্রজাপতিরা ডানা মুড়িয়া বসে।

বিভিন্ন রকমের অসংখ্য শুঁয়াপোকা আছে। সেইগুলি হইতে যেসকল প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করে, তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

টেলিভিসন ও চিকিৎসা

লণ্ডন গাই হাসপাতালে টেলিভিসন ব্যবস্থার দৃশ্য। একটি রোগীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচারের আয়োজন হচ্ছে। অস্ত্রোপচারের যাবতীয় প্রক্রিয়ার দৃশ্য বাঁ-দিকে স্থাপিত C. P. S. এমিট্রন ক্যামেরায় প্রতিফলিত করবার জন্যে ডান দিকে ৪৫° ডিগ্রি হেলানো দর্পণ ও scilytic light রয়েছে।

লণ্ডনের গাই হাসপাতালের অস্ত্রোপচার-কক্ষে সম্প্রতি একটি টেলিভিসন ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ছাত্রেরা এখন থেকে ক্লাস-রুমে বসেই অস্ত্রোপচারের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ টেলিভিসনের সাহায্যে দেখতে পাবে; অস্ত্রোপচার দেখবার জন্যে তাদের আর অযথা চিকিৎসকের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়াতে হবে না।

গাই হাসপাতালের একজিবিশন রুম, লেকচার রুম এবং ডিপার্টমেণ্টাল লাইব্রেরীতে অস্ত্রোপচারের যাবতীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যে ১৫" ইঞ্চি ক্যাথোড-রে টিউব সমন্বিত H. M. V. রিসিভার বসানো হয়েছে। এর ফলে অস্ত্রোপচার দেখবার জন্যে আগেকার মত ছাত্রদের আর সার্জনের পিছনে ভীড় করে দাঁড়াতে হবে না।

বৃটেনের টেলিভিসন গবেষণাক্ষেত্রে এ সম্পর্কে যে কাজ হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা সম্পর্কীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এ-ধরণের যন্ত্রের ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমেরিকার
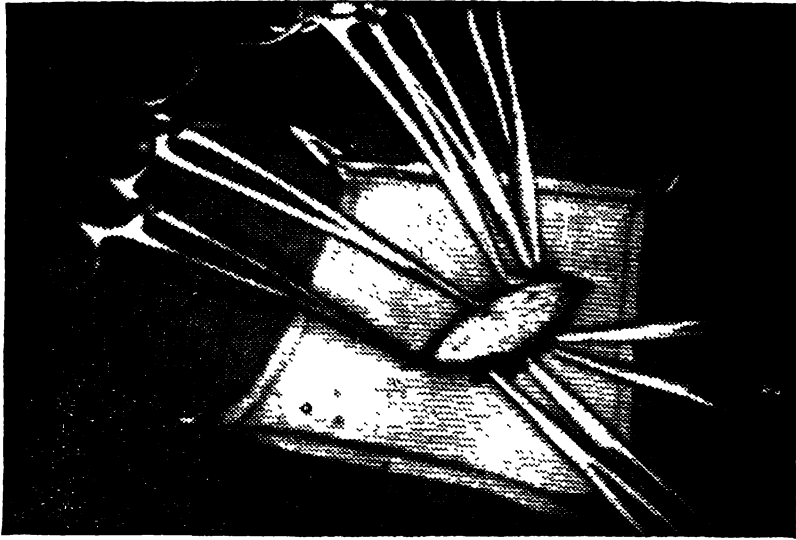
টেলিভিসনে অস্ত্রোপচারের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। চামড়ার কর্তিত অংশের চারদিকে ফরসেপ্‌স্‌ দিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা নালীগুলোকে চেপে রাখা হয়েছে।

কোন কোন হাসপাতালে টেলিভিসনের ব্যবহার থাকলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় তা স্থায়ীভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা এইবারই প্রথম। এতে চিকিৎসক এবং ছাত্র দুই দলই উপকৃত হবেন।
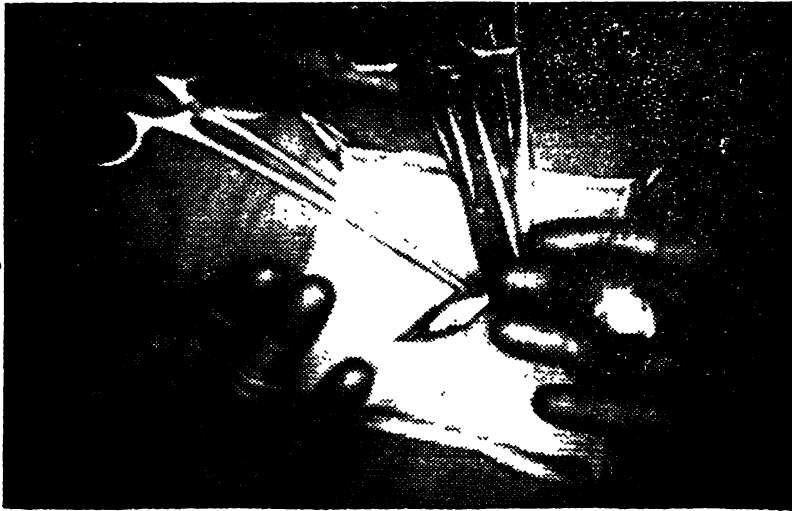
অস্ত্রোপচারের ঘরে সার্জন ডিম্বাকৃতি ছোট্ট একটা জিনিস দেখাচ্ছেন। এতে ক্ষতস্থান সেলাই করবার জন্যে 'গাট' রয়েছে।

এই সম্পর্কে যে এমিট্রন ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয় সেটি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি গাই হাসপাতালের অস্ত্রোপচারের ঘরে রোগীর টেবিলের উপর বসানো হয়েছে। ক্যামেরার লেন্স্ নির্বাচন এবং ফোকাসিং ইত্যাদি কাজ সবই দূর থেকে পরিচালনা করা সম্ভব। এমন কি যিনি অস্ত্রোপচার করবেন তাঁর মুখের সামনে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থাও আছে। তার ফলে ছাত্রেরা সরাসরি তাঁর মুখ

ক্ষতস্থান বন্ধ করে ক্লিপ দিয়ে চামড়া জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

থেকে বিভিন্ন অস্ত্রোপচার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পারবে। গাই হাসপাতালে টেলিভিসন রিসিভারের পর্দায় কি ভাবে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচারের দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে ছবিতে তা দেখা যাচ্ছে।

বিবিধ

পুণায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন

আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন আরম্ভ হবে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্যে বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

২রা থেকে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যহ বিভাগীয় অধিবেশনে নিজস্ব প্রবন্ধ পড়া হবে। বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ সাধারণ ও বিশেষ বিভাগে পঠিত হবে।

এবার প্রত্যহ সন্ধ্যায় জনসাধারণের পক্ষে সহজ-বোধ্য বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জনকল্যাণমূলক ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন শিক্ষায়তনে যাঁরা বিদেশাগত বিজ্ঞানীদের বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করতে চান তাঁরা যেন ডাঃ বি; মুখার্জি—১, পার্ক ষ্ট্রীট, কলকাতা অথবা অধ্যাপক বি, সঞ্জীব রাওয়ের (ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বাঙ্গালোর) সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন।

বিভাগীয় সভাপতিদের নাম—ডাঃ এন, এম, বসু (আলিগড়) অঙ্কশাস্ত্র; ডাঃ পি, ভি, সুখোত্তম (নয়াদিল্লী) সংখ্যাতত্ত্ব; ডাঃ আর, এন, ঘোষ (এলাহাবাদ) পদার্থবিদ্যা; ডাঃ জে, কে, চৌধুরী (কলকাতা) রসায়ন; ডাঃ জে, কোটস্ (নয়াদিল্লী) ভূতত্ত্ব ও ভূগোল; ডাঃ পি, মহেশ্বরী (দিল্লী) উদ্ভিদতত্ত্ব; ডাঃ বি, সি, বসু (ইজ্জত-নগর) প্রাণিবিদ্যা, ডাঃ ভন ফুরার হেমেনডর্ফ (হায়দরাবাদ) নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব; ডাঃ এম, ভি, রাধাকৃষ্ণ রাও (বোম্বাই) চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা; মিঃ আর, এল, শেঠি (নয়াদিল্লী) কৃষিবিজ্ঞান; ডাঃ কালিদাস মিত্র (নয়াদিল্লী); অধ্যাপক কালীপ্রসাদ মিত্র (নয়াদিল্লী) শারীরবৃত্ত; অধ্যাপক কালীপ্রসাদ (লক্ষ্ণৌ) মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা; ডাঃ মালহোত্র (আজমীর) এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষদ দেবনাগরী হরফে হিন্দীকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করে। সরকারী কাজ-কর্মে ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যার আন্তর্জাতিক ধরণ ব্যবহৃত হবে। আরও পনেরো বছর অবশ্য কাজ-কর্মে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হবে। তারপরে পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে ইংরেজীর প্রচলন করতে পারবে। প্রয়োজন হলে এই পনেরো বছর প্রেসিডেণ্ট ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দী এবং ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যার আন্তর্জাতিক ধরণের সঙ্গে দেবনাগরী গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহারে নির্দেশ দিতে পারবেন।

পাঁচ বছর পরে পার্লামেণ্টের সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কমিশন সরকারী কাজে হিন্দীর প্রচলন এবং ইংরেজী ব্যবহারের বাধা-নিষেধ সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারবেন। ভারতের মিশ্রিত সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে হিন্দীর দ্রুত প্রচারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব হয়েছে।

ভারতীয় সমুদ্রের তথ্য সংগ্রহ

ভারতীয় সমুদ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ভারত সরকার আটজন বিজ্ঞানী নিয়োগ করেছেন। উক্ত বিজ্ঞানীরা বর্তমানে তথ্য-সংগ্রহ সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত আছেন। সমুদ্রের প্রাকৃতিক তথ্য, সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করবেন।

প্রাকৃতিক সমুদ্রতত্ত্ব বলতে সমুদ্রবক্ষের স্রোত, সমুদ্র মধ্যস্থ গভীর জলের স্রোত, উভয় প্রকার স্রোতের মধ্যে সম্পর্ক, সমুদ্রতলের তথ্য, জলের তাপমাত্রা, লবণের পরিমাণ, রাসায়নিক সংগঠন প্রভৃতি বুঝায়। সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যও পড়বে।

ভারতীয় সমুদ্র সম্পর্কে এপর্যন্ত খুব অল্প তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের কাজে ভবিষ্যতে আরও বৈজ্ঞানিক কর্মীর প্রয়োজন হবে।

তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর প্রথম তুলার উৎপাদন সম্ভবতঃ প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। ৩১শে অগাষ্ট যে মরশুম শেষ হয়েছে তাতে বিশ্বের মজুত তুলার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যে পরিমাণ তুলা প্রয়োজন হয়েছিল বর্তমান বছরে তার পরিমাণ শতকরা দু ভাগ হ্রাস পাবে; অথচ উৎপাদন শতকরা পনেরো ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রুসেল্‌সে গত এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক তুলা উপদেষ্টা কমিটির যে অধিবেশন হয় ভারতীয় প্রতিনিধিদল তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিদলই তুলা সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। বি, জে, সারিয়া, বি, এন, ব্যানার্জি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল অধিবেশনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জানান যে, তুলার মূল্যের মান রক্ষার গুরুত্ব অবশ্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু কোন কোন দেশ—বিশেষতঃ মিশর ও পাকিস্তান তুলার মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করেছেন। তাদের তুলার মূল্য হ্রাস করা উচিত। আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ তাদের তুলা সম্পর্কে যে শঙ্কিত হয়েছেন তার কারণ চাহিদার অভাব নয়, বিনিময় ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ই তাঁদের আশঙ্কার কারণ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | অক্টোবর—১৯৪৯ | দশম সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের অবস্থা

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্"

তার কিছুদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্‌লা দেশকে বর্ণনা করিলেন—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান,
কেন গো মা তোর রুক্ষকেশ
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ"

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের গান বাঙালীর কণ্ঠে আর আসিতেছেনা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান আমাদের বার বার মনে আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা কেন হইল, তাহার কিভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব, ইহা ভাবিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি। ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের অনেক আশা হইয়াছিল। বহুদিন হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি "The foremost meaning of independence is freedom from material want—food, clothing and shelter combined with liquidation of unemployment and illiteracy", আমাদের আশা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। অভাব যেন ক্রমশই বাড়িতেছে। বর্তমান সময়ে খাদ্যের দুরবস্থা অত্যন্ত প্রকট হইয়াছে। সেই কারণে আলোচনার জন্য খাদ্যকে মুখ্য বিষয় বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি খাদ্যের অবস্থা কি, তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের পরিধি দাঁড়াইয়াছে ২৮,২১৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,১১,৯৬,৪৫৩। লোকসংখ্যার হিসাব গত আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী। ১৯৪১ সালের পর লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং দেশ বিভক্ত হওয়ার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে বহু আশ্রয়প্রার্থী এখানে আসিয়াছেন। এই দুইয়ে মিলিয়া পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বর্তমান সময়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষের মত হইবে। খাদ্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে দুইটি জিনিসের উপর নজর রাখিতে হইবে। প্রথম লোকসংখ্যা এবং দ্বিতীয় জমি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ২½ কোটি লোক এবং প্রায় সাড়ে

২৮ হাজার বর্গমাইল জমি আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—(১) বন (২) জমি আবাদের উপযুক্ত নহে (৩) অনাবাদী জমি (৪) পতিত জমি এবং (৫) আবাদী জমি। খাদ্যের বর্তমান হিসাবের জন্য পূর্বে উল্লেখিত প্রথম চার শ্রেণীর জমির কোন প্রয়োজন নাই। পশ্চিমবঙ্গের জমির শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত তালিকাতে দেওয়া হইল।

১নং তালিকা—পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৫ ৪৬ সালের জমির হিসাব—

(হাজার একর)

বন	১৬২৫
জমি আবাদের উপযুক্ত নহে	৩৩০৬
অনাবাদী জমি	১৯৩৩
পতিত জমি	২৭৯১
আবাদী জমি	৯২৪২
মোট	১৮,৮৯৭

জমি আবাদের উপযুক্ত নহে—এই শ্রেণীর জমির মধ্যে বাড়ী, রাস্তা, পুকুর ইত্যাদি ধরা হইয়াছে। অতএব কোন সময়ে এই জমিতে চাষ হইতে পারিবে না। অনাবাদী জমি—এই শ্রেণীর জমিতে বর্তমানে চাষ হইতেছে না; কিন্তু ছোট পরিকল্পনার সাহায্যে এই জমিতে চাষ করা সম্ভব। পতিত জমি—বর্তমানে কোন চাষ হইতেছে না, ইহারও কিছু অংশ চাষ করা সম্ভব। বর্তমান আলোচনায় আমাদের শুধু আবাদী জমির উপর নির্ভর করিতে হইবে। ১নং তালিকা হইতে পাওয়া যায়—মোট জমির "বন" শতকরা ৯ ভাগ, "জমি চাষের উপযুক্ত নহে" শতকরা ১৭ ভাগ, "অনাবাদী জমি" শতকরা ১০ ভাগ, "পতিত জমি" পতকরা ১৫ ভাগ এবং আবাদী জমি শতকরা ৪৯ ভাগ। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ফসল উৎপন্ন হয় শতকরা ৪৯ ভাগ জমি হইতে। পশ্চিমবঙ্গে ফসলের হিসাব ২নং তালিকাতে দেওয়া হইল।

২নং তালিকা—পশ্চিমবঙ্গে ফসলের হিসাব (হাজার টন)

ফসলের নাম	গত ৫ বছরের গড়	শতকরা ১০ ভাগ বাদ	ঠিক ফসলের পরিমাণ
চাউল	৩৫৪০·৪	৩৫৪·০	৩১৮৬·৪
গম	২৫·৮	২·৬	২৩ ২
	৩৫৬৬·২	৩৫৬·৬	৩২০৯·৬

শতকরা ১০ ভাগ বীজ-ধান ও নষ্ট হওয়ার জন্য বাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন এক বৎসরের ফসলের হিসাব না লইয়া গত ৫ বৎসরের গড় লওয়া হইয়াছে। ২নং তালিকাতে জোয়ার আর ভুট্টা ধরা হয় নাই। প্রায় ৪০ হাজার টন জোয়ার এবং ভুট্টা বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। মোট খাদ্যের পরিমাণ হইল ৩২৪৯৬০০ টন বা প্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মণ। পশ্চিমবঙ্গে মোট খাদ্যের প্রয়োজন কত তাহার হিসাব করিতে হইবে। বর্তমানে এখানে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু ভাল ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, মোট ২½ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ লোককে এই ব্যবস্থার অধীনে আনা হইয়াছে; বাকী লোকের খাদ্য সরবরাহ করার কোন বন্দোবস্ত নাই। মোট খাদ্যের হিসাব করিতে হইলে বর্তমান হারে হিসাব করিলে ভুল হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মোট লোকসংখ্যাকে এই ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—সহর বা সহরতলীর অন্তর্গত এবং গ্রামের

অন্তর্গত। ২½ কোটি লোকের মধ্যে ১,৬০,০০,০০০ জন লোক গ্রামের এবং ৯০ লক্ষ সহর বা সহরতলীর। গ্রামের লোকের মাথাপিছু বাৎসরিক ৫½ মণ (অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ২০ আউন্স) এবং সহরের লোকের মাথাপিছু ৩½ মণ (অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১২ আউন্স) খাদ্যের প্রয়োজন। এখানে খাদ্য বলিতে চাউল এবং গম ধরা হইয়াছে। ০-৩ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা গ্রামে মোট প্রায় ২০,০০,০০০ এবং সহরে প্রায় ১০,০০,০০০ জন। এই সংখ্যার কিছু তারতম্য হইতে পারে। মোট হিসাবের পক্ষে তাহাতে তেমন কোন ভুল হইবে না। এই সংখ্যা মোট লোকসংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে; কারণ ইহারা চাউল বা আটা কিছুই খায় না।

মোট খাদ্যের প্রয়োজন

১,৪০,০০,০০০ × ৫½ মণ = ৭,৭০,০০,০০০ মণ
৮০,০০,০০০ × ৩½ মণ = ২,৮০,০০,০০০ মণ

১০,৫০,০০,০০০ মণ

মোট ফসলের পরিমাণ ৮,৮০,০০,০০০ মণ

ঘাটতি—১,৭০,০০,০০০ মণ

দেখা যাইতেছে যদি সমস্ত লোকের জন্য ভাল ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে বৎসরে আমাদের প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ খাদ্যের অভাব হয়। অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৬%। বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৪৬০ হাজার টন খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই বৎসর খাদ্যের মোট যাহা প্রয়োজন আমাদের প্রায় তাহা ছিল। প্রায় ½ অংশ লোককে অপরিমিত খাদ্য সরবরাহ করিয়া এবং বাকী ½ অংশ লোকের খাদ্যের দায়িত্ব না লইয়া বৎসরের প্রথম হইতে আমাদের খাদ্যের দারুণ অনটন—এই অবস্থা কিরূপে উদ্ভব হইল আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। উপরোক্ত হিসাবে খাদ্যের যে ঘাটতি দেখান হইয়াছে তাহা বর্ধিত হারে হিসাব করা হইয়াছে। বর্তমান রেশনের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যদি সমস্ত লোককে ভাল ভাবে খাইতে হয় তবে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকার খাদ্যের অভাব রহিয়াছে। এই অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে আমাদের কি করা কর্তব্য? আমাদের তিনটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে (১) অনাবাদী ও পতিত জমি উদ্ধার করিতে হইবে (২) বিঘা প্রতি ফসলের হার বাড়াইতে হইবে এবং (৩) প্রজাস্বত্ব আইন বদলাইতে হইবে। উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন:—

(ক) সেচের বন্দোবস্ত।
(খ) সার ও উন্নত বীজের ব্যবস্থা।
(গ) একাধিক ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা।
(ঘ) উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থা।

(ক) সেচের ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান তিনটি সেচের পরিকল্পনা করা হইয়াছে—দামোদর নদ, গঙ্গা ও ময়ুরাক্ষী নদী সম্পর্কে। এই কাজ শেষ হইতে অনেকদিন সময় লাগিবে। এই সময়ে বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া ব্যবস্থা করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা করাও শক্ত। এইজন্য মনে হয় ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার সাহায্যে ফসল বাড়াইবার চেষ্টা করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে National Planning Committee-র অভিমত নিম্নে দেওয়া হইল:—

"If large scale Irrigation work is found of so direct an advantage in increasing the total surface under cultivation, as well as the volume of crops raised there on, it would be worth considering whether irrigation of a more appopriate character such

as wells, tanks, and reservoirs suitable for bringing water to every individual field, in the required quantiy and at the proper time, would not serve the purpose still better."

"The extension of irrigation works further, not only in regard to large scale canalisation of the principal rivers, but also in the appropriate forms of village tanks, reservoirs or wells would result in the yield per unit being very materially increased,"

মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা ২০ ভাগ জমিতে সেচের বন্দোবস্ত আছে। বাকী জমিতে চাষের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। ফসল বাড়াইতে হইলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার সাহায্যে আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে এবং অনাবাদী ও পতিত জমির কতক অংশে চাষের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কলিকাতার অতি সন্নিকটে প্রায় ৭০ বর্গ মাইল চাষের জমি জলপথের অভাবে গত ১০ বৎসর চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই জলপথের ব্যবস্থা হইলে ২৪ পরগণা ও কলিকাতার খাদ্য সমস্যা অনেক পরিমাণে দূর হয়। বর্তমানে যে পতিত ও অনাবাদী জমি রহিয়াছে তাহার যদি একচতুর্থাংশ জমিতে আমরা চাষের বন্দোবস্ত করিতে পারি তাহা হইলেই খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের এত চিন্তিত হইতে হয় না। প্রতি বৎসর শ্যাম, ব্রাজিল, বর্মা বা কোথা হইতে চাল আসিবে তাহারও হিসাব করিতে হয় না। পৃথিবীর কোন দেশে চাষ সম্পূর্ণ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না, সর্বত্রই সেচের সাহায্যে কৃষির উন্নতি করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও খাদ্যের ব্যাপারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অবিলম্বে সেচ পরিকল্পনার দিকে নজর দিতে হইবে।

(খ) সার ও উন্নত বীজের প্রয়োজনীয়তা—

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে চাষের জমিতে সার প্রায় ব্যবহার করা হয় না। জমির উৎপাদন শক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। জমির উৎপাদন শক্তি বাড়াইতে হইলে অবিলম্বে সারের বহুল ব্যবহার প্রয়োজন। গ্রামের চাষীরা সারের ব্যবহার ঠিক জানে না। বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সারের ব্যবহারের কথা চাষীদের জানাইতে হইবে। এই সঙ্গে চাষের বীজের কথাও বলা দরকার। কোন্ জমিতে কোন্ বীজ কার্যকরী হইবে অর্থাৎ সর্বাধিক ফসল দিবে তাহাও জানা দরকার। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয়েকটি সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে বীজ ও সারের বিষয় গবেষণা করা হয় এবং স্থানীয় চাষীদের এ বিষয়ে সাহায্য করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বা ইহাদের শাখা বাড়ানো প্রয়োজন। প্রতি ইউনিয়নের লোকেরা যাহাতে উন্নত কৃষি গবেষণার সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। উন্নত বীজ এবং সার ব্যবহার করিলে আমাদের বিঘা প্রতি ফসল অনেক পরিমাণে বাড়িবে এবং খাদ্য-সমস্যা অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে।

(গ) একাধিক ফসলের ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে অনেক জমিতে বৎসরে একবারের বেশী ফসল হয় না। আবাদী জমির শতকরা ৫ ভাগ জমিতে একাধিক ফসল হয়। ফসল বাড়াইতে হইলে জমির (প্রতি ইউনিয়নের) একটি করিয়া ফসল মানচিত্র (Crop Map) প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় কোন্ জমিতে দুইবার ফসল উৎপন্ন করা যায় তাহা বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে যাহাতে ফসল উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাশিয়া ৪ মাসে যাহাতে শস্য পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছে।

উন্নত বীজের সাহায্যে জমিতে বৎসরে তিনবার ফসল পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিষয়ে এই পরিমাণ উন্নত হইতে এখনও দেরী আছে ; কিন্তু আমরা চেষ্টা করিলে বৎসরে অনেক জমিতে দুইবার ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারি।

(ঘ) উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থা—

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চাষের যে ব্যবস্থা আছে তাহার প্রভূত উন্নতি করার প্রয়োজন। পুরানো লাঙ্গল দিয়া চাষের পরিবর্তে ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা দরকার। অবিলম্বে চাষের পদ্ধতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বর্তমান পদ্ধতি যাহাতে সুচারুরূপে কাজ করিতে পারে সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নজর দিতে হইবে, অর্থাৎ চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থা, বলদ, হাল, লাঙ্গল ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে National planning committee-র report হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"In the west it took some 70 years to change over from the old traditional method to the modern scientific system of agriculture. In India, perhaps we may take half this time if the intensive efforts for rapid improvement of technique in cultivation as also its prerequisites now being planned are put into effect. As most observers have noted the Indian cultivator compares quite favourably, in regard to the knowledge of his subject and mastery of technique with any other peasant in any other part of the world."

ফসল বাড়াইবার উপায় হিসাবে যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম, প্রত্যেক স্বাধীন দেশে ইহা ব্যতীত অনেক বিষয়ে যত্ন লওয়া হয়। প্রধান কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইল। আমাদের দেশে ও অন্য দেশে একর প্রতি ফসলের হারের তারতম্য নিম্নলিখিত তালিকাতে দেওয়া হইল :—

৩নং তালিকা—বিভিন্ন দেশে একর প্রতি ফসলের হার।
(পাউণ্ডে দেওয়া হইয়াছে)

দেশের নাম	১৯৩৬ ৪৭ সালে ফসলের হার
পশ্চিমবঙ্গ	৮০০
ভারতবর্ষ	৭৭১
আমেরিকা	১৩৩৪
ইটালী	২৪৩১
স্পেন	২৩৫৮
মিশর	২০২৪

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায়, আমাদের দেশে একর প্রতি ফসলের হার কত কম। আমরা যদি কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারি তাহা হইলে একর প্রতি ফসল দ্বিগুণ করিতে পারিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) প্রজাস্বত্ব আইন বদল—

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির তৃতীয় পন্থা হিসাবে আমাদের বর্তমান চাষী এবং জমির যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা বদল করিতে হইবে। চাষীদের সম্পূর্ণভাবে বুঝাইতে হইবে যে, চাষের উৎপন্ন ফসলের তাহারাই প্রধান অংশীদার। তাহারা একথা উপলব্ধি করিলে চাষের কাজে আরও অধিক পরিমাণে মনযোগ দিবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বক্তৃতায় বহু জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, চাষীদেরই জমি হওয়া উচিত। বর্তমান সরকার যদি Land Tenure System-এর কিছু বদল করেন তাহা হইলে চাষীরা নূতন উদ্দীপনা পাইবে এবং চাষের প্রভূত উন্নতি সাধন করিবে। কোন বৃহৎ পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে বেশ সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে প্রজাস্বত্ব আইনের কিছু পরিবর্তন করা হইলে ফসল উৎপাদন বেশ কিছু বাড়িবে এবং তাহাতে ঘাটতির পরিমাণ অনেক কমিবে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ভালভাবে পশ্চিম-বঙ্গের লোকের খাদ্য-সমস্যা মিটাইতে হইলে

আমাদের বৎসরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ খাদ্যের অভাব হয়। আমাদের অনাবাদী ও পতিত জমি মোট ৪৭২৪১০০ একর। যদি আমরা বড় এবং ছোট পরিকল্পনার সাহায্যে ইহার এক চতুর্থাংশ জমিতে ফসল ফলাইতে পারি তাহা হইলে প্রতি বৎসর পরের দেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। অতিরিক্ত ফসলের হিসাব—

মোট অনাবাদী ও পতিত জমি—৪৭,২৪০০০ একর

¼ অংশ " " —১১,৮১,০০০ একর

১২ মণ ফসল প্রতি একর--১,৪১,৭৩০০০ মণ চাউল

বর্তমান আবাদী জমির একর প্রতি

১½ মণ অধিক ফসল—১,৩৮,৬৩০০০ মণ চাউল

মোট—২,৮০,৩৬০০ মণ ফসল

উপরোক্ত হিসাবে প্রায় ১২ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করিবার কথা ধরা হইয়াছে। ইহা এক বা দুই বৎসরে সম্ভব নয়; কিন্তু আমাদের প্রতি বৎসর সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একরে ১½ মণ অধিক ফসল ধরা হইয়াছে, ইহা মোটেই বেশী হয় নাই। কারণ বর্তমানে একর প্রতি মাত্র ৮০০ পাউণ্ড ফসল হয়। ইহা বাড়াইয়া অন্ততঃ ৯২০ পাউণ্ড করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালের মধ্যে ১১০০০ একর অনাবাদী জমি আবাদী জমিতে পরিবর্তন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয় ইহা অত্যন্ত কম। যদি যুক্তপ্রদেশ ৬০,০০০ হাজার একর জমি চাষের জমিতে পরিবর্তিত করিতে পারেন, আমাদের নিশ্চয়ই তাহা পারা উচিত। আমরা যদি প্রথম দুই বৎসর ৫০,০০০ একর আবাদী জমি পাই এবং বর্তমান আবাদী জমির প্রতি একরে ১ মণ করিয়া ফসল বাড়াইতে পারি তাহা হইলেই খাদ্যের ব্যাপারে প্রায় আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারিব। অনাবাদী ও পতিত জমি উদ্ধার সম্পর্কে National Planning Committee-র অভিমত এইরূপ :—

"Even if the whole of this area (culturable waste and fallow) may not be suitable for cultivation, even if some portion has to remain fallow because of the necessity to recoup the physical and chemical properties of the soil exhausted by cultivation Considerable chunks can nevetheless be added, if a planned programme of intensive land reclamation and land development is taken in hand."

প্রতি বৎসর আমাদের জানানো হয় খাদ্য নাই, তোমাদের আধ-পেটা খাইয়া থাকিতে হইবে। এভাবে বেশীদিন চলিতে পারে না। আমাদের দেশেই খাদ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। আমাদের সেদিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আনিয়া আমাদের সমস্যা মিটাইতে পারিবেন না। আমরা চাই আমাদের জমির উন্নতি, চাষের সুব্যবস্থা। তাহা হইলেই খাদ্য-সমস্যা মিটিবে। বড় বড় পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে অনেকদিন সময় লাগিবে, অবিলম্বে ২।১ বৎসরের মধ্যে ছোট পরিকল্পনার সাহায্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বাহির হইতে খাবার আনিয়া কোন দেশ সাময়িকভাবেও খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিতে পারেন নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পরিবেন না। জমির উন্নতি ও চাষের সুব্যবস্থা হইলে National planning committee যে দুইটি জিনিস আশা করিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে আমরা তাহা করিতে পারিব।

National Planning Committee-র report :—

"There must be an entirely new approach to the food problem of this country. This approach should be based on two main objectives. Firstly the dependence of the country on imports from abroad should be liquidated by orderly and planned stages. Secondly the commitments undertaken by the Governments of the country under the present system of food controls'......should be liquidated by similar orderly and planned stages."

স্থষ্টি-রহস্য

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

পৃথিবীর মানুষ বিশাল বিশ্বের এককোণে দাঁড়িয়ে বিস্মিত নয়নে দেখতে পায় তার চতুর্দিকে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত মহাকাশ। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আকাশের এই জ্যোতিষ্কগুলোর তথ্য কিছু আমরা জানতে পেরেছি। সৌরজগৎ, নক্ষত্রলোক, নীহারিকাজগৎ ছাড়িয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা যেন ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, বিশ্বের এই বিশালতা উপলব্ধি করে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। হাজার বার প্রশ্ন করেছি, কোথায় এই বিশ্বের আদি? কোন্ সুদূর অতীত কোন্ ভাস্কর গড়ে তুলেছে এই ভাস্বর জ্যোতিষ্কগুলোকে? যে বিশ্বের অন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি, তার আদিকথা, তার সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনও মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলায় না। তবু মানুষ আদিযুগ হতে সৃষ্টি-রহস্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। বিষ্ণুপুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিশ্বের রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী বিজ্ঞানী সেই সব সিদ্ধান্ত বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে রাজী নন। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন বিশ্বের মূল রহস্য। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বসৃষ্টির আদিম প্রত্যূষে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল অখণ্ড নভোবায়ব (cosmic gas)। সেই বায়বরাশির অন্তর্নিহিত কোনরূপ অস্থিরতার ফলে নভোবায়ব ক্রমশ বিভক্ত হয়ে এক একটি বিন্দুর আকার ধারণ করল। সেই বায়ব বিন্দুগুলোই মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টির সেই প্রাথমিক পর্যায়ে নক্ষত্রগুলো ছিল শীতল ও হাল্কা বায়ব দিয়ে গড়া।

নক্ষত্রসৃষ্টির এই প্রক্রিয়া মেনে নিতে হলে প্রশ্ন উঠে, সাধারণ বায়ুমণ্ডলে কেন এরকম বায়ু-বিন্দুর সৃষ্টি হয় না? সেখানে তো অনন্তকাল ধরে সেই অবিরাম বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত রয়েছে। যদিও নভোমণ্ডলের উপাদান ও তাপের সংগে সাধারণ পার্থিব বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও তাপের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তবুও তাদের সাধারণ ধর্মে পার্থক্য হওয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। তবুও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বায়ুহীন স্থান সৃষ্টি করে কতকগুলো বায়ুবিন্দু গড়ে উঠবে—একথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু নভোবায়ুমণ্ডল ও সাধারণ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এই তফাৎ রয়েছে যে, উভয়ের ঘনমান এক নয়। সাধারণ বায়ুমণ্ডলের তুলনায় বিশাল বিশ্বের নভোবায়ুমণ্ডল অনেকগুণ বৃহত্তর। তাই সাধারণ বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও সময়ে বায়ু-বিন্দু গঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায় তবে সেই বিন্দুর বায়ব চাপ বর্ধিত হয়ে সেই ঘনীভবনকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের সাবেক ঘনত্ব ফিরে আসে। অথচ নভোবায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত বায়ববিন্দুগুলোর জ্যামিতিক আয়তন এত বৃহৎ যে, তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে সেই বায়ব দেহপিণ্ডের অস্তিত্ব বজায় থাকবে; পরন্তু মহাকর্ষের ফলে সেই দেহপিণ্ডের সংকোচন বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে তার তাপ ক্রমশ বেড়ে চলবে।

যখন নক্ষত্রদেহের বস্তুপিণ্ড নক্ষত্র সৃষ্টির পূর্বে মহাকাশে সমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল তখন তার গড় ঘনত্ব ছিল জলের চেয়ে ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ১গুণ মাত্র। এইরূপ অল্প ঘনত্ব ও তাপের ফলে ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,

০০০,০০০ কিলোগ্রাম ভর ও দুই বা তিন আলোক-বৎসর ব্যাস বিশিষ্ট বিভিন্ন নক্ষত্রের জন্মলাভ সম্ভব হয়েছে। তারপর আরও মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে এরা বর্তমান নক্ষত্রের আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই প্রক্রিয়ায় যদি পূর্বোক্ত আকার ও ভরের চেয়ে বৃহত্তর নক্ষত্রের জন্ম হয়ে থাকে তবে সেই সব অতি-তারকার অন্তঃস্থিত নিউক্লিয়ার তেজবিকিরণ ও কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা সেগুলোকে অস্থিরবস্থ করেছে। ফলে তারা সংগে সংগে দুই বা ততোধিক তারকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে, নক্ষত্রজগতের ব্যাস প্রায় ২ বিলিয়ন বৎসর। তা হলে এই ২ বিলিয়ন বৎসর পূর্বেই নভোবায়ুমণ্ডল থেকে বিভিন্ন নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—বর্তমান যুগে কি আর নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে, অথবা সেই এক সময়েই বিশ্বসৃষ্টি তার পূর্ণতা লাভ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মহাকাশের বিশেষ ও বিভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আমাদের নক্ষত্র জগতের কয়েকটি তারকা বাকীগুলোর চাইতে বয়সে অনেক ছোট। লাল দানবদের কথা ধরা যাক। তারা তো সবে মাত্র তাদের জীবন আরম্ভ করেছে। লালউজ্জ্বল নক্ষত্র E Aurigae I এখনও তার প্রাথমিক মহাকর্ষীয় সংকোচনের পর্যায়ে অবস্থান করছে। এথেকে নিশ্চিতই বলা যায় যে, অন্যান্য নক্ষত্রের কাছে এরা নিতান্তই শিশু। এরা অন্যান্য নক্ষত্রদের জন্মের বহু পরে জন্মলাভ করেছে। সাধারণ পর্যায়ের নীল দানব নক্ষত্রগুলোর বয়সও অপেক্ষাকৃত অল্প। তাই বর্তমানকালে নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি হবেনা একথা বলা যায় না। বরং মহাশূন্য বায়ব-নীহারিকা নামে যে বস্তুপুঞ্জ রয়েছে তা থেকে অনায়াসে নূতন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে। তবে একথা সত্য যে, সেই আদিম যুগে প্রধান প্রধান নক্ষত্রদেহের সৃষ্টি হয়ে গেছে—অধুনা এরকম সৃষ্টি বিরল মাত্র।

শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে আমরা আর এক সমস্যার সম্মুখীন হই। আমরা জানি, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার তাপকেন্দ্রিন ক্রিয়ার ফলে নক্ষত্রদেহের তেজ নির্গত হয়। শ্বেত বামন নক্ষত্র-গুলোতে হাইড্রোজেন উপাদান ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে আর তাপকেন্দ্রিন ক্রিয়া চলে না। বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের সূর্যও একদিন এই শ্বেত বামন অবস্থায় পৌছবে। এই অবস্থায় আসতে সূর্যের অথবা সেইরূপ নক্ষত্রের লাগবে কয়েক বিলিয়ন বৎসর; কারণ জন্মের পর সূর্য আজ পর্যন্ত তার দেহস্থিত শতকরা ৩৫ ভাগ হাইড্রো-জেনের ১ ভাগ মাত্র ব্যয় করেছে। তবে সিরিয়াস-সহচর নক্ষত্রের হাইড্রোজেন উপাদান ফুরাল কি করে? যেহেতু রাসায়নিক মৌল মহাকাশে সমভাবে মিশ্রিত ও পরিব্যাপ্ত রয়েছে—তাই সিরিয়াস সহচরের হাইড্রোজেন উপাদান নিশ্চয়ই কম ছিল না; আবার অন্যান্য নক্ষত্রের জন্মের অর্থাৎ ২ বিলিয়ন বৎসরের অনেক পূর্বে শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এও সম্ভব নয়।

অধ্যাপক গ্যামো সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্তমানের শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলো কখনও শৈশব পর্যায়ে আসে নি। অত্যন্ত ভারী উজ্জ্বল ও দ্রুত বিচরণশীল নক্ষত্রগুলো তাদের সৃষ্টির পর বর্তমানের বহুপূর্বেই তাদের হাইড্রোজেন ব্যয় করে ফেলেছে। তারপর আমাদের সূর্য থেকে বহুগুণে ভারী এই সব নক্ষত্র দেহ সংকোচনের ফলে বহুগুণ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অতীতের এই বিখণ্ডিত অংশগুলোই আজকে শ্বেত বামনরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য অনেকাংশে উদ্ঘাটিত হলেও আমরা আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট তিমিরেই আছি। বিগত শতকের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যান্ট গ্রহ-সৃষ্টির এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ খাড়া

করেছিলেন। তাঁর মতে সূর্যের আদিম মহাবর্ষীয় সংকোচনকালে বহির্কেন্দ্রিক বল দ্বারা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন বায়ব-বলয় দিয়ে গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ বেশী দিন টিকে নি; কারণ, গণিতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংকোচন ও আবর্তনশীল সূর্য থেকে যদি বায়ব-বলয় উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে তা একটি গ্রহে ঘনীভূত হতে পারে না। সেখানে শনির বলয়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড পুঞ্জীভূত হওয়াই সম্ভব। অপরদিকে দেখা যায়, সৌর-জগতের সমগ্র আবর্তনীয় ভরবেগের শতকরা ৯৮ ভাগ গ্রহগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে; অথচ সূর্যের আবর্তনে এই ভরবেগ শতকরা ২ ভাগ মাত্র। মূল আবর্তনশীল বস্তুদেহে ভরবেগ এত অল্প অথচ সেই বস্তুদেহ থেকে উদ্ভূত গ্রহগুলিতে ভরবেগ এতবেশী, একথা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন যে, নিশ্চয়ই সূর্য এবং অন্যান্য কোন নক্ষত্রের ঘর্ষণের ফলে

১নং চিত্র
সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায়
নক্ষত্র থেকে গ্রহের উৎপত্তি

গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে আর বহিরাগত ভরবেগ সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে।

এই নূতন মতবাদকে সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন (hit-and-run) মতবাদ নামে অভিহিত করা হয়। (১নং চিত্র)। এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদা একক সূর্য যখন মহাশূন্যে বিচরণ করছিল তখন আর একটি নক্ষত্র তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। গ্রহ-সৃষ্টির জন্য উভয়ের শারীরিক প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। পরস্পরের মহাকর্ষজনিত শক্তি বহুদূরেও উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করল। উভয়ের দেহপৃষ্ঠে এই আকর্ষণের ফলে প্রচণ্ড ঢেউ উঠলো। এই ঢেউ নক্ষত্রদেহে উচ্চতার সৃষ্টি করল। এই উচ্চতা যখনই একটা সীমা অতিক্রম করে, তখনই উভয় নক্ষত্রকেন্দ্রের মধ্যস্থলের একটি সরল রেখায় এই উচ্চ বস্তুপিণ্ড বহুধা বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিখণ্ডিত বস্তুপিণ্ডগুলোতে তাদের জনক-নক্ষত্রদ্বয়ের গতির কিয়দংশ আরোপিত হয়। তাই যখন নক্ষত্র দুটি পরস্পরকে ছেড়ে দূরে সরে যায়, তখন তারা সংগে নিয়ে যায় এক একটি আবর্তনশীল গ্রহমণ্ডলী। মহাকর্ষশক্তিবলে উদ্ভূত ঢেউয়ের দ্বারা নক্ষত্রটিও গ্রহগুলোর প্রায় সমান দিকে নিজ অক্ষপথে বিচরণ করবার গতি লাভ করে। যে নক্ষত্রের সংগে সূর্যের সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহজগৎ সৃষ্ট হয়েছে সে নক্ষত্র আজ কয়েক লক্ষ বৎসরে হয়ত বহু দূরে আমাদেরই গ্রহজগতের কতকগুলো ভাইবোনকে সংগে নিয়ে সরে গিয়েছে। বিজ্ঞানীর দূরবীণে সেই ক্ষণিকের অতিথির চিত্র আর ধরা পড়ে না।

নক্ষত্রগুলোর মাঝখানে এতবেশী ব্যবধান রয়েছে এবং সে তুলনায় নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ এত ছোট যে, নক্ষত্রদের মধ্যে এইরূপ সংঘাত প্রায়ই হয় না। কয়েক কোটি বছরে কয়েক কোটি নক্ষত্রের মধ্যে দু-একটি হয়ত এই সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। আমাদের সূর্য ও তার সেই

সংঘর্ষকারী নক্ষত্রই বোধহয় একমাত্র এইরূপ সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে গ্রহজগতের সৃষ্টি করেছে। আজও দূরবীণে নিকটতর নক্ষত্রের গ্রহ ধরা পড়েনি। তবে অনেক জুড়ি তারা আকাশে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সৃষ্টির আদিযুগে বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব ছিল অল্প। ক্রমশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্ফীত হয়ে পড়ছে—তাই নক্ষত্রদের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে সেরূপ সংঘাত সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সেই আদিমযুগে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের সংঘাত হওয়ার প্রচুর সুযোগ ছিল। তাই কোন কোন নক্ষত্রের গ্রহজগৎ সম্ভব হয়েছে। কোনও নক্ষত্রেরা তৃতীয় এক নক্ষত্রের সহায়তায় নিকটতর নক্ষত্রকে স্থায়ীভাবে বেঁধে রেখেছে। সেগুলোকেই আমরা জুড়ি তারা বলি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব ক্রমশ স্ফীত হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানী হাব্‌ল্ আমাদের দৃষ্টি-পথে অনুভূত বিভিন্ন নীহারিকার বেগ পরিমাপ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তারা ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বহির্ছায়াপথ নীহারিকাগুলোর এই অপসরণবেগ সবক্ষেত্রে সমান নয়। আমাদের নক্ষত্রলোকের কাছাকাছি নীহারিকা থেকে দূরের নীহারিকাগুলোর এই বেগ বরং বেশী। আমাদের নক্ষত্রলোক থেকে আমরা যতই দূরে এগিয়ে যাই, ততই এদের অপসরণবেগ সেকেণ্ডে কয়েকশত মাইল থেকে ৬০০০০ মাইল পর্যন্ত বেড়ে যায়। আমাদের ছায়াপথ থেকেই যে বহির্ছায়াপথ নীহারিকাগুলো সরে যাচ্ছে তা নয়; পরস্পর থেকে তাদের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে মাত্র। অধ্যাপক গ্যামো একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। একটা রাবারের বেলুনের পৃষ্ঠদেশে যদি অল্পবিস্তর সমদূরবর্তী কিছু অংকন করে তাতে ফুঁ দেওয়া যায় তবে মনে হবে যেন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অন্যান্য বিন্দু-গুলোর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সেই নির্দিষ্ট বিন্দুতে যদি কোনও পতংগ বসে থাকে, তবে তার মনে হবে যে, অন্যান্য বিন্দুগুলো তার অবস্থান থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আর সেই বিন্দুগুলোর অপসরণবেগ পতংগ থেকে বিন্দুগুলোর দূরত্বের
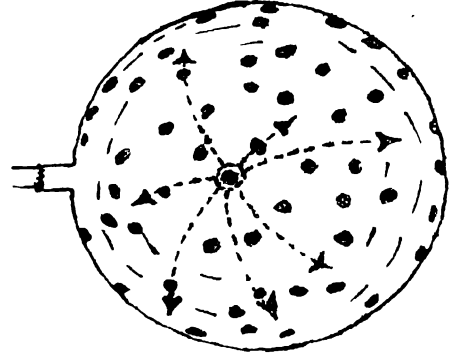
২নং চিত্র

সংগে সমানুপাতিকে হবে। (২নং চিত্র)। তাই বিজ্ঞানী হাব্‌লের মতে বলা যায় যে, বহির্ছায়াপথ নীহারিকা সমন্বিত মহাকাশ ক্রমশ স্ফীত হয়ে পড়ছে। এতে নক্ষত্র জগতের জ্যামিতিক আয়তন বাড়ে না, কেবল তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বই বেড়ে চলে। ২ বিলিয়ন বৎসর পরে নক্ষত্রলোকগুলোর ব্যবধান দ্বিগুণ বর্ধিত হবে। আর ২ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে নক্ষত্র লোকগুলোর ব্যবধান এত অল্প ছিল যে, নীহারিকাগুলো মহাকাশে অখণ্ড ও সমভাবে পুঞ্জীভূত নক্ষত্ররাজিরূপে অবস্থিত ছিল।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নক্ষত্রগুলো যে ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, নক্ষত্রলোকগুলোও প্রায় একই প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তফাৎ এই যে, বিভিন্ন অণু সমন্বিত বায়ব থেকে নক্ষত্রের সৃষ্টি—আর নক্ষত্রবিন্দু দিয়ে গঠিত নাক্ষত্রিক বায়ব দিয়ে ছায়াপথগুলো গড়ে উঠেছে। বিশ্বের স্ফীতি-শীলতার পূর্বে এই সমস্ত ছায়াপথের নক্ষত্রমণ্ডলীদের মধ্যে মহাকর্ষের ক্রিয়া বিশেষভাবে পরিস্ফুট ছিল। সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহসৃষ্টির মত এই মহাকর্ষ নক্ষত্রলোকগুলোকে কিছুটা কৌণিক ভরবেগ যোগান দিয়েছে এবং নাক্ষত্রিক

বায়বের বলয়রূপ এক অংশকে মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্নকরে নীহারিকার কুন্তলিত বলয় সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত কথাগুলো অনুধাবন করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে পৃথক পৃথক নক্ষত্র গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানী জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বলেন যে, প্রথমেই ছায়াপথগুলোর সৃষ্টি হয়। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক গ্যামো ও তাঁর সহকর্মী টেলার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ছায়াপথগুলো গঠিত হওয়ার সময় নক্ষত্রদের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে নক্ষত্র ও নক্ষত্রজগৎ সৃষ্টির পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। পরন্তু ছায়াপথগুলোর ব্যবধান ও জ্যামিতিক আয়তন এই সিদ্ধান্তের দ্বারা গণনা করে বাস্তব দৃষ্ট আয়তন ও দূরত্বের সংগে মিলে যেতে দেখা যায়।

পার্থিব তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো কবে সৃষ্টি হলো, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নক্ষত্র ও ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র মহাকাশে যে বায়ব পরিব্যাপ্ত ছিল তার তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ছিল অত্যধিক। এই তাপমাত্রা হবে প্রায় কয়েক বিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আর ঘনত্ব জলের চেয়ে কয়েক বিলিয়ন গুণ বেশী। জার্মান পদার্থবিদ্‌ ওয়াইজ স্যাকারের মতে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ভারী তেজস্ক্রিয় মৌল মহাকাশের এই অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের জীবনকাল যথাক্রমে ৪.৫ ও ১.৬ বিলিয়ন বৎসর। এইরূপ জীবনকাল ও বর্তমানকালে পৃথিবীতে তাদের তুলনামূলক প্রাচুর্য থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অন্ততঃ ২ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে এই ধাতুগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াইজ স্যাকারের সিদ্ধান্ত এই ব্যাখ্যার সংগে মিলে যায়। তাই নক্ষত্র সৃষ্টি ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অবশ্য নক্ষত্র সৃষ্টির প্রাক্কালে এই নভোবায়বের ঘনত্ব ও তাপ ক্রমশ কমে গিয়ে নক্ষত্র সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ, নক্ষত্র, গ্রহ, নীহারিকা সৃষ্টির অপূর্ব রহস্য এইভাবে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে নব নব গবেষণার ফলে হয়তো সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কলাকৌশল আরও স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে। ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

বিদ্যুতের ব্যবহার

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। মানুষ দৈহিক শক্তির পরিবর্তে বিজ্ঞানের সাহায্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। বিদ্যুৎ আমরা চোখে দেখিনা; কিন্তু ইহার দ্বারা সম্পাদিত কাজ হইতে আমরা ইহাকে চিনিতে পারি। এই বিদ্যুতের সহায়তায় আমরা রাত্রির অন্ধকারকে দিনের আলোর মত উজ্জ্বল করিতে পারি। ইচ্ছামত বায়ুর তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমাদের শ্রান্তি দূর করিতে পারি। বেতারের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের খবর আদানপ্রদান

করিতে পারি। আজ বিদ্যুতের সহায়তায় অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়; বিদ্যুৎই বিজ্ঞানের প্রাণ।

প্রথমে বিলাসিতারূপে গণ্য হইলেও বর্তমানে শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলেই বিদ্যুৎ এখন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য; দিনে দিনে ইহার প্রয়োগ আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক সর্ববিধ কর্মের মধ্যেই দ্রুত প্রসার লাভ করিয়া আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আমাদের সুখ, সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে।

গৃহস্থালীতে বিদ্যুৎ :—

গভীর অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া গৃহের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকের বন্যা বহন করিয়া আনা বিদ্যুতের পক্ষে তুচ্ছতম ব্যাপার। বিদ্যুতের আশ্চর্য ক্ষমতার পার্শ্বে আলাদিনের প্রদীপের ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হইয়া পড়ে। বিদ্যুতের সহায়তায় গৃহের আবহাওয়ার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, বেতার যন্ত্র, শৈত্যোৎপাদক যন্ত্র, জলতাপন যন্ত্র, বৈদ্যুতিক মার্জনী প্রভৃতির প্রচলনে গৃহের পরিবেশ অধিকতর সুস্থ ও সুখ সম্পন্ন হইয়া উঠে, কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। জীবন-যাত্রার মান উন্নততর হয় এবং অবকাশের কোমল মুহূর্তগুলি দীর্ঘতর ও নিবিরোধ হইয়া উঠে।

আদর্শ আলোক :—

অন্যান্য আলোকের তুলনায় বৈদ্যুতিক আলোক বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। এই আলোক দিবালোকের মতই স্বচ্ছ। যে সব আবর্জনার কথা আমরা চিন্তাও করিতে পারি না বিজলী আলোকের সাহায্যে তাহারা আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্‌ঘাটিত হয়। বৈদ্যুতিক আলোক এইভাবে আমাদের গৃহের পরিবেশকে স্বাস্থ্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। ব্যবহারের দিক দিয়াও এই আলোক যথেষ্ট সুবিধাজনক।

দৃষ্টিশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। আলোকের প্রখরতা বা মালিন্য অকারণে চক্ষুকে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট করে। যে আলোক চক্ষুর স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির অনুকূল তাহাই উত্তম আলোক। একটি সুন্দর বাতির সাহায্যে এইরূপ উত্তম আলোক লাভ করা সম্ভব। উক্ত বাতির সাহায্যে যথাস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ মৃদু আলোক সৃষ্টি করা অতি সহজ। অবশ্য এই বাতিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য গৃহ মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। পাতলা আবরণে এই বাতি ঢাকিয়া দিলে অতি সহজেই আলোর ঝকমকানি বা অস্পষ্টতা দূর করা যায়। উত্তম আলোকের প্রধানতঃ তিনটি গুণ আছে। প্রথমতঃ, এই আলোক পর্যাপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার তীব্রতা থাকিবে না এবং তৃতীয়তঃ, গৃহের সর্বত্র এই আলোক স্থাপন করা সম্ভব হইবে। বৈদ্যুতিক আলো উক্ত তিনটি প্রয়োজন সিদ্ধ করে। বৈদ্যুতিক আলো হইতে আমরা যে পরিমাণ উপকার পাই তাহার তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ অতীব তুচ্ছ।

গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য ২৫, ৪০, ৬০, ৭৫ এবং ১০০ ওয়াট প্রামাণিক আকারের বাতিই উপযোগী। তন্মধ্যে ৬০ ওয়াট বাতিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

অনুপযোগী আলোকের দ্বারা আমাদের যে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয় তাহার সহিত তুলনায় বৈদ্যুতিক আলোর মূল্য খুবই বেশী। গৃহের আবহাওয়াকে অধিকতর মধুর, স্নিগ্ধ ও সুন্দর করিতে, আমাদের আরাম-লিপ্সাকে চরিতার্থ করিতে এবং দৃষ্টিশক্তিকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিজলী বাতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে।

বায়ু সঞ্চালন ও বায়ু চলাচল :—

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদের ধারণা, গৃহকে স্বাস্থ্যের অনুকূল রাখিতে হইলে গৃহান্তর্গত বায়ুর ঘণ্টায় একবার বা দুইবার পরিবর্তন দরকার। যে স্থলে

বিশুদ্ধ বায়ুর উপযুক্ত সরবরাহ নাই অথবা দরজা জানালা উন্মুক্ত করিলেও যে স্থলে প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু সঞ্চালন করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে দুই প্রকার বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—(১) নির্গমন ও সঞ্চালন পাখা এবং (২) টেবিল ও ছাতপাখা। প্রথম প্রকার পাখার সাহায্যে গৃহের আবর্জনা ও দুর্গন্ধ বিতাড়িত করিয়া বিশুদ্ধ বাতাস সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, দ্বিতীয় প্রকার পাখার সাহায্যে গৃহমধ্যস্থ বিশুদ্ধ বাতাসের পরিমাণ বিশেষভাবে বর্ধিত না হইলেও বায়ু মৃদুভাবে আন্দোলিত হয়। এইরূপ পাখার ব্যবহারে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ মন্দীভূত হয়। কারণ নিশ্চল বায়ু অপেক্ষা চলমান বায়ুর শৈত্যোৎপাদিকা শক্তি অধিক। বৈদ্যুতিক পাখার গতি অতি সহজেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কোন কোন টেবিল পাখার দোলায়মান গতির সাহায্যে বিস্তৃত অঞ্চলে বায়ু সঞ্চালিত হয়। ব্যয়িত শক্তির পরিমাণও অতি অল্প; ৩০ হইতে ১৪০ ওয়াটের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং ব্যয়ের দিক দিয়াও অন্য প্রকার পাখার তুলনায় এই পাখা সস্তা। সাধারণ আকারের বৈদ্যুতিক বাতির মতই ইহাতে খরচ পড়ে। বর্তমানে বিজলী পাখার মূল্য ৬০৲ হইতে ১২০৲ টাকা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ইহা সুলভ বলা যাইতে পারে।

গৃহস্থালীর টুকিটাকি প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি :—

গৃহস্থালীতে টুকিটাকি ব্যবহারের জন্য ইস্ত্রি, কেটলি, টোষ্ট করিবার ও কাফি ছাঁকিবার যন্ত্র, রন্ধন-জালিকা ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সামগ্রী সকলের নিকটই অতি পরিচিত।

বিজলী ইস্ত্রি :—

ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্র রুমাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ শয্যাবরণ পর্যন্ত সব কিছুই অতি সহজে ইস্ত্রি করা যায়। ইহার সাহায্যে কেবলমাত্র শ্রমলাঘবই হয় না, বস্ত্রাদি দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করে এবং মালিন্যের প্রভাব হইতেও রক্ষা পায়। মাত্র বিশ-পচিশ টাকার পরিবর্তে একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহার ব্যবহারে যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয় তাহাও অতি অল্প।

বৈদ্যুতিক কেটলী :—

ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে প্রয়োজনমত জল গরম করা যাইতে পারে। দেয়াল সংযুক্ত প্লাগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া একটি বোতাম টিপিলেই এই যন্ত্র কাজ করিতে আরম্ভ করে। অতি প্রত্যূষে চা প্রস্তুত করিতে হইলে বৈদ্যুতিক কেটলী ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই কেটলী দেখিতেও সুন্দর এবং ব্যবহারে গৃহের পরিচ্ছন্নতা বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। এই সব কারণে যে কোন টেবিলে বৈদ্যুতিক কেটলী ব্যবহার করা যাইতে পারে; অধিকন্তু ইহাতে অতি অল্প শক্তি ব্যয়িত হয়।

টেবিলে ব্যবহারের জন্য অনুরূপ আর একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র আছে। ইহার সাহায্যে আমরা মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে দুইটি রুটি টোষ্ট করিতে পারি। এইরূপ কর্মতৎপরতার জন্যই উক্ত যন্ত্রে অল্প শক্তি ও অর্থ ব্যয়িত হয়।

বৈদ্যুতিক ছাঁকনী :—

ইহার সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাফি ছাঁকা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে কাফি রাখিয়া জল ঢালিয়া দিয়া বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেই আমাদের কাজ সমাপ্ত। যাহাতে গরম জল উপচাইয়া পড়িয়া বা অত্যধিক গরম হইয়া যন্ত্রটি নষ্ট না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় কলকব্জা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক রন্ধন জালিকা :—

ক্রয় এবং ব্যবহারের দিক দিয়া সুলভ বলিয়া ইহা অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

জল গরম করা অপেক্ষা রন্ধনকার্যে সহায়তা করার জন্যই ইহার উদ্ভব। ইহার সাহায্যে অতি সহজেই আহার্যাদি প্রস্তুত করা যায়। ইহাতে তিন প্রকার তাপ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলিয়া ইহার সাহায্যে বিচিত্র প্রকার রন্ধনক্রিয়াও সম্ভব। সাধারণতঃ দুইপ্রকার বৈদ্যুতিক রন্ধন জালিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—(১) সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ও (২) অনাচ্ছাদিত। প্রথম প্রকার রন্ধন জালিকার তাপোৎপাদনের মূল উপাদানটি অদাহ্য বস্তুর আবরণের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। ইহার উপরিভাগ সমভাবে উষ্ণ হয় ও আবরণটি দীর্ঘকাল তাপ ধারণ করিতে পারে এবং পাত্রমধ্যস্থ তরল পদার্থ যাহাতে ঘনীভূত হইয়া খণ্ড খণ্ড না হইতে পারে তাহার সহায়তা করে। আচ্ছাদিত রন্ধন জালিকা ব্যবহার করিতে হইলে চ্যাপ্টা ও মোটা বাসনকোসন দরকার। কারণ তাহাতে ইহাদের চ্যাপ্টা ও মোটা তলদেশ সহজেই যন্ত্রটির আবরণের সঙ্গে আঁটিয়া বসিবে। অন্য প্রকার তৈজসপত্র ব্যবহার করিলে দ্রুত উত্তাপ উৎপন্ন হয় না এবং অনেক উত্তাপ অপব্যয়িত হয়।

অনাচ্ছাদিত রন্ধন জালিকায় উত্তাপ উৎপাদনের মূল যন্ত্রটি অংশতঃ বা পূর্ণতঃ অনাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া কিরণসম্পন্ন উত্তাপ উৎপন্ন হয়। ইহাতে যে কোন প্রকার রন্ধন সামগ্রী ব্যবহার করা চলে। কারণ উত্তাপের জন্য এস্থলে যন্ত্রের আবরণের সহিত তৈজসপত্রের সংস্পর্শের উপরে নির্ভর করিতে হয় না। এইরূপ যন্ত্র অধিকদিন স্থায়ী হয় না। গনগনে উত্তাপের প্রয়োজন হইলে ইহাই ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

বেতার যন্ত্র, শৈত্যোৎপাদক যন্ত্র, পাকপাত্র, বায়ুনিষ্কাশন করিয়া আসবাবপত্র পরিষ্কার করিবার যন্ত্র, প্রক্ষালনপাত্র প্রভৃতি আরও বহুবিধ উন্নততর বৈদ্যুতিক কল উদ্ভাবিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার যন্ত্রপাতির মূল্য বর্তমানে অধিক হইলেও ভারতবাসীদের বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও বৈদ্যুতিক সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। এইসব বৈদ্যুতিক সামগ্রী যেভাবে শ্রমলাঘব ও আরাম বৃদ্ধি করে তাহাতে ব্যয় সার্থক হইয়া থাকে।

পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ব্যাটারি চালিত বেতার যন্ত্র :—

এই যন্ত্র মানবগৃহে বিদ্যুতের একটা বিশেষ দান। সাধারণ ব্যাটারির মূল্যাধিক্য, অনিশ্চত কার্যকারিতা এবং নানাপ্রকার উৎপাত দূর করিয়া উহা নির্ভরযোগ্য গ্রহণশক্তির পরিচয় দেয়। পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ব্যাটারিযুক্ত রেডিওর আমদানী হইলে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। মুষ্টিমেয় উৎসাহীকে আনন্দ দান করার পরিবর্তে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করা এবং দিকে দিকে বিশ্বসংসারের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবার দায়িত্ব উপরোক্ত বেতারের উপর নির্ভর করে।

বিজলীর সাহায্যে রন্ধন :—

বৈদ্যুতিক পাকপাত্র নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। আচ্ছাদিত প্লেটযুক্ত পাকপাত্রে দুই তিনটি কড়াই একসঙ্গে গরম করা যায়। সেঁকিবার ও গরম করিবার পৃথক পৃথক চুল্লি অথবা ভাজিবার ও সিদ্ধ করিবার প্লেটযুক্ত পাকপাত্রও পাওয়া যায়। বিদ্যুতের সাহায্যে উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করা এত সহজ যে যাঁহারা একবার এইরূপ খাদ্য আহার করিয়াছেন তাঁহারা কখনও অন্য প্রকার রন্ধন পদ্ধতিতে খুসী হইতে পারেন না। কয়লা বা কাঠের আগুনে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই প্রকার আগুনে রন্ধন করিলে ধোঁয়া, ঝুল এবং ধুলাবালি খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশিয়া যায়। বৈদ্যুতিক পাকপাত্রে এই রকম কোন ঝঞ্ঝাট নাই।

সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক পাকপাত্রে অধিক, মাঝারি ও অল্প উত্তাপের জন্য পৃথক পৃথক বোতাম থাকে। ইহাদের সাহায্যে ইচ্ছামত তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেবলমাত্র একটি বোতাম টিপিলেই

এই কাজ সম্পন্ন হইয়া যায়। বৈদ্যুতিক চুল্লির সঙ্গে একটি তাপমাপক যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। ইহার সাহায্যে সহজেই তাপের পরিমাপ করা যায়। কোন কোন পাকপাত্রে তাপ নিয়ন্ত্রণের এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, কেহ না থাকিলেও যথাসময়ে সুন্দর-ভাবে রন্ধনকার্য সমাধা হইয়া যায় এবং খাদ্যসামগ্রী সুসংরক্ষিত থাকে। যে সময়ে বিদ্যুৎ রন্ধনকার্য সম্পন্ন করে সেই সময়ের মধ্যে আমরা অন্যান্য অনেক কাজ সারিয়া লইতে পারি।

কোনরূপ জ্বালানি না পোড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করে বলিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে রন্ধনকালে ধোঁয়া বা বাষ্পের সৃষ্টি হয় না। যেস্থানে উত্তাপের দরকার সেস্থানেই উত্তাপ পরিচালিত হয়, সমগ্র রন্ধন গৃহটা উত্তপ্ত হইয়া উঠে না। এই কারণে সর্বদাই রন্ধনগৃহটি স্নিগ্ধ, আরামপ্রদ ও পরিষ্কার থাকে। ধোঁয়া বা ঝুল থাকে না বলিয়া বাসনকোসন তৈজসপত্র পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখা সম্ভব হয়।

ভাল বৈদ্যুতিক চুল্লি সবসময়ই তাপ নিরোধক পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত থাকে বলিয়া অতি অল্প উত্তাপ বাহিরের বাতাসে পরিচালিত হইয়া নষ্ট হয়। উক্ত বিদ্যুৎ-চুল্লির এই প্রকার তাপধারক ক্ষমতার জন্য বোতাম খুলিয়া দিলেও অনেক সময় রন্ধনকার্য চলিতে পারে।

শৈত্যোৎপাদন :—

খাদ্যদ্রব্যকে টাটকা এবং ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহাকেও অবহিত করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। মাছ, মাংস এবং দুধ কত তাড়াতাড়ি বাসি হইয়া যায় তাহা সকলেই জানেন। গ্রীষ্মকালে এই সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে।

বৈদ্যুতিক শৈত্যোৎপাদক যন্ত্রের দ্বারা এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান অতি সহজে সম্ভব হয়। খাদ্যদ্রব্যকে বহুদিন ধরিয়া টাটকা, বীজাণুমুক্ত, পুষ্টিকর ও সুগন্ধযুক্ত রাখিতে হইলে নাতিশীতোষ্ণ স্থানে ইহাকে রাখিতে হইবে। ৪০-৪৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ ইহার পক্ষে উপযোগী। বৈদ্যুতিক শৈত্যোৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যে সকল ঋতুর সকল সময়েই এই উত্তাপ উৎপন্ন করা যায়। শৈত্যোৎপাদক যন্ত্র এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, যে গৃহে ইহা স্থাপিত হয় সেই গৃহের উত্তাপ যখন পূর্বনির্ধারিত চরম সীমায় (সাধারণতঃ ৪৮° ফাঃ) উত্থিত হয় তখন ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যখন গৃহের উত্তাপ পূর্বনির্ধারিত নিম্নতম সীমায় (সাধারণতঃ ৩৫° ফাঃ) নামিয়া যায় তখন ইহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

শৈত্যোৎপাদক যন্ত্র ব্যবহার করিলে কিরূপ ব্যয় হইবে তাহা নির্ভর করে ভাণ্ডার গৃহের যে পরিমাণ তাপ ইহাকে অপহরণ করিতে হয় তাহার উপর।

বৈদ্যুতিক মার্জনী :—

ইহার সাহায্যে অল্পপরিশ্রমে গৃহের প্রতিটি অংশ নিখুঁত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার করা যায়; অথচ সাধারণ মার্জনীর সাহায্যে গৃহ পরিষ্কার করিলে যে গোলমালের সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক মার্জনীর ব্যবহারে তাহার একতৃতীয়াংশেরও কম গোলমাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঝাঁটা ও ঝাড়নের সাহায্যে পুরাতন পদ্ধতিতে গৃহ পরিষ্কার করিলে যেরূপ ধূলায় মেঘ উঠে বিদ্যুতের সাহায্যে গৃহ পরিষ্কার করিলে সেরূপ হয় না। ইহার সাহায্যে নির্দিষ্ট পাত্রে ধূলি সঞ্চিত হয় এবং বরাবর নর্দমায় গিয়া এই পাত্র খালি করিয়া ফেলা চলে। উচ্চবেগে ঘূর্ণিত একটি পাখার সাহায্যে ইহা সম্ভব। এইরূপ পাখার সাহায্যে ঘরের কার্নিস, ছবির ফ্রেম, বইয়ের তাক, খোদাই করা আসবাব পত্র প্রভৃতির উপর হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ফেলা এবং উড়াইয়া দেওয়া সহজ।

বৈদ্যুতিক মার্জনী বোতামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বোতাম পাখার হাতলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। দেয়ালে আঁটা প্লাগের সঙ্গে নমনীয়

তারের সাহায্যে পাখার সংযোগ স্থাপন করিলেই বিদ্যুতের ক্রিয়া সুরু হয়।

বৈদ্যুতিক সেলাই কল :—

সেলাইয়ের কলের সঙ্গে বিদ্যুৎ সঞ্চারক যন্ত্রের সংযোগ দ্বারা সেলাইয়ের কাজকে দ্রুততর এবং সহজসাধ্য করা হয়। যে কোনও সেলাইয়ের কলের সঙ্গে বিদ্যুৎ সঞ্চারক যন্ত্র সংযুক্ত করা সম্ভব। ইহাতে সুবিধা মত কলের বেগ বা গতি নিয়ন্ত্রণ করা চলে। সেলাই করিতে গেলে চোখের অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া কার্যস্থলে প্রচুর আলোর প্রয়োজন।

চুল শুকাইবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র :—

এই যন্ত্রটির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক পাখা এবং একটি তাপোৎপাদক যন্ত্র থাকে। পাখার সাহায্যে চুলের মধ্যবর্তী ঠাণ্ডা বাতাস আহৃত হইয়া তাপোৎপাদক যন্ত্রের একটি নলের মধ্যে সঞ্চারিত হইলে এক ঝাপটা উষ্ণ বাতাস উৎপন্ন হয়।

পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ব্যাটারী চালিত ঘড়ি :—

বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা নির্ভুলভাবে সময় নির্ধারণ করিতে পারি। বিদ্যুৎ প্রবাহ পথের সহিত একবার ঠিকমত সংযুক্ত করিয়া দিলে এইরূপ ঘড়ি বিনা দমে এবং কোনরূপ যত্নের অপেক্ষা না রাখিয়া নিখুঁতভাবে কাজ করিয়া যায়। ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির পরিমাণ নগণ্য বলিলেই চলে।

বৈদ্যুতিক প্রক্ষালন যন্ত্র :—

উক্ত যন্ত্র সাহায্যে উত্তমভাবে ধৌতকার্য নিষ্পন্ন করা হয়। বস্ত্রাদি নিংড়াইবার একটি কল এই যন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া হাত দিয়া নিংড়াইবার প্রয়োজন হয় না। পাঁচ, ছয়, আট এবং দশ গ্যালন জল ধরিবার উপযোগী আকারের বৈদ্যুতিক প্রক্ষালন যন্ত্র পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যন্ত্রগুলি সীসা বা দস্তার কাজ করা তামা অথবা ইস্পাত দিয়া নির্মিত। আকারের অনুপাতে এই যন্ত্র আমাদের যে পরিমাণ উপকার করে তাহার তুলনায় ইহার ব্যয়ের পরিমাণ অতি অল্প।

জল সরবরাহ ও জল নিকাশে বিদ্যুৎ :—

সভ্য সমাজে প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। ইহার অভাবে সর্বদাই কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। জনসাধারণকে প্রয়োজনমত বিশুদ্ধ জল জোগাইবার গুরু দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের।

জল সরবরাহের কারখানাগুলিতে মন্দগতি বাষ্পীয় এঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত পাম্পের সাহায্যে কূপ বা বাঁধ হইতে জল তুলিয়া সেই জল বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় ধরিয়া রাখা হয়। এই চৌবাচ্চা এরূপ উচ্চস্থানে রাখা হয় যেখান হইতে অনায়াসে জল প্রবাহিত হইতে পারে। এইসব এঞ্জিন নির্ভরযোগ্য। জল সরবরাহ ও জল নিকাশের অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা বৈদ্যুতিক পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাতে অল্প মূলধনের প্রয়োজন এবং ইহার পরিচালন ও পরিপোষণ অত্যন্ত সহজসাধ্য। কেবলমাত্র সহরেই নহে পল্লীঅঞ্চলেও বিদ্যুতের সাহায্যে জল সরবরাহ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা লাভজনক।

খোলা পুষ্করিণী হইতে বরাবর জল সংগ্রহ করিবার যে রীতি তাহা স্বাস্থ্যবিরোধী ও শ্রমসাধ্য। পল্লীঅঞ্চলে উপযুক্ত স্থানে একটি সুগভীর কূপ খনন করিলে বিশুদ্ধ ও শীতল জল সহজেই পাওয়া যায় এবং এই জল কলুষিত হইবার কোন-প্রকার সম্ভাবনা থাকে না। যেখানে ঐরূপ কূপ বর্তমান সেখানে উচ্চ বেগসম্পন্ন বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে উচ্চ স্থানে স্থাপিত জলাধার হইতে জল বাহির করিয়া আনা যায়। জলের চাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়াও উক্ত কাজ সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

এই প্রকার বৈদ্যুতিক পাম্পগুলি স্বয়ংক্রিয় সুইচের সহিত সংযুক্ত থাকে। জলাধারের জল যখন নির্দিষ্ট চিহ্নের নীচে নামিয়া যায় তখন ঐ সুইচের সাহায্যে পাম্পের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং

জলাধার যখন পূর্ণ হইয়া যায় তখন পাম্পের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। চাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্তমানে বিশেষভাবে প্রবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতিতে পাম্পের সাহায্যে জল একটি সংকীর্ণ, অংশতঃ বায়ুপূর্ণ জলাধারের মধ্যে সবেগে সঞ্চালিত হয়। জল যত বাড়িতে থাকে জলাধারের মধ্যবর্তী বাতাস তত সংকুচিত হইতে থাকে। নলের মুখগুলি খুলিয়া দিলে উক্ত চাপের শক্তিতে জল নলের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় চাপের দ্বারা চালিত একটি সুইচ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে যে, জলাধারের চাপ যখন পূর্ব-নির্ধারিত নিম্নতম সীমায় নামিয়া আসে তখন যন্ত্রটি কাজ করিতে আরম্ভ করে (এই চাপ সাধারণতঃ প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে ২১ পাউণ্ড) এবং পুনরায় যখন জলাধারের চাপ স্বাভাবিক হয় (সাধারণতঃ প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে ৪৩ পাউণ্ড) তখন ইহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

এই উপায়ে কোনরূপ যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াও নল হইতে সর্বদাই জল পাওয়া যায়। পল্লীঅঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থা করিলে পল্লীবাসীরা বিশুদ্ধ জলের প্রচুর সরবরাহ পাইতে পারিবে।

কি প্রকারে পাম্প ব্যবহার করা হইবে, কি পরিমাণ জল সরবরাহ করিতে হইবে, কত জল তুলিতে হইবে এবং কত চাপ দরকার হইবে—এই সবের উপর ব্যয়ের অঙ্ক নির্ভর করে।

শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ :—

উভয় বঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৬ কোটির উপর। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক পল্লীঅঞ্চলে (৭০,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ৮৬টি মহকুমায় বিভক্ত স্থানে) বাস করে। শিল্প-বাণিজ্যের কোনরূপ সুবিধা না থাকায় পল্লীবাসীদের জীবনধারণের মান অতি নিম্ন। একমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের বহুল প্রসারই এই সমস্ত লোকের অর্থনৈতিক জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে পারে। শত শত বেকার ও অর্ধবেকারকে কর্মে নিয়োজিত করিতে পারে।

প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রেরণ ও অল্প মূল্যে বিতরণের বহু পরিকল্পনা আমরা রচনা করিয়াছি। এই সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিবে, বেকার শ্রমিকদের বেকারত্ব ঘুচিয়া যাইবে। সস্তা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যতীত জলের এবং দ্রব্যাদি আদান-প্রদানের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে কারখানা নির্মাণের প্রশস্ত সম্ভাবনা ধনীদের দৃষ্টি পল্লী-অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। পল্লীঅঞ্চলে সহজে শ্রমিকও পাওয়া যায়। শিল্প ব্যবসায়ী মাত্রেই এই সকল সুবিধা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বহু প্রাকৃতিক সুবিধাও আছে। শিল্পে প্রয়োজনীয় বহু কৃষিজাত দ্রব্য কারখানার অতি নিকটেই পাওয়া যাইতে পারে। চা ও পাট এইখানে উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত প্রচুর পরিমাণ কয়লা, তামাক, আখ, তৈলবীজ, লাক্ষা, পশুচর্ম, কাঠ এবং বাঁশ বঙ্গদেশে জন্মায়। যে সব স্থানে কাঁচা মাল পাওয়া যায়, আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা আছে এবং শ্রম ও বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ সহজে সম্ভব, সেই সব স্থানে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলে অল্পব্যয়ে প্রচুর পরিমাণ উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

কৃষিকর্মে বিদ্যুৎ :—

এই সরকার আগামী বৎসরের মধ্যেই কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীঅঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রেরণপথ স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দূরবর্তী অঞ্চল-গুলিতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত দেশে ব্যাপকভাবে এবং ভারত-বর্ষের কতকাংশে পরিমিতভাবে কৃষিকার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে। মহীশূর, যুক্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চল একবার ঘুরিয়া আসিলে

বোঝা যাইবে পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে কৃষিকর্মে কি বিশাল উন্নতি দেখা দিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে 'গ্রীড' পদ্ধতিতে গাঙ্গেয় প্রণালী হইতে সেচের উদ্দেশ্যে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। এই প্রদেশে কৃষি-কর্মে বিদ্যুৎ প্রয়োগের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। মাদ্রাজ এবং মহীশূরে সুবিস্তৃত পল্লীঅঞ্চলে কূপ ও পুষ্করিণী হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া জল সেচের কাজে সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় এবং তৈল চালিত এঞ্জিনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত এঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

জল সেচন :—

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। ইহার শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী জীবিকার্জনের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। ইহার মোট আয়তন ৫৩ লক্ষ একর। তন্মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ মোট আয়তনের ৪৭% অংশ কৃষির অধীন। বনাঞ্চল বাদ দিলে আরও প্রায় ৬½ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ বর্তমানে যে জমি চাষ করা হয় তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষির জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যদি সেচের সুবিধা থাকিত তবে আরও অধিক জমিতে চাষ সম্ভব হইত। এই সমস্ত আলোচনা বাদ দিলেও বর্তমানে যে জমি চাষ করা হয় তাহাতেও উত্তম জল সরবরাহ সম্ভব হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলের জন্য মৌসুমী বায়ুর খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হয়। মধ্যবঙ্গের নদীগুলি মৃতপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের নদী-গুলি বৃষ্টি হইলে পূর্ণ থাকে, বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যায়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ক্ষেত্র বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়। বাংলা-দেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান্য। কর্ষিত ক্ষেত্রের প্রায় ৮৮% ভাগে ধান্য রোপন করা হয়। এই চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন। যদি সেচের সুবিধা থাকিত তবে অনায়াসে বৎসরে একই ক্ষেত্রে দুইটি উত্তম ধান্যের চাষ এবং একটি উত্তম তরিতরকারী, শাকসব্জির চাষ সম্ভব হইত। সেচের সুবিধার অভাবে বর্তমানে একই জমিতে মাত্র একটি কি দুইটি ধান্যের আবাদ হয়। তন্মধ্যে কোনটিকেই উত্তম বলা চলে না।

পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি একই উপায়ে আমাদের দেশে মৃৎকর্ষণ হইতেছে। এই প্রদেশে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথমে দরকার জল সেচন ও সার সরবরাহের সুব্যবস্থা।

আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সংকটের সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইলে প্রত্যেকটি উপযুক্ত ভূমিতে উন্নততর ধরণের কৃষির প্রচলন করিতে হইবে। ইহা একমাত্র উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা ও নিষ্কাশন প্রণালী দ্বারাই সম্ভব। এই ব্যবস্থার জন্য নির্ভরযোগ্য ও পরিমিত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট সর্বাগ্রেই নানাবিধ লোভনীয় সর্তে এই উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য সাহায্য এখন হইতেই পাওয়া যাইবে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাইবার জন্যও গভর্ণমেণ্ট সকলকে সহায়তা করিবেন।

শস্যের চাষ : —

জমির কার্যে শ্রমিকদের গো-মহিষাদিই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু ইহাদের সাহায্যে জমির কাজ অতি মন্থর গতিতে নিষ্পন্ন হয় এবং অতীব কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া শ্রম এবং উপকরণ উভয়েরই অপব্যয় হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যদেশে খাদ্যশস্যের খোসা ভাঙ্গিবার, মূল ও তুষ ছাড়াইবার এবং শস্য ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিবার জন্য গোলাঘরের যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাহাদের চালনা করিবার কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ইহার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে কার্যগুলি সুসম্পন্ন হয় বলিয়া টন প্রতি খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

শস্য তুলিবার ও মাড়াইবার যন্ত্রগুলি চালাইবার জন্য সুব্যবহার্য বিদ্যুৎ সঞ্চারক যন্ত্র ব্যাপকভাবে

ব্যবহৃত হয়। বহুস্থানে তৃণ ও শস্যাদি শুষ্ক করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলীকে উষ্ণ করা হয়।

পক্ষির চাষ :—

নানাবিধ পক্ষিপালন ও ডিম্বোৎপাদন শিল্প বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। ডিমে তা' দেওয়া, শাবক পালন, শীতের সময় মুরগীর গৃহ-গুলিকে উত্তপ্ত ও আলোকিত করিয়া ডিমের উৎপাদান বৃদ্ধি করা ও ডিমগুলি আহরণ করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।

উদ্যান রচনা :—

উদ্যানের আচ্ছাদিত ও ছায়াচ্ছন্ন অংশে বায়ু-তাপন, মৃৎশোধন ও উত্তাপন প্রভৃতি কার্যেও ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক আলোকের স্থিতিকাল ও ঘনত্বের বিচিত্র নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বৃক্ষলতার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পুষ্টি ও ফলফুল উৎপাদনের ক্ষমতাকে মানুষ ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারে।

পশুপালন :—

পশুপালন শিল্পেও বিদ্যুতের দান অসামান্য। দুগ্ধ দোহন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এই শিল্পে বিপুল পরিবর্তন আনিয়াছে। হস্তের পরিবর্তে বিদ্যুতের দ্বারা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুগ্ধদোহন করা হইতেছে। দোহনের পর দুগ্ধ যাহাতে অম্লত্ব প্রাপ্ত না হয় সেই উদ্দেশ্যে দুগ্ধের উত্তাপ হ্রাস করা দরকার। ইহার জন্য যথোপযোগী শৈত্যোৎপাদনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেবল-মাত্র বৈদ্যুতিক শৈত্যোৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যেই ইহা সম্ভব। সকল পশুপালন কেন্দ্রে একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুগ্ধের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে ধুইয়া, মাজিয়া অল্প-ক্ষণের জন্য বিদ্যুৎচালিত বীজাণুনাশক আধারের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অনুকূল।

দুগ্ধ হইতে মাখন, পনির, সর, চকোলেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্যও বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গণিতের নবজন্ম ও পরিচয়

শ্রীশিশিরকুমার দেব

যতই দিন এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গুলোর মধ্যে বিভাগ ও উপবিভাগের সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানে অনেক শিক্ষিত লোকের ভুল হয়, কোনটা কোন বিষয়ের মধ্যে পড়ে। ১৯শ শতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্রের এই সমস্যাকে এড়াবার জন্যে কয়েকজন দার্শনিক দর্শনকে টুকরো টুকরো করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে ভাগ করে দেবার আন্দোলন করেন। যাহোক তা সফল হয়নি। গণিত শাস্ত্রের মধ্যেও অনেকটা সেই রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা গণিতের রূপ ও তার বর্তমান স্থিতি নিয়ে আলোচনা করব।

গণিতশাস্ত্রের প্রধানতঃ দুইটি দিক রয়েছে—একটি তত্ত্বগত বা বিশুদ্ধ গণিত ও দ্বিতীয়টি প্রায়োগিক বা ফলিত গণিত। আবার এদের প্রত্যেকের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং এই সব শাখা-প্রশাখা এক এক সময় এমন লুকোচুরি খেলতে থাকে যে, বোঝাই যায় না তা কোন্ বিশিষ্ট জ্ঞানের মধ্যে পড়ে। যেমন বিশুদ্ধ গণিতের গণিত-ন্যায় শাখা, ফলিত গণিতের কয়েকটা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক শাখা। বিশুদ্ধ গণিতের এই অংশটি (এখনও

ঠিক হয়নি এটা গণিতের না ন্যায়ের অংশ) নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে।

গণিত-ন্যায়ের আবিষ্কারই টেনেছে মধ্যযুগীয় ও বর্তমান গণিতের সীমারেখা। মূল আবিষ্কারক হিসেবে লাইবনিৎসের (১৬৪৬-১৭১৬) নাম উল্লেখযোগ্য। রাসেলের মতে Aristotelian Logic এর প্রতি তাঁর অন্ধ বিশ্বাসের ফলেই তিনি তাঁর লেখা প্রকাশ করেন নি। তা না হলে ১৫০ বছর আগেই গণিত-ন্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য লবচেভ্‌স্কি, রীমান, হ্যামিল্টন প্রমুখ প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদ্‌গণ তাদের দিক থেকে গণিতরাজ্যে এক বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। গণিত-ন্যায়ের প্রধান ক্রিয়া হলো গণিতকে ন্যায়শাস্ত্রে পরিবর্তিত করা। এতে তত্ত্বের দিক দিয়ে হয়ত গণিতের যথেষ্ট উন্নতি হলো, মানুষের চিন্তাশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার; কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগে—ন্যায় যখন ন্যায় এবং গণিত যখন গণিত তখন কোনটার মূল্য বেশী? গণিত ও ন্যায় দুটি বিভিন্ন বিষয়। গণিতের এই রূপান্তরের মানেই হচ্ছে, তার একটা নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া ন্যায়ের পটভূমিকায়। এটা ঠিক যে, ক্ষতি হয়নি কারও, দুই-ই পরস্পরের মিলনে সমৃদ্ধ হয়েছে—গণিতের রূপায়ন দিকটা ন্যায়ের রসে সিঞ্চিত হয়েছে; আবার ন্যায়ের এই প্রকৃষ্ট প্রয়োগ তার জয়ের সূচনা করছে।

তারপর প্রশ্ন আসে, এই নতুন বিষয়টি কার কুক্ষিগত করতে হবে? দু-বিষয়ের ছাত্রই এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছে এবং কার গবেষণা বেশী এগুচ্ছে তা মেপে বলা কঠিন। তবে এপর্যন্ত যতটুকু হয়েছে তাতে দেখা যায়, দার্শনিক বা নৈয়ায়িকদের অংশই হয়তো কিছু বেশী হবে। (অবশ্য এর মূলে আছেন গণিতবিজ্ঞানী এবং তাঁরাই এর রূপ দেন)। যাহোক, এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে যথেষ্ট এবং সামান্য ৭০।৫০ বৎসরের (যদিও বুল (Bool) সাহেব ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এর কাঠামো রচনায় নিযুক্ত ছিলেন তার 'Mathematical analysis of Logic' নামক বইয়ে। তবে Cantor, Peano, Frege এবং Russell Whitehead—এঁরাই এর বর্তমান রূপ দেন।) মধ্যে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে একটা অপূর্ব সামগ্রী বলে বিবেচিত হয়েছে।

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন বিষয়টির ব্যবহারিক মান কতটুকু? গণিত ও ন্যায় দুটিই সব চাইতে বেশী বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তানুশীলন। কিন্তু পৃথিবীর বাস্তবরূপ আলোচনা করলে দেখতে পাই, এরা প্রায় সবাইকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। শুধু প্রত্যক্ষ প্রায়োগিক মূল্য দিয়ে অন্ততঃ এই সময়ে এর সঠিক বিচার করা সঙ্গতও নয় সম্ভবও নয়। পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনে এদের কর্মক্ষেত্রে নামার দরকার হয় না, কারণ রূপকারকে শক্তি যোগানই এদের প্রধান ও একমাত্র কাজ। মানুষের সমাজে যেসব অপ্রীতিকর কার্য হচ্ছে তার মূলে আছে মানুষের চিন্তাশক্তির খবতা, বিভিন্ন প্রবৃত্তির ভ্রমাত্মক পাদক্ষেপ ও সংঘর্ষ। আশা করা যায়, এই নতুন বিষয়টি থেকে অচিরেই ভ্রমের ও বিশৃঙ্খলতার প্রতিষেধকের অভিব্যক্তি হবে (ভাষা ও তার অর্থ নিয়ে যে প্রকার গবেষণা হচ্ছে তার জন্যে একে দায়ী করা মোটেই অসঙ্গত নয়)।

মোটামুটিভাবে এই-ই তার স্থিতি এবং বাকীটুকুতে আমরা এর ঐতিহাসিক বিবর্তন ও চর্চা নিয়ে আলোচনা করব।

গণিতের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক গ্রীক আমল থেকেই রয়েছে। পীথাগোরীয় সংখ্যার মধ্যে রয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মূল। দার্শনিক প্লেটোর আখড়ায় তো জ্যামিতি-না-জানা লোকের প্রবেশ নিষেধ। গ্রীক আমলের গণিত ও দর্শনের সুগভীর সম্পর্ক নিয়ে হোয়াইটহেড তাঁর শেষ বই Essays in Science & Philosophy-র

কয়েকটা প্রবন্ধে ও F. S. C. Northrop 'Essays written for Whitehead' নামক বইয়ে The Mathematical background and contents of Greek Philosophy প্রবন্ধে সুন্দর ও সহজভাবে আলোচনা করেছেন। যাহোক গণিতের বিপ্লবের সূত্রপাত হয় বুল সাহেবের Investigation into Laws of Thought (1844) ও Mathematical Analysis of Logic (1847) নামক দুইটি পুস্তক প্রকাশের পর। তারপর জার্মানীর Frege ও ইটালীর Peano গণিতকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন ও সংখ্যার একটা বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেন। এঁরা অবশ্য সূত্রপাত করেন, কিন্তু পূর্ণরূপ দান করেন পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ গণিত দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল ও আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড তাঁদের 'Principia Mathematica' নামক পুস্তকের তিনটি খণ্ড (V. 1—1910, V. 2—1912, V. 3—1913) প্রকাশের পর। অবশ্য এর আগে Weierstrass, Dedekind, Abel-এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য এবং হোয়াইটহেডের 'Universal Algebra' (1898) এবং রাসেলের 'The Principles of Mathematics'—(1903) পুস্তক দুটি এদিক দিয়ে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। ১৯০০ খৃঃ অব্দে প্যারিসে 'International Congress of Philosophers'-এর এক অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়ে রাসেল ও হোয়াইটহেড পিয়ানোর সঙ্গে আলাপ করেন। রাসেল তার সঙ্গে পিয়ানোর যথেষ্ট মিল দেখতে পান এবং পিয়ানোর নিকট থেকে তাঁর জিনিসগুলো চেয়ে নেন এবং পরে সব মিলিয়ে ১৯০৩ খৃঃ অব্দে 'Principles' প্রকাশ করেন। তারপর হোয়াইটহেড এদিকে আকৃষ্ট হন এবং দুজনে মিলে দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যুগান্তকারী 'Principia' প্রকাশ করেন। 'Principia'র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়—প্রথমটি হয় Symbols, relations, classes induction' প্রভৃতি নিয়ে, ২য়টি হয় 'Number arithmetic, series, functions' প্রভৃতি নিয়ে এবং ৩য়টি হয় 'Series, numbers, vector-families, cyclic functions' প্রভৃতি নিয়ে। চতুর্থ খণ্ডটির ভার ছিল নাকি হোয়াইটহেডের উপর এবং এর বিষয়বস্তু ছিল জ্যামিতি। সম্প্রতি রাসেল Mind (April. 1948)-এ প্রকাশিত Whitehead and Principia Mathematica' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন যে, হোয়াইটহেড কিছুটা লেখেন এবং তা এখনও আছে। হোয়াইটহেড যে লিখতে আরম্ভ করেন তা নিজেও স্বীকার করেছেন; কিন্তু দুজনের দার্শনিক মতবৈষম্যের ফলে বইটি আর প্রকাশিত হয় নি। (হোয়াইটহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র জে, এইচ, সি, হোয়াইটহেড—ওয়াইনফ্লেট প্রফেসর অব পিওর ম্যাথেমেটিকস্ অক্সফোর্ড কে লিখেছিলাম এ সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, "...Yes, it would have been nice if A. N. W. had written it—though it should not have been written before the consequences of Relativity were explored, which means that something like 1935 would have been right!" যাহোক হয়ত Russell-এর 'Human Knowledge—its scope & limit' বইটি এর জবাবদিহি করেছে। মিঃ হোয়াইটহেডকে ১৯৫০ সালে International Congress of Mathematicians-এর তৃতীয় অধিবেশনে সেই অপ্রকাশিত লেখাটুকু ও তাঁর নিজের কিছু এই সম্বন্ধে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছিলাম—তাতে তিনি লিখেছেন, "No, I don't think I shall write a book like that—at least not for several years," যাহোক হোয়াইটহেড ও রাসেলের নিকট পৃথিবীর গণিতবিজ্ঞানীরা চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে, অবশ্য যদিও Principia-র মধ্যে অনেক গলদ

ধরা পড়ছে এবং তার পরিবর্তন, শুদ্ধি ও ব্যাখ্যা হচ্ছে।

'Symbolic Logic নিয়ে Tarski, Langford, C. I. Lewis, Carnap ও Quine-এর বইগুলো Principia-র পরিপূরক ও সাহায্যকারী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। রাসেলের 'Intro. to Math. Philo.' (1919) ও তার আগে 'Foundations of Geo' উল্লেখযোগ্য। গণিতের এই বিপ্লবের ফলে তিনটি প্রধান দলের উৎপত্তি হয়েছে—Formal logicians, Intuitionists ও Logisticians। এর মধ্যে শেষেরটাই অধিকতর নতুন এবং এদের বক্তব্যকেই গণিত-ন্যায় বলা হয়ে থাকে সাধারণতঃ।

Princeton-এ আজকাল যেরূপ জ্ঞানচর্চা হচ্ছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ১৯৪৬ সালে Princeton Bicentennial Conference এ Problem of Mathematics নামক প্রচার পত্রিকাতে গণিত-ন্যায়ের সরসতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কথা হয়েছে। কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, হার্বার্ড, প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ নিয়ে গভীর গবেষণা হচ্ছে। Zurich-এর Prof. Bernays ১৯৩৮ এর International Congress of Philosophers-এর প্যারিস অধিবেশনে Philosophy of Math. & Logic আলোচনায় এর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি মাস কয়েক আগে B B C-এর এক অধিবেশনে 'The New Mathematical Philosophy নামক প্রবন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী L. L. Whyte এই বিষয়টির ব্যবহারিক মূল্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি আশা করেন, এই বিষয়টি মানবের সভ্যতা গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করবে। Principia-র মূল্য নির্ণয় করা এই সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় তবে গাণিতিক বিপ্লবের ঢেউ অনুভব করা যায়।

গণিতের এই অভিব্যক্তির ফলে গণিতের দর্শন-বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়েছে ও হচ্ছে। হোয়াইটহেড মৃত্যুকাল পর্যন্ত আক্ষেপ করে গেছেন যে, তথাকথিত গণিত বিজ্ঞানীরা শুধু বাইরের দিকটাই দেখেন, কিন্তু ভিতরের দার্শনিক গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অজ্ঞ এবং এই সত্যিকারের ভিত্তিতে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য হিসেবে গণিতজ্ঞদের মধ্যে দুটো শ্রেণী বিভাগ করেছেন—mathematician এবং good mathematician। প্রত্যেক সত্যানুসন্ধী ব্যক্তিমাত্রেই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে যেভাবে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে আঙ্কিক প্রহসন ও অভিনয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এটা বললে অতিরঞ্জন বা অসমঞ্জস হবে না যে, গণিতের সংজ্ঞা সৌন্দর্য লাভ করেছে গণিত-ন্যায়ের আবিষ্কারের ফলে। গণিতের বাস্তবতা শুধু কতকগুলো যান্ত্রিক ক্রিয়া বা চিহ্নমাত্রই নয়। যেখানে সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ নেই সেখানে গণিত শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অসুন্দর ও অর্থহীন চিন্তাবিন্যাসও বটে।

অবশ্য দার্শনিক দিকটাই গণিতের সব নয়, যদিও প্রধান গণিতের নিশ্চয়ই গাণিতিক দিক আছে এবং সেইদিকটা কি—প্রশ্ন করেই আমি আমার প্রবন্ধের রাশ টানব। Principia প্রকাশের পর Philosophy of Mathematics নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে ও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকেরা প্রায় সবাই দার্শনিক। অতিআধুনিকখানি বোধ হয় Herman Weye এর Philosphy of Mathematics and Natural Sciences (Priceton)। এইসব বইগুলোতে একটা জিনিস সব চাইতে বেশী চোখে পড়ে যে, গ্রন্থকারগণ (যেমন, Black, Berkeley, Nicod, Ramsey প্রভৃতি) গণিতের নতুন রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে যেন দর্শনের মধ্যেই ডুবে গেছেন, গণিতের গাণিতিক স্বাতন্ত্র্যকে ন্যায় ও দর্শনের

হাতে সমর্পণ করে। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ভারতবাসী রামানুজমের কাছে নাকি সংখ্যাগুলো ছিল তাঁর খেলার সাথী—খেলা যথেষ্টই আছে, অধিকতর আনন্দপ্রদ খেলাও এসেছে, কিন্তু খেলার সাথীর ব্যক্তি-পরিবর্তনে কি রামানুজম একটুও দুঃখিত হতেন না? (রামানুজমের কীর্তি অন্যদিকে; কিন্তু বেঁচে থাকলে এর ঝাঁঝ এড়াতে পারতেন না।)।

দর্শন ছাড়াও গণিতকে সহজ ও কবিত্বময় করতে অনেক গণিতজ্ঞ প্রয়াসী—তাঁদের বইগুলো উৎপন্ন হচ্ছে প্রধানতঃ আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে। গণিতজ্ঞেরা বিচার করবেন তাতে কতটুকু গণিত আছে। ১,২ প্রভৃতি গণিত নয়, এরা শুধু চিহ্ন মাত্র। ১৯শ শতকে যেসব জ্ঞানীরা দর্শনের স্বতন্ত্র সত্বাকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে ভাগ করে দেবার আন্দোলন করেছিলেন, হয়ত ২০শ শতকের পৃথিবীর জ্ঞানা-কাশে সেইরূপ বিপ্লব আসন্ন। গণিতকে নিয়ে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে—দর্শনতত্ত্বযুক্ত গণিত গণিতই নয়; গণিত সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তানুশীলন মাত্র গণিত ন্যায়ের অংশ, গণিতের কাব্য ইত্যাদি—তাতে মনে হয়, গণিতের স্বাতন্ত্র্য বিভিন্ন বিষয়ের উপচ্ছায়ায় আবৃত হয়ে পড়ছে দিন দিন। একদিকে রয়েছে উগ্র Logic-ভাব, অন্যদিকে চলেছে magic-এর লাস্য! আমি একথা বলছি না যে—নৈয়ায়িক, দার্শনিক, পদার্থবিদ্, অর্থ-নীতিবিদ্ ও শিক্ষায় উদারনীতিবিদ্‌রা গণিতকে জখম করছেন বা আত্মসাৎ করছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গণিতজ্ঞের কাছে—গণিত কি? গণিত যেমন বস্তুনিরপেক্ষ তেমনি অন্য বিষয় নিরপেক্ষও বটে। গণিতের গাণিতিক পরিচয় কি? ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'Indian Math. Soc'-এর ষোড়শ অধিবেশন হচ্ছে মাদ্রাজে, ১৯৫০ সালে তৃতীয় অধিবেশন হচ্ছে 'International Congress of Mathematicians'-এর—পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীরা তাতে যোগদান করবেন, তাঁদের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে (বিশেষতঃ Logic, Philosophy, History, Education ও Applied Math. বিষয়ক) এটা অবশ্যই জানা যাবে—গণিত কতটুকু গণিত আছে। জানা যাবে, গণিত-ন্যায় গণিতের অংশ, না ন্যায়ের অংশ। যদি গণিতের অংশ বলে স্বীকৃত না হয় তবে সেই আন্দোলনকেই স্বীকার করা হবে। Prof. Hardy তাঁর 'A Mathematicians Apology' নামক বই লিখে গণিতজ্ঞসুলভ বাহবা নিয়েছিলেন—তার প্রকাশক এখন 'Mathematicians' শব্দটি পাল্টে 'Escapists' শব্দটির জন্যে অনুমতি চেয়ে হয়ত স্বর্গে চিঠি দেবেন! চিঠির উত্তর কি হতে পারে তা আপনারা একটু বিচার করুন! উত্তর যতদিন না পাই ততদিন 'গণিতের গাণিতিক পরিচয় কি?' প্রশ্নটি করতে আমাদের এতটুকু পিছপা হতে অন্ততঃ লজ্জিত হওয়া উচিত নয়!

[ভারতীয় বৈশিষ্ট্য :—

ভারতবর্ষে গণিতানুশীলন অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ন্যায় চর্চায় ভারতের নৈয়ায়িকরা নাকি বিদেশীয়ের নিকট ভয়ঙ্কর। ভারতবাসীরা জ্ঞানানুশীলনে তৎপর, কিন্তু বিজ্ঞানু-শীলনে অতঃপর।

গণিত ন্যায়ের আলোচনা কিছু কিছু হচ্ছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায় বিভাগে, আর কোথাও গণিত বিভাগে। সম্প্রতি দু একখানি গণিত পত্রিকায় গণিত-ন্যায় সম্পর্কে টীকা বা ব্যাখ্যা বের হয়েছে। Indian Math. Soc-এর পূর্ব অধি-বেশনগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা খুবই কম হয়েছে বা মোটেই হয় নি। সামনের ডিসেম্বরের সম্মেলনে এ বিষয়ে কিছু শুনতে পাব আশা করি। ভারতবাসী ধীর, স্থির, পশ্চাৎপদ প্রভৃতি যাই হোক না কেন, জাতগর্বী ও জ্ঞানধর্মী। আমার কিন্তু বলতে ইচ্ছা করে 'ভারতবর্ষ রামানুজমের দেশ', 'স্বাধীন ভারতবর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গৃহীত রামানুজমের দেশ'—অনেক আগেই বলার ছিল, কিন্তু এখন বলেই ভাল হলো।]

বিনাতারের তড়িৎ

শ্রীঅমূল্যধন দেব

নলের ভিতর দিয়া জল পাঠাইতে হইলে যেমন জলাধারের চাপের প্রয়োজন তেমনি তড়িৎ সঞ্চালনের নিমিত্তও চাপের প্রয়োজন হয়। এই চাপকে ইংরাজীতে বলে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স। ভল্টা প্রবর্তিত এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এই চাপ বা ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স মাপা যায় এবং ভোল্টেজ নামে অভিহিত হয়। টর্চলাইটের ২ ভল্ট চাপ বা বড বড় তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ৬৬০০০ বা ততোধিক ভোল্টের চাপ একই প্রক্রিয়া সাধন করে।

তড়িতের চাপ বা তড়িৎ উৎপাদন বাহ্যতঃ তিন উপায়ে সম্ভব হয়—

(১) রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ; যেমন, টর্চলাইট বা মোটর গাড়ীর সেল।

(২) দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির ধাতুর সংযোগ-স্থলকে তপ্ত করিয়া ; যেমন, পাইরোমিটার যন্ত্র বা মেঘের বিদ্যুৎ।

(৩) চুম্বকের সহায়তায়। কার্যকরীভাবে তড়িৎ উৎপাদন চুম্বক গুণসম্পন্ন বস্তুর সাহায্যেই হয়। তড়িৎ বহনকারী তারকে যদি চুম্বকাকীর্ণ স্তরের মধ্যে ঘুরানো যায় তবে তড়িৎ সৃষ্টি হয়। চুম্বক স্তরের শক্তি, তড়িৎবাহী তারের দৈর্ঘ্য এবং ঘুরানোর বেগের উপর তড়িৎ উৎপাদন বা তড়িৎ চাপ নির্ভর করে। গণিতের সংজ্ঞায় যদি

ই — তড়িৎ চাপ (ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স)

এ — তড়িৎ (সংখ্যাবাচক)

র — তড়িৎ বহনকারী তারের অন্তর্নিহিত বাধা বা প্রতিরোধ শক্তি হয়—

তবে $এ = \frac{ই}{র}$।

চুম্বকাকীর্ণ স্তরের মাধ্যমে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তাহার গতি উভয়মুখী অর্থাৎ প্রতি আবর্তনের মধ্যেই তরঙ্গের দিক বা গতি পরিবর্তন হয়। এই তড়িৎ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানী সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন। লেন্‌জ, কার্কফ, হেল্‌মহোল্ট্‌জ্‌ প্রভৃতির নামই অগ্রগামী হিসাবে বলা হয়। তড়িৎকে তড়িৎবাহী তারের অন্তর্নিহিত বা অন্তর-স্থষ্ট যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদিগকে রেজিস্ট্যান্স, ইন্‌ডাক্ট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স বলা হয়। উভয়মুখী তরঙ্গকে একমুখী করা সম্ভব হয় কমিউটেটরের সহায়তায় অথবা মোটর-জেনারেটর বা রেক্টিফায়ার বা কনভারটার দ্বারা।

তামার তারই তরঙ্গ বহন করিবার জন্য বেশী ব্যবহৃত হয়। দামের তুলনায় ইহার অন্তর্নিহিত রোধ শক্তি কম। অবশ্য তরঙ্গ বহনকারী তামার তার বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। রাসায়নিক প্রক্রিয়া (ইলেক্ট্রোডিপজিসন) দ্বারা প্রস্তুত তারই এই উদ্দেশ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

তামার মাধ্যমে যেমন তড়িৎ প্রবাহিত হয়, অদৃশ্য বা বাহনহীন অবস্থায়ও তড়িৎ প্রবাহিত হয়। সচরাচর যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তাহা এই যে, জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়িলে যেমন তরঙ্গ প্রবাহ প্রান্ত অবধি পৌঁছায় তেমনি তড়িৎ প্রবাহও ইথার সংজ্ঞাধারী অদৃশ্য পাথারে তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং তাহা প্রান্ত অবধি পৌঁছায়।

বিনাতারে তড়িৎ প্রেরণ করিতে হইলেও তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে হয়। উক্ত তরঙ্গকে অন্য প্রান্তে গ্রহণ করাও সম্ভব। গ্রহণ করিবার উপাদানকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব যাহাতে প্রেরিত

তরঙ্গ অবিকল অবস্থায় ধরা পড়ে। উক্ত তরঙ্গ যে বার্তা, সঙ্গীত বা সংকেত বহন করিয়া আনে তাহাও অবিকল অবস্থায় পুনঃ প্রকাশ সম্ভব।

প্রেরিত তরঙ্গ অবিকলভাবে ধরা পড়িবার একটি সর্ত এই যে, তরঙ্গের অন্তর্নিহিত সমস্ত বাধার সামঞ্জস্য বিধান করা। গণিতের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{L.C.}}$

অর্থাৎ তরঙ্গের ক্রম $= \frac{1}{2\times3.14}$ $\sqrt{\frac{১}{\text{ইন্ডাক্ট্যান্স}\times\text{ক্যাপাসিট্যান্স, রেজিস্ট্যান্স}}}$

ইনডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স তড়িৎবাহী মাধ্যমের অন্তর্নিহিত বা অন্তর-স্পৃষ্ট রোধশক্তির বিভিন্ন বিকাশ। এক সেকেণ্ড সময়ে যতবার তড়িৎ তরঙ্গের আবর্তন হয় (সাইকেল) তাহাকে ক্রম (ফ্রিকোয়েন্সি) বলা যাইতে পারে।

তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ একটি ঢেউয়ের শীর্ষ বা অন্য কোন স্থান হইতে পরবর্তী ঢেউয়ের শীর্ষ বা অনুরূপ স্থান পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহাকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বলে।

তরঙ্গের দৈর্ঘ্য × ক্রম = গতিবেগ।

তড়িৎ প্রবাহের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান অর্থাৎ এক সেকেণ্ড সময়ে ১৮৬,০০০ মাইল বা ৩০০,০০০ কিলো-মিটার অতিক্রম করে।

বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। হ্রস্ব, মধ্যম ও দীর্ঘ। (শর্ট, মিডিয়াম ও লঙ্)। হ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবহার করায় একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রতিহত হইয়াও অব্যাহতভাবে চলিতে সক্ষম হয়। তরঙ্গ দীর্ঘ হইলে অনেক সময় প্রতিকূল তরঙ্গের সংঘাতে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় এমনভাবে তৈয়ারী যে, সব রকম শব্দ কর্ণপটহে প্রতিফলিত হয় না বা শ্রুতিগোচর হয় না। শব্দতরঙ্গ খুব উচ্চ ক্রমের হইলে (হাই ফ্রিকোয়েন্সী) স্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচর হয় না। আমরা যাহাকে বলি কানে তালা লাগা, সেই অবস্থারই সৃষ্টি হয়। বেতার তরঙ্গকে এজন্য এমনভাবে সংহত করিতে হয় যাহাতে তরঙ্গের ক্রম শ্রুতিসাপেক্ষ হয়। প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ আবর্তনের বেশী হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না।

১নং চিত্র

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চুম্বকের সহায়তায় তড়িৎ প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহার গতি আবর্তশীল বা উভয়মুখী। শ্রুতিসাপেক্ষ করার অন্য সর্ত এই যে, এই তড়িৎতরঙ্গ একমুখী হওয়া প্রয়োজন। উভয়মুখী তরঙ্গকে শোধন করিয়া একমুখী তরঙ্গের সৃষ্টি করিবার জন্য শোধন যন্ত্র বা ভাল্‌ভ ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী ভাল্‌ভ কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, ইহা কোন পদার্থের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। নলকূপের পাম্প দ্বারা যখন আমরা জল তুলি তখন জলের গতি একমুখীই থাকে অর্থাৎ নীচ হইতে উপরে। পাম্পের হাতল ছাড়িয়া দিলেও উত্থিত জল নিম্নগামী হইতে পারিবে না, ভাল্‌ভ বাধা দিবে। বেতার তরঙ্গকেও একমুখী করার জন্য ভাল্‌ভ ব্যবহৃত হয়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে থারমো-আয়োনিক ভাল্‌ভ।

ভাল্‌ভের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া এই :—একটি বায়ুহীন বাল্‌বের একদিকে একটি ফিলামেণ্ট থাকে। ফিলামেণ্টের বিপরীত দিকে এনোড নামধারী একটি ধাতব পাত থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ধনাত্মক লাইনের (+) সঙ্গে উক্ত এনোড সংযুক্ত হয় আর ঋণাত্মক লাইনের (−) সঙ্গে ফিলামেণ্ট সংযুক্ত হয়। এনোড ও ফিলামেণ্টের মধ্যে গ্রীড নামে একটি তার থাকে। এই তার বেতার যন্ত্রের আকাশ তারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

ফিলামেণ্টকে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে ইলেক্ট্রন নামধারী ঋণাত্মক তড়িৎ বিচ্ছুরিত হয় এবং এনোড নামধারী ধনাত্মক তড়িতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তড়িৎ বিজ্ঞানের ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। ফিলামেণ্ট হইতে ঋণাত্মক তড়িৎ এইভাবে ধনাত্মক তড়িতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ক্ষীণ তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আকাশ তারের সংলগ্ন গ্রীড মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকার ফলে এই ক্ষীণ তড়িৎ প্রবাহের সংঘাত উক্ত গ্রীডে লাগে। আকাশ তারের সংলগ্ন গ্রীডের মধ্যে বেতার তরঙ্গের উভয়মুখী ঢেউও আসিয়া প্রতিহত হয়। যখন ধনাত্মক ঢেউ আসে তখন ফিলামেণ্ট হইতে ঋণাত্মক তড়িৎ আকর্ষণ করে এবং এনোডের সহায়ক হয়; কিন্তু পরমুহূর্তে যখন ঋণাত্মক ঢেউ আসে তখন ফিলামেণ্ট হইতে আর ঋণাত্মক তড়িৎ আকর্ষণ করিতে পারে না (তড়িৎ বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী)। কাজেই গ্রীডের মধ্যস্থতায় তড়িতের গতি একমুখীই থাকে।
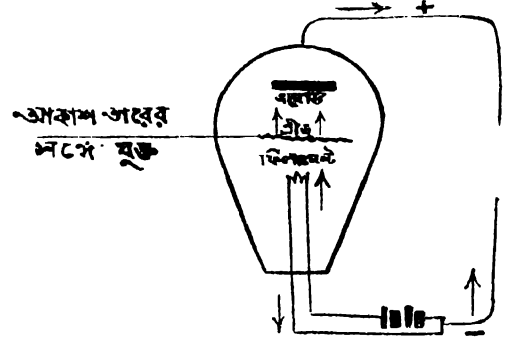
২নং চিত্র
থার্মো আয়োনিক ভাল্‌ভ্।

ভাল্‌ভের সাহায্যে ধৃত বেতার তড়িৎকে শ্রুতিগোচরের জন্য অ্যাম্প্‌লিফায়ারের সাহায্যে শব্দের মাত্রা বা বিতানকে সুসংহত করা হয়। ট্রান্সফরমারের প্রক্রিয়া অনুযায়ী অ্যাম্পলিফায়ার কাজ করে। ভাল্‌ভের কাজ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(১) আবর্তনের সংখ্যা বৃদ্ধি (হাইফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্প্‌লিফিকেশন)

(২) উভয়মুখী তরঙ্গকে একমুখী করা (রেক্টিফিকেশন)

(৩) তরঙ্গের বিস্তার বৃদ্ধি (লো ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাগ্‌নিফিকেশন)। একাধিক ভাল্‌ভ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

(১) প্রেরক যন্ত্রের দূরত্ব অনুযায়ী বেতার তরঙ্গের শক্তি ম্রিয়মান হয়। যাহাতে গ্রাহক যন্ত্রের নিকট শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ উপস্থিত

হয় এজন্য আবর্তনের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্র কাছাকাছি থাকিলে (৪০ মাইল ধরা যাইতে পারে) এই কৌশল অবলম্বন করিবার প্রয়োজন না-ও হইতে পারে।

(২) গ্রীডের সাহায্যে উভয়মুখী বেতার তরঙ্গকে একমুখী করার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভাল্‌ভের ইহা একটি অত্যাবশ্যক ক্রিয়া।

(৩) গ্রাহক যন্ত্রে ধৃত বেতার তরঙ্গকে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত তরঙ্গের বিস্তার বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

বেতার যন্ত্রের ভাল্‌ভ্ তৈয়ার করিতে খুব নিপুণতার প্রয়োজন। অন্যান্য উপাদান সহজেই এবং স্বল্পব্যয়ে সংগ্রহ করা যায়। তড়িৎ বিজ্ঞানের কানুন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকিলে বেতার যন্ত্র নির্মাণ করা বা কুশলী হওয়া আয়াসসাধ্য। ভারতবর্ষে বেতার যন্ত্র তৈয়ারী করিবার জন্য সরকারী পরিকল্পনা আছে। অনেকে ভাল্‌ভ কিনিয়া অন্যান্য উপাদান নিজে প্রস্তুত করিয়া ছোট ছোট বেতার যন্ত্র অল্প দামে বাজারেও বাহির করিতেছেন।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ কি অনিবার্য?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আইনষ্টাইনের কাছে ফ্রয়েড লেখেন, স্বার্থের ব্যাঘাত হলে জীবজন্তুরা বল প্রয়োগে তার মীমাংসা করে থাকে। স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষও এই নিয়মেরই বশবর্তী। (Why War?—Paris: International Institute of Co-operation; League of Nations. 1933; p. 3.) তাহলে মানব প্রকৃতিতে যুদ্ধবিগ্রহ যেন স্বাভাবিক ও অনিবার্য। যুদ্ধের বিলোপ যেন শুধু একটা অলীক চিন্তা কিম্বা ইচ্ছানুযায়ী স্বপ্ন মাত্র। এইভাবে দেখলে সভ্যতার ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধের ইতিহাস—আর যে সময়কে আমরা শান্তি বলে মনে করি সে সময় হয় পরবর্তী যুদ্ধের আয়োজনের সময়। তাহলেই যুদ্ধ ও যুদ্ধায়োজনের কাহিনীই হয় সমাজের ও ইতিহাসের বড় উপাদান। এই মত সত্য হলে সত্যিকার শান্তিপ্রিয়তা সমাজের বিনাশ ঘটায়। কারণ সত্যিকার শান্তিপ্রিয়তায় আত্মরক্ষার আয়োজন বা প্রয়াস থাকে না। তাছাড়া সমাজে মানুষের কাজের ধারা যদি বাস্তবিকই এরূপ হয় তবে মনে বিষাদ ছাড়া শান্তি কখনও আসতে পারে না। ফ্রয়েড কিন্তু সমাজকে এরূপভাবেই দেখতে চান। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের প্রকৃতিতে ধ্বংসকারী বৃত্তি আছে; এই বৃত্তিই শান্তির পরম শত্রু। স্বভাবতঃই মানুষের যদি ঘৃণা না করে, ধ্বংস না করে থাকা না চলে, তবুও তার যদি কতকটা শান্তিপূর্ণভাবে কোন এক গণ্ডির ভিতর থাকতে হয় তবে তার এই সহজাত বৃত্তিকে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ফেলা দরকার হয়ে পড়ে। এর এই অর্থ হয় যে, কোন জাতির আভ্যন্তরিক শান্তি আনতে হলে তার সহজাত ধ্বংসকারী বৃত্তিকে অন্যজাতির উপর প্রয়োগ করতে হবে; অর্থাৎ অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধের মূল্যে আভ্যন্তরিক শান্তি কোন জাতির পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে। ফ্রয়েডের মত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, কোন জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে যদি তাদের ঘৃণা করবার সাধারণ এক বস্তু থাকে কিম্বা যুদ্ধ করবার সাধারণ এক লক্ষ্য ঘটে।

তাহলে কোন জাতির আভ্যন্তরিক শান্তি নির্ভর করে তার আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের উপর এবং সেজন্যেই নেতারা আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রবিপ্লব এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সূচনা করেন। কাশ্মীরের প্রধান নেতা শেখ আবদুল্লা কোন সময়ে এরূপ কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীর আক্রমণ পাকিস্থানী নেতাদের গড়ে তোলা; তারা এই করে আভ্যন্তরিক গৃহযুদ্ধ ও গৃহবিবাদ হতে লোকের মন অন্য সমস্যায় ফিরাতে চান। (অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ৭ নভেম্বর, ১৯৪৭)।

মানুষের মনে সহজাত ধ্বংস বৃত্তি থাকলেও এবং যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এ বৃত্তির প্রকাশ পেলেও মানুষ যে সর্বদাই এ বৃত্তির বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করবে এরূপ বলা যায় না। যুদ্ধের মূলে এ বৃত্তি আছে বটে; আবার সাধারণ খুন-জখম, মামলা-মোকদ্দমা, রাজনৈতিক আলোচনা ও চক্রান্ত—এ সবের মূলেও এই বৃত্তি থাকতে পারে। একই বৃত্তির বিবিধ প্রকাশ হয়। তা ছাড়া ধর্ষকামের (sadism) ন্যায় বিধ্বংসী ভাব মানুষের মনে গৌণভাবেও আসতে পারে। এরূপ হলে এই বিধ্বংসী বৃত্তি মনের এক ব্যাধিত (morbid) ভাব হবে। মরণ-লিপ্সাকে (death instinct) ফ্রয়েড মনের এক বৃত্তি বলে মেনে নিলেও এ বৃত্তি এখনও অনিশ্চিত ও সন্দেহযুক্ত। শত্রুপক্ষীয় প্রতিকুল আগ্রহ সব যদি পরিপূরণ না হয়ে প্রতিহত হয় এবং জমাট বাঁধতে থাকে তা হলে সেগুলো থেকে মনে ধর্ষকামের ভাব আসে এবং সেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং এই ধর্ষকাম গৌণ এবং আত্মরক্ষার অনুকুল নয়। ফ্রয়েড স্পষ্ট প্রমাণ করতে পারেন নি যে, মনের এই বিধ্বংসী ভাব প্রধান ও মৌলিক। যদি এই বিনাশ প্রবৃত্তি অপ্রধান ও গৌণভাবেই মনে আসে এবং সমাজে যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি করে তাহলে সমাজকে নতুন আদর্শে গড়ে তুললে, পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ সুব্যবস্থিত হলে, সমাজের লোকের স্বার্থরক্ষার বিধিব্যবস্থা থাকলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ কমে যায় এবং সমাজে শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, স্বজাতি-নিগ্রহ, গৃহযুদ্ধ জাতীয় জীবনে বিরল। জাতীয় জীবনে শান্তিই সচরাচর দেখা যায়; এটাই সাধারণ, গৃহ-বিবাদ কতকটা অসাধারণ। কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তিই সাধারণতঃ দেখা যায় না; শান্তিই অসাধারণ, যুদ্ধই সাধারণ। এখন এই প্রশ্ন আসে—কেন লোক জাতীয় জীবনে শান্তিতে থাকতে চায়, আর আন্তর্জাতিক জীবনে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়?

জাতীয় জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে শান্তিস্থাপনের প্রধান কারণ হচ্ছে লোকের স্বার্থরক্ষার সুবন্দোবস্ত এবং তার জন্যে কার্যকরী আইন প্রণয়ন; আর লোকের মনে এক জাতীয় বোধশক্তির উন্মেষ। এই জাতীয় বোধ-শক্তি নিজের জাতির লোককে হত্যা করতে মনে বিতৃষ্ণা আনে, বাধা দেয়। বাস্তবিক পক্ষে পুলিস, সৈন্য কি আইন প্রয়োগে জাতীয় জীবনের শান্তি রক্ষা চলে না। সমাজে অসন্তুষ্ট, দুর্দান্ত, অসচ্চরিত্র লোকের দমনের জন্যেই আইন। সৈন্য ও পুলিস প্রয়োজনীয়; কিন্তু শুধু পুলিস ও সৈন্য দিয়ে সমাজে শান্তি বেশীদিন বজায় রাখা চলে না। সত্যিকার শান্তি শুধু আইন প্রয়োগে আসে না। সত্যিকার শান্তি আনতে হলে লোকের মনে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি, মারামারি-কাটাকাটির প্রতি অশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা জন্মান দরকার। শান্তি, শৃঙ্খলার কর্তা শুধু পুলিস নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা বা বিতৃষ্ণা না থাকলে শান্তি, শৃঙ্খলায় বাস করা চলে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এরূপ বিতৃষ্ণা কি শুধু জাতীয় জীবনেই সম্ভব, আর আন্তর্জাতিক জীবনে অসম্ভব?

আন্তর্জাতিক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা রাখবার সুব্যবস্থা নেই। যে ব্যবস্থা আছে তাহাও বলবৎ রাখবার শক্তি নেই; আর

লোকের মনে আন্তর্জাতিক বোধশক্তিই প্রকাশ পায় না। আন্তর্জাতিক শান্তি রাখবার জন্যে আন্তর্জাতিক সমিতি (League of Nations) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল এই সমিতি আন্তর্জাতিক আইন ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে শক্তিহীন এবং এই সমিতির সভ্যদের মনে আন্তর্জাতিক বিবেকবুদ্ধি জন্মান দূরে থাকুক তাদের মন হতে একাধিপত্যের ক্ষমতা লাভ করবার লালসা বিন্দুমাত্র কমে নাই। ফলে সমিতি লোপ পেলো। ইউ, এন, ও, কি এই-ই হবে? জাতীয় জীবনে যা সম্ভব, আন্তর্জাতিক জীবনে কি তা অসম্ভব? মনের দিক হতে বিচার করলে তো অসম্ভব বলে মনে হয় না। ছেলেবেলা হতেই আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে একটা স্বকাম ভাব থাকে। যখন পরিবারের মধ্যে বড় হই তখন পরিবারের অন্যান্য লোকের সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে হয়। সেজন্যে ব্যক্তিগত স্বকাম ভাব কিছু খর্ব হয়ে যায়; কিন্তু পরে এই স্বকাম ভাব সমাজে, দলে ও জাতিতে আরোপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। এ যেন লোকের একরূপ পোষমানান ভাব। এই পোষমানান ভাব না থাকলে ভিন্ন দলের, ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন স্বার্থের লোক নিয়ে এক জাতি গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু মনোবিদগণ কখনই বলবেন না, এই পোষমানান সামাজিক ভাব মনে প্রথমে জাগবে—প্রথমে লোক বেশী সামাজিক হয়ে উঠবে তারপর বৃহত্তর সমাজ গড়ে তুলবে। তাঁরা বলবেন বৃহত্তর সমাজে নানারকম লোকের সঙ্গে চলতে চলতে তাদের সামাজিক মন নানা বিষয়ের ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠবে। এই ভাবেই দেশ, সমাজ ও জাতি সমাবদ্ধ, সদৃশাংশাত্মক ও স্ফটিকাত্মক হয়ে উঠে। বিভিন্ন জাতির ভিতর কেউ বা পরাক্রান্ত, কেউ বা দুর্বল থাকেন এবং পরাক্রান্ত জাতি অন্যের উপর প্রভুত্ব করেন। কিন্তু যখন সবল ও দুর্বল জাতি—সবাই মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হন তখন প্রথম প্রথম প্রতিপত্তি যথেষ্ট থাকে বটে; কিন্তু সাম্য, স্বাধীনতা, ঘনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা অবলম্বন করলে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের পার্থক্য কমে যায়; সব জাতি মিলে এক মহাজাতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু পরস্পরের পার্থক্য, ভেদাভেদ যদি লোপ না পায় তবে সে সঙ্ঘ সজীব হয় না; তার স্থায়িত্বও আসে না। এক জাতীয় লোকের ভিতর যে সাম্য, যে ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা জন্মে, মনের এমন কোন আইন নাই যাতে বলা যায় যে, এ সাম্য, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা স্বজাতীয় লোকের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকবে—সে সীমার, সে গণ্ডির ওপারে যেতে পারবে না। পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলেই কিছু ত্যাগ করতে হবে; সেজন্যেই আমরা পরিবারের ভিতর, সমাজের ভিতর, জাতির ভিতর সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারি। এই ডোমেষ্টিকেটেড ভাব কোন এক জায়গায় থেমে যাবে, তার আর বিস্তার হবে না—এমন তো কোন নিয়ম নেই! বর্দ্ধিষ্ণু সাম্যভাব সম্ভব এবং আদর্শ মহাসঙ্ঘের গঠনও অসম্ভব নয়। এ এক রকম শিক্ষা। এ শিক্ষা আদর্শ আন্তর্জাতিক জীবন গঠনের অনুকূল।

তেজস্ক্রিয়া ও পরমাণুবাদ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

রঞ্জনরশ্মি—রঞ্জন রশ্মি বা একস্-রে আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। আবিষ্কর্তা জার্মান বৈজ্ঞানিক ডব্লিউ, সি, রঞ্জেন। ইহার পূর্বে আবিষ্কার হইয়াছিল ক্যাথোড্ রশ্মি। রঞ্জন রশ্মির সহিত পরমাণুর গঠন প্রণালীর সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। বাস্তবিক রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কার না হইলে পরমাণুর যে রূপটি আজ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লোক চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। সুতরাং যে জিনিসের গুরুত্ব এত বেশী তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানা দরকার।

ক্রুক্স্ টিউবের সহিত অনেকেরই পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহা দুইমুখ বন্ধ একটি কাচের নল এবং পাম্পের সাহায্যে অধিকাংশ বাতাস বাহির করিয়া লওয়াতে ইহার ভিতরকার বাতাসের চাপ অত্যন্ত কম। ইহার ভিতর দিয়া দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালন করিলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তিন প্রকার রশ্মির উদ্ভব হইয়া থাকে। যথা,—(১) ক্যাথোড্ রশ্মি, (২) পজিটিভ রশ্মি, (৩) রঞ্জন রশ্মি।

পজিটিভ্ রশ্মির সহিত সম্বন্ধ আমাদের কম। সুতরাং তাহাকে বাদ দিয়া আমরা ক্যাথোড্ রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মির মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব।

যখন কোন পদার্থের মধ্য দিয়া, বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালিত করা যায়, তখন তাহার এক অংশ ধনাত্মক এবং অপর অংশ ঋণাত্মক প্রান্তে পরিণত হয়। ক্রুক্স্ নলেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। সুতরাং ক্রুক্স্ নলের মধ্য দিয়া যখন শক্তিশালী বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা করা যায় তখন দেখা যায় যে, এক প্রকার রশ্মি তাহার ঋণাত্মক প্রান্ত হইতে সরল রেখায় নির্গত হইয়া ভীষণবেগে বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাই ক্যাথোড্ রশ্মি। ক্যাথোড্ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত নামে উহাকে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

কিন্তু রশ্মি নামে অভিহিত হইলেও আসলে ইহারা রশ্মি নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহারা তড়িতাণু বা ইলেক্ট্রনের স্রোতমাত্র। ক্যাথোডের পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তীব্র বেগে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ইহার গুণ অনেক। বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ইহারা বাতাসের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তড়িৎযুক্ত করিয়া তোলে, আলোকচিত্রের কাচগুলিকে বিনষ্ট করে, চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এমন কি কোন কোন পদার্থের উপর পড়িয়া তাহা হইতে পীতাভ আলো বিকিরণ করিতে থাকে। ইহা হইতেই রঞ্জন রশ্মির উৎপত্তি। ক্রুক্স্ নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপকে যদি এমন ভাবে কমাইয়া ফেলা যায় যে, উহা প্রায় বিদ্যুৎবাহী শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনার ফলে যদি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ প্রান্তের বিপরীত দিকস্থ কাচ তীব্রভাবে আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠে তাহা হইলে আলোকোদ্ভাসিত প্রান্তের বাহিরের দিকে এক প্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ইহাই রঞ্জন রশ্মি।

সোজা করিয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, ক্যাথোড রশ্মি যখন কোন পদার্থের উপর সজোরে ধাক্কা মারিতে থাকে, তখনই রঞ্জন রশ্মির উৎপত্তি হয়। এখানে কাচের উপর ধাক্কা লাগাতেই রঞ্জন রশ্মির উদ্ভব হইয়াছে।

রঞ্জন রশ্মির গুণ ও ক্যাথোড রশ্মি হইতে ভিন্ন। উহা শুধু কাচ কেন, অনেক কঠিন পদার্থকেও সরাসরি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহা আলোকচিত্রকে বিনষ্ট করিতে পারে এবং

বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বাতাসকে বিদ্যুৎবাহী করিয়া তোলে। রঞ্জন রশ্মি শক্তিশালী চুম্বকশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট বা প্রভাবিত হয় না। এই শেষোক্ত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রঞ্জন রশ্মি তড়িৎযুক্ত নয়।

কিন্তু তবে উহা কি? আমরা জানি, আলোক রশ্মি ঈথারের মধ্যে তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। যেমন জলে ঢিল ছুঁড়িলে তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তেমনি ঈথরে ধাক্কা লাগিলে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের উদ্ভব ঘটে, তাহাতেই আলোকের জন্ম হয়। তবে বিভিন্ন আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। রঞ্জন রশ্মিও ঈথার তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। ইলেকট্রনগুলি কঠিন পদার্থের (যেমন ক্রুক্‌স্ টিউবের কাঁচ, ইউরেনিয়াম ধাতু ইত্যাদি) উপর ধাক্কা মারিয়া ঈথারে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাহা হইতেই রঞ্জন রশ্মির সৃষ্টি হয়।

কথাপ্রসঙ্গে আমরা ঈথারের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ঈথার জিনিসটা যে কি, কি যে তাহার গুণ বা বিশেষত্ব তাহা বলি নাই। ঈথার বিজ্ঞানীদের মানস কন্যা। তাঁহারা বিশ্বাস করেন ঈথার আছে—সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া সর্বভূতে, সর্ব পদার্থের অণুতে, পরমাণুতে—ঈথারের অস্তিত্ব বর্তমান। এ অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার যো নাই। করিলে এতদিন ধরিয়া তিলে তিলে বিজ্ঞানের যে সৌধ তাঁহারা রচনা করিয়াছেন, নিমেষেই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং মানিতেই হইবে যে, ঈথার আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সব কিছুরই নাগালের বাহিরে থাকিয়া সে সকলের উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে। বিশ্বব্যাপি ঈথারে প্রতিমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। তাহাদের কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা মাঝারি ধরণের। এই তরঙ্গের সাহায্যে আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, রঞ্জন রশ্মি সব কিছুরই সৃষ্টি।

বলিয়াছি তরঙ্গগুলি ছোট, বড়, মাঝারি নানা রকমের। কিন্তু কত ছোট এবং কত বড় যে ইহাদের গণ্ডী সে সম্বন্ধে বলা কিছু সম্ভবপর নয়। তবে ক্ষুদ্রত্বের দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, আজ পর্যন্ত যত তরঙ্গ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

১। বেতারের জন্য বৈদ্যুতিক তরঙ্গ……তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৩×১০^{৩} হইতে ৫×১০^{৪} সেঃ মিঃ
২। বৃহত্তম উত্তাপ তরঙ্গ………………… ,, ৬×১০^{-৩} ,,
৩। লোহিত আলোক তরঙ্গ…………… ,, ৬×১০^{-৫} ,,
৪। সবুজ আলোক তরঙ্গ………………… ,, ৫×১০^{-৫} ,,
৫। বেগুনি আলোক তরঙ্গ……………… ,, ৪×১০^{-৫} ,,
৬। বেগুনাতীত আলোক তরঙ্গ……… ,, ৪×১০^{-৫} হইতে ২×১০^{-৫} ,,
৭। রঞ্জন রশ্মি…… ………………………… ,, $১০^{-৮}$ হইতে $১০^{-৯}$,,

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ সোডিয়াম রশ্মির তরঙ্গ অপেক্ষা হাজার গুণ ছোট। ইহাকে একটি পরমাণুর আকারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ব্যাকারেল রশ্মি

রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কারের এক বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে এইচ, ব্যাকারেল নামে অপর একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক আর এক প্রকার রশ্মি আবিষ্কার করেন। ইহার আবিষ্কর্তার নামানুসারে নাম রাখা হইল ব্যাকারেল রশ্মি। ব্যাকারেল দেখিতে চাহিলেন যে, রঞ্জন রশ্মির প্রভাবে যেমন কতকগুলি ধাতব পদার্থ অন্ধকারে আলো বিকিরণ করিতে

থাকে, তেমনি এই জাতীয় ধাতব পদার্থগুলি আপনা হইতে কোন অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করিতে পারে কিনা? এই উদ্দেশ্যে তিনি পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম সালফেট প্রমুখ কয়েকটি পদার্থ কালো কাগজে মুড়িয়া আলোকচিত্রের প্লেটের উপর রাখিয়া দিলেন এবং ২৪ ঘণ্টার পর প্লেটগুলি সাধারণ প্রক্রিয়ায় ধুইতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, পদার্থগুলির আকৃতির ছাপ প্লেটের উপর অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি অনুমান করিলেন যে, ইউরেনিয়াম প্রমুখ পদার্থ হইতে এমন কতকগুলি রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় যাহারা অন্ধকারেও কালো কাগজকে অনায়াসে ভেদ করিয়া আলোক-চিত্রের প্লেটগুলিকে নষ্ট করিতে পারে। ইহার নাম হইল ব্যাকারেল রশ্মি।

যে সব বস্তুর এরূপ অন্তর্ভেদী রশ্মি বিকিরণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে বলা হয় রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ এবং এই ভেদ করিবার ক্ষমতাটিকে বলা হয় রেডিও অ্যাকটিভিটি বা রেডিও তৎপরতা। যে সমস্ত পদার্থের মধ্যে ইউরেনিয়াম নামক মৌলিক পদার্থটি আছে তাহারা সকলেই রেডিও তৎপর বা তেজস্ক্রিয়।

ইহাদের গুণও রঞ্জন রশ্মির গুণের অনুরূপ। ইহারাও কাঁচ কিংবা ধাতুর পাতলা পাতের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতে পারে এবং বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহার অণুগুলিকে তড়িৎযুক্ত করিয়া তোলে। প্রথম প্রথম ইহাদিগকে রঞ্জন রশ্মি হইতে অভিন্ন মনে হইয়াছিল বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিনিস দুইটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া গেল।

এখন হইতে রাসায়নিক জগতের চিন্তাধারার মূলে আঘাত লাগিল এবং বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরিয়া যে ভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন সে ধারাও অনেকাংশে বদলাইয়া গেল। রেডিও অ্যাকটিভিটি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার হইয়া ছিল মোট ৮০ টি। কিন্তু ব্যাকারেলের আবিষ্কারের পূর্বে মৌলিক পদার্থের মধ্যে এমন একটি অত্যদ্ভুত গুণ কাহারও চোখে পড়ে নাই। একবার যখন চোখে পড়িল তখন বিজ্ঞানীরা সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুরূপ ৪০টি পদার্থ পরপর আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ইহারা রাসায়নিক জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। ইহাদিগকে বলা হইল রেডিও অ্যাকটিভ এলিমেণ্ট এবং ইহাদের গুণটির নাম হইল রেডিও অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা।

ইউরেনিয়ামের পর আসিল থোরিয়াম। এ পদার্থটি বহুপূর্বে আবিষ্কার হইলেও, ইহা যে এমন একটি অদ্ভুত গুণের অধিকারী তাহা কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই। করিলেন স্মিড্ সাহেব। তারপর হইতে একে একে নূতন পদার্থের আবিষ্কারের পালা সুরু হইল। কিন্তু এই সব আবিষ্কারের মধ্যে যেটি সব চাইতে বড়, যাহার তুলনা মেলা ভার, তাহা হইতেছে মাদাম কুরীর আবিষ্কৃত রেডিয়াম ধাতু। এ-আবিষ্কারটি শুধু যে বিজ্ঞান জগতে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়া আছে তাহা নয়, ইহার দ্বারা বিজ্ঞান জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে—বিজ্ঞানীদের অনেক মত এবং পথের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

যে পদার্থটি আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছে, যাহা মানুষের মনে পরম বিস্ময় এবং কৌতূহলের স্রোত বহাইয়া দিয়াছে, তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার সৌভাগ্য অনেকের না হইলে তাহার স্বরূপ জানিবার সুযোগ সকলেরই জুটিয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রেডিয়াম

১৮৯৮ খৃঃ অব্দে মাদাম কুরী আবিষ্কার করিলেন রেডিয়াম। আমরা দেখিয়াছি যে, ইউ-রেনিয়াম এবং ইউরেনিয়াম-জাত পদার্থগুলি রঞ্জন রশ্মির মত একপ্রকার রশ্মি বিকিরণ করে, যাহা

আলোকচিত্রের প্লেটগুলিকে নষ্ট করিতে পারে এবং বাতাসের পরমাণুগুলিকে বিদ্যুৎবাহী করিতে পারে। মাদাম কুরী হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, ইউরেনিয়ামের এই গুণটির তীব্রতা নির্ভর করে সম্পূর্ণ তাহার পরিমাণের উপর। অর্থাৎ যে পদার্থের মধ্যে ইউরেনিয়াম ধাতুর আধিক্য যত বেশী, সেই পদার্থটি উপরোক্ত গুণগুলির অধিকারী তত বেশী। ইহার উপর নির্ভর করিয়া মাদাম কুরীর পক্ষে রেডিয়াম আবিষ্কারের পথ সুগম হইয়া উঠিল।

গ্র্যানাইট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তরীভূত পদার্থ লইয়া পরীক্ষাকালে তিনি দেখিলেন যে, এমন অনেক স্বভাবজাত প্রস্তর রহিয়াছে যাহার মধ্যে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ অপেক্ষা তেজস্ক্রিয় গুণটির আধিক্য অনেক বেশী। যেমন পিচ-ব্লেণ্ড ইহার তেজস্ক্রিয়ক্ষমতা মূল ইউরেনিয়াম ধাতু অপেক্ষা চারগুণ বেশী। স্যাল্‌কোলাইটের (তামা এবং ইউরেনিয়ামযুক্ত স্বভাবজাত প্রস্তর বিশেষ) ক্ষমতা দ্বিগুণ। ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? মাদাম কুরী ঘোষণা করিলেন যে, এই সকল প্রস্তরের মধ্যে ইউরেনিয়াম ব্যতীত এমন আর একটি পদার্থ রহিয়াছে যাহার কর্মতৎপরতা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মাদাম কুরী কৃত্রিম উপায়ে স্যাল্‌কোলাইট প্রস্তুত করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বেশী তো নয়ই, বরং তাহা অপেক্ষা আড়াইগুণ কম। সুতরাং তাঁহার অনুমানই সত্য হইল।

নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান মিলিল বটে, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তাহার নিষ্কাশন ব্যাপার লইয়া। সে সমস্যারও সমাধান হইল মঁশিয়ে এবং মাদাম কুরীর অসীম ধৈর্য এবং অনন্যসাধারণ কর্মকুশলতার গুণে। বস্তুতঃ এই বস্তুটি নিষ্কাশন করিতে গিয়া স্বামী এবং স্ত্রীতে মিলিয়া যে অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা দেখাইলেন তাহার দ্বারাই জগতে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

দেখা গেল নূতন পদার্থটির অর্থাৎ রেডিয়ামের প্রধান উৎস হইতেছে জোয়াকিমষ্টাল্ (বোহেমিয়া) পিচ-ব্লেণ্ড। অপরাপর অনেক প্রস্তরীভূত পদার্থের মধ্যে রেডিয়াম বিদ্যমান থাকিলেও, পরিমাণের আধিক্য দেখা গেল এই জাতীয় পিচ্‌ ব্লেণ্ডে।

অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে ঠিক হইল, এক টন—প্রায় সাড়ে সাতাশ মণ পিচ-ব্লেণ্ডের মধ্যে রেডিয়ামের পরিমাণ থাকে ·৩৭ গ্র্যাম এবং নিষ্কাশন করিতে যাইয়া সে পরিমাণ আরও কমিয়া দাঁড়ায় উহার অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ·১৯ গ্র্যাম। সোজা ভাষায় বলিতে গেলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই যে, সাড়ে সাতাশ মণের একটি ক্ষুদ্র পাহাড় সদৃশ পিচ-ব্লেণ্ডের স্তূপ হইতে বিরাট পরিশ্রম এবং ততোধিক বিরাট ধৈর্যের পরিবর্তে যে রেডিয়ামটুকু পাওয়া যায় তাহার ওজন হয় মাত্র তিন পাই। পর্বতের মূষিক প্রসবের যে গল্প আমরা পড়িয়াছি, ইহাই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

একে তো রেডিয়ামের পরিমাণ নিতান্ত অল্প, তার উপর বেরিয়াম নামে তাহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা এমনভাবে "লেজুরের" মত তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে যে, ইহাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা দায়। ইহাদের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য এত বেশী যে, সাধারণ উপায়ে একটিকে অপরটির নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা দুরূহ ব্যাপার।

কুরী দম্পতি এই দুরূহ কার্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা পাহাড় প্রমাণ পিচ-ব্লেণ্ড লইয়া কার্য সুরু করিলেন। তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক হইল একটি তড়িৎমাপক যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা বিভিন্ন অংশের বিকিরণ ক্ষমতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যে অংশের বিকিরণ ক্ষমতা বেশী সে অংশটিকে গ্রহণ করিয়া অপর অংশটি বাদ দিয়া তাঁহারা সর্বশেষে এমন একটি অংশে আসিয়া উপনীত হইলেন—যে অংশের মধ্যে পদার্থটির সমগ্র বিকিরণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং তাঁহারা আশা করিলেন যে, এই অংশের মধ্যে নূতন মৌলিক পদার্থটি নিশ্চয়ই আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই অংশের মধ্যে আবার বেরিয়াম ধাতুও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। উহাদের পৃথক করা প্রয়োজন

যে প্রণালীর দ্বারা কুরী দম্পতি রেডিয়াম নিষ্কাশিত করিলেন তাহা মোটামুটি ভাবে ছকের আকারে নিম্নে দেওয়া গেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যে পদার্থ পাওয়া গেল তাহা রেডিয়াম ব্রোমাইড এবং বেরিয়াম ব্রোমাইডের সংমিশ্রণ মাত্র।

পিচ-ব্লেণ্ড

|

ইহাকে সর্বপ্রথম সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত বাতাসের সংস্পর্শে পোড়াইয়া পাতলা সালফ্যুরিক অ্যাসিড সহযোগে নিষ্কাশিত করা হয়।

|

দ্রবণ—ইহার মধ্যে থাকে ইউরেনিয়াম।

তলানী—ইহার মধ্যে থাকে রেডিয়াম, সীসা, ক্যালসিয়াম সালফেট প্রভৃতি পদার্থ।

|

তলানীকে কষ্টিকের দ্বারা ফুটান হয়। তারপর জল দিয়া ধুইয়া ফেলা হয়।

|

তলানী

|

ইহাকে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে সম্পৃক্ত করা হয়।

দ্রবণ

|

ইহার মধ্য দিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করিলে পোলোনিয়ম্ ধাতু তলানীরূপে পড়িয়া যায়।

|

ইহার পর যে দ্রবণটি পাওয়া যায় তাহাকে যোগধর্মান্বিত করিয়া (oxidise) অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিলে অ্যাকটিনিয়মের তলানী পড়িতে থাকে।

তলানী

|

ইহাকে সোডিয়াম কার্বনেট সহযোগে ফুটান হয়। ফলে পূর্বোল্লিখিত ধাতুর সালফেটগুলি কার্বনেট-এ পরিণত হয়। তারপর জল দিয়া ধুইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয়।

|

এইভাবে যে দ্রবণটি পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে থাকে রেডিয়াম, পোলোনিয়াম, অ্যাকটিনিয়ম ইত্যাদি।

|

দ্রবণটিতে সালফ্যুরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে বেরিয়াম, রেডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সীসা, লৌহ, এবং খুব সামান্য মাত্র অ্যাকটিনিয়ামের তলানী পড়ে।

তলানীটিকে ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় সোডিয়াম

কার্বনেট-এর সহিত ফুটাইবার পর জল দিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। এইভাবে যে তলানীটি পাওয়া যায় তাহাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করিলে বিভিন্ন পদার্থগুলি ক্লোরাইডে পরিণত হয়। এখন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ইহার মধ্য দিয়া চলনা করিলে পোলোনিয়ামের তলানী পড়িয়া যায়।

তলানী-পোলোনিয়াম
(১ টন পিচব্লেণ্ড হইতে ·০০০০৪ গ্র্যাম পোলোনিয়াম পাওয়া যায়।)

দ্রবণ

ইহাকে ক্লোরিনের দ্বারা যোগধর্মান্বিত করিয়া (oxidised) অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয়।

তলানী অ্যাকটিনিয়াম

দ্রবণ

ইহাকে সোডিয়াম কার্বনেট-এর সহিত ফোটান হয়। তারপর হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড সহযোগে জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়। ইহাতে পুনরায় হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে রেডিয়াম এবং বেরিয়াম ব্রোমাইড অদ্রাব্য পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়।

দ্রবণ

ক্যালসিয়াম ব্রোমাইড।

তলানী

রেডিয়াম ব্রোমাইড এবং বেরিয়াম ব্রোমাইড।

এইভাবে যে দুইটি অদ্রাব্য লবণ পাওয়া যায়, সদ্য প্রস্তুত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সাদৃশ্য এত বেশী যে, উভয়কে সহজে চেনা মুস্কিল। তবে কিছুকাল অবস্থিতির পর রেডিয়াম-জাত লবণের ক্রমশই বর্ণ পরিবর্তন হইতে থাকে। ইহা প্রথমে হলদে তারপর গোলাপী রঙে পরিণত হয়।

রেডিয়ামের আর একটি গুণ এই যে উহার লবণ বা তদ্জাত দ্রবণ হইতে এক প্রকার নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। যদি সামান্য মাত্র বেরিয়াম লবণ উহার মধ্যে বর্তমান থাকে তাহা হইলে এই আলোর তীব্রতা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়।

বেরিয়াম হইতে রেডিয়ামকে পৃথক করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ প্রচলিত পদ্ধতিগুলির কোনটিই এক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। ইহাদিগকে পৃথক করা হইয়া থাকে আংশিক স্ফটিকীকরণের সাহায্যে। রেডিয়াম ব্রোমাইড এবং বেরিয়াম ব্রোমাইড, এই দুইটি লবণের মধ্যে প্রথমটির দ্রবণীয়তা শেষেরটি অপেক্ষা কম।

সুতরাং ক্ষটিকীকরণের সময় রেডিয়াম ব্রোমাইড সর্বপ্রথম দানা বাঁধিয়া তলায় পড়িয়া যায়। বেরিয়াম ব্রোমাইড তখনও দ্রবণের মধ্যে থাকে। এইভাবে যে রেডিয়াম ব্রোমাইড পাওয়া যায় তাহাকে বার বার জল হইতে ক্ষটিকীকরণের সাহায্যে বিশুদ্ধ করা হয়। বিশুদ্ধ রেডিয়ামের কর্মতৎপরতা আর কোনমতেই বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। এইভাবে রেডিয়ামের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায়। এই যে রেডিয়াম, ইহা জগতের এক কৌতূহলের এবং মহা বিস্ময়ের বস্তু। ইহার কর্মতৎপরতা ইউরেনিয়াম হইতে অনেকগুণ বেশী।

এই নূতন পদার্থটির বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হইলে দেখা গেল যে, ইহার আলোকচিত্র অন্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন ধরণের এবং বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক। সুতরাং রেডিয়াম, বেরিয়ামের সহিত মিশিয়া থাকিলেও বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কিন্তু রেডিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক পূর্ব হইতেই নিঃসন্দেহ হইলেও মূল ধাতুটি আবিষ্কৃত হইল অনেক পরে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। মাদাম কুরী এবং ডেবায়ার্ন রেডিয়াম ক্লোরাইডকে বিদ্যুৎবিশ্লিষ্ট করিলেন। যে যন্ত্রটির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হইল তাহার ঋণাত্মক তড়িৎবাহক দণ্ডটি পারদের এবং ধনাত্মক তড়িৎ-দণ্ডটি প্ল্যাটিনাম, ইরিডিয়ামের মিশ্র ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত।

রেডিয়াম ক্লোরাইড-এর জলের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনার সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লিষ্ট হইল। রেডিয়াম এবং ক্লোরিন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া – এবং + প্রান্তের দিকে ধাবিত হইল। রেডিয়াম – প্রান্তে পারদের সহিত মিলিত হইল এবং ক্লোরিন + প্রান্তে আসিয়া ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হইয়া গেল। এখন পারদ হইতে রেডিয়ামকে বিচ্ছিন্ন করা বিশেষ কষ্টকর নয়। কারণ ৩৬০° ডিগ্রির উপর উত্তপ্ত হইলে তরল পারদ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উবিয়া যায়। কুরী এবং ডেবায়ার্ন পারদযুক্ত রেডিয়ামকে একটি ছোট লোহার নৌকায় করিয়া উদযান্ বাষ্পের আধারে ৭০০° ডিগ্রিতে উত্তপ্ত করিলেন। পারদ বাষ্পাকারে উবিয়া গেলে বিশুদ্ধ ঝক্‌ঝকে রেডিয়াম ধাতু নৌকার উপর পড়িয়া রহিল।

রেডিয়াম হইতে তাহার প্রধান গুণ অর্থাৎ রেডিও অ্যাকৃটিভিটি গুণটি যদি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায়, ইহার কার্যকলাপ অপরাপর ধাতুর মতই সাধারণ। বিশেষ করিয়া বেরিয়ামের সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব বেশী। তাই বেরিয়ামের গুণাবলীর সহিত ইহার মিল যথেষ্ট। রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন পদার্থগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে থাকে এবং তাহাদিগকে যদি জলে দ্রবীভূত করা যায় তাহা হইলে দ্রবণ হইতে একটা নীলাভ আলো বাহির হইতে থাকে। রেডিয়ামযুক্ত পদার্থগুলি সবই সাদা; কিন্তু কিছুক্ষণ বাতাসে থাকিবার পরেই তাহারা হলদে, পাটকিলে প্রভৃতি বর্ণে রূপান্তরিত হইতে থাকে। ইহা ছাড়াও রেডিয়ামের আরও কয়েকটি অনন্যসাধারণ গুণ আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইউরেনিয়াম হইতে একপ্রকার রশ্মি স্বতঃই নির্গত হয়, তাহার নাম ব্যাকারেল রশ্মি। রেডিয়াম হইতেও ঠিক এই রশ্মিই নির্গত হয়, তবে তাহার তীব্রতা অনেক গুণ বেশী। হীরা, চুনি, জিঙ্ক সালফাইড, ক্যালসিয়াম সালফাইড প্রভৃতি পদার্থ এই রশ্মির মধ্যে পড়িলে আপনা হইতেই জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। জলের মধ্যে রেডিয়াম থাকিলে তাহা হইতে ক্রমাগত উদ্‌যান এবং অম্লযান গ্যাস বাহির হইতে থাকে। চোখ বুজিয়া কপালের কাছে যদি রেডিয়াম ব্রোমাইড ধরা যায় তাহা হইলে চোখের তারা আপনা আপনি জ্বলিয়া ওঠে এবং চোখ বোজা থাকিলেও খোলা চোখের মতই আলো দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যানসার প্রভৃতি কয়েকটি দুরারোগ্য রোগ

রেডিয়াম রশ্মির সাহায্যে আরাম হইলেও আমাদের দেহ চর্মের পক্ষে এই রশ্মি আদৌ কল্যাণপ্রদ নয়, কারণ এ রশ্মি দেহের উপর পড়িলে যন্ত্রনা-দায়ক ক্ষত উৎপন্ন হয়।

রেডিয়াম রশ্মি এবং ব্যাকারেল্ রশ্মি যে এক এবং অভিন্ন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু এই রশ্মিগুলি কি সরল প্রকৃতির অথবা বিভিন্ন রশ্মির সংমিশ্রণ, (যেমন রঞ্জন রশ্মি এবং আলোক রশ্মির মিশ্রণ) সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই—এখন সেই কথাই বলিব। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা এক বা দুই প্রকারের রশ্মি নয়—ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার রশ্মি লইয়া গঠিত। প্রধানতঃ দুই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটি পরিশ্রুতপ্রণালী দ্বারা, দ্বিতীয়টি চুম্বকশক্তির আকর্ষণের সাহায্যে। পরিশ্রুত পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা খুব নিখুঁত না হইলেও মোটামুটি চলনসই গোছের বলা যাইতে পারে। তারই বর্ণনা প্রথমেই আমরা করিব। যাহারা গোল্ড-লিফ-ইলেকট্রোস্কোপ নামক বিদ্যুৎমাপক যন্ত্রটির সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, একটি পিতলের দণ্ডের এক প্রান্তে দুইটি খুব পাতলা সোনার পাত আঁটিয়া একটি কাঁচের আধারের মধ্যে যন্ত্রটিকে তৈয়ার করা হয়। পাত দুইটি যখন একই প্রকার তড়িতের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তফাতে সরিয়া যায়। বিদ্যুৎমুক্ত হইলে আবার ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এইরূপ একটি বিদ্যুৎ মাপক যন্ত্রের নিকট সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম ধাতু আনিলে দেখা যায় যে, সোনার পাত দুইটি তফাৎ হইতে ক্রমশই ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। ধরা যাক, ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিল দশ সেকেণ্ড। এখন রেডিয়াম ধাতুটিকে যদি পাতলা রাংয়ের পাতের মধ্যে মুড়িয়া যন্ত্রটির সামনে ধরা যায়, তাহা হইলে পাত দুইটি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে বটে, তবে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে নয়; ফিরিতে হয়ত একশত সেকেণ্ড সময় লাগিয়া যাইবে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, রাংয়ের পাত এমন একপ্রকার রশ্মিকে আটক করিয়াছে যাহার অভাবে সোনার পাত দুইটির স্বস্থানে ফিরিয়া আসার বিলম্ব ঘটিতেছে; কিন্তু আর এক প্রকার রশ্মি অনায়াসে রাংয়ের পাতটিকে ভেদ করিয়া সোনার পাত দুইটিকে আক্রমণ করিতেছে। আবার দেখা গেল রাংয়ের পাতকে ভেদ করিয়া যে রশ্মি গমনা-গমন করিতে পারে তাহা সীসার পাতের নিকট পরাস্ত হয়। সুতরাং রাংয়ের পাতের পরিবর্তে সীসার পাত ব্যবহার করিলে দ্বিতীয় প্রকার রশ্মিটি আটক পড়িয়া যায়। কিন্তু সীসার পাত তৃতীয় প্রকার রশ্মিকে আটকাইতে পারে না। সীসার পাতের দ্বারা যে দ্বিতীয় প্রকার রশ্মি প্রতিহত হইয়াছে তাহা ঐ সোনার পাত দুইটির স্বস্থানে ফিরিয়া আসার বিলম্ব হইতে বুঝা যায়।

পরিশ্রুতপ্রণালীর দ্বারা মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, রেডিয়াম হইতে নির্গত রশ্মি তিন প্রকারের এবং ধাতুর পাতকে ভেদ করিয়া গমনাগমন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের বিভিন্ন। চুম্বক শক্তির প্রয়োগে এ ব্যাপারটি আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় এবং তাহাদের স্বরূপও ভালভাবে বোঝা যায়।

এক টুকরা সীসার মধ্যে একটি গর্ত করিয়া তাহার ভিতর সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম ধাতু রাখিয়া রেডিয়াম হইতে নির্গত রশ্মিগুলির বাহিরে আসিবার জন্য গর্তটির আবরণের মাঝে একটি সরু ছিদ্র রাখিতে হইবে। একটি শক্তিশালী চুম্বকের দুইটি প্রান্তের মাঝে রেডিয়াম সমেত সীসার টুকরাটি যদি রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ছিদ্রপথ দিয়া তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হইতেছে। রাদারফোর্ড তাহাদের নাম দিলেন,—আলফা, বীটা এবং গামা রশ্মি।

ইহাদের মধ্যে গামা রশ্মিটিই হইতেছে আসল রশ্মি। রঞ্জন রশ্মির মতই ইহা বিদ্যুৎ-

চৌম্বকশক্তি বিশিষ্ট তরঙ্গ বিশেষ। আলোক রশ্মির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তবে আলোক রশ্মির তরঙ্গ ইহা অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহা বিদ্যুৎশক্তি অথবা চুম্বকশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ইহাদের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া গামা রশ্মি সোজা পথ ধরিয়া ছুটিয়া যায়। রঞ্জন রশ্মি অপেক্ষা ধাতব পদার্থকে ভেদ করিবার ক্ষমতা ইহার বেশী। প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমিত সীসার পাতকে ইহা অনায়াসেই ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

আলফা এবং বীটা রশ্মি দুইটি আসলে রশ্মি নয়। ইহারা তড়িৎযুক্ত অজস্র অণুকণিকা, অতি তীব্রগতিতে ছুটিয়া চলে। চৌম্বক ক্ষেত্র এব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রতি ইহাদের আচরণ হইতেই বুঝা যায় যে, বীটা কণাগুলি অধম তড়িৎযুক্ত এবং আলফা কণাগুলি উত্তম তড়িৎযুক্ত। বায়ু-শূন্য নলের (ক্রুক্স্ নল) ক্যাথোড প্রান্ত হইতে যেমন বস্তুকণাগুলি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলে তেমনি রেডিয়ামের উপরিভাগ হইতে বীটা কণাগুলি সজোরে নির্গত হইতে থাকে। তবে ইহাদের গতিবেগ ক্যাথোড রশ্মি অপেক্ষা অনেক বেশী—প্রতি সেকেণ্ডে ১০০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুটিয়া চলে। আলোক-রশ্মি, ক্যাথোড রশ্মি এবং বীটা রশ্মির কোন্‌টির গতিবেগ কত তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

আলোক রশ্মি···৩০ × ১০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

বীটা রশ্মি···(৬ × ১০⁴) হইতে (২৮ × ১) কিলোমিঃ প্রতি সেকেণ্ডে।

ক্যাথোড রশ্মি · (২ × ১০⁴) হইতে (১০ × ১০⁴) কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ যে কোন বস্তু অপেক্ষা বীটা রশ্মির তড়িতাণুগুলি অধিকতর বেগে ছুটিয়া চলে। ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলির মত বীটা রশ্মির কণাগুলিকে বলা যাইতে পারে যে, ইহারা ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত পরমাণুবিশেষ। ইহাদের বিদ্যুতের ঐকিক্ মান (unit charge) হইতেছে, e = ১'৫৯ × ১০⁻¹⁹ কুলম্ব্। ইহাই বিদ্যুতের সর্বনিম্ন অবিভাজ্য মান। ইহাকে বলা হয় 'এলিমেণ্টারী ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টাম্।' হাইড্রোজেন অথবা ক্লোরিনের মত এক বন্ধনীশক্তি বিশিষ্ট (monovalent) পরমাণু যখন কোন দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎযুক্ত কণা বা 'আয়ন'রূপে অবস্থান করে তখন উহা উপরোক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহাদের তড়িৎ সমষ্টির পরিমাণ হইয়া হইয়া থাকে ১'৫৯ × ১০⁻¹⁹ কুলম্ব্। আজ পর্যন্ত যত প্রকার কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা কম তড়িৎযুক্ত কণা। আরও জানা গিয়াছে যে, একটি তড়িৎ অণুর জড়ত্ব হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়ত্বের ১/১৮৩০ অংশ অর্থাৎ ১৮৩০ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং একটা বীটা কণার গুরুত্বও হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্বের ১/১৮৩০ অংশ।

বলা হইয়াছে যে, বীটা রশ্মি ঠিক ক্যাথোড রশ্মি না হইলেও ক্যাথোড রশ্মির অনুরূপ। এক-খানি আলোকচিত্রের কাচ যদি উহার গতিপথে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কাচ খানির যে যে অংশের সহিত কণাগুলি সংস্রবে আসে সেই সেই অংশগুলি অনেকটা বিবর্ণ প্রায় হইয়া যায়। ছবি হইতে দেখা যায় যে, তড়িৎ গুণযুক্ত বীটা কণাগুলি চুম্বকশক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তির্যকপথ গ্রহণ করিয়াছে। গামা রশ্মির মত ধাতব পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইবার ক্ষমতা ইহার নাই। তবে ১/৮ ইঞ্চি সীসার পাতকে ইহারা ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

বীটা রশ্মির পর আলফা রশ্মি। চৌম্বক শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইহাদেরও গতিপথ তির্যক হইয়া যায়। তবে বীটা রশ্মির মত ইহাদের গতিপথ অতখানি তির্যক ভাবাপন্ন

হয় না; অধিকন্তু বীটা রশ্মির গতিপথ হইতে ইহার গতিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বীটা রশ্মি যদি অধম তড়িতাণুর সমষ্টি হয়, আল্‌ফা রশ্মি হইবে উত্তম তড়িতাণুর সমষ্টি। আল্‌ফা রশ্মি, নামে রশ্মি হইলেও আসলে ইহারা বীটা রশ্মির মতই তড়িৎ কণার সমষ্টি মাত্র। প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ইহারা এক একটি তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু। ধাতব পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইবার মত ক্ষমতা ইহাদের নাই। মাত্র একখানা কাগজের দ্বারাই প্রতিহত হইয়া ইহারা ফিরিয়া আসে।

রাদারফোর্ডের গবেষণা হইতে এই রশ্মিগুলি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। রেডিয়াম হইতে নির্গত আল্‌ফা কণাগুলি সেকেণ্ডে প্রায় ২০,০০০ হাজার মাইল বেগে এবং বীটা কণাগুলি সময় সময় ১,০০০০০ মাইল বেগে (অর্থাৎ ক্যাথোড রশ্মি এবং আলোক রশ্মির বেগের অনুরূপ) ধাবিত হয়।

পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে হইলে আল্‌ফা এবং বীটা রশ্মির কণাগুলি যে ভাবে সাহায্য করে, গামা রশ্মি সেভাবে করে না। গামা রশ্মির সহিত রঞ্জন রশ্মির সাদৃশ্য অনেকখানি এবং তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাসেও এ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আমরা দেখিয়াছি যে, ক্রুক্‌স্ নলের বেগবান ক্যাথোড কণাগুলির কঠিন পদার্থের সহিত সংঘর্ষ হইলে রঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রেও রেডিয়ামের মধ্য হইতে নির্গত বীটা কণাগুলির সহিত রেডিয়ামের কঠিন অংশের সংঘর্ষে গামা রশ্মির উৎপন্ন হইতেছে।

আল্‌ফা কণাগুলিকে বলে উত্তম তড়িতাণু। তড়িৎযুক্ত বলিয়া চুম্বক অথবা বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা তাহারা আকর্ষিত হয়; তখন ইহারা সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে বিচরণ করে। বিদ্যুৎ প্রভাবে বীটা কণাগুলি যতখানি বাঁকিয়া যায়, আল্‌ফা কণাগুলি ততখানি যায় না। রেডিয়াম ধাতু হইতে যে অবিচ্ছিন্ন তাপ নির্গত হয় তাহার জন্য মূলতঃ দায়ী এই আল্‌ফা কণাগুলি। তাহাদের সহিত পদার্থের অনবরত সংঘাতে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ক্রুক্‌স্ এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন যাহার সাহায্যে এই সংঘাতের পরিচয় স্পষ্টভাবেই চোখে দেখা গেল। যন্ত্রটির নাম স্পিন্‌থ্যারিস্কোপ।

যন্ত্রটি খুবই সাধারণ, সাদাসিধা গোছের। একটি পাতের উপরে এক পর্দা জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ লাগাইয়া যন্ত্রটিকে প্রস্তুত করা হয়। ইহারই সামনে দাঁড় করান থাকে একটি লৌহ শলাকা। মাথায় তাহার সামান্য এক টুকরা রেডিয়ামযুক্ত পদার্থ। ইহার একপ্রান্তে একটি লেন্স থাকে। অন্ধকারে লেন্সের ভিতর দিয়া জিঙ্ক-সালফাইডের পাতটিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকির দল জ্বলিতেছে নিবিতেছে, বিজ্ঞানীরা ইহার নাম দিয়াছেন প্রজ্বলন। অনেক সময় দেখা যায় যে, দানাদার পদার্থের দানাগুলি চূর্ণ হইবার সময়ে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। দুই টুকরা চিনির দানাকে রাত্রির অন্ধকারে যদি ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রকার আলো দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে বলা যাইতে পারে, লৌহশলাকা-স্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে হিলিয়াম পরমাণু সবেগে নির্গত হইয়া জিঙ্ক সালফাইডের-দানাগুলিকে আঘাত করার ফলে উহারা চূর্ণ হইয়া যায় এবং আলো বিকিরণ করিতে থাকে। প্রত্যেক আলোক বিন্দুর জন্য দায়ী এক একটি আল্‌ফা কণা।

বীটা কণার গুরুত্ব এবং তড়িৎ সমষ্টির কথা বলিয়াছি। এখন আল্‌ফা কণার কথা বলিব। জিঙ্ক সালফাইড-এর পর্দার উপর আঘাত করিয়া তাহারা যে প্রজ্বলনের সৃষ্টি করে তাহা হইতেই তাহার তড়িৎ সমষ্টি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। মনে করা যাক্‌, লেন্সের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে এক শতটি প্রজ্বলন দেখা গেল এবং ঐ এক সেকেণ্ডে রেডিয়াম-যুক্ত পদার্থ হইতে নির্গত আল্‌ফা কণার তড়িৎ

সমষ্টি হইল দশ ; তাহা হইলে এক একটি প্রজ্জ্বলনের অর্থাৎ এক একটি আল্‌ফা কণার বৈদ্যুতিক সমষ্টি হইল $\frac{১০}{১০০}$ অর্থাৎ $\frac{১}{১০}$। রাদারফোর্ড, গাইগার প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়, এক সেকেণ্ডে যদি প্রজ্জ্বলন সংখ্যা n হয় এবং আল্‌ফা কণাগুলির তড়িৎ সমষ্টি E হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক আল্‌ফা কণার তড়িৎ সমষ্টি হইবে $\frac{E}{n}$। ইহার পরিমাণ স্থির হইয়াছে $২ \times (১.৫৯ \times ১০^{-১৯})$ কুলম্ব্ অর্থাৎ উদ্‌যান কণার দ্বিগুণ। আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, এইসব কণাগুলির গুরুত্ব উদ্‌যান পরমাণুর গুরুত্বের চারগুণ অর্থাৎ হিলিযাম পরমাণুর সমান।

আল্‌ফা কণাগুলি যে তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু এ তথ্যটি ১৯০৯ খৃঃ পূর্বে নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯০৯ খৃঃ রাদারফোর্ড হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, তথ্যটি সত্য। তারপর হইতে ইহার আলোক বিশ্লেষণ এবং অপরাপর পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীরা চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিলেন যে, আল্‌ফা কণাগুলিই হিলিয়াম পরমাণু।

রাদারফোর্ডের পরীক্ষা :—যে যন্ত্রের দ্বারা এই তথ্যটি প্রমাণিত হইল তাহা দুইটি কাঁচের নল লইয়া গঠিত। একটি নলের মধ্যে অপরটি সন্নিবিষ্ট। ভিতরকার নলের কাচ এমনি পাতলা যে বেগবান আল্‌ফা কণার পক্ষে তাহাকে ভেদ করিয়া আসা খুবই সম্ভব; কিন্তু হিলিয়াম গ্যাসের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই পাতলা কাঁচনির্মিত নলের মধ্যে অল্প পরিমাণ রেডিয়াম ইমানেশন* নামক পদার্থ রাখা হইল। তারপর পাম্পের সাহায্যে যন্ত্রটির মধ্য হইতে বাতাস সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করিয়া লওয়া হইল। প্রথমেই যন্ত্রটির মধ্যে হিলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল। কিন্তু কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ হইলে রাদারফোর্ড হিলিয়ামের সন্ধান পাইলেন।

হিলিয়ামের সাক্ষাৎ মিলিল যন্ত্রটির বাহিরের নলের মধ্যে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, হিলিয়াম আসিল কোথা হইতে? বাহির হইতে যখন আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বলিতে হইবে ইহা আসিয়াছে রেডিয়াম ইমানেশন হইতে —আল্‌ফা-কণা রূপে। এই সকল আল্‌ফা কণা যখন পাতলা কাচের আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া তড়িৎ বিযুক্ত হইল, তখন তাহারা হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হইয়া গেল। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইল যে, আল্‌ফা কণাগুলি তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণুবিশেষ। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙ্গনের সময় যে হিলিয়াম পরমাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তি বিচ্ছুরিত আল্‌ফা রশ্মি হইতেই হইয়া থাকে।

আল্‌ফা, বীটা এবং গামা রশ্মি সম্বন্ধে এত কথা বলিবার পরও আর একটি কথা বলার প্রয়োজন। রেডিয়ামের যে সকল গুণ আমরা দেখিতে পাই সেগুলি কোন একটি মাত্র রশ্মির দ্বারা সংঘটিত হয় না; তিন প্রকার রশ্মির সংযোগেই ইহা সম্ভব হয়। সাধারণ অবস্থাতেই সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে এই তিনপ্রকার রশ্মি অনবরত নির্গত হইতে থাকে। রেডিয়ামের এই উগ্র তেজস্ক্রিয় গুণের জন্য ইহার উত্তাপ সর্বদাই পারিপার্শ্বিক বস্তু অপেক্ষা ১.৪ ডিগ্রী বেশী। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে, এক গ্র্যাম অথবা এক আনা চার পাই ওজনের রেডিয়ামের মধ্যে যে শক্তি বা তেজ থাকে, তাহার দ্বারা অনুরূপ ওজনের জলকে উহা প্রতি ঘণ্টায় ০° ডিগ্রী হইতে ১৩০° ডিগ্রী পর্যন্ত

* রেডিয়াম ইমানেশন্ এক প্রকার গ্যাস। ইহার অপর নাম নিটন। নিটন নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির (আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রাইটন্, জেনন্, ইহারা নিষ্ক্রিয় গ্যাস) অন্যতম। রেডিয়াম হইতে আল্‌ফা রশ্মি নির্গত হইবার পর যে গ্যাসটি অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই বলা হয় ইমানেশন্। রেডিয়াম — ইমানেশন + হিলিয়াম পরমাণু।

উত্তপ্ত করিতে পারে। গণনার দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এক গ্র্যাম অর্থাৎ এক আনা চার পাই ওজনের রেডিয়ামের মধ্যে রেডিও অ্যাক্‌টিভ গুণটি ২৫০০ বৎসর ব্যাপী স্থায়ী হয়। অর্থাৎ রেডিয়াম আবিষ্কার হইয়াছে ১০৯৬ খৃঃ অব্দে। তখনকার এক গ্র্যাম ওজনের রেডিয়ামকে যদি সযত্নে যাদুঘরে রাখা যায়, তাহা হইলে ৪৩১৮ খৃঃ পর্যন্ত তাহার মধ্যে তেজস্ক্রিয় গুণগুলি পাওয়া যাইবে। আর তাহা হইতে যে তেজ নির্গত হইবে তাহার পরিমাণ প্রায় ১ টন কয়লা হইতে নির্গত তেজের সমান। অর্থাৎ এক গ্র্যাম রেডিয়ামের মধ্যে নিহিত শক্তি এক গ্র্যাম কয়লা হইতে নির্গত শক্তির ২৫০,০০০ গুণ বেশী। জলের মধ্যে যদি রেডিয়াম অথবা রেডিয়াম-যুক্ত পদার্থ রাখা যায়, তাহা হইলে উহা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহা হইতে ক্রমাগত উদ্‌যান এবং এবং অম্লজান গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, রেডিয়াম অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। ইহা সর্বদাই সক্রিয় পদার্থ। কিন্তু সক্রিয় থাকিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। এত প্রচুর শক্তি আসে কোথা হইতে এবং তাহা যোগায়ই বা কে?

এক সময় এই সম্বন্ধে দুই রকম মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রথম মত অনুযায়ী রেডিয়াম শক্তির রূপান্তরক। উহা পারিপার্শ্বিক বস্তু হইতে শক্তি সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তিকে অপর একটি রূপে রূপান্তরিত করিতে থাকে। বর্তমানে এ মতবাদের প্রচলন নাই। এখন উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মতানুযায়ী রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির স্থিতিশীলতা অত্যন্ত কম। উহা অস্থায়ী এবং স্বয়ং-ভঙ্গুর অর্থাৎ আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্‌ফা অথবা বীটা রশ্মি বিকিরণ করিয়া আর একটি নূতন পদার্থে পরিণত হয়। এই নূতন পদার্থটি রেডিও অ্যাক্‌টিভ গুণসম্পন্ন হইতে পারে। সেক্ষেত্রে উহা রশ্মি বিকিরণ করিয়া অপর আর একটি নূতন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন রেডিয়াম হইতে একটি আল্‌ফা কণা বাহির হইয়া নিটন গ্যাসের উৎপত্তি হয় আবার নিটন আর একটি আল্‌ফা কণা বিকিরণ করিয়া রেডিয়াম এ নামক পদার্থে পরিণত হয়। রেডিয়াম-এ হইতে আল্‌ফা রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া রেডিয়াম-বি এবং উহা হইতে বীটা রশ্মি বিকিরিত হইয়া রেডিয়াম-সি এর উৎপত্তি হয়। এইরূপ আল্‌ফা কিংবা বীটা রশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে তাহারা নিজেদের এক একটি বংশ সৃষ্টি করে। এই বংশ অসীম নয়,—সসীম। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এমন একটি পদার্থের সৃষ্টি হয় যিনি মোটেই তেজস্ক্রিয় নন। সেইখানেই বংশের 'ইতি' হয়।

প্রথম মতটি পরিত্যক্ত হইলেও দ্বিতীয় মতবাদটি বিজ্ঞানী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। হাতে কলমে পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। একটি উদাহরণ হইতে ব্যাপারটি অনেকখানি পরিস্ফুট হইবে। ধরা যাক, 'ক' একটি রেডিও অ্যাক্‌টিভ পদার্থ। উহা রশ্মি বিকিরণ করিয়া 'খ' নামে আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হইতেছে। 'ক' হইতে 'খ' এর উৎপত্তি বলিয়া 'ক'কে পৃথকভাবে বিশুদ্ধরূপে পাওয়া মুস্কিল। যাহা পাই তাহা 'ক' এবং 'খ' এর সংমিশ্রণ। এখন মনে করা যাক্, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'ক' এবং 'খ' কে পৃথক করিতে পারা যায়। যদি 'খ' কে সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট রহিবে তাহা বিশুদ্ধ 'ক'। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা যাইবে এই বিশুদ্ধ 'ক' এর মধ্যেই আবার 'খ' এর আবির্ভাব হইয়াছে। 'খ' ক্রমাগত 'ক' হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এরূপ কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারাই উপরোক্ত মতবাদটি প্রচলিত হইয়াছে।

কাল্পনিক পরীক্ষার কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন আমরা আসল দুই একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ

করিব। ইউরেনিয়াম যে রেডিও অ্যাক্টিভ গুণসম্পন্ন সে কথা আমরা জানি। ক্রুক্স্ এই ইউরেনিয়াম লইয়া পরীক্ষাকালে দেখিতে পাইলেন যে, ইউরেনিয়ামযুক্ত পদার্থে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করিলে প্রায় সমস্ত ইউরেনিয়াম-যুক্ত পদার্থটি দ্রবীভূত হইয়া যায়, শুধু সামান্য পরিমাণ আর একটি পদার্থ অদ্রাব্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। দ্রবণটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উহা রেডিও অ্যাক্টিভ গুণবর্জ্জিত। কোনরূপ তৎপরতা তাহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। অথচ ঐ সামান্য অদ্রাব্য পদার্থটির মধ্যে যতকিছু রেডিও তৎপরতা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। ক্রুক্স্ এই অদ্রাব্য পদার্থটির নাম দিলেন ইউরেনিয়াম-এক্স্। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে, ঐ নিষ্ক্রিয় দ্রবণটি পুনরায় রেডিও অ্যাক্টিভ হইয়া উঠিয়াছে এবং সক্রিয় অদ্রাব্য পদার্থটির সমস্ত তৎপরতাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দ্রবণের মধ্যে আবার যদি কার্বনেট প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে আগেকার ঘটনার পুণরাবৃত্তি দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, ইউরেনিয়াম হইতে সব সময়ই এমন একটি পদার্থ (ইউরেনিয়াম-এক্স্) উৎপন্ন হইতেছে যাহা এইরূপ রেডিও শক্তির জন্য দায়ী। অর্থাৎ ভিন্নরূপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ইউরেনিয়াম আপনা আপনি ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ইউরেনিয়াম-এক্স্ এবং হিলিয়ামে রূপান্তরিত হইতেছে।

১৯০২ খৃঃ অব্দে রাদারফোর্ড এবং সডি থোরিয়াম লইয়া পরীক্ষা করিয়া অনুরূপ ফলই পাইলেন। থোরিয়াম লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিলে থোরিয়াম হাইড্রক্সাইডের তলানি পড়িয়া যায়। থোরিয়াম রেডিও অ্যাক্টিভ পদার্থ; কিন্তু সদ্য প্রস্তুত হাইড্রক্সাইডটি নয়। দেখা গেল বেরিয়ামের যত কিছু কর্মতৎপরতা সমস্ত দ্রবণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। দ্রবণটিকে জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলার পর যে পদার্থটি পাওয়া যায় তাহা থোরিয়াম নয় বটে, তবে তাহার কর্মতৎপরতা থোরিয়ামেরই অনুরূপ। ইউরেনিয়াম-এক্স্-এর মত ইহার নামকরণ হইল,—থোরিয়াম-এক্স্। এই থোরিয়াম-এক্স্-এর কর্মতৎপরতা ইউরেনিয়াম-এক্স্-এর মতই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং জলটির কর্মতৎপরতা ক্রমশই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, থোরিয়াম-এক্স্-এর কার্যক্ষমতা যে পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে, থোরিয়াম জলের কার্যক্ষমতা ঠিক সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ইহাদের উভয়ের কর্মতৎপরতার যোগফল সকল অবস্থায় সমান। এখান হইতে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, থোরিয়াম হইতে অপর একটি পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে যাহা কর্মতৎপর এবং যাহাকে থোরিয়াম হইতে অনায়াসে পৃথক করিতে পারা যায়।

ইউরেনিয়াম অথবা থোরিয়ামের শেষ অণুটি যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাঙ্গিয়া ইউরেনিয়াম-এক্স অথবা থোরিয়াম এক্স্-এ পরিণত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভাঙ্গাগড়া চলিতে থাকে। তবে ভাঙ্গাগড়ার কার্যকাল সব ধাতুরই এক নয়। যেখানে ইউরেনিয়াম-এক্স্-এর অর্দ্ধেক জীবনীশক্তি নষ্ট হইতে সময় লাগে বাইশ দিন, সেখানে থোরিয়াম-এক্স্-এর লাগে চারদিন মাত্র।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা জানি, তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধিতে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সাধারণ অবস্থায় যে সব প্রক্রিয়া সম্ভবপর নয়, তাপবৃদ্ধির সহিত সেগুলি সম্ভবপর হয়। যেমন বারুদের স্তূপ সাধারণ অবস্থায় অতি নিরীহ, কিন্তু তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে কিরূপ প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে এই রেডিও শক্তিবিশিষ্ট পদার্থগুলির পক্ষে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে কিছু যায় আসে না। ইহাদের

কর্মতৎপরতা—তাহা ধ্বংসের দিকেই হোক, অথবা সৃষ্টির দিকেই হউক (যেমন ইউরেনিয়াম হইতে ইউরেনিয়াম-এক্স্) উত্তাপের দ্বারা অপরিবর্তনীয়ই থাকিয়া যায়। এমন কি ২০০ ডিগ্রী তাপেও এই ভাঙ্গা-গড়ার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে ইহার প্রভেদ এইখানে।

রাসায়নিক বস্তুর অণুগুলি সাধারণতঃ ক্ষারাংশ এবং অম্লাংশ লইয়া গঠিত (Basic and Acidic radicals) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইহাদেরই সংযোগ-বিয়োগে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া কেবলমাত্র অম্লাংশের বা ক্ষারাংশের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু রেডিও শক্তি বিশিষ্ট অণুগুলির সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। তাহাদের কর্মতৎপরতা তাহাদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অম্লাংশের সহিত কোন সম্বন্ধই ইহার নাই। যেমন রেডিয়াম ব্রোমাইড এবং রেডিয়াম-কার্বনেট—এই দুইটির অণুর মধ্যে শতকের হার হিসাবে রেডিয়ামের পরিমাণ বিভিন্ন। সুতরাং ইহাদের কর্মতৎপরতাও বিভিন্ন। কর্মতৎপরতা নির্ভর করে শুধু রেডিয়াম ধাতুর পরিমাণের উপর, অন্য কিছুর উপর নয়।

উপরের ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরিমাণের উপর যে কর্মতৎপরতা নির্ভর করে তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, পরমাণুগুলিই রেডিও তৎপরতার উৎস—অণুগুলি নয়। (রেডিয়াম ব্রোমাইডের মধ্যে যে পরিমাণ রেডিয়াম আছে তাহার উপর সমগ্র কর্মতৎপরতা নির্ভর করে, রেডিয়াম ব্রোমাইড নামক সমগ্র যৌগিক পদার্থের উপর নয়।) অর্থাৎ এ জিনিসটি সম্পূর্ণ পরমাণুঘটিত ব্যাপার, অণুর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত তেজস্ক্রিয়ার কোন সংস্রব নাই। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় এ ঘটনাগুলি আণবিক নয় (যেমন সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে), পরমাণুঘটিত এক অভিনব ব্যাপার। তৃতীয়তঃ আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যাকারেল রশ্মি হইতে যে আল্‌ফা কণা নির্গত হয়, তাহা কোনরূপ রশ্মি নয়, তাহা পার্থিব বস্তুর ভগ্নাংশ মাত্র; অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ নিয়তই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এই পার্থিব কণাগুলি বিকিরণ করিতেছে। সুতরাং মৌলিক পদার্থ ভাঙ্গিয়াই যদি এই কণাগুলির সৃষ্টি হয় এবং ইহার জন্য রেডিও-শক্তিকে দায়ী করা যায়, তাহা হইলে রেডিও-শক্তির জন্য দায়ী পরমাণুগুলি, অণুগুলি নয়। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইউরেনিয়াম প্রমুখ তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি স্বতঃই এবং ক্রমাগতই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অপর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইতেছে।

এই যে ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপার, ইহার তীব্র গতিবেগকে বাহির হইতে রাসায়নিক অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় নাই। অর্থাৎ তাপের মাত্রা বাড়াইয়া কমাইয়া অথবা অম্ল এবং ক্ষার প্রভৃতি অন্য কোন তৃতীয় পদার্থ যোগ করিয়া তাহার গতিবেগে বাধা জন্মাইতে পারা যায় না। তাহারা যে ভাবে এবং যে পরিমাণে ভাঙ্গিতেছে ঠিক সেইভাবে এবং সেই পরিমাণেই ভাঙ্গিতে থাকে।

এই ভাঙ্গাচোরার সময় পদার্থের ভিতর হইতে তাপ নির্গত হইতে থাকে এবং সে তাপের পরিমাণ অন্য কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে নির্গত তাপের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

এই রকম ভাঙ্গাচোরার সময় তিন রকম রশ্মির উৎপত্তি হয়। এবং তাহা হইতে শেষ পর্যন্ত আমরা হিলিয়াম গ্যাস পাইয়া থাকি। এই ভাঙ্গাচোরার সময় একটি মৌলিক পদার্থ শুধু যে দ্বিতীয় আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া থামিয়া যায় তাহা নয়, দ্বিতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা আল্‌ফা কিংবা বীটা রশ্মি বিচ্ছুরিত

করিয়া তৃতীয় পদার্থে এবং তৃতীয় পদার্থটি চতুর্থ আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে। যেমন, ইউরেনিয়াম→ইউরেনিয়াম-এক্স্→আইও-নিয়াম→রেডিয়াম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রেডিয়ামের পিতৃপুরুষ হইতেছে ইউরেনিয়াম এবং তাহার জনক হইতেছে আইওনিয়াম।

আবার ইউরেনিয়াম-রেডিয়ামের বংশ যদি আমরা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব লেড বা সীসাতে ইহাদের বংশের পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে।

এইরূপে আমরা যদি ভালভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিকে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, সকল পদার্থগুলি এক বংশ হইতে উদ্ভূত এবং পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট।

রেডিও অ্যাক্টিভ পদার্থগুলি যখন প্রথম প্রথম আবিষ্কৃত হইতেছিল, তখন হইতেই তাহাদিগকে তিনটি বংশে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল—ইউরেনিয়াম বংশ, থোরিয়াম বংশ এবং অ্যাক্টিনিয়াম বংশ। পরে দেখা গেল অ্যাক্টিনিয়াম বংশটি ইউরেনিয়াম বংশ হইতেই উৎপন্ন, তাহারই একটি শাখা মাত্র। সুতরাং শেষপর্যন্ত ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম এই দুইটি বংশই বজায় রহিল, অ্যাক্টিনিয়াম ইউরেনিয়াম-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

নিম্নে প্রদত্ত বংশ সূচী হইতে উহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে। পরমাণুর গুরুত্ব, ইহাদের জীবন কাল এবং কোন্ পদার্থ কি প্রকার রশ্মি বিকিরণ করিয়া পরবর্তী পদার্থে রূপান্তরিত হয়—এ সমস্তই এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম বংশ

ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম বংশের প্রথম পুরুষ ইউ-রেনিয়াম। এই হইতে কয়েক পুরুষ ব্যবধানে আইও-নিয়ামের জন্ম এবং আইওনিয়াম হইতে রেডিয়াম উৎপন্ন। আইওনিয়াম রেডিয়ামের জনক। বংশের ধারা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কেন ইউরেনিয়াম সংশ্লিষ্ট খনিজ পদার্থের মধ্যে আমরা রেডিয়ামের সন্ধান পাইয়া থাকি। রেডিয়াম ক্রমাগতই ইউরেনিয়াম হইতে উৎপন্ন হইতেছে ; তাহা না হইলে ইহাদের জীবন কাল যত বেশীই হোক না কেন, কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে তাহার কোন অস্তিত্বই খুজিয়া পাওয়া যাইত না।

রেডিয়াম হইতে কয়েক পুরুষ পরেই রেডিয়াম-এফ বা পোলোনিয়ামের উৎপত্তি হইয়াছে। পোলো-নিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে প্রথম আবিষ্কার বলিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মাদাম কুরী পিচব্লেণ্ড হইতে ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন পদার্থগুলি এত অল্প পরিমাণে বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া আছে যে, চর্মচক্ষে তাহার দর্শন মেলা ভার। শুধু তেজস্ক্রিয় গুণটি আছে বলিয়াই আজও তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের নিকট লুপ্ত হয় নাই। ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম বংশ নীচে দেওয়া হইল :—

ইউরেনিয়ম (১) (২৩৮·৫)
↓ →আল্‌ফা রশ্মি
ইউরেনিয়াম (২) (২৩১·৫)
↓ →আল্‌ফা রশ্মি
ইউরেনিয়াম-এক্স (২৩০·৫)
↓ →বীটা এবং গামা রশ্মি
আইওনিয়াম (২৩০·৫)
↓ →আল্‌ফা এবং বীটা রশ্মি
রেডিয়াম (২২৬·৫)
↓ →আল্‌ফা রশ্মি
ইমানেশন (২২২)
↓ →আল্‌ফা, বীটা এবং গামা রশ্মি
রেডিয়াম-এ হইতে ই পর্যন্ত
↓ →আল্‌ফা, বীটা এবং গামা রশ্মি
রেডিয়াম-এফ্ বা পোলোনিয়াম (২১০)
↓ →আল্‌ফা রশ্মি
রেডিও-লেড বা সীসা (২০৬)

থোরিয়াম বংশ

থোরিয়াম (২৩২)

↓ →আল্‌ফা রশ্মি

মেসোথোরিয়াম (১) (২২৮)

↓ →বীটা রশ্মি ?

মেসোথোরিয়াম (২) (২২৮)

↓ →বীটা এবং গামা রশ্মি

রেডিওথোরিয়াম (২২৮)

↓ →আল্‌ফা এবং বীটা রশ্মি

থোরিয়াম-এক্স (২২৪)

↓ →আল্‌ফা রশ্মি

ইমানেশন (২২০)

↓ →আল্‌ফা, বীটা এবং গামা রশ্মি।

থোরিয়াম এ হইতে ডি পর্যন্ত

↓

থোরিয়াম-লেড

অ্যাক্‌টিনিয়াম বংশ

অ্যাক্‌টিনিয়াম

↓ →বীটা রশ্মি

রেডিও-অ্যাক্‌টিনিয়াম

↓ →আল্‌ফা, বীটা, গামা রশ্মি

অ্যাক্‌টিনিয়াম-এক্স্‌

↓ →আল্‌ফা রশ্মি

ইমালেশন আল্‌ফা

↓ →বীটা রশ্মি

অ্যাক্‌টিনিয়াম-এ

↓ →আল্‌ফা রশ্মি

অ্যাক্‌টিনিয়ম-বি

↓ →বীটা এবং গামা রশ্মি

অ্যাক্‌টিনিয়াম-সি

↓ →আল্‌ফা. বীটা এবং গামা রশ্মি

অ্যাক্‌টিনিয়াম-ডি বা অ্যাক্‌টিনিয়াম সীসা

ইমানেশন

ইতিপূর্বেই আমরা রেডিয়াম-ইমানেশন বা নিটন্‌ গ্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ পদার্থ টির একটি বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব আছে বলিয়া ইহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতে চাই। রেডিয়াম-ইমানেশন ছাড়াও থোরিয়াম-ইমানেশন এবং অ্যাক্‌টিনিয়াম ইমানেশন আছে। ইহারা প্রথমটির মত গুরুত্বব্যঞ্জক না হইলেও এই প্রসঙ্গে তাহাদের কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

সুরু হইতেই যাঁহারা তেজস্ক্রিয় পদার্থ লইয়া কাজ করিতেছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি পদার্থের আশে পাশের বস্তুগুলিও সাময়িক ভাবে রেডিও গুণবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম মনে হইল, বুঝি তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি বিকিরণ গুণটিই ইহার জন্য দায়ী অর্থাৎ তাহারাই এই তেজস্ক্রিয় গুণটিকে পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলিতে অনুবর্তিত করিতেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে তেজস্ক্রিয় পদার্থটিকে কাঁচপাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলি এইরূপ কর্মশক্তি লাভ করিতে পারে না। আবার ইহাও ধরা পড়িল যে, কাগজ, তুলা প্রভৃতি ছিদ্র বিশিষ্ট পদার্থগুলি এই কর্মশক্তিকে বাধা দিতে পারে না। তাহাদিগকে ভেদ করিয়া এই কর্মশক্তি পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলির উপর ছড়াইয়া পড়ে। এই ছড়াইয়া পড়ার কাজকে সাহায্য করে বাতাস। বাতাসকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর দিয়া লইয়া গিয়া বিদ্যুৎমান যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাতাসের মধ্যে এই কর্মশক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারা এই মতই প্রবল হইল যে, এক প্রকার গ্যাস অথবা অনুকণা বায়ুস্রোতের দ্বারা পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই প্রকার অনুবর্তিত কর্মশক্তির ইন্ধন যোগাইতেছে।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে রাদারফোর্ড এবং সডি এই বিষয় লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। গবেষণা করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, থোরিয়াম প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রকৃতই এক প্রকার পদার্থের নিষ্ক্রমণ হয় যাহারা তেজস্ক্রিয় গুণসম্পন্ন। তাঁহারা ইহার নাম

দিলেন ইমানেশন। এই ইমানেশনের যে সমস্ত গুণপ্রকাশ পাইল, তাহা গ্যাসের অনুরূপ। গণনা করিয়া দেখা গেল যে, মাত্র ৫৪ সেকেণ্ডের মধ্যেই তাহাদের অর্ধেক জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

তারপর পরীক্ষাকার্য যতই চলিতে লাগিল, ততই দেখা গেল যে, শুধু থোরিয়াম নয়, রেডিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতি পদার্থগুলিও অনুরূপ ইমানেশন বিচ্ছুরিত করিয়া থাকে। তাহাদের নাম হইল থোরন, র‍্যাডন (নিটন), অ্যাক্টন ইত্যাদি। র‍্যাডন এবং অ্যাক্টনের অর্ধজীবনীশক্তি ৩.৮৫ এবং ৩.৯ সেকেণ্ড মাত্র। এইসব ইমানেশনকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্রবে আনিয়াও তাহাদের সহিত প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; সুতরাং তাহারা যে কর্মশক্তিহীন এবং পিরিয়ডিক টেবলের শূন্য গ্রুপের দলভুক্ত তাহা প্রমাণিত হইল।

ইমানেশনগুলির মধ্যে রেডিয়াম ইমানেশন বা নিটনই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত। এইসব পদার্থের কতটুকু মাত্র লইয়া যে বিজ্ঞানীদের গবেষণা করিতে হয় তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। এক গ্রাম রেডিয়াম হইতে ইমানেশন পাওয়া যায় $\frac{১}{১০}$ মিলিমিটার। অর্থাৎ ১ ইঞ্চিকে ২৫০ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে লইয়া একটি (কিউব) রচনা করিলে যতটুকু হয় ঠিক সেই পরিমাণ। অথচ এক গ্রাম রেডিয়াম লইয়া কাজ করিবার মত সৌভাগ্য কোন বিজ্ঞানীরই নাই। তাঁহাদের ভাগ্যে যেটুকু জোটে তাহা $\frac{২}{১০}$ হইতে $\frac{৫}{১০}$ গ্রাম মাত্র। সুতরাং এই সামান্য মাত্র পদার্থ হইতে উৎপন্ন ইমানেশনের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। ইহাতেও বিজ্ঞানীরা দমিলেন না। তাঁহারা পরীক্ষা করিবার উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইলেন। ইমানেশনের গুণাবলী গ্যাসের গুণাবলীর অনুরূপ। ইহাকে কোন একটি নির্বিশেষ-ধর্মী বা উদাসীন গ্যাসের সহিত মিশাইয়া বিজ্ঞানীরা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা এই সংমিশ্রিত গ্যাসকে একপাত্র হইতে অপর পাত্রে অনায়াসে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইলেন এবং বিদ্যুৎ মাপক যন্ত্রের সাহায্যে ইমানেশনের গুণাবলীও উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হইলেন।

এইভাবে নিটন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া জানা গিয়াছে যে, সাধারণ গ্যাসের মতই ইহার আচরণ। ইহা 'বয়েলের' নিয়মকেই মানিয়া চলে। র‍্যাম্‌জে এবং গ্রে নিটনকে তরল গ্যাসে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং পরমাণুর গুরুত্বও নির্ধারণ করিয়াছেন। এই গুরুত্ব নির্ধারণ ব্যাপারে যে কিরূপ নৈপুণ্য এবং মনীষার পরিচয় আছে তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। র‍্যাম্‌জে গুরুত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন গ্যাসটিকে ওজন করিয়া তাহার ঘনত্ব হইতে। অথচ আমরা দেখিয়াছি $\frac{১}{১০}$ মিলিমিটারেরও কম গ্যাস লইয়া কাজ করিতে হয় বিজ্ঞানীদের। সুতরাং তাঁহাদের কাজ যে কতখানি শ্রমসাধ্য তাহা প্রণিধানযোগ্য। ০.১ মিলিমিটার নিটন গ্যাসের ওজন $\frac{১}{১৪,০০০০০}$ গ্রাম ইহাকে ওজন করিতে হইলে কিরূপ সূক্ষ্ম নিক্তি বা তৌল যন্ত্রের প্রয়োজন তাহা সাধারণের অনুমানের বাহিরে। এই যন্ত্রও প্রস্তুত হইল। ইহার দ্বারা এক মিলিগ্রামের $\frac{}{১০০}$ ভাগ ওজন করা সম্ভবপর। এইখানেই বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। কল্পনাকে বাস্তবে যাঁহারা রূপ দিতে পারেন তাঁহারাই তো আসল বিজ্ঞানী। এই তৌলযন্ত্রের দণ্ডটি সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম স্ফটিকের অংশ দ্বারা নির্মিত। ওজনগুলি সাধারণ ধাতু নির্মিত নয়। স্ফটিক নির্মিত গোলকের মধ্যে বায়ু পুরিয়া সেগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বায়ুর ওজনটুকুই আসল ওজনের কাজ করিয়া থাকে। তৌলযন্ত্রটি একটি বায়ুচলাচলহীন আধারের মধ্যে আবদ্ধ। আধারটির

ভিতরকার বায়ুর চাপ পাম্পের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী কমান এবং বাড়ান যাইতে পারে। এইরূপে ভিতরকার বাতাসের চাপ কমাইয়া এবং বাড়াইয়া তৌলযন্ত্রটিকে এমন একটি অবস্থায় আনিতে পারা যায়, যাহা ওজন করিবার পক্ষে উপযোগী। অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে এই অবস্থায় আনা কষ্টসাধ্য নহে। যে জিনিসটির ওজনের প্রয়োজন তাহার ওজন স্ফটিকনির্মিত গোলকের মধ্যে রুদ্ধ বায়ুর ওজনের সহিত তুলনা করিয়া ঠিক করিতে হয়। একটি বাতাসের সাহায্যে অপর একটি বাতাসকে ওজন করা—তাহা যত কমই হউক না কেন, নিতান্ত কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই উপায়ে নিটনের ওজনও পাওয়া গেল।

ব্যাপারটিকে আপাতঃ দৃষ্টিতে যত সহজ মনে হয়, আসলে তাহা নয়। একবার ওজন করিতে হইলে এত রকম খুঁটিনাটির সম্মুখীন হইতে হয় যাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ না দিয়া নিটনের সাধারণগুণ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া শেষ করিব।

নিটন রেডিও গুণসম্পন্ন। ইহা শুধু যে আল্‌ফা রশ্মি বিকিরণ করে তাহা নয়, রেডিয়ামের মত আপনা হইতে উত্তাপও বিকিরণ করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, নিটন নিষ্ক্রিয় গ্যাস, আর্গন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির সমশ্রেণীভুক্ত। অগ্ন্যুত্তপ্ত প্ল্যাটিনাম চূর্ণ, প্যালেডিয়াম চূর্ণ, ম্যাগনেসিয়াম চূর্ণ প্রভৃতির উপর দিয়া নিটনকে চালনা করিয়া দেখা গিয়াছে—তাহার কোন পরিবর্তনই ঘটে নাই; এমন কি ক্ষারযুক্ত পদার্থের উপস্থিতিতেও অম্লান থাকে। নিটন গ্যাসের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা করিয়াও তাহার কোন পরিবর্তন করিতে পারা যায় নাই। অথচ এই অবস্থায় নাইট্রোজেন অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা এবং ইহার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া যে সব রেখা পাওয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নিটন নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং পিরিয়ডিক টেবলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস জেননের উপরে ইহার স্থান।

নিটন যখন রেডিও গুণসম্পন্ন, তখন নিটন হইতে আমরা নূতন পদার্থের উদ্ভব প্রত্যাশা করিতে পারি। আমাদের সে প্রত্যাশা যে ভুল নয় তাহার প্রমাণ, ইহা স্বতঃই ভাঙ্গিয়া হিলিয়াম গ্যাসের জন্ম দেয়।

মাদাম কুরী এবং রাদারফোর্ড রেডিয়াম এবং থোরিয়াম লইয়া কাজ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল পদার্থের সান্নিধ্যে অপর পদার্থ রাখিলে তাহাদের মধ্যে রেডিও গুণের বিকাশ পায়। শুধু রেডিয়াম এবং থোরিয়াম নয়, অ্যাক্‌টিনিয়ামের মধ্যেও এই গুণটির সাক্ষাৎ মিলিল। এই যে প্রবর্তিত কর্ম-তৎপরতা ইহার শক্তির তীব্রতা নির্ভর করে প্রবর্তিত বস্তুটির প্রকৃতির উপর নয়, প্রবর্তকের শক্তির উপর এবং যত বেশী সময় একটিকে অপরটির সান্নিধ্যে রাখা যায়, তাহার উপর। কিন্তু প্রবর্তককে ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইলে প্রবর্তিত বস্তুটির কর্মশক্তি ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে।

রাদারফোর্ড পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, প্ল্যাটিনাম তারকে যদি থোরিয়াম ইমানেশনের নিকট রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা রেডিও-শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে। সেই তারটিকে যদি গরম জলে ডুবান যায় তাহা হইলেও কর্মশক্তির কোন তারতম্য বোঝা যায় না। কিন্তু অ্যাসিড বা অম্লরসে তারটি ডুবাইলে উহাতে আর কর্ম-শক্তির কোন সন্ধান মিলেনা। যাহা কিছু কর্মশক্তি অ্যাসিডের মধ্যে থাকিয়া যায়। আবার অ্যাসিডকে পাত্রের মধ্যে জ্বাল দিয়া শুকাইয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, কর্মশক্তি অ্যাসিড হইতে পাত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন কি প্ল্যাটিনাম তারটিকে কোন কিছু দ্বারা চাঁচিয়া

ফেলিয়াও তাহা হইতে কর্মশক্তিকে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে শক্তির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা কোন কঠিন পদার্থবিশেষ—গ্যাস বা কোন প্রকার বায়বীয় পদার্থ নয়। এই জিনিসটিকে বলা হয় অ্যাক্‌টিভ ডিপজিট এবং ইহা ইমানেশন হইতে উৎপন্ন। থোরন (থোরিয়াম ইমানেশন) এবং অ্যাক্‌টিনন (অ্যাক্‌টিনিয়াম ইমানেশন) হইতেও সর্বদাই এই প্রকার কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। এই যে অ্যাক্‌টিভ ডিপজিট ইহা স্বল্পস্থায়ী পদার্থ মাত্র। ইহারাও আবার ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

উৎপত্তি স্থান

রেডিও গুণযুক্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহারা যে কোথায় এবং কি ভাবে এই বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া থাকিয়া আপনাদের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। এই সকল পদার্থগুলির মধ্যে রেডিয়াম এবং থোরিয়াম বিশেষ খ্যাত। বায়ুমণ্ডলের সকল অংশেই ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দশ লক্ষ ভাগ বায়ুর মধ্যে $\cdot০৬ \times ১০^{-১২}$ ভাগ রেডিয়াম ইমানেশন এবং ২×১০^{-১৯} ভাগ থোরিয়াম ইমানেশন বর্তমান। সুতরাং বিদ্যুৎমাপক যন্ত্রকে বিদ্যুৎযুক্ত করিয়া মুক্ত বাতাসে রাখিয়া দিলে দেখা যায়, এক কিংবা দেড় দিনের মধ্যেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন সোনার পাত দুইটি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। সমুদ্রের জলেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, অন্ততপক্ষে ২০,০০০ টন রেডিয়াম সমুদ্রের জলে মিশিয়া রহিয়াছে। তবে পৃথিবীর কঠিন আবরণের মধ্যে এই পদার্থগুলি যে পরিমাণ পাওয়া যায়, এমন আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রধান উৎস প্রস্তরীভূত পদার্থ, কাদামাটি ইত্যাদি। এক গ্র্যাম প্রস্তরীভূত পদার্থের মধ্যে $১\cdot৪ \times ১০^{১-২}$ গ্র্যাম রেডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এমন অনেক ঝরণা বা উৎসের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, যাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। অনেকের বিশ্বাস এই ক্ষমতার জন্য দায়ী রেডিও অ্যাক্‌টিভ পদার্থ। তাহারা অল্পবিস্তর এই সব জলের মধ্যে মিশিয়া থাকে বলিয়াই জলের এই গুণ। ইহা ছাড়াও এই পদার্থগুলি আমাদের আরও একটা উপকার করিতেছে। ইহাদের মধ্য হইতে সর্বদাই উত্তাপ নির্গত হইতেছে। এই উত্তাপের দ্বারা ক্ষীয়মাণ পৃথিবীর উত্তাপ অনেক পরিমাণে সংরক্ষিত হইতেছে। সুতরাং রেডিও গুণসম্পন্ন পদার্থগুলি রাসায়নিক জগতে যেমন, মনুষ্য জগতেও তেমনি প্রয়োজনীয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ছোটদের বিভাগ

অক্টোবর—১৯৪৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় জানবার জন্যে তোমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হোক।

আগামী সংখ্যার প্রবন্ধের বিষয়

কি হবে ?
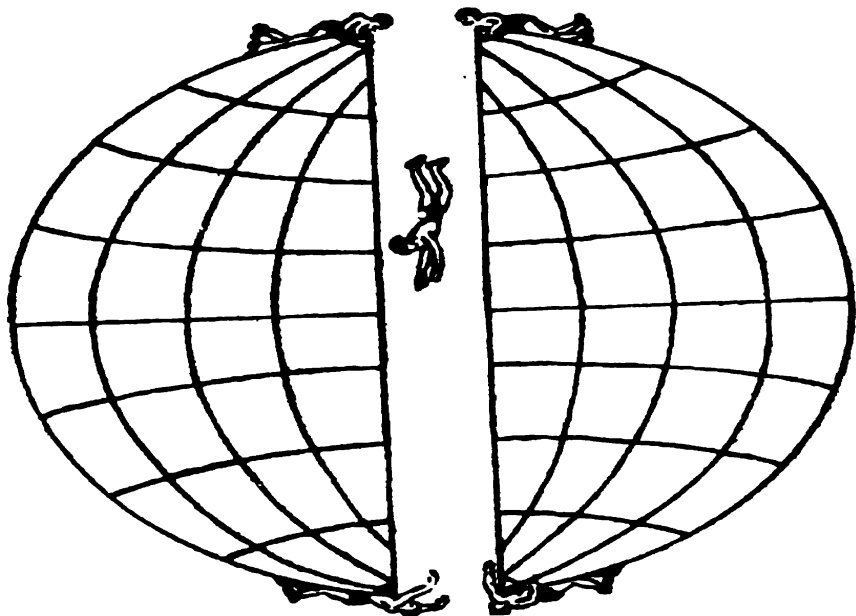
মনে কর, একজন এঞ্জিনিয়ার পৃথিবীর এপিঠ থেকে ওপিঠ পর্যন্ত কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়ে লম্বালম্বি বিরাট একটা সুরঙ্গ খনন করেছেন। এপিঠ থেকে সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে ওপিঠের আকাশ এবং ওপিঠ থেকে এপিঠের আকাশ দেখা যায়। কোন একটি লোককে যদি এই সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তবে (মরা বাঁচার প্রশ্ন বাদ দিয়ে) তার অবস্থা কি হবে ?

এবিষয়ে লেখবার জন্যে তোমরা বই-পুস্তক এবং বড়দেরও সাহায্যে নিতে পার। ব্যাপারটা কি হতে পারে বুঝে নিয়ে নিজের ভাষায় প্রকাশ করবে। সব চেয়ে ভাল লেখাটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হবে। স.

করে দেখ

ব্যালান্সিং-এর কৌশল

(এক)

পূর্বে তোমাদিগকে ভার-বাঁক, কাঠের ঘোড়া প্রভৃতির ব্যালান্সিং-এর কৌশল সম্বন্ধে বলেছিলাম। এবার আরও কয়েক রকমের ব্যালান্সিং-এর কৌশল সম্বন্ধে বলছি। তোমরা অনায়াসেই এগুলো করে দেখতে পারবে।

প্রথমে দুখানা চ্যাপ্টা কাঠ জোগাড় কর। একখানা হাত দেড়েক লম্বা, আর একখানা হাতখানেক বা আরও কিছু ছোট হলেও চলবে। লম্বা কাঠখানার উপর জল-ভর্তি একটা বালতি ঝুলিয়ে দাও। ছোট কাঠখানা টেরছাভাবে বালতির মধ্যে ঢুকিয়ে বড়খানার সঙ্গে এমন ভাবে ঠেকা দিয়ে দাও যাতে জল সমেত বালতিটা অনেকটা হেলানোভাবে ঝুলে থাকে। এক নম্বরের 'খ' ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে ছবি দেখেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। এবার বালতি সমেত বড় কাঠখানাকে টেবিলের ধারে বা যে কোন একটা স্ট্যাণ্ডের উপর রেখে দাও। দেখবে, অত ভার নিয়েও বালতিটা কেমন কাঠটাকে নিয়ে ঝুলে আছে। দুলিয়ে দিলে উপরে-নীচে দোল খাবে বটে; কিন্তু পড়ে যাবে না। বালতিটাকে যদি ঠেকা দিয়ে হেলানোভাবে না রেখে এক নম্বরের 'ক' ছবির মত সোজাভাবে কাঠখানার সঙ্গে ঝুলিয়ে দাও তবে কিছুতেই তাকে টেবিলের ধারে বা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে রাখতে পারবে না।
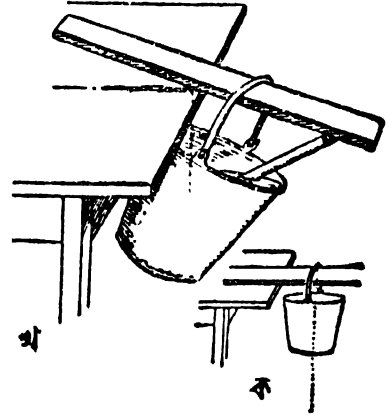
১নং চিত্র

(দুই)

বোতলের মুখে আঁটা ছিপির উপর খাড়াভাবে একটা সূচ অথবা আলপিন বসানো রয়েছে। একটা পয়সা বা আধুলিকে ওই সূচ বা আলপিনটার ডগায় খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পার কি? চেষ্টা করে দেখো—কিছুতেই খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু সাধারণ একটা কৌশলে একটা পয়সা বা আধুলিকে অনায়াসে সূচ বা আলপিনের ডগায় খাড়া করে রাখতে পার। এমন কি সূচ বা আলপিনের ডগায় বসিয়ে সেটাকে এদিক-ওদিক একটু দুলিয়ে দিলেও পড়ে যাবে না। কৌশলটা খুবই সহজ। ধারালো ছুরি দিয়ে একটা কর্কের তলার দিকের খানিকটা লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেল। কর্কের সেই চেরা দিকটায় একটা পয়সা বা আধুলি জোর করে প্রায় অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দাও। খাবার টেবিলে চামচের মত যেরকম কাঁটা ব্যবহৃত হয় ঠিক সে রকমের দুটা কাঁটা জোগাড় কর। কর্কটার গায়ে পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে হেলানোভাবে কাঁটা দুটাকে ফুটিয়ে দাও। এবার কর্কে আটকানো পয়সা বা আধুলিটাকে সবসমেত সূচ বা আলপিনটার ডগায় বসিয়ে দাও। দেখবে—কর্কে আটকানো চামচের মত কাঁটা দুটা নিয়ে পয়সাটা আলপিনের ডগায় খাড়াভাবেই বসে থাকবে। একটু দুলিয়ে দিলেও কয়েকবার দোল খেয়ে ঠিক একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে—পড়ে যাবে না। দুই নম্বরের ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ব্যবস্থাটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না।
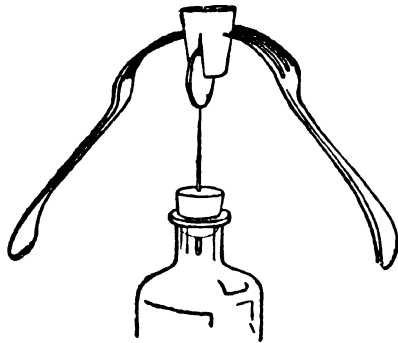
২নং চিত্র

(তিন)

তিন নম্বরের ছবির মত কাঠ বা অন্য কোন জিনিসের একটা পাখী তৈরী কর। লেজের শেষের দিকটা ছবির মত বাঁকানো হবে। অর্থাৎ ভার কেন্দ্রটা যেন পাখীটার পায়ের নীচে ঠিক সমসূত্রে থাকে। লেজের বাঁকানো প্রান্তে একখণ্ড সীসা বা অন্য কোন ভারী জিনিস গুঁজে দাও। পাখীটাকে এইবার যে কোন জায়গায় বসিয়ে দিলে দেখবে, হেলেদুলে গেলেও ঠিক একই জায়গায় বসে থাকবে। ছবিটাকে ভাল করে দেখে নাও।

৩নং চিত্র

(চার)
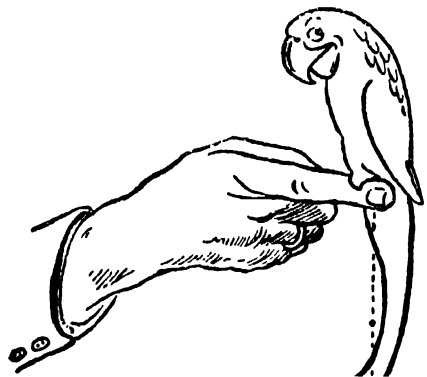
বোতল-ব্যারোমিটার

বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে। যে যন্ত্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ধারণ করা যায় তাকে বলে ব্যারোমিটার বা বায়ুমান যন্ত্র। তোমরা অনেকেই হয়তো ব্যারোমিটার দেখে থাকবে। কিন্তু আজ তোমাদিগকে সহজ এক রকম ব্যারোমিটার তৈরীর কথা বলছি। যে কেউ এই যন্ত্র তৈরী করে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারবে। একখণ্ড কাগজের গায়ে স্কেলের মত দাগ কেটে সেটাকে একটা বোতলের গায়ে এঁটে দাও। বোতলটাকে অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি কর একটা চায়ের পিরিচ বা কানা উচু থালা জল ভর্তি করে তার মধ্যে জল ভর্তি বোতলটাকে উল্টো করে বসিয়ে দাও। এটাই হবে ব্যারোমিটার। বোতলের গায়ে স্কেলের সাহায্যে দেখতে পাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জলের লেভেলও উঁচু-নীচু হবে। আবহাওয়ার সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখে নিলেই পরে জলের লেভেলের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার আসন্ন দুর্যোগের কথা বুঝতে পারবে। ছবি থেকে বোতল ব্যারোমিটার তৈরীর ব্যবস্থাটা সহজেই বুঝতে পারবে।
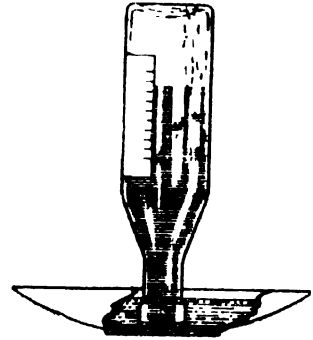
৪নং চিত্র

(পাঁচ)

চুলের তৈরী হাইগ্রোমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাপ করা যায় তাকে বলে হাইগ্রোমিটার। অতি সহজ উপায়ে একরকম হাইগ্রোমিটার তৈরী করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো—অনায়াসেই এরকমের হাইগ্রোমিটার তৈরী করতে পারবে। প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা কয়েকগাছা চুল সংগ্রহ কর। জল মিশ্রিত কষ্টিক সোডা (হাল্কা সলিউসন) দিয়ে চুলের তৈলাক্ত পদার্থ বেশ করে পরিষ্কার করে নাও। এবার একগাছা চুলের এক প্রান্ত একটা স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে আটকে দাও এবং চুলটার নীচের প্রান্তে প্রায় ৫০ গ্র্যাম ওজনের একটা ভার ঝুলিয়ে দাও। স্ট্যাণ্ডের নীচের দিকে, দুপাশে আটকানো দুখানা ছিদ্রকরা টিনের পাতের মধ্যে একটা সূচের ওপর লাটাইয়ের মত খুব হাল্কা একটা কাটিম বসাতে হবে। কাটিমটা যেন খুব সহজভাবেই এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে। ভার-ঝুলানো চুলটাকে কাটিম্‌টার উপর দিয়ে একটা কি দুটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে নিতে হবে। কাটিম-বসানো

সুচটার একদিকে কাগজ থেকে কাটা একটা তীরের ফলা এঁটে দাও। সাদা পোস্টকার্ডে অর্ধ বৃত্তাকারে স্কেল এঁকে সেটাকে তীরের ফলাটার প্রায় গা ঘেঁসে ঘড়ির ডায়েলের মত
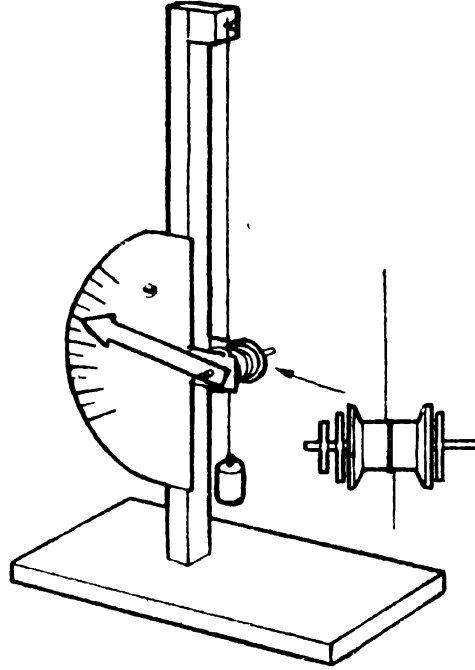
৫নং চিত্র

করে বসিয়ে দাও। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, ব্যবস্থাটা বুঝতে কিছু মাত্র কষ্ট হবে না। বায়ুমণ্ডলের কমবেশী আর্দ্রতা অনুযায়ী চুলের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে কাটিম-টার সঙ্গে তীরের ফলাটাও ঘুরে গিয়ে ডায়েলের ওপর অবস্থার নির্দেশ দিবে। গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

সংস্পৃষ্ট বায়ু

বায়ু আমরা দেখতে পাই না; অনুভবে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে এর অস্তিত্ব আমরা টের পাই মাত্র। এর কোন আকৃতি নেই—স্বচ্ছ বায়বীয় পদার্থ; কাজেই চোখে ধরা পড়ে না। বস্তুতঃ কঠিন পদার্থ—ইট, কাঠ, পাথর; তরল পদার্থ—জল, তেল, দুধ—এ সবের মতই বায়ুর বস্তুগত গুণ বা ধর্ম সবই রয়েছে। প্রভেদ মাত্র এই যে, বায়বীয় পদার্থের অণুপরমাণুগুলো পরস্পর সংবদ্ধ নয়—একটা পাত্রে সামান্য বায়ু প্রবেশ করালেও তা সমস্ত পাত্রটায় ছড়িয়ে পড়ে। সকল বায়বীয় পদার্থেরই এ একটা বৈশিষ্ট্য। এক টুকরা

পাথরের উপর যত চাপই দিই না কেন, সাধারণ হিসেবে ওর আয়তন কিছুমাত্র কমে না। যে পাত্রে ৫ সের জল ধরে চেপেচুপে তাতে যে ৬ সের জল ধরাব এমন উপায় নেই। বস্তুতঃ কঠিন ও তরল পদার্থের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করলে আয়তন সামান্য কিছু কমে বটে; কিন্তু তা এত সামান্য যে, যন্ত্রকৌশল ব্যতীত চোখে তা ধরাই পড়বে না। কিন্তু বায়বীয় পদার্থের বেলায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ; বাতাসের আয়তন সামান্য চাপে অতি সহজেই যথেষ্ট কমান যায়।

একটা পাত্রে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমরা বলি পাত্রটা খালি বা শূন্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেটা বায়ুতে পূর্ণ। এরূপ একটা বদ্ধমুখ পাত্রে বায়ু থাকা সত্ত্বেও আরও প্রচুর বায়ু পাম্পের সাহায্যে প্রবেশ করান যায়। পাত্রটি বেশ সুদৃঢ় হলে ক্রমে চাপের জোর বাড়িয়ে বায়ুর সংপেষণ আমরা ক্রমেই বাড়াতে পারি। এতে বায়ু ঘনীভূত হয়—আবদ্ধ বায়ুর চাপ বাড়ে। এ ভাবে অল্প পরিসরের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অধিক বায়ু জমালেই তাকে বলা হয় সংস্পৃষ্ট বায়ু (Compressed air)।

চাপ দিলে বায়ুর আয়তন যখন কমে বা কোন নির্দিষ্ট আয়তনের পাত্রে বেশী বায়ু প্রবেশ করান হয় তখন এই সংস্পৃষ্ট বায়ু পাত্রের গায়ে জোর চাপ দেয়। সংপেষণের জন্যে যে শক্তি আমরা ব্যয় করি সংস্পৃষ্ট বায়ুতে সেই শক্তি সঞ্চিত হয় এবং পাত্রের গায়ে সেই পরিমাণ চাপ পড়ে। আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি—স্বাভাবিক অবস্থাতেই বায়ু নিয়ত আমাদের দেহের উপর চাপ দিচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের এই চাপও বড় কম নয়—প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড বা ৭৷৷০ সের। অভ্যস্ত বলে এই চাপ আমরা টেরই পাই না। স্বাভাবিক অবস্থায় ঘরের মধ্যে এক বর্গ ফুট পরিমাণ বায়ুর চাপ হবে তাহলে ৭৷৷০ সের × ১৪৪ = ২৭ মণ; অর্থাৎ এক বর্গফুট পরিমিত কোন বস্তুর উপর বায়ুর ২৭ মণ ওজনের চাপ পড়ে; ইহাই বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ। যাক্, এখন যদি এই এক বর্গফুট পরিমিত বায়ুকে অর্ধ বর্গ ফুট পরিমিত স্থানে সংস্পৃষ্ট করা যায় তাহলে তার চাপ হবে দ্বিগুণ, অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০ পাউণ্ড। আরও চাপ দিয়ে এক তৃতীয়াংশ বর্গফুটে সংস্পৃষ্ট করলে বায়ুর চাপ হবে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪৫ পাউণ্ড। অবশ্য এভাবে বায়ুর সংপেষণ আমরা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে পারি না—কারণ তাতে যে প্রচণ্ড শক্তির চাপ প্রয়োগ করতে হয় তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। আর সেরূপ অত্যধিক সংস্পৃষ্ট বায়ুর প্রচণ্ড চাপ ধারণক্ষম পাত্রও তৈরী করা কঠিন।

বায়ু সংস্পৃষ্ট করতে একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়—তাকে বলে বায়ু-সংপেষণ যন্ত্র ইংরাজীতে যাকে বলে 'কম্প্রেশন পাম্প'। মোটর গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির টায়ার বায়ুপূর্ণ করতে এই পাম্প ব্যবহৃত হয়। এর গঠন প্রণালী খুবই সহজ। চিত্রটি লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যাবে। একটা ধাতুনির্মিত দণ্ডের মাথায় একটা ধাতব চাকৃতি, তার নীচে একটা ধার-উঁচু বাটী-মত গোলাকার চামড়া। দণ্ডের মাথায় এদুটি দৃঢ়ভাবে আট্কান

থাকে। একটা ধাতুনির্মিত চোঙ্গার মধ্যে এটা সবশুদ্ধ ঢুকিয়ে দিলে এমন হওয়া চাই যেন চাকতিখানা চোঙ্গার বেড়ের চেয়ে একটু ছোট হয়; কিন্তু বাটীর মত চামড়াখানা চোঙ্গার গায়ে টাইট হয়ে থাকে। চাকৃতি ও চামড়াশুদ্ধ দণ্ডটাকে বলা হয় পিস্টন। চোঙ্গাটার নীচের দিকটা বন্ধ, কিন্তু একটা সরু ধাতব নল লাগান। এই নলটা থেকে রাবারের পাইপ দিয়ে টায়ারের মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয়। টায়ারের মুখে থাকে একটা ছোট বল—যাকে ভাল্‌ভ বলে। এটা এমনভাবে বসান থাকে যাতে বায়ু বাইরের চাপে টায়ারের মধ্যে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরের চাপে বেরুতে পারে না। এখন পিস্টনটার হাতল ধরে নীচে চাপ দিলে চোঙ্গার মধ্যের আবদ্ধ বায়ুতে চাপ পড়ে—ফলে পিস্টনের সংলগ্ন চামড়াখানা সোজা হয়ে বাতাস উপরের দিকে বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ হয় (ছবি দেখ)। এর ফলে ভিতরের সংস্পৃষ্ট বায়ুর চাপে টায়ারের মুখের ভাল্‌ভটি খুলে গিয়ে বায়ু সবেগে টায়ারের মধ্যে ঢোকে। তারপর পিস্টনটা টেনে উপরে তুললে চোঙ্গায় আবদ্ধ বায়ুর চাপ কমে যায়—আর টায়ারে আবদ্ধ বায়ুর চাপে ভাল্‌ভটা এঁটে গিয়ে ভিতরের বায়ু চোঙ্গার মধ্যে আসা বন্ধ করে দেয়। পিস্টনের নীচে চোঙ্গার মধ্যে বায়ুর চাপ কমে যায়; এজন্য চোঙ্গার উপর দিক থেকে বাইরের বাতাস চেপে ভিতরে ঢোকে—চামড়াখানা এই চাপের ফলে বেঁকে গিয়ে বায়ুর ভিতরে ঢোকার পথ করে দেয়। এরূপে পিস্টনের নীচে চোঙ্গার মধ্যে পূর্ব্ববৎ বায়ু পূর্ণ হয়। পিস্টনটাকে আবার নীচে চাপ দিয়ে এই বায়ু টায়ারের মধ্যে ঢোকান হয়। এভাবে পিস্টনটাকে উঠানামা করিয়ে বাইরের বায়ু টায়ারের মধ্যে সংস্পৃষ্ট করা হয়। টায়ারটা ক্রমে ফুলে উঠে, শক্ত হয়—অর্থাৎ ভিতরের সংস্পৃষ্ট বায়ু টায়ারের গায়ে চাপ দিয়ে তাকে শক্ত করে তোলে।
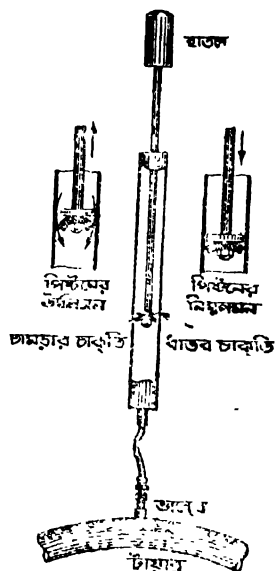
বায়ুকে সংস্পৃষ্ট করার কৌশল ও সংস্পৃষ্ট বায়ুর ব্যবহার পূর্ব্বে লোকের জানা ছিল না। আজকাল মোটর গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির চাকায় রবারের টায়ার লাগান—সংস্পৃষ্ট বায়ুর সাহায্যে একে শক্ত করে তোলা হয়। পূর্ব্বে সব গাড়ীতেই কাঠের বা লোহার চাকা লাগান হতো। এরূপ চাকা কাদায় বসে যায়—গাড়ী ভাল চলে না; আবার চাকার তলায় ইট বা পাথরের টুকরো পড়লে বা রাস্তা অসমান হলে গাড়ী পদে পদে লাফিয়ে ওঠে, আরোহীর হয় প্রাণান্ত। অনেক লোকের অনেক চেষ্টার ফলে ক্রমে চাকার উপর রাবারের একটা মোটা ফিতের মত নিরেট টায়ার লাগান সুরু হলো। এতে গাড়ীর ঝাঁকুনি একটু কমল বটে, কিন্তু তেমন সুবিধা কিছু হলো না।

তারপর অনেক লোকের অনেক চিন্তা ও চেষ্টার পরে গাড়ীর চাকায় বায়ুপূর্ণ রাবারের টায়ার লাগানর বুদ্ধি বের করেন—জন ডানলপ্ নামে এক ভদ্রলোক। ইনি ছিলেন একজন ডাক্তার। চিন্তা করে করে তিনি এই কৌশলটা বের করলেন এবং এরূপ টায়ার তৈরী করে দেখলেন—বায়ুপূর্ণ রাবারের টায়ারের চাকা সব দিক থেকে ভাল। এতে গাড়ী দ্রুত চলে, চাকা কাদায় ডুবে তেমন আটকে যায় না—নীচে ছোটখাট ইট পাথর পড়লেও চাকা চেপ্‌টে গিয়ে গাড়ীতে তেমন ঝাঁকুনি লাগে না। গাড়ীর চাকার সংস্পৃষ্ট বায়ুর এই যে ব্যবহার এই আবিষ্কারের মূল্য অনেক; কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা একে সহজ ও স্বাভাবিক মনে করছি। মোটর গাড়ী, বাইসাইকেল, এরোপ্লেন প্রভৃতি উন্নত ধরণের সকল গাড়ীর চাকাতেই আজকাল বায়ুপূর্ণ রাবারের টায়ার লাগান হচ্ছে।

পাম্পের সাহায্যে কোন টায়ার বায়ুপূর্ণ করতে হলে যত বেশী পাম্প করা যায় ততই সংস্পৃষ্ট বায়ুর চাপে টায়ারটা শক্ত হতে থাকে। সংস্পৃষ্ট বায়ুর এই চাপের ফলে আবার পাম্পের পিস্টনটা ঠেলে নীচে নামাতে ক্রমেই বেশী জোর দিতে হয়,—এক সময় পিস্টনটাকে আর নীচে নামানই সম্ভব হয় না। বায়ু সংপেষণের জন্য এই যে শারীরিক বা যান্ত্রিক শক্তি ব্যয়িত হয় তা সংস্পৃষ্ট বায়ুতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। বায়ুপূর্ণ টায়ারের মুখ যদি এখন সহসা খুলে দেওয়া যায় তাহলে অতি তীব্র বেগে বায়ু বেরুতে থাকে—আবদ্ধ শক্তি ছাড়া পেয়েছে! আর এক ভাবেও সংপৃষ্ট বায়ুর শক্তি পরীক্ষা করা যায়। একটা কম্প্রেশন পাম্পের নীচের ছিদ্র-মুখটা আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে যদি পিস্টনটা চেপে দেওয়া যায় তাহলে পিস্টনের চাপে ভিতরের বায়ু সংস্পৃষ্ট হবে। এখন হঠাৎ পিস্টনটা ছেড়ে দিলে ওটা জোরে উপরে লাফিয়ে উঠবে। কেন এমন হয়? সংস্পৃষ্ট বায়ুতে সঞ্চিত শক্তি সুযোগ পেয়ে পিস্টনটাকে সজোরে উপরে ঠেলে তোলে, এবং এভাবে সংস্পৃষ্ট বায়ু পূর্বের স্বাভাবিক আয়তন ও চাপে ফিরে আসে। তাহলে দেখা গেল, সংস্পৃষ্ট বায়ু থেকে আমরা শক্তি পেতে পারি। এই শক্তির পরিচয় মানুষ বহুদিন পেয়েছে, অধুনা এই শক্তির সাহায্যে নানারূপ দরকারী যন্ত্রাদি চালনার ব্যবস্থা হয়েছে।

সংস্পৃষ্ট বায়ুর শক্তিসাহায্যে কোন যন্ত্র চালাতে হলে যে প্রচণ্ড চাপযুক্ত বায়ুর প্রয়োজন তার জন্যে এঞ্জিন বা মোটর চালাতে হয়; হাতে পাম্প চালিয়ে এরূপ শক্তিসম্পন্ন সংস্পৃষ্ট বায়ু তৈরী করা সম্ভব হয় না। এঞ্জিন বা মোটর চালিয়ে প্রকাণ্ড কম্প্রেশন পাম্পের পিস্টন চালান হয়; আর বিশেষ ধরণের সুদৃঢ় পাত্রে বায়ু সংস্পৃষ্ট করে রাখা হয়। সামান্য একটা সাইকেলের পাম্প চালালেই ঘর্ষণের ফলে পিস্টনটা গরম হয়ে ওঠে। এঞ্জিন-চালিত প্রকাণ্ড পাম্পের পিস্টন অত্যধিক গরম হয়—এজন্য ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ দিয়ে তাকে অবিরত ঠাণ্ডা করার কৌশল করতে হয়। এইরূপ সংস্পৃষ্ট বায়ুর প্রচণ্ড চাপের শক্তি দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালান হচ্ছে;—এদিয়ে পাথর কাটা, লোহার পাত ছিদ্র করা ও জোড়া লাগান, কারখানার বিশাল হাতুরী চালান প্রভৃতি নানা কাজ করা হয়।

এ হয়তো একটু অদ্ভুত মনে হবে—এঞ্জিন বা মোটর চালিয়েই যদি শক্তি ব্যয় করতে হলো তাহলে আর সংস্পৃষ্ট বায়ুচালিত যন্ত্রের সুবিধাটা কি ? এঞ্জিন চালিয়েই তো ঐ যন্ত্র চালান যেত ! কিন্তু তা নয় ; বিশেষ বিশেষ কাজে এরূপ যন্ত্রের আবশ্যকতা প্রচুর। এঞ্জিন যেমন প্রকাণ্ড তেমন ভারী, কাজেই যখন তখন যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্পৃষ্ট বায়ুচালিত যন্ত্র সহজেই যত্রতত্র নিয়ে যাওয়া যায়—বায়ুপূর্ণ পাত্রটাও হালকা, আবার রবারের পাইপ লাগিয়ে সহজেই দূরে প্রয়োজনমত জায়গায় নিয়ে যন্ত্রটা চালান যায়। খনির মধ্যে, জলের তলায় এরূপ যন্ত্র চালান ভারী সুবিধে। বিশেষতঃ খনির মধ্যে এঞ্জিন চালালে দাহ্য গ্যাসে আগুন লাগার ভয় আছে—সংস্পৃষ্ট বায়ুতে আগুনের ভয় নাই, একান্ত নিরাপদ। আবার এই যন্ত্রনিঃসৃত বিশুদ্ধ বায়ু খনির দূষিত বায়ু নষ্ট করে দেয়। যাই হোক, সংস্পৃষ্ট বায়ুর আরও বহুবিধ ব্যবহার আছে। কারখানায় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী একটা দণ্ডের উপর করে শূন্যে তোলা হয়েছে ; তলাটা পরিষ্কার করা বা মেরামতের জন্য—সংস্পৃষ্ট বায়ুর চাপে এখানে ঐ দণ্ডসুদ্ধ গাড়ীটা উপরে তোলা হয়। রেলগাড়ীর প্রকাণ্ড এঞ্জিন এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া বা এঞ্জিনের মুখ ঘোরানো, এসবও সংস্পৃষ্ট বায়ুব সাহায্যে করা হয়। জাহাজ তৈয়ারীর কারখানায় মোটা মোটা লোহার পাত জুড়তে সংস্পৃষ্ট বায়ুর শক্তিতে বিশাল হাতুড়ী সব উঠা নামা করানো হয়। কৌশল করে সংস্পৃষ্ট বায়ুর শক্তি দিয়ে আরও বহু রকম কাজ করা যেতে পারে।

'তরল বায়ু' কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়। অদ্ভুত শোনালেও বিজ্ঞান বায়ুকেও জল-তেলের মত তরল পদার্থে পরিণত করেছে। হবে না কেন ? জল ফুটালে বাষ্প হয়ে উঠে যায়, অর্থাৎ তরল পদার্থ বায়বীয় হয়ে গেল। এখন এই বাষ্প যদি আবার ঠাণ্ডা করা যায় তাহলে আবার জল পাই। জল ফুটছে, বাষ্প উঠছে ; এই বাষ্পের উপর ঠাণ্ডা থালা ধরলে ওর গায়ে ফোটা ফোটা জল জমে। এভাবে বাষ্প অর্থাৎ বায়বীয় জলকে ঠাণ্ডা করে যেমন তরল জল পাওয়া যায়, তেমনই বায়ু বা যে কোন বায়বীয় পদার্থকে উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে তা তরল হবে। অবশ্য সকল গ্যাসের পক্ষে উপযুক্ত ঠাণ্ডা করা বড় সহজ নয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি কয়েকটি গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থকে সহজেই তরল করা যায়। বায়ুকে তরল করতে হলে অত্যধিক ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। বরফাচ্ছাদিত মেরু অঞ্চলের শৈত্যেও বায়ু তরল হয় না ; এর জন্য যন্ত্রকৌশল প্রয়োজন। তরল বায়ু কিরূপ ঠাণ্ডা তা নীচের ছবিটা থেকে বুঝা
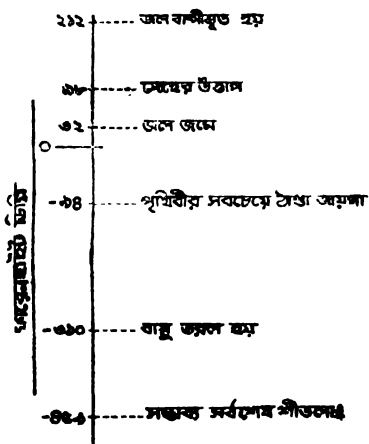
যাবে। আমাদের পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপ এমনই যে, বায়ু বায়বীয় অবস্থায় ও জল তরল অবস্থায় আছে। শীত-প্রধান দেশে অবশ্য জল কঠিন অবস্থায় অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়। পৃথিবীর উত্তাপ যদি বেশী হতো (যেমন লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে ছিল) তাহলে সব জল যেত বাষ্প হয়ে উড়ে, আমাদের এক ফোটা জল মিলতো না খেতে। পৃথিবী যদি তেমন ঠাণ্ডা হতো (যেমন ঠাণ্ডা আমাদের চাঁদ) তাহলে সর্বত্র জল জমে বরফ হয়ে যেত—আরও অত্যধিক ঠাণ্ডা যদি হতো তাহলে বায়ু পর্যন্ত তরল হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা বলেন, চন্দ্রের এই অবস্থা—সেখানে বায়ুমণ্ডল নেই। পৃথিবী এমন হলে আমাদের কি দশা হতো।

এখন দেখা যাক্, বায়ুকে তরল করা যায় কিরূপে? বায়ুপূর্ণ সাইকেলের টায়ারের মুখ খুলে দিলে ভিতরের সংস্পৃষ্ট বায়ু তীব্রবেগে বেরিয়ে আসে। এই বায়ুপ্রবাহে আঙ্গুল দিলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। এই পরীক্ষায় বুঝা গেল, সংপৃষ্ট বায়ু ছোট কোন ছিদ্র পথে বেরিয়ে আসার সময় ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই ঠাণ্ডা বায়ুকে সংস্পৃষ্ট করে আবার ছিদ্রপথে ছেড়ে দিলে আরও ঠাণ্ডা হবে। এভাবে বার বার করলে অবশেষে এই বায়ু এত ঠাণ্ডা হয় যে, একেবারে তরল হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থাই বায়ু তরল করার সুবৃহৎ যন্ত্রে করা হয়েছে।

চিত্রে যন্ত্রটির নক্সা পরিষ্কার করে দেখান হয়েছে। একটা মোটা নলের ভিতরে একটা সরু নল দিয়ে সবটা ক্রমাগত বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে একটা বড় পাত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে। এরূপ বাঁকানর কারণ দীর্ঘ নল অল্পস্থানে ধরবে, এই মাত্র। নল দুটার দুইপ্রান্ত আলাদা হয়ে রয়েছে—নিম্নভাগে দুই নলের দুই মুখ আলাদাভাবে একটা ছোট পাত্রে যুক্ত রয়েছে। এই সমস্তটা একটা বড় পাত্রের মধ্যে রেখে পাত্রটা খড় কুটা দিয়ে ভর্তি করা হয়, যাতে বাইরের তাপ ভিতরের নলে না পৌঁছায়। এখন শক্তিশালী কম্প্রেশন পাম্প লাগিয়ে উপর থেকে ভিতরের সরু নলের মধ্যে বায়ু সংস্পৃষ্ট করা হয়। অবশ্য এই বায়ু পূর্বেই শুষ্ক ও ধূলিকণাশূন্য করে নেওয়া হয়।

পাম্প চালিয়ে ভিতরের সরু নলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করালে বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপ অপেক্ষা প্রায় ২০০ গুণ চাপবিশিষ্ট বায়ু ভিতরের সরু নলের মধ্যে জমে। এখন সরু নলটার নিম্নভাগে সংযুক্ত (খ) ট্যাপটা সহসা খুলে দিলে সবেগে বায়ু ছোট পাত্রটার মধ্যে বেরিয়ে আসে। সংস্পৃষ্ট বায়ু এরূপে সরু পথে বেরিয়ে আসায় কিছু ঠাণ্ডা হয়। এই ঠাণ্ডা বায়ু ছোট পাত্রটা থেকে মোটা নলের মধ্য দিয়ে সজোরে উপরে উঠে যায়। এই বায়ু কৌশল করে পাম্পের ভিতর দিয়ে পুনরায় সরু নলের মধ্য দিয়ে পূর্বের মত বের
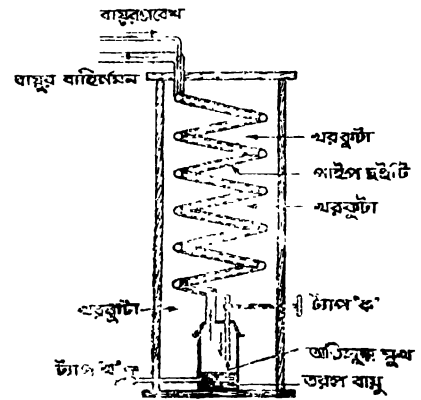
করা হয়। এবার এই বায়ু আরও কিছু ঠাণ্ডা হবে। এইভাবে বহুবার করে করে বায়ু ক্রমাগত ঠাণ্ডা হতে হতে এত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে যে, শেষে তরল বায়ু ফোঁটা ফোঁটা করে ছোট পাত্রটার তলায় জমতে থাকে। বায়ু তরল হয়ে গেল। এই বায়ু (ক) ট্যাপ দিয়ে বের করে বিশেষ পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়।

তরল বায়ু দেখতে জলের মত—সামান্য একটু নীলাভ। এই বায়ু এত ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা যে, এর মধ্যে আঙ্গুল ডোবালে পুড়ে যায়। সাধারণ পাত্রে তরল বায়ু রাখলে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক তাপেই ফুটতে থাকে—আর বায়বীয় অবস্থায় আবার ফিয়ে যায়। বাইরের তাপ লাগতে না পারে এমন পাত্রেই তরল বায়ু রাখা হয়। বাজারে যে ভ্যাকুয়াম ফ্ল্যাস্ক কিনতে পাওয়া যায়—যার মধ্যে দুধ, চা প্রভৃতি দীর্ঘ সময় গরম থাকে—তার সৃষ্টিই হয়েছিল তরল বায়ু রাখার জন্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বায়ু তরল হয় -৩১০° ডিগ্রিতে, কিন্তু জল জমে বরফ হয় ৩২° ডিগ্রিতে; কাজেই তরল বায়ুর চেয়ে বরফ ৩৪২° ডিগ্রি বেশী গরম! এক খণ্ড বরফের উপর একটা পাত্রে তরল বায়ু রাখলে বরফের উত্তাপেই তা ফুটবে—আর এক প্রকার বাষ্প উঠতে থাকবে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি?

বায়ুকে এত চেষ্টা করে তরল করা হয় কেন, একথা অনেকের মনে হতে পারে। এরও প্রয়োজন আছে। বায়ু প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। এই গ্যাস দুটি পৃথকভাবে পেতে হলে তরল বায়ু থেকে সহজে পাওয়া যায়। তরল বায়ু খোলা পেলে আবার সাধারণ বায়ুতে পরিণত হয়। এ সময় নাইট্রোজেন প্রথমে বাষ্প হয়ে উঠে যায়, অক্সিজেন ওঠে পরে। নানা কাজের জন্য এভাবে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস পৃথক করা হয়।

ইন্দ্রনাথ

উদ্ভিদের আকর্ষণী-তন্তু

লতা জাতীয় উদ্ভিদেই আকর্ষণী-তন্তু জন্মিয়া থাকে। তাহাদের কাণ্ড শক্ত নহে বলিয়াই অপর কোন দৃঢ় অবলম্বন আশ্রয় করিয়া বিস্তার লাভ করিতে হয়। এই বিস্তৃতির সহায়তা করে আকর্ষণী-তন্তু। অবশ্য এমন কতকগুলি লতা-গাছও আছে যাহাদের আকর্ষণী-তন্তু নাই। আকর্ষণী-তন্তুবিহীন লতা-গাছ শক্ত, সরল কাণ্ডবিশিষ্ট অন্যান্য গাছের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা ঐসব শক্ত গাছের গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া উপরে উঠিয়া যায়। কাজেই আকর্ষণী-তন্তু না থাকিলেও তাহাদের বিস্তৃতি লাভের অসুবিধা ঘটে না। কিন্তু বিস্তৃতিলাভের জন্য লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি লতানে গাছ আকর্ষণী-তন্তুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় লতানে গাছের কাণ্ড ও বোঁটার সন্ধিস্থল হইতে সুতার মত একরকমের পদার্থ বাহির হয়।

এই সূতার মত পদার্থগুলি গোড়ার দিক হইতে ডগার দিকে ক্রমশ সরু হইয়া আসে, ঠিক যেন হাতীর শুঁড়ের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। উপরের পিঠ অর্ধগোলাকার, নীচের পিঠ চেপ্টা
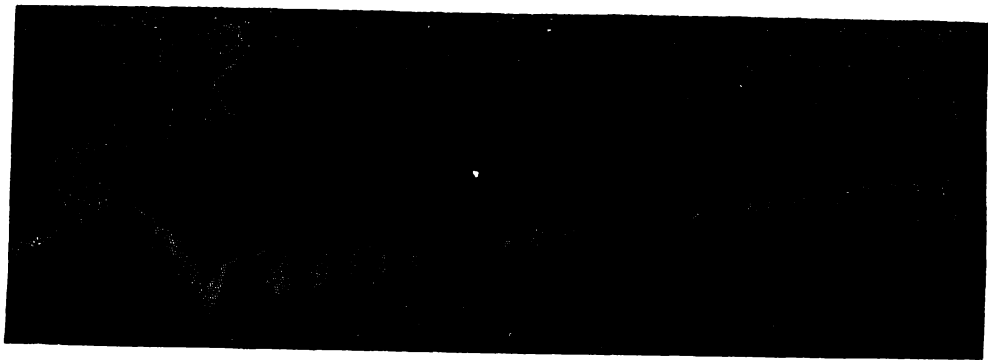
লতার আকর্ষণী-তন্তু

ও মসৃণ। সোজাভাবে প্রসারিত অবস্থায় আকর্ষণী-তন্তু ক্রমশ সম্মুখের দিকে বাড়িতে থাকে। দেখিলেই মনে হয়, আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য কোন দৃঢ় অবলম্বনের সন্ধানে উন্মুখ হইয়া আছে। আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ এরূপ কোন আকর্ষণী-তন্তুর মসৃণ দিকটাতে একটা পেন্সিল বা কাঠি কয়েকবার বুলাইয়া দিলে খানিকক্ষণ পরেই দেখা যায়—আকর্ষণী-তন্তুটা ডগার দিক হইতে ক্রমশ কুণ্ডলী পাকাইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু কোন শক্ত জিনিসকে ধরিতে না পারিলে তন্তুর কুণ্ডলীটা ঘড়ির চ্যাপ্‌টা স্প্রিঙের মত জড়াইয়া যায়। কোন দৃঢ় পদার্থকে ধরিতে পারিলে তন্তুটা লম্বা স্প্রিঙের মত জড়াইয়া থাকে। এরূপ লম্বা স্প্রিঙের মত বহু সংখ্যক আকর্ষণী-তন্তুর অবলম্বনে লতা-গাছ ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। আকর্ষণী-তন্তুগুলি লম্বা স্প্রিঙের মত জড়াইয়া থাকে বলিয়া লতা-গাছ প্রবল ঝড়-ঝাপ্‌টাতেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

লতা গাছের আকর্ষণী অনেক রকমের দেখা যায়। আমাদের দেশের বেত জাতীয় লতার বড় বড় আকর্ষণী জন্মিয়া থাকে। এগুলি কিন্তু লাউ, কুমড়ার আকর্ষণীর মত কুণ্ডলী পাকায় না, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ইহাদের গায়ে নীচের দিকে বাঁকানো অসংখ্য কাঁটা থাকে—আকর্ষণী এই কাঁটার সাহায্যেই অন্যান্য বড় বড় গাছপালা অবলম্বন করিয়া বেতের লতাগুলিকে উপরে উঠিতে সাহায্য করে। কতকগুলি লতার পাতার অগ্রভাগ হইতে সরু আকর্ষণী-তন্তু বাহির হয়। কোন কোন লতার আকর্ষণী হয় পাখীর পায়ের তিনটি আঙ্গুলের মত। আঙ্গুলের নখের মত আকর্ষণীর সাহায্যে তাহারা অন্যান্য উদ্ভিদের কাণ্ড অবলম্বন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে। কতকগুলি লতানে গাছ আবার আকর্ষণী-তন্তুর মত শিকড়ের শোষণযন্ত্র সাহায্যে কোন সুদৃঢ় অবলম্বন আশ্রয় করিয়া বিস্তৃতি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

শ্রীশিবপ্রসাদ গুহ (চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী)

(২)

উদ্ভিদের ভূমির উপরের কাণ্ড প্রধানতঃ দু'রকমের। একটি মাটির ওপর মাথা তুলে সোজা দাড়িয়ে থাকে অপরটি মাটিতে শায়িত অবস্থায় থাকে বা কোন কিছুকে অবলম্বন করে ওপরে উঠে। এই শেষোক্ত শ্রেণী, লতা নামে পরিচিত। আম, কাঁঠাল, জামের গাছ সোজা মাথা তুলে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে; কিন্তু শিম, পুঁই, কুমড়ো, শশা, প্রভৃতি লতা কোন অবলম্বন না পেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, অন্য কোন গাছ বা মাঁচা প্রভৃতি আশ্রয় করে বা জড়িয়ে ওপরে ওঠে। আবার কোন কোন গাছ, যেমন লাউ, কুমড়ো, শশা ইত্যাদি নিজের দেহকে না জড়িয়ে একরকম সুতোর মত রূপান্তরিত শাখার সাহায্যে অবলম্বন দণ্ডকে আশ্রয় করে কাণ্ড বিস্তার করে চলে। এই সুতোর মত শাখাগুলোকে আকর্ষণী তন্তু বলে। এগুলো সাধারণতঃ পর্বসন্ধি থেকেই বের হয়। কিন্তু শাখার মত না হয়ে রূপান্তর গ্রহণ করে।

উদ্ভিদের আকর্ষণী-তন্তু উদ্ভিদকে অনেকখানি সাহায্য করে তার কাণ্ড বিস্তারে। আকর্ষণীযুক্ত গাছগুলো তাদের আকর্ষণীর সাহায্যে মাঁচার ওপর বা কোন গাছকে জড়িয়ে চলে। ফলে সূর্য্যালোক ও মুক্ত বাতাস গ্রহণে সুবিধা হয় এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

আকর্ষণী অনেক রকমের দেখা যায়। (১) কাণ্ডের রূপান্তরিত আকর্ষণী (২) পাতার রূপান্তরিত আকর্ষণী এবং (৩) উপপত্রের আকর্ষণী।

কাণ্ড-আকর্ষণী:—এগুলো দেখতে সরু সুতোর মত, পত্রবিহীন ও স্প্রিং-এর মত কুণ্ডলী পাকানো শাখা। এগুলো দেখা যায় আঙ্গুর, ঝুম্‌কো-লতা ইত্যাদি গাছে। কোন কোন সময় এই আকর্ষণীর গায়ে পাতার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উদ্‌গত হয়; কিন্তু সেগুলো শাখাতে রূপান্তরিত হয় না। কাণ্ড-আকর্ষণী পাতার পার্শ্বের পার্শ্বমুকুল বা অগ্রমুকুলে রূপান্তরিত হয়। ঝুমকো-লতার পার্শ্বমুকুল আকর্ষণীতে পরিণত হয়। আঙ্গুর জাতীয় গাছের অগ্রমুকুলই এইরূপ আকর্ষণীতে পরিণত হয়। কোন কোন সময় দেখা যায় ফুলের কুঁড়ি আকর্ষণীতে পরিণত হয়। যেমন—কপাল-পুটকি লতা (Cardiospermum)।

পাতার রূপান্তরিত আকর্ষণী:—এইরূপ আকর্ষণী উলট-চণ্ডাল, (Gloriosa), Vergin's bower (Clematis) ইত্যাদি গাছে দেখা যায়।

উপপত্র আকর্ষণী:—পাতার গোড়ার কাছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতার মত জিনিস থাকে তাকে উপপত্র বলে। এই উপপত্রও কোন কোন সময় আকর্ষণীতে পরিণত হয়, যেমন—কুমারিকা (Smilax) গাছে। লাউ, কুমড়ো, শশা ইত্যাদি লতার আকর্ষণীর তলার দিকটা চ্যাপটা ও মসৃণ, বাহিরের দিকটা অর্দ্ধগোলাকার ও খস্‌খসে। এই আকর্ষণী ক্রমাগত স্প্রিং-এর মত জড়িয়ে যায়। সামনে যদি কোন কঞ্চি বা অপর কিছু পড়ে তো তাকে জড়িয়ে ধরে। যেগুলো এরূপ কোন অবলম্বন না পায় তারাও চেপ্টা একটা কুণ্ডলীর মত জড়িয়ে থাকে।

অনেক আরোহী লতা-গাছ আছে যাদের আকর্ষণীর মত কোন 'হাত' নেই যা দিয়ে তারা কোন গাছকে আশ্রয় করে। কিন্তু তবুও তারা মাঁচায় বা গাছে চড়ে। এসব গাছ নিজের দেহকেই অপর কোন সরল গাছের গায়ে জড়িয়ে দেয়।

ফজলুর রহমান (প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।)

বিবিধ

কলকাতায় যক্ষ্মারোগের দ্রুত প্রসার

কলকাতা নগরীতে অতি দ্রুত যক্ষ্মারোগ প্রসারের ফলে গত জানুয়ারি মাসের ১লা থেকে জুলাইয়ের ১৫ তারিখের মধ্যে এক হাজার পাঁচশত নিরানব্বই জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে বলে কর্পোরেশনের হিসেবে প্রকাশ। অন্যান্য সমস্ত রোগ মিলিয়ে ওই সময়ে মোট মৃত্যুসংখ্যা বাইশ হাজার দু'শ এক। তার মধ্যে যক্ষ্মা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। তারপরেই কলেরা। কলেরায় এক হাজার উনাশী জন মারা গিয়েছে। বসন্ত, প্লেগ ও ম্যালেরিয়ায় যথাক্রমে ৪৬৭, ৫০ ও ৫৬৬ জন মারা গেছে। ১২ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্য্যন্ত বসন্ত ও কলেরা মহামারীরূপে ঘোষিত হয়েছিল।

বি, সি, জি, টীকা অভিযান

পাটনার খবরে প্রকাশ, বিহারে বি, সি, জি, টীকা অভিযান প্রসারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঙ্ঘের আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা-নিবারণী মিশনের নেতা ডাঃ পল অ্যাণ্ডারসন প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার এক প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে বলেছেন—"কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক টীকার মতই যক্ষ্মা-নিবারণী টীকা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করাই আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য। প্রতিবছর ভারতে প্রায় দশ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে দু'জন লোক এরোগে মারা যায়; মৃত্যুহারের দিক থেকে ম্যালেরিয়ার পড়েই এরোগের স্থান।"

ডাঃ অ্যাণ্ডারসন বলেন—"গত তিন বছরের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকা, মধ্য-প্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান ও সিংহলের জনসাধারণের মধ্যে এই টীকা প্রচলন করেন এবং আশী লক্ষ লোককে এই টীকা দেন, এই টীকা যক্ষ্মা-নিরাময়ক নয়; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধক।

পাটনা মেডিক্যাল কলেজের কর্মচারী এবং নার্সদের মধ্যে টীকা দেওয়া সুরু হবে এবং বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে পাটনায় স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই অভিযান প্রথমেই আরম্ভ করা হবে। ডাঃ কে, জিসাম ও দুজন নার্সের অধীনে বৈদেশিক দলটি এখানে তিনমাস অবস্থান করবেন এবং এই অভিযান পরিচালনের জন্যে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনটি স্থানীয় দলকে তাঁরা এবিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

বর্তমানে হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, পূর্ব পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, পাটনা ও আসামে বিদেশীয় ছয়টি দল কাজ করছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ও প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই সব দল এখানে এসেছেন। বর্তমান চুক্তি আগামী ১৯৫০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ডাঃ অ্যাণ্ডারসন শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ রওনা হবেন। সেখানে আর একটি দল বি, সি, জি, টীকা অভিযানের কাজে ব্যাপৃত আছেন।

শিশু পক্ষাঘাত রোগের আশঙ্কা

ভারতে ব্যাপকভাবে শিশু পক্ষাঘাত রোগ দেখা দেওয়ার ফলে ভারত ২০টি 'আয়রণ লাংস্' প্রেরণের জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকট তারযোগে আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান ভারতের আবেদনের উত্তরে ২০টি 'আয়রণ লাংস্' পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের ওয়াশিংটন শাখা জানান যে, আমেরিকাতেও ব্যাপকভাবে উক্ত রোগ দেখা দিয়েছে। সেজন্যে 'আয়রণ লাংস্' পেতে অসুবিধা হচ্ছে।

ব্যাপক চাষের পরিকল্পনায় উন্নতধরণের বীজ

ব্যাপক চাষের পরিকল্পনানুযায়ী প্রাদেশিক সরকারসমূহকে উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহের জন্যে কেন্দ্রীয় খাদ্য-দপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন দেশে উন্নত ধরণের বীজের চাহিদা খুব বেশী। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত গত খাদ্য-উৎপাদন সম্মিলনে কয়েকটি প্রদেশ এরূপ গমের বীজ সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই বছর খাদ্য-দপ্তরে ৪২ হাজার টন গমের বীজ সরবরাহের অনুরোধ এসেছে। তার মধ্যে খাদ্য-দপ্তর পাকিস্তান থেকে ২০ হাজার টন সিন্ধুর গম, যুক্তপ্রদেশ থেকে ৫ হাজার টন এবং পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ১৫ হাজার টন গম সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। বীজ সরবরাহের পূর্বে ওগুলো ঠিক ও টাট্‌কা আছে কিনা খাদ্য-দপ্তর তা পরীক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন।

ভারতের শিল্প জাতীয়করণ

ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, প্রথম শ্রেণীর শিল্প সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে। এগুলো প্রকৃতপক্ষেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে সরকার আগ্রহশীল হলেও বাস্তব কারণে আগামী ১০ বছরের মধ্যে এর জাতীয়করণ সম্ভব হবে না। এই সিদ্ধান্ত থেকে মনে করবার কোন কারণ নেই যে, ১০ বছর পরে অকস্মাৎ এই শিল্পের জাতীয়করণ হয়ে যাবে। আজ অধিক উৎপাদন দেশের জরুরী প্রশ্ন—এ থেকেই শিল্পের জাতীয়করণ প্রশ্নের মিমাংসা হয়ে যাবে। শিল্প, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হলে অধিক উৎপাদনের সহায়ক হতে পারে—এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে সরকার এসম্পর্কে বিবেচনা করবেন। পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে, বর্তমানে জাতীয়করণের আলোচনা নিতান্তই পুঁথিগত এবং দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর কোন সংশ্রব নেই। ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য কতকগুলো বিষয়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তার কথা বাদ দিলে চলবে না। খোলাখুলি বলতে হয় যে, মূল শিল্প হাতে নেওয়ার মত স্বচ্ছলতা ভারত সরকারের নেই। তাছাড়া, যন্ত্রজগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল; নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বহু কারখানার যন্ত্রপাতি আধুনিক যুগে অচল হয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি জানতে চান যে, কতকগুলো অচল যন্ত্রপাতি কিনে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হোক—এটা আদৌ কাম্য কিনা।

ভারতে বিদেশী কারবার সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতসরকারের চুক্তি হয়েছে এবং সেগুলো পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—কোন কারণেই সেগুলো দেশের বিভিন্ন শিল্পের সমান মর্যাদা ভোগ করবে না।

চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরতত্ত্বে নোবেল প্রাইজ

জুরিক ইউনিভারসিটির ইনষ্টিটিউট অব ফিজিও-লজির ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ হেস্‌ এবং লিসবন ইউনি-ভারসিটির এমেরিটাস প্রোফেঃ অ্যান্টোনিও এগাস মনিজকে সম্প্রতি শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যায় সংযুক্তভাবে নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক মনিজ একজন বিখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিদ। তিনি এক সময়ে পর্তুগালের বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বয়স এখন ৭৫ বছর। এই সর্বপ্রথম মানসিক বিকারগ্রস্ত একটি রোগীকে তিনি অস্ত্র চিকিৎসায় নিরাময় করেছেন। তিনি এ বিষয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বোধ হয় অভূতপূর্ব; কারণ মানসিক রোগে অস্ত্র চিকিৎসায় এরূপ সাফল্য লাভের কথা পূর্বে আর কখনও শোনা যায় নি।

ডাঃ হেসের বয়স ৬৮ বছর। তিনি চক্ষু ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ডাঃ হেস্‌ ১৯৪৭ সাল থেকে জুরিকের ফিজিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কলকাতায় ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষের প্রদর্শনী

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু ভারতের ভূমিকর্ষণ ব্যবস্থা মোটেই উন্নত ধরণের নয়। ভারতকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যে অধিক ফসল ফলাবার জন্যে ট্রাক্টর (কলের লাঙ্গল) ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। ভারতের বহু আবাদী ও অনাবাদী জমি আছে; কিন্তু তাতে ভাল কর্ষণ ও জলসেচন ব্যবস্থা চালু না থাকায় আশানুরূপ শস্য উৎপন্ন হচ্ছে না। সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় যাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সচেতন হয়েছেন এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে সরকার জরুরী ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছেন। যুগোপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যাতে সহজেই ফসল বৃদ্ধির আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়, তদুদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেই ভারত সরকার বিদেশ থেকে কতক ট্রাক্টর আমদানী করেছেন। যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ট্রাক্টরে চাষ আরম্ভ হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-কার্যে ট্রাক্টর প্রয়োগের উদ্যোগ চলেছে। গত ২৩শে অক্টোবর কলকাতায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে এক একর জমিতে ট্রাক্টর চাষের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দেখান হয় যে, ট্রাক্টরের সাহায্যে ঘণ্টায় এক একর জমি চাষে মোট চার টাকার বেশী খরচ পড়ে না। ভারতকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করার পক্ষে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ প্রবর্তন কত প্রয়োজন তা এই তথ্য থেকেই উপলব্ধি করা যাবে।

চা'ল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনা

'যুগান্তরের' খবরে প্রকাশ—পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের একজন মুখপাত্র এইরূপ জানিয়েছেন যে, ধানকাটা মরশুম পর্যন্ত যদি প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় না ঘটে তবে এবৎসর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রধান খাদ্য-ফসল আমন ধানের ফলন বেশ ভাল হবে বলে আশা করা যায়। সমস্ত ব্যাপারে ভালভাবে চললে সরকারী হিসেব অনুযায়ী এ বৎসর পশ্চিম বঙ্গে কিঞ্চিদধিক ৩৫ লক্ষ টন চা'ল হবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ বৎসরে ৩৬ লক্ষ টন চা'লের প্রয়োজন।

সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় চলতি বছরে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫০০০ একর পতিত জমিতে চাষ হয়েছে।

উক্ত সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলো আরও কাযকরী হবার ফলে এবং যান্ত্রিক লাঙ্গলের সাহায্যে আরও অধিক পরিমাণে চাষ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে আগামী দু-এক বছরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ চা'লের দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পারে বলে আশা করা যায়।

ধান ভানার উন্নত পদ্ধতি

ধান-ভানাই পদ্ধতির উন্নতি করে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন বেশী চা'ল পাওয়া যেতে পারে। শ্রীযুক্ত এস বর্মা তাঁর প্রস্তাবিত উন্নয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ উপলক্ষে পূর্বোক্ত মন্তব্য করেন। প্রকাশ, ব্রহ্মদেশে শ্রীযুক্ত বর্মা পাঁচটি চা'লের কলের মালিক ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। জাপানী অধিকারের সময় এবং নূতন ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের আমলে, জরুরী অবস্থায় চা'ল উৎপাদন সুসংহত করবার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে ধানী জমির পরিমাণ ৮৩,৫৭৩,৭০০ একর। ঐ জমিতে প্রতি বৎসর গড়ে ৩১,৫৯৭,০০০ টন ধান জন্মে। ভারতবর্ষে চা'লের কলের সংখ্যা ১২০০টি এবং তার অধিকাংশ 'হলার' ধরণের। ধান ভানার কোনও পর্যায়েই চা'ল হতে ধান সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না।

শ্রীযুক্ত বর্মা বলেন, এই ত্রুটির জন্যে চা'লকে ধানমুক্ত করা কঠিন হয়। ফলে পুনঃ পুনঃ ভানার

প্রয়োজন হয়। তদুপরি চা'ল বেশী ভেঙ্গে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো ভেঙ্গে তুষের সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং মোট উৎপাদনের শতকরা ৬½ ভাগ নষ্ট হয়। এই তুষ তণ্ডুলবিশিষ্ট ভুষি প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালানীরূপে অথবা পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে বহুল পরিমাণ খাদ্যের অপচয় হয়।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চা'ল থেকে ধান বেছে নেবার ব্যবস্থা করা হলে, তুষ ছাড়াবার জন্যে ধান পুনঃ পুনঃ ভানবার প্রয়োজন হয় না। তাতে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে না। বিভিন্ন চা'ল-কলের জন্যে ধান স্বতন্ত্রকারী পদ্ধতি নির্বাচনের সময় এদের এঞ্জিনিয়ারিং খুঁটিনাটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধান স্বতন্ত্রীকরণের 'রোটারী টাইপ' যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তন করতে হবে।

এই ধরণের ধান ছাড়ান কল নির্মাণের ও তা বসাবার ব্যয় ২০০০ হইতে ২৫০০ টাকার মধ্যে। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শতকরা ৬½ ভাগ বেশী চা'ল উৎপন্ন হবে। ঐ অতিরিক্ত চাউলের মূল্য আনুমানিক প্রায় ৬৮ কোটি টাকা। তিন চার মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনাণুযায়ী কাজ আরম্ভ হতে পারে।

পরিষদের কথা

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসুবোধনাথ বাগচী মহাশয় উচ্চ শিক্ষার জন্য গত ৭ই অক্টোবর '৪৯ তারিখ ইউরোপ যাত্রা করেছেন। হল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তিনি ব্যাবহারিক রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করবেন। পরিষদের প্রারম্ভিক কাল হতে ডাঃ বাগচী যেরূপ উৎসাহ ও পরিশ্রম করে পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন তাতে পরিষদের পক্ষ হতে আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ও উচ্চশিক্ষার জন্যে আমেরিকায় গিয়াছেন। আমরা আশা করি, বিদেশে সাফল্য লাভ করে প্রত্যাবর্তনের পরে আমরা তাঁদের পুনরায় পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পাব।

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী মহাশয় পরিষদের কর্মসচিবের পদ ত্যাগ করায় কার্যকরী সমিতির গত ২০শে অক্টোবর তারিখের অধিবেশনে তাহার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় এবং শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের কর্মসচিবের পদে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হয়েছেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার কল্পে পরিষদের সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আবেদনে গত ফেব্রুয়ারি '৪৯ মাসের পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নোক্ত দান পাওয়া গেছে। ধন্যবাদের সহিত এই সকল দানের প্রাপ্তি স্বীকার করছি—

শ্রীঅরবিন্দকুমার দত্ত ১০৲ শ্রীপি, সি, চ্যাটার্জী ১০০৲ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জী ৫১৲ শ্রীদীপেনকুমার বসু ৪৲ শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী ৫০৲ শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউসন ১০০৲ শ্রীহৃষীকেশ রায় ৫৲ ছাত্রী সমিতি, শিলঙ্ গভর্ণমেণ্ট গার্ল হাইস্কুল ১৲ শ্রীতুলাল দাস ১৲ শ্রীপ্রফুল্লকুমার চ্যাটার্জী ২৫০৲ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যালকাটা কেমিক্যাল—জুলাই '৪৯ হইতে মাসিক ১০০৲ শ্রীএম, মাক্ষ ৫০০৲ শ্রীদ্বিজদাস মজুমদার ১০৲ শ্রীযুত ঘুটঘুটিয়া ৫০০৲ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৲ শ্রীষষ্ঠীরাম নন্দী ১০৲ শ্রী পি, সি, সিংহ ২৫৲ শ্রীশ্যামাপদ সাহু ২৲।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ নবেম্বর—১৯৪৯ একাদশ সংখ্যা

জার্মানিতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি এবং ভারতে ঐ শিল্পের অবনতির কারণ অনুসন্ধান

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

রঞ্জক পদার্থ, সংশ্লেষণ সম্ভূত ঔষধপত্র (Synthetic drugs), বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি জৈব রসায়নশাস্ত্র বা অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির উপর প্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানিতে লিবিগ, হফমান, কেকুলে, বেয়ার, এমিলফিশার প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাবে জৈব রসায়নশাস্ত্রের অভূতপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়। এই সব প্রথিতযশা অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভ করে অনেক শক্তিশালী কেমিষ্টই জার্মানিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কারখানা খুলে প্রধানতঃ রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুতি ও ব্যবসায় চালাতে থাকলেও এঁরা মৌলিক গবেষণায় বিরত হন নি, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকগণের সঙ্গে সর্বদা প্রগাঢ় যোগসূত্র রক্ষা করেই এঁরা চলতেন এবং তাঁদের মৌলিক গবেষণার ধারায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি সাধন করতেন। কারখানার যে সকল খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ এই নীতি অনুসরণ করতেন তাঁদের মধ্যে হাইনরিখ কারোর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারো একাধারে প্রতিভাবান্ গবেষক ও সুলেখক ছিলেন, তদ্ভিন্ন কারখানা স্থাপন ও তার সুপরিচালনার জন্যেও তাঁর দক্ষতার সীমা ছিল না। অধ্যাপক বেয়ারের ল্যাবরেটরিতে প্রথম কৃত্রিম নীল তৈরির যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, উচ্ছ্বসিতভাবে একখানি চিঠিতে তিনি তাহা কারোকে জানান। বলা বাহুল্য, ঐ পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্বক কারো লুডভিগসহাফেনের বাডিশে অ্যানিলিন সোডা ফাব্রিকে শীঘ্রই উহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক বেয়ারের অন্যতম কৃতী ছাত্র গ্রেবে যখন অ্যালিজারিন নামক উদ্ভিজ্জ রঞ্জক পদার্থ, আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত অ্যানথ্রাসিন থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের পন্থা আবিষ্কার করেন, তখন উহার প্রস্তুতির ভারও লন কারো—তাঁর বাডিশে কারখানাতে। অ্যালি-জারিনের উৎপাদন এত লাভজনক হয় যে, ১৮৮১ সালে এক বৎসরেই বাডিশে কারখানা উহা থেকে দেড় কোটি টাকা লাভ করেন। জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণা দেশের অর্থাগমে

কিরূপ বিপুলভাবে সহায়তা করে—এই একটিমাত্র উদাহরণেই তা বুঝা যায়।

আমরা রাসায়নিকগণের জীবনী পাঠে দেখতে পাই লিবিগ, কেকুলে প্রভৃতি মনীষীর জন্মস্থান ডারমষ্টাট শহরে। আর হফমানের প্রিয় ছাত্র ছিলেন জর্জ মার্ক—যিনি ডারমষ্টাটের মার্ক কারখানাকে নূতন নূতন গবেষণা দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কের রাসায়নিক শিল্পের প্রাচীনত্ব ও বিরাটত্ব সম্বন্ধে সমগ্র জগৎ পরিচিত। যশস্বী রসায়নবিদগণের চিন্তাধারা ও গবেষণার ফল এই কারখানার গৌরববর্ধনে কতদূর সাহায্য করেছে তা সহজেই অনুমেয়।

তারপর এই সব কারখানার কর্তৃপক্ষের চরিত্রবল, ব্যবসায় বুদ্ধি, শ্রমশীলতা এবং হৃদয়বত্তা এত বেশী ছিল যে, তাঁদের অপক্ষপাত মধুর ব্যবহারে কারখানার সামান্য কর্মী থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে, একান্তভাবে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন কারখানার মঙ্গল সাধনে।

হাইনরিখ কারোর পুস্তকে (Development of Coaltar colour Industry—translated from German to English by S. P. Sen & H. G. Biswas) দেখতে পাই কি সুন্দর সুন্দর বাগান সংযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল কারখানার কর্মীদের জন্যে। ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, স্কুল, ক্লাব, সমবায় সমিতির দোকান প্রভৃতিও কারখানার কর্তৃপক্ষই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বার্ধক্য ও ব্যাধির জন্যে কর্তৃপক্ষ ইনসিওরের ব্যবস্থা করতেন। ফলতঃ গভর্ণমেণ্টের আইন করে কারখানার কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হয় নি কোনও ব্যাপারে। কারখানার কর্মীদের অসহায় বিধবা, নাবালক পুত্র-কন্যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করা হতো কোম্পানি থেকেই। কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের সুবিধা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যেই কর্মী ও কর্মচারীদের সর্বপ্রকারে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজেদের উন্নতমন ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন।

গত নভেম্বর মাসে ডারমষ্টাটে মার্কের কারখানা পরিদর্শনকালে শ্রীযুক্ত ফিচে বললেন—তাঁদের কারখানার লোকদেরও অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয়। এঁদের কলোনিতে ঘর খালি না থাকলে কোম্পানির খরিদী জমি স্বল্পমূল্যে বিলি করে এবং নামমাত্র সুদে টাকা ধার দিয়ে কর্মীদের নিজেদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। মার্ক পরিবারের মুক্তহস্ত দানে গঠিত ফাণ্ড থেকে অর্থ সাহায্য করে অসুস্থ কর্মীদের বায়ুপরিবর্তনের ব্যয়ভার বহন করা হয়ে থাকে। মার্কের কারখানায় (জার্মানির অপর বড় বড় কারখানাতেও) বার্ধক্যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে। ৬৫ বৎসর বয়স অবসর গ্রহণের সময়। বড়দিনের সময় কারখানার সকলকেই বোনাস দেওয়া হয়। কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখবার ও মেলামেশার সুবিধার জন্যে কোম্পানির ভাল খেলার বিভাগ আছে—অর্কেস্ট্রা এবং গানের দলেরও সুনাম আছে। প্রায়ই বিভাগীয় এবং মাঝে মাঝে সমস্ত কারখানার লোকের সমবেত প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে ছোট বড় সকলেই অবাধে পরস্পর মেলামেশা করতে পারে এবং কারখানাকে একটি পরিবারের মত ভাবতে শেখে। Kraft durch Freude—বা আনন্দের সহিত শারীরিক শক্তির বিনিয়োগ জার্মান চরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা ও রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। জ্ঞান ও কর্মযোগী, সর্বত্যাগী আচার্য্য রায়ের আবির্ভাব ভারতবর্ষের পক্ষে এক মহা সৌভাগ্যের দ্যোতক।

কিন্তু আজ জার্মান রাসায়নিক শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে একথা স্বতই মনে আসে

যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত 'হিমালয়ান' ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী যদি ঐ সময়ে এডিনবরার অধ্যাপক ক্রামব্রাউনের কাছে না গিয়ে জার্মানিতে বেয়ার, এমিলফিশার বা হফমানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষা লাভ করতে যেতেন তবে আজ আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত—অত্যাবশ্যক ঔষধপত্র, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতির জন্যে আজ আমাদিগকে বিদেশীর মুখের দিকে আর চেয়ে থাকতে হতো না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও তাহলে আজ সত্যিকারের রসায়নবিদ্ ও শিল্পবিদ্ আরও অধিক সংখ্যায় আমরা দেখতে পেতাম। তারপর আচার্য রায় যে সময় বিলাতে শিক্ষার্থে যান ঐ সময় বিলাতের মেধাবী উচ্চাভিলাষী রসায়নের ছাত্রমাত্রেই জার্মানিতেই ঐ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ণধারগণ যদি অতীতের ঐ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি নিরোধে কৃতসংকল্প হন, যদি সত্যিকারের দেশকল্যাণ যথার্থই তাঁদের কাম্য হয়, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী ছাত্রদের সকলকেই মার্কিন মুলুক বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্মানিতে বা জার্মানির দিকপাল রসায়নবিদ্‌গণের পদাঙ্ক অনুসরণে আজ যেখানে পুরাদমে রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর চর্চা অবাধ গতিতে চলেছে—সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক রুজিকা ও কারারের ল্যাবরেটরিতে পাঠালে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানে দেশ সত্যসত্যই ধন্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। সকলেই জানেন আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, এমন কি ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি যেরূপ উন্নতস্তরে উঠেছে—সে তুলনায় জৈব রসায়ন বা অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি বড়ই পিছনে পড়ে আছে। অথচ শেষোক্ত শাস্ত্রই আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। এর কারণ অনুসন্ধানকালে দেখা যায়, বহুশতাব্দী যাবৎ আমাদের সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে মস্তিষ্ক চালনার এবং মননশক্তির যেরূপ অনুশীলন হয়েছে, হাতের কাজের অভ্যাস থেকে তাঁরা সেই পরিমাণে দূরে আছেন। বিজ্ঞানের যে সব বিভাগে ভারতীয়েরা জগৎবিখ্যাত হয়েছেন সেগুলির অনুশীলনে হাতের কাজ যারপর নাই কম দরকার; পরন্তু অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির উচ্চতর গবেষণায় মানসিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজের নিপুণতা সমভাবে প্রয়োজনীয়। জার্মান রসায়নবিদ্‌গণের জীবনী পাঠে দেখতে পাই তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন—কারিগর ও কৃষক পরিবার থেকে—যাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে হাতের কাজের দক্ষতা বিকাশ লাভ করেছে।

আজ স্বাধীন ভারতে জৈব রসায়নের উচ্চতর গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং রাসায়নিক শিল্পের প্রগতিসাধন যদি সত্য সত্যই আমাদের আন্তরিক লক্ষ্য হয় তবে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার দরকার। এখন ছেলে মেয়েদের লিখন পঠন শিক্ষাদানের সঙ্গে তাদের হাতের কাজের শিক্ষা দিবারও সুযোগ দিতে হবে। তদ্ভিন্ন ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা কৃষক এবং কারিগর শ্রেণীর এতাবৎ অন্ধকার গৃহও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্‌ভাসিত করে তুলতে হবে। কোটিকে গুটিকয়েক হলেও তাদের মধ্যেই হয়ত আমরা লিবিগ, পিটার গ্রিস বা হাইনরিখ কারোর মত প্রতিভার আবির্ভাব দেখতে পাব। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগও দিতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার ক্রমোন্নতি সাধনের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাদানের সম্যক ব্যবস্থা করাও সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বর্জিত ক্ষুদ্র দেশপ্রেমিকতার উচ্ছল ভাবাবেগে ভাষা সম্বন্ধে একগুঁয়েমি দেখাতে গেলে আমরা আখেরে জগৎসভায় শেষ বেঞ্চের স্থানও যে দাবী করতে পারব না, এই রূঢ় সত্য রাজনীতিকগণ সম্যক উপলব্ধি করলেই আমার বহুবর্ষব্যাপী রসায়নশাস্ত্র ও রাসায়নিক শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং গত শীতকালে জার্মানির শিক্ষায়তন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

শিল্পে সীসার ব্যবহার

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় বলে, ভারী যেন সীসা। ওজন সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও সীসার গুণ সম্বন্ধেও কথাটা খাটে। প্রকৃতপক্ষে সীসা ওজনে যেমন ভারী, গুণেও তেমনি ভারী; কিন্তু দামে আবার তেমনি সস্তা এবং এত বহু-ব্যবহৃত ধাতু আর একটিও দেখা যায় না। যুদ্ধের পূর্বেই সীসা নানাবিধ শিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন গবেষণার ফলে ইহার প্রয়োগ নব নব ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রসারিত হইয়াছে। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক মিশ্রধাতুও তৈয়ারী হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, শান্তির সময়ে তাহাই আবার মনুষ্যের কল্যাণ ও সুখসমৃদ্ধির নব নব দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবে। শিল্প ছাড়া ঔষধের ক্ষেত্রেও সীসার ব্যবহার আছে। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার গুলাউস্ লোসন্ (Basic Acetate of Lead)—যাহা ভাঙ্গা, মচকান প্রভৃতি ব্যথ্যায় ব্যবহার করা হয়—সীসা হইতে প্রস্তুত। অবশ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সীসার শিল্পে ব্যবহারের দিকটাই মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে।

সীসার ব্যবহারিক ধর্ম: সীসা বিবিধ গুণের আকর। এই সকল গুণের সুবিধা লইয়া সীসাকে বিবিধ প্রয়োজনে লাগানো হইয়াছে। শিল্প ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মোট যে পরিমাণ সীসার দরকার হয় তাহার শতকরা ১০ ভাগ ব্যবহৃত হয় শুধু ওজনে ইহা খুব ভারী বলিয়া। শতকরা ৩০ ভাগের ব্যবহার নির্ভর করে ইহার নমনীয়তা, ক্ষয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা ও বিভিন্ন কাজে লাগিবার গুণের উপর। আর শতকরা ২৪ ভাগ ব্যবহৃত হয়—মিশ্র-ধাতুরূপে উহাদের সঙ্কোচক গুণ, অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে গলিয়া যাওয়া এবং চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতার উপর। শতকরা অপর ৩৩ ভাগ ব্যবহৃত হয় নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থরূপে রূপান্তরিত হইয়া।

সীসা সম আয়তনের জল অপেক্ষা ১১·৩৪ গুণ, সম-আয়তনের লোহা অপেক্ষা ১·৫ গুণ এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম অপেক্ষা ৬·৫ গুণ ভারী। এই আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্যই সীসা বন্দুকের গুলি, ছররা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সীসা প্রায় ৬২৬ ডিগ্রি (ফারেন্‌হাইট্) তাপ মানে গলিয়া যায়। ইহা হইতে প্রস্তুত কতিপয় মিশ্রধাতু ইহা অপেক্ষা অনেক কম উত্তাপে অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ ডিগ্রি তাপমানে গলে। সেই জন্য এই সকল মিশ্রধাতু ঝালাই কাজে, ছাঁচ, ছাপার হরফ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সীসার সহিত অ্যান্টিমনি অথবা ক্যাল্‌সিয়াম ধাতু সংযোগে প্রস্তুত মিশ্রধাতুর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহার উপর সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। এই মিশ্রধাতু ক্ষয় উৎপাদনকারী সাল্‌ফেট সমূহেরও ক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। সেই জন্য ইহা ষ্টোরেজ ব্যাটারী তৈয়ারী করিবার জন্য এবং সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের কারখানায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সাগর গর্ভস্থ টেলিগ্রাফ তারের খাপ, জলবাহী নল এবং ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারোপযোগী ক্ষয়রোধক বিশেষ বিশেষ পাত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সীসার আর একটি ব্যবহারিক গুণ এই যে, ইহাকে পিটাইয়া চ্যাপ্‌টা পাতে পরিণত করা যায় কিংবা তারের মত সরু ও লম্বা করা যায়। সেই

জন্য সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিবার কার-খানার প্রকোষ্ঠ নির্মাণ, কিংবা টুথ্‌পেষ্ট ভরিবার টিউব, অথবা চওড়া পাত দিয়া বড় বড় ট্যাঙ্ক মুড়িবার জন্য ইহা ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার আর একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, এক্স-রে কিংবা রেডিয়াম রশ্মির গতি ইহা প্রতিরোধ করিতে পারে; অর্থাৎ পুরু সীসার পাত ভেদ করিয়া এই সকল রশ্মি বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সেই-জন্য যে সকল প্রকোষ্ঠে এই প্রকার রশ্মি লইয়া কাজ করা হয় তাহার দরজা, জানালা ও দেয়াল সীসার পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হয়। দেখা গিয়াছে যে, এক মিলিমিটার পুরু সীসার পাত ৭৫ কিলোভোল্ট শক্তির এক্স-রে শোষণ করিয়া লইতে পারে এবং ৩৪ মিলিমিটার অর্থাৎ প্রায় ১·৩ ইঞ্চি পুরু সীসার পাত দ্বারা ৬০০ কিলোভোল্ট শক্তির রশ্মি অনায়াসেই নিবারিত হয়।

রঞ্জন ও অন্যান্য শিল্পে সীসার ব্যবহার: সীসা হইতে প্রস্তুত নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সাদা রঙের লেড কার্বনেট (সফেদা) ও সাল্‌ফেট রঞ্জন-শিল্পে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে যে সাদা রং প্রস্তুত হয় তাহা দরজা জানালা ও কড়ি-বরগায় লাগাইবার কাজে বেশী দরকার হয়। মুদ্রাশঙ্খ (litharge), রেড লেড্‌ প্রভৃতি সীসার অক্‌সাইড বর্গ (অর্থাৎ সীসার সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত পদার্থসমূহ) রঞ্জন-শিল্প, ষ্টোরেজ ব্যাটারী, কীট-পতঙ্গাদি নষ্ট করিবার জন্য কলাইকরা বাসন প্রস্তুতের কারখানায়, তৈল শোধন-শিল্পে, কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহারে লাগিতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে সীসাজাত রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পে শুধু সীসার কিরূপ চাহিদা ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধের সময়ে ইহার চাহিদা আরও বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

ষ্টোরেজ ব্যাটারীর জন্য ১৯৮,০০০ টন; সমুদ্র গর্ভস্থ ইলেক্‌ট্রিক তারের আস্তরণের জন্য ৭৪,৪০০ টন; ইমারত ও কারখানা প্রস্তুত শিল্পে ৫০,০০০ টন; যুদ্ধোপকরণের জন্য (গোলাগুলি প্রভৃতি) ৪২,৩০০ টন; সীসার পাত প্রস্তুতের জন্য ২১,৮০০ টন; ঝালাই করিবার জন্য ২০,০০০ টন; জাহাজাদি মেরামত কার্যে ১৬,০০০ টন; ছাপার হরফ প্রস্তুতের জন্য ১৪,০০০ টন; বিয়ারিং প্রস্তুতের জন্য ১২,৮০০ টন; মোটরগাড়ী প্রস্তুত শিল্পে ৮৯০০ টন; সীসার মিশ্রধাতু দ্বারা লোহার পাত মুড়িবার জন্য ৬০০০ টন; অন্যান্য প্রয়োজনে ৬৩,১০০ টন।

সীসার মিশ্রধাতু: যুদ্ধের সময়ে সীসা অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা সহজলভ্য থাকায় প্রয়োজনের তাগিদে ইহার দ্বারা ব্যবহারোপযোগী নানা উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফলে অন্যান্য ধাতুর তুলনায় সীসার ব্যবহার বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে নানাবিধ শিল্পে সীসার ব্যবহার হইত বটে; কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে ইহার ব্যবহার ও প্রয়োগ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সীসা ও সীসা হইতে প্রস্তুত মিশ্রধাতুর নূতন প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—দরজার উপর নাম লিখিবার ফলকরূপে এবং শৌচাগার ও স্নানের ঘরের মেজে প্রস্তুত করিবার জন্য অধুনা পিতলের পরিবর্তে সীসার মিশ্রধাতু ব্যবহৃত হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে বিশুষ্ক খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা বর্তমানে একটি শিল্পে পরিণত হইয়াছে। এই সকল খাদ্যদ্রব্য বিদেশে চালান দিবার জন্য বায়ু ও জল নিরোধক সীসার পাতের মোড়কে ভরিয়া রাখা হয়। এইভাবে সিগারেট, চা, দেশলাই, ঔষধপত্র, ব্যাণ্ডেজ, বন্দুক-বারুদ প্রভৃতির মোড়করূপে সীসার পাতের ব্যবহার এখন বিশেষ প্রচলিত।

গ্যালভ্যানাইজ কার্যে সীসা: যুদ্ধের সময়ে সীসার যে সকল প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে আস্তরণ বা প্রলেপরূপে সীসার ব্যবহার অন্যতম। অধুনা ইস্পাত ও লোহার পাতের উপর

সীসার আস্তরণ খুব প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গ্যাল্ভ্যানাইজ করা লোহা বা ইস্পাতের প্রচলনই খুব বেশী। উত্তাপ দ্বারা গলানো তরল দস্তার ভিতর লোহার পাত ডুবাইয়া লইলে তাহা গ্যাল্-ভ্যানাইজ করা হয়। এই দস্তা লাগানো লোহার উপকারিতা এই যে, ইহাতে সহসা মরিচা ধরে না। লোহাতে অনুরূপ ভাবে সীসার প্রলেপ লাগাইয়া লইলেও উহা দস্তা দিয়া গ্যাল্ভ্যানাইজ করার মতই কাযকরী হয়। এমন কি, তাহার স্থায়িত্ব আরও বেশী দেখা যায়। এইরূপ সীসার আস্তরণের আর একটা সুবিধা এই যে, রং ধরাইবার পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী।

সীসার ঝালাই

কোন ধাতুর দুইটি অংশে জোড় দিতে হইলে রাং-ঝালাই করা হইল প্রচলিত ব্যবস্থা। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন ঝালাই করিবার ধাতুর অভাব ঘটিল তখন অনন্যোপায় হইয়া দুইটি সীসার খণ্ডকে উত্তপ্ত করিয়া জোড় দিতে চেষ্টা করিয়া দেখা গেল যে, কোন প্রকার ঝালাই ব্যবহার না করিয়াও বেশ স্থায়ীভাবে উহাদের জোড় লাগিয়া গিয়াছে। বর্তমানে সীসার জোড় লাগাইবার জন্য আর অন্য ঝালাইয়ের প্রয়োজন হয় না; তাহাতে খরচাও অনেক বাঁচিয়া যায়। এই আবিষ্কারও বিগত যুদ্ধের অন্যতম দান।

প্ল্যাষ্টিক শিল্পে সীসা

আজকাল প্ল্যাষ্টিকের তৈয়ারী নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীর প্রচলন হইয়াছে। প্ল্যাষ্টিকের এই সকল বিবিধ ছাচ প্রস্তুত করিবার জন্য সীসার প্রয়োজন হয় খুব বেশী। সীসার ছাঁচে প্ল্যাষ্টিকের নমুনার অতি সূক্ষ্ম অংশেরও ছাপ পড়ে। সীসা এত নরম ধাতু যে, ছাঁচে ঢালাই করিবার পক্ষে ইহা যেমন সুবিধাজনক তেমনি আবার তরল প্ল্যাষ্টিক যখন সেই ছাঁচে ফেলা হয় তখন নমুনার আকৃতি সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে তাহাতে মুদ্রিত হইবার পক্ষেও সমধিক উপযোগী।

প্ল্যাষ্টিক যে নমুনায় তৈয়ারী হইবে প্রথমে ঠিক তদনুযায়ী ইস্পাতের একটি নমুনা প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা গলানো তরল সীসার মধ্যে অতিদ্রুত ডুবাইয়া তুলিয়া লওয়া হয়। ঠাণ্ডা পাইয়া সীসার একটা পাতলা আস্তরণ ইস্পাতের নমুনার গায়ে লাগিয়া যায়। জলের ভিতরে পরে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া সীসার পাতলা ছাঁচটি ধীরে ধীরে ইস্পাত হইতে খসাইয়া লওয়া হয়। এই ভাবে সীসার যে ছাঁচ প্রস্তুত হয় তাহার ভিতরে তরল প্ল্যাষ্টিক ঢালিয়া নানাবিধ সৌখীন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বর্তমানে প্রস্তুত হইতেছে।

ইহা ছাড়া বিজ্ঞানীরা সীসাকে শিল্পে প্রয়োগ করিবার আরও অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজন ও সভ্যতার বাহনরূপে সীসার বহুল ব্যবহার ও প্রয়োগ যে অধিকতর সার্থক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ণালী-বৈচিত্র্য ও তাহার কার্যকারিতা

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার আইজাক নিউটন সূর্যের শ্বেত আলোক রশ্মিকে একটি কাঁচের প্রিজমের ভিতর পাঠিয়ে দেখতে পেলেন যে, রশ্মিটি সাতটি বিভিন্ন রঙের রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই রং গুলো যথাক্রমে বেগুনি, ঘন নীল, নীল, সবুজ, পীত, নারঙ্গ এবং লাল। এই ব্যাপারটিকে পরে আলোকের বিচ্ছুরণ এবং এই বর্ণমালাকে বর্ণালী নাম দেওয়া হয়। নিউটন আরো লক্ষ্য করলেন যে, বিভিন্ন রঙের রশ্মি বিভিন্ন পরিমাণ প্রতিফলিত হয়েছে—লাল রশ্মি সব চাইতে কম এবং বেগুনি রশ্মি সব চাইতে বেশী। সূর্যরশ্মির বদলে যদি কোন প্রজ্বলিত কঠিন বা তরল পদার্থ হতে উদ্ভূত সাদা আলোক রশ্মিকে ব্যবহার করা যায়। তাহলেও একই ফল পাওয়া যাবে। পরে দেখা গেল যে, সূর্যরশ্মি এই যে বর্ণালী তৈরী করে এটাই সব নয়—এই বর্ণালীর দু-পাশে আরো বিস্তৃত বর্ণালী আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সেজন্যে যে বর্ণালীটুকু আমরা চোখে দেখতে পাই তাকে আমরা দৃশ্যমান বর্ণালী বলি। দৃশ্যমান বর্ণালীর লাল অংশের পরে যে বর্ণালী বিস্তৃত হয়ে আছে তার নাম অবলোহিত বা ইনফ্রা রেড। বেগুনি অংশের পরে যে বর্ণালী তার নাম অতি-বেগুনি বা আলট্রা ভায়োলেট। বলা বাহুল্য আলো আর কিছুই নয়, তরঙ্গ সমষ্টি। কাজেই অবলোহিত বা অতি-বেগুনি আলোও তরঙ্গ। তফাৎ এই যে, অবলোহিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশী এবং অতি-বেগুনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব ছোট। অবলোহিত তরঙ্গের চাইতেও দীর্ঘ তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গ বলা হয়। আবার অতি-বেগুনি তরঙ্গের চাইতেও ছোট তরঙ্গ আছে যাদের নাম রঞ্জেন-রশ্মি ও গামারশ্মি। আগেই রয়েছে বর্ণালীর অবলোহিত বা অতি-বেগুনি অংশ, যা আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে। কাজেই এবিষয়ে পর্যালোচনা করতে হলে এদের তাপশক্তি অথবা রাসায়নিক শক্তির বিচার করতে হবে। ১৮০০ সালে উইলিয়াম হার্শেল এবং ১৮০১ সালে রিটার যথাক্রমে অবলোহিত এবং অতি-বেগুনি বর্ণালী আবিষ্কার করেন। সূর্য থেকে বিকিরিত অতি-বেগুনি রশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে খুব উপকারী; যদিও পরিমাণ বেশী হলে আশঙ্কার কারণ আছে।

কোন গ্যাস অথবা বায়বীয় পদার্থ যে বর্ণালী সৃষ্টি করে তা কিন্তু এথেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। এই বর্ণালী কতকগুলো রেখার সমষ্টি এবং যে কোন মৌলিক পদার্থের বাষ্পের বেলায় এই রেখাগুলোর পারস্পরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এই রেখাগুলো যে কোন একটি বিশেষ মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য। গ্যাসের বেলায়ও এই ব্যাপার ঘটে।

বিভিন্ন স্বপ্রভ পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিকে প্রিজমের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দু-রকম বিভিন্ন বর্ণালীর খোঁজ পাওয়া গেছে। এদের নাম (১) বিকিরণ বর্ণালী বা এমিশন্ স্পেক্ট্রাম এবং (২) শোষণ বর্ণালী বা অ্যাব্সরপ্সন স্পেক্ট্রাম। প্রজ্বলিত কঠিন পদার্থ থেকে যে বর্ণালীর সৃষ্টি হয় তাকেই বিকিরণ বর্ণালী বলা হয়। এই বিকিরণ বর্ণালীও আবার দু-রকম হতে পারে যথা—ধারাবাহিক অথবা রেখা বর্ণালী। প্রজ্বলিত কঠিন পদার্থ, যেমন বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট

কিংবা বৈদ্যুতিক আর্ক—এই ধরণের ধারাবাহিক বর্ণালী সৃষ্টি করে। প্রজ্জলিত তরল পদার্থও এই একই রকম বর্ণালী তৈরী করে। কিন্তু প্রজ্জলিত গ্যাস অথবা বায়বীয় পদার্থ থেকে যে বর্ণালীর উদ্ভব হয় সেটা কয়েকটা উজ্জ্বল রেখার সমষ্টি। এই ধরণের বর্ণালীকেই রেখা বর্ণালী বলা হয়। এই রেখাগুলোর রং, যে মৌলিক পদার্থের গ্যাস থেকে রেখাগুলো তৈরী হয়েছে তারই বৈশিষ্ট্য সুচনা করে। মৌলিক পদার্থের প্রকৃতি নিরূপণে এবং তাদের পারমাণবিক গঠনপ্রণালীর চর্চায় এই বর্ণালী অভূতপূর্ব্ব সাফল্য দেখিয়েছে।

যদি শ্বেত আলোক রশ্মির পথে কোন স্বচ্ছ পদার্থ ধরা যায়, যেটা রশ্মির কয়েকটা উপাদানকে শোষণ করে নিতে পারে, তাহলে যে বর্ণালী সৃষ্টি হয় তাতে কয়েকটি রঙের অভাব দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধরণের বর্ণালীকে শোষণ বর্ণালী বলা হয়। শোষণ বর্ণালীকেও আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—কালো-রেখা বর্ণালী বা ডার্ক লাইন স্পেক্ট্রাম এবং কাল-পটি বর্ণালী বা ডার্ক ব্যাণ্ড স্পেক্ট্রাম। কোন উত্তপ্ত পদার্থ থেকে নির্গত শ্বেত আলোক রশ্মিকে যদি কোন ঠাণ্ডা বাষ্পের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয় তাহলে ঐ বাষ্প শ্বেত আলোক রশ্মি থেকে ঠিক সেই সেই উপাদানগুলো শোষণ করে নেবে, যেগুলো নিজেরাই বিকিরণ করত প্রজ্জলিত অবস্থায়। কাজেই যে বর্ণালী এতে সৃষ্টি হবে তা ধারাবাহিক হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু মাঝে মাঝে কালো রেখা থাকবে। বাষ্পের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে ওগুলো শোষিত হয়েছে। সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট বর্ণালী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার যদি পথের মাঝখানে কোন লাল রঙের কাঁচ রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শুধু লাল এবং খানিকটা নারঙ্গ আলো বেরিয়ে এসেছে—বর্ণালীর বাকী অংশটা কালো হয়ে আছে। একেই বলা হয় কালো-পটি অথবা শোষণ-পটি বর্ণালী।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, প্রজ্জলিত অবস্থায় যে কোন মৌলিক পদার্থ তার বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণালী সৃষ্টি করে এবং এই বর্ণালী এমন কতকগুলো রেখার সমষ্টি যেগুলো অন্য কোন মৌলিক পদার্থের বর্ণালী রেখা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাজেই বিশেষ বিশেষ বর্ণালী দেখে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে চিনে ফেলা খুবই সহজ। এই প্রক্রিয়া এমনই সূক্ষ্ম যে, যদিও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ একই রঙের সৃষ্টি করে তাহলেও ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তারা বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যেহেতু প্রায় সব পরিচিত মৌলিক পদার্থের বর্ণালী জানা আছে, সেহেতু তাথেকে কোন অপরিচিত পদার্থে কি কি মৌলিক পদার্থ বর্তমান তার বর্ণালী বিচার করে সহজেই তা বলা যেতে পারে।

সাধারণভাবে সাদা জিনিস বলতে আমরা তাকেই বুঝি, যে সবরকম রশ্মিকে প্রতিফলিত করতে পারে এবং কালো জিনিস তাকেই বলি, যে সবরকম রশ্মিকে শোষণ করে নিতে পারে। এই সাদা এবং কালোর ভিতর বহুরকম রঙের জিনিস বর্তমান এবং এদের রং নির্ভর করবে এদের নির্বাচিত শোষণ অর্থাৎ 'সিলেক্‌টিভ্‌ অ্যাবসর্‌প্‌সন' এবং প্রতিফলনের ওপর। এই কারণেই সোনার রং পীতবর্ণ; কারণ লাল, সবুজ, নীল প্রভৃতি সব রশ্মিকেই সোনা শোষণ করে নেয়, শুধু পীতবর্ণের রশ্মিকে প্রতিফলিত করে। খুব পাত্‌লা সোনার পাতকে যদি তার ভিতর থেকে আগত আলো দিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহলে তার রং সবুজ বলে মনে হবে। আবার রূপার সাল্‌ফেট গোলা জলের রং নীল; কারণ সাদা রঙের রশ্মির অন্য সব রং এই জল শোষণ করে নিয়ে শুধু নীল রংকে প্রতিফলিত করে।

সূর্যের বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালী সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। সূর্যের বর্ণালী যদি ভালরূপ পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সমস্ত

বর্ণালীতে কালো কালো দাগ আছে। এই কালো দাগগুলো প্রথম লক্ষ্য করেন ফ্রানহোফার এবং তিনি এর ধারাবাহিক পর্যালোচনা করে ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে এদের নামকরণ করেন। এজন্যে এই লাইনগুলোকে ফ্রানহোফার লাইন বলা হয়। ১৮৬১ সালে বুন্‌সেন এবং কার্কফ্ সর্বপ্রথম এই ফ্রানহোফার লাইনের ব্যাখ্যা করলেন। এটা অনুমান করা হলো যে, সূর্যের কেন্দ্রস্থলে শ্বেতউত্তপ্ত কঠিন পদার্থ অথবা তরল পদার্থ বর্তমান আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ফটোস্ফিয়ার। এই ফটোস্ফিয়ারকে ঘিরে আছে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়া যার নামকরণ হয়েছে ক্রমোস্ফিয়ার। এই ক্রমোস্ফিয়ারে পৃথিবীতে অবস্থিত প্রায় সব-প্রকার মৌলিক পদার্থ, যথা—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বাষ্প বর্তমান। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মৌলিক পদার্থের বাষ্প ঠিক সেই সেই আলোক তরঙ্গকে শোষণ করবে যেগুলো তারা নিজেরা প্রজ্বলিত অবস্থায় বিকিরণ করতে পারে। কাজেই বুন্‌সেন ও কার্কফের মতে, শ্বেত সূর্যালোক যখন বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বাষ্পের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন ওই বাষ্প শ্বেত-আলোক রশ্মি থেকে ঠিক ঠিক সেই আলোক তরঙ্গকে শোষণ করে নেয়, যাদের ওই মৌলিক পদার্থগুলো প্রজ্বলিত অবস্থায় বিকিরণ করে। কাজেই সূর্যের বর্ণালীতে কালো রেখার অবস্থান এই বোঝায় যে, সূর্যের আবহাওয়াতে কিছু না কিছু মৌলিক পদার্থ বর্তমান আছে। এভাবে পরীক্ষা করে সূর্যের ভিতর হাইড্রোজেন, লোহা, ক্যাল-সিয়াম ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

প্রায় সব স্থির নক্ষত্রের বর্ণালী সূর্যের বর্ণালীর মত, অর্থাৎ উজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিতে কালো রেখা বর্ণালী। কতগুলো আকাশচারী পদার্থ আছে, যেমন নীহারিকা, যেগুলো অল্প সংখ্যক উজ্জ্বল রেখার বিকিরণ বর্ণালী সৃষ্টি করে। এথেকে অনুমান করা যায় যে, এই পদার্থগুলো সম্পূর্ণ গ্যাসের তৈরী এবং সম্ভবতঃ খুব অল্প চাপে এই গ্যাসগুলো বর্তমান।

পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বর্ণালীর কার্যকারিতা অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে সমর্থ হয়েছেন এবং বহু নতুন মৌলিক পদার্থ, যথা—হিলিয়াম সিজিয়াম, রুবিডিয়াম প্রভৃতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন কি—সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু প্রভৃতি দূর আকাশচারীদের গঠন-তাৎপর্য সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করতে সাহসী হয়েছেন। এই বর্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতি এতই সূক্ষ্ম যে যদি এদ্বারা কোন পদার্থে, ·০০০০০০৫ মিলি-গ্র্যামের একভাগ কোন মৌলিক পদার্থ বর্তমান থাকে তাহলেও তাকে চিনে ফেলতে পারা যায়।

ডিকুমারল

শ্রীঅনিতা মুখোপাধ্যায়

পেন্সিল কাটতে গিয়ে হঠাৎ ব্লেডটা গেল আঙুলের মধ্যে বসে। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল মেঝেয়। দীপু তাড়াতাড়ি পেন্সিল ও ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আঙুলটা টিপে ধরলে খুব জোরে। একটু পরে ছেড়ে দিলে; দেখলে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ আঙুলের যে রক্তনালীটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়া আরম্ভ হয়েছিল তার মুখে একটু রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে তরল রক্তস্রোতের আসবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু রক্তটা জমাট বাঁধল কেন? আর যদিই বা জমাট বাঁধল তো রক্তনালীর ভিতরে জমাট না বেঁধে বাইরে আসবার পর জমাট বাঁধল কেন?

তার কারণ, রক্তে এক বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ থাকে—যা রক্তসঞ্চালন তন্ত্রের বহির্ভূত কোন কোষের সংস্পর্শে এলে থ্রম্বোকাইনেজ নামে এক জটিল যৌগিকের সৃষ্টি করে। এই থ্রম্বোকাইনেজের সঙ্গে রক্তের সংযোগ ঘটলে রক্তের কণিকাগুলো বিশ্লেষিত হয়ে ফাইব্রিন নামে এক কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই ফাইব্রিনই রক্তে এনে দেয় কাঠিন্য, যার ফলে রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

রক্তের এই জমাট বাঁধবার ক্ষমতা, জীবমাত্রের প্রতিই প্রকৃতিদেবীর একটা দান। এই জমাট বাঁধবার ক্ষমতা না থাকলে কোন রক্তনালী একবার কেটে বা ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত বন্ধ হবার কোন উপায়ই আর থাকত না।

কিন্তু প্রকৃতিদেবী যত অকৃপণ হবার চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁর কোন দানই অবিমিশ্র ভাল নয়। তাই দেখি রক্তের এই জমাট বাঁধবার ক্ষমতাও সময়ে সময়ে জীবনধারণের পক্ষে হয়ে ওঠে মারাত্মক। প্রায়ই কোন আঘাত পেলে কিম্বা কোন কঠিন অস্ত্রোপচারের ফলে রক্তনালীর ভিতরে কিছুটা রক্ত হঠাৎ জমে গিয়ে রক্তনালীর ভিতরের আবরণে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। ফলে সেই রক্তনালীর ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে রক্তাল্পতার জন্যে একটা পা কিম্বা অন্য কোন অঙ্গ (যেখানকার রক্ত সরবরাহ হয় ওই নালীটি দিয়ে) ফুলে ওঠে, পচতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হয় অঙ্গটিকে। এই জমাট-বাঁধা বাঁধটিকে বলা হয় থ্রম্বাস। কখন কখন এমনও হয় যে, ওই থ্রম্বাস থেকে কয়েকটি টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে রক্তস্রোতের সঙ্গে সারা দেহময় ঘুরে বেড়ায়। তখন তাকে বলে এম্বোলী। এই এম্বোলীর পথে কোথাও অপেক্ষাকৃত ছোট রক্তনালী পড়লে সেখানে আরও একটি থ্রম্বাস সৃষ্টি করে। যদি ভাগ্যক্রমে তা না-ও হয় তবে শেষপর্যন্ত ওই এম্বোলীটি হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে মৃত্যু ঘটায়। হৃৎপিণ্ডে না এসে যদি এম্বোলী রক্তস্রোতের ধাক্কায় ফুসফুসে গিয়ে হাজির হয় তাহলে হয় সাঙ্ঘাতিক পাল্‌মোনারি এম্বোলিজম রোগ, যা সারানো নাকি শিবেরও অসাধ্য।

তাই বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসকদের চেষ্টা ছিল এমন একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া—যা নাকি পঙ্গু করে দিতে পারবে রক্তের এই জমাট বাঁধবার ক্ষমতাকে। হয়তো আরও বহু বছর কেটে যেত এই একটা কিছুর সন্ধানে,—বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ত সংখ্যাতীত লোক,—মরতো তারও বেশী—যদি না ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারির এক দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় ম্যাসিডনের উইস্কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কার্ল

পল লিঙ্কের অফিসে এসে হাজির হতো একজন চাষা। তার চার চারটি দামী গরু মরে যাওয়ায় সে পাগলের মত হয়ে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে সত্তর মাইল গাড়ী হাঁকিয়ে চলে এসেছে বিশেষজ্ঞের কাছে, এর কারণ এবং প্রতিকারের উপায় জানতে। সে তো গরুগুলোকে sweet clover-এর বিচালী ছাড়া আর কিছুই খেতে দেয়নি! বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার জন্যে সে কয়েক বালতি রক্ত আর একটা মরা গরু আনতেও ভোলেনি। ডাঃ পলের সহকারীরা কিন্তু গরুর দেহটি না দেখেই বল্লেন—এর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। Sweet clover-এর খড়ে মাঝে মাঝে এমন একটা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে সে খড় খেলে সব জন্তুরই রক্তের জমাট বাঁধবার ক্ষমতা লোপ পায় আশ্চর্যজনক ভাবে, আর তারই জন্যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাদের পশুজীবন। এই পর্যন্ত জানে সবাই; কিন্তু এর বেশী একটি কথাও বলতে পারলে না বিজ্ঞান।

স্পষ্টই দেখা গেল, এ উত্তর মোটেই সন্তুষ্ট করেনি চাষীকে। যদি এই সামান্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হয় তবে বিশেষজ্ঞদের সার্থকতা কি? সামান্য সমস্যাই বটে! যদি সে ঘূণাক্ষরেও জানতে পারত যে, তার এই সামান্য সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করবেন সেই বহু আকাঙ্খিত ওষুধ, যার কথা আগেই বলেছি, তাহলে অন্ততঃ কিছুটা প্রসন্ন হয়ে বাড়ী ফিরত সে।

সেই রাত্রেই ডাঃ লিঙ্ক তার সহকর্মীদের নিয়ে শুরু করে দিলেন গবেষণা। বার বার তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন—মরা গরুর রক্তকে জমাট বাঁধাতে। কেটে গেল সারা রাত; ভোরের সূর্য দেখা দিল পূর্ব দিগন্তে। তখনও কিন্তু শেষ হলো না বিজ্ঞানীদের গবেষণা; কারণ পাত্রের রক্ত আগের মতই তরল রয়ে গেছে। পারলেন না তাঁরা ওই রক্তকে জমাট বাঁধাতে।

তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চললো বিজ্ঞানীদের সাধনা—পচা sweet clover-এর খড়ে এমন কি জিনিস আছে যার প্রভাবে রক্ত হারায় তার জমাট বাঁধবার ক্ষমতা? ভারতীয় তপস্বীদের সাধনার কথা পড়ি পুরাণে, শাস্ত্রে—তার সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসের গভীরতাই হলো মাপকাঠি। কিন্তু সেদিন ওই কজন বিজ্ঞানী যে কঠোর সাধনা—কঠোর তপস্যা করেছিলেন—সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে তার সত্যতার প্রমাণ দেবে ইতিহাস।

সাধনায় সিদ্ধি আনতে দেরী হলো না। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে তাঁরা sweet clover-এর খড়ে পেলেন অতি ছোট, আণুবীক্ষণিক কয়েকটি ক্রিষ্ট্যাল বা কেলাসের সন্ধান। দেখা গেল, sweet clover-এর বিশিষ্ট গন্ধ ও স্বাদের মূলে কুমেরিন (Coumarin) নামে যে জিনিসটা আছে খড় পচবার সময়ে সেটি হয়ে যায় ডিকু-মেরিন। এরই সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁরা অণুবীক্ষণে। এই ডিকুমেরিণ রক্তের জমাট বাঁধবার ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দেয়।

বছর খানেকের মধ্যে বিজ্ঞানীরা বেশ বেশী পরিমাণে ডিকুমেরিন পেয়ে গেলেন পচা sweet clover-এর বিচালী থেকে, আর জেনে গেলেন তার রাসায়নিক সংগঠন। কিছুদিন বাদে কৃত্রিম ডিকুমেরিন বা ডিকুমারল তৈরী করতেও তাঁরা সক্ষম হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা শুরু হয়ে গেল—ডিকুমারল প্রয়োগ করে মানুষকে থ্রম্বাস আর এম্বোলীর হাত থেকে বাঁচান যায় কিনা। তখন পর্যন্ত রক্তের জমাট বাঁধার প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার হতো হেপারিন নামে একটা ওষুধ। কিন্তু হেপারিন মোটেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না; এমন কি, সময়ে সময়ে মানুষের ওপর তার ফল বড় সাঙ্ঘাতিক হতো। ডিকুমারলের এসব দোষ ছিল না—বেশ নির্ভয়ে এই সস্তা নির্ভরযোগ্য ওষুধটি ব্যবহার করা চলতে লাগল। জার্ণাল অফ অ্যামেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক সংখ্যায়, মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ এড্গার এলেন জানালেন, তিনি প্রায় দেড় হাজার

রোগীকে অস্ত্রোপচারের পর ডিকুমারল প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মতে ঐ ১৬০০-এর ভিতর কম করে ২৫০ জন পাল্‌মোনারি এম্বোলিজম বা ভেনাস থ্রম্বসিস-এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে; আর মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে এসেছে অন্ততঃ ৮০ জন। তাদের মধ্যে ৭১৬ জন ছিল স্ত্রীলোক, যাদের অস্ত্রে করতে হয়েছিল কঠিন অস্ত্রোপচার। সাধারণ হিসেব মত তাদের মধ্যে ২৮ জনের ভেনাস থ্রম্বসিস হওয়া এবং পাঁচ ছয় জনের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ডিকুমারল বাতিল করে দিল হিসেব। ডিকুমারলের গুণে মৃত্যু-সংখ্যা পৌঁছল শূণ্যয়, আর মৃদু ভেনাস থ্রম্বসিস্‌, তা ও হলো ঐ কয়েক-জনের।

এদিকে কর্ণেল মেডিকেল কলেজের ডাঃ আর্‌ভিং, এস, রাইট তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন—করোনারি থ্রম্বসিস (হৃৎপিণ্ডে বা কাছাকাছি শিরা বা ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধা, যাতে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়) রোগে ডিকুমারল উপকার দেয় কিনা। তাঁরা ইচ্ছে করে বেছে নিলেন ৮০ জন এমন রোগীকে যারা প্রায় মৃত্যুর সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। ডিকুমারল প্রয়োগের ফলে তাদের মধ্যে মাত্র পনেরো জনের মৃত্যু হলো যা নাকি ডাঃ রাইটের মতে খুবই আশাপ্রদ।

একটি ৬৮ বছরের বৃদ্ধাকে ডাক্তাররা জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর করোনারি থ্রম্বসিস ছাড়াও ছিল—বহুমূত্র, গলব্লাডার আর উচ্চ রক্তচাপ। মস্তিষ্কে একটি থ্রম্বাসের জন্যে ইনি স্মৃতিশক্তি ও কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। পায়ে থ্রম্বাসের জন্যে পা-টি কেটে বাদ দিতে হয়েছিল! মাত্র ১৮ দিন ডিকুমারল প্রয়োগের পরই তিনি ফিরে পেলেন তাঁর স্মৃতিশক্তি। আজ—ডাক্তাররা জবাব দেবার ৪ বছর বাদেও তিনি বেশ ভালভাবেই বেঁচে আছেন; অবশ্য বহুমূত্র, রক্তচাপ এ রোগগুলো তাঁর ঠিকই বজায় আছে—কিন্তু থ্রম্বাস আর এম্বোলির দরুণ কোন দৈহিক গ্লানি আর নেই তাঁর—নেই হঠাৎ কোন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা।

আমেরিকার হৃদ্‌রোগের বিশেষজ্ঞরা (হার্ট স্পেশালিষ্ট এসোসিয়েশন) ১৯৪৬ সালে এক পরীক্ষা সুরু করেন। ১০টি সহরের ১৬টি হাসপাতাল বেছে নিয়ে তাঁরা অর্ধেক রোগীকে ডিকুমারল প্রয়োগ করলেন, আর বাকী অর্ধেকের চিকিৎসা করলেন, সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে। প্রথম ৮০০ জন রোগীকে দেখবার পর এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ডাঃ রাইট জানিয়েছেন যে, যে সব রোগীদের ডিকুমারলের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মৃত্যু ও রোগের জটিলতা বৃদ্ধির হার অন্য রোগীদের তুলনায় আশ্চর্যরকমে কমে গেছে। কাজেই তাঁরা চিকিৎসক সমাজে সুপারিশ করলেন যে, প্রতিটি করোনারি থ্রম্বসিসের রোগীকে যেন ডিকুমারল প্রয়োগ করা হয়—অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া। যেমন, যায় রক্ত জমাট বাঁধার স্বভাবই কম বা যার রক্তপাত হবার ধাত একটু বেশী—তাদের তঞ্চনবিরোধী (anti-coagulant) ওষুধ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ঠিক ভাবে ডিকুমারল বা অন্য কোন তঞ্চনবিরোধী ওষুধ ব্যবহার করতে পারলে সারা বছরে করোনারি থ্রম্বসিস্‌ রোগে যে কিছুবেশী ১০,০০০ লোক মরে তার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ কমানো যায়। আর রোগ যন্ত্রণা যে কতলোকের কমানো যায় তার ইয়ত্তাই নেই। অনেকে অবশ্য এখনও ডিকুমারল ব্যবহারে আপত্তি জানাচ্ছেন এই অজুহাতে যে, ডিকুমারল তো সেই পচা sweet clover এর বিচালিতে পাওয়া ডিকুমেরিনের কৃত্রিম রূপ। ডিকুমেরিন খেয়ে সব জন্তুই যখন রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা হারানোর দরুণ মারা গেল তখন ডিকুমারল প্রয়োগের ফলে মানুষও যে ওই একই রকমে মারা যাবে না—সেবিষয়ে কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? এ আপত্তি অতি সহজেই নাকচ করে

দেওয়া যায়। এ কথা ঠিক যে, ডিকুমারল প্রয়োগ করলে—রক্তের জমাট বাঁধবার ক্ষমতা কমে গিয়ে বা নষ্ট হয়ে গিয়ে মারা পড়বার একটা ক্ষীণ আশঙ্কা আছে; কিন্তু পরিমিত মাত্রায়, আশু মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মারফৎ প্রয়োগ করা যায় তাহলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না বললেই চলে। আর তাছাড়া বর্তমানে নিশ্চিত মৃত্যু বা অঙ্গহানির আশঙ্কার হাত থেকে বাঁচতে হলে অনাগত ভবিষ্যতের একটা ক্ষীণতম বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে কেউ অরাজী হন না।

আজ হেপারিনেরও উন্নতি করা হয়েছে। হেপারিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি হলেও বহু অসুবিধা এখনও রয়ে গেছে। হেপারিনের অবিশ্বাস্য চড়া দামের কথা ছেড়ে দিলেও হেপারিন শিরায় ইন্‌জেকসন করে ছাড়া প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু ডিকুমারল খেলেও কাজ হয়। কাজেই খুব জরুরী দরকারেই হেপারিন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া সবক্ষেত্রেই ডিকুমারল আজ অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিকুমারল আজ বাঁচাচ্ছে হাজার হাজার লোকের জীবন। ডিকুমারল অন্য কোনও রোগে ব্যবহার করা যায় কিনা তার পরীক্ষা এখনও চলছে। আশা হয়, সে সেখানেও সফল হবে, প্রমাণ করে দেবে—খড়গাদা থেকেও রত্ন পাওয়া যায়।

গো-মাতার শাবক প্রসব

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ

দুইশত আশী হইতে দুইশত চুরাশী দিনে সাধারণতঃ গো-মাতার গর্ভস্থিত ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় গর্ভনিহিত পেশী সঙ্কোচন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং প্রসব ব্যাথা আরম্ভ হয়। পেশী সঙ্কোচন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু মুখ খুলিতে থাকে। ক্রমে ভ্রূণ-আবরক জলস্থলী বাহির হইয়া আসে ও ফাটিয়া যায় এবং প্রসবদ্বারে গো-শাবকের অঙ্গ দেখা যায়। গো-শাবক প্রসূত হওয়ার স্বাভাবিক রীতি দুইটি:—প্রথমতঃ শাবকের সম্মুখে পা দুইটি বাহির হইবে ও তৎসঙ্গে সম্মুখের পায়ের হাটুর উপরিস্থিত মস্তকও নির্গত হইবে; অথবা পিছনের পা দুইটি প্রথম বাহির হইবে।

প্রসবকালে শাবক নিগমণের রীতি।

সাধারণতঃ প্রসব ব্যাথা আরম্ভের এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যেই শাবক প্রসূত হয়। প্রসবের এই নির্দিষ্ট সময়ের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিলে গর্ভস্থিত শাবক প্রসবের স্বাভাবিক অবস্থান রীতির গোলযোগ ঘটিয়াছে মনে করিতে হইবে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে প্রসবের অহেতুক চেষ্টায় গো-মাতার যথেষ্ট সামর্থ্য ক্ষয়িত হয় এবং ক্রমশ সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং গো-মাতার শক্তি নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই গর্ভে শাবকের অবস্থান সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই পরীক্ষার জন্য গর্ভ মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হয়। গর্ভ মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবার পূর্বে অঙ্গুলির নখগুলি কাটিয়া বীজাণু-নাশক দ্রব্য মিশ্রিত জলে কনুই পর্যন্ত সমস্ত হাত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া তৈলাক্ত পদার্থে সিক্ত করিতে হইবে।

মাতৃগর্ভে গো-শাবকের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অস্বাভাবিক অবস্থান পরিদৃষ্ট হয়:—

(১) দুইটির স্থলে একটি মাত্র সম্মুখের পায়ের নির্গমন ও অপরটির গর্ভ মধ্যে বিপরীত দিকে অবস্থান।

(২) কেবলমাত্র মস্তকের নিষ্ক্রমণ ও পা-গুলির গর্ভমধ্যে বিপরীত দিকে অবস্থিতি।

(৩) মস্তক পৃষ্ঠদেশের উপরে পশ্চাদাভিমুখী; অন্যান্য অঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থান।

(৪) বক্ষদেশের নীচের দিকে মস্তকের পশ্চাৎ অভিমুখী অবস্থান।

(৫) লেজ সমেত চারিটি পায়ের একসঙ্গে নিষ্ক্রমণ।

(৬) গাত্রদেশের একাংশের প্রসব দ্বারের দিকে অস্বাভাবিকভাবে অবস্থান।

এতদ্ভিন্ন প্রসবকালে শাবকের আরও অনেক প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থান সম্ভবপর। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধৈর্য সহকারে গর্ভ মধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া শাবককে জরায়ুর ভিতরে পশ্চাৎদিকে সঞ্চালন দ্বারা অঙ্গগুলি প্রসবের রীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে গো-মাতার শাবক নিষ্কাশণ শক্তির অল্পতাহেতু গর্ভস্থিত শাবকের পা ধরিয়া টানিয়া বা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া বাহির করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। টানিয়া বাহির করার সময় কুক্ষিদেশের আকৃতি অনুযায়ী গো-শাবকের পা দুইটি নীচের দিকে টানিতে হইবে।

আসন্ন প্রসবা গাভীর বাহ্যিক লক্ষণ।

প্রসবের দুই একদিন পূর্ব হইতেই আসন্ন-প্রসবা গাভীর পেট নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে পুচ্ছমূলের নিকট কটিদেশে কিছু অবনমন দেখা যায়। প্রসব-দ্বার যথেষ্ট বিস্তৃত হয় ও ইহার প্রান্তদেশ দুইটি স্ফীত হয়। পালান ও স্তন পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ করে। স্তনে কোন প্রকার ত্বকের সংকোচন দেখা যায় না—উহা মসৃণ ও স্ফীত হয়। পালান ও স্তন রক্তাভ হইয়া উঠে। প্রসবের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাভী বারে বারে উঠিতে ও বসিতে থাকে। প্রসবের দুই তিন ঘণ্টা পূর্বে প্রসব ব্যাথা আরম্ভ হয় ও প্রসব-দ্বার দিয়া শ্লৈষ্মিক পদার্থ নির্গত হইতে থাকে।

প্রসব-স্থান।

মানুষের মনোনীত উপযুক্ত প্রসবাগার অপেক্ষা উন্মুক্ত, নির্জন, তৃণাচ্ছাদিত, শুষ্ক, গোচারণ ভূমি প্রসবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কারণ গো-জাতীয় জীবেরা সাধারণতঃ প্রবৃত্তি প্রণোদিত। যেখানে মানব সমাগম হওয়ার বা অন্য কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে সেস্থান তাহারা পছন্দ করে না।

আলো-বাতাসযুক্ত নির্জন প্রশস্ত কক্ষ (৭ হাত ×৮ হাত) প্রসবাগার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রসবাগার রূপে ব্যবহারের পূর্বে কক্ষটি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও ধৌত করিতে হইবে। এইজন্য ফিনাইল মিশ্রিত জল (১০০ ভাগে এক ভাগ), কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত জল, তুঁতে মিশ্রিত জল অথবা এই প্রকার কোন বীজাণুনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ঘরের মেজেতে রৌদ্রসিক্ত, বীজাণুবর্জিত খড়ের বিছানা থাকা প্রয়োজন। প্রসবের পূর্বে গাভীর গাত্র কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে (শতকরা ৫ ভাগ) ধুইয়া ও মুছিয়া লইতে হইবে। প্রসূত হওয়ার পর শাবক মায়ের শরীরের যে কোন স্থান চাটিতে আরম্ভ করে, সুতরাং গো-মাতার গাত্র সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন না থাকিলে বীজাণু শাবকের অঙ্গে প্রবেশ করিয়া অতি সহজেই নানা রোগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই গো-মাতার অবস্থার প্রতি দিন-রাত্রি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রসবান্তে শাবকের ব্যবস্থা।

যদি শাবক স্বাভাবিকভাবে প্রসূত হইতে থাকে তবে প্রসব সময়ে নির্গমনের জন্য কোন প্রকার সাহায্য করার দরকার নাই। শাবক প্রসূত হওয়া মাত্রই গো-মাতা তাহার জিহ্বা দ্বারা সজোরে শাবকের গাত্র লেহন আরম্ভ করে। ইহাতে সহজেই আর্দ্র শ্লৈষ্মিক পদার্থগুলি দূরীভূত হইয়া শাবকের

গাত্র শুষ্ক হয়। লেহনে শাবক-দেহে রক্ত সঞ্চালন ও উত্তাপ প্রয়োজন মত বাড়ে। কোন কোন সময় এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক পদার্থগুলি প্রসূত শাবকের নাকে, মুখে ঢুকিয়া উহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তখন দ্রুত ঐসব পদার্থগুলি নাক, মুখ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। নতুবা শাবকের মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রথমবার প্রসবের পর কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাতা শাবকের গাত্র লেহন না করিয়াই সরিয়া পড়ে। তখন তোয়ালে অথবা ঐ প্রকার কোন মোটা কাপড় দ্বারা ঘষিয়া শ্লৈষ্মিক পদার্থগুলি দূর করিয়া শাবকের গাত্র শুষ্ক করিতে হইবে ও পরে চেষ্টা করিয়া গো-মাতাকে শাবকের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিতে হইবে।

শাবক কদাপি নিশ্চল অবস্থায় প্রসূত হয়। ইহাকে প্রকৃত মৃত না বলিয়া 'সাময়িক মৃত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় প্রসবের পর কাল বিলম্ব না করিয়া শাবকের বক্ষের পার্শ্বদেশে ধীরে ধীরে চপেটাঘাত, সম্মুখের পা দুইটি বিশেষ-ভাবে সঞ্চালন, নাকে, মুখে 'ফুঁ' দেওয়া, বক্ষের পার্শ্বদেশে অল্প গরম জল ঢালিয়া মর্দন অথবা নাসারন্ধ্রে পালক দিয়া সুড়সুড়ি দেওয়া প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুনরায় শাবকের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠে।

শাবক জন্মগ্রহণ করার পর নাভিরজ্জু তুঁতে মিশ্রিত জল বা টিন্‌চার আয়োডিন দ্বারা ধুইয়া বীজাণুমুক্ত সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে। নতুবা নাভিনলীর ভিতর দিয়া বীজাণু অতি সহজেই শাবকের অন্ত্রে ঢুকিয়া জ্বর সহ পেটের অসুখের সৃষ্টি করে। গাভী উন্মুক্ত আলো-বাতাসযুক্ত শ্যামল ভূমিতে প্রসব করিলে শাবকের বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সময় সময় প্রসূত শাবকের নাভিদেশ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। ফিট্‌কিরি মিশ্রিতজল সিঞ্চনে রক্তক্ষরণ কমিয়া যায়। অধিক রক্তক্ষরণ হইলে "বন্ধনী" দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

স্বাভাবিক সবল গো-শাবক জন্মের পর অর্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে দাঁড়াইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে সমর্থ হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে শাবক স্তন্য পানে অসমর্থ হইলে উহাকে স্তন্যপানে সাহায্য করিতে হইবে। অধিক দুর্বলতার জন্য সাহায্য পাইয়াও শাবক স্তন্য পান করিতে না পারিলে বোতলে রবারের কৃত্রিম স্তনবৃন্ত সংযুক্ত করিয়া দুগ্ধ পান করাইতে হইবে।

গর্ভ-পুষ্প।

মাতৃদেহ হইতে গর্ভ-পুষ্পের সাহায্যে ভ্রূণে খাদ্য বিতরিত হয় এবং অনাবশ্যক পরিত্যক্ত পদার্থ-গুলি গর্ভ-পুষ্পের রক্তস্থলীর সাহায্যে বাহির হইয়া আসে। শাবকের জন্মের পর দুই ঘণ্টা হইতে চার ঘণ্টার ভিতর গর্ভ-পুষ্প মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। কোন কোন সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। প্রসবের চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরও যদি গর্ভ-পুষ্প বাহির হইয়া না আসে তবে জরায়ুতে হাত ঢুকাইয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য নহে। গর্ভ-পুষ্প পড়িতে অধিক বিলম্ব হইলে কেহ কেহ জরায়ুর ভিতর আইডোফরম্ নামক বীজাণুনাশক বটিকা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থায় বীজাণু দ্বারা পচনক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। গর্ভ-পুষ্প স্বাভাবিকভাবে নির্গত না হইলে প্রত্যহ কোন প্রকার বীজাণুনাশক দ্রব্য মিশ্রিত জলে জরায়ুর ভিতর 'ধারাণী' দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য ডেটল্ মিশ্রিত জল (২০০ ভাগে ১ ভাগ), লবণাক্ত জল (৫ সেরে এক ছটাক লবণ গরম জলে ফুটাইয়া, ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে) অথবা এই প্রকার কোন বীজাণুনাশক তরল পদার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। জরায়ুধৌত ফেরৎ জলে পচা গলিত পদার্থ না দেখা পর্যন্ত অথবা দুর্গন্ধ অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ জরায়ুতে 'ধারাণী' দিতে হইবে।

সাধারণতঃ শাবকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ-পুষ্পের সহিত উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

কদাচিৎ এই সংযোগ জন্মের পরও অবিচ্ছিন্ন থাকে। তখন কালবিলম্ব না করিয়া বীজাণুমুক্ত পরিচ্ছন্ন কাঁচি দ্বারা ঐ সংযোগ ছিন্ন করিয়া দিতে হয়; নতুবা শ্বাসরোধে শাবকের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

শাবক প্রসূত হওয়ার পরেই গো-মাতার নির্জনতা ও বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। কিছু উষ্ণ পানীয় জল ভিন্ন অন্য যে কোন খাদ্য প্রসবের দশ বার ঘণ্টা পরে দিতে হইবে। প্রসবের পর প্রথম তিনদিন প্রতি বেলায় নিম্নলিখিত খাদ্য-মিশ্রণটি গরম জলে ভিজাইয়া উষ্ণ অবস্থায় গো-মাতাকে খাওয়াইতে হইবে।

প্রসবের অব্যবহিত পরে গো-মাতার ব্যবস্থা।

গমের ভূসি ২ সের
গুড় ½ সের
জোয়ান ⅛ সের
আদা ½ পোয়া
হলুদ ১ ছটাক

এই সঙ্গে দূর্বা জাতীয় হরিৎ ঘাসও বিশেষ উপযোগী। এই খাদ্য ব্যবস্থায় ক্রমশ পুষ্টিকর খাদ্য যোগ করিয়া একমাসে গো-মাতাকে 'উপযুক্ত পূর্ণ খাদ্য' দিতে হইবে। প্রথম তিন দিনের পর কিছু কিছু করিয়া যব বা যৈ চূর্ণ ও তিসির খৈল উপরোক্ত খাদ্যে যোগ করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে দূর্বা জাতীয় ঘাসের সঙ্গে, ডাল বা সীম জাতীয় ঘাসও অল্প অল্প করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ক্রমিক খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনে প্রসূতীর দেহাভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীতে বিঘ্ন ঘটিবে না এবং ধীরে ধীরে গো-মাতা স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইবে।

রোগ বিস্তারে ছত্রাক

শ্রীনির্মলকুমার চক্রবর্তী

বর্ষার সময় যখন কোন কাঠগোলার পাশ দিয়ে যাই অথবা গ্রামের রাস্তার ধারে বাঁশঝাড় বা কোন কাটা গাছের গুঁড়ির দিকে তাকাই তখনই আমরা সাদা, লাল, হলুদ, বাদামী প্রভৃতি নানা বর্ণের, নানা আকারের ছোটবড় ছত্রাক দেখতে পাই। সাধারণতঃ ছত্রাক বললে আমরা "ব্যাঙের ছাতা" জাতীয় উদ্ভিদের কথাই মনে করে থাকি। কিন্তু "ব্যাঙের ছাতা" ছাড়াও আরও নানা রকমের ছত্রাক পাওয়া যায়। এমন অনেক ছত্রাক আছে যাদের খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। সেগুলোকে দেখবার জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। ছত্রাকের সংখ্যা যে কত এবং তারা যে কত বিভিন্ন রকমের হতে পারে তা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। বিজ্ঞানীরা প্রায় ৮১৫০০টি বিভিন্ন রকমের ছত্রাকের জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-ছাড়া আরও যে কত হাজার আজও অজানা রয়ে গেছে তা কে জানে! উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

আমাদের বাংলাদেশে পলিপোর জাতীয় ছত্রাকই (Polypore অর্থাৎ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত) সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। এ ছাড়া অ্যাগারিকাস প্রভৃতি নানা-জাতীয় ছত্রাকও পাওয়া যায় প্রচুর। গঠন বৈচিত্র্যানুসারে বিজ্ঞানীরা ছত্রাকগুলোকে প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম তিন ভাগের (Phycomycetes, Ascomycetes এবং

Basideomycetes) জীবন-ইতিহাস বিজ্ঞানীদের নিকট সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কেবল শেষ-ভাগের ছত্রাকদের (Fungi Imperfecti) সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে।

এই সমস্ত ছত্রাকের মধ্যে কেউ বা তাদের বিষ-ক্রিয়ার জন্যে মানুষের জীবনে অভিশাপ স্বরূপ, আবার কেউ বা রোগ নিরাময় বা অন্য কোন উপকারী কাজের জন্যে অমৃতের ন্যায় আদরনীয়। এদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। কতকগুলো ছত্রাক, যারা চিকিৎসা-জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তাদের যারা রোগ বিস্তারে সাহায্য করে তাদের একটা অংশের বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করবো। এখানে যে সকল ছত্রাকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে তারা প্রায় সকলেই আণবীক্ষণিক। খালি চোখে তাদের দেখা যায় না।

এক প্রকারের ছত্রাক আছে যারা দেখতে অনেকটা ইলিপ্‌স্‌-এর মত (Yeast like cells)। এদের নাম হিষ্টোপ্লাজ্‌মা ক্যাপ্‌সুলেটাম (Histoplasma Capsulatum)। এরা সাধারণতঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে এবং Lymph Vessels এবং Mononuclear Blood Cells-এর মধ্যে অনেকটা ইলিপ্‌স্‌-এর মত আকার ধারণ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে থেকে এরা রক্তহীনতা, শারীরিক ক্ষীণতা, নাক, ওষ্ঠ এবং অন্ত্রের আল্‌সার প্রভৃতি নানা রোগের সৃষ্টি করে।

উষ্ণ-মণ্ডলের শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যারা খালি গায়ে কাজ করে তাদের শারীরিক যে কোন ক্ষতের সুযোগ নিয়ে ফিয়ালোফোরা ভেরুকোসা (Phialophora Verrucosa) নামে বৃত্তাকার বাদামী রঙের একপ্রকার ছত্রাক আক্রমণ করে এবং একপ্রকার চর্মরোগের সৃষ্টি করে। এর ফলে হাত ও পায়ের চামড়াগুলো খসখসে হয়ে যায় এবং জায়গাটা ফুলকপির মত অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

অ্যাক্টিনোমাইসিস্‌ বোভিস্‌ (Actinomyces Bovis) শাখা প্রশাখা সমন্বিত সুতার মত দেখতে। এই ছত্রাক মানুষের ঘাড়ে এবং মাথায় পুঁজযুক্ত আবের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ কৃষক এবং রাখালেরাই এ-রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া এরা গরু, ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি জীবজন্তুর "চোয়াল ফীতি", "কঠিন জিহ্বা" প্রভৃতি রোগেরও সৃষ্টি করে।

কাদামাটি, ফেলে রাখা কাঠ প্রভৃতির ওপরে "স্ফ্রোট্রিকিয়াম শেঙ্কি (Sphrotrichium Schenckii) নামে এক ধরণের ছত্রাক শরীরের যে কোন রকম অতি তুচ্ছ ক্ষতের (যেমন গোলাপ গাছের কাঁটা ফোটার ক্ষত) মধ্য দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই ছত্রাকগুলোর গায়ের রঙ প্রথমে সাদা থাকে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এরা বাদামী রঙ ধারণ করে। প্রথমে এরা বহির্চর্মের নীচে ফোড়ার সৃষ্টি করে। পরে লসিকাবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ীর (Lymphatics) ভিতর দিয়ে শরীরের অপরাপর অংশ (যেমন মাংসপেশী, অস্থি, ফুসফুস, অন্ত্র, শারীরিক গ্রন্থিসমূহ এবং মস্তিষ্ক পর্যন্ত) আক্রমণ করে।

"মোনিলিয়া (ক্যানডিডা) অ্যালবিক্যান্‌স্‌" [Monilia (Candida] Albicans) নানা আকারের দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলো লম্বা ফিতার মত, আবার কতকগুলো অনেকটা ইলিপ্‌স্‌-এর মত দেখতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওষ্ঠ এবং মুখগহ্বরের ক্ষতের জন্যে এরা দায়ী। এছাড়া হাতের মুঠা এবং আঙুলের ফাঁকের মধ্যকার চামড়ার ওপরেও এরা ক্ষত সৃষ্টি করে। অনেকে আবার এমনও মনে করেন যে, পাল্‌মোনারি টিউবারকিউলোসিস্‌-এর গৌণ কারণ এরাই। হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির মুখের ভিতর শতকরা ৩ থেকে ২৪ ভাগ পর্যন্ত মোনিলিয়া অ্যাল্‌বিক্যান্‌স্‌ বিদ্যমান।

ঋতু পরিবর্তনের সময়ে অসাবধানতার জন্যে অথবা খাদ্যপ্রাণের অভাবে শারীরিক দুর্বলতার

জন্যে উষ্ণ-মণ্ডলের অধিবাসীদের "মোনিলিয়া (ক্যানডিডা) সাইলোসিস" [Monilia (Candida) Psilosis] নামে এক রকমের ছত্রাক আক্রমণ করে। দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখ, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগের জন্যে এরাই দায়ী।

যে সব কর্মীরা লোম, পালক প্রভৃতির পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে তাদের মধ্যে "অ্যাস্পারজিলোসিস" (Aspergillosis) নামে একপ্রকার রোগ দেখা যায়, যার লক্ষণগুলো সমস্তই পাল্মোনারি টিউবারকিউলোসিস-এর মত। কিন্তু রোগীর কফ পরীক্ষার দ্বারা যক্ষ্মার কোন রকম জীবাণু পাওয়া যায় না। অ্যাস্পারাজিলাস ফিউমিগেটাস (Aspergillus Fumigatus) নামে সূতার মত দেখতে একরকমের ছত্রাক এই রোগের সৃষ্টি করে। স্যাঁৎসেঁতে জায়গার কর্মীরাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। পটাসিয়াম আয়োডাইড দিয়ে চিকিৎসা করালে ফুসফুসের রোগ নিশ্চিতরূপে সারানো সম্ভব। এরা আবার পাখীর হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে এবং পক্ষিসমাজে মহামারীর সৃষ্টি করে। আর একজাতীয় অ্যাস্পারজিলাস আছে যারা শ্রবণেন্দ্রিয়, নখ প্রভৃতি আক্রমণ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফোঁড়া বা হাঁপানি রোগের সৃষ্টি করে।

আরগট (Ergot) নামটা অনেকেরই জানা। বহুকাল থেকে সন্তান প্রসবের সময় একে ব্যবহার করা হতো, কারণ এর দ্বারা জরায়ুর হঠাৎ সঙ্কোচন ঘটান যায় এবং তার ফলে সন্তান-প্রসব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। আজকাল আরগটকে ওভাবে ব্যবহার না করে প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্রাব বন্ধের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্লাভিসেপ্‌স্ পারপিউরিয়া (Claviceps Purpurea) নামে এক প্রকার ছত্রাক থেকে এই ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ছত্রাক রাই-গাছের গর্ভকোষকে আক্রমণ করে এবং ফসলের সময় রাই-দানার পরিবর্তে Sclerotium বা আরগট-দানার আবির্ভাব ঘটায়। এগুলো প্রায় ৩-৪ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এবং দেখতে অনেকটা ছোট ছোট আঙ্গুলের মত। এদের রঙ গাঢ় বাদামী এবং উপরকার আবরণও বেশ শক্ত। এই জিনিসগুলো থেকে আরগোমেট্রিন নামে একপ্রকার উপক্ষার পাওয়া গিয়েছে। এই আরগোমেট্রিন থেকেই বাজারে প্রচলিত ওষুধ আরগট প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া আরগোটক্সিন এবং আরগোটিনিন নামে আরও দুরকমের উপক্ষার এই Sclerotium থেকে পাওয়া গিয়েছে। এরাও আরগোমেট্রিনের মতই কাজ দেয়। তবে এদের ক্রিয়া সুরু হয় ধীরে ধীরে এবং কার্যক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত মৃদু। এছাড়া আরগোটক্সিন রক্তচাপবৃদ্ধি করতে এবং মোরগের ঝুঁটিতে পচন সৃষ্টি করতে সক্ষম।

কিন্তু এই Sclerotium-গুলো যদি শস্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে মানুষ অথবা গৃহপালিত জীবজন্তুর পেটের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তবে মহামারীর সৃষ্টি হয়। হাতের ওপরের আঙ্গুলসমূহ ফুলে ওঠে এবং ক্রমে পচনক্রিয়া দ্বারা সেগুলো হাত এবং পা থেকে খসে যেতে থাকে। গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তুর বেলায় এই বিষক্রিয়া বেশী পরিমাণে দেখা যায় এবং সেই সকল ক্ষেত্রে এরা গর্ভপাত ঘটায় ও পক্ষাঘাত রোগের সৃষ্টি করে। এছাড়া পচনক্রিয়ার দ্বারা কান, পায়ের ক্ষুর, শিং, লেজ প্রভৃতি অংশগুলো শরীর থেকে খসে পড়তে থাকে। আরগটের এই বিষক্রিয়ার নাম আরগটিজ্‌ম্। আক্রান্ত জীবকে জোলাপ খাওয়ানোর পর Sclerotium-মুক্ত ঘাস, জল খাওয়ানো হলে এই বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

উপরের বিবরণের দ্বারা আমরা ছত্রাকের কর্মক্ষমতার মাত্র একটি সামান্য অংশের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। রোগ বিস্তারে সাহায্য করে, এরকম ছত্রাকের সংখ্যা এখানেই শেষ হয় নি। ছত্রাকের কর্মক্ষমতার এই দিকটার ওপর চিকিৎসক বা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী কারুর দৃষ্টিই সম্যকভাবে আকৃষ্ট হয় নি। কারণ মেডিকেল কলেজগুলোতে ছত্রাক-

বিদ্যার (Mycology) স্থান নেই বললেই হয় এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ছাত্ররাও শরীর-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকেফহাল নন। রোগ বিস্তারের বিভিন্ন ছত্রাকের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দুই বিভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় শাখার উন্নতি সম্ভবপর নয়। ছত্রাকের কর্মক্ষমতা আরও নানা দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। শস্যের ক্ষতি করতে, বনজ সম্পদ নষ্ট করতে, খাদ্যদ্রব্যকে অখাদ্যে পরিণত করতে এদের জোড়া মেলা ভার। মানুষের উপকারী ছত্রাকের সংখ্যাও অবশ্য কম নয়। আরগট, পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধের নাম আজ সর্বজনবিদিত। বহুবিধ জৈবপদার্থ উৎপাদনেও এদের ব্যবহার আমাদের শ্রমশিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়ক। মানুষের উপকারী ছত্রাকের সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

কপিবীজের চাষ

শ্রীমাণিকলাল বটব্যাল

শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ উপাদান প্রয়োজন। শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক ঐ উপাদানগুলি সবজি-জগৎ হইতে গ্রহণ করাই যে সুলভ ও প্রশস্ত তাহা বর্তমানে সর্বজনবিদিত। কাজেই জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দেশের সর্বত্র যাহাতে সবজির বহুল প্রচলন হয় এবং দেশের জনসাধারণ যাহাতে অল্পমূল্যে সেগুলিকে তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে পাইতে পারে সেদিকে জাতীয় সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পুষ্টি-গবেষণায় বিশেষজ্ঞদের হিসাবে ভারতে বর্তমানে নাকি আবশ্যকীয় সবজির মাত্র অর্ধেক উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেশের জরুরি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদনের হার সত্বর দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক।

সবজি-চাষের সার্থকতা সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য উন্নতধরণের বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে অধিক। সুতরাং ন্যায্য মূল্যে ভাল জাতের বীজ দেশের সর্বত্র সরবরাহের ব্যবস্থা সবজি-চাষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সবজি-চাষ আজও ভারতে আশানুরূপ উন্নতিলাভ করে নাই। দেশের যখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন উন্নত কৃষিবিদ্যার, ঠিক সেই সময়েই ভারতবর্ষ রহিল শত বৎসর পিছনে পড়িয়া। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সবজি-চাষের এই অনগ্রসরতার মূল কারণ—চাষের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন পন্থাবলম্বীদের মতানৈক্য। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় কপিবীজ চাষের কথা বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে কপিবীজ চাষের বহুবিধ পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের তুলনামূলক মান নির্ণয়ের আশানুরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। সুখের বিষয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দেশের অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক-কর্মীদিগকে আহ্বান করিয়া কপিবীজ চাষের প্রচলিত প্রণালীগুলির সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারণের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কপিবীজ চাষের একটি সাধারণ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রথা অনুসারে কপিচারার ক্ষেত হইতে আবশ্যকীয় শিশু চারাগুলিকে গোড়ায় একখণ্ড মাটিসমেত তুলিয়া ফেলা হয় এবং পরে পরিণত, উৎকৃষ্ট বীজ লাভের উদ্দেশ্যে

নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। যাঁহারা এই প্রণালী অনুসরণ করেন তাঁহারা যে সমস্ত সুবিধার কথা বলেন নীচে তাহাদের কয়েকটি দেওয়া গেল :—

(১) এই ব্যবস্থায় পুনর্বার ফসল উৎপাদনের জন্য জমি অনেক আগেই খালি করিয়া দেওয়া যায়।

(২) নির্বাচিত চারা গাছগুলিকে অবাঞ্ছিত আবহাওয়া হইতে অনায়াসে রক্ষা করা যায়।

(৩) চারাগুলির সুচারুরূপে যত্ন নেওয়া চলে।

(৪) অধিকতর উৎকর্ষ বিধানের জন্য বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ [illegible] বিশেষ ভাবে নির্বাচন করা যায়।

কপিবীজ চাষের ঐ প্রণালীটির এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও অসুবিধাও যে কিছু আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন সংক্ষেপে অসুবিধাগুলির কথা বলিতেছি :—

(১) চারা তুলিয়া পুনরায় রোপন করিবার জন্য অতিরিক্ত শ্রম বা মজুরির প্রয়োজন।

(২) এই ব্যবস্থায় কতকগুলি গাছ মারা যায়, ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

(৩) চারা গাছ উৎপাটনের সময় শিকড়ের কিছু অনিষ্ট সাধিত হওয়ায় উদ্ভিদের ক্রম-বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ইহার ফলে বীজ উৎপাদনের পরিমাণও কমিয়া যায়।

চারাগাছের জন্ম হইতে বীজের পরিপূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত একই ক্ষেত্রে গাছকে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থায় ভারতীয় কৃষিবিদ্‌দের বিশেষ আস্থা নাই। তাঁহাদের মতে ঐ প্রণালীর দ্বারা যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ অল্প এবং উহার অঙ্কুরোদ্‌গম ও ফলনও উন্নতধরণের হয় না। যাহা হউক, উক্ত প্রণালীতে চাষের প্রচলন আমরা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে দেখিতে পাই এবং উহাই কপিবীজ চাষের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হয়।

উৎপাদনকারীদের কেহ কেহ আবার চারা গাছটিকে মাটিবিহীন অবস্থায় ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া অন্য কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহাদের ধারণা, এই ব্যবস্থায় আরও বেশী ফলনের চারা তৈয়ারী হয়। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, কপি-চারাকে যে কোন অবস্থাতেই এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিবার সময় ইহার বিস্তৃত মূলসমূহে বেশ আঘাত লাগে। মাটিবিহীন অবস্থায় স্থানান্তরিত করিলে তো কথাই নাই। মাটিবিহীন অবস্থায় স্থানান্তরিত চারাগুলি মাটিযুক্ত চারা অপেক্ষা অঙ্কুরোদ্‌গম, ফল প্রসব ক্ষমতা, বাঁধাই প্রভৃতি সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণি[illegible]ছে।

কপি চারার উপরের অংশের বাঁধাই লইয়াও স্থানান্তরকরণের মধ্যে বেশ একটি পার্থক্যের সৃষ্টি করে। চারা গাছে 'ফুলটি' প্রকাশের ঠিক পূর্বেই স্থানান্তরকরণ কেহ কেহ পছন্দ করেন। আবার আর একদল আছেন তাঁহাদের মতে 'ফুলটি' একটু প্রকাশ পাবার পর স্থানান্তরকরণ বিধেয়। কিন্তু এই উভয়বিধ ব্যবস্থার কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ, সম্যক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আজও নির্ধারিত হয় নাই।

স্থায়ী এবং মাটিসহ স্থানান্তরিত চারার মধ্যে তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম প্রকারের চারা দ্বিতীয় প্রকারের চারা অপেক্ষা অধিক বীজ উৎপাদনে সমর্থ। উক্ত পার্থক্যের কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, কপি-চারার মূল সাধারণতঃ মাটির নীচে ১½ ফুট হইতে ২½ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং গভীরত্বে প্রায় ৩ ফুট নীচে থাকে। স্থানান্তরকরণ প্রথায় উক্ত জটিল মূলসমূহে বিশেষ আঘাত লাগার ফলেই চারাগুলি স্বল্প প্রসবী হয়। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি ধারণা আছে যে, উল্লিখিত দ্বিবিধ চারার মধ্যে স্থানান্তরিত বা রোপিত চারার ফুল, বীজ এবং অঙ্কুরোদ্‌গমের হার উৎকৃষ্টতর। কিন্তু ঐ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা

উপরের প্রমাণ হইতেই বেশ বুঝা যায়। তবে এক্ষেত্রে সর্বদাই সজাগ থাকা দরকার যে, স্থায়ী চারা হইতে বীজ প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল উপযুক্ত চারাগুলিকেই ক্ষেত্রে পরিবর্ধিত হইবার সকল প্রকার সুযোগ দান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অযোগ্য চারাগুলির সত্বর অপসারণ প্রয়োজন। তাহা না করিলে উভয়ের স্বার্থসংঘাতে বিপরীত ফল দেখা দিবে। মাটিবিহীন এই উভয়বিধ প্রথায় চারা গাছগুলিকে স্থানান্তরে রোপণের যে প্রথা আছে তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত প্রণালীটিই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও সমৃদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ ১৯৪৫-৪৬-এর বিবরণীতে জানা গিয়াছে যে, মাটিযুক্ত অবস্থায় স্থানান্তরে রোপিত চারার ফলন ও বীজের পরিমাণ দ্বিতীয় প্রকারের চারার ফলন ও বীজের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ।

কৃষক সম্প্রদায় সাধারণতঃ কপি চারাগুলিকে 'Compact head' অবস্থায় স্থানান্তরিত করেন; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, 'Sprouted head' অবস্থায় চারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিলে উহা অপেক্ষা বেশী কাজে আসে। 'Compact headed' এবং 'Sprouted headed' এই উভয়বিধ চারার স্থানান্তরকরণের পর তাহাদের বীজ-প্রসবের ক্ষমতা যথাক্রমে ১১৯.৩ এবং ১৬৫.৫ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পৌষ্পিক অঙ্কুরের সংখ্যামানের তারতম্য অনুসারেও বীজ উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পৌষ্পিক অঙ্কুরের সংখ্যামানের ভিত্তিতে বীজ উৎপাদন ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, পৌষ্পিক অঙ্কুরের সংখ্যা ২৫% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০০% করিলে গড় বীজ উৎপাদনের হার যথাক্রমে ৭৬.০ হইতে ১২৮.১-এ পরিণত হয়; কিন্তু গড় অঙ্কুর উদ্গমের হার যথাক্রমে ৯০.৫ হইতে ৭৬.৫-এ অবনমিত হয়। তবে দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল অবস্থাতেই সমগ্র পৌষ্পিক অঙ্কুরকে বীজে পরিণত হইবার সুযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, পারতপক্ষে স্থানান্তর রোপণের সাহায্য না লওয়াই যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক। তবে মাটিযুক্ত এবং মাটিবিহীন এই দুই প্রকারের স্থানান্তরকরণ প্রথাই প্রচলিত আছে। স্থানান্তর রোপণের নিতান্ত প্রয়োজন হইলে প্রথমোক্ত প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তাছাড়া মাটিযুক্ত চারার স্থানান্তর রোপণের সময় 'Sprouted head' চারা দেখিয়া স্থানান্তর করাই প্রশস্ত। আবাদের সময় ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় যদি এই নিয়মগুলি যথাযথভাবে মানিয়া চলেন তবে এই দুর্দিনে কৃষিবিদ্যার দ্বারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু

শ্রীহৃষীকেশ রায়

বায়ুচাপবলয়গুলি সূর্যের অনুগামী, ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই চাপবলয়গুলি আবার নিয়ত বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে; সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতও তাহাদের অনুসরণ করে। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের আপাত গতিপথে বায়ুবলয়গুলিও যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে সরিয়া যায় এবং বৃষ্টিপাতের সহায়ক হয়। বায়ুপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি উচ্চ হইতে নিম্ন চাপের অভিমুখে। দেখা যায় যে, উচ্চ চাপবলয়ের অন্তর্গত দেশগুলিতে বৃষ্টি বিরল এবং নিম্ন চাপবলয়ের অন্তর্গত দেশগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অধিক। নিরক্ষীয় শান্ত নিম্নচাপবলয়ে প্রচুর পরিচলন বৃষ্টি হইলেও, ক্রান্তীয় শান্ত উচ্চ চাপবলয়ে বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ মরুভূমিই কর্কটীয় ও মকরীয় শান্তবলয়ে অবস্থিত। ভূ-পৃষ্ঠকে যেমন বিভিন্ন বায়ুচাপবলয়ে ভাগ করা যায়, তেমনি বৃষ্টি-বিরল ও বৃষ্টিপূর্ণ অংশেও ভাগ করা যায়। অবশ্য সূর্যের আপাত গতি, জল ও স্থলের অবস্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের সীমারেখার পরিবর্তন হয়।

বায়ুপ্রবাহ বৃষ্টির বাহন। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে প্রতিহত হইয়া বৃষ্টিপাত করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে মহাদেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয় ও সেই স্থানের তাপ হ্রাস করে। উষ্ণমণ্ডলে উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুও সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করিয়া মহাদেশের পূর্বোপকূলে বৃষ্টির সহায়তা করে। কিন্তু এই বায়ুপ্রবাহ পশ্চিমাভিমুখে নিরক্ষরেখার দিকে অগ্রসর হয় বলিয়া ইহা সাধারণতঃ ক্রমে উষ্ণ হয় এবং পথে কোন বাধার সম্মুখীন হইলে উষ্ণতার জন্য ঊর্ধ্বগামী হইয়া বৃষ্টিপাত করে। উত্তর গোলার্ধের শীতকালে সূর্য যখন নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থান করে সেই সময় বায়ুবলয়গুলি দক্ষিণে সরিয়া যাওয়ায় আয়নবায়ু অধ্যুষিত দেশগুলির উপর দিয়া সজল প্রত্যায়ণ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত দেশগুলিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকালেও অনুরূপ কারণে বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সাধারণতঃ নিম্ন অক্ষাংশে বৃষ্টি অধিক ও উচ্চ অক্ষাংশে বৃষ্টি কম হয়।

বায়ুর গতিপথে যখন জল ও বায়ু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন ইহাদের মধ্যে বিনিময় হয়। জলকণা বাষ্পরূপে বায়ুর সহিত এবং বায়ু জলরাশিতে মিশ্রিত হয়। বরফ বা তুষারের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময়ও বায়ু জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে। হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিবার সময় শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু শুষ্ক হইলেও হিমালয়ের বরফ হইতে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত করে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকিলে আরও অধিক জলীয়বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। তাপের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সেই সীমারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। কোন নির্দিষ্ট তাপে বায়ু যখন আর জলীয়বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে না তখন সেই বায়ুকে পরিপৃক্ত বায়ু বলে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত বায়ুরও জলীয়বাষ্প গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বর্ধিত হয়। দেখা গিয়াছে

এক ঘন ফুট বায়ু ৪০° ফারেনহাইট তাপে ৩.০৯ গ্রেন এবং ৭০° ফারেনহাইট তাপে ৪ গ্রেন জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে। কোন কারণে এই তাপমাত্রা কমিয়া গেলে বায়ু আর পূর্বের ন্যায় জলীয়বাষ্প ধারণক্ষম থাকে না। সেজন্য ইহার অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। বায়ু পরিপৃক্ত না হইলে মেঘ বা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না। শীতপ্রধান দেশের বায়ু অপেক্ষা সাহারা মরুভূমির বায়ুতে জলীয়-বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলেও সাহারায় বৃষ্টিপাত হয় না, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কারণ তাপের আধিক্যের জন্য সাহারার বায়ু আরও জলীয়বাষ্প গ্রহণক্ষম।

শিশির, কুয়াসা, মেঘ প্রভৃতি বায়ুর জলীয়-বাষ্পের ঘনীভূত বিভিন্ন রূপ। বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের* নীচে নামিলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যে জলকণার সৃষ্টি করে তাহাই ভূ-পৃষ্ঠে শিশিররূপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় জমে এবং বায়ুতে কুয়াসা বা মেঘে পরিণত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তুষার, বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়।

শরৎকালের প্রাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে দূর্বাশ্যামল পথে ভ্রমণ করিলে আমাদের পদদ্বয় জলসিক্ত হয়। এই জলকণাই শিশির। দূর্বাদলে এই জলকণা আসে কোথা হইতে? পূর্বে ধারণা ছিল, বায়ুর জলীয়বাষ্প শৈত্যের প্রভাবে ঘনীভূত হইয়া শিশির বিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডবাসী আবহতত্ত্ববিদ্ ডাঃ জন এট্‌কিথ্ বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এই জলকণা বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্পের ঘনীভূত রূপ নয়; ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যে জলীয়বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই ঘনীভূত হইয়া শিশির বিন্দুতে পরিণত হয়। সিক্ত ভূ-পৃষ্ঠে যে বাষ্পীভবন হয়, বৃক্ষলতাও প্রস্বেদন ক্রিয়ার দ্বারা তাহার যথেষ্ট সাহায্য করে। ভূ-পৃষ্ঠ ও তাহার উপরিস্থ বায়ু যতক্ষণ উষ্ণ থাকে এবং জলীয়বাষ্পের দ্বারা পরিপৃক্ত না হয় ততক্ষণ এই বাষ্পীভবন ক্রিয়া চলিয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে তাপ বিকিরণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিয়া ভূ-পৃষ্ঠ ও লতাগুল্মের পাতাগুলির তাপ শিশিরাঙ্কে নামিয়া আসিলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির কণা সৃষ্টি করে। শরৎকালে মেঘমুক্ত আকাশ ও দীর্ঘ রাত্রি, তাপ বিকিরণের সহায়ক। সেজন্য প্রচুর শিশির এই সময়ে ঘাসের উপর দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে যখন বায়ুমণ্ডলে শিশিরাঙ্ক হিমাঙ্ক অর্থাৎ শূণ্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অপেক্ষা কম হয় সেই সময় শিশিরবিন্দু জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়। ইহাই তুহিন। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসন্তকালের রাত্রিতে আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় দ্রুত তাপ বিকিরণের ফলে তুহিন সৃষ্টি হইয়া সেইস্থানের ফলের বাগানের প্রচুর ক্ষতি করে। কৃত্রিম উপায়ে ধূম্র-জালের সৃষ্টি করিয়া তুহিনের আক্রমণ হইতে ফলের বাগানগুলি রক্ষার ব্যবস্থা অনেকাংশে সফল হইয়াছে।

* **শিশিরাঙ্ক**—হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে শিশিরাঙ্ক নিরূপণ করা হয়। প্রথমে রাসায়নিক উপায়ে জলীয়বাষ্প গ্রহণক্ষম নির্দিষ্ট ওজনের ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের উপর দিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিপৃক্ত বায়ু পরিচালিত করিয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ওজনের আধিক্য হইতে সেই বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ নিরূপিত হয়। প্রতি ঘন ফুট পরিপৃক্ত বায়ুতে ৩০° ফাঃ তাপে ২.২° গ্রেন, ৪০° ফাঃ তাপে ৩.০৯ গ্রেন ৫০° ফাঃ তাপে ৪.২৮ গ্রেন, ৬০° ফাঃ তাপে ৪.৮৭ গ্রেন জলীয়বাষ্প থাকিবে। কোন স্থলের বায়ুর শিশিরাঙ্ক নির্ণয় করিতে হইলে হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের তাপমাত্রা কমাইতে কমাইতে এক সময় দেখা যাইবে যে, যন্ত্রের গায়ে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জমিতেছে। এই তাপমাত্রাই শিশিরাঙ্ক। বায়ুর তাপমাত্রা যাহাই হউক না কেন, শিশিরাঙ্কের তাপে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প উপরোক্ত তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প সেই বায়ুতে আছে।

ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত জলীয়বাষ্পের যে অংশ নিম্ন তাপযুক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসে তাহাই ঘনীভূত হইয়া শিশির কণার সৃষ্টি করিলেও তাহার উপরিস্থ বায়ুর তাপের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কোন কারণে এই বায়ুর তাপ হ্রাস পাইলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বায়ুতে ভাসমান থাকিয়া কুয়াসার সৃষ্টি করে। এই ভাসমান জলকণাগুলি অতি ক্ষুদ্র, সেজন্য ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোতের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহারা বৃষ্টিধারার ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠে পতিত না হইয়া যে সকল কণিকা অপেক্ষাকৃত গুরু তাহারাই ভূ-পৃষ্ঠে নামিয়া আসে। নানা কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ুস্তর শীতল হইয়া কুয়াসা সৃষ্টির সহায়তা করে।

বায়ুতে ভাসমান অদৃশ্য ধূলিকণা তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইলে ইহার সংস্পর্শে যে বায়ু আসে তাহাও শীতল হয়। ফলে তাহাতে যে জলীয়-বাষ্প থাকে তাহা ঘনীভূত হয় ও কুয়াসার সৃষ্টি করে। আবার জলীয়বাষ্প পরিপূক্ত উষ্ণ ও শীতল বায়ুস্রোত পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে উভয়ের গড় তাপে তাহারা আর পূর্বের ন্যায় জলীয়বাষ্প ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। কারণ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার তাপের উপর। সেজন্য অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কুয়াসায় পরিণত হয়। শীতল বাতাসের অধিক জলীয়বাষ্প ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সেই শীতল বাতাসের মধ্যে যদি উষ্ণ জল রাখা যায় তাহা হইলে সেই উষ্ণ জল হইতে উত্থিত বাষ্পকে ঘনীভূত অবস্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণারূপে দেখা যায়। শীতকালের প্রাতে জল ভূ-সংলগ্ন বায়ুস্তর অপেক্ষা উষ্ণ থাকায় উপরোক্ত কারণে শীতকালে ঘন কুয়াসা দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে উত্তর আটল্যান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ মেক্সিকো উপসাগরীয় স্রোত ও উত্তর মহাসাগর হইতে আগত শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলনে গভীর কুয়াসার সৃষ্টি হয়। ঐ শীতল স্রোতে বাহিত হিম-শৈলগুলি তাহাদের পার্শ্ববর্তী বায়ুস্তর শীতল করিয়া এই কুয়াসা সৃষ্টি কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের উপরিস্থ উষ্ণ বায়ু, শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের উপরিস্থ শীতল বায়ুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার তাপ হ্রাসের ফলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়। আবার ল্যাব্রাডরের শীতল বায়ু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও বায়ুর জলীয়বাষ্পের অনুরূপ ঘনীভবন হয়, ফলে কুয়াসার সৃষ্টি হয়। বায়ুস্তরের গভীরতার উপর কুয়াসার গভীরতা নির্ভর করে। এর গভীরতা মাত্র এক ফুট হইতে কয়েক শত ফুটও হইতে পারে। সম-তাপযুক্ত বায়ু ঊর্ধ্বে যতদূর বিস্তৃত থাকে কুয়াসাও উচ্চতায় সাধারণতঃ ততদূর বিস্তৃত হয়। কুয়াসার প্রারম্ভে বায়ু শান্ত ও ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা উষ্ণ থাকে। নিম্নাংশ হইতে ক্রমে শীতল হইয়া জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় ও কুয়াসা ঊর্ধ্বদিকে বিস্তার লাভ করে। ধূলিবিহীন বায়ুতে জলীয়বাষ্পের ঘনীভবন সম্ভব হইলেও কুয়াসার সৃষ্টি করিতে বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা একান্ত প্রয়োজন। কুয়াসার জলকণাগুলি অতি ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে "ফগ্" বলে। বায়ুমণ্ডলের তাপ শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে না নামিলে সাধারণতঃ "ফগ্" দেখা যায় না। "ফগ্" দেখিতে সাদা কিন্তু কারখানাবহুল স্থানে ধোঁয়ায় ইহার বর্ণ ধূসর হইয়া যায়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, "ফগ" বায়ুস্রোতে ধীরে ধীরে বাহিত হইতেছে।

মেঘ উচ্চ বায়ুস্তরে অবস্থিত কুয়াসা মাত্র। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে অবলম্বন করিয়া ঘনীভূত জলীয়বাষ্প মেঘের সৃষ্টি করে। শৈত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলকণার আকার (সাধারণতঃ অর্ধ মিলিমিটার) তথা ভরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মহাকর্ষশক্তির ক্রিয়ার ফলে ক্রমে বৃষ্টিধারারূপে ধরাপৃষ্ঠে সেকেণ্ডে তিন হইতে আট মিটার (এক মিটার = ৩৯·৩৭...ইঞ্চি) বেগে

পতিত হয়। এই পতনের সময় বৃষ্টিকণাকে আরও শীতল বায়ুস্তর ভেদ করিতে হইলে বৃষ্টিকণা জমিয়া কঠিন হয় ও শিলাবৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। উষ্ণ শুষ্ক বায়ু জলরাশির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় বাষ্পীভবনের জন্য প্রচুর জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে এবং প্রবাহপথে পর্বতে বাধা পাইলে উর্ধ্বগামী হয়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যত উর্ধ্বে উঠা যায় শৈত্য তত অধিক এবং বায়ুর ঘনত্বও কম। এজন্য উর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে তাহার তাপ কমিয়া যায় এবং চাপ কম হওয়ায় প্রসারিত হইয়া আরও শীতল হয়। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে এবং পর্বতের প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ইহাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে। এই বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতের এই অংশে বহু নদীর উৎপত্তি হয়। এইরূপ বৃষ্টিপাতের পর বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায়, সেজন্য বায়ু-প্রবাহ পর্বত অতিক্রম করিলে পর্বতের অনুবাত ঢালে বৃষ্টি কম হয়। এই বৃষ্টিবিরল অঞ্চলকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে। ভূ-পৃষ্ঠে এইরূপ যে বৃষ্টিপাত হয় তাহা বহুলাংশে পর্বতে অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতে বাধা পাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ু উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত করিলেও ঐ মহাদেশের মধ্যাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত না থাকিলে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ বিপন্ন হইত এবং মৌসুমী-বায়ু প্রভাবিত বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের অভাবে বঙ্গদেশের সুজলা, সুফলা নাম লোপ পাইত।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগ বেশী এবং সূর্যের উত্তাপ সারা বৎসরই প্রখর; সেজন্য এখানকার জল অধিক পরিমাণে বাষ্পীভূত হয় এবং এই অঞ্চলের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উর্ধ্বগামী হয় ও প্রচুর জলীয়বাষ্প আহরণ করে। বায়ু উর্ধ্বে উঠিলে চাপের হ্রাস হওয়ার ফলে প্রসারিত হইয়া শীতল হয় এবং ইহার জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া ঐ অঞ্চলে সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত করে। এইরূপ বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টি বলে।

আয়ণবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চল হইতে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। কিন্তু মহাসাগর অতিক্রম করিবার সময় এই বায়ু জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত করে। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব আয়ণবায়ু উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আপেলেশিয়ান পর্বতে বাধা পাইয়া সেই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। কিন্তু আফ্রিকার উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব আয়ণবায়ু স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে না, সেজন্য আফ্রিকার উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতও হয় না। ফলে বিশাল সাহারা মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত দক্ষিণ-পূর্ব আয়ণবায়ু অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ পর্বতে বাধা পাইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত করে।

প্রত্যায়ণ বায়ু উষ্ণ অঞ্চল হইতে শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। তবে ইহার গতিপথে সমুদ্র থাকা চাই; নচেৎ কোনরূপ বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না। উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতে বাধা পাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ু উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপ-কূলের দক্ষিণাংশে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ুর প্রভাবে ক্যান্টাব্রিয়ান, পীরেনীজ, আল্প্‌স্‌ প্রভৃতি পর্বতের দক্ষিণে, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল ও টাসমেনিয়ায় শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ুতে ধূলিকণার অভাবে আকাশ আপাত-দৃষ্টিতে মেঘশূন্য বলিয়া মনে হইলেও, কখন কখন বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। অবশ্য এরূপ ঘটনা খুবই বিরল। সময়ে সময়ে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে বৃষ্টিপাত হইলেও সে বৃষ্টিবিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে না। কারণ উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ থাকায় এই বায়ুস্তরের উপরে ভাসমান মেঘ হইতে যে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টিকণা উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে পুনরায় বাষ্পাকারে উর্ধ্বে উত্থিত হয়।

উষ্ণ ও শীতল বায়ুপ্রবাহ পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরে যেমন কুয়াসা হয়, উচ্চ বায়ুস্তরেও তেমনি মেঘের সঞ্চার হয়। ফলতঃ কুয়াসা ও মেঘের গঠন প্রণালীতে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা, বারি-বর্ষণের ক্ষমতা, আকৃতি, গঠনপ্রণালী প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের মেঘকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

"সাইরাস" মেঘ বায়ুমণ্ডলের অতি উচ্চ স্তরে অবস্থান করে। ইহা দেখিতে অনেকটা সূত্রাকার বা পাখীর পালকের ন্যায়। কারণ ছয়-সাত মাইল উচ্চে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় এই শ্রেণীর মেঘ গভীর হইতে পারে না। ইহা এত পাতলা যে, ইহার মধ্য দিয়া সূর্য বা চন্দ্রের আলোক আসিতে বিশেষ বাধা পায় না। দিনমানে সাদা দেখাইলেও সূর্যাস্তের সময় এই মেঘ নানা-বর্ণে রঞ্জিত হয়। উচ্চ বায়ুস্তরে শৈত্যাধিক্যে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া "সাইরাস" মেঘ গঠিত হয়। এইরূপ মেঘে বৃষ্টি না হইলেও ইহার আবির্ভাবে অনেক সময় ঘূর্ণাবাত বা প্রতীপ ঘূর্ণাবাতের আবির্ভাব সূচিত হয়।

কুয়াসার ন্যায় দেখিতে, স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘকে "ষ্ট্রাটাস" মেঘ বলে। ইহার বিশেষ কোন আকার নাই। উষ্ণ ও শীতল বায়ুস্তরের মিলনক্ষেত্রে অর্ধ হইতে পাঁচ-ছয় মাইল উর্ধ্বে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শীতকালে সাধারণতঃ এই মেঘ দেখা যায়।

গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে স্তূপীকৃত পশমের ন্যায় যে মেঘ দেখা যায় তাহাকে "কিউমুলাস" মেঘ বলে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর উর্ধ্বগমনের ফলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া এইরূপ মেঘের সৃষ্টি হয়। ইহার উপরিভাগ গম্বুজাকৃতি ও তলদেশ সমান, সেজন্য দেখিতে অনেকটা ফুলকপির মত। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ইহার তলদেশের দূরত্ব মাত্র এক মাইল হইলেও ইহার শীর্ষদেশ প্রায় তিন মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত।

উপরোক্ত তিনপ্রকার মেঘে বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু আকৃতিবিহীন ঘন গভীর "নিম্বাস" নামক মেঘই বৃষ্টি বর্ষণ করে। ইহাকে "বাদল মেঘ" নামেও অভিহিত করা যায়। ইহার মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া এই মেঘের রং কৃষ্ণবর্ণ।

ঐ চারি প্রকার মেঘের সহিত আকৃতি ও স্বভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া মেঘের আরও কয়েক প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। সময় সময় সমস্ত আকাশব্যাপী যে পাতলা সাদা সাদা মেঘ দেখা যায় তাহাই "সাইরো-ষ্ট্রাটাস" মেঘ। আমরা যাহাকে সূর্য বা চন্দ্রের শোভা বলি তাহা এইরূপ মেঘে আলোকের প্রতিসরণ হেতু হইয়া থাকে। বেলাভূমিতে ছোট ছোট তরঙ্গের আঘাতে বালি যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপে সজ্জিত হয়, বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে সেইরূপ আকারের "সাইরো-কিউমুলাস" মেঘ দেখা যায়। অল্টো কিউমুলাস" (বারো হইতে কুড়ি হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত) মেঘের সহিত "সাইরো-কিউমুলাস" মেঘের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। "অল্টো-কিউমুলাস" মেঘ অনেক সময় সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় দেখায়। ইহা ব্যতীত "অল্টো-ষ্ট্রাটাস", ষ্ট্রাটোকিউমুলাস", "কিউ-মুলো-নিম্বাস" (গভীর ঘন পর্বতাকৃতি মেঘ, এই মেঘে বজ্রপাত ও মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়) প্রভৃতি

নানা প্রকারের মিশ্র মেঘ দেখা যায়। আকাশের কোথাও মেঘ না থাকিলেও কোন উচ্চ পর্বত শিখরে "ব্যানার ক্লাউড" নামক একরকম ধ্বজার ন্যায় মেঘ দেখা যায়।

মেঘের গতিবেগ নির্ভর করে, যে বায়ুতে মেঘ ভাসিয়া বেড়ায় সেই বায়ুর গতিবেগের উপর। বায়ুর যাহা গতিবেগ, মেঘেরও প্রায় সেই গতিবেগ হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, "ষ্ট্রাটাস" মেঘের গতিবেগ কম। নিশ্বাসের ঘণ্টায় বারো-তের মাইল হইতে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগ হয়। "সাইরাস"-এর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা অধিক। অক্ষাংশ ও ঋতুভেদে মেঘের গতিবেগের এমন কি উচ্চতারও তারতম্য লক্ষিত হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আকাশ বৈকালে যত মেঘময় থাকে, রাত্রিকালে বা প্রাতে ততটা থাকে না। মেঘের জলকণাগুলি অবিরত পরিবর্তিত হয়। কতক পুনরায় বাষ্পীভূত হয়, অবশিষ্টাংশ বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসে, আবার নূতন সৃষ্ট জলকণা সেই স্থান পূর্ণ করে। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেকটি বৃষ্টিবিন্দুই অল্পাধিক বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন—কোনটি ধনাত্মক, কোনটি ঋণাত্মক। বৃষ্টিবিন্দুতে এইরূপ তড়িতাবেশ বৃহত্তর বৃষ্টিকণা গঠনে সহায়তা করে।

যুগল তারার উৎপত্তি ও বিবর্তন

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' 'জুড়ি তারা' প্রবন্ধে যুগল নক্ষত্রদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে। আকাশে যেসব তারা কাছা-কাছি থেকে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে তাদের কি উপায়ে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তাদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি কি খবর পেতে পারেন তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে এদের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছে এবং উৎপত্তির পর এরা কিরূপ ভঙ্গীতে নিজেদের গতি ও রূপ নিয়ন্ত্রিত করেছে সেই বিষয়ের অবতারণা করা হবে।

বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও জগদানন্দ রায় এদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের 'নক্ষত্র পরিচয়' বইতে এদের খবর কিছু পাওয়া যাবে।

'জুড়ি তারা' নামটা বদলে এ প্রবন্ধে 'যুগল তারা' নাম দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যখন কোন নির্দিষ্ট পরিভাষা হয় নি তখন এদের যতগুলো নাম সম্ভব সাধারণের ও বিজ্ঞানীদের সামনে তা আনা ভাল। যে নামটা সব চেয়ে লাগসই তা আপনা থেকেই চলে যাবে। 'জুড়ি তারা' নামটতে অনেকের আপত্তি আছে, যদিও নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। জুড়ি কথাটার অর্থ সঙ্গী—সেই হিসেবে যুগল নক্ষত্রদের মধ্যে একটিকে অপরটির জুড়ি বলা যেতে পারে; কিন্তু এরা দুটিতে মিলে যা হয়েছে তাকে জুড়ি তারা বলা ঠিক হয়ত হবে না। সুতরাং যুগল তারা, যুগ্ম তারা, যমক তারা প্রভৃতি নামগুলোর মধ্যে বিচার করা প্রয়োজন যে, কোনটি ভাল।

যুগল নক্ষত্রদের আকাশে দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এদের আরম্ভ হল কি করে। এরা কি আজন্ম সঙ্গী, না হঠাৎ একদিন একটি অপরটিকে সঙ্গী বেছে নিয়ে অনন্ত নৃত্যে রত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা যুগল তারাদের সম্বন্ধে এমন কতকগুলো জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন যা থেকে এ প্রশ্নের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। তাই যুগল নক্ষত্রদের ইতিহাস ও জন্মবৃত্তান্ত

আলোচনা করবার আগে সেই তথ্যগুলো জেনে নেওয়া ভাল।

যুগল তারা একে অপরের চারিদিকে ঘোরে আপেক্ষিকভাবে উপবৃত্তের আকারে; অর্থাৎ একটি তারা থেকে দেখলে অন্যটির সঞ্চরণ-পথ উপবৃত্ত বলে মনে হবে। উপবৃত্ত অর্থে একটি বৃত্তকে চেপ্টে দিলে যা হয় তা-ই। কোনও গোল জিনিসের ছায়া টেরচা হয়ে মাটিতে পড়লে যে আকার নেয় তাকে উপবৃত্ত বলে। উপবৃত্ত আঁকবার আর একটা উপায় হলো—একটি কাগজে দুটি আলপিন পুঁততে হবে। তারপর একটি সুতার দু-প্রান্ত এই আলপিন দুটিতে বেঁধে একটি পেনসিল দিয়ে. সুতাটিকে টান করে ধরে পেনসিলটাকে সুতাটার গায়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলেই পেনসিলের শীষটা কাগজের গায়ে উপবৃত্ত এঁকে দেবে। সুতাটা অবশ্য একটু ঢিলে হওয়া প্রয়োজন। পিন দুটির দূরত্বকে সুতার মাপ দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রতা বলে। আর পিন দুটিকে বলে নাভি বা ফোকাস। উৎকেন্দ্রতা যত বেশী হবে উপবৃত্তটা ততই চ্যাপ্টা হবে।

সূর্যের চারদিকে গ্রহদের ঘোরাটাও ঠিক এই ধরণের। এক্ষেত্রে অবশ্য সূর্যের গতি প্রায় নেই বললেই হয়। কারণ, গ্রহের তুলনায় সূর্যের ভর এত বেশী যে, মোটা মানুষের মত তাঁর নড়াচড়াটা খুব কম এবং হাল্কা গ্রহদের ছুটাছুটি খুব বেশী। ফলে গ্রহগুলো উপবৃত্তের আকারে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং সূর্য থাকে উপবৃত্তটির মাঝখানে, নয় তার অন্যতম নাভিদেশে।

আকাশ-বিজ্ঞানীদের জানা আছে যে, যদি দুটা বস্তুর একটা অপরটার টানে ঘোরে তাহলে একটা পূর্ণ পাক দেওয়ার পর্য্যটন কালটা নির্ভর করে তাদের ভর ও গড় দূরত্বের উপর। গড় দূরত্বটা হলো সুতাটার মাপের অর্দ্ধেক বা উপবৃত্তের লম্বাই-এর অর্দ্ধেক। এর পারিভাষিক নাম অর্দ্ধ-পরাক্ষ এই পরাক্ষের সঙ্গে নাভিদ্বয়ের দূরত্বের, তথা উৎকেন্দ্রতার কোনও সংস্রব নেই।

সূর্যের যে গ্রহগুলো আছে তারা সবাই সূর্য্যের টানে ঘুরছে বলে তাদের পর্যটন কালের উপর ভরের প্রভাবটা সব ক্ষেত্রেই এক। সুতরাং এদের মধ্যে তুলনা করলে গড় দূরত্বের উপর পর্যটন কালের প্রভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে কোনও গ্রহের পর্যটন কালের ত্রিঘাতকে সূর্য থেকে দ্বিঘাত দিয়ে ভাগ করলে একই সংখ্যা উৎপন্ন হবে। পৃথিবীর পর্যটন কাল এক বছর এবং তার গড় দূরত্বকে (প্রায় ১০ লক্ষ মাইল) যদি একক ধরা যায় তাহলে পযটন কালের ত্রিঘাতকে দূরত্বের দ্বিঘাত দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া গেল ১। বৃহস্পতির দূরত্ব পৃথিবীর চেয়ে ১১·৮৬২ গুণ বেশী এবং তার সূর্য-প্রদক্ষিণের সময় ৫·২০৩ বছর। দেখা যাচ্ছে

$$\frac{(৫·২০৩)^৩}{(১১·৮৬২)^২} = \text{প্রায় ১}$$

অন্যান্য গ্রহের বেলায়ও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। অথচ গ্রহগুলোর গতিপথের উৎকেন্দ্রতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পৃথিবীর গতিপথের উৎকেন্দ্রতা ১/৫০, মঙ্গলের ১/১০, বুধের ১/১৫। দেখা যাচ্ছে যে, মঙ্গল সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে দূরে হয়েও তার উৎকেন্দ্রতা বেশী। সুতরাং সে হিসেবে বুধের উৎকেন্দ্রতা পৃথিবীর চেয়ে কম হওয়া উচিত, অথচ পৃথিবীর উৎকেন্দ্রতা বুধের উৎকেন্দ্রতার চেয়ে কম। গণিতজ্ঞেরাও অঙ্ক কষে দেখেছেন যে—ভর, দূরত্ব ও পর্যটন কাল অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হলেও উৎকেন্দ্রতা এদের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখে না। সে স্বাধীনভাবে নিজের খুসীমত কাজ করে। উৎকেন্দ্রতা নির্ভর করে প্রথম যেদিন পর্যটন আরম্ভ হয়েছিল সেদিনকার বেগ, দূরত্ব ও গতিপথের উপর।

গ্রহদের বেলায় এইভাবে উৎকেন্দ্রতার স্বাধীনতা লক্ষ্য করা গেলেও এবং গণিতজ্ঞেরা তদ্বিষয়ে একমত হলেও এটা দেখা যায় যে, বহু যুগল তারায়

উৎকেন্দ্রতার সঙ্গে পর্যটন কালের যেন একটা আবছা সম্বন্ধ রয়েছে। এই ছোট্ট খবরটুকু বিজ্ঞানীর চোখে কিন্তু বড়ই আশ্চর্য মনে হলো; কারণ গণিতজ্ঞের চোখে উৎপ্রেক্ষতার স্বাধীনতাটা বড়ই কঠোরভাবে পরিক্ষীত সত্য। সুতরাং বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে বাধ্য হলেন যে, যুগল তারার উৎপত্তি ও তার বিবর্তনের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনও নিয়ম কার্যকরী রয়েছে যা তার ঘোরার সময় ও উৎকেন্দ্রতার মধ্যে এই আবছা সম্বন্ধটুকু এনে দিয়েছে। সুতরাং এদের উৎপত্তি ও বিবর্তনের বিষয় চিন্তা করা জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন বোধ করলেন।

এছাড়াও যুগল নক্ষত্রদের মধ্যে আরও কয়েকটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার আছে। তারাদের মধ্যে একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী-বিভাগের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এ-প্রবন্ধে সম্ভব নয় ('নক্ষত্র পরিচয়' বইটির ২৫ পৃষ্ঠায় এই শ্রেণী-বিভাগের বর্ণনা আছে)। মোটামুটি এই শ্রেণী-বিভাগ হয়েছে তারার রঙের উপর। যথা: নীলাভ তারা, নীলাভ-সাদা তারা, সাদা তারা, হলদে তারা, নারাঙ্গি তারা ও লাল তারা। জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, বিবর্তনের পথে যে কোনও একটি তারা ধাপে ধাপে নীলাভ থেকে লাল নক্ষত্রে নেমে যায়। দেখা যায় যে, জুড়ি তারাদের মধ্যে যারা খুব তাড়াতাড়ি ঘোরে সেগুলো অনেকেই পড়ে নীলাভ শ্রেণীর কাছাকাছি; আর যাদের ঘোরবার সময় খুব বেশী তাদের টান সাদা ও হলদের দিকে। নারাঙ্গি শ্রেণীর জুড়ি খুবই বিরল এবং লাল শ্রেণীর জুড়ি প্রায় নেই বললেই হয়। অর্থাৎ বোঝা গেল যে, বিবর্তনের পথে তারারা যত এগিয়েছে তাদের ঘোরবার সময়টাও তত বেড়ে গেছে। এর অর্থ—জুড়ি তারারা ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; ফলে পর্যটন কালটাও বেড়ে চলেছে।

আরও দেখা যায় যে, নীলাভ সাদা শ্রেণীর যুগল তারাগুলো মোটামুটি নীলাভ শ্রেণীর চেয়ে হাল্কা; অর্থাৎ বিবর্তনের ধাপ নামার সঙ্গে তারাদের ওজন যাচ্ছে কমে।

বিবর্তনের ভিতর এরকম ঐক্য দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করলেন যে, প্রায় সমস্ত যুগলদেরই উৎপত্তির ইতিহাস এক। ফলে বিবর্তনের ধাপ নামবার সময় একই নিয়মে তাদের উৎকেন্দ্রতা ও দূরত্ব বদলাতে থাকে, যার ফলে দূরত্ব বা পর্যটন কালের সঙ্গে উৎকেন্দ্রতা একটা সম্বন্ধ বজায় রেখে চলে।

এবার যুগল তারাদের উৎপত্তি কি কি কারণে হওয়া সম্ভব এবং সেগুলোর মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য তা বিচার করা যেতে পারবে। যুগল তারাদের উৎপত্তি হতে পারে তিন রকম ভাবে:—প্রথম, একটি তারা তার অঙ্গ থেকে অপরটিকে সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়, মহাকাশে যাত্রার পথে দুটা কাছাকাছি আসা তারা পরস্পরের মহাকর্ষে বাঁধা পড়েছে। তৃতীয়, নীহারিকা থেকে এরা কাছাকাছি হয়েই সৃষ্ট হয়েছে।

এই তিনটি মতের মধ্যে প্রথমটিতেই উৎকেন্দ্রতার স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। বক্তব্যের কারণটা একটু সুপরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা যাক। বলা হয়েছে যে, উৎকেন্দ্রতাটা নির্ভর করে—প্রথম যেদিন প্রদক্ষিণ আরম্ভ হলো সেদিনকার গতি ও দূরত্বের উপর। সুতরাং মহাকর্ষের টানে ধরা-পড়া তারাদের গতি ও দূরত্বের মধ্যে কোনরূপ সংস্রব না থাকাই স্বাভাবিক। নীহারিকা থেকে উৎপন্ন যুগলদের বেলায়ও অনুরূপ যুক্তি খাটবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে উৎপন্ন যুগলদের মধ্যে উৎকেন্দ্রতা তার স্বাধীনতা অবশ্যই রক্ষা করবে। কিন্তু প্রথমটির বেলায় উৎকেন্দ্রতার স্বাধীনতা হারানোর যথেষ্ট কারণ আছে। কারণটা এবার বোঝান হবে।

নিজের দেহ থেকে দ্বিতীয় তারা সৃষ্টি হতে

পারে দুরকম ভাবে—প্রথমতঃ, ঘূর্ণ্যমান তারা থেকে একটা টুকরা ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কম্পমান তারার কাঁপন বেড়ে গিয়ে তা থেকেও টুকরা বের হতে পারে। প্রথম মতটি প্রচলিত করেছেন বিশেষভাবে জীন্‌স্‌ এবং দ্বিতীয় মতটিকে প্রচলিত করেছেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এলাহাবাদের অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এক্ষেত্রে কতটা বেগে টুকরা ছিট্‌কে বেরুলে কতদূর গিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করবে—এ দুটার মধ্যে সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। ফলে উৎকেন্দ্রতা ও দূরত্ব, তথা উৎকেন্দ্রতা ও পর্যটন কালের মধ্যে সম্বন্ধ এসে পড়ে। সুতরাং প্রথম উপায়ে অর্থাৎ অঙ্গ থেকে সৃষ্ট হয়েই যুগল তারার উৎপত্তি হয়, এটা মনে করাই স্বাভাবিক।

শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, কয়েকটা যুগল তারার উৎকেন্দ্রতা নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে। মনে করা যায় যে, এরা অন্য উপায়ে সৃষ্ট যুগল তারকা।

মেচ্‌নিকফ

শ্রীদিলীপকুমার দাস

'একটা কিছু করব বা বড় হব'—এই আশা নিয়ে বড় হয়েছেন, পৃথিবীর বিখ্যাত নরনারীর মধ্যে এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল হলেও কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন যাঁরা ছোটবেলা থেকে বড় হবার আশা পোষণ করে বড় হয়েছেন। বড় হতেই হবে, মনে মস্ত বড় আশা অথচ হতাশা ও নৈরাশ্যে বারংবার বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েও নতুন উদ্যম ও আশা নিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে গিয়েছেন ও সাফল্যলাভ করেছেন—এরকম একজন বিজ্ঞানীর জীবনী আজ আলোচনা করব। এঁর নাম হলো এলি মেচ্‌নিকফ।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন প্রায়ই আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে, তেমনি বিজ্ঞানীদের আবির্ভাবও খানিকটা আকস্মিকভাবেই ঘটে থাকে। বিজ্ঞানীরূপে মেচ্‌নিকফের আবির্ভাবও খানিকটা আকস্মিক বলেই মনে হয়। তাঁর জীবনী আলোচনা থেকেই সে কথা বোঝা যাবে।

মেচ্‌নিকফ জন্মগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ রাশিয়ায়, ১৮৪৫ সালে। তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদি। খারকভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিজ্ঞানের আলোচনায়, বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এসব কাজে নিজের সামর্থ্য অথবা অসামর্থ্যের কথা তিনি ভেবে দেখেন নি। জনৈক অধ্যাপকের কাছ থেকে ধার করে পাওয়া এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা তিনি বিভিন্ন পদার্থ পরীক্ষা করে দেখতেন ও সেসব পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পত্রিকায় লিখে পাঠাতেন। আবার যে প্রবন্ধ পাঠানো হয়েছে সেগুলো যাতে ছাপানো না হয় সে নির্দেশ দিয়ে তিনি প্রায়ই সম্পাদকদের কাছে চিঠি দিতেন। তিনি জানাতেন, তাঁর প্রবন্ধে ভুল আছে। এরূপ ভুল হবার কারণ, পূর্বদিনের পরীক্ষার ফলাফলের সংগে পরের দিনের ফলাফলের কোনও সংগতি থাকতো না। কাজেই এই বিপত্তি ঘটতো। আবার কোনও কোনও সময়ে হয়তো সম্পাদকেরাই তাঁর লেখা নাকচ করে দিতেন। এতে নৈরাশ্যে তিনি মাঝে মাঝে আত্মহত্যার সংকল্প করে বসতেন।

বয়স বিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই তিনি বলেছিলেন, আমার নিজের সামর্থ্য আছে; আমি প্রতিভাসম্পন্ন—আমি একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক হতে চাই। যে ব্যক্তি অল্প বয়সেই এতখানি আশা পোষণ করতেন তাঁর পক্ষে সামান্য নৈরাশ্যেই আত্মহত্যা করবার সংকল্পের কারণ খানিকটা আন্দাজ করতে পারা যায়।

পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি একজন নাস্তিক ছিলেন। সহপাঠী বন্ধুদের নিরীশ্বরবাদ বোঝাতে গিয়ে তাঁদের প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত করে তোলতেন। তখনকার দিনে রাশিয়ার বিপ্লববাদীদের উত্তেজনামূলক প্রচারপত্রাদি পড়তেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এই ভাবে পাঠ্যতালিকানুযায়ী পড়াশুনা না করেও বছরের শেষের দিকে সামান্য কয়েকমাস পড়াশুনা করে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ও মেধাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মেচ্‌নিকফ প্রায়ই তাঁর অধ্যাপকদের সঙ্গে কলহ বাধিয়ে নিজের কাজে নিজেই ব্যাঘাত ঘটাতে লাগলেন। তারপর, একদিন বিরক্ত হয়ে, 'রাশিয়ায় কোনও বিজ্ঞানই নেই' এই কথা বলে জার্মেনীর উর্জ্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। সেখানে তিনি কিছু রাশিয়ান ছাত্র খুঁজে বের করলেও তাঁরা তাকে ইহুদী বলে গ্রহণ করলেন না; ফলে, শেষ পর্যন্ত আবার দেশে ফিরে এলেন। সংগে তিনি কিছু বইও নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পেশিজ'ও ছিল। তিনি বইটা পড়ে ফেললেন ও ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক হয়ে উঠলেন। তারপর বহুদিন পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনবাদ তাঁর চিন্তাজগৎ অধিকার করে রইলো, অন্য সব কিছুই তিনি ভুলে গেলেন।

এরপর তিনি সত্যসত্যই জীবনের জয়যাত্রার পথে পা বাড়ালেন। ডারউইনের মতবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই গবেষণার কাজ নিয়েই তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে এক গবেষণাগার থেকে আর এক গবেষণাগারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

২৩ বছর বয়সে মেচ্‌নিকফ বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ক্ষয়রোগগ্রস্ত। স্ত্রীকে আরোগ্য করে তোলবার জন্যে তিনি তাকে নিয়ে ইউরোপে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রীকে শুশ্রূষা করার ফাঁকে সময় খুঁজে তিনি তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে ভোলেন নি। একটা চাঞ্চল্যকর কিছু আবিষ্কার করে যাতে একটা ভাল মাইনের অধ্যাপনার চাকরী পাওয়া যায়, সে চেষ্টাও তিনি করতে লাগলেন। ডারউইনের মতবাদের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' এই তত্ত্বটুকু প্রমাণ করবার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। এসময়ে তিনি উক্ত বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, উদ্‌বর্তিতেরা যোগ্যতম নয়, তারা ধূর্ততম।

এরপর মেচ্‌নিকফের স্ত্রী মারা যান। তাঁর স্ত্রীকে জীবনের শেষের দিকে মরফিন দিয়ে রাখা হতো। মেচ্‌নিকফের নিজেরও শেষ পর্যন্ত মরফিন গ্রহণ করবার অভ্যাস হয়ে যায় ও দিনের পর দিন মরফিনের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। এতে তাঁর চোখ ভীষণভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি হলেন একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, চোখ ছাড়া তাঁর চলবে কি করে? 'বেঁচে থাকব কিসের জন্যে' এই ভেবে তিনি আত্মহত্যা করবার জন্য একদিন প্রচুর পরিমাণে মরফিন গ্রহণ করেন। কিন্তু বমি হয়ে যাওয়াতে রক্ষা পান। এভাবে আত্মহত্যা করতে পারলেন না দেখে আর একদিন মেচ্‌নিকফ গরম জলে স্নান করে উন্মুক্ত বাতাসে ঠাণ্ডার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যান, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবেন আশায়। কিন্তু এতে তাঁর কিছুই হলো না, বরঞ্চ সেইদিন রাত্রে এমন একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়লো যাতে তিনি আবার গবেষণা নিয়ে মেতে গেলেন। একটা লণ্ঠনের শিখার কাছে তিনি কীট-পতঙ্গদের ঝাঁকেঝাঁকে ঘুরে বেড়াতে লক্ষ্য করেন ও তাদের স্বল্পায়ু দেখে ডারউইনের মতবাদের

'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এই তত্ত্বটুকু এদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় জাগে। আবার তিনি গবেষণার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে পড়েন।

এই সময়ে মেচ্নিকফ ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। মেচ্নিকফ এখানে একজন জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত ও পরিচিত হন। এই সময়ে তাঁর দুঃখ-দুর্দশার লাঘব হয়। অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির কিছুদিন পরে তিনি আবার বিবাহ করেন ও তাঁর স্ত্রী ওলগাকে ইচ্ছামত শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা করেন।

১৮৮৩ সাল—জীবাণু সম্বন্ধে পাস্তুর ও কক্-এর আবিষ্কারে সবাই বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। এমন সময় মেচ্নিকফও একদিন হঠাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী থেকে জীবাণু অনুসন্ধানকারী হয়ে পড়লেন। এ-দিকে আবার ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে তিনি পরিবারবর্গসহ সিসিলি দ্বীপে চলে যান এবং সেখানে তাঁর বাড়ীতেই ছোটখাট একটা গবেষণাগার গড়ে তোলেন। জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জেগে উঠলেও তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি তখন পর্যন্ত বোধহয় একটা জীবাণুও দেখেন নি।

একদিন তিনি স্পঞ্জ ও তারামাছের পরিপাকপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এদের শরীরের মধ্যে নিজদেহস্থ কোষ ছাড়াও আরও কতকগুলো ভ্রমণকারী কোষ মেচ্নিকফের নজরে পড়ে। এই কোষগুলো আকারে খুবই ছোট ও দেখতে প্রায় এককোষী অ্যামিবার মত। তারামাছের লার্ভার দেহ কাঁচের মত স্বচ্ছ। উক্ত লার্ভার দেহের মধ্যে মেচ্নিকফ খানিকটা কারমাইন প্রবেশ করিয়ে দেন এবং খুব উত্তেজনার সংগে লক্ষ্য করেন যে, ভ্রমণকারী কোষগুলো কারমাইনটুকু আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে ফেললো। মেচ্নিকফ তখন ভেবেছিলেন এদের কোষগুলো বোধহয় পরিপাক যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। এই ঘটনার পর তিনি যখন আবার এ-বিষয় নিয়েই ভাবছিলেন তখন বিশেষ কোন পরীক্ষা না করেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই সময় তিনি এতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ঘরের মধ্যে পায়চারী করেও তাঁর চিন্তিত মনকে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারছিলেন না। এজন্যে তাঁকে সমুদ্রতীরে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে, 'তারামাছের দেহাভ্যন্তরস্থ ভ্রমণকারী কোষগুলো যখন খাবার ও কারমাইন কণিকা খেয়ে ফেলে, তখন এরা নিশ্চয়ই জীবাণুও খেয়ে ফেলবে। এই ভ্রমণকারী কোষগুলো তারামাছকে অনিষ্টকারী জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। ভ্রমণকারী কোষগুলো ও রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো আমাদের রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে।...এরাই আমাদের রোগ-প্রতিরোধক শক্তির কারণ...এরাই মানবজাতিকে সাংঘাতিক ধরণের রোগজীবাণুর দ্বারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।' এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—মেচ্নিকফ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন হঠাৎ এবং এটা তিনি তখনই যাচাই করে দেখেন নি।

মানুষের শরীরের মধ্যে কাঁটা ঢুকে থাকলে তার চারধারে মৃত শ্বেতকণিকাগুলো পুঁজ হয়ে জমে থাকে। এই ব্যাপারটা স্মরণ করেই মেচনিকফ একদিন তারামাছের লার্ভার দেহে কতকগুলো গোলাপের কাঁটা বিঁধিয়ে দিলেন। তারপর দিন খুব ভোরে উঠেই ওই লার্ভাগুলো পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে, ওই কাঁটাগুলোর চারপাশে ভ্রমণকারী কোষগুলো ভীড় করে জমে রয়েছে। এরপর তিনি আর কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করেই স্থির করলেন যে, সকল প্রাণীর রোগ-

প্রতিরোধক শক্তির কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তখন ওই স্থানে উপস্থিত বিখ্যাত ইউরোপীয় অধ্যাপকদের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা বলেন। তিনি এতই নিপুণতার সঙ্গে বলেন যে, তখন জীবাণু সম্বন্ধে প্রচারিত তথ্যাদি যে সমস্ত অধ্যাপক ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতেন না, তাঁরাও সেদিন মেচ্‌নিকফের কথায় সায় দেন।

মেচ্‌নিকফ তাঁর তথ্যাদি প্রচারের জন্যে ভিয়েনায় চলে যান। তাঁর প্রধান বক্তব্য হলো আমাদের শরীরের ভ্রমণকারী কোষগুলো রোগ-জীবাণু খেয়ে ফেলে। ভিয়েনায় তাঁর বন্ধু প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ক্লস-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন ও অধ্যাপক ক্লস মেচ্‌নিকফের তথ্যাদি তাঁর পত্রিকায় ছাপাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাঁরা দুই বন্ধুই ঐ জীবাণুগুলোকে কি নাম দেওয়া যেতে পারে, এই ভাবনায় বিব্রত হয়ে পড়েন। অভিধান দেখে তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন—ঐ জীবাণুগুলোর নাম হবে 'ফ্যাগোসাইট'। ফ্যাগোসাইট সম্বন্ধে মেচ্‌নিকফ তাঁর গবেষণা ও তথ্যাদি প্রচার করে যেতে থাকেন। তিনি ভিয়েনা থেকে ওডেসা চলে যান এবং সেখানকার চিকিৎসকমণ্ডলীর এক সভায় ঐ ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর রোগ-আরোগ্যকারী শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করে তোলেন। তিনি নিজে সঠিকভাবে এবিষয়ে কিছু লক্ষ্য করেছেন কিনা এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও ফ্যাগোসাইটকে রোগজীবাণু মেরে ফেলতে দেখেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেননি।

মেচ্‌নিকফ জানতেন, তাঁর তথ্যাদি সত্যিকারের পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। তা না হলে সেগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে গৃহীত হবে কেন? তিনি একরকম জলজ মাছি খুঁজে বের করেন। এগুলোর দেহও তারামাছের লার্ভার মত স্বচ্ছ, বাইরে থেকে স্বচ্ছন্দে দেহাভ্যন্তর দেখা যায়। তিনি এই জলজ মাছিগুলোর দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। একদিন তিনি বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলেন—একটা মাছি 'ঈষ্ট' জীবাণু গিলে ফেললো। তিনি ঐ জীবাণুটাকে মাছিটার পাকস্থলীর মধ্যে নেমে যেতে দেখলেন। তারপরই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যেটা লক্ষ্য করলেন সেটা হলো, ঐ মাছিটার পাকস্থলীর ফ্যাগোসাইটগুলো 'ঈষ্ট' জীবাণুটাকে ঘিরে ফেলে আস্তে আস্তে খেয়ে ফেললো।

এই সামান্য পর্যবেক্ষিত ঘটনার মধ্যে মেচ্‌নিকফ রোগ-প্রতিরোধক শক্তির সূত্র খুঁজে পেলেন। ওই মাছির শরীরে ফ্যাগোসাইটগুলো 'ঈষ্ট'-জীবাণুকে পরাভূত করতে অক্ষম হলেই 'ঈষ্ট'-জীবাণুগুলো সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও তাদের দেহ থেকে নিঃসৃত একপ্রকার বিষ মাছিগুলোকে মেরে ফেলে। অন্যান্য প্রাণীদের শরীরেও এইরকম ঘটনা মেচ্‌নিকফ আশা করতে লাগলেন।

১৮৮৬ সালে পাস্তুর ১৬ জন রাশিয়ানকে পাগলা নেকড়ে বাঘের দংশনজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাশিয়ানদের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। রাশিয়ান কৃষকেরা ওডেসাতে একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্যে এই ঘটনার কিছু পরেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মেচ্‌নিকফ এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি এই সময়ে ব্যাং ও বানরের ফ্যাগোসাইটের রোগ-জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন। উক্ত গবেষণাগারের প্রধান কাজ ছিল ভ্যাক্‌সিন তৈরী করা। তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হবার পর মেচ্‌নিকফ গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর নিজের গবেষণার কার্যে বেশী ব্যস্ত, ভ্যাক্‌সিন তৈরীর কার্যের ভার অন্য কারও ওপর ন্যস্ত করা হোক। তাঁর বন্ধু ডাঃ গ্যামেলিয়া প্যারিস থেকে এবিষয়ে শিক্ষালাভ করে ভ্যাক্‌সিন তৈরীর কাজ দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন।

এদিকে মেচ্‌নিকফ নিত্য নতুন তথ্যাদি প্রচার করে ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন।

কতকগুলো কারণে মেচ্‌নিকফ উক্ত গবেষণাগার ছেড়ে যাবার কথা ভাবছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ছুটি নিয়ে ভিয়েনায় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেখান থেকে প্যারিসে পাস্তরের সংগে দেখা করতে যান। পাস্তর তখন জীবাণু নিয়ে গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মেচ্‌নিকফের প্রচারিত তথ্যাদি সম্বন্ধে সম্মতিসূচক মত প্রদান করেন এবং বলেন যে তাঁর ধারণা মেচ্‌নিকফ ঠিক পথেই গবেষণা চালাচ্ছেন। জীবাণু অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে পাস্তর তখন প্রধান। তাঁর মত ব্যক্তির এই ধরণের মতপ্রকাশে মেচ্‌নিকফ গর্ববোধ করেন। তিনি পাস্তরের গবেষণাগারে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবার সুযোগ পাবার জন্যে পাস্তরের কাছে আবেদন জানান। পাস্তর মেচ্‌নিকফের জন্যে একটা গবেষণাগার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। এর কয়েকমাস পরেই মেচ্‌নিকফ প্যারিসে পাস্তর ইনস্‌টিটিউটে যোগদান করেন। এখানে তাঁর স্ত্রী ওল্‌গাও তাঁকে গবেষণাগারের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন।

পাস্তর ইনস্‌টিটিউটে প্রবেশ করবার আগেই মেচ্‌নিকফের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়া থেকে তাঁর মতবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেখানকার জীবাণু অনুসন্ধানকারীরা। বৈজ্ঞানিক সম্মিলনীতে ও প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলোতে মেচ্‌নিকফের বিরুদ্ধবাদীরা সমানে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যান। মেচ্‌নিকফ আবার হতাশায় দমে পড়েন। আত্মহত্যা করবার সংকল্প আবার তাঁর মনের মাঝে জেগে ওঠে।

কিন্তু তাঁর এই হতাশা ক্ষণিকের জন্যে। এমিল বেরিং মেচ্‌নিকফের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, সকল প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তি জন্মে তাদের দেহের রক্ত থেকে, ফ্যাগোসাইট থেকে নয়। প্রত্যুত্তরে মেচ্‌নিকফ বললেন, ফ্যাগোসাইটগুলোই রোগজীবাণু খেয়ে ফেলে ও আমাদের রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। এবার মেচ্‌নিকফ তাঁর তথ্যাদি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁদের এই তর্কযুদ্ধ প্রায় বিশবছর ধরে চললো।

এপর্যন্ত মেচ্‌নিকফ যতগুলো পরীক্ষা করেছিলেন তার সবগুলোই তাঁর মতবাদকে বিরুদ্ধবাদীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই করেছিলেন। এসব পরীক্ষা দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ফ্যাগোসাইট অনেক সময় সাংঘাতিক ধরণের রোগজীবাণুও খেয়ে ফেলে। এসব পরীক্ষা করবার সময় তিনি নিজে অনেক রোগজীবাণু, এমন কি কলেরা জীবাণুও খেয়েছেন এবং তাঁর সহকর্মীদের খাইয়েছেন। এক ধরণের জীবাণু যে আর এক ধরণের জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে, অর্থাৎ রোগজীবাণুধ্বংসকারী ফ্যাগোসাইটদের কথা উল্লেখ করে তিনি মানুষের রোগপ্রতিরোধক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মীদের বলতেন, 'এই ক্ষুদ্র রোগজীবাণুগুলো যে কিরূপ বহুপ্রজ সেটা লক্ষ্য করো। অনুকূল অবস্থার মধ্যে বাড়তে দিলে এরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে ও সমগ্র মানবসমাজ ধ্বংস করে ফেলতে সমর্থ হবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এদেরও শত্রু আছে এবং বিনাকষ্টেই এরা ঐ রোগজীবাণুগুলোকে মেরে ফেলতে পারে। মানুষ তার শরীরে প্রায় সকলপ্রকার রোগজীবাণু বহন করে। তোমাদের শরীরের মধ্যেও বহুপ্রকার রোগজীবাণু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জীবিত আছে।' তারপর, সহকর্মীদের মধ্যে যে কোনও একজনকে দেখিয়ে বলতেন, 'তুমি তো একজন যুবক এবং বেশ স্বাস্থ্যবানও, কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তোমার মুখ ও অন্ত্রের মধ্য থেকে আমি বহু

রোগজীবাণু বের করতে পারব।' পরীক্ষাদ্বারা তিনি তাঁর এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করতেন এবং একজন স্বাস্থ্যবান যুবকের শরীর থেকেও যক্ষা জীবাণু, ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু প্রভৃতি বের করতে সমর্থ হতেন। তারপর তিনি তাঁর সহ-কর্মীদের প্রশ্ন করতেন, "আচ্ছা বলতো, জীবাণু-গুলো এই ব্যক্তির শরীরে এইরূপ নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে আছে কেন? এটা কি আমাদের প্রকৃতিজ অথবা স্বোপার্জিত রোগপ্রতিরোধক শক্তির জন্যে? এই শক্তির জন্যে ওরা আংশিকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকতে পারে; কিন্তু ওদের নিস্তেজ-ভাবে পড়ে থাকবার আরও একটা কারণ আছে। কারণটা হলো আমাদের শরীরে আর এক ধরণের জীবাণুর অবস্থিতি। এরা আমাদের শরীরের রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরণের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে। সেই অস্ত্রের কথা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের জানা নেই।" তিনি একথাও বলতেন, 'রোগজীবাণু মেরে ফেলতে পারে এমন কোনও শক্তিশালী রাসায়নিক অস্ত্রের অধিকারী জীবাণু নিশ্চয়ই আছে।'

এই উক্তিগুলো থেকেই মেচ্‌নিকফের মতবাদ ও যে মতবাদের সূত্র ধরে তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন এবং জীবনে খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হতে পেরে ছিলেন, সেটা বোঝা যাবে।

পূর্বোক্ত সুদীর্ঘ কালব্যাপী তর্কযুদ্ধে মেচ্‌নিকফ জয়ী হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের স্বপক্ষে আনতে সমর্থও হয়েছিলেন। এরপর বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি তাঁর গবেষণা ও গবেষণালব্ধ মতবাদ সম্বন্ধে বিরাট এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে তাঁর সুদীর্ঘকালের গবেষণার সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

মেচ্‌নিকফের অনুসন্ধানী দৃষ্টি হঠাৎ আবার অন্য দিকে ঘুরে যায়। মানুষের বৃদ্ধবয়সের বিজ্ঞান ও মৃত্যুবিজ্ঞান—এই দুই বিজ্ঞানের উদ্ভট কল্পনা তাঁর মাথায় জাগে এবং তিনি তাঁদের যথাক্রমে নাম দেন—'জেরোনটোলজি' (Gerontology) ও থেনানটোলজি (Thenontology)। এসময়ে তাঁর অনুসন্ধান কার্য আবার ভিন্নমুখী পথ ধরলো। তিনি শুনে ছিলেন, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার একটা কারণ হলো—শিরাগুলো শক্ত হয়ে যাওয়া। মদ্য-পান, সিফিলিস ও কতকগুলো রোগের জন্যেও শিরা শক্ত হয়ে যায়।

এই সময় মেচ্‌নিকফ এ-সম্পর্কীয় গবেষণায় মনোযোগী হলেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী রুক্স। বানরের শরীরে সিফিলিস রোগ সংক্রামিত করে সেই সংক্রমণ বন্ধ করা যায় কিনা, অথবা ঐ রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে তোলা যায় কিনা—এই ছিল তাঁদের গবেষণার বিষয়। মেচ্‌নিকফের অবশ্য আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল এই গবেষণার পেছনে। সিফিলিস কিভাবে শিরাগুলোকে শক্ত করে ফেলে, সেটা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁরা তাদের গবেষণার ব্যয়ভার বহন করলেন নিজেরাই, যে বৃত্তি পেয়েছিলেন তাই দিয়ে।

পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট ওরাংওটাং ও শিম্পাঞ্জিতে ভরে উঠলো। সিফিলিস রোগীর দেহ থেকে সিফি-লিসের জীবাণু নিয়ে একটা শিম্পাঞ্জির শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেখা গেল, শিম্পাঞ্জি সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে চার বছরেরও বেশী সময় ধরে তাঁরা (মেচ্‌নিকফ ও রুক্স) এক বানরের দেহ থেকে আর এক বানরের দেহে রোগের বীজ ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন এবং এই রোগের কোনও প্রতিষেধক বের করতে পারা যায় কিনা, তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। মেচ্‌নিকফ একটা বানরের কানে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন ও ২৭ ঘণ্টা পরে সেই কানটা কেটে নিলেন। পরে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, সেই বানরটার শরীরে কখনও সিফিলিসের লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। মেচ্‌নিকফ ভাবলেন, এই রোগের জীবাণু যে জায়গা দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে সেখানে;নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ

পর্যন্ত অবস্থান করবার পর শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। মানবদেহে কি ভাবে এই রোগ সংক্রামিত হয় সেটা যখন জানা আছে তখন ওই জীবাণু শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়বার আগেই একটা প্রতিকার করা যেতে পারে।

অবশেষে মেচ্‌নিকফ ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট আবিষ্কার করলেন। দুটা বানরের শরীরে একটা জায়গায় একটুখানি আঁচড়ে দিয়ে ঐ স্থানে সিফিলিসের জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। একটা বানরের ওই আঁচড়ানো জায়গায় একঘণ্টা বাদে ক্যালোমেল মলমটা ঘষে দেওয়া হলো। আর একটাকে কিছুই করলেন না। যে বানরটার শরীরে মলম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটার কিছুই হলো না, কিন্তু অপরটা সিফিলিস রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হলো। মানবদেহেও অনুরূপ পরীক্ষা করে মেচ্‌নিকফ সাফল্যলাভ করলেন।

মেচ্‌নিকের এই আবিষ্কারে নীতিবিদরা ভীষণভাবে প্রতিবাদ জানালেন। এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের ফলে ব্যভিচারজনিত শাস্তি বন্ধ হবে—এই রব তুললেন নীতিবিদরা। মেচ্‌নিকফ প্রত্যুত্তরে বললেন, 'রোগটা যেহেতু ব্যভিচারজনিত সেই হেতু এর বিস্তার প্রতিষেধনের ওষুধ আবিষ্কারে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সকল প্রকার নৈতিক প্রতিষেধকও যখন সিফিলিস রোগের বিস্তার ও তা থেকে নির্দোষ ব্যক্তিরও শাস্তিভোগ বন্ধ করতে পারে নি তখন সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে এই রোগ দূরীকরণের প্রচেষ্টা ব্যাহত করাও অসাধুতা'।

গবেষণারত জীবাণু অনুসন্ধানকারী মেচ্‌নিকফের জীবন প্রদীপ একদিন নিবে গেল। তিনি ৭১ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। এই হলো মেচ্‌নিকফের সংক্ষিপ্ত জীবনী। একটা বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে যদি শৃংখলা ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে যেরূপ দেখতে পাওয়া যায়, মেচ্‌নিকের জীবনী সমগ্রভাবে বিচার করে দেখলে আমরা সেরূপই দেখতে পাই।

মেচ্‌নিকফের নাম ডারউইন বা পাস্তুরের মত বিখ্যাত নয়। কর্মবহুল জীবনে তিনি যে বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন তা-ও নয়। তবুও বিজ্ঞান জগতে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা যে ব্যক্তির মাথা দিয়ে বেরুত, যে ব্যক্তি খেয়ালের তাড়নায় চলতেন—তিনিই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—জীবাণুজগতে জীবাণুদের মধ্যে পরস্পরের সংগ্রামে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু পরাভূত হচ্ছে আর এক শ্রেণীর জীবাণুর কাছে। মানবসমাজ যে শেষোক্ত শ্রেণীর জীবাণু দ্বারা প্রভূতভাবে উপকৃত হতে পারে, তার ইঙ্গিত মেচ্‌নিকফ দিয়ে গেলেন। আজ পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি অ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধসমূহ আবিষ্কারে আমরা তাঁর কল্পনাকে সার্থকরূপে রূপায়িত হতে দেখছি।

মেচ্‌নিকফের জীবনী আলোচনায় তাঁকে সাধারণভাবে যত কাছে থেকে দেখা যায়, সেইভাবেই দেখা হয়েছে। আশা করি পাঠক পাঠিকারা তাঁকে সেইভাবেই গ্রহণ করবেন

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের "নিবেদন"

[১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরের ৩০শে নভেম্বর তার দ্বাত্রিংশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস। বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসে আচার্যদেব যে বাণী দিয়েছিলেন—এই উপলক্ষ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো।]

"বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই-সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাস বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাহারা কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন আমাদের কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।"

* * *

"যে-সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই-সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা

ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত-হস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে-আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূর স্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহু চর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির, সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।"

* * *

"কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তূষ্ণীভূত অসীম জীবসঞ্চারে, অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার

পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভুত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মানুষের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারত-খণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও আর্থিক ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখ মোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য।

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরে গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।"

বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে। ১৯১৭

দীক্ষা

"আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যহই শিখিতেছি, দিন দিন অগ্রসর হইতেছি, এবং বাড়িতেছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'গাছের উপর যে পাখীটি বসিয়া

আছে তাহাই লক্ষ্য, পাখীটি কি দেখিতে পাইতেছ?' অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, 'না পাখী দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বিঘ্ন বাধার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

তবে সেই লক্ষ্য কি? লক্ষ্য, শক্তি সঞ্চয় করা যাহা দ্বারা অসাধ্যও সাধিত হয়।

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনরূপ সঞ্চয় করে না, যে পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।

যে সঞ্চয় করিয়াছে সেইই শক্তিমান, সেইই তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করিবে। কে এই সাধনার পথ ধরিবে?

এজন্য কেবল অল্প কয়েকজনকেই আহ্বান করিতেছি। দুই এক বৎসরের জন্য নহে, কিন্তু সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার জন্য। দেখিতেছ না ধূলিকণার ন্যায়, কীটের ন্যায় জীবন পেষিত হইতেছে! ভীষণ জীবন চক্রের গতি দেখিয়া ভীত হইয়াছ? স্বভাবের নির্ম্মম, কাণ্ডারীহীন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ? কিন্তু তোমাদেরই অন্তরে দৈব দৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল কর। হয়ত প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, উদ্দেশ্যে দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে, এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার আহার উল্কাপিণ্ড, তাহার শিরায় শিরায় গলিত ধাতুর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য ধূলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না; জীবনও হয়ত তবে অবিনশ্বর। মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা একই স্থানে উপনীত হই। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ কর। জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ তোমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক। নির্ভীক বীরের ন্যায় জীবন মহাহবে নিক্ষেপ কর।"

ডি, ডি, টি

শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ

এই পৃথিবী মনুষ্যবাসের উপযোগী হইলেও একেবারে নিরাপদ নয়। সৃষ্টির আদি হইতেই মানুষকে এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করিতে হইয়াছে। দৃশ্য ও অদৃশ্য, নানা শত্রুর সহিত অবিরত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া তাহার অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইয়াছে। এই সংগ্রামে সে কখনও অস্ত্রবল, কখনও বা বুদ্ধিবলের সাহায্য লইয়াছে।

কীট পতঙ্গাদি প্রথমোক্ত শ্রেণীর শত্রু হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই, বুদ্ধিবলেই ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এইসব কীট-পতঙ্গের মধ্যে মশা, মাছি, পঙ্গপাল বিস্তর ক্ষতিসাধন করে এবং মানুষের নিরুপদ্রব জীবনে বহু বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ইহাদের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষকে নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। তাই সংক্রামক রোগবাহী মাছির স্পর্শদোষ হইতে খাদ্য রক্ষার জন্য মানুষ ঢাকনা স্থাপন করে, মশার কামড় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মশারি ব্যবহার করে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কীট-পতঙ্গের অত্যাচার নিবারণ করা যায় না। ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি কিরূপে রোধ করা যায় বা ব্যাপকভাবে ইহাদের বিনাশ সম্ভবপর হয়, ইহাই ছিল বিজ্ঞানী-দের বহুকালের চিন্তনীয় বিষয়।

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কতকগুলি কীটধ্বংসী রাসায়নিকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পাইরেথ্রাম ও রোটেনন্ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আদর্শ কীটধ্বংসী হিসাবে ইহাদের অনেক ত্রুটি আছে। কেরোসিনের সহিত পাইরেথ্রাম মিশাইয়া যে রাসায়নিক জিনিসটি ব্যবহার করা হয় তাহাতে কোন কোন রোগবাহী কীটের বিষক্রিয়া নষ্ট হইলেও, ইহার কীটধ্বংসী ক্রিয়া বেশী স্থায়ী হয় না। অপরপক্ষে রোটেননের ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলেও, ইহা কেবল চূর্ণরূপেই ব্যবহার করা করা চলে।

তাহা ছাড়া এই দুইটি কীটধ্বংসী স্বভাবজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন, কোনও রাসায়নিক সংমিশ্রণ ক্রিয়ায় এগুলিকে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। ইহার পর জৈব ও অজৈব বহু রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ডি, ডি, টির ন্যায় একটিও আদর্শস্থানীয় হয় নাই।

বিগত যুদ্ধের সময়েই বহু অবজ্ঞাত ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোথেনের গবেষণা ও বহু প্রচলন হইয়াছে, যদিও বহু পূর্বেই ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাসবোর্জে ওথমার জিডলার নামে জনৈক ছাত্র তাঁহার থিসিস ডিগ্রীর জন্য রাসায়নিক সংমিশ্রণ প্রণালীতে ডি, ডি, টি প্রস্তুত করেন। তখন কিন্তু ইহার কীটধ্বংসী গুণসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। মাত্র ছয় লাইনে তিনি তাঁহার আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ডি, ডি, টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আর কোন আগ্রহ দেখান নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াই ছিল।

নয় দশ বৎসর পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডের মুলার সাহেব ডি, ডি, টি-র কীটধ্বংসী গুণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে আলুর ফসল যখন একপ্রকার গুবরে পোকার দ্বারা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল তখন ডি, ডি, টি

প্রয়োগে উহা বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইল। ডি, ডি, টি-র বিস্ময়কর গুণাবলীর কথা নিউইয়র্কে জানান হইলেও নিউইয়র্ক সরকার এবিষয়ে কোন আগ্রহ প্রদর্শন করিলেন না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে ১০০ পাউণ্ড পরিমাণ ডি, ডি, টি উৎপন্ন হইল। ঐ ব'সরই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কৃষিবিভাগ ডি, ডি, টি-র কীটধ্বংসী গুণাবলীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঐ কৃষিবিভাগ মানুষের চর্ম ও চুলে যে সব কীট জন্মায়, তাহার উপর ডি, ডি, টি-র ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ডি, ডি, টি-র আশ্চর্য ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্জন জেনারেলের অফিসও এই বিষয়ে বেশ উৎসুক হইলেন। ইহার পর যুক্তরাষ্ট্রে ডি, ডি, টি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইল। বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিও ইহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং বহু গবেষণার ফলে বৃটেনেও ডি, ডি, টি-র উৎপাদন ও প্রচলন বৃদ্ধি পাইল। তবে এখনও এত বেশী পরিমাণে ডি, ডি, টি উৎপাদিত হয় নাই, যদ্দ্বারা কৃষিকার্যে কীট-পতঙ্গের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে।

দেওয়ালে ডি, ডি, টি ছড়াইলে যে কোন কীট-পতঙ্গ মরিয়া যায় এবং ইহার ক্রিয়া তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। তাই হাসপাতালে ডি, ডি, টি-র ব্যবহারে বহু উপকার সাধিত হয়। ইহার দ্বারা বিছানা ধৌত করিলে প্রায় একবৎসর যাবৎ বিছানায় কোন ছারপোকা আসে না। যে সব কাপড়ে (বিশেষতঃ গরম কাপড়ে) পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকে, ইহা দ্বারা সেইসব কাপড় পরিশ্রুত করিলে একমাস পর্যন্ত আর ঐ সব পোকা জন্মাইতে পারে না। পোষাক-পরিচ্ছদ ডি, ডি, টি-তে ধুইলে ৬।৮ সপ্তাহ আর পরিষ্কার করিবার দরকার হয় না। এইভাবে ডি, ডি, টি ব্যবহারে বিগত মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যেরা প্রভূত উপকার পাইয়াছিল।

ডি, ডি, টি-র ক্রিয়া রোটেনন বা পাইরেথ্রামের মত অল্পস্থায়ী নয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডি, ডি, টি-র প্রচলন মানুষের কল্যাণ-সাধনে অনেকখানিই সাহায্য করিয়াছে। যে বদ্ধজলে মশার কীট জন্মায় সেই জলে ডি, ডি, টি ছড়াইলে মশার কীটগুলি মরিয়া যায়, তবে যে সব কীটের ডানা হইয়াছে তাহারা ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। প্লেগের সময় ডি, ডি, টি-র বহুল প্রয়োগ আমরা দেখিয়াছি। ইহার দ্বারা প্লেগাক্রান্ত ইঁদুর মরে না, তবে ইঁদুরের গায়ে যে বীজাণুবাহক কীট থাকে, সেই কীটগুলি ধ্বংস হয়। তাই ডি, ডি, টি প্লেগ সংক্রমণ অনেকাংশে নিবারিত করে। ডি, ডি, টি সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে। মানবকল্যাণে ডি, ডি, টি যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। যে জিনিসটিতে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবার সম্ভাবনা আছে, যাহাতে প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মূল কারণ অপসারিত হইতে পারে, সেই ডি, ডি, টি যে আবিষ্কারের ইতিহাসে উচ্চস্থান লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান-সংবাদ

উন্মাদ রোগের চিকিৎসা

বৃটেনে গত ২০ বৎসরে বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকদের চিকিৎসার জন্যে নানা রকম উন্নত ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার প্রত্যেকটি উন্মাদাশ্রম এইসব হতভাগ্যদের জন্যে হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। এই ধরণের হাসপাতালগুলো ১৯৪৮ সালের স্বাস্থ্য আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে কাজ করছে।
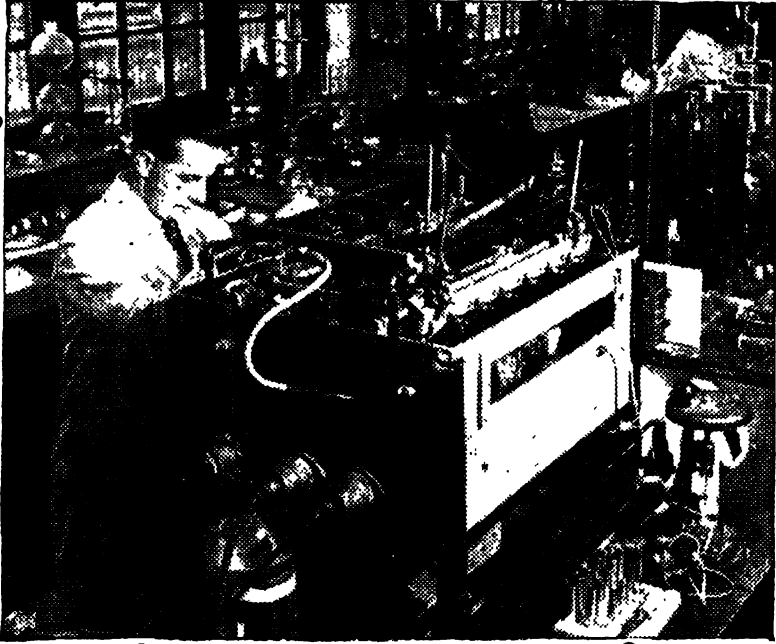
বায়োকেমিক্যাল লেবরেটরীতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রক্ত ও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত গবেষণা চলছে।

গত ২০ বছরের মধ্যে বৃটেনে বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকদের চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পূর্বে উন্মাদাশ্রমে এই সব লোকদের প্রধানতঃ আটক রাখা হতো। সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না বললেই চলে, যেটুকু ছিল তাও নিতান্ত সামান্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসকদের সহায়তায় এদিকে বর্তমানে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। প্রত্যেকটি উন্মাদাশ্রম আজ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যান্য অসুখবিসুখের মত মস্তিষ্কের ব্যাধি সারানো সম্ভব—চিকিৎসকদের এই বিশ্বাস বৃটেনে সকলের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনের পক্ষে এটা কম বড় আশার কথা নয়।

মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের মস্তিষ্ক তরঙ্গ বা 'ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম' নেওয়া হচ্ছে

মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের নানারকম শিল্প ও কারিগরি ব্যাপারে ব্যাপৃত রাখা হচ্ছে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীদের দেহ বিশেষভাবে এক্স-রে করে পরীক্ষা করা হয়। এতে রোগের মূল নিরূপণ করা চিকিৎসকদের পক্ষে সহজ হয়। রোগীর বাড়াবাড়ি অবস্থায় চিকিৎসার জন্যে অনেক সময় নিদ্রাকর্ষক ওষুধের সাহায্য নেওয়া হয়, যাতে সে অন্ততঃ তিন সপ্তাহকাল "অচৈতন্য" থাকে। তারপর জ্ঞান ফিরে আসবার পর ধীরে ধীরে তার চিকিৎসা চলে।

রোগের প্রথম অবস্থায় যাতে রোগী চিকিৎসার সুযোগ পায় তার চেষ্টা হয়; কা.ণ তাতে তার সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

এসব রোগীরা চিকিৎসায় কিছু সুস্থ বোধ করলে তাদের স্বতন্ত্র স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়। সেখানে তারা স্বাধীনভাবে লাইব্রেরী, ক্লাব, ক্যাফে এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা করে নতুনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পায়। পুরুষ রোগীরা অনেক সময় হাসপাতালের ফার্মে সব্জি, ফল ইত্যাদি তৈরী করার কাজে সাহায্য করে থাকে।

উন্মাদাশ্রমের ভোজনাগারের বসবার ব্যবস্থা

বৃটেনের প্রায় সমস্ত উন্মাদ-আশ্রমগুলো ১৯৪৮ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য আইনের অধীনে এসেছে। তার ফলে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ব্যাপক গবেষণার ফলে চিকিৎসা কার্য সহজ হয়েছে।

লণ্ডন এয়ারট্রাফিক কণ্ট্রোল টাওয়ার

ইতিহাস বিখ্যাত "টাওয়ার অব লণ্ডনের" কথা অনেকেই জানেন; কিন্তু লণ্ডনের আর একটি 'টাওয়ার' বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কম প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। তার কথা আজ হয়তো অনেকেরই জানা নেই। এর নাম "লণ্ডন টাওয়ার",—লণ্ডন এয়ার পোর্টের 'এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্রোল টাওয়ার'। বি ও এ সি-র "স্পীডবার্ড" এবং অন্যান্য বিমানগুলোর ক্যাপ্টেন এবং রেডিও অফিসাররা ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের উপরে এসে সর্বদা অবতরণের সময় রেডিও টেলিফোনের সাহায্যে এই টাওয়ারের পরামর্শ নিয়ে থাকেন।
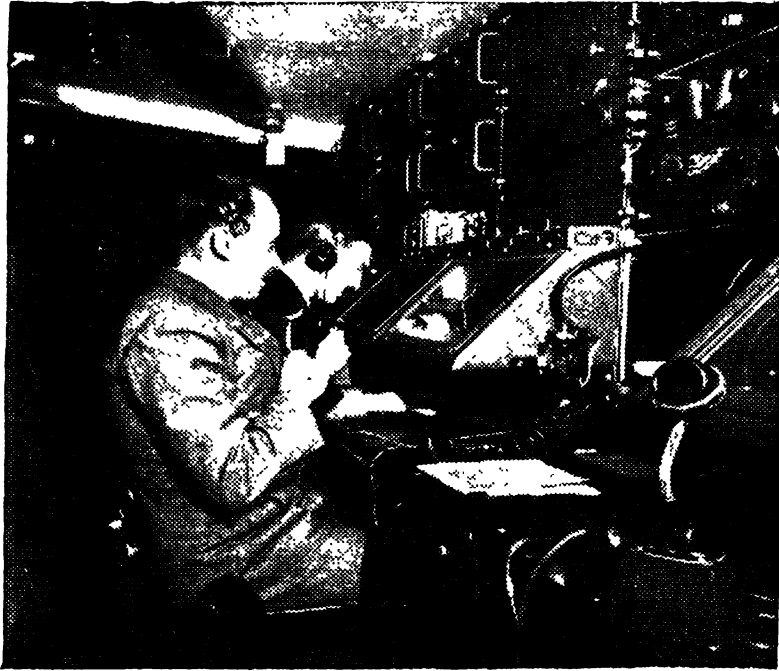
জি, সি, এ, কণ্ট্রোলার বিমানকে কুয়াসার মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে অবতরণ করার জন্যে চালকের সঙ্গে কথা বলছেন।

তাঁরা পাহাড়ের এবং মেঘের আড়াল থেকে লণ্ডন এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্রোল এলাকার সীমানার মধ্যে এসে রেডিও সংকেত দিয়ে "লণ্ডন টাওয়ারের" কাছ থেকে নির্দেশ নেন। লণ্ডনের মধ্যভাগে এই কণ্ট্রোল এলাকার পরিধি প্রায় ৩০ মাইল।

বিমানের রেডিও-কম্পাস থেকে তার অবস্থান বুঝে ক্যাপটেন রেডিও টেলিফোনে সংকেত পাঠান "কলিং লণ্ডন টাওয়ার। স্পীডবার্ড জর্জ ওবো চার্লি এসে পৌচেছে। আবহাওয়া এবং উচ্চতা সম্পর্কে নির্দেশ দাও।"

"লণ্ডন টাওয়ার" তার 'এ্যাপ্রোচ কণ্ট্রোলে'র লাউড স্পীকারে তা স্পষ্ট শুনতে পায় এবং তখনই তাকে কণ্ট্রোল এলাকার মধ্য দিয়ে রেডিও সাহায্যে পথের নির্দেশ দেয়।

বিমান অবতরণের জায়গায় র‍্যাডার যন্ত্রপাতি নিয়ে একদল লোক সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে, তারা র‍্যাডার স্ক্রীনের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং সময় মত পাইলটকে রেডিও টেলিফোন সাহায্যে অবতরণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়।
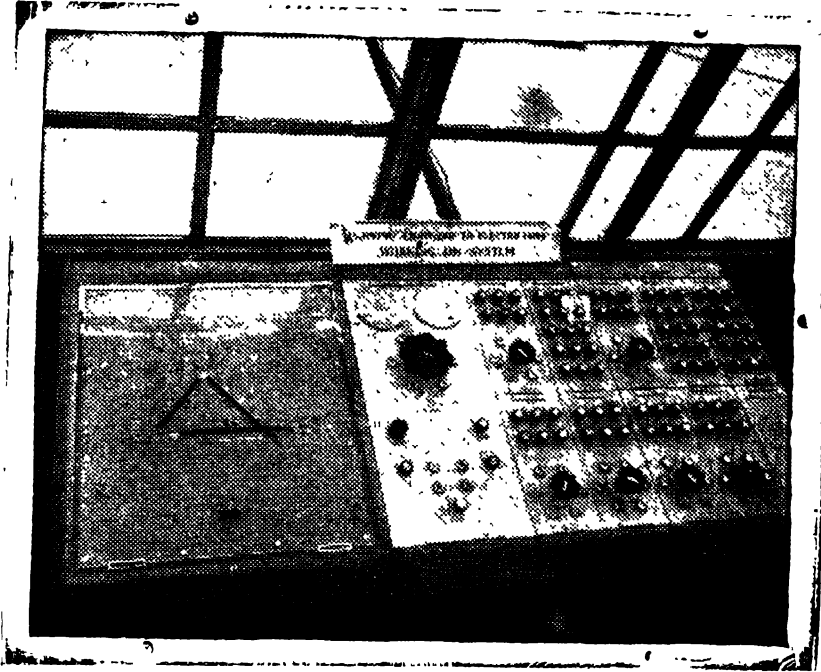
বিমানক্ষেত্র আলোকিত করবার জন্যে লণ্ডন কণ্ট্রোল টাওয়ারের আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

জর্জ ওবো চালির ক্যাপ্টেন তখন নীচের নির্দেশ অনুসারে এয়ারপোর্টের কাছে এগিয়ে আসে। বিমানটি এয়ার পোর্টের ১০ মাইলের মধ্যে এলে র‍্যাডার স্ক্রীনের উপর তার গতি ধারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হতে থাকে, তাতে বিমানটি নির্দিষ্ট পথে 'রানওয়ের' ব্যবস্থা অনুযায়ী এগিয়ে আসছে কিনা তা লক্ষ্য করা সম্ভব হয়।

ক্যাপ্টেন বিমানে বসে 'ইয়ারফোনে' শুনতে পায় "তুমি আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। আরো তিন ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসো......আরো এক ডিগ্রী দক্ষিণে......হ্যাঁ এবার সোজা চলে এসো...... তুমি ৫০ ফিট বেশী উঁচুতে রয়েছ......এখনও দু-মাইল পথ......আরও ৩০ ফিট নেমে এসো......।

তারপর কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন মুখ তুলে সামনে তাকিয়ে দেখে—রানওয়ে। বিমানটি সশব্দে নেমে আসে, ইঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। বিমানের দরজার মধ্য দিয়ে ভেসে আসে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর "আপনারা এই পথে আসুন।" যাত্রা শেষ হয়।
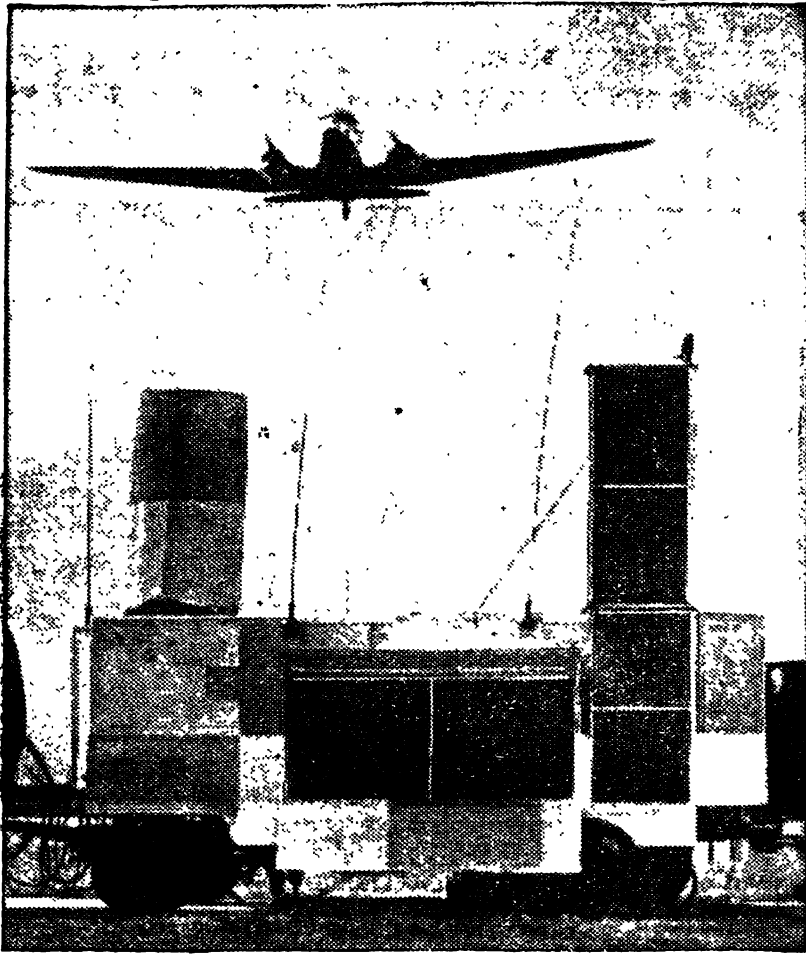
র‍্যাডার কণ্ট্রোলের সাহায্যে বিমানের নির্বিঘ্নে অবতরণ মহড়া।

"অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউনহলে এসম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালার লেপ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর সার উইলিয়ম মেকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-উর্ম্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটী রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয়কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ স্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কণী তার হীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি সাধনে কৃতিত্ব দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্ব্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত; এখন বিনাতারে সর্ব্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র, ১৩২৮
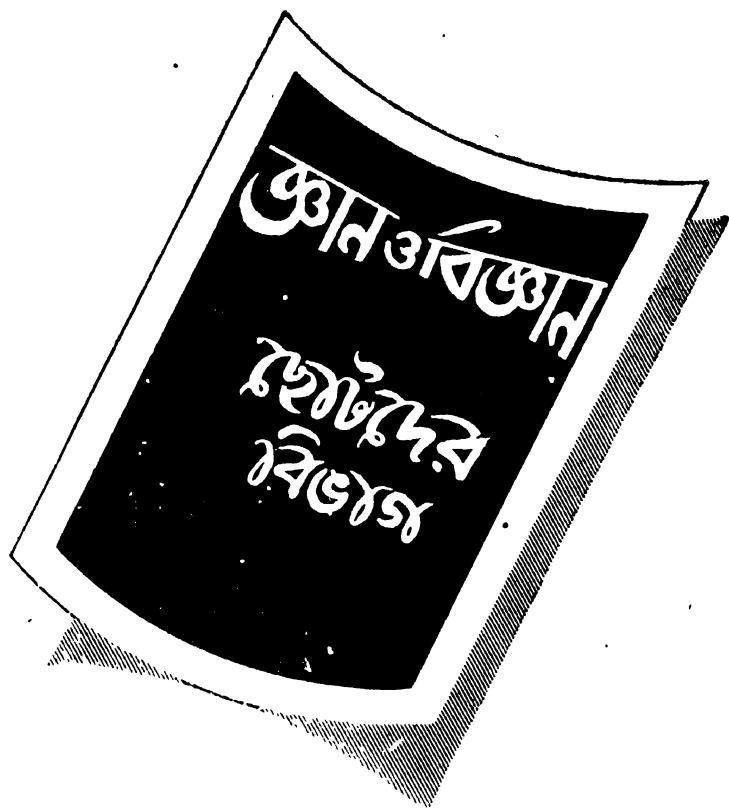
নভেম্বর—১৯৪৯
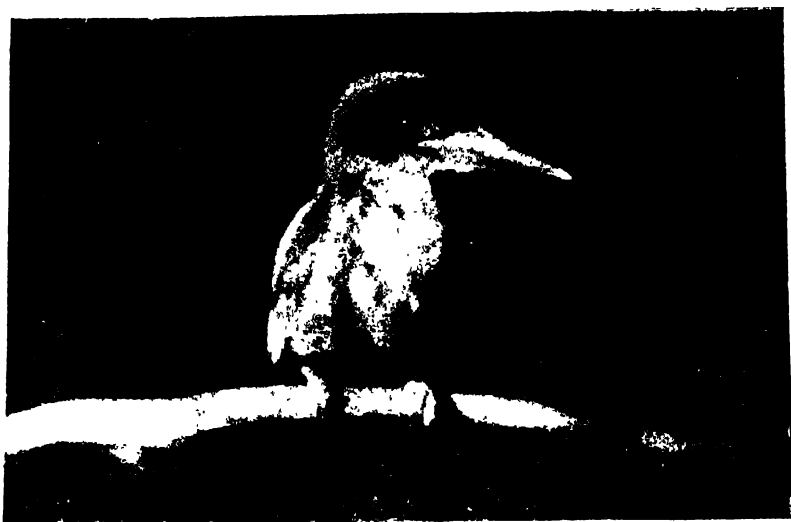
শ্রীমান শংব চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত ফটো।

ব্যাঙের জীবন

সামনের মাসের জন্যে ব্যাঙের জীবন সম্পর্কে তোমাদের প্রবন্ধ পাঠাতে আহ্বান জানাচ্ছি। ছবিতে ব্যাঙের জীবনের অবস্থা-পরিবর্তনগুলো দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙের জীবনের পরিবর্তনের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তোমরা এ সম্বন্ধে যা দেখেছ বা যা জান অল্প কথায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' অন্ততঃ দুপৃষ্ঠার বেশী না হয়— প্রবন্ধ লিখে পাঠাও। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখবে। সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হবে।

করে দেখ

পেরিস্কোপ

তোমরা খেলার মাঠে বা বিরাট সভাসমিতিতে নিজের হাতে তৈরী পেরিস্কোপ ব্যবহার করতে অনেককেই দেখেছ। দৃষ্টিপথে কোন বাধাবিঘ্ন থাকলে পেরিস্কোপের সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করতে পারা যায়। বিভিন্ন রকমের পেরিস্কোপ তৈরী হতে পারে এবং তৈরী করাও খুব সহজ। তোমরা যাতে নিজের হাতে তৈরী করতে পার সেজন্যে দুরকমের পেরিস্কোপ তৈরীর উপায় বলে দিচ্ছি; আশাকরি তোমরা অন্ততঃ একটা যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা করবে।

কার্ডবোর্ড, টিন, কাঠ বা অন্য কিছু দিয়ে একটা লম্বা চতুষ্কোণ বাক্সের মত তৈরী কর। এই লম্বা বাক্সটার দু-প্রান্তে দু-দিকে দুটা চতুষ্কোণ গর্ত কর। উপরের প্রান্তে একখানা চৌকা আর্শি ৪৫ ডিগ্রিতে হেলানো-ভাবে বসাও। এ আর্শিখানার কাচটা থাকবে নীচের দিকে মুখ করে। নীচের গর্তের কাছেও পূর্বের আর্শিখানার মত ৪৫ ডিগ্রি হেলিয়ে আর একখানা আর্শি বসাও। এ আর্শিখানার কাচটা থাকবে উপরের দিকে। উপর ও নীচের দুটা আর্শিই এমন ভাবে হেলিয়ে বসাবে যেন তারা পরস্পর সমান্তরাল থাকে। এবার লম্বা বাক্সটার উপরের মুখ উঁচু করে ধরে নীচের কাচখানার দিকে তাকালেই যে কোন প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে দূরের দৃশ্য দেখতে পাবে। ১ নম্বর ছবিখানা ভাল করে দেখে যন্ত্র তৈরী করতে চেষ্টা কর।
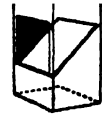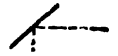
১নং চিত্র

এছাড়া একটা লম্বা লাঠির দুপ্রান্তে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে দুখানা আর্শি বসিয়ে দিলেও

ঠিক ওই রকমের কাজ হবে। উপরের কাচখানাকে সুতা বেঁধে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থাও করতে পারে।
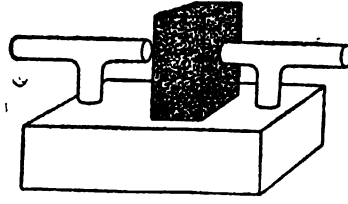
২নং চিত্র

আর একরকম পেরিস্কোপ তৈরী করতে পার—যা একটু জটিল হলেও তৈরী করতে তেমন কোন গুরুতর অসুবিধা নেই। ২ নম্বর ছবি দেখ। যন্ত্রটা হবে এই ছবির মত। শক্ত কার্ডবোর্ডের চওড়া একটা বাক্স যোগাড় কর। ইংরেজী T অক্ষরের মত কাগজের দুটি চোঙ তৈরী করতে হবে। T-এর আকৃতিবিশিষ্ট এই চোঙ দুটিকে বাক্সটার গায়ে ছিদ্র করে এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। এবার ৩ নম্বরের ছবি দেখ। দুটা চোঙের মধ্যেই
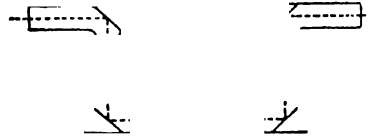
৩নং চিত্র

দুখানা করে আর্শি ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে বসাতে হবে। চোঙের আর্শির মুখ থাকবে নীচের দিকে। চোঙ বরাবর বাক্সের তলায়ও দুদিকে দুখানা আর্শি থাকবে হেলানোভাবে, উপরের আর্শির সমান্তরালে। নীচের আর্শি দুখানার মুখ থাকবে উপরের দিকে।

যে কোন একদিকের চোঙের মধ্য দিয়ে তোমার বন্ধুদের কোন একটা জিনিস দেখতে বল। বেশ দেখা যাবে। এবার একখানা ইট, কাঠ বা মোটা বই চোঙ দুটোর মধ্যস্থলে ২নং ছবির মত করে দাঁড় করিয়ে দাও। বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভাববে—এবার আর চোঙের মধ্য দিয়ে পূর্বের সেই দূরের জিনিসটাকে আর দেখা যাবে না। কিন্তু চোঙের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে তারা অবাক হয়ে যাবে। দূরের জিনিসটা আগের মতই দেখা যাচ্ছে। ইট, কাঠ বা বই মধ্যস্থলে রাখাতেও দেখবার অসুবিধা হচ্ছে না। গ. চ. ভ.

জেনে রাখ

পৃথিবীর অতীত যুগের কথা

আমাদের পৃথিবীর বয়স কত—বলতে পার? সন, তারিখ নির্দেশ করে সে কথা বলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবীতে মানুষ জন্মাবার বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। বহুকাল বলতে কিন্তু দু'চার হাজার বা দু'চার লাখ বছর নয়, কোটি কোটি বছর বোঝায়। কিন্তু মানুষের কৌতূহল অদম্য। পৃথিবীর বয়স এবং তার অতীতের ইতিহাস জানবার জন্যে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এই চেষ্টার ফলেই এপর্যন্ত জানতে পারা গেছে যে, পৃথিবীর বয়স এক বিলিয়ন বা দু' বিলিয়ন বছরের কম নয়। (বিলিয়ন = ১,০০০,০০০,০০০)। কি অভাবনীয় ব্যাপার! চেষ্টা করে দেখো—কল্পনা করতে পার কিনা।
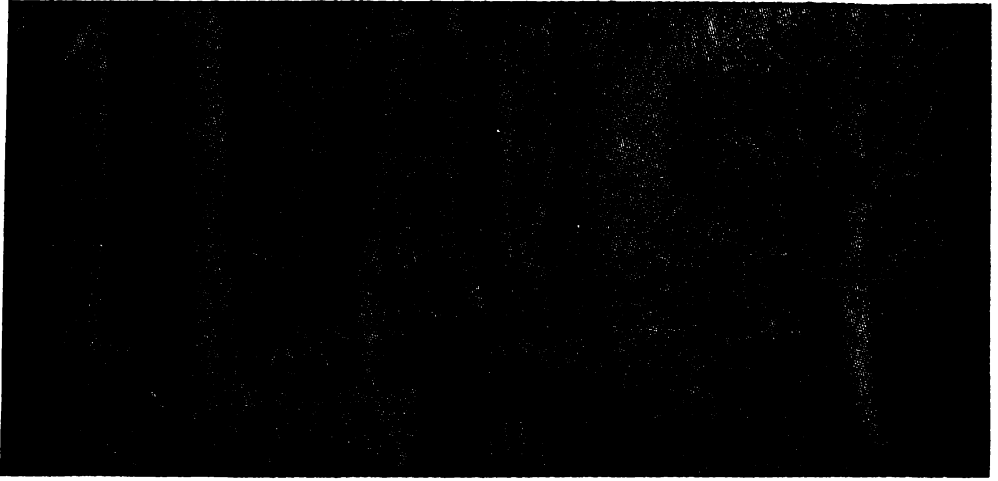
কার্বনিফেরাস যুগের বিশালকায় অসার উদ্ভিদাদির নমুনা

কিন্তু কথা হচ্ছে—পৃথিবীর বয়সের এ হিসেব পণ্ডিতেরা পেলেন কেমন করে? বিভিন্ন উপায়ে তাঁরা পৃথিবীর বয়সের এই হিসেবটা সংগ্রহ করেছেন। প্রধান একটা উপায় হচ্ছে—কোন নির্দিষ্ট স্তর থেকে সংগৃহীত একটুকরা পাথর চূর্ণ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা থেকে সমস্ত সীসা পৃথক করে নেওয়া। দেখা গেছে—ইউরেনিয়াম নামক ধাতব পদার্থ ধীরে ধীরে সীসার রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানেন—ইউরেনিয়াম থেকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সীসা উৎপন্ন হতে কতটা সময় লাগতে পারে। কাজেই পাথরের বিভিন্ন স্তরের সীসার পরিমাণের হিসেব থেকে পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায়। আর এক রকমের উপায় হচ্ছে—পাথরের একফুট পুরু স্তর গড়ে

উঠতে কতটা সময় লাগতে পারে তার হিসেব করা। এই হিসেব পেলে পৃথিবীর বুকের উপরের শিলা-স্তরগুলো মোট যতটা পুরু তা থেকেও পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করা যেতে পারে। মোটের উপর এ-ধরণের আরও অন্যান্য উপায়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়সের হিসেব করে দেখেছেন। বিভিন্ন হিসেবে প্রায় একই রকম ফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় প্রায় দু'বিলিয়ন বছর। পৃথিবীর বয়সের এ-হিসেব ঠিকই হোক, কি অঠিকই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। মোটের উপর আমাদের মাস, বর্ষ গণনার হিসেবে পৃথিবী যে বয়সে অতি প্রাচীন এবং এই অভাবনীয় দীর্ঘ অতীতে যে অসংখ্য বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর বুকে অসংখ্য রকমারি শিলাস্তর রয়েছে। যেসব শিলার স্তর-বিন্যাস সুস্পষ্ট, সেগুলো সম্পর্কেই জীবতত্ত্ববিদেরা অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত। গতি পরিবর্তনের জন্যেই হোক, কি বাধা পাওয়ার ফলেই হোক নদনদীর স্রোতের বেগ মন্দীভূত হলে সেখানে পলি পড়তে সুরু করে। বছরের পর বছর এক স্তরের উপর আর এক স্তর করে ক্রমাগতই পলি জমতে থাকে। পলিস্তর যত বাড়ে ততই তাদের চাপে নীচের স্তরগুলো ক্রমশঃ প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। স্রোতের সঙ্গে আনীত উদ্ভিদাদি ও নানারকম জীবজন্তুর মৃতদেহ এসব পলিস্তরে প্রোথিত থেকে যায়। সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ধ্বংসকারী জীবাণুর আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে থাকে এবং কালক্রমে প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ে। এগুলোকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল। জীবাশ্ম, জীবের আসল অস্থি নয়, প্রস্তরীভূত নকল মাত্র। হাজার হাজার বছরে পাথরে পরিণত পলিস্তরের মধ্যে ওই সকল জীবাশ্মগুলোকে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খনি প্রভৃতি খোঁড়বার সময়েই কিছু কিছু জীবাশ্মের সন্ধান মেলে। তাছাড়া কদাচিৎ অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া কোন কোন জীবজন্তুর পায়ের দাগ বা লতাপাতার অবিকল ছাপ পাথর বা কয়লার স্তরে পাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে পলিস্তর সংগঠনের সময় চাপা পড়ে এগুলো সংরক্ষিত হয়েছিল।
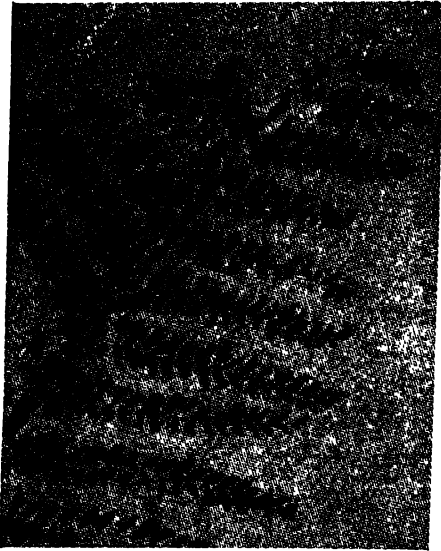
কয়লাস্তরে প্রাপ্ত ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের ছাপ

একথা সহজেই বুঝতে পার—নিম্নতম শিলাস্তরই সবচেয়ে পুরনো এবং উপরের স্তর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া জীবজন্তু, গাছপালার ফসিলের

তুলনামূলক বিচার করলেই বোঝা যায়—পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে একই রকমের গাছপালা বা জীবজন্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সবচেয়ে নীচের স্তর থেকে যতই উপরের দিকে আসা যায় ততই দেখা যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের রকমারি ক্রমশঃই বেড়ে গেছে। দেহ গঠনের জটিলতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রমাণ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা গেছে—মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে সবাইর শেষে। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে কি রকমের জীবজন্তু ও গাছপালার অস্তিত্ব ছিল সেকথা জানবার জন্যেই শিলাস্তর ও তার
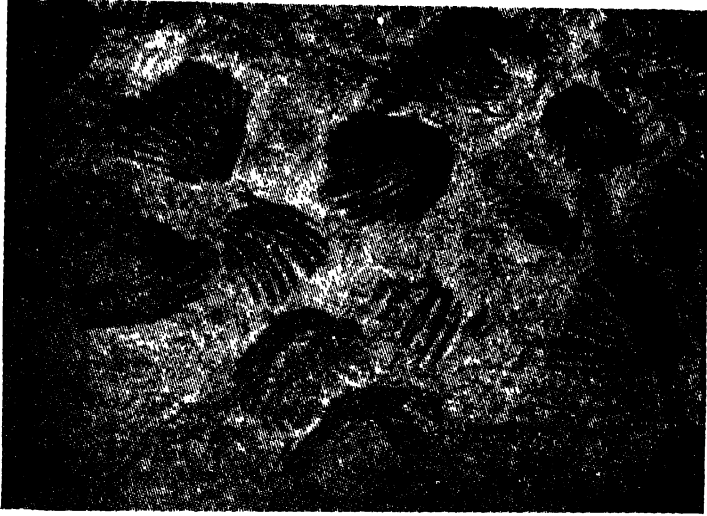
বেলে পাথরে প্রোথিত অতীত যুগের প্রস্তরীভূত ঝিনুকের খোলা

মধ্যে প্রোথিত জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির ফসিলের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। তোমরা বলতে পার—সমুদ্রের তলায় যেসব পলিস্তর জমছে সেগুলো আমাদের দৃষ্টি গোচরে আসবে কেমন করে? কিন্তু একথা মনে রেখো—পৃথিবীর বুকের উপর অনবরতই ভাঙা-গড়া চলছে। আজ যেখানে সমুদ্র, হাজার হাজার বছর পরে সেখানে হয়তো তার অস্তিত্বই থাকবে না—সেখানে হয়তো বিস্তীর্ণ বালুকারাশি বা বিশাল স্থলভাগ আত্ম-প্রকাশ করবে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর আজকের মানচিত্রের সঙ্গে তখনকার মানচিত্রের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুদূর অতীতে অধিকাংশ স্থলভাগই জলে নিমজ্জিত ছিল। যেখানে ছিল নিম্নভূমি সেখানে বিশাল পর্বত আত্মপ্রকাশ করেছে। এরূপ ভাঙাগড়ার ব্যাপার আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। কাজেই সমুদ্রের নীচের শিলীভূত পলিস্তরে সংরক্ষিত জীবাশ্মের নমুনা যে মানুষের গোচরীভূত হবে সেটা মোটেই অসম্ভব নয়।

যাহোক, শিলাস্তরে প্রাপ্ত আদি জীব ও তাদের ক্রম-পরিণতির অবস্থানুযায়ী পৃথিবীর এ বয়সটাকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়েছে। এর আদি বা প্রথম যুগের নাম

দেওয়া হয়েছে—এজোয়িক মহাযুগ। দ্বিতীয় যুগের নাম হলো প্রোটারোজোয়িক মহাযুগ। প্রথম এ দু-যুগের ঘটনা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝা যায় না। কারণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসিল প্রভৃতি বিপর্যস্ত বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এজোয়িক মহাযুগে জীবের অস্তিত্বের কোনই চিহ্ন পাওয়া যায় নি। প্রোটারোজোয়িক বা দ্বিতীয় মহাযুগে শ্যাওলা জাতীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রোটোজোয়া
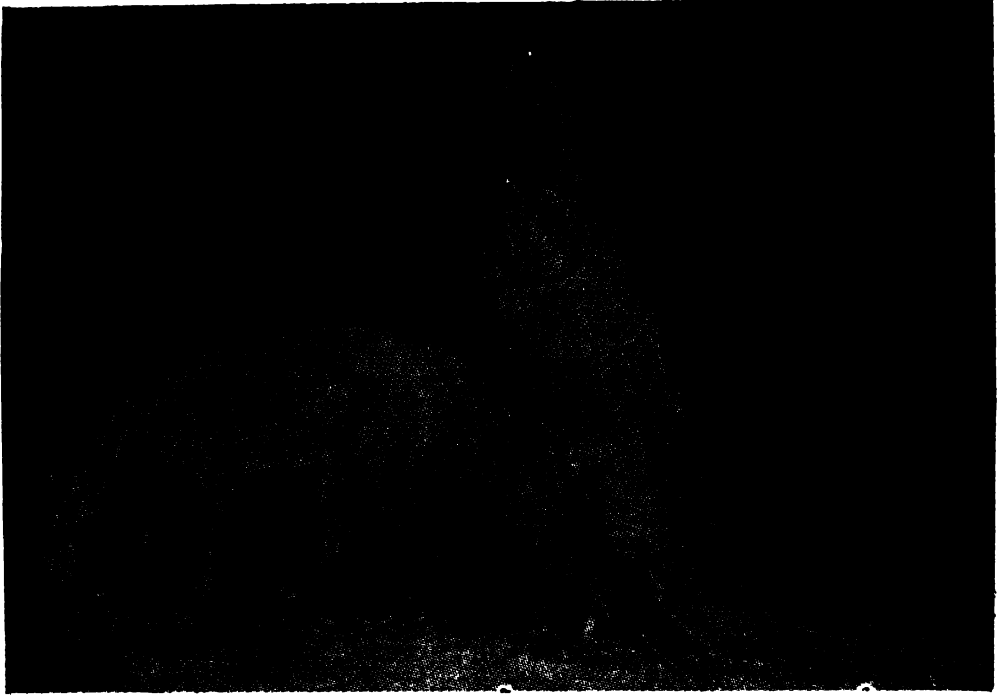
হংস-চঞ্চু ডাইনোসোর

ও সামুদ্রিক কৃমিজাতীয় জীবের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে। এসব এবং আরও অন্যান্য প্রমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন—আদি জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল—জলে, বিশেষ করে সমুদ্রের অগভীর জলেই তাদের উৎপত্তি। পৃথিবীর এই আদি যুগের বয়স কত সেকথা কেউ বলতে পারে না। দ্বিতীয় যুগ প্রায় ৬০০ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে এই দ্বিতীয় যুগের শেষ হয়। তৃতীয় যুগকে বলা হয়—পেলিয়োজোয়িক মহাযুগ। একে আবার কয়েক যুগে ভাগ করা হয়েছে। শিলাস্তরের প্রমাণ থেকে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে শামুক, ঝিনুক, ট্রিলোবাইট প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখা যায়। অর্ডোভিশিয়ান যুগে শামুক, কৃমির সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যায়। সিলুরিয়ান যুগে ট্রিলোবাইটদের সংখ্যা কম দেখা যায় এবং

এরাকনিড জাতীয় ও মৎস্যজাতীয় প্রথম মেরুদণ্ডী জীবের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। ডিভোনিয়ান যুগে প্রচুর মৎস্য জাতীয় জীব, বিভিন্ন জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ, বিশাল আকৃতির
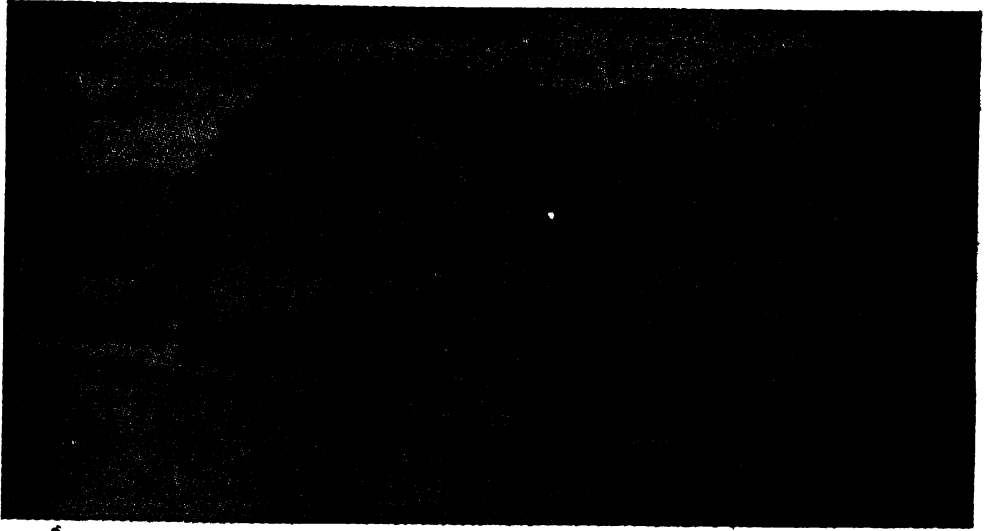
অতীতযুগের ব্রোন্‌টোসোরাস বা বজ্র টিকটিকির কঙ্কাল

শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের চিহ্ন বিদ্যমান। স্থলভাগে তখনও উদ্ভিদ ও প্রাণীর চিহ্ন নাই। কেবল উপকূলের ধারে ধারে পোকামাকড় অধ্যুষিত শৈবাল জাতীয় অসার বৃক্ষলতার সমাবেশ। পেলিয়োজোয়িক মহাযুগের পর হলো কার্বনিফেরাস যুগ। এ যুগে
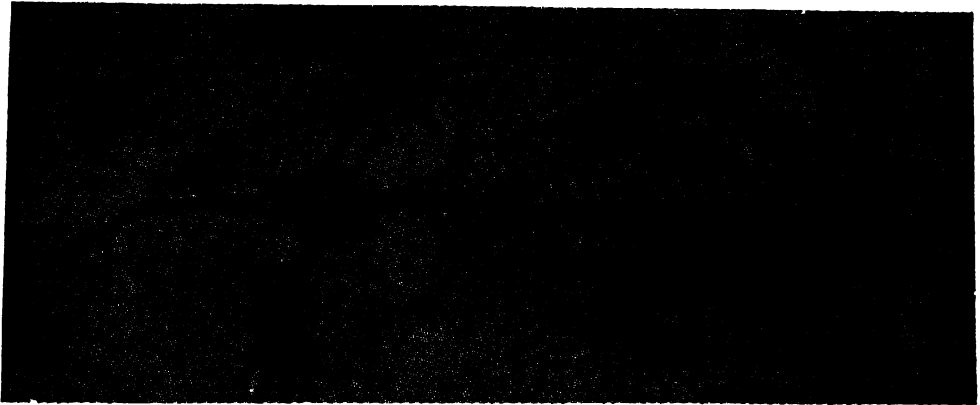
দু-শ' মিলিয়ন বছর আগেকার এক জাতীয় উভচর প্রাণীর কঙ্কাল

স্থলভাগে উদ্ভিদ, পোকামাকড় ও উভচর প্রাণীদের আবির্ভাব দেখা যায়। পরবর্তী পারমিয়ান যুগে অপুষ্পক গাছপালার অসম্ভব বৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দেখা যায়। এর পরে হলো—মেসোজোয়িক মহাযুগ। এ-যুগে সরীসৃপের প্রাধান্য। অতিকায় টিকটিকি,

সাপ, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি রকমারি অগণিত সরীসৃপ তখন পৃথিবীতে বিচরণ করতো। কতকগুলো সরীসৃপ আবার কিছুটা উড়তেও পারতো। একশো ফুটের মত লম্বা বিশালকায় কতকগুলো সরীসৃপ ছিল এ-যুগের জীবজগতের বিশেষত্ব। এ-যুগেই সপুষ্পক উদ্ভিদ ও পক্ষিজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। তারপর হলো কেইনোজোয়িক মহাযুগ। এই যুগে আধুনিক জীবজন্তু ও গাছপালার পূর্বপুরুষ, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রাধান্য দেখা যায়। এ-যুগেই প্রাইমেট বর্গীয় জীবের (মানুষ যাদের অন্তর্ভুক্ত) আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি ঘটে। তারপর হলো প্লিষ্টোসিন মহাযুগ। এতে মানুষের প্রাধান্য।
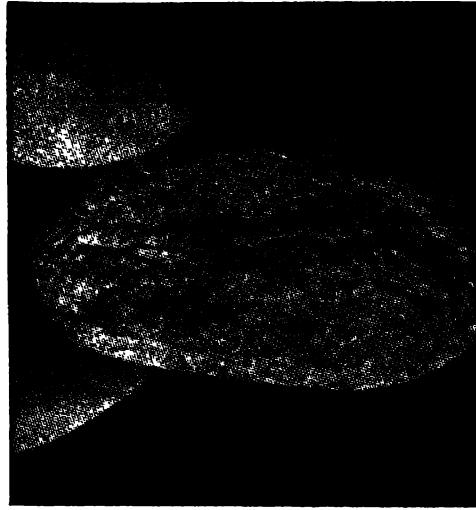
অতীত যুগের এক জাতীয় সরীসৃপের প্রস্তরীভূত ডিম

কার্বনিফেরাস যুগে যে সকল উদ্ভিদাদির চিহ্ন পাওয়া যায় তার ছবি দেখে তোমরা খানিকটা অনুমান করতে পারবে—শেওলা, ঢেঁকিলতা প্রভৃতি অসার উদ্ভিদ-সমূহ কি বিশাল আকারে পরিবর্ধিত হয়েছিল! প্রাণীর মধ্যে একরকম গুবরে পোকা ও বড় বড় ফড়িঙের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়।

মেসোজোয়িক বা সরীসৃপ যুগের যেসব প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের বিশাল আকৃতির বিষয় চিন্তা করলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। প্রস্তরীভূত সত্যিকার কঙ্কালগুলো না পেলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইতো না যে, পৃথিবীর বুকে কোনদিন এরূপ বিশালকায় জীবজন্তু ঘুরে বেড়াতো। ডাইনোসোর নামে জীবগুলোই ছিল সবচেয়ে বিরাট আকৃতির। বিভিন্ন জাতের ডাইনোসোরের শিলীভূত কঙ্কাল আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে—তাদের একজাতের মুখের গড়ন ছিল হাঁসের ঠোঁটের মত। তাদের বলা হয় হংস-চঞ্চু ডাইনোসোর—কোন কোন ডাইনোসোর জাতীয়

জীব আবার খানিকটা উড়তে পারতো। ডিপ্লোডোকাস্‌গুলো প্রায় ৯০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো। ব্রন্‌টোসোরাস বা বজ্র-টিকটিকি নামক সরীসৃপ জাতীয় জীবগুলো প্রায় ৬০-৭০ ফুট লম্বা এবং ১৫-১৬ ফুট উঁচু হতো, ওজনেও ছিল প্রায় ৩০/৪০ টনের বেশী। এছাড়া টাইরেনোসোরাস নামক ভীষণ প্রকৃতির একরকম সরীসৃপ জাতীয় জানোয়ারের শিলীভূত কঙ্কালও পাওয়া গেছে। কোন কোন শিলাস্তর থেকে সরীসৃপের প্রস্তরীভূত ডিমও পাওয়া গেছে।

পক্ষিজাতীয় প্রাণীর আদি পুরুষ আর্কিয়প্‌টেরিক্সের শিলীভূত কঙ্কাল

বিজ্ঞানীদের মতে অভিব্যক্তির ফলে সরীসৃপ থেকে পাখীর উদ্ভব ঘটেছে। ব্যাভেরিয়ার কোন শ্লেট পাথরের খনিতে সরীসৃপ ও পাখীর সংযোগস্থল—পাখীরই আদি পুরুষের গায়ের ছাপ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে আর্কিয়প্‌টেরিক্স। এদের ডানা, পালক ছিল আধুনিক পাখীর মত; কিন্তু লেজ সরীসৃপের লেজের মত টুক্‌রা টুক্‌রা হাড়ে গঠিত। এর ঠোঁটে আছে দাঁত, যা পাখীদের থাকে না। ডানার অস্থিসংস্থানও সরীসৃপের মত। এ রকমের আরও কত বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু, গাছপালার প্রস্তরীভূত চিহ্ন যে পৃথিবীর বুক থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বারান্তরে এ-সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী তোমাদের জানাতে চেষ্টা করবো। গ. চ. ভ.

কি হবে?

পৃথিবীর একপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি বিশাল গর্তে যদি কোন লোককে ঠেলিয়া ফেলা যায় তবে তাহার অবস্থা কি হইবে বিবেচনা করিতে গেলে আমাদিগকে তৎপূর্বে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং ওজন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ বা সন্নিকটবর্তী বস্তুকে পৃথিবী প্রতিনিয়ত কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে।

এই টানের নামই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকে জোরে লাফ দিলে আবার আমরা ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া মহা-শূন্যে চলিয়া যাইবার কোন উপায় নাই। আমরা যাহাকে ওজন বলি তাহা এই আকর্ষণে-রই অভিব্যক্তি ;—আকর্ষণকে অনুভব করি ওজনের মধ্য দিয়া। আকর্ষণ কমিলে ওজন কমিবে, আকর্ষণ বাড়িলে ওজন বাড়িবে, আকর্ষণ না থাকিলে ওজনও থাকিবে না। ওজনের সহিত আকর্ষণের নিগূঢ় সম্বন্ধ। পৃথিবীকেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া করে না অর্থাৎ পৃথিবীকেন্দ্রে পদার্থ ওজন শূন্য।

এখন কোন লোককে যদি উপরোক্ত সুড়ঙ্গ পথে ঠেলিয়া দেওয়া যায় তবে প্রথমে সে মাধ্যাকর্ষণের টানে সবেগে কেন্দ্রের দিকে চলিতে থাকিবে ; কিন্তু যত কেন্দ্রের নিকটবর্তী
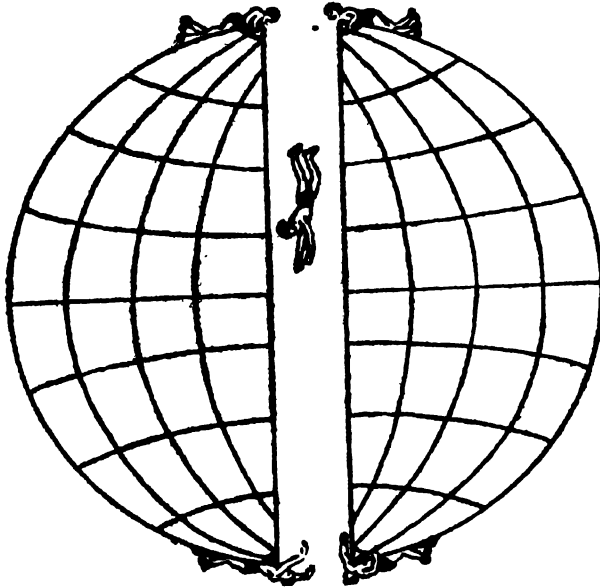
হইবে মাধ্যকর্ষণের মাত্রা ততই কমিতে থাকিবে। অবশেষে ঠিক কেন্দ্রে পৌঁছিলে মাধ্যা-কর্ষণের মাত্রা শূন্য হইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে হয়ত মনে হয় লোকটি কেন্দ্রে আসিয়া থামিয়া যাইবে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হইবে না। পৃথিবীর মধ্যে মাধ্যকর্ষণ নির্ভর করে কেন্দ্র হইতে পদার্থের দূরত্বের উপর ; দূরত্ব যত বাড়িবে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তত বাড়িবে, দূরত্ব যত কমিবে মাধ্যাকর্ষণ তত কমিবে। কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে লোকটি হইতে কেন্দ্রের দূরত্ব হইবে শূন্য, সেহেতু তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণের কোন প্রভাব থাকিবে না।

পৃথিবীকেন্দ্রে কোন আকর্ষণ নাই বলিয়া লোকটি যে বেগে আসিতেছিল সেইবেগে অবাধে কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া অপর পৃষ্ঠের আকাশে বিলীন হইতে পারিবে না। কেন না, লোকটি যত অপর পৃষ্ঠের

দিকে অগ্রসর হইবে ততই পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে তাহার দূরত্ব বাড়িতে থাকিবে। সেই সঙ্গে তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবে। এজন্য ইহা লোকটির গতি-বেগকে ক্রমাগত মন্দীভূত করিয়া দিবে; কারণ ইহা এখন গতির বিপরীত দিকে কার্য করিতেছে। লোকটি ঠিক ভূ-পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে মাধ্যাকর্ষণ তাহার উপর পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিবে এবং পূর্বেকার প্রাপ্ত গতি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। সেই মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণের টানে লোকটি আবার কেন্দ্রের দিকে সবেগে আসিতে থাকিবে এবং কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া অপর পৃষ্ঠে আসিরা উপস্থিত হইবে। অনন্তকাল ধরিয়া এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে অর্থাৎ লোকটি সুড়ঙ্গ পথে ক্রমাগত এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠে যাওয়া আসা করিবে।

মালিক নিয়াজ আহমাদ (দশম শ্রেণী)

(   )

প্রশ্ন করা হয়েছে—পৃথিবীর এপিঠ থেকে ওপিঠ পর্যন্ত সুরঙ্গ খনন করে তার মধ্যে একটা লোককে ফেলে দিলে লোকটার অবস্থা কি হবে?

একথা ঠিক যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের ভিতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় একটা সুরঙ্গ খনন করা সম্ভবপর নয়। সম্ভব না হলেও—এরকম একটা সুরঙ্গের কথা কল্পনা করা মোটেই অসম্ভব নয়। এখন একটা লোককে এই সুরঙ্গের মধ্যে ফেলে দিলে তার অবস্থা কি হবে—সেটাও অনুমান করা যেতে পারে।

বিশাল সুরঙ্গ—এপিঠ থেকে ওপিঠের আকাশ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে গর্তের মধ্যে ঠেলে ফেলা হলো। লোকটা পড়ছে—মাধ্যাকর্ষণের টানে সে সবেগে কেন্দ্রের দিকে পড়তে থাকবে—প্রতি মুহূর্তেই গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে। প্রবল গতি-বেগের ফলে বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষে ভাষণ গরম হয়ে লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু বলা হয়েছে—মরা বাঁচার প্রশ্ন নেই। ধরে নেওয়া গেল—লোকটা মরবেও না বা পুড়েও ছাই হবে না। তবে লোকটার কি হবে? সুরঙ্গের মধ্যে লোকটাকে বাধা দেবার কিছু নেই। সে ছুটছে। ভূ-কেন্দ্র অতিক্রম করেও সে ছুটতে থাকবে—নিজের গতিবেগের ধাক্কায়। তবে এবার আর নীচের দিকে নয়—এবার ছুটছে সে উপরের দিকে—পৃথিবীর অপর পিঠের দিকে। এবার অবশ্য তার গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকবে। উপরের দিকে একটা বল ছুড়ে দিলে যেমন হয়, অবস্থাটা হবে অনেকটা সেরকম। কিন্তু সুরঙ্গের অপর মুখ পর্যন্ত পৌঁছেই লোকটা আবার নীচের দিকে নামতে থাকবে এবং ঠিক আগের মত গতিতেই ছুটে গিয়ে তাকে প্রথম পতনের স্থানে পৌঁছতে হবে। সুরঙ্গের মধ্যে বাতাস বা অন্য কিছুর প্রতিবন্ধকতা না থাকলে লোকটা এইভাবেই চিরকাল পেণ্ডুলামের মত একবার এদিক আবার ওদিক পর্যায়ক্রমে উঠানামা করতে থাকবে।

কিন্তু যেহেতু সুরঙ্গের মধ্যে বাতাস রয়েছে, সেই বাতাসের প্রতিবন্ধকতার ফলে প্রতিবার কেন্দ্র অতিক্রমকালে মানুষটির গতিবেগের হ্রাস হবে। ফলে, প্রতি দোল-নেই মানুষটির কেন্দ্র হতে দূরত্ব ক্রমশঃ কমে যাবে। অবশেষে এই দূরত্ব শূন্য হয়ে যাবে, অর্থাৎ মানুষটি কেন্দ্রেই স্থির হয়ে থাকবে

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য। (দশম শ্রেণী)

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

৩০শে নবেম্বর, ১৯৪৯ আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বাত্রিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ ও উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ করমচাঁদ মেটা, পি-এইচ, ডি; এস সি, ডি (ক্যানটাব); এফ, এন, আই "Control of Rust Epidemics of Wheat in India—A National Emergency" সম্বন্ধে আচার্য জগদীশ চন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা দিবেন। পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য প্রদেশপাল ডাঃ কে, এন, কাটজু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রাসায়নিক গবেষক ডাঃ বাসুদেব ব্যানার্জিকে লজ্জাবতী লতা সংক্রান্ত রাসায়নিক গবেষণার জন্যে বিশ্ববিশ্রুত নোবেল লরিয়েট প্রোফেঃ কুন তাঁর কাইজার উইলহেল্‌ম্ ইনষ্টিটিউটের ল্যাবটরীতে কিছুকাল গবেষণা করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ডাঃ ব্যানার্জি শীঘ্রই একাজে যোগদানের জন্যে যাত্রা করবেন। ডাঃ ব্যানার্জি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করছি।

বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গের ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ

এক প্রেস নোটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান বছরে প্রদেশের ফসলের একটি আনুমানিক হিসেব দিয়েছেন। এই হিসেবে প্রকাশ যে, এ বছর এ প্রদেশের ফসলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ।

বর্তমান বছরে ধানের বীজ বপনের সময় পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় বপন-কার্যের কিছুটা ক্ষতি হয়। গত বছরের চেয়ে এবছর কিছু পরিমাণ কম জমিতে বীজ বপন করা হয়েছে। পরে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় আশা করা যায় যে, এ বছর গত বছরের চেয়ে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশী হবে।

এ বছর প্রায় ১,২০১,২০০ একর জমিতে ফসল হয়েছে বলে হিসেব পাওয়া গেছে। গত বছর ১,২৭০,৫০০ একর জমিতে ফসল হয়েছিল।

এ বছর প্রতি একর জমিতে প্রায় দশ মণ চা'ল পাওয়া যাবে। গত বছর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় পৌনে নয় মণ। ১৯৪৮-৪৯ সালে গম উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ বছর ৮৭,৯০০ একর জমিতে গম হয়েছে বলে হিসেব করা হয়েছে। গত বছর ওই জমির পরিমাণ ছিল ৮৪,০০০ একর। এ বছর গড় উৎপাদনের পরিমাণ হবে, স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ। গত বছর ওই পরিমাণ ছিল, শতকরা ৭০ ভাগ। একর প্রতি নয় মণ ধরলে এ বছরের মোট উৎপাদন হবে ২৩,৮০০ টন। গত বছর ওই পরিমাণ ছিল, ১৯,৪০০ টন।

১৯৪৮-৪৯ সালের বার্লির পরিমাণ ১৯,৩০০ টন হবে বলে ধরা হয়েছে। গত বছর ১৫,৪০০ টন পাওয়া গিয়েছিল। এ বছরের ছোলা উৎপাদনের পরিমাণ ৭১,৮০০ টন ধরা হয়েছে। গত বছর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫,৭০০ টন। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রদেশে ১,৪৯০ টন তিল পাওয়া যাবে বলে হিসেব করা হয়েছে। গত বছরের পরিমাণ ছিল ৩০৩৫ টন।

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের বিষময় প্রতিক্রিয়া

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, চমকপ্রদ ওষুধ ষ্ট্রেপ্‌টোমাই-সিনকে হয়তো বর্জন করতে হবে; কারণ জিনিসটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। উক্ত জার্নালে প্রকাশ যে, দেহের অষ্টম স্নায়ুর উপর এই ওষুধের বিষময় প্রতি-

ক্রিয়া দেখা দিতে পারে—শিরোঘূর্ণন, বধিরতা এমন কি রোগীর মস্তিষ্কও স্থায়ীভাবে বিকৃত হয়ে যেতে পারে। উক্ত জার্নালে আরও বলা হয়েছে যে, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন পেনিসিলিনের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর এবং পেনিসিলিনের চেয়ে এর শক্তিও কম। অনেক রোগ বীজাণুর উপর পেনিসিলিনের কোন কাজ হয় না, কিন্তু সেগুলোর উপর ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন বেশ কাজ করে। যক্ষ্মারোগে এই ওষুধ প্রায়শঃই উপযুক্ত হয়; কিন্তু অধিকাংশ যক্ষ্মারোগীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই ওষুধের সুফলকে ব্যর্থ করে দেয় এবং অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ওইরূপ থাকে।

তিনটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার

২১শে নভেম্বর মস্কোর খবরে প্রকাশ—সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবছর তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা গ্রহগুলোর নামকরণ করেছেন—রাশিয়া, মস্কো ও কম্‌সোমোনিয়া। রাশিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত এধরণের মোট ১১৩টি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার করেছেন।

১৫০ বছর ধরে যে তিনটি নতুন গ্রহের সন্ধান চলছিল তারা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী পথে নিজ নিজ কক্ষে সূর্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে। এগুলোকে নিষ্প্রভ তারকার মত দেখায়।

গর্ভ-নির্ণয় পরীক্ষা

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী গর্ভ-ধারণ নির্ণয় সম্পর্কে যেসব পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছেন তাতে অনেকেই উপকৃত হবেন আশা করা যায়। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ অ্যাস্‌হাইম-জনডেক অথবা ফ্রীডম্যান উদ্ভাবিত পরীক্ষায় গর্ভ-ধারণ নির্ণয় করে থাকেন। এই পরীক্ষায় সাদা ইঁদুর অথবা খরগোস প্রভৃতি প্রাণীদের ব্যবহার করা হয়; কাজেই সময়সাপেক্ষ ও কিঞ্চিৎ ব্যয়-সাধ্য। ডাঃ ভাদুড়ী তাঁর পরীক্ষায় স্থানীয় কয়েক জাতীয় ব্যাং ব্যবহার করেছেন। কোন পুং-ব্যাঙের শরীরের অন্তস্ত্বকে ৫ সি, সি, পরিমাণ স্ত্রী-মূত্র ইনজেকসন করে দেওয়া হয়। গর্ভবতী স্ত্রী-লোকের মূত্র হলে ২৫ মিনিটের মধ্যে ব্যাঙের মূত্রের মধ্যে স্পার্মাটোজোয়ার আবির্ভাব ঘটে। ডাঃ ভাদুড়ীর পূর্বে কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানী অবশ্য গর্ভনির্ণয় পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গেই ব্যাং ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ব্যাঙের মূত্রের মধ্যে স্পার্মাটোজোয়া আবির্ভাবের সময় এর প্রায় ৩।৪ গুণ বেশী লেগেছে। তিনি মনে করেন—গর্ভরোগ বা অনুরূপ টিউমার জাতীয় রোগে এই পরীক্ষা রোগনির্ণয়ের সহায়ক হিসেবে ফলদায়ক হবার সম্ভাবনা আছে। ডাঃ ভাদুড়ী গো-মহিষাদি প্রাণীর গর্ভনির্ণয় সম্পর্কেও পরীক্ষা করছেন। ইতিপূর্বে যদিও অনেকেই গর্ভবতী গো-মহিষের লালা, মূত্র, রক্ত, দুধ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন সুস্পষ্ট ফল লাভে সমর্থ হন নি। পুং-ব্যাঙে গো-মূত্রের পরীক্ষা পূর্বে হয় নি বলে তিনি পরিশ্রুত গোময়-দ্রবণ পুং-ব্যাঙের অন্তস্ত্বকে প্রবিষ্ট করে পরীক্ষার ফলে আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ধারণা, সম্ভবতঃ গর্ভবতী গাভীর গোময়ে বর্তমান কোন গোনাডোট্রফিক হরমোন-এর ক্রিয়ার ফলেই পুং-ব্যাঙের মূত্র মধ্যে স্পার্মাটো-জোয়ার আবির্ভাব ঘটে।

মানবকল্যাণে রাশিয়ার প্রথম আণবিক শক্তি ব্যবহার

সোভিয়েট লাইসেন্স প্রাপ্ত সংবাদপত্র 'নট এক্সপ্রেসে' ৫ই নভেম্বর বার্লিনের খবরে প্রকাশ—সাইবেরিয়ার দুটি নদী ওবি ও তানসাহির গতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে রাশিয়ানরা আণবিক শক্তির সাহায্যে ককেশাস ও উড়াল পর্বতমালার কতকাংশ উড়িয়ে দিয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, শান্তির কাজে এই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হলো। উড়াল পর্বতমালা

ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়াকে বিভক্ত করে রেখেছে। ককেশাস পর্বতমালা তুরস্কের নিকটে রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। 'নট এক্সপ্রেসে' আরও বলা হয়েছে যে, আণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট সরকারের বিবৃতির অর্থ বর্তমান বিশ্ববাসী বুঝতে পারবে। কাস্পিয়ান হ্রদ ও কারা (আরল) সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সেচ-কার্যের দ্বারা ৭ কোটি ১০ লক্ষ একর জমি উর্বর করা ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার ডেভিডভ এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে কয়েক বছরের মধ্যেই কারাকুম মরুভূমি ও সাইবেরিয়ার উত্তর অঞ্চল মনোরম উদ্যানে পরিণত হবে। এতে বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণ করা যাবে যে, মৃত্যু ও ধ্বংস যাদের কাম্য নয়, তারা মানুষের কল্যাণের জন্যে কিভাবে আণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে।

আণবিক শক্তির সাহায্যে রাশিয়ার মেঘ সৃষ্টির চেষ্টা

ইউরোপীয় সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা করবার জন্যে যে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে, যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রকাশ—সোভিয়েট রাশিয়াতে কেবল যে আণবিক বোমা তৈরী করবার কাজই দ্রুতগতিতে চলছে তা-ই নয়, তারা আণবিক শক্তির সাহায্যে মেঘ সৃষ্টি করে নতুন ধরণের আণবিক মারণাস্ত্র তৈরীর গবেষণাও চালাচ্ছে। এই সংবাদে আরও প্রকাশ যে, আণবিক বোমা প্রয়োগে রাশিয়া কেবল শিল্পকেন্দ্র ও বন্দরসমূহ ধ্বংসের পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত হয় নি; তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগেরও পরিকল্পনা করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ধ্বংস কার্যে আণবিক বোমা বিশেষ কার্যকরী নয়। কাজেই তারা আণবিক বোমার সাহায্যে মেঘ সৃষ্টি করে সৈনিকদের ধ্বংস করবার জন্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ফ্রান্সের মরিস স্যুম্যান, পল রেণো এবং বৃটেনের লর্ড ভ্যান্সিটার্ট ও লর্ড ব্র্যাবাজোন আছেন। এঁরা পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিকট এ সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন।

প্রাগের সন্নিকটে ইউরেনিয়াম খনি

প্যারিসের স্বাধীন চেকোশ্লোভাক পরিষদ এ-মর্মে ঘোষণা করেছেন যে, সম্প্রতি প্রাগের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রিব্রামে ক্যানাডার চেয়েও বিশ গুণ গুরুত্বপূর্ণ ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। পরিষদ ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েট তত্ত্বাবধানে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশিত হচ্ছে।

মানবকল্যাণে আণবিক শক্তি

(আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের অভিমত)

ওয়াশিংটনের ১৫ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ—কয়েকদিন পূর্বে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ আঁদ্রে ভিশিনস্কী দাবী করেছিলেন যে, রাশিয়া কেবল মানবকল্যাণের জন্যেই আণবিক শক্তি ব্যবহার করছেন। ওয়াশিংটনের বিশেষজ্ঞ মহল কিন্তু একথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি।

মঃ ভিশিনস্কীর বক্তৃতার পর ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েকজন পরমাণু-বিশেষজ্ঞকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাঁরা বলেন যে, মঃ ভিশিনস্কী পরমাণু শক্তির যে সমস্ত ব্যবহারের কথা বর্ণনা করেছেন সকল সময় তা সম্ভব নয়। আবার কোন কোন সময় হয়তো সেগুলো কেবল তত্ত্বের দিক থেকেই সম্ভব বলে মনে হবে। তাঁরা আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে যদিও অনেক পূর্বেই পরমাণুশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে তবুও জাতীয় অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সুরু হতে এখনও বহু বছর বিলম্ব আছে। কাজেই আজ রাশিয়া যা বলছে তা একরকম অসম্ভবই বলা চলে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের এই সন্দেহের আর একটা কারণ হলো—মঃ ভিশিনস্কীর একটি উক্তি।

সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে মঃ ভিশিনস্কী বলেন যে, রাশিয়ার পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। ২৫শে সেপ্টেম্বরের টাস-এর একটি বিবৃতি থেকেই তিনি জানতে পারেন যে, রাশিয়া বর্তমানে মানবকল্যাণের জন্যেই পরমাণুশক্তি ব্যবহার করছে।

পরমাণু বোমার সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে দেবার কাহিনীকে বিশেষজ্ঞেরা 'কল্পনা-বিলাস' বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন যে, পরমাণু বোমা একাজের উপযোগী নয়। একটি পরমাণু বোমা ২০,০০০ টন টি, এন, টি-র সমান শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং কোথাও একটা পাহাড় ধ্বসাবার জন্যে কেউ যে এরূপ বিরাট শক্তি ক্ষয় করবে তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। পরমাণু বোমার বিস্ফোরণকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করে বিজ্ঞানীর অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

অন্ধের দৃষ্টিশক্তির পুনরুজ্জীবন

মস্কোর এক সংবাদে জানা গেছে যে, সোভিয়েট একাডেমীর সদস্য রুশ চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ফিলাটভ নতুন কর্ণিয়া (চোখের সম্মুখভাগের স্বচ্ছাবরণ) সংস্থাপন করে তিন হাজারেরও বেশী অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন।

রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ

সুইডিস বিজ্ঞান পরিষদ এবার কালিফোর্ণিয়ার অধ্যাপক এফ, ডব্লিউ, গিয়াককে ১৯৪৯ সালের রসায়নশাস্ত্রের নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। রসায়ন বিজ্ঞানে আমেরিকা এই পঞ্চম বার নোবেল প্রাইজ বিজয়ের গৌরব অর্জন করলো।

জাপানের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিদেকি ইউ-কাওয়াকে এবছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ প্রদান করা হয়েছে। এই সর্বপ্রথম একজন জাপানী বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পেলেন।

আগামী ১০ই ডিসেম্বর ষ্টকহোমে নোবেল প্রাইজ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সে-সময়ে নোবেল প্রাইজ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। সাধারণতঃ রাজা গুস্তাফ চেক, মেডেল ও ডিপ্লোমা সমূহ বিতরণ করে থাকেন। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে এবছর তাঁর স্থলে যুবরাজ এডল্‌ফ পুরস্কার বিতরণ করবেন।

আফগানিস্থানের লুপ্ত সহর

আমেরিকান আবিষ্কারকেরা আফগানিস্থানে একটি লুপ্ত সহর আবিষ্কার করেছেন। এই সহরের গৃহ, ফোয়ারা ও খাল প্রায় যথাযথ অবস্থায় আছে। আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারেল হিষ্ট্রির নৃতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিঃ ওয়াল্টার এ-বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে এই নগরীর নাম ছিল পেশাওয়ারান। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সহরটি বিদ্যমান ছিল। ইহা আফগানিস্থানের সিস্তান এলেকায় মরুভূমি অঞ্চলে 'ডেজার্ট অব ডেথ' নামক স্থানে অবস্থিত। এর পাঁচ মাইল দূরে একটি পল্লী বিদ্যমান আছে।

ভারতে আমদানী খাদ্যশস্য

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারত ২৬৭৯১০০ টন খাদ্যশস্য আমদানী করেছে। এই আমদানী খাদ্যের মধ্যে গমের পরিমাণ ১৪২০৬০০ টন ও চা'লের পরিমাণ ৫৯০০০০ টন।

ভারত যে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর চুক্তি করেছে তার মধ্যে ২৭ লক্ষ টন ইতিমধ্যেই আমদানী করা হয়েছে। গত বছর ভারত ৪৮ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্য আমদানী করেছিল।

পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রী-বিমান

ব্রিস্টলের নিকটবর্তী ফিলটনে বিশেষভাবে নির্মিত বিমানক্ষেত্র থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমান 'ব্র্যাবাজোন' গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রথমবার আকাশে ওঠে। বিমানখানি প্রায় সাতাশ মিনিট আকাশে ছিল। ব্রিস্টল ও গ্লস্টারসায়ারের উপর

পাঁচশ' ফিট উঁচুতে বিমানখানি বারকয়েক ঘোরবার পর প্রায় চার হাজার ফিট উঁচুতে আরোহণ করে। আকাশে ওঠবার সময়ে প্রায় দু'মাইল দূর থেকে বিমানের এঞ্জিনের গর্জন শোনা গিয়েছিল। বিমানটির ওজন ১৩০ টন। এতে আটটি এঞ্জিন আছে। এধরণের বিশালকায় দুটি বিমান তৈরী করতে প্রায় এককোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়েছে। বৃটিশ ওভারসিজ এয়ার ওয়েজ দ্বিতীয় বিমানটিকে লণ্ডন-নিউইয়র্কের পথে যাত্রীবাহী বিমান হিসেবে ব্যবহার করবেন। এই দীর্ঘপথ যাতায়াত করবার সময় বিমানখানি শ'খানেক যাত্রী বহন করতে পারবে। কম দূরত্ব অতিক্রম করবার সময় দু'শ যাত্রী বহন করাও সম্ভব।

পঙ্গপাল-প্রতিরোধ সম্মেলন

পঙ্গপাল উপদ্রুত কেন্দ্র ওমন নামক অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক পঙ্গপাল-প্রতিরোধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃটেন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, কেনিয়া মিশর, ইরান এ সম্মেলনে যোগদান করেন। কেনিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের পঙ্গপাল-নিবারণ কার্যে নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি সেখানকার পঙ্গপাল-নিরোধক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান করেন। ২১ ঘণ্টা বেলুচিস্থানের পঙ্গপাল অঞ্চল পরিদর্শন করবার পর প্রতিনিধিগণ পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক আপ্যায়িত হন।

ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের খনিজ সম্পদ

"শিল্প বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকার" অক্টোবর সংখ্যায় ডাঃ ডি এন ওয়াদিয়ার শিল্পে অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহের খনিজ সম্পদের আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যত তথ্য পাওয়া যায় তা সন্নিবেশিত হয়েছে। ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন্ কোন্ খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে ভারত পরমুখাপেক্ষী এবং তার নিজস্ব খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ ও সন্ধানের জন্যে সরকারী ও বে-সরকারী কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে তা সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে :—

ক্যাষ্টর অয়েল থেকে সেবাসিক এসিড প্রস্তুত

প্লাষ্টিক প্রভৃতি প্রস্তুতকার্যে সেবাসিক এসিডের ব্যবহার বাড়ছে। ক্যাষ্টর অয়েল থেকে কষ্টিক সোডার সাহায্যে সেবাসিক এসিড পাওয়া যায়। রাসায়নিক গবেষণাগারসমূহে এই প্রস্তুতপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে

ফেলস্পার থেকে পটাস

পটাস একটি মূল্যবান রাসায়নিক সার। কিন্তু ভারতে এই দ্রব্যটির পরিমাণ বেশী নয়। সম্প্রতি হায়দরাবাদের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে স্থানীয় ফেলস্পার থেকে পটাস প্রাপ্তির একটা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারা গেছে যে, এই দেশে প্রাপ্ত ফেলস্পার ব্যবহার করলে অল্প ব্যয়ে পটাস প্রস্তুত করা যেতে পারে।

হায়দরাবাদের রাইচুর, মহবুবনগর, গুলবর্গা, এবং গোলকুণ্ডা জেলাসমূহে প্রচুর ফেলস্পার পাওয়া যায়।

ভারতের সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষসমূহ

ভারতে সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে গোলাপ জাতীয় সকল পুষ্প-বৃক্ষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কতকগুলো রঙ্গীন চিত্র এই প্রবন্ধের সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। গন্ধ ব্যবসায়িগণ এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাবেন।

পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার

ওয়াশিংটনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের আকস্মিকভাবে জীবনাবসান ঘটেছে— এ সংবাদে দেশবাসী মাত্রেই মর্মাহত হবেন। 'অধ্যাপক সরকার বাংলার, তথা আধুনিক ভারতেরই একজন কৃতী সন্তান। শিক্ষক, জনসেবক এবং জ্ঞানসাধকরূপে দেশকে তিনি যে কত ভাবে সেবা করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর এই সর্বতোমুখী প্রতিভা ও কর্মশক্তি দেশের বাইরেও ব্যাপ্তিলাভ করেছে এবং বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজে সম্মান লাভ করে তিনি দেশকে, জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন।' অধ্যাপক সরকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় বর্ষ | ডিসেম্বর—১৯৪৯ | দ্বাদশ সংখ্যা

জড় বনাম তেজ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

বিশ্বজগতে তিনটি সত্ত্বা রয়েছে যাদের বাদ দিয়ে কোনও সত্ত্বা আমরা কল্পনা করতে পারি না। এগুলো হলো জড় (matter), তেজ (energy), আর চৈতন্য (consciousness)। সেই কোন অতীত যুগ থেকে চিন্তাশীল মানুষ এই সত্ত্বা ত্রয়ের রূপ, সম্বন্ধ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাভাবে গবেষণা করে আসছে। প্রথমতঃ আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসমূহে এই চিন্তা ধারার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই। দর্শনের চিন্তাধারা দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যে উপসংহারে এসেছে তা' সর্বসম্মত না হলেও চূড়ান্ত। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সেই চৈতন্যই সর্বময়' —দৃশ্যজগতে চৈতন্য ব্যতিরেকে জড় বা তেজের সত্ত্বা মায়ামাত্র; চৈতন্যই সত্ত্বাময়, চিন্ময় ও আনন্দময় —এই তত্ত্বগুলোতে উপস্থিত হয়ে দার্শনিক স্তব্ধ হয়েছেন—আরও উর্ধে ওঠবার অবকাশ তার নেই। দার্শনিকের বিচারলব্ধ এই তত্ত্বকে কিন্তু সাধারণ মানুষ সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেছে এই জন্যেই যে, বাস্তব ইন্দ্রিয় দিয়ে সাধারণে এর অনুভূতি পায় না। সেই খানেই সুরু হয়েছে বিজ্ঞানের যাত্রা। কেবলমাত্র আন্তরিক জ্ঞানই ছিল দর্শনের উপাদান; কিন্তু বিজ্ঞান তার চলার পথে প্রকৃতিকেই নিয়োজিত করেছে তার রহস্য উদ্ঘাটনে।

চৈতন্যকে দূরে রেখে বিজ্ঞান জড় ও তেজ এই দুটি সত্ত্বা সম্বন্ধে গবেষণা করেছে। এই ভিন্ন সত্ত্বা দুটির রূপ ও কার্য বিভিন্ন—এই হলো বিজ্ঞানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত। জড় ও তেজের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই খানে যে, জড়ের ভর ও ওজন রয়েছে, কিন্তু তেজের তা নেই। স্থিতিশীল জড়কে তেজই দেয় গতি। জড়ের বিনাশ নেই। একরূপ জড়ের বিনাশে একই ওজন বিশিষ্ট অন্যরূপ জড়ের উদ্ভব হয়। তেজের পক্ষেও ঠিক একই কথা খাটে। একই তেজ খাদ্যের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত হয় আমাদের পেশীতে। সেই তেজই আবার ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় আমাদের শরীরের গতি শক্তিতে। জড় ও তেজ—দুইয়েরই বিনাশ নেই। মোট কথা—জড়ের বিনাশে জড়ের ও তেজের বিনাশে তেজের জন্ম। এ-দুটিই আমাদের অনুভূতির মধ্যে—এবং এরা পরস্পর নির্ভরশীল। তবু প্রথম দৃষ্টিতে পৃথকধর্মী জড় ও তেজের এই যে বিরোধী ভাব বিজ্ঞানীরা ধারণা করে ছিলেন, কালের

গতিতে তার ক্রমপরিবর্তন হচ্ছে। আমরা সেই কথাই আলোচনা করব।

বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে আমাদের এই জড়জগৎ। আর এই মৌলিক পদার্থগুলোর যৌগিক মিলনে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের এই পরিদৃশ্যমান বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির একটা কর্তা রয়েছে—তাকেই আমরা বলতে পারি, শক্তি বা তেজ। আসলে এক হলেও তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহির্জগতে প্রকাশ পায়। তেজের কর্তৃত্বে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-এর একটা চিরন্তন আবর্তন শুরু করেছে। তার যাত্রা অনাদি কাল থেকে—আয়ুও তার অনন্ত।

এই জড়জগৎ নিয়ে চিন্তারত বিজ্ঞানী একদিন ঘোষণা করলেন—বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ তোমাদের শাস্ত্রে আছে; এদের প্রত্যেকটিকে ভেঙ্গেচুরে এক একটি ক্ষুদ্রতম কণার সত্বা উপলব্ধি করবে, যাকে সেই পদার্থের অণু বলতে পার। আবার অণুকে আরো ভাঙ্গলে পাবে পরমাণু। পরমাণুরা একা থাকতে পারে না, পৃথক অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই এরা পরস্পর মিলিত হয়ে অণুর সৃষ্টি করে। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর ধর্ম পৃথক, ওজনও পৃথক। এখন আমরা বলতে পারি যে, বিরানব্বুইটি মৌলিক পরমাণু নিয়েই জড়জগৎ। তেজ নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী বল্লেন—এই যে তেজরূপী আলো দেখছ এরা কতকগুলো বস্তুকণিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কণিকাগুলো আমাদের চোখের উপর সোজাসুজি এসে পড়ে বলে আমরা দেখতে পাই। একটি স্থিতিস্থাপক গোলককে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলে যেরূপ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, এই আলোকণাগুলোও কোন স্বচ্ছ পদার্থের সংস্পর্শে এসে ঠিক সেরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়। আলোর প্রতিসরণও এই কণিকাবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কতকগুলো আলোককণা যখন একটা নির্দিষ্ট বেগে ছুটে গিয়ে স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিহত হয় তখন নিউটনের নিয়ম (Third law of motion) অনুযায়ী সেই কণিকাগুলোর ওপর সেই স্বচ্ছ জড় পদার্থের শক্তি লম্বভাবে আরোপিত হয়; আর আলো কণাগুলো (বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে) নিজের পথ ও লম্বপথের মাঝামাঝি রাস্তা করে নেয়। বস্তুতঃ একেই আমরা প্রতিসরণ বলি। এই মতবাদ দিয়েই নিউটন আবার বর্ণালী রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

শ্রাবণ মাসের বর্ষণরত আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু রৌদ্রের আবহাওয়ায় আমরা রামধনু দেখে বিস্মিত হয়েছি—আদিম যুগের মানুষ একে দেবতার ধনুক বলে পূজা করেছে। নিউটন এই ধনুককে আটকে ফেললেন তাঁর পরীক্ষাগারে। একটি ত্রিপার্শ্ব কাঁচের ওপর সূর্যালোক ফেলে তিনি পেলেন রামধনুর সাতটা রং—বেগনি থেকে লাল পর্যন্ত সাজানো রয়েছে ঠিক সেই রামধনুর মত। এর নাম দেওয়া হলো সৌর-বর্ণালী। কণিকাবাদের দৃষ্টিতে দেখা গেল, সাতটা আলো-কণিকার সংমিশ্রণে সাদা রঙের সূর্যালোকের সৃষ্টি। বিভিন্ন রঙের আলো কণিকার তেজও বিভিন্ন। তাই যখন তারা একযোগে একটা ত্রিপার্শ্ব কাঁচের উপর এসে পড়ে তখন বেগনি রং তার তীব্রতম শক্তির জন্যে প্রতিসরণের বেলায় একটু বেশী বেঁকে যায়; কিন্তু লাল রং বাঁকে কম। তার মাঝখানে বিভিন্ন শক্তির অন্যান্য রংগুলো তাদের পথ বেছে নেয়। রামধনুর বেলায় বৃষ্টি বিন্দুগুলো আকাশে ত্রিপার্শ্ব কাঁচের কাজ করে। নিউটনের কণিকাবাদ তাঁরই বলবিদ্যার উপর ভিত্তি করে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল—ঠিক সেই সময়ে তাঁরই সমসাময়িক হয়গেন্স্ আর এক মতবাদ খাড়া করলেন। তাঁর মতে—ভরহীন ঈথর সমুদ্রে এই বিশ্ব ডুবে আছে। ঈথর বহন করে আলোর কণা নয়, আলোর এক একটি তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে আঘাত দেয়, ফলে আমরা দেখতে পাই। জলের মধ্যে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে আমাদের পেশীর শক্তি জলে

আরোপিত হয়। তাতে সৃষ্টি হয় জলের তরঙ্গ। সে তরঙ্গ আমাদের নিয়োজিত শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। জল তার বাহন মাত্র। তেমনি আলোক কোনও উৎস থেকে উদ্ভূত হলেই সে ঈথরকে বাহন করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলের তরঙ্গের মত। এই তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করা যায় সুন্দরভাবে। আলোক তরঙ্গের গতিবেগ সর্বত্র সমান নয়—তাই যখন একটি তরঙ্গ স্বচ্ছ কাচের পৃষ্ঠে আঘাত করে তখন তার খানিকটা অংশ কাচের ভিতর যে গতিবেগে যায়, বাইরের অংশটা ঈথরে থাকায় তার গতিবেগ ভিন্ন হওয়ার ফলে সেই তরঙ্গের পথ পরিবর্তিত হয়—আমরা একেই বলি প্রতিসরণ। একটি তরঙ্গশীর্ষ ও একটি তরঙ্গপাদ এই নিয়ে একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয়। বিভিন্ন রঙের পক্ষে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন। বিভিন্ন রঙের বিভিন্নরূপ কণিকার সত্বা কল্পনা করার চাইতে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতায় তাদের কল্পনা করা স্বাভাবিক। তাছাড়া বিভিন্ন আলোর কণিকার একই গতিবেগ থাকা সম্ভব নয়—যা সম্ভব মনে করে আমরা কণিকাবাদের ভিত্তিতে আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলাম। কণিকাবাদের বিরুদ্ধে তরঙ্গবাদের এই যুক্তি তাকে বিজয়ীর আসন থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী ইয়ং ও ফ্রেজনেল আলোর এক নূতন ধর্মের কথা আমাদের শোনালেন। তাঁরা পরীক্ষায় দেখলেন যে, আলোর দুটি তরঙ্গ, বিশেষ ব্যবস্থার ফলে সংযুক্ত হয়ে পাশাপাশি একবার আলো ও একবার অন্ধকার band-এর সৃষ্টি করে। আলো যদি কণিকাধর্মী হয় তবে দুটি আলোর কণিকা মিলে তো আলোক-শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে না—বরং তরঙ্গবাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা এই ব্যাখ্যা করতে পারি যে, যেখানে আলোর 'ব্যাণ্ড' দেখা যায় সেখানে দুটি তরঙ্গের দুটি শীর্ষ বা দুটি পাদ সর্বতোভাবে একত্র হয়েছে; আর যেখানে একটি তরঙ্গের শীর্ষ ও অপর তরঙ্গের পাদ মিলিত হয়েছে সেখানে তাদের পরস্পর কাটাকাটি হয়ে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে। আবার একটি ছোট ছিদ্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আলো যায় বেঁকে এবং পাশাপাশি আলো ও অন্ধকার বৃত্তের সৃষ্টি করে ঠিক আগেকার নিয়মানুযায়ী। একে বলা হয় আলোর ডিফ্র্যাক্‌সন বা অপবর্তন। তরঙ্গবাদ দিয়ে আলোর এই ধর্মগুলো ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু কণিকাবাদ এখানে যুক্তি খুঁজে পায় না। আলোর সমবর্তন, আলোক তরঙ্গকে স্পষ্টতঃ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলেই প্রমাণ করে। এখন আর আলোকে কণিকাধর্ম আরোপ করার অবকাশ নেই। আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে মেনে নিতে বাধ্য যে—আলো, তাপ, বিদ্যুৎ সমস্ত শক্তিই তরঙ্গধর্মী। এ তরঙ্গ কি তবে নিশ্চিতই ঈথর তরঙ্গ? এর ভিতরেও আর একটা সমস্যা রয়েছে। ওরষ্টেড প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখলেন যে, প্রত্যেক বিদ্যুৎভরণ তার চার পাশে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে, আর কোন চুম্বকক্ষেত্র তার বলরেখা পরিবর্তন করলে আবার তাড়িৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। সেই তাড়িৎক্ষেত্রের বলরেখার পরিবর্তন আবার চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। আমাদের পূর্বোক্ত বিদ্যুৎভরণ যদি আস্তে আস্তে স্থান পরিবর্তন করতে থাকে তবে আমরা পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র পাব যা পরে আবার পরিবর্তনশীল তাড়িতক্ষেত্রের সৃষ্টি করবে—যতক্ষণ না বিদ্যুৎভরণ স্থির হয় ততক্ষণ। আমরা এমনিভাবে পরপর চৌম্বক-তাড়িৎক্ষেত্রের সত্বা অনুভব করবো। এই সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করলেন ম্যাক্সওয়েল তাঁর বিখ্যাত সমীকরণের সাহায্যে। তিনি দেখালেন, চৌম্বক বা তাড়িৎক্ষেত্র তেজ বা শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। স্থানপরিবর্তনশীল বিদ্যুৎভরণ এই যে পরপর তাড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করলো এগুলো তেজ বা শক্তিতরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে আমরা দেখলাম, বিদ্যুৎ চলে তাড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গে ঈথর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে। প্রমাণ হলো যে, ঈথরের মত তাড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও

মহাশূন্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক সমীকরণে এই মূল্যবান কথাটি নিহিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানী হার্জ সত্য সত্যই তাড়িৎ-চৌম্বকীয় বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করলেন। এই তাড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ নির্ধারিত হলো এক সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। আলোকের গতিবেগও ঠিক এই। তবে কি আমাদের সেই সাতরঙা বর্ণালীর আলো ও তাড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ এক? হ্যাঁ ঠিক তাই। তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্য, অদৃশ্য তেজ তাড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। এরা যদি সবাই এক গোষ্ঠীর হয়ে থাকে তবে এদের আকৃতি-প্রকৃতিতে এত প্রভেদ কেন? এর উত্তরে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কথা এসে পড়ে। আমরা জানি একটি তরঙ্গশীর্ষ ও একটি তরঙ্গপাদ নিয়ে একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। একটি বিশেষ তরঙ্গ এক সেকেণ্ডে যতবার স্পন্দিত হয়, সেই সংখ্যাকে বলা হয় সেই তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা। তাহলে আমরা পাই—তরঙ্গের বেগ = তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য × স্পন্দনসংখ্যা।

তাপ, আলো প্রভৃতির তরঙ্গের গতিবেগ যদি মহাশূন্যে একটি নিত্য-সংখ্যা বা কন্‌ষ্ট্যান্ট হয় তাহলে তাদের রূপ ও প্রকৃতি নির্ভর করবে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও স্পন্দন-সংখ্যার উপর। তরঙ্গের গতিবেগকে একটি নিত্য-সংখ্যা রাখতে হলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়লে তরঙ্গের স্পন্দন কম হতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী অথচ স্পন্দন (৬ হাজার থেকে ১০।২২ হাজার, ৫০০০০ মিটার থেকে $\frac{1}{2}$ মিলিমিটার) সবচেয়ে কম। তারপর যথাক্রমে তাপ তরঙ্গ, দৃশ্য সাত রঙা আলোক তরঙ্গ, অতিবেগনি রশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতির স্থান। বেতার তরঙ্গ থেকে এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ যেমন ক্ষুদ্রতর হতে থাকে তেমনি স্পন্দন সংখ্যা বাড়ে। এখন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তাড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করলেই আমরা বিভিন্ন তেজকে হাতের কাছে পাব। অতএব সমস্ত তেজ বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতিতে জেগে থাকলেও তারা লয় পেল সেই এক তরঙ্গ ধর্মে।

তেজের কথা বলতে গিয়ে আমরা জড় পদার্থকে সেই কোন্ পরমাণুবাদের যুগে ফেলে এসেছি। ডাল্‌টনের পরমাণুবাদকে কেন্দ্র করে যখন রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার বহু সমস্যার সমাধান হচ্ছিল তখন ক্রুক্‌শ্ পরমাণুর ভিতরকার একটি ক্ষুদ্রতম বস্তুকণার অস্তিত্বের কথা শোনালেন। নলের ভিতর কিছু বাতাস রেখে তিনি তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালালেন। বিদ্যুৎবর্তনীর ঋণ-ফলক ও ধন-ফলক সেই নলের ভিতর থাকলো। দেখা গেল, একটি রশ্মি ঋণ-ফলক থেকে ধন-ফলকের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এর নাম দেওয়া হলো ক্যাথোড বা ঋণ-রশ্মি। পরীক্ষায় দেখা গেল, এই রশ্মিতে কিছুটা জড় ও কিছুটা বিদ্যুৎ তেজের সংমিশ্রণ রয়েছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিলিকান এই রশ্মির প্রত্যেকটি কণিকার ভর ও বিদ্যুৎ মাত্রা নির্ধারণ করলেন। এদের নাম দেওয়া হলো, ইলেকট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৫০ ভাগের এক ভাগ ভর ও ঋণ-বিদ্যুতের সমন্বয়ে এদের সৃষ্টি। ইলেকট্রন পরমাণুর একটি উপাদান বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো। আমরা প্রত্যেক মৌলিকপদার্থ বা পরমাণুকে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বলেই জানি। ইলেকট্রন যদি এই পরমাণুর একটি উপাদান হয় তবে কিছু ধন-বিদ্যুৎও পরমাণুতে থাকা সম্ভব। আমরা আর একবার পূর্বোক্ত সেই ক্যাথোড-রশ্মির নলকে পরীক্ষা করে দেখলাম—যেদিকে ক্যাথোড নির্গত হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত দিকে আর একটি রশ্মি বেরুচ্ছে—তার নাম হলো ক্যানেল রশ্মি। এই রশ্মির প্রত্যেকটি কণিকায় রয়েছে একমাত্রা ধন-বিদ্যুৎ; আর তাদের ভর পরমাণুর ভরের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। এদের নাম হলো—আয়ন। এখন আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে,

প্রত্যেক পরমাণুতে দুটি পদার্থ রয়েছে—একটি ঋণ-বিদ্যুৎ সমন্বিত প্রায় ভরহীন বস্তুকণা আর একটি ঠিক পরমাণুর ওজনের ধন-বিদ্যুৎ সমন্বিত বস্তুকণা। পরমাণুর ওজনের কাছে ইলেকট্রনের ভর উপেক্ষণীয় বলেই আয়ন বা পরমাণুর প্রোটন, পরমাণুর সমস্তটা ওজন পেয়ে থাকে এবং ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমপরিমাণের বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ সম্মিলিত হয়ে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ পরমাণুর সৃষ্টি করে। এখন আমরা জানতে পারলাম যে, জড় পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা নয়। ইলেকট্রন ও প্রোটন নামে দুটি তড়িৎ কণিকাই জড় পদার্থের সৃষ্টি করেছে। কোন বস্তু যখন তাপ বা আলো বিকিরণ করে তখন তার পরমাণুর ভিতরকার ইলেকট্রনগুলো সবেগে আন্দোলিত হয়ে তাড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি করে। তাপ বা দৃশ্য-আলোকরূপে তখন আমরা সেই তরঙ্গকে অনুভব করি আমরা এই নূতন উপসংহারে এলাম যে, জড় পদার্থ নিছক জড় পদার্থ নয়—কতকগুলো বিদ্যুৎ কণিকায় তার দেহ গড়া। আমাদের পূর্বোক্ত ক্যাথোড নল নিয়ে পরীক্ষা করে রঞ্জেন এক নূতন রশ্মির সন্ধান পেলেন। ক্যাথোড রশ্মি কাচ নলের দেওয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই রশ্মির জন্ম দিয়েছে। এর নাম দেওয়া হলো এক্স-রে বা রঞ্জেন রশ্মি। ক্যাথোড রশ্মি বা ক্যানেল রশ্মির মত এক্স-রে'তে নেই কোন বস্তুকণা—আলোকের মত সম্পূর্ণ তরঙ্গধর্ম এতে বিদ্যমান; কিন্তু এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোক, এমন কি অদৃশ্য অতি বেগনি আলোর চাইতেও কম। এই রশ্মি অতি ভেদক বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানব শরীরের ভিতরকার তথ্য সংগ্রহের জন্যে এর প্রয়োগ করা হয়। তরঙ্গধর্মী রশ্মিদের তালিকায় রঞ্জেন রশ্মির নাম যোগ করে দেওয়া হলো। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সামান্য অংশ জুড়ে রয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রীন। এর ব্যাস হলো ১/১০^১২ সেঃ, পরমাণুর ব্যাস ১/১০^৮ এর কাছাকাছি। পরমাণুর প্রায় সবটা ভর কেন্দ্রীনে নিবদ্ধ। আর কেন্দ্রীনের উপাদান হচ্ছে প্রোটন, নিউট্রন ও পজিট্রন প্রভৃতি কতকগুলো বস্তুকণা। প্রোটনের সঙ্গে পূর্বেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। নিউট্রন হলো বিদ্যুৎহীন বস্তুকণা। এর ওজন প্রোটনেরই সমান। পজিট্রন ঠিক ইলেকট্রনের অনুরূপ ওজনের ধন-বিদ্যুৎ সমন্বিত বস্তুকণা। নিউট্রন ও পজিট্রন মিলে যেমন প্রোটনের সৃষ্টি হতে পারে আবার প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলে নিউট্রনের জন্ম দেয়। সে যা-হোক এই কেন্দ্রীনের চারদিকে পরমাণুর বাকী আয়তনটুকু ঘিরে কতকগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে এই কেন্দ্রীনকে প্রদক্ষিণ করে কতকগুলো ইলেকট্রন, ঠিক আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে। নিউট্রন বিদ্যুৎহীন বস্তুকণা বলেই বিদ্যুৎযুক্ত কেন্দ্রীনকে ভেঙে ফেলার ক্ষমতা তার অসীম।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমরা আর এক নূতন আলোর সন্ধান পেলাম। এর নাম হলো গামা রশ্মি। রঞ্জেন রশ্মির চাইতেও এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছোট এবং ভেদশক্তি খুব বেশী। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোর কেন্দ্রীন থেকে এই অদৃশ্য আলোক রশ্মি এবং আল্‌ফা ও বীটা নামে আরো দুটি রশ্মি আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বীটা রশ্মি ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আল্‌ফা রশ্মি হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন মাত্র। এই তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলোকে অন্য মৌলিক পদার্থে আপনা আপনি রূপান্তরিত হতে দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হলেন। পরমাণু যে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা, এ সিদ্ধান্ত আর টিকলোনা। কোন ধাতুর

পরমাণুতে তেজের সংস্পর্শ হলে পরমাণুর কিছু ইলেক্‌ট্রন তার কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। এই পরীক্ষাকে আলোক-তড়িৎ আখ্যা দেওয়া হয়। আলোকের তীব্রতা বাড়ালে এক্ষেত্রে বহির্গত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু তার গতিবেগ থাকে একই। ধরা যাক, আমরা সোডিয়াম পৃষ্ঠের উপর ক্ষীণ সবুজ আলো ফেললাম। ফলে কত ইলেক্‌ট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে বাইরে ছুটলো, আর তাদের গতিবেগই বা কত—এ আমরা গণনা করতে পারি। পরে সেই সবুজ আলোর তীব্রতা যদি বাড়িয়ে দিই তবে কক্ষচ্যুত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা যায় বেড়ে; কিন্তু তাদের গতিবেগ সেই একই থাকে। এখানে সবুজ আলোর পরিবর্তে অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করে আমরা বহির্গত ইলেকট্রনগুলোর গতিবেগ বাড়াতে পারি। আলোক যদি তরঙ্গধর্মী হয় তবে সে তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগের তীব্রতা বাড়াতে পারেনা কেন? তবে কি আলোক কণাধর্মী? আলোক-তড়িৎ পরীক্ষা আবার নিউটনের আলোক-কণিকাবাদের নবজন্ম দিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বল্লেন, আলোক-তড়িৎ সমস্যাকে ব্যাখা করতে হলে আলোককে তরঙ্গধর্মী বলা চলবে না। প্রত্যেক আলোকের একটা ক্ষুদ্রতম পরমাণু আছে। তাকে কোয়াণ্টা বলা যায়। বিভিন্ন তেজের ক্ষেত্রে এই কোয়াণ্টার তেজও বিভিন্ন। আলোকের ক্ষেত্রে আমরা কোয়াণ্টাকে ফোটন আখ্যা দিই। এখন আমরা আলোক-তড়িৎকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। সবুজ আলোর ফোটনগুলোর প্রত্যেকটি একটা নির্দিষ্ট তেজমাত্রা বহন করে। আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির অর্থ, ফোটনেরই সংখ্যা বৃদ্ধি। এখন প্রত্যেকটি ফোটন প্রত্যেক ইলেক্‌ট্রনকে একই গতিবেগ দিবে। কারণ একই আলোর ফোটন একই তেজ বহন করে, কিন্তু আলো তীব্রতর হলে তাতে বেশী ফোটনের সৃষ্টি হয়; ফলে ইলেক্‌ট্রনও বহির্গত হয় বেশী পরিমাণে। কিন্তু অন্য আলোর বেলায় ইলেক্‌ট্রনের আগেকার গতিবেগ বদলায় কেন? কারণ বিভিন্ন আলোর ফোটনের তেজের পরিমাণ বিভিন্ন। বিজ্ঞানীরা এই ফোটন বা কোয়াণ্টার গাণিতিক পরিমাণ নির্ণয় করেছেন।

কোয়াণ্টা = $৪\cdot১ \times ১০^{-১৫}$ × স্পন্দন-সংখ্যা।

এক্ষেত্রে স্পন্দন-সংখ্যা বলতে এক সেকেণ্ডে ফোটনটি যতবার স্পন্দিত হয় তার পরিমাণ। $৪\cdot১ \times ১০^{-১৫}$ এই সংখ্যাটি প্ল্যাঙ্কের নিত্য-সংখ্যা নামে খ্যাত। আলোক-তড়িৎ কোষের পরীক্ষায় দেখা গেল, ফোটনের স্পন্দন-সংখ্যা বাড়লে ইলেক্‌ট্রনের তেজ বা গতিবেগ বাড়ে। স্পন্দন-সংখ্যা যদি একমাত্রা বাড়ান যায় তবে ইলেকট্রনের তেজ বাড়ে $৪\cdot১ \times ১০^{-১৫}$ ইলেকট্রন ভোল্ট। প্রত্যেক ধাতুর ক্ষেত্রে এই অনুপাত সমান বলেই একে নিত্য-সংখ্যা বলা যায়। তবে আলোক বা তেজ কি তরঙ্গ-ধর্মী নয়—কোয়াণ্টামবাদ দিয়ে তো তার অপবর্তন প্রভৃতি ধর্মের ব্যাখ্যা করা যায় না; কিন্তু তরঙ্গবাদ দিয়েওতো আলোক-তড়িতের ব্যাখা করা চলে না। অগত্যা বিজ্ঞানীকে এই অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকতে হলো—তেজে আরোপিত হলো উভয় মতবাদ, ভবিষ্যতের উপর এই সমস্যা সমাধানের ভার ন্যস্ত করে। তরঙ্গধর্মী তেজে যখন কণিকা ধর্মের আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখন বিজ্ঞানীরা জড় পদার্থের কণিকাধর্মে তরঙ্গধর্মের সম্ভাবনার কথা শোনালেন। আমরা জানি সাধারণ আলোক একটি ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অপবর্তিত হয়ে পরপর আলো ও অন্ধকার বৃত্তের সৃষ্টি করে। কিন্তু রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলে সাধারণ ছিদ্র দিয়ে তার অপবর্তন সম্ভব নয়। কোন কোন আলোর অপবর্তনের জন্যে যে সূক্ষ্ম সমান্তরাল দাগ কাটা ধাতু ফলক ডিফ্র্যাকসন গ্রেটিং রূপে ব্যবহৃত হয়—তাতেও রঞ্জেন রশ্মির অপবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতির মাঝেই এমন কতকগুলো দানাবাঁধা পদার্থ রয়েছে যাদের পরমাণু বিন্যাসের সুষ্ঠু ব্যবস্থা

ডিফ্র্যাকসন গ্রেটিং-এর কাজ করে। এই গ্রেইটিং-এ রঞ্জেন রশ্মির অপবর্তন সম্ভব হলো। সূক্ষ্ম সোনার পাতকে গ্রেটিং রূপে ব্যবহার করে বিজ্ঞানী টম্‌সন ইলেক্‌ট্রন রশ্মির অপবর্তন আবিষ্কার করলেন। রঞ্জেন রশ্মির অপবর্তনে যে চিত্র পাওয়া যায়, ইলেক্‌ট্রনের অপবর্তনের চিত্রটি তার সঙ্গে মিলে গেল। ডেম্প্‌ষ্টার আবার প্রোটনেরও অপবর্তন প্রমাণ করলেন। ফলে এই ধারণা দাঁড়াল যে, জড় বস্তুকে আমরা এতদিন যে বিদ্যুৎকণা কল্পনা করেছিলাম—সেই জড় পদার্থে আবার তেজের তরঙ্গধর্ম আরোপিত হলো। জড় ও তেজ উভয়েতেই আমরা কণাবাদ ও তরঙ্গবাদের এক বিস্ময়কর সমন্বয় দেখতে পেলাম। তবে জড় ও তেজ এতদিন তাদের যে বিরাট ব্যবধান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ কি সে ব্যবধান ঘুচে গিয়ে তারা পরস্পর হাত মিলাবে? তাই সম্ভব। কয়েকজন বিজ্ঞানী সীসকের ভিতর গামা রশ্মি চালিয়ে এই রশ্মি থেকে ইলেক্‌ট্রন ও পজিট্রনের আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন। আবার কোনও জড় পদার্থের ভিতর পজিট্রন প্রয়োগ করে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন ও নিয়োজিত পজিট্রনের সমন্বয়ে তারা গামা রশ্মিকে প্রত্যক্ষ করলেন। তেজ থেকে জড়ের ও জড থেকে তেজের রূপান্তর যেন বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে আজ প্রথম ধরা পড়লো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে গণিতের ভাষায় তেজ ও জড়ের পরস্পর রূপান্তরের এক বিরাট সম্ভাবনার কথা আমাদের জ্ঞাপন করেছিলেন। ধূমকেতুর লেজ সূর্যের ঠিক উল্টো দিকে কেন ফিরে থাকে? কারণ সূর্যের আলোকের চাপ ঐ লেজের ক্ষুদ্রকণা-গুলোকে দূরে সরিয়ে রাখে সব সময়। চাপ থাকলে তার ভর থাকাওতো স্বাভাবিক।

তেজের ভর $= \frac{\text{তেজ}}{(\text{গতিবেগ})^{২}}$। মহাশূন্যে তেজের গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল ধরা যায় তবে তার ভর অত্যন্ত সামান্য দাঁড়ায়। অতি সামান্য হলেও বহুদিন থেকে ভরহীন আলোককণা বা তরঙ্গ আজ যখন জড়ের ভর গ্রহণ করলো তখন জড় ও তেজের ব্যবধান যা একটু খানি টিকে ছিল তা' একেবারে উবে গেল। তবে জড় ও তেজের রূপান্তর তো স্বাভাবিক। হিসেবে দেখা যায় যে, একগ্র্যাম জড় পদার্থ সর্বতোভাবে তেজে রূপান্তরিত হলে ৯×১০^{২০} আর্গ তেজের উদ্ভব হবে। বিজ্ঞানীদের মতে নবাবিষ্কৃত নভোরশ্মিতে জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তরের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্তমান। এই নভোরশ্মি সর্বদেশে ও সর্বকালে কোন এক অজানা লোক থেকে বিশ্বের উপর বর্ষিত হচ্ছে। জলে, স্থলে, বায়ুমণ্ডলে ও মহাশূন্যে সর্বত্র অবাধ গতিতে এই তেজের বিকিরণ হচ্ছে। এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য গামা রশ্মির চাইতেও ছোট। তাই এর ভেদশক্তি অত্যন্ত বেশী। কেউ কেউ এই রশ্মিকে প্রোটন, পজিট্রন প্রভৃতি মৌলিক বিদ্যুৎকণার বর্ষণ বলে মনে করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জীন্‌স্‌ মনে করেন যে, উত্তপ্ত নক্ষত্র জগতের প্রচণ্ড তাপে জড় পরমাণু থেকে মুক্ত হচ্ছে আদিম মৌলকণা—ইলেকট্রন ও প্রোটন ইত্যাদির আকারে। তারাই আবার বিপরীত ধর্মের আকর্ষণে সংহত হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড তেজের মধ্যে। সেই তেজের বিকাশ আমরা দেখতে পাই নভোরশ্মিতে। আবার বিজ্ঞানী মিলিকান বলেন, নক্ষত্র জগতের উত্তাপে পরমাণুর ধ্বংস হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পুনরায় সৃষ্টি হচ্ছে তেজের—যারা আবার ইলেকট্রন, প্রোটন তৈরী করছে। সেই ইলেকট্রন, প্রোটন আবার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর জন্ম দিচ্ছে। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন থেকে পরমাণুর জন্ম হওয়ার সময় পরমাণু তার সেই উপাদানগুলোর অবিকল ওজন পায় না, তার ভর যায় কমে। ডাঃ মিলিকান বলেন, সেই কমতি ভরই তেজ রূপে বিকিরিত হয়। তাকেই আমরা নভোরশ্মি আখ্যা দিয়ে থাকি।

জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তরের সমস্যা এতদিন মতবাদে ও পরীক্ষাগারে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু তার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করলাম পরমাণু বোমার সৃষ্টিতে। হিরোসিমার হিমশীতল মৃত্যুতে সহসা আমরা অনুভব করলাম তার বীভৎস দিকটা।

পর্যায়সারনীতে যে ৯২টী মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তাদের অঙ্ক সংখ্যা পরমাণুর কেন্দ্রীনস্থিত তড়িৎ-ভরণ মাত্রার সঙ্গে সমান। এইরূপ ৯২ নং মৌলিক পদার্থ হচ্ছে ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ওজন ২৩৮। ২৩৪ ও ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের সমপদ এই মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রয়েছে। সমপদ বলতে এই বোঝায় যে, একই পরমাণু সংখ্যার মৌলিক পদার্থ তার আপন ধর্ম বজায় রেখে নিজের কেন্দ্রীনে কিছু ভর বাড়ায় বা কমায়। $_{92}U^{238}$ বলতে আমরা ২৩৮ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়ামকে বুঝি। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে ইউ-রেনিয়াম পাওয়া যায় তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই এই $_{92}U^{238}$ বাকীটা $_{92}U^{235}$ ও $_{92}U^{234}$। $_{92}U^{238}$ এর কেন্দ্রীনে নিউট্রন প্রবেশ করিয়ে ইতালীয়ান বিজ্ঞানী ফার্মি এর সামান্য অংশে রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তিনি মন্তব্য করলেন—৯৩, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ পরমাণু সংখ্যার নবতম মৌলিক পদার্থের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ীত্বের জন্যে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলো। পরে নানা পরীক্ষায় ৯৩ ও ৯৪ পরমাণু সংখ্যার মৌলিক পদার্থের নিশ্চিত অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হলো। এদের নাম দেওয়া হলো নেপচুনিয়াম ও প্লুটো-নিয়াম। $_{92}U^{235}$ এর কেন্দ্রীনে নিউট্রন প্রয়োগ করে বিজ্ঞানী অটো হ্যান এবং তার সহকর্মীরা দেখলেন $_{92}U^{234}$ কেন্দ্রীন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ৫৬ পরমাণু সংখ্যার বেরিয়াম ও ৫০ থেকে ৫৭ পরমাণু সংখ্যার কতক-গুলো মৌলিক পদার্থের জন্ম দিচ্ছে। ইউরে-নিয়ামের এই দ্বিখণ্ডীকরণ $_{92}U^{238}$ এর চেয়ে সমপদ $_{92}U^{235}$ এর দ্বারা বেশী সুবিধাজনক ও কার্যকরী। দ্বিখণ্ডীকৃত মৌলিক পদার্থগুলোকে ওজন করে দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুর ১/১০০০ ভাগ ভর কোথায় হারিয়ে গেল। তখন বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন যে, এই সামান্য ভরটুকু তেজে রূপান্তরিত হয়েছে। $_{92}U^{235}$ কেন্দ্রীনকে এইভাবে খণ্ডিত করে বিজ্ঞানীরা এক বিরাট তেজপুঞ্জের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। ফার্মীর আবিষ্কৃত প্লুটোনিয়ামের দ্বিখণ্ডীকরণেও তাঁরা বিরাট শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন। একগ্র্যাম প্লুটোনিয়াম থেকে ৪ × ১০⁷ আর্গ তেজ মুক্তি লাভ করে। ১০০০ টন কয়লা পুড়িয়ে আমরা যে শক্তি পাই এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামকে পূর্ব প্রক্রিয়ায় দ্বিখণ্ডিত করলে সেই শক্তি পাব। যুধ্যমান জাতিগুলো তখন এই শক্তিকে তাদের অস্ত্র বলে ব্যবহার করবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হলো। হিসেব করে দেখা গেল, দু-টনের ট্রাইনাইট্রোটলুইন যেখানে ৩ × ১০⁵ কিলো ক্যালোরি শক্তিতে ২০০ গজ ব্যবধানের মধ্যে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করতে পারে সেখানে দু-টনের একটি ইউরেনিয়াম বোমা তার চেয়ে ১০⁷ গুণ শক্তি সৃষ্টি করে ২০ মাইল ব্যাসার্ধ পরিমিত বৃত্তের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাবে। বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা ব্যর্থ হলো না। আমেরিকার কারখানায় এই বোমা তৈরী হলো। হিরোসিমায় জড় থেকে রূপান্তরিত এই তেজের বীভৎস ধ্বংসলীলা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

জড়ের নিত্যতাবাদ ও তেজের নিত্যতাবাদ এ দুটিকে মিলিয়ে জড় ও তেজের নিত্যতাবাদের আইন প্রতিষ্ঠা হলো। বোঝা গেল, এই বিশ্ব-জগতে জড় ও তেজের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে। তারা পরস্পর রূপান্তরিত হয়ে ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মোটের উপর তাদের পরিমাণ অক্ষুণ্ন রাখছে।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের দ্বিখণ্ডীকরণে যে তেজের উদ্ভব হয় তা' দিয়ে মানবসমাজের এক মহত্তর

কল্যাণের বিরাট সম্ভাবনার কথা আমরা বিজ্ঞানীদের কাছে শুনেছি এবং মানুষের শুভবুদ্ধি এই শক্তিকে সেভাবেই নিয়োজিত করুক; কিন্তু তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞান আজ কোথায়? জড় ও তেজ যদি এক, তাহলে জড় তো তেজের ঘনীভূত বিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়! চারিদিকে এই যে তেজের বিপুল বিকাশ এর সার্থকতা কি এইখানেই শেষ? খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী তাঁর খেই হারিয়ে ফেলেছেন। আজ মনে হচ্ছে, দার্শনিকের 'চৈতন্য'ও এই শক্তির সঙ্গে হাত মিলাবে—প্রাচ্য দর্শনের মূলসূত্রটিকে আজ আমরা আবার স্বীকার করবো, কোন কোন বিজ্ঞানী সেই সম্ভাবনার কথাও আমাদের জানিয়েছেন।

ক্রোম্যাটোগ্রাফি

শ্রীজীবনকুমার চক্রবর্তী

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ উৎঘাটনে বিজ্ঞানীদের চেষ্টার বিরাম নেই। প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলোর বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তাদের নানা রকমের উপকারিতা সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই দরকার তাদের প্রত্যেকটির উপাদানগুলোকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা। যে সমস্ত উপাদান এতে বেশী পরিমাণে থাকে, তাদের পৃথক করার বেলায় বিজ্ঞানীরা সাধারণ ল্যাবরেটরী প্রণালীগুলো অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু মুস্কিল হয় কোন সূক্ষ্ম পদার্থের উপাদানগুলোকে পৃথক করার বেলায়। কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম পদার্থটি আরও কয়েকটি সমজাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। তখন আর ল্যাবরেটরীর সাধারণ প্রণালী দ্বারা তাদের আলাদা করা খুব সহজ হয় না। এই সমস্যার সমাধান করেছে 'ক্রোম্যাটোগ্রাফি'। এই সহজ প্রণালী দ্বারা বিজ্ঞানীরা নানা জাতীয় স্বাভাবিক সংমিশ্রণ থেকে সমজাতীয় প্রত্যেকটি উপাদানকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন।

১৯০৬ সালে রুশদেশীয় বিজ্ঞানী সোয়েট এই অভিনব প্রণালীটি আবিষ্কার করেন। সোয়েট সাধারণতঃ গাছপালা নিয়ে গবেষণা করতে ভালবাসতেন। উদ্ভিদ-জগতের নানারকম সুন্দর সুন্দর স্বাভাবিক রং তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত, যেমনভাবে আরও অনেক বিজ্ঞানীকে করেছিল। লতাপাতার সবুজবর্ণ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়েই তিনি এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি আবিষ্কার করেন। গাছের পাতা সবুজ বা পীতাভ বর্ণের হয়; তার কারণ এতে ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ আছে। সোয়েট কতকগুলো সবুজ পাতা থেকে পেট্রোলের সাহায্যে কতকটা সবুজ জিনিস বের করে নিলেন এবং পেট্রোল মিশ্রিত সবুজ পদার্থটিকে একটি কাঁচের নলে ভর্তি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গুঁড়োর (চক্ বা খড়িমাটির গুঁড়ো) উপর ঢেলে দিলেন এবং দেখতে পেলেন—আপাতদৃষ্টিতে সবুজ রং বিশিষ্ট তরল পদার্থটি ওই গুঁড়োগুলো অতিক্রম করবার সময় তাদের সংস্পর্শে এসে কয়েকটা বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথমেই নলের উপরের অংশের একটা জায়গায় ফিকে হলদে রং দেখা যাচ্ছে; তারপরেই ক্রমশ নীচে দুটো সবুজ রং

রয়েছে এবং আরও নীচের দিকে আরও খানিকটা জায়গায় হল্‌দে রং প্রকাশ পাচ্ছে। সর্বশেষে তাতে যে তরল পদার্থটি এলো তার রং একদম হল্‌দে। প্রত্যেকটি জিনিস তিনি আলাদা করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন—ক্লোরোফিলেরও আবার দুটি স্বতন্ত্র উপাদান আছে। যথা—আল্‌ফা-ক্লোরোফিল ও বিটা-ক্লোরোফিল। সোয়েট নিজেই এই প্রণালীর সাহায্যে অনেক সূক্ষ্ম জিনিসের গবেষণা করেছেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটির মীমাংসা করেছেন। সর্বোপরি তিনি এই প্রণালীটিকেও বিশেষ উন্নত করে গেছেন।

তাহলেই মোটামুটিভাবে ক্রোম্যাটোগ্রাফি হচ্ছে একটি সহজ অথচ স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরী প্রণালী, যা দিয়ে কোন সংমিশ্রণ থেকে তার প্রত্যেকটি উপাদানকে পৃথক করা যায়। কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের শোষণ ক্ষমতার উপরই এই প্রণালীর ভিত্তি। এই শোষণ বা আকর্ষণ করার ক্ষমতাও আবার সকল রাসায়নিক পদার্থের সমান নয়। তেমনি মিশ্রিত দ্রব্যের উপাদানগুলোরও আবার নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ আছে। কাজেই কোন্‌ জাতীয় উপাদানের কোন্‌ রাসায়নিক পদার্থের উপর সহজ আকর্ষণ তা আগে থাকতে জেনে নিলে ভাল হয়। এজন্যে নানাজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অ্যালুমিনা (ব্রকম্যান্‌) (প্রেসিপিটেটেড্‌) ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্‌সাইড, সুক্রোজ প্রভৃতি। সোয়েট এজাতীয় প্রায় ১০০টি জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

প্রণালীটি সাধারণতঃ এই ;—একটা কাঁচের নলের ভিতরে প্রয়োজন মত রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো বেশ আঁট করে ভর্তি করে নলটিকে সোজাভাবে কর্কের ভিতর দিয়ে একটা ফ্লাস্কের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষণীয় নমুনাটি একটি সাধারণ দ্রাবকে সম্পূর্ণরূপে গলিয়ে নিয়ে নলের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ঢেলে দেওয়া হয়। দ্রাবক পদার্থটি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে পরীক্ষণীয় দ্রব্যটি সম্পূর্ণভাবে গলে যায়, কোন কিছু অবশিষ্ট না থাকে। এজন্যে সাধারণতঃ হাল্কা পেট্রোলিয়াম, বেন্‌জিন, কার্বন-ডাইসালফাইড, অ্যালকোহল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গুঁড়োগুলোর ভিতর দিয়ে নমুনা মিশ্রিত তরল পদার্থ সহজে অতিক্রম করবার জন্যে প্রেসার বা সাক্‌সন ব্যবহার করা হয়। মিশ্রিত দ্রব্যের অনেকগুলো উপাদানই নলের গুঁড়োগুলোর বিভিন্ন অংশে মোটামুটিভাবে পাশাপাশি আটকে যাবে। এটা বিভিন্ন রঙের তারতম্য থেকেই বোঝা যাবে। এভাবে বিভিন্ন উপাদানগুলো গুঁড়োর মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়ারও একটা নিয়ম আছে। কাঁচের নলের গুঁড়োর উপর প্রত্যেকটি উপাদানের সমান আকর্ষণ থাকে না। যার টান সবচেয়ে বেশী সে প্রথমেই আটকে যায়। যার টান অপেক্ষাকৃত কম সেটি এরূপভাবে উপর থেকে ক্রমশ নীচের দিকে আবদ্ধ হয়। যাদের বিশেষ কোনও আকর্ষণ থাকে না—সেগুলো তরল পদার্থের সঙ্গে নীচের ফ্লাস্কে জমা হয়। নলের মধ্যস্থিত গুঁড়োর উপর এই বিভিন্ন রং বা উপাদানের সমাবেশকে 'ক্রোম্যাটোগ্রাম্‌' বলে। যে দ্রাবকে পরীক্ষণীয় বস্তুটি গলান হয়েছিল শুধু সেই দ্রাবক পদার্থটিকে উপর থেকে কিছুক্ষণ ঢাললেই দেখা যাবে যে, উপাদানগুলো পূর্বে যেসব জায়গায় মোটামুটি রকমে আটকে গিয়েছিল সেগুলো ক্রমেই নীচের দিকে সরে গিয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রত্যেক পৃথক বন্ধনীস্থিত গুঁড়োগুলোকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এগুলো এবং ফ্লাস্কের মধ্যস্থিত তরল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেই বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে বলে দেওয়া যায়।

অবশ্য দরকার মত কাজের সুবিধার জন্যে এই ধরণের যন্ত্রকেই নানারকম ভাবে পরিবর্ধন ও সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এই

ধরণের যন্ত্রেরই ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, বিভিন্ন রং বিশিষ্ট বন্ধনীস্থিত গুঁড়োগুলোকে পৃথক করতে অসুবিধা হয়; অথবা এমনও হয় যে, গুড়োগুলো মিশ্রিত দ্রব্যের অনেকগুলো উপাদানকেই সুবিধামত একত্রে ধরে রাখতে পারে না। তখন আবশ্যক মত দ্রাবক পদার্থের দ্বারা প্রত্যেকটি উপাদানকে ক্রমান্বয়ে তলায় আলাদা আলাদা ফ্লাস্কে টেনে নেওয়া যায় এবং প্রত্যেকটি ফ্লাস্কের তরল পদার্থ পরীক্ষা করে উপাদানগুলো বলে দেওয়া হয়। এই রকম প্রণালীকে লিকুইড বা তরল ক্রোম্যাটোগ্রাফি বলে।

রঙ্গীন পদার্থের ক্রোম্যাটোগ্রাম সহজেই তাদের বিভিন্ন রং থেকে বোঝা যায়; সুতরাং দেখেই উপাদানগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু দেখা গেছে যে, খুব সামান্য রং বিশিষ্ট পদার্থ বা সম্পূর্ণ রং বিহীন পদার্থের বেলায়ও এই ধরণের পৃথক করার নিয়মের কোন তারতম্য হয় না। সেখানে অবশ্য উপাদানগুলোর রাসায়নিক গুঁড়োর উপর কার কোথায় কি ভাবে অবস্থান, তা খালি চোখে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। তবে তা ঠিক করার জন্যেও নানারকম উপায় আছে। সে সব ক্ষেত্রে আল্‌ট্রা ভায়োলেট ল্যাম্পের সাহায্য নেওয়া হয়, অথবা রং বিহীন মিশ্রিত দ্রব্যটিকে সুবিধামত রঙ্গীন পদার্থে পরিণত করে নেওয়া হয়।

ক্রোম্যাটোগ্রাফির প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি বলা হলো। সোয়েটের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এর ব্যবহার ও খ্যাতি ততটা বিস্তৃত হয়নি। তার কতকগুলো কারণ ছিল। এই আবিষ্কারের বিষয় তিনি একমাত্র রুশ ভাষাতেই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে গত কয়েক বছরের ভিতরে ক্রোম্যাটোগ্রাফি পৃথিবীর প্রত্যেক গবেষণাগারে একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি নানাজাতীয় স্বাভাবিক সংমিশ্রণের গবেষণার জন্যে এই প্রণালীর খুব ব্যবহার হচ্ছে। বিখ্যাত ঔষধ পেনিসিলিন আবিষ্কারের সময় এর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে বহু সূক্ষ্ম গবেষণার জন্যে এই প্রণালী অপরিহার্য।

আর্ভিং ল্যাংম্যুর

শ্রীসরোজকুমার দে

আজ আমরা কত রকমেরই না বৈদ্যুতিক আলো দেখতে পাই! কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ—কিছুই বাদ যায়নি। বৈদ্যুতিক বাল্‌বের মধ্যে ভরা নানা রকমের গ্যাসই এই রঙীন আলোর উৎস। যেদিন প্রথম বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কৃত হয়, সেদিন—বাল্‌বের মধ্যে যে কোন গ্যাস ভরা যেতে পারে—এ ধারণা কারুরই ছিল না। কিন্তু একদিন এ সম্বন্ধে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—তিনিই হলেন আর্ভিং ল্যাংম্যুর।

আমেরিকার ব্রুকলিন সহরে ১৮৮১ সালে ৩১শে জানুয়ারি ল্যাংম্যুরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁর ছিল চারিটি সন্তান। ল্যাংম্যুর তাঁর তৃতীয় পুত্র।

ল্যাংম্যুরের বড় ভাই আর্থার ছিলেন একজন

বিশিষ্ট রসায়নবিদ্। তাঁর অনুপ্রেরণায় ল্যাংম্যুর ছেলেবেলাতেই রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর্থার মাঝে মাঝে ভাইয়ের কাছে রসায়নের অদ্ভুত কাহিনী বলতেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার চমৎকার রসায়নের পরীক্ষাও করে দেখাতেন। ল্যাংম্যুরের কাছে এসব জিনিস যেন যাদুবিদ্যার মত মনে হতো। ল্যাংম্যুরের বয়স তখন ছ'বছর। আর্থার সে সময়ে নিউইয়র্কে ট্যারীটাউনে রসায়নের ছাত্র ছিলেন। একদিন রাত্রে আর্থার কলেজ থেকে একটি বোতলে চার আউন্স ক্লোরিন গ্যাস ভরে এনে ভায়ের হাতে দিলেন। ল্যাংম্যুর অত্যন্ত উৎসুক হয়ে সেই বোতলের ছিপিটা খুলেই নাকে দিয়ে গ্যাসটা খুব জোরে টেনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রায় দম আটকে মারা যাবার মত অবস্থা হলো। বাড়ীতে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। যাহোক, সেবারের মত ল্যাংম্যুর বেঁচে গেলেন। এই ঘটনার পর কয়েক বছর তার পিতা বাড়ীতে কোন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ঢোকাতে দেন নি।

এই সময়ে ল্যাংম্যুরের পিতা পরিবারবর্গ নিয়ে আমেরিকা ছেড়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বাস করতে চলে যান। তিনি সেখানে নিউইয়র্ক জীবন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হয়ে কাজ করতে থাকেন। ল্যাংম্যুরকে সেখানকার একটি ফরাসী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মকানুন তাঁর একবারেই ভাল লাগতো না—স্কুল ছিল তাঁর কাছে কারাগার। বই পড়ার চেয়ে ভাবতেই তাঁর বেশী ভাল লাগতো। তাঁর মস্তিষ্ক সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন থাকত। তিনি যাকে সামনে পেতেন, তার সঙ্গেই বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতেন। এমন কি, যখন কাউকে পেতেন না তখন তাঁর আট বছরের ছোট ভাই ডিন্‌কে বিজ্ঞানের কথা বলে বলে অতিষ্ঠ করে তোলতেন। মাঝে মাঝে ডিন্ তার কাছে ছাড়া না পেয়ে কেঁদে উঠত, তারপর বয়স্ক কেউ ছুটে এসে তাকে নিষ্কৃতি দিত।

১৮৯৫ সালে ল্যাংম্যুর তাঁর পিতাকে জানালেন যে, তিনি আমেরিকার স্কুলে ভর্তি হতে চান। এই সময় আর্থার বিজ্ঞানে ডক্টরেট পান। তিনি তখন ভাইকে বিজ্ঞান পড়বার জন্যে খুব উৎসাহিত করতে লাগলেন। ল্যাংমুরের একটি বিশেষ গুণ ছিল—তিনি যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন তার আর অন্য কোনদিকে মন থাকত না। এই সময়ে আর্থার, অ্যালিস ডিন্ নামে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ল্যাংম্যুর তাকে দেখেছিলেন এবং তাকে তাঁর ভালই লেগেছিল। কিছুদিন পূর্বে র‍্যামসে ও লর্ড র‍্যালে আবিষ্কার করেন যে, বাতাসের মধ্যে আর্‌গন নামে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে। আর্থার একদিন ভাইকে এই আবিষ্কারের গল্প বলছিলেন। কিন্তু কথার মাঝে হঠাৎ একসময় তিনি বলে উঠলেন আর্ভিং জান বোধহয়—অ্যালিস্ ডিনের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? ল্যাংম্যুর শুধু একটি 'হুঁ' দিয়ে বললেন, 'তুমি আর্‌গন সম্বন্ধে যা বলছিলে তাই আগে বল, তারপর অন্য কথা।

এর পরের বছরেই আর্থারের বিয়ে হয়ে যাবার পর ল্যাংম্যুর দাদার কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলেন এবং ব্রুকলিনের একটি স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। ল্যাংম্যুর বাড়ীতেই একটি ছোটখাট বিজ্ঞানাগার গড়ে নিয়মিত সেখানে দাদার পরামর্শ মত রসায়নের বিবিধ পরীক্ষা করতে লাগলেন।

১৮৯৯ সালে ল্যাংম্যুর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেটালার্জি সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে থাকেন। ১৯০৩ সালে সেখান থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি গোটিংগেনে গিয়ে ওয়ালটার নার্ণষ্টের তত্ত্বাবধানে প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন।

পাঁচ বছর পরে তিনি স্কিনেক্‌টেডিতে এক বিজ্ঞান সভায় যোগদান করেন। এই সভায় ফোলিন জে, ফিঙ্ক নামে তাঁর এক ক্লাসের বন্ধুর সঙ্গে দেখা

হয়। কিন্তু তখন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর একজন কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু ল্যাংমুারকে সাদর অভ্যর্থনা করে কোম্পানীর গবেষণাগারে নিয়ে গেলেন এবং সেখানকার বহু কর্মচারী ও প্রধান পরিচালক ডাঃ উইলিস আর হুইট্‌নির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ল্যাংমুার এই কোম্পানীর কাজকর্ম খুব ভাল করে দেখাশুনা করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেবার হুইট্‌নিকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু এর পরের বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি হুইট্‌নি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে আবার স্কিনেক্‌টেডিতে কিছুদিন কাটাবার জন্যে চলে এলেন।

ল্যাংমুার প্রতিদিন কোম্পানীর কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখতেন—কর্মচারীরা কে কোথায় কেমনভাবে কাজ করছে। এই সময় এই কোম্পানী টাংষ্টেন তারের নতুন বৈদ্যুতিক আলো তৈরী করছিল। তখন সবেমাত্র এই টাংষ্টেন বৈদ্যুতিক আলোতে ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়েছে। কারণ এই ধাতু খুব বেশী উত্তাপ না পেলে গলে না (৩৩৭০° সে)। ল্যাংমুার দেখলেন, কারখানার কর্মচারীগণ এই আলো তৈরী করতে গিয়ে একটি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছে। সেটি হলো, টাংষ্টেনের ফিলামেণ্ট বায়ুশূন্য বাল্‌বে বেশীদিন স্থায়ী হয় না—কিছুদিনের মধ্যেই তারটা ভেঙে গিয়ে আলোটি অকেজো হয়ে পড়ে।

তখন এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে হলো, টাংষ্টেন তারের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোন গ্যাসীয় পদার্থ আছে। বিদ্যুত যখন তারের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে তখন সেগুলি ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। তিনি হুইট্‌নিকে সেকথা জানালেন এবং বললেন যে, তিনি নানারকমের তারকে বায়ুশূন্য স্থানের মধ্যে গরম করে পরীক্ষা দ্বারা দেখতে চান যে, কতখানি গ্যাসীয় পদার্থ তার থেকে বেরিয়ে আসে। হুইট্‌নি পরীক্ষা করবার সম্মতি দিয়ে নিজেও তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ল্যাংমুার পরীক্ষা করে দেখলেন—ফিলামেণ্ট থেকে তার নিজের পরিমাণ গ্যাসের প্রায় ৭০০০ গুণ বেশী গ্যাস বেরিয়ে আসে—এই গ্যাস বের হওয়া যে কবে শেষ হবে তারও কোন ঠিক নেই।

ল্যাংমুারের মনে তখন প্রশ্ন জাগল—কোথা হতে এই গ্যাস আসছে? তিনি এই নিয়ে গভীর ভাবে গবেষণা করতে লাগলেন। গবেষণা করতে করতে এমন সব বিষয়ে চলে গেলেন যে, প্রকৃত বিষয়টি প্রায় চাপা পড়ে গেল। তবুও কিন্তু ডাঃ হুইট্‌নি তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ল্যাংমুার বহুদিন যাবৎ এ-বিষয়ে গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রায় তিন বছর গবেষণার পর ল্যাংমুার আবিষ্কার করলেন যে, ফিলামেণ্ট থেকে যে গ্যাসটি বেশী পরিমাণে বেরিয়ে আসে, সেটি হাইড্রোজেন। এই হাইড্রোজেন কাচের বাল্‌বের ভিতরের 'মেটাল কাপের' সংযোগস্থলে লাগানো ভেসিলিনের জলীয়বাষ্প থেকে উৎপন্ন হয়। ল্যাংমুারের এই তত্ত্ব আজ 'মার্‌কারি ভ্যাকুয়াম ল্যাম্পের' বহু উন্নতি সাধন করেছে। ল্যাংমুার আরও দেখলেন—কোন বাল্‌বকে একবারে বায়ুশূন্য করা সম্ভবপর নয়, কাজেই তিনি অন্য পন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি নানারকম গ্যাস বিভিন্ন পরিমাণে বাল্‌বের মধ্যে ভরে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, বাল্‌বে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা হলে খুব বেশী টেম্পারেচারে উত্তাপ ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। বহু গবেষণার পর প্রমাণিত হলো—জ্বলন্ত ফিলামেণ্ট, হাইড্রোজেনের অণুকে পারমাণবিক হাইড্রোজেনে বিযুক্ত করে। এই সূত্র ধরেই ল্যাংমুার 'অ্যাটমিক হাইড্রোজেন টর্চ' আবিষ্কার করেন—যার কাছে হেয়ারের 'অক্সি-হাইড্রোজেন ব্লো পাইপ'-ও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

এর প্রধান ব্যাপার হলো, একটি বৈদ্যুতিক আর্কের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করিয়ে সেটি জলে যাবার পূর্বেই তাকে পারমাণবিক হাইড্রোজেনে পরিণত করা হয়। এরই ফলে অত্যন্ত উত্তাপের সৃষ্টি হয়। কঠিন ধাতু জোড় দেওয়ার কাজে এই টর্চ ব্যবহৃত হয়।

বায়ুশূন্য বাল্‌ব কিছুদিন ব্যবহার করার পর দেখা যায়—কাচের ভিতরের অংশ কালো হয়ে গেছে। ল্যাংম্যুর পরীক্ষা করে দেখলেন, বাল্‌ব-গুলো একেবারে বায়ুশূন্য না হওয়ার ফলেই এই ত্রুটি ঘটে। ফিলামেণ্ট থেকে টাংষ্টেনের পরমাণুগুলো বেগে বেরিয়ে এসে সোজা বালবের কাচে গিয়ে ধাক্কা মারে এবং সেখানেই তারা লেগে থাকে। এই জন্যেই বালবের কাচ কালো হয়ে যায়। তিনি দেখলেন, যদি বালবের মধ্যে জলীয় বাষ্প ছাড়া অন্য কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস পরিমাণ মত ভরে দেওয়া যায় তাহলে পরমাণুগুলো ঐ গ্যাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিলামেণ্টে ফিরে আসে; সেজন্যে বালবের কাচ কালো হয়ে যাবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ল্যাং-ম্যুরের এই আবিষ্কার বাল্‌ব তৈরীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তখন থেকে নাইট্রোজেন ভর্তি বাল্‌ব এবং পরে আর্‌গন ভর্তি বাল্‌ব তৈরী হতে লাগল।

এছাড়া বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রায় প্রত্যেক রকম বায়ুশূন্য টিউবের উন্নতিসাধনে ল্যাংম্যুরের দান অসাধারণ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'ইলেকট্রোনিক থিয়োরী অফ্ ভ্যালেন্সি' এবং সারফেস কেমিষ্ট্রীতে। কাচের ওপর অতি সূক্ষ্ম গ্যাসীয় আবরণ জলের ওপর তৈলাবরণ, প্রতি বস্তুর ওপর সূক্ষ্ম কঠিন আস্তরণ—সারফেস কেমিষ্ট্রীতে তাঁর আবিষ্কার। তিনি এর নাম দেন এক অণুস্তর বা 'মনো-মলিকিউলার লেয়ার'। কারণ এই স্তর এত সূক্ষ্ম যে এর উচ্চতা মাত্র এক অণুর সমান। এই আবিষ্কারের জন্যে ল্যাংম্যুর ১৯৩২ সালে রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান।

চমৎকার বক্তৃতা করাও ল্যাংম্যুরের পারদর্শী-তার পরিচয় দেয়। তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসা-ইটিতে প্রথম 'পিলগ্রীম ট্রাষ্ট লেকচার' দিয়ে কেমিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক 'ফ্যারাডে পদক' পান .এবং এডিন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রোম্যান্‌স্ লেকচার দিয়ে অক্সফোর্ডের অনারারী ডিগ্রী পান।

ল্যাংম্যুর যে কেবলমাত্র নীরস বিজ্ঞান নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে এসেছেন তা নয়—খেলা-ধূলা বিষয়েও তিনি খুব উৎসাহী। স্কিনেক্‌টেডিতে তিনিই প্রথম বয়-স্কাউট্‌সের প্রবর্তন করেন। পাহাড়-পর্বত আরোহণে তিনি সুপটু—আজ বৃদ্ধ বয়সেও পাহাড়ে উঠতে একটুও ক্লান্তি বোধ করেন না। একবার তাঁর এক জার্মান বন্ধুর কথায় হার্জ পর্বতে আরোহণ করে বাহান্ন মাইল চলার পর ব্রোকেন্ শৃঙ্গে ওঠেন ও আবার ফিরে আসেন। যাবার সময় তাঁর বন্ধুটিও সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিন্তু আটত্রিশ মাইল গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং সেইখানেই যাত্রা শেষ করেন। তাঁর নিজের ছিল একটি প্লেন—সেই প্লেনের তিনি নিজেই অনেকদিন যাবৎ চালক ছিলেন। একবার তিনি আগ্রহবশতঃ প্লেনে করে ন' হাজার ফিট্ ওপরে উঠে সূর্যগ্রহণ লক্ষ্য করেন। ল্যাংম্যুর বয়সে বৃদ্ধ হলেও মনের তারুণ্য আজও তাঁর অবিকৃত আছে।

গো-শাবকের রক্ষণাবেক্ষণ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ

শাবক প্রসূত হওয়ার পর মাতৃস্তন হইতে একপ্রকার ঘন-তরল পদার্থ নির্গত হয়। উহাকে 'দুগ্ধপূর্ব-মাতৃরস', গেঁজাদুধ বা গাঁদ্‌ড়া-দুধ নামে অভিহিত করা হয়। ইহাতে প্রোটিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক থাকে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ-জীবনের শেষ পর্যায়ে, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত যে সকল অনাবশ্যকীয় পদার্থ গো-শাবকের অন্ত্রে সংগৃহীত হয়, শাবকের জন্মের পর এই মাতৃরস পানে ঐ সকল পদার্থ অনায়াসে মলরূপে বাহির হইয়া আসে। এই রস গো-শাবকের পক্ষে কতকগুলি রোগের প্রতিষেধক। জন্মের পর শাবকের অন্ততঃ পাঁচ বা ছয়দিন এই মাতৃরস পান করা বিশেষ প্রয়োজন। শাবকের জন্মের অব্যবহিত পরেই কোন কারণে গো-মাতার মৃত্যু ঘটিলে, অথবা অন্য কোন কারণে শাবক এই মাতৃরসে বঞ্চিত হইলে কোষ্ঠকাঠিন্যে কষ্ট না পাইয়া যাহাতে সহজে স্বাভাবিক মলত্যাগ করিতে পারে, তজ্জন্য শাবককে একটি ছোট চামচপূর্ণ পরিশ্রুত রেড়ির তেল তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়াইতে হয়। স্বাভাবিকভাবে মলত্যাগ হইলে আর রেড়ীর তেল খাওয়ান প্রয়োজন হয় না।

দুগ্ধপূর্ব-মাতৃরস (Colostrum)

গো-শাবক পালনের সাধারণ রীতি দুইটি :—
(১) স্বাভাবিক (২) কৃত্রিম।

সাধারণ পদ্ধতিতে গো-শাবক উহার জন্ম হইতে মায়ের সেই 'বিয়ানের' দুধ দেওয়া বন্ধ না করা পর্যন্ত আপন মাতৃস্তন্য পান করিয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে। কৃত্রিম উপায়ে শাবক পোষণ নিশ্চয়ই প্রকৃতির অনুশাসনের বিরুদ্ধে। এবং ইহাও সত্য যে, সর্বপ্রকার পদ্ধতি অপেক্ষা স্বাভাবিক পালন বিধি উৎকৃষ্ট ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ। সরাসরি মাতৃস্তন হইতে পান করাতে শাবক অতি পরিচ্ছন্ন দুধ পায় ও দুধের উত্তাপ শরীরোপযোগী থাকে। শাবক এক এক বারের চোষণ দ্বারা মুখপূর্ণ দুধ পান করিতে পারায় পরিপাক সহজ হয়। সুতরাং এই প্রথায় শাবকের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাইতে দিলেই শাবক অতি দ্রুত বাড়িয়া উঠে।

গো-শাবকের স্বাভাবিক পালন পদ্ধতি।

কোন কোন গরুর পালান ও পালান-বৃন্তগুলি অত্যন্ত শক্ত থাকে। উহাদের দোহন করা সুকঠিন হয়। এই অবস্থায় গরুকে দোহন না করিয়া ইহার আপন শাবক ভিন্ন অন্য দুই একটি গো-শাবকেরও এই গাভী হইতে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। পূর্ব হইতেই এই প্রকার গাভীর দুগ্ধ প্রদান ক্ষমতা জানিয়া দুই বা ততোধিক শাবকের এই গাভী হইতে দুগ্ধ পান করা যথেষ্ট হইবে কিনা তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার স্বাভাবিক দুগ্ধপানের ব্যবস্থায় শাবকগুলি সহজেই বড় হইয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত পালান-বৃন্তযুক্ত গাভী দোহন অসম্ভব হইলেও উহার দুগ্ধের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে হইয়া থাকে।

গো-শাবকের দুই হইতে আড়াই সপ্তাহ বয়স হইলেই খড়, ঘাস বা গমের ভুষি জাতীয় খাদ্য সম্মুখে পাইলেই একটু একটু খাইতে চেষ্টা করে। ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আহার্য খাওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ছয় মাস বয়সের সময় শাবক প্রত্যহ দেড় হইতে দুই সের খড় ও অর্ধ সের যব, তিসি, খৈল ও গমের ভুষির মিশ্রণ খাইতে পারে।

শাবকের জন্ম হইতেই সরাসরি মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পান করায় কতকগুলি অসুবিধা পরিদৃষ্ট হয় :—

গো-শাবকের কৃত্রিম পালন পদ্ধতি।

(১) শাবকের পেয় দুগ্ধের পরিমাণ বা গো-মাতার দুগ্ধ প্রদান ক্ষমতার পূর্ণ পরিমাপ করা যায় না। (২) গো-দুগ্ধস্থিত ননী অনাবশ্যকভাবে শাবকের জন্য ক্ষয়িত হয়। (৩) গো-মাতার দুগ্ধ প্রদানকালে কোন কারণে শাবকের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিলে গো-মাতার সেই 'বিয়ানে' দুগ্ধ প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে। যদিও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গো-শাবক পালন অপেক্ষাকৃত অল্প রোগাশঙ্কায় ও স্বল্পব্যয়ে সুষ্ঠুভাবে হইয়া থাকে তথাপি উল্লিখিত অসুবিধা সৃষ্টির সম্ভাবনায় কৃত্রিম শাবক-পালন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

এই পদ্ধতিতে শাবক জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই উহাকে চট বা কোন প্রকার আচ্ছাদন বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয় এবং গো-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে দূরে সরাইয়া লওয়া হয়। কেহ কেহ জন্মের পর চার পাঁচ দিন পর্যন্ত শাবককে মায়ের সঙ্গে থাকিতে দিয়া পরে সরাইয়া লওয়া সমীচীন মনে করেন। শাবককে মায়ের নিকট হইতে দূরে সরাইবার পরেই একটা তোয়ালে বা মোটা কাপড় দিয়া উহার শরীরের আর্দ্র শ্লৈষ্মিক পদার্থগুলি উত্তমরূপে মুছিয়া শরীর শুষ্ক করা হয়। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার শাবককে উহার আপন মাতৃস্তন্য দোহন করিয়া আনিয়া 'দুগ্ধপূর্ব মাতৃরস' খাওয়াইতে হয়। এই মাতৃরসের উত্তাপ ৯০°-১০০° ফাঃ হওয়া প্রয়োজন।

শাবকের জন্মের পর কোন পাত্রে করিয়া দুধ আনিয়া উহার সম্মুখে ধরিলেই সে দুধ পান করে না। জন্মের পর যখন শাবক একটু একটু দাঁড়াইতে শিখে তখন হইতেই মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পানের জন্য সে উন্মুখ হইয়া উঠে। মাতৃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে কোন প্রকার বোধ শক্তি না থাকায় সে মায়ের যে কোন অঙ্গ চাটিতে থাকে।

শাবকের স্বেচ্ছায় পাত্র হইতে দুগ্ধপান শিক্ষা।

কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত শাবকের জন্য উহার জন্মের পরের প্রবল খাওয়ার আগ্রহের সুযোগ লওয়া হয়। একটি পরিচ্ছন্ন কড়াই বা ঐ প্রকার কোন উন্মুক্ত পাত্রে দুগ্ধপূর্ব মাতৃরস বা গাঁদ্‌ড়া দুধ দোহন করিয়া আনিতে হইবে। যে শাবককে দুধ পান করাইবে তাহার হাত অতি উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া হাতের দুইটি অঙ্গুলী (মধ্যমা ও তর্জনী) শাবকের মুখে স্পর্শ করাইলেই সে ব্যগ্রভাবে অঙ্গুলীদ্বয় চুষিতে আরম্ভ করিবে। এই অবস্থায় অঙ্গুলীদ্বয় ধীরে ধীরে গাঁদ্‌ড়া দুধের পাত্রের ভিতরের দিকে অবনত করিতে থাকিলে অঙ্গুলী চোষণরত অবস্থায় শাবকের মুখও অবনত হইবে। ক্রমশঃ অঙ্গুলীগুলি মাতৃরসে ডুবাইতে হইবে। ফলে শাবকের মুখও মাতৃরস স্পর্শ করিবে এবং ক্রমাগত অঙ্গুলী-চোষণে কিছু কিছু মাতৃরস শাবকের মুখের ভিতর চলিয়া যাইবে। দৃষ্টি রাখিতে হইবে—যাহাতে শাবকের নাসারন্ধ্র মাতৃরসে ডুবিয়া না যায়। এইরূপে কখনো কখনো শাবকের মুখ হইতে অঙ্গুলি সরাইয়া লইতে হয়; ইহাতে অঙ্গুলীর সাহায্য ছাড়াও কিছু কিছু গাঁদ্‌ড়া দুধ শাবকের মুখে চলিয়া যাইবে। জন্মের পর দুই একদিন এই প্রকার চেষ্টা করিলে অতি সহজেই শাবক নিজেই পাত্র হইতে চুমুক দিয়া খাইতে শিখিবে।

যদি এই ব্যবস্থায় শাবক দুগ্ধ পান করা না শিখে তবে শাবককে ছয় বা সাত ঘণ্টা অভুক্ত রাখিয়া পূর্ববর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী চলিলে উহা ক্ষুধার্ত হইয়া নিজেই পাত্র হইতে পান করিতে শিখিবে।

শাবক নিজে পাত্র হইতে দুগ্ধপান করা শিখিলে, যেস্থানে একাধিক শাবক থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া আলাদা পাত্র হইতে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা একে অন্যের হিস্যা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে পারে।

শাবকের জন্মের পর পাঁচ ছয়দিন পর্যন্ত উহাকে

দুগ্ধপূর্ব মাতৃরস বা গেঁজাদুধ খাওয়াইতে হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা অপরিহার্য। ইহার পর শাবককে দুগ্ধপান করানো আরম্ভ করা হয়। প্রথম সপ্তাহে প্রত্যহ তিনবারে অন্ততঃ আড়াই সের দুধ পান করাইতে হইবে। শাবক এই পরিমাণ দুগ্ধ হজম করিতে পারিলে দ্বিতীয় সপ্তাহে দুধের পরিমাণ কিছু কিছু বাড়াইতে হইবে।

মাতৃরসের পর শাবকের দুগ্ধ পান।

তৃতীয় সপ্তাহে শাবকের খাদ্যে দুধের পরিবর্তে মাখন-তোলা দুধের প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যহ যতটুকু পূর্ণদুগ্ধ (whole-milk) কমানো হইবে ঠিক ততটুকু করিয়া মাখন-তোলা দুধ পানীয়ের সহিত মিশাইতে হইবে। এই প্রকারে শাবকের চতুর্থ সপ্তাহ হইতে একমাস বয়সে পূর্ণদুগ্ধের পরিবর্তে সম্পূর্ণ মাখন-তোলা দুধ দেওয়া চলিবে। মাখন-তোলা দুধ প্রবর্তনের সময় হইতে শাবককে কিছু কিছু গমের ভূষি ও শস্যদানা মিশ্রণ এবং তৎসহ শুষ্ক ঘাস বা খড় খাইতে দেওয়া হয়।

প্রত্যেকবার দুগ্ধপানের পর শাবকের মুখের ভিতর ও বাহির উত্তমরূপে জলে ধুইয়া দিতে হইবে; নতুবা একে অন্যের কান, মুখ বা অন্য কোন অঙ্গ সর্বদা চাটিতে থাকে অথবা মুখে মাছি বসিয়া উপদ্রব করে।

কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট শাবকের দৈনন্দিন খাদ্যসূচী।

শাবকের বয়স	পূর্ণদুগ্ধের পরিমাণ	মাখন-তোলা দুধের পরিমাণ	শস্যদানা মিশ্রণের পরিমাণ	খড়, ঘাস ইত্যাদি,
জন্ম হইতে পাঁচ দিন	আপনার মায়ের সঙ্গে থাকিবে অথবা প্রত্যহ আড়াই সের দুগ্ধপূর্ব মাতৃরস পান করাইতে হইবে।			
৬ দিন হইতে ১৪ দিন	২ সের হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩½ সের পর্যন্ত	...	...	...
১৫ দিন হইতে ২১ দিন	৩½ সের হইতে ক্রমশঃ কমাইয়া ১ সের পর্যন্ত	১ সের হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩½ সের পর্যন্ত	অর্দ্ধ পোয়া	যতটুকু খাইতে পারে
২২ দিন হইতে ২৮ দিন	...	৩½ সের	১ পোয়া	„ „ „
২৯ দিন হইতে ৩৫ দিন	...	৩½ সের হইতে ৪½ সের পর্যন্ত	১½ পোয়া	„ „ „
৩৬ দিন হইতে ৪২ দিন	...	৪½ সের হইতে ৫ সের পর্যন্ত	১½ পোয়া	„ „ „
৪৩ দিন হইতে ৪৯ দিন	...	৫ সের হইতে ৫½ সের পর্যন্ত	অর্দ্ধ সের	„ „ „
৫০ দিন হইতে ৫৬ দিন	...	৫½ সের হইতে ৬ সের পর্যন্ত	অর্দ্ধ সের	„ „ „

৫৭ দিন হইতে ৬৩ দিন	...	৬ সের	৩ পোয়া	„	„
৬৪ দিন হইতে ৭০ দিন	...	৬ সের	৩ পোয়া	„	„
৭১ দিন হইতে ৭৭ দিন	...	৬ সের	৩ পোয়া	„	„
৭৮ দিন হইতে ৮৪ দিন	...	৬½ সের	১ সের	„	„
৮৫ দিন হইতে ৯১ দিন	...	৭ সের	১ সের	„	„

নিম্নলিখিত যে কোন একটি শস্য-দানা মিশ্রণ, শাবকের ১৫ দিন বয়স হইতে ৯১ দিন বয়স পর্যন্ত বিশেষ উপযোগী :—

১নং মিশ্রণ	২নং মিশ্রণ	৩নং মিশ্রণ	৪নং মিশ্রণ
ভূট্টাচূর্ণ—৩ ভাগ।	গমের ভুষি—১ ভাগ।	গমের ভুষি—২ ভাগ।	গমের ভুষি—১ ভাগ।
গমের ভুষি—১ ভাগ।	ভূট্টাচূর্ণ—৩ ভাগ।	খৈ চূর্ণ—২ ভাগ।	ভূট্টাচূর্ণ—৩ ভাগ।
তিসি চূর্ণ—১ ভাগ।	খৈ চূর্ণ—৩ ভাগ।	তিসি চূর্ণ—১ ভাগ।	
	তিসি চূর্ণ—১ ভাগ।		

গো-শাবকের খাদ্যে, উহার তিন মাস বয়স হওয়ার পর দুগ্ধ বা অন্য কোন দুগ্ধজ পদার্থের দরকার হয় না। তখন উপযুক্ত শস্য-দানা মিশ্রণ ও ঘাস, খড় প্রভৃতি খাইয়া রীতিমতভাবে উহা আপন পুষ্টি সাধনে সমর্থ হয়।

কৃত্রিম পন্থায় গো-শাবক পোষণের জন্য যেখানে মাখন-তোলা দুধ পাওয়া যায় না সেখানে নিম্নলিখিত মিশ্রণটি জলে সিদ্ধ করিয়া তরল মণ্ডের আকারে শাবককে খাওয়ান হয়। এই মিশ্রণের এক সের প্রায় নয় সের মাখন-তোলা দুধের সমকক্ষ।

মাখন-তোলা-দুধের অভাবে সমপুষ্টিকর অন্য খাদ্য।

মিশ্রণ

ভূট্টা চূর্ণ—২০ ভাগ
খৈ চূর্ণ—৪০ ভাগ
গম চূর্ণ—১২ ভাগ
কলাই বা রক্ত চূর্ণ—৫ ভাগ
তিসি চূর্ণ—২২ ভাগ
লবণ—১ ভাগ

মোট—১০০ ভাগ

মাখন-তোলা দুধের অভাবে শাবককে ননী-খোওয়া জল বা ছানার জল খাওয়ান যাইতে পারে। এই দুইটি খাদ্যে মাখন-তোলা দুধ অপেক্ষা প্রোটিনের আনুপাতিক হার খুবই কম। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে তিসির জেলী বা তরল তিসি-সিদ্ধ জল প্রত্যহ আধ পোয়া খাওয়াইতে হইবে। শাবকের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার মাত্রা বাড়াইয়া প্রত্যহ একপোয়া পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অন্য কোন শস্যদানা মিশ্রণ ব্যবহার করিলে দেখিতে হইবে যেন ঐ মিশ্রণে প্রোটিনের ভাগ যথেষ্ট বেশী থাকে।

যেখানে ননী-ধোয়া জল, ছানার জল বা মাখন-তোলা দুধ কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সবুজ কলাই, মটর, লুসার্ণ বা ক্লোভার জাতীয় ঘাসের 'চা' বা ঐ সব ঘাস জলে সিদ্ধ করিলে যে নির্যাস তৈয়ারী হইবে—তাহা খাওয়ান চলিবে। খাওয়ার পদ্ধতি পূর্ববর্ণিত কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট শাবকের দৈনন্দিন খাদ্যসূচী অনুযায়ী হইবে।

শাবকের শারীরিক বৃদ্ধির জন্য খনিজ পদার্থ অত্যাবশ্যক। সাধারণ লবণ ভিন্ন ক্যালসিয়াম ও

শাবকের খাদ্যে খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা।

ফসফরাস নামক খনিজ পদার্থ শাবকের খাদ্য-মিশ্রণে অবশ্য যোগ করিতে হইবে। শারীরিক বৃদ্ধির সময় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অস্থি নির্মাণের কাজে লাগে। এতদ্ভিন্ন শরীরাভ্যন্তরের কোমল তন্তুগুলি বর্ধনের জন্যও ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। গো-শাবকের খাদ্যে ক্যালসিয়াম শতকরা ৩৩ ভাগ ও ফসফরাস ৩০ ভাগ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক খনিজ পদার্থ খাদ্যে যোগ করিলে শাবকের উদরাময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মটর, কলাই, লুসার্ণ প্রভৃতি সবুজ ঘাসে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। প্রত্যহ এক সের এই জাতীয় খাদ্য দিতে পারিলেই গো-শাবকের ক্যালসিয়ামের অভাব পূর্ণ হয়। গমের ভূষি, কার্পাসবীজ চূর্ণ, তিসি চূর্ণ প্রভৃতি পদার্থে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস থাকে। খাদ্যে অস্থিচূর্ণ মিশ্রণ করিলে' অতি অল্পব্যয়ে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব পূর্ণ হইবে।

খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে শাবকের গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পটাসিয়াম আয়োডাইড বা সোডিয়াম আয়োডাইড কিঞ্চিৎ পরিমাণে খাদ্যে যোগ করিলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

শাবকের খাদ্যে ভিটামিন-ডি থাকার একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে অস্থি নির্মাণকারী ভিটামিন

গো-শাবকের খাদ্যে-ভিটামিন।

বলা হয়। শরীরে ইহার অভাবে শাবকের অস্থি-সন্ধি ফুলিয়া উঠে, পিঠ কুঁজো হয় ও পা বাঁকিয়া যায়। সূর্যরশ্মি যথেষ্ট পাইলে ভিটামিন-ডি-এর অভাব হয় না। ত্বকে ভিটামিন-সহায়ক দ্রব্য থাকায় সূর্যরশ্মির সংযোগে উহা শরীরে ভিটামিন-ডি উৎপাদন করে। কডলিভার তৈল অথবা এই প্রকার অন্য কোন মৎস্য তৈল হইতেও ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়।

শাবকের খাদ্যে ভিটামিনের অভাবে উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে ও নানা প্রকার চোখের ব্যারাম হয়। সবুজ ঘাসে যথেষ্ট ভিটামিন-এ থাকে; হলুদ ভুট্টাতেও এই ভিটামিন আছে। অর্ধ সের ডাল বা সীম জাতীয় সবুজ ঘাসে যে পরিমাণ ভিটামিন-এ থাকে তাহা একটি গো-শাবকের দৈনিক প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। স্তন্যপায়ী শাবকের মায়ের খাদ্যে যথেষ্ট হরিৎ ঘাসের ব্যবস্থা থাকিলে ঐ মাতৃদুগ্ধ হইতে আহরিত ভিটামিন-এ হইতেই শাবকের প্রয়োজন পূর্ণভাবে সাধিত হয়।

অন্যান্য ভিটামিন, যাহা খুব অল্প মাত্রায় গো-শাবকের শরীর বর্ধনের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা উহার দৈনন্দিন সাধারণ আহার্য হইতেই প্রয়োজন অনুযায়ী সংগৃহীত হয়।

শাবকের মাসখানিক বয়স হইলেই উহা কিছু কিছু ঘাস খাইতে আরম্ভ করে। সেই অবস্থায়

গো-শাবক চারণ।

শাবক যাহাতে স্বেচ্ছায় চরিয়া খাইতে পারে তজ্জন্য উন্মুক্ত, আলো-ছায়াযুক্ত তৃণরাজিপূর্ণ চারণ ভূমির ব্যবস্থা করা শাবকের শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য।

গো-শাবকের গোয়াল বা বাসস্থান পূর্ণ বয়স্কা গাভীগৃহ হইতে পৃথক স্থানে থাকিবে। একটি

গো-শাবকের 'গোয়াল' বা বাসস্থান।

শাবকের জন্য অন্ততঃ ১২ বর্গ ফুট বাসস্থান দরকার। বাসগৃহে খাদ্যাধার ও পানীয়াধার থাকা বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যাধার—১০ ইঞ্চি উচ্চ, ৮ ইঞ্চি গভীর এবং প্রস্থে ১২ ইঞ্চি চওড়া হইবে। বাসগৃহ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ থাকিলে শাবক স্বচ্ছন্দে দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে; ইহা শাবকের আনন্দ ও স্বাস্থ্যবর্ধনের সহায়ক।

ফ্রীডরিখ গস্

শ্রীআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেছে। আর্কিমিডিস্, নিউটন, লাইবনিৎস, অয়লার, লাগ্রাঞ্জ—গণিতের এই সব মহারথীরা বিষয়টিকে আশাতীতভাবে এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে গাণিতিক যুক্তিবত্তায় সম্যক্ দৃঢ়তার অভাব ছিল। যে বিরাট জার্মান প্রতিভা সমস্ত গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাকে সুষ্ঠু করে তুলেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন ফ্রীডরিখ গস্।

জার্মানীর ব্রান্সউইকে গস্ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৭ খ্রীঃ এপ্রিলের ৩০ তারিখে। গসের পিতা গেরার্ট গস্ ছিলেন একজন উদ্যান রক্ষক মালী। উদ্যান রক্ষা ইত্যাদি কয়েকটি কাজে তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হতো। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই সৎ এবং সাদাসিধা, কিন্তু কৃষকসুলভ রুক্ষ প্রকৃতির। গসের মা ডোরোথিয়া ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় চিত্ত, তীক্ষ্ণধী অথচ কৌতুকময়ী। বাস্তবিক পক্ষে গসের বিরাট প্রতিভা গঠনে সহায়তা করেন তাঁর মা। গেরার্ট চাইতেন—মালীর ছেলে মালীই হোক। কিন্তু ডোরোথিয়ার দৃঢ় আপত্তিতেই তা' সম্ভব হয় নি। গসের কিশোর মন গঠনে আর এক জনের সাহায্য উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন গসের মামা ফ্রীডরিখ। বয়নকার্যে তিনি অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সে মারা যান।

সব শ্রেষ্ঠ লোকের ছোটবেলা থেকেই তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে আসক্তি দেখে চমৎকৃত হতে হয়। গসেরও নাকি গণিতে আসক্তি দেখা যায় তিন বছর বয়সের আগে থেকে। একবার গেরার্ট তাঁর অধীনস্থ মজুরদের মজুরীর হিসেব কষ্‌ছেন। যখন সেটা শেষ হয়ে এসেছে তখন শুনে চম্‌কে উঠলেন ছেলে বলছে—"বাবা, তুমি গুণতে ভুল করলে যে! এটাতো হবে—" পুনর্গণনার পর দেখা গেল, গসের কথাই ঠিক। বাস্তবিক এ ঘটনা শুনে আশ্চর্য হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন না তখন গস্ দু-একটা অক্ষর চিনলেও অঙ্কের কথা তাঁকে কেউ কিছু বলেনি। বড় জোর তাঁকে এক দুই গুণতে শেখানো হয়েছিল। শেষ বয়সে গস্ এই বলে কৌতুক করতেন যে, তিনি কথা বলতে শেখার আগেই গুণতে শিখেছেন।

ছোটবেলায় একবার তাঁর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। তিনি তাঁদের বাড়ীর কাছের এক খালের ধারে খেলা করছিলেন। এমন সময় তাঁর শিশুসুলভ চপলতায় কি করে যেন জলের টানে ডুবজলে গিয়ে পড়েন। এই দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের সকল সম্ভাবনাই লুপ্ত হতো, যদি না নিকটবর্তী একটি মজুর তাকে রক্ষা করত।

সাত বছর বয়সে কাছের এক পাঠশালায় ভর্তি হলেন গস্। সেখানের মাষ্টার ছিলেন ব্যুট্‌নের। তাঁর নির্দয় শাসনে ছেলেরা এতই তটস্থ থাকত যে, পড়া খুব এগুতো না। প্রথম দু-বছর গসের তেমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি। দশবছর বয়সে তিনি অঙ্ক কষার ক্লাসে উঠলেন। এই ক্লাসেই তিনি ব্যুটনেরকে অবাক করে দেন—এরিথ্‌মেটিক প্রোগ্রেশনের একটি অঙ্কের দ্রুত উত্তর দিয়ে। বাস্তবিক ব্যুট্‌নের আশা করেন নি—মাত্র দশ বছরের একটি ছেলে ঐ সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ে এত দ্রুত উত্তর দিতে পারে। তিনি অন্ততঃ গসের ওপর সদয় হতে বাধ্য হলেন। এমন কি, নিজে গস্‌কে খুব ভাল অঙ্কের বই কিনে দিলেন। গস্ অতি অল্প সময়ে তা-ও শেষ করে ফেললেন। ব্যুট্‌নের স্বীকার

করলেন যে, ছাত্রটিকে শিক্ষা দেবার মত আর কোন জ্ঞান তাঁর নেই। কিন্তু সেই স্কুলে ১৭ বছরের আর একটি ছেলে ছিল বার্টেল্‌স্। তার সঙ্গে গসের হলো খুব বন্ধুত্ব। তারা দুজনে একসঙ্গে অঙ্ক কষ্‌ত, আলোচনা করত, অথবা তখনকার বইয়ে দেওয়া প্রমাণগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন প্রমাণ বের করত। বাইনোমিয়্যাল থিয়োরেমে *n* যখন শূন্য থেকেও বড় কোন সংখ্যা নয় তখন ওই থিয়োরেম কি করে প্রমাণ করা যায় তা গস্ নিজে বের করেন এই সময়ে। এত ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনে গাণিতিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত। বারো বছর বয়সেই ইউক্লীডিয় জ্যামিতিতে তাঁর পূর্ণআস্থা কিছুটা বিচলিত হয়। ষোল বছর বয়সেই তিনি এমন এক জ্যামিতির সন্ধান পান যা ইউক্লীডিয় জ্যামিতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গণিত জগতে গস্‌ই প্রথম সম্যক সুষ্ঠু বিশ্লেষণ সুরু করেন। তাঁরই দেখাদেখি আবেল, কশি এঁরাও তাঁদের বিশ্লেষণকে দৃঢ় করেন।

বার্টেলের চেষ্টায় গস্ ক্রমে ব্রান্সউইকের ডিউক ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন তাঁর বয়স মোটে চৌদ্দ বছর। এই লজ্জাশীল বিনয়নম্র বালকের গুণে উদার হৃদয় ডিউক মুগ্ধ হলেন। গসের বিদ্যাশিক্ষার যাবতীয় খরচ তিনিই বহন করতে লাগলেন। গসের পড়াশুনা যে চলবেই এ একরকম ঠিক হয়ে গেল।

কলেজে ভর্তি হবার আগে তিনি বাড়ীতে ছুটির মধ্যে কয়েকটা পুরোনো ভাষা শিখতে লাগলেন। বাড়ীতে তাঁর পিতা আবার গোলমাল সুরু করলেন। তিনি কাজের মানুষ। পুরোনো ভাষা শেখা তাঁর কাছে বোকামির চূড়ান্ত। ছেলের পক্ষে মা আবার বাক্‌যুদ্ধ সুরু করলেন এবং জিতলেন।

ভাষাতত্ত্বের বিষয়টা গসের ভাল লাগলেও গণিতে তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। কলেজে ভর্তি হবার সময় তিনি ল্যাটিনভাষায় সুপণ্ডিত এবং তাঁর অনেকগুলো বড় বড় কাজ তিনি ঐ ভাষাতেই লিখে গেছেন। ক্যারোলিন কলেজে গস্ তিন বছর পড়েছিলেন এবং আয়ত্ত করেছিলেন লাগ্রাঞ্জ, লাপ্লাস, অয়লার প্রভৃতি গণিতজ্ঞের কাজ এবং সর্বোপরি নিউটনের প্রিন্সিপিয়া। কলেজ জীবন থেকেই তিনি সুরু করেন গাণিতিক গবেষণার কাজ। কোয়াড্রাটিক রেসিপ্রোসিটীর নিয়মটা (যা অয়লার আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেন নি) গস্ এই সময়েই আবিষ্কার ও প্রমাণ করেন। সর্বনিম্ন বর্গ পদ্ধতিও তাঁর এই সময়ের আবিষ্কার। ভূমিজরিপ এবং আরও অনেক কাজে ওই পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয়। আঠার বছরে তিনি কলেজ ছেড়ে ঢুকতে যাচ্ছেন গ্যোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তখনও তিনি ঠিক করতে পারেন নি যে, গণিত অথবা ভাষাতত্ত্ব কোনটিকে তার পড়ার বিষয় করবেন।

অবশেষে ১৭৯৬ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ ঠিক করলেন—গণিত নিয়েই তিনি পড়াশোনা করবেন। ভাষা শেখাটা একটা খেয়াল হিসেবেই রাখলেন বটে, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আর তিনি মাথা ঘামান নি। এই সময় থেকেই তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাগুলো এক ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। এই ডায়েরীটি আবিষ্কৃত হয় তাঁর মৃত্যুর ৪৩ বছর পরে। এই ছোট্ট একটুখানি ডায়েরীতে তিনি লিখে রেখেছিলেন ১৩৬টি আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ফলাফল। সেগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, সমস্তগুলো বোঝা যায় নি। হয়ত বা পরে কোন শ্রেষ্ঠতর গাণিতিক এসে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করবেন। এ ডায়েরী থেকে জানা যায়—তখনই তিনি কয়েকটি ইলিপ্টিক ফাংশানে দ্বৈত অনুবর্তন (Double periodicity) আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য পরেই আবার লিখেছেন, ইলিপ্টিক ফাংশানে দ্বৈত অনুবর্তন এক সাধারণ ব্যাপার। এসব আবিষ্কার যদি তিনি প্রকাশ করতেন তবে সেই বিশ বছরেই তিনি

হতেন খ্যাতিমান। কিন্তু কখনো তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি।

এসব প্রকাশের ব্যাপারে অনাসক্তির কারণের কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। বলেছেন—তাঁর স্বভাবের বলে দেওয়া গভীর ইঙ্গিতগুলোয় সাড়া দেওয়ার জন্যেই তিনি বৈজ্ঞানিক কাজে হাত দিতেন। সেগুলো যে অপরের শিক্ষার জন্যে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে, এ ছিল তাঁর কাছে একেবারেই গৌণ ব্যাপার। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর মন সে সময়ে এত বিভিন্ন রকমের ভাব ও ধারণায় পূর্ণ থাকত যে, তার সবগুলোকে আয়ত্তে রাখতে তাঁকে অনেক বেগ পেতে হতো এবং সেগুলোর অতি সামান্য অংশই তিনি লিপিবদ্ধ করতে পারতেন। এখানে মনে পড়ে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরসৃষ্টি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সে কথা—"হঠাৎ চলতি পথে কানে লাগে এক একটা রেশ, কান পেতে শুনি—নিজেরই অচেনা লাগে যেন। পরিমাণের আধিক্যই এর কারণ হয়ত। কত মুকুল ঝরে যায়: কতকগুলো ফলের মধ্যে মুক্তি পায়, আমগাছ কি খবর রাখে তার কোন কালে?"

গস্ তাঁর যে কোন আবিষ্কারই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঘষে মেজে দেখতেন তা সম্পূর্ণ নিখুঁত কিনা। পরে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে সেটিকে ডায়েরীতে টুকে ফেলতেন। তাঁর সৃষ্ট গণিতবৃক্ষে সব ক'টিই ছিল পাকা ফল। কিন্তু পাকা হলেও ওগুলোকে হজম করা দারুণ কঠিন। তাঁর সমসাময়িক অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর তত্ত্বগুলোর কিছু সোজা ব্যাখ্যা দিতে। কিন্তু আবার পুরোনো কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করতে গসের ধৈর্য ছিল না। বাস্তবিক গস্ যদি একটু সহজ হতেন তবে আবেল এবং ইয়াকবির মত বড় গাণিতিকেরা গস্‌কে সহজ করতে যে সময় দিয়েছিলেন সে সময়ে অনেক বড় কাজ করতে পারতেন। গস্ ছিলেন সর্বৈব গাণিতিক।

১৭ থেকে ২১—এই তিন বছরে গসের জীবনে অনেক লাভ হয়েছে। তাঁর বন্ধু সংখ্যা খুব কম হলেও তারা সকলেই ছিল সহৃদ্বন্ধু। এই তিন বছরেই গস্ তাঁর অঙ্ক গবেষণায় (Disquisitiones arithmaticoe) বিরাট কাজ শেষ করেন। এখান থেকে তিনি চলে গেলেন হেল্মষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। গণিতের পূর্বাপূর্ব আরও বড় আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে। তাছাড়া সেখানে আছে একটি সুন্দর গণিত গ্রন্থাগার। পৌঁছেই দেখলেন—আগে থেকেই তিনি সেখানে খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে আছেন। জার্মেনীর তখনকার সেরা গণিতজ্ঞ ফাফ্ হেল্মষ্টেটের অধ্যাপক। তিনি সসম্মানে গস্‌কে নিজের বাড়ীতে রাখলেন। ফাফের সঙ্গে পরিচয়ে গস্ মুগ্ধ হয়েছিলেন, শুধু তাঁর গণিতে অদ্ভুত দখলের জন্যই নয়, তাঁর পুতচরিত্র, খোলা মনও তাঁকে মুগ্ধ করে।

১৭৯৯ খ্রীঃ তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, এক চলবিশিষ্ট প্রত্যেক মূলদ অখণ্ড অপেক্ষককে প্রথম মানের উৎপাদক পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা যায় (A new proof that every rational Integral Function of one variable can be resolved into real factors of 1st or 2nd degree) এবং এরই ফলে পেলেন হেল্মষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি। তিনি তাঁর দেওয়া প্রমাণটাকে নতুন প্রমাণ বলেছিলেন; কিন্তু আসলে তাঁরটাই সঠিক প্রথম প্রমাণ।

১৮০১ খ্রীঃ প্রকাশ পেলো তাঁর বিপুল Disquisitiones Arithmaticoe—এরিথ্মেটিকের ওপর তাঁর গবেষণার সাত খণ্ডে বিভক্ত লেখা। অবশ্য এ কাজটি তাঁর তিন বছর আগে থেকেই হয়ে পড়েছিল। এখানে তিনি ফারমাট, অয়লার, লিজেণ্ডার, লাগ্রাঞ্জ প্রভৃতির করা ছন্নছাড়া কাজগুলো নিজের আবিষ্কারের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক সুসমঞ্জস গণিতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু মোটের উপর বইটি এতই দুর্বোধ্য যে, ডিরিখলেটের মত গণিতজ্ঞকেও ভয়ানক পরিশ্রম করে এর একটি সহজ ভাষ্য লিখতে হয়।

এরপর কিছুদিন গস্ গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে পড়েন। এখন অনেকে বলেন, তিনি তাঁর সময়টা ঐ বাজে কাজে না লাগালেই পারতেন। কেননা ওটা সহজ কাজ, লাপ্লাসের মত গণিতজ্ঞের দ্বারাই হয়ে যেত। কিন্তু তবুও ফলিত গণিতের এই কাজটুকুর দ্বারাই তিনি ইউরোপে সেরা গাণিতিক বলে পরিচিত হলেন। তাই এটুকুর প্রয়োজন ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনটি বিশেষ স্মরণীয়। কেননা ঐদিন Ceres নামে গ্রহাণুপুঞ্জের একটি বড় টুকরোর সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞানীমহলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। কেননা হেগেল নামে এক দার্শনিক তাঁর কি সব দার্শনিক বিচার থেকে বুঝেছিলেন, সাতটা গ্রহ ছাড়া আর গ্রহের খোঁজ করতে যাওয়াটা মূঢ়তা। কিন্তু এই সময় Ceres এবং পরপর ছোট ছোট আরও কয়েকটি গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হওয়ায় দার্শনিক তত্ত্বে লোকের ভক্তি একটু কমে যায়। গস্—কাণ্ট, হেগেল, শেলিন প্রভৃতি দার্শনিকদের তেমন পছন্দ করতেন না। কেননা তাঁরা দর্শনে অন্যায়ভাবে বৈজ্ঞানিক কথা-গুলো ব্যবহার করতেন, যেগুলো তাঁরা নিজেরাই কিছু বোঝেন নি। বাস্তবিক দার্শনিক বিচারে নামবার আগে স্থূলবুদ্ধিকে কঠিন গণিতে ঘষে শানিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, রাসেল হোয়াইটহেড, হিলবার্ট প্রভৃতির দর্শনক্ষেত্রে অপূর্ব অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। অথচ প্রথমে এঁরা ছিলেন সেরা গাণিতিক। অবশ্য গস্ দর্শনের অগ্রগতির বিপক্ষে ছিলেন না। নৈতিকতাবোধ, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, মানবজাতির ভবিষ্যৎ—এসব বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের জগাখিচুড়ী তিনি বরদাস্ত করতেন না।

Ceresকে নিয়ে দারুণ গোলমালের সৃষ্টি হয়। কারণ টেলিস্কোপের বাইরে চলে গেলে আবার কবে কোথায় একে দেখা যাবে, তার কিছু ঠিক ছিল না। কিছু অঙ্ক কষাকষির পর গস্ বলে দিলেন—মা ভৈঃ, Ceres হারাবে না। তাকে আবার দেখা যাবে অমুক স্থানে। Ceres পুনরাবিষ্কৃত হলো নির্দিষ্ট সময়ে। লাপ্লাস পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন—গস্ জগতের সেরা বিজ্ঞানী। অবশ্য সাধারণভাবে সবাই তাঁকে তখন ধিক্কার দিয়েছিল—কি এক গ্রহের কক্ষপথ নিয়ে মিছামিছি মাথা ঘামাচ্ছেন বলে। তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব এবং বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের মূলকথা যখন তিনি আবিষ্কার করেন তখন সাধারণে ধিক্কার দিয়েছিল—বাজে কথা বলে। এখন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়েই পারি না।

তিনি দু-বার বিবাহ করেন এবং তাঁর এক ছেলে জোসেফ পিতার মত দ্রুত গণন ক্ষমতা লাভ করে।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গসের পিতা মারা যান। এরও দু-বছর আগে তিনি কঠিন আঘাত পান যখন তাঁর দুর্দিনের সহায়ক ডিউক ফার্ডিনাণ্ড নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যান। এখন সংসারে সাহায্যের জন্যে নিজের কিছু কাজের প্রয়োজন। অনেক জায়গা থেকে ডাকলেও তিনি গ্যোটিঙ্গেন মানমন্দিরে অধ্যক্ষের কাজটাই নিলেন। কারণ এখানে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার সুবিধা ছিল। বেতন অতি সামান্য হলেও নিতান্ত সাধাসিধে গসের তাতেই চলে যেত।

এ সময়ে ফরাসীরা গ্যোটিঙ্গেন অঞ্চল দখল করে নেয় এবং অত্যাচারী শাসকদের নিয়মমত গসের কাছ থেকে ২০০০ ফ্রাঁ দাবী করেন, যুদ্ধ তহবিলে দেবার জন্যে। অতটাকা দেওয়া বেচারা গসের ছিল সাধ্যের অতীত। কিন্তু লাপ্লাস প্যারিসে তাঁর হয়ে টাকাটা দিয়ে দেন। গস্ এতে ঘোরতর আপত্তি জানান এবং শীঘ্রই কিছু টাকা তাঁর হাতে আসায় লাপ্লাসকে সুদসমেত ঋণ শোধ করে দেন। আর একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে ১০০০ গিল্ডার প্রেরণ করেন। এ দানটি গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন কেননা প্রেরককে খুঁজে পান নি।

১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট। গস্ প্রথম দেখলেন সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব। ছোট ছোট গ্রহ সম্পর্কে গসের গাণিতিক অস্ত্রগুলো বোধহয় পরীক্ষা করতে এসেছে ঐ বড় শত্রু ধূমকেতু। কিন্তু গণিত-অস্ত্র যতদিন তাঁর হাতে আছে ততদিন তিনি অপরাজেয়। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গস্ দেখলেন —ধূমকেতুটি চলেছে সুড়সুড় করে তাঁরই গণনার পথে। এই বছরেই তাঁর অপূর্ব আবিষ্কার—কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের অ্যানালিটিক ফাংশান তত্ব। এ আবিষ্কারও তিনি প্রকাশ করেন নি। কেবল চিঠিতে জানিয়েছিলেন বেসেলকে। তাই কশিকে আবার এ তত্ব পুনরাবিষ্কার করতে হয়।

পর বছর একদিকে চলছে নেপোলিয়নের সৈন্য-দলের দারুণ বিপদ, আর একদিকে গসের আর একটি মহৎ আবিষ্কার—হাইপার জিওমেট্রিক সিরিজের ওপর। দেখা গেল, এই সিরিজেরই বিশেষ বিশেষ রূপ হচ্ছে—বাইনোমিয়্যাল উপপাদ্য, ত্রিকোণমিতিক, লগারিদমিক ইত্যাদি নানা সিরিজ। গসের এই আবিষ্কারের ফলেই পদার্থ বিজ্ঞানে মহৎ উপকার সাধিত হয়।

শুধু মাত্র গণিতের এই সব আবিষ্কারই নয়, জ্যামিতি এবং ভূমি জরিপে তার প্রয়োগ ইত্যাদি নানা কাজেও গসের অবদান রয়েছে। অবলীলাক্রমে কেমন করে তিনি এত গাণিতিক আবিষ্কার করে চলেন এ প্রশ্নে স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে তিনি জবাব দিয়েছেন—যে কেউ গভীরভাবে নিরবচ্ছিন্ন গাণিতিক চিন্তা করবে সে-ই আমার মত আবিষ্কার করতে পারে।

দেখা গেছে, গসের যৌবনে ভূতে পাওয়ার মত তাঁকে যেন মাঝে মাঝে গণিতে পেত। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যেতেন এবং তখন শত শত গাণিতিক চিন্তায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তেন। তখন হয়ত বা একদৃষ্টে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। এরপর পূর্ণশক্তি নিয়ে লেগে যেতেন কাগজে কলমে সমস্যার সমাধান করতে। এক জায়গায় যুক্ত অথবা বিযুক্ত চিহ্ন বসবে তা তিনি চার বছর ধরে ঠিক করতে পারছিলেন না—পরে বিষয়টিতে সহসা আলোকপাত হওয়ায় তিনি তৃপ্ত হন। কোন জরুরী সমস্যা সমাধানের জন্য কত রাত্রিই তিনি বিনিদ্র কাটিয়েছেন যাতে পরদিন ভোর হওয়ার আগেই সকল সমস্যার কুঝটিকা ভেদ করতে পারেন। এমনি গভীর নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাই বোধহয় তাঁর চমকপ্রদ কাজের মূল রহস্য।

এসব ছাড়াও তাঁর ছিল আর একটি মহৎ গুণ। নিউটনের মত তিনিও ছিলেন ল্যাবরেটরীর কাজে অত্যন্ত দক্ষ। এই গুণটি সাধারণতঃ বিশুদ্ধ গাণিতিকদের মধ্যে দেখা যায় না। জ্যোতি-বিজ্ঞানের সেকেলে যন্ত্রপাতিকে তিনি অনেক উন্নত করে তোলেন। তড়িৎ-চুম্বকের মূল গবেষণার কাজে তিনি এই সময়ে আবিষ্কার করেন, দ্বিসূত্রী চুম্বক-মাপক যন্ত্র। ছোট মাপে টেলিগ্রাফ যন্ত্রও তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কার।

নিউটনকে গস্ মহা ভক্তি করতেন। কেননা কোন একটি আবিষ্কারের পেছনে তিনি বছরের পর বছর সময় দিতেন এবং তা প্রকাশ করার দিকে (এ যুগের মত) তাঁর কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখা যেত না। সেইজন্যে—গাছ থেকে আপেল পড়া দেখেই যে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ টানের কথা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন—এ গল্পে গস্ মহা চটে উঠতেন। বলতেন—কোন আনাড়ী লোকের প্রশ্ন থেকে রেহাই পেতে নিউটন ঐ গল্প বানিয়ে-ছিলেন। আসলে ওর পেছনে ছিল সুদীর্ঘ ঐকান্তিকতা। বাস্তবিক এ-যুগেও এমন ঘটনার অভাব নেই। প্রচলিত প্রবাদ যে, কোন পতন-শীল অবস্থা থেকে আইনষ্টাইন জানতে পারেন, পতনকালে টানের মত কোন কিছু অনুভূত হয় না। অমনি তিনি মাধ্যাকর্ষণ টানকে ব্যাখ্যা

করলেন ক্ষেত্রের গুণাগুণ বলে। আসলে ব্যাপারটি এত সহজে ঘটে নি। তাঁর আবিষ্কারের মূলে ছিল ইতালীতে দুজন গাণিতিক রিচি এবং লেভি-সিভিটার Tensor Calculus আয়ত্ত করার জন্যে কয়েক বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা; আর ঐ দুজন গাণিতিকের কাছ থেকেই তিনি পান রীম্যানের জ্যামিতিতত্ত্ব, যা তাঁর আবিষ্কারের খুব সাহায্য করেছে।

শেষ বয়সে গস্ নানা বিষয়ে চর্চা করতেন। অনেকগুলো ভাষা জানায় তাঁর খুব সুবিধা হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি সকল খবরই তিনি রাখতেন। সেক্সপীয়র, স্কট প্রভৃতির সাহিত্য তাঁর খুব ভাল লাগতো। গ্যেটেকে তাঁর তত পছন্দ হতো না। বাষট্টি বছরে তিনি রাশিয়ান ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং দু-বছরের মধ্যে তাদের সাহিত্য পড়তে সুরু করেন এবং ওদেশীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে রুশ ভাষাতেই পত্রালাপ করেন।

১৮৩০ থেকে ৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান বিশেষ করে তড়িৎ-চুম্বকত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তারপর তিনি আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করেন—সেটি হচ্ছে ডিফারেন্সিয়্যাল জ্যামিতি। এর কাজ হলো—একটি বিন্দুর একেবারে নিকটস্থ নানা রকমের বক্র-তল এবং রেখার গুণাগুণ আবিষ্কার করা। গসের পর রীম্যান্ এই ডিফারেন্সিয়্যাল জ্যামিতিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত করেন। আধুনিক আপেক্ষিকতা বাদে এ জ্যামিতি একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কন ব্যাপারেও তিনি যে নূতন আলোক পাত করেন তা এখনো কাজে লাগে—স্থিরবিদ্যুৎ, হাইড্রোডিনামিক্স ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে।

গসের সমস্ত আবিষ্কারের নাম করা অসম্ভব। কেননা তাঁর সকল আবিষ্কার এখনো আমরাই আবিষ্কার করতে পারি নি। এখনো সেগুলো খুঁজে বের করতে হচ্ছে।

শেষ কয়েকটি বছর গস্ অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্মানের উচ্চশিখরে। তিনি কখনই বিশ্রাম চাইতেন না। কেননা তাঁর শক্তিশালী মস্তিষ্ক নিরন্তর কাজ করে চলত। এই সময়ে গ্যোটিঙ্গেনের কাছে রেললাইন তৈরী হচ্ছিল (১৮৫৪ খ্রীঃ)। তিনি উৎসাহভরে তা দেখতে যেতেন। পর বছর তাঁর হৃদরোগ ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। হাত কাঁপলেও সুবিধা পেলেই তিনি কাজ করতেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি প্রাণত্যাগ করেন—৭৮ বছর বয়সে, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে।

পরিচ্ছদের কলংক মোচন

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পোষাকপরিচ্ছদে কত রকমেরই না দাগ লাগে—মরচের দাগ, কালীর দাগ, তেলের দাগ, রক্তের দাগ, চায়ের দাগ আরো কত কি। বর্তমান বস্ত্রসংকটের দিনে জামাকাপড়ে দাগ লাগলে তা নিয়ে বেশ একটু বিব্রত হতে হয়—দাগ লেগেছে বলে সেটাকে একেবারে বাতিল করাও চলে না, অথচ দাগওলা জামাকাপড় পরে ভদ্রসমাজে বেরুতে কেমন যেন অস্বস্তিও বোধ হয়। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে এ সমস্ত দাগ কিন্তু সহজে তোলা যায়। জামাকাপড়ের বিশেষ বিশেষ দাগ তোলবার জন্যে যে সব রাসায়নিক পদার্থ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, এই নিবন্ধে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রয়োগক্ষেত্র আলোচনা করছি।

আমাদের জামাকাপড়ে লোহার মরচের দাগটাই সাধারণতঃ বেশী লাগে। মরচের দাগ তুলতে হলে প্রথমে কাপড়টা গরম জলে ভিজিয়ে, যে জায়গায় দাগ লেগেছে সেখানটায় একটু লেবুর রস যোগ করলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দাগটা উঠে যায়। অক্সেলিক অ্যাসিড বা পটাসিয়াম টেট্রা-অক্সেলেটের দ্রবণ এই দাগ তোলার কাজে আরো বেশী উপযোগী। দ্রবণটি সব সময় গরম অবস্থায় ব্যবহার করাই উচিত।

কালীর দাগ যদি সদ্য হয়, তা হলে ফুলার্‌স্ আর্থ বা ট্যালকাম পাউডার কলংকিত জায়গায় ছড়িয়ে দিলে কিংবা ছুরি দিয়ে ঘষে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সাদা কাপড়ে কালী লাগলে দুধ দিয়ে তা তোলা যায়; অথবা টমেটোর রস অল্প জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করে ব্যবহার করলেও ফল পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়া দ্রবণ দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কালীর দাগ সহজেই নষ্ট করা যায়। লোহাঘটিত কালীর দাগ তুলতে অক্সেলিক অ্যাসিডই হলো সব চেয়ে উপযোগী।

তেল বা চর্বি ইত্যাদির দাগ যদি শক্ত হয়ে লেগে যায়, তাহলে প্রথমে একটা ছুরি দিয়ে দাগটা ঘষতে হবে। তারপর গরম সাবান জল অথবা কেরোসিন তেল বা সলভেণ্ট ন্যাপথা মেশানো সাবান জল ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ফুলার্‌স্ আর্থ, ট্যালকাম পাউডার প্রভৃতির চূর্ণ দিয়েও তৈলাক্ত পদার্থের দাগ তোলা যায়।

রক্তের দাগ পরিষ্কার করার সময় গরম জল আগে থেকে দেওয়া উচিত নয়। তাতে রক্তের প্রোটিন শক্ত হয়ে কাপড়ে এঁটে যায়। প্রথমে অল্প গরম জলে কাপড়টা ভিজিয়ে কলংকিত জায়গাটাকে সামান্য ঘষতে হয়। এতে দাগটা একটু বাদামী হয়। এই অবস্থায় গরম জল দিলে দাগ তাড়াতাড়ি উঠে যায়। যদি অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়, তা হলে টেবিল-চামচের দু-চামচ অ্যামোনিয়া এক গ্যালন জলে মিশিয়ে সেই জল দিয়ে ধুলে রক্তের দাগ অনায়াসে চলে যায়।

চা বা কফির দাগ সাধারণতঃ জল দিয়ে ধুলেই উঠে যায়। সামান্য যদি দাগ থাকে, রোদে দিলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এক পাঁইট জলে চায়ের চামচের এক চামচ পারম্যাংগানেট অফ পটাস গুলে সেই দ্রবণ কলংকিত জায়গায় মাখিয়ে দিলে ৫ মিনিটের মধ্যে দাগটা চলে যাবে। পারম্যাংগানেটের দাগ হয়তো একটু থেকে যেতে পারে। হাই-ড্রোজেন পারকসাইড দিলে তা উঠে যাবে।

ফলের দাগ তুলতে হলে ৩ ফিট উঁচু থেকে কাপড়ের কলংকিত জায়গার ওপর জলের ধারা ফেলতে হয়। এতে যদি ফল না পাওয়া যায় তখন লেবুর রস বা হাইপো দ্রবণ ব্যবহার করলে অতি সহজেই দাগ উঠতে পারে।

ঘামের দাগ সহজে তোলা যায় না। গরম জল বা অ্যামোনিয়া দিয়ে কিছুটা ফল পাওয়া যায়। যে জায়গায় দাগ লেগেছে সে জায়গাটা ৩০ মিনিট ধরে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে তারপর অ্যামোনিয়া-জলে ভেজাতে হবে এবং শেষে সাবান জলে ধুলে দাগ অনেকটা চলে যাবে।

এক রকম প্রতিকারক দিয়েই যে তুলো, লিনেন, রেশম বা পশম সব রকম কাপড়ের দাগ তোলা যাবে, এমন কথা নেই। তুলো বা লিনেন কাপড়ের ক্ষেত্রে যে প্রতিকারক ফল দেয়, রেশম বা পশমের ক্ষেত্রে সেটা উপযোগী না-ও হতে পারে। কি ধরণের কাপড়ে কোন্ প্রতিকারক কার্যকরী হবে, সেটা নির্ভর করে সুতোর চরিত্রের ওপর। নীচে দাগ প্রতিকারকের একটা সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ প্রতিকারক উপযোগী, সেটা তাদের নামের ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

দাগ প্রতিকারকের নাম—(১) ঠাণ্ডা জল, (২) অক্সেলিক অ্যাসিড (৩) উড স্পিরিট (৪) মেথিলেটেড স্পিরিট (৫) অ্যামেনিয়া (৬) অ্যামো-নিয়া মিশ্রিত জল (৭) গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসেটিক

অ্যাসিড (৮) ফরমিক অ্যাসিড (৯) ল্যাকটিক অ্যাসিড (১০) ওলিক অ্যাসিড (১১) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (১২) অ্যাসিড মিশ্রিত স্পিরিট (১৩) গ্লিসারিন (১৪) সোহাগা (১৫) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (১৬) কার্বন ডাইসালফাইড (১৭) বেঞ্জিন (১৮) হাইড্রোজেন পারকসাইড (১৯) জেভেল ওয়াটার (২০) ইথার (২১) অ্যাসেটিক ইথার (২২) হাইপো (২৩) অ্যাসিটোন (২৪) অ্যামিল অ্যাসিটেট।

এই রাসায়নিক পদার্থগুলো বড় বড় ডাক্তারখানায় বা রসায়নাগারে পাওয়া যায়।

তালিকা

দাগের চরিত্র	তুলো বা লিনেন	রেশম বা পশম	রেয়ন
মরিচা	১,৮,১১,১২,১৯,২০	১,২,৮,১১,১২	*ঐ
কালী	১,৩,৫,৯,১১,১৩,১৪,১৯,২০	১,৩,৫,৯,১১,১৩,১৪,২০	ঐ
চর্বি পদার্থ	১৫,১৬,১৭	ঐ	ঐ
রক্ত	১,৫,৭,৯,১৮	ঐ	ঐ
চা	১,৯,১২,১৩,১৪,১৯	১,৯,১২,১৩,১৪	ঐ
কফি	১,৯,১২,১৩,১৪,১৮,১৯	১,৯,১২,১৩,১৪,১৮	ঐ
দুধ	১,৯	ঐ	ঐ
ফল	১,৫,৮,৯,১০,১২,১৩,১৪,১৮,২২	ঐ	ঐ
দুর্বা	১,৪,১৯,২১	১,৪,২১	ঐ
বিয়ার	১,৫,৮,৯,১০,১২,১৩,১৪,১৮,১৯	১,৫,৮,৯,১০,১২,১৩,১৪,১৮	ঐ
পেণ্ট	১০,১৭	ঐ	ঐ
ছাতাপড়া দাগ	১,৫,৬,৯,১৮,১৯	১,৫,৬,৯,১৮	ঐ
আইওডিন	৫,১৯,২২	৫,২২	ঐ
অজ্ঞাত দাগ	১,৩,৫,৮,৯,১১,১৩,১৪,১৯,২২	১,৩,৫,৮,৯,১১,১৩,১৪,২২	ঐ

ঐ চিহ্ন দ্বারা তুলো ও লিনেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দাগ প্রতিকারকদের নাম বুঝতে হবে।

সাদা দস্তানার চামড়া

শ্রীসুশীলরঞ্জন সরকার

শীতের হাওয়া বইতে সুরু করেছে, সকলেই তাই প্রতিরোধের আয়োজনে ব্যস্ত। ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া যেন তীরের মত বিঁধতে চায়। আত্মরক্ষা করতে হলে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম চাই। আদিম কাল থেকেই মানুষ শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করছে। গাছের ছাল, পাতা থেকে আরম্ভ করে পশুর চামড়া পর্যন্ত যে সব জিনিস তাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত ছিল তাই কাজে লাগান হয়েছে। আজও সুসভ্য মানুষ নিত্য নতুন সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবনে সচেষ্ট রয়েছে। আজও শীত নিবারণে চামড়া ও পশমের উপযোগীতা রয়েছে। আদিম যুগের মানুষের আধুনিক য়ুরোপীয়

সংস্করণেও দেখা যাবে, পশুর চামড়া ও পশম থেকে তৈরী পোষাক; কোটপ্যাণ্ট বাদ দিলেও মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে জুতামোজা। এ সমস্তই শীতের হাত থেকে দেহটিকে বাঁচাবার জন্যে। আমাদের গরমের দেশ, শীতবস্ত্রের এত সমারোহ নেই; তবুও হিমালয়ের কাছ বরাবর দেশসমূহে শীতের প্রাবল্য অনুভব করা যাবে। কিন্তু পৃথিবীতে মেরু অঞ্চলের দিকে ভয়াবহ শীতের দেশ রয়েছে; অনেক জায়গায় বরফের ঘর করেও মানুষকে থাকতে হচ্ছে। সেখানে পশুর চামড়া শীতের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেহটাকে গরম রাখতে সাহায্য করছে। হাত, পা কোন অংশই অনাবৃত রাখবার উপায় নেই, শীতে জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মেরু অঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলেও য়ুরোপ, আমেরিকার, শীতপ্রধান অঞ্চলে শীতকালে যে ভীষণ শীত পড়ে তাতে উপযুক্ত শীতবস্ত্র ছাড়া কোথাও বেরুবার উপায় নেই। হাত দুখানা দস্তানার খাপে না পুরলে কোন কাজ করবার উপায় নেই, শীতে অবশ হয়ে থাকবে। তাই কাজের লোকের না হলে একেবারেই চলে না। অনেক রকমের দস্তানা পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে পশমের আর চামড়ার তৈরীও আছে। সাদা এবং রং-বেরঙেরও দেখা যায়—তবে নরম, সাদা দস্তানার আকর্ষণ সব চাইতে বেশী। কি চমৎকার গরম, মোলায়েম অনুভূতি তা এনে দেয়—মনটাও হয়ে ওঠে প্রফুল্ল। সৌখীন লোকের ঐ ধবধবে সাদা, মোলায়েম দস্তানা চাই-ই! তাই সেসব দেশে এই দস্তানা প্রস্তুত করবার আয়োজন রয়েছে। সাদা দস্তানার চামড়া তৈরীর জন্যে য়ুরোপ, আমেরিকায় বহু ট্যানারী আছে। আমাদের দেশে দস্তানার অনিবার্য প্রয়োজন সকলের নেই; তাই এই শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি। কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত গবেষণার অভাবে এই লাভজনক শিল্প অনগ্রসর রয়ে গেছে। প্রস্তুতপ্রণালী জটিল না হলেও উৎকৃষ্ট সাদা দস্তানার চামড়া তৈরী করা শক্ত কাজ। চর্ম-শিল্পে উন্নত দেশসমূহে, বিশেষতঃ জার্মেনীতে এবিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সাফল্যলাভ করেছে যথেষ্ট।

কাঁচামাল হিসেবে ছাগলের চামড়াই আসল সাদা দস্তানা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে ভেড়ার চামড়ার ব্যবহারও চলে। চামড়ার স্বাভাবিক রং বা সাদা রং বজায় রেখে চামড়া পাকা করতে গেলে ফটকিরির সাহায্য নিতে হয়। ফটকিরির ইংরাজী নাম অ্যালাম; তাই পাকা করার এই পদ্ধতির নাম অ্যালাম ট্যানিং। সাধারণ অ্যালাম রাসায়নিকের ভাষায় লেখা হয় $Al_2(SO_4)_3, K_2SO_4, 24H_2O$, অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম ও পটাশিয়াম ধাতুর যুক্ত সালফেট। এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম সালফেটই চামড়া পাকা করে, কিন্তু একটা জিনিস এর সংগে যোগ না করলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। সেটি হচ্ছে লবণ—এই লবণ যোগ না করে ট্যান করলে চামড়া নরম হবে না, শুকোলে কাঠ হয়ে যাবে। আরো দুটা জিনিস এই সংগে ব্যবহার করা হয়ে থাকে—ময়দা আর ডিমের হলদে অংশ। ময়দা চামড়ার ফাঁক বুজিয়ে নিরেট করে, আর ডিমের হলদে অংশ চামড়া নরম থাকবার ব্যবস্থা করে।

কাঁচা চামড়া প্রথমেই জলে ভিজিয়ে নরম ও পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এরপর দিনছয়েক চুন ও আর্সেনিক সালফাইড দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। আর্সেনিক সালফাইড বিষাক্ত পদার্থ, খুব সতর্ক হয়ে কাজ করা হয়। এর বদলে সোডিয়াম সালফাইড ব্যবহার করা চলে; কিন্তু আর্সেনিকের কতকগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে; এতে চামড়া মোলায়েম ও দানাগুর উজ্জ্বল হয়। জার্মেনীতে যেসব গ্লাভ কিড্ ট্যানারী আছে তাতে আর্সেনিক সালফাইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে চামড়া পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, লোমের গোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে ও চর্বি

অনেকাংশে বেরিয়ে গেছে। লোম সব তুলে ফেলে ও মাংসল পিঠ থেকে খানিকটা মাংস চেঁচে ফেলে দিয়ে পাৎলা করে নেওয়া হয়। ধুয়ে নিয়ে ওজন করা হয়ে থাকে। এবার চামড়ার অতিরিক্ত ক্ষারত্ব নষ্ট করতে হবে। এইজন্যে এন্‌জাইম বেট কাজে লাগান হয়। এর আর একটা কাজ আছে—চামড়া যে সব সুক্ষ্ম তন্তুর সমবায়ে গঠিত তাদের বাঁধুনি আলগা করে দেবার ক্ষমতা এর রয়েছে। তার ফলে তন্তুগুলো জড়িয়ে না থেকে পাশাপাশি সাজান থাকে; এতে তৈরী চামড়া শক্ত হবার সুযোগ পায় না। ভারতে প্যাংক্রিয়ল নামে বেট্ পাওয়া যায়। শতকরা তিনভাগ ওজনের এই প্যাংক্রিয়ল জলে গুলে তাতে একাজ সমাধা করা চলে। জার্মেনীতে অবশ্য আরাপোন নামে একটি বেট্ ব্যবহার করা হয়। ৩৭° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই বেট্ করা শেষ হয়। এরপর আসল ট্যানিং। ফটকিরি, ময়দা, লবণ, ডিমের হলদে অংশ আর জল দিয়ে একটা লেই-এর মত করা হয়। চামড়াগুলো এই লেই সহযোগে বিদ্যুৎচালিত ড্রামে আস্তে আস্তে চালান হয়। কম চামড়া হলে কাঠের টবে হাত বা পা দিয়ে কাজ করা চলে। যতক্ষণ চামড়া নরম ও ধবধবে সাদা না হচ্ছে ততক্ষণ সমানে চালিয়ে যেতে হবে। পরে চামড়াগুলো তুলে নিয়ে প্রত্যেকটা আলাদা অলাদা গুটিয়ে সামান্য গরম ঘরে ২৪ ঘণ্টা জড়ো করে দেওয়া হয়। এবার খোলা হাওয়ায় ধীরে ধীরে শুকিয়ে নিতে হবে, তা না হলে শুকিয়ে কঠিন হয়ে যাবে। যেটুকু শক্ত হবে স্টেক্ করে নিলে তা নরম হয়ে যাবে। এরপর ২ মাস চামড়াগুলো পুরোনো হতে দিতে হয়। আসল কথা হলো, চামড়া যে ফটকিরি দ্রবণ শোষণ করে নেয় তা যতদিন না একেবারে চামড়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হচ্ছে ততদিন চামড়া ধুলেই ফটকিরি সহজে দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে। এর ফলে সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হলো বলে মনে করা যেতে পারে। তাই ফটকিরি যাতে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে যেতে পারে সেজন্যে ২ মাস সময় দেওয়া হয়। অবশেষে চামড়াগুলো সামান্য জলে ভিজিয়ে নরম করে আবার কম পরিমাণ ফটকিরি, লবণ, ডিমের হলদে অংশের লেই দিয়ে খানিকক্ষণ চালান হয়। এরপরই শুকিয়ে নিয়ে স্টেক্ করে ফ্রেঞ্চ চক্ ছড়িয়ে বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে নিলেই ধবধবে সাদা দস্তানা তৈরীর উপযোগী চামড়া তৈরী শেষ হলো।

চামড়ার সাদা ধবধবে রং সহজে হয় না; এজন্যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। সাদা রঙের আদর বেশী। তৈরী করতে মেহনত থাকায় দামও বেশী। আজকাল সাদা চামড়া তৈরী করতে অ্যালাম ট্যানিং-এর বদলে জির্‌কোনিয়াম ট্যানিং করা হয়ে থাকে। তবে এখনও সুনিশ্চিত সাফল্য লাভ করা যায় নি। আমাদের দেশে একেই চর্ম-শিল্প অবহেলিত, তাতে এই সব সৌখীন শিল্প গড়ে ওঠবার সুযোগ পাবে কিনা বলা শক্ত।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের দান

শ্রীতারকারঞ্জন গুপ্ত

সমগ্র মানব ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই বিপ্লবের ভূমিকা বিজ্ঞানের রাজ্যেও নেহাৎ অল্প নয়। বরঞ্চ বলা যায় যে, বিপ্লবের স্বল্প স্থায়িত্বকালের মধ্যেই বহু নতুন আবিষ্কার ঘটেছিল। কিন্তু এটাই চরম কথা নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন, ফরাসী বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলো নতুন রূপ ধারণ করেছিল। আসল কথা, এই বিপ্লব

বিজ্ঞানকে জাতির প্রয়োজনে নিয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বন্ধন মোচন করেছিল।

প্রাক্-বিপ্লবযুগে বিজ্ঞানের অবস্থা :—

সামন্ততান্ত্রিক যুগকে বিজ্ঞানের পক্ষে বলা যায়—প্রায় বন্ধ্যা। পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা বলি। এই সময় আরবীয় বিজ্ঞানীরাই ছিলেন সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু অ্যারিষ্টটল বিজ্ঞানকে যতটা উন্নত করে দিয়ে গিয়েছিলেন, এই আরবীয় বিজ্ঞানীরা তার চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। খৃষ্টান দেশগুলোর অবস্থা তো ছিল আরো শোচনীয়। পাদ্রীরা পূর্বের প্রাচীন ভাবধারাকে প্রাণপণে বজায় রাখবার চেষ্টায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রবলতম বাধা উপস্থিত করতেন। যা কিছু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চর্চা করতেন অ্যালকেমিষ্টরা।

কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই এই জড় অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই যে নতুন অধ্যায় দেখা দিল—এই অধ্যায়ে অনেকগুলো দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা সাধিত হয় এবং সংগে সংগে কতকগুলো নতুন দেশের আবিষ্কার হয়। এর ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং তখনই প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রস্তুতি সুরু হয়। অন্যান্য দেশ থেকে নতুন ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আমদানী হওয়াতে সভ্যজগতে প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। এই সময়েই অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সংগে সংগে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোড়ন দেখা দেয়। এ ছাড়া অ্যালকেমিষ্টদের কাছ থেকে অর্জিত বিদ্যা শিল্পে প্রয়োগ করা হলো। শিল্পক্ষেত্রে স্বর্ণ ও পারদের মিশ্রণ বা অ্যামালগামের প্রচলন বলা যায়, তখন সম্পূর্ণ নতুন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রবল প্রয়োজনীয়তা থেকেই উদ্ভূত হলো গণিতশাস্ত্র। "প্রয়োজন" এবং "আবিষ্কার" এই দুটো কথা যেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; পূর্বের জড় অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে বিজ্ঞান নবোদ্গত সমস্যার সমাধান করতে করতে তার শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনে পদার্পণ করল। পরের দু-শ' বছরে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ঘটলো। বিজ্ঞান স্বকীয় মহিমা লাভ করল। গুটেনবার্গ, র‍্যাবেলে, গ্যালিলিও, দেকার্ত, পাস্‌কাল্, নিউটন প্রভৃতি অসংখ্য মনীষীর নাম সেই দু-শ' বছরের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তারপর বাফোঁ দিলেন তাঁর জীবসম্বন্ধীয় ক্রমবিবর্তনের মতবাদ। (যদিও তিনি সেই মতবাদ ইতস্ততঃ ভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন।) ধনী এবং অভিজাত বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। আবেনোলে প্রচণ্ড উৎসাহে তাঁর বিচিত্র বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগুলো সাধারণের সামনে দেখাতে লাগলেন। জনসাধারণের জীবনের সংগে বিজ্ঞান একাংগীভূত হলো। সুরু হয়ে গেল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

কিন্তু এই জয়যাত্রার পথে প্রয়োজন হলো নতুন সংস্কারের। প্রয়োজন হলো গবেষণাগারগুলোর পুনর্গঠনের। সামন্তপ্রথা এবং তার জড় সংস্কারাদির জন্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা এই সময়ে যেমন অবহেলিত হতো—সেই রকম ভাবে বিজ্ঞানের উন্নতির পথেও পুরোনো চিন্তাধারাগুলো প্রবল বাধার সৃষ্টি করল।

যেমন ধরা যাক্, জার্ডিন দ্যু র‍্যয় বা রাজকীয় উদ্যানের প্রসঙ্গ। এই উদ্যানে নানা দেশ থেকে বিচিত্র উদ্ভিদ আর প্রাণী আমদানী করে সংরক্ষণ করা হতো। এই রাজকীয় উদ্যানের সংগে সংযুক্ত ছিল ক্যাবিনেট অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি। এই ক্যাবিনেটে যদিও কয়েকজন ভাল বিজ্ঞানী ছিলেন—তবু যে বিপুল কার্যাবলী তাঁদের সামনে ছিল—তার তুলনায় তাঁরা ছিলেন নেহাৎই সংখ্যালঘু। তার ওপর ক্যাবিনেটের সমস্ত কার্যভার পরিচালনা করতেন একজন রাজমনোনীত পরিচালক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মনোনয়নে

গুণাগুণের বিচার করা হতো না। স্বাভাবিকভাবেই ভাল বিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও জার্ডিনের সমস্ত উদ্যম বিপথগামী হতো।

জার্ডিনের বিদ্যোৎসাহীগণ এই ব্যবস্থা মেনে নেন নি। তাঁদের সংগে রাজমনোনীত পরিচালকের বাদবিসংবাদ এবং মনোমালিন্য লেগেই থাকল। এই কলহ চরমে উঠল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট। জার্ডিনের সভ্যেরা প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করলেন তাঁদের নিজেদের ভিতর থেকে প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ দবেঁতঁকে।

বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের বিজ্ঞান জগৎ :—

বিপ্লবের পর এই জার্ডিনের নতুন নাম হলো ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি। সেখান থেকে পরিচালকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হলো। তার স্থান অধিকার করল গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত ডিরেক্টর। বিজ্ঞানীতে বিজ্ঞানীতে পার্থক্য দূর করা হলো। এবং এই মিউজিয়ামই হয়ে উঠল বিজ্ঞানের পীঠস্থান। বিপ্লব ফরাসীদেশে নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজ ও পরিস্থিতি তার জীবন রক্ষার তাগিদে নতুন নতুন প্রয়োজন ও সমস্যার সৃষ্টি করতে লাগল। পূর্বের বৈজ্ঞানিক জগৎ তার সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারলেন না। প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন।

কি ধরণের প্রয়োজন উদ্ভূত হচ্ছিল তা বিবৃত করলে বোঝা যাবে নতুন আবিষ্কারের কারণগুলো। যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজন হলো সল্টপিটারের। যুদ্ধাস্ত্র আর কামানের জন্যে প্রয়োজন হলো নতুন ধরণের ঢালাই। টেক্‌নিক্যাল আবিষ্কারগুলোকে পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে বিজ্ঞানী স্যাপে উদ্ভাবন করলেন সামরিক বিমান বিজ্ঞান এবং টেলিগ্রাফিক অপ্‌টিক্‌স্। তার ওপর বাণিজ্য বিস্তারের সংগে সংগে প্রয়োজন হলো ওজন আর দৈর্ঘ্য মাপবার প্রণালীতে সমমান নির্ণয়। এথেকেই দশমিকের পূর্ণ প্রচলন এবং মেট্রিক প্রণালীর সৃষ্টি হলো। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই মান-নির্ণয়ে সমতার দাবী তোলা হয়। কেননা সেই সময় প্রদেশে প্রদেশে দৈর্ঘ্য মাপবার প্রণালীতে প্রচুর পার্থক্য ছিল। যার ফলে হিসেবের ব্যাপারে তো জটিলতার সৃষ্টি হতোই—তা ছাড়া মাঝে মাঝে ভুলও হতো এবং বাণিজ্যের ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট হতো। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে "গণপরিষদ" মান নির্ণয়ে সমতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। বোর্দা, লাগ্রাঁজ, লাপ্লাস, মর্জ, কঁদর্সে প্রমুখ প্রসিদ্ধ মনীষীদের নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হলো। দৈর্ঘ্যের একক নির্ণীত হলো মিটার। বিজ্ঞানীরা মিটারের সূত্র হিসেবে বললেন যে, মিটার পৃথিবীর পরিধির এক চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের একটি অংশ। রিপাবলিকের তৃতীয় বর্ষে অষ্টাদশ জার-মিনালে আইন দ্বারা মেট্রিক প্রণালীকে বিবৃত করা হলো। পদার্থবিদ লেফার-জিনিয়ান সেই সময়ের প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের ওজনের সংগে কিলোগ্র্যামের সম্বন্ধ ঠিক করে দিলেন। প্রথম থেকেই স্পেন, ডেনমার্ক, সার্দিনিয়া, টাস্‌কানি প্রভৃতি দেশগুলো মেট্রিক প্রণালীকে স্বীকার করে নিল। আজকাল সকল সভ্য দেশই এই প্রণালীকে স্বীকার করে নিয়েছে।

সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে কতখানি কাজে লাগানো যেতে পারে এসব উদাহরণ তারই প্রমাণ। নতুন নতুন প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগার এবং শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠল। তাদের মধ্যে—"ইকোল পলিটেক্‌নিক্", "ব্যুরো অফ্ লঙ্গিচিউড্‌স্", "বিব্‌লিওথিক্ ন্যাশনাল" প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহু চিকিৎসা-কেন্দ্রেরও প্রতিষ্ঠা হলো। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবল ইচ্ছাতে মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র-গুলোর নতুন করে সংস্কার করা হলো। বিপ্লব বিরোধীরা আজও চীৎকার করে যে, বিপ্লবে নাকি মনীষীদের কোন স্থান ছিল না। কথাটা যে অবাস্তব, ঘটনাই তার প্রমাণ দিয়েছে।

একটা কথা আজ মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন দেশে এই সমস্ত অতি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্যে আয়োজন করা হচ্ছিল তখন ফ্রান্সকে একটি বিদেশী শক্তির সঙ্গে প্রবল যুদ্ধে জড়িত থাকতে হয়েছিল। এই সময়েই ভেঁদি এবং গির্ঁদির্াঁ বিপ্লবের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের আয়োজন করেছিল। কিন্তু মন্তেগার্দ পরিচালিত কনভেনসন এই সমস্ত বিপদের মধ্যেও ধীর মস্তিষ্কে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক প্রচারের জন্যে যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন। এথেকে এই কথাটাই প্রমাণিত হয় যে, জনশক্তি যখন শত্রুপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হয় সেই সময়েও বিজ্ঞান ও কৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন তার সম্মুখ থেকে অপসারিত হয় না। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, এই কথাটাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী কমিউন, ১৯১৮ সালের সোভিয়েট শক্তি এবং স্পেনীয় রিপাব্লিকান সরকার তার মাত্র তিন বছরকাল স্থায়িত্বের মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে।

বিপ্লব বিরোধীরা আরও বলে যে, বিপ্লবের সময় প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ল্যাভয়সিয়েকে হত্যা করা হয়েছে। এ কথা সত্য; কিন্তু অপরদিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, বিপ্লবের দলে প্রসিদ্ধ মনীষীরা যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গণিতবিদ মঁজ হয়েছিলেন একজন মন্ত্রী। রাসায়নিক ফ্যুর ক্র্যয় এবং গাইতঁ দ্য মোরাভিউ হয়েছিলেন কনভেনসনের সদস্য। লাগ্রাঁজ, বার্থোলে, ভক্যুলেঁ, হ্যানি, জুসেঁ, ল্যাসিপিড প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণ বিশ্বস্তভাবে এই রিপাবলিকের সেবা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ তরুণ বিজ্ঞানী বিসা হয়েছিলেন প্যারিসের "স্কুল অফ্ মেডিসিনের" অধ্যাপক। বিসা প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে বহু নতুন সংস্কার সাধন করেছিলেন।

এইবার আসা যাক্ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী লামার্কের প্রসঙ্গে। যে লামার্ক ছিলেন প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের জার্ডিনের একটি অখ্যাত পদাধিকারী, বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে সেই লামার্কই হয়েছিলেন মিউজিয়মের একজন সেরা অধ্যাপক। বিপ্লব লামার্ককে তাঁর বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারে নৈতিক সাহায্য দিয়েছিল। প্রাণীজগতে বিবর্তনবাদ মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে একটি অবিনাশী ও মহৎ সম্পদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাণীজগতে আর উদ্ভিদজগতে যখন বহু নতুন নতুন আবিষ্কার হয় সেই সময়েই এই মতবাদের গোড়াপত্তন হয়। বাফোঁ ভীতচিত্তে এই মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছিলেন। দিদেরোও ইহা অনুভব করেছিলেন; কিন্তু এই মতবাদের সংগে তৎপ্রচলিত সংস্কার ও ধর্মমতের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। সরবনের ফ্যাকাল্টি অফ্ থিয়োলজী কর্তৃক বাফোঁর ওপর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হলো। বাফোঁ পশ্চাদপসরণ করলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লামার্ক এই মতবাদকে পুনরায় লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন। যদিও তাঁকে অনেক বিরোধীতা সহ্য করতে হয়েছিল তবু এ-বিষয়ে সরকারী তরফ থেকে তাঁকে কোন বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় নি। কেননা ইতিমধ্যেই ফরাসী বিপ্লব চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রগতি সাধন করেছিল।

ফরাসী বিপ্লব সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতির দ্বারা বিজ্ঞানের রুদ্ধ অগ্রগতি বন্ধন মোচন করে দিয়েছিল। মুক্তির প্রচেষ্টাতে বিজ্ঞান এবং জাতিকে এক করে দিয়েছিল। জনসাধারণের সংগে বিজ্ঞানের এই মিতালী পুরাতন জড় কুসংস্কার এবং প্রচণ্ড বাধার ওপর জয়ী হয়েছিল। বিজ্ঞান জগতে ফরাসী বিপ্লবের সেরা দান হলো এই।

আলোকচিত্রের অবদ্রব

(উপকরণ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

কোন জিনিসের উপর প্রতিকৃতি আঁকিতে বা ছাপ তুলিতে হইলে একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। রঙের প্রলেপেই কাগজ প্রভৃতির উপর প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে। ওইরূপ কোন আশ্রয়ের উপর আলোকের সহায়তায় প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিতেও প্রয়োজন একটি মাধ্যমের। রাসায়নিক পদার্থের যৌগিক মিশ্রণেই এই মাধ্যমের সৃষ্টি। ইহা তরল বা শুষ্ক যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ইহাকে আলোকচিত্রের অবদ্রব বা ইমালসন বলা হয়। রাসায়নিক মতে দুইটি তরল পদার্থ মিশাইলে যদি অমিশ্রিত থাকে (যেমন তেল আর জল) তাহাকেই অবদ্রব বলা হয়। আলোকচিত্রের এই মাধ্যমটিতে কঠিন পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থ সংমিশ্রিত হয়; এই জন্য ইহাকে অবদ্রব আখ্যা দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। কিন্তু আলোকচিত্রের প্রচলনাবধি এই ভুল নামই চলিয়া আসিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে যে, এখন উহার পরিবর্তন ঘটাইলে নানারূপ অসুবিধার সম্ভাবনা বলিয়া আর্ষপ্রয়োগের ন্যায় ঐ নামই প্রচলিত রহিয়াছে।

'হ্যালোজেন' গ্রীক ভাষা—অর্থ লবণ সমুদ্র। সামুদ্রিক লবণের মধ্যে মৌলিক পদার্থ ক্লোরিন পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে হ্যালোজেন বলা হয়। মৌলিক ব্রোমিন ও আয়োডিন পদার্থ দুইটিও রাসায়নিক অর্থে ক্লোরিনের সমগোত্রীয়। ইহাদের লবণ পদার্থ বা সল্ট (ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ও আয়োডাইড) "হ্যালাইড্স্" নামে পরিচিত।

ধাতু ও অধাতুর সংমিশ্রণে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকে লবণ পদার্থ বা সল্ট বলা হয়। সিলভারের (ধাতব রৌপ্যের) সহিত ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন মিশাইলে যথাক্রমে সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার আয়োডাইড পাওয়া যায়। এই সিলভার সল্টগুলি 'সিলভার হ্যালাইড্স্' নামেই প্রসিদ্ধ। সিলভার ক্লোরাইড সাদা, সিলভার ব্রোমাইড হাল্কা হলদে ও সিলভার আয়োডাইড গাঢ় হলদে। আলোকস্পর্শে এই তিনটি সল্টের রং ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া কালো হয়।

সর্বপ্রথম ৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে একজন অ্যারেবিয়ান দার্শনিক সিলভার নাইট্রেটের আলোকস্পর্শে কালো হওয়ার সন্ধান প্রচার করেন। সিলভার ক্লোরাইড যে আলোকস্পর্শে কালো হয়, জার্মান রসায়নবিদ জন হেনরিক সুলজ্-ই ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে (ভিন্নমতে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে) প্রথম প্রকাশ করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের মিস্টার হেল্-অট সিলভার নাইট্রেটের মজার খেলা দেখাইতেন। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দ্বারা স্বল্পালোকে সাদা কাগজে লেখা হইত; ঐ কাগজ রৌদ্রে ধরিলেই সিলভার নাইট্রেটের অদৃশ্য লেখাগুলি ক্রমশঃ কালো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া দর্শকদের অবাক করিয়া দিত।

তখনকার দিনে এই বিষয়ে সন্ধানী লোকের তেমন প্রাচুর্য ছিল না বলিয়াই আলোকস্পর্শে ওইরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনকে কাজে লাগাইবার গবেষণা খুব ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। প্রায় ৫০ বৎসর পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মিস্টার ওয়েজ উড্ কাগজে সিলভার নাইট্রেট মাখাইয়া সর্বপ্রথম কালো আদর্শ চিত্র (সিল্-উ-এট্) প্রস্তুত করেন। মিস্টার ওয়েজ উডের প্রণালী গবেষণা করিতে যাইয়া সার

হামপ্রে ডেভি সিলভার নাইট্রেট হইতে সিলভার-ক্লোরাইডের আলোক-অনুভূতি অধিক বলিয়া প্রমাণ করিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মিস্টার জোসেফ নিপসী, বিটুমেন (অ্যাস্‌ফাল্ট) দ্রবণ ব্যবহারে ছবিও তুলিয়াছিলেন। ইহার ব্যবহার এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মিস্টার ডাগ্‌ড়ি সিলভার আয়োডাইডের প্রচলন করেন। এইরূপে গবেষণা দ্বারা ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে।*

আলোকচিত্রের প্রথম যুগে সিলভারের সঙ্গে যে ক্লোরিন বা আয়োডিন মিশানো হইত উহা সরলভাবে মিশিত না, কারণ সাধারণতঃ ধাতব পদার্থের সহিত অধাতব পদার্থের সোজাসুজি মিশ্রণ অসম্ভব। পরে দেখা যায় যে, অম্লরসের মাধ্যমে ওই উভয় পদার্থের পুরাপুরি মিশ্রণ সম্ভব।

এক খণ্ড ধাতব রৌপ্য (সিলভার) যদি উষ্ণ তরল সোরাজাত অম্লে (নাইট্রিক অ্যাসিডে) ভিজান যায় তবে বাষ্পের ক্রিয়ায় উহা গলিয়া একটি বর্ণহীন পরিষ্কার তরল দ্রবণ প্রস্তুত হয়। এই দ্রবণটির তরল অংশ শুকাইয়া লইলে সিলভার-নাইট্রেটের নির্মল দানা পাওয়া যায়। ইহাই আলোকচিত্র-রসায়নের মূল উপকরণ। ইহার সঙ্গে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, অ্যামোনিয়াম প্রভৃতি ক্ষারধর্মী ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের যৌগিক মিশ্রণেই আলোক-অনুভূতিসম্পন্ন সিলভার-সন্ট বা সিলভার হ্যালাইড্‌স্‌ প্রস্তুত হয়।

সিলভার নাইট্রেট সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়; কিন্তু হ্যালাইড্‌স্‌-এর অংশ জলের সঙ্গে না মিশিয়া তলায় পড়িয়া থাকে। এই জন্য এইরূপ সিলভার-সন্ট দ্রবণে মসৃণ প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হইত না। কাচের উপর অ্যালবুমেন মাখাইয়া পরে সিলভার সন্টের প্রলেপ দিয়া এই ত্রুটি কিছুটা সংশোধিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে (ভিন্নমতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে) ইংলণ্ডের ফ্রেড্রিক স্কট আর্‌চার এই পদ্ধতির আরও উন্নতিসাধন করেন, কলোডিয়ন প্রচলনে। কলোডিয়ন যোগে সিলভার সন্টের পরিপূর্ণ মসৃণ প্রলেপ পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর আলোক-চিত্রের কাজে এই পদ্ধতিই বিশ বৎসর পর্যন্ত একটানা চালু ছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ম্যাডক্স কলোডিয়নের পরিবর্তে জিলাটিনের ব্যবহার প্রচলন করেন। জিলাটিনের কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য অদ্যাবধি মূল আলোকচিত্রে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেবল মাত্র ছাপাখানায় ব্লক সংক্রান্ত কয়েক প্রকার কাজের জন্য কলোডিয়নের ব্যবহার এখনও হইয়া থাকে।

জিলাটিন সিলভার হ্যালাইড্‌স্‌-এর তলানি পড়া বা জমাট বাঁধিয়া যাওয়াকে নিবারণ ত করেই, অধিকন্তু ইহা সিলভার সন্টের আলোক-অনুভূতিও বাড়াইয়া তোলে; যে গুণটি কলোডিয়নের একেবারেই নাই। আবার ইহার আঠাল চট্‌চটে ভাব কলোডিয়ন হইতে অনেক বেশী বলিয়া অবদ্রব প্রস্তুত করিবার সময় মিশ্রণ অতি সহজসাধ্য হয়। কলোডিয়নকে দ্রবীভূত করিতে জৈব পদার্থের সাহায্য ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু জিলাটিন সাধারণ জলেই অক্লেশে গলিয়া যায়।

জিলাটিন জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে, পরে গরম জলে মিশাইয়া উত্তাপে জ্বাল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে যখন উহা জলের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিশিয়া আঠাল ও চট্‌চটে হয় তখন হ্যালাইড্‌স্‌-এর অংশ উহাতে যোগ করিলেই উভয় পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক আলোতেই করা যায়। পরে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (দ্রাবক জল) এক সঙ্গে সম্পূর্ণটুকু অথবা অল্প অল্প করিয়া ওই জিলাটিন-হ্যালাইড্‌স্‌ দ্রবণের সহিত উত্তাপ যোগে মিশ্রিত করা হয়। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণটি আলোক-অনুভূতি সম্পন্ন হয় বলিয়া এই প্রক্রিয়া

* "আলোকচিত্রের জন্মকথা" জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ডিসেম্বর '৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এবং ইহার পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি নিরাপদ আলোকে করা হয়। এইভাবে প্রস্তুত দ্রবণটির কনিকাগুলি এত সূক্ষ্ম হয় যে, সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দেখা যায় না। পুনরায় ইহাতে নির্দিষ্ট তাপ দেওয়া হয়। এই তাপে ঐ কনিকাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় কণায় পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মিলিত শক্তি অর্থাৎ আলোক-অনুভূতিও তুলনায় বাড়িয়া যায়। দ্রবণটি শীতল হইলে জমিয়া শক্ত হয়; শক্ত না হইলে পরিমাণমত আরও জিলাটিন মিশাইয়া শক্ত করা হয়। এই শক্ত পদার্থটি রূপার ছাটুনিতে ছাটা হয়। পরে উপযুক্ত কাপড়ের থলিতে রাখিয়া জলের স্রোতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধোওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ক্ষারধর্মী হ্যালাইড্‌স্‌, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি অপসৃত করা হয়। অবশেষে আবার উত্তাপ যোগে এই পদার্থটির আলোক গ্রহণ শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। ইহাই আলোকচিত্রের মূল অবদ্রব বা ইমালসন। পৃথক পৃথক সার রঞ্জক পদার্থ যোগে এই অবদ্রবের বিভিন্ন বর্ণ-দ্যুতি গ্রহণের শক্তিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ও শক্তির অবদ্রবের জন্য উল্লিখিত উপাদানগুলির পরিমাণের ও তাপমাত্রার সংকেত নির্দিষ্ট আছে। প্রস্তুতির পরক্ষণেই যদি এই অবদ্রব ব্যবহার করা না হয় তবে উহাকে শীতল করিয়া জমাট বাঁধাইয়া উপযুক্ত শুষ্ক-শীতল প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। ব্যবহারের সময় আবার গলাইয়া লওয়া হয়।

কোনও আশ্রয়ের উপর প্রলেপ মাখাইবার সময় অবদ্রবে যাহাতে ফেনা না হয় সেই জন্য উহাতে অ্যালকোহল মিশ্রিত করা হয়। নির্দোষ ও মসৃণ প্রলেপের জন্য স্যাপোনিন যোগ করা হয়। ইহাতে প্লেট, ফিল্ম, পেপার প্রভৃতির অবদ্রবের শুষ্ক প্রলেপের উপর পরিস্ফুটন দ্রবণের (ডেভেলপিং সলিউসনের) ক্রিয়াও সমানভাবে হইয়া থাকে। জলের সংস্পর্শে জিলাটিন নরম হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং উত্তাপের সহ্যসীমা ছাড়াইলে গলিয়া যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রবণের প্রক্রিয়াকালীন, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপে উহা যাহাতে ভিত্তিভূমি হইতে গলিয়া উঠিয়া না যায় সেই জন্য অবদ্রবের সঙ্গে ক্রোম অ্যালাম অথবা ফরম্যালিন যোগ করা হয়। পচন নিবারক পদার্থ-যোগে অবদ্রবটিকে বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত রাখাও হয়।

আলোকচিত্রের অবদ্রবকে এক শ্রেণীর জল-রং (ওয়াটার কলার) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলোকস্পর্শে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা বিভিন্ন রঙে রূপান্তরিত হয় মাত্র। কাচের উপর যেমন জল-রঙের প্রলেপ শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা ফাটিয়া যায় এবং কাগজও যেমন জল-রঙের স্পর্শে ঢেউ খেলিয়া উঠে, ভিত্তিভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী আলোকচিত্রের অবদ্রব-প্রলেপটিরও ঐ-রূপ অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া হয়। ভিত্তিভূমির স্বরূপ বুঝিয়া অবদ্রবে প্রলেপ মাখাইবার পূর্বে উহাদের উপর পৃথক পৃথক ভিত প্রস্তুত করিয়া ঐ ত্রুটি সংশোধিত করা হয়।

শক্ত, পিচ্ছিল কাচের জন্য একক ক্রোম অ্যালাম বা উহার সহিত সামান্য জিলাটিন মিশাইয়া ভিত-গঠনের দ্রবণ প্রস্তুত হয়। নরম কাগজ যাহাতে অবদ্রবের প্রলেপে ঢেউ খেলিয়া না উঠে সেই জন্য জিলাটিন ও ব্যারিয়াম সালফেটের দ্রবণ দ্বারা উহাকে শক্ত করিয়া লওয়া হয়। সেলুলয়েড শক্ত ও নমনীয়; কাজের সুবিধার জন্য ইহাকে ঐরূপ রাখা প্রয়োজন। ভিত প্রস্তুতের কোন প্রকার ঘন প্রলেপ দিলে উহা পুরু হইয়া পড়ে। বিশেষ একপ্রকার তরল জৈব পদার্থের দ্বারা ধুইয়া লইলেই উহার গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাঁতের সৃষ্টি হয়। এই দাঁতই অবদ্রবকে আটকাইয়া রাখে এবং শত শত ফিট অবদ্রব মাখানো সেলুলয়েড এক সঙ্গে ফিতার ন্যায় গুটাইয়া রাখা যায়।

কাচ ও সেলুলয়েড স্বচ্ছ। উহাদের গায়ে মাখানো অবদ্রব ভেদ করিয়া আলোকরশ্মি অপর পৃষ্ঠে যাইয়া প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিহত আলোকরশ্মি দ্বিতীয়বার অবদ্রবের উপর অনাবশ্যক ক্রিয়া করে। আলোকের এইরূপ দুষ্ট প্রতিফলন রোধ করিবার জন্য উহাদের অবদ্রবের অপর পৃষ্ঠে অবদ্রবের শ্রেণী বিচার করিয়া পৃথক পৃথক রঞ্জক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে—আলোকচিত্রের ভাষায় ইহাকে "ব্যাকিং" বলা হয়।

পাতলা সেলুলয়েডের উপর অবদ্রবের প্রলেপ শুকাইলে উহা স্বভাবতঃ ওই দিকেই বাঁকিয়া গুটাইতে থাকে ও নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে। এক্স-রে, চলচ্চিত্র ছাড়া ও অন্য সকল শ্রেণীর সেলুলয়েড আশ্রয়ের ব্যাকিং-এর সহিত তুল্যপরিমাণ জিলাটিন মিশাইয়া উভয় দিকের সমতা রক্ষা করা হয়। এইরূপ জিলাটিন প্রয়োগে চলচ্চিত্রের সেলুলয়েড পুরু হয় বলিয়া ওই সংশোধন কাজে এক প্রকার তরল জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এক্স-রের সেলুলয়েডের উভয় দিকে একই প্রকার অবদ্রব মাখানো থাকে বলিয়া উহা কোন দিকেই বাঁকিয়া যায় না।

সর্বপ্রথম প্রচলিত সেলুলোজ নাইট্রেট স্তর অতীব সহজ দাহ্য ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিস সহরে ইহাতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৭৩ জন লোকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হওয়ায় প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোকচিত্রের বিভিন্ন শাখায় সেলুলয়েড আশ্রয় ব্যবহারে অনেক সুবিধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন চলচ্চিত্রে ইহা অপরিহার্য। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ইহার অবাধ ব্যবহারের জন্য গবেষণা দ্বারা সেলুলোজ অ্যাসিটেট স্তরের প্রচলন হয়। নাইট্রেট স্তর হইতে অ্যাসিটেট স্তর ব্যয়বহুল ও ভঙ্গুর, কিন্তু সহজ দাহ্য নয়; মোটা কাগজ হইতেও ইহা কম দাহ্য। এই জন্য আইনের বন্ধনও শিথিল করিয়া ইহাকে সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে।

এইরূপে পৃথক পৃথক আশ্রয়কে অবদ্রবের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। সচরাচর কাচ, সেলুলয়েড ও কাগজের উপরই অবদ্রবের প্রলেপ দেওয়া হয়—ইহারাই যথাক্রমে আলোকচিত্রের প্লেট, ফিল্ম ও পেপার নামে পরিচিত।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

মিসেস তাচিয়ানা সেডিনা-সাহা

শিক্ষার কথা মনে হতেই আশ্চর্য হয়ে জানতে ইচ্ছা করে—পাঠকবর্গ এ'কথাটা উপলব্ধি করতে পারেন কিনা যে, নিরক্ষর মানুষকে তুলনা করা চলে অন্ধের সঙ্গে। অন্ধ যেমন অন্যের উপদেশে চলে, অপরের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয় এবং চলতে চলতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পথের মূল্যবান বস্তু ভেঙ্গে ফেলতে পারে; নিরক্ষর মানুষের জীবনও কাটাতে হয় এমনিভাবে।

শিক্ষাহীন মানুষ হয় দৃষ্টিহীন, সর্বরকমের ধর্মোন্মত্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এসবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করাও তার পক্ষে হয় একান্ত কঠিন; কারণ অজ্ঞতার জন্যে যে কোন রকম বিপজ্জনক উপদেশ সে গ্রহণ করে ফেলে সহজেই। এমন হতভাগ্যদের জন্যে করুণার উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ আজকের দিনে তাদের জীবন অবর্ণনীয় দুঃখে পূর্ণ।

এই ধরণের কত হতভাগ্যকেই না দেখতে পাই আমরা ভারতের বুকে। পিছিয়ে-পড়া পল্লী অঞ্চলে এদের সংখ্যা এত বেশী যে, সেখানে একজন পুরুষের পক্ষেও অক্ষরজ্ঞান থাকা ভাগ্যের কথা; মেয়েদের ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এরা সারাটা জীবনভরেই পায় শুধু লাঞ্ছনা। প্রথম জীবনে তারা লাঞ্ছনা পায় পিতার কাছ থেকে; কারণ পিতার কাছে মেয়ে লাভ ক্ষতিযুক্ত, বিক্রয়ের সামগ্রীর মত। তার পরের জীবনে মেয়েরা লাঞ্ছিত হয় স্বামীর কাছে, যার নিকট স্ত্রী পেয়ে থাকে দাসী-সুলভ মর্যাদা মাত্র। সর্বশেষে নারীরা পায় নিজ পুত্রের হাতে অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। কোন ভারতীয় গ্রাম্য রমণী তার মা বা অন্য আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখাবার জন্যে কোনদিন কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা স্কুলের ছাত্রের সন্ধান পেলে কতই খুসী না হয়! আবার একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মা বোনদের পত্র পেয়েও তার মর্ম সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকতে হয়, যে পযন্ত না পত্র পড়ে বুঝিয়ে দেবার কোন লোক পাওয়া যায়।

অনেকের পক্ষে একথা বিশ্বাস করাই শক্ত যে, মাত্র বছর পঁচিশ বছর আগেও রাশিয়াতে দেখা যেত এসব দৃশ্য। জার-শাসিত রাশিয়ায় বুর্জোয়া সম্প্রদায় জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা তাদের স্বার্থের প্রতিকূল বলে মনে করতো। তাই দেখি জার-শাসনের নীতিই ছিল—বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা; অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শাসন ও শোষণ করা ছিল খুবই সুবিধাজনক।

রাশিয়াতে নিরক্ষরতার মূলোৎপাটন।

এখন প্রশ্ন উঠে, কি করে সেই রুশদেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের শতকরা ৯৮ জনকে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হলো। অথচ জারের আমলে গ্রাম ও শহরে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা গড়ে ৩৩% এর বেশী ছিলনা বললেই চলে।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হলো। প্রায় একই সময়ে ঘোষণা করা হলো, পুরুষের সঙ্গে সোভিয়েট নারীর সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা। "আমরা আমাদের জনগণকে উন্নতির এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই যাতে দেশকে কি করে শাসন করতে হবে, প্রতিটি গৃহিনী পর্যন্ত তা জানতে পারবেন"। রুশবিপ্লবী মহামতি লেনিন বললেন,—"যখন আমাদের মা, বোন ও মেয়েদের পুরোপুরি শিক্ষিত করে তুলতে পারব তখনই সম্ভব হবে আমাদের সর্বহারার শিশু সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে তোলা।" সোভিয়েট সরকার জনসাধারণের বিবেক, আত্মসম্মান জ্ঞান বিদ্যোৎসাহীতাকে এমনি করে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। নীচে যে সংখ্যার হিসেব দেওয়া হয়েছে তা থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে, ক্ষমতা লাভের পর সোভিয়েট সরকার জনশিক্ষাকে কি অবস্থায় পেয়েছিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জারের শিক্ষাদপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১৩৬,৭০০,০০ রুবল্ (১ রুবল—প্রায় ২।৵০)। তাতে মাথা পিছু গড়ে এক রুবলেরও কম খরচ হতো। আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত অঞ্চলের প্রতি অবহেলা করা হতো বা অত্যাচার অবিচার বেশী চলত, সে সব জায়গায় শিক্ষার জন্য মাথা পিছু মাত্র সিকি রুবল্ খরচের অনুমতি দেওয়া হতো। একই সময়ে শিক্ষার জন্যে ইংল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে মাথাপিছু খরচ হতো যথাক্রমে ৩ ও ৩.৫ রুবল্, আর আমেরিকায় ৯ রুবল্। জারের আমলে প্রতি হাজারের মধ্যে ৫০ জনও স্কুলে যেত না। রাশিয়ার ২২% বালক-বালিকার মধ্যে মাত্র ৪.৭% স্কুলে যোগদান করতো।

সোভিয়েট সরকারকে এমনিভাবে জনশিক্ষার

ব্যাপারে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতা।

কারণ ক্ষমতা গ্রহণের পরক্ষণেই সোভিয়েট সরকার সর্বহারা সম্প্রদায় ও কৃষককুলের প্রায় সবাইকেই পেয়েছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থায়। অথচ অপেক্ষা করার মত সময়ও তখন ছিল না। দেশকে সর্বতোভাবে দ্রুতগতিতে পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যেতে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও অসংখ্য যোগ্য ব্যক্তির আবশ্যক হয়েছিল একান্তভাবে। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদি মানবজীবনের অমূল্য রত্নরাজি একান্ত-ভাবেই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকারে। এই শ্রেণীর লোকদের যদিও কাজে লাগানো যেত সহজেই তবুও বিশ্বাস করা যেতনা পুরোপুরিভাবে। অথচ সোভিয়েট সরকার চেয়েছিলেন সবরকম পুনর্গঠনের কাজেই তার বিশ্বস্ত, অনুরক্ত ও উৎসাহী কর্মীর দল।

সুতরাং সোভিয়েট সরকারকে প্রধানতঃ ও যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা এই প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ। কারণ প্রাপ্ত-বয়স্কেরই দ্রুত কাজে নিয়োগ প্রয়োজন; যেহেতু তাদের অনেকেই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সরকারী কাজে ও কারখানায় নিযুক্ত ছিল। সারা জাতির জন্যেই গ্রহণ করা হলো শিক্ষাবিস্তারের এই কাজ। বিদুষী সোভিয়েট শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ লিওনাভার স্মারকলিপি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি, (এই শিক্ষয়িত্রী পরে অবশ্য সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভ্যাও হয়েছিলেন।)

"১৯১৮ সালে (অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী বৎসর) আমি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছি। শিক্ষালাভের জন্যে জনসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে কত কঠোর চেষ্টাই যে করেছে এবং ৩০-৪০ বছর বয়সে লিখতে পড়তে শিখে তাদের যে কত আনন্দ দেখেছি সে কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।"

চাষীমজুরের ভিতর থেকে নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় প্রধানতঃ যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল (যা বর্তমানে ভারতবর্ষের পক্ষেও উপযোগী) এইরূপ:—কলকারখানার সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের তিন মাসের ভিতর শিক্ষিত (অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন) করে তোলা যায় যদি শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কিংবা শিক্ষামন্ত্রী নিজ নিজ এলাকায় এই আদেশ জারী করেন যে, কারখানায় কার্যরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় যে কোন কারখানার পরিচালকগণকেও আবার শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর আদেশ দিতে হবে। বিভাগীয় কর্মচারীবৃন্দ সুবিধামত নানা উপায় অবলম্বন করে উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবেন। বিভিন্ন কর্মীদলের প্রধান বা কাপ্তানদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগীতা ও নাগরিক চেতনার উন্মেষ করাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়, কাপ্তেনরাও সমাজসেবার ভিত্তিতে অবিলম্বেই ক্লাস নেওয়া আরম্ভ করবেন। সরকারও শ্রেষ্ঠ কাপ্তেনদের নানা রকমের উপাধি, কৃতিত্বের ছাপ ও পুরস্কারাদি দানের ব্যবস্থা করতে পারেন। একই উপায়ে প্রাপ্তবয়স্ক চাষীদের ভিতরেও বর্ণজ্ঞান দিতে সহায়তার জন্যে রাশিয়ার গ্রাম্য সোভিয়েটের 'ষ্টারোটা' বা সভাপতির ন্যায় ইউনিয়নের সভাপতিদের ও গ্রামের অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের আহ্বান করা যেতে পারে।

সোভিয়েট সরকার যখন বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক তখনই দেখা দিল

শিশুদের নিরক্ষরতা।

শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্মীদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্যা।

আট থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশ-ব্যাপী প্রথম দফায় স্থাপিত বিদ্যালয়গুলোর কাজের

ফলেই সোভিয়েট সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে—১৯৩২ সালের শেষের দিকে বাধ্যতামূলক অক্ষর জ্ঞানের কাজ সমাধা করা। সহরগুলোতে এই কাজ ১৯৩০-৩১ সালেই শেষ হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই ১৮২ লক্ষ লোকের নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশের বুকে নিরক্ষরতার অবসানের জন্যে প্রকৃতপক্ষে ৪৫০ লক্ষেরও অধিক লোককে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়েছিল। কার্যতঃ দেখা গেল—পরিকল্পনায় যা ছিল তার আড়াই গুণ কাজ সম্পন্ন হলো অস্বাভাবিক সাফল্যের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কারখানায়, দোকানে, প্রতিষ্ঠানে সহরের বড় বড় বাড়ীতে ও দূরবর্তী গ্রাম সমূহে বিশেষ শিক্ষার জন্যে বৃহৎ বৃহৎ সংস্থা, পাঠাগার, ক্লাব ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছিল; এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদাতার সাহায্যে বিপ্লবের পর যে সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ও সরকারী কর্মচারী অশিক্ষিত ছিল তাদের অক্ষর জ্ঞান লাভে বাধ্য করা হয়েছিল। ঐ সব ব্যবস্থার মধ্যে ইচ্ছুক গৃহিনীদেরও সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনিভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষের দিকেই অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যার ৯০%-এ পৌছলো।

বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা।

জাতীয় জীবনের সকল শাখায় চূড়ান্ত উন্নতির জন্যে দেশে প্রবর্তিত হলো সার্বজনীন সাত বছরের শিক্ষা। তারই জন্যে প্রতিষ্ঠা হলো দ্বিতীয় দফার বিদ্যালয়সমূহের।

১৯৩২ সালের শরৎকালে স্কুলগুলোর শেষের তিন শ্রেণীর (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ালো ৪২.৯৮ লক্ষে; অথচ ১৯২৭-২৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১২.১৬ লক্ষ। মূল পরিকল্পনায় ১৯৩২-৩৩ সালে ব্যবস্থা হয়েছিল, এইসব শ্রেণীতে পড়ার জন্যে ১৮.৪৩ লক্ষ ছাত্রের। এমনি ভাবে সহরগুলোতে সার্বজনীন সপ্তবর্ষীয় শিক্ষা পরিকল্পনা আশ্চর্যরূপে সাফল্যলাভ করলো। সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সমবয়স্ক বালক-বালিকাদের শতকরা ৬৭ জন পড়াশুনা করত ঐ সমস্ত সপ্তবর্ষীয় বিদ্যালয়ে।

১৯৩৪ সাল থেকে সতের বছর বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন কারিগরী শিক্ষা প্রচলনের কার্যক্রমকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা সুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হলো তৃতীয় দফার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

মোটের উপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হলো। কারণ ১৯২৭-২৮ সালে এর সংখ্যা ছিল ১১২ লক্ষ, আর ১৯৩২ সালে তা ২৪১ লক্ষে পৌছায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্কুলের কম বয়সী ছেলেমেয়েদেরও বিশেষ রকমের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্যে তৈরী করে নেওয়ার কাজও অনেকাংশে এগিয়েছিল। ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ১৯৩২ সালে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ৫৩.২ লক্ষ; অর্থাৎ তিন থেকে সাত বছর বয়সের সমস্ত সোভিয়েট বালক-বালিকার ৩৩.৭%। এই ব্যবস্থার এক অতিরিক্ত সুবিধা এই যে, জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট শিশুদের কঠিন সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করে তোলা হয়। শিশুদের এমনি করে সরকারী অভিভাবকত্বে নিয়ে যাওয়ায় সোভিয়েট মায়েরা সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণে এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে সম্পূর্ণ বাধাবিমুক্ত হয়েছিলেন।

মোটের উপর এইসব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ফলেই ইউ, এস্, এস্, আর, আজ জনশিক্ষা ও মৌলিক শিক্ষায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারে সক্ষম হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে বিভিন্ন নামে ছাপান বই প্রকাশ করা হয়েছিল ৩৬,২০০ খানি; আর পরিকল্পনার শেষের দিকে হয়েছিল ৫৩,৮০০

খানি। সমস্ত বই ও সাময়িক সাহিত্য মুদ্রণের সংখ্যা ১৯২৮ সালে ছিল ২·১ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি) ; অথচ ১৯৩২ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়াল ৩·৫ বিলিয়নে।

শিক্ষা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

রাশিয়া এক বিরাট দেশ, পৃথিবীর প্রায় এক ষষ্ঠাংশ। এর অধিবাসীরা বহু বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তাদের ভাষা, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও মনস্তাত্বিক ব্যাপারে বিচিত্র পার্থক্য বিদ্যমান। জারের আমলে রাশিয়া যখন এক অবিভক্ত সাম্রাজ্য ছিল তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত একমাত্র রুশভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলে অনুমোদন করা হতো। শিক্ষার পথে এ ছিল এক মস্ত বড় বাধা। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার প্রতি দেখান হতো চূড়ান্ত অবহেলা। সুতরাং যে কেউ স্কুলে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো, সে তুর্কী, উজবেগী, ককেশীয় বা ইউক্রেনীয় যে-ই হোক না কেন, রুশ ভাষাতেই তাকে পড়াশুনা করতে হতো। অথচ এই রুশভাষা অধিকাংশ ছাত্রের কাছেই ছিল বিদেশী ভাষা (ভারতবর্ষেও আজ পর্যন্ত ছাত্রেরা ইংরেজী শিখতে বাধ্য হয়)। পাঠ্যপুস্তক, সাময়িক সাহিত্য, সংবাদপত্র ইত্যাদি সমস্তই ছাপা হতো রুশভাষায়। সমস্ত সরকারী অফিসে রুশভাষায় কাজ চলতো বলে সরকারী কর্মচারীরাও বাধ্য হতেন এই ভাষা শিখতে।

খাস রুশীয়েরা সামরিক শক্তির জোরে সংখ্যালঘুদের শাসন ও শোষণ করে নিজেদের প্রাধান্যের পরিচয় দিত। বিপ্লবোত্তর যুগে নূতন সোভিয়েট আইনের প্রবর্তন করে মহান রুশবিপ্লবী ভ্লাডিমির ইলিচ লেলিন ঘোষণা করলেন যে, প্রত্যেক সংখ্যাল্প জাতির নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধারণতন্ত্র গঠনের ও আপন আপন জাতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধনে অবাধ অধিকার আছে। সোভিয়েট আইনে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলো পেয়েছিল অবাধ অধিকার ; অর্থাৎ ইউনিয়নে যোগ দেবার প্রশ্নে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতো।

বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্দেশে তুর্কীস্থান, ইউক্রেন,, শ্বেতরাশিয়া ইত্যাদি কতকগুলো স্বাধীন দেশের স্বেচ্ছায় মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘকেই বুঝায়। এই পরিবর্তিত নীতির জলন্ত দৃষ্টান্ত হলো এই যে, ১৯২৮ সালে রাশিয়ার নূতন সাধারণতন্ত্রগুলোকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা দানের এবং মাতৃভাষার সাহায্যে নিজ নিজ প্রতিভার পুষ্টিসাধনের অবাধ অধিকার ও উৎসাহ দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ৪৮ রকম ভাষায়, আর ১৯৩১ এ হয়েছিল ৬৩টি ভাষায়। ১৯২৮ সালে সমস্ত প্রকাশিত বই'য়ের ১৮·৩% ছিল সংখ্যাল্পদের মাতৃভাষায় ; এবং ১৯৩১ সালে এই সংখ্যাই দাঁড়ায় ২৫·২%-এ।

বর্তমানে সংখ্যাল্পদের অঞ্চলে মাথাপিছু ৩০ থেকে ৪০ রুবলের উপর খরচ করা হয় শিক্ষার জন্যে। বিপ্লবের আগে যে সব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যেও কদাচিৎ দু-একটা স্কুল দেখা যেত, আজ সেই সব অঞ্চল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে গর্ববোধ করছে। উদারণ স্বরূপ বলা যায়—বিপ্লবের পূর্বে যে বায়লোরুশিয়ায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিলনা আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া আজারবাইজনে ১৩টি ; আর্মেনিয়ায় ৮টি ; উজবেগীস্থানে ৩০টি ; তুর্কমেনিস্থানে ৫টি ; কজাকস্থানে ১৯টি ; কিরঘিজিয়ায় ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। জর্জিয়ায় বিপ্লবের পূর্বে ছিল মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০ ; আজ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ১৮টি ও তার ছাত্রসংখ্যা হয়েছে ২১,৮০০। খাস রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউক্রেনই সর্ববৃহৎ ও অনুগৃহীত সংখালঘু প্রদেশ। সেখানে জারের আমলে ছিল ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ; অথচ

বর্তমানে সেখানে রয়েছে ১৩০টি উচ্চ শিক্ষায়তন।

বিপ্লবের পূর্বে যে সমস্ত জাতির নিজ ভাষার বর্ণমালা ছিলনা, তাদের মাতৃভাষাকে লেখায় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করা হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পরিণতি হিসেবে ইউ. এস্. এস্. আর-এর নিজের ও জাতীয় সাধারণতন্ত্রের ছেলেমেয়েরা বিনা খরচে লেখাপড়া শিখতে পারছে। ইউ. এস্. এস্. আর.-এর রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্গত উচ্চশিক্ষায়তনগুলোর অধিকাংশ ছাত্রকেই সরকারী বৃত্তি ও বাসস্থান দেওয়া হয়। শিক্ষাও দেওয়া হয় স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষায়। সোভিয়েট শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে অতি সহজেই ধারণা করা চলে পাঠশালার ছাত্রদের সংখ্যা ও শিক্ষার খাতে খরচের বরাদ্দ দেখেই। ১৯৩৭ সালে শুধু স্কুলের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ইত্যাদির জন্যেই খরচ হয়েছিল ৬১৭৯০ লক্ষ রুবল্। ১৯১৪ সালে প্রাক্-সোভিয়েট যুগে পাঠশালার ছেলেমেয়ে সহ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮,১৩৭,০০০। এই সংখ্যা ১৯৩৯ এর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল ৪৭,৪৪২, ১০০তে। ১৯১৪ সালে মাত্র জন ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিত; আর ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ১২,৫৭৬, ০০তে (সাধারণ ও বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্রে) দাঁড়ায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জারের রাশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র পড়ত মাত্র ১১২,০০০ জন; অথচ বর্তমানে এই ছাত্র সংখ্যা ৬৫০,০০০ এর উপর। জারের আমলে ২০০ বৎসরে যতগুলো স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশী হয়েছে সোভিয়েট শাসনের ২৫ বছরে। জারের আমলে মনে করা হতো যে, শিক্ষা, গরীব বা সাধারণ লোকের জন্যে নয়। কিছু কাল আগে ভারতবর্ষেও ছিল এমন সব ধারণা। বাস্তবিকই জার সরকার চাষী মজুরদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায়তনের প্রবেশপথেই বহু বাধার সৃষ্টি করতেন। ঐ সব শিক্ষায়তনগুলো ছিল শুধু একদল সুবিধাবাদীর আবাসস্থল।

অনুপম কীর্তি।

জনশিক্ষার কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের পদমর্যাদারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। প্রাক্-বিপ্লব যুগে অর্দ্ধাহারী শিক্ষকদের কোন মূল্য তো দেওয়াই হতো না এবং করা হতো অবহেলা। কিন্তু বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষকসম্প্রদায় দেশের সাংস্কৃতিক পরিপুষ্টির এক অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষকদের বর্তমান পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তাদের উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবনে উন্নীত করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল অঞ্চল ও জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলো থেকে বহু শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভ্য বা সভ্যা নির্বাচিত হচ্ছেন।

শিক্ষা ব্যাপারে ঐ সব নীতি গ্রহণের ফলে ইউ. এস্. এস্. আর-এর সমস্ত জনসংখ্যার মধ্যে বুদ্ধিজীবির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪%।

বর্তমান রাশিয়া এক অবিভাজ্য সাম্রাজ্য নয়; কৃত্রিম বৈষম্য দ্বারা এর জাতিগুলোকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই রাশিয়াই নবীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রসমবায়। এই রাষ্ট্রসমবায় বা রাষ্ট্রসঙ্ঘে সমস্ত জাতির অধিকার রয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার। আবার একই সঙ্গে সমস্ত জাতি তাদের সমবেত চেষ্টায় সাধারণ মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার কাজে মিলিত হয়েছে। এই ধরণের মিলন ভারতভূমির জন্যেও কামনা করছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। সে মিলন হবে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সংস্কৃতি ও প্রতিটি মানুষের সুখসমৃদ্ধির ভিত্তিতে।

ভারতের সম্পদ ও শিল্পোন্নতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতার বহু বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতাগণ আমাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন "বিলাতী বর্জন কর ও স্বদেশী জিনিস কেনো।" ইহার গূঢ় তথ্য যে কোথায়, তখন অনেকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর উহার অর্থ এখন কাহারও অবিদিত নয়। আমরা তখন জানিতাম যে, বিদেশী জিনিস ভাল এবং স্থায়ী, এবং স্বদেশী জিনিস ভাল নহে। আমাদের তখন বোঝান হইত যে, ভারতবর্ষ সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এই দেশে প্রচুর খাদ্য আছে; কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে, আমরা আমাদের নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারি না; ফলে দেশের বহু অর্থ বিদেশে পাঠাইয়া খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয়। তাহা ছাড়া আসবাব, নিত্য ব্যবহার্য বহু দ্রব্য এবং কলকারখানার বহু যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই সকলের মূলে আছে আমাদের দেশে সেই সকল শিল্পের অভাব, যে সমস্ত শিল্প দ্বারা বহু সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানী দ্বারা আমরা বিদেশের অর্থ ঘরে আনিতে পারিতাম ও দেশকে সমৃদ্ধশালী করিতে পারিতাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৫০ বৎসর স্বাধীনতার মধ্যে তাহারা এক উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও প্রবল জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই উন্নতির মূলে আছে—মার্কিণ শিল্প। মার্কিণ শিল্প বলিতে এই বোঝায় না যে, জেনারেল মোটর বা জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর মত বিরাট প্রতিষ্ঠান, যাহাতে নিযুক্ত আছে হাজার হাজার কর্মী। কারণ এইরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মার্কিণ দেশে আছে মাত্র উনিশটি এবং ক্ষুদ্র শিল্প, যাহাতে দুইশত অপেক্ষা কম শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাহার সংখ্যা হইতেছে মোট দুই লক্ষ। এই দুই লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি ও সম্পদের ভিত্তিস্বরূপ।

ভারতের শিল্পোন্নতি ও সম্পদ বাড়াইতে হইলে আমাদের চাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাতে নিযুক্ত থাকিবে দশ হইতে একশত জন শ্রমিক। এমন কি কুটিরশিল্পকেও আমরা ক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ে ফেলিতে পারি। কারণ অনেকগুলি কুটিরশিল্পের সমষ্টি একটি বৃহৎ শিল্পের সমান। ভারতে প্রস্তুত তাঁতের কাপড়, ছিট, চাদর প্রভৃতির চাহিদা বিদেশে যথেষ্ট আছে। আমরা এখন অনেকে তাঁত বসাইয়া নানারূপ আকর্ষণীয় নক্সাযুক্ত কাপড় ও নানা ডিজাইনের জামার ছিট তৈয়ারী করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে পারি। এইরূপ কুটিরশিল্পের মূলধন হইবে যৎসামান্য এবং আবশ্যক হইলে যৌথ মূলধন নিযুক্ত করা যাইতে পারে, যাহাতে সাধারণ লোক ব্যবসার অংশীদার হইতে এবং মুনাফার অংশ পাইতে পারেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পের উৎপাদন শক্তির সমষ্টি একটি বৃহৎ মিলের উৎপাদন শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

আমাদের শুধু বস্ত্রশিল্প লইয়া থাকিলেই চলিবে না, চাই যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই ক্ষুদ্র শিল্পে থাকিবে জনসাধারণের মূলধন আর থাকিবে বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ার। জনসাধারণ বা কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয় মিলিয়া প্রত্যেকে তাহাদের উপার্জন হইতে পাঁচশত টাকাই হউক, আর পাঁচ হাজার টাকাই হউক, যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা সেইরূপ মূলধন নিয়োগ করিয়া একটি ছোট

যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার পিছনে থাকিবেন বিজ্ঞানী, যিনি পথ প্রদর্শন করিবেন। এই বিজ্ঞানীই কোন জিনিস প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিবেন। আমাদের দেশে এখন শিক্ষিত ও পারদর্শী বিজ্ঞানীদের অভাব। ইহার কারণ হইতেছে—যখন কোন যুবক বিজ্ঞানাগার হইতে পাশ করিয়া বাহির হন তখন তাহার শিক্ষার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান এবং যে কোন একটি চাকরি পাইলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ভাবিয়া নূতন জিনিস তৈয়ারীর চেষ্টা বা কোন জিনিস তৈয়ারী করিবার প্রণালী বা নিয়মাবলী শিক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেন না। আমাদের এই বৈজ্ঞানিক ছাত্রদের উপরেই জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে হইবে। পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা কার্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। নূতন জিনিস তৈয়ারী করিতে হইবে ও বাজারে চালাইতে হইবে এবং বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে। তবেই দেশের সম্পদ বাড়িবে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সূচের মত একটি সামান্য জিনিসও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। একটি ফাউন্টেন পেন—তাহাও আমরা ভালভাবে তৈয়ারী করিতে পারি না। কারণ ফাউন্টেন পেন প্রস্তুত প্রণালী আমাদের বৈজ্ঞানিক কর্মীরা ভালভাবে গবেষণা করিয়া শিক্ষা করেন নাই। এইরূপ কয়েক হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যাহা হইতে বোঝা যায়—বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারীর পদ্ধতি শিক্ষা করি নাই বলিয়া আমাদের বিদেশী জিনিসের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, দেশের শিল্প ও সম্পদ বাড়াইতে হইলে এই কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন:—

(১) যৌথ মূলধন দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা, যাহাতে মধ্যবিত্ত লোকেরা হবে অংশীদার।

(২) স্বাধীন চেষ্টায় শিল্প প্রতিষ্ঠা গঠন, যাহাতে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। উপরন্তু তাহাদের আবশ্যকমত অর্থসাহায্য করিবেন।

(৩) পারদর্শী বিজ্ঞানী, যিনি উচ্চ বেতনে বা অংশীদাররূপে ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবেন।

(৪) তৈয়ারী মাল দেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানী।

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হওয়াই ভাল; কারণ তাহাতে অনেক লোক কাজে নিযুক্ত হইয়া উপার্জন করিতে পারিবেন এবং তাহাতে দেশের গভর্ণমেণ্টেরই সম্পদ বাড়িবে, মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনিকের সম্পদ বাড়িবে না। ক্ষুদ্র-শিল্প সকল সময়েই জনসাধারণের হস্তে থাকা উচিত। তাহাতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জনসাধারণ উৎসাহ পাইবেন এবং নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার উপর দেশের উন্নতি ও সম্পদ নির্ভর করিতেছে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বরং অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহ দেওয়া উচিত। কারণ কোনরূপ বাধা পাইলেই বা ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বুঝিলেই জনসাধারণের সামান্য পুঁজি মূলধনে নিয়োগ করিতে ভয় পাইবেন। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক শিল্প অধিকৃত হইবে এবং মুনাফা বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হইবে ও শ্রমিককে মুনাফার অংশীদার করাই হইবে—এইরূপ ভাষণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মুখে শুনিয়া কেহই নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না। গভর্ণমেণ্টের এইরূপ অদূরদর্শিতার জন্য আমাদের দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পথে কত যে বাধা পাইতেছে তাহা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। আশা করা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করিবেন এবং আমাদের শিক্ষিত যুবকদের ইউনিভার্সিটি শিক্ষা সমাপ্তির পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন জিনিস কিরূপে তৈয়ারী করিতে হয় তাহাও হাতেকলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

সংকলন

গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্যে যে সমস্ত বিশেষ ধরণের রোগ জন্মে থাকে তার বিরুদ্ধে বৃটেন বহুকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য রোগ উচ্ছেদের জন্যে সেখানে ইংরেজ বিজ্ঞানী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ম্যালেরিয়া, নিদ্রারোগ এবং পীতজ্বর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্থানে স্থানে যেভাবে প্রসার লাভ করে তা সত্যই আশংকাজনক। এই তিনটি রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্বপ্রধান। সেদিন পর্যন্ত এই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন রকম উন্নয়নমূলক কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বহুলাংশে ম্যালেরিয়া নিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমূলে ধ্বংস করাও কঠিন হবে না।

ব্যাপক পরীক্ষা

৫০ বছর পূর্বে প্রথম যখন জানা যায় যে, ম্যালেরিয়া মশার সাহায্যে বিস্তার লাভ করে তখন সকলেই অনুমান করেছিল—ম্যালেরিয়া দমন সহজ হবে। কারণ যেখানেই ম্যালেরিয়া দেখা দেবে সেখানেই মশা ধ্বংশ করে তার উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলবে। কিন্তু কাযতঃ দেখা গেল, তা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব।

নানাদেশের কীটতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যাপক গবেষণার ফলে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়—সমস্ত রকম মশার মধ্যে একমাত্র অ্যানোফিলিস্ মশাই ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করতে পারে এবং তাদের আক্রমণ থেকেই মানুষের দেহে রোগের বীজাণুসংক্রামিত হয়। এই সব মশা বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুষ্টি লাভ করে। সেজন্যে পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালানোর পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়।

এই সংগ্রাম পরিকল্পনা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় মশার রকমভেদ অনুযায়ী রচিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মালয়ের জলাজায়গার এক ধরণের মশার কথা উল্লেখ করা যায়। এই মশা সাধারণতঃ বিশেষ পারিপাশ্বিক অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে। অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা মশার বৃদ্ধি সংযত বা ব্যহত করা সম্ভব হয়েছে। এই মশার মধ্যে কতকগুলো মশা ছায়াঘন ঝোপঝাড় পছন্দ করে, আবার কতকগুলো সূর্যালোক ভালবাসে। যাহোক, বর্তমান যুগে ডি-ডি টি নামক ওষুধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিরোধের সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছে। এই কীটঘ্ন ওষুধটি ম্যালেরিয়ার সর্বপ্রধান শত্রু।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস

আফ্রিকার সমগ্র বিষুবরেখা অঞ্চলে অ্যানোফিলিস গ্যামবিয়া (Anopheles gambiae) নামে একরকম সাংঘাতিক মশা ম্যালেরিয়া বিস্তারের প্রধান নায়ক হিসেবে বহুকাল ধরে দুর্নাম অর্জন করেছে। যে কোন নোংরা জলা-জায়গায় তারা এতদিন বংশ বৃদ্ধি করে এসেছে। দু-বছর পূর্বেও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে এসব ক্ষুদ্রাকৃতি মশা উচ্ছেদের বিষয় চিন্তা করা পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সুদান এবং উত্তর ইজিপ্টে অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র আফ্রিকা থেকে ম্যালেরিয়া নির্বাসিত করা কঠিন হবে না। এই কাজে বর্তমানে ডি-ডি-টি ছাড়া গ্যামেক্সেন (Gammexane) নামে আরও একটি নূতন কীটঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

ম্যালেরিয়া আজ ধ্বংসোন্মুখ। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, ডি-ডি-টি অভিযানের ফলে সাইপ্রাস দ্বীপ আজ সম্পূর্ণভাবে ম্যালেরিয়া মুক্ত। এই দ্বীপটি সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে।

বৃটিশ গায়নায় ডাঃ জর্জ গিগ্‌লিওলি-ও এই কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন; কিন্তু তাঁকে বিরাট অঞ্চলে শত শত মাইল ব্যাপী জলপ্রণালী সম্পর্কে কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাঁর এই অভিযান প্রধানতঃ দু'রকম মরাত্মক মশার বিরুদ্ধে চলে—অ্যানোফিলিস্ ডার্লিংগি (A. Darlingi) এবং অ্যানোফিলিস অ্যাকোয়াসালিস (A. Aquasalis)। এই সময় তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে সর্বপ্রকার বসতবাটিতে ডি-ডি-টি নিক্ষেপ করতে হয়। যদিও এই দু-রকমের

মশার প্রজনন ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটির পরিষ্কার জলে এবং অপরটির ঝোপঝাড়ে। তবু দু-বছরের মধ্যে তাদের প্রায় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। তার ফলে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

নিদ্রারোগ

ম্যালেরিয়ার পর ট্রাইপেনোসোমিয়াসিস্ (Trypanosomiasis) বা নিদ্রারোগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ট্রাইপেনোসোম এক-রকম ক্ষুদ্র ব্যাঙাচির মত জীব যা মানুষের বা পশুর দেহের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং ভয়াবহ সেট্‌সি মক্ষিকার সাহায্যে এক দেহ থেকে আর এক দেহে সংক্রামিত হয়। এই মক্ষিকাগুলো আফ্রিকার বিষুবরেখা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এদের আক্রমণে মানুষ বা গৃহপালিত পশু যে কেবল কঠিন নিদ্রারোগে আক্রান্ত হয় তা নয়, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, আফ্রিকার গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলে মোট ৬,৫০,০০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে কম করেও ২,০০০,০০০ লোক ভয়াবহ নিদ্রারোগে ভুগছে। সেজন্যে টাঙ্গানাইকার দুই-পঞ্চমাংশ মাত্র বসবাস বা চাষের উপযোগী, বাকী অংশ সেট্‌সি মক্ষিকার উপদ্রবে একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য। বিজ্ঞানীদের মতে ২১ রকমের সেট্‌সি মক্ষিকা নিদ্রারোগ বিস্তারে সক্ষম। সেই সঙ্গে এও জানা গিয়েছে যে, কয়েক রকমের গাছ-পালা এবং বিশেষ ধরণের আবহাওয়ার মধ্যে তারা প্রসার লাভ করে।

এই রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালানো সহজ সাধ্য নয়, তা সময় সাপেক্ষ। বহু কীটতত্ত্ববিদ্ এ সম্পর্কে বহু গবেষণা করেছেন। বর্তমানে মক্ষিকাগুলোর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করে তার বিস্তার রোধ করার পরিকল্পনা হয়েছে। বিমানের সাহায্যে উপর থেকে ডি-ডি-টি'র ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। সেই সঙ্গে নবাবিষ্কৃত শক্তিশালী প্রতিকারক ভেষজ অ্যান্‌ট্রিপোল (Antrypol) এবং ট্রাইপার-সামাইডের (Tryparsamide) ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের ব্যাপক ব্যবস্থা সত্ত্বেও মক্ষিকার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

উত্তর নাইজেরিয়ার আন্‌চাউ সহর নিদ্রারোগের জন্যে বহুকাল ধরে কুখ্যাতি অর্জন করে এসেছে। সহরটি যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। এই সহরটিকে নিদ্রারোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে মাত্র দশ বছরের মধ্যে প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল এলাকা থেকে সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলা হয়। নূতন ভাবে সহর পত্তন করা হয়। এখন তা পুরোপুরি স্বাস্থ্যসমৃদ্ধি লাভ করেছে। এর সমস্ত কৃতিত্ব হলো ডাঃ এইচ, এম, লেস্টার, ডাঃ টি, এ, এম. ন্যাশ এবং ডাঃ কেনেথ মরিস-এর।

পীতজ্বরের অবসান

পীতজ্বরের বিরুদ্ধেও একদিন এই ভাবে জয়লাভ করা সম্ভব হয়। সে জয়লাভের ইতিহাসও রোমাঞ্চকর। ইংরাজ বিজ্ঞানীরা জীবন বিপন্ন করে কিভাবে রোগের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন তা আজ আর কারো অজানা নেই। একশ' বছর পূর্বে একবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই দুর্ধর্ষ পীতজ্বরের মড়কে সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল, এমন কি, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকাও এই মড়কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি।

যে বীজাণু থেকে এই রোগের উৎপত্তি তা এক রকমের অতি ক্ষুদ্র 'ভাইরাস'। জ্বরের প্রথম তিন দিন তা রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ থেকে অন্য দেহে 'এডিস ইজিপ টি' (Aedes aegypti) নামে এক রকমের "বাঘা মশা"র দ্বারা সংক্রামিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই ধরণের মশার বাস লোকালয়ে হওয়ায় ডি-ডি-টির সাহায্যে তা দূর করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলে পীতজ্বরও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকার জনবহুল এলাকা থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের প্রধান প্রধান রোগের বিরুদ্ধে কিভাবে এতকাল সংগ্রাম হয়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হলো। এ কথা আদৌ অতিরঞ্জিত নয় যে, একমাত্র কুষ্ঠরোগ ছাড়া সমস্ত রকম গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় রোগের প্রতিকার সম্ভব হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক আজ অকাল মৃত্যু বা অকারণ রোগ ভোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নব জীবনের স্বাদ লাভ করেছে। এই দুরূহ কর্তব্য পালনের জন্যে, বৃটেনের 'কলোনিয়াল মেডিক্যাল সার্ভিসে'র সদস্যগণ বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। তাঁরা সর্বরকম অন্যায় সমালোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জনকল্যাণে যেভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন তা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। বি, আই, এস,

মুরগী পালন সম্পর্কিত গবেষণা

বহু প্রাচীন কাল থেকে মানুষ খাদ্যের জন্যে হাঁস, মুরগী পালন করে আসছে; কিন্তু এই কাজে বা এর আনুসঙ্গিক সমস্যাবলীর সমাধানে বৈজ্ঞানিক উপায়সমূহ প্রয়োগের চেষ্টা বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে করা হয়েছে বলে জানা যায় না।

আলোর সাহায্যে প্রত্যেকটি ডিমকে পরীক্ষা করে বাছাই করা হচ্ছে।

হাঁস-মুরগী পালন সংক্রান্ত নানা প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্যে বৃটেনে অনেকগুলো গবেষণা কেন্দ্র আছে। এডিনবরার গবেষণা কেন্দ্রটি তার মধ্যে অন্যতম। মুরগী ও ডিম মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য বটে, কিন্তু এগুলোর অন্য ব্যবহারও আছে। শ্রমশিল্প ও ভেষজশিল্পে ডিমের ব্যবহার অল্প নয় এবং মুরগী নিয়ে গবেষণার ফলে মানুষের কয়েকটি গুরুতর রোগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। বেরিবেরি রোগের কারণ ও রোগ নিবারণের উপায় আবিষ্কার মুরগী নিয়ে পরীক্ষার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় রক্ষিত মুরগীর হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা হচ্ছে।

জীববিজ্ঞাবিদ্‌দের গবেষণার জন্যে মুরগী একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাণী। মুরগীর জন্ম, বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং মুরগীর দেহে নানা প্রকার পরীক্ষাকার্য চালিয়ে জীববিদ্যা সংক্রান্ত নানা সমস্যায় সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।
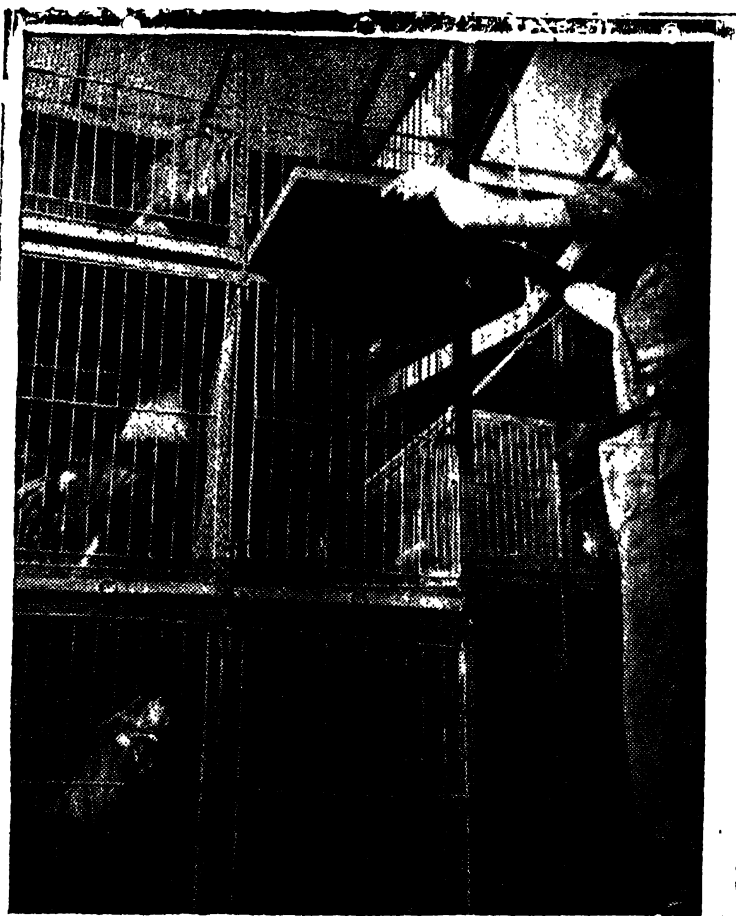
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মুরগীগুলোকে পরীক্ষাগৃহে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে এই পরীক্ষাগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এডিনবরা গবেষণা কেন্দ্রে প্রয়োজনের অধিক মুরগী পালন করা হয়। প্রত্যেকটি মুরগীর বংশ ও জীবনেতিহাস স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করা হয়। অতিরিক্ত মুরগীগুলো অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

ক্যানসার রোগ সম্পর্কে গবেষণার কয়েকজন চিকিৎসক সম্প্রতি এই গবেষণা কেন্দ্রে কয়েকটি মুরগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে ওই পক্ষিগুলোর মধ্যে ক্যানসার রোগ প্রতিরোধের অদ্ভুত শক্তি আছে। এর ফলে ক্যানসার রোগের নতুন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প নয়।

মোরগের ঝুঁটিতে সামান্য পরিমাণে প্রয়োগ করে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় ওষুধের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়।

এডিনবরা গবেষণা কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হয় ২০ বছর পূর্বে। ১৯৩৭ সালে কৃষি গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে বর্তমান গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক ও জীববিদ্যাসংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধানে এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে এই গবেষণা কেন্দ্রের দান

ক্যালীর ঘটিত টিউমারে বহু মুরগীর মৃত্যু ঘটে থাকে। এই রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্যে তাজা ডিমের ভিতর
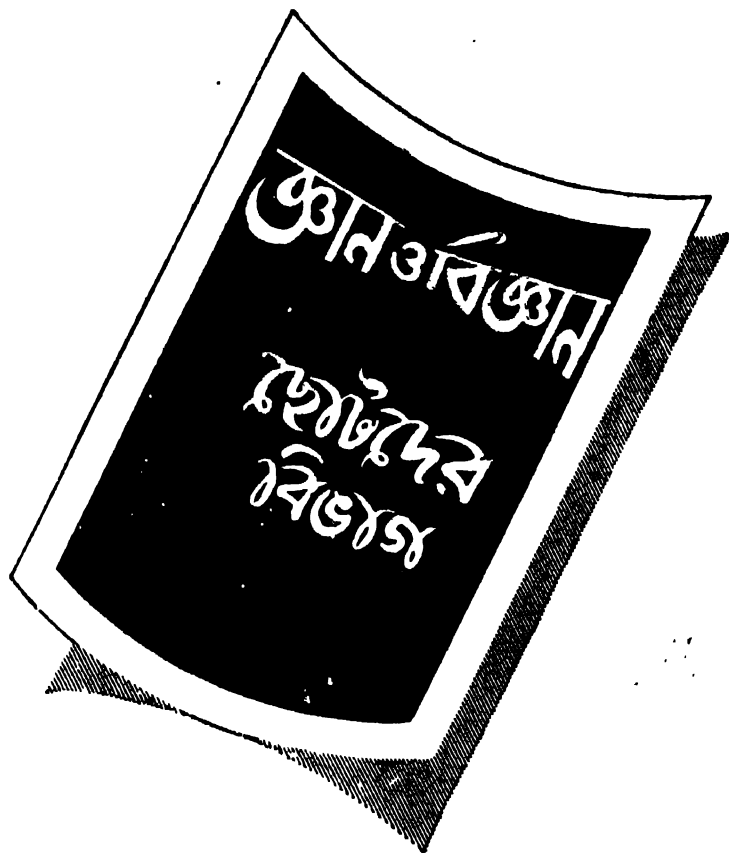
ডিসেম্বর—১৯৪৯

আগামী মাসের জন্যে তোমাদের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়ে ছোট্ট প্রবন্ধ পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি। জানুয়ারি, '৫০ এর ২৫ তারিখের মধ্যেই প্রবন্ধ আমাদের হাতে আসা দরকার। সর্বোৎকৃষ্ট লেখাটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হবে।

ফুল ফোটে কেন?

১। ফল ধরবার জন্যেই ফুলের প্রয়োজন।

২। ফুলের মধ্যে এবং গাছের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে।

৩। পুং-ফুলে রেণু জন্মে—স্ত্রী-ফুলে রেণু নেই

৪। মৌমাছি, ভ্রমর ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের সাহায্যে পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলে সংলগ্ন হয়। এর ফলেই ফুল থেকে ফলের উৎপত্তি হয়।

৫। বিভিন্ন গাছের ফুল ফোটা ও রেণু পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে কি জান, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণন কর।

করে দেখ

পল্‌তে শূন্য বাতি

লোহা কঠিন পদার্থ হলেও উপযুক্ত উত্তাপ প্রয়োগে তরল হয়ে যায়। আবার তেল, জল প্রভৃতি তরল পদার্থ উত্তপ্ত হলে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। কেরোসিন তেলে পল্‌তে ডুবিয়ে আমরা আলো জ্বালি, কিন্তু সেই তরল কেরোসিনকে উত্তাপ প্রয়োগে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করলে পল্‌তে ছাড়াই তাতে আলো জ্বালানো চলে। কেরোসিন ষ্টোভ জ্বলবার কারণও এই। পল্‌তের সাহায্যে মেথিলেটেড্ স্পিরিট দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। কিন্তু পল্‌তে ছাড়াও সহজেই মেথিলেটেড্ স্পিরিটের আলো জ্বালানো চলে। এটা তোমরা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার; তবে খুব সাবধানে করবে, কারণ এতে অতি সহজেই আগুন ধরে যায়।

পল্‌তে বিহীন স্পিরিট বাতির নমুনা

সাধারণ একটা টেষ্ট-টিউব সংগ্রহ কর। টেষ্ট-টিউবটার মুখে বেশ আঁট হয়ে বসতে পারে এরকমের একটা কর্কের মধ্যে ছিদ্র করে তাতে ছোট্ট একটা কাচের নল বসিয়ে দাও। কর্কের নীচে কাচের নলটা যেন অতি সামান্যই বেরিয়ে থাকে। টেষ্ট-টিউবটার মধ্যে খানিকটা মেথিলেটেড্ স্পিরিট ভর্তি করে কাচের নলসমেত কর্কটা এঁটে বসিয়ে দাও। এ অবস্থায় টেষ্ট-টিউবটাকে ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে বসিয়ে দিলেই কাচের নলের ভিতর দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসবে এবং একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিলেই নলের মুখে বাতি জ্বলতে থাকবে। একটু বুদ্ধি করে করলে অন্য ভাবেও মেথিলেটেড্ স্পিরিটের গ্যাসের সাহায্যে পল্‌তে বিহীন স্পিরিট বাতি তৈরী করতে পার।

সীসার গাছ

তোমরা অনেকেই হয়তো তুঁতে, চিনি, মিছরি প্রভৃতি পদার্থের দানাবাঁধার ব্যাপারটা দেখে থাকবে। এরকমের আরও অনেক জিনিস আছে যারা বিভিন্ন রকমের বিচিত্র সজ্জায় দানা বেঁধে থাকে। এরূপ সুদৃশ্য দানা বাঁধবার একটা পরীক্ষার কথা বলছি। খুব সহজেই পরীক্ষাটা করে দেখতে পারবে।

মোটা-মুখ একটা সাদা বোতল এবং তার মুখে এঁটে বসতে পারে এরূপ একটা কর্ক যোগাড় কর। কর্কটার ভিতর দিয়ে কতকগুলো সরু পেতলের তার চালিয়ে দাও। তারগুলোর প্রান্তভাগ দিয়ে একখণ্ড দস্তার পাতকে ঘুরিয়ে বেঁধে দিতে হবে। অথবা একখণ্ড দস্তার পাতের মধ্যে কতকগুলো ছিদ্র কর। সেই ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে এক

বোতলের মধ্যে সীসার গাছ।

একটা তারের প্রান্তভাগ প্রবেশ করিয়ে দাও। তারের প্রান্তভাগ বঁড়শী বা হুকের মত করে বাঁকিয়ে দিলেই দস্তার পাতখানা ঝুলে থাকবে। এই পরীক্ষার জন্যে একটা

রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করতে হবে। সেটা হচ্ছে – সুগার অফ লেড্। (সুগার অফ লেড্ বললেও এর সঙ্গে কিন্তু সুগার অর্থাৎ চিনির কোন সম্বন্ধ নেই। রাসায়নিকের ভাষায় একে বলে—লেড্ অ্যাসিটেট। এর একটু মিষ্টি স্বাদ আছে বটে; কিন্তু পদার্থটা বিষ। একথাটা বিশেষভাবে মনে রেখে কাজ করবে।) এই লেড্ অ্যাসিটেটের সলিউশন দিয়ে বোতলটাকে প্রায় পুরোপুরি ভর্তি কর। এবার দস্তার ঝুলানো পাত সমেত কর্কটাকে বোতলের মুখে বেশ করে এঁটে দিয়ে বোতলটাকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখ। কিছুকাল পরেই দেখতে পাবে—ঝুলানো তারগুলোর চতুর্দিকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য দানা জমে উঠেছে এবং এই দানাবাঁধার ব্যাপারটা ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। দেখে মনে হবে যেন একটা সজীব উদ্ভিদ ধীরে ধীরে ডালপালা গজিয়ে বেড়ে উঠছে। একেই বলা হয়—সীসার গাছ। দিনের পর দিনই গাছটার ডালপালা বিস্তৃত হতে থাকবে।

অ্যালুমিনিয়ামের উপর ক্রমবর্ধমান ছত্রাকের মত দানাবাঁধা

জীবন্ত না হয়েও দানা বাঁধবার সময় কতকগুলো পদার্থ যে সজীব বস্তুর মত বেড়ে ওঠে, তার আর একটা পরীক্ষার কথা বলছি। এ পরীক্ষাটা আরও সহজে করে দেখতে পার।
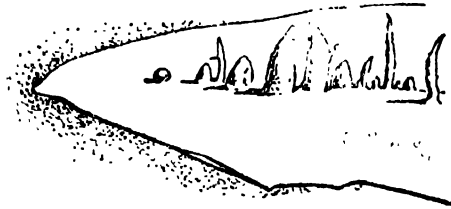
অ্যালুমিনিয়াম-পাতের উপর কোমল পশমের মত জিনিস গজিয়ে উঠছে।

যে কোন রকমের এক টুকরা অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করে তাকে শিরিষ কাগজ দিয়ে বেশ করে ঘষে পরিষ্কার করে নাও। টুকরাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তার উপর দু-এক ফোঁটা পারা (mercury) ঘষে দাও। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে—অ্যালুমিনিয়াম টুকরার যেখানে যেখানে ভাল ভাবে পারা লেগেছে সেসব জায়গা থেকে ঠিক কোমল পশমের মত সাদা এক রকম পদার্থ বেরিয়ে আসছে। চোখের সামনেই দেখতে দেখতে সেগুলো ক্রমশ লম্বায় বেড়ে যাবে। কোন কোনটা আধ ইঞ্চিরও বেশী বড় হয়ে উঠবে। আসলে জীবন্ত না হলেও এই বাড়ন্ত পদার্থগুলোকে এক রকমের বেঙের ছাতা জাতীয় সজীব উদ্ভিদ বলেই মনে হবে।

গ, চ, ভ,

জেনে রাখ

মাদকতা উৎপাদক, অবসাদক ও উত্তেজক ওষুধের কথা

নারকটিক অর্থাৎ মত্ততা উৎপাদক, নিদ্রাকর্ষক বা

সংজ্ঞাপহারক ওষুধ।

ম্যারিজুয়ানা (Marijuana)—হেম্প বা শণ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদের পাতা ও ফুল থেকে ম্যারিজুয়ানা উৎপাদিত হয়ে থাকে। সিগারেট ইত্যাদির মত করে এর ধূম পান করা হয়। ব্যবহারের প্রায় এক ঘণ্টা পর এর মাদকতা সুরু হয়। কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে এর কোন উপযোগিতা নেই।

হ্যাসিস্ (Hashish)—আমাদের দেশীয় প্রচলিত নাম—ভাং। অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রাচ্যের অধিবাসীরা ভাং ব্যবহার করে আসছে। ভাঙের ধূম পান করা হয়; আবার অনেক ক্ষেত্রে ভাং চিবিয়ে বা বেটে খাওয়াও হয়।

আফিং (Opium)—পপি গাছের বীজাধার থেকে আফিং পাওয়া যায়। লোকে আফিঙের ধূম পান করে অথবা অমনি গিলে খায়। আফিঙের নেশায় লোক অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মরফিন ও অন্যান্য কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় উপক্ষার এই আফিং থেকেই পাওয়া যায়।

মরফিন (Morphine)—আফিং থেকেই মরফিন তৈরী হয়। বিভিন্ন রকমে ব্যবহৃত হলেও ওষুধ হিসেবেই এর ব্যবহার হয় বেশী। মরফিয়া গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা ইনজেকসনের সাহায্য নিয়ে থাকে।

হিরোইন (Hiroin)—মরফিন-জাত সব রকমের ওষুধের মধ্যে হিরোইনই সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। হিরোইনকে ইন্‌জেকসনেও ব্যবহার করা হয়; কিন্তু হিরোইন এত বিপজ্জনকযে, এর ব্যবহার একটা গুরুতর সমস্যায় দাঁড়িয়েছে।

কোকেন (Cocaine)—দক্ষিণ আমেরিকার কোকা বৃক্ষ হতে উৎপাদিত হয়। নস্যের মত করে, চিবিয়ে খেয়ে বা ইনজেকসনের সাহায্যে কোকেন ব্যবহৃত হয়।

বেদনানাশক ঔষধ
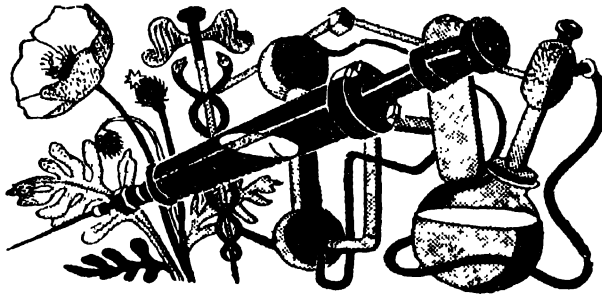
মরফিন (Morphine)—১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মরফিন প্রথম উৎপাদিত হয়। আজ পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মরফিন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে ব্যবহারকারী যাতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে এরূপ পদার্থ উৎপাদনের জন্যে জোর গবেষণা চলছে।

কোডেইন (Codeine)—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মরফিন থেকে কোডেইন প্রস্তুত করা হয়। ইহা কাশি এবং ব্যথা-বেদনায় ব্যবহৃত হয়। এর মূল ঔষধ মরফিনের মত ইহা অভ্যাসগত হয়ে পড়ে না। কিন্তু মরফিন অপেক্ষা এর কার্যকরীশক্তি কিছু কম।

মেটাপন (Metapon)—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মরফিন থেকে মেটাপন নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। বেদনা উপশমে মরফিনের চেয়ে ইহা দ্বিগুণ শক্তিশালী ; কিন্তু ইহাও অভ্যাসগত হয়ে পড়ে। মেটাপন গিলে খাওয়াও চলে। এতে মানসিক অবসাদ কম হয়। দুর্মূল্যতার দরুণ এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

ডেমেরল (Demerol)—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কৃত্রিম উপায়ে ডেমেরল তৈরী করা হয়েছে। এটা প্রকৃতপক্ষে সিন্থেটিক মরফিন ছাড়া আর কিছুই নয়। মরফিনের চেয়ে এর মাত্রা দশগুণ বেশী দেওয়া যেতে পারে ; কারণ এর বিষক্রিয়া যথেষ্ট কম। প্রায় মরফিনের মতই বেদনানাশক শক্তি আছে। এর আর একটা সুবিধা এই যে, ব্যবহারে লোকে তেমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না।

মেথাডন (Methadon)—যুদ্ধের সময় জার্মেনীতে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৪৭ সাল

থেকে আমেরিকায় প্রচলন স্থুরু হয়। মেথাডন বেদনা উপশম করে এবং মরফিনের মত বমনোদ্রেক করে না। কিন্তু আনন্দের অনুভূতিও আনে না। মেথাডন খুবই কম অভ্যাসগত হয় এবং মরফিনের অভ্যাস দূর করার জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিডেটিভ অর্থাৎ নিদ্রাকর্ষক, সিগ্ধকারক বা মোহ উৎপাদক ঔষুধ

ক্লোর‍্যাল (Chloral)—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ক্লোর‍্যাল আবিষ্কৃত হয়। নিদ্রাদায়ক ওযুধ হিসেবে বহুদিন থেকেই এর খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু বহুদিন ব্যবহারে এটা অভ্যাসগত হয়ে পড়ে এবং গুরুতর বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এজন্যে আজকাল ক্লোর‍্যাল খুবই কম ব্যবহৃত হয়।

সালফানল (Sulfanol)—সালফানল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্লোর‍্যালের পরিবর্তে ইহা প্রয়োগ করা হতো ; কিন্তু বারবিচ্যুরেট্স আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে সালফানল আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। সালফানলও অভ্যাসগত হয়ে পড়ে।

বার্‌বিচ্যুরেট্স্ (Barbiturates)—এমিল ফিসার কর্তৃক বার্বিট্যালের নিদ্রাকর্ষক গুণের বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হতে বার্বিচ্যুরেট্স্-এর প্রচলন স্থুরু হয়েছে। ইহা ব্যবহারে নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব হয় এবং এনেস্‌থেটিক্‌সের মত স্নায়ুগুলোকে শিথিল করে দেয়। বারবিচ্যুরেট্স্ কিন্তু খুববেশী অভ্যাসগত হয়ে পড়ে না ; কিন্তু অনেক সময় ক্ষতিসাধন করে—এমন কি অকস্মাৎ এতে জীবন হানির কথাও শোনা যায়। বারবিচ্যুরেট্স্ কতকগুলো বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। প্রকারভেদ অনুযায়ী এদের ফলাফলেও অনেক পার্থক্য রয়েছে ; তবে পার্থক্যটা প্রধানতঃ এদের কার্যকরী শক্তির স্থায়িত্বের সময় সম্পর্কিত। এর মধ্যে সাধারণ কতকগুলোর নাম দেওয়া হলো :—

বার্বিট্যাল বা ভেরোন্যাল Barbital (Veronal)—বার্বিচ্যুরেট্স্ শ্রেণীর প্রথম আবিষ্কৃত ওষুধ হলো বার্বিট্যাল বা ভেরোন্যাল। ৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এর প্রভাব স্থায়ী হতে পারে।

ফেনোবার্বিট্যাল বা লুমিন্যাল Phenobarbital (Luminal)—লুমিন্যালে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা এর বড় বড় গুলি ব্যবহার করে থাকেন। এর ক্রিয়া প্রায় ৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে।

পেন্টোবার্বিট্যাল বা নেম্বুট্যাল Pentobarbital (Nembutal)—পেন্টোবারর্বিট্যাল স্নায়বিক খেঁচুনি উৎপাদক বিষক্রিয়ার প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রায় ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ক্রিয়া স্থায়ী হয়।

পেন্টোথ্যাল (Pentothal)- পেন্টোথ্যালকে সাইকিয়াট্রিতে ব্যবহার করা হয়। ফল ক্ষণস্থায়ী।

পাইরিডিন্স্ বা প্রেসিডন Pyridines (Presidon)—পাইরিডিন্স্ নামক নতুন ওষুধটি এই বছরই আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনের অস্থিরতাবোধে এবং রাত্রির নিদ্রাহীনতায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ফল দীর্ঘস্থায়ী। ব্যবহারে সাধারণতঃ অন্য উপসর্গ দেখা দেয় না। বার্বিচ্যুরেট্স্ অপেক্ষা ইহা কমই অভ্যাসগত হয়।

উত্তেজক ঔষুধ
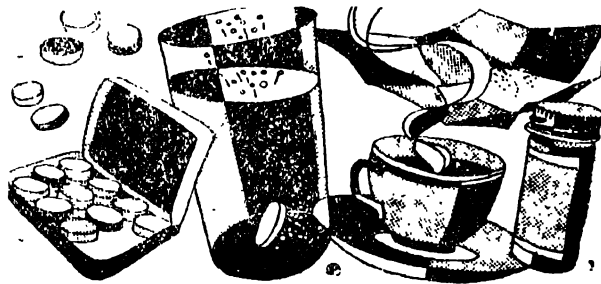
কেফিন (Caffeine)—ওষুধটা প্রস্তুত হয়েছে চা এবং কফি থেকে। ইহা খেলে শরীরে মৃদু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অমিশ্রিত অবস্থায় ইহা অল্প পরিমাণে ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বেঞ্জিড্রিন (Bengedrine)—বেন্জিড্রিন এপর্যন্ত নাসিকা পরিষ্কারে এবং মনের সজীবতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। এক সময়ে বেঞ্জিড্রিন পেপ-পিল-এর মত ব্যবহৃত হতো। কিন্তু মাঝে মাঝে জীবনহানি ঘটার দরুণ বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছে।

ব্রোমাইড্স্ (Bromides)—ব্রোমাইড বারবিচ্যুবেট্স্-এর মতই কার্যকরী। বর্তমানে ইহা প্রচুর পরিমাণে চিকিৎসা কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণতঃ ব্রোমাইড মাথাধরা প্রভৃতিতে বেশ কাজ করে। অত্যধিক ব্যবহারে 'ব্রোমিজ্‌ম্' অর্থাৎ শরীরে চাকাচাকা দাগ, বিতৃষ্ণা, খেঁচুনী ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

অ্যাসপাইরিন (Aspirin)—১৮৭৫ সাল অবধি উইলো গাছের ছাল থেকে এ-জিনিস উৎপাদিত হচ্ছিল। এই ছাল হতে স্যালিসিলিক অ্যাসিড বের করা হয়। এই স্যালিসিলেটই (অ্যাস্পাইরিন যার মধ্যে বেশী প্রচলিত) কম উত্তেজক, বেদনানাশক এবং বিশেষ করে মাথাধরায় ও সান্নিপাতিক জ্বরে কাজ দেয়। এস্পিরিনের মত মিশ্রণেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

গ, চ, ভ,

"আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্যক্ষেত্রে প্রত্যহই শিখিতেছি, দিন দিন অগ্রসর হইতেছি, এবং বাড়িতেছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'গাছের উপর যে পাখীটি বসিয়া আছে তাহাই লক্ষ্য, পাখীটি কি দেখিতে পাইতেছ?' অর্জুন উত্তর করিলেন, 'না পাখী দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বিঘ্ন বাধার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

ব্যাঙের জীবন
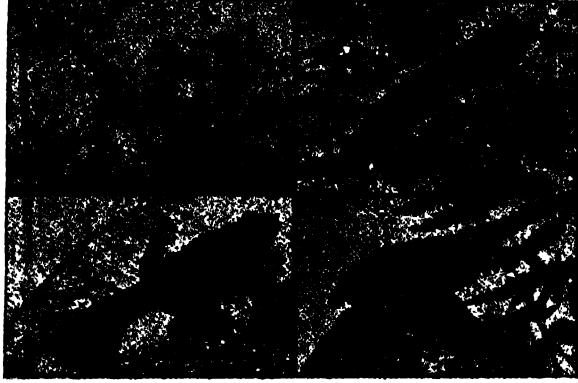
বর্ষা সুরু হইবার পর হইতে কিছুকাল পর্যন্ত নালা, ডোবা বা অপরিচ্ছন্ন জলাশয়ে অনবরত ব্যাঙের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ এটাই ব্যাঙের ডিম পাড়িবার সময়। বর্ষা সুরু হইলেই রাত্রির অন্ধকারে কুণো ব্যাংগুলি আনাচ-কানাচ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জলে পড়ে এবং ডিম পাড়িবার জন্য প্রস্তুত হয়। সোনা ব্যাং, গেছো ব্যাং, কটকটে ব্যাং সকলেই প্রায় এই সময়ে ডিম পাড়ে। তবে সময়ের কিছু তারতম্য আছে। আমাদের দেশে সোনা ব্যাং, কুণো ব্যাং এবং কটকটে ব্যাং-ই সচরাচর বেশী দেখা যায়। অবশ্য গেছো ব্যাং-ও কম নয়। এদের প্রত্যেকেরই ডিম পাড়িবার রীতি বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ একটা সামঞ্জস্য আছে। কুণো ব্যাং জলজ লতাপাতার মধ্যে খুব লম্বা দুই ছড়া মালার মত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি কালো সাগুদানার মত, জেলীর ন্যায় একটা পদার্থের লম্বা সূতায় পর পর সাজান থাকে। সোনা ব্যাং বা কোলা ব্যাঙের ডিম কিন্তু মালার আকারে সাজান থাকে না; সেগুলি ছোট ছোট জেলীর চাপড়ার মত একটা পদার্থের মধ্যে আটকানো অবস্থায় জলের উপর এখানে সেখানে ভাসিয়া থাকে। কুণো ব্যাং ডিম পাড়িবার পর দুই একদিনের মধ্যেই সরু সরু লম্বা ও চ্যাপ্টা টুকরার মত মিশকালো বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি জলের ঘাসপাতা আঁকড়াইয়া দুই তিন দিন প্রায় নিশ্চলভাবেই থাকে; তবে মাঝে মাঝে শরীরটাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাঁপাইতে কাঁপাইতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। ৩।৪ দিনের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া সাধারণ ব্যাঙাচির অবস্থায় উপনীত হয়। ডিম্বাকার ছোট্ট একটু গোল জিনিস—পিছনে আছে একটা লম্বা লেজ—এই হইল ব্যাঙাচি। দেখিতে দেখিতে ব্যাঙাচি ক্রমশঃ আকারে

বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কুণো ব্যাঙের পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙাচির চেহারা প্রায় ছোট্ট একটা লেজওয়ালা কালো কিসমিসের মত। দশ পনেরো দিনের মধ্যেই ব্যাঙাচির শরীরের পরিবর্তন দেখা যায়—তখন পিছনের পা দুইটা গজাইতে থাকে। সামনের পা তখনও দেখা দেয় নাই, তার পর গজায়। সামনের পা গজাইবার পর ব্যাঙাচি মোটামুটি ব্যাঙের আকৃতি ধারণ করে, অবশ্য লেজটা থাকে। তবে তখন বাচ্চাটা খুবই ছোট্ট থাকে—দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ ইঞ্চিরও কম। চার পা আর লেজ সমেত ছোট্ট ব্যাঙের ছানা আরও দুই একদিন জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। কিন্তু তখন আর জল হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার পূর্বের মত সুবিধা থাকে না। কাজেই জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিতে হয়। জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিবার পর লেজটা ডগার দিক হইতে ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং কিছুকাল পরে আর তার চিহ্ন থাকে না। ব্যাঙাচি লেজের সাহায্যেই জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ডাঙ্গায় উঠিলে তাহার খাদ্যবস্তু হয়—ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ। এই জন্য তখন পায়ের উপরই নির্ভর করিতে হয়; কাজেই লেজের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

সোনা ব্যাঙের ব্যাঙাচি কিন্তু দেখিতে কুণো ব্যাঙের ব্যাঙাচির মত কালো নয়। এরা আকারেও বেশ বড় হয় এবং গায়ের রং হয় ইহাদের অনেকটা কালচে সাদা। ইহারা কিন্তু কালো ব্যাঙাচির মত অনবরত শ্যাওলা প্রভৃতি খাইয়া বড় হয় না। ইহারা ঠিক শিকারী পাখীদের মত ছো-মারিয়া জলজ কীট-পতঙ্গ শিকার করিয়া উদর পূরণ করে। এই ব্যাঙাচিগুলিকে মোটেই ব্যাঙাচি বলিয়া মনে হয় না; অনেকেই ছোট্ট মাছ বলিয়া ভুল করে। ইহাদেরও শরীরের পরিবর্তন কুণো ব্যাঙের ব্যাঙাচিদের মতই হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গেছো ব্যাঙের একটানা ডাক শোনা যায় বটে, কিন্তু অনেকেই সেগুলিকে চাক্ষুষ দেখিতে পায় না; কারণ তাহারা গাছের গায়ে বেমালুম আত্মগোপন করিয়া থাকে। বর্ষার শেষের দিকেই ইহারা বেশীর ভাগ ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিম পাড়িবার কায়দা আবার আশ্চর্য ধরণের। বর্ষার সময় খাল-বিলের জলের ধারে জলসংলগ্ন লতা-পাতার গায়ে সাদা বলের মত একরকম জিনিস ঝুলতে দেখা যায়। এগুলোকে সাধারণতঃ লোকে ভূতের থুথু বলে। আসলে এই-গুলি গেছো ব্যাঙের শরীর হইতে বহিষ্কৃত ফেণা। এই ফেণার ডেলার মধ্যেই গেছো ব্যাং ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া ওই ফেণার ডেলার মধ্যেই ছোট ছোট ব্যাঙাচিগুলি বাড়িতে থাকে। কিছু দিন উহার ভিতরে থাকিবার পর বাচ্চাগুলি ক্রমাগত জলের ভিতর পড়িতে থাকে। জলের মধ্যে সাধারণ ব্যাঙাচি জীবনের বাকী অংশটা কাটাইয়া ব্যাঙের রূপ ধারণ করে।

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
(দশম শ্রেণী)।